কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল

কলি. বিশ্ব. পুঁথি-১৯৮৪

(দেড়শত বৎসরের প্রাচীন পুঁথি)

[পৃঃ ৭৯

[redacted] সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

উত্তর-চৈতন্যযুগ

প্রথম খণ্ড

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., ডি.ফিল.,
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি
কলিকাতা

তন্ত্রবিভূতির মনসামঙ্গল

(ব্যক্তিগত সংগ্রহ—১২৫১ বঙ্গাব্দের পুঁথি)

[পৃঃ ৯৯



প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬০

ম এজেন্টস্ ঃ

আজাদ এণ্ড কোং

হোস্টেল রোড

।-১



ব্যাঘ্রবাহন দক্ষিণরায়

(হাওড়া শহর)

[পৃঃ ১৪৭

করিয়াছিলেন। যাহা হউক ওসমান খাঁ নিহত হইলে (১৬১২ খ্রীঃ অঃ) মুঘলশক্তির বিরোধী পক্ষ ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে হতবল হইয়া পড়িল। অতঃপর ইসলাম খাঁ বহু সংঘর্ষের পর শ্রীহট্ট, কাছাড় ও কামরূপ জয় করিয়া লইলেন। ১৬১৬ খ্রীঃ অব্দে ইসলাম খাঁয়ের আকস্মিক মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাসিম খাঁ মুঙ্গের হইতে বাঙলায় আসিয়া সুবাদারী পদ গ্রহণ করিলেন। কুড়ি বৎসর সুবাদারী (১৬১৩-১৬৩৩) করিলেও তিনি এমন কোন শাসনকৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই, যাহাতে তিনি জ্যেষ্ঠের মতো গৌরব লাভ করিবেন। তাঁহার দুর্বলতা ও অন্যায় ব্যবহারের ফলে মুঘলশাসন ও সেনাবাহিনীতে নানা বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল। কুচবিহার, কামরূপ, কাছাড়ে আবার প্রবলভাবে মুঘলবিরোধিতা দেখা দিল। আরাকানের মগদস্যুরা মুঘলশাসনের দুর্বলতার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিল; তাহারা ১৬১৪-১৫ খ্রীঃ অব্দে পর্তুগীজ বোম্বেটেদের সঙ্গে যোগ দিয়া ভুলুয়ায় ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিল। যাহা হউক, আরাকান ও পর্তুগীজদের মধ্যে মনোমালিন্য ও বিরোধের অবকাশে মুঘলবাহিনী অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া আরাকান-রাজকে চট্টগ্রামে পলাইয়া যাইতে বাধ্য করিল। কিন্তু আসাম অভিযান (১৬১৫) সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইল; চট্টগ্রাম আক্রমণ করিতে গিয়াও মুঘলবাহিনীর দুর্দশার সীমা রহিল না। ১৬১৬ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে মুঘল সেনাপতি চট্টগ্রাম হইতে লোকলস্কর উঠাইয়া লইয়া জাহাঙ্গীর নগরের দিকে (ঢাকা) পলাইয়া আসিলেন। ইহার পর ইব্রাহিম খাঁ ফতে জঙ্গ বাঙলার সুবাদারীপদে যোগদান করিয়া বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও সামরিক কুশলতার দ্বারা হৃতগৌরব মুঘলমহিমাকে পুনরায় স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, পূর্বের সুবাদারগণ বিদ্রোহী পাঠান ও হিন্দু সামন্তদিগকে ঢাকায় কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, ইহার ফল ভাল হইতেছে না। ইঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে হয়তো ইঁহাদের সহায়তা পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহারই চেষ্টায় জাহাঙ্গীর বিদ্রোহী কারারুদ্ধ ভুঁইয়া ও তাঁহাদের পরিজনদের মুক্তির আদেশ পাঠাইলেন। ইব্রাহিম খাঁ ঠিকই অনুমান করিয়াছিলেন। এই বিদ্রোহিগণ মুক্তি পাইয়া বিদ্রোহাচরণ ত্যাগ করিয়া মুঘলশক্তির সহায়ক হইয়াছিলেন। ১৬১৮ খ্রীঃ অব্দে ত্রিপুরা ও আরাকান বিজিত হইল। ইব্রাহিম খাঁ মুঘলবাহিনীর বিশৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া পূর্ব-বাঙলাকে

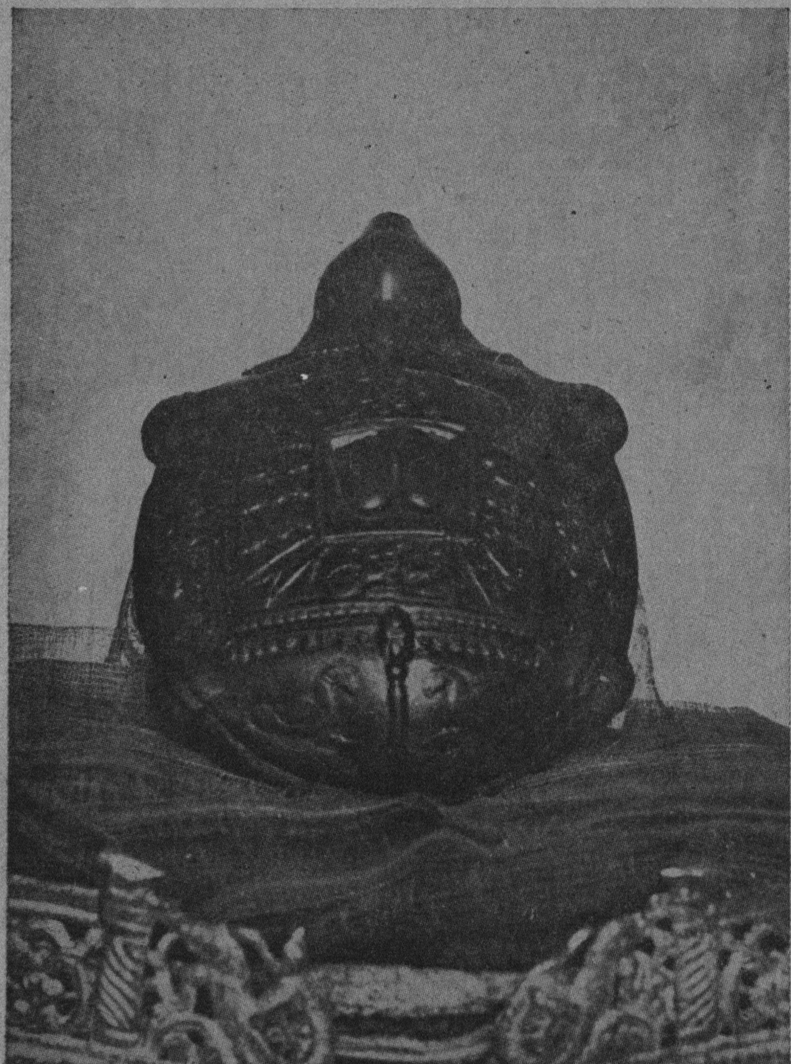


ধর্মরাজ ঠাকুর
(চব্বিশ পরগণার বহড়ু গ্রাম)

[পৃঃ ২৪২

যথার্থই নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে আনিলেন। কিন্তু শীঘ্রই এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইয়া ইব্রাহিম খাঁয়ের বিচক্ষণ শাসনব্যবস্থা বিপর্যস্ত করিয়া দিল। শাহ্‌জাদা শাহ্‌জাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া এই সময়ে বাঙলায় উপস্থিত হইলে ইব্রাহিম খাঁ প্রমাদ গণিলেন।

১৬২২ খ্রীঃ অব্দের দিকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার শাহ্‌জাহান বিমাতা নূরজাহানের আধিপত্যে শঙ্কিত ও সন্দিহান হইয়া পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন এবং আগ্রার অভিমুখে অভিযান চালাইতে বিফল হইয়া দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু আবার দাক্ষিণাত্য হইতে বাঙলার দিকে চলিলেন। ইতিপূর্বে সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহ্‌জাদাকে বাধা দিবার জন্য উড়িষ্যার সুবাদার মির্জা আহ্‌মদ বেগ খাঁ (ইব্রাহিমের ভ্রাতুষ্পুত্র) ও ইব্রাহিম খাঁকে ফারমান প্রেরণ করিলেন। এই অবস্থায় মির্জা আহম্মদ ও তাঁহার পিতৃব্য ইব্রাহিম উভয়সঙ্কটে পড়িলেন। ইহা তো পিতা-পুত্রের কলহ, মাঝখানে রহিয়াছেন ক্ষমতালোভী বুদ্ধিমতী নূরজাহান। এরূপ পারিবারিক কলহে বিশ্বস্ত সুবাদার কি করিবেন বুঝিতে পারিলেন না। শাহ্‌জাহান বাঙলায় আসিয়া বর্ধমানের ফৌজদারের নিকট প্রথম বাধা পাইলেন। যাহা হউক, শাহ্‌জাহান এখানে জয়লাভ করিয়া চলিলেন আকবর নগরের (রাজমহল) অভিমুখে। ইব্রাহিম খাঁ-ও বহু সৈন্য সামন্তসহ শাহ্‌জাদাকে বাধা দিবার জন্য আকবর নগরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। শাহ্‌জাহান প্রথমে তাঁহাকে নিজের দলে টানিয়া লইতে চাহিলেন, কিন্তু বিশ্বস্ত সুবাদার রাজপুত্রের অনুরোধ ও ভীতিপ্রদর্শন সত্ত্বেও প্রভু জাহাঙ্গীরের প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করিলেন না, বরং যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। সুচতুর শাহ্‌জাদা গোপনে গোপনে ইব্রাহিম খাঁয়ের পক্ষভুক্ত সেনাধ্যক্ষদের অনেককেই নিজদলভুক্ত করিয়া লইলেন এবং যখন সেনাধ্যক্ষ ও সৈন্যেরা পর্যন্ত শাহ্‌জাহানের পক্ষে যোগ দিলেন, তখন হতাশ ইব্রাহিম মুষ্টিমেয় অনুচরসহ শাহ্‌জাহানের বাহিনীর সঙ্গে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে সকলের অজ্ঞাতে নীরবে প্রাণদান করিলেন (১৬২৪)। বিজয়ী শাহ্‌জাহান আকবর নগর জয় করিয়া চলিলেন জাহাঙ্গীর নগর বা ঢাকার অভিমুখে। এখানে তিনি রাজকীয় অভ্যর্থনা লাভ করিলেন, তারপর জাঁকাইয়া বাঙলা শাসন করিতে শুরু করিলেন। উড়িষ্যা ও বাঙলার সর্বময় কর্তা হইয়া শাহ্‌জাহান চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন না, অতি-



স্বরূপনারায়ণের (ধর্ম) কূর্মমূর্তি

(হুগলী জেলার গোঘাট গ্রাম)

[পৃঃ ২৪৯

দ্রুত বিহার জয় করিয়া নিজ শাসনসীমা বৃদ্ধি করিলেন ; ইতিমধ্যে কুমার পরভেজ ও মহাবৎ খাঁ তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলে তিনি আগ্রার অভিমুখে বিজয়গর্বে যাত্রা করিলেন। জৌনপুর, অযোধ্যা, এলাহাবাদ ও চুণার দুর্গ শাহ্‌জাহানের করতলগত হইল, কিন্তু মির্জাপুরের নিকট সম্রাটের বাহিনীর সঙ্গে তাঁহাকে সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হইল। এই সুযোগে বাঙলার শাসকগণ, যাঁহারা তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙলা হইতে তাঁহাকে আর কোন সাহায্য পাঠাইলেন না। ফলে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে বিফলমনোরথ হইয়া লোকজন সহ পুনরায় রাজমহলে (আকবর নগর) ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু ব্যাপার সঙিন দেখিয়া অনুচরদের লইয়া আবার দাক্ষিণাত্যের দিকে প্রস্থান করিলেন। কুমার পরভেজ পিতার নির্দেশে শাহ্‌জাহানের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। মহাবৎ খাঁ এই সময়ে (১৬২৫-২৭) বাঙলা শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ওদিকে নূরজাহান তাঁহার উপর বিরূপ হইয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিলে তিনি দাক্ষিণাত্যে গিয়া বিদ্রোহী শাহ্‌জাহানের পক্ষেই যোগদান করিলেন। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে আরাকানরাজ আবার লুঠতরাজ শুরু করিয়া দিলেন। তখন ১৬২৬ খ্রীঃ অব্দের মাঝামাঝি মুকরম খাঁ নামক এক বিচক্ষণ ব্যক্তি বাঙলার সুবাদাররূপে প্রেরিত হইলেন। তাহার পর বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইলে জাহাঙ্গীর ফিদাই খাঁকে সুবাদার করিয়া বাঙলায় প্রেরণ করিলেন। তিনি বিশৃঙ্খলার অনেকটা দূর করিতে পারিয়াছিলেন। প্রতিবৎসর বাঙলা হইতে তিনি জাহাঙ্গীরকে পাঁচ লাখ ও নূরজাহানকে পাঁচ লাখ, মোট দশ লাখ টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। ১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইলে শাহ্‌জাহান সিংহাসন লাভ করিলেন, এবং ফিদাই খাঁয়ের স্থলে নূতন সুবাদার কাসিম খাঁকে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর শাহ্‌জাহানের শাসনকাল আরম্ভ হইল।

জাহাঙ্গীরের বাইশ বৎসর শাসনকালের মধ্যে বাঙলার উপর দিয়া নানা পরিবর্তনের স্রোত বহিয়া গিয়াছে। স্থানীয় পাঠান-আফগান ও হিন্দু ভূস্বামী-সামন্তদের সমস্ত স্বাতন্ত্র্য, শক্তি ও বিরোধিতা নষ্ট হইল, অহোম ও আরাকানের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষের সূত্রপাত হইলেও শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, কুচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলের সামন্তগণ সম্পূর্ণরূপে মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিলেন, কেহ-বা উৎখাত হইয়া গেলেন। অপরদিকে পর্তুগীজ বোম্বেটে ও আরাকান মগ

কাশীরাম দাসের মহাভারত

কলি. বিশ্ব. পুঁথি-১৭২৫

(১০৮৩ বঙ্গাব্দের পুঁথি)

জলদস্যুগণ এই সময়ে অনেকটা হতবল হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক জাহাঙ্গীরের শাসনকালে বাঙলাদেশ যে প্রভূত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

(খ) শাহ্‌জাহানের শাসন (১৬২৭-৫৮)॥

সম্রাট শাহ্‌জাহানের শাসনকাল বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগসূত্র রক্ষা করিয়াছিল। অবশ্য মুঘলশাসনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকটি বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনে কথঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলেও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে এই সাম্রাজ্যবাদী শাসনপ্রণালী কোনরূপ গভীর ও সুচিরস্থায়ী রেখা বিন্যাস করিতে পারে নাই।

শাহ্‌জাহানের ত্রিংশ বর্ষব্যাপী দীর্ঘ শাসনকালে গৌড়বঙ্গের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ঘন ঘন চরিত্র বদল না হইলেও দেশের পথ ও প্রান্তর যে পুনঃ পুনঃ অশ্ব-ক্ষুরধ্বনিতে বিঘ্নিত হইয়াছে, আম্রচ্ছায়াশীতল সদাসন্তুষ্ট জন-জীবনের অলস প্রশান্তি যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। বাঙলাদেশে শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে তিনটি প্রধান ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহার উত্তপ্ত উল্লাস এবং রঙ্গশালার ধড়াচূড়াধারী কুশীলবদের ঘন ঘন পালাবদলের কাহিনী, কিছু কিছু যুদ্ধবিগ্রহের বিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক শোষণক্রিয়ার ফলাফল বাঙালীর জীবনে পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছিল। সেই তিনটি ঘটনা—(১) মুঘলশাসনে হুগলীর পর্তুগীজ বন্দর বিনাশ ও বোম্বেটেদের ক্ষমতা হ্রাস, (২) আসাম অভিযানে মুঘলশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা, (৩) শাহ্‌জাহানের রাজত্বের শেষভাগে পুত্রদের ভাবী উত্তরাধিকার লইয়া দ্বন্দ্ব-কলহ।

শাহ্‌জাহানের রাজ্যপ্রাপ্তি (১৬২৮) হইতে সিংহাসন চ্যুতি ও বন্দিত্ব (১৬৫৮)—এই তিরিশ বৎসরের মধ্যে কাশিম খাঁ জুয়িনি (১৬২৮-৩২, ইনি নূরজাহানের ভগিনীপতি) আজম খাঁ মীর মুহম্মদ বাকর (ইরাদা৭ খাঁ, ১৬৩২-৩৫), ইসলাম খাঁ মাশাদি (১৬৩৫-৩৯), সাহজাদা সুজা (১৬৩৯-৪৭, ১৬৪৮-৫২, ১৬৫২-৫৮), মোট চারিজন সুবাদার বাঙলাদেশ শাসন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শাহ্‌সুজা প্রায় তিরিশ বৎসর নিরুদ্বেগে এদেশে সুবাদারী করিয়াছিলেন, অবশ্য মাঝখানে তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য বাঙলা হইতে কাবুল যাইতে হইয়াছিল।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল

কলি. বিশ্ব. পুঁথি ৫০২১

(১২৩২ বঙ্গাব্দের পুঁথি)

[পৃঃ ৯২১

সুজার সুবাদারী লাভ (১৬৩৯) ও বাঙলায় আসিবার পূর্বে যে কয়টি ঘটনা শাহ্‌জাহানের শাসনকালকে চিহ্নিত করিয়াছে, তন্মধ্যে মুঘলবাহিনী কর্তৃক পর্তুগীজ কেন্দ্র হুগলী অধিকার (১৬৩২), কামরূপ পুনরভিযান ও অধিকার (১৬৩৭-৩৮) এবং আরাকান যুদ্ধ (১৬৩৮) বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এই যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা উত্তর ও উত্তর-পূর্ববঙ্গ আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও, পশ্চিমবঙ্গে হুগলীতে পর্তুগীজ সংঘর্ষ বাদ দিলে এদেশে এমন কোন যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে নাই যাহা জনসাধারণের জীবন ও মনের উপর সুগভীর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত।

শাহ্‌জাহান বাদশাহ্ হইয়াই সর্বাগ্রে বাঙলার সুবাদার ফিদাই খাঁকে (জাহাঙ্গীর দ্বারা নিযুক্ত) বরখাস্ত করিয়া নিজ মনোনীত কর্মচারী কাশিম খাঁকে উক্তপদে নিয়োগ করিয়া পাঠাইলেন (১৬২৮-৩২)। এদিক দিয়া শাহ্‌জাহানের লোকনির্বাচন উপযুক্ত হইয়াছিল। কাশিম খাঁ হুগলীর পর্তুগীজ কেন্দ্র চূর্ণ করিয়া ও বোম্বেটে দমন করিয়া সুবাদার হিসাবে প্রায় ইসলাম খাঁয়ের মতোই (১৬০৮-১৩) কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে বাঙলায় পর্তুগীজ উত্থান সম্বন্ধে দুই এক কথা আলোচনা করা যাইতে পারে।

সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত সপ্তগ্রাম বন্দর একদা অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্যের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। বঙ্গোপসাগর হইতে ভাগীরথী বাহিয়া সরস্বতীর জলপথে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত বাণিজ্যের যে বিকিকিনি চলিত, তাহাতে পর্তুগীজ বণিকদেরও বিশেষ প্রভাব ছিল। ক্রমে ষোড়শ শতাব্দীতে সরস্বতী নদীতে চড়া পড়িয়া যাওয়ায় মন্থরগামিনী ও ক্ষীণস্রোতা নদীটির যেমন গৌরব নষ্ট হইল, তেমনি সপ্তগ্রামের বাণিজ্যগৌরবও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইয়া গেল। ষোড়শ শতাব্দীতে জলপথে ও স্থলপথে যেমন অব্যাহত গতিতে পর্তুগীজ বাণিজ্য চলিতেছিল, তেমনি জলদস্যুতাও তাহাদের প্রায় প্রাত্যহিক কর্মে পরিণত হইয়াছিল। 'আকবরনামা' অনুসারে দেখা যায় যে, আকবর পেড্রো ট্যাভারেস (Pedro Tavares) নামক এক পর্তুগীজের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে বাঙলায় অবাধ বাণিজ্যাধিকার, নগর-প্রতিষ্ঠা, ধর্মান্তরীকরণ, ধর্মপ্রচার ও গির্জা বানাইবার 'ঢালাও' অনুমতি দিয়াছিলেন (১৫৭৮); এই সময়ে সপ্তগ্রামের বাণিজ্যিক প্রাধান্য পূর্বো-

গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণ

কলি. বিশ্ব. পুঁথি-১৭৮৪

(১১৫৮ বঙ্গাব্দের পুঁথি)

[পৃঃ ১২৩১

লিখিত প্রাকৃতিক কারণে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিলে পর্তুগীজ বণিক সপ্তগ্রামের নিকটে নৌবাহনযোগ্য ভাগীরথীতীরে একটি ছোট গঞ্জ বা ক্ষুদ্রাকার বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করিল।[৪] পরে তাহাই হুগলী নামে পরিচিত হইল; ইহারই অদূরে ব্যাণ্ডেলে রোমানক্যাথলিক অগাস্টীনীয় গির্জা প্রতিষ্ঠিত হইল (১৫৯৯)। প্রথমদিকে হুগলীর পর্তুগীজ বণিকগণ একপ্রকার অর্ধ-বর্বর বিশৃঙ্খল জীবন যাপন করিত; কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে হুগলীতে মেয়রের শাসন স্থাপিত হইল, ব্যাণ্ডেল গির্জার পাশে জেসুইট পাদ্রীদের জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, আশেপাশে ছোটখাট 'ধর্মঘর' অর্থাৎ গির্জাও গজাইয়া উঠিতে লাগিল।

হুগলীর পর্তুগীজ বণিক ও ব্যাণ্ডেলের ধর্মযাজকগণ যুগপৎ বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের ঐহিক ও পারত্রিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন; মুসলমান বণিকগণ ব্যবসার ব্যাপারে কিছু কোণঠাসা হইয়া পড়িল। উপরন্তু পর্তুগীজ পাদ্রীগণ হিন্দুসমাজের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে মুঘল সুবাদারদের গ্রাহ্য না করিয়াই ছলে-বলে-কৌশলে ধর্মান্তরীকরণ চালাইতে লাগিল। অপরদিকে নিম্নবঙ্গে আরাকানী বোম্বেটেদের সঙ্গে মিলিত হইয়া পর্তুগীজ 'হার্মাদের' অত্যাচার এমন বর্বর ও নির্মম আকার ধারণ করিল যে, শাহ্‌জাহান কাশিম খাঁকে বাঙলার সুবাদারের পদে নিয়োগ করিবার সময় এই মর্মে আদেশ দিলেন—অবিলম্বে পর্তুগীজদের বাণিজ্যকেন্দ্র চূর্ণ করিয়া, তাহাদিগকে গ্রেফতার করিয়া —প্রয়োজন হইলে হত্যা করিয়া, অথবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়া শ্বেতাঙ্গ নরনারী-বালবৃদ্ধ—সকলকেই রাজধানীতে ক্রীতদাসরূপে প্রেরণ করিতে হইবে। পর্তুগীজদের উপর শাহ্‌জাহানের 'অগ্নিশর্মা' হইবার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, তিনি যখন পিতৃদ্রোহী হইয়া বাঙলায় আসিয়াছিলেন (১৬২৪), তখন ঢাকার পর্তুগীজ বণিকগণ প্রথমে সাহায্য করিলেও শেষের দিকে তাহারা শাহ্‌জাদাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। ফলে শাহ্‌জাহানকে বাধ্য হইয়া গর্ভবতী পত্নী মোমতাজকে রোটাস দুর্গে রাখিয়া পুনরায় দাক্ষিণাত্যে পলাইয়া যাইতে হয়। তাঁহার কয়েকজন পরিচারিকা ও অন্তঃপুরিকা পর্তুগীজদের হস্তে অবর্ণনীয় নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিল। বাদশাহ হইয়া

৪ ১৫৮০ খ্রীঃ অব্দের দিকে পর্তুগীজ বণিকেরা সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া হুগলীতে চলিয়া আসিয়াছিল। দ্রষ্টব্যঃ HOB—II

শাহ্‌জাহান পুরাতন অপমানের 'দাদ' তুলিবার সুযোগ পাইলেন। দ্বিতীয়তঃ, হুগলীবন্দর পর্তুগীজদের বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হওয়ার ফলে মুসলমান বণিকদের কাজকারবার বিপর্যয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তৃতীয়তঃ, মুঘলশক্তির চিরশত্রু আরাকানী মগরাজা হুগলীর পর্তুগীজদের নিকট হইতে আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয় করিয়া পর্তুগীজ নাবিকদের সহায়তায় মুঘলশাসনকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল।

শাহ্‌জাহানের নির্দেশে সুবাদার কাশিম খাঁ হুগলী অবরোধ করিলেন (১৬৩২)। এই বৎসরের জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মে এই অবরোধ ও আক্রমণ যুগপৎ চলিল। বিচক্ষণ কাশিম খাঁ যেমন নিজেদের শক্তিসামর্থ্য ও দুর্বলতা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন, তেমনি বিপক্ষীয় পর্তুগীজদের গোপন সংবাদাদি সুকৌশলে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথমদিকে পর্তুগীজদের গোলাবর্ষণের ফলে মুঘলবাহিনী কিঞ্চিৎ বিপর্যস্ত হইলেও শেষপর্যন্ত মুঘলের হস্তে অবরুদ্ধ পর্তুগীজদের শোচনীয় অবস্থা হইল। হুগলী হইতে বেতড় (হাওড়া শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত) পর্যন্ত নদীর দুইধারে গড়খাই খনন করিয়া সেখানে মুঘলবাহিনী অপেক্ষা করিতে লাগিল, যাহাতে জলপথে পর্তুগীজগণ গোপনে পলাইতে না পারে। সাঁখরাইলের কাছে, যেখানে গঙ্গার ধারা ঈষৎ ক্ষীণকায় হইয়া গিয়াছিল, সেখানে নৌকার সাহায্যে পুলবন্দী করিয়া পর্তুগীজদের পলাইবার শেষ আশাও নির্মূল করা হইল। ইতিমধ্যে ঢাকা, বর্ধমান ও রাজমহল হইতে বৃহদাকারের কামান আসিয়া পড়িল। এদিকে অবরুদ্ধ পর্তুগীজেরা গোয়া হইতে কোন সাহায্য না পাইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িল। প্রায় তিনমাস অবরোধের পর পর্তুগীজেরা হুগলী ত্যাগ করিয়া সকলের অলক্ষ্যে নৌকাযোগে পলাইবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু গঙ্গার দুই তীর হইতে মুঘলবাহিনীর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে তাহারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইল (১৬৩২, সেপ্টেম্বর)। অল্প কয়েকজন কোনও-প্রকারে প্রাণ লইয়া সাগরদ্বীপে আশ্রয় পাইয়াছিল। বন্দী পর্তুগীজ স্ত্রী-পুরুষগণ শাহ্‌জাহানের নিকট প্রেরিত হইলে সৌন্দর্যরসিক শাহ্‌জাহান সুন্দরীগুলিকে বাছিয়া লইয়া তাহাদিগকে নিজ প্রয়োজনে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন, বাকি সকল-কেই কয়েদখানায় নিক্ষেপ করিলেন। পর্তুগীজ কয়েদীগণ আর কোনদিন প্রাণ লইয়া কয়েদের বাহিরে আসিতে পারে নাই। শাহ্‌জাহানের প্রচণ্ড

আঘাতে বাঙলাদেশে পর্তুগীজ শক্তি আর কোনদিন প্রকাশ্যে বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রাধান্যলাভ করিতে পারে নাই।[৫]

শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালের যে ঘটনা বাঙলার ইতিহাসে কথঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার মধ্যে আরাকান ও অহোমরাজের সঙ্গে মুঘল-বাহিনীর সংঘর্ষ উল্লেখযোগ্য। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে কামরূপের উপর অহোমরাজের লোলুপ দৃষ্টি পড়িলে বাঙলার মুঘল সুবাদার শঙ্কিত হইলেন, বিশেষতঃ অহোমরাজ সুসেংফার ('প্রতাপসিংহ', ১৬০৩-৪১) সামরিক দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার ফলে স্থানীয় ছোটবড় ভূস্বামীরা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলে বাঙলার মুঘলশাসন আরও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। মুঘল অঞ্চল হইতে পলাইয়া গিয়া অনেক মুঘলবিরোধী হিন্দু-মুসলমান (পাঠান) অহোমরাজের নিরাপদ আশ্রয়ে আতিথ্য গ্রহণ করিতে লাগিল। ফলে বাধ্য হইযাই মুঘল সুবাদার মুতাকাদ খাঁ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। কামরূপে অহোমরাজ মুঘলবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন (১৬৩৭-৩৮)। কিন্তু অহোমরাজের সামরিক কৌশলের ফলে মুঘলবাহিনী প্রথম দিকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল, অনেক সৈন্য ও সেনাধ্যক্ষ বন্দী হইল (১৬৩৭)। অবশ্য অল্পকালের মধ্যেই কামরূপ অঞ্চলে মুঘল আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল, অহোমরাজ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন।

ইহার কিছু পরে ১৬৩৮ খ্রীঃ অব্দের দিকে আরাকানরাজের সঙ্গেও মুঘলশাসকের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। মুঘলবাহিনী যখন কামরূপে অহোমদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত ছিল, তখন সেই সুযোগে আরাকানরাজ মুঘল অধিকারে দৌরাত্ম্য শুরু করিলেন। ইসলাম খাঁ এই সময়ে আরাকান রাজবংশের গৃহবিবাদের সুযোগ লইবার চেষ্টা করিলেন: চট্টগ্রামে যে ফিরিঙ্গী ও

৫ পর্তুগীজ জাতি দীর্ঘকাল বাঙলাদেশে বাণিজ্য করিয়াছে, নানাপ্রকার দুর্ধর্ষ অত্যাচারও চালাইয়াছে, গ্রামে গ্রামে 'ধর্মঘর' বানাইয়া অসহায় হিন্দুমুসলমানকে বলপূর্বক জিভ ভজাইয়াছে। আর একটা কাজ করিয়াছে, বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করিয়া নিজেদের পশু প্রবৃত্তির কলঙ্কচিহ্ন বাঙলার সমাজদেহে রাখিয়া গিয়াছে। তাই ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, "Their courage was vitiated by cruelty, their inquisitiveness was marred by greed, and their progress in the province was ordinarily marked by disorder and lawlessness." (HOB—II, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধটি পঠিতব্য।)

পর্তুগীজ বোম্বেটেরা আরাকানরাজকে গোলাবারুদ দিয়া সাহায্য করিত, তাহারাও এই সময়ে আরাকানের ব্যাপার হইতে সরিয়া দাঁড়াইল, অনেকে মুঘল অধিকারে পলাইয়া আসিল, কেহ কেহ খ্রীষ্টান ধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইল।[৬] ফলে আরাকানের নৌবাহিনী মুঘল অধিকারে প্রবেশ করিয়াও সাহস করিয়া আক্রমণ শুরু করিতে পারিল না। অতঃপর পূর্ববাঙলার আরাকান ভীতি ও মগফিরিঙ্গীর উৎপাত হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিল। শাহ্‌জাহানের দীর্ঘবিস্তারী শাসনে কিছু যুদ্ধবিগ্রহের পর পশ্চিমবঙ্গে পর্তুগীজ আধিপত্য যেমন হ্রাস পাইল, তেমনি উত্তর-পূর্বে অহোমভীতি এবং দক্ষিণপূর্বে মগ-ফিরিঙ্গীর উৎপাত বিশেষভাবে দুর্বল হইয়া পড়িল। কিন্তু তাঁহার শাসনকালের শেষে পুত্রদের সিংহাসন লইয়া বাদ-বিসংবাদে বৃদ্ধ শাহ্‌জাহানের রাজকীয় গৌরব হ্রাস পাইল। এই পারিবারিক বিরোধজনিত বিশৃঙ্খলা বাঙলাদেশেও কিছু পরিমাণে দেখা দিয়াছিল।

শাহ্‌জাদা মুহম্মদ সুজা ১৬৩৯ হইতে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ, মোট একুশ বৎসর বাঙলাদেশে সুবাদারী করিয়াছিলেন এবং এই দীর্ঘকালের মধ্যে এদেশে রাজ্যশাসনগত বিশেষ কোন বিশৃঙ্খলা ঘটিবার অবকাশ পায় নাই। সুজা আর্দ্র বাঙলা অপেক্ষা শুষ্ক বিহারের নিকটবর্তী রাজমহল অধিকতর পছন্দ করিতেন। তাই এখানেই তিনি দীর্ঘকাল বসবাস করেন, পূর্ববাঙলার মুঘলকেন্দ্র ঢাকায় তাঁহার একজন প্রতিভূ বাস করিতেন। তাঁহার সাহায্যে সুজা পূর্ববাঙলার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। এই দীর্ঘ একুশ বৎসরের মধ্যে তিনি অল্প কিছুদিনের জন্য রাজমহল ত্যাগ করিয়া পিতার সঙ্গে আফ্গানিস্তান অভিযানে গিয়াছিলেন। ১৬৫৮ হইতে ১৬৫৯ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে শাহ্‌জাহানের অসুস্থতার সময়ে সিংহাসন লইয়া গণ্ডগোল বাধিলে সুজা দিল্লীর সিংহাসন লাভের জন্য সৈন্যসামন্ত লইয়া বাঙলা হইতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তাঁহাকে আরাকানের দিকে পলাইতে হইল। এই সময়ে বাঙলা দেশে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। ১৬৬০ খ্রীঃ অব্দের মাঝামাঝি মীর জুমলা বাঙলার নবনিযুক্ত সুবাদার হইয়া ঔরংজেবের শাসনকালে এদেশে কিয়ৎপরিমাণে শাসনশৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিলেন।

---

৬ খ্রীষ্টান পর্তুগীজেরাও মুসলমান হইয়াছিল; দ্রষ্টব্য: HOB—II, পৃঃ ৩৭১-৩৭২

১৬৪২ খ্রীঃ অব্দে উড়িষ্যার শাসনভারও তাঁহার উপর অর্পিত হইল। অতঃপর সুজা ১৬৫৯ সাল পর্যন্ত নিরুদ্বেগে বাঙলা ও উড়িষ্যায় সুবাদারী করিয়া কিছু অলস ও বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন—দেশেও বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। হিজলীর জমিদারের যৎকিঞ্চিৎ বিদ্রোহ দমন করিয়া মোরাং এবং কাছাড়ের ভূস্বামীদের বশ্যতা ও হস্তী উপহার লাভ করিয়া সুজা বাঙলা ও উড়িষ্যার শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় কৃষিকার্যের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই কয় বৎসরে দেশের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, দিনেমার ও ইংরাজ বণিক (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী) ভালই ব্যবসা চালাইতেছিল। এই সময়ে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুজাকে বার্ষিক ৩,০০০৲ টাকা দিয়া এদেশে নিরাপদে বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করিল। কিন্তু রাজমহলে সুজার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িল, সন্তানাদি লইয়া তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। দীর্ঘদিন নিরুদ্যম আলস্যে অতিবাহিত করিয়া তাঁহার কর্মশক্তিও হ্রাস পাইয়াছিল। ওদিকে আবার গোঁড়া সুন্নী ঔরংজেব মনে করিতেন, সুজা বাঙলায় গিয়া সুন্নী মত ত্যাগ করিয়া শিয়া বনিয়া গিয়াছেন। ঔরংজেবের এ সন্দেহ সত্য নাও হইতে পারে। কিন্তু সুজা বাঙলা দেশে অনেক শিয়া ও ইরাণী পণ্ডিতদের আমদানি করিয়াছিলেন, অনেককে উচ্চপদ দিয়াছিলেন—ইহা মিথ্যা নহে। শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক মুসলমান তাঁহার অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

যাহা হউক, ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দের দিকে বৃদ্ধ শাহ্‌জাহান অসুস্থ হইয়া পড়িলে দিল্লীর সিংহাসনের অধিকার লইয়া তাঁহার পুত্রদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব শুরু হইল—দারা, সুজা, মোরাদ ও ঔরংজেব—সকলেই বাদশা বনিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। এই সুযোগে সুজাও বাঙলাদেশে বাদশা হইবার খোয়াব দেখিতে লাগিলেন। ১৬৫৭ সালে নভেম্বর মাসের শেষের দিকে তিনি রাজমহলে অতি আড়ম্বরপূর্ণ উপাধি ('আবুল ফৌজ নাসির-উদ্দিন মুহম্মদ, দ্বিতীয় তাইমুর, তৃতীয় সিকান্দার শাহ্, শাহ্‌সুজা বাহাদুর গাজি') ধারণ করিয়া অভিষেক-ক্রিয়া সমাধা করিলেন। কিন্তু তিনি বেশীদিন আর বাদশাহী-লীলার সুযোগ পাইলেন না, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্ত্রীপুত্রাদি ও কিছু অনুচর সহ আবার বাঙলার দিকে ফিরিয়া চলিলেন। ইতিমধ্যে ঔরংজেব যুদ্ধে ও কৌশলে জয়ী হইয়া বাদশাহ হইলেন। স্থির হইল বাঙলা, উড়িষ্যা ও

বিহারের কিয়দংশ সুজার অধিকারে যাইবে, কিন্তু তিনি রাজমহলেই বাস করিবেন। সুজা বুঝিলেন যে, কৌশলী ঔরংজেব দারার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত আছেন বলিয়া সুজার ব্যাপারে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু বিপদ কাটিয়া গেলে নিজ মূর্তি ধরিবেন। তাই তিনি বাহিরের দিকে ঔরংজেবকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া ভিতরে ভিতরে বড় রকমের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। যথারীতি তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন (১৬৫৯), কিন্তু ঔরংজেবের কাছে পরাজিত হইয়া রাজমহল আশ্রয় করিলেন, ঔরংজেবের সেনাপতি মীরজুমলা তাঁহাকে তাড়াইয়া লইয়া চলিলেন। ১৬৬০ খ্রীঃ তিনি মালদহে মীরজুমলার নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া প্রথমে টাঁডায় এবং সেখান হইতে পলাইয়া ঢাকায় পৌছিলেন। মীরজুমলা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ঢাকার নিকটে উপস্থিত হইলে ভীত সুজা আরাকানের দিকে যাত্রা করিলেন আশ্রয়ের আশায়। সেখানেই তিনি আরাকানরাজের দ্বারা নিহত হন। এদিকে মীরজুমলা বিজয়গর্বে (১৬৬০, মে) ঢাকায় প্রবেশ করিলেন।

সুজার শাসনের শেষ দুই বৎসর বাঙলা, বিশেষতঃ রাজমহল ও ইহার চারিপার্শ্বের উপর দিয়া সর্বদা শাসনবিশৃঙ্খলার ঝড় বহিয়া গিয়াছিল। অতঃপর সুবে বাঙলা-বিহার উড়িষ্যা ঔরংজেবের শাসনভুক্ত হইলে এদেশে আবার শাসনগত নিয়মানুগত্য ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল।

(গ) ঔরংজেবের অধীনে বাঙলা (১৬৬০-১৭০৭) ॥

পিতাকে বন্দী, জ্যেষ্ঠকে হত্যা এবং পুত্রকে চিরজীবনের মতো কয়েদ করিয়া প্রবীণ বয়সে ঔরংজেব সিংহাসনে বসিলেন। ধর্মীয় অন্ধতা ও সংশয়-দগ্ধ মনোভাব সত্ত্বেও প্রথম তিরিশ বৎসর তিনি অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে শাসনকর্তৃত্ব চালাইয়াছিলেন। তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী শাসনে বাঙলায় যাঁহারা সুবাদার হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মীরজুমলা বা মুয়াজ্জম খাঁ (১৬৬০-১৬৬৩), শায়েস্তা খাঁ (১৬৬৩-১৬৭৮), শাহাজাদা মুহম্মদ আজম (১৬৭৮-১৬৮০), ইব্রাহিম খাঁ (১৬৮৯-৯৮), এবং শাহ্‌জাদা আজিম উদ্দিনের (পরে আজিম উস্‌-সান) নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে আবার মীরজুমলা মাত্র তিন বৎসর সুবাদারী করিয়া অতিশয় দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

মীরজুমলা রাজনৈতিক, সামরিক ও রাজস্বসম্পর্কীয় জটিল ব্যাপারে

অতিক্রান্ত নিয়মশৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন। শাহজাহানের বন্দিদশা হইতেই এদেশে সুবাদারী সংক্রান্ত নানা বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। সুজা পলায়ন করিলে কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে বাঙলাদেশে শাসন ও সামরিক বিভাগে বিশেষ শিথিলতা দেখা দিয়াছিল। তাঁহার আসাম অভিযান যেন নিয়তির নির্দেশেই ব্যর্থ হইল। মীরজুমলা পুরাদস্তর সুবাদার হইয়া বসিবার পূর্বে সুজার অনুপস্থিতির সুযোগে কুচবিহাররাজ কামরূপ হইতে মুঘল ফৌজদার ও মুঘলের অনুগত হিন্দু ভূস্বামীকে পলাইতে বাধ্য করিলেন; কিন্তু অহোমরাজ আবার কুচবিহার সেনাবাহিনীকে কামরূপ হইতে বিতাড়িত করিয়া (১৬৬০) এই অঞ্চলে অহোম শক্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন। ১৬৬৩ খ্রীঃ অব্দে সুবাদার হইয়া মীরজুমলা আসাম ও কুচবিহাররাজকে উচিত শাস্তি দিতে অগ্রসর হইলেন। বহু বিপর্যয়ের পর তিনি অহোমরাজকে পর্যুদস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল, ঢাকায় ফিরিবার পূর্বেই (১৬৬৩) পথিমধ্যে দারুণ জ্বরে তাঁহার দেহান্ত হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর নূতন সুবাদার যোগ দিবার পূর্বে ভগবানদাস (রাজকর্মচারী) রাজস্বের ভার লইলেন, এবং দিলীর খাঁ, দাউদ খাঁ, ইতিসাম খাঁ—ইঁহারা কোনও প্রকারে সুবাদারের কাজকর্ম চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। অতঃপর নবনিযুক্ত সুবাদার শায়েস্তা খাঁ (মোমতাজ মহলের ভাই) ১৬৬৪ খ্রীঃ অব্দে ঢাকায় আসিয়া শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

মীরজুমলা তিন বৎসর সুবাদারী করিলেও তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছে কুচবিহার ও কামরূপ অভিযানে; মাত্র এক বৎসর তিনি রাজধানীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। পর্তুগীজ বোম্বেটে ও মগ দস্যুদিগকে শায়েস্তা করিবার জন্য তিনি রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী সরাইয়া আনিলেন। রাজস্ববিভাগে তাঁহার বিচক্ষণতা ও চতুর বুদ্ধি উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বে অনেকে 'আইমাদার' নিষ্কর জমি ভোগ করিত; অনেকে রাজ-ফারমানের বলে বিপুল জায়গীর লাভ করিয়া সরকারের জমি ও রাজস্ব ফাঁকি দিত। মাত্র দেড় বৎসরের মধ্যে মীরজুমলা এইরূপ বহু জমি সরকারের খাসে আনয়ন করিলেন; ব্যবসায়ী ও রাহি ব্যক্তিদের নিকট হইতে তাহাদের আয়ের এক চতুর্থাংশ ('জাকাত'), মুনাফাকারীদের নিকট 'হাসিল' কর এবং অবস্থাপন্ন হিন্দু-মুসলমান 'খুশনাশিন' ব্যক্তিদের আয়ের একটা বড় অংশ

রাজস্ববাবদ ঢাকার রাজকোষে জমা পড়িতে লাগিল। অবশ্য ইহাতে দেশের অবস্থা যে খুব একটা ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহা মনে হয় না। মীরজুমলা অধিকাংশ সময় আসাম অভিযানে ব্যয় করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার অনুপস্থিতিতে এদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া সুবাদারের কর্মচারীরা 'জাকাত' ও 'হাসিলের' কঠোর নিয়ম শিথিল করে নাই। ফলে একমুষ্টি অন্নের জন্য মানুষ সব কিছু বিলাইয়া দিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। মীরজুমলা শাসন ও সামরিক বিভাগে, বিশেষতঃ নৌবিভাগে যে-সমস্ত নূতন নিয়ম প্রচলিত করিতে চাহিয়াছিলেন—সময়াভাবে এবং আসাম অভিযানের ফলে তাহা সম্ভব হয় নাই। তবে এদেশের ব্যবসাবাণিজ্যকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনিয়া মীরজুমলা সমস্ত বাণিজ্যপ্রবাহকে শাসনশক্তির নির্দেশ অনুসারে চলিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে বাজার হইতে সুলভমূল্যে সমস্ত দ্রব্য কিনিয়া লইতেন, তারপর উচ্চমূল্যে তাহাই আবার বাজারে ছাড়িতেন। যুদ্ধাদিব সময় তিনি ইংবাজ ও দেশীয় বণিকদের নিকট বলপূর্বক অর্থসংগ্রহ করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেন না। প্রয়োজনস্থলে তিনি ইংরাজ বণিকদিগকে ঋণ দিতেন। একবার ইংরাজ কুঠিয়ালদের উপর বিরূপ হইয়া তিনি এমন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হইবার মতো হইয়াছিল। যাহা হউক তিনি সামরিক প্রয়োজনে ইংরাজ ও দিনেমার বণিকদের ধনজন, গোলাবারুদ, যুদ্ধজাহাজ প্রভৃতির বিস্তর সাহায্য লইতেন, কিন্তু বিদেশী বণিকদের সব সময়ে নিজ 'দস্তের' মধ্যে রাখিতেন। রাজ্যশাসন, রাজস্ব ও সামরিক বিভাগে নূতন ব্যবস্থা চালু করিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি মাত্র দেড বৎসর শাসনসংস্কার ও সামরিক ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকাল আর একটু দীর্ঘ হইলে এবং সমস্ত সময় আসাম-অভিযানে অতিবাহিত না হইলে হয়তো বাঙলার শাসন ও রাজস্বব্যবস্থা মুঘলযুগে উন্নততর হইতে পারিত।

মীরজুমলার মৃত্যুর প্রায় দুইমাস পরে এ সংবাদ ঔরংজেবের নিকট পৌঁছিলে বিহারের সুবাদার দাউদ খাঁ বাঙলার সুবাদার নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার কর্মভার গ্রহণের কিছুদিন পূর্বে দিলীর খাঁ অস্থায়িভাবে বাঙলার সুবাদারী চালাইয়াছিলেন। তারপর তিনি ১৬৬৩ খ্রীঃ অব্দের

মাঝামাঝি কয়েকমাস কাজ চালাইবার পর দাউদ খাঁ বিহার ত্যাগ করিয়া ঢাকায় আসিয়া সুবাদারী পদ গ্রহণ করিলেন (১৬৬৪)। ইতিপূর্বে মীরজুমলার মৃত্যুর ফলে বাঙলার শাসনব্যবস্থা শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, উচ্চ রাজকর্মচারী মহলে নানাপ্রকার মনোমালিন্য সৃষ্টি হইয়াছিল—যে যাহা ইচ্ছা করিতেছিল। এক কথায় সুবাদারের অভাবে এই সুবার শাসনকার্য ও রাজস্ব-ব্যবস্থা প্রায় ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। তদুপরি আবার দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল। যুদ্ধবিগ্রহাদির ফলে এ দেশের বহু ক্ষতি হইয়াছিল, অসংখ্য রণতরী নষ্ট হইয়াছিল, বহু সৈন্য ও সেনাপতির প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। ফলে অধস্তন কর্মচারীরা বাহশাহ বনিবার রঙিন খোয়াব দেখিতে লাগিলেন। সরকারী কর্মচারীদের অত্যাচারের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসাবাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সুবাদারের কোন কোন উৎসাহী কর্মচারী ফিরিঙ্গী বণিকদের হকের ধনেও হাত বাড়াইতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় ১৬৬৪ খ্রীঃ অব্দে ঔরংজেবের সাক্ষাৎ মাতুল তেষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ আমির-উল-উমরা শায়েস্তা খাঁ বাঙলার সুবাদার হইয়া আসিলেন।

মাতুল শায়েস্তা খাঁ দুর্বিনীত কর্মচারীদিগকে শায়েস্তা করিতেই ক্লান্ত হইয়া পাড়িয়াছিলেন। পূর্বে তিনি দাক্ষিণাত্যে অনেক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধবয়সে ঢাকায় পৌঁছিয়া এদেশের আর্দ্র বাতাসে এবং বয়োধর্মের ফলে তাঁহার কর্মোদ্যম লোপ পাইল। তিনি উচ্চ কর্মচারী ও উপযুক্ত পুত্রদের হাতে শাসনভার ছাড়িয়া দিয়া যযাতির মতো হারেমে হুরী-পরীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ঢাকাই গুলেস্তাঁয় আরব্যরজনীর নায়ক হইয়া রহিলেন। ১৬৮৩ খ্রীঃ অব্দের দিকে বৃদ্ধ বয়সে রোগে ভুগিয়া তিনি আরও অশক্ত হইয়া পড়িলেন। অবশ্য বিরাশি বৎসর (১৬৮২) বয়সেও তিনি একটি পুত্র সন্তান লাভ করিয়া নিজ শক্তিসামর্থ্যের প্রমাণ দিলেন। মহা আনন্দে মশগুল হইয়া বার্ধক্য, আওরত ও ব্যাধি সহ শায়েস্তা খাঁ ঢাকা শহরে বাদশাহী চালে শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। পাছে মনিব-ভাগিনা ঔরংজেব কিছু মনে করেন, এই জন্য মাতুল আমির-উল-উমরা খাঁ সাহেব ভাগিনার কাছে মূল্যবান খেলাত পাঠাইতে লাগিলেন। ভাগিনা মাঝে মাঝে মাতুলের নিকট দুই-দশ লাখ ধার লইতেন। ভাগিনা জানিতেন, আসল শুধিতে হইবে না। মাতুলও জানিতেন, হাতছাড়া আসল আর ঘরে

ফিরিবে না। তখন ঔরংজেব দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন। শায়েস্তা খাঁ যুদ্ধ পরিচালনা ব্যয়ের জন্য প্রতিবৎসর বাদশাহকে পাঁচলাখ টাকা পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ইহাই খরচ-ই-খিসাক্ নামে পরিচিত। ১৬৮৫ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত বাঙলা হইতে প্রতিবৎসর এই হারে টাকা প্রেরিত হইয়াছিল; ইহারই সঙ্গে হিন্দুদিগকে উৎপীড়িত করিয়া জিজিয়া করও সংগৃহীত হইতেছিল। এই বাবদ প্রতিবৎসর প্রায় একলক্ষ টাকা দিল্লীর রাজকোষে জমা পড়িতে লাগিল। ১৬৭৮ খ্রীঃ অব্দে শায়েস্তা খাঁ সম্রাটকে নজরানা স্বরূপ ৩০ লক্ষ নগদ টাকা এবং ৪ লক্ষ টাকার হীরাজহরতাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন; এই জন্য তিনি দেশবাসীকে নিঃশেষে দোহন করিবার বিবিধ উপায় বাহির করিয়াছিলেন। 'দস্তক' সত্ত্বেও বণিকদিগকে প্রত্যেক থানায় কর দিতে বাধ্য করা হইত। যে 'আব্ওয়াব' বা বিশেষ কর উঠিয়া গিয়াছিল, তাহা পুনঃ প্রবর্তিত হইল। তদুপরি সুবাদার মহাশয় চুটাইয়া 'সওদা-ই-খাস' বা নিজেই বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। ফলে বুড়া বয়সেও তিনি প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেন। বাদশাহী মেজাজী শায়েস্তা খাঁ বহু অর্থের অপচয় করিয়া ঢাকা শহরে বড় বড় দালানকোঠা নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙালী হিন্দু-মুসলমান নিঃশেষ-শোষণের ফলে যে ক্রমেই জাহান্নমের পথে নামিতেছিল, তাহা বুঝিবার মতো দূরদর্শিতা ও উদারতা এই বৃদ্ধ লোভী সুবাদারের আদৌ ছিল না। তিনি বৃদ্ধ বয়সে অশক্ত শরীরেও ভোগ-বিলাসে যে কিরূপ অর্থের শ্রাদ্ধ করিতেন, সে বিষয়ে স্টেইন সান মাস্টার নামক এক ইংরাজ বণিক লিখিয়াছিলেন যে, শায়েস্তা খাঁ বাঙলাদেশে সুবাদারী করিয়া প্রতিবৎসর, "got so great a treasure as the like is seldom heard of now-a-days in the world, being computed by knowing persons at 38 Krores of rupees, and his income is daily two lakh rupees, of which his expense is one half."[৭] বৃদ্ধ শায়েস্তা খাঁয়ের মতো নির্মম শোষক ও অর্থলোভী সুবাদার বাঙলাদেশে বড় একটা আসেন নাই। তাঁহারই লোলুপতার ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যে প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার বারোটি উপযুক্ত পুত্রের সহায়তায় এই সুবার শাসনকার্য সুশৃঙ্খলার সঙ্গে

---

৭ HOB, II, p. 375

অতিবাহিত হইতেছিল। মীরজুমলার মৃত্যুর পর সুবাদারের শিথিলতার ফলে কুচবিহার আবার স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল। কিন্তু শায়েস্তা খাঁ বাঙলার সুবাদার হইয়া আসিতেছেন শুনিয়া কুচবিহাররাজও বিদ্রোহ ত্যাগ করিয়া নতি স্বীকার করিলেন।

শায়েস্তা খাঁর লোলুপ শোষণ নিন্দার যোগ্য হইলেও এক বিষয়ে তিনি কিছু প্রশংসা দাবি করিতে পারেন। তাঁহারই চেষ্টায় ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দের দিকে চট্টগ্রামের বোম্বেটেদের আড্ডা ভাঙিয়া গিয়াছিল। ১৫শ শতাব্দী হইতে এই অঞ্চল আরাকানী মগদের জলদস্যুতার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়, পরে পর্তুগীজ বোম্বেটেরাও এখানে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব-বঙ্গের উপকূলভাগে ভীষণ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে। বাঙালী হিন্দু-মুসলমান-দিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহারা কিরূপ অবর্ণনীয় অত্যাচার করিত, দাসহাটে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে গো-মহিষাদির ন্যায় ক্রয়বিক্রয় করিত, তাহার নানা বর্ণনা সমসাময়িক য়ুরোপীয় ভ্রমণকারীদের বিবরণীতে পাওয়া যাইবে।[৮]

শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রামের মগ ও ফিরিঙ্গীদের কেন্দ্রসমূহ সমূলে বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বহু রণতরী নির্মাণ করাইলেন এবং শীঘ্রই যুদ্ধার্থে বহির্গত হইলেন (১৬৬৫)। ইতিমধ্যে চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গী বোম্বেটে এবং আরাকান রাজের মধ্যে কলহ হওয়ায় ফিরিঙ্গীরা চট্টগ্রাম ত্যাগ করিয়া শায়েস্তা খাঁয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলে বুদ্ধিমান খাঁ সাহেব তাহাদিগকে নিজ সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করিলেন। ফিরিঙ্গী সেনাপতিদের উপদেশে শায়েস্তা খাঁ অবিলম্বে ১৬৬৫ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসের দারুণ শীতে জ্যেষ্ঠ পুত্র উমেদ খাঁয়ের নেতৃত্বে বহু 'ঘুরাব' (যুদ্ধের বড় নৌকা) ও 'কোষা' (ছোট নৌকা) সহ

---

৮ "They carried off the Hindus and Muslims they could seize, pierced ot their hands, passed thin strips of cane through the holes, and threw the men huddled together under the decks of their ships. Every, morning they flung down some uncooked rice to the captives from above, as people fling grain to fowl......They sold their captives to the Dutch, English and French merchants at the port of the Deccan. Sometimes they brought their captives to Tamluk and Balasore for sale at high prices..." Ibid, pp. 378-79

অভিযান প্রেরণ করিলেন। ফিরিঙ্গীরাও নৌকা যোগে সুবাদারের বাহিনীর সহায়ক হিসাবে পাশে পাশে চলিল। সুবাদারের বাছা বাছা সেনাবাহিনী শত্রুর অলক্ষ্যে স্থলপথে অগ্রসর হইল। অতঃপর দারুণ জলযুদ্ধে মগবাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হইল, চট্টগ্রাম বাঙলার সুবাদারের দখলে আসিল; সুবাদারের জ্যেষ্ঠপুত্রের বীরত্বে ও ফিরিঙ্গীদের উপদেশ অনুসারে মগবাহিনী পরাভূত হইয়া পলায়ন করিল, এই অঞ্চল চিরদিনের জন্য মগ-দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তি পাইল। ঔরংজেবের নির্দেশে চট্টগ্রামের নাম বদলাইয়া ইসলামাবাদ রাখা হইল।

শায়েস্তা খাঁ বাঙলাদেশকে ভয়ানকভাবে শোষণ করিলেও চট্টগ্রামের মগ বোম্বেটেদের কেন্দ্র চূর্ণ করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এখনও অমর হইয়া আছেন। কিছুদিনের জন্য তিনি আগ্রা যাত্রা করিলে ঔরংজেবের সর্বাপেক্ষা প্রিয় পুত্র শাহ্‌জাদা মুহম্মদ আজমশাহ্‌ বৎসর খানেক বাঙলায় সুবাদারী করিয়া দেশটাকে প্রায় পরীস্থানে পরিণত করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। অতি অপদার্থ শাহ্‌জাদাটি এক বৎসরের মধ্যে ৮০ লক্ষ টাকা নিজ থলিয়ায় ভরিতে পারিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে! যাহা হউক ইহার অল্প পরেই শায়েস্তা খাঁ পুনরায় বাঙলার কার্যভার গ্রহণ করিলেন (১৬৭৯)। ইহার পর তিনি ১৬৮৮ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত—প্রায় নয় বৎসর কাল এদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়বার সুবাদার হইয়া আসিবার পর শায়েস্তা খাঁয়ের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দারুণ বিরোধ বাধিল। ১৬৮২ খ্রীঃ অব্দে উইলিয়ম হেজেস হুগলীর কোম্পানীর এজেন্ট হইয়া আসিয়া দেখিলেন যে, মুসলমান কর্মচারীদের লোভ ও অত্যাচারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসাবাণিজ্য প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। সুবাদারের নির্মম সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াও বিশেষ কোন ফল হইল না। বাধ্য হইয়া হেজেস বিলাতে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন যে, শায়েস্তা খাঁ ও ঔরংজেবকে বাহুবল ভিন্ন শায়েস্তা করা যাইবে না, সুবিচারও পাওয়া যাইবে না। বিলাতের ডিরেক্টরবর্গ ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় জেম্‌সের নিকট এই মর্মে অনুমতি লাভ করিলেন যে, প্রয়োজন স্থলে প্রতিশোধ গ্রহণ ও বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা সুবাদারের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ-সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে

পারিবে। শুধু তাহাই নহে, ঔরংজেবের সাম্রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য জাহাজ বোঝাই গোরাসৈন্য ইংলণ্ড হইতে এদেশের অভিমুখে যাত্রা করিল (১৬৮৬)। অবশ্য মাত্র খান তিনেক জাহাজ শেষ পর্যন্ত বাঙলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। বিপদ বুঝিয়া শায়েস্তা খাঁও 'সাজ সাজ' রবে প্রস্তুত হইলেন। ছলছুতায় হুগলীর ফৌজদারের সঙ্গে ইংরাজ সৈনিকের লড়াই বাধিয়া গেল। ইংরাজের জাহাজ হইতে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের ফলে হুগলীর ফৌজদার পলাইয়া গেলেন। এই দুঃসংবাদ ঢাকায় পৌঁছাইলে শায়েস্তা খাঁ ইংরাজদিগকে উচিত শিক্ষা দিবার জন্য প্রচুর সেনাবাহিনী পাঠাইয়া দিলেন এবং সমস্ত ইংরাজকে বাঁধিয়া আনিবার আদেশ দিলেন। ব্যাপারটা এতদূর গড়াইবে তাহা তিনখানি রণতরীর মালিক ইংরাজ বণিক বুঝিতে পারেন নাই। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা যাহা করিয়া থাকেন এখনও তাহাই করিলেন—অর্থাৎ শায়েস্তা খাঁয়ের হাতে পড়িবার ভয়ে হুগলীর সমস্ত ইংরাজ বণিক জাহাজে উঠিয়া মালপত্র টাকাকড়ি—সব ফেলিয়া ভাগীরথী ধরিয়া ভাসিয়া চলিলেন, এবং সুতানুটী গ্রামে (আধুনিক কলিকাতা) নদীর ধারে নঙ্গর করিলেন : এখান হইতে ইংরাজদের প্রধান নেতা জোব চারনক মিটমাটের জন্য শায়েস্তা খাঁয়ের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতে লাগিলেন ; কিন্তু বৃদ্ধ সুবাদারকে কঠিন হইতে দেখিয়া ইংরাজ বণিকগণ বালেশ্বরের অভিমুখে চলিলেন। এদিকে এখানেও সুবাদারের বাহিনী হানা দিল এবং প্রচণ্ড যুদ্ধে ইংরাজদের দুর্বল করিয়া ফেলিল। অপরদিকে দারুণ জ্বরেও অনেক ইংরাজ সৈনিক ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী মাটি লইল। যাহা হউক ১৬৮৭ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে সুবাদারের প্রতিভূ ও অবশিষ্ট ইংরাজ বণিকদের মধ্যে সন্ধি হইল, জুন মাসের দারুণ গ্রীষ্মে অল্প কয়েকজন ইংরাজ জিনিসপত্র লইয়া স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। কিন্তু শায়েস্তা খাঁ বুঝিলেন যে, ইংরাজদের বাণিজ্য বন্ধ হইলে দেশের রাজস্বেরও ঘাটতি হইবে ; তাই তিনি ইংরাজ বণিকদের আহ্বান করিয়া উলুবেড়িয়ায় কেল্লা করিতেও অনুমতি দিলেন। কিন্তু নানা কারণে বণিক ইংরাজ আর বাণিজ্যের পসরা নামাইতে চাহিল না, ১৬৮৮ খ্রীঃ অব্দের শীত-কালে তাহারা সব কিছু ফেলিয়া সুতানুটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে অবশ্য তাহারা পথিমধ্যে ডাঙায় নামিয়া জনসাধারণের উপর অকথ্য অত্যাচার করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে শায়েস্তা খাঁ বাঙলা ত্যাগ করিয়া

গেলেন (১৬৮৮)। ঔরংজেব দেখিলেন এই বিরোধের ফলে দেশের বাণিজ্য ও রাজস্বের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার উপদেশে এবং বাঙলার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁয়ের অনুরোধে ইংরাজ বণিকগণ মান্দ্রাজ হইতে আবার বাঙলার অভিমুখে যাত্রা করিল এবং ১৬৯০ খ্রীঃ অব্দে ২৪শে আগষ্ট দারুণ দুর্যোগ মাথায় করিয়া ভাগীরথীতীরে সুতানুটী গ্রামে জাহাজ বাঁধিল—সঙ্গে ছিলেন তাহাদের পুরাতন নেতা জোব চারনক—কলিকাতা নগরীর সেইদিন ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। ঐ একই বৎসরে ফরাসীরা চন্দননগরে একখানি গ্রাম কিনিয়া সেখানে ফরাসী কেন্দ্র স্থাপন করিলেন।

শুনা যায় শায়েস্তা খাঁয়ের আমলে বাঙলাদেশে, বিশেষতঃ ঢাকা অঞ্চলে টাকায় আট মণ চাউল বিকাইত। কোন কোন মুসলমান ঐতিহাসিক ('রিয়াজ-উস্ সালাতিনে'র লেখক গোলাম হোসেন) শত মুখে শায়েস্তা খাঁয়ের গুণ বর্ণনা করিলেও, তিনি যে অতিশয় লোভী ও অমিতব্যয়ী সুবাদার ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি তাঁহার প্রাপ্য বেতন ছাড়াও রাজকোষের অর্থ যথেচ্ছা ব্যয় করিতেন। তাঁহার বিবেচনাহীন অমিতব্যয়িতার জন্য সুবার দেওয়ানও সম্রাটের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ঢাকা অঞ্চলে টাকায় আট মণ চাউল বিকাইত—ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। প্রথমতঃ, ঢাকা অঞ্চল তৎকালে সারা বাঙলার শস্যভাণ্ডার বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিমবঙ্গের যে অঞ্চল পূর্ববঙ্গের মতো উর্বর নহে, সেখানেও ১৬৩২ খ্রীঃ অব্দের দিকে টাকায় পাঁচ মণ চাউল মিলিত।[৯] শুনা যায় তিনি এই ব্যাপার (অর্থাৎ টাকায় আট মণ চাউল) স্মরণীয় করিবার জন্য ঢাকা শহরের পশ্চিম দিকের তোরণদ্বার বন্ধ করিয়া তাহাতে এই মর্মে লিপি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন যে, যে সুবাদারের শাসনে আবার শস্যের দাম এইরূপ নামিয়া যাইবে, শুধু তিনিই ঐ বন্ধ দরজা খুলিতে পারিবেন। নবাব সরফরাজ খাঁয়ের সুবাদারীর সময় সেই দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়—তখন চাউলের দাম ঐ পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছিল। আসলে শায়েস্তা খাঁ অত্যন্ত আড়ম্বর ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করিতেন, দুই হাতে টাকা পয়সা উড়াইয়া দিতেন, ভদ্রবেশী জুয়াচোরদের প্রচুর দানখয়রাত করিতেন—বহু পরগাছার দল তাঁহার উপর দিব্য নির্ভর

৯ **Ibid, II, p. 387**

করিয়া আখের গুছাইয়া লইত। ঢাকা শহরে অনেকগুলি বড় বড় ইমারত নির্মাণ করিয়া তিনি অপব্যয়কে কিঞ্চিৎ সার্থক করিয়াছিলেন। যিনি প্রাপ্য বেতন কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইয়াও ঔরংজেবের শ্যেনচক্ষুকে ফাঁকি দিয়া এক কোটি বিরাশি লক্ষ তন্‌খা হজম করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া 'কেরামত' দিবার প্রয়োজন নাই।

শায়েস্তা খাঁ বিদায় লইলে বৎসরখানেকের জন্য সুবাদার হইয়া আসিলেন ঔরংজেবের ধাত্রীপুত্র অতি অপদার্থ খান-ই-জাহান বাহাদুর (১৬৮৮-৮৯)—বাঙলার গালগল্পে যিনি 'খানজা খাঁ' নামে কুখ্যাত। ইনি এক বৎসর পরে বাঙলা হইতে পদচ্যুত হইয়া চলিয়া যাইবার সময়ে আশ্চর্য নির্লোভতার বশে মাত্র দুই কোটি টাকা হস্তগত করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন!

ইহার পর আসিলেন প্রসিদ্ধ ইব্রাহিম খাঁ—বিশুদ্ধ ইরাণী সংস্কৃতিতে আবাল্য লালিত এই সাধু প্রকৃতির সুবাদার নয় বৎসর কাল শান্তচিত্তে দেশ শাসন করিয়াছিলেন। ইংরাজ বণিক ও মুসলমান ঐতিহাসিক—সকলেই ইব্রাহিম খাঁয়ের গুণকীর্তন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক সেইযুগের পক্ষে তিনি আশ্চর্য মহত্ত্ব ও প্রশংসনীয় ঔদার্য দেখাইয়াছিলেন। যখন প্রায় সমস্ত সুবাদার দুই হাতে সোনারূপা কুড়াইয়া লইত, তখন তিনি বিস্ময়কর নির্লোভ ও সৎ জীবনযাপন করিয়াছেন। শাসনকার্যেও সহৃদয়তা ও ঔদার্যের পরিচয় দিয়া সাধু ইব্রাহিম খাঁ পরবর্তী কালেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হইয়াছেন। তিনি ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন। তাঁহার পত্র পাইয়া জোব চারনক মান্দ্রাজ হইতে জাহাজযোগে সুতানুটীতে আসিয়া কুঠী স্থাপন করিলেন (১৬৯০)—যেখানে একশত বৎসর পরে প্রাচ্য ভূমির শ্রেষ্ঠ শহর কলিকাতা গড়িয়া উঠিয়াছে। চন্দনগরের ফরাসীরাও তাহাদের ক্রীত গ্রামখানিকে সামরিক কায়দায় সাজাইতেছিল। কিন্তু ১৭শ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই মুসলমান শাসনে ভাটা পড়িতে আরম্ভ হইল। বৃদ্ধ ঔরংজেব রাজধানী ছাড়িয়া দীর্ঘ পনের বৎসর ধরিয়া সুদূর দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন; অপরদিকে মারাঠাদের সহিত শক্তি পরীক্ষায় তাঁহার সেনাবাহিনী বেকায়দায় পড়িয়াছিল, সেই সমস্ত পরাজয়ের খবর সব সুবাতেই ছড়াইয়া পড়িতেছিল। ফলে যাহারা এতদিন ভয়ে চুপ করিয়া ছিল, কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে এইবার তাহারা মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। সাধু

ইব্রাহিম খাঁ দিবারাত্র কিতাব ও তস্‌বি লইয়া থাকিতেন! বৃদ্ধ বয়সে এই খানদানী ইরাণী যুদ্ধবিগ্রহ বড় একটা পছন্দ করিতেন না। ফলে বাঙলাদেশে সপ্তদশ শতাব্দীর সমাপ্তির দিকে আবার রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।

এই সময়ে (১৬৯৫) পশ্চিমবঙ্গে শোভা সিং ও রহিম খাঁয়ের হাঙ্গামা আরম্ভ হইল। ইব্রাহিম খাঁয়ের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে ঘাঁটাল-চন্দ্রকোণার হিন্দুস্থানী জমিদার শোভা সিং যথেচ্ছা লুঠপাট করিতে লাগিল। ১৬৯৬ খ্রীঃ অব্দের গোড়ার দিকে মুঘল অধিকার হঠাইয়া দিয়া এই শোভা সিং বর্ধমান পর্যন্ত অধিকার করিয়া ফেলিল, এবং ঐ অঞ্চলে নিশ্চিন্ত মনে রাহাজানি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে উড়িষ্যার আফগান নেতা রহিম খাঁ যোগ দিলে ব্যাপার বেশ সঙিন হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা বিনা বাধায় হুগলী পর্যন্ত আসিয়া নির্মম অত্যাচার করিতে লাগিল, হুগলীর মুসলমান ফৌজদার পলাইয়া গিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। গঙ্গার পশ্চিম পারের অঞ্চলসমূহ এই লুঠেরা বিদ্রোহীদের হাতে রহিল। এইরূপে শোভা সিং হুগলী পর্যন্ত অঞ্চল, প্রায় ১৮০ মাইলের উপর জাঁকাইয়া রাজত্ব করিতে লাগিল। এই ব্যক্তি বর্ধমানের ফৌজদার রাজা কৃষ্ণরামকে হত্যা করিয়া তাঁহার কুমারী কন্যার উপর বলপ্রয়োগ করিতে গিয়া সেই বালিকার ছুরিকাঘাতে ঘৃণ্য প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ফৌজদারের সাধ্বী কন্যা পরপুরুষের লালসা-মত্ত স্পর্শদোষ হইতে নিজ কুমারীধর্ম রক্ষা করিবার জন্য নিজেও সেই ছুরিকার আঘাতে আত্মহত্যা করিলেন। এই সমস্ত সংবাদ আলমগীরের কর্ণগোচর হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ ইব্রাহিম খাঁকে পদচ্যুত করিলেন (১৬৯৭) এবং সম্রাটের পৌত্র আজিম উদ্দিনকে বাঙলার সুবাদার পদে নিয়োগ করিলেন। শাহ্‌জাদার আসিতে কিছু বিলম্ব হওয়ায় ইব্রাহিম খাঁয়ের পুত্র জবরদস্ত খাঁকে বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হইতে আদেশ দেওয়া হইল। যুবক জবরদস্ত খাঁ পিতার মতো নহেন, জবরদস্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অচিরে রহিম খাঁকে দলবলসহ চন্দ্রকোণার জঙ্গলে পলাইয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। কিন্তু নবনিযুক্ত সুবাদার ঔরংজেবের সাধের নাতি আজিম উদ্দিন জবরদস্ত খাঁয়ের বীরত্বের জন্য কিছুমাত্র উল্লসিত হইলেন না। তাঁহার অপ্রীতিকর ব্যবহারের প্রতিবাদে যুবক সেনানায়ক জবরদস্ত খাঁ বাঙলা ত্যাগ করিয়া গেলেন। এদিকে আজিম উদ্দিন বৎসরখানেক বর্ধমানে নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া

রহিলেন ; ফলে বিদ্রোহীরা ঝোপজঙ্গল হইতে বাহির হইয়া মুঘলবাহিনীকে নানা স্থানে আক্রমণ করিয়া দারুণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিল। যাহা হউক বিদ্রোহীদের নেতা রহিম খাঁ ধরা পড়িলে সুবাদারের আজ্ঞায় তাহার শিরশ্ছেদ করা হইল (১৬৯৮), ফলে অন্যান্য বিদ্রোহীরা দলবলসহ পলাইয়া গেল, কেহ বা তন্‌খার বিনিময়ে মুঘলবাহিনীর লবণ গ্রহণ করিল। এই সময় জনসাধারণের জান ও ইজ্জত পুনঃ পুনঃ বিপন্ন হইলে কলিকাতা, চন্দননগর ও চুঁচুড়ার য়ুরোপীয় অধিবাসীরা ঢাকার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁয়ের নিকট এই মর্মে আবেদন করিলেন যে, দেশে যখন এইরূপ বিশৃঙ্খলা চলিতেছে, তখন তাঁহাদিগকে তাঁহাদের বাসস্থান নিরাপদ ও সুদৃঢ় করিবার অনুমতি দেওয়া হউক। সুবাদার দূর ভবিষ্যতের দিকে না চাহিয়া বিদেশী বণিকদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। অতঃপর কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম, চন্দননগরে ফোর দ'লিয়ঁ। (ফোর্ট দি অরলিয়ানস্) এবং চুঁচুড়ায় কেল্লার প্রাচীর ও বুরুজ নির্মাণ আরম্ভ হইল। ইব্রাহিম খাঁয়ের পরে লোভী সুবাদার আজিম উস্‌সানকে ১৬৯৮ সালের জুলাই মাসে মাত্র ১৬,০০০ টাকা দিয়া ইংরাজগণ সুবাদারের নিকট হইতে এই মর্মে এক আদেশনামা বাহির করিয়া লইলেন যে, সুতানুটী (উত্তর কলিকাতা), কলিকাতা (মধ্য কলিকাতা) ও গোবিন্দপুর (দক্ষিণ কলিকাতা)—তিনখানি গ্রাম কিনিয়া লইয়া কেল্লা সুদৃঢ় করিয়া তিনখানি গ্রামের ব্যবস্থা নিরাপদ ও সুরক্ষিত করিবেন। বস্তুতঃ ১৬৯৮ সালেই কলিকাতা নগরীর যথার্থ পত্তন আরম্ভ হইল। স্থূলবুদ্ধি আজিম উস্‌সান বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার প্রদত্ত আদেশের বলে ১৬,০০০ টাকার বিনিময়ে পরবর্তী কালে ইংরাজ অর্ধ পৃথিবীর উপর আধিপত্য স্থাপন করিবে। কলিকাতায় ইংরাজ, চন্দননগরে ফরাসী ও চুঁচুড়ায় দিনেমার বণিকগণ শুধু কেল্লা নির্মাণ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গ অস্ত্রধারীদের দ্বারা আত্মরক্ষা অসম্ভব জানিয়া ইহারা দেশীয় সিপাহি নিয়োগ করিল—দিল্লীর বাদশাহের সাধের নাতি বাঙলার সুবাদারের নাসিকার অগ্রভাগেই এই সমস্ত ব্যাপার চলিতে লাগিল। স্ত্রীপুত্রকে অপমান ও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য দলে দলে হিন্দু-মুসলমান অধিবাসিগণ ইংরাজ-ফরাসী-দিনেমার কেন্দ্রে আশ্রয় লইতে লাগিল। ক্রমে কলিকাতা জাঁকাইয়া উঠিল, আর মুঘল হর্ম্যচূড়া হইতে গৌরবরশ্মি ধীরে ধীরে অপসৃত হইতে লাগিল। আজিম-

উস্‌মানের মতো মূঢ় সুবাদার ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারেন নাই. ইতিহাসের সঙ্কেত ধরিবার মতো 'এলেম' এই সমস্ত অপদার্থ শাহ্‌জাদাদের আদৌ ছিল না।

১৬৯৭ সালে আজিম-উদ-দিন (পরে আজিম উসসান) সুবাদারের কর্মভার লইয়া বর্ধমানে উপস্থিত হইলেন। ইহার পর প্রায় তিনবৎসর ধরিয়া তিনি বাঙলাদেশে খেয়াল খুশি মতো যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন। ১৭০০ খ্রীঃ অব্দে মুরশিদকুলি খাঁ বাঙলার দেওয়ান হইয়া উপস্থিত হইলেন।

১৭০৭ খ্রীঃ অব্দে বৃদ্ধ বয়সে ঔরংজেব দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন, সেই বৎসরেই মুরশিদ বাঙলার ডেপুটি সুবাদার হইলেন। তাঁহার ন্যায় অসাধারণ বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও কর্মক্ষম সুবাদার মুঘল সাম্রাজ্যে দুর্লভ বলিলেই চলে। ১৭১৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'মুতামন-উল-মুল্‌ক্‌ আলা-উদ-দৌলা জাফর খাঁ বাহাদুর নাসিরি নাসির জং'—এই মস্ত উপাধি লইয়া বাঙলার সুবাদারী পদ লাভ করিলেন। ইহার দশবৎসর পূর্বে ঔরংজেব গত হইয়াছিলেন, কিন্তু বাঙলাদেশে মুরশিদকুলি খাঁর মতো বিচক্ষণ দেওয়ান ও সুবাদার ছিলেন বলিয়া তাঁহার জীবিতকালে এদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজস্ববিভাগ সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া পড়ে নাই। কিন্তু ইতিহাসের রথচক্রকে কে বাধা দিতে পারে? ঔরংজেবের মৃত্যুর পূর্ব হইতেই মুঘল সাম্রাজের পতন অনিবার্য হইয়া উঠিতেছিল, দিল্লী-আগ্রা হইতে ঔরংজেবের দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির ফলে দিল্লীকেন্দ্রেও আলমগীরের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিবাদ ঘনাইয়া আসিতেছিল। ঔরংজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা শুরু হইয়া গেল, সিংহাসনের আশেপাশে তাঁহার উত্তরাধিকারীরা শ্বাপদের মতো নখদন্ত শানাইয়া কাজিয়া আরম্ভ করিয়া দিল. আর সেই সুযোগে ইংরাজ বণিক অতিশয় চাতুর্যের সঙ্গে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙলাদেশে ধীর ও মন্থর গতিতে বাণিজ্য ও শক্তির আধিপত্যের বাহু বিস্তার আরম্ভ করিল।

এই শত বৎসরের (১৬০৫-১৭০৭) আলোচনা করিয়া দেখা গেল যে, বাঙলাদেশের শাসন ও রাজস্বব্যবস্থা মুঘল শাসনে আসিয়া সর্বভারতীয় বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে ঐক্যলাভ করিল; দেশের উপর দিয়া অসংখ্য বিদ্রোহ ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা বহিয়া গেল, কত সুবাদার-দেওয়ান-ফৌজদার-বখ্‌শী

বদলাইল। কেহ মাথা বিকাইয়া দিল, কেহ থলি ভরিয়া আশরফি লইয়া দেশ ত্যাগ করিল, কেহ রাজমহল-ঢাকায় বসিয়া বাদশাহী খোয়াব দেখিয়া অর্ধস্বপ্নাতুর চিত্তে অলস মুহূর্তগুলি নিষ্ক্রিয়ভাবে অতিবাহিত করিল, কেহ ভুঁইয়া দমন করিয়া, মগ-ফিরিঙ্গী-বোম্বেটেদের উচিত শাস্তিবিধান করিয়া দুর্গম তরাই অঞ্চলে লড়াই করিতে গিয়া জ্বরে ভুগিয়া মাটি লইল। অপর দিকে সাগরপারের বণিকের দল 'তরাজু' ধরিয়া রেশমের গাঁট ওজন করিতে করিতে চারিপাশে সতর্ক দৃষ্টি হানিতে লাগিল—মুমূর্ষু মুঘল মরিতে যেটুকু বিলম্ব। মধ্যযুগের অন্তিম মুহূর্ত ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, সুতানুটী-গোবিন্দপুরের জলাজঙ্গলকে কেন্দ্র করিয়া বণিক ইংরাজ নূতন বৈশ্যসভ্যতার আমদানি করিল, আর সেই শাঠ্য ষড়যন্ত্রের যুগে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ কখনও ভয়ে বৈতসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, কখনও-বা মুঘলের রাজস্ববিভাগের জমাখরচের জের টানিয়া, খতিয়ান লিখিয়া উদ্বেগে দিন যাপন করিতে লাগিল। ১৭০৭ খ্রীঃ অব্দে অসুস্থ জীর্ণদেহে বৃদ্ধ ঔরংজেব দাক্ষিণাত্যে দেহ ত্যাগ করিলেন—মুঘলসাম্রাজ্যের বিরাট বনস্পতি ভাঙিয়া পড়িল; ভিতরে ভিতরে ইহার প্রাণশক্তি যে অনেক পূর্ব হইতেই নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল, তাহা আলমগীর বাদশাহের মৃত্যুর পূর্বেই স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

২

সমাজের কথা

হিন্দু-মুসলমান ॥

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত মোট একশত বৎসরের বাঙলার সামাজিক জীবন-বিকাশের ইতিহাস হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই ধর্মান্তরীকরণের ফলে বহু নিম্নবর্ণের হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। একদিকে রাষ্ট্রের চণ্ডনীতি, হিন্দুসমাজের অপ্রীতিকর ব্যবহার, আর একদিকে উদারতর ইসলাম ধর্মের ভ্রাতৃত্বের আহ্বান, পীর-ফকির-মুরশিদের অধ্যাত্ম্য কলা-কৌশল ইত্যাদি নানা কারণে হিন্দুসমাজের একপ্রান্তে

ধর্মান্তরীকরণের যে ধারা বহিয়া চলিয়াছিল, তাহা মুঘলযুগেও বিশেষ হ্রাস পায় নাই। পরে পূর্ববঙ্গকে মুসলমান শাসনের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য ঢাকায় মুঘল সুবাদারের রাজধানী ও কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত হইল; কুচবিহার-ত্রিপুরা-আসামের হিন্দুরাজত্ব হয় ভাঙিয়া পড়িল, আর না হয় মুঘল সুবাদারের শ্রীচরণে নত হইয়া জান মান বাঁচাইল। এই সময় হইতে পূর্ববঙ্গে ধর্মান্তরীকরণ প্রবলবেগে অগ্রসর হইল। বৌদ্ধধর্ম ও তন্ত্রের দেশ পূর্ববঙ্গের অন্তেবাসী হিন্দুসমাজে ইসলামধর্ম প্রবলবিক্রমে প্রচারলাভ করিতে লাগিল, যাহার ফলে হিন্দু-বৌদ্ধপ্রধান পূর্বাঞ্চলে সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুসমাজের উপর জাঁকিয়া বসিল। পাঠান আমলে বাঙালী হিন্দু, ধর্মান্তরিত বাঙালী মুসলমান এবং কিছু কিছু তাতার-তুর্কী মুসলমানে মিলিয়া একপ্রকার সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাঙলায় বসবাস করিত। পাঠানগণ এদেশে বাস করিয়া, বাংলা ভাষা শিখিয়া, দেশীয় পণ্ডিত গুণিজনকে খেতাব-খেলাত দিয়া যে সমাজব্যবস্থার পত্তন করিয়াছিলেন, বহিরাগত মুঘলশাসনে তাহা ভাঙিয়া পড়িল, এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতির স্থলে শঙ্কা-সন্দেহ প্রধান বাধা সৃষ্টি করিল। ইহার কারণ মুঘল সুবাদারগণ দিল্লী-আগ্রা-লাহোর হইতে অল্প কয় বৎসরের জন্য বাঙলাদেশ শাসন করিতে আসিতেন, সঙ্গে ফার্সী-উর্দু-ভাষী অনুচর কর্মচারী আসিত। তাঁহাদের স্বল্প মেয়াদী কার্যকাল শেষ হইলেই তাঁহারা নিজ নিজ আস্তানায় ফিরিয়া যাইতেন। সভাস্থলে তাঁহারা উত্তরাপথের ওস্তাদ ও জ্ঞানিগুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, মুঘল তমদ্দুন মোটামুটি মানিয়া চলিতেন। তাই এদেশের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের কোন প্রয়োজন বোধ করিতেন না, সময়ও পাইতেন না। বরং এদেশের বাঙালী হিন্দু ও পাঠান মুসলমানেরা সুবাদার সরকারে চাকুরী লাভের জন্য নিজেরাই ফার্সী ও উর্দু শিখিত। এই জন্য মুঘল সুবাদার বা বাঙলার বাহিরের উচ্চ রাজকর্মচারীরা বাংলা ভাষা শিখিয়া বাঙালী জাতির সঙ্গে পরিচিত হইবার চেষ্টা করেন নাই।

তদানীন্তন বাঙলাদেশের হিন্দুসমাজের কথা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, চৈতন্য ও চৈতন্যসম্প্রদায়ের প্রভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর হিন্দু-সমাজের বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছিল। চৈতন্যপ্রভাবের পূর্বে হিন্দুসমাজে শাক্ত, শৈব, নাথধর্ম ও ধর্মঠাকুরের দল-উপদল আধিপত্য করিতেছিল,

তাহা চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলি আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে।[১০] শাক্তধর্মের মধ্যে পৌরাণিক তন্ত্রাশ্রয়ী উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজ এবং লৌকিক শাক্তমতের অন্তর্ভুক্ত চণ্ডী-মনসা-বাসুলী প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের দেবীরাও গৃহীত হইলেন। নাথধর্ম ও শৈবধর্ম বহুস্থলে প্রায় মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিল। ইহার সঙ্গে আবার লৌকিক শিবের গালগল্প সমন্বিত শিবায়নগুলিও অবিরোধে স্থান করিয়া লইয়াছিল। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ধর্মঠাকুরও[১১] ধীরে ধীরে সমাজের উচ্চশ্রেণীতে প্রাধান্য বিস্তার করিতেছিল। ইতিমধ্যে চৈতন্যপ্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বাঙলার হিন্দুসমাজকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত করিতে লাগিল, ফলে শাক্তমত কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ দুর্বল হইয়া পড়িল।

হিন্দুসমাজে মুসলমানী আদব-কায়দা ও দরবারী রীতিনীতিও অল্পবিস্তর স্থান পাইতেছিল, হিন্দুকর্মচারীরা কাজকর্মের সুবিধার জন্য ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। চৈতন্য আবির্ভাবের ফলে সমাজের নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণভার অনেক সময় ব্রাহ্মণেতর জাতির হস্তে চলিয়া গেল। পরবর্তী কালে বৈষ্ণব সমাজে যাঁহারা গুরুর আসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ ব্রাহ্মণ ছিলেন না, যেমন নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। হিন্দুসমাজের আর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, এইযুগে অনেক কুলস্ত্রী বৈষ্ণবমণ্ডলে গুরু বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। অদ্বৈত গৃহিণী সীতাদেবী, নিত্যানন্দের কনিষ্ঠা পত্নী জাহ্নবাদেবী, শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী—ইঁহারা বৈষ্ণবসমাজে শুধু অতিশয় মান্যাই ছিলেন না, সপ্তদশ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের একটা বড় অংশ অনেক সময়ে তাঁহাদের নির্দেশেই পরিচালিত হইত। বহু শিষ্যানুশিষ্য পরিবৃত হইয়া তাঁহারা বৈষ্ণবসমাজে যেমন শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বাহিরেও সম্মান লাভ করিয়া রুদ্ধ হিন্দুসমাজে মুক্ত বায়ু প্রবাহিত করিয়াছিলেন। অবশ্য তন্ত্রে নারীর প্রাধান্য থাকিলেও সমাজজীবনে বা বৃহত্তর ক্ষেত্রে শাক্তসমাজের মহিলাদের অন্তঃপুরের বাহিরে বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল না।

সপ্তদশ শতাব্দীতে কায়স্থসমাজের প্রাধান্য ও প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল;

---

১০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে (২য়)—চৈতন্যজীবনীকাব্য প্রসঙ্গে এবিষয়ে আলোচিত হইয়াছে।

১১ ধর্মমঙ্গল কাব্য প্রসঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

বড় বড় ভূস্বামী ও জমিদারেরা প্রায় সকলেই কায়স্থ বংশোদ্ভূত ছিলেন। বল্লাল সেনের কৌলীন্যপ্রথা উচ্চতর হিন্দুসমাজে পূর্বের মতোই প্রাধান্য অব্যাহত রাখিয়াছিল—যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে কুলীনগণ ব্যাজচ্ছলে 'বল্লাল সেনিয়া' বলিয়া উল্লিখিত হইতেন।

বাঙলার হিন্দুসমাজে বাঙলার বাহিরের হিন্দুও কিছু কিছু গৃহীত হইয়াছিল। মানসিংহ যখন বাঙলাদেশের সুবাদার হইয়া আসিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে যে সমস্ত রাজপুত সিপাহি ও কর্মচারী আসিয়াছিল, তাহাদের অনেকেই এদেশেই বাস করিত। পশ্চিমের লালা ও মারাঠি চক্ষু চিকিৎসককে তখন প্রায়ই বাঙলার পল্লীগ্রামে দেখা যাইত।[১২] চৈতন্যদেবের প্রভাবে ও মুঘল শাসনের ফলে বাঙলার ভৌগোলিক সঙ্কীর্ণতা কিয়দংশে বিদূরিত হইলে বাঙালী ও অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুদের অল্পস্বল্প যোগাযোগ ঘটিতে লাগিল।

মুঘল শাসনের প্রথম দিকে মুঘল সুবাদার ও দেওয়ানের সঙ্গে বাঙলার বাহির হইতেই রাজকর্মচারী ও সেনাবিভাগের পদাধিকারীরা আসিতেন; কিন্তু কালক্রমে বাঙলার হিন্দুসমাজের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় রাজানুগ্রহের আশায় ফার্সী শিখিতে লাগিল, হিন্দুসমাজ হইতে ধর্মান্তরিত মুসলমানগণও উত্তরাপথের পীর-ফকির ও সুফী সাধকদের প্রভাবে ফার্সীভাষা রপ্ত করিয়া তাহারাও সুবাদারের অধীনে শাসন ও রাজস্ববিভাগে ছোটখাট চাকুরী পাইতে লাগিল। বিশেষতঃ রাজস্বের কড়াক্রান্তির হিসাব-নিকাশ মোগলাই মস্তিষ্কে বড় একটা প্রবেশ করিত না। তাই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই দেখা যাইতেছে, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের শাসন ও রাজস্ববিভাগে কিছু কিছু হিন্দু কর্ম লাভ করিয়া চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত সমাজের বীজ বপন করিয়াছিল। অবশ্য মুর্শিদকুলি ও আলিবর্দির সময়ে শাসন, রাজস্ব ও সামরিক বিভাগে বাঙালী ও অবাঙালী হিন্দুর বিশেষ প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল।[১৩]

একদা ঢাকা শহর হিন্দুপ্রধান ছিল; কিন্তু যেদিন রাজমহল হইতে ঢাকায় মুঘল-বাঙলার শাসনযন্ত্র সরিয়া আসিল, সেই দিন হইতে পূর্ববঙ্গের

---

১২ ইহারা নাকি চক্ষুর ছানি কাটিয়া চক্ষুরোগ নিরাময় করিতে পারিত। দ্রষ্টব্য—রজনীনাথ চক্রবর্তী প্রণীত গৌড়ের ইতিহাস (২য়)। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলেও (ক. বি. ১ম, পৃ. ৩৩১) ইহার উল্লেখ আছে।

১৩ মুঘলযুগে যশোবন্ত রায় ঢাকার দেওয়ান এবং আলমচাঁদ সহকারী দেওয়ান ছিলেন।

প্রধানকেন্দ্র ঢাকায় মুসলমানের আনাগোনা বাড়িয়া গেল, তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং হিন্দুর সংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পাইয়া গেল। ধর্মান্তরীকরণও মুঘলযুগে বেশ চলিয়াছিল ; এমন কি উৎপাতকারী ফিরিঙ্গীদিগকে ধরিতে পারিলে অনেক সময় সুবাদার তাহাদিগকেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেন। হিন্দু জমিদারগণ যথাসময়ে রাজস্ব দিতে না পারিলে বা সুবাদার-ফৌজদারের বিষনজরে পড়িলে অথবা তাঁহাদের রক্তে বারো ভুঁইয়াদের স্মৃতি চাড়া দিয়া উঠিলে তাঁহারা কখনও প্রাণ দিতেন, কখনও-বা প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া ধর্ম খোয়াইতেন।[১৪] শাহ্‌জাহানের নির্দেশে হুগলী অধিকার করিয়া সুবাদার বহু পর্তুগীজকে বন্দী অবস্থায় আগ্রার প্রেরণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা কোন ক্রমে প্রাণ লইয়া কয়েদখানা হইতে বাহির হইতে পারিয়াছিল ; যাহারা খ্রীষ্টানধর্ম ত্যাগ করিতে চাহে নাই, গারদের অন্ধকারে তাহাদের মাটি লইতে হইয়াছিল। মুঘল রাজকর্মচারীরা হিন্দুর উপর যে অকথ্য অত্যাচার করিত তাহার নানা গল্পকাহিনী, স্মৃতি-উপস্মৃতি ও কিংবদন্তীতে অদ্যাপি বাঁচিয়া আছে। বিশেষতঃ ঔরংজেবের সময়ে শায়েস্তা খাঁ যখন এদেশের সুবাদার, তখন তিনি অতি-উৎসাহের বশে বাঙলার হিন্দু তীর্থযাত্রীদের নিকট জিজিয়া কর আদায় করিয়া প্রতি বৎসর দিল্লীর তোষাখানায় লাখখানেক রৌপ্য-মুদ্রা প্রেরণ করিতেন। হিন্দুর উপরে উৎপীড়নের কথা সমসাময়িক বৈষ্ণব সাহিত্যেও দুষ্প্রাপ্য নহে। 'প্রেম বিলাসে' যবন শাসনকেই সমস্ত দুর্গতির মূল বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। 'অদ্বৈত প্রকাশে'ও মুসলমান শাসন ভর্ৎসিত হইয়াছে।

হিন্দু সমাজে বৈষ্ণবপ্রভাবের ফলে শ্রেণীভেদ প্রথা কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছিল, তাহার আমরা ইতিপূর্বে আভাস দিয়াছি। শুধু সাধারণ সমাজে নহে, কিছু কিছু নীচ জাতীয় ব্যক্তিও দুর্দান্ত জমিদাররূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। মানসিংহের সঙ্গে ঝিঝোতিয়া ব্রাহ্মণবংশীয় সচিন্তা

১৪ শ্রীহট্টের জমিদার রাজা গোবিন্দ পরাভূত হইয়া দিল্লীতে আনীত হন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। খাজনা অনাদায়ে বা অন্য কোন অপরাধের অভিযোগে হিন্দু ভূস্বামীরা ঢাকার কয়েদখানায় নিক্ষিপ্ত হইলে বিনা ধর্মত্যাগে বড় কেহ বাহিরে আসিতে পারিতেন না।

রায় নামক যে ব্যক্তি এদেশে আসিয়াছিলেন, তিনি পরে প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করিয়া ফতেসিংহ পরগণার এক হাড়িবংশোদ্ভূত জমিদারকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।[১৫]

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবধর্ম ও আচার-আচরণ হিন্দুসমাজের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম মূলতঃ আবেগকেন্দ্রিক; বাঙালী-মানসও আবেগের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। কাজেই চৈতন্য-প্রবর্তিত অনুরাগমূলক বৈষ্ণবধর্ম বাঙালীর মনের অনুকূল ধাতু হিসাবে সমগ্র জাতিচেতনাকে যে সহজেই উদ্বুদ্ধ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? সমগ্র বাঙলাদেশে এই বৈষ্ণবধর্ম বিস্তার লাভ করিবার হেতু হিসাবে মুঘলশাসনকে পরোক্ষভাবে দায়ী করা যায়। মুঘলশাসনের ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর দুই-তিন দশকের মধ্যেই পূর্ব ও উত্তর-পূর্ববঙ্গের ভুঁইয়াদের বিরোধিতা সম্পূর্ণ লোপ পাইল; চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, আসাম, কুচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে মুঘলশাসন ও আধিপত্য স্থাপিত হওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ববঙ্গের অপরিচয়ের ব্যবধান ঘুচিয়া গেল, পশ্চিমবঙ্গের বৈষ্ণবধর্মও ঐ সমস্ত অঞ্চলে বিস্তারলাভ করিতে লাগিল। অবশ্য বৈষ্ণবপ্রভাবের অতিরেকের ফলে হিন্দুসমাজের অবশিষ্ট বলবীর্য শিথিল হইয়া পড়িল কিনা তাহাও চিন্তার যোগ্য। রাজপুতানার বৈরাগী সন্ন্যাসীরা বাঙলার বৈষ্ণবদের মতো শুদ্ধ জীবন যাপন করিলেও শক্তির চর্চা করিতে কুণ্ঠিত হইত না; মুসলমান সৈন্য মন্দির আক্রমণ করিলে রাজপুত সন্ন্যাসীরাই দল বাঁধিয়া অস্ত্র ঘুরাইয়া আততায়ীকে তাড়াইয়া দিত, কখনও-বা বিফল হইয়া প্রাণ দিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে আসামে এই ধরণের একদল ক্ষাত্রধর্মী গোঁসাই বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর উদ্ভব হইয়াছিল।[১৬] যাহা হউক হিন্দুসমাজে বৈষ্ণবপ্রাধান্য স্বীকৃত হইবার ফলে নিরামিশাষী, লীলাবাদী ও রাগানুগাসাধনায় বাস্তব-বিস্মৃত বৈষ্ণবসমাজ যে ক্রমেই ইহবিমুখ হইয়া উঠিতেছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না।

হিন্দুসমাজে অন্যান্য মতাদর্শও একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। অবশ্য তখন সমাজে প্রকাশ্যে বৌদ্ধ মত ও আচার-আচরণ লোপ পাইয়া গিয়াছিল,

১৫ রজনীকান্ত চক্রবর্তী—গৌড়ের ইতিহাস (২য়)

১৬ Gaite—*History of Assam*

কোথাও-বা গ্রাম্য সংস্কারের ছদ্মবেশে উচ্চসমাজ হইতে দূরে গিয়া প্রচ্ছন্নভাবে কোনও প্রকারে আত্মরক্ষা করিতেছিল। পূর্ববাঙলায় কামরূপ হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত অঞ্চলে, মুসলমান আধিপত্য সত্ত্বেও, কিছু কিছু বৌদ্ধপ্রভাব ছিল, বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরাও এই অঞ্চলে মধ্যযুগে নিতান্ত নগণ্য ছিলেন না। অবশ্য তান্ত্রিক মহাযান, ও হিন্দুতন্ত্রের নানা শাখা-উপশাখার যথেচ্ছা সংমিশ্রণের ফলে বৌদ্ধ সহজিয়া মতাবলম্বী জনসাধারণ সমাজের ঈষৎ নিম্নস্তরে বাস করিত। ইহারা স্মার্ত হিন্দুসমাজে 'নেড়া-নেড়ী' নামে পরিচিত হইয়া অপ-খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ইহাদের জীবনধারা, আচার-আচরণ, ধর্মমত, সমাজ ও যৌনাচারের শিথিলতা হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণদের মধ্যে নিন্দিত হইয়াছিল; পরে নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র (বীরভদ্র) সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহাদিগকে চৈতন্যধর্মে দীক্ষিত করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে স্থান দান করিয়াছিলেন।[১৭] কিন্তু ইহারা বৈষ্ণবসমাজে গৃহীত হইয়াও পূর্বতন আচার-আচরণ ত্যাগ করিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বৈষ্ণব ধর্ম, সমাজ ও সম্প্রদায় ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িল, অলৌকিক 'উজ্জ্বলরস' লৌকিক জীবনের পাত্রে ক্রমেই গাঁজাইয়া উঠিতে লাগিল। স্মার্ত ও শাক্ত হিন্দুসমাজে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বৈষ্ণবদের এই যৌনাতিরেক নিন্দিত হইয়াছিল—তাহার মূল কারণ এই বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়।

হিন্দুসমাজে বৈষ্ণবের সঙ্গে শাক্ত প্রভাবও স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল। যে নবদ্বীপ মহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্র, তাঁহার তিরোধানের পরে এখানে শাক্ত প্রভাব খুব জাঁকাইয়া ওঠে; অদ্যাপি এই বৈষ্ণবতীর্থে শাক্ত পূজা-উপাসনার বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। প্রতাপাদিত্য ঘোরতর শাক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার যশোরেশ্বরী দেবী প্রতিষ্ঠার গল্প হইতেই বুঝা যায়। যেদিন তিনি খুড়া বসন্তরায়কে বধ করিলেন, সেদিন তাঁহার রাজসভায় সুরা ও মাংসের বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল।[১৮] অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই অভিজাত সমাজ ও ভূস্বামিবংশে বৈষ্ণবপ্রভাব সূচিত হইয়াছিল, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলের

---

১৭ এই গ্রন্থের 'বৈষ্ণব সাহিত্য' বিষয়ক অধ্যায়ে বীরচন্দ্র প্রসঙ্গে এবিষয়ে বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

১৮ HOB (II)

অনেক জমিদার ও রাজবংশ চৈতন্যধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে কোন কোন হিন্দু জমিদার বা স্থানীয় রাজা পর্তুগীজ পাদ্রীদিগকে নিজ নিজ এলাকায় আহ্বান করিয়া এবং ধর্মপ্রচারের সুযোগ দিয়া যথেষ্ট ঔদার্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের পরমানন্দরায় ও রামচন্দ্ররায় পর্তুগীজ মিসনারীদিগকে রাজ্য মধ্যে অবাধে ধর্মপ্রচার, ধর্মান্তরীকরণ ও গির্জা বানাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

এই একশত বৎসরের মধ্যে বাঙলার জনচিত্ত আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, হিন্দু জনসাধারণ বৈষ্ণবপ্রভাবে ব্যাকুলচিত্ত হইলেও কুলধর্মানুশাসনে যাঁহারা শাক্ত ছিলেন, তাঁহারা কোন কোন দিক দিয়া সমাজ ও পরিবারের বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় আচারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেন—যদিও বৈষ্ণব ও শাক্তের মধ্যে তত্ত্বের দিক দিয়া যাহাই হউক, আচার-আচরণের দিক দিয়া বিশেষ পার্থক্য ছিল। সমাজে বৈষ্ণব সহজিয়াদের অনুপ্রবেশের ফলে এবং তাহাদের যৌনাচারী সাধন-প্রক্রিয়ার প্রতি গার্হস্থ্য হিন্দুর স্বতঃই বিরাগ ছিল বলিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই নৈষ্টিক ও স্মার্ত হিন্দু-সমাজে বৈষ্ণব প্রভাবের প্রতি কোথাও ঔদাসীন্য, কোথাও-বা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া জাগিতেছিল। সমাজে পীর-ফকির-মুরশিদ ও সুফী সাধকদের আনাগোনা পাঠান আমলেই শুরু হইয়াছিল ; মুঘলযুগে যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধির ফলে এই সময়ে উত্তর-ভারত হইতে আউলিয়া, সিয়া ও সুফী মতাবলম্বী মুসলমানগণ দলে দলে বাঙলায় আসিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। সুবাদার শাহসুজার সিয়া-প্রীতি গোপন ছিল না। তাঁহার অবসানের অর্ধশতাব্দী পরে মুর্শিদকুলি খাঁয়ের সময়ে বাঙলায় যথার্থ সিয়া সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। ঈসা খাঁয়ের সময়ে নাকি ৩৬০ জন আউলিয়া পূর্ববঙ্গে ধর্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন।[১৯] মুঘলযুগে সুবাদার, দেওয়ান প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে উত্তর-ভারত হইতে ইসলাম ধর্মের গুরু-পুরোহিতেরাও আসিতেন ; ফলে বাঙলার ধর্মান্তরিত মুসলমান সম্প্রদায় এই সমস্ত পীর-ফকির-মুর্শিদের সংস্পর্শে আসিয়া ইসলামি তমদ্দুনের প্রভাবে নিখিলভারত মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমপ্রাণতা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু

---

১৯ রজনীকান্ত চক্রবর্তী—গৌড়ের ইতিহাস (২য়)

ঠিক সেই পরিমাণে উত্তরাপথের কুরুক্ষেত্র-মথুরা-বৃন্দাবন-কাশী-কোশলের মধ্যযুগীয় সন্ত-সংস্কৃতি বাঙলাদেশে আনীত হয় নাই। কবীর-নানক-রজ্জব-দাদু-রুইদাস-গেয়ানীনাথ-মীরাবাঈ—ইঁহাদের সঙ্গে বাঙালী পরিচিত হইয়াছে অনেক পরে, ইংরাজ আমলে।[২০] বরং বাঙলার গৌড়ীয়ধর্ম ও চৈতন্যপ্রভাব বাঙলার প্রান্তীয় অঞ্চলে বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছিল, বৃন্দাবন-নীলাচল-দক্ষিণ-ভারতে চৈতন্যদেবের পূত জীবনকথা প্রচারিত হইয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী হিন্দুসমাজ মুসলমানের সংস্পর্শে আসিয়া ইসলামি ধরণ-ধারণ সম্বন্ধে অল্পাধিক অবহিত হইয়াছিল। উভয় সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে কখনও প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল, কখনও-বা কারণে-অকারণে সেই প্রীতিবন্ধন ছিঁড়িয়া যাইত। অনেক মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে পদ লিখিয়াছিলেন, হিন্দুর দেবদেবীবন্দনা গুনাহ্ বলিয়া মনে করেন নাই। কখনও-বা হিন্দু ভক্তসমাজ সত্যপীরের শীর্নি বাঁটিয়া ইসলাম ধর্মের প্রতি প্রকারান্তরে ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। সহজিয়া সাধনা-বিষয়ক কোন কোন পুঁথিতে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সাধনাকে সংযুক্ত করিবার বিচিত্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে। 'বীরভদ্রের শিক্ষামূলক কড়চা' শীর্ষক একখানি সহজিয়া পুঁথিতে আছে যে, বীরভদ্র মদিনা নগরে হজরতের ঘরে মাধব বিবির সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। এই পুস্তিকায় নিত্যানন্দ তাঁহার পুত্র বীরভদ্রকে বলিতেছেন :

শীঘ্র করি যাহ তুমি মদিনা সহরে।
যথায় আছেন বিবি হজরতের ঘরে॥
তথায় যাই শিক্ষা লহ মাধব বিবির সনে।
তাঁহার শরীরে প্রভু আছেন বর্তমানে॥
মাধব বিবি বিনে তোর শিক্ষা দিতে নাই।
তাঁহার শরীরে আছেন চৈতন্য গোঁসাই॥২১

এইভাবে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমান—উভয়েই সত্যপীরের

২০ অবশ্য নাভাজীকৃত হিন্দী 'ভক্তমাল' (১৫৮০) বাংলায় অনুবাদ হইলে (অনুবাদক—১৮শ শতাব্দীর শ্রীনিবাস আচার্য গোষ্ঠীভুক্ত লাল দাস) বাঙালী ভক্তেরা উত্তরাপথের সন্ত-সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ জানিতে পারিয়াছিল।

২১ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত 'বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব' দ্রষ্টব্য।

পূজা-উপাসনা করিত—আউল-বাউল-সাঁই-সহজিয়াদের দ্বারা দুই সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মধ্যে অনেক সময়ে প্রীতির সম্পর্ক দৃঢ়তর হইয়াছিল।

এইবার ফিরিঙ্গী বণিকের কথা। বাঙালীসমাজ ফিরিঙ্গীদের দেখিয়া নিশ্চয় বিস্মিত ও ভীত হইয়াছিল। বাস্তবিক বাঙলাদেশে বাঙালীর সঙ্গে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য জাতির সম্পর্ক স্থাপিত হয় পর্তুগীজ বোম্বেটে ও পাদ্রীদের মারফতে। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই নিম্নবঙ্গে পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছিল, এবং তাহাদের সঙ্গে আবার জেসুইট্ পাদ্রীগণ মুঘলশাসনের দুর্বলতা এবং হিন্দুসমাজের নিষ্ক্রিয়তার ফলে দেশের অভ্যন্তরেও গির্জা বানাইয়া হিন্দু-মুসলমানের কানে যিশুমন্ত্র দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের ভাষা, আচার-আচরণ, উপাসনাপ্রণালী, নৃশংসতা ও ধর্মপ্রচারণার উগ্রতা সে যুগের বাঙালীর মনে শুধু প্রতিকূল বিতৃষ্ণাই সৃষ্টি করিয়াছিল। সে যাহা হউক, সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী হিন্দু-মুসলমান নানা প্রকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দ্বারা কখনও বিরক্ত, কখনও-বা সন্ত্রস্ত হইয়াছিল। অবশ্য হিন্দু জনসাধারণ একজোট হইয়া কোথাও মুঘল রাজশক্তির বিরুদ্ধে বাধাদানের চেষ্টা করে নাই। শুধু মাঝে মাঝে ভূস্বামিগণ শাসক কর্তৃপক্ষের বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিয়া স্বাতন্ত্র্য লাভের চেষ্টা করিতেন।

এইবার এই শতাব্দীর বাঙালীসমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

অর্থনৈতিক অবস্থা॥

সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, জনসাধারণের ক্রয়-বিক্রয়জনিত অর্থ উপার্জন, ব্যবসাবাণিজ্য, বহির্বাণিজ্য, উপকূল-বাণিজ্য ইত্যাদি চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, এই শতাব্দীতে কেন্দ্রীকৃত মুঘল শাসনের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও মুদ্রামানের আদানপ্রদান মোটামুটি এক প্রকার নিয়মশাসনের মধ্যে আসিয়াছিল। টোডরমল্ল, সুজা ও মীরজুমলার অর্থনৈতিক ও রাজস্বসংক্রান্ত বিলি-ব্যবস্থার ফলে দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বাহিরে চলিয়া গেলেও সর্বত্র একটা নিয়মানুগ রাজস্ব ও করপ্রথা অনুসৃত হইত। অবশ্য অসাধু কর্মচারী, লোভী সুবাদার ও বিদেশী বণিকের লোলুপতার জন্য

অধিকাংশস্থলে জনসাধারণকেই দুঃখভোগ করিতে হইত। যাহারা রাজস্ব আদায় করিতে বাহির হইত, তাহারা সঙ্গে সিপাহীশান্ত্রী লইয়া ঘুরিত; হিসাবমতো রাজস্ব ও মনোমতো 'ধুতি' (অর্থাৎ ঘুষ) না পাইলে ইহারা অস্ত্র ব্যবহারেও কুণ্ঠিত হইত না।[২২] এই কর্মচারীরা কিরূপ অত্যাচার করিত, পূর্ববঙ্গ গীতিকাসমূহে তাহার কিছু কিছু গল্প-কাহিনী আছে। অনেক সময়ে জায়গীরদার ও জমিদারেরা ইচ্ছামতো রাজস্ব নির্ধারণ করিতেন; তদুপরি সুবাদার আবার যথেচ্ছা 'আবওয়াব' বৃদ্ধি করিয়া জনসাধারণকে সহ্যের শেষ-সীমায় আনিয়া ফেলিতেন। যদিও তখন দেশে ইংরাজ, দিনেমার, ফরাসী ও পর্তুগীজ বণিকেরা বাণিজ্য করিত, জিনিষপত্র ক্রয়বিক্রয় করিত, উত্তর-প্রদেশ হইতে স্থলপথ ও জলপথে আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য চলিত, সমুদ্রপথেও কিছু কিছু বহির্বাণিজ্য চলিত, কিন্তু তাহাতে জনসাধারণের যে বিশেষ আর্থিক সচ্ছলতা ঘটিত, তাহা মনে করিবার কারণ নাই। ঐতিহাসিকের মতে[২৩] মুঘল যুগে যাতায়াতের সুব্যবস্থা ও একধরণের শাসনব্যবস্থার ফলে বাঙালীর অর্থনৈতিক কূপমণ্ডূকতা ঘুচিয়া গিয়া দেশের অবস্থা মোটামুটি ভালই চলিতেছিল। কিন্তু একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ফিরিঙ্গী ও মুসলমান বণিকদের বাণিজ্য এবং উত্তর প্রদেশের হিন্দুস্থানী লালাদের বিকি-কিনির দ্বারা সাধারণ বাঙালী বিশেষ লাভবান হয় নাই। যদিও রায়তগণ শস্যের বদলে মুদ্রার দ্বারাই খাজনা শোধ করিত,[২৪] এবং শায়েস্তা খাঁ ও সুজাউদ্দিনের সময়ে টাকায় নাকি আটমণ চাউল মিলিত, তবু একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, সাধারণের ক্রয়ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ তখনও কড়ির দ্বারা ক্রয়বিক্রয় হইত; এমন কি ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দেও কলিকাতা শহরে নিম্নতম মুদ্রামান হিসাবে কড়ি ব্যবহৃত হইত।

য়ুরোপীয় বণিকেরা রূপার বদলে বাণিজ্য করিত, কাজেই দেশের মধ্যে ধীরে ধীরে বাণিজ্যের মুদ্রামান হিসাবে রৌপ্যের ব্যবহার বাড়িতে লাগিল। ফলে যেমন জনমজুরের পারিশ্রমিক কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইল, তেমনি ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যও বাড়িতে লাগিল। সমাজের উপরের তলার ধনী,

---

২২ স্টুয়ার্টের *History of Bengal* দ্রষ্টব্য।

২৩ HOB (II)

২৪ *Ain-i-Akbari*

পোদ্দার, জমিদার ও রাজসরকারের কর্মে-নিরত মধ্যবিত্তগণ কিঞ্চিৎ সুখ-সুবিধা ভোগ করিলেও নিম্নস্তরের জনসাধারণের অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেল। যাহারা রেশম বা সুতীবস্ত্র উৎপন্ন করিত, তাহাদিগকে নামমাত্র দাদন দিয়া ফিরিঙ্গী বণিকগণ উৎপন্ন কাঁচামাল সুলভমূল্যে গুদামজাত করিত; তারপর তাহাদের কুঠীতে সেই সমস্ত রেশম ও কার্পাস এ দেশের শ্রমিকদের দ্বারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া চড়াদামে দেশে বিদেশে বিক্রয় করিত। ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দে পর্যটক বার্নিয়ার দেখিয়াছিলেন যে, কাশিমবাজারে দিনেমার কুঠীতে সাত-আটশত দেশীয়লোক শ্রমিকের কাজ করিত। টাভারনিয়রের মতে কাশিমবাজার হইতে প্রতিবৎসর সাড়ে সাতাশ হাজার মণ রেশম বিদেশে রপ্তানি হইত। পাশ্চাত্য দেশ হইতেও কিছু কিছু দক্ষ শ্বেতাঙ্গ শ্রমিক আনিয়া তাহাদিগকে কাশিমবাজারের কুঠীতে রেশম পরিষ্কারের কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বিদেশী বণিক এদেশে বাণিজ্য করিয়া কি পরিমাণ অর্থের লেনদেন করিত তাহার আনুমানিক হিসাব পাওয়া গিয়াছে। ১৬৫১ খ্রীঃ অব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম হুগলীতে কুঠী স্থাপন করে। ইহার পূর্বে (১৬৪২) তাহারা বালেশ্বরে কুঠী নির্মাণ করিয়া ব্যবসা চালাইত। ১৬৮০ খ্রীঃ অব্দের দিকে এদেশে তাহাদের প্রায় সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা খাটিত। একবৎসরের মধ্যে তাহাদের মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইল প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা। বলাই বাহুল্য সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য রৌপ্য টাকার বিনিময়েই চলিত।[২৫] ইংরাজ বণিক উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে যে রূপা দিত, রাজমহল ও ঢাকার টাঁকশালে সেই রূপা গলাইয়া টাকা ছাপা হইত। পাঠানযুগে কৃষিজাত ও তন্তুজাত দ্রব্যাদি দেশের মধ্যেই ক্রয়-বিক্রয় হইত; অল্প কিছু চীন-মালয়-আরবে যাইত, কিছু-বা পর্তুগীজ বণিকেরা কিনিয়া লইত। বহির্বাণিজ্য সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া দেশের মধ্যে দ্রব্যের বিনিময়ে বাহির হইতে বিশেষ রূপার আমদানি হইত না। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে আন্তঃপ্রাদেশিক ও বৈদেশিক বাণিজ্যের বৃদ্ধির ফলে দেশে রূপার আমদানি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাঙলাদেশে কলিকাতা, চন্দননগর, চুঁচুড়া-হুগলী বাণিজ্যের ঘাঁটিতে পরিণত হইল, এই অঞ্চলেই বিদেশী বণিকের বিশেষ আনাগোনার ফলে পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথীর উভয়

২৫ HOB (II)

তটে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সরিয়া আসিল, উত্তরকালে এই পীঠস্থানেই ভারতের নব সভ্যতার জন্ম হইল।

দেশে রূপার আমদানি হইলেও মুঘল সুবাদারেরা যে পরিমাণ অর্থ শোষণ করিয়া দিল্লী-আগ্রায় চলিয়া যাইতেন, এবং যে হারে মুঘল বাদশাহকে রাজস্ব ও নজরানা পাঠাইতেন তাহার ওজনটাও তুচ্ছ করিবার মতো নহে। জাহাঙ্গীরের পূর্বে বাঙলা দেশ পুরাপুরি মুঘল অধিকারে আসে নাই; সুতরাং বাংলা হইতে দিল্লীতে রাজস্ব বাবদ বিশেষ কিছু প্রেরিত হইত না। কেবল জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর কিছু পূর্বে (১৬২৭) এখানকার সুবাদার এই মর্মে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, প্রতিবৎসর বাঙলা হইতে জাহাঙ্গীরকে পাঁচলক্ষ এবং নূরজাহানকে পাঁচলক্ষ—মোট দশলক্ষ টাকা সুবাদারের ব্যক্তিগত দান ('খাসা') হিসাবে পাঠাইতে হইবে। তখনও বাঙলা হইতে নির্ধারিত পরিমাণ রাজস্ব প্রেরিত হইত না। ১৬৮২ খ্রীঃ অব্দ হইতে সুবাদার শায়েস্তা খাঁ প্রতিবৎসর পাঁচলক্ষ টাকা পাঠাইতেন। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, মুঘল সুবাদার, তা তিনি শাহ্‌জাদাই হউন, বা অন্য কোন খানদানী বংশোদ্ভূত হউন, বাঙলাদেশ হইতে মুঠা মুঠা সোনা-রূপা, হীরা-জহরত লইয়া যাইতেন। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে যখন ঔরংজেব দীর্ঘকাল ব্যস্ত ছিলেন, তখন সে যুদ্ধের মোটা ব্যয় নির্বাহ হইত বাঙলার রাজস্বের দ্বারা, শায়েস্তা খাঁ যুদ্ধের জন্যই বহুটাকা বাদশাহকে প্রেরণ করিতেন। বহির্বাণিজ্যের দ্বারা যে রূপা ঘরে উঠিত এইরূপে তাহা বাহিরে চলিয়া যাইত, বাকি অংশ লোভী সুবাদার ও অসাধু রাজকর্মচারীদের জঠর পুরাইতেই নিঃশেষ হইয়া যাইত। মধ্যস্বত্বভোগী, জমিদার-তালুকদার-গাঁতিদার-জায়গীরদারগণ তাহার কিছু কিছু প্রসাদ পাইত, কিন্তু যাহারা কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করিত, যাহারা হাজাশুখার যত বিপদ সব ঘাড় পাতিয়া লইত, যাহাদের জমির উপর দিয়া মুঘল সুবাদারের ঘোড়সওয়ার চলিয়া যাইত, সুলভ শস্যের দিনেও তাহাদিগকে অধিকাংশ সময় অর্ধাশনে দিন গুজরান করিতে হইত। তাহাদের পরিধানে থাকিত খাদি (ছোট ধুতি), খুঞা (তিসির আঁশের কাপড়) বা ধোকড়ী (মোটা কাপড়),—শীতকালে বড় জোর গায়ে দোপাট্টা ও পাছুড়ি উঠিত। মীরজুমলার অল্পদিন শাসনের ফলে রাজস্ব ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ সুরাহা হইলেও ছোট খাট ব্যবসায়ীদের নিকট 'জাকাত' (বার্ষিক আয়ের

এক চতুর্থাংশ) এবং 'হাসিল' (বাণিজ্য শুল্ক) কর অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে আদায় করা হইত। মীরজুমলা 'সওদা-ই-খাস' অর্থাৎ সমস্ত পণ্যদ্রব্যকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ছোট বড় সমস্ত ব্যবসায়ীর নিকট তিনি যুদ্ধব্যয় বাবদ প্রচুর অর্থ আদায় করিতেন। তাঁহার শাসনকালে (১৬৬১) এদেশে দারুণ দুর্ভিক্ষে বহুলোক অন্নাভাবে মারা পড়িয়াছিল। মীরজুমলার মৃত্যু এবং শায়েস্তা খাঁয়ের কর্মভার গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ে বাঙলায় এমন বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল যে, সরকারী কর্মচারীরাও ভয়সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে সুলভমূল্যে উৎপন্ন দ্রব্য কিনিয়া লইয়া জনসাধারণকেই চড়া দামে বিক্রয় করিত। বলাই বাহুল্য 'সওদা-ই-খাস'-এর সমস্ত ভারটা জনসাধারণের উপর পড়িত। উপরন্তু সুবাদারেরা যথেচ্ছা অর্থ সংগ্রহ করিতেন। শায়েস্তা খাঁ মাত্র সাত বৎসরের মধ্যে (১৬৭৮-৮৫) ঔরংজেবকে প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা পাঠাইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, স্বয়ং শায়েস্তা খাঁ দ্বাদশ বৎসর সুবাদারী করিয়া আটত্রিশ কোটি টাকা সঞ্চয় করেন। শুনা যায়, তাঁহার নাকি দৈনিক আয় ছিল দুই লাখ, এবং ব্যয় হইত এক লাখ। এইরূপ দুইচারিটি তথ্যের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যাইবে, সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজ্যের ছায়াতলে আসিয়া বাঙলাদেশে শাসন, রাজস্ব ও সামরিক ব্যাপারে ঐক্য ও বিধিনিয়ম স্থাপিত হইয়াছিল; দেশে ব্যবসাবাণিজ্যের বৃদ্ধি ও পাশ্চাত্য বণিকের তাহাতে অংশ গ্রহণের ফলে দেশে প্রচুর মূলধন খাটিত, কিন্তু জনসাধারণ তাহার বিশেষ অংশ পাইত না। তদুপরি বিদ্রোহীদের উৎপাতের জন্য বাঙলায় শাসনঘটিত অশান্তি বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল। শোভা সিং ও রহিম খাঁ পশ্চিমবঙ্গের অনেকটা অংশের উপর নখর প্রহার করিলে বাঙালী বুঝিল মুঘল রাজমহিমা অস্তগত প্রায়। অপরদিকে তখন ভাগীরথীর পূর্বপারে সুতানুটী-গোবিন্দপুরে ইংরাজ বণিক জঙ্গল কাটিয়া বিকিকিনির গঞ্জ বানাইয়াছে, শহর তৈয়ারী করিয়াছে, কেল্লাবুরুজ নির্মাণ করিয়া তাহাতে কামান সাজাইয়াছে; এখানে লোকে স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া নিশ্চিন্তমনে কাজকর্ম করিতে পারিবে, কোম্পানীর মুল্লুকে আর ধর্ম-কর্ম-মান-ইজ্জত গোরু-জরু হারাইবার ভয় নাই—এই ভরসায় বহু সম্পন্ন গৃহস্থ, জমিদারের শাখাপ্রশাখা, জনমজুর—সকলেই নিরাপদ আশ্রয়ের কামনায় কালিকাক্ষেত্রের অদূরে ভাগীরথীতীরে

সুতানুটী, গোবিন্দপুরে আসিয়া জমায়েত হইতে লাগিল। পুরাতন অর্থনৈতিক কাঠামো, সমাজব্যবস্থা, মধ্যযুগীয় জীবন ও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এতদিন ধরিয়া যে সমস্ত জমিদার ও ভূস্বামিসম্প্রদায় দেশের দশের মান রক্ষা করিতেছিলেন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে নিযুক্ত ছিলেন, মুঘল সুবাদারের অত্যাচারের ফলে অনেকেরই রাতারাতি ভাগ্যের পাশা উল্টাইয়া গেল। অতঃপর ইঁহারা নূতন জীবন ও নূতন জীবিকার সন্ধানে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

৬

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

সপ্তদশ শতাব্দীর হিন্দু ও মুসলমান সমাজের শিক্ষাদীক্ষা কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত তাহা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে। বাঙলার মুঘল শাসন প্রত্যক্ষতঃ শিক্ষাবিস্তারে কোন সাহায্যই করে নাই, বরং টোল-চতুষ্পাঠীর জন্য প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর জমিগুলিও লোভী সুবাদারগণ বিনা বাক্যব্যয়ে কাড়িয়া লইয়াছিলেন। চৈতন্যপ্রভাবে বৈষ্ণবসমাজে, এমন কি হিন্দু-সমাজের মধ্যে কিছু কিছু শাস্ত্রচর্চা আরম্ভ হইয়াছিল: পুরাণ-উপপুরাণ, বিশেষতঃ বৈষ্ণব মতাবলম্বী পুরাণসাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত, বৃন্দাবন গোস্বামীদের সংস্কৃতে রচিত তত্ত্বগ্রন্থ প্রভৃতিও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে অনুশীলিত হইত। বিশেষতঃ ন্যায়শাস্ত্রের চর্চার যে রীতি ষোড়শ শতাব্দীতে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহার ধারা সপ্তদশ শতাব্দীতেও অব্যাহত ছিল। বরং একটা লক্ষণ দেখা যাইতেছিল—হিন্দু সমাজে ফার্সীর চলন জনপ্রিয় হইতেছিল। মুঘল সুবাদার বা অন্যান্য রাজকর্মচারীদের প্রায় কেহই বাংলা ভাষার ধার ধারিতেন না, জানিবার প্রয়োজনও বোধ করিতেন না। প্রথম দিকে উত্তর-ভারত হইতেই মুসলমান কর্মচারীরা এদেশে আসিত, তাহাদের সঙ্গে ফার্সীজ্ঞানসম্পন্ন উর্দুভাষী হিন্দুও আসিত। রাজস্ববিভাগে ইহাদেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল। যাহা হউক সরকারী চাকরীর লোভে কিছু কিছু হিন্দু ফার্সীভাষা ও মুসলমানী হিসাব-

নিকাশে বেশ রপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ফৌজদারী-দেওয়ানী আদালত এবং ঢাকা-মুর্শিদাবাদে সুবাদার ও দেওয়ানের বিভাগে ফার্সীভাষাই ব্যবহৃত হইত বলিয়া মুঘলযুগে, বিশেষতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দুসমাজে ফার্সী-ভাষা রাজভাষা ও অর্থকরী ভাষা বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। অবশ্য বাংলা ভাষাতেও ক্রমে ক্রমে প্রচুর আরবী, ফার্সী শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল। বাউল ও সুফী গুরু-মুরশিদের দ্বারা ইসলামি তমদ্দ্ুনের সাধন-ভজন বিষয়ক বহু পারিভাষিক শব্দ হিন্দুর শব্দভাণ্ডারেও অবলীলাক্রমে প্রবেশ করিয়াছিল। নদীয়া, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলের জমিদারের সভাতেও ইসলামিভাষা ও ফার্সী 'কিচ্ছা'র বেশ সমাদর দেখা যায়। তবে পুরাতন জমিদার বংশ উচ্চহারে রাজস্ব দিতে না পারায় তাঁহাদের বিষয়সম্পত্তি সুবাদারের বিভাগে নিযুক্ত বিত্তবান কিন্তু কৌলীন্যহীন কর্মচারীরাই সেই সমস্ত জমিদারী কিনিয়া লইতে লাগিল। মুর্শিদকুলি খাঁয়ের কিছু পূর্ব হইতে এই ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছিল। ফলে যে সমস্ত পুরাতন ভূস্বামী ও রাজবংশ টোল-চতুষ্পাঠীর ব্যয় নির্বাহের জন্য নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি দিতেন, গুরুপুরোহিতের জন্য 'বার্ষিকে'-র ব্যবস্থা করিতেন, হঠাৎ-জমিদারগণের নূতন শাসনে অর্থাভাবে সেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা শুষ্ক হইতে লাগিল। বস্তুতঃ মুঘলযুগেই বাঙালীর শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির অবনতির সূচনা হয়। যে সমস্ত ঐতিহাসিক বাঙলায় মুঘলশাসনের মহিমা কীর্তনে পঞ্চমুখ, তাঁহারা বোধ হয় এই দিকটার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহেন নাই। মুঘলযুগে বাঙলা দেশের ভৌগোলিক সঙ্কীর্ণতা কিয়ৎ পরিমাণে ঘুচিয়াছিল, পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যাতায়াতের ফলে সারা বাঙলার হিন্দুসমাজ একই প্রকার জীবন ও সাধনার দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিয়াছিল, তাহাও স্বীকার্য; কিন্তু সমাজ, অর্থনীতি ও শিক্ষাসংস্কৃতি বিচার করিলে বাঙলা দেশের সপ্তদশ শতাব্দীর মুঘল শাসনের নিরঙ্কুশ গুণকীর্তন করা উচিত হইবে না। দেশ কীভাবে লোভী সুবাদার ও কর্মচারীদের দ্বারা শোষিত হইতেছিল, ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধি সত্ত্বেও দেশের অবস্থা বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই—তাহা আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি। শিক্ষার ব্যাপারেও দেখা যাইতেছে, একমাত্র বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায়কে বাদ দিলে অন্যত্র শিক্ষার মান অতিশয়

অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। রাষ্ট্র যেখানে প্রতিকূল, অথবা উদাসীন, হিন্দুর প্রতি শাসনশক্তি স্বতঃই বিরূপ এবং সামন্ত-ভূস্বামী শক্তি যেখানে 'অস্তংগতমহিমা', সেখানে মৌলিক শিক্ষাদর্শ তো অবনত হইয়া পড়িবেই। কেবল কিঞ্চিৎ ফার্সীভাষার প্রচলন হওয়াতে মুসলমানি গল্প আখ্যায়িকা এবং সুফী মরমী সাধনা ও ধর্মাচরণ মুসলমান সমাজে নূতনপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এবং হিন্দুসমাজেও তাহার তরঙ্গ প্রবেশ করিয়াছিল। তবে গুণ ও পরিমাণের দিক দিয়া তাহার মূল্য যৎসামান্য। ঢাকা-মুর্শিদাবাদকে ঘেরিয়া একটা অলস-বিলাসী নাগরিক সমাজ যেমন গড়িয়া উঠিল, তেমনি কাশিমবাজার, হুগলী, চুঁচুড়া ও কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া বৈশ্য সভ্যতার পত্তন হইল। কিন্তু যাহাকে যথার্থ শিক্ষা বলে, সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতির চর্চা এই শতাব্দীতে সাধারণ হিন্দুসমাজে বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছিল। কোন কোন হিন্দু জমিদারের সভায় বিদ্যোৎসাহী দু'একজন ভূস্বামী জ্ঞানীগুণীদের অল্প-স্বল্প পৃষ্টপোষকতা করিলেও সমগ্র সমাজে তাহার প্রভাব অধিকদূর বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। তর্জা, পাঁচালী, যাত্রা, নাটগীতি, এবং কবিগান ধরণের অমার্জিত নাগরিক আনন্দোল্লাস নূতন সভ্যতার সংস্কৃতিহীন পরিবেশে পরবর্তী শতকে যেভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছিল, সপ্তদশ শতাব্দীতেই তাহার ভিত্তি পত্তন হইয়াছিল। শিক্ষাদীক্ষাহীন নাগরিকতা ও বৈশ্যপ্রাধান্য সমগ্র সমাজকে কীভাবে প্রাণশক্তিহীন করিয়া ফেলে, শাঠ্যষড়যন্ত্রই প্রধান হইয়া উঠে, তাহা পরবর্তী শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে।[২৬] যাহা হউক মুঘল যুগের বাহ্যিক ঐশ্বর্য সত্ত্বেও অন্তরে অন্তরে বাঙালীসমাজ যে ক্রমেই দীনদুর্বল হইয়া পড়িতেছিল, বহুকাল প্রচলিত সংস্কৃতির ধারা-উপধারা শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, তাহা এই যুগের সংস্কৃত সাহিত্যাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইলেই বুঝা যাইবে।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিচয় ॥

আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি যে,[২৭] ষোড়শ শতাব্দীতে সাহিত্য ও নব্য ন্যায়ে বাঙালী-মনীষা কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। অবশ্য ষোড়শ শতাব্দীতে

---

২৬ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্গত 'রাজবৃত্ত' দ্রষ্টব্য।

২৭ লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের' ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

রচিত সংস্কৃত রসসাহিত্যের প্রায় সবটাই চৈতন্যানুরাগী বৈষ্ণবদের দ্বারা রচিত এবং তাহা স্বতঃই বৈষ্ণব আদর্শের অনুকূল। চৈতন্যদেবের প্রভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণবসমাজে সংস্কৃত কাব্যাদির চর্চা ও অনুশীলন হইয়াছিল, এবং তাহার সঙ্গে বুদ্ধিমার্গীয় নব্য ন্যায়ের চর্চায় বাঙালীর মননধর্মের বিস্ময়কর পরিচয় পাওয়া যায়। এই দুই প্রকার বিষম ধাতুর মিলন—অর্থাৎ আবেগ-মূলক বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও মননকেন্দ্রিক নব্য ন্যায় চর্চা—ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্য-যুগে বাঙালী-চেতনার অভূতপূর্ব বিকাশ শুধু ইহা হইতে স্পষ্ট অনুভূত হইতে পারে। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে যদিও বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, টীকা-টিপ্পনীর স্তূপ বাড়িয়াছে, ন্যায়-স্মৃতি-মীমাংসা-বেদান্ত চর্চারও নানা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তবু ষোড়শ শতাব্দীর সেই প্রাণোচ্ছল প্রেরণা সপ্তদশ শতাব্দীর ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি-আশ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থাদি অনুশীলনে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। মুঘল শাসনের ফলেই হউক, অথবা উচ্চতর আদর্শ হইতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্খলনের জন্যই হউক, সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী কবি-মনীষীরা সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে বিশেষ কোন প্রশংসনীয় মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। অবশ্য যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও স্মৃতি-সংহিতার শাসন-অনুশাসন ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালীর চিত্তে নূতন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার অনেকটাই সপ্তদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ-সাহিত্য, বৈষ্ণবনিবন্ধ, জীবনীকাব্য প্রভৃতির মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল; সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালীসমাজ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পরিচয় লাভ করিবার জন্য ততটা সংস্কৃত পাঠের প্রয়োজন বোধ করিত না—তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য, স্মৃতির প্রচুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই বোধ হয় সাধারণ সমাজে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের অনুশীলন অপেক্ষা বাংলা সাহিত্যের প্রচার অধিক হইয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত সংস্কৃত কাব্যনাট্যাদির কিছু কিছু পরিচয় যে পাওয়া যায় নাই তাহা নহে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বহু অনুসন্ধান করিয়া বাঙালী রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাদির তালিকা, পুঁথি, কবি-পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত গ্রন্থের অতি অল্পই মুদ্রিত হইয়াছে। শুধু যেগুলি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং যেগুলি স্মৃতি ও নব্য ন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, আধুনিক কালে শুধু সেইগুলিই কিছু কিছু মুদ্রিত হইয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী লেখক ও কবিগণ কয়েকখানি দূত-কাব্য লিখিয়া কিঞ্চিৎ কবিপ্রতিভার পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন। অবশ্য অন্যান্য কাব্য, গদ্যকাব্য ও নাটক প্রহসনের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। পদ্মনাভ মিশ্র বোধ হয় ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে 'বীরভদ্রদেবচম্পূ' শীর্ষক চম্পূকাব্যে নিজ পৃষ্ঠপোষক বীরভদ্রদেবের কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় অম্বষ্ঠবৈদ্য চন্দ্রশেখর 'সূর্জন চরিত' শীর্ষক মহাকাব্যে আকবর যুগের ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন। অবশ্য এই দুইজনে গৌড়ীয় হইলেও ইঁহারা বারাণসীধামে বসিয়া এই কাব্য দুইখানি রচনা করিয়াছিলেন। গোবিন্দ ভট্টাচার্য নামক আর এক বাঙালী কবি সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শাহ জাহানের প্রধানমন্ত্রী আসফ খাঁয়ের প্রশস্তি প্রকাশ করিয়া 'পদ্যমুক্তাবলী' রচনা করেন। আরও দুই একখানি লৌকিক (সেক্যুলর) ধরণের কাব্যগ্রন্থের নাম পাওয়া যাইতেছে। কৃষ্ণনাথ রচিত 'আনন্দলতিকাচম্পূ' নামক চম্পূকাব্যে মর্ত্যদেহধারী প্রেমিক-প্রেমিকার রোমান্টিক আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তদশ-অষ্টদশ শতাব্দীর মহিলা কবি বৈজয়ন্তী তাঁহার স্বামীকে গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করিতেন। প্রিয়ম্বদা নাম্নী আর এক মহিলা-কবি সপ্তদশ শতাব্দীতে 'শ্যামারহস্য' শীর্ষক একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে দূত-কাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা প্রয়োজন।[২৭] কালিদাসের 'মেঘদূতে'র আদর্শে বাঙলাদেশে দ্বাদশ শতকের ধোয়ীর 'পবনদূত' হইতে পরবর্তী কালে সংস্কৃতে অসংখ্য দূত-কাব্য রচিত হইয়াছে। এই দূত-কাব্যগুলির অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণ বা গোপীকৃষ্ণ বিষয়ক—দুই একখানিতে সীতারামের ঘটনার বর্ণনাও আছে। ভট্টপল্লীবাসী রামদয়াল তর্করত্ন 'অনিলদূতে' মথুরাপ্রস্থিত শ্রীকৃষ্ণসমীপে বিরহিনী গোপী কর্তৃক বায়ুকে দূতরূপে প্রেরণের আখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন। 'কীরদূতে' (কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি রামাগোপালের রচনা) শুকপক্ষীকে গোপীগণ কৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিল। লম্বোদর বৈদ্য 'গোপীদূতে' দেখাইয়াছেন যে, গোপীরা কোন একজন গোপীকে কৃষ্ণের নিকট দূতী প্রেরণ করিয়াছিল। গোপেন্দ্রনাথ গোস্বামী 'পাদপদূতে' একটু

---

২৭ বাঙালী কবি রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের জন্য ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান' এবং দূতকাব্যের জন্য ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর 'বঙ্গীয় দূতকাব্যেতিহাস' দ্রষ্টব্য।

অভিনব ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছেন—বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গৃহপ্রাঙ্গণের নিম্ববৃক্ষকে নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট দূত করিয়া পাঠাইতেছেন—এইভাবে কাব্যটি রচিত হইয়াছে। অম্বিকা চরণের 'পিকদূত', রঘুনাথ দাসের 'হংস-দূত', রুদ্র ন্যায়বাচস্পতির 'ভ্রমরদূত' (ইহাতে রামচন্দ্র ভ্রমরকে সীতার নিকট দূত করিয়া পাঠাইয়াছেন), শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের 'চন্দ্রদূত' (১৮শ শতাব্দীর) রামচন্দ্র কর্তৃক সীতার নিকট চন্দ্রকে দূতরূপে প্রেরণ, অজিত ন্যায়রত্নের 'বকদূত' কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের 'বাতদূত' (সীতা কর্তৃক বাতাসকে রামচন্দ্রের নিকট দূতরূপে প্রেরণ) প্রভৃতি অসংখ্য দূতকাব্যে নিতান্ত গতানুগতিক বর্ণনা ভিন্ন বিশেষ কোন প্রতিভার চিহ্ন লক্ষ্য করা যায় না। কেহ কেহ আবার 'কাকদূত' (গৌরগোপাল শিরোমণি) রচনা করিয়া অজ্ঞাতসারে কিঞ্চিৎ হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিরহিনী শ্রীরাধা একটি কাককে কৃষ্ণের নিকট দূত করিয়া পাঠাইতেছেন—এ বর্ণনা বিরহবেদনা অপেক্ষা কৌতুকরস সৃষ্টিতেই অধিকতর সাহায্য করে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, দূতকাব্যের কবিরা ব্যাঘ্রভল্লুকাদিকে রাধাকৃষ্ণ সমীপে দূতিয়ালীর গুরুভার অর্পণ করেন নাই। এযুগে যে কিছুই লিখিতে পারে না, সে অন্ততঃ 'রম্যরচনা'য় হাত পাকাইতে চাহে ; সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর সংস্কৃতজ্ঞ কবিরা সেইরূপ নানা প্রকার দূতকাব্যে 'কেরামতি' দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই শতাব্দীতে কয়েকখানি নাটকপ্রহসনও পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ভুলুয়ার রাজা ও বারো ভুঁইয়াদের অন্যতম লক্ষ্মণমাণিক্যের 'কুবলয়াশ্বচরিত' (মদালসার পুত্র) এবং তাঁহার পুত্র অমর মাণিক্যের 'বৈকুণ্ঠবিজয়' (উষা-অনিরুদ্ধ পরিণয়) নাটক উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্মণমাণিক্যের সভাকবি কবি-তার্কিকের, 'কৌতুকরত্নাকর' এবং গোপীনাথ চক্রবর্তীর 'কৌতুকসর্বস্ব' অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ প্রহসন—বেশ্যা ইহার প্রধান চরিত্র। উত্তর চৈতন্যযুগে সংস্কৃতি ও সদাচারের স্বাভাবিক স্রোত ক্রমেই ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করে, তাহার প্রচ্ছন্ন পরিচয় এই সমস্ত স্থূলরুচির সংস্কৃত প্রহসনে লক্ষ্য করা যাইবে। সংস্কৃতে রচিত আদিরসাত্মক কাব্য, কবিতা ও নাটক প্রহসন অষ্টাদশ শতাব্দীতেও যথেষ্ট মিলিতেছে। ১৭৬৯ শকে অনুলিখিত 'ধূর্তসমাগম' প্রহসনে একজন বেশ্যাপ্রিয় সন্ন্যাসীর রঙ্গ-কৌতুক বর্ণিত হইয়াছে। দামোদর

গুপ্তের 'কুট্টনীমতমের' পুঁথি ১১৭২ সনে বাংলা অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। 'চৌরপঞ্চশিকার' শ্লোকসংগ্রহ (সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর পুঁথি) এবং 'অমরুশতকের' পুঁথিও (১৭৫১ খ্রীঃ অব্দের পুঁথি) এমন কিছু দুষ্প্রাপ্য নহে।[২৮]

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙালীরচিত প্রতিভাদীপ্ত সংস্কৃত কাব্য কাহিনীর বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া না গেলেও দেশের মধ্যে প্রাচীন সুবিখ্যাত কাব্যনাট্যাদি যে বিশেষভাবে অনুশীলিত হইত, টীকাটিপ্পনী রচিত হইত—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কালিদাসের 'মেঘদূত' (১৭৮৬ সংবতে বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুঁথি),[২৯] কবিরত্নপ্রণীত 'মেঘদূতে'র টীকা (১৬৩৯ শক), কবিরাজের 'রাঘবপাণ্ডবীয়' (১৬১১ শক), নীতিবর্মার 'কীচকবধ' (১৫৯৬ শক), কালিদাসের শকুন্তলা (১৪৯৪ শক), কৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' (১৬৬৫ শক), শ্রীহর্ষের 'নৈষধরচিত' (১৬০৭ শক) ও ইহার নানা টীকা কিরাতার্জুনীয়, কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, ভট্টিকাব্য, রত্নাবলী প্রভৃতি কাব্যনাট্যাদির পুঁথিনকল ও টীকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে 'মেঘদূতে'র পুঁথি ও টীকার সংখ্যাই সর্বাধিক। 'মেঘদূতে'র জনপ্রিয়তা ও প্রভাবের ফলেই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু দূতকাব্য রচিত হইয়াছিল। মুঘলযুগে শাসকসম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত হইয়াও এই যুগের বাঙলাদেশের পণ্ডিতসমাজ যে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যনাট্যাদির চর্চা, অনুশীলন ও টীকাটিপ্পনী রচনা করিয়াছিলেন, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে—ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি চৈতন্যপ্রভাবের ফলে কীভাবে উচ্চবর্ণের মধ্যে দৃঢ়মূল হইয়াছিল। নানা ব্যাকরণ, অভিধান-অলঙ্কার শাস্ত্রের পুঁথির সংখ্যা যেরূপ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, পৃষ্ঠপোষকের সহায়তা ও সহানুভূতি না পাইয়াও ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থসন্তানগণ শুধু সারস্বত বুদ্ধির প্ররোচনাতেই সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য ও দর্শনাদি সাহিত্যের সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, এইজন্য আজও তাঁহারা স্মরণীয় হইয়া আছেন।[৩০]

---

২৮ *Descriptive Catalogue of the Sanskrit mss. in the Asiatic Society*—Mm. H.P. Shastri.

২৯ বঙ্গাব্দীয় মধ্যে পুঁথি সকলের তারিখ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

৩০ ব্যাকরণ-অভিধান-অলঙ্কার গ্রন্থের তালিকার জন্য ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সপ্তদশ শতাব্দীতে পুরাণের প্রচুর অনুশীলনও একটি মূল্যবান তথ্য। বস্তুতঃ মধ্যযুগের উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজ স্মৃতি ও পুরাণের দ্বারাই অধিকাংশ স্থলে নিয়ন্ত্রিত হইত। এমন কি, আধুনিক যুগের হিন্দুগণও স্মৃতিসংহিতা ও পুরাণের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। চৈতন্যপ্রভাবে সংস্কৃত পুরাণগ্রন্থ, বিশেষতঃ কৃষ্ণলীলাঘটিত পুরাণ সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'টি তো বাঙালীর রচিত, বাঙলাদেশেই রচিত হইয়াছিল। দেবীপুরাণও বাঙলাদেশে বহু ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল। বৃহৎ নন্দিকেশ্বর পুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, মহাভাগবতপুরাণ (শাক্ত), দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ,[৩১] ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ,[৩২] পদ্মপুরাণ, সনৎকুমার সংহিতা প্রভৃতি পুরাণগ্রন্থ সপ্তদশ শতাব্দীর উচ্চ সমাজে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ—এই যুগে বঙ্গাক্ষরে লেখা এই সমস্ত পুরাণের বহু পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে যে নবপুরাণীকরণ লক্ষ্য করা যায়, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবসাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্যে পুরাণের যে প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তাহার মূল উৎস এই সমস্ত সংস্কৃত পুরাণ ও উপপুরাণ। তন্মধ্যে কোন কোন অর্বাচীন উপপুরাণ বাঙালীর দ্বারা বর্ধিত, কোথাও বা সম্পূর্ণ রচিত হইয়াছিল। বলাই বাহুল্য শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবপুরাণ—এই তিনশ্রেণীর গ্রন্থ সপ্তদশ শতাব্দীর পণ্ডিতসমাজে অনুশীলিত হইত। কথকঠাকুরদের কথকতার দ্বারা এই সমস্ত পুরাণের কাহিনী ও নীতি-আদর্শ অশিক্ষিত সমাজেও প্রচার লাভ করিয়াছিল। লোকসংস্কৃতি ও পুরাণসংস্কৃতি উভয়ের সংমিশ্রণে বাঙলার জনসমাজ গঠিত হইয়াছে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

দর্শন পরিচয় ॥

ইহা তো গেল সংস্কৃত কাব্যনাট্যাদির আলোচনা—যাহা মূলতঃ আবেগাশ্রয়ী। কিন্তু মননশীল রচনায় সপ্তদশ শতাব্দীর ব্রাহ্মণপণ্ডিতের দল কত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

---

৩১ কামরূপে রচিত—ইহাতে নরবলির বিধান আছে।

৩২ ৮ম শতাব্দীর দিকে গ্রথিত, ১৬শ শতাব্দীতে বাঙালী পণ্ডিতের দ্বারা সুবিস্তারিত। এই বিষয়ে ডঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরার '*Studies in the Puranas*' দ্রষ্টব্য।

আমরা ইতিপূর্বে[৩৩] ষোড়শ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক পটভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, বিশুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বচিন্তা ও নির্বস্তুক মননে বাঙালী কোনদিনই বিশেষ পারঙ্গমত্ব দেখাইতে পারে নাই।[৩৪] এদেশে স্মৃতি, ন্যায়, মীমাংসা, সাঙ্খ্য, তন্ত্র, যোগ ও বেদান্ত অল্পাধিক অনুশীলিত হইলেও নব্যন্যায়েই বাঙালীর ক্ষুরধার বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে। ষোড়শ শতাব্দী হইতেই সারা ভারতের পাঠার্থীরা নব্যন্যায়ে দীক্ষা লাভ করিবার জন্য নবদ্বীপের দ্বারস্থ হইতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতেও কিছু কিছু প্রথাসিদ্ধ শাস্ত্র চর্চা হইয়াছিল—যদিও পরিমাণগত হিসাবনিকাশে তাহার মূল্য ঈর্ষার যোগ্য নহে।

'মীমাংসা'র আলোচনা বাঙলাদেশে কোনদিনই খুব কিছু জনপ্রিয় ছিল না। উদয়নাচার্য তাঁহার 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি'-তে গৌড় মীমাংসকদের উল্লেখ করিয়াছেন; প্রাক্ তুর্কী যুগে গৌড়ীয় মীমাংসকদের কিছু খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল, যে জন্য হলায়ুধ তাঁহার 'ব্রাহ্মণসর্বস্বে' লিখিয়াছিলেন যে গৌড়ে বেদচর্চার স্থলে মীমাংসার প্রতি সকলের অধিকতর আকর্ষণ। যাহা হউক ষোড়শ শতাব্দীর পরে পৃথকভাবে মীমাংসার চর্চা বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর চন্দ্রশেখর বাচস্পতির 'ধর্মদীপিকা'য় স্মৃতি-মীমাংসা আলোচিত হইলেও বাচস্পতি ষড়দর্শনে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। মূলতঃ তিনি স্মৃতিতত্ত্বই আলোচনা করিয়াছিলেন, শুধু ব্যাখ্যা ও মতস্থাপনের জন্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে মীমাংসার সাহায্য লইয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গের আর একজন চন্দ্রশেখর 'তত্ত্বসংবোধিনী' শীর্ষক একখানি টীকাগ্রন্থে মীমাংসা আলোচনা করিয়াছিলেন। সাঙ্খ্যদর্শনও এদেশে সপ্তদশ শতাব্দীত অল্পবিস্তর আলোচিত হইয়াছিল। সাঙ্খ্যের সেশ্বরবাদী ব্যাখ্যাতা সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশেই জন্মগ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'সাঙ্খ্যকৌমুদী' (ঈশ্বরকৃষ্ণের টীকা) শ্রীনাথ ভট্টাচার্যের 'সাঙ্খ্যপ্রয়োগ' প্রভৃতির দৃষ্টান্তে বুঝা যাইতেছে যে, তন্ত্রের

৩৩ লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (২য়) দ্রষ্টব্য।

৩৪ বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীদের মধ্যে রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী ও গোপালভট্ট দার্শনিক মননবিশ্লেষণে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহার গৌরব বাঙালী পুরাপুরি দাবি করিতে পারে না। কারণ তাঁহারা দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী। পরবর্তী কালের বিখ্যাত বৈষ্ণব দার্শনিক ও টীকাকার বলদেব বিদ্যাভূষণ বাঙালী বৈষ্ণবসমাজে অতিশয় মান্য হইলেও বাঙালী নহেন। তাঁহার নিবাস উড়িষ্যা।

দেশ গৌড়বঙ্গে পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বযুক্ত সাঙ্খ্য দর্শনও পাণ্ডিতসমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল।

বৈশেষিক দর্শনও যে একেবারে অনালোচিত ছিল তাহা নহে। নব্য-ন্যায়ের মূলে ছিল ন্যায় ও বৈশেষিক ; সুতরাং এদেশে বৈশেষিকের আলোচনাও কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, নব্যন্যায়ের প্রভাবেই এদেশে ষোড়শ শতাব্দীর পরে বৈশেষিকের আলোচনা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।[৩৫] সপ্তদশ শতাব্দীর জগদীশ তর্কালঙ্কার 'প্রশস্তপাদ ভাষ্যের' যে টীকা রচনা করেন, তাহার নাম 'সূক্তি'। বর্ধমান নামে আর এক পণ্ডিত উদয়নের 'কিরণাবলীর' উপর টীকা রচনা করিয়াছিলেন। বৈশেষিকের উপর বিশেষ কোন প্রতিভাসম্পন্ন মৌলিক টীকা পাওয়া যায় না। কণাদ তর্কবাগীশের 'ভাষারত্নে' কিছু কিছু মৌলিকতা লক্ষ্য করা যায়। জয়রাম ন্যায়পঞ্চাননের 'পদার্থরত্নমালা'তেও বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

নব্যন্যায়, বেদান্ত ও তন্ত্রে বাঙালীর প্রতিভা যথার্থ পথ পাইয়াছে। নব্য-ন্যায়ের সমস্ত গৌরব ষোড়শ শতাব্দী আত্মসাৎ করিলেও সপ্তদশ শতাব্দীতেও কয়েকজন প্রথমশ্রেণীর নব্যনৈয়ায়িকের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই শতাব্দীতে যে কয়জন প্রসিদ্ধ নব্যন্যায়পন্থী পণ্ডিত বাঙালীর তীক্ষ্ণধী মননের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জগদীশ তর্কালঙ্কার, রুদ্রন্যায় বাচস্পতি, জয়রাম পঞ্চানন, গৌরীকান্ত সার্বভৌম, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিনাম তর্কবাগীশ, বিশ্বনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন, রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ, গোবিন্দশর্মা, রঘুনাথ ন্যায়ালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য, নৃসিংহ পঞ্চানন, রামদেব চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, রামরুদ্র তর্কবাগীশ প্রভৃতিই নৈয়ায়িকদের নাম উল্লেখ-যোগ্য।[৩৬] সপ্তদশ শতাব্দীর গদাধর ভট্টাচার্য যখন নবদ্বীপে নব্যন্যায় অধ্যাপনা করিতেন, তখন নাকি ৪০০০ ছাত্র এবং ৫৫০ জন অধ্যাপক নব্যন্যায় অনুশীলনে নিযুক্ত ছিলেন।[৩৭] 'পদাঙ্কদূতে'র রচনাকার শ্রীকৃষ্ণ

---

৩৫ অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর 'Bengal's Contribution to Philosophical Literature' (*The Indian Antiquary*, 1929) দ্রষ্টব্য।

৩৬ মনোমোহন চক্রবর্তীর 'History of Navya Nyaya in Bengal and Mithila'. (*Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1915) দ্রষ্টব্য।

৩৭ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—বাঙালীর সারস্বত অবদান

সার্বভৌমও বিখ্যাত নব্যন্যায়পন্থী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধমত নিরসন করিয়া ন্যায়ের টীকা রচনা করেন। ব্যক্তিগত ধর্মমতের দিক দিয়া তিনি সম্ভবতঃ চৈতন্যপন্থী ছিলেন। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বহু নৈয়ায়িক স্মৃতিমীমাংসাদি ততটা না মানিলেও অনেকেই "যশোদানন্দনং বন্দে" বা "প্রণম্য শিরসা কৃষ্ণং" বলিয়া কৃষ্ণ বন্দনা করিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর গদাধর ও মথুরেশের টীকাটিপ্পনীই বাঙলার নব্যন্যায়ের বিশেষ গৌরব প্রচার করিয়াছে। অবশ্য এই শতাব্দীতে দীর্ঘ টীকা অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রী বা মন্তব্য (chit)-যুক্ত তীক্ষ্ণ আলোচনাই অধ্যাপক ও ছাত্রমহলে অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছিল। জানকীনাথ চূড়ামণি, সতীশ তর্কালঙ্কার, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি পণ্ডিতের নাম স্বীকার করিয়াও বলা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে নব্যন্যায়ের আর সেরূপ দীপ্তি ও তীক্ষ্ণতা ছিল না। বুদ্ধির চুলচেরা বিশ্লেষণে বাঙালীর মেধা মুক্তির স্বাদ লাভ করে বটে, কিন্তু আবেগও এ জাতির প্রাণ ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত। তাই এই শতাব্দীতে যেমন বৈষ্ণবদর্শন আলোচিত হইয়াছে, তেমনি নব্যন্যায়ের বুদ্ধিমার্গীয় আলোচনাও পণ্ডিত সমাজে জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই দুইপ্রবৃত্তি, বুদ্ধি ও আবেগ বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ। তাই বিশুদ্ধ মননধর্মী বাঙালী নৈয়ায়িকদের কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা উচ্চারণ করিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন, কেহ-বা চৈতন্যদেবের বিশেষ গুণগ্রাহী ও অনুরাগী ছিলেন।

আমরা ইতিপূর্বে অন্যত্র[৩৮] বাঙালীর দর্শনচর্চা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে, হিন্দুযুগে যেমন বাঙালী বেদান্তের আলোচনা করিত, তেমনি চৈতন্যযুগে ভক্তিধর্ম ও দ্বৈতবাদের প্রাধান্যের দিনেও শঙ্করাচার্যের বেদান্তসূত্রের অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের প্রতিও বাঙালী উদাসীন হইয়া যায় নাই। ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত মধুসূদন সরস্বতী বেদান্তের নানা টীকাটিপ্পনী লিখিয়া এবং মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়া বাঙালীর দার্শনিক চিন্তার গৌরব বৃদ্ধিই করিয়াছিলেন। তাঁহার 'অদ্বৈতসিদ্ধি' সুবিখ্যাত গ্রন্থ। শাঙ্করদর্শনে বিশ্বাসী মধুসূদন 'অদ্বৈতরত্নরক্ষণ', 'বেদান্তকল্পলতিকা' প্রভৃতি টীকাটিপ্পনী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অল্প পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী এবং নন্দরাম তর্কবাগীশ (সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ-

৩৮ এই লেখকের বাং. সা. ইতিবৃত্ত (২য়) দ্রষ্টব্য।

ভাগ) বেদান্তের টীকাটিপ্পনী লিখিয়া বেদান্তচর্চার পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাতেও বেদান্তের চর্চা অব্যাহত ছিল। অবশ্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী গীতা-ভাগবতের টীকা রচনা করিয়া এবং বলদেব বিদ্যাভূষণ দশখানি উপনিষদের টীকা এবং 'গোবিন্দ ভাষ্য', 'প্রমেয়-রত্নাবলী', 'সিদ্ধান্তরত্ন' প্রভৃতি গ্রন্থে দ্বৈতবাদী ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা বলা চলিতে পারে যে, বৈষ্ণবসমাজের বাহিরে বিশাল পণ্ডিতসমাজে অদ্বৈত বেদান্তেরই অধিকতর প্রভাব লক্ষিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে পাণ্ডিত্যের প্রাথমিক নিদর্শন হিসাবে নব্যন্যায় ও বেদান্ত স্বীকৃত হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে যিনি ব্যাকরণ ও অলঙ্কারে নিষ্ঠা দেখাইতে পারিতেন, সারস্বত সমাজে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া যাইত।

বৈষ্ণব সমাজে একদিকে যেমন বাংলা পদাবলী, চৈতন্য ও অন্যান্য মহাজন-জীবনী, বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও নিবন্ধ জাতীয় গ্রন্থ এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মৌলিক সংস্কৃত রচনা এবং তাহার বঙ্গানুবাদ বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, তেমনি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও বলদেব বিদ্যাভূষণের গ্রন্থ, ভাষ্য ও টীকা—যাহাতে দ্বৈতবাদী ভক্তিদর্শন ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বৈষ্ণবসমাজে, বিশেষতঃ সংস্কৃতজ্ঞ রক্ষণশীল বৈষ্ণবসমাজে তাহার বিশেষ প্রচার হইয়াছিল।

তন্ত্রপ্রসঙ্গ ॥

প্রসঙ্গক্রমে তন্ত্রের কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইতিপূর্বে[৩৯] আমরা দেখিয়াছি যে, তন্ত্রের খিড়কীপথে অনেক ন্যক্কারজনক সাধনপ্রক্রিয়া শাক্তপন্থী হিন্দুসমাজে, কখনও প্রকাশ্যে—অধিকাংশ সময়েই গোপনে অনুশীলিত হইত। তন্ত্রের যে অংশটুকু ব্যবহারিক, তাহাতেই সর্বাধিক বিকার প্রবেশ করিয়াছিল। বৈষ্ণব, বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউলদের মতের সঙ্গে তন্ত্রের ছিটাফোঁটা মিশাইয়া ধর্মের অনুমোদনে যে নির্ভেজাল কামচর্চা চলিত তাহা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে উৎকট আকার ধারণ করে। তন্ত্রের ক্রিয়া-কর্মের ও তত্ত্বকথার রূপকে এই সমস্ত পুস্তিকায় কামশাস্ত্র ও কুট্টনীমতেরই অনুশীলন হইয়াছে। ষোড়শ শতকের ব্রহ্মানন্দ ও তাঁহার শিষ্য পূর্ণানন্দ

৩৯ লেখকের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

তান্ত্রিকগ্রন্থ রচনা করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রকে শাক্ত পরিবারে প্রচার করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার গুপ্তিপাড়ায় বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৭২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার 'শ্যামাকল্পলতিকা' নামে তান্ত্রিকগ্রন্থে শাক্তদর্শন, তত্ত্ব ও কৃত্য বিষয়ে অনেক গুহ্য কথা বিবৃত হইয়াছে। গৌড়শঙ্করের 'তারা-রহস্যপুস্তিকা' (১৬৩০ খ্রীঃ অঃ) আর একখানি প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ। রঘুনাথ তর্কবাগীশ 'আগমতত্ত্ববিলাসে' (১৬৮৭ খ্রীঃ অঃ) প্রায় কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশের মতো বিরাট পটভূমিকায় তন্ত্রমত সমূহ আলোচনা করেন। এই গ্রন্থ রচনা করিতে গিয়া তর্কবাগীশ ১৬০ খানি তন্ত্রবিষয়ক পুঁথি আলোচনা করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বাঙলা দেশের নানা স্থান হইতে তন্ত্রের অনেক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এদেশের জনসাধারণের একটা বড় অংশ তন্ত্রমতে নিত্যকর্ম নির্বাহ করিত। এই শাক্ত সংস্কার বোধহয় বৌদ্ধপ্রাধান্য প্রশমিত হইবার পর বাঙালী সমাজে সুপ্রচার লাভ করে। মহাযান বৌদ্ধ-মতের নানা শাখাপ্রশাখা (মন্ত্রযান, কালচক্রযান, বজ্রযান, সহজযান) এবং নাথধর্মে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, কৌলশাস্ত্র, হটযোগ প্রভৃতি গুহ্যশাস্ত্রের কৃত্যসমূহ প্রবেশ করিয়াছিল। তাই বাঙালী সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি কুলধর্মে শাক্ত ও তান্ত্রিক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনা ঘোরতর শাক্তবিদ্বেষী হইলেও শাক্তগণ কৃষ্ণ ও কালীকে একাকার করিয়া মানসিক ঔদার্যের পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য বৈষ্ণবগণ সম্পূর্ণভাবে শাক্তমত পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহারাই তো 'রাধাতন্ত্র' লিখিয়াছিলেন। সমীরাচার্য রচিত 'গোবিন্দ-কল্পলতা' আসলে তন্ত্রের গ্রন্থ। শুধু বাহিরে বৈষ্ণব রসের শর্করা মণ্ডন দেওয়া হইয়াছে—এইমাত্র[৪০] পার্থক্য।

সুফীপ্রসঙ্গ ॥

এই প্রসঙ্গে সুফী, মারফতী, মুর্শিদ ও বাউল ভজন সম্বন্ধে একটু উপক্রম করা যাইতে পারে।[৪১] আমরা রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, শাহ্ সুজার সময় হইতে বাঙলায় সিয়া ও সুফী সম্প্রদায়ের

৪০ শাক্তপদাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙলার শাক্ত ও তন্ত্রমত সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য দেওয়া হইয়াছে।

৪১ মুসলমান কবিদের প্রসঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা আছে

কিঞ্চিৎ প্রাধান্য ঘটিয়াছিল। মুঘল শাসনের একচ্ছত্র শাসনে আসার ফলে প্রদেশে প্রদেশে যাতায়াতের সুগমতা বৃদ্ধি পাইল। ফলে উত্তরভারত হইতে সুফী সাধক ও সিয়া উলেমাগণ বাঙলা দেশে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। ইরাণে নূতন রাজবংশ (রাজ্‌ভি) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় স্থানীয় সিয়া সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বিপত্তির আশঙ্কা করিয়া হিন্দুস্থানে পলাইয়া আসেন। বাঙলাদেশে ইঁহাদের কেহ কেহ আসিয়াছিলেন, সুতরাং স্থানীয় মুসলমানসমাজে ইঁহাদের প্রভাব বিস্তৃত হওয়াও স্বাভাবিক। চট্টগ্রাম আরাকানকে কেন্দ্র করিয়া একদল সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান কবি নূতন সাহিত্যশাখার যে পথ নির্মাণ করেন, তাহাতে যুগপৎ সুফী ও হিন্দু বাউলের আদর্শের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। তাই হিন্দু বাউলগণও ইসলামি সাধনার পরিভাষিক শব্দসমূহ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুফী মতাবলম্বী মুসলমান কবিগণও হিন্দুর যোগসাধনা, তন্ত্র ও বাউলদর্শন সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন না।

এই পটভূমিকায় অতঃপর সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের রূপ, রীতি ও সাধনা আলোচনা করিতে হইবে। মুঘল শাসনের সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে জনসাধারণ ধীরে ধীরে যেমন ভৌগোলিক সঙ্কীর্ণতা ছাড়াইল, তেমনি সমাজজীবনের সঙ্গেও সকলের ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ হইল। সমাজেও মুঘল নাগরিকতার ভালমন্দ, মার্জিত নাগরিকতা ও উচ্ছৃঙ্খল নাগরিকতা— উভয়ই বাঙালী হিন্দুসমাজে অল্পবিস্তর প্রবেশ করিল। পাঠান যুগে গৌড়, রাজমহল, তাঁড়ায় কবে রাজধানী নির্মিত হইতেছে, কবেই-বা তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছে জনসাধারণ তাহার বিশেষ সংবাদ রাখিত না। কিন্তু মুঘল-যুগে ঢাকা ও মুর্শিদাবাদকে ভুলিয়া থাকা কঠিন হইল, দেশের মানুষ দেশ ও সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধসূত্রে জড়িত হইয়া পড়িল। এইজন্য একটু বিস্তারিত আকারে সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালাদেশের সমাজ, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মঙ্গলকাব্য

মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও অপ্রধান মঙ্গলকাব্য

ভূমিকা ॥

অন্যত্র[১] আমরা সাধারণভাবে সমস্ত মঙ্গলকাব্যের এবং বিশেষভাবে মনসামঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু, কাহিনী ও সামাজিক পটভূমিকা আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আমরা এই অধ্যায়ে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রধান মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ ও পরিচয় বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিব।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য, বিশেষতঃ মঙ্গলকাব্যে ভাঁটার টান শুরু হইয়া গিয়াছিল। চৈতন্যযুগের অবসানের পর স্বাভাবিকভাবেই জাতির সাহিত্য ও সাধনায় শিথিলতা সঞ্চারিত হইয়াছিল। মঙ্গলকাব্যের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও ইহাতে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাদ্যুতি প্রায়ই লক্ষ্যগোচর হয় না। গত শতাব্দীতে মুকুন্দরাম, নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত—প্রভৃতি কবির মতো মৌলিক প্রতিভা লইয়া সপ্তদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যের কোন কবি আবির্ভূত হন নাই। অবশ্য এই যুগের মঙ্গলকাব্যেরও কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যাহার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। চৈতন্যপ্রভাবে পুরাণাশ্রিত ও সংস্কৃত ভাষাবাহী ঐতিহ্য সমাজের প্রায় সর্বশ্রেণীর মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে থাকিলে মঙ্গলকাব্যেও সে ধারা সঞ্চারিত হইয়াছিল। মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলে পুরাণ ও পৌরাণিক ঐতিহ্যের বিশেষ প্রাধান্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধর্মমঙ্গলকাব্য পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। ধর্মমঙ্গলে বৌদ্ধপ্রভাব, বা অন্য কোন লৌকিক প্রভাব থাকিলেও ইহাতে পৌরাণিক ধর্ম, নীতি ও আদর্শ অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতোই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। শুধু চণ্ডী, মনসা ও ধর্মমঙ্গলকাব্য নহে,

---

১ এই লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' (২য়) মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

লৌকিক দেবদেবী লইয়া আরও নানাপ্রকার পুরাণধর্মী ও লৌকিক ধরণের মঙ্গলকাব্য এ যুগে প্রচুর রচিত হইয়াছে। এই শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যে গ্রাম্য লৌকিকভাব হ্রাস পাইয়া তাহার স্থলে পৌরাণিক প্রভাব দৃঢ়মূল হইতে আরম্ভ করিয়াছে—ভাষায় তৎসম শব্দের বাহুল্যেই তাহা বুঝা যাইবে। শুধু ভাষায় নহে, অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যে বৈষ্ণবপ্রভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহাও লক্ষণীয়। ইতিপূর্বে মঙ্গলকাব্যে পাঁচালী ও ব্রতকথার রীতি অনুসৃত হইলেও ষোড়শ শতাব্দী হইতে এই শাখা যথার্থ কাব্যরূপ লাভ করিল, এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহার একটা বাঁধাবাঁধি আকার-আয়তন দাঁড়াইয়া গেল। এই যুগের মঙ্গলকাব্যে মৌলিক কাব্যসৃষ্টিক্ষমতা ততটা প্রকাশ না পাইলেও তৎকালীন দেশ ও সমাজের নানা পরিচয় যে ইহাতে স্পষ্টাক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অতঃপর আমরা এই শতাব্দীর মনসা, চণ্ডী ও অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইতেছি।

১
মনসামঙ্গল কাব্য

সপ্তদশ শতাব্দীতে মনসামঙ্গল কাব্যের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত মঙ্গলকাব্যেরও যে বহুল প্রচার হইয়াছিল তাহা নকল করা পুঁথিগুলি হইতে প্রমাণিত হইতেছে। মুকুন্দরাম, মাধব আচার্য, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব—ইঁহাদের পুঁথিসমূহ তখন দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তদুপরি সপ্তদশ শতাব্দীর কয়েকজন কবিও কিছু কিছু জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন। এই শতকের মনসামঙ্গলের প্রধান কবিদের মধ্যে দ্বিজ বংশীদাস (ময়মনসিংহ), কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ (বর্ধমান), জগৎজীবন ঘোষাল (উত্তরবঙ্গ), তন্ত্রবিভূতি (উত্তরবঙ্গ), ষষ্ঠীবর (শ্রীহট্ট) কালিদাস (উত্তর রাঢ়), বিষ্ণুপাল (রাঢ়, বর্ধমান ?), প্রভৃতি কবিদের নাম উল্লেখযোগ্য। আরও দুএকজন স্বল্প প্রতিভাধর কবি এই শতাব্দীতেই (রসিক মিত্র—বর্ধমান, কবিচন্দ্র—রাঢ়, সীতারাম দাস—রাঢ়) মনসামঙ্গল রচনা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ প্রচার লাভ করিয়াছিলেন। অবশ্য ইঁহারা গ্রামীণ

সীমাবদ্ধতা ছাড়াইয়া বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িতে পারেন নাই, ইঁহাদের কাব্যগুলিও লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করিয়া যথার্থ সাহিত্যের পংক্তিভোজে আহূত হইতে পারে কিনা সন্দেহ। পূর্ববঙ্গে আবার বাইশ কবি মনসামঙ্গল ('বাইশা') বা ষটকবি মনসামঙ্গলের কিছু কিছু প্রচার হইয়াছিল। আধুনিক কালে এইরূপ দুই একখানি পুঁথি মুদ্রিতও হইয়াছে। নিম্নে 'বাইশা' সম্বন্ধে সংক্ষেপে যৎসামান্য আলোচনা করা যাইতেছে।

বাইশকবি মনসামঙ্গল (বাইশা) ॥

পূর্ববঙ্গে মনসামঙ্গল কাব্যের যেমন জনপ্রিয়তা, তেমনি মনসা পূজারও খুব জাঁকজমক হইয়া থাকে। তাই এই সমস্ত অঞ্চলে মনসামঙ্গলের পুঁথি এখনও খুব ঘটা করিয়া পঠিত হইয়া থাকে। সে যুগে পুরাতন কবিদের নানা পুঁথি পুনঃ পুনঃ নকল করিয়া যেমন ব্যবহার করা হইত, তেমনি আবার কোন কোন সংগ্রাহক প্রয়োজনের জন্য মনসামঙ্গলের নানা কবির পুঁথি হইতে উৎকৃষ্ট অংশ নির্বাচিত করিয়া কাহিনীর ধারা মোটামুটি বজায় রাখিয়া একপ্রকার মিশ্রধরণের (composite) মনসামঙ্গল-কাব্য সঙ্কলন করিতেন। নানা কবির রচনার দ্বারা গ্রথিত এইরূপ মনসামঙ্গলের কোন পুঁথি আমরা না দেখিলেও এই ধরণের মুদ্রিত গ্রন্থ ('বাইশা') হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ববঙ্গ, বিশেষতঃ চট্টগ্রামে এইরূপ একাধিক কবির রচনাসমূহে সমৃদ্ধ মনসামঙ্গল কাব্য পুঁথির আকারেও প্রচলিত ছিল। চট্টগ্রাম ও ঢাকা হইতে এইরূপ মিশ্র মনসামঙ্গল কাব্যের পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে, কলিকাতার বটতলা হইতেও এইরূপ মনসামঙ্গলের মুদ্রিত সংস্করণ বাহির হইয়াছিল, এখনও পাওয়া যায়।[২] এই ধরণের কাব্যের 'বাইশকবি মনসামঙ্গল' ('বাইশা') এবং 'ষট্‌কবি মনসামঙ্গল'—এই দুই প্রকার রূপ প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে

২ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'বাইশকবির মনসামঙ্গল বা বাইশা' (১৯৫৪) নামে যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বাইশকবির পুরাতন পুঁথির পুনর্মুদ্রণ নহে। সম্পাদক বয়জন মনসামঙ্গলের কবির (হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, দ্বিজ বংশীদাস, জীবন মৈত্রেয়, বিষ্ণুপাল, নারায়ণদেব, বিপ্রদাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ও ষষ্ঠীবর) রচনা হইতে অংশ বিশেষ সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন, কিন্তু পুরাতন 'বাইশকবির' অনুসরণে তিনি এই কাব্য সঙ্কলনের নাম দিয়াছেন 'বাইশকবির মনসামঙ্গল বা বাইশা'। ('সম্পাদকের নিবেদন' দ্রষ্টব্য।)

বাইশকবির একাধিক মুদ্রিত সংস্করণ আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু ষটকবি মনসামঙ্গলের কোন মুদ্রিত সংস্করণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। পশ্চিম-বঙ্গে ইহার কোন পুঁথির সন্ধানও পাওয়া যায় নাই।[৩]

এ পর্যন্ত আমরা তিনখানি[৪] বাইশকবির মুদ্রিত সংস্করণ দেখিয়াছি।[৫] (ক) বাইশকবি মনসা (২য় সংস্করণ, চট্টগ্রামে মুদ্রিত), (খ) বাইশকবি মনসা (৩য় সংস্করণ, কলিকাতা), (গ) শ্রীশ্রীপদ্মাপুরাণ বাইশকবি মনসা-মঙ্গল (৩য় সংস্করণ ঢাকায় মুদ্রিত)। এই তিনখানি সংস্করণের প্রথমে যে ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে, তাহা হইতে কয়েকটি বিশেষ তথ্য পাওয়া যাইতেছে। চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের (১৩০১) ভূমিকায় সম্পাদক বলিতেছেন:

> শ্রীশ্রীপদ্মপুরাণ অনুসারে অতিপূর্বকালে বাইশজন কবি মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীমনসাদেবীর পূজা প্রকাশ উপলক্ষে চন্দ্র সদাগরের বিবাদ ইত্যাদি যে যে ঘটনা হইয়াছিল তাহা রচনা করিয়াছিলেন, এই জন্য এই পুস্তকের নাম বাইশকবি মনসা।

১৩১৮ সালে কলিকাতা হইতে যে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাহার ভূমিকায় বলা হইয়াছে:

> দ্বাবিংশ কবি প্রণীত মনসাপুঁথি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। এই বাইশকবি দ্বারা বিরচিত হস্তলিখিত গ্রন্থ বহুকাল যাবৎ চট্টগ্রামবাসীগণ শ্রাবণমাসে পাঠ করিয়া

৩ ডক্টর আশুতোষ দাস মহাশয় চট্টগ্রাম প্রচলিত ষট্‌কবির পুঁথি দেখিয়াছেন ও পাঠ শুনিয়াছেন। এই পুঁথি আকারে সংক্ষিপ্ত, গ্রাম্যরুচিপূর্ণ—আধুনিক রুচির নিকট তত প্রীতিকর মনে হইবে না। তিনি চট্টগ্রাম হইতে বাইশকবির পুরাতন পুঁথি সংগ্রহের ও চেষ্টা করিতেছেন। ১৩৬৫ সনের 'কর্ণফুলী' মাসিকপত্রে (মাঘ) তিনি এই পুঁথি সংগ্রহের জন্য চট্টগ্রামবাসীদিগকে অনুরোধ করিয়া একটি আবেদনও প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এখনও বাইশকবির কোন পুঁথি সংগ্রহ করা যায় নাই।

৪ তিনখানি মুদ্রিত গ্রন্থের আখ্যা পত্র:—(১) বাইশকবি মনসা / শ্রীনবীনচন্দ্র বিশ্বাস কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত / চট্টগ্রাম ভারতীযন্ত্রে শ্রীগুরুপ্রসন্ন সেন দ্বারা মুদ্রিত / চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লা / বিশ্বাস কোম্পানির পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য / ১৩০১—২য় সং, (২) বাইশকবি মনসা / শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী কর্তৃক সংগ্রহীত ও প্রকাশিত / তৃতীয় সংস্করণ / কলিকাতা /১৩১৮, (৩) শ্রীশ্রীপদ্মপুরাণ বাইশকবি মনসামঙ্গল / চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সংগৃহীত / ও শশিভূষণ দেব কবিরঞ্জন কর্তৃক সংশোধিত / ঢাকা মোগলটুলী পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত / তৃতীয় সংস্করণ / ১৩০৪ সন।

৫ সম্প্রতি কলিকাতা হইতে বাইশকবির নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে। ইহা চট্টগ্রাম সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ।

আসিতেছেন। কতিপয় বৎসর গত হইল কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সমবেত হইয়া সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য বাইশকবি নাম দিয়া এই গ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন, কিন্তু তাহাতে ভ্রমবশতঃ স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনা একই কবির নামে ভণিতা দেওয়া হইয়াছে। বিশেষতঃ ১৪ জন মাত্র কবির নাম তাহাতে উল্লেখ আছে। আমরা বহু লোকের কাছে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া বহুল অনুসন্ধান করতঃ অনেকগুলি পুরাতন হস্তলিখিত কীটদষ্ট পুঁথি হইতে সমুদায় কবির রচনা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিলাম।

সম্পাদক বা প্রকাশকগণ ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গে মনসাপূজা উপলক্ষে তিনপ্রকার পুঁথি পঠিত হইয়া থাকে—(১) বাইশকবি মনসামঙ্গল বা বাইশা, (২) ষট্‌কবি মনসামঙ্গল, (৩) ক্ষেমানন্দী।[৬] পশ্চিমবঙ্গের কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের কাব্য নানা হাতফেরতা হইয়া সংক্ষিপ্তাকারে পূর্ববঙ্গেও পৌঁছাইয়াছিল, এবং মনসাপূজা উপলক্ষে তাহা ব্যবহৃত হইত—কেতকাদাসের জনপ্রিয়তা এই ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। ছয়জন কবির কাব্য হইতে সঙ্কলিত মনসামঙ্গলের পুঁথি বা মুদ্রিত সংস্করণ আমরা দেখি নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে মন্তব্য হইতে বিরত হইতেছি।

বাইশকবির সম্পাদকগণ সকলেই 'ষট্‌কবি' মনসা মঙ্গলের নিন্দা করিয়াছেন।[৭] তাঁহাদের মতে 'বাইশকবি'-ই প্রাচীনতর ও প্রামাণিক; 'ষট্‌কবি' পরবর্তী কালে অশিক্ষিত জনসাধারণের রুচির ছায়ায় রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছিল। তাই অশিক্ষিত সমাজেই ইহার প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল। যাহা হউক বাইশকবির মুদ্রিত সংস্করণে বাইশজন কবির তালিকা দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে সব নামগুলি পাওয়া যায় না, এক সংস্করণের সঙ্গে

---

৬ "অস্মদ্দেশে তিনপ্রকার মনসাপুঁথি প্রচলিত আছে। প্রথম বাইশকবি, ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ ও বড়রসাত্মক এবং বহুবিস্তারিত। দ্বিতীয় ষট্‌কবি ও তৃতীয় ক্ষেমানন্দি। এই দুইখান অতি সংক্ষেপ। এমন কি কিছু নাই বলিলেও হয়। ষট্‌কবি ছয়জন কবির দ্বারা রচিত হইয়াছে বলিয়াই ষট্‌কবি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। কেতকাদাসের অপর নাম ক্ষেমানন্দ, তাঁহার একার রচিত পুঁথির নামই ক্ষেমানন্দি।"—১৩১৮ সনে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'বাইশকবি মনসা'র (৩য় সংস্করণ) ভূমিকা।

৭ "বাইশকবির রচনা যেমন অতিশয় মধুর ও সর্বজনাদৃত, ষট্‌কবির রচনা তেমনি অশ্লীল ও ঘৃণিত।...অশিক্ষিত লোক ষট্‌কবি রচনা করিয়া তাহা সর্বসাধারণের নিকট আদৃত হইবার জন্য পূর্বপ্রণীত বাইশকবি হইতে গ্রন্থকারের নামভণিতা স্থলে স্থলে যোজনা করিয়া দিয়াছেন।" —ঐ, ভূমিকা

অপর সংস্করণের মুদ্রিত বাইশটি নামের মধ্যেও সব সময়ে ঐক্য পাওয়া যায় না। প্রাচীনতম যে সংস্করণটি (১৩০১ সালে চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত) আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহাতে এই বাইশজন কবির নাম পাওয়া যাইতেছে। যথা:—বিশ্বেশ্বর, আকিঞ্চনদাস, রঘুনাথ দ্বিজ, রমাকান্ত, জগন্নাথবিপ্র, বংশীদাস দ্বিজ, সীতাপতি, রাধাকৃষ্ণ, বল্লভঘোষ, নারায়ণদেব, গোপিচন্দ্র, জানকীনাথ, কমলনয়ন, যদুনাথ, বলরাম, হরিদাস ভট্ট, রামনিধি, পাণ্ডুয়া, অনুপচান্দ ভট্ট, রামকান্ত, মহিদাস দ্বিজ, দ্বিজ হরিদাস। অবশ্য এই নামগুলি সমস্ত সংস্করণে নাই, অনেক সময়ে সংখ্যা ঠিক থাকিলেও কবিদের নামের পরিবর্তন হইয়াছে। তবে মুদ্রিত গ্রন্থগুলিতে অধিকাংশ স্থলে নারায়ণদেব ও বংশীদাসের রচনা গৃহীত হইয়াছে; এই বাইশটি নামের মধ্যে অনেকগুলি নাম গায়েনদেরও হইতে পারে। মুদ্রিত বাইশকবির ভাষা অতিশয় আধুনিক। ঢাকা হইতে প্রকাশিত বাইশকবির (১৩৩১) একটু উদাহরণ লক্ষণীয় :—

অর্ধেক পাটের শাড়ী কাঁকাল বেড়িয়া।
নয়নে নয়ন আর উরে উরঃ দিয়া॥
এত্তেক কৌশল করি করিল শয়ন।
তবু না পেলেম পোড়া পুরুষের মন॥

ইহা কখনও পুরাতন পুঁথির ভাষা নহে। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন, "এই ধরণের গ্রন্থগুলি একেবারে মূল্যহীন নয়। এ গুলির সংগ্রাহক-সংকলয়িতারা সাধারণতঃ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই।"[৮] (তাঁহার এই মন্তব্য যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ নহে। তাহার কারণ) চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত (১৩০১) সংস্করণটির বহুস্থলে আধুনিক পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষার উৎকট আতিশয্য আছে। চট্টগ্রাম, বরিশাল, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ এবং শ্রীহট্টে বাইশকবির যে সমস্ত পুঁথি প্রচলিত আছে, তাহাতে আধুনিক সঙ্কলকদের হস্তক্ষেপ ঘটাই স্বাভাবিক। কারণ মনসাপূজা উপলক্ষে এই পুঁথি এখনও পঠিত হয়, অজস্র নকল হয়। (নানা সময়ে আবির্ভূত কবিদের রচনাংশ ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে, সঙ্কলনের সময়ে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে। উপরে আমরা বাইশকবি হইতে কয়েকছত্র আধুনিক রচনা উল্লেখ করিয়াছি। সমস্ত 'বাইশা'তেই এইরূপ বহু আধুনিক

---

৮ ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম (অপরার্ধ)

ছত্র পাওয়া যাইবে। এগুলি কালক্রমে পুঁথিনকলেব সময় ঘটিয়াছে, মুদ্রিত করিবার সময়েও সংস্কর্তাগণ যে-পুরাতন বা তথাকথিত কুরুচিপূর্ণ শব্দ বদলাইবার সময়ে অনেক কিছু রদবদল করেন নাই, তাই-বা কে বলিতে পাবে? ঢাকা হইতে প্রকাশিত সংস্কবণেব (তৃতীয় সংস্কবণ, ১৩৩৪) সম্পাদক তাহা স্বীকাব কবিয়া লিখিয়াছেন :

> আমাবা বহু পবিশ্রম ও অর্থব্যয স্বীকার পূবক নানা পুঁথি দৃষ্টে পাঠেব সামঞ্জস্য বিধান ও সংশোধন সমাধান কবিযা সাধাবণ্যে এই গ্রন্থ প্রচাব কবিলাম। যে সমযে এই সকল পাঁচালীগীতি বিরচিত হইযাছিল, সে সমযে বাংলা ভাষাব বীতিনীতি আজকাল-কাব মত ছিল না। বর্তমান সমযে বাংলা কবিতাব মধ্যে যেরূপ রুচি ও বীতি-প্রণালী দাঁড়াইযাছে, সেই দিকে দৃষ্টি বাখিলা আমবা বক্ষ্যমাণ কবিতাগুলিব আংশিক সংশোধন কবিযা দিলাম।

এই "আংশিক সংশোধন" যে নিতান্ত সামান্য সংশোধন নহে, তাহা বাইশকবিব যে-কোন সংস্কবণেই দেখা যাইবে।

বাইশকবিব কাব্যমূল্য পৃথকভাবে বিচাবেব প্রযোজন নাই। কাবণ নানা কবিব কাব্য হইতে তিল তিল সংগ্রহ কবিয়া যে তিলোত্তমা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাব নিজস্ব কোন পৃথক গৌবব নাই। যে যে স্থলে অর্বাচীন কালের সঙ্কলক ও সংস্কর্তাগণ কবিযশঃপ্রার্থী হইযা কিছু কিছু নিজ রচনা যোগ করিয়াছেন তাহাও এত স্বাদগন্ধবর্জিত ও বর্ণবৈচিত্র্যহীন যে,সাহিত্যের ইতিহাসে সে বিষয়ে ঘটা কবিযা আলোচনা কবিবার প্রয়োজন নাই।

দ্বিজ বংশীদাস ॥

ময়মনসিংহেব কবি দ্বিজবংশীদাসের পদ্মাপুবাণ পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে নিতান্ত অপবিচিত গ্রন্থ নহে। পূর্বোল্লিখিত বাইশকবিতেও দ্বিজবংশীদাসের অনেক পদ ও রচনা গৃহীত হইয়াছে। এই কাব্য মুদ্রণের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত সমাজ ইহাব নামপরিচয় জানিতেন না। দীনেশচন্দ্র 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' সর্বপ্রথম এই কবিব কিঞ্চিৎ পবিচয় উদ্ধাব কবেন। প্রাচীন পালাগান সংগ্রাহক চন্দ্রকুমাব দে ময়মনসিংহ হইতে লোকমুখে প্রচলিত পালাগান সংগ্রহ করিতে গিয়া বংশীদাসেব বিস্তাবিত পরিচয় সংগ্রহ করেন এবং সেই সমস্ত তথ্য 'সৌরভ' পত্রিকায় দুই কিস্তিতে প্রকাশ করেন (১৩২০)। অতঃপর দীনেশচন্দ্র 'ময়মনসিংহ গীতিকা' সঙ্কলন কালে ('দস্যু কেনারামের

পালা') বংশীদাস ও তাঁহার কন্যা চন্দ্রাবতী সম্বন্ধে লোকশ্রুতির উল্লেখ করেন। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ও বামনাথ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় সর্বপ্রথম দ্বিজবংশীদাসের (বংশীবদন) 'পদ্মাপুরাণ' (পদ্মপুরাণ নহে) সতর্কতার সহিত সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহাতেও বংশীদাসের কুলপরিচয় ও কবি-পরিচয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য বিবৃত হইয়াছিল। অবশ্য তখনও চন্দ্রাবতী ও বংশীদাস সম্পর্কে শিক্ষিতসমাজে বিশেষ কোন তথ্য প্রচারিত হয় নাই। তাই উক্ত সম্পাদকদ্বয় বংশীদাসের কাব্য সম্পাদনকালে তাঁহার কন্যা চন্দ্রাবতীর কোন উল্লেখ করেন নাই। এমন কি দীনেশচন্দ্রও ১৯১৪ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গসাহিত্যপরিচয়ে' (১ম খণ্ড) বংশীদাসের প্রসঙ্গে চন্দ্রাবতীর কোন পরিচয় দেন নাই, নামও উল্লেখ করেন নাই।[৯] ১৩২০ সনে চন্দ্রকুমার দে 'সৌরভ' মাসিক পত্রে এ বিষয়ে নানা তথ্য প্রকাশ করিবার পূর্বে চন্দ্রাবতী সম্পর্কে কেহই প্রায় কিছু জানিতেন না, যদিও দীনেশচন্দ্রের ভাষায়—'ময়মনসিংহের অন্তর্গত একটা বৃহৎ প্রদেশ জুড়িয়া চন্দ্রাবতীর গীতিকা বনফুলের ন্যায় ছড়াইয়া আছে।"[১০]

বংশীদাসের পুঁথির সংখ্যা বেশী নহে, পূর্ণ পুঁথির সংখ্যা আরও অল্প—আর প্রাপ্ত পুঁথিগুলিও প্রাচীন নহে। দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ও বামনাথ চক্রবর্তী সর্বপ্রথম বংশীদাসের যে কাব্য মুদ্রিত করিয়াছিলেন (১৩১৮), তাহা কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথির পাঠ অবলম্বনে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহাদের অবলম্বন ছিল ১৭১৭ শকাব্দের একখানি পুঁথি। আরও তিনখানি পুঁথির সহিত পাঠ মিলাইয়া এবং ১৭১৭ শকাব্দের পুঁথিটিকে মূলস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পুঁথির শুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ের জন্য তাঁহারা যেমন চারিখানি পুঁথির পাঠ তুলনা করিয়া নিজেদের যুক্তিবুদ্ধি অনুসারে তোলাপাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি

৯ অবশ্য এইজন্য তিনি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' পদ্মাপুরাণের সম্পাদক চক্রবর্তী মহাশয়দের প্রতি একটু অনুযোগ করিয়া লিখিয়াছেন, "আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হাইকোর্টের প্রধান উকিল শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্তী মহাশয় বংশীদাসের 'মনসামঙ্গল' বৃহৎ ভূমিকাসহ প্রকাশ করিবার সময় বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর নাম জানিতেন না।" অবশ্য দীনেশচন্দ্রও চন্দ্রকুমার দের প্রমুখাৎ চন্দ্রাবতীর নাম ও তৎসম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎপূর্বে তিনিও এবিষয়ে কিছু জানিতেন না।

১০ রামায়ণ ও ময়মনসিংহ গীতিকাপ্রসঙ্গে চন্দ্রাবতী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

মার্জিত রুচির অনুরোধে মূলপুঁথির পাঠও কিঞ্চিৎ বদলাইয়াছিলেন—এরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত। তাহা না হইলে ছাপা গ্রন্থের সঙ্গে পুঁথির পাঠের কিছু কিছু গরমিল হইতেছে কেন? প্রথম পুঁথিটিতে যদিও সর্বত্র বংশীদাসের ভণিতা ছিল, কিন্তু পাঠভ্রান্তির জন্য সম্পাদয়দ্বয় অন্য পুঁথি হইতে বিশুদ্ধতর পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকাশক এবিষয়ে বলিয়াছেন, "প্রথমোক্ত গ্রন্থের দুর্বোধ, দুরর্থ ও ভ্রমাত্মক পদগুলির সদর্থ ও সংশোধন জন্য কখন কখন শেষোক্ত পুঁথিগুলির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।" তাঁহাদের মতে, কলিকাতার বটতলা হইতে বংশীদাসের নামে যে সমস্ত পদ্মাপুরাণ ছাপা হইয়াছে, তাহাতে বংশীদাস ছাড়াও অন্য কবির ভণিতা আছে এবং "তাহাতে বংশীদাসের কবিত্বের সম্যক পরিচয়ও পাওয়া যায় না" (ভূমিকা)। শুধু কলিকাতা-বটতলারই এরূপ অপরাধ নহে, ঢাকার মোগলটুলী নিবাসী পূর্ণচন্দ্র সিংহ ১৯০৪ সালে কলিকাতা হইতে বংশীদাসের যে পদ্মাপুরাণ মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহাতেও মূলপুঁথির পাঠ ইচ্ছামতো পরিবর্তন ও বিকৃত করা হইয়াছিল।[১১] উক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ মহাশয় বংশীদাসকে যেন ঢালিয়া সাজিয়াছিলেন। বলাই বাহুল্য তিনি বংশীদাসের মূল রচনা এত বদলাইয়াছেন যে, কবির জাতি, কুল—দুই-ই গিয়াছে। অনেক সময় তিনি বংশীদাসের পুঁথি হইতে দুই-চারি ছত্র লইয়া বাকিটুকু নিজে রচনা করিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। ফলে পুরাতন পুঁথির ভাষা এবং বিশ শতকের ঢাকার কবির ভাষায় কলমে জোড় বাঁধে নাই, অনেকটা কবি সুকুমার রায়ের "হাঁসজারু"র আকার ধারণ করিয়াছে।

বংশীদাসের মুদ্রিত গ্রন্থ ও পুঁথির সহিত পাঠ মিলাইয়া আমরা দেখিয়াছি, অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো বংশীদাসের কাব্যেও বহু রদবদল হইয়াছে। নিম্নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি (৩২৭) ও সাহিত্যপরিষদের পুঁথির (২৮৭৭) পাঠের সঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠের তুলনা করা যাইতেছে:—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি (৩২৭)

চলিলেক নাগরাজ ব্রহ্মশাপ হেতু কাজ
পরীক্ষিত রাজার ভুবন।

---

১১ ছাপা কাব্যের আখ্যায়িকা পত্র:—শ্রীশ্রীপদ্মাপুরাণ / মহামুনি বেদব্যাস প্রণীত / দ্বিজ বংশীদাসের দ্বারা পয়ারাদি ছন্দে রচিত / বিষহরি ও পদ্মাবতীর পাঁচালি / শ্রীপূর্ণচন্দ্র সিংহ কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত / ঢাকা / মোগলটুলী / ১৯০৪

লোকাইয়া মায়া বলে　　　দ্বিজরূপে কুতুহলে
　　অন্তরীক্ষে করিল গমন ॥
হিমালয় কৈলাস স্মরি　　　চতুর্ভিতে লেজে বেড়ি
　　চিরকাল তথাত বৈষয় ।
যাহার চক্ষুর পাকে　　　চন্দ্রসূর্য তেজ ঢাকে
　　রাত্রিদিবা নাহি পরিচয় ॥

মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ

চলিল তক্ষক নাগ　　　ফলাইতে ব্রহ্মশাপ
　　পরীক্ষিত রাজার ভবন ।
লুকাইয়া মায়াবলে　　　দ্বিজবেশে কুতূহলে
　　অন্তরিক্ষে করিল গমন ॥
হিমাদ্রি কৈলাস যুড়ি　　　চতুর্দিকে লেজে বেড়ি
　　চিরকাল তথান্ত বসয় ।
যাহার চক্ষুর পাকে　　　দিবাকর তেজ ঢাকে
　　রাত্রি দিবা নাহি পরিচয় ॥

সাহিত্য পরিষদের পুঁথি (২৮৭৭)

　　কত নিদ্রা যাও সোবধনি ।
প্রদিপ নিবাইল কিসে　　　সর্ব্বাঙ্গ ছাইল বিসে
　　ক্ষোণে আমি তেজিব পরাণি ॥
তর মর বিদায়　　　বিসে মর প্রাণ যায়
　　আমি জাই জমের ভুবন ।
আছিলাম সোরপুরি　　　আনিলেক বিষহরী
　　বিবাদ কারণে বাপ সন ॥

মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ

　　কত নিদ্রা যাও সুবদনি ।
প্রদীপ নিবাল কিসে　　　সর্ব্বাঙ্গ ছাইল বিষে
　　ক্ষণেকেতে ত্যাজিব পরাণি ॥
তোমার কাছে বিদায়　　　বিষে মোর প্রাণ যায়
　　আজি যাব যমের ভুবনে ।
আছিলাম সুরপুরী　　　আনিলেক বিষহরী
　　বিবাদ কারণে পিতা সনে ॥

এই দৃষ্টান্তে দেখা যাইতেছে, ছাপাগ্রন্থের সম্পাদকদ্বয় পুঁথির "অসাধু ও ভুলভ্রান্তি পূর্ণ" শব্দের কথঞ্চিৎ সংস্কার করিলেও একেবারে খোলনলিচা পাল্টাইয়া ফেলেন নাই।

বংশীদাসের পরিচয় তাঁহার মুদ্রিত কাব্যে যে-ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে এখানে তাহা হইতে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইতেছে। মুদ্রিত গ্রন্থের 'গোত্রাবলী' অংশে কবি নিজের বংশ পরিচয় দিয়াছেন :—

বন্দ্যঘাটি গাঁই গোত্র রাঢ়ীর প্রধান।
সাণ্ডিল্য গোত্র বলি যাহার বাখান ॥
... ...
বংশবীজ পূর্ব্বে গোসাই চক্রপাণি।
ভূতভবিষ্যত আদি ত্রিকাল যে জ্ঞানী ॥
রাঢ় হৈতে আসিলেন লৌহিত্যের পাশ।
হাজরাদি পাতুয়ারী গ্রামেত নিবাস ॥
সম্বন্ধ করিলেন রত্নাবতী ঠাকুরানী।
তান পুত্র কালিদাস হৈল মহাজ্ঞানী ॥
তান পুত্র পুরুষোত্তম প্রাজ্ঞ মহাশয়।
এক প্রজাপতি বলি সব লোকে কয় ॥
কুলেশীলে গরিষ্ঠ সম্পদ অতিশয়।
হৃদয়ানন্দ হৈল তাহান তনয় ॥
তান পুত্র যাদবানন্দ সুধী অতিশয়।
দ্বিজ বংশী জন্মিলেক তাহান তনয় ॥

(কবি বংশীদাস রাঢ়ী ব্রাহ্মণ—বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিক। নারায়ণ দেবের মতো তাঁহারও এক পূর্বপুরুষ (চক্রপাণি) রাঢ় ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত পাতোয়াড়ী (পাত্রবাড়ী, পাতুয়ারী, পাটুয়ারী) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম যাদবানন্দ, মাতার নাম অঞ্জনা। বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী প্রণীত রামায়ণের ছড়ায় আছে যে, কবির পত্নীর নাম সুলোচনা।[১২] কবি বংশীদাস সংস্কৃত পুরাণ, আগম, তন্ত্রাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ তাঁহার পদ্মাপুরাণের যত্রতত্র তন্ত্র ও আগমের দৃষ্টান্ত আছে।)[১৩] কবি সংস্কৃত পুরাণাদিতে যে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহার প্রমাণ তিনি নাকি

১২ সৌরভ, ১৩২০, ২য় বর্ষ (চন্দ্রকুমার দে লিখিত প্রবন্ধ 'মহিলা কবি চন্দ্রাবতী')

১৩ মুদ্রিত গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক জানাইয়াছেন—"সেকালের রীত্যনুসারে বংশীদাস

'কৃষ্ণগুণার্ণব', রামগীতা, চণ্ডী—তিনখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন।[১৪] পুরাণাদির প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল, তাহা তিনি গোত্রাবলীতে স্বীকার করিয়াছেন—"পুরাণ রচিতে মোর কবিত্বের আশ।"

এখন দেখা যাক, কবি আনুমানিক কোন্ সময়ে বর্তমান ছিলেন, তাঁহার কাব্যই বা কবে রচিত হইয়াছিল। মুদ্রিত কাব্যের 'গোত্রাবলী'র শেষে এইভাবে কাব্যরচনার সন তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে :—

জলধির বামেত ভুবন মাঝে দ্বার।
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পয়ার॥

অর্থাৎ (জলধি—৭, ভুবন—১৪, দ্বার—৯) ১৪৯৭ শকাব্দ বা ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্য রচিত হইয়াছিল। এই সন অনুসারে মনে হয়, তিনি ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[১৫] আরও একটি গৌণপ্রমাণ—বংশীদাসের নিকটতম অধস্তন পুরুষের (যিনি ১৩১৩ সন অর্থাৎ ১৯০৬-৭ সালে বর্তমান ছিলেন) হিসাব ধরিলে দেখা যাইবে যে, কবি সপ্তদশ শতাব্দীতে (শেষভাগে হওয়াই সম্ভব) বর্তমান ছিলেন, অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র। কারণ প্রতি তিনপুরুষে মোটামুটি একশত বৎসর ধরা হয়।[১৬] তবে তাঁহাকে কিছুতেই ষোড়শ শতাব্দীতে স্থাপন করা যায় না। অবশ্য মুদ্রিত গ্রন্থের কালজ্ঞাপক পয়ার ছত্র দুইটিকে সম্পাদকদ্বয় কোন্ পুঁথি

গ্রাম্য টোলে বিদ্যাধ্যয়ন করেন এবং কালে ব্যাকরণ কাব্য, অলঙ্কার ও দর্শনাদি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। শ্রীচৈতন্য যেরূপ প্রথমে নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলে, লোকে তাঁহাকে 'নিমাই পণ্ডিত' বলিয়া অভিহিত করিত, বংশীদাসকেও তাঁহার স্বস্থানবাসী লোকে 'বংশী পণ্ডিত' বলিত। এখনও তাঁহার গ্রামস্ত (sic) লোকে 'বংশী পণ্ডিত'ই বলিয়া থাকে।"—ভূমিকা, পৃ. ।৶৹

১৪ ভূমিকা (পৃ. ।৶৹—॥৹) দ্রষ্টব্য। সম্পাদকদ্বয় নাকি রামগীতা ও চণ্ডীর কয়েকখানি বিচ্ছিন্ন পত্র দেখিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহারা সংস্কৃতে লিখিত 'কৃষ্ণগুণার্ণব' গ্রন্থে বংশীবদনের নামও পাইয়াছিলেন :—

গুরুদেবং নমস্কৃত্য বংশীবদন পণ্ডিতঃ।
তনোতি পুস্তকং নাম শুদ্ধ কৃষ্ণগুণার্ণবং॥

১৫ সম্পাদকের' বলিয়াছেন, "সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শকের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, পূর্ব্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত ক্ষুদ্র পাওরাড়ী (পাত্রবাড়ী) গ্রামে এক ব্রাহ্মণ শিশু জন্মগ্রহণ করিল।"

১৬ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা,—১৩

হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বলেন নাই, বংশীদাসের কোন পুঁথিতেই এই শ্লোক পাওয়া যায় না। তাই কেহ কেহ ইহার প্রামাণিকতা স্বীকার করিতে চাহেন না।[১৭] সে যাহা হউক, অন্য প্রমাণের অভাবে কবিকে সপ্তদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে (শেষভাগে হওয়াই সম্ভব) স্থাপন করিয়া আমরা কাব্যটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইবার চেষ্টা করিব।

(বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ আকারে সুবৃহৎ—যথারীতি দেবখণ্ড ও মানবখণ্ডে বিভক্ত।[১৮] নানা দেবদেবীর বন্দনার পর দেবখণ্ডে বিশ্বসৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষযজ্ঞ, সতীর তনুত্যাগ, মহাদেবের তপস্যা, মদনভস্ম, হরপার্বতীর বিবাহ, কার্তিক-গণেশের জন্ম—এই পর্যন্ত কবি পুরাণকে অনুসরণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ কালিদাসের কুমারসম্ভবের প্রভাব এই অংশে দৃষ্টিগোচর হইবে)—এবং কবি যে সংস্কৃত কাব্যাদিতে পরম অভিজ্ঞ ছিলেন, দেবখণ্ডের অন্তর্গত এই অংশটুকুতে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু (শিবের কৈলাসে আগমন হইতে) পরবর্তী আখ্যানসমূহে (শিবের পুষ্পবাটী প্রস্থান ও মহামায়ার মায়াজাল বিস্তার, নেত্রাবতী ও পদ্মাবতীর জন্ম, পদ্মার প্রথম পূজা, কন্যা লইয়া শিবের গৃহে গমন, পদ্মাবতীর বিবাহ, নেত্রাবতীর বিবাহ, জরৎকারু-মুনির পত্নীত্যাগ) (বাঙলার শিবায়নের আদর্শই অনুসৃত হইয়াছে।) অবশ্য পদ্মাবতী ও জরৎকারুর প্রসঙ্গ আনিয়া কবি পুরাণের ধারাকেও কথঞ্চিৎ বজায় রাখিয়াছেন।

পরবর্তী অংশ, মানবখণ্ডে চন্দ্রধরের সঙ্গে মনসার বিবাদের পূর্বে তিনি

---

১৭ ডঃ সুকুমার সেনের বা. সা. ইতি.—১ম (পরার্ধ); ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ('বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস') দেখাইয়াছেন যে, কবি আত্মকথা প্রসঙ্গে যে হাজরাদি পরগণার উল্লেখ করিয়াছেন, ১৫৯৫ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে তাহার নাম বা অস্তিত্ব ছিল কিনা ঘোর সন্দেহ। শুনা যায় ১৫৮৬-৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঈশা খাঁ ময়মনসিংহের কোন এক রাজা লক্ষ্মণ হাজরাকে পরাজিত করেন। তাঁহার নামানুসারেই হাজরাদি পরগণার নামের উৎপত্তি। সুতরাং ১৫৭৫ খ্রীঃ অব্দে কাব্য রচিত হইলে তাহাতে হাজরাদি পরগণার নাম থাকা সম্ভব নহে। অতএব উক্ত কালজ্ঞাপক শ্লোকটি প্রামাণিক নহে। ডঃ ভট্টাচার্যের এই মত সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য।

১৮ শুনা যায় ময়মনসিংহ অঞ্চলে বংশীদাসের যে পুঁথি পাওয়া যায়, তাহাতে নাকি দেড়-হাজার পৃষ্ঠা আছে—"এদেশে এমন গায়ক আজও জীবিত আছেন, যাঁহারা এই দেড়হাজার পৃষ্ঠার অতিকায় পুঁথিখানা আগাগোড়াই একদম কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ই চৈত্র, ১৩৪৫—চন্দ্রকুমার দে লিখিত 'ময়মনসিংহের কবিকথা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

কাজির সঙ্গে মনসার বিরোধ ও ধন্বন্তরি বধের পালা রচনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে ইহার মধ্যে তিনি পরীক্ষিতের সর্পযজ্ঞেরও সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়াছেন। (কবি লৌকিক কাহিনী লিখিতে বসিয়া প্রায় কোথাও পৌরাণিক প্রভাব বিস্মৃত হন নাই, সুযোগ মতো পুরাণ হইতে সাহায্য লইয়াছেন। ইহার পরে চাঁদসদাগরের প্রচলিত কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই কাহিনী মূলগ্রন্থের অর্ধেকেরও অধিক স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। এই কাহিনীটির তেমন কোন বৈচিত্র্য নাই।) তবে ইহাতে চাঁদসদাগরকে মূলতঃ চণ্ডীর (কালী) উপাসকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—যদিও শিবের প্রতিও তাঁহার শ্রদ্ধা আছে। চাঁদসদাগরের পিতা কোটীশ্বর শিবদুর্গার বরেই পুত্র লাভ করেন এবং শিবের আদেশে শিব নামের সঙ্গে ঐক্য রাখিয়া পুত্রের নামকরণ করেন চন্দ্রধর।[১৯] চাঁদসদাগরও শিবের ভক্ত ছিলেন, এবং তাঁহার নিকটেই 'মহাজ্ঞান' লাভ করেন ("শঙ্করের বর দানে পাইয়াছে মহাজ্ঞানে")।

(মানবখণ্ডের কাহিনী গতানুগতিক হইলেও কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। ইহাতে চাঁদসদাগর মূলতঃ শাক্ত—অবশ্য শিবের প্রতিও তিনি অনুরক্ত। পরবর্তী ও পূর্ববর্তী মনসামঙ্গলে তিনি পরম শৈব। উপরন্তু দেখা যায় যে, সনকা যখন পদ্মাকে ঘটে স্থাপন করিয়া পূজা করিতেছিলেন, তখনও তাঁহাকে চণ্ডিকাজ্ঞানে পূজা করিতে সদাগরের আপত্তি ছিল না।[২০] কিন্তু রাত্রিতে চণ্ডিকা তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন, কদাচারী

১৯ (ক) বর দিলা মহেশ্বর　　সুপুত্র হইবে তোর
যার যশঃ ঘোষিবে সংসার।
আমাতে একান্ত ভক্তি　　হইবে সে মহামতি
মোর নামে নাম থুইও তার॥
(খ) পুত্র হইল হরচণ্ডিকার বরে।
সেই তপস্বী যে কামসাগরে মরে॥
পুত্র পাইয়া মহানন্দ কোটীশ্বর।
শিবের আজ্ঞায় নাম রাখে চন্দ্রধর॥ (মুদ্রিত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত)

২০ চাঁদসদাগর ভক্তিভরে পদ্মাবতীকে পূজা করিতে গিয়া বলিয়াছেন :—
যেই দুর্গা সেই তুমি জগতের মাতা।
অভেদ চণ্ডিকা তুমি নাহিক অন্যথা॥
তোমার অনন্ত মায়া কে জানিতে পারে।
লক্ষ বলি দিয়া কালি পূজিব তোমারে॥

সর্পের দেবী মনসাকে 'মারি দড় হেঁতালের বাড়ি' তাড়াইয়া না দিলে সদাগরের সমূহ বিপদ। তাই প্রভাতে উঠিয়াই চাঁদসদাগর সক্রোধে মনসার ঘট ভাঙিয়া হেঁতালের লাঠির আঘাতে পদ্মাবতীর কাঁকাল ভাঙ্গিয়া দিলেন— এইরূপে মানব-দেবীর বিরোধ আরম্ভ হইল। মনসার চক্রান্তে ছয় পুত্র অকালে মরিলে সনকা স্বামীকে পদ্মাবতীর আরাধনা করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলে চাঁদসদাগর ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়াছিলেন :

চান্দ বলে রাম রাম, হেন অনুচিত কাম
চণ্ডিকা পূজিনু যেই হাতে।
সে হাতে ফুলপানী পাইতে ভাগ্য কবে কানী
কি বলিমু চণ্ডীর সাক্ষাতে ॥

অতঃপর কাহিনীটি চণ্ডী ও মনসার বিবাদে পরিণত হইয়াছে, শুধু চাঁদসদাগর দুই কোপনস্বভাবা দেবীর রোষতোষের মধ্যে পড়িয়া দারুণ দুর্ভোগ ভোগ করিয়াছেন। (কবি চণ্ডীকে অনেক স্থলে 'কালী'ও বলিয়াছেন। অর্থাৎ এ কাব্যে শৈব প্রভাব অপেক্ষা তন্ত্রাশ্রিত শাক্ত প্রভাবই অধিকতর লক্ষণীয়। রঙ্গরসের জন্য শিবের প্রয়োজন হইলেও আখ্যানটিতে মুখ্যতঃ দুই দেবীর সংঘর্ষই প্রাধান্য পাইয়াছে।) চাঁদসদাগর এক দেবীর প্রতি অধিকতর অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া মনসার নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন। বিপদে পড়িয়া তিনি দেবী চণ্ডিকারই শরণ লইয়াছেন,[২১] এবং সঙ্কট হইতে মুক্তি লাভ করিয়াই প্রথমে দেবীর পূজা করিবার পর নিজেকে চণ্ডীর সেবকরূপেই ঘোষণা করিয়াছেন।[২২] কোন কোন সময় স্বয়ং মহাদেব চাঁদের দুঃখের কারণ হইয়াছেন। চাঁদ দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্য করিতে গেলে পদ্মাবতী বণিকের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ব্যর্থ হইয়া পিতা মহাদেবের নিকট অনুযোগ করিল :

তুমি হেন পিতা যার তার এত তিরস্কার
মরিব চান্দর অপমানে ॥

---

২১ চণ্ডিকা দিলেন বর শুন পুত্র চন্দ্রধর
বন্ধন মোচন হৌক তোর।
বলে দ্বিজ বংশীদাসে আপন বন্ধন খসে
বিপদে তরিল চন্দ্রধর ॥

২২ বাসাতে আসিয়া চান্দ সর্বাগ্রে আপনি।
স্নান আচমন করি পূজিলা ভবানী ॥

তখন শিব কন্যার প্রতি মমতাবশতঃ চাঁদের ডিঙা নিমজ্জিত করিবার আদেশ দিয়া বলিলেন :

আজ্ঞা দিলু চল যাও ডুবাও চন্দের নাও
চন্দ্রধরে বাখিও পরাণে॥

কীভাবে ডিঙা ডুবাইতে হইবে (কারণ "আপনি সহায় চণ্ডী চান্দর ডিঙায়"), তাহাও মহাদেব কন্যাকে গোপনে বলিয়া দিলেন। পিতাপুত্রীর এই ষড়যন্ত্রে চাঁদের সমুদ্রে অত্যন্ত দুর্বিপাক হইল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাঁদের কাতর প্রার্থনায় অন্তরীক্ষ হইতে চণ্ডী তাঁহার চৌদ্দ ডিঙা রক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন মনসা আবার পিতার নিকট হাজির হইয়া প্রথমে ভোলা মহাশ্বরকে "দেবের দেবতা হৈয়া স্ত্রীর অধীন" হইবার জন্য খুব একপ্রস্থ গালি দিলেন, তার পরে কাঁদিয়া হাট বাধাইয়া দিলেন। অতঃপর মহাদেব নিজে চলিলেন। চাঁদের ডিঙা ডুবাইতে গিয়া দেখেন, স্বয়ং চণ্ডী হইয়াছেন চাঁদের কাণ্ডারী। সুতরাং মনসা সৎ-মায়ের সঙ্গে পারিবেন কেন? মহাদেব চটিয়া গিয়া দেবী চণ্ডিকাকে যৎপরোনাস্তি গালি দিলেন ("স্ত্রী হৈয়া স্বতন্ত্র তুমি দেবে উপহাস")। প্রত্যুত্তরে দেবীও স্বামীকে গুটিকয়েক কড়া কথা শুনাইয়া দিলেন :

চণ্ডী বলে, ভাঙ্গুড়া যে তোর লজ্জা নাই।
যে তোরে দেবতা বলে তার মুখে ছাই॥

তখন মহাদেব ক্রুদ্ধা মুখরা স্ত্রীকে কোনও প্রকারে বুড়া বলদে তুলিয়া লইয়া পলাইয়া গেলেন। অতঃপর মনসা সহজেই চাঁদের ডিঙা ডুবাইয়া দিলেন। কাব্যের সমাপ্তির দিকেও দেখা যাইতেছে, বেহুলা নৃত্য করিয়া দেবতাদের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হইলেও মনসার মন গলাইতে পারে নাই। সেখানেও চণ্ডী বেহুলার পক্ষ লইয়া মনসাকে কটুভাষায় নিন্দা করিয়াছেন। বেহুলাও চণ্ডীর ইঙ্গিতে মনসাকে উচিত কথা শুনাইতে ছাড়ে নাই :

তখনে চণ্ডিকা দিলা আঁখি ঠার দিয়া।
গায়ে বল করি বেউলা চলে আগু হৈয়া॥

বেহুলা যখন বুঝিতে পারিল, চণ্ডী তাহার পক্ষেই আছেন, তখন সেও ভয় ত্যাগ করিয়া মনসাকে দুর্বাক্য বলিতে কসুর করিল না। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত মনসা ও চণ্ডীর বিবাদ মিটিয়া গেল। লখিন্দর জীবন ফিরিয়া পাইল। মনসার ললাট চুম্বন করিয়া চণ্ডী সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন :

দেবের দুর্লভ তুমি শঙ্করের ঝী।
তোমারে যে নাহি পূজে তার জ্ঞান কি॥

তোমারে পূজিলে যেন আমারেই পূজে।
মূঢ় অজ্ঞান জনে ভিন্ন ভিন্ন বুঝে॥
তুমি আমি দুই নহে একই প্রকৃতি।
কহিলু পুজিব তোমা চম্পকের পতি॥

কাহিনীর এই বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গে তন্ত্রের বিশেষ প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। অনুমান, সেই প্রভাবেই বংশীদাসের কাব্যে চণ্ডীর প্রাধান্য ঘটিয়াছে, এবং চাঁদবেণে শাক্ত ভক্তে পরিণত হইয়াছেন। বিষ্ণুপাল ও সীতারাম দাসের মনসামঙ্গলে আবার ধর্মঠাকুরের প্রভাব লক্ষ্য করা যাইবে।

চরিত্রবিচারে বংশীদাস এমন কোন বৈচিত্র্য দেখাইতে পারেন নাই যাহার জন্য তাঁহাকে নারায়ণদেবের সমকক্ষ বলা যাইবে। বেহুলাকে তিনি কিয়ৎ-পরিমাণে বাস্তবানুগ করিয়াছেন, কিন্তু চাঁদসদাগরের চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও দেব-দ্রোহী ঔদ্ধত্য অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। চণ্ডী ও মনসার বিবাদ যেখানে মুখ্য ঘটনা, সেখানে চণ্ডীর আশ্রিত চাঁদের পৌরুষ ও বীর্য ফুটিবার অবকাশ কোথায়? তবে কবি পুরাণ-সংস্কৃতির দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হইয়াছিলেন বলিয়া এ কাব্যের মানব-মানবীর চরিত্রে তীব্র আদিম ভাবের চেয়ে বরং একটা সংযত বৈশিষ্ট্য অধিকতর সার্থক হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যে সাধারণতঃ পার্থিব চরিত্রের মধ্যেই তীক্ষ্ণ তির্যক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া ওঠে। বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব, বিপ্রদাস—সকলের কাব্যেই নরখণ্ডের মধ্যে রচনা-চাতুর্য লক্ষ্য করা যায়। বংশীদাস যদিও গোটা কাব্যের অর্ধেকের বেশি স্থান নরখণ্ডের জন্য নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু মহাদেব, চণ্ডী ও মনসার চরিত্রেই অধিকতর বাস্তবতা ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সূচিত হইয়াছে।

বংশীদাসের কাব্যে করুণ ও হাস্যরস যে চিত্তাকর্ষী হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। মনসাকে জরৎকারু মুনি বিনা দোষে ছাড়িয়া গেলে মনসার বিলাপ পতি-পরিত্যক্তা রমণীর বেদনাকেই উদ্ঘাটিত করে:

কান্দে পদ্মা মুনির গোচরে।
তুমি হেন প্রাণপতি বুঝিতে না পারি মতি
কোন দোষে ছাড়ি যাও মোরে॥
মাও নাহি অভাগিনী ব্রহ্মার বচনে আনি
বাপে দিল দিয়া বর চায়্যা।

দিয়া হেন গুণনিধি　　　বঞ্চিল দারুণ বিধি
মরিমু গরল বিষ খায়্যা ॥
পতি ধন পতি প্রাণ　　　পতি সে নারীর ধ্যান
পতি বিনে নাহিক উপায় ।
তুমি প্রভু সুপুরুষ　　　অবলা নারীর দোষ
একবার ক্ষমিতে যোয়ায় ॥

লখিন্দরের মৃত্যুতে বেহুলার বিলাপেও কবি সদ্য-বিধবার বেদনাকে অল্প কথায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন :

প্রভু আমা বঞ্চি গেলা কোন দোষ পাইয়া ।
বারেক বোলান দেও অভাগীরে চাইয়া ॥
আমারে অনাথা করি গেলা কোন দোষে ।
অভাগিনী বিপুলারে সঁপি কার পাশে ॥

বংশীদাস সাধারণতঃ হাস্যপরিহাস যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিয়াছেন, কবির মনোভঙ্গী কিঞ্চিৎ গম্ভীর ধরণের ছিল। কিন্তু দুই-একস্থানে তাঁহার রঙ্গ-কৌতুক নিতান্ত মন্দ হয় নাই। ধূর্ত বণিক চন্দ্রধর বাণিজ্যে গিয়া এক মূর্খ রাজার নিকট চটের মহিমা কীর্তন করিতে গিয়া বলিয়াছেন, চট গায়ে দিলে—

উরসে কামড়াইতে　　　দুই হাতে চুলকাইতে
স্বর্গের দুর্লভ সুখ পায় ॥

চাঁদ অসভ্যদের দেশে বাণিজ্য করিতে গিয়া দেখেন :

কোন পুরুষেও তারা পান নাহি খায় ।
মুখের দুর্গন্ধে কাছে রহন না যায় ॥
মাতাপিতা মৈলে তারা রাখে শুখাইয়া ।
মামীশাশুড়ীর লয় কাপড় কাড়িয়া ॥

ব্রাহ্মণ-কবি কলির ব্রাহ্মণের উপরেও বেশ এক হাত লইয়াছেন :

কলির ব্রাহ্মণ আর বলির ছাগল ।
ভালমন্দ জ্ঞান নাই প্রশ্রয় পাগল ॥২৩

---

২৩ অবশ্য কবি দরিদ্র ব্রাহ্মণের দয়ার কথাও বিস্মৃত হন নাই। চাঁদসদাগরের ডিঙা ডুবিলে, তাঁহার দুর্গতিতে কেহ সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ দয়াপরবশ হইয়া নিজের সম্বল একখানি বস্ত্র ছিঁড়িয়া অর্ধখানি বিপন্ন চাঁদকে দিয়াছিলেন :

কর যোড় করি চান্দ কৈল নমস্কার ।
একখানি বস্ত্র পাইলে পারি পরিবার ॥

পরিশেষে বেহুলা নৃত্যগীতে দেবতাদের সন্তুষ্ট করিলে মহাদেব মনসাকে লখিন্দরের জীবন ফিরাইয়া দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া পাঠাইলেও মনসা নানা অছিলায় ঘরে শুইয়া রহিলেন। তখন নারদ, কার্তিক ও গণেশ চলিলেন ভগিনীকে আহ্বান করিয়া দেবসভায় লইয়া যাইবার জন্য। পদ্মা বলিলেন, সদাগরের হেঁতালের বাড়ি খাইয়া তাঁহার জ্বর আসিয়াছে। কিন্তু তাঁহার গায়ে হাত দিতেই ছলনা ধরিয়া পড়িয়া গেল—গা স্বাভাবিক মানুষের মতো শীতল। নারদ বলিলেন, তাই তো, এ যে দেখি মৃত্যুকাল—"শীতল সকল গাও পাথরের মতো।" তখন তিনি বলিলেন, আহা পদ্মাকে কেই-বা ঔষধ দিবে? বরং আমি ঔষধ প্রয়োগ করি :

চুতুরার২৪ পাতা দেহ সর্বাঙ্গে জড়িয়া।
কাঁকলীতে দাগ দেহ লোহা পোড়াইয়া॥
তাহার উপরে দেহ লোন লেম্বু জড়ি।
যাবে কাঁকলীর বিষ হেঁতালের বাড়ি॥

অবশ্য এরূপ অমোঘ ঔষধ আর প্রয়োগ করিতে হইল না, ঔষধের নামেই রোগ পলাইল : পদ্মা বিরসচিত্তে উঠিয়া বসিলেন।

(বংশীদাস সংস্কৃতানুসারী অনেক অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছেন। কবি পুরাণের ছাঁচে পদ্মার কাহিনী রচনা করিতে চাহেন, কিন্তু কতটুকুই-বা তাঁহার সাধ্য! সেই প্রসঙ্গে কবি কয়েকটি উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন :

পুরাণ রচিতে মোর কবিত্বের আশ।
চন্দ্র ধরিতে যেন শিশুর প্রয়াস॥
বামন যেমন চায় আকাশ ধরিতে।
কদলীর বৃক্ষ যেন সমুদ্র তরিতে॥)

পুরাণানুসারী সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণনায় কবি সাঙ্খ্য দর্শনের সাহায্য লইয়াছেন :

না আছিল দিবারাত্রি ভূমি আকাশ।
চন্দ্র সূর্য না আছিল তমঃপ্রকাশ॥
শূন্য প্রকৃতিময় নাহি তার রেখা।
ব্রহ্ম পুরুষ মাত্র সবে আছে লেখা॥

ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ জানে যাচকের ব্যথা।
একখানি বস্ত্র আর কান্ধে মাত্র পৈতা॥
তথায় ব্রাহ্মণ জাতি দয়ার নিধান।
পরিধান বস্ত্র চিরি দিল অর্ধখান॥

২৪ চুতুরা—ধুতুরা

নির্লেপ নির্গুণ তান নাহি রাগরোষ।
তা হৈতে হৈল আত্মা প্রধান পুরুষ।
প্রকৃতির বলে যে পুরুষ অধিষ্ঠান।
এতেকে প্রকৃতিনাম বলয়ে প্রধান॥
সেই যে প্রকৃতি হতে হইল মহৎ।
প্রকৃতিএ আবরিল সকল জগৎ॥
মহত্বকে প্রকৃতিএ আবরিল পুনি।
তাহাতে জন্মিল শব্দ অনাহত ধ্বনি॥

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিয়া আমরা বংশীদাস প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। কবি ধর্মমতে শাক্ত (চণ্ডীর সেবক) ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তন্ত্রের সঙ্গে তাঁহার গভীর পরিচয় থাকাও কিছু বিচিত্র নহে। মনসা কর্তৃক লখিন্দরের বিষ ঝাড়ানো প্রসঙ্গে তন্ত্র ও যোগসাধনার ইঙ্গিত আছে। যথা :

ব্রহ্মরন্ধ্র পথে নাম শঙ্খিনীর নালে।
সকার দুয়ারে বিষ নামহ পাতালে॥
বঙ্ক ওঙ্কারে পদ্মা ভাবয়ে যোগিনী।
সব বিষ সাপটি চাপড়ে কৈল পানী॥
পরম পুরুষ পুণ্য জ্যোতির্ময় হয়।
যে নালে আইলা বিষ সেহি নালে ক্ষয়॥
ইঙ্গলা পিঙ্গলা আর চিত্রা নামে নাড়ী।
সুষুম্নার মূলে দিয়া উর্ধ্বে নৈল ঝাড়ি॥

কবির রচনায় তন্ত্রের প্রভাব থাকিলেও তাঁহার মনে সর্বদা একটা স্নিগ্ধ মধুর ভক্তি নিরাজ করিত, তাহা পদ্মাপুরাণের দিসাগুলি হইতে বুঝা যাইবে। কবি কোন কোন কাহিনী বা বেদনার দৃশ্য বর্ণনায় প্রথমে দুই চারি পংক্তি গানের ধুয়া রচনা করিয়াছেন—অনেকটা গৌরচন্দ্রিকার মতো। পরে যাহা বিবৃত হইবে, তাহার সঙ্গে সাদৃশ্য রাখিয়া এই 'দিসা' প্রযুক্ত হইয়াছে। রাম-সীতা[২৫] ও হরপার্বতী বিষয়ক অনেক দিসার যেমন সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তেমনি বৈষ্ণবভক্তির অনুকূল রাধাকৃষ্ণ বা শুধু কৃষ্ণ বিষয়ক দুই-এক ছত্রের দিসা মূল কাব্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি বৈষ্ণব দিসা উদ্ধৃত হইতেছে :

২৫ রামসীতা বিষয়ক কয়েকটি দিসা—দেখ লো সই রঘুকুলমণি, আমি আর না জানি রাঘব বিনে, রমণীমোহন বেশ ধর হে রাম, ব্রহ্মার শিরোমণি রাঘব রাম, এবার তরাও মোরে সীতাপতি রাম, ইত্যাদি।

(১) চল বিনোদিয়া রাই।
যমুনে চল যাই॥
(২) গোপাল বনে যায় রে মায়ের প্রাণ লৈয়া।
(৩) রসের মাধুরি বিনোদ শ্যাম কে কৈল চুরি।
(৪) গোপাল ধীরে ধীরে পথ চল নিরখিয়া।
উছুট লাগিবে পায় পাষাণ ঠেকিয়া॥
(৫) কেন বে রন্ধনে আইল বড়াই।
নীপতরু মূলে দেখিয়া কানাই॥
(৬) রাধা কোলে করি কানাই ভাসে।
কোলে থাকিয়া রাধা খল খল হাসে॥
(৭) সখি গো, চল দেখি গিয়া।
সাজিছে বিনোদ শ্যাম রাধার লাগিয়া॥
(৮) বংশীবদনের বদনে।
বাঁশী জানে রাধা নাম কেমনে॥[২৬]

চৈতন্যের নামেও কয়েকটি দিসা পাওয়া যাইতেছে :
(১) ও প্রাণ শচীর দুলাল গৌরকিশোর রে।
(২) গৌরাঙ্গ নাচে নবদ্বীপের মাঝে।
(৩) নিমাই, কে ভাঙ্গিল আমার নদীয়ার বসতি।

কবি শংকরধর্মের প্রতি অনুরক্তি দেখাইলেও সপ্তদশ শতাব্দীর সর্বপ্লাবী বৈষ্ণবপ্রভাবের বাহিরে যাইতে পারেন নাই। তাঁহার অন্তরটি কোন কোন দিক দিয়া বৈষ্ণবরসের অনুকূল ছিল। তিনি বৈষ্ণব পদ রচনা করিলে ব্যর্থ হইতেন না, তাহা এই দিসাগুলির সহজ রস ও কবিত্ব হইতে অনুমিত হইতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গলের মধ্যে দ্বিজ বংশীদাস ও কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের কাব্য দুইটি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবার দাবি রাখে।[২৭]

কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ॥

ছাপাখানার যুগে মনসামঙ্গল কাব্যসমূহের মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় (১৮৪৪) বলিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার

২৬ কবি এখানে সুকৌশলে নিজের নামও ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার কোন কোন ভণিতায় বংশীবদন নামও পাওয়া যায়।

২৭ এখানে উদ্ধৃত ছত্রগুলি ১৩১৮ সনে প্রকাশিত দ্বারকানাথ ও রামনাথ চক্রবর্তীর সংস্করণ হইতে গৃহীত।

শিক্ষিতসমাজে মনসামঙ্গলের কবি হিসাবে তাঁহার প্রথম প্রচার হইয়াছিল। ১৮৭৪ সালে রামগতি ন্যায়রত্ন 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' ক্ষেমানন্দ ব্যতীত পদ্মাপুরাণের আর কোন কবির নাম বা পরিচয় উল্লেখ করেন নাই। অথচ ক্ষেমানন্দের পূর্বে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের মধ্যে অন্ততঃ তিনজন কবির (বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব, বিপ্রদাস পিপলাই) কাব্য রচিত হইয়াছিল। তবে এই কবিগণের কাব্য অঞ্চলবিশেষেই প্রচারিত হইয়াছিল, পশ্চিমবঙ্গে তাঁহাদের প্রচার ছিল না বলিয়া মনে হয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গেও মনসাপূজা হয়; ঝাঁপান, ভাসান প্রভৃতি এখানে অজ্ঞাত বস্তু নহে, এখনও রাঢ় অঞ্চলে ও দক্ষিণবঙ্গে শ্রাবণ মাসে ঘটা করিয়া মনসাপূজা, অরন্ধন, ভাসান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের পদ্মাপুরাণের কবিগণ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অল্পস্বল্প পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন—তজ্জন্য দীনেশচন্দ্রের অক্লান্ত পরিশ্রমই অনেকাংশে দায়ী। সে যাহা হউক, পূর্ববঙ্গেও কিন্তু ক্ষেমানন্দের পুঁথি অপ্রচলিত ছিল না। অনেক সময় তাঁহার কাব্য সংক্ষিপ্তাকারে 'ক্ষেমানন্দী' নামে পূর্ববঙ্গে মনসাপূজায় ব্যবহৃত হইত। মনসা-পূজকেরা যেমন বাইশকবি-ষট্‌কবির সঙ্কলিত কাব্য ব্যবহার করিতেন, তেমনি 'ক্ষেমানন্দী'ও একদা চট্টগ্রাম-ময়মনসিংহ অঞ্চলে খুব চলিত, ক্ষেমানন্দের পুরাপুঁথিও পূর্ববঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। সীমাবদ্ধ প্রতিভাসত্ত্বেও কবি উভয়বঙ্গেই সমাদর লাভ করিয়াছেন।

ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের পুরাপুঁথি ও বিভিন্ন খণ্ডিত পালার পুঁথির সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। মনসামঙ্গলের সম্পাদক অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মোট ৬৬ খানি পুঁথির সাহায্যে এই কাব্য সম্পাদনা করিয়াছেন।[২৮] অবশ্য অধিকাংশ পুঁথি কোন একটি পালা অবলম্বনে রচিত। যেমন—ধন্বন্তরি পালা, উষাহরণ পালা, হাসন-হোসন পালা। তবে মনসার জাগরণ পালা (অর্থাৎ মনসামঙ্গলের মূল কাহিনী বা বেহুলা-লখিন্দর কাহিনী) অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। জাগরণ পালার পুঁথির সংখ্যাও অন্যান্য পালা অপেক্ষা বেশী। অধ্যাপক ভট্টাচার্য ক্ষেমানন্দের যে ৬৬ খানি পুঁথি সংগ্রহ

---

২৯ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ বিরচিত মনসামঙ্গল'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের "সাঙ্কেতিক চিহ্ননির্দেশ" দ্রষ্টব্য।

করিয়াছেন, তন্মধ্যে ২৫ খানিই মনসার জাগরণ পালা। এতদ্ব্যতীত ১৩-১৪ খানি পুরাপুঁথিও পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং পুঁথির প্রমাণ বিচার করিলে ক্ষেমানন্দ বিষয়ক আলোচনার পথ অধিকতর সহজ মনে হইবে—অন্তত: বিভিন্ন পুথির পাঠ অবলম্বনে ক্ষেমানন্দের মূল রচনার খানিকটা উদ্ধার করা যায়। সম্পাদক অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ক্ষেমানন্দের বিভিন্ন পুঁথি হইতে পৃথক পৃথক পালা সংগ্রহ করিয়া একত্রে মুদ্রিত করিয়াছেন—ইহাও একপ্রকার 'বাইশকবি মনসামঙ্গল' বা composite text। প্রভেদের মধ্যে, বাইশকবিতে বিভিন্ন কবির বিশেষ-বিশেষ পালা সংগ্রথিত করিয়া কাহিনীর ধারাবাহিকতা ও পৌর্বাপর্য বজায় রাখা হইত, আর অধ্যাপক ভট্টাচার্য ক্ষেমানন্দের বিভিন্ন পুঁথি হইতে পৃথক পৃথক পালা সংগ্রহ করিয়া ক্ষেমানন্দের কাব্যের সমগ্র রূপ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা হউক এই প্রকার সম্পাদনা, "গবেষণার কাজের অনুপযোগী"[২৯] হইলেও অ-গবেষক সাধারণ পাঠক-সমাজে এইরূপ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

ইতিপূর্বে নানা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, পুঁথির ভাষা ও মুদ্রিত গ্রন্থের ভাষার মধ্যে প্রায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য ; এমন কি একই সময়ে বিভিন্ন পুঁথির মধ্যে ভাষা, পালা, বর্ণনা, চরিত্রের মধ্যেও নানা পার্থক্য ঘটিয়াছে। যে সমস্ত গ্রন্থ অত্যধিক জনপ্রিয় হইয়াছিল, বহুবার যাহার পুঁথি নকল হইয়াছিল, তাহাতে পরিবর্তনের মাত্রা কিছু অধিক। ছাপাখানার যুগে উনবিংশ

---

২৯ এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ (নাথ নহে, মোহন) ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত বইটিকে সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলা চলে না। ভট্টাচার্য মহাশয় এক একটি পুঁথি হইতে এক একটি পালা লইয়া বইটি সঙ্কলন করিয়াছেন। এ সংস্করণ গবেষণার কাজের অনুপযোগী। তাছাড়া সম্প্রদায় বিশেষের বিরাগভয়ে তিনি একটি নির্দিষ্ট পালা পরিত্যাগ করিয়াছেন।" (বাং. সা ইতি. অপরার্ধ, পৃ ২৫৩) এখানে ডঃ সেন "বিশিষ্ট পালা" বলিতে হাসন-হোসন পালার কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের গ্রন্থের ১ম খণ্ডে হাসন-হোসন পালা স্থান পায় নাই ; ইহাতে গ্রন্থের অঙ্গহানি হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য অধ্যাপক ভট্টাচার্য সম্পাদিত কাব্যের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, মনসামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ডে হাসন-হোসন পালা থাকিবে। প্রথম খণ্ড প্রকাশের (১৯৪৩) পর বিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও অধ্যাপক ভট্টাচার্য ঘোষিত মনসামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ড অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। "সম্প্রদায় বিশেষের বিরাগভয়ে"ই হোক, বা যে কোন কারণে হোক, মনসামঙ্গলের প্রথমখণ্ডে হাসন-হোসনের পালা পরিত্যাগ করা অধ্যাপক ভট্টাচার্যের উচিত হয় নাই।

শতাব্দীতে বটতলা হইতে ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের বহুবার মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া সমগ্র বাঙলাদেশেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্য মঙ্গল-কাব্যের অন্য কবিদের চেয়ে ক্ষেমানন্দের নাম অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল—এমন কি পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গলের কবিরা পশ্চিমবঙ্গে পরিচিত হইবার পূর্বেই ক্ষেমানন্দ পূর্ব, উত্তর-পূর্ববঙ্গ ও শ্রীহট্টের মনসাভক্ত সমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন।

ক্ষেমানন্দের কাব্য সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি।[৩০] তাহার পরে ১৮৫২ সালে আরও একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অতঃপর ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল 'মনসার ভাসান' নামে বটতলা (চিৎপুর অঞ্চল) হইতে বহুবার প্রকাশিত হয়। ক্ষেমানন্দের পুঁথির মনসামঙ্গল এবং কলিকাতা বটতলা হইতে সুলভ মূল্যে প্রকাশিত মনসার ভাসানগুলির মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। বটতলার মনসার ভাসানগুলি মূলতঃ চাঁদসাগর বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী। প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় এইভাবে উল্লিখিত হইত—"মনসার উপাখ্যান—অর্থাৎ চাঁদবাণিয়ার মনসার সহিত বিবাদ এবং বেহুলা লখিন্দরের জীবনবৃত্তান্ত সম্বলিত বিষহরী দেবীর মহিমা প্রকাশক গ্রন্থ : কবি কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ দাস কর্তৃক পয়ারাদি বিবিধছন্দে বিরচিত।" দেবখণ্ড অর্থাৎ মনসামঙ্গলের প্রথম অংশ এই সমস্ত পাঁচালী জাতীয় ভাসান গানে প্রায়ই মুদ্রিত হইত না। মুদ্রাকর ও প্রকাশকগণ কবিকে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ না বলিয়া 'কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ'—এইরূপ দুইজন কবির রচনা বলিয়া মনে করিতেন। তাই ১৮৪৪ সালে মুদ্রিত প্রথম সংস্করণ হইতে ১৯২৫ সালে প্রকাশিত ক্ষেমানন্দের যাবতীয় মনসার ভাসানে "শ্রীকেতকা দাস সাহায্যে শ্রীক্ষেমানন্দ কর্তৃক বিবিধ ছন্দে বিরচিত" এইরূপ কবিপরিচয় থাকিত। কোন কোন ভাসানে আবার কেতকাদাসের স্থলে 'কেতকানন্দ দাস' মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সমস্ত ভাসান গানের প্রকাশকগণ মনে করিতেন যে, কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ দুইজন পৃথক কবি, একে অপরের সহযোগী। তাই রচনাকার রূপে দুইজনের নামই মুদ্রিত হইত। কেহ কেহ

৩০ ইহার আখ্যাপত্র—কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ দাস রচিত মনসামঙ্গল/অর্থাৎ... বিষহরী দেবীর মহিমা প্রকাশক গ্রন্থ/বাং ১২৫১/ (ইহার একখানি মাত্র কপি ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে।)

আবার ক্ষেমানন্দের পুঁথি অবলম্বনে কাহিনীটিকে একটু আধুনিক আকারে নূতন করিয়া লিখিয়া প্রচার করিতেন। এইরূপ একখানি ভাসান ১৭৯১ শকে (১৮৬৯) মুদ্রিত হইয়াছিল।[৩১] কৃশদেব পাল মূল পুঁথি অবলম্বনে নিজের ভাষায় ভাসান রচনা করেন এবং ক্ষেমানন্দের স্থলে সর্বত্র নিজের নামভণিতা ব্যবহার করেন।

এই সমস্ত মনসার ভাসানে পুরাতন পুঁথি হইতে পাঠ গৃহীত হইয়াছিল। কারণ পুঁথির সঙ্গে মুদ্রিত পাঠের সাদৃশ্য আছে। অবশ্য অনেক স্থলে প্রকাশকগণ মূল পুঁথির কাহিনীকে কোথাও সংক্ষেপে, কোথাও-বা পরিবর্তিত করিয়া ও ভাষা পাল্টাইয়া পালার রদবদল করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তবু দেখা যাইতেছে, পুঁথির পাঠকে মুদ্রিত ভাসানে একেবারে পরিত্যাগ করা হয় নাই। অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত মনসামঙ্গলে যে পুঁথির পাঠ গৃহীত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুদ্রিত ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসানের পাঠের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, বটতলার বহুনিন্দিত প্রকাশকগণ ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল মুদ্রণে শুধু 'বাণিয়াখণ্ড'টি গ্রহণ করিলেও পুঁথির পাঠ সর্বত্র বদলাইয়া ফেলেন নাই। এখানে বিভিন্ন পাঠের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :—

যতীন্দ্রমোহন সম্পাদিত পুঁথির পাঠ

প্রথম যুগলপুটে প্রণতি গণেশ ঘটে
উর প্রভু আমার আসরে।
গায়েনে বন্দিয়া গায় উর প্রভু গণরায়
গজান গম্ভীর গুণবরে॥
গলে দোলে যোগপাটা কপালে সিন্দুর ফোঁটা
মূষিক বাহনে যোগধারী।
তুমি সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিধান দ্বীপিচর্ম্ম
তত্ত্ব কেহ বলিতে না পারি॥

৩১ ইহার আখ্যাপত্র—মনসামঙ্গল অর্থাৎ মনসাচরিত গ্রন্থঃ/কেতকাদাস ও ক্ষমানন্দের বিরচিত/পয়ারাদি ছন্দে পদ্মপুরাণ গ্রন্থের মূল অবলম্বন করিয়া/শ্রীযুক্ত কৃশদেব পাল কর্তৃক বিরচিত ও সংশোধিত হইল/শকাব্দ ১৭৯১

মধুসূদন শীল প্রকাশিত মনসার ভাসান (১৮৫৮)

প্রণতি যুগলপুটে প্রথম গণেশ ঘটে
অতএব নায়ক আসরে।
গায়ক বন্দিয়া গায় উর প্রভু গণরায়
গহনগম্ভীর গুণবরে॥
বাম অঙ্গে যোগপাটা কপালে ভাস্কর ফোটা
মূষিকবাহন যোগধারী।
ত্বংহি সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিধান দ্বীপচর্ম্ম
তব তত্ত্ব বলিতে না পারি।

গৌরচরণ পাল প্রকাশিত বটতলা সংস্করণ (১৮৭৯)

প্রণতি যুগলপুটে প্রথম গণেশ ঘটে
অতএব নায়ক আসরে।
গায়ক বন্দিয়া গায় উর প্রভু গণরায়
গহন গম্ভীর গুণবরে॥
বাম অঙ্গে যোগপাটা কপালে ভাস্কর ফোঁটা
মূষিকবাহন যোগধারী।
ত্বংহি সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিধান দ্বীপচর্ম্ম
তব তত্ত্ব বলিতে না পারি॥

পুঁথির পাঠের সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর মনসার মুদ্রিত ভাসানগুলির বিশেষ পার্থক্য না থাকিলেও ভাসানের সম্পাদকগণ যত্নপূর্বক গ্রন্থ প্রকাশ করিতেন না বলিয়া অনেক শব্দ ছাড় যাইত, অনেক শব্দ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহারা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে নূতন শব্দ বসাইয়া দিতেন; কোথাও-বা জনরুচির দিকে চাহিয়া অনেক পুরাতন পালার অল্পাধিক অদলবদল করিতেন। সে যাহা হউক ক্ষেমানন্দের মুদ্রিত ভাসানগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল, যাহার ফলে একদা উত্তর ও উত্তর-পূর্ববঙ্গে ক্ষেমানন্দের খুব সমাদর হইয়াছিল। রামগতি ন্যায়রত্ন, যিনি সর্বপ্রথম বাংলা-সাহিত্যের প্রথম প্রামাণিক ইতিহাস রচনা করেন, তিনিও ক্ষেমানন্দ ভিন্ন অন্য কোন মনসামঙ্গল কাব্যের কবির নাম জানিতেন না। এইরূপ জনপ্রিয়তার মূল কারণ কবির প্রথম মুদ্রণ সৌভাগ্য। মনসামঙ্গলের অন্য কোন কবির কাব্য পূর্বে মুদ্রিত হইলে তিনিও অল্পকালের মধ্যে সুপ্রচার লাভ করিতে পারিতেন।

কারণ ক্ষেমানন্দকে মনসামঙ্গলের পূর্ববর্তী কবিদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রতিভার অধিকারী বলিয়া মনে হইবে না। তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলেরও উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এত মুদ্রণ হয় নাই।

ক্ষেমানন্দের প্রায় একশত বৎসর পূর্বে মুকুন্দরাম অভয়ামঙ্গল (চণ্ডীমঙ্গল) কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গল রচনায় দুই-এক স্থলে মুকুন্দরামকে হুবহু অনুকরণ করিয়াছেন। মুকুন্দরামের আত্মপরিচয়ের বর্ণনার সঙ্গে ক্ষেমানন্দের আত্মপরিচয়ের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই আত্মপরিচয়ে ক্ষেমানন্দ মুকুন্দরামের রীতি অনুসরণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কায়স্থবংশোদ্ভূত কবি[৩২] বর্ধমানের অন্তর্গত বলভদ্রের তালুকে কাঁথড়া গ্রামে বাস করিতেন।[৩৩] কবির পিতা শঙ্কর স্থানীয় ফৌজদার (?) বারা খাঁর অধীনে কর্ম করিতেন। তাঁহার একটি কনিষ্ঠ ভাই ছিল, নাম অভিরাম। যুদ্ধে বারা খাঁ নিহত হইলে কবির পিতা নূতন জমিদারের অধীনে বড়ই অসুবিধায় পড়িলেন এবং গ্রাম ছাড়িয়া দুই পুত্র ও পত্নীকে লইয়া জগন্নাথপুরে উপস্থিত হইলেন। সেখানকার জমিদার ভারমল রায় কবির পিতাকে জমিদারী কর্মে নিয়োগ করিয়া আশ্রয় দিলেন। একদিন দুইভাই জলার ধারে খড় কাটিতে গিয়া দেখেন, অন্যান্য ছেলেরা মাছ ধরিতেছে। ক্ষেমানন্দ ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া তাহাদের হাঁড়িভরা মাছ কাড়িয়া লইলেন এবং মাছগুলি ভায়ের হাতে দিয়া মায়ের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। ছেলের দল কবিকে যৎপরোনাস্তি গালি দিয়া প্রস্থান করিল। এদিকে একাকী কবি সেই জলার ধারে দেবী বিষহরীর সাক্ষাৎ পাইলেন। কবি সহসা দেখেন এক মুচিনী তাঁহাকে কাপড় কিনিতে অনুরোধ করিতেছে। কবির পায়ে পিঁপড়া কামড়াইলে তিনি যেই নীচু হইয়া দেখিতে গিয়াছেন, অমনি মুচিনী অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণে সর্পভূষিতা মনসা আবির্ভূতা হইয়া কবিকে আদেশ দিলেন :

---

৩২ কবি একস্থলে কায়স্থ সমাজের কল্যাণ কামনা করিয়া বলিয়াছেন :

ক্ষেমানন্দের বাণী রক্ষ ঠাকুরাণী
যতেক কায়স্থ আছে।

৩৩ অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মনে করেন যে, পানাগড় রেল স্টেশনের আড়াই মাইল উত্তরে 'কাক্‌সা' নামে যে গ্রাম আছে, তাহাই ক্ষেমানন্দের কথিত কাঁথড়া গ্রাম। (যতীন্দ্রমোহন সম্পাদিত ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের ভূমিকা, পৃ. ১৫)

ওরে পুত্রক্ষেমানন্দ কবিতা কর প্রবন্ধ
আমার মঙ্গল গায়্যা বোল।[৩৪]

এই আত্মবিবরণীতে মুকুন্দরাম ও ধর্মমঙ্গলকাব্যের কবিদের আত্মবিবরণীর যে প্রভাব পড়িয়াছে, কোথাও কোথাও তাহা অনুকরণ বলিয়া মনে হয়।[৩৫] সে যাহা হউক কবির কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে অনুকরণমূলক এই আত্মকথার মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে দু-একটি নাম উল্লিখিত হইয়াছে—বারা খাঁ[৩৬] ও ভারমল্ল রায়।[৩৭] এই দুই জনই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইঁহাদের সন-তারিখ নির্ণয় দুরূহ নয়। উপরন্তু ইহাতে চৈতন্যবন্দনা আছে বলিয়া গ্রন্থটি যে চৈতন্যতিরোধানের শতখানেক বৎসর পরে রচিত হইয়াছিল সেরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত।

বারা খাঁ দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্গত সেলিমাবাদ সরকারের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৬৪০ খ্রীঃ অব্দে তিনি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের পুত্র শিবরামকে বিশ বিঘা মৌরসী জমি দিয়া যে দানপত্র দিয়াছিলেন তাহা দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় দেখিয়াছিলেন, উহা বহুদিন তাঁহার কাছেই ছিল।[৩৮] তাহা হইলে অনুমান করা যাইতে পারে, বারা খাঁ অন্ততঃ ১৬৪০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তারপর তিনি নিহত হইয়া থাকিবেন। অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ক্ষেমানন্দের কাব্য সম্পাদনা কালে বারা খাঁর সমাধি দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেলিমাবাদ এখন বর্ধমান জেলার একখানি গ্রাম, এখন নাম সিলামপুর—পানাগড় স্টেশনের আড়াই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই গ্রামের দক্ষিণে দামোদরের তীরে বারা খাঁর কবর এখনও আছে। বারা খাঁ এখন হিন্দু-মুসলমানের নিকট পীর বলিয়া শ্রদ্ধা লাভ করিয়া আসিতেছেন।

---

৩৪ উদ্ধৃতিগুলি যতীন্দ্রমোহন সম্পাদিত (ক. বি.) গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

৩৫ এই আখ্যানের সঙ্গে রূপরামের ধর্মমঙ্গলের প্রারম্ভে কবির আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কবির নিকট ধর্মের উপস্থিতি এবং কবিকে ধর্মমঙ্গলকাব্য রচনা করিতে নির্দেশ দানের আখ্যানের সাদৃশ্য আছে।

৩৬ রণে পড়ে বারা খাঁ বিপাকে ছাড়িল গাঁ
যুক্তি করি জনক জননী।

৩৭ রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই তাঁহারে ভেটিতে যাই
নাম তাঁর ভারামল্ল।

৩৮ দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

চৈত্রমাসের শেষ শুক্রবারে এখনও এই অঞ্চলে বারা খাঁর উদ্দেশে মেলা হইয়া থাকে। বারা খাঁ নিহত হইলে সেলিমাবাদে অরাজকতার সূত্রপাত হইয়াছিল, এবং ক্ষেমানন্দের পিতা এই গ্রাম ত্যাগ করিয়া ভারমল্লের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

ভারমল্ল রায়ের সন-তারিখও মোটামুটি নির্দেশ করা যাইতে পারে। টোডরমল্ল যখন বাঙলাদেশে আসেন, তখন তাঁহার সঙ্গে কেশবমল্ল ও তাঁহার দুই পুত্র ভারমল্ল ও বিষ্ণুদাসও আসিয়াছিলেন। ১৫৭৫-৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে টোডরমল্ল বাঙলায় ছিলেন; এই সময় কেশবমল্লের পুত্রদ্বয় প্রায় যুবক অনুমান করা যাইতে পারে। তাহা হইলে কবির পিতা যখন ভারমল্লের আশ্রয় লন, তখন তিনি সুবৃদ্ধ হইয়াছিলেন—ইহাও অনুমান। কবিকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বা দ্বিতীয়ার্ধের কোন এক স্থলে স্থাপন করা যায়। যে পুঁথিগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আধুনিক হস্তক্ষেপ অত্যন্ত প্রকট আকারে ধরা পড়িয়াছে। তাই কাব্যটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

কবি কাব্যের মধ্যে কোথাও কেতকাদাস, কোথাও ক্ষেমানন্দ, কোথাও-বা কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ এইরূপ ভণিতা দিয়াছেন। ইহার মধ্যে কোনটি তাঁহার প্রকৃত নাম, কোনটি মনসা-সেবকের উপাধি তাহা লইয়া কিঞ্চিৎ মত-ভেদ দেখা দিয়াছে। এতদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে যে, কবির নাম ক্ষেমানন্দ: মনসাভক্ত বলিয়া কেতকাদাস শব্দটি কবি নামের পূর্বে ব্যবহার করিয়াছিলেন। কারণ কবি মনসার আর এক নাম দিয়াছিলেন কেতকা।[৩৯] কেতকা নামটি মনসার প্রতিনাম হিসাবে আর কোন কবি ব্যবহার করেন নাই। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় প্রথমে ক্ষেমানন্দ কবির নাম, কেতকাদাস কবির উপাধি বলিয়া গ্রহণ করিলেও সম্প্রতি তিনি এই মত পরিত্যাগ করিয়া 'কেতকাদাস'কেই কবির প্রকৃত নাম বলিয়াছেন।[৪০]

---

৩৯ পদ্মবনে জন্ম হৈল পদুমা কুমারী।
বনের ভিতরে নাম মনসা কুমারী॥
কিয়া পাতে জন্ম হৈল কেতুকা সুন্দরী।
উনকোটি নাগের মাতা জয় বিষহরি॥

৪০ বা. সা. ইতিহাস, ১ম, অপরার্ধ।

ডঃ সেনের যুক্তির ধারাটি অনুসরণ করা যাক। আরও দুই-তিন জন কবির নাম ক্ষেমানন্দ ছিল বলিয়া (এবং কেতকাদাস বলিয়া অন্যকোন কবির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া) ডঃ সেন আমাদের কবিকে কেতকাদাস নামেই অভিহিত করিতে চাহেন। কিন্তু 'ক্ষমানন্দ' নাম, না উপাধি, না অন্য কিছু, সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই। কবির নাম হিসাবে শুধু 'কেতকাদাস' শব্দ ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ কবি কাব্যের অধিকাংশ স্থলে 'ক্ষেমানন্দ' ভণিতা দিয়াছেন, এমন কি আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক অংশেও প্রথমে 'ক্ষেমানন্দ' ব্যবহার করিয়াছেন :

গালাগালি দেয় তারা মৎস্য ছিল হাঁড়ি ভরা
সকলি লইল ক্ষেমানন্দ।

কেতকাদাস কবির প্রকৃত নাম হইলে, বালকেরা এখানে কবিকে কেতকাদাস বলিয়াই সম্বোধন করিত। অবশ্য আত্মপরিচয়ের শেষে কবি কেতকাদাসই ব্যবহার করিয়াছেন :

ব্রাহ্মণী চরণ আশে গাইল কেতকাদাসে
তুয়া বিনে অন্য নাহি গতি ॥

এখানে তিনি শুধু কেতকাদাস ব্যবহার করিলেন কেন? ইতিপূর্বে মুচিনীর বেশ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণীর বেশে কেতকা (মনসা) কবিকে বর দিয়া গিয়াছেন : তাই ভক্তির বশে কবি নিজেকে এখানে কেতকাদাস বলিয়াছেন। আরও দুই একটি প্রমাণ আমরা এখানে উল্লেখ করিতে পারি। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ১৩১৬ সালে বঙ্গবাসী মুদ্রাযন্ত্র হইতে ক্ষেমানন্দদাস নামক কোন এক কবির ক্ষুদ্রাকারের মনসামঙ্গল প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ কাব্যের সর্বত্র ক্ষেমানন্দ দাস ভণিতা আছে। মনে হয়, ক্ষেমানন্দের কাব্য পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রিয়তা লাভ করিলে কেহ কেহ ঐ নামে কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতি লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ছাপাখানার যুগে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ক্ষেমানন্দের যত মনসার ভাসান প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেও সর্বত্র কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দকে দুই জন পৃথক কবি বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু সম্পাদকগণ এই সমস্ত ভাসানের আখ্যাপত্রে ক্ষেমানন্দকে (১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দের সংস্করণে 'ক্ষমানন্দ' বলিয়া উল্লিখিত) মূল কবি এবং কেতকাদাসকে সহায়ক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। "শ্রীকেতকানন্দ দাস সাহায্যে শ্রীক্ষেমানন্দ দাস কর্তৃক বিবিধ ছন্দে বিরচিত" (১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দের সংস্করণ)—

এইরূপ উক্তিই বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সময়ে মুদ্রক ও সম্পাদকগণ কিন্তু জানিতেন যে, ক্ষেমানন্দই প্রধান কবি, কেতকাদাস তাঁহার সাকরেদ মাত্র। সুতরাং মনসামঙ্গলের কবি যে ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস তাঁহার উপাধি, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। তাহা না হইলে পূর্ববঙ্গে তাঁহার কাব্য 'ক্ষেমানন্দী' নামে প্রচারিত হইয়াছিল কেন ?

ক্ষেমানন্দের কাব্যকাহিনী বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মনে হয় যে, কোন কোন কবি যেমন উপযুক্ত প্রতিভাসত্ত্বেও পরবর্তী কালে অন্তরালে চলিয়া যান, সেইরূপ আবার কোন কোন কবির ততটা প্রতিভা না থাকিলেও সৌভাগ্যবশতঃ জনসাধারণের প্রচুর প্রশংসা লাভ করিয়া থাকেন। পরবর্তী কালেও তাঁহাদের সমাদর ব্যাহত হয় না। ক্ষেমানন্দ সেইরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কাব্য রচনা করিয়া প্রায় তিনশত বৎসর ধরিয়া তিনি পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে আশাতীত খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, দুই একজন স্বল্প-প্রতিভাধর কবি তাঁহার নামভণিতায় ছড়া-পাঁচালী ধরণের মনসার ভাসান লিখিয়া খ্যাতিলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন।[৪১] ছাপাখানার যুগে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই তাঁহার কাব্য মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল, কেহ-বা তাঁহার কাব্য অবলম্বনে, কিছু কিছু নূতনকথা যোগ করিয়া নিজ ভণিতা দিয়া মনসার ভাসান মুদ্রিত করিয়াছিলেন।[৪২] কোন কোন সমালোচক তাঁহাকে মনসামঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া প্রচুর প্রশংসা করিয়াছেন,[৪৩] কেহ বা তাঁহার রচনায় উৎকৃষ্ট কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য লক্ষ্য করিয়াছেন।[৪৪]

বস্তুতঃ কাহিনীটি সংক্ষেপে সংহত আকারে বিবৃত হইয়াছে—ইহাই এ কাব্যের একমাত্র গুণ। দেবখণ্ডের মধ্যে ঊষাহরণ পালাই দীর্ঘতম। কবি

---

৪১ পরে এই কবি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

৪২ কৃষ্ণদেব পাল রচিত মনসার ভাসান (পূর্বে উল্লিখিত)।

৪৩ ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ইতি. ১ম (অপরার্ধ), পৃ. ২৫৯

তাঁহার মতে—"কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম ও কাশীরাম যেমন যথাক্রমে রামকথা, চণ্ডীকথা ও ভারতকথার প্রতিনিধি স্থানীয় কবি, কেতকাদাসও তেমনি মনসামঙ্গল কাব্যের।"

৪৪ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, "ক্ষেমানন্দের কাব্যে উচ্চাঙ্গের কবিত্বের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও দুর্লভ নহে।" (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৩য় সংস্করণ)

নানা পুরাণ হইতে (খিলহরিবংশ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ) ইহার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ধন্বন্তরি পালাও দীর্ঘ। মনসা-জাগরণ পালার (বেহুলা-লখিন্দর কাহিনী) আখ্যান এমন কোন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নহে যাহার জন্য তিনি বিশেষ গৌরব দাবি করিতে পারেন। এই কাহিনীটি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহার পূর্বে মনসামঙ্গলের কয়েকজন উৎকৃষ্টতর প্রতিভার কবি এ কাহিনীকে একটা ছকের মধ্যে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন—কাহিনীগ্রন্থনে তাঁহার মৌলিকতা দেখাইবার বিশেষ কোন অবকাশ ছিল না। অবশ্য নৌযাত্রাপথের বর্ণনায় তিনি যে সমস্ত স্থানীয় গ্রামজনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলির ভৌগোলিক সংস্থান পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গলের কবিদের মতো বায়ুলোকে স্থাপিত হয় নাই, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ও চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রাম ও নদ-নদীর নাম তিনি যথাযথ সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন। বর্ণনার মধ্যেও বহুস্থলে পশ্চিমবঙ্গীয় সমাজ জীবনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কবির রচনারীতি ও পরিকল্পনা-প্রকরণের অনেক স্থলে মুকুন্দরামের বিশেষ প্রভাব আছে। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, মুকুন্দরামের আত্মপরিচয়ের অনুকরণেই তিনি নিজ আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গীয় মাঝিদের বিলাপের বর্ণনায় ক্ষেমানন্দ মুকুন্দরামের প্রায় অবিকল অনুকরণ করিয়াছেন। মুকুন্দরাম লিখিয়াছিলেন :

কান্দে রে বাঙ্গাল ভাই বাফোই বাফোই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই ॥
আর বাঙ্গাল কান্দে শোকে শিরে দিয়া হাথ।
হলদী গুঁড়া হারাইল শুকুতার পাত ॥
আর বাঙ্গাল বলে বড় লাগে মায়া মো।
বিদেশে রহিলুঁ না দেখিলুঁ মাগু পো ॥
আর বাঙ্গাল বলে আমি অই তাপে মৈল।
কালী গুরী দুটি মাগু সেই কোথা গেল ॥
এইরূপে শোকে কান্দে যতেক বাঙ্গাল।
জনমের মত সব হইলু কাঙ্গাল ॥

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত চণ্ডীমঙ্গল)

ইহারই অনুকরণে ক্ষেমানন্দ লিখিয়াছেন :

বাঙ্গাল কান্দে হড়ুর বাফে বাফে ॥ ধ্রু ॥
... ...
মাথার হাত দিয়া কান্দে যতেক বাঙ্গাল।
সকল ডুবিল জলে হৈনু কাঙ্গাল ॥
পোস্তের হোলা ভাঙ্গা গেল ছাকনার কানি।
আর বাঙাল বলে গেল ছেঁড়া কাঁথা খানি ॥
ধূলায় লোটায়্যা কান্দে আর বাঙ্গাল বলে।
সাত গাট্যা টেনা মোর ভাঙ্গা গেল জলে ॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই ঐ তাপে মরি।
এমন নাহিক বস্ত্র উভু করা্যা পরি ॥
বিদেশে হারাণু প্রাণ চাঁদা বস্তার পাকে।
ডাকাচুরি নহে ভাই কব গিয়া কাকে ॥
যতেক বাঙ্গাল তারা চারিদিকে চায়।
মনসার হটে চাঁদবেণ্যা জল খায় ॥৪৫

মনসার জাগরণপালা অর্থাৎ বেহুলা-লখিন্দরের মূল পালা সংক্ষেপীকরণের ফলে এতটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে যে, বর্ণনার মধ্যে সহজ গতি প্রায়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তবে এই অংশ মনসামঙ্গলের অন্যান্য কবিদের তুলনায় স্বল্পপরিসরের মধ্যে রচিত হওয়ায় পরবর্তী কালে মনসাভাসান নামে মুদ্রিত হইয়া বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল।

চরিত্র বিচার প্রসঙ্গে বিশেষ কোন নূতন কথা বলিবার অবকাশ নাই। ইতিপূর্বে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ এই জাতীয় গ্রন্থের চরিত্ররচনায় একটা বাঁধা গত ছকিয়া দিয়াছিলেন; ক্ষেমানন্দ তাহার বাহিরে গিয়া নূতন কোন বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তবে মনসার ঈর্ষাতুর চরিত্রটি মন্দ হয় নাই। সমুদ্রমন্থনের পর শিব কালকূট পানে হতচেতন হইয়া পড়িলে তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য সর্পের দেবী এবং মহাদেবের আত্মজা মনসার ডাক পড়িল। কার্তিক-গণেশ দুই ভাই গিয়া মনসা দিদিকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। সমস্ত শুনিয়া মনসা ভারি খুশি হইলেন—বেশ হইয়াছে, বাপ মরিলে বিমাতা চণ্ডী ('কালিনী') বিধবা হইবে, মনসার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে:

৪৫ মুকুন্দরামের অভয়ামঙ্গলের সঙ্গে ক্ষেমানন্দের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনার জন্য অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের ভূমিকা (পৃঃ ৫০–৫২) দ্রষ্টব্য।

পাতাল কুমারী বলে প্রবোধিয়া ভাই।
যত দুখ দিল মোরে কালিনী সতাই ॥
কহিতে সে সব কথা বাড়ে শোকানল।
ভাল হৈল মৈল বাপ খাইয়া গরল।
অঙ্গার দহনে মোর চক্ষু কৈল কানি।
অবিরত দিবানিশি অই মনে গণি ॥
আজি মনে প্রীত হৈল শুনি সমাচার।
এতদিনে চণ্ডীর ছুটিল অহঙ্কার ॥
হেমন্ত-ঋষির বেটীর গর্ব্ব হৈল চূর্ণ।
মনসার মনোবাঞ্ছা হৈল সম্পূর্ণ ॥
বিষপানে মরিল মহেশ মোর বাপ।
চণ্ডিকা রণ্ডিকা হৈল ঘুচিল সন্তাপ ॥
প্রাণ গেলে মনসা তথায়ে নাহি যাই।
এই সমাচার কহ গিয়া প্রাণের ভাই ॥

বাপ মরিয়াছেন তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু বিমাতা চণ্ডিকা 'রণ্ডিকা' হইবেন, ইহাতেই মনসার আনন্দ। এখানে সর্পের দেবীর ঈর্ষাতুর বিষাক্ত চরিত্রটি চমৎকার ফুটিয়াছে।

বেহুলা, চাঁদসদাগর প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টিতেও কবি নূতন কোন বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিতে পারেন নাই। বেহুলার স্নিগ্ধ করুণ কোমলতা ও পাতিব্রত্যের দার্ঢ্য প্রায় সমস্ত মনসামঙ্গল কাব্যের সাধারণ লক্ষণ। অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ক্ষেমানন্দের বেহুলা চরিত্র সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, "কেতকাদাসের বিশেষত্ব এই যে, বেহুলা এখানে কেবল একটা আদর্শের প্রতিলিপি নয়, রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন। বেদনায়, শোকে, দুঃখে তিনি কাঁদিয়া সকলকে কাঁদাইয়াছেন, বুদ্ধিকৌশল প্রয়োগে সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন, আনন্দে উৎসবে হাস্যরসিকতায় সকলকে প্রসন্ন করিয়াছেন; অশ্রু ও হাসিতে পরিপূর্ণ জীবনের সৃষ্টি হইয়াছে।"[৪৬] এ মন্তব্য অযৌক্তিক নহে, তবে অধিকাংশ মনসামঙ্গলের বেহুলা চরিত্রে এই একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাইবে; ইহার জন্য ক্ষেমানন্দের অতিরিক্ত প্রশংসা করিবার প্রয়োজন নাই।

চাঁদসদাগরের চরিত্রটির শেষ রক্ষা না হইলেও কবির সৃষ্টিশক্তি নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মতো নহে। চাঁদসদাগর কদাপি মনসাকে মানিতে চাহেন

৪৬ অধ্যাপক ভট্টাচার্য সম্পাদিত ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল (ক. বি.), ভূমিকা পৃঃ ৬৩

নাই—"মনস্তাপ পায় তবু না নোয়ায় মাথা"—ইহাই চাঁদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, এবং কবি এই চারিত্রিক পৌরুষ বর্ণনায় বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন :

যে হাতে পূজিনু মুই সোনার গন্ধেশ্বরী।
কেমনে পূজিব তাহে জয় বিষহরি ॥

এই উক্তিতেও চাঁদের দার্ঢ্য প্রকাশিত হইয়াছে। লখিন্দরের সর্প দংশনে মৃত্যু হইলে অন্যান্য পুরপরিজনদের মতো তিনি শোকে ভাঙিয়া পড়েন নাই, তাঁহার চোখে অশ্রুর স্থলে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। পুত্রশোকে শুষ্কহৃদয় চাঁদ এইবার নিশ্চিন্ত হইলেন। যাহাকে লইয়া মনসার সঙ্গে বিবাদ, সেই সর্বকনিষ্ঠ পুত্রটিও মনসার কোপে প্রাণ দিল—আর কিসের ভয়? ক্ষোভে দুঃখে ব্যর্থবেদনায় চাঁদ উন্মাদের মতো নৃত্য করিতে লাগিলেন :

নখাই বাসরে মৈল চাঁদবান্যা বার্তা পাল্য
পুত্রশোকে শুকাইল হিয়া।
বিভাদিনে চাঁদবান্যা পুত্রের মরণ শুন্যা
নাচে হেন্তালের বাড়ি লইয়া ॥
নখাই মৈল ভাল হৈল।
নির্ভয় হৈনু মনে চেঙ্গমুড়ী কানী সনে
এতদিনে বিবাদ ঘুচিল ॥

কিন্তু সনকাকে কে প্রবোধ দিবে?

সনকা কান্দে উভরায়।
পুত্র সম নাহি প্রিয় প্রবোধিতে নারে কেহ
তার হিয়া কি দিলে জুড়ায় ॥

অবশ্য কবি চাঁদচরিত্রের শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই,—মনসামঙ্গলের কোন কবিই পারেন নাই। চাঁদ এতদিন ধরিয়া মনসার বিরোধিতা করিয়াছিলেন, সর্বনাশের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়াও তিনি মনসাকে পূজা করিতে অসম্মত হইয়াছেন। কিন্তু যেই তিনি দেখিলেন, বেহুলার কৃতিত্বে ও মনসার আনুকূল্যে নিমজ্জিত ডিঙ্গাসমূহ ভাসিয়া উঠিল, সাত সন্তান পুনর্জীবিত হইল, অমনি তাঁহার মন নরম হইয়া গেল :

সাবিত্রী সমান হৈল পুত্রবধূ মোর।
ঘরেতে পাইলু মুই চৌদ্দ মধুকর ॥
হেন মনসার পূজা নাহি করি যদি।
বিপাকে হারাই পাছে হাতে পায়্যা নিধি ॥

এখানে নিতান্তই বণিক্‌বুদ্ধির বশে তিনি হিসাব করিয়া মনসার ভক্ত হইয়াছেন। তাই তিনি মনসার উদ্দেশ্যে বলিলেন :

হারামরা পাইনু তোমার আশীর্বাদে।
পূজিব তোমার পদ বড় মোর সাধে ॥

অতঃপর মনসার নির্দেশে চাঁদ শুধু ঘটা করিয়া মনসা পূজাই করিলেন না, মনসার অনুচর লাখ লাখ সর্পকেও বিশেষ ভক্তিসহ পূজা দিলেন। অবশ্য কাব্যের উপসংহারে মনসামঙ্গলের কবিগণ বাধ্য হইয়াই চাঁদকে মনসাভক্ত করিয়াছেন, যদিও আধুনিক রুচির দৃষ্টিতে চাঁদের চরিত্রমহিমা ইহাতে লঙ্ঘিত হইয়াছে। চাঁদ যখন গলবস্ত্র হইয়া জোড়করে পূজা করিতে অগ্রসর হন :

গলায় কাপড় দিয়া সদাগর দাণ্ডাইয়া
মনসারে বলে স্তুতিবাণী।
তুমি দেব দেবতা তুমি হরদুহিতা—
তুমি দেবী ঈশাননন্দিনী ॥

তখন সেই স্তবপাঠ স্বার্থক্লিষ্ট বলিয়া ততটা স্বতোস্ফূর্ত মনে হয় না।

ক্ষেমানন্দের রচনাশক্তি তীক্ষ্ণ ও তির্যক নহে, আলঙ্কারিক কৌশলও কোন অভিনবত্ব দাবি করিতে পারে না। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, নিদর্শনা প্রভৃতি অলঙ্কারে তিনি সংস্কৃত রীতিপদ্ধতিই অনুসরণ করিয়াছেন। 'জলদ নিন্দিয়া কেশভার,' 'পূর্ণিমার চন্দ্র যেন অমৃত বরিষে' প্রভৃতি উক্তিগুলি বেশ নিপুণ হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার পূর্বেই বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে ছন্দোলঙ্কারের নানা বৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রকাশ ভঙ্গিমায় তৎসম শব্দ ও সংস্কৃত অলঙ্কারের কৌশল আমদানিতে ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদকারগণ অধিকতর নিপুণতা দেখাইয়াছিলেন। কবির মার্জিত চাঁচাছোলা ভাষা-ভঙ্গিমার রীতিটি পূর্ববর্তী কাব্যধারারই অনুবর্তন করিয়াছে। কেহ কেহ তাঁহার বর্ণনায় 'সরলতা' ও 'সহৃদয়তা'—এই দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছেন।[৪৭] অবশ্য অনেক সময় অক্ষমতাকে সরলতা বলিয়া ভ্রম হয়। তিনি সহজভাবে কাহিনীর উপস্থাপনা করিয়াছেন, অনেক কথা অতি সংক্ষেপে সারিয়াছেন। ভাষাভঙ্গিমায় কবি সপ্তদশ শতাব্দীর তৎসম শব্দের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন—এইটুকুই তাঁহার কৃতিত্ব। সে যাহা হউক পশ্চিমবঙ্গে[৪৮]

৪৭ ডঃ সুকুমার সেন—বাং. সা. ইতি—১ম (অপরার্ধ)

৪৮ "দক্ষিণরাঢ়ে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ক্ষেমানন্দের পাঁচালী গানের আদর এখনও অবিলুপ্ত রহিয়াছে।" (ডঃ সেন—বা. সা. ই.—১ম, অপরার্ধ)

এই কাব্যের খ্যাতি এখনও অব্যাহত আছে, পূর্ববঙ্গেও ইহার সমাদর হ্রাস পায় নাই। এদেশে পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গলের কবিরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কথঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করেন—তাও ছাপাখানার প্রসাদে। কিন্তু ক্ষেমানন্দের ভাসান তাঁহাদের পূর্বেও পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল। জনসাধারণ এই ভাসানগানের সাহায্যে মনসার উৎসব-অনুষ্ঠানকে সুসম্পূর্ণ করিত, পশ্চিমবঙ্গের মনসা-'কাল্ট্'-এর মূলে ক্ষেমানন্দের দান স্বীকার করিতে হইবে।

এবার আমরা ক্ষেমানন্দের নামে প্রচারিত আর একখানি ক্ষুদ্রতর মনসামঙ্গলের কথা উল্লেখ করিব।[৪৯] ১৩০৮ সালে প্রকাশিত, শিবচন্দ্র শীল সম্পাদিত 'গোবিন্দচন্দ্রের গীতে'র ভূমিকায় সম্পাদক বলিয়াছেন, "কেতকানন্দ দাস ও ক্ষেমানন্দ দাস কৃত মনসার উপাখ্যান বা ভাসানের এক আদর্শ গ্রন্থ অবশ্যই ছিল। বর্তমানে তাহা লোপ পাইয়াছে।" বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় এই উক্তি হইতে মনে করিয়াছিলেন যে, ক্ষেমানন্দের নিশ্চয় কোন মূল পুঁথি ছিল, যাহা অবলম্বনে পরবর্তী কালের পুঁথি অনুলিখিত হইয়াছিল, এবং ছাপাখানার যুগে তাহারই রূপান্তরিত ও বর্ধিত সংস্করণ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। পুঁথির সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি মানভূম জেলার লাড়াপাবড়া গ্রাম হইতে দেবনাগরী অক্ষরে (কায়থী হরফ[৫০]) অনুলিখিত মনসামঙ্গলের একখানি ক্ষুদ্র পুঁথি পাইলেন, যাহার ভণিতায় কেবল ক্ষেমানন্দের নাম ছিল—কেতকাদাসের নহে। ১৩১৫ সালে সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে এই পুঁথিটি প্রদর্শিত হয়, তাহার বৎসর খানেক পরে (১৩১৬) তাঁহার সম্পাদনায় এই মনসামঙ্গল প্রকাশিত হয়। সম্পাদকের মতে, "পুঁথিখানির পাঠ এবং আলোচনা করিয়া উহা যে ক্ষেমানন্দকৃত মনসামঙ্গলের আদর্শ, আমাদের এরূপ ধারণা জন্মিয়াছে" (ভূমিকা, পৃ, ২)। তাঁহার কেন এরূপ ধারণা জন্মিল, তাহার জন্য তিনি কোন কারণ দর্শান নাই। ঐ ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, "অধুনা ক্ষেমানন্দ

৪৯ ইহার আখ্যা পত্র—মনসামঙ্গল/কবি ক্ষেমানন্দ দাস প্রণীত/১৩১৬

৫০ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ৫২৯ ও ১৪১৮ সংখ্যক পুঁথিদ্বয়ই এই মনসামঙ্গল। পুঁথি দুইখানি বিহারী বণিক সমাজে প্রচলিত 'কায়থী' (কায়স্থ অর্থাৎ হিসাবনবিশ) অক্ষরে লিখিত। এ বিষয়ে শ্রীহট্টের 'স্মৃতি' পত্রিকায় (১৩৪৮, শারদীয়া সংখ্যা) অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের প্রবন্ধটি ('কৈথী অক্ষরে লিখিত বাংলা পুঁথি') দ্রষ্টব্য।

বিরচিত বলিয়া যতগুলি পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তক প্রচলিত আছে, তাহার কোন একখানির সহিত উহার মিল নাই।" অথচ সম্পাদক এই পুস্তিকাটিকে ক্ষেমানন্দের পুঁথি বলিতে চাহেন। মনসার জাগরণ বা বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীটি ইহাতে একপ্রকার হইলেও ক্ষেমানন্দের প্রাপ্ত কোন পুঁথির সহিত বসন্তরঞ্জন আবিষ্কৃত দেবনাগরী হরফে লিখিত এই পুঁথির ভাব-ভাষা—কোন দিক দিয়াই মিল নাই।[৫১]

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেমানন্দের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ফলে মানভূম পুরুলিয়া অঞ্চলে (এখানে মনসার ভাসান এখনও প্রচলিত আছে) কোন ব্রত-কথাকার ক্ষেমানন্দের ভণিতা লইয়া এই পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। নয়টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধ্যায়ে বিভক্ত এই কাহিনীটি স্থানীয় প্রবাদ ও কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া নাগরী অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। ইহার ভাষায় উত্তর-পশ্চিম বাঙলায় রাঢ়বুলির বিশেষ প্রাধান্য আছে। যথা—

রাম ভুলালিয়া রে যাদব ভুলালিয়া।
ওরে কতদিন পেড়হাবে গোপাল হামাগুড়ি দিয়া॥
নাঞিবে বিষ নাঞিরে নাঞি কালিয়ার গায়।
ধবল ধুলিয়ার বিষ ধূলিতে লোটায়॥
হাটিতে জানিলে গোপাল খাত্যো দিব ননী।
ওরে কারে দিব টাড় বালা গলে হার মণি॥
গোপালের করে তবে যশোমতি ধরে।
চল দেখি বাছা ক্ষীরসর দিব তোরে॥
গোপালে খায়াঞে ননী রাণী আনন্দিত।
আস্ত আস্ত বাছা মোর শুন নন্দসুত॥

কাহিনীটি পুরাপুরি গ্রাম্য ব্রতকথায় ঢঙে রচিত, ক্ষেমানন্দের অনেক পরে আধুনিক যুগে রচিত হওয়াই অধিকতর সম্ভব। যাহা হউক কাব্যের ভণিতার

৫১ ক্ষেমানন্দের প্রচলিত পুঁথির সঙ্গে প্রাপ্ত পুঁথির বৈসাদৃশ্যগুলির জন্য অধ্যাপক ভট্টাচার্য সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা (পৃ. ১৭-২৫) দ্রষ্টব্য। এ বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উভয় সংস্করণের গ্রন্থকার এক হইতে পারেন না। অধিকন্তু একখানি গ্রন্থ অপরখানির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বা পরিবর্তিত সংস্করণ হওয়াও সম্ভব নহে।" তাঁহার মতে এই পুস্তিকার রচনাকার ক্ষেমানন্দ বোধ হয় কোন গায়েন হইবেন। ইনি গায়েন হউন, পুস্তিকার রচনাকার হউন—যেই হউন, প্রচলিত ক্ষেমানন্দের কাব্যের সঙ্গে এ পুঁথির কোন দিক দিয়াই যোগাযোগ নাই।

কোথাও কেতকাদাসের নাম নাই, এবং মূল কাব্যটির দেবদেবী বন্দনার পর চাঁদসদাগরের সিংহল যাত্রা হইতেই শুরু হইতেছে। ভাষাতে আঞ্চলিক প্রভাব সত্ত্বেও ইহার আধুনিকতা ঢাকা পড়ে নাই। আঞ্চলিক ভাষার জন্যই বর্ণনার কোন কোন অংশ সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া মনে হইতে পারে।[৫২]

কিন্তু পুস্তিকাটি অর্বাচীন কালের হইলেও রচনার ঢঙ নিতান্ত নিন্দনীয় নহে। যিনি ব্রতকথা ধরণের এই ছোট আখ্যায়িকাটি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার রচনাশক্তি কিঞ্চিৎ প্রশংসা দাবি করিতে পারে। এই ব্রতকথায় চাঁদ-সদাগরের ঋজু চরিত্র অনেকটা বজায় আছে। তিনি কাহারও অনুরোধে মনসাকে পূজা করিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু বেহুলার সনির্বন্ধ অনুরোধ ("অনেক উপায় ছুঁড়ী করিল আপনি") এবং লখিন্দরের প্রার্থনায় ("শুন শুন ওহে বাপা স্থির কর মন। একবার পূজা বাবা স্থির কর মন ॥") অগত্যা শৈব চাঁদ শিবপূজার পর নিমরাজি হইয়া মনসাপূজায় বসিলেন :

শিবের সেবা করি তবে আনন্দিত মন।
চান্দ বলে পুজি এব চেঙ্গমুড়ার চরণ ॥

চাঁদ অশ্রদ্ধাবশতঃ পূর্বে না বসিয়া পশ্চিমাস্য হইয়া 'চেঙমুড়ী' মনসার পূজায় বসিলেন এবং ইচ্ছা করিয়া 'জয়দেবী' না বলিয়া 'জয়ভেবী' বলিয়া পুষ্পার্ঘ্য দিলেন :

জয় ভেবী বল্যে বেজ্যা দেই পুষ্প পাণি।
তা দেখিয়া হাসে মাতা জগৎ জননী ॥
দৈবের নির্বন্ধ ভাই কে করে খণ্ডনে।
ভেবী বলিতে দেবী বাইরায় চান্দের বদনে ॥

অবশ্য হেলাভরে পুষ্প দিলেও দৈবের কৃপায় চাঁদের দিব্যজ্ঞান লাভ হইল, তখন তিনি নিজ কৃতকর্মের জন্য মনসার নিকট যথাবিধি ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন :

মনসায় পূজিরে চান্দের আনন্দিত মন।
প্রণাম করিল চান্দ অতি বিলক্ষণ ॥
শুন শুন পদ্মাবতী বলিএ তোমারে।
নিজগুণে কর দয়া অধম পামরে ॥

৫২ "রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দী হওয়া অসম্ভব নহে।" (ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ই. ১ম, অপরার্ধ) কিন্তু ভাষা বিচারে এই পুস্তিকাকে কোন দিক দিয়াই পুরাতন বলা যায় না।

'জয় ভেবী' বলিতে মুখ দিয়া 'জয় দেবী' বাহির হওয়া, পূর্বদিকে না বসিয়া পশ্চিমদিকে বসিয়া দেবী পূজার ছলনাময় আয়োজন ইত্যাদি নানা বর্ণনা গ্রাম্য ব্রতকথার শিশুসুলভ বর্ণনাই স্মরণ করাইয়া দেয়। যাহা হউক, "এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিতে যাহা আছে, তাহা জগতে অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না"—[৫৩] পুঁথিসম্পাদক বসন্তরঞ্জনের এই আকাশস্পর্শী প্রশংসা কিঞ্চিৎ হাস্যকর হইলেও ব্রতকথা হিসাবে এই ক্ষুদ্রকাব্যের কাহিনীগ্রন্থন ও চরিত্র চিত্রণ অবহেলার যোগ নহে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

তন্ত্রবিভূতি ॥

ডক্টর আশুতোষ দাস ও শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কবি জগজ্জীবন ঘোষাল বিরচিত যে মনসামঙ্গল মুদ্রিত হইয়াছে,[৫৪] নানা কারণে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙলার নানা অঞ্চলে মনসার কাহিনী বিচিত্র আকার লাভ করিয়াছে, আঞ্চলিক ভেদই ইহার অন্যতম প্রধান কারণ। পূর্ব, উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন মনসামঙ্গলের কবির পরিচয় প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে মনসামঙ্গলের যে কাহিনী, চরিত্র ও বিষয়বস্তু আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে ভৌগোলিক সংস্থানের বৈচিত্র্যের জন্য উক্ত কাব্যের মূল কাঠামো মোটামুটি বজায় থাকিলেও, ছোটখাট ব্যাপারে অল্প-বিস্তর পার্থক্য আছে। ডক্টর দাসের সম্পাদিত গ্রন্থ হইতে মনে হইতেছে, উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গলের মধ্যে বাঙালীর সমাজ ও নীতির এক নূতন তাৎপর্য নিহিত আছে। চৈতন্যযুগের ঈষৎ পূর্ব হইতেই যে পৌরাণিক প্রভাব উচ্চতর মহলে স্বাভাবিক ভাবেই অধিকার বিস্তার করিতেছিল, তাহা পরিস্রাবণের পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণেতর সমাজে ছড়াইয়া পড়িলেও, যে বাঙালী মন বহু কালাগত কুলাচার ও কৌম জীবনবোধের মধ্যে লালিত হইয়াছিল, যে সমস্ত সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আচার-আচরণ, কৃত্য, অধিমানসের দ্বারা দৈনন্দিন লোকজীবনযাত্রা ও লোকাতিচারী অধ্যাত্ম-প্রণালীকে পরিচালিত ও পরিপুষ্ট করিত, তাহা মূলতঃ ষড়ায়তনবন্দী দেহ-

৫৩ ঐ পুস্তিকার ভূমিকা, পৃ. ৪

৫৪ পরে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

চেতনাকেই অবলম্বন করিয়াছে—ইহাই বাঙালীর আর্যেতর গ্রামীণ সংস্কার, যাহা উত্তরাপথের পৌরাণিক সংস্কারের গঙ্গোদকে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া যায় নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, সহজিয়া বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব আচার, নাথ 'কালট্', 'ধর্ম কালট্', আউল-বাউল-সাঁই-মুর্শিদা-মারফতি ইত্যাদি সাহিত্য ও ধর্মপ্রণালীর মধ্য দিয়া কখনও প্রকাশ্যে, কখনও-বা সংগোপনে বহিয়া চলিয়াছে—এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানালোকিত যুগেও এই রহস্যবাদী দেহসাধনার ধারা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় নাই। পুরাণকেন্দ্রিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং গ্রামীণ জীবনধারার যুগপৎ প্রভাব এই মঙ্গলকাব্যেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইবে, এবং সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ হইতে আবিষ্কৃত দুইখানি মনসামঙ্গলকাব্য (তন্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্য) হইতে বাঙালী-সংস্কৃতির এই বিচিত্র সমন্বয়টি পাঠকের মনে কৌতূহল সঞ্চার করিবে।

উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি তন্ত্রবিভূতি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বিশেষ কোন সংবাদ বা তথ্য সংগ্রহ করা যায় নাই। উত্তরবঙ্গের তন্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবন ঘোষাল যে মনসামঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, স্থানের নৈকট্যের জন্য একের পুঁথিতে অন্যের রচনা প্রচুর প্রবেশ করিয়াছে। ডঃ আশুতোষ দাস মহাশয় উত্তরবঙ্গ পরিভ্রমণকালে সর্বপ্রথম তন্ত্রবিভূতির পুঁথি সন্ধান পান এবং মালদহ জেলা হইতে তিনি তন্ত্রবিভূতির ভণিতাযুক্ত দুইখানি পুঁথি সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে একখানির লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, আর একখানি বোধহয় পূর্বের পুঁথির প্রতিলিপি। লিপিকাল—বাংলা ১২৪৪ সাল। অতঃপর ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' (১ম-পূর্বার্ধ) এই পুঁথির বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছেন। ইহার প্রায় এক বৎসর পরে ডঃ দাস সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের সহায়তায় জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলের যে সংস্করণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তন্ত্রবিভূতি সম্বন্ধে দুই একটি তথ্য থাকিলেও (ভূমিকা —পৃ. ১৲-১৶০) এই কবি সম্বন্ধে কোন বিস্তারিত পরিচয় নাই। ডঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন যে, জগজ্জীবন ঘোষাল তাঁহার পূর্ববর্তী কবি তন্ত্রবিভূতির রচনার অংশবিশেষ আত্মসাৎ করিয়াছেন। জগজ্জীবনের পুঁথিতেও কিছু কিছু পদে তন্ত্রবিভূতির ভণিতা পাওয়া যায়। ডঃ দাসও বলিয়াছেন যে, জগজ্জীবন তাঁহার পূর্বসূরী তন্ত্রবিভূতির নিকট ঋণী। কিন্তু

ডঃ দাস ডঃ সেনকে যে দুইখানি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, পরে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।[৫৫] সম্প্রতি আমায় ছাত্র শ্রীমান গোকুলানন্দ মিশ্র মালদহ হইতে তন্ত্রবিভূতির একখানি পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আমাকে ব্যবহারের জন্য দিয়াছেন। পরের পৃষ্ঠায় ইহার একপৃষ্ঠার আলোক চিত্র মুদ্রিত হইল। আমরা পুঁথিটি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি—লিপিদৃষ্টে ইহাকে একশত-দেড়শত বৎসরের পুরাতন মনে হইতে পারে। পুঁথিটি এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে :

শ্রীশ্রীরাম / অথ মনসামঙ্গল লিক্ষ্যতে॥ আস্তিকস্য মনির্ম্মাতা ভগ্নি বাসুকী কবি :। জড়ৎকারু মুনিপত্নি মনসাদেবী নমস্তুতে॥

নমো দেবী আদিত জগৎ সর্ব্ব পুজিত
তুমি দেবী নাম বিসহরি।
তুমি জগতের মাতা সঙ্করের প্রাণদাতা
কৌতুক মর্ত্তেতে অবতরি॥
নম জগতের মাতা সঙ্করের প্রাণদাতা
বিসহরি বিস করে হর্ত্তা।
সাপের বিনাস হারি পাপ বিনা সনকারি
হেমবর্ণ জগতের মাথা॥
তোতলা সর্ব্বেস্বরি নমো দেবী বিসহরি
মালদেবে যদি কর দয়া।
নট নাটে স্বরি ত্রিপুরাসুন্দরী
তুমা গোতি পদে দেহ ছায়া॥

৩০৪ পৃষ্ঠায় পুঁথি শেষ হইয়াছে, প্রতিপৃষ্ঠায় ৯টি করিয়া পংক্তি। তুলোট কাগজ একটু জীর্ণ হইয়া পড়িলেও সেহাই কালিতে লেখা পুঁথির অধিকাংশ অক্ষর খুব উজ্জ্বল, এবং প্রায় পুরা পুঁথিটির পাঠ অবিকৃত আছে। হাতের লেখা কিছু পুরাতন—দেড়শত-দুইশত বৎসরের প্রাচীন পুঁথির পুরাতন অক্ষরের মতো, কিছু কিছু আধুনিক অক্ষরও আছে। কারণ এ পুঁথি বাংলা ১২৫৩ সালে অর্থাৎ ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে নকল করা হইয়াছিল। পুঁথির পুষ্পিকাটি এইরূপ :

---

৫৫ সম্প্রতি ডঃ দাস পুঁথি দুইখানি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং আমরাও তাহা পরীক্ষা করিয়াছি।

ইতি মনসামঙ্গল সংপুর্ন্ন ॥ স্বাক্ষর শ্রীবিজয়গোবিন্দ সর্ম্মা ॥ সাঃ ভবানীপুর। পাঠহার্থ শ্রীবংসিবদন পাল। সাঃ ভবানীপুর ॥ জথাদৃষ্টং তথা লিখিতং দোষ নাস্তিক। ভিমস্বাপি রণভঙ্গে মনিনাঞ্চ মতিভ্রম। জত্নেন লিখিতং গৃন্থং জো হরেৎ মম পুস্তকং মাতা চ শুকুরি তস্ত পিতা তস্যচ গর্দ্দব। সন ১২৫১ সাল তারিখ ২৬ ভাদ্র রোজ সোমবার ১ একপ্রহর বেলা সমএ পাঠ সানে গৃন্থ সংপুর্ন্ন মিতি ॥

পঁুথিটির অধিকাংশ স্থলে তন্ত্রবিভূতির ভণিতা আছে; কিন্তু শেষাংশে জগজ্জীবন ঘোষালের ভণিতাও কয়েকবার লক্ষ্য করা গিয়াছে। পঁুথির মধ্যেও দুই-চারি বার জগজ্জীবনের ভণিতা ব্যবহৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে জগজ্জীবনের মুদ্রিত সংস্করণ ও তন্ত্রবিভূতির পঁুথির পাঠ মিলাইয়া আমরা যে তথ্যগুলি পাইয়াছি, এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিতেছি।

ডঃ সেন ও ডঃ দাস—দুই জনেই বলিয়াছেন যে, পরবর্তী কবি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলের অনেকটা তন্ত্রবিভূতির দ্বারা প্রভাবিত, কোথাও-বা জগজ্জীবন তন্ত্রবিভূতিকেই আত্মসাৎ করিয়াছেন—যেমন পরবর্তী কালে জীবন মৈত্রেয় জগজ্জীবনকে আত্মসাৎ করিয়াছেন।[৫৬]

পঁুথির পাঠ মিলাইয়া দেখা গিয়াছে যে, সম্পাদক ডঃ দাস এবং ডঃ সেনের এরূপ মন্তব্য অযৌক্তিক নহে। প্রথমতঃ পালাসন্নিবেশ উভয় কবির কাব্যেই প্রায় একরূপ। দ্বিতীয়তঃ, বর্ণনার ধারার মধ্যেও বিস্ময়কর সাদৃশ্য বর্তমান। কোন কোন স্থলে প্রায় প্রতিপংক্তিতে মিল আছে। তন্ত্রবিভূতির পঁুথির মধ্যে ভণিতার যে স্থলে জগজ্জীবনের উল্লেখ আছে, সেই অংশগুলি জগজ্জীবনের মুদ্রিতগ্রন্থের জগজ্জীবনের ভণিতায় মিলিতেছে—তবে জগজ্জীবনের মুদ্রিত সংস্করণে অনেক অতিরিক্ত পংক্তি আছে। কবির মুদ্রিত গ্রন্থে তন্ত্রবিভূতির রচনাও জগজ্জীবনের ভণিতায় চলিয়া গিয়াছে। কোন কোন অংশে জগজ্জীবনের বর্ণনায় কিছু বাহুল্য আছে। দুই কবির কাব্যের পংক্তির গুণাগুণ বিশ্লেষণ করিয়া মনে হইতেছে, জগজ্জীবনই তন্ত্রবিভূতিকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। কারণ তন্ত্রবিভূতি যাহা সংক্ষেপে সারিয়াছেন, তাহাকেই জগজ্জীবন ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া বিস্তারিত আকারে লিখিয়াছেন; ফলে কোন কোন স্থলে জগজ্জীবনের রচনার মধ্যে অপ্রাসঙ্গিকতা দোষ ঘটিয়াছে। মনসামঙ্গলের আদিরসের অংশগুলিতে তন্ত্রবিভূতি রং চড়াইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। যেমন প্রথম দিকে মহাদেবের

৫৬ জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল (ক. বি.), ভূমিকা, পৃ. ১

বীর্যক্ষয়, মনসার বিবাহে স্বামী জরৎকারুর মনসা ত্যাগ, লখিন্দর কর্তৃক মাতুলানী ধর্ষণ ইত্যাদি। এই অংশে তন্ত্রবিভূতি যথাসম্ভব বাকসংযম ও রুচির মুখ রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু জগজ্জীবন এইরূপ বর্ণনায় এমন মাতিয়া উঠিয়াছেন যে, মাত্রাজ্ঞান বিসর্জন দিয়া অশ্লীল বীভৎসতার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন। পূর্বসূরী অপেক্ষা উত্তরসূরীরা প্রায়ই কিছু অধিকতর কলকণ্ঠ হইয়া থাকেন। তাই বহুস্থলে জগজ্জীবনের বর্ণনা অনাবশ্যক দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর মনে হয়। দুই কবি একই অঞ্চলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া দুইজনের পুঁথিতেই নানা গণ্ডগোল পাকাইয়াছে। গায়েনদের দ্বারাই এই ব্যাপার আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা সাধারণ শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য বা নিজেদের বোধসৌকর্যের জন্য অনেক সময় একের পুঁথিতে অন্যের রচনা চালাইয়া দিয়াছেন। ফলে পুঁথিতে জগজ্জীবন নিজে যেমন তন্ত্রবিভূতিকে অনুসরণ করিয়াছেন, তেমনি লিপিকর ও গায়েনেরাও তন্ত্রবিভূতির অনেক রচনা জগজ্জীবনের পুঁথির সহিত মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। তন্ত্রবিভূতির পুঁথি সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। তাঁহার পুঁথিতেও জগজ্জীবনের রচনা নিতান্ত দুর্লভ নহে। জগজ্জীবনের কাব্য অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আকারে রচিত এবং জনরুচির প্রীতিকর আদিরসের অসংযত উল্লাস আছে বলিয়া গোটা উত্তরবঙ্গে এই কাব্য প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ববর্তী তন্ত্রবিভূতির কাব্য শুধু মালদহের কালিয়াচক থানা এবং হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্ভুক্ত গ্রামাঞ্চলে এখনও কথঞ্চিৎ প্রচলিত আছে।[৫৭] কিন্তু কাব্যবৈশিষ্ট্য গুণাগুণ, চরিত্রসৃষ্টি, আদিরসাত্মক সংযম প্রভৃতি আলোচনা করিয়া আমাদের স্পষ্ট ধারণা হইয়াছে যে, তন্ত্রবিভূতির রচনাশক্তি অনেক বেশী সংহত, ঋজুগতি। ভাষাবিন্যাসেও আমরা জগজ্জীবন অপেক্ষা তন্ত্রবিভূতিরই অধিকতর পক্ষপাতী। সর্বোপরি শালীনতা, লোকচরিত্রজ্ঞান ও বাস্তব চিত্রাঙ্কনে তন্ত্রবিভূতির কোন কোন অংশ মনসামঙ্গলের অনেক কবিকেই ম্লান করিয়া দিবে। ডঃ সুকুমার সেন মনসামঙ্গলের কবি বিপ্রদাসের অকুণ্ঠ জয়গান করিয়াছেন। কিন্তু তন্ত্রবিভূতির রচনারীতি, ঘটনাসন্নিবেশ ও অন্যান্য লিপিকৌশল বিপ্রদাস অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কাব্যটি মুদ্রিত হইলে পাঠকগণ কবির যথার্থ মূল্য বুঝিতে পারিবেন।

৫৭ জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল, ভূমিকা, পৃ. ১৲

তন্ত্রবিভূতি তাঁহার কাব্যের প্রায় সর্বত্র পুরা ভণিতা দিয়াছেন :

মন দিঞা শুন সভে মনসার গীত।
তন্ত্রবিভূতি গায় মনসাচরিত॥

'তন্ত্র' কথাটিকে তাঁতী অর্থে ধরিয়া ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করিয়াছেন "মনে হয় কবি জাতিতে তাঁতি ছিলেন, তাই ভণিতায় নিজেকে 'তন্ত্রবিভূতি বলিয়াছেন।"[৫৮] এই অনুমান একেবারে অমূলক বলিয়া মনে হয় না। কারণ মালদহের কালিয়াচক থানার চতুষ্পার্শ্বে (যেখানে তন্ত্রবিভূতির পুঁথি পাওয়া গিয়াছে) এখনও বহু তাঁতীর বাস। ইহাদের অধিকাংশ বৈষ্ণব, কিছু বা মুসলমান জোলা।[৫৯] অবশ্য উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে তন্ত্র ও শাক্ত ধর্মের প্রভাব আছে; কবি তন্ত্রমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া নিজেকে 'তন্ত্র' অর্থাৎ তান্ত্রিক বলিয়াছেন, এরূপ অনুমানও নিভ্রান্ত যুক্তিহীন নহে। উপরন্তু এই কাব্যে নানা পুরাণাদি গ্রন্থের এরূপ নিপুণ অনুকরণ আছে যে, কবিকে উচ্চতর সমাজের ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়।

তন্ত্রবিভূতি মনসাকে কখনও কখনও 'ব্রাহ্মণী ভোতল' বলিয়াছেন। কাব্যের প্রারম্ভে দেবখণ্ডের বর্ণনা একটু অভিনব; শিব স্বয়ং ধর্মপূজা করিতে গিয়া মনসার জন্ম দিলেন, মনসা পাতালে গিয়া চতুর্ভুজ শরীর ও সর্পভূষণ লাভ করিলেন। তারপর শিব কন্যাকে বাড়ী আনিয়া কিরূপ দুর্ভোগ ভুগিলেন তাহার বিচিত্র বর্ণনা কবি রসাইয়া রসাইয়া বলিয়াছেন। তার পরের কাহিনী এইরূপ : দুর্গা-মনসার বিবাদে মনসা কর্তৃক দুর্গাকে দংশন, দুর্গার নির্বন্ধাতিশয্যে শিবের মনসাকে বনে পরিত্যাগ, মনসার রাখালদের নিকট পূজা গ্রহণ, মনসার রূপ দেখিয়া ব্রহ্মার আত্মবিস্মরণ, ফলে বিষের জন্ম—ব্রহ্মা সেই বিষ সর্বত্র পাঠাইয়া দিলেন। সমুদ্র-মন্থনে বিষের উৎপত্তি, শিব কর্তৃক এক বিন্দু বিষপান ও মূর্চ্ছা, মনসা কর্তৃক পিতার প্রাণ রক্ষা—অতঃপর শিবের বরে মনসা দেবীরূপে গণ্য হইলেন। পরে মনসার সঙ্গে জরৎকারুর বিবাহ, মনসাকে ব্যাঙ ধরিয়া খাইতে দেখিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া মুনির প্রস্থান, যাইবার সময় মনসাকে পুত্রবর প্রদান,—অতঃপর কলিতে পূজা প্রচার করিতে গিয়া মনসার সঙ্গে চাঁদসদাগরের

৫৮ ডঃ সুকুমার সেন—বাং সা. ইতি. ১ম (পূর্বার্ধ)
৫৯ ডঃ দাসের নিকট এ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি।

বিরোধ, চাঁদের প্রথম পাঁচপুত্র, পরে আর একপুত্র—মনসার রোষে মোট ছয়পুত্রের জীবনান্ত, মনসার নির্দেশে তাড়কা রাক্ষসী মৃতদেহগুলিকে শুকাইয়া রাখিল, চাঁদের নৌকাডুবি, বেহুলা লখিন্দরের জন্ম,—লখিন্দর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও চাঁদ পুত্রের বিবাহ দিলেন না, কারণ তিনি জানিতেন বিবাহ বাসরে লখিন্দরের সর্পদংশনে প্রাণ যাইতে পারে। তখন নবীন যুবক লখিন্দর হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া মাতুলানীর সম্ভ্রম বিনষ্ট করিল। বাধ্য হইয়া চাঁদ পুত্রের বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। ইহার পর ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের ভাষায়, "প্রাপ্ত পুঁথিতে কাহিনীর উল্লেখযোগ্য স্বতন্ত্রতা নাই।" দেবখণ্ডে একটু আধটু বৈচিত্র্য আছে বটে, কিন্তু কবি জগজ্জীবন ঘোষালের মতো তিনি আদিরসকে প্রাধান্য না দিলেও, কোন কোন স্থলে দেহঘটিত কথা একটু খোলাখুলিভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। মধ্যযুগের সাহিত্যে রতিরঙ্গ বর্ণনায় কবিরা বড় একটা কৃপণতা করিতেন না। মনসামঙ্গলেও সেই রীতিপ্রথা অনুসৃত হইয়াছে। ভারতীয় মনের কাছে আদিরস অশুচি বা ঘৃণ্য নহে। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে যেমন লৌকিক রতিকে সূক্ষ্মতম উজ্জ্বলরসে পরিণত করা হইয়াছে, কিঞ্চিৎ পরিমাণে লোকজীবনাশ্রয়ী মঙ্গলকাব্যে ও শিবায়নে তাহা হয় নাই। তাই তন্ত্রবিভূতির কাব্যে শিব ধর্মপূজার জন্য ফুল তুলিতে গিয়া শক্তিক্ষয় করিলেন, ফলে মাংসপিণ্ডরূপে মনসার জন্ম হইল। ব্রহ্মার সঙ্গে মনসা যখন সাগর পার হইতেছিলেন, তখন পিতামহ চতুর্মুখও অনুরূপ দুর্বলতার পরিচয় দিয়া ফেলিলেন। ফলে গরলের সৃষ্টি হইল, মনসা বেশ পরিধান করিতে গিয়া বিবস্ত্রা হইয়া পড়িলেন, ইত্যাদি বর্ণনা এবং নবকিশোর লখিন্দর কর্তৃক মাতুলানী দূষণের মতো কদাচারকেও কবি বর্ণনা করিতে কোন কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। যাই হউক এ কাব্য যে একজন শক্তিশালী কবির সৃষ্টি তাহা অস্বীকার করা যায় না। কবির পরিচ্ছন্ন বর্ণনার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। পদ্মাবতী মনসার জন্মের পর :

পদ্মপত্রে জন্ম তার নাম পদ্মাবতি।
তে কারণে পদ্মপত্রে করিলা বসতি ॥
* * *
বাপ ২ বোলি ডাক পাড়ে ঘনে ঘন।
শুনি সঙ্করের সঙ্কোচিত মন ॥

সঙ্গে না আনই মোর কার্তিক গণপতি।
বাপ ২ বোলি ডাক ডাকে কোন জাতি॥
বিধির ঘটনা ছিল দৈবের স্থষ্টী।
মনসার দিগে সিবের পড়্যা গেল দৃষ্টী॥
ফিরা না দেখহ মোরে সঙ্কর আতাই।
তোমার ঝি হই আমি নাম মনশাই॥
তোমার তেজেতে জন্ম নাম পদ্মাবতি।
দশ দণ্ড মধ্যে মোর হইল আকৃতি॥

তখন মনসা পিতা শিবের সহিত কৈলাসে যাইয়া 'সত্যের সতাই' দেখিতে চাহিলেন। কিন্তু দুর্গার ভয়ে ভীত মহাদেব নবজাতা কিন্তু পূর্ণযৌবনা মনসা-কন্যাকে কৈলাসে লইয়া যাইতে সঙ্কুচিত হইলেন :

তোমাকে বোলিএ আমি না জাইহ ঘর।
ঘরে দুর্গা আছে মোর বড়ই প্রখর॥
আমার বাক্য শুন মা ব্রহ্মাণী তোতল।
তুমি গেলে হবে মা ই ছন্দ কোন্দল॥
জখন বোলিবে দুর্গা কুচ্ছীত বচন।
সহিতে নারিবে তুমি করিবে ক্রন্দন॥

কিন্তু মনসা বাপের সঙ্গে কৈলাসে হাজির হইলেন। তাঁহার সন্ধান পাইয়া সন্দেহপরায়ণা ও কোপনস্বভাবা দুর্গা শিব-কন্যাকে যথেষ্ট 'কুচ্ছীত বচন' বলিয়া 'হেনস্থা' করিলেন :

স্থন বেটী দুষ্টমতি　　　বাপ লঞা কর রতি
কাহাকে বোলহ তুমি বাপ॥

কিন্তু করুণরসের বর্ণনায় কবির আন্তরিকতা স্বীকার করিতে হইবে। ষষ্ঠপুত্র সর্পাঘাতে মারা গেলে সনকার ক্রন্দন অন্তর স্পর্শ করে :

স্থনিঞা চান্দোর কথা　　　কান্দে সোনা হানে মাথা
ভুমে পরে অঙ্গ আছারিঞা।
তন্ত্রবিভূতি কবি　　　বলে মা মনসাদেবি
দ্বিজমুনি অস্তিকের মাতা॥
ছয় পুত্র খায় সাপে　　　কান্দে সোনা অনুতাপে
ভুমে পরে পুত্র ২ বলি।
মস্তকে মারএ ঘায়　　　কারয়ে করুণ রায়
হায় পুত্র কুলপালি বোলি॥

তুমি পুত্র গুণবান   অতিশয় পুণ্যবান
তোমাক দংসিল পদ্ম নাগে।
বড়ই ভরসা ছিল   কুলপানি পুত্র রহিল
বিধি দুঃখ লেখিল এই ভাগ্যে ॥

চাঁদসদাগর স্ত্রীর কাছে লখিন্দরের যোগ্য বধূ বেহুলার রূপ বর্ণনা করিতেছেন :

শুন ২ সনকা বধূর রূপগুণ।
সকল সুন্দর কথা সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥
বাহু মৃণাল যেন দেখিতে সুন্দর।
মুখপদ্ম দেখ জেন দুতিয়ার চন্দ্র ॥
নয়ন কটাক্ষ জেন দেখিতে সুঠাম।
নাসা দিঘল জেন গরুড় সমান ॥
চাপার পাঁখড়ি জেন কন্যা সর্ব্ব গায়।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত জেন সুন্দর হাতপায় ॥
ত্রিভুবনের রূপ দিঞা সৃজিল গোঁসাই।
ত্রিভুবনের রূপের তুলনা দিতে নাই ॥

লখিন্দরের বিবাহে সমাগতা নারীগণের পতিনিন্দার একস্থল বেশ কৌতুকজনক। এক স্ত্রী তাহার অলস স্বামী সম্বন্ধে বলিতেছে :

আর যুবতি বোলে কথা মিথ্যা নহে তোর।
মুঞি হেন সুন্দরি নারি কুজা ভাতার মোর ॥
সকল দিন বুঞা থাকে খাবার বেলা লড়ে।
চিত করা্যা সুতাইলে কাত হৈঞা পরে ॥

টাকাকড়ির বর্ণনায় কবি বেশ আধুনিক মনের পরিচয় দিয়াছেন :

এই করি[৬০] মাতাপিতা   এই করি জন্মদাতা
এই করি সয়ন সংহতি ॥
এই করি আছে জার   সংসারে বান্ধব তার
করি বর হয় সর্ব্বধন।
সংসার মোহিনি কাম   করি বর অনুপাম
নিকরিঞা নিস্ফল জীবন ॥
এই (যদি) দিতে পারি   সাজি আইসে পরনারি
জাতিকুল না করে বিচার।

---

৬০ অর্থাৎ কড়ি।

জার নাহি করি ধন　　　পুর নহে পুত্রগণ
নিজ নারি না দেয় শৃঙ্গার ॥
করি জগতের মুল　　　করি রাখে জাতিকুল
সঙ্কটে করেন পরিত্রাণ।
এই করি আছে জার　　　সাফল জিবন তার
কোরি হৈলে হয় মহাজ্ঞান ॥

সংক্ষেপে বর্ণিত দশ-অবতার চিত্রও উল্লেখযোগ্য :

মিনরূপে কৈল চারি বেদের উদ্ধার ॥
কুম্ভরূপে লেখিল দেব চক্রপাণি।
তার পৃষ্ঠেতে মনাই লেখিল ধরনি ॥
বরাহ রূপেতে পৃথি দন্তেল ধরিল।
নরসিংহ রূপে হিরণ্যকস্যপু বিদারিল ॥
বলি ছলিল হরি বামন রূপ হৈঞা।
প্রষুরাম রূপে হরি নিখেত্রি করিঞা ॥
স্রিরাম রূপেতে হরি রাবণ বধিঞা।
অসোক বন হৈতে সিতা আনিল উদ্ধারিঞা ॥
বেদরূপে লেখে আর কল্কি অবতার।
লিখন কড়িল মনাই ই দস অবতার ॥

লখিন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু হইলে চাঁদসদাগর সনকাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন :

সোনকা প্রবোধ চান্দো বোলেন বচন।
পুত্রের কারণে সোক কর অকারণ ॥
ভাল হৈল মৈল পুত্র বালা লখিন্দর।
নিধনিয়ার ঘরে চোরের নাহি ডর ॥
ডাল গেল পাত গেল মুল হৈল সার।
কানি বেড়ায় ডালে ডালে চান্দো মহাবির ॥
মোর ভাগ্যে মৈল পুত্র বালা লখিন্দর।
কানির সঙ্গে গেল মোর বাদ বা দাস্তর ॥

এই সামান্য উদ্ধৃতি[৬১] হইতে তন্ত্রবিভূতির কাব্যশক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। পরবর্তী কালের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের উপর যে সমস্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্য আরোপিত হইতেছে, তাহার অনেকটা যে তন্ত্রবিভূতির প্রাপ্য

৬১ এই উদ্ধৃতিগুলি আমাদের সংগৃহীত পুঁথি হইতে দেওয়া হইয়াছে।

তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল যে নূতনত্ব পরিলক্ষিত হয়, তাহার প্রথম সূচনা করেন তন্ত্রবিভূতি। এই জন্য সপ্তদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গল কাব্যের বিবর্তন ইতিহাসে তন্ত্রবিভূতির কাব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জগজ্জীবন ঘোষাল ॥

তন্ত্রবিভূতির কাব্য সমন্ধে সম্প্রতি কিছু কিছু তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি জগজ্জীবন ঘোষাল অনেক পূর্ব হইতেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার রচনার একটা বড় অংশ তন্ত্রবিভূতির রচনার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও ভাষারীতি, প্রকাশভঙ্গিমা, ঘটনা, চরিত্র আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা অত্যন্ত অসতর্ক পাঠকেরও দৃষ্টি এড়াইবে না। ডঃ আশুতোষ দাস ও শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল (১৯৬০) প্রকাশিত হইবার পূর্বে সাধারণ পাঠকে এই কাব্যের সঙ্গে পরিচিত না হইলেও সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ ইহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মোটামুটি অবহিত ছিলেন।[৬২] ডঃ সুকুমার সেনই সর্বপ্রথম কবির কাব্য লইয়া আলোচনা করেন।[৬৩] কয়েক-বৎসর হইল কাব্যটি সুসম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হওয়ায় কবি ও কাব্যের পরিচয় গ্রহণ সহজ হইয়াছে। ইতিপূর্বে জগজ্জীবনের পুঁথি সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যামোদীরা অবহিত থাকিলেও তাঁহার পুরাপুঁথি সংগ্রহ করিয়া মুদ্রণের চেষ্টা সম্প্রতি দেখা দিয়াছে। জলপাইগুড়ির স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য জগজ্জীবনের একখানি খণ্ডিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশ-গুপ্ত মহাশয়কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করেন। কিছুদিন পরে ডঃ দাশগুপ্ত শুনিলেন যে, ডঃ আশুতোষ দাস মহাশয়ও জগজ্জীবনের প্রাচীনতর ও পূর্ণাঙ্গ পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। তখন তাঁহার উপদেশে সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ডঃ আশুতোষ দাসের যুগ্মসম্পাদনায় ডঃ

৬২ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ২য় ; সাহিত্য ১৩১০

৬৩ সুকুমার সেন,—বা. সা. ইতি, ১ম খণ্ড (১ম সংস্করণ, ১৯৪০)

দাসের পুঁথির পাঠ অবলম্বনে (পরিশিষ্টে অন্য পুঁথির পাঠান্তর সহ) জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল প্রকাশিত হইয়াছে।

জগজ্জীবন গ্রন্থের মধ্যে অনেক স্থলে নিজের পরিচয় দিয়াছেন ; এই সঙ্কেত হইতে সন তারিখ পাওয়া না গেলেও মোটামুটি কবিপরিচয় পাওয়া যায়।[৬৪] ইহাতে দেখা যাইতেছে, কবি জগজ্জীবন ঘোষালবংশে দিনাজপুরের কুচিয়ামোড়া গ্রামে (এখন পূর্ণিয়া জেলার মধ্যে[৬৫] মহারাজ প্রাণনাথের গ্রামে) জন্মগ্রহণ করেন। জয়ানন্দ কবির পিতামহ, পিতার নাম রূপ রায়চৌধুরী, মাতা—রেবতী, ভ্রাতা—ঘনশ্যাম। কবির স্ত্রীর নাম পদ্মমুখী। কবি মনসার স্বপ্নাদেশে এই কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি কবে রচিত হইয়াছিল, তাহার কোন নির্দেশ বা সন-তারিখের উল্লেখ পুঁথিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং অনুমানের আশ্রয় লইতে হইবে। ডঃ দাস বলিয়াছেন যে, 'রাজ্যোপাখ্যানে' (নরখণ্ড, ১২শ অধ্যায়) দিনাজপুরের মহারাজা (কান্তনগরের জমিদার) প্রাণনাথের সময় ধরিয়া এবং মতানৈক্যের অবসর রাখিয়া মনে হয়, কবির কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত হইয়া থাকিবে। ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন, জগজ্জীবনের একটি পুঁথির লিপিকাল ১১০৩ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৬৯৬ খ্রীঃ অব্দ। অর্থাৎ জগজ্জীবনের কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেও রচিত হইতে পারে।[৬৬] কবির গ্রামের জমিদার ১৬৪৭ খ্রীঃ অব্দে জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং ডঃ সেনের অনুমানই ঠিক। আরও একটা কথা—পূর্বোল্লিখিত সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য যে খণ্ডিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার প্রারম্ভে ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাসের

---

৬৪ (ক) চৌধুরী রূপরায় সর্বদেশে গুণ গায়
জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।
তার পুত্র ঘনশ্যাম তার কনিষ্ঠ অনুপম
বিরচিত জগৎ জীবন॥

(খ) ব্রাহ্মণ ঘোষাল খ্যাতি কুচিয়ামোড়ে বসতি
প্রাণ মহামহী পতির দেশে।
জগৎ জীবন গায় বান্দিয়া অবলার পায়
কবি দুর্বাচন্দ্র পতির আদেশে॥

৬৫ প্রাণনাথ ১৬৮৭ খ্রীঃ অব্দে রাজা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র ১৭২২ খ্রীঃ অব্দে জমিদারী পাইয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য—ব. সা. প. পত্রিকা, ২য়

৬৬ ড: সুকুমার সেন, ঐ গ্রন্থ (১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৭৮৪)

উল্লেখ আছে।[৬৭] হয়তো জগজ্জীবনের লিপিকারগণ ক্ষেমানন্দের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া গোড়ার দিকে তাঁহাকে শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন। কিন্তু কেতকা-দাসের পরে যে জগজ্জীবনের কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া আমাদের অনুমান, জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে—একেবারে শেষের দিকেই রচিত হওয়া সম্ভব।

জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল অন্যান্য প্রধান মঙ্গলকাব্যের মতো দেবখণ্ড ও বানিয়াখণ্ড—এই দুইভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে, ডঃ দাসের মতে, তন্ত্রবিভূতির দেবখণ্ডের সঙ্গে জগজ্জীবনের দেবখণ্ডের বিশেষ পার্থক্য আছে। কবি বাণিয়া-খণ্ডেই তন্ত্রবিভূতিকে বিশেষভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। মতের দিক হইতে তিনি শক্তির উপাসক ছিলেন—যদিও কাব্যের একস্থলে চৈতন্য অবতারের উল্লেখ আছে।

দেবখণ্ডের প্রথমে কবি ধর্মমঙ্গল ধরণের সৃষ্টি লীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যখন চারিদিকে নিঃসীম নিরবয়ব শূন্যতা তখন সেই নেতি হইতে অনাদি ঈশ্বর আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টি করিলেন :

অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বটপত্রের উপর।
জলমধ্যে ভাসে দেব অনাদি ঈশ্বর ॥

এই অনাদি ঈশ্বরই নিরঞ্জন। নিরঞ্জন তাঁহার চারি ভ্রাতাকে সৃষ্টি করিতে বলিলে ধর্মের উৎপত্তি হইল। ভ্রাতা অনিলের উপদেশে ধর্ম ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাস হইতে সৃষ্টি হইল মনসার। কন্যার রূপে আসক্ত হইয়া ধর্ম তাহাকেই বিবাহ করিলেন, বিবাহের রাত্রে স্ত্রীসম্ভাষণের পর ধর্ম মনসাকে ত্যাগ করিয়া পলাইলেন এবং গলিত শবের আকারে ভাসিতে ভাসিতে তপস্যারত ব্রহ্মা-বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলেন। শিব ধ্যানে ধর্মকে পিতা বলিয়া চিনিতে পারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে ধর্মের চেতনা হইল। তিনি পুত্র মহাদেবকে বলিলেন যে, চিন্তার কারন নাই, ধর্মই মৃত্যুর পর শিবের অঙ্গে স্থান পাইবেন এবং শিবকে জানাইলেন, "মনসা কামিনী হবে তোমার ঘরণী।" ধর্ম প্রথমে কন্যা মনসাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং শিব সেই মাতৃস্থানীয়া মনসাকেই

৬৭ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (৩য় সংস্করণ)

বিবাহ করিবেন। ধর্মের দেহের দাহকার্য করা হইলে মনসাও সেই চিতায় প্রাণত্যাগ করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই চিতাতেই শিশুকন্যা হইয়া জন্ম লইয়া কাঁদিতে লাগিলে ব্রহ্মার যুক্তি অনুসারে তাঁহাকে মঞ্জুষায় করিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। হেমন্ত ঋষি সেই মঞ্জুষা ধরিয়া নবজাত কন্যাটিকে নিজ স্ত্রীকে লালন পালন করিতে দিলেন। দ্বিতীয় জন্মের পর মনসার নাম হইল গৌরী; তিনি হেমন্ত ঋষির কন্যারূপে পরিচিত হইয়া ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। এদিকে শিব "কামিনী অভাবে কাতর প্রাণ।" যুবতী গৌরী শিবের তপস্যায় ফুল জোগাইতে লাগিলেন। একদা শিব গৌরীকে দেখিয়া বিবাহ করিতে চাহিলেন, সখীদের সাহায্যে উভয়ের গান্ধর্ব বিবাহ হইল, যথারীতি হরগৌরী দাম্পত্যনিশি যাপন করিলেন। এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া হেমন্ত ঋষি কন্যার চরিত্রে বিশেষ সন্দিহান হইলেন এবং চরিত্রের বিশুদ্ধি প্রমাণের জন্য অষ্ট পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। পরীক্ষাগ্রহণ করিয়াও হেমন্ত ঋষি কন্যার উপর সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তিনি মনে করিলেন 'কয়ালী' (কাপালিক) শিব গৌরীকে কোন মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন—তাই গৌরী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। শিব এদিকে কয়ালীর ছদ্মবেশে গৌরীর অঙ্গ স্পর্শ লাভ করিলে হেমন্ত ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া ছদ্মবেশী শিবকে কাঠের ঘরে বন্দী করিয়া রাখিলেন। কিন্তু ঋষি ইষ্টদেবতা শিবের চরণে যত ফুল দিলেন, সমস্তই বন্দী কয়ালীর পায়ে আসিয়া পড়িল। তখন ঋষি বুঝিলেন, ছদ্মবেশী কয়ালীই মহাদেব—তাঁহার ইষ্টদেবতা। ইহার পরের ঘটনা গতানুগতিক—হরগৌরীর বিবাহ, গঙ্গাগৌরী কোন্দল, শিবের রাগ করিয়া পুষ্পবনে যাত্রা, পথিমধ্যে বিদ্যাধরীদিগকে জলক্রীড়া করিতে দেখিয়া আত্মবিস্মৃত শিবের মনোবিকার এবং মনসা-বিষহরীর জন্ম,[৬৮] নিজ কন্যাকে দেখিয়া কামোন্মত্ত মহাদেবের অনুচিত অভিলাষ, মনসার বাধাদান, শিব কর্তৃক গোপনে মনসাকে নিজ নিকেতনে আনয়ন—তারপর গৌরীর সঙ্গে কলহ হইতে পরবর্তী বাণিয়াখণ্ডের ঘটনায় অল্প-স্বল্প পার্থক্য ও নূতনত্ব থাকিলেও মোটামুটি ঘটনা ও চরিত্রে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য

৬৮ কবি মনসাকে তিন জন্ম গ্রহণ করাইয়াছেন। প্রথমে মনসা ধর্মের কন্যা ও পত্নী, পরের জন্মে ধর্মের পুত্র শিবের ঘরণী গৌরী। এই জন্মেই মনসা বিষহরীর শিবের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। কবি মনসা নামটিকে তিনবার ব্যবহার করিয়া ঘটনা, লোকাচার ও পারিবারিক চারিত্রনীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন।

দৃষ্টিগোচর হয় না। শুধু একস্থলে একটু নূতনত্ব আছে। লখিন্দর বিবাহ-যোগ্য হইলেও তাহার মাতা তাহার বিবাহ দিতে চাহেন না :

সনকায় বোলে ই কথা না কহিয় বাপ।
বিভা রাত্রিতে বাছা খাইবে কালসাপ॥

অথচ লখিন্দরের সঙ্গে বেহুলার (ঊষা ও অনিরুদ্ধ) বিবাহ না হইলে মনসার মহিমা প্রচার হয় না। তখন বিষহরী কামসোনা অপ্‌সরাকে নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন লখিন্দরের মাতুলানী কৌশল্যার বেশে স্বপ্নে লখিন্দরের সঙ্গে মিলিত হইয়া বণিকনন্দনকে কামোত্তেজিত করে। তাহাই হইল। উত্তেজিত লখিন্দর কামোন্মত্তচিত্তে মাতুলানীর তীব্র বাধা দান সত্ত্বেও অগম্যা গমন করিল। সনকা এই সংবাদ জানিয়া কৌশল্যাকে কোনও প্রকারে নিরস্ত করিয়া স্বামীর কাছে গিয়া পুত্রের কুকীর্তি বলিয়া দিয়া শীঘ্র বিবাহ দিতে অনুরোধ করিল। এই ব্যাপারে "চম্পলাপতি হেট কৈল মাথা।" বাধ্য হইয়া চন্দ্রধর পুত্রের বিবাহ দিতে অঙ্গীকার করিলেন :

সাধু বোলে পুত্র যদি করে অনাচার।
বিভা দিব পুত্রকে করিলাম অঙ্গীকার॥

চাঁদ যাহাতে বাধ্য হইয়া পুত্রের বিবাহ দেন, এইজন্য কবিকে অগম্যাগমনের মতো কুৎসিত ঘটনার অবতারণা করিতে হইয়াছে।

কবির বাণিয়াখণ্ডের চরিত্রে অন্যান্য মনসামঙ্গল কাব্য অপেক্ষা বিশেষ কোন নূতন বৈশিষ্ট্য নাই। বেহুলার একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য, চাঁদের প্রচণ্ড বিরোধী মনোভাব, পরে আবার ভক্তির আতিশয্য, সনকার স্নেহব্যাকুলতা প্রভৃতি বর্ণনা প্রায় গতানুগতিক। কবি মানবমানবীর চরিত্র বর্ণনায় অনেক সময় স্নিগ্ধকোমলতা রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার কাব্যে ঘরোয়া সুর মন্দ হয় নাই। উত্তরবঙ্গের স্থানীয় জীবনচিত্র, পরিবেশ, সমাজের ভাষা; রীতিনীতির প্রভাব এই কাব্যে বেশ স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। এই জন্য কাব্যটির একটি আঞ্চলিক মূল্য আছে। তবে দেবদেবীর চরিত্র বর্ণনায় তিনি যেন রোখ করিয়া গ্রাম্য, পাশব ও অনাগরিক রুচির আশ্রয় লইয়াছেন। যে ভাষায় কন্যা মনসা ও বিমাতা দুর্গা কলহ করিয়াছেন তাহা মানবীর জিহ্বাতেও উচ্চারিত হয় না। যথা :

পদ্মা বোলে মাতাই না বোল আর মন্দ।
আমি বলিলে পাছে হইবে বড় দ্বন্দ্ব॥
দুর্গা বোলে কি বলিলে ঢেট মুন্নদারী।
তোর মত নই আমি ঢেমন ভাতারী॥
পদ্মা বোলে কহিলে উকুটা যায় যার।
তোর মত নহি আমি অসুর ভাতার॥
দুর্গা বোলে অসুর মারিলু বাহুবলে।
তুই যেন ধরিলি গিয়া বাপের আঁচলে॥

এ ভাষা পণ্যারমণীদের পল্লী হইতে ছাঁকিয়া লওয়া হইয়াছে। তাঁহার কাব্যে আদিরস বহুস্থলে গাঁজাইয়া উঠিয়া কটুগন্ধ তালব্যরসে পরিণত হইয়াছে। দেহসম্ভোগের খোলাখুলি বর্ণনার জন্য এ কাব্য ততটা অপাঠ্য নহে; অশুচি ঘৃণ্য, অমনুষ্যোচিত রিরংসা ইহার কোন কোন অংশকে কুৎসিত 'পর্ণোগ্রাফি'তে পরিণত করিয়াছে। ইতিপূর্বে দেবখণ্ডে তিনি ধর্ম ও তাঁহার কন্যা মনসার দাম্পত্যলীলার মনস্তাত্ত্বিক নির্লজ্জ বর্ণনা দিয়াছেন, প্রথম সাক্ষাতে মহাদেব ও দুর্গার গান্ধর্ববিবাহের বর্ণনায় তিনি এমন বে-আব্রুভাবে মিলন বর্ণনা করিয়াছেন যে, মনস্তত্ত্ব ও কামশাস্ত্র অনুসারে সে বর্ণনায় মুন্সিয়ানা থাকিলেও ভারতচন্দ্রের মতো সূক্ষ্ম কারুকার্যের দ্বারা অমসৃণতাকে ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন নাই। এই সমস্ত দুর্নীতিপূর্ণ অশালীন রিরংসার অনাবৃত বর্ণনাকে পুরাপুরি তন্ত্রের প্রভাব বলিয়া লঘু করা যায় না।[৬৯] দেহঘটিত আদিরসের বর্ণনাকে ভারতবর্ষ কোনদিনই অশ্লীল বা অপরাধ বলিয়া ঘৃণা করে নাই। কিন্তু অগম্যাগমনের অপরাধ ভারতের নীতিশাস্ত্রে ক্ষমার অযোগ্য মহাপাপ। ব্রাহ্মণকবি জগজ্জীবন দুর্নীতিপূর্ণ

৬৯ এবিষয়ে ডঃ আশুতোষ দাসের মন্তব্য—"তন্ত্রভাবাভিষিক্ত মননের ফলেই মঙ্গলকাব্যে এই জীবনধর্মিতা ও পঞ্চোৎসবের আনন্দে আপেক্ষিক অশ্লীলতা" (সুরেন্দ্রনাথ কলেজ পত্রিকা, ১৯৬২-৬৩, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের রসসূত্র')। এই জাতীয় কামক্লিন্ন বর্ণনাকে তিনি জগজ্জীবনের কাব্যের ভূমিকায় 'লোকায়ত' রতি বলিয়াছেন। খোলাখুলি রিরংসার বর্ণনা কিয়দংশে লোকায়ত জীবনের অনুকূল, তাহা সমাজতাত্ত্বিকগণ সমাজবিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝিবেন। কিন্তু জগজ্জীবনের বর্ণনায় লোকায়ত বা লোকরুচির প্রভাব থাকিলেও তাঁহার নিজের রুচিও এবিষয়ে তাঁহাকে অনেকটা সাহায্য করিয়াছে। কারণ আপত্তিকর বর্ণনাগুলি রচনাকৌশলের দিক হইতে নিন্দনীয় নহে—কবি যেন এই বর্ণনায় নিজেরই প্রবৃত্তির নিক্রিয় তৃপ্তি খুঁজিয়াছেন।

অশ্লীল বর্ণনায় অত্যন্ত পুলক বোধ করিয়াছেন। দেবখণ্ডে প্রথমে ধর্ম ও তাঁহার কন্যা মনসার, দ্বিতীয়তঃ মহাদেব ও তাঁহার মাতৃস্থানীয়া মনসার (জন্মান্তরে নাম গৌরী) বিবাহ, এবং বাণিয়াখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো লখিন্দরের মাতুলানী দূষণ—ইত্যাদি বর্ণনা অতিশয় ঘৃণ্য। এই ব্যাপারকে 'জীবনধর্মিতা' বলিয়া বিনা প্রতিবাদে পরিপাক করাও দুরূহ। এই রূপ বর্ণনা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে দুষ্প্রাপ্য নহে, কিন্তু জগজ্জীবনের কাব্যে কুরুচিপূর্ণ বর্ণনা আরও তীব্র ও পূতিগন্ধময় হইয়াছে।

জগজ্জীবনের কাব্যে কলুষিত বর্ণনা থাকিলেও কাব্যকুশলতা বিচার করিলে এই কবি প্রশংসা দাবি করিতে পারেন। সংস্কৃত সাহিত্য, পুরাণ, অলঙ্কারশাস্ত্র প্রভৃতিতে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল, তাহার প্রমাণ তাঁহার কাব্যের মধ্যেই আছে। ছন্দ, শব্দপ্রয়োগ, এবং উপমাদি অলঙ্কার প্রয়োগেও তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি, বুদ্ধি ও মনন বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। পয়ার-ত্রিপদীতে তিনি অক্লেশে পাড়ি জমাইয়াছেন; ভাষায় উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক প্রভাব সত্ত্বেও বাক্‌রীতি বহুস্থলে তৎসম শব্দের অনুকূল। বেহুলা-সনকার বিলাপ এবং চাঁদের শুষ্ক কঠিন বেদনা প্রকাশের ভাষা যথোপযুক্ত হইয়াছে। 'হারামখোর'দের প্রসঙ্গে কবি দুই সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ সুকৌশলে ফুটাইয়াছেন। এতদিন এই কাব্য সাধারণ পাঠকের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না, এখন মুদ্রিত হওয়াতে ইহার মধ্যে অঞ্চলবিশেষের সমাজ-জীবনের বাস্তবচিত্র এবং মনসা-'কাল্‌ট'-এর অভিনব পরিচয় পাইয়া পাঠক-সমাজ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের নানা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারিবেন।

মনসামঙ্গলের কয়েকজন অপ্রধান কবি ॥

সমগ্র বাঙলাদেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার পূজা-উপাসনা ও ব্রত-অর্চনাদি চলিয়া আসিতেছে, বাঙলার প্রান্তীয় অঞ্চলে ভিন প্রদেশেও মনসার পূজা, বিশেষতঃ, বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী নানা আকারে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। এই প্রসঙ্গে হরিদ্বারের মনসা পাহাড়ের উপর মনসাদেবীর শ্বেতমন্দিরটির কথাও মনে পড়িবে। এই দেবীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও বাস্তব প্রয়োজনের যোগ রাখিয়া যেমন কয়েকজন শক্তিশালী কবি মনসার

পূজা প্রচার উপলক্ষে বেহুলা লখিন্দরের গল্প লিখিয়াছিলেন, তেমনি বাঙলা ও শ্রীহট্টে দুই একজন স্বল্পপ্রতিভাধারী আঞ্চলিক কবিও মনসার পাঁচালী, ব্রতকথা বা ভাসান লিখিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মনসামঙ্গলের অন্যতম প্রধান কবি ক্ষেমানন্দের নামে যেমন বহু ভাসান গান চলিতেছে, তেমনি বাঙলার উত্তর, পূর্ব ও উত্তরপূর্বাঞ্চলে অনেক কবি মনসার লীলামাহাত্ম্য রচনা করিয়া অঞ্চলবিশেষে অল্প কিছুকাল জনপ্রিয়তা রক্ষা করিয়াছিলেন। কাব্য হিসাবে ইঁহাদের রচনাগুলি সাহিত্যের মানমন্দিরে নিতান্ত অবজ্ঞার আসন অধিকার করিয়া আছে। কোন কোন কবির দুই একখানি ছেঁড়া পুঁথি সম্বল, কাহারও দুই একখানি পৃষ্ঠামাত্র উদ্ধার করা গিয়াছে। ইহার একটা প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য আছে, পুঁথির তালিকা-বিবরণীতে ইহাদের হিসাব থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সাহিত্য বিচারে ইহাদের কোন মূল্য নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে মনসামঙ্গলের অনেকগুলি কাব্য পাওয়া গিয়াছে বটে, তন্মধ্যে প্রধান কবিদের পরিচয় ইতিপূর্বে দেওয়া হইয়াছে। আরও দুই একজন—যেমন বিষ্ণুপাল, ষষ্ঠীবর দত্ত, কালিদাস, সীতারামদাস প্রভৃতি কবির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে বিষ্ণুপাল ও ষষ্ঠীবর দত্তের কাব্য সম্বন্ধে কেহ কেহ পূর্বেই কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গলের বিস্তারিত পরিচয় দিয়া ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় লুপ্তরত্নোদ্ধার করিয়াছেন—যদিচ রত্নটি কিঞ্চিৎ কর্দমলিপ্ত। ১৩০৭ সালের বীরভূমি পত্রিকায় (পৃ. ২৬৭) সর্বপ্রথম বিষ্ণুপালের পুঁথির কথা প্রচারিত হয়, এবং তাঁহার রচনা হইতে কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়। সেহাড়া গ্রামের এক ধীবরের বাড়ী হইতে পুঁথিটি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এ পর্যন্ত বিষ্ণুপালের মোট তিনখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে দুইখানি খণ্ডিত এবং একখানি প্রায় পূর্ণাঙ্গ পুঁথি[৭১]। পুঁথিতে কবির কোন পরিচয় নাই, সন-তারিখও নাই; এই পুঁথিগুলি বর্ধমান ও বীরভূমের কোন কোন অঞ্চল হইতে মিলিয়াছে। এখনও নাকি দক্ষিণ-পশ্চিম বর্ধমানে বিষ্ণুপালের পুঁথি মনসার পূজা ও ভাসানে ব্যবহৃত হয়।[৭২] কবি খুব সম্ভব রাঢ় অঞ্চলের লোক ছিলেন। ভাষাতে উত্তর-রাঢ়ের প্রচুর প্রভাব রহিয়াছে, সন-তারিখের অভাবে

৭১ এসিয়াটিক সোসাইটির ৬৯৯০ সংখ্যক পুঁথি।

৭২ ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ইতি. (১ম, অপরার্ধ)

ইহার রচনাকাল বা কবির আবির্ভাব কালের কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। ডঃ সেন ভাষা দৃষ্টে কাব্যখানিকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের রচনা বলিয়া মনে করেন। উত্তরবঙ্গের মাণিকদত্তের লঘুছন্দে রচিত রচনার কোন কোন অংশ কবি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাকে ষোড়শ শতাব্দীর কবি মাণিকদত্তের পরবর্তী বলিয়া বোধ হইতেছে।

এই সমস্ত মনসামাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্য, যাহা প্রধানতঃ রাঢ় অঞ্চলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত হইয়াছিল, তাহাতে ধর্মমঙ্গলের অনুরূপ সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। ইতিপূর্বে জগজ্জীবন ঘোষালের দেবখণ্ডে তাহার প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। বিষ্ণুপালের পুঁথির গোড়াতেও ধর্মমঙ্গলকাব্য ও ধর্ম-উপাসনা পদ্ধতির কিছু কিছু প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। হাসান-হুসেন পালা বর্ণনায় কবি মুসলমান সমাজের সুবিস্তৃত বাস্তবচিত্র অঙ্কন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। ভাষার মধ্যে রাঢ় বুলির সঙিনের খোঁচা ব্যতীত কাব্যটির বিশেষ কোন গৌরব নাই। মাঝে মাঝে কবি প্রহেলিকা জাতীয় যে সমস্ত পদ লিখিয়াছেন, সেগুলির কৌতুক ও অদ্ভুত রস প্রশংসনীয়। 'কুঁদুলিয়া' নারদের চিত্রটিও মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের একটি জীবন্ত চিত্র বলিয়া গৃহীত হইতে পারে :

ঢেঁকির সাজন করিতে নারদের গমন।
মুড়া ঝাঁটা বান্ধ্যো দিল বলিঞা লেঙ্গুর॥
পুরান তালাই দিল পালান ভিড়িঞা।
নেআলির দড়ি দিল কর‍্যানি বলিঞা॥
শামুকের খুলি দিল ঘুঙ্গুর বলিঞা।
পানা বিরমুল নিল শ্বেতচামর বলিয়া॥
দুদিকে দুখানি কুলা দিল রে বান্ধিয়া।
পক্ষরাজ ঘোড়া যাবে উধায় করিয়া॥
আলকুসির গুঁড়া নিল বগলে দাবিঞা।
ঢেঁকিতে চাপেন মুনি দুকাটি বজাঞা॥
যাত্রা করিঞা নারদ মুনি যায়।
মুনিদের ছেল্যাগুলি ইধুলি খেলায়॥
তাহাদের চুলে ধর‍্যা ঢেঁকিতে ঢুসায়।
মাঞী-বাপু কর‍্যা ছেলে ঘরকে পালায়॥

ঢেঁকিতে চড়িয়া আলকুশি গুঁড়া লইয়া গাজনের সঙের বেশে নারদের বিশ্ব-পরিক্রমা গ্রাম্য মনেরই উপযুক্ত হইয়াছে। অবশ্য করুণরসের স্থলে কবির ভাষার অক্ষমতা, ছন্দের ত্রুটি ও শব্দের দীনতা অনেকটা হ্রাস পাইয়া গিয়াছে। যেমন বেহুলার বিলাপ :

আমি মর্য়ে গেলে প্রভুর ঢের দাসী হব।
প্রভু মর্যো গেলে আমি অনাথিনী হব॥
তরুতে লতাতে দুটি রহিল বেড়িয়া।
দুমুখে রহিল রামা একমুখ হঞা॥

বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল নিতান্তই গ্রাম্য মন ও গ্রাম্য পরিবেশের জন্য রচিত হইয়াছিল। কাজেই ভাষার পরিপাট্য ইহাতে নাই বলিলেই চলে, রস-রুচিতেও কবি গ্রাম্যভাব ছাড়াইতে পারেন নাই, আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবের জন্য এ কাব্য সাধারণ পাঠক সমাজেও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। ইহার পুঁথির সংখ্যা বিরল। তবে কাহিনী গ্রন্থনে ও বাস্তবতা সঞ্চারে তাঁহার কৃতিত্ব উপেক্ষা করিবার মতো নহে।

ষষ্ঠীবর দত্তের মনসামঙ্গল[৭৩] বাঙলাদেশে বিশেষ প্রচলিত না থাকিলেও শ্রীহট্টে ইহার একাধিক মুদ্রণ হইয়াছে। কলিকাতা বটতলা হইতেও ইহার একটি মুদ্রিত সংস্করণ (১৩৪৫) প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার কাব্য শ্রীহট্টে বেশ জনপ্রিয় : মনসাপূজাদিতে এখনও তাঁহার কাব্য ভক্তিসহ পঠিত হয়। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মহাভারতের গঙ্গাদাস সেনের পিতা ষষ্ঠীবরের সঙ্গে মনসামঙ্গলের এই কবির গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। যদিও মুদ্রিত কাব্যগুলি বিশেষ নির্ভরযোগ্য নহে, তবু ইহা হইতে কবির আংশিক পরিচয় এবং কাব্যটির মোটামুটি স্বরূপ বুঝা যাইবে। শ্রীহট্টে নারায়ণদেব ও ষষ্ঠীবরের মনসামঙ্গল এখনও প্রচলিত আছে।

ষষ্ঠীবর যে শ্রীহট্টে কিরূপ জনপ্রিয় ছিলেন, তাহার প্রমাণ ঐ অঞ্চলে প্রচলিত যে কোন মনসামঙ্গলে ষষ্ঠীবরের বহু রচনা স্থান পাইয়াছে। ষষ্ঠীবরের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ কোন তথ্য জানিবার উপায় নাই ; নানা পুঁথি

---

৭৩ ষষ্ঠীবরের দুইখানি মুদ্রিত সংস্করণের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—(১) ষষ্ঠীবরের পদ্মাপুরাণ, বিরজাকান্ত ঘোষ সম্পাদিত, শ্রীহট্ট ১৩৩২, (২) ষষ্ঠীবরের পদ্মাপুরাণ—ফণীন্দ্রচন্দ্র দাস ও গিরিশ-চন্দ্র দাস সম্পাদিত, ১৩৪১

হইতে শুধু এইটুকু জানা যায় যে, এই শৈব কবি[৭৪] বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন—কয়েকখানি বৈদ্যকশাস্ত্র ও কুলপঞ্জিকা হইতে তাহাই অনুমিত হয়। তাঁহার পূর্বপুরুষ বল্লালসেনের আমলে স্বদেশ রাঢ় ভূমি ত্যাগ করিয়া শ্রীহট্টের মৌলবীবাজার মহকুমার অন্তর্গত গয়গড় গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার পিতার নাম ভুবনানন্দ, পিতামহের নাম পুরুষোত্তম। জ্যেষ্ঠভ্রাতা হৃদয়ানন্দ। কবির মধ্যে কাব্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উল্লেখ আছে, কোথাও কোথাও তাঁহার ভণিতাও আছে। বৈদ্যশাস্ত্রের ষষ্ঠীবর ও কবি ষষ্ঠীবরকে যাঁহারা একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন কুলপঞ্জিকার প্রমাণ। কিন্তু কাব্যের মধ্যে কবির কোথাও এরূপ উল্লেখ নাই। অবশ্য শ্রীহট্টের স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে কবিকে গয়গড় অধিবাসী বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার পদ্মা-পুরাণ রচনা সম্পর্কে অনেক গল্প এখনও শ্রীহট্টে প্রচলিত আছে। তিনি নাকি গুণরাজ খাঁ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন—যদিও মনসামঙ্গলের কোথাও সেরূপ উল্লেখ নাই। কেহ কেহ তাঁহাদের অধস্তন পুরুষদের নিকট রক্ষিত বংশলতিকা হইতে মনে করেন—কবি সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কেহ-বা এ সমস্ত প্রমাণের উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া পুঁথির ভাষা দেখিয়া মনে করেন, কবির কাব্য অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে—ভারতচন্দ্রেরও পরে, সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল।[৭৫] কারণ মুদ্রিত কাব্যের ভাষায় প্রাচীনত্বের বিশেষ কোন চিহ্ন নাই, বরং কোথাও কোথাও ভারতচন্দ্রের ভাষারীতির অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। ডঃ সেনের এ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। কারণ ষষ্ঠীবরের যে কয়খানি পুঁথি শ্রীহট্ট হইতে মুদ্রিত হইয়াছে তাহার ভাষাতে অত্যন্ত উৎকট আধুনিকতা প্রবেশ করিয়াছে। যথা :

শ্রীহট্টের দত্তগ্রাম হয় ষষ্ঠীবর ধাম
মাতৃদেবী অতি পুণ্যশীলা।
তার গর্ভে জনমিয়া পদ্মাপুরাণ বিরচিয়া
দত্তবংশ কীর্তি প্রকাশিলা॥

এ ভাষা প্রাচীন নহে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও দেখিয়াছেন যে, ষষ্ঠীবরের পুঁথিতে বিকৃত ও প্রাদেশিকতা দুষ্ট শব্দ আছে, ফলে ইহা শ্রীহট্টের বাহিরের

৭৪ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, (৩য় সংস্করণ)

৭৫ ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ইতি. ১ম (অপরার্ধ)

লোকের ভাল না লাগিবারই কথা। যাঁহারা এই সমস্ত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন, তাঁহারা সারা বাঙলার মুখ চাহিয়া শ্রীহট্টের ভাষায় লিখিত[৭৬] এ কাব্যের পাঠ ইচ্ছামতো বদলাইয়া ইহাকে মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গীয় সাধুরূপ দিতে চাহিয়াছেন। পাঠ বিকৃতির জন্য তাঁহার কাব্যের সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলিবার অবকাশ নাই। এ বিষয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "অবশ্য অধুনা প্রচলিত ষষ্ঠীবরের পদ্মাপুরাণ যেভাবে বিকৃত হইয়াছে তাহা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কোন ধারণাই নির্ভুল হইতে পারে না।"[৭৭] যাহা হউক ষষ্ঠীবরের কাব্যকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচনার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যে মতান্তরের অবকাশ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেজন্য কামতা-কামরূপের মনসামঙ্গলের কবি মনকর ও দুর্গাবরের কাব্যের আলোচনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত নহে, এবং বাংলা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য নহে, ঠিক তেমনি ঐ একই কারণে শ্রীহট্টের কবি ষষ্ঠীবরকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হইতে বাদ দেওয়া কর্তব্য। কারণ শ্রীহট্টের বাহিরে তাঁহার কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই, পরে উৎসাহী ব্যক্তিগণ আঞ্চলিক প্রীতিবশতঃ আঞ্চলিক কবিকে সববাঙলায় প্রচলিত দিবার জন্য শ্রীহট্ট ও কলিকাতা হইতে কবির আঞ্চলিক ভাষাকে পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষায় পরিবর্তিত করিয়া প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন।[৭৮] প্রচলিত মনসামঙ্গলের সঙ্গে তাঁহার কাব্যের দুই চারি স্থলে গরমিল আছে। তাঁহার পূর্বজ নারায়ণদেবের মনসা কাহিনীর দ্বারা তিনি আদৌ প্রভাবিত হন নাই—অন্ততঃ তাঁহার কাব্যে সেরূপ কোন প্রমাণ নাই।

কাব্যটি নিতান্তই গতানুগতিক: কাহিনী, চরিত্র ও রসের বৈচিত্র্য বিচারে অন্যান্য মনসামঙ্গলের পার্শ্বে কবিকে অত্যন্ত নিষ্প্রভ মনে হয়। ডঃ সেন ষষ্ঠীবরের একটি অংশের মৌলিকতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। গৌরী পুষ্প তুলিতে গেলে গোপনে মহাদেবের সংস্পর্শ লাভ করিয়া বিস্রস্ত বেশে বাড়ী ফিরিলে মাতার দ্বারা ভৎর্সিত হন এবং অগ্নি পরীক্ষা দিয়া

---

৭৬ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য-উল্লিখিত গ্রন্থ। ("এই মুদ্রিত পুঁথি দুইটি আদ্যোপান্ত ষষ্ঠীবরের খাঁটি রচনা বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। উভয় পুঁথির ভাষাই অত্যন্ত আধুনিকতা প্রাপ্ত এবং তাহাদিগের মধ্যে স্থানে স্থানে অন্য কবির রচনার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।")

৭৭ ডঃ ভট্টাচার্য—উল্লিখিত গ্রন্থ

৭৮ ভাষা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য (পাদটীকা—৭৬) দ্রষ্টব্য।

চরিত্রের বিশুদ্ধি প্রমাণ করিতে বাধ্য হন। আর একটি অংশে 'কেওয়ালী'র (কাপালিক) ছদ্মবেশে শিবের আবির্ভাব এবং গৌরীকে বিবাহের প্রস্তাব ইত্যাদি বর্ণনাকে ডঃ সেন ষষ্ঠীবরের মৌলিক পরিকল্পনা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ষষ্ঠীবরের মৌলিক সৃষ্টি নহে। তাঁহার পূর্বে জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে এইরূপ বর্ণনা আছে—কামরূপের কবি মনকরের মনসামঙ্গলেও প্রায় একইরূপ বর্ণনা আছে। সুতরাং ইহার জন্য ষষ্ঠীবরের মৌলিক কল্পনাশক্তির প্রশংসা করিবার প্রয়োজন নাই। একই ধরণের লোকায়ত গালগল্পগুলিকে নানা কবি ব্যবহার করিয়াছিলেন, কোন একজন ইহার মৌলিকতা দাবি করিতে পারেন না। যাহা হউক, ষষ্ঠীবরের কাব্যে বিশেষ কোন পাঠযোগ্য গুণ নাই : দু-এক স্থল অবশ্য নিতান্ত মন্দ নহে। যেমন সমুদ্রযাত্রার পূর্বে চাঁদের অশুভ দর্শন :

সোনকারে বিদায় দিয়া চলিল তৎকালে।
ঘর হতে বাহিরিতে মাথে লাগে চালে ॥
বসন পরিতে চাঁদ আঁঠুতে ঠেকে কোচা।
আচম্বিতে চোখে লাগে আঙ্গুলের খোঁচা ॥
শঙ্কর পূজি চলে সাধু ললাটেতে ফোটা।
নগরের মধ্যে দেখে হস্তপদ কাটা ॥

কবি কালিদাস ও ধর্মমঙ্গলের কবি সীতারাম দাসের মনসামঙ্গলের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। গৌড়বাসী কালিদাসের মাত্র দুইখানি পুঁথির অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে বিশ্বভারতীর পুঁথিশালায় কাব্যটির মাত্র একখানি পৃষ্ঠা আছে। কবি নিজেই কাব্য রচনার কাল নির্দেশ করিয়াছেন :

গ্রহধরা ঋতু শশী সেই খ্যাত
এই অব্দে কাব্য সৃষি।
মনসামঙ্গল কাব্য মনোহর
কবি কালিদাস ভাষি ॥

অর্থাৎ ১৬১৯ শকাব্দে (১৬৯৭-৯৮ খ্রীঃ), সপ্তদশ শতাব্দীর সমাপ্তির দিকে এই কাব্য রচিত হয়। কাব্যটির ভাষা ব্যতীত কিছুই উল্লেখযোগ্য নহে। ছন্দ, বিশেষতঃ অন্ত্যানুপ্রাসে তাঁহার দক্ষতা ও সতর্কতা লক্ষণীয়। কাব্যের আরম্ভটি অবহেলার যোগ্য নহে :

অহিহত ভীতহরা বন্দো জরৎকার দারা
হেরি হেমচম্পক সঙ্কাশা।
খরতর রূঢ় অতি উরগ-ভূষণ তথি
অম্বুরূঢ় খরতর নাসা॥
শুন গো সঙ্কর সুতা বাণীরূপে হয়্যা ত্রাতা
কণ্ঠরূঢ়ে কর অবস্থিতি।
মনের জড়িমা যত দংশিয়া করহ হত
অজ্ঞানে করহ অনুমতি॥[৭৯]

এ ভাষার বন্ধন যেমন সুদৃঢ়, তেমনি তৎসম শব্দের প্রয়োগ-কৌশলও বিশেষ প্রশংসনীয়। অবশ্য প্রাপ্ত পুঁথিটি ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে (১৮০৩ খ্রীঃ) অনুলিখিত হইয়াছিল। তবু ইহাতে মুদ্রণে-উৎসুক আধুনিক সংস্কর্তার হস্তক্ষেপ ঘটিবার অবকাশ হয় নাই। কারণ এই খণ্ডিত পুঁথি অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। দু' এক স্থল যে বাস্তবিক কবিত্বের লক্ষণ যুক্ত তাহা এই উদ্ধৃতিটি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে:

ভণে দেব ত্রিপুরারি নিত্য তেজ বিদ্যাধরি
মদনে শুকায় মম মন।
দেখি তব মুখসবি মন্মথ সাগরে ভাসি
ত্রাণ কর দিয়া আলিঙ্গন॥
পরিহর নিত্য আশ মর সঙ্গে কর বাস
দুল বালা মনুজ যুবতি।
তেজিয়া সবার সঙ্গ তব সঙ্গে অর্ধ অঙ্গ
হৈয়া থাকিব রূপবতী॥

এই শব্দকল্প ও বাক্‌রীতি, নায়িকা স্থানীয়া বেহুলার সঙ্গে শিবের রঙ্গপরিহাস কৌতুকরস হিসাবে, আদিরসাত্মক হইলেও, উপভোগ্য হইয়াছে। দুঃখের বিষয় খণ্ডিত পুঁথিটি এখনও মুদ্রিত হয় নাই, হইলে সাধারণ পাঠক কবির যথার্থ পরিচয় লাভ করিতে পারিতেন।

ধর্মমঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবি সীতারামদাস অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে (১০১৪ মল্লাব্দ, ১৭০৮ খ্রীঃ অঃ) মনসামঙ্গলকাব্য রচনা করেন। ধর্মঠাকুরের ভক্তকবি মনসার কাব্য লিখিতে গিয়া সর্পের দেবীকে ধর্মের পূজারিণী রূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে;

৭৯ সা—প—প, ১৩০৮

ধর্মকে অবলম্বন করিয়া যেমন অনেক মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে, সেইরূপ অন্যান্য মঙ্গলকাব্যেও ধর্মের প্রভাব পরোক্ষভাবে পড়িয়াছে। তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, বিষ্ণুপাল—মনসামঙ্গলের কোন কোন কবি ধর্মঠাকুরের প্রসঙ্গ গ্রহণ করিয়াছেন। সীতারাম মূলতঃ ছিলেন ধর্মের গায়ক, তিনি মনসার গানও করিতেন। কাজেই মনসাকে ধর্মের ছায়াতলে আনিতে তাঁহার দ্বিধা হয় নাই। তাঁহার মনসা প্রকৃত পক্ষে মনসামঙ্গলের মনসা অপেক্ষা শাক্ত দেবী গজলক্ষ্মীর অধিকতর নিকটবর্তী। তাঁহার কাব্যকে তিনি 'কমলাকীর্তন'ও বলিয়াছেন।[৮০] তাঁহার কিছু পূর্বেই পশ্চিমবঙ্গে কেতকাদাসের কাব্য অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, ফলে সীতারামের কমলাকীর্তনে (অর্থাৎ মনসামঙ্গলে) কেতকাদাসের বিশেষ প্রভাব দৃষ্টি-গোচর হইলে বিস্ময়ের কিছু নাই।

এখানে আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গলের কয়েকজন কবির পরিচয় দিলাম। এই শতাব্দীই মনসামঙ্গলের শেষ সীমা, এবং রচিত কাব্যসমূহের মধ্যে অন্ততঃ দুই-তিন খানি কাব্যে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।[৮১]

পূর্ব ও উত্তর-পূর্ববঙ্গে, যেখানে মনসাপূজা অতিশয় ব্যাপকভাবে প্রচারলাভ করিয়াছিল, সেখানে তথাকথিত বাইশকবি বা অন্যান্য মনসামঙ্গলে বহু কবির ভণিতা পাওয়া যায়। যেমন বৈদ্যহরিদাস, কৃষ্ণানন্দ, বিপ্র জানকীনাথ, বৈদ্য জগন্নাথ, বৈদ্য কবিকর্ণপূর, শ্রীরামবিনোদ প্রভৃতি।[৮২] এই সমস্ত নাম খুব সম্ভব লিপিকর বা গায়েনদের ভণিতা। পূর্ববঙ্গে মনসা উপাসনা উপলক্ষে অনেক-দিন ধরিয়া গৃহস্থের অঙ্গনে মনসার গান, বিশেষতঃ জাগরণপালা গীত হইত। সেই উপলক্ষে প্রধান প্রধান কবি—যেমন নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত, ক্ষেমানন্দ, বাইশকবি, ষটকবি, বংশীদাস, ষষ্ঠীবর প্রভৃতি কবির কাব্য পঠিত ও গীত হইত। অত্যন্ত জনপ্রিয়তা ও চাহিদার জন্য কবিদের রচনায় অনেক

---

৮০ ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ইতি.—১ম (অপরার্ধ)

৮১ এখনও নানা কবির পুঁথি অবজ্ঞাত অবস্থায় এসিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পুঁথিশালায় পড়িয়া আছে। এই সমস্ত কাব্য কাব্যহিসাবে যাহাই হোক না কেন, মনসামঙ্গলের বৃত্ত সম্পূর্ণ করিবার জন্য ইহাদের মুদ্রণ হওয়া প্রয়োজন।

৮২ ডাঃ সুকুমার সেন—ঐ

অজ্ঞাতনামা লিপিকার বা গায়েন নিজ নিজ নাম ভণিতায় ব্যবহার করিতেন —এইভাবে অসংখ্য কবির নাম পাওয়া যাইতেছে। বলাই বাহুল্য এই সমস্ত নামের মধ্যে দুই একটি ব্যতীত কোনটিই প্রকৃত কবির ভণিতা নহে। অবশ্য এই নামের নামাবলী হইতে প্রকৃত কবির নাম বাছিয়া বাহির করাও দুরূহ। সে যাহা হউক, এই যুগের মনসামঙ্গলের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের কয়েকজন বিশিষ্ট কবি মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, এ সংবাদও উল্লেখযোগ্য। অবশ্য উত্তরবঙ্গের কাব্যগুলিতে রুচির প্রতি বেপরোয়া মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডে যেমন পুরাণ ও লৌকিক মনোভাবের সংমিশ্রণ দেখা যাইবে, তেমনি ধর্মঠাকুর (ধর্মনিরঞ্জন) ও ধর্মপূজাতত্ত্বেরও কিঞ্চিৎ প্রভাব সঞ্চারিত হইতেছিল, তাহাও কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি এড়াইবে না। তদানীন্তন রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমির জীবন ও সমাজের নানা পরিচয় এই সমস্ত কাব্যে অল্পবিস্তর পাওয়া যাইবে। অবশ্য যাঁহারা এই কাব্যে বর্ণিত যে-কোন ঘটনাকেই তৎকালীন সমাজচিত্র বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন, তাঁহারা আধুনিক সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসচেতনাকে মধ্যযুগে প্রয়োগ করিতে অভিলাষী—বলা বাহুল্য এইরূপ বিচারপদ্ধতি কালানৌচিত্য দোষের পর্যায়ে পড়ে। লখিন্দরের মাতুলানীর প্রতি কুব্যবহার, ধর্ম-মনসা ও মহাদেব-দুর্গার দাম্পত্যকথা (তন্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবনের কাব্যে বর্ণিত) এক যুগের সমাজচিত্র বলিয়া পুরাপুরি গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই, বা সদলবাণিজ্যে বর্ণিত হাস্যকর অতিরঞ্জন উপকূল-বাণিজ্যের যথার্থ তালিকা বলিয়া মধ্যযুগীয় বাণিজ্যিক ইতিহাসের কলেবর বৃদ্ধিও নিষ্প্রয়োজন।

২

চণ্ডীমঙ্গল ও দুর্গামঙ্গল কাব্য

সপ্তদশ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সংখ্যাও যেমন অল্প, গুণগত উৎকর্ষও তেমনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। চট্টগ্রামের দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গল ছাড়িয়া দিলে, এই শতাব্দীতে কোন উল্লেখযোগ্য চণ্ডীমঙ্গলকাব্য পাওয়া

যায় নাই। বস্তুতঃ ষোড়শ শতাব্দীই চণ্ডীমঙ্গলের স্বর্ণযুগ। মুকুন্দরাম ও দ্বিজমাধব—দুইজনেই ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে চণ্ডীমঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের স্বাভাবিক প্রাণপ্রবাহ ক্ষীণতর-হইতে আরম্ভ করে। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যযুগের প্রভাবে বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যেরূপ নব ভাব ও ভাবনার বন্যা নামিয়াছিল, সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই তাহার বিপুল প্রসার ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের স্বল্পতা এবং ইহাতে প্রথমশ্রেণীর কবির অনুপস্থিতিতেই তাহা বুঝা যাইবে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ও চণ্ডীদেবীর পরিকল্পনা, উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।[৮৩] এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তথাপি প্রসঙ্গক্রমে চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধে এই শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করা যাইতে পারে। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, চণ্ডীর পরিকল্পনায় যুগপৎ ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য প্রভাব কার্যকরী হইয়াছে।[৮৪] সংস্কৃতে রচিত শাক্ত-শৈব পুরাণাদিতে, এবং প্রাক্‌পৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্যেও চণ্ডীতত্ত্বের নানা বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। সর্বশক্তির আধার, মাতৃকা-তন্ত্রের প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ চণ্ডীর মূর্তি, পূজা ও উপাসনাদি আর্যমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত হইলেও অব্রাহ্মণ্য আর্যেতর সমাজে, বিশেষতঃ গিরিকান্তারবাসী অনার্য কৌমে অনুরূপ ধরণের শিকার বা পশুযূথের রক্ষয়িত্রী এক দেবীমূর্তির পূজার্চনা, কখনও মূর্তিরূপে, কখনও শিলাখণ্ডরূপে নির্বাহ হইত। ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য চণ্ডী—কে কাহার উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহাদের কলেবর কোন্ প্রভাবে গঠিত, রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা অবশ্য প্রত্নতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের আলোচনার বিষয়। সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে এখানে শুধু এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, বাঙলাদেশে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক ও লৌকিক চণ্ডী—উভয়েরই প্রভাব দেখা যায়। তবে মনসামঙ্গলের তুলনায় চণ্ডীমঙ্গলে আর্যসংস্কার ও ব্রাহ্মণ্য প্রভাব একটু অধিকমাত্রায় পড়িয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে চৈতন্য প্রভাবে এবং মুসলমান শাসনের প্রতিক্রিয়ার ফলে হিন্দুসমাজের গ্রামীণ দৃষ্টি পৌরাণিক সাহিত্য ও উত্তর-ভারতীয় পূজার্চনার প্রতি আকৃষ্ট হইলে চণ্ডীমঙ্গলে পুরাণের

৮৩ লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'র দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৮৪ ঐ গ্রন্থ।

প্রভাব গুরুতর আকার ধারণ করে। ফলে সপ্তদশ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গলের এক বিচিত্র রূপান্তর দেখা দিল। ইহাদের একটিকে সাধারণভাবে চণ্ডীমঙ্গল, এবং অপরটিকে দুর্গামঙ্গল নাম দিতে পারা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর ধারা অনুসরণ করিয়া দ্বিজ রামদেব, দ্বিজ হরিরাম, জনার্দন—এই তিনজন কবি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অপরদিকে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুকল্প হিসাবে দ্বিজ কমললোচন, ভবানীপ্রসাদ রায়, রূপনারায়ণ ঘোষ—ইঁহারা নূতন ধরণের দুর্গামঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। শেষোক্ত শ্রেণীটি প্রায় পুরাপুরি পৌরাণিক চণ্ডীকাহিনীর বাংলা রূপান্তর মাত্র। এবার এই সমস্ত কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইয়া সপ্তদশ শতাব্দীর চণ্ডীকাহিনীর স্বরূপ বুঝিয়া লওয়া যাক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, চণ্ডীকাহিনীর এই দুই শাখা অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়াছিল। এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নূতন করিয়া চণ্ডীমঙ্গল রচিত না হইলেও পৌরাণিক দুর্গামঙ্গল ধরণের কিছু কিছু কাব্য প্রচারিত হইয়াছিল।

দ্বিজ রামদেব ॥

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের অন্যতম শক্তিশালী কবি দ্বিজ রামদেবের 'অভয়ামঙ্গল' অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে।[৮৫] ইতিপূর্বে কেহ এই কবির নাম শুনেন নাই, কাব্যেরও কোন সন্ধান রাখিতেন না। ডঃ আশুতোষ দাস মহাশয় এই কবিকে বিস্মৃতির অতলতল হইতে উদ্ধার ও বাঙলার পাঠক-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অংশের উপর আলোকপাত করিয়াছেন। রামদেবের অভয়ামঙ্গল (কবি কোথাও কোথাও 'সারদা-চরিত'-ও বলিয়াছেন)[৮৬] আবিষ্কৃত না হইলে সপ্তদশ শতাব্দীতে উপস্থিত করিবার মতো চণ্ডীমঙ্গলের কোন কবিকেই পাওয়া যাইত না।

ডঃ দাস দ্বিজ রামদেবের তিনখানি পুঁথির সন্ধান পাইয়া তাহা সংগ্রহের চেষ্টা করেন। প্রথম পুঁথিখানি ১১২৫ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭১৯ খ্রীঃ অব্দে অনুলিখিত হইয়াছিল। শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস এই মূল পুঁথির একখানি অনুলিপি

৮৫ দ্বিজ রামদেব-বিরচিত অভয়ামঙ্গল—ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (১৯৫৭)

৮৬. 'রচিলেক রামদেবে সারদাচরিত' (মুদ্রিত কাব্যের সর্বশেষ পংক্তি)।

প্রস্তুত করেন ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে। ডঃ দাস বহু চেষ্টা করিয়াও মূল পুঁথিখানিকে পাকিস্তান হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, পরে সংবাদ পাইলেন—পুঁথিখানিকে পোকায় কাটিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং ডঃ দাস প্রাচীন পুঁথিটির (১৮শ শতাব্দী) ১৩৩৫ সালের নকল করা আধুনিক কপি লইয়া কার্য আরম্ভ করেন। পরে তিনি ১২৮৮ বঙ্গাব্দে (১৮২২ খ্রীঃ অঃ) ত্রিপুরায় লিপিকৃত আর একখানি অর্বাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেন। পুঁথি দুইখানির (অর্থাৎ পূর্বের নকল এবং এই পুঁথিটি) মধ্যে কিছু কিছু পাঠভেদ আছে।[৮৭] পরে তিনি প্রথম পুঁথির অনুরূপ আর একখানি পুঁথি আনন্দমোহন রায় ব্যাকরণতীর্থের নিকট দেখিয়াছিলেন। কিন্তু ডঃ দাস সম্পাদিত কাব্যের অবলম্বন—প্রাচীন পুঁথির আধুনিক নকল এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অনুলিপিকৃত আর একখানি পুঁথি। এই পুঁথিগুলি নোয়াখালি জেলার নিকটবর্তী ত্রিপুরাজেলার প্রান্তসীমা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। ডঃ দাস অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে, পূর্বে চট্টগ্রাম হইতে কয়েকঘর লোক ত্রিপুরার এই অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। যাঁহাদের বাটী হইতে তিনি পুঁথি সংগ্রহ করেন, "তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা যে চট্টগ্রামের লোক ছিলেন তাহা তাঁহাদের কথাবার্তায় চট্টগ্রামী অন্তঃসলিল প্রভাবেও সমর্থিত হয়। কবি রামদেব যে চট্টগ্রামের লোক ছিলেন তাঁহার কাব্যে অভ্রান্ত পরিচয় মিলে।"[৮৮] কবি রামদেব যে, চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন, তাহা কবির ব্যবহৃত চট্টগ্রামী শব্দ হইতেই বুঝা যায়।[৮৯]

(রামদেব প্রশংসনীয় কবিত্বশক্তি, কাহিনী গ্রন্থনৈপুণ্য ও চরিত্র সৃষ্টির মৌলিক শক্তির পরিচয় দিলেও কাব্যমধ্যে আত্মপরিচয়-সংক্রান্ত কোন ইঙ্গিত দেন নাই।) মঙ্গলকাব্যের কবিরা এতটা কৃপণতা করিতেন না, সন-তারিখ

৮৭ গ্রন্থের পরিশিষ্টে সম্পাদক পাঠভেদ উল্লেখ করিয়াছেন।

৮৮ ঐ ভূমিকা, পৃ. ৸৵৹

৮৯ "কবি আঞ্চলিক তথা দেশজ (চট্টগ্রামী) শব্দকে কাব্যে স্থান দিয়াছেন।" (ভূমিকা—৸৶৹) রামদেব কী পরিমাণ চট্টগ্রামী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা ডঃ দাসের ভূমিকায় (পৃ. ১৲—১/৹) পাওয়া যাইবে। আর একস্থলে সম্পাদকের মন্তব্য, "কাব্যে কবির পিতৃ নামোল্লেখ ছাড়া বংশানুক্রম কিংবা অন্য পরিচয়ের নিদর্শনবিরলতা সত্ত্বেও রামদেব যে চট্টগ্রামের কবি তাহা তাঁহার শাব্দিক প্রয়োগ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপভাষার লক্ষণগুলিতে বিদ্যমান রহিয়াছে।" (ভূমিকা, পৃ. ১৶৹)

সম্বন্ধে তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেও বংশক্রম ও অন্যান্য তথ্যে তাঁহারা বেশ কলকণ্ঠ হইতেন। কিন্তু আমাদের কবি নিজের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলেন নাই। (তাঁহার নাম রামদেব, তিনি দ্বিজ বংশোৎপন্ন, পিতার নাম কবিচন্দ্র, কৌশলে কবি নিজেকে 'কবি বিধুসুত' বলিয়া পিতার নাম নির্দেশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আর কোন ব্যক্তিগত পরিচয় পাওয়া যায় না।) পুঁথির শেষে রচনাকালজ্ঞাপক একটি শ্লোক আছে :

ইন্দুবাণ ঋষিবাণ বেদ সনজিত।
রচিলেক রামদেবে সারদা'চরিত ॥

'অঙ্কস্য বামা গতি' ধরিয়া ইহা হইতে ১৫৭১ শকাব্দ (১৬৪৯ খ্রীঃ অঃ) পাওয়া যাইতেছে। অবশ্য এই সন নির্ণয়েও কিঞ্চিৎ হিসাবের সাহায্য লইতে হয়। ইন্দু—১, বাণ—৫, ঋষি—৭, বাণ—৫—অর্থাৎ ১৫৭৫ শক। 'বেদ সনজিত' —ইহার অর্থ, সম্পাদকের মতে উক্ত অঙ্কে চার সংখ্যা বেশী রহিয়াছে। ১৫৭৫ হইতে ৪ বাদ গেলে ১৫৭১ শকাব্দ পাওয়া যায়। ডঃ সুকুমার সেন 'বেদ সন জিত'-কে 'বেদ সমজিত' ধরিয়া ১৫৭৬ ÷ ৪ = ১৫৭৯ শকাব্দ (১৬৫৭-৫৮ খ্রীঃ) পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি 'ইন্দুবাণ ঋষিবাণ' হইতে ১৫৭৬ শকাব্দ কি করিয়া পাইলেন বুঝা যাইতেছে না—ইহা ১৫৭৫ শকাব্দ হইবে। ইহার সঙ্গে তিনি আবার চার যোগ দিলেন কেন, তাহাও অজ্ঞাত। পুনশ্চ তিনি বলিতেছেন, "বেদ সমজিত স্থানে 'শকসংজ্ঞিত' পাঠ কল্পনা করিলে ১৫৭৫ শকাব্দ হয়।" সহসা তিনি 'বেদ সমজিত'-কে 'শকসংজ্ঞিত'—এরূপ পাঠের কল্পনাই-বা কেন করিলেন তাহাও বুঝা যাইতেছে না। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বেদ সনজিত '-কে 'বেদ মণজিত' ধরিয়াছেন। তাঁহার ধারণা দ্বিজ রামদেব মাধব আচার্যের মঙ্গলচণ্ডীর অনুকরণে বোধহয় এইভাবে গ্রন্থ রচনার সন-তারিখ নির্দেশ করিয়াছেন :

ইন্দুবাণ ঋষিবাণ শক নিয়োজিত।
রচিলেক রামদেব সারদা চরিত ॥[১০]

এ অনুমান সত্য হইলে ইহা হইতে ১৫৭৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৫৩ খ্রীঃ অব্দ পাওয়া যাইতে পারে। অবশ্য এ সমস্ত অনুমান বা কল্পনা মাত্র। সুতরাং ডঃ সেন ও ডঃ ভট্টাচার্য পরিকল্পিত সন-তারিখকে নিছক অনুমান বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। ডঃ দাস ১২২৮ সালে ত্রিপুরায় অনুলিখিত যে পুঁথিটি পাইয়াছেন,

১০ মাধবাচার্য চণ্ডীমঙ্গলে এইভাবে সনের নির্দেশ করিয়াছেন।

তাহার শেষ পৃষ্ঠাটির আলোকচিত্র দেখিয়া (ডঃ দাসের সম্পাদিত গ্রন্থে সংযোজিত) মনে হইতেছে, পংক্তিটি 'বেদ সনজিত'-ই হইবে, ডঃ সেনের 'শক সংজ্ঞিত'-ও নহে, ডঃ ভট্টাচার্যের 'শক নিয়োজিত'-ও নহে। কারণ উক্ত আলোকচিত্রে 'স' কে ডঃ সেন 'ম' মনে করিয়াছেন। ঐ আলোকচিত্রের দ্বিতীয় পংক্তিতে 'রচিলেক রামদেব সারোদা চরিত'-এ 'সারোদা'র 'স' এবং পূর্ব পংক্তির 'বেদ সনজিতে'র 'সন'-এর 'স' একই প্রকার। সুতরাং 'বেদ সনজিত'কে অন্য কিছু বলিবার উপায় নাই। এই তারিখ যথার্থ হউক বা না হউক, রামদেব সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বর্তমান ছিলেন, এ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। তাঁহার রচনার একস্থলে 'ফিরিঙ্গী' শব্দের উল্লেখ আছে বলিয়া তাঁহাকে পরবর্তী কালের কবি বলিবার কারণ নাই। মুকুন্দরাম রামদেবের অন্ততঃ ৭৫ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তিনিও 'হার্মাদা' (পর্তুগীজ 'আর্মাদা') শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধব গায় সারদা চরিত ॥

কবি যে চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন তাহার কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া না গেলেও কয়েকটি পারিপার্শ্বিক ইঙ্গিত হইতে তাঁহাকে চট্টগ্রামের কবি বলিয়াই মনে হয়। প্রথম কারণ তাঁহার কাব্যে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক শব্দের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে—মাধবাচার্যের অপেক্ষা অনেক বেশী। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার পুঁথি ত্রিপুরা-নোয়াখালি অঞ্চলেই পাওয়া গিয়াছে—অন্যত্র নহে। রামদেব কাব্য মধ্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বৈষ্ণবপদ লিখিয়াছিলেন; এগুলি পৃথকভাবে "খুলনা হইতে ত্রিপুরা পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।"[৯১] তৃতীয়তঃ, চট্টগ্রামের অন্যতম বিখ্যাত কবি মঙ্গলচণ্ডীর রচয়িতা মাধব আচার্যের কাব্যের কোন কোন অংশের সঙ্গে তাঁহার কাব্যের অংশবিশেষের মিল আছে। মাধব আচার্য রামদেবের বেশ কিছুকাল পূর্বে চট্টগ্রামে বসিয়া মঙ্গলচণ্ডীর গীত রচনা করিয়াছিলেন। দুই জন কবি একই কাহিনী অবলম্বনে কাব্যরচনা করিয়াছিলেন বলিয়া পরবর্তী কবি পূর্ববর্তীর দ্বারা কোন কোন স্থলে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত অনুমানের দ্বারা কবিকে চট্টগ্রামের অধিবাসী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

৯১ ডঃ দাসের ভূমিকা, পৃ. ১৮/০

এবার কাব্য পরিচয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে দ্বিজ রামদেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পূর্বে মুকুন্দরাম ও দ্বিজ মাধব (মাধব আচার্য) চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়া এই ধরণের মঙ্গলকাব্য রচনার বাঁধা পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও কবি কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ মৌলিকতা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কবিদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। কাব্যটিতে মাধব আচার্যের চণ্ডীমঙ্গলের প্রভাব পড়িয়াছিল। কাজেই কাহিনী পরিকল্পনা, ভাষা ও অন্যান্য প্রসঙ্গে মাধব আচার্যের কিঞ্চিৎ প্রভাব আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দ্বিজ মাধবের

সারদাচরণ-সরোজ মধু লোভে।
দ্বিজ মাধব তথি অলি হইয়া শোভে॥

এবং দ্বিজ রামদেবের

দেবীপদ সরোজ সৌরভ অতিশয়।
দ্বিজ রামদেব তথি অলি হইয়া রয়॥

দ্বিজ মাধবের

প্রণমোহ গণপতি গৌরীর নন্দন।
ভকতবৎসল দেব বিঘ্নবিনাশন॥

এবং রামদেবের

প্রণমহ গণাধীপ গৌরীর নন্দন।
স্মরণে আপদখণ্ড বিঘ্নবিনাশন॥

প্রভৃতি পংক্তির সাদৃশ্য দেখিয়া কেহ কেহ কবির মৌলিকতা সম্বন্ধে সংশয়ের প্রশ্ন তুলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, "দ্বিজ রামদেব অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিজ মাধবের ভাষা পর্যন্ত অনুকরণ করিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কাহিনীকে বিভিন্ন পালায় ভাগ করিতে গিয়া দ্বিজ মাধব কাহিনীর যেখানে আসিয়া এক এক দিনের দিবা কিংবা রাত্রে পালা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, দ্বিজ রামদেবও সেখানেই আসিয়া তাঁহারও এক এক দিনের দিবা কিংবা রাত্রি পালা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।... দ্বিজ মাধবের প্রতিষ্ঠা সমাজের মধ্যে স্থাপিত হইবার পর, তাঁহারই রচনার ভাব এবং অন্তর্গত আদর্শ অনুসরণ করিয়া দ্বিজ রামদেব তাঁহার কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন......।"[৯২] ডঃ ভট্টাচার্যের মতে দ্বিজ রামদেব পরবর্তী কালে মাধব

৯২ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (৪র্থ সং, পৃ. ৪২০)

আচার্যের অনুসরণ করিয়া 'অভয়ামঙ্গল' বা 'সারদাচরিত্র' রচনা করিয়াছিলেন—কবির মৌলিকতা যৎসামান্য। অপরদিকে গ্রন্থ-সম্পাদক ভূমিকায় 'মাধবাচার্য ও রামদেব' শীর্ষক অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, দ্বিজ রামদেব মাধব আচার্যের অনুকরণ করেন নাই, কারণ উভয়ের কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র, ভাষা ও নানা খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিস্তর পার্থক্য আছে (ভূমিকা—পৃ. ৪॥/০—৫।৵০)। ডঃ দাসের এই মন্তব্য নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। বাস্তবিক মাধব আচার্য ও দ্বিজ রামদেবের কাব্যের মধ্যে যেমন কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে, তেমনি নানা স্থানে নানা ধরণের পার্থক্যও আছে। দুই কবির রচনায় পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু সাদৃশ্য ঘটিল কেন, সে বিষয়ে কাব্য সম্পাদক ডঃ দাস বলিতেছেন, "মাধবাচার্যের কাব্যে ঘটনা বর্ণনের উপক্রমে স্থলবিশেষে রামদেবের ব্যবহৃত অনেক শব্দ এবং একাধিক বাক্যগত একরূপতা রহিয়াছে। উভয়ের কাব্যের কাহিনী, গীতের পালা বিভাগ এবং ঘটনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ইহাতে মাধব আচার্যের আত্মবিবরণীতে প্রদত্ত পুষ্পিকার উপর নির্ভর করা প্রাচীনত্ব সম্পর্কে স্বতঃ সংশয় জাগে। আমাদের মতে তিনি রামদেবের সমসাময়িক। কাব্যগত উৎকর্ষের বিচারেও মাধব আচার্যকে রামদেবের অক্ষম অনুকারী বলিয়া মনে হয়।"[১৩]

ডঃ দাসের এ মন্তব্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে যে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োজন, তাহা এখনও হস্তগত হয় নাই; দ্বিজ মাধবকে রামদেবের সমসাময়িক বলিবার যথেষ্ট যুক্তি নাই। দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলের পুষ্পিকায় উল্লিখিত সন-তারিখকে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। কারণ তাহা হইলে একই যুক্তিতে রামদেবের গ্রন্থের পুষ্পিকায় উল্লিখিত সন-তারিখকেও বাতিল করিয়া দেওয়া যায়। সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া দ্বিজ রামদেব সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ সংশয়ের অবকাশ রাখিয়া নিম্নলিখিতরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি:

(ক) দ্বিজ রামদেব দ্বিজ মাধবের পরবর্তী কবি, এবং কোন কোন দিক দিয়া তাঁহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ভাষার মধ্যেও সেইরূপ প্রভাব ও অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়।

(খ) উভয়ের মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনি কাহিনী চরিত্র প্রভৃতিতে পার্থক্যও আছে প্রচুর।

---

১৩ ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদিত দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গল, (ভূমিকা, পৃ ৫৵-৭৵)

(গ) রামদেবের কবিপ্রতিভা দ্বিজ মাধব অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। আমাদের মনে হয় দ্বিজ মাধবের শিল্পরসবর্জিত ক্ষুদ্রাকারের মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালীকে কবি রামদেব মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃততর পটভূমিকায় নূতন রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, এবং অনেকটা সার্থকও হইয়াছিলেন।

রামদেব যে বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে মৌলিকতা সৃষ্টি বা প্রশংসনীয় কবিকর্মের পরিচয় প্রদর্শন সহজ ছিল না। কারণ তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে চণ্ডীমঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরামের কাব্য উভয়বঙ্গেই বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। তাঁহার কাব্যরচনার ৭০-৭৫ বৎসর পূর্বে তাঁহার দেশের আর এক কবি মাধব-আচার্যের চণ্ডীমঙ্গল গান অন্ততঃ চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচারিত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় কাহিনীতে মৌলিকতা দেখাইবার সুযোগ না থাকিলেও কবি রামদেব রচনাকৌশল, চরিত্রে নূতন নূতন আলো-ছায়ার বৈচিত্র্য সৃষ্টি, মনস্তত্ত্ব, সাংসারিক অভিজ্ঞতা, পারিবারিক প্রতিবেশ প্রভৃতি ব্যাপারে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মুকুন্দরামের পরই তাঁহার কাব্য গণনার যোগ্য হইয়া পড়ে। এরূপ একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যের প্রচার না হইবার কারণ রহস্যময়। দ্বিজ মাধবের সঙ্গে তাঁহার রচনার কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে; পূর্ববর্তী কবির রচনার প্রভাবেও তাঁহার কাব্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিলসিত হইয়াছে। কিংবা না হয় তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া গেল, কবি রামদেব মাধব আচার্যের রচনা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামদেবের রচনা যে মাধব আচার্য অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আমাদের কোন সংশয় নাই। দুইখানি কাব্যের তুলনা করিলেই দেখা যাইবে, দ্বিজ মাধবের কাব্য হইতে ব্রতকথার ভঙ্গী-বৈশিষ্ট্য দূর হয় নাই, অপরদিকে রামদেবের 'অভয়ামঙ্গল' ('সারদাচরিত্র') মূলতঃ কাব্য। অবশ্য ইহাতে খুল্লনার ছাগরক্ষণ এবং অন্যান্য অংশে ব্রতকথার প্রভাবও আছে। চরিত্রগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য—বাস্তবজীবনের সঙ্গে কবির গভীর সংস্পর্শ। নরনারী বা দেবদেবী সমস্ত চরিত্রই প্রতিদিনের জীবনকেই যেন চিত্রিত করিয়াছে। বিশেষতঃ মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর চরিত্রে যেরূপ পার্থিব মলিনতা ও অপকৃষ্টতা লক্ষ্য করা যায়, ইহাতে সেরূপ বাহুল্য প্রায়ই অনুপস্থিত। অবশ্য বাস্তবতার সঙ্গে যে কল্পনার সুসামঞ্জস্য থাকিলে সাধারণ ব্যাপারও বিচিত্র রসে ভরিয়া ওঠে, আমাদের কবির সেই শক্তি ততটা তীক্ষ্ণ ছিল না। যদি থাকিত,

তাহা হইলে তিনি মুকুন্দরামের গৌরব খর্ব করিতে পারিতেন।) তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, সর্বাঙ্গীণ প্রতিভা বিচারে মুকুন্দরাম শ্রেষ্ঠ হইলেও বণিকখণ্ডের কাহিনী গ্রন্থনে রামদেবের পরিমাণ-সামঞ্জস্য অধিকতর প্রশংসার যোগ্য। অভিজ্ঞ পাঠক মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি প্রসঙ্গে আসিয়া রচনার অযথা দৈর্ঘ্য, অপ্রাসঙ্গিকতা, পুনরাবৃত্তি ও কাহিনী গ্রন্থনে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য দর্শনে মাঝে মাঝে ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন। কিন্তু রামদেবের কাহিনী এই দিক দিয়া বেশ সুগ্রথিত হইয়াছে।

(মুকুন্দরামের রচনায় যেমন একটা প্রসন্ন সহাস্য রূপ সকল পাঠকেই প্রত্যক্ষ করিতে পারে, যাহার পথ বাহিয়া মুকুন্দরাম আমাদের কালের ব্যক্তি হইয়া পড়িয়াছেন, দ্বিজ রামদেবের বিবৃতিধর্মী কাব্যটিতে তাহার কিঞ্চিৎ অভাব আছে। বরং করুণরসে তাঁহার কাব্য পাঠকচিত্তে সহানুভূতি সঞ্চার করিতে সমর্থ। পুত্রকে বাণিজ্যে বিদায় দিতে খুল্লনার বিলাপ বর্ণনায় রামদেবের প্রশংসনীয় কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যাইবে। এই কাব্যে যেখানে বেদনার কথা আসিয়াছে, সেখানে রামদেবের লেখনী মানবরসে ভরিয়া উঠিয়াছে।) তবে মুকুন্দরামের বেদনা ও হিউমার এক হইয়া গিয়া যে ধূপছায়ার সৃষ্টি করিয়াছে এবং কাব্যের উপভোগ্যতা বাড়িয়াছে, রামদেবের সৃষ্টিক্ষমতা ততটা উচ্চশ্রেণীর ছিল না। যাহা হউক, কাব্যটির বহু অংশ যে এখনও পাঠকচিত্তে আনন্দ দিতে পারে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

(রামদেবের কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য, কবি শাক্ত কাব্য লিখিলেও বৈষ্ণব ধর্মই যে তাঁহার সাধ্যসাধন, তাহা এই কাব্যের যত্রতত্র সংযোজিত বিষ্ণুপদগুলি আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। প্রায় শতাধিক বৈষ্ণব পদে[১৪] কবির ভক্তিনত হৃদয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। পদাবলী সাহিত্যের সঙ্গে কবির নিবিড় পরিচয়, বিশেষতঃ ব্রজবুলিতে পদরচনার চেষ্টা প্রশংসার যোগ্য।) মাধব আচার্যের মঙ্গলচণ্ডীর গীতেও 'বিষ্ণুপদ' আছে বটে, কিন্তু তাহাতে পূর্ণতা নাই; তাহার পরিমাণ প্রায় স্থলেই দুইচারি ছত্রে সীমাবদ্ধ। কিন্তু রামদেব প্রায় বৈষ্ণবপদাবলীর আদর্শে পুরাপদের মাপেই 'বিষ্ণুপদ' রচনা করিয়াছিলেন। এই পদগুলির স্নিগ্ধমধুর ধ্বনিঝঙ্কার ও বৈষ্ণব প্রেমভক্তি

---

১৪ মুদ্রিত গ্রন্থের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

কবিকে বৈষ্ণব কবিরূপেও পরিচিত করিতে পারিত।) এখানে আমরা কয়েকটি উৎকৃষ্ট বৈষ্ণবপদের উল্লেখ করিতেছি :

(১) বাৎসল্য রসের পদ : যশোদার উক্তি

তোম্মারা নি আম্মারে যাদবে
এই পন্থে দেখিছ যাইতে।
মুঞি অভাগিনী ও দুঃখতাপিনী
না মারিছম নবনী খাইতে ॥
ভাণ্ডেতে রহিল ননী কথা গেল নীলমণি
মাএর পরাণধন।
দিনান্তে না আইলা ঘরে রইল বাছা করে ঘরে
বল মু কি করিব এখন ॥

(২) সখ্যরসের গোষ্ঠবিহারের পদ :

ভাইরে, মধুবনে আর ভয় নাই।
আনন্দে বিহরে তথা রামকানাই ॥
আজু আপনি মাঠেতে আইলে নন্দের দুলাল।
না ধাইঅ না ধাইঅ রঙ্গিয়া রাখোয়াল ॥
দেখ না কদম্বতলে ও দীনদয়াল।
আনন্দে বিহরে রঙ্গে নন্দের দুলাল ॥

(৩) কৃষ্ণের বংশী শ্রবণে রাধার অন্তর্বেদনা :

কি আর কুলনাজে সই কি আর কুলনাজে।
শ্রবণ নয়ান সব জীবন যৌবন ধন
সকলি হরিল ব্রজরাজে ॥
শ্রবণ নিবোধ বাখি কতবার মুদি আখি
কত শত কাজে মন বান্ধি।
বন্ধুর নিরস বাশী এমন সরসভাবী
শুনি প্রাণ পসে কান্দি কান্দি ॥

(৪) কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা :

দেখ পহু আওত নন্দ কিশোর।
ওরূপ হেরি হেরি অভিনব নাগরী
কুলের ধরম দেহ তোর।
শ্যামতনু চুমি অংস অবলম্বিত
দোলএ মণিময় হার।

যখনে বারি বারি হেরিয়া রঙ্গিণী
খেলত সুরধুনি ধার ॥

(৫) শিশু গৌরাঙ্গের বর্ণনা :

ভালি ভালি নাচে গৌর রায় ।
কনক নূপুর পাএ ওবেশ বনাইছে মাএ
ডগমগ হরে গোরার গাএ ॥

(৬) রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কবির পদ :

রাঘব হে কে তোহ্মারে বোলে দয়াময় ।
জানকী জীবনধন দহন করল পণ
অব কি ভরম দূর নএ ॥

(৭) জাহ্নবী স্তুতি প্রসঙ্গে গঙ্গাহীন পূর্ববঙ্গের কবির পূত গঙ্গার তীরে অবস্থানের প্রতিজ্ঞা :

পতিত পাবনী জাহ্নবী গঙ্গে ।
আর পুনরপি না যায়্ বঙ্গে ॥

এই সমস্ত পদ কবির বিচক্ষণ রচনাশক্তির অভ্রান্ত প্রমাণ দিয়াছে। ব্রজবুলিতে তাঁহার যে কিছু অধিকার ছিল, এবং তিনি তদানীন্তন বৈষ্ণব-পদসাহিত্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, তাহা এই পদগুলি হইতে বুঝা যাইতেছে। আরও একটা কথা, এই পদগুলি তিনি শুধু পদরচনাশক্তির প্রমাণ দিবার জন্য রচনা করেন নাই ; মূল কাব্যের বক্তব্যবিষয়ের প্রবেশক হিসাবে তিনি এগুলিকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন—যাহা মাধব আচার্যের বিষ্ণুপদে সুলভ নহে। যেমন—খুল্লনা-ধনপতির মিলন বর্ণনার পূর্বে রাধাকৃষ্ণ মিলনের ধুয়া :

আজু রাধার শুভদিনে মিলিল কানাই ।
ভাগ্যবতী রাধার ভাগ্যের সীমা নাই ॥

বা খুল্লনা-বিবাহে পুলকিত ধনপতির সাজসজ্জা বর্ণনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণের অভিসারের তুলনা :

মুরলী আজু ঘন ঘন বাজে ।
না জানি কালিয়া চান্দ কার তরে সাজে ॥
সঘন গভীর নিশি জলদ ডাকে ঘোর ।
রাধার মন্দিরে আজি সুখের নাহি ওর ॥

অনেকটা গৌরচন্দ্রিকার সঙ্গে এই পদগুলির প্রয়োগ-নৈপুণ্যের তুলনা মনে পড়ে। গৌরচন্দ্রিকা যেমন বৈষ্ণব পদাবলীর প্রবেশক, তেমনি এই বৈষ্ণব-পদগুলি মূল পালার অনেক স্থলে প্রবেশক বা সূচকরূপে সার্থক হইয়াছে। এই পদসমূহ যে রামদেব রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ পদের ভণিতায় প্রায় সর্বত্র রামদেবের নাম আছে। তবে দু-একটি পদে আবার গোবিন্দ দ্বিজ, মনোহর দ্বিজ ও উমাকান্তের ভণিতা পাওয়া যায়।[৯৫] কবি শাক্ত মঙ্গলকাব্য রচনা করিলেও মনোভাব ও চিত্তধর্মের দিক হইতে বৈষ্ণব রসেই নিষ্ণাত ছিলেন। তাহার প্রমাণ—এই কাব্যে তিনি শুধু বৈষ্ণব পদের আদর্শেই নিজে পদ রচনা করেন নাই, বৈষ্ণব কবিদের পদকেও গ্রন্থ মধ্যে সাদরে স্থান দিয়াছেন। যাহা হউক দ্বিজ রামদেব বহুকাল লোকলোচনের পরপারে বিস্মৃতিলোকে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। ডঃ আশুতোষ দাস মহাশয় কবির কাব্যকে আবিষ্কার ও প্রকাশ করিয়া চণ্ডীমঙ্গল শাখার একটি লুপ্ত রত্নোদ্ধার করিয়াছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্যাধ কালকেতু ও ধনপতির সমুদ্রযাত্রা অবলম্বনে চণ্ডীপূজা বিষয়ক যে সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ, উল্লেখযোগ্য এবং উল্লেখের অনুপযুক্ত পুঁথিপুস্তিকাদি রচিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা অধিক নহে, গুণগত উৎকর্ষও এমন কিছু চিত্তাকর্ষী নহে। দ্বিজ জনার্দনের চণ্ডীমঙ্গলের যে ক্ষুদ্র পুঁথিটি (সা. প. পুঁথি—২০৭) দীনেশচন্দ্র আলোচনা করিয়াছিলেন, আসলে সেটি একটি অনতিপ্রসর মেয়েলি ব্রতকথার লৈখিক রূপ মাত্র। আকার অতিশয় ক্ষুদ্র, কালকেতুর গল্পটি ব্রতলেখক 'নম নম' করিয়া সারিয়াছেন। ভাষা এত আধুনিক[৯৬] যে, দীনেশচন্দ্রের মতানুসারে কবিকে ২৫০-৩০০ শত

৯৫ নিম্নলিখিত সংখ্যাচিহ্নিত পদে যে যে কবির ভণিতা পাওয়া যাইতেছে তাহার তালিকা :—

(১) গোবিন্দ দ্বিজ—২০, ২৭, ৪২, ৪৭, ৫২ (গোবিন্দসুত), ৫৩, ৬৫, ৬৯, ৭৪

(২) মনোহর দ্বিজ—৪৬

(৩) উমাকান্ত—৯৫

ডঃ দাস অনুমান করেন, গোবিন্দ দ্বিজ, মনোহর দ্বিজ ইঁহারা চৈতন্যসমসাময়িক পদকর্তা (ভূমিকা-পৃ. ৩⁄০) কিন্তু বৈষ্ণবপদসঙ্কলনে এই ভণিতায় কোন কবির পদ পাওয়া যায় না।

৯৬ ব্যাধেরে দেখিয়া দেবী উপায় চিন্তিল।
দুর্গতি নাশিনী দেবী সদয় হইল ॥
স্বর্ণ গোধিকারূপ ধরিয়া পার্বতী।
ব্যাধ পথ জুড়িয়া রহিল ভগবতী ॥ (জনার্দনের চণ্ডীমঙ্গল)

ইহা কদাপি সপ্তদশ শতাব্দীর ভাষা হইতে পারে না।

বৎসরের প্রাচীন বলা যায় না। দীনেশচন্দ্র 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়ে' (১ম) দ্বিজ হরিরামের যে চণ্ডীমঙ্গলের কথা বলিয়াছেন তাহার পুঁথিটি ১০৮০ সালে (১৬৭৪ খ্রীঃ) অনুলিখিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহাকে কিছু প্রাচীন বলিতে হইবে। হরিরাম এই চণ্ডীমঙ্গলকে 'অদ্রিজামঙ্গল' বলিয়াছেন। এই কবি বিদ্রোহী জমিদার শোভা সিং-এর বোধহয় সভাকবি ছিলেন, কারণ কাব্যমধ্যে শোভা সিং-এর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ১৬৯৬ খ্রীঃ অব্দে শোভা সিং নিহত হন। সুতরাং কাব্যটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত হইতে পারে।

দুর্গামঙ্গল ॥

সপ্তদশ শতাব্দীর যে কয়টি চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের উল্লেখ করা হইল, সেগুলিতে কালকেতু ও ধনপতির কাহিনী স্থান পাইয়াছে, এবং দেবী চণ্ডিকাও গ্রামীণ চণ্ডী'কাল্ট্'-এর দ্বারা পরিস্রুত হইয়াছেন—তাহাও স্বীকার্য। বহুকাল হইতে যে চণ্ডীদেবতার পূজা-উপাসনা বাঙলাদেশে চলিয়া আসিতেছিল তাহার অনেকটাই মার্কণ্ডেয় পুরাণের দুর্গাসপ্তশতী অবলম্বনে নির্বাহ হইত। কিন্তু মহিলাসমাজে ও লৌকিক ধর্মানুশীলনে ব্যাধের দেবী চণ্ডীর পূজার্চনাই অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছিল, এবং এই দেবীর মহিমাজ্ঞাপক দুইপ্রকার কাহিনীকে (কালকেতু ও ধনপতি) কেন্দ্র করিয়া বিপুল-কলেবর চণ্ডী-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহা চণ্ডীমঙ্গল, অভয়ামঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, সারদা চরিত প্রভৃতি নামে পরিচিত। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী হইতে দেবীমহিমা বিষয়ক আর একপ্রকার মঙ্গলকাব্যশ্রেণীর অনুবাদধর্মী কাব্য প্রচলিত হইয়াছিল—ইহার নাম দুর্গামঙ্গল। সপ্তদশ শতব্দীতে রচিত এইরূপ দুইখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, এবং তাহা মুদ্রিতও হইয়াছে। পূর্বে আলোচিত চণ্ডীমঙ্গল—লৌকিক মঙ্গলকাব্য, আর এই দুর্গামঙ্গল সম্পূর্ণরূপে পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য—কিন্তু লৌকিক মঙ্গলকাব্যের ছায়ায় পড়িয়া যাওয়াতে ইহার তেমন প্রচার হয় নাই।

বহুকাল হইতে বাঙলাদেশে পুরাণবর্ণিত চণ্ডীপূজা, বিশেষতঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবী দশভুজার বিবিধ দৈত্যদানব বধ এবং মেধস মুনি, সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের কাহিনাটি উচ্চতর ব্রাহ্মণ্য সমাজে সুপরিচিত ছিল; বাঙালীর দুর্গোৎসবও এই মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতেই নির্বাহ হইত। প্রাচীন

বাঙলার প্রসিদ্ধ রাজা দনুজমর্দনদেব 'চণ্ডীচরণপরায়ণ'—এই গৌরববাচক উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক চণ্ডীপূজাদি মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় নির্বাহ হইত। দুর্গোৎসবে চণ্ডীপাঠের সময় সংস্কৃতজ্ঞ শ্রোতারা দুর্গাসপ্তশতীর পুণ্যকাহিনী বুঝিতে পারিতেন; কিন্তু যাহারা সংস্কৃত বুঝিত না, তাহারা হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্মোৎব দুর্গাপূজাপদ্ধতির সবটা অনুধাবন করিতে পারিত না। তাহারা বরং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতু ও ধনপতির গল্প বেশ বুঝিত। কারণ প্রথমতঃ লৌকিক চণ্ডীর কাহিনী প্রাগার্য যুগ হইতে আর্যেতর কৌমের মধ্য দিয়া বহু যুগ ধরিয়া বহিয়া আসিতেছিল। উপরন্তু ইহা জীবন্ত ব্রত-অর্চনারূপে মধ্যযুগের স্ত্রীসমাজে বিশেষ পরিচিত ছিল। কিন্তু সেই দিক দিয়া পৌরাণিক চণ্ডীকাহিনী সাধারণ সমাজে ততটা জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই। এই ধরণের পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যের সংখ্যাল্পতাই তাহার প্রমাণ। যাহা হউক এখানে সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত (আংশিক অনূদিত) দুইখানি দুর্গামঙ্গলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

চণ্ডীর মহিমাবিষয়ক এই শ্রেণীর মঙ্গলকাব্য দুর্গামঙ্গল বা ভবানীমঙ্গল নামে পরিচিত। ইহাতে প্রধানতঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণের দুর্গাসপ্তশতীর আখ্যানটি বিস্তারিত আকারে অনুসৃত হইয়াছে, কোথাও ভাবানুবাদের সাহায্য লওয়া হইয়াছে, কোথাও-বা চণ্ডীর সংস্কৃত শ্লোককেই ভাঙিয়া বাংলা পয়ার-ত্রিপদীতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। অবশ্য কবিগণ মার্কণ্ডেয় চণ্ডীকে পুরাপুরি অনুসরণ করিলেও রামচন্দ্রের অকালবোধন, হিমালয়-মেনকা-দুর্গাসংক্রান্ত শিবের কাহিনীকে (যাহা মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত নহে) বেশ ফলাইয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং এই পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যগুলি পুরাপুরি অনুবাদ-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। কারণ কবিগণ মূল চণ্ডীর বহির্ভূত কিছু কিছু কাহিনী ইহাতে সংগ্রথিত করিয়াছেন —তবে এই দুর্গামঙ্গল কাব্য মঙ্গলকাব্য অপেক্ষা অনুবাদ-সাহিত্যের অধিকতর নিকটবর্তী।

সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত দুর্গামঙ্গলের দুইজন কবির নাম উল্লেখযোগ্য —'চণ্ডিকা বিজয়'-এর কবি দ্বিজ কমললোচন এবং দুর্গামঙ্গলের আর এক কবি ভবানীপ্রসাদ রায়। প্রথমে সংক্ষেপে দ্বিজ কমললোচনের চণ্ডিকা-বিজয়ের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

দ্বিজ কমললোচনের 'চণ্ডিকাবিজয়' (কোন কোন স্থলে 'কালীযুদ্ধ' বলা হইয়াছে) ১৩১৬ বঙ্গাব্দে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে পঞ্চানন সরকারের সম্পাদনায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার মূল পুঁথি রংপুর হইতে সংগৃহীত হইয়া রংপুর সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। সম্পাদকের বিবৃতি অনুসারে দ্বিজ কমললোচন রংপুর জেলার আন্ধুয়া পরগণার মিঠাপুর থানার অন্তর্গত ঘাঘট নদীর তীরে অবস্থিত চড়কাবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম যদুনাথ[৯৭]। কবি কাব্যে এইভাবে নামধাম পিতৃপরিচয় দিয়াছেন :

ঘোড়াঘাট সরকার আন্ধুয়া পরগণা তার
দিল্লীশ্বর সুতের জাগির।
চতুর্দ্ধারি মুসলমান পুরাণের নাহি মান
বৈসে দ্বিজ ঘর্ঘটের তীর॥
চড়কাবাড়ীতে ঘর যদুনাথ বংশধর
নাম শ্রীকমললোচন।
অম্বিকা কৃপার লেশে চণ্ডিকা বিজয় ভাষে
শিরে ধরি শ্রীনাথ চরণ॥

এই শ্রীনাথ সম্ভবতঃ কবির গুরু। রংপুরের চারিদিকে মুসলমান বেষ্টিত অঞ্চলে হিন্দুর ধর্মকর্ম নষ্ট হইতেছিল, কবির মানসম্ভ্রমও বোধ হয় মুসলমান অত্যাচারে পদদলিত হইতেছিল। তাই কবি মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে কাহিনী সঙ্কলন করিয়া বোধ হয় মানসিক বল সঞ্চয় করিতে চাহিয়াছিলেন। কাব্যের মধ্যে 'দিল্লীশ্বর সুতের জাগির' উল্লিখিত হইয়াছে। দিল্লীশ্বরের পুত্র শাহ্‌সুজা ১৬৩৯ হইতে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙলার সুবাদারী করিয়াছিলেন। কবি এই সময়ে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই কাব্য রচনা করেন। আকারে আয়তনে কাব্যটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে—১৪৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম তিন অধ্যায়ে দেবদেবীর বন্দনার পর চতুর্থ অধ্যায় হইতে যথার্থ কাব্য আরম্ভ হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দুর্গাসপ্তশতী তাঁহার মূল অবলম্বন। কবি গ্রন্থের প্রারম্ভে কাব্যের উৎস নিজেই নির্দেশ করিয়াছেন :

মার্কণ্ড পুরাণে তোমার স্তবনে
সপ্তশত শ্লোকময়।

---

৯৭ শুদ্ধ সদাচার দ্বিজ যদুনাথ নাম।
কমললোচন তার সুতের আখ্যান॥

তাহাতে যে গুণ জানে বুধজন
সর্ব্বপ পাতক নয় ॥

পঞ্চম অধ্যায়ের সুরথোপাখ্যান হইতে আরম্ভ করিয়া সমাধি বৈশ্য, মেধস মুনি, মহামায়ার সৃষ্টি, দনুজদলনে যাত্রা, মহিষাসুর-শুম্ভ-নিশুম্ভ-চণ্ডমুণ্ড-ধূম্রলোচন-রক্তবীজ বধ প্রভৃতি আখ্যান মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারেই প্রায় ভাষান্তরের মতো অনুসৃত হইয়াছে। অতঃপর ১৩৪ অধ্যায় হইতে বাঙালীর দশভুজা পূজা বর্ণনার পর কাব্য শেষ হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডী ও অসুরসংঘর্ষে যে বিচিত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হইয়াছে, সর্বাকাশ-পরিব্যাপিনী আদ্যাশক্তির বিস্ময়রাগোদ্বেল যে দেবী মূর্তি অঙ্কিত হইয়াছে, কমল-লোচনের চণ্ডিকা-বিজয়ে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে না। প্রথমতঃ, সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিনির্ঘোষ, প্রচণ্ড আবেগ ও বিশালতা কমললোচন তদানীন্তন অপরিণত-গঠন বাংলায় কি করিয়াই-বা রক্ষা করিবেন? চণ্ডমুণ্ডের সেনা দেবীকে কটুকথা বলিয়া আক্রমণ করিতে আসিলে ক্রোধে দেবী যে কালিকামূর্তি ধারণ করিলেন, তাহার বর্ণনা কিছু প্রশংসা দাবি করিতে পারে :

রক্তবর্ণ হৈল দেবীর ত্রিতিন লোচন।
লোহিত বরণ দুর্গার ও চান্দবদন ॥
জবাপুষ্পের বর্ণ হৈল কলেবর।
মহাকোপে অভয়া কাঁপিছে থর থর ॥
অধর ওষ্ঠ কাঁপে কোপযুক্ত মনে।
হস্তপদ আদি সব কম্পমানে ॥
সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত দেবী ক্রোধ যুক্ত হয়্যা।
কেশরী বাহন যুদ্ধ স্থলেতে দাঁড়ায়া ॥
ভ্রূকুটি-কুটিল দেবী চাহে চারিভিতে।
ললাট হইতে কালী হৈল আচম্বিতে ॥
কৃষ্ণবর্ণ ধরে কালী করাল বদনা।
খড়্গচর্ম্ম করে ধরে বিকট দশনা ॥
চতুর্ভুজ ধরে দেবী খট্টাঙ্গধারিণী।
দনুজমুণ্ডের মালা সর্ব্বাঙ্গে শোভিনী ॥

কবি দুই এক স্থলে প্রাচীন ও পৌরাণিক পরিবেশ বিস্মৃত হইয়া তাঁহার সমকালীন দেশকালের অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। দৈত্যগণ দেবীকে বন্দুক লইয়াও আক্রমণ করিয়াছিল : 'বন্দুক গেরাপ ছাড়ে কোন কোন

বীর'! মহিষাসুরের সমরকক্ষ বর্ণনায় (যুদ্ধঘর) কবি রংপুরের ঘরের চাল ছাইবার প্রক্রিয়া বর্ণনা করিয়াছেন :

কনকের সারকরুয়া কনকের ছাটনি।
রজতের গুণা দিয়া লয়াছে বান্ধনি ॥

সারকরুয়া, ছাটনি, আন্ধারি, ঝরা, খিচনি প্রভৃতি শব্দ মহিষাসুরের কক্ষ বর্ণনায় ব্যবহৃত হইয়াছে (মুদ্রিত গ্রন্থের ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা)। এখনও রংপুর অঞ্চলের ঘরামিরা এই শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া থাকে। যাহা হউক কবি কমললোচন মার্কণ্ডেয় পুরাণকে আদর্শ করিয়া অনুবাদ বা ভাবানুবাদের সাহায্যে পৌরাণিক কাহিনীকে চণ্ডিকাবিজয়ে ব্যবহার করিয়াছেন, কাব্য-হিসাবে তাহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। অবশ্য লৌকিক মঙ্গলকাব্যের পাশে পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যের ধারা (যদিও কিছু বৈচিত্র্যহীন) সপ্তদশ শতাব্দী হইতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এই কাব্য হইতে তাহা অনুমান করা যায়।

ভবানীপ্রসাদের 'দুর্গামঙ্গল'ও এই একই আদর্শ অনুসরণ করিয়াছে। জন্মান্ধ দুঃখী কবি ভবানীপ্রসাদের কাব্য রচনাকৌশলের দিক হইতে কমললোচন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ময়মনসিংহ জেলার আটিয়া পরগণার কাঁটালিয়া গ্রামে বৈদ্যবংশে কবি ভবানীপ্রসাদের জন্ম হয়। তাঁহাদের মৌলিক উপাধি ছিল 'কর', কিন্তু 'রায়' উপাধি তাঁহারা অধিকাংশ স্থলে ব্যবহার করিতেন। কবির পিতার নাম নয়নকৃষ্ণ রায়। জন্মান্ধ কবি বাল্যেই মাতাপিতা হারাইয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সে তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। অন্ধকবি প্রথম জীবনে জ্ঞাতিদের দ্বারা নিগৃহীত হইয়া বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন। দুর্গামঙ্গলের একস্থলে কবি আত্মপরিচয় দিয়া বলিয়াছেন :

নিবাস কাঁটালিয়া গ্রাম বৈদ্যকুলে জাত।
দুর্গার মঙ্গল বোলে ভবানী প্রসাদ ॥
জন্মকাল হৈতে কালী করিত দুঃখিত।
চক্ষুহীন করি বিধি করিলা লিখিত ॥
মনে দঢ়াইয়াছি আমি কালীর চরণ।
দাঁড়াইতে আমার নাহিক কোন স্থান ॥
জ্ঞাতিভ্রাতা আছে আমার নাম কাশীনাথ।
তাহার তনয় দুই কি কহিব সম্বাদ ॥
জাতিভাই করি তেঁহ করেন আপ্যিত।
তাহার তনয়গুণ কহিতে অদ্ভুত ॥

তারপর কবি জ্ঞাতিভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের দ্বারা কিরূপ নির্যাতিত হইতেন, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। এই ধরণের কাব্যে এইরূপ ব্যক্তিগত বাস্তব পরিচয় একটু অভিনব ঘটে। প্রাপ্ত পুঁথিটির শেষে যে তারিখ (১০৭১) আছে,[১৮] তাহা বঙ্গাব্দ হইলে পুঁথিটি ১৬৬৫ খ্রীঃ অব্দে অনুলিখিত হইয়া থাকিবে, এবং কবি ইহার কিছু পূর্বে বর্তমান ছিলেন তাহাও অনুমান করিতে হয়। কিন্তু ব্যোমকেশ মুস্তফীর সম্পাদনায় সাহিত্যপরিষদ হইতে দুর্গামঙ্গলের যে মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন-তারিখ নাই।

ব্যোমকেশ মুস্তফী দুর্গামঙ্গলের দুইখানি পুঁথি অবলম্বনে সর্বপ্রথম এই কাব্য সম্পাদনা করেন। অবশ্য পুঁথি দুইটির পাঠের মধ্যে নানা গণ্ডগোল ছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 'দুর্গা সপ্তশতী' অবলম্বনে কবি ভবানীপ্রসাদ এই পুরাণাশ্রয়ী কাব্য রচনা করেন। ঠিক অবিকল অনুবাদ না করিয়া কবি অধিকাংশস্থলে ভাবের অনুসরণ করিয়াছেন। মূল পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তর দিয়া চণ্ডীমাহাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে। কবি কিন্তু তাহার পূর্বেও খানিকটা কাহিনী রচনা করিয়াছেন—যাহাতে বাঙলাদেশে প্রচলিত দুর্গোৎসবের ঐতিহ্য কিয়দংশ গৃহীত হইয়াছে। কাব্যের প্রারম্ভভাগে পুরাণের অতিরিক্ত এই কাহিনীগুলি আছে:—(১) রামের বিরহ, (২) রাম ও অগস্ত্যসংবাদ, (৩) মেনকা-স্বপ্ন, (৪) মৈনাককে প্রেরণ, (৫) মৈনাকের কৈলাসযাত্রা, (৬) মৈনাক-শিবসংবাদ, (৭) মৈনাক গৌরীসংবাদ, (৮) শিব-গৌরী সংবাদ, (৯) গৌরী বিদায়, (১০) হিমালয়ে গৌরীর আগমন। ইহার পর মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে সুরথপ্রসঙ্গ শুরু হইয়াছে। সুরথের পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্তি পর্যন্ত অংশে (সুরথ প্রসঙ্গ, মধুকৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ, শুম্ভনিশুম্ভোপাখ্যান, ধূম্রলোচন বধ, চণ্ডমুণ্ড বধ, রক্তবীজ বধ, শুম্ভনিশুম্ভ বধ, দেবীস্তুতি, দেবীর আশ্বাসবাণী, সুরথের দুর্গাপূজা, তাঁহার পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্তি) কবি মার্কণ্ডেয় পুরাণকেই অনুসরণ করিয়াছেন। তার পর আবার শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজা (অগস্ত্য মার্কণ্ডেয় পুরাণের গল্প বিবৃত করিলে রামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের আয়োজন), দেবীস্তুতি, দেবীর বরদান, শিবের হিমালয়ে গমনোদ্যোগ, এবং

---

১৮ সা-প-পত্রিকা, ১৩০৩

হিমালয়ে গমন, মেনকার খেদ, দেবীর কৈলাস আগমন—সমাপ্তি অংশের এই বর্ণনাগুলিতে মঙ্গলকাব্যের ধারা অনুসৃত হইয়াছে।

কবি যে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর পুরাপুরি অনুবাদ করেন নাই তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন :

শ্লোক ভাঙ্গিয়া লিখি যদি পুস্তক বাড়য়।
সংক্ষেপে কহিলাম কিছু বুঝে যেহি লয়॥

প্রারম্ভ ভাগে কবি কাব্যের বিষয়সূচী এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন :

যেরূপে হৈল পূজা অকালে আশ্বিনে।
মন দিয়া সেহি কথা শুন সর্বজনে॥
যেমতে আসিলা দেবী বাপের নিবাস।
ই তিন ভুবনে হৈল পূজার প্রকাশ॥
সৃষ্টির পত্তন মধুকৈটভ বিনাশ।
মৈষাসুর বধ দেবীর মাহাত্ম্য প্রকাশ॥
রক্তবীজ বধ শুম্ভনিশুম্ভ নিধন।
দেবতার স্তুতিবাণী স্বরথ মোক্ষণ॥
যেন মতে রামচন্দ্র সমুদ্রের তীরে।
দশভুজা রূপে পূজা করিলা চণ্ডীরে॥
নিদ্রা হৈতে ভগবতীকে চৈতন্য করিয়া।
লঙ্কাজয়ী হৈলা রাম তোমাকে সেবিয়া॥
গিরিপুরী হৈতে দেবী চলিলা কৈলাস।
যেরূপে রহিলা দেবী শিবের নিবাস।
ই সব মাহাত্ম্য কিছু করিব প্রকাশ॥

কাব্যের আরম্ভ একটু নূতন—মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক। রামচন্দ্র লঙ্কা অভিযানে সেতু বাঁধিতে গিয়া অকালে দেবীর আরাধনা করেন, অগস্ত্য ঋষিকে তিনি দেবীমাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিলে মুনি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর কাহিনী রামচন্দ্রকে শুনাইলেন—এইভাবে কাব্য আরম্ভ হইয়াছে। "ভবানী প্রসাদ সকল স্থলে শ্লোকে শ্লোকে অনুবাদ না করিলেও অধিকাংশ স্থলেই ভাবগ্রহণ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সরল সুন্দর অনুবাদ হইয়াছে।"[৯৯] চণ্ডীব বিখ্যাত "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ" অংশের অনুবাদটি নিতান্ত মন্দ হয় নাই :

---

৯৯ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৩

যেহি দেবী বুদ্ধিরূপে সর্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে॥
যেহি দেবী লজ্জারূপে সর্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে॥
যেহি দেবী ক্ষুধা রূপে সর্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে॥

ভবানীপ্রসাদের ভাষা পরিচ্ছন্ন, সরল—কিছু অর্বাচীন বলিয়া মনে হয়। প্রাপ্ত পুঁথির সন-তারিখে কারচুপি না থাকিলে তিনশত বৎসরের পূর্ববর্তী অন্ধকবি ময়মনসিংহে বসিয়া পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষা দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত করিয়া-করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। যেমন:

দেখি আনন্দিত হৈলা যত দেবগণ।
করিলা আপনে কালী বিস্তার বদন॥
খড়্গ ধারে মাথা তার কাটিয়া ফেলায়।
ভূমিতে পড়িবা মাত্র তুলিছে জিভায়॥
ছিটায় ব্রহ্মাণী দেবী কমণ্ডলের জল।
জলের ছিটায় ভস্ম হইছে সকল॥
করেন ইন্দ্রাণী দেবী বজ্রের প্রহার।
দেবগণে বনমধ্যে করে মহামার॥
শিবাগণে মরামাংস টানি টানি খায়।
রুধির খাইয়া অস্থি অপরে চাবায়॥
রুধির করিছে পান ভৈরবী যোগিনী।
সুধাপানে মত্ত হৈলা আপনি ভবানী॥

এই বীভৎস বর্ণনাতেও কবি রচনার গুণে ক্লাসিক সংযম রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। ভবানী প্রসাদের দুর্গামঙ্গল মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুসরণে রচিত হইয়াছে, কাজেই ইহাতে কবির নিজস্ব কৃতিত্ব দেখাইবার বিশেষ অবকাশ ছিল না। তবু সহজ বিবৃতিমূলক বর্ণনায় কবির ভাষা যথোপযুক্তই হইয়াছে।

এই ময়মনসিংহ জেলায় আদাজান গ্রামে কবি রূপনারায়ণের দুর্গামঙ্গল পাওয়া গিয়াছে।[১০০] অবশ্য প্রাপ্ত পুঁথিতে সন-তারিখ কিছুই নাই। কিন্তু কুলজিগ্রন্থের উল্লেখ হইতে কেহ কেহ এই কবির কুলপরিচয় আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। আদাজান গ্রামের পুরাতন অধিবাসী ঘোষ পরিবার নাকি রূপনারায়ণের উত্তরপুরুষ। ইঁহাদের কুলপঞ্জিকা অনুসারে

১০০ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩০৪ (রসিকচন্দ্র বসুর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

১৩০৪ বঙ্গাব্দের আধুনিক ঘোষবংশধর হইতে অষ্টমপুরুষ ছিলেন রূপনারায়ণ। সাধারণতঃ প্রতি একশত বৎসরে তিন পুরুষ ধরা হয়। তাহা হইলে প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে—অনুমান সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৬৪৯?) কবি বর্তমান ছিলেন, এবং ঐ সময়ে সম্ভবতঃ কাব্যটি রচিত হইয়াছিল। যে পুঁথিটি পাওয়া গিয়াছে তাহা ১৮২৯ সালের অনুলিখন। যদিও পুঁথির মধ্যে কবির কোন পরিচয় নাই, তথাপি 'কায়স্থবংশাবলী' শীর্ষক কুলজী গ্রন্থে রূপনারায়ণের কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। কবিরা ঘোষ-উপাধিক; পিতার নাম জগন্নাথ ঘোষ। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার প্রবন্ধকারের মতে [১০১] রূপনারায়ণ ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুঁথিতে কিছু কিছু পুরাতন ও আঞ্চলিক শব্দ (কহন্তি, করুকা, বলোঁ, মাঙ্গিলা অর্থাৎ মাগিলা, কমুন অর্থাৎ কেমন, দেখিলোঁ) থাকিলেও ভাষাতে আধুনিক শব্দ-যোজনাই অধিক। কবির সংস্কৃত ভাষায় অধিকারও বেশ প্রশংসনীয়। কাব্যের মাঝে মাঝে তিনি যে সমস্ত সংস্কৃত স্তবস্তুতি লিখিয়াছেন, তাহার মুন্সিয়ানা স্বীকার করিতে হইবে। কবির হিন্দী ও ব্রজবুলিতে বেশ অধিকার ছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণ অবলম্বনে এই কাব্য রচিত হইলেও কবি আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই; কাব্যটি সর্বসাধারণের জন্য পাঁচালী আকারে রচিত, অনেক রাগরাগিণীর উল্লেখও আছে। মূল চণ্ডীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে ভাষান্তরিত করিতে গিয়া তাঁহাকে দীর্ঘতর বর্ণনার সাহায্য লইতে হইয়াছে। কাজেই কাব্যটি ঠিক অনুবাদধর্মী না হইয়া ব্যাখ্যামূলক হইয়া পড়িয়াছে। রচনাতেও আলঙ্কারিক বাহুল্য সর্বদা সৌন্দর্যবর্ধক হয় নাই, সাধারণের জন্য রচিত বলিয়া কবি ইহাতে চিত্তাকর্ষী ছন্দ-অলঙ্কারের নৈপুণ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যেমন—

পাবক তপন কিরণ দেহ।
চিকুর নিকর সজল মেহ॥
পীযূষসদন বদন ইন্দু।
তরল কমল শম্ভু সিন্ধু॥

অথবা

কৌমোদকী চারু চক্র
মোহে বৈরী নাশে দক্ষ

---

১০১ ঐ, পৃ ৭৭

অসংখ্য বিপক্ষে কক্ষ
সর্বভক্ষ ঈক্ষিণী।
ইন্দ্রচন্দ্র দেববৃন্দ
পূজতি পদারবিন্দ
বাহন মৃগেন্দ্র ইন্দ্র
ব্রহ্মবন্দ্য বন্দিনী ॥

রূপনারায়ণ শাক্ত কাব্য লিখিলেও রচনার অনেক স্থলে বৈষ্ণব মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। কাব্যের প্রারম্ভে বিনয়সূচক পংক্তি গুলি তাঁহার বৈষ্ণব হৃদয়টিকেই প্রকাশিত করিয়াছে :—

তাহার চরিত্র কিছু করিতে করি আশা :
শ্লেষ না করিয় ভাই বলি অপভাষা ॥
চণ্ডাল-ভাণ্ডেতে যদি থাকে গঙ্গাজল।
তথাপি পবিত্র বড় জানিয় নিশ্চল ॥

সপ্তদশ শতাব্দীর এই সমস্ত দুর্গামঙ্গল কাব্য হইতে বুঝা যাইতেছে যে, মঙ্গলকাব্যকে অবলম্বন করিয়া যেমন লৌকিক শাক্ত আদর্শ প্রচারিত হইয়াছিল, তেমনি পৌরাণিক শাক্ত পুরাণের প্রভাবে দুর্গামঙ্গলের মতো শাক্ত মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকরী হইতে থাকে ; পরবর্তী শতাব্দীতেও এই পৌরাণিকতার আদর্শ অধিকতর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অবশ্য এই সমস্ত কাব্যসাহিত্যে কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিভার অভ্যুদয় হয় নাই বলিয়া পুরাণধর্মী অসংখ্য বাংলা কাব্য রচিত হইলেও কোনখানি পাঠকচিত্তে গভীর রেখাপাত করিতে পারে নাই। লৌকিক মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এই ধরণের পুরাণকেন্দ্রিক মঙ্গলকাব্যের নানা প্রভেদ লক্ষ্য করা যাইবে। এই পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যগুলি, বিশেষতঃ দুর্গামঙ্গলের ন্যায় চণ্ডীকাব্য পৌরাণিক আদর্শ অনুসৃত হওয়ার ফলে ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গিমা হইতে মঙ্গলকাব্যের স্থূলতা ও গ্রাম্যতা অপসৃত হইয়াছে, ভাষাও অনেক মার্জিত হইয়াছে। কিন্তু লৌকিক মঙ্গলকাব্যের কবিগণ (মনসা-চণ্ডী) যেরূপ সৃষ্টিশীল প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, দুর্গামঙ্গল ধরণের পুরাণাশ্রয়ী মঙ্গলকাব্যে সেরূপ কোন চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শেষোক্ত কাব্যে কবিগণ মার্কণ্ডেয় পুরাণকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া মূলকে ছাড়িয়া

আপন শক্তি ও প্রতিভার সাহায্যে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এই সমস্ত কারণেই দুর্গামঙ্গল শ্রেণীর কাব্য লৌকিক মঙ্গলকাব্যের মতো ব্যাপক প্রচার লাভ করিতে পারে নাই।

এই সপ্তদশ শতাব্দীতে এই ধরণের নানাকাহিনী ব্রতকথা বা শিথিল মঙ্গলকাব্যের আকারে রচিত হইয়াছিল এবং স্থানীয় অঞ্চলে কিছু প্রচার লাভ করিয়াছিল।

যেমন ১৬৯৭ খ্রীঃ অব্দে লিপিকৃত ঘোর মঙ্গলচণ্ডীর পুঁথি,[১০২] তেমনি দ্বিজ মাধব ও দ্বিজ শ্রীনাথের 'চণ্ডিকার ব্রতকথা'।[১০৩] সাহিত্যের ইতিহাস বিবর্তনে এগুলির বিশেষ কোন প্রভাব নাই। পরবর্তী শতাব্দীতে এই প্রকার অপদার্থ পাঁচালী-ব্রতকথার ছোট ছোট পুঁথি গোটা দেশেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল মেয়েলি ব্রতকথার বাহিরে ইহার কোন গৌরব নাই, এবং সাহিত্যের ইতিহাসে পাদটীকাতে ইহাদের নামোল্লেখ ব্যতীত বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নাই, প্রয়োজনও নাই। অতঃপর সপ্তদশ শতাব্দীর লৌকিক ও পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যের সমাপ্তি প্রসঙ্গে কবি কৃষ্ণরামের বিশেষ উল্লেখ বোধ করিতেছি। এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে আমরা মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলের যে পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে, সপ্তদশ শতাব্দীতে লৌকিক মঙ্গল কাব্যের খুব উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া না গেলেও, যাহা মিলিয়াছে তাহাও একেবারে তুচ্ছ করিবার যোগ্য নহে। এই শতাব্দীতেই পুরাণ কাহিনী অবলম্বন করিয়া কবিরা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সমস্ত পৌরাণিক ও অনুবাদাশ্রয়ী পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন, আমরা সংক্ষেপ তাহার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এই শতাব্দীতে যিনি অতি সাধারণ প্রতিভা লইয়া অনেকগুলি লৌকিক মঙ্গলকাব্যে লিখিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণরাম দাস। এখানে তাঁহার কাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

---

১০২ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩০৮

১০৩ ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ইতি.—১ম (অপরার্ধ)

৩

কৃষ্ণরাম দাসের মঙ্গলকাব্য

কবি কৃষ্ণরামদাস পাঁচখানি মঙ্গলকাব্য রচনা করিয়া যে বিষয়-বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সহিত প্রতিভা যুক্ত হইতে পারে নাই বলিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি এতদিন প্রায় অজ্ঞাতজীবন যাপন করিয়াছেন। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় সর্বপ্রথম কবির জীবন ও কাব্যসম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করেন। তাঁহার পূর্বে রায়মঙ্গল ও কালিকামঙ্গল আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার নামটি উল্লিখিত হইত—এই মাত্র। সম্প্রতি ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় কবি কৃষ্ণরাম দাসের সমগ্র গ্রন্থাবলী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রকাশিত হওয়াতে কবির প্রতিভা ও অন্যান্য প্রসঙ্গে আলোচনা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছে।

'কালিকামঙ্গলে' কবি প্রদত্ত আত্মবিবরণী হইতে কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সপ্তগ্রাম সরকারের অধীন ভাগীরথীর পূর্ব পারে অবস্থিত কলিকাতা পরগণার অদূরে নিমিতা (আধুনিক নিমতে) গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়।[১০৪] এই নিমিতাগ্রাম এখনও জনবহুল, কলিকাতার আটমাইল উত্তরে বেলঘরিয়া রেলস্টেশনের একমাইল পূর্বে অবস্থিত। এই গ্রামের জমিদার সাবর্ণ্য গোত্রাধিকারীদের নিকট হইতে জোব চারনক কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর—তিনখানি গ্রাম কিনিয়া লইয়াছিলেন। কবির পিতার নাম ভগবতী দাস, জাতিতে তাঁহারা কায়স্থ। কবি মাত্র বিশ বৎসর বয়সে ("বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর") প্রথম কাব্য 'কালিকামঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। যখন তিনি এই কাব্য রচনা করেন তখন দিল্লীর সিংহাসনে ঔরংজেব বাদশাহ এবং শায়েস্তা খাঁ বাঙলার সুবাদার :

অরংসাহা ক্ষিতিপাল রিপুর উপরে কাল
রামরাজা সর্বজনে বলে।
নবাব সারিস্তা খাঁ আদি করি সাতগাঁ
বহু সরকার করতলে॥ (কালিকা মঙ্গল)

---

১০৪ অতি পুণ্যময় ধাম সরকার সপ্তগ্রাম
কলিকাতা পরগণা তার।
ধরণী নাহিক তুল জাহ্নবীর পূর্বকূল
নিমিতা নামেতে গ্রাম যার॥ (কৃষ্ণরাম গ্রন্থাবলী, কালিকামঙ্গল)

নবাব শায়েস্তা খাঁ বাঙলায় দুইবার সুবাদার হইয়াছিলেন—১৬৬৪-১৬৭৬ খ্রীঃ অঃ এবং ১৬৭৯-১৬৮৯ খ্রীঃ অঃ। ইহার মধ্যেই কবির প্রথম কাব্য 'কালিকা-মঙ্গল'[১০৫] রচিত হইয়াছিল। 'কালিকামঙ্গলে' যে সন-তারিখ কৌশলে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৫৯৮ শক বা ১৬৭৬-৭৭ খ্রীঃ অব্দ পাইয়াছেন। যখন কালিকামঙ্গল রচিত হয়, তখন কবির বয়স বিশ বৎসর। তাহা হইলে তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মোট পাঁচখানি কাব্য তাঁহার ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে—(১) কালিকামঙ্গল, (২) রায়মঙ্গল, (৩) ষষ্ঠীমঙ্গল, (৪) শীতলামঙ্গল, (৫) কমলা-মঙ্গল। পরবর্তী অধ্যায়ে কালিকামঙ্গল আলোচনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণরামের প্রথম কাব্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান প্রসঙ্গে শুধু অবশিষ্ট চারিখানি কাব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। একই কবির লেখনী হইতে পাঁচখানি মঙ্গলকাব্য বাহির হইয়াছিল, কবির পক্ষে ইহা শ্লাঘার বিষয় বটে; কিন্তু কাব্যবিচারে পাঁচখানির কোনটিই বিশেষ প্রশংসা দাবি করিতে পারে না, একমাত্র কালিকামঙ্গলেই কিঞ্চিৎ কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

রায়মঙ্গল ॥

কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল যদিও গ্রন্থতালিকার তৃতীয় গ্রন্থ, তথাপি আমরা বিষয়গৌরবের জন্য সর্বপ্রথম এই কাব্য আলোচনা করিতেছি। রায়মঙ্গল কাব্য ১৬০৮ শকে বা ১৬৮৬ খ্রীঃ অব্দে সমাপ্ত হয়। কবি নিজেই সন-তারিখের নির্দেশ দিয়াছেন :

কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল।
বসু শূন্য ঋতু চন্দ্র সকের বৎসর ॥

ব্যাঘ্রবাহনে আবির্ভূত দক্ষিণরায়ের মহিমাকীর্তনই এই লোককাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। মঙ্গলকাব্যের রচনার পশ্চাদপটে তদানীন্তন সমাজ ও গণজীবনের প্রভাব আবিষ্কার করাও দুরূহ নহে। আর্যেতর যুগের ধর্মবিশ্বাস ব্রতকৃত্যাদি বাংলা মঙ্গলকাব্যের কায়া নির্মাণ করিয়াছে, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণ অনেক সময় এই ধরণের কাব্যের কাহিনী, চরিত্র ও ভাব-তত্ত্বকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। আদিতে আর্যেতর সমাজে কৃষিজীবী অরণ্যবাসী

---

১০৫ পরবর্তী অধ্যায়ে কালিকামঙ্গল আলোচনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

অস্ট্রিক কৌম ও তাহাদের বংশধরগণ প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে বা অন্য কোন পার্থিব আপদবিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য প্রচণ্ড শক্তিশালী লৌকিক দেবদেবীর পরিকল্পনা ও পূজা করিত, এই ধরণের ভয়ভক্তি-সঞ্জাত নানা উপধর্ম বা বা 'কাল্টের' (cult) প্রভাবেই বাঙলাদেশে মঙ্গলকাব্য-সমূহের বনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছে। কান্তারবাসিনী চণ্ডী, সর্পবিভূষিতা মনসা, ব্যাঘ্রবাহন দক্ষিণরায়—এ সমস্তই একটি প্রাচীন আরণ্যক সমাজব্যবস্থার স্মৃতিচিহ্ন। অবশ্য চণ্ডী ও মনসার পূজা আরাধনা, স্তবস্তুতি, মাহাত্ম্যবিষয়ক মঙ্গলসাহিত্য সৃষ্টি—এ সমস্তই সমগ্র বাঙলাদেশ ব্যাপিয়া হইয়াছিল; কিন্তু দক্ষিণের রায় (দক্ষিণরায়) ও কালুরায়কে (কুম্ভীর বাহন দেবতা বা কুম্ভীর দেবতা) কেন্দ্র করিয়া যে 'কাল্ট্' বা উপধর্ম ও সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা সাধারণতঃ অঞ্চলবিশেষেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে এই উপধর্মাবলম্বী বাংলা সাহিত্য সংখ্যাধিক্য ও গুণগত উৎকর্ষে হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। রায় মঙ্গল, কালুরায়ের পাঁচালী, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, বাশুলীমঙ্গল—এই নামীয় কাব্যগুলি কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে। ইহাদের সংখ্যাও যেমন নখাগ্রে গণনীয়, তেমনি প্রভাব ও প্রচারও অতিশয় সীমাবদ্ধ।

ব্যাঘ্র-অধ্যুষিত নিম্নবঙ্গে ব্যাঘ্রদেবতা বা ব্যাঘ্রবাহন দেবতার আদিম পরিকল্পনা আর্যেতর সমাজে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব বঙ্গে পুরাতন যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে, এবং সে অনুমানের পক্ষে প্রমাণও আছে। বাঙলার প্রাচীন অস্ট্রিক বা নিষাদজাতীয় অধিবাসী, যাহারা বনেজঙ্গলে জলেজলায় বাস করিত, তাহারা যে বন্যজন্তুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ব্যাঘ্রদেবতার পরিকল্পনা করিয়াছিল, তাহাও মিথ্যা নহে। প্রচণ্ড শক্তিধর ব্যাঘ্রও যে আর্যসমাজে কোন দেবদেবীর বাহন হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। মহিষ ও সিংহ পুরাণোক্ত দেব-দেবীর বাহন হইয়াছিল, তেমনি বাঘও মহাযানী বৌদ্ধদেবী মঞ্জুশ্রীর বাহন বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু পৌরাণিক গ্রন্থে ব্যাঘ্রবাহন কোন দেব-দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই বাঙলাদেশে প্রচারিত ব্যাঘ্রবাহন দক্ষিণরায়ের পৌরাণিক অস্তিত্ব নাই। অস্ট্রিক লোকধর্মই নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়া দক্ষিণরায়ে পর্যবসিত হইয়াছে। অবশ্য বাঙলাদেশে বাঘকে দেবতা বলিয়া বড় কেহ পূজা করে না—যদিও মনসা পূজার সঙ্গে সর্পপূজারও

বিধান আছে। কিন্তু মধ্যভারত ও কর্ণাটের লোকে এখনও বাঘকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করে,[১০৬] এবং ভদ্রেতর সমাজে সভ্যতার বাহিরে পাহাড়ে জঙ্গলে এখনও এই ব্যাঘ্র পূজা প্রচলিত আছে। বাঙলাদেশে রায়মঙ্গলকাব্য ও দক্ষিণরায়ের উপাসনা পদ্ধতি হইতে দেখা যাইতেছে, সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সামান্য দুই একখানি রায়মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহা আর শুধু নিম্নসমাজে সঙ্কুচিত হইয়া নাই, ভদ্রসমাজে যথাযোগ্য আসন করিয়া লইয়াছে। এখনও চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, মেদিনীপুর অঞ্চলে দক্ষিণের রায় ভদ্রসমাজেও প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলেও ঈষৎ নিম্নসমাজে ব্যাঘ্রদেবতার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গে হিন্দু-মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাঘ্রদেবতা বা ব্যাঘ্রবাহন দেবতার পূজা-উপাসনা প্রচলিত আছে। হিন্দুর ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায় ; ব্যাঘ্র-অধীশ্বর বড়খাঁ গাজি ও ব্যাঘ্র-অধিষ্ঠাত্রী দেবী বনবিবির উপাসনা কিছুকাল পূর্বেও গ্রাম্য মুসলমান সমাজে বিশেষভাবে চলিত। উত্তরবঙ্গের ব্যাঘ্রদেবতার নাম—সোনারায়। পাবনা জেলার মুসলমান সমাজ এই সোনারায়কে পীর সোনারায় বলিয়া পৃথকভাবে উপাসনা করিয়া থাকে। ময়মনসিংহ জেলায় এই ব্যাঘ্রদেবতার নাম বাঘাই, কোথাও-বা গাজিসাহেব ও শালপীন পীরনামেও ইনি পরিচিত।

বাঙলার বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেও কোন কোন সম্প্রদায় বাঘকে ভক্তি ও পূজা করিয়া থাকে। মধ্যপ্রদেশের ব্যাঘ্রোপাসক এক সম্প্রদায় কখনও ব্যাঘ্র হত্যা করে না। নেপালে বাঘভৈরব নামে এক ব্যাঘ্রোপাসক সম্প্রদায় এখনও আছে। বিহারে বনরাজার (অর্থাৎ বাঘ) পূজা এখনও লোপ পায় নাই। মধ্যপ্রদেশ ও অন্যান্য অঞ্চলে পার্বত্য ও অরণ্যচর জাতি নানা নামে বাঘের পূজা করিয়া থাকে।[১০৭] কিন্তু বাঙলাদেশে দক্ষিণরায়ের পাঁচালী ও রায়মঙ্গলে ঠিক ব্যাঘ্রের পূজা-উপাসনা বর্ণিত হয় নাই। দক্ষিণরায় অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গের অধিকারী বাঘবাহন লৌকিক দেবতা ; বাঘসমাজ তাঁহার অনুচর, বাঘেরাই তাঁহার সেনাবাহিনী। মনসামঙ্গলে মনসা যেমন সর্পের

---

১০৬ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, (৩য় সংস্করণ)

১০৭ বিস্তারিত বিবরণের জন্য ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

দেবী, রায়মঙ্গলেও তেমনি দক্ষিণরায় বাঘদের প্রধান। মনসামঙ্গলে মনসার পূজা প্রচারিত হইলেও সাপের উপাসনা বর্ণিত হয় নাই—এই কাব্যের পূজোপাসনার বিষয় সর্পভূষণা দেবী; তেমনি রায়মঙ্গলের দেবতা দক্ষিণরায় ব্যাঘ্রসেবিত হইলেও নিজে বাঘ নহেন, নরাকার দেবতা। কাজেই অন্যান্য প্রদেশের ব্যাঘ্রোপাসনা এবং দক্ষিণবঙ্গের ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণরায়ের উপাসনায় বিশেষ পার্থক্য আছে। দক্ষিণরায়ের পূজা পশুপূজা নহে, কিন্তু মধ্যপ্রদেশ বা অন্য অঞ্চলে ব্যাঘ্রোপাসনা প্রকৃতই বাঘের পূজা।

বাঙলার রায়মঙ্গল কাব্য বা দক্ষিণরায়ের পাঁচালীর কাব্যগুণ অবহেলার যোগ্য হইলেও ইহাতে জাতিসম্প্রদায়গত এমন কয়েকটি সামাজিক ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য আছে যে, তাহার অভিনব তাৎপর্য স্বীকার করিতে হইবে। দক্ষিণরায়ের মৃন্ময় মূর্তি, মুণ্ডপ্রতীক, বা সিন্দূরচর্চিত প্রস্তরখণ্ড এখনও দক্ষিণবঙ্গে, বিশেষতঃ চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, মেদিনীপুর, যশোহর, খুলনা, নোওয়াখালি, সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলে শ্রদ্ধার সহিত পূজিত হয়। সিপাহিবেশী ব্যাঘ্রবাহন দক্ষিণরায়ের সুদৃঢ় বীরমূর্তি এখনও নানাস্থানে স্থায়ী মন্দিরে পূজিত হয়। বলাই বাহুল্য যে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন পৌরাণিক ও লৌকিক মঙ্গলকাব্য রচনার ধুম পড়িয়া গেল, তখন ব্যাঘ্র উপদ্রব দমন করিবার জন্য ঐ আদর্শে পাঁচালী ছড়া রচিত হইতে লাগিল। অবশ্য ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর অনেক পূর্ব হইতেই ব্যাঘ্রপ্রধান অঞ্চলে লোকে ব্যাঘ্রদেবতার পূজা করিয়া বাঘের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিত। বস্তুতঃ সাপ ও বাঘ বাঙালীর সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার ইতিহাস বড় বিচিত্র। ভয়ের বস্তু কেমন করিয়া ভক্তি-শ্রদ্ধার বস্তু হইয়া পড়ে, প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত টটেম-ট্যাবুর সমাজতাত্ত্বিক ও কৌম-মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ ও পরিণাম বিচার করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।[১০৮] নদীমাতৃক ও জলজঙ্গলাকীর্ণ বাঙলাদেশে সাপ-বাঘ তাই অতি প্রাচীন যুগ হইতে, সম্ভবতঃ প্রাগার্য নিষাদ-কিরাত সভ্যতার যুগ হইতে, ভয়-

---

১০৮ বিস্তৃত বিবরণের জন্য *Man of India* (Vol, XXVII, 1947) পত্রে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'The Tiger Cult and its Literature in Lower Bengal' এবং *Hindustan Review* (July 1923) পত্রে 'The Cult of Dakshin Ray in Southern Bengal' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ভক্তি-শ্রদ্ধাবিস্ময়ের প্রতীকরূপে পূজা লাভ করিয়া আসিতেছে।[১০৯] আধুনিক যুগে অবশ্য বাঘ বাংলা সাহিত্যে, বিশেষতঃ কৌতুকসাহিত্যে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। মধ্যযুগে গ্রামীণ পরিবেশে যাহা ছিল ভয়-ভক্তির বস্তু, আধুনিক নাগরিক জীবনে তাহাই কৌতুকরস সঞ্চার করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাঘ্রাচার্য, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের অপারকুশলকর্মা ডমরুধরের ব্যাঘ্র-কথা, সর্বশেষ পরশুরামের দক্ষিণরায়ের পাঁচালী—সমস্তই কৌতুকের দৃষ্টিকোণ হইতে রচিত।

প্রচলিত রায়মঙ্গলে যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটি আখ্যানভাগ লক্ষ্য করা যাইবে। একটি মুকুন্দরামের অনুকবণে রচিত বণিক পুষ্পদত্তের গল্প, আর একটি বড় গাজিখাঁর গল্প। হিন্দু-মুসলমানেব বিরোধ, মুসলমানেব ঔদ্ধত্য এবং পরাজয়ী মনোভাবাপন্ন হিন্দুকবির হিন্দুর দেবতা ও মুসলমানের পীরকে মিলাইবাব চেষ্টা দ্বিতীয় কাহিনীটিতে বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর নিম্নবঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান জমিদারেব দাঙ্গা-হাঙ্গামা কলহ-কাজিয়া ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ রায়মঙ্গল কাহিনীতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

বণিক পুষ্পদত্তের পিতা বহুদিন বিদেশে বাণিজ্য কবিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া পুষ্পদত্ত মাতা সুশীলার অনুমতি লইয়া বাণিজ্যে গিয়া পিতার সন্ধানে প্রস্তুত হইল। তাহাব অনুচর রতাই নৌকা-নির্মাণের জন্য সুন্দরবনে কাঠাহরণে গিয়া ভ্রমক্রমে দক্ষিণবায়ের গাছে হাত দিয়া রায়ের অনুচর ছয় বাঘের প্রকোপে পড়িল, কিন্তু ভক্তিভরে দক্ষিণবায়ের পূজা করিয়া পুষ্পদত্তের নিকট ফিরিয়া আসিল। অতঃপর পুষ্পদত্ত মায়ের নির্দেশে দক্ষিণরায়ের পূজা করিয়া বাণিজ্যে যাত্রা করিল। পথে সে যেখানে যেখানে দক্ষিণরায়ের আস্তানা দেখিতে পাইল, সেখানেই দেবতাকে ভক্তিভরে পূজা দিল। পথে সে দেখিল, একস্থলে হিন্দু ও মুসলমান ভক্তেরা হইয়া একইসঙ্গে দক্ষিণরায় ও বড গাজিখাঁর পূজা করিতেছে। সে কৌতূহলী কর্ণধারের নিকট এই ঘটনার কাহিনী শুনিতে চাহিলে, কর্ণধার দক্ষিণরায় ও বড় গাজিখাঁর বিরোধ ও বন্ধুত্বের গল্প বলিল। দক্ষিণরায় ও বড গাজি

---

১০৯ ছড়া-পাঁচালী-ব্রতকথার বাঘমামার গল্প শিশুমনে সস্নেহ কৌতুকরস সঞ্চার করিয়া থাকে।

খাঁ—দুইজনেই ব্যাঘ্রের নেতা ব্যাঘ্রবাহন লৌকিক দেবতা। একদা ধনপতি সদাগর (মুকুন্দরামের প্রভাব) বাণিজ্যে বাহির হইয়া দক্ষিণরায়ের পূজা দিলেও বড় গাজিখাঁর পূজা না করাতে গাজি ক্রুদ্ধ হইয়া বাঘসেনা লইয়া দক্ষিণরায়ের মন্দির আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। তখন দক্ষিণ-রায় ও বড় গাজিখাঁর মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল—দুইদলেই বাঘসৈন্য; সৃষ্টি যায় যায়। গাজি যেমন ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে চড়িয়া প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তেমনি আবার সক্রোধে অশ্লীল বদ জোবান ছাড়িতে লাগিলেন। তিনি দক্ষিণরায়ের যতবার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন, ততবারই মুণ্ড গজাইতে লাগিল। সৃষ্টিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণ অর্ধেক মুসলমান, অর্ধেক হিন্দুবেশ ধরিয়া দুইজনের মাঝখানে অবতীর্ণ হইলেন :

অর্ধেক মাথায় কালা একভাগে চূড়া টালা
বনমালা ছিলিমিলি তাতে।
ধবল অর্ধেক কায় অর্ধনীল মেঘপ্রায়
কোরাণ পুরাণ দুই হাতে।।[১১০]

অতঃপর দুইজনের বিবাদ মিটিয়া গেল, গাঢ় 'দোস্তানি' স্থাপিত হইল। দেবতাই নির্ধারিত করিয়া দিলেন—দক্ষিণে দক্ষিণরায়ের অধিকার, হিজলীতে কালুরায়ের অধিকার এবং বড় গাজিখাঁর অধিকার সর্বত্র[১১১]—বড়গাজির সমাধি ও দক্ষিণরায়ের মুণ্ড হিন্দুমুসলমানে ভক্তিভাবে পূজা করিত। এই অংশে সত্যপীর ধরণের হিন্দুমুসলমানের সমন্বয় চেষ্টা লক্ষণীয়—যদিও চেষ্টাটা হইয়াছিল উপদ্রুত হিন্দুর পক্ষ হইতে। কবিও দক্ষিণরায়ের তুলনায় বরং বড় গাজিকে অধিকতর শক্তিমান রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। যাহা হউক, পুষ্পদত্ত এই গল্প শুনিয়া বাণিজ্যতরী বাহিয়া তুরঙ্গ নগরে উপস্থিত হইল।

---

১১০ মাথার অর্ধেক কালো টুপি, আর একভাগে বাঁকাচূড়া, বনমালা ও তসবি গলে, অর্ধেক দেহ শ্বেত, অর্ধেক নীলমেঘবর্ণ, একহস্তে কোরাণ, আর এক হস্তে পুরাণ—ইহাতে হিন্দুর কৃষ্ণ ও মুসলমানের পীরের সমন্বয় হইয়াছে।

১১১ দেবতা বিবাদ মীমাংসা করিয়া বলিলেন :

এখন দক্ষিণরা'র সব ভাটি অধিকার
হিজুলিতে কালুরায় থানা।
সর্বত্রে সাহেবপীর সবে নোঞাইবে শির
কেহ তারে না করিবে মানা।।

পথে আসিতে আসিতে সে জলমধ্যে এক বিচিত্র নগর দেখিতে পাইল। তুরঙ্গরাজ্যের অধীশ্বরকে সে এ বিষয়ে গল্প করিল, কিন্তু রাজাকে সেই নগর দেখাইতে পারিল না বলিয়া সে কয়েদ হইল। তারপর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত পুষ্পদন্ত ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের কৃপায় রক্ষা পাইল—পূর্বে একই ব্যাপারে কারারুদ্ধ পিতাকে সে মুক্ত করিল, পরাভূত ও নিহত তুরঙ্গরাজ দক্ষিণরায়ের কৃপায় আবার বাঁচিয়া উঠিলেন, এবং মহানন্দে পুষ্পদন্তের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন—এ গল্প মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের অক্ষম অনুকরণ মাত্র। পুষ্পদন্তের কাহিনী কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে; তবে বড় গাজিখাঁ ও দক্ষিণের রায়ের যুদ্ধকাহিনীতে তৎকালীন সমাজজীবনেরই বাস্তব ছায়াপাত হইয়াছে।

মুসলমান সমাজে ব্যাঘ্রের অনুরূপ দৈবমহিমা বিষয়ক গল্প প্রচলিত আছে। পূর্বের গল্পে যেমন প্রকারান্তরে গাজিখাঁর বলবীর্যের প্রতি কবির অধিকতর ভয় ও শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইয়াছে, তেমনি মুসলমান সমাজে প্রচলিত 'বনবিবির জহুরানামা'তে[১১২] দক্ষিণরায়ের গর্ব খর্ব হইয়াছে।

দক্ষিণরায় বনবিবির সেবক দুখেকে ব্যাঘ্ররূপ ধরিয়া গ্রাস করিতে গিয়া ব্যর্থ হইলেন, কারণ আক্রান্ত হইয়া দুখে বনবিবিকে স্মরণ করিয়াছিল। বনবিবি দুখেকে রক্ষা করিতে আসিলে দক্ষিণরায় পলাইয়া গেলেন। তাহাতেও রক্ষা নাই, বনবিবির ভাই জঙ্গলী দক্ষিণরায়কে সেই বন হইতে তাড়াইয়া দিল। দক্ষিণরায় তারপর দোস্ত জেন্দাগাজি ও বড় গাজিখাঁর শরণ লইলে গাজিদ্বয়ের মধ্যস্থতায় বনবিবি দক্ষিণরায়কে ক্ষমা করিলেন। এখানে দক্ষিণরায়কে হীনবীর্য ও নিষ্প্রভ করিয়া আঁকা হইয়াছে। রায়মঙ্গল ও বনবিবির কেচ্ছার মধ্যে ব্যাঘ্রভীত দুইটি সমাজ—হিন্দু ও মুসলমানের সামাজিক সম্পর্কের পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যাইতেছে। অবশ্য একথা ঠিক যে, "রায়মঙ্গলের পরিণামে দক্ষিণরায়েরই প্রতিষ্ঠা নির্দেশ করা হইয়াছে।" তথাপি হিন্দু কবি দক্ষিণরায়ের প্রতিস্পর্ধী বড় গাজিখাঁকে বিশেষ সমীহ করিয়া চলিয়াছেন, ঘাঁটাইতে সাহস করেন নাই। হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর শ্রদ্ধালাভ এবং মুসলমান সমাজের (শাসক শক্তি?) প্রতিকূলতা

---

১১২ ইহা মুন্সী বয়নদ্দীন সাহেব রচিত ও কলিকাতা হইতে ১২৮৪ সনে আকাজুদ্দিন আহমদ কর্তৃক প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য: ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস)

বা বিরোধিতা জয় করার জন্য হিন্দুর ঈশ্বরকে অর্ধনারীশ্বরের মতো একঅঙ্গে মুসলমানি বেশ, আর এক অঙ্গে হিন্দুর পরিধান, এক হস্তে কোরাণ আর এক হস্তে পুরাণ লইয়া আবির্ভূত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমান সমাজে প্রচলিত অনুরূপ বনবিবির গল্পে দক্ষিণরায় বনবিবির হস্তে নাস্তানাবুদ হইয়াছেন। মুসলমান সমাজ যে দক্ষিণরায়কে গাজি ও বনবিবি অপেক্ষা অত্যন্ত হীন মনে করিত, ইহাই তাহার বড় প্রমাণ। এই সমস্ত কাহিনী হইতে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী হিন্দু ও ধর্মান্তরিত বাঙালী মুসলমানের সম্পর্কটি কেমন ছিল তাহা বুঝা যাইতেছে। ভয়ে ভক্তিতে হিন্দু কবি মুসলমান পীর ফকিরের জয়ধ্বনি করিতেন, কিন্তু ইসলাম-ধর্মাবলম্বী সমাজে পরধর্মসহিষ্ণুতা দেখা যাইত না। অবশ্য বৈষ্ণব, বাউল, সহজিয়া, সুফী প্রভৃতি উপসম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রদায়গত কাঠিন্য অনেকটা হ্রাস পাইয়াছিল। সুফী মুসলমানও হিন্দুর যোগসাধনা ও গুহ্য শব্দাবলী যথেচ্ছা ব্যবহার করিতেন। হিন্দুর আউল-বাউল সম্প্রদায়ও মুসলমানী মরমী সাধনভজন-সংক্রান্ত শব্দ ও কৃত্য সহজেই নিজের করিয়া লইয়াছিলেন।[১১৩] কিন্তু লৌকিক সমাজে ও গল্প কাহিনীতে সাধারণ হিন্দু-মুসলমান ও ভুস্বামীদের যুদ্ধ-সংঘর্ষ প্রভৃতি বেশ বাস্তবতার সঙ্গে চিত্রিত হইয়াছে।

কবি কৃষ্ণরাম দাসের পূর্বে দক্ষিণরায়ের মহিমাজ্ঞাপক কোন লিখিত কাহিনী পাওয়া যায় না। কবি কিন্তু তাঁহার কাব্যের প্রারম্ভে পূর্বতন কোন এক মাধব আচার্যের উল্লেখ করিয়াছেন :

পূর্বেতে করিল গীত মাধব আচার্য।
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য ॥

অতঃপর স্বয়ং দক্ষিণরায় মাধব আচার্যের কাব্যের ত্রুটি দেখাইয়া কৃষ্ণরামকে উৎকৃষ্টতর কাব্য রচনা করিতে আদেশ দিলেন :

মশান নাহিক তাহে সাধু খেলে পাশা।
চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা ॥
মোর গীত না জানিয়া যতেক গায়ন।
অন্তগীতি ফিরাইয়া গায় জাগরণ ॥
কাকুটী নাকুটী আর করে রাঙ্গভঙ্গী।
পরম কৌতুকে শুনে মউল্যা মলঙ্গী ॥

---

১১৩ বাউল গান প্রসঙ্গে এবিষয়ে পরে আলোচনা করা হইয়াছে।

তোমার কবিতা যার মনে নাহি লাগে।
সবংশে তাহারে তবে সংহারিবে বাঘে।[১১৪]

বোধ হয় মাধব আচার্য নামক কোন এক পূর্বতন কবি বাঘ-ছড়ার কোন অপরিণতগঠন পাঁচালী বা ব্রতকথা ধরণের 'বাঘমঙ্গল' রচনা করিয়া থাকিবেন। দক্ষিণরায়ের বোধহয় ইহা মনঃপূত হয় নাই। তাই তিনি স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া কবি কৃষ্ণরামকে বিস্তৃততর কাব্য রচনা করিতে আদেশ দিলেন। কাব্যের প্রধান কাহিনী ও পুষ্পদত্তের পিতৃসন্ধানে যাত্রা এবং দক্ষিণরায়ের কৃপাপ্রাপ্তির ঘটনা মুকুন্দরামের অপরিপক্ক অনুকরণ মাত্র। এ কাহিনীতে কোনও প্রকার মৌলিকতা বা প্রতিভার চিহ্ন পাওয়া যায় না। চরিত্র, ঘটনা প্রভৃতি অতি দুর্বল। শুধু পুষ্পদত্ত কর্তৃক সমুদ্র মধ্যে মায়া-নগরী দর্শন কিঞ্চিৎ নূতনত্বের সঞ্চার করিতে পরিয়াছে।[১১৫] অবশ্য ইহাও মুকুন্দরামের কমলেকামিনীর আদর্শে পরিকল্পিত। তবে বড় গাজিখাঁর সঙ্গে দক্ষিণরায়ের বিরোধের কাহিনীটি প্রশংসার যোগ্য। উদ্ধত মুসলমানের ধর্মান্ধতাবশতঃ হিন্দুর প্রতি অত্যাচার বর্ণনায় কবিকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ব্যাঘ্রবাহন বড় গাজিখাঁ দক্ষিণরায়ের আস্তানা ভাঙিয়া রায়ের সেবকদের মারিয়া ধরিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বীরত্বের ঘাটতি অংশ পুরাইয়া লইয়াছেন অশ্রাব্য গালিগালাজ করিয়া ; ক্রোধের বশে গাজি সাহেব এমন কয়েকটি অশ্লীল গালি দিয়াছেন যাহা কোন দায়িত্বশীল কবিই কলমবন্দী করিতে পারিতেন না। কিন্তু আমাদের কবির এবিষয়ে বড় একটা চক্ষুলজ্জা ছিল না ; তিনি অবলীলাক্রমে অশ্লীল গ্রাম্যকথা লিখিয়া গিয়াছেন। বোধহয় তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, অশ্লীল না হইলে গালিতে যথেষ্ট রোখ প্রকাশ পায় না। অবশ্য হিন্দী-উর্দু বাত্‌চিতে কলিকাতাবাসী কবি যে

১১৪ 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলীর' সম্পাদক ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য বলিয়াছেন যে, কবি কৃষ্ণরাম দক্ষিণরায়ের পূর্বতন কবি মাধব আচার্যের কাব্যের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা "বোধহয় বাংলা সাহিত্যে এক কবি কর্তৃক আর এক কবির কাব্যের প্রথম সমালোচনা" (ভূমিকা—পৃ. ১৸৵০)। কিন্তু কৃষ্ণরামের অন্ততঃ দেড়শত বৎসর পূর্বে পদ্মাপুরাণের কবি বিজয়গুপ্ত পূর্ববর্তী কবি বলিয়া পরিচিত কানা হরিদত্তের কাব্যেরও এইরূপ দোষত্রুটি দেখাইয়া সমালোচনা করিয়াছিলেন।

১১৫ মধ্যযুগে য়ুরোপীয় নাবিকেরাও বহুদিন সমুদ্রে পাড়ি দিয়া দৃষ্টিভ্রান্তি ও কল্পনার বিকারের বশে সমুদ্রের উপরে এইরূপ মায়ানগরী, গির্জা, মৎস্যকন্যা, ড্র্যাগন প্রভৃতি দেখিত, তাহার অনেক বর্ণনা পুরাতন সমুদ্রভ্রমণ-সাহিত্যে পাওয়া যায়।

বেশ এলেম দেখাইয়াছেন, তাহার প্রমাণ—ক্রুদ্ধ গাজির হিন্দী-উর্দু-মিশ্রিত গালাগালি। সপ্তদশ শতাব্দীতেই উত্তরাপথের উর্দু-ফার্সী ভাষী মুসলমান ও হিন্দী-হিন্দোস্তানীভাষী হিন্দু সম্প্রদায় নানা সূত্রে পশ্চিমবঙ্গে যাতায়াত করিত। মুসলমান আসিত সুবাদার দেওয়ানের কর্মচারী হইয়া, সেনাবিভাগে জঙ্গী চাকুরী লইয়া। উত্তরপ্রদেশ অর্থাৎ দিল্লী-আগ্রা-আযোধ্যা-লক্ষ্ণৌ-এলাহাবাদ-বারাণসীর 'লালা' শ্রেণীর হিন্দীভাষী ব্যাপারীরা মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতা পর্যন্ত অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নিত্য যাতায়াত করিত। কাজেই সপ্তদশ শতাব্দী হইতে বাঙলাদেশে বাঙালী হিন্দুসমাজেও হিন্দী-উর্দু জবান সীমাবদ্ধক্ষেত্রে নিতান্ত অপ্রচলিত ছিল না। কৃষ্ণরাম বড় গাজিখাঁর মুখে যে হিন্দী-উর্দু গালাগালি দিয়াছেন তাহাতে কবির ভাষা-জ্ঞানের প্রশংসা করিতে হইবে—যদিও রুচিজ্ঞানের নহে। এখানে অপেক্ষাকৃত নিরীহ অংশ উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হইতেছে। দক্ষিণরায়ের 'রবদবা' শুনিয়া রুষ্ট গাজি সাহেবের উক্তি :

কোপে কহেন গাজি কাঁহাকা আহ্বক পাজি
জঙ্গুলি হয়েগো মহাদাগ।
হররোজ চালুকেলা সাড়ে পাঁচ খায় ডালা
গোসাঞী আপকি কহে আপ॥
ফের তাবে নিল ভাগ তলাশে না পাও লাগ
অরুকে হুজুর বৈটে আট।
বায়দা মোকের আলো এড়িয়া মুড়ি একে মার ডালো
কোল হয়ে নেড়্যা মোর কাট॥
আমলা না পাও হাম জাহির উনকি নাম
তামাম মুল্যুক কিয়া হাত।
চকমকি ইতি তেরি বাঁসো পাড়ো এতি বেরি
আউরত মরদ একসাথ॥
দোস্তানি নাহিক হাম কারে এসা বদ কাম
মুক সামালে তোম রহ।
আপন ভালাই চাও বিলাথ জুড়িয়া দেও
শীতাব খবর তুনে কহ॥

ক্রুদ্ধ গাজি দক্ষিণরায়কে মুখ ছুটাইয়া গালি দিতেছেন :

বেমান কাফের তোম বেসোর কমজাত।
শুনরে আহম্মক শিখি মেরি এক বাত॥

খাওকে জঙ্গুলি হয়াকে মাতআলা।
এতাবড়ে কদুরথ দেওএ গালিগালা॥
আভি নাই জান্তেহ বড়খাঁ গাজি পীর।
খোদার মাদার দিয়া ছুনিয়াকু জাহির॥

ইহার উত্তরে দক্ষিণরায় যে ভাষায় গালি ফিরাইয়া দিলেন তাঁহার তেজ এতটা তীব্র নহে:

প্রধানে প্রধানে দেখা গালাগালি লাগে।
গরজিয়া গাজিরে কহেন রায় আগে॥
পায়েতে পড়িলি পুর্বে মনে নাই এটা।
গোস্ত খাইয়া মস্ত হইলে দোস্ত আর কেটা॥
মটুক বামনের বেটি লইয়া আইলে কাড়্যা।
ইমান এমনি বটে কর্ম্মা বাটপাড়া॥

এখানে বোধ হয় গাজি কর্তৃক ব্রাহ্মণকন্যা অপহরণের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল কাব্য হিসাবে অকিঞ্চিৎকর হইলেও ইহাতে কাব্যবহির্ভূত এমন অনেক বিষয় আছে যাহা কৌতূহলোদ্দীপক। দুই নেতার যুদ্ধে সমাগত ব্যাঘ্রবাহিনীর বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি সুকৌশলে বড় গাজিখাঁয়ের দলে ৩০, দক্ষিণরায়ের দলে ৪৯টি বাঘ এবং ৪৫টি বাঘিনীর বিচিত্র নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন, বাঘের নাম—হোগলবুনিয়া, গামালে, ভুম্বরি, রূপচাঁদা, হুড়া, ধাম্‌লা, ফেটানাকা, পাটাবুকা। বাঘিনীর নাম—তোমরি, ছাকিনী, ছবী, ঝমকি, লকলকি, ফকফকি, হিড়মি প্রভৃতি।

কৃষ্ণরামের আদর্শে পরবর্তী শতাব্দীতে রুদ্রদেব ও হরিদেব দুইখানি রায়মঙ্গল লিখিয়াছিলেন।[১১৬] এই সমস্ত ছড়া ও ব্রতকথাজাতীয় রচনাতে এমন কোন কবিপ্রতিভা ফুটিয়া উঠে নাই, যাহা সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে মনসা-চণ্ডীমঙ্গলের অসংখ্য পুঁথি মিলিয়াছে, একাধিক প্রতিভাধর কবির আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী হইতে স্থানীয় গ্রাম্য পূজাব্রতাদি অবলম্বনে দুই একখানি ছড়া পাঁচালী ধরণের কাব্য রচিত হইয়াছিল, যাহাতে বিশেষ কোন চিত্তাকর্ষী গুণ নাই। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণরামের দুই একখানি কাব্য

১১৬ (ক) রুদ্রদেবের পুঁথি—বর্ধমান সাহিত্যসভা প্রকাশিকা, সংখ্যা ২
(খ) হরিদেবের পুঁথি—ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ও বিশ্বভারতী প্রকাশিত।

কথঞ্চিৎ উল্লেখযোগ্য। এবার তাঁহার অন্যান্য কাব্য সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাক।

ষষ্ঠীমঙ্গল ॥

কবি কৃষ্ণরামের তৃতীয় কাব্য ষষ্ঠীমঙ্গল ১৬৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। কারণ কবি নিজ কাব্যে সন-তারিখেরও ইঙ্গিত দিয়াছেন :

কবি কৃষ্ণরাম বলে ষষ্ঠীর মঙ্গল।
মহী শূন্য ঋতু চন্দ্র শক সংবৎসর ॥

অর্থাৎ ১৬০১ শকে এ কাব্য রচিত হয়।

ষষ্ঠীপূজা বাঙলাদেশে বহু পরিচিত ব্রতপর্ব—যাহা পূর্বে স্ত্রীসমাজে প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। এই ষষ্ঠীদেবীর উৎসব ও ব্রতপালনের নানা শ্রেণী ও বিষয়বৈচিত্র্য আছে, যেমন অরণ্য ষষ্ঠী, অন্ন ষষ্ঠী, লুণ্ঠন ষষ্ঠী, ইত্যাদি। তন্মধ্যে সন্তান জন্মের সঙ্গে যে ষষ্ঠীদেবীর উল্লেখ দেখা যায় এবং যিনি নবজাত শিশুর রক্ষাকারিণী বলিয়া নারীসমাজের পূজা লাভ করিয়া থাকেন, তিনি বৌদ্ধ জাতকের হারীতীই হউন, অথবা সন্তানের রক্ষাকারিণী লৌকিক দেবী হউন, অর্বাচীন পুরাণেও এই ষষ্ঠীদেবীর উল্লেখ আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে মাতৃকাগণের মধ্যে প্রধানা শিশুরক্ষয়িত্রী[১১৬] এবং প্রকৃতির ষষ্ঠাংশরূপিণী ও কার্তিকেয়ের পত্নী ত্রিজগৎ-ধাত্রী ষষ্ঠীদেবীর উল্লেখ আছে। স্কন্দপুরাণেও বারো মাসে বারো প্রকার ষষ্ঠীপূজার উল্লেখ আছে। যথা—বৈশাখে চান্দনী ষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠে অরণ্য ষষ্ঠী (বাঙলায় জামাতৃ ষষ্ঠী), আষাঢ়ে কার্দমা ষষ্ঠী, শ্রাবণে লুণ্ঠন ষষ্ঠী (লোটন ষষ্ঠী), ভাদ্রমাসে চপেটী ষষ্ঠী (চাপড়া ষষ্ঠী), আশ্বিনে দুর্গা ষষ্ঠী, কার্তিকে নাড়ী ষষ্ঠী, অগ্রহায়ণে মূলক ষষ্ঠী, পৌষে অন্ন ষষ্ঠী, মাঘমাসে শীতল ষষ্ঠী, ফাল্গুনে গোরূপিণী ষষ্ঠী[১১৭] এবং চৈত্রে অশোক ষষ্ঠী। বাঙলা দেশে দ্বাদশ মাসেই নারী সমাজ এই দ্বাদশপ্রকার ষষ্ঠীপূজা উপলক্ষে কিছু কিছু

১১৬ তন্ত্রেও তাঁহাকে 'বামক্রোড়ে সপুত্রিকাম্' রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বালেশ্বর জেলায় যে ষষ্ঠীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও দেখা যাইতেছে, দেবী বামউরুর উপরে একটি শিশুকে বসাইয়া বাম হস্তের দ্বারা তাহাকে ধরিয়া আছেন।—ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য—কৃষ্ণরামদাসের গ্রন্থাবলী, ভূমিকা, পৃ. ৩/০

১১৭ গোমুণ্ডে ষষ্ঠীপূজা—ইহা আর্যেতর সংস্কার। একদা ষষ্ঠীদেবী কি ভাগাড়ের দেবতা ছিলেন ?

বারব্রত উপবাস এখনও পালন করেন, কিন্তু সন্তান জন্মের সঙ্গে যে ষষ্ঠীর যোগাযোগ তিনি বিড়ালবাহনা—এবং বিড়ালটি প্রায়ই কালো বিড়াল। প্রাচীন ষষ্ঠী মূর্তিতেও দেখা যায়, বিড়াল উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সন্তানের জন্ম ও রক্ষার সঙ্গেই ষষ্ঠীদেবীর প্রধান সম্পর্ক এবং নারীসমাজই তাঁহার প্রধান উপাসিকা। ষষ্ঠী পূজাসংক্রান্ত রূপকথা ও ব্রতকথার ধরণের যে গল্পটি বাঙলার নারীসমাজে প্রচলিত আছে, কবি কৃষ্ণরাম মোটামুটি সেই গল্পটিকেই 'ষষ্ঠী মঙ্গলে' গ্রহণ করিয়াছেন। এই কাহিনী নিতান্ত ব্রতকথার ছাঁচে লিখিত, পুঁথির শেষে আবার ষষ্ঠীপূজার প্রক্রিয়াও বর্ণিত হইয়াছে।

ষষ্ঠীদেবীর দাসী লীলাবতী পৃথিবীতে দেবীর পূজা প্রচারে বাহির হইয়া দেখিল যে, সপ্তগ্রামের রাণী ষষ্ঠীপূজার দিন ব্রতপালন না করিয়া মাছপোড়া দিয়া ভাত খাইতেছেন। রাণী ষষ্ঠীর মহিমা বা পূজা জানিতেন না, লীলাবতীর কাছে বৃত্তান্ত শুনিতে চাহিলে ষষ্ঠীর পরিচারিকা তখন একটি আখ্যান বর্ণনা করিল। সনোকাপুরের সায়বেণে নামক এক বণিকের পত্নী ষষ্ঠীপূজার দিন কনিষ্ঠা বধূকে ষষ্ঠীপূজার নৈবেদ্যাদি পাহারা দিতে নিযুক্ত করিয়া স্নানে গেলে লোভী বধূটি ষষ্ঠীর ফলমূলাদি খাইয়া ফেলিল এবং বলিল যে, কালো বিড়ালে নৈবেদ্য খাইয়া গিয়াছে। ষষ্ঠীর অনুচর কালো বিড়াল এই মিথ্যা অপবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া বধূটির নবজাত প্রত্যেক সন্তানকে চুরি করিয়া লুকাইয়া রাখিল। বধূ বনে গিয়া সন্তান প্রসব করিল এবং অতিযত্নে তাহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কালো বিড়াল আসিয়া এই সন্তানটিকেও লইয়া পলাইয়া গেল। বধূর মর্মান্তিক রোদনে ষষ্ঠীদেবীর দয়া হইল, তিনি তাহার সন্তানগুলিকে ফিরাইয়া দিলেন এবং তাহাকে ষষ্ঠীপূজা শিখাইয়া দিয়া সাবধান করিয়া বলিলেন :

> কালিএ বিড়াল যত মোর অংশ তারা।
> অপমান করিলে বালক হবে হারা॥
> মিছে করি নাহি দেউ বিড়ালের দোষ।
> পুত্র মারিলে মোর হবে বড় রোষ॥

এই ছড়াধরণের কাব্যটি নিতান্তই ব্রতকথা-পুস্তিকা। বাঙলাদেশে নারী সমাজে এই গল্পটি আজও চলিয়া আসিতেছে। কবি কৃষ্ণরাম ইহাতে কোন দিক দিয়াই কোন বৈশিষ্ট্য দেখাইতে পারেন নাই। তবে বণিক বধূটির

লোভের বশে ষষ্ঠীর নৈবেদ্য খাইয়া ফেলার চিত্রটি মন্দ হয় নাই। বধূটির সাত শিশু মাকে চিনিতে পারিয়া আব্দার ধরিল :

কেহ বলে রাঙ্গা বস্তর দেহো মোরে মা।
নহিলে না যাব ঘরে নাহি চলে পা॥
গাছের উপরে কেহ দেখে রাঙ্গা ফল।
কেহ বলে উহা মোরে দেহো গো সকল॥
নানা পরকার পাখী বেড়াএ চরিএ।
কেহো বলে উহা মোরে দেহো গো ধরিএ॥

এই দৃশ্যটিতে বাৎসল্যরসের বর্ণনাটুকু নিতান্ত মন্দ হয় নাই। এই কাব্যের পরে তাঁহার রায়মঙ্গল লিখিত হয়; রায়মঙ্গলের রচনারীতি কাহিনী ইত্যাদি যে ষষ্ঠীমঙ্গল অপেক্ষা অনেকটা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

শীতলামঙ্গল॥

কৃষ্ণরামের 'শীতলামঙ্গলে' রচনার কোন সন-তারিখ নাই, শুধু কবির নামটি ভিন্ন অন্য কোন পরিচয়ও নাই। উপরন্তু কাব্যটির শেষাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে—যেখানে পুষ্পিকায় সন-তারিখ ও কবিপরিচয়ের উল্লেখের সম্ভাবনা ছিল। তাই ইহা যে রায়মঙ্গল-কালিকামঙ্গল-ষষ্ঠীমঙ্গলের কবি কৃষ্ণরাম দাসেরই কাব্য, তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যায় না, কেবল ভণিতায়—কৃষ্ণরাম দাস—এইটুকু উল্লেখ আছে। অবশ্য কবি ভণিতার একস্থলে বলিয়াছেন,

রায়ের মঙ্গল কবি কৃষ্ণরাম গায়।
কেবা কি করিতে পারে শীতলা সহায়॥

ইহাতে অনুমিত হইতেছে শীতলামঙ্গলের কৃষ্ণরাম এবং রায়মঙ্গলের কৃষ্ণরাম একই ব্যক্তি। রায়মঙ্গলে যেমন কায়স্থপ্রীতির পরিচয় (কবি কায়স্থ বংশোদ্ভূত ছিলেন) পাওয়া যায়, তেমনি শীতলামঙ্গলেও "সকল কাএস্ত যত, দেখ ভাই প্রকাশ যত"—এইরূপে ইঙ্গিতে মনে হয়, ইনি আমাদের নিমতার কবি। ইহাতে রায়মঙ্গলের উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, শীতলা-মঙ্গল রায়মঙ্গলের (১৬৮৬) পরে রচিত হইয়াছিল। কবির রায়মঙ্গল ও শীতলামঙ্গল যথার্থ মঙ্গলকাব্যের রীতিতে রচিত, ষষ্ঠীমঙ্গল ও কমলামঙ্গল অনেকটা ব্রতকথা জাতীয়। শীতলামঙ্গলে মুকুন্দরামের ধনপতির আখ্যান-

ধারাই অনুসৃত হইয়াছে—কৃষ্ণরাম নানা কাব্যে মুকুন্দরামের গল্পকাহিনীর প্রভাব স্বীকার করিয়াছিলেন।

বাঙলাদেশে সর্বত্র শীতলা ও মনসার 'থান' (স্থান) ও 'তলা' (শীতলাতলা, মনসাতলা) রহিয়াছে, সেখানে পর্বদিবসে বা প্রত্যহ পূজাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ষষ্ঠী যেমন একান্তই স্ত্রীসমাজের দেবতা—শীতলা সেরূপ নহেন। গুটি-মারীভীত বাঙালী হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকলেই রাসভ-বাহনা স্বর্ণ-ঘট ও সম্মার্জনীধারিণী শীতলাকে ভয়ে ভক্তিতে পূজা করিয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন, বেদে দুর্ভাগ্যের প্রতীকরূপে যে কালীর উল্লেখ আছে তিনিই শীতলা। বৌদ্ধের পর্ণশবরী দেবীর মূর্তিতেও দেখা যায়, দেবীর পাদদেশে বসন্ত রোগাক্রান্ত কয়েকটি লোক শায়িত রহিয়াছে।[১১৮] উহাতে একটি গাধার মূর্তিও আছে। পর্ণশবরী শুধু নাম পাল্টাইয়া বাঙলাদেশে শীতলায় পরিণত হইয়াছেন এরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত। দক্ষিণভারতে শীতলাম্মাও বসন্তরোগের দেবী। মার্কণ্ডেয় পুরাণে 'দেবীমাহাত্ম্য' অংশে ইঁহাকে অলক্ষ্মী বলা হইয়াছে। সে যাহা হউক, বসন্ত-মারীভীত বাঙালী যে বহু পূর্ব হইতে শীতলার উপাসনা করিয়া আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কবি কৃষ্ণরাম কিছু কিছু নূতন কাহিনী জুড়িয়া, কিছু-বা পুরাতন কাহিনীর জের টানিয়া শীতলামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।

শীতলামঙ্গল কাব্যটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার ধারাটি মোটামুটি মঙ্গল কাব্যের অনুকূল : রচনা ও বিষয়বস্তু গতানুগতিকতা হইতে মুক্ত না হইলেও কাহিনীর পূর্বাপর সঙ্গতি বজায় আছে, বক্তব্যটি ষষ্ঠীমঙ্গল অপেক্ষা অধিকতর পরিপক্ব, রচনাও অনেক সংহত হইয়াছে। ইহাতে শীতলামাহাত্ম্য বিষয়ক তিনটি কাহিনী লক্ষ্য করা যাইবে—মদনদাস জগাতির কাহিনী, কাজির কাহিনী ও হৃষীকেশ সাধুর কাহিনী। কায়স্থ মদনদাস জগাতি সপ্তগ্রামের মুড়াঘাটে দলবল লইয়া শুল্ক আদায় করে—কিন্তু শীতলাদেবীকে ভক্তি করে না। শীতলার অনুচর বসন্তরায় ব্যাপারীর ছদ্মবেশে নানা ব্যাধি লইয়া মুড়াঘাটে উপস্থিত হইল জগাতিকে উচিত শিক্ষা দিবার জন্য। মদনদাসের কর্মচারীরা বসন্তরায়কে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করিয়া তাহার জিনিষ-পত্র লুটিয়া লইল। কবি এই গালির ভাষায় হিন্দী ব্যবহার করিয়া বেশ রস-

---

১১৮ দ্রষ্টব্য : ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত *Sadhan Mala*, p. CIXX

বোধের পরিচয় দিয়াছেন। মুড়াঘাটের অনুচরগণ সক্রোধে গালি দিয়া বলিল :

জাতে হায় ডোম ঘোঁড়ে পর বহুত দিমাগ ভর
নজরে আয়তে নাহি হাম।
... ...
রাম রাম বালা কিয়া নাহি গালি দেই মোরাতেই
কেমন আক্কেল বড়ই গোঁয়ার।
বাত নাহি মানতা নাহি শুন পাঁড়ে এ সভাই
গুইজাত নাতকা উহার॥
দাগাবাজ জৈসা কাম শির লেগা তেরা হাম
শুন আরে আম্বোক কেটোন।

ইহার ফলে মদনদাস অনুচরসহ কিভাবে শীতলার প্রকোপে পড়িল এবং পরিশেষে শীতলা ও বসন্তরায়ের মন্দির স্থাপন করিয়া ব্যাধি হইতে রক্ষা পাইল, তাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এখন বাকি রহিল দুইজন, এক মুসলমান কাজি ও উজানির রাজা চন্দ্রশেখর। শীতলা-বিরোধী কাজির উচিত শাস্তি হইল, নানা ব্যাধিতে কাজি সাহেবের অন্তঃপুরিকারা এবং পরিচারকের দল বিপর্যস্ত হইল, কাজিও যথেষ্ট শাস্তি পাইলেন :

কাজির হৈল গোদ দুই চক্ষে ছানি।
কি হৈল কি হৈল বলি শিরে কর হানি॥
বিবি ফতিমার তরে হাজুত মানিল।
শীতলাদেবীর খেলা তবু না বুঝিল॥

কাজিকে আরও শাস্তি দিবার বাসনায় বসন্তরায় বৈদ্যের ছদ্মবেশে গিয়া কাজিসাহেবকে "চেঙ্গ্যা" করিবার জন্য নূতন দাওয়াই বাতলাইলেন :

লঙ্কা মরিচ বেঁটে দেহে সর্বগায়।
ঘুচিবে সকল জ্বালা ইহার উপায়॥

আরও যে সমস্ত ঔষধের নির্দেশ দিলেন তাহা গ্রাম্য রসিকতায় পূর্ণ। উদ্ধত কাজি অসুখে কাবু হইলে শীতলার আর এক অনুচর জরবাঁন (জরাসুর?) গিয়া কাজিকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল :

শুন শুন ওহে কাজি কি লাগি এমন আজি
পীর কেন আসিয়া না রাখে।
আমার বচন ধর খোদার স্মরণ কর
তবে মুক্ত হইবে বিপাকে॥

স্বরূপে আমি এথা কাছে লেয়াব শেব কাতা পাছে
পুজিবারে জননী শীতলা।
খেদারিয়াছিলে তুমি সেই সে ব্রাহ্মণ আমি
গরবে করিলে অবহেলা ॥
লোকমুখে লাজ পাবা সাহেব বকতার বাবা
এখন কোঁতাও কেন এত।
কি লাগি না কর কোপ কোথায় গেলে লাপগেপ
কোথায় গোলাম সেই যত ॥

যাহা হউক অসুখে ভুগিয়া কাজির যথেষ্ট আক্কেল হইল, তিনি স্বীকার করিলেন,

এখন বুঝিলাম ভাবি শীতলা পরম দেবী
পূজিব তাঁহার পদযুগ।

তারপর কাজি হিন্দু-মুসলমান ধর্মের সমন্বয় চেষ্টা করিয়া বলিলেন :

বিচার করিএ দেখি কোরাণপুরাণ একি
সাবদা বসতি সর্বঘটে।
হিন্দু কি মোচোলমানে পয়দা একই স্থানে
আচারেতে জুদা জুদা বটে ॥

কাজি সদলবলে শীতলার মন্দির নির্মাণ করিয়া দেবী পূজা করিলে তাঁহার অনুচরবর্গসহ তিনি ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

ইহার পরে হৃষীকেশ বণিকের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে—এ কাহিনীতে কবি পুরাপুরি মুকুন্দরামের ধনপতির গল্প অনুসরণ করিয়াছেন। রায়মঙ্গলে কবি ঘটনা-কাহিনী যেভাবে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, এখানেও তাহার অপেক্ষা অন্য কোন তন তথ্য বা বৈচিত্র্য দেখাইতে পারেন নাই। হৃষীকেশ সাধু রাজার আদেশে দক্ষিণপাটনে চলিল মণিমাণিক্য আনিবার জন্য। সাধু অজয়নদ বাহিয়া গঙ্গায় উপনীত হইল এবং নবদ্বীপ শান্তিপুর, আঁবুয়া (অম্বিকা কালনা), গুপ্তিপাড়া, ত্রিবেণী, হুগলী, চুঁচুড়া, মণিরামপুর, দিগঙ্গা, চানক, মহেশ, কোন্নগর, কোতরঙ্গ, পেনেটি, আগড়পাড়া, বরাহনগর, বালি, চিতপুর, ডিহিকলিকাতা, কালীঘাট হইয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল, তারপর উড়িষ্যা পার হইয়া দক্ষিণ পাটনে যাত্রা করিল। পথে সে একমায়া-পুরী দেখিল। তারপর চন্দ্রভানুর রাজ্যে উপনীত হইয়া রাজার কাছে এই

গল্প করিলে তাহার অবস্থা পূর্ব-বর্ণিত রায়মঙ্গলের ধনপতির মতো হইল—পরিণতিও এক প্রকার।

এই তৃতীয় কাহিনীটিতে কিছুমাত্র মৌলিকতা নাই, রচনাকৌশলও নগণ্য। কিন্তু প্রথম দুইটি কাহিনী বর্ণনায় কবির যৎকিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাইবে। কবি পথের বর্ণনায় অপেক্ষাকৃত বাস্তবতার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার ভৌগোলিক মতামত প্রশংসার যোগ্য। তবে এ কাব্যেও তিনি অবলীলাক্রমে অশ্লীল গালাগালি ব্যবহার করিয়াছেন। এরূপ গ্রাম্য ইতর শব্দ প্রয়োগে কবির কৃতিত্ব যে অসাধারণ তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বাঙলাদেশের আর কোন কবি এত কুৎসিত কুরুচিপূর্ণ গালিগালাজ ব্যবহার করেন নাই। এবিষয়ে কবির শিশুসুলভ ভাষাগত উলঙ্গ বর্বরতা পরম উপভোগ্য। ইদানীং যাঁহারা বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট বাস্তবতা ও জীবনধর্মের অভাবে এ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়েন, তাঁহারা এই কবির ভাষা প্রয়োগে গ্রাম্য দুঃসাহস দেখিয়া খুশি হইতে পারেন। যাহা হউক শীতলামঙ্গলে কবিপ্রতিভার এমন কোন নূতনত্ব নাই যাহা পাঠকের কিঞ্চিৎ কৌতূহলও আকর্ষণ করিতে পারে।

কমলামঙ্গল ॥

কৃষ্ণরামের সর্বশেষ কাব্য 'কমলামঙ্গলের' রচনাকাল জানা যায় না, ভণিতাতেও এমন কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই যাহার দ্বারা রায়মঙ্গল-কালিকা-মঙ্গলের কবিই ইহার রচয়িতা এরূপ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। কয়েকটি পরোক্ষ প্রমাণও আছে। একটি প্রমাণ, কায়স্থ কবি তাঁহার অন্যান্য কাব্যে যেমন কায়স্থদের কথা বলিয়াছেন, তেমনি কমলামঙ্গলে "সকল কাএস্ত কত দেখ ভাই প্রকাশ যেত" ইত্যাদি বলিয়াছেন। ভণিতাও অন্য কাব্যের অনুরূপ :

> পাঁচালি সরস কবি কৃষ্ণদাস গায়।
> কিন্তু না কহিহ কিছু কমলাসহায় ॥

তাঁহার অন্যান্য কাব্যে ব্যবহৃত ভণিতা প্রায় এইরূপ। এই দুইটি গৌণ প্রমাণের বলে মনে হয়, যিনি রায়মঙ্গল, কালিকামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল লিখিয়াছিলেন, কমলামঙ্গলও তাঁহারই রচনা। বাঙলাদেশে লক্ষ্মীপূজার অর্থ ঐশ্বর্যের

আরাধনা ; দেবী প্রধানতঃ গার্হস্থ্য কল্যাণের জন্ম পূজিতা হইয়া থাকেন। প্রাকবৈদিক্ ও বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধতন্ত্র, হিন্দুতন্ত্র, পৌরাণিক ইতিবৃত্ত প্রভৃতির মধ্য দিয়া লক্ষীদেবী বাঙলার নারী সমাজে ব্রতকথার দেবীরূপে পরিণত হইয়াছেন। মহালক্ষ্মী গজলক্ষ্মী, অলক্ষ্মী—এসমস্তই তাঁহার বিভিন্ন রূপের বর্ণনা। লক্ষীর সঙ্গে কৃষি, বিশেষতঃ ধান্তের বিশেষ যোগ আছে। তাঁহার মূর্তি বর্ণনায় ধান্তের প্রচুর উল্লেখ দেখা যায়। কেহ কেহ মনে করেন, ক্ষেত্রপাল, পঞ্চাসুর, এবং শিবায়নের শিব যেমন আদি-অস্ট্রিক কৃষিদেবতারই প্রকার ভেদ, তেমনি প্রাচীন প্রাগার্য যুগের বাঙলাদেশে কৃষিদেবীরূপে লক্ষীর অনুরূপ কোন দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। পরে আর্যীকরণের প্রভাবে পুরুষসমাজ হইতে আর্যেতর আচার-আচরণ ব্রতনিয়মাদি লোপ পাইলেও স্ত্রীসমাজে তাহার কিছু কিছু চিহ্ন রহিয়া গিয়াছিল। মধ্যযুগে পুরাণীকরণের ফলে গ্রাম্য কৃষিদেবী ও আর্য-সমাজের ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষী এক হইয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণরামের লক্ষীও ধান্তভূষণা, সুতরাং তাঁহার পরিকল্পিত কমলা বা লক্ষী আর্যেতর সমাজের কৃষিদেবী।

'কমলামঙ্গল' কৃষ্ণরাম কবে রচনা করিয়াছিলেন, তাহা জানা না গেলেও ইহা যে তাঁহার সর্বশেষ রচনা তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ রচনা, কাহিনী, কবিত্ব কোন দিক দিয়াই তিনি ইহাতে কিছুমাত্র কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তবে ইহার একটা বৈশিষ্ট্য, বাঙলাদেশের বালক-বালিকাদের মধ্যে দুইবন্ধু-সংক্রান্ত যে সমস্ত রূপকথা প্রচলিত আছে, কবি সেই সমস্ত রূপকথায় সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ সন্তান জনার্দন ও বণিকপুত্র—দুইজনে অভিন্নহৃদয় বন্ধু। তাহারা লক্ষীর কৃপা লাভ করিল। একদা জনার্দন এক মায়াপুরীর রাক্ষসী-পালিতা কন্যাকে বিবাহ করিল, তারপরে সে কমলাদহে কমলার অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া কাঞ্চীপুরের রাজার নিকট গল্প করিল। বহুকথিত মুকুন্দরামের ধনপতির কাহিনীর ছায়ানুসরণে জনার্দনের দুর্বিপাক, তাহা হইতে তাহার মুক্তির উপায়, এবং কাঞ্চীপুরের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন—কাহিনীটি মোটামুটি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এ সমস্ত ব্রতকথা ধরণের উপকাহিনী সাহিত্যের ইতিহাসে বিস্তারিত আকারে বর্ণিত

হইবার যোগ্য নহে। রূপকথা ও ব্রতকথার সংমিশ্রণে রচিত এই 'কমলামঙ্গল' কোনদিক দিয়াই পাঠযোগ্য হয় নাই। শুধু বিভিন্ন ধান্যের নাম ও রূপ বর্ণনায় তাঁহার কিঞ্চিৎ দক্ষতা ও বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। দেবী লক্ষ্মী কমলাদহে বিবিধ ধান্যের আভরণ পরিধান করিয়া বসিয়া রহিলেন জনার্দনকে ছলনা করিবার জন্য। কবি এই প্রসঙ্গে বহু প্রকার ধান্যের বর্ণনা দিয়াছেন। যেমন—কনকচুর, সীতাভোগ, কামিনী, জামাইনাড়ু, হরিভোগ, সূর্যভোগ, চন্দ্রমণি, লক্ষ্মীভোগ, পুণ্যভোগ, তুলসী ইত্যাদি। অবশ্য এই নামগুলির কিছু কিছু কবিকল্পিত। যে যাহা হউক, কবি কৃষি-ব্যবস্থা সম্বন্ধেও যে কিঞ্চিৎ অবহিত ছিলেন, তাহা ধান্যের বিস্তারিত তালিকা হইতে বুঝা যাইতেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যের প্রতিভাবান কবির সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাইয়া আসিতেছিল, কৃষ্ণরামদাস লৌকিক ভাববস্তু, বা গল্প ছাড়া প্রবাদ-উপকথা অবলম্বনে যে সমস্ত অর্বাচীন ধরণের মঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একমাত্র কালিকামঙ্গল ও রায়মঙ্গল বাদ দিলে আর কোন কাব্যেই তাঁহার কিছুমাত্র প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। কালিকামঙ্গলে তাঁহার কৃতিত্ব কিরূপ তাহা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

তৃতীয় অধ্যায়

কালিকামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর) ও শিবায়ন

একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্য শ্রেণীর গ্রন্থবাহুল্য পরিলক্ষিত হইলেও প্রতিভায় তখন ভাটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। পূর্বের অধ্যায়ে মনসা ও চণ্ডী-কাহিনী আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। এই অধ্যায়ে আমরা 'কালিকামঙ্গল' ও শিবায়ন আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে, বিষয়বস্তু ও রচনাকৌশল কোন দিক দিয়াই এই শতাব্দীর উক্ত কাব্যসমূহ শিল্পরসসমৃদ্ধ হইতে পারে নাই। নানা কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন, লিপিকার-গায়েন-পাঁচালী-গায়কেরা বহু পুঁথি নকল, নকলের নকল করিয়া কীটকুলের বিরাট ভোজ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু কালিকামঙ্গলে নরনারীর বাস্তব জীবনের বর্ণনা এবং শিবায়নে ক্ষেত্রপাল লৌকিক শিবের কৌতুকরসোজ্জ্বল বাস্তবধরণের লীলাখেলা ব্যতীত এই যুগের উক্ত শাখাসাহিত্যে বিশেষ কোন শিল্পগুণ লক্ষ্য করা যায় না।

১

কা লি কা ম ঙ্গ ল (বি দ্যা সু ন্দ র)

ভূমিকা॥

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দার প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিদ্যাসুন্দর-ঘটিত কালিকামঙ্গলের কাহিনী অলস-বিলাসী নাগরিক রুচিকে উল্লসিত করিয়াছিল, আবার আর এক শ্রেণীর ভক্তশ্রোতার চিত্ত যে কালিকার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় নত হইয়াছিল, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে কালিকামঙ্গলের বিশেষ পার্থক্য আছে। পরিবেশ, চরিত্র ও বিষয়বস্তু বিচার করিলে আদিরসাশ্রিত এই ভক্তিকাব্যকে একটু স্বতন্ত্র স্থান দিতে হইবে। ইহাতে দেখা যাইবে যে, বিদ্যাসুন্দরঘটিত

রোমান্টিক প্রেমের কাহিনীই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে, এবং অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে। কবিগণ নামমাত্র কালিকাপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, কোন প্রকারে মঙ্গলকাব্যের প্রথাপালন করিয়াই অধিকতর উত্তেজক বিদ্যা-সুন্দরের সমাগম বর্ণনায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সুন্দর কালিকার প্রসাদে অনূঢ়া রাজকুমারী বিদ্যার শয়নমন্দিরে সিঁধ কাটিয়া দক্ষ সিঁধেল চোরের মতো অশেষ চাতুরী প্রকাশ করিয়া অকুস্থলে উপস্থিত হইয়াছে। কবিগণ মনকে চোখ ঠারিয়া তথাকথিত গান্ধর্বমতে চোরচূড়ামণির সঙ্গে কুমারী বিদ্যার 'নম নম' করিয়া বিবাহ প্রসঙ্গ সারিয়াছেন, এবং তারপরে নরনারীর কামোত্তপ্ত আদিম নর্মলীলার হুবহু বাস্তবচিত্র অঙ্কন করিয়া অশুচি, অসামাজিক ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রেমকে কালীমাতার শান্তিজল ছিটাইয়া এই ব্যাপারের ঘৃণাজুগুপ্সাকে কথঞ্চিৎ মোলায়েম করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহারা ইহাতে কতদূর সফলকাম হইয়াছেন, তাহা অবশ্য সংশয়ের ব্যাপার। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের ধারায় যে একটি নূতন সুর সংযোজিত হইতেছে, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ইতিপূর্বে এবং ইহার পরে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলি মূলতঃ সাম্প্রদায়িক ধর্মসাহিত্য—যাহাতে লৌকিক বা ছদ্মপৌরাণিক দেবদেবীর পূজা প্রচারের জন্য দেবদেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যে মানুষের কাহিনীই প্রধান; শাপভ্রষ্ট দেবতা, দেবী বা অন্য কেহ মর্ত্যদেহ গ্রহণ করিয়া মানবলীলার মধ্যদিয়া দেবতার অলক্ষ্য ও অলৌকিক প্রভাবের বশে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত মঙ্গলকাব্যের কবিগণ সর্বদা একটা বিশেষ দেবচেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াই কাব্য রচনা করিতেন। কেহ-বা দেব-দেবী কর্তৃক স্বপ্নাদেশের প্রসঙ্গ আনিয়া বক্তব্যবিষয়ের প্রতি শ্রোতাদের শ্রদ্ধাভক্তি জাগাইতে চেষ্টা করিতেন। অর্থাৎ সাধারণ মঙ্গলকাব্যে ধর্ম-প্রচারণার উদ্দেশ্যেই প্রকট। কিন্তু কালিকামঙ্গলগুলি মূলতঃ মানবরসের কাব্য; বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে বাস্তব নর-নারী দেহপ্রমাথী অনঙ্গরঙ্গের উতরোল উল্লাস অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কবিগণ বিদ্যাসুন্দরের বাস্তবধর্মী কাহিনীটির গ্রন্থনের দিকে অধিক দৃষ্টি দিয়াছেন, তাই কালিকা-মঙ্গলকে শুধু 'বিদ্যাসুন্দর' নামও দেওয়া যাইতে পারে। বিদ্যার শয়নমন্দিরে সিঁধ কাটিবার বৃত্তান্ত, মশানে গিয়া কালিকা কর্তৃক ভক্ত সুন্দরকে রক্ষা এবং পরিশেষে কালিকার পূজা প্রচার করিয়া উভয়ের স্বর্গারোহণ—এই অংশে

কবিগণ বাধ্য হইয়া কালিকার কিঞ্চিৎ প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। মধ্যযুগে শ্রোতারা যে ভাবাদর্শ ও জীবনাদর্শের বাতায়নে বাস করিত, সেখানে বিশুদ্ধ পার্থিব চেতনার কাব্য বা নর-নারীর সামাজিক-অসামাজিক প্রেমের কাহিনী জনপ্রিয় হইতে পারিত না। প্রচ্ছন্নভাবে সাধারণ মানবচিত্তের গভীরে বাস্তব মানুষের সুখদুঃখ মিলন বিরহের প্রতি একটা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা আছে, একশ্রেণীর পাঠক ও শ্রোতা এই ফেনিল জীবনরসকে ভুলিতে পারেন নাই। তাই বিদ্যাসুন্দরকাব্যে কালিকার মোড়ক দিয়া আদিরসের উদ্দামতাকে খানিকটা পরিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল। শুধু আদিরসের নহে, ইহাতে গোপন প্রেম—যাহা, গান্ধর্বমতের দোহাই সত্ত্বেও উচ্চতর রুচির নিকট কিঞ্চিৎ প্রতিকূল মনে হইবেই, বিশেষতঃ গোপন প্রণয়ের ফলে সসত্ত্বা বিদ্যার অবস্থা, সুন্দরের ধৃত হওয়া প্রভৃতি বর্ণনায় অধ্যাত্ম চেতনা বা উচ্চতর প্রেমের কিছুমাত্র আদর্শ নাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এবিষয়ে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা যথার্থ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে—"গল্পের ভিতর গল্প—ভারতবর্ষের এক নূতন ব্যাপার, ঠিক যেন চীনে বাক্স—একটার ভিতর একটা, তার ভিতর একটা। আমাদের পঞ্চতন্ত্র তাই, হিতোপদেশ তাই, বৃহৎকথা তাই, কথাসরিৎসাগর তাই, মহাভারত তাই, পুরাণগুলিও তাই। বাঙলায় আসিয়া বিদ্যাসুন্দরও তাই হইয়া পড়িয়াছে। উপরের বাক্স কালিকা-মঙ্গল, ভিতরের গল্প বিদ্যাসুন্দর।"[১] এই যে ভক্তির মোড়কে মুড়িয়া পার্থিব আদিরসের কাহিনী রচনা—ইহার উৎসটি বড়ই কৌতূহলজনক। এখন দেখা যাক, বাঙলাদেশে কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দরের[২] অন্তর্ভুক্ত বাস্তব প্রণয়ের গল্পটি কীভাবে কোথা হইতে উড়িয়া আসিল।

বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর উৎস ॥

সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্য ও পদ্যে অনেকগুলি রোমান্টিক গল্পকাহিনী একদা পাঠকসমাজে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল তাহা সংস্কৃত সাহিত্যের

১ শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত বলরাম কবিশেখরের কালিকামঙ্গলের প্রারম্ভে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'মুখবন্ধ'।

২ পূর্ববঙ্গের কবি কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরে বাস্তব প্রণয় কাহিনী অনুসৃত হইলেও, তাহাতে কালিকার কোন প্রসঙ্গই নাই, কবি ঐ কাব্যে কালিকার স্থলে সত্যপীর মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। পরে এবিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অল্পবিস্তর জ্ঞাত আছেন। এই সমস্ত রোমান্টিক গল্প-সাহিত্যে যুদ্ধবিগ্রহ, দুঃসাহসিক অভিযান এবং নরনারীর প্রেমলীলাই মুখ্যতঃ বর্ণিত হইয়াছে। বাঙলাদেশের কালিকামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাসুন্দর কাহিনী সংস্কৃত এবং প্রাকৃত রোমান্টিক প্রেমগাথা হইতে বাংলা সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে এবং দেবদেবী-সংক্রান্ত ভক্তিরসকে আচ্ছন্ন করিয়া আদিরসাত্মক মানবজীবনকে অধিকতর প্রাধান্য দিয়াছে। গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' (পাওয়া যায় নাই), ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী', সোমদেবের 'কথাসরিৎ-সাগর' জয়রথের 'হরচরিতচিন্তামণি' অজ্ঞাতনামা কবির 'শুকসপ্ততি' 'সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা', 'বেতালপঞ্চবিংশতি', দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত', আনন্দের সংস্কৃত-প্রাকৃতমিশ্রিত চম্পূকাব্য 'মাধবানল কথা', সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা', বাণভট্টের 'কাদম্বরী', ত্রিবিক্রমভট্টের 'দময়ন্তীকথা'—এ সমস্তই আখ্যায়িকা বা কথাগ্রন্থ। ইহাদের কোনটি বিশুদ্ধ গদ্যে, কোনটি কবিতায়, কোনটিতে বা গদ্য-পদ্যের মিশ্রণ (চম্পূ) লক্ষ্য করা যাইবে। গল্পগুলিতে অদ্ভুতরস ও আদিরসের জোড়কলম বাঁধিয়া আখ্যানের কৌতূহলজনক উপা-দান গঠিত হইয়াছে। পৌরাণিক যুগে, বিশেষতঃ উত্তর-বৌদ্ধযুগে, যখন সমাজে এক প্রকার অবক্ষয়ী পর্ব শুরু হইয়া গিয়াছিল, তখন অসামাজিক উগ্র প্রেম, নারীর অসতীত্ব, পুরুষের লাম্পট্য, গোপন প্রণয়ের ষড়যন্ত্র—এই জাতীয় তীব্র রিরংসামূলক আখ্যানের একদা খুব জনপ্রিয়তা দেখা গিয়াছিল। কোন এক রাজকন্যার সঙ্গে তাঁহার শিক্ষক বা কবি পণ্ডিতের গোপন প্রণয়, রাজার দ্বারা প্রণয়-ষড়যন্ত্রের আবিষ্কার, গুপ্ত প্রণয়ীর প্রাণদণ্ডাদেশ দান, পরে সুকৌশলে প্রণয়ীর প্রাণরক্ষা এবং রাজকন্যার সঙ্গে পুনর্মিলন—এইরূপ রূপ-কথা ধরণের গালগল্প সর্বযুগের বয়স্ক শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। উদয়ন-কথাকোবিদ প্রাচীন গ্রামবৃদ্ধেরাই নহে, সর্বযুগেই এই প্রকার আকাশ-কুসুম চয়নে কবিরা বিশেষ ঔৎসুক্য বোধ করিয়া থাকেন এবং প্রায়শঃই নায়কের স্থলে দরিদ্র কবি নিজেকেই স্থাপন করিয়া এক প্রকার পরোক্ষ নায়কত্বের গৌরব ভোগ করিতে চাহেন। তাই এই সমস্ত কাহিনীতে প্রায়ই দেখা যায়, অপরূপা রাজকন্যা তাঁহার শিক্ষক বা কোন কবির কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া আকৃষ্ট হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ জৈন কবি রাজ-শেখর সূরীর গল্পের নায়ক মদনকীর্তি ও রাজকন্যা মদনমঞ্জরীর গোপন

প্রেম এবং রাজার দ্বারা মদনকীর্তি ধৃত হওয়ার[২] আখ্যায়িকাতেও একই মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বাঙলাদেশে বিদ্যাসুন্দর আখ্যায়িকার পশ্চাদপটে একটা জটিল ও বহুদূরবিস্তৃত সংস্কৃত আদিরসের গল্পের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে বলিয়া এই বিষয়টি একটু বিস্তারিত আকারে আলোচিত হওয়া কর্তব্য।

আলোচকগণ মনে করেন যে, বাংলা কলিকামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর অন্তরালে দুটি সংস্কৃত আখ্যানের বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে। একটি কাশ্মীরী কবি বিহ্লণের নামে প্রচলিত 'চৌরপঞ্চাশিকা' বা 'চৌরীসুরতপঞ্চাশিকা'—ইহাতে পঞ্চাশটি শ্লোকে কোন এক কবি-পণ্ডিতের সঙ্গে এক রাজকুমারীর গোপন প্রণয়ের আভাস আছে। চৌরপঞ্চাশিকা নাকি 'বিহ্লণ কাব্য' বলিয়া আর একটি কাব্যের পরিশিষ্ট। প্রচলিত গল্পে ও চৌরপঞ্চাশিকার পরবর্তী কালের টীকা হইতে জানা যাইতেছে যে, "বিহ্লণ নামক একজন কাশ্মীরী পণ্ডিত রাজার মেয়েকে (গুজরাটের রাজধানী অনহিল পত্তনের রাজা) লেখাপড়া শিখাইতেন; ক্রমে তাঁহাদের প্রণয় সঞ্চার হয় এবং আরও কিছু সঞ্চার হয়। রাজা টের পাইয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার আদেশ করেন। সেই সময়ে তিনি ৫০টি কবিতা রচনা করেন। সেই ৫০টি কবিতার নাম চৌরপঞ্চাশিকা। রাজা তাঁহার কবিতায় সন্তুষ্ট হইয়া কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেন ও তাহাদের দুইজনকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দেন"।[৩] বিহ্লণ কাব্য বলিয়া কোন কাব্য পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তাঁহার নামে 'চৌরপঞ্চাশিকা' শীর্ষক ক্ষুদ্র শ্লোকসংগ্রহ একদা প্রণয়কবিতা রূপে সংস্কৃতজ্ঞ মহলে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কাশ্মীরী কবি বিহ্লণ 'বিক্রমাঙ্কদেব চরিত' নামক ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করিয়া বিখ্যাত হন। তিনিই 'চৌরপঞ্চাশিকার' কবি—এইরূপ প্রসিদ্ধি বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কাহারও কাহারও মতে তিনিই এই চৌরপ্রণয়ী; তাঁহার জীবনেই ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল। "তিনি কল্যাণী নগরে গিয়া চালুক্যবংশের রাজকবি হন, এবং অনেক কাব্য রচনা করেন।"[৪] বিহ্লণ কাশ্মীরের অধিবাসী হইলেও কনৌজ, প্রয়াগ, কাশী প্রভৃতি বহু দেশ

২ ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম (অপরার্ধ)
৩ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত কালিকামঙ্গলের মুখবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য।
৪ ঐ

পর্যটন করিয়া কিছুকাল অনহিলবাদের রাজা কর্ণদেব ত্রৈলোক্যমল্লের (১০৬৪-১০৯৪) নিকট অবস্থান করেন, তারপর কল্যাণের চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সভাকবি হইয়া 'বিদ্যাপতি' উপাধি লাভ করেন, এবং পৃষ্ঠ-পোষকের গৌরব বর্ধনের জন্য 'বিক্রমাঙ্কদেব চরিত' নামক বিখ্যাত ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করেন। ইঁহারই নামে 'চৌরপঞ্চাশিকা' চলিতেছে। মনে হয়, পরবর্তী কালে অন্য কেহ ইহার পূর্বে বিহ্লণকাব্য অংশটুকু জুড়িয়া দিয়া একটা গোটা কাব্য রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে চৌরপঞ্চাশিকার রচনায় চৌরছদ্মবেশী কবির হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছিল; চৌর নামক এক কবির নামও পাওয়া যাইতেছে। কেহ কেহ বলেন চৌরকবি ও বিহ্লণ একই ব্যক্তি। এ সমস্ত অনুমানের ভিত্তি যাচাই করিয়া দেখিবার মতো নির্ভরযোগ্য কোন উপাদান পাওয়া যায় নাই। কাজেই শুধু এইটুকু অনুমান করা যায় যে, চৌরপঞ্চাশিকা 'বিদ্যাপতি' উপাধিধারী বিহ্লণেরই রচনা। কাশ্মীরী চৌরপঞ্চাশিকার প্রারম্ভে আছে, "অথ চ চৌরীসুরত-পঞ্চাশিকা পণ্ডিত বিহ্লণকৃতা"। সুতরাং বিহ্লণকেই পঞ্চাশ শ্লোকাত্মক চৌরপঞ্চাশিকার কবি বলিয়া গ্রহণ করা যায়। তবে বিহ্লণকাব্যটি অন্য কাহারও রচনা। বিহ্লণের চৌরপঞ্চাশিকা অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করিলে কবিযশঃ-প্রার্থী অন্য কোন ব্যক্তি পূর্বোক্ত শ্লোকের প্রসঙ্গ ধরিয়া এবং বিহ্লণকে নায়ক বানাইয়া বিহ্লণ কাব্য লিখিয়া থাকিবেন। গুপ্ত প্রণয়ের অপরাধে ধৃত চৌরপঞ্চাশিকার কবি প্রাণদণ্ডাদেশের আদেশ পাইয়া পঞ্চাশ শ্লোকে রাজকন্যার সঙ্গে তাঁহার মিলন বর্ণনা করিয়াছেন—ইহাতে মূল কাহিনীটি পরোক্ষভাবে রহিয়া গিয়াছে, পঞ্চাশটি শ্লোকে নায়ক-নায়িকার সঙ্গে পূর্ণ মিলনের কাহিনী স্মরণ করিয়াছেন। তাই মনে হয়, পরে কেহ চৌরপঞ্চা-শিকাকে পরিশিষ্টরূপে পরিগণিত করিয়া নায়ক-নায়িকার কাহিনী গ্রন্থন করেন, যাহার নাম হয় বিহ্লণকাব্য। কাশ্মীর ও দক্ষিণভারতে চৌরপঞ্চা-শিকার দুই প্রকার কাহিনী চালিত আছে, যাহাতে নামধামের যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য রহিয়াছে। কাশ্মীরী মতে, রাজকন্যা চন্দ্রলেখা মহিলাপত্তনের রাজা বীরসিংহের আত্মজা। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত কাহিনীতে দেখা যাইতেছে, রাজকন্যার নাম যামিনীপূর্ণতিলক, পাঞ্চালরাজ মদনাভিরাম তাঁহার পিতা।

বাঙলাদেশে চৌরপঞ্চাশিকার সঙ্গে কালিকামঙ্গলের বিদ্যাসুন্দরের গল্প

কিভাবে জড়াইয়া গেল তাহার ইতিবৃত্ত কৌতূহলোদ্দীপক। এদেশে বাংলা অক্ষরে লেখা একখানি সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্য পাওয়া গিয়াছে—বররুচি নাকি ইহার রচয়িতা। আমাদের মনে হয় কোন অর্বাচীন কবি সংস্কৃত-বিদ্যাসুন্দর লিখিয়া বররুচির নামে চালাইয়া দিয়াছেন। তখন হইতেই অনেকে মনে করিতেছেন যে, বিহ্লণ হইতেছেন সুন্দর, এবং বিদ্যা তাঁহার প্রণয়িনী (চন্দ্রলেখা বা যামিনীপূর্ণতিলকা)। পণ্ডিত রাম তর্কবাগীশ চৌরপঞ্চাশিকার টীকায় (১৭৯৮ খ্রীঃ অঃ)[৫] প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, চৌরপঞ্চাশিকার উদ্দিষ্ট কাহিনীটি বিদ্যাসুন্দরেরই আখ্যান। রাঢ়দেশের চৌর-পল্লীর নৃপতি গুণসাগরের পুত্র সুন্দর রাজকন্যা বিদ্যার সহিত মিলিত হন এবং ধৃত হইয়া বধার্থ নির্দিষ্ট হইলে চৌরপঞ্চাশিকার শ্লোকগুলি রাজার নিকট আবৃত্তি করেন। এই শ্লোকগুলির দুই অর্থ, একটি অর্থ—সুন্দর ও বিদ্যার মিলন, আর এক অর্থ—কালিকার স্তুতি। সুন্দরের স্তবে তুষ্ট হইয়া কালিকা রাজার জিহ্বায় ভর করিলেন। তখন রাজা স্বীকার করিলেন যে, সুন্দরই বিদ্যার স্বামী। অতঃপর বিদ্যার সঙ্গে সুন্দরের আনুষ্ঠানিক বিবাহ হইল। তর্কবাগীশ এখানে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী ও চৌরপঞ্চাশিকাকে এই ভাবে সংযুক্ত করিয়াছেন।[৬] অবশ্য তর্কবাগীশের পূর্বেই প্রাচীন বাংলা কালিকামঙ্গলে সুন্দরের মুখে চৌরপঞ্চাশিকার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ দ্বিজ শ্রীধরের (১৫শ শতাব্দী) কাব্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই প্রাচীনতম বাংলা বিদ্যাসুন্দরেও চৌরপঞ্চাশিকার বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা করা যাইবে।

কাশ্মীরী কবির চৌরপঞ্চাশিকার শ্লোক কালিকামঙ্গলে সুন্দরের মুখে উল্লিখিত হইয়াছে কি ভাবে, তাহা চিন্তার বিষয়। এই সমস্যা সমাধানের দুইটি সূত্র আছে। চৌরপঞ্চাশিকার প্রচলিত কাহিনীতে দেখা যায়, স্বয়ং কবি বিহ্লণ গোপনে রাজকন্যার সঙ্গে মিলিত হইয়া ধৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনকাহিনীতেও দেখা যাইতেছে, তাঁহার পৃষ্ঠপোষক রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে বিদ্যাপতি উপাধি দিয়াছিলেন। বাঙলাদেশের কালিকামঙ্গলে এইভাবে বিহ্লণের বাস্তব জীবনের কিয়দংশ এবং চৌর-

৫ A. B. Keith—*A History of Sanskrit Literature*, p. 188

৬ সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, ভূমিকা, পৃ. ১২-১৩

পঞ্চাশিকার কাল্পনিক রোমান্টিক গল্প মিলিয়া মিশিয়া উত্তরাপথের কাহিনী পূর্বভারতে আসিয়া কালিকার ভক্তির আবরণে উপস্থাপিত হইয়াছে।

এ বিষয়ে আরও একটু বক্তব্য আছে। বররুচি নামক কোন এক কবির বঙ্গাক্ষরে লেখা সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের একাধিক পুঁথি বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে; বাঙলার বাহিরে কিন্তু উক্ত বররুচির সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্য পাওয়া যায় নাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে একটি সংশয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন, "লোকে বলে বিদ্যাসুন্দর বররুচির লেখা। কোন্ বররুচি তার ঠিকানা নাই। কাত্যায়ন বররুচির লেখা?—না 'বাররুচং কাব্যং' যাঁর, সেই বররুচির লেখা? না বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের বররুচির লেখা?—কিছুই ঠিক করিতে পারা যায় না। অনেকে অনেক রকম পুঁথি পাইতেছেন এবং অনেক রকম মত প্রকাশ করিতেছেন।"[৭] পণ্ডিত রামগতি বলিয়াছিলেন, "অনেকের বিশ্বাস এই যে, বররুচিকৃত একখানি প্রাচীন পুস্তক আছে। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান তাহাতে বর্ণিত আছে।"[৮]

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে অনেকগুলি বররুচির নাম পাওয়া যাইতেছে। বররুচি নামে কোন একজন প্রাচীন আলঙ্কারিক ছিলেন বলিয়া মনে হয়।[৯] 'প্রাকৃত প্রকাশে'র বৈয়াকরণ বররুচি[১০] (হর্ষদেবের 'লিঙ্গানুশাসনে' আর এক বররুচির উল্লেখ আছে), বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম বররুচি, 'সিংহাসন দ্বাত্রিংশিকা'র লেখক বলিয়া পরিচিত বররুচি এবং 'নীতিরত্ন' নামক একখানি নীতিকাব্যের বররুচি—ইঁহাদের মধ্যে কে আসল, কে নকল কে প্রাচীন, কে-ই বা অর্বাচীন—তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। মনে হয় অর্বাচীন কালের কোন সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালী কবি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম বররুচির নামে বাংলা কালিকামঙ্গলের কাহিনী অবলম্বনে সংস্কৃতে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন।

দীনেশচন্দ্রের মতে ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানটি পাওয়া যায়।[১১] কিন্তু বোম্বাই হইতে প্রকাশিত ও বেঙ্কটেশ্বর সম্পাদিত ভবিষ্যৎ পুরাণে এই আখ্যান নাই।

৭ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত কলিকামঙ্গলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মুখবন্ধ।

৮ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব

৯ Keith—Ibid ১০ Ibid

১১ দীনেশচন্দ্র সেন—*History of Bengali Language and Literature*

রামগতি তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' (প্রথম সংস্করণ-১৮৭১) বররুচিকৃত বিদ্যাসুন্দরের উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি দুইখানি পুস্তকের ইঙ্গিত দিয়া বলেন যে, বাগেরহাট স্কুলের শিক্ষক পঞ্চানন ঘোষ দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত 'সুন্দরকাব্য' নামে সংস্কৃতে রচিত একখানি বিদ্যা-সুন্দরকাব্য ন্যায়রত্ন মহাশয়কে প্রেরণ করেন। তাঁহার মতে, "বররুচিকৃত প্রাচীন গ্রন্থ নহে, একজন আধুনিক বঙ্গদেশীয় কবির বিরচিত।" তিনি সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের আরও একখানি পুঁথি দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও, তাঁহার মতে, বররুচি রচিত নহে। কিন্তু পরের সংস্করণে তিনি শেষোক্ত কাব্যখানিকে বররুচির কাব্য বলিয়া স্বীকার করেন। ১২৭৯ সনের 'বঙ্গদর্শনে' রামদাস সেন বররুচির বিষয়ে একটি প্রবন্ধে 'কলিকাতা প্রাকৃতিক যন্ত্র' হইতে প্রকাশিত সংস্কৃত ব্যাখ্যা সহ বররুচির সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের উল্লেখ করিয়াছিলেন। ময়নাগড়ের ঈশানচন্দ্র ঘোষ এই সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরকাব্য (বররুচির রচিত বলিয়া প্রচারিত) ১৯২৯ সংবতে (১৮৭২ খ্রীঃ অঃ) বাংলা অক্ষরে ছাপিয়া প্রকাশ করেন। ইহাতে মূলকাব্যের ৫৪টি শ্লোক এবং তাহার পর চৌর-পঞ্চাশিকার ৫০টি শ্লোক একত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালের পণ্ডিতগণ ও ঈশানচন্দ্র প্রকাশিত ৫৪টি শ্লোকযুক্ত বিদ্যাসুন্দরকাব্যকে বররুচি রচিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত 'কাব্যসংগ্রহে' ঐ বৎসরেই উক্ত ৫৪টি শ্লোক বররুচি বিরচিত 'বিদ্যাসুন্দরম্' নামে মুদ্রিত হয়। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় 'কাব্যসংগ্রহে'র প্রথম ভাগে 'চৌরপঞ্চাশিকা'ও মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ১৮৬২ সালে নন্দলাল দত্ত সম্পাদিত 'কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহে' যে সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের উল্লেখ আছে, তাহা খুব সম্ভব এই বর-রুচিকৃত। তবে সম্পাদক সেই সংস্কৃত পুঁথিটির কথা শুনিয়াছিলেন, চাক্ষুষ করেন নাই। আধুনিককালে অধ্যাপক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় *The Long-lost Sanskrit Vidya-Sundar*[১২] প্রবন্ধে ৫৪৬ শ্লোক সমন্বিত সংস্কৃতে রচিত এক সুদীর্ঘ বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্বোল্লিখিত নন্দলাল দত্ত সম্পাদিত গ্রন্থে যে বিদ্যাসুন্দরের ইঙ্গিত আছে, ইহার সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে (১৭২৮ শক) শ্রীরাম তর্কবাগীশ চৌরপঞ্চাশিকার 'কাব্য সন্দীপনী' টীকায়

১২ Proceedings of the Second Oriental Conference (1922), pp. 215-220

সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর হইতে যে শ্লোকগুলি উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা বররুচি নামীয় কোন কবির বিদ্যাসুন্দর কাব্য হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের মতে, বাংলা বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গলের আখ্যানটি বররুচির সংস্কৃত কাব্য হইতে গৃহীত।

অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাতেও দুই একখানি অনুরূপ গ্রন্থ পাওয়া যায়। দীনেশচন্দ্র নাকি ফার্সীভাষায় রচিত একখানি প্রাচীন বিদ্যাসুন্দরের পুঁথি দেখিয়াছিলেন।[১৩] শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় কবি নেজাবত উল্লা রচিত একখানি ফার্সী বিদ্যাসুন্দর কাব্যের সবিস্তারে পরিচয় দিয়াছেন।[১৪] ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল উর্দুতেও অনূদিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়।[১৫] ১৮০৯ খ্রীঃ অব্দে গোবিন্দদাস বৈরাগীর সম্পাদনায় কলিকাতা রামমোহন সাহার লেন হইতে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রায় ২০০ শত বৎসর পূর্বে কাশীনাথ নামে এক মৈথিল লেখক 'বিদ্যা-বিলাপ' নামে মৈথিলী-বাংলাভাষায় একখানি নাটিকা রচনা করিয়াছিলেন।[১৬]

এই সমস্ত উল্লেখ ও প্রমাণ দৃষ্টে মনে হয়, কোন এক রাজপুত্র বা কবি-পণ্ডিতের সঙ্গে কোন এক রাজকন্যার গুপ্তপ্রণয়ের রোমান্টিক গল্প বহু পূর্ব হইতে ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রচলিত ছিল। বিহ্লণের চৌরপঞ্চাশিকা, জৈনকবি রাজশেখর সূরীর গল্প, বররুচির রচিত বলিয়া প্রচারিত বিদ্যাসুন্দর-কাব্য রোমান্স্‌প্রিয় জনরুচিনন্দনের জন্যই রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। চৌরপঞ্চাশিকার নায়ক-নায়িকার নাম বিহ্লণ ও যামিনীপূর্ণতিলকা বা চন্দ্রলেখা, রাজশেখর সূরীর আখ্যায়িকা নায়ক-নায়িকার নাম মদনকীর্তি ও মদনমঞ্জরী। চৌরপঞ্চাশিকার কাহিনীই বাঙলাদেশের কালিকামঙ্গলের বা বররুচির 'বিদ্যাসুন্দরম্‌' কাব্যের নায়ক-নায়িকাকে যথাক্রমে বিদ্যা ও সুন্দর নামে পরিচিত করিয়াছে। বস্তুতঃ বাঙলার কালিকামঙ্গলসমূহের কাহিনী সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্য চৌরপঞ্চাশিকার প্রভাবেই রচিত ও প্রচারিত

১৩ দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

১৪ 'সাধনালি' পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) এই ফার্সী গ্রন্থের পরিচয় প্রকাশিত হয়। করিম সাহেব উক্ত গ্রন্থ ১৮২৫-২৬ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচনা মনে করিয়াছিলেন।

১৫ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত কালিকামঙ্গলের ভূমিকা (পৃ. ৮০) দ্রষ্টব্য।

১৬ নেপালে বাঙলা নাটক—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত।

হইয়াছে। অবশ্য বররুচির 'বিদ্যাসুন্দরম্'-এর প্রভাবেই কালিকামঙ্গল রচিত হইয়াছে কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বররুচির সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরকেই বাংলা বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গলের মূল বলিয়াছেন।[১৭] কিন্তু সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্য অর্বাচীন, না প্রাচীন—অথবা বিদ্যাসুন্দরের বররুচি প্রাচীন বররুচির আধুনিক প্রেতাত্মা কিনা—একথা যতক্ষণ না নিশ্চয়রূপে প্রমাণিত হইতেছে, ততক্ষণ কে কাহার উপর ভিত্তি করিয়াছেন, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। বিশেষতঃ বররুচির বিদ্যা-সুন্দরের কোন প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় নাই; সুতরাং সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের প্রভাবেই বাংলা কালিকামঙ্গল রচিত হইয়াছে, এরূপ অনুমান অপেক্ষা বরং বাংলা কালিকামঙ্গলের গল্প এবং সংস্কৃত চৌরপঞ্চাশিকার প্রভাবে সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর অর্বাচীন কালে দেবভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে—এইরূপ অনুমানই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

সংস্কৃতে রচিত যতগুলি প্রণয়কাব্য (বিশেষতঃ চৌরপঞ্চাশিকা ও সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর) পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি মূলতঃ পার্থিব প্রণয়রসের কাহিনী। দেবদেবীর প্রভাব সেখানে একেবারেই নাই। অপরদিকে বাংলা কালিকা-মঙ্গলে কালিকা-ভক্তির বাহ্যিক আবরণ অধিকতর স্পষ্ট। একমাত্র কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরে কালিকামাহাত্ম্য বর্ণিত হয় নাই, সেখানে কালিকার স্থলে সত্যপীরের মহিমা চিত্রিত হইয়াছে।[১৮] অবশ্য কালিকামঙ্গলে কালীভক্তির মহিমা প্রায়ই নিষ্প্রভ—মানব-মানবীর আদিরসাত্মক উত্তেজক বর্ণনাই সেখানে অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। মধ্যযুগে পাঠক-শ্রোতা ভক্তির গান ছাড়া মর্ত্যজীবন-কাহিনীর প্রতি বোধহয় বিশেষ আকর্ষণ বোধ করিত না। তাই কালিকামঙ্গলের কবিরা কালিকার মহিমার কথা নামমাত্র উল্লেখ করিয়া বিদ্যাসুন্দরের প্রেমলীলা বর্ণনায় অধিকতর উল্লাস বোধ করিয়াছেন।

চৌরপঞ্চাশিকা ও সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে কালিকার প্রসঙ্গ না থাকিলেও শ্রীরাম তর্কবাগীশ ১৯শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চৌরপঞ্চাশিকার যে টীকা প্রণয়ন করেন, তাহাতে তিনি প্রথম ঘোষণা করেন যে, চৌরপঞ্চাশিকার ৫০টি শ্লোকে সুন্দর ইষ্টদেবী কালিকার স্তুতি করিয়াছিলেন। বাঙলাদেশে

১৭ Proceedings of the Second Oriental Conference

১৮ পরে আলোচিত হইয়াছে।

কালিকামঙ্গলের প্রভাবেই চৌবপঞ্চাশিকার দ্ব্যর্থবোধক টীকা (একপক্ষে বিদ্যা, আর একপক্ষে কালিকা) ও অর্থ প্রচারিত হইয়াছিল। প্রায় তাবৎ কালিকামঙ্গলে সুন্দব এই দুই প্রকাব ব্যাখ্যাসহ চৌবপঞ্চাশিকাব শ্লোক আওড়াইয়া এক ঢিলে দুই পাখী মাবিয়াছে; একদিকে সে উক্ত কবিতা আবৃত্তি কবিয়া বিবহবেদনা প্রশমিত কবিয়াছে, আব একদিকে মা কালীব স্তুতি কবিয়া একই কবিতায় দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ কবিয়া অনেক পবিশ্রম বাঁচাইয়াছে।

কালিকামঙ্গলে কালীভক্তিব বাড়তামোডক সত্ত্বেও বিদ্যাসুন্দব কাহিনীব তীব্র আদিবস ঢাকা পডে নাই। কেহ কেহ বিদ্যাসুন্দব কাহিনীকে উচ্চাঙ্গেব রূপক বলিয়া গ্রহণ কবিয়াছেন। কেহ কেহ মনুসংহিতা বেদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ হইতে [১৯] বিদ্যা ও সুন্দব নাম দুইটিব গূঢ় অধ্যাত্ম তাৎপর্য আবিষ্কাবেব চেষ্টা কবিয়াছেন। "পুরুষ খোঁজে বিদ্যা, আব নাবী চায় সৌন্দর্য—এই রূপকেব উপব বিদ্যাসুন্দব কাহিনীব ভিত্তি।"[২০]—কেহ কেহ এরূপ অদ্ভুত মনগডা তত্ত্বকথাবও সাহায্য লইয়াছেন। বিবাহেব আসবে "কন্যা ববযতে রূপম্, পিতা শ্রুতম্" হইতে পাবে, কিন্তু চৌবপঞ্চাশিকা এবং বিদ্যাসুন্দবেব গল্পেব পশ্চাতে রূপক তাৎপর্য খুঁজিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। বোমান্টিক প্রণযকে অবলম্বন কবিয়া সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় যে সমস্ত কথা ও কাব্য বচিত হইয়াছে, তাহাদেব প্রায় কোনটিতেই কোনও প্রকাব অধ্যাত্ম বা গভীব চিন্তাগ্রাহ্য তাৎপর্য নাই, নিতান্ত কামোদ্দেজিত গল্পবসই ইহাব প্রধান উদ্দেশ্য ও একমাত্র ফলশ্রুতি। সুফী প্রভাবে আদিবসেব আখ্যানে মুসলমান কবিগণ কোনও কোনও সময়ে মবমী সাধনা ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। লয়লামজনু, য়ুসুফ-জুলেখা, সলমোন-অংসালেব প্রেমেব কাহিনীতে সুফী সম্প্রদায়েব ভগবৎ প্রেমোপাসনাই ব্যক্ত হইয়াছে। চিশ্‌তিয়া সম্প্রদায়েব সাধক মহিউদ্দিনের শিষ্য মালিক মুহম্মদ জায়সী (১৫৪০) যে 'পদুমাবৎ' কাব্য বচনা করেন, তাহা আত্মা-পবমাত্মাব রূপকার্থেই গৃহীত হইয়া আসিতেছে। নূব-মহম্মদেব ইন্দ্রাবতী কাব্যও এইরূপ আধ্যাত্মিক রূপক কাব্য—মর্ত্য প্রণয় যাহার বাহ্যিক উপাদান। বাঙলাদেশেব আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যেও অনুরূপ কৌশল লক্ষ্য কবা যাইবে। রূপকপ্রিয় সমালোচকগণ 'শকুন্তলা'-

১৯ শাবদীয় জনসেবক (১৩৫১) ডঃ সুকুমার সেনের 'বিদ্যাসুন্দর তত্ত্ব' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২০ ডঃ সুকুমার সেন—বা সা. ইতি. ১ম (অপরার্ধ)

'রত্নাবলী' প্রভৃতি আদিরসের গ্রন্থকেও রূপককাব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। কোন কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মাবলম্বীরা বিদ্যাসুন্দরকেও রূপক-কাব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন। তাঁহাদের মতে বিদ্যাসুন্দরের গল্পটিতে মানবপ্রেমের মারফতে অধ্যাত্মতত্ত্বের গূঢ় তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মানবের আদর্শস্বরূপ সৌন্দর্যের (সুন্দর) সঙ্গে বিদ্যার মিলন দেখানই নাকি এই কাব্যের উদ্দেশ্য। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের প্রথম ইংরাজী অনুবাদক পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত গৌরদাস বৈরাগী ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দেই এই রূপক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "The union of the hero and the heroine represents the union of Beauty and Wisdom—a union constituting an excellent ideal of human perfection,[২১] the Greek ideal embodied in Plato's Charmides of a beautiful mind in a beautiful body." বৈরাগী মহাশয় এখানে দান্তে বিয়াত্রিচের প্রসঙ্গও তুলিতে পারিতেন। মধ্যযুগের কবিগণ নিছক আদিরসের কাব্যকে ভক্তির শান্তিজল ছিটাইয়া অশুচি অসামাজিককে শ্রদ্ধা দিতে চাহিয়াছিলেন; আর আধুনিক কালের রুচিবাগীশ সমালোচকগণ গুপ্তপ্রণয়ঘটিত আদি-রসের কাহিনীকে রূপকের গূঢ় তাৎপর্যমণ্ডিত করিয়া রুচি ও শুচিতা বাঁচাইতে চাহেন। কিন্তু বাঙলাদেশের কালিকামঙ্গলে এরূপ কোন রূপকা-শ্রয়ী গূঢ় তাৎপর্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কালিকামঙ্গলে রক্তাংশুকের অন্তরালে মকরকেতনের চীনাংশুক ঢাকা পড়ে নাই, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। চৌরপঞ্চাশিকা, বিদ্যাসুন্দর—এসমস্তই আমাদের কাছে মর্ত্যপ্রেমের উত্তপ্ত স্পর্শ বহিয়া আনে, ভাগবতকথা উপরি পাওনা মাত্র। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসুন্দরের এই মানবরসের দিকে চাহিয়াই লিখিয়াছিলেন,

ওগো সুন্দর চোর,
বিদ্যা তোমার কোন্ সন্ধ্যার
কনক চাঁপার ডোর!

রসিক পাঠকের মনে, কালিকামঙ্গল নহে, বিদ্যাসুন্দরের গল্পকথা এখনও বাঁচিয়া আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে।

---

২১ ডঃ সেন এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়াই বলিয়াছেন, "পুরুষ খোঁজে বিদ্যা আর নারী চায় সৌন্দর্য—এই রূপকের উপর বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর ভিত্তি।" (বা. সা. ই.) এবিষয়ে আমাদের মন্তব্য পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

কালিকামঙ্গল কথা ॥

দেবী কালিকা তন্ত্রোক্ত দেবী। পুরাণের মধ্যে তাঁহার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি অর্বাচীন পুরাণে দশমহাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কালিকার যে সমস্ত বর্ণনা ও কাহিনী আছে, তাহা মূলতঃ তন্ত্র হইতে পুরাণসাহিত্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। কালিকার বর্ণনায় বিশেষভাবে আর্যেতর সমাজ, জীবন ও দেবী পরিকল্পনার আদর্শ লক্ষ্য করা যায়। "ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী মসীমলিনমুখী মুক্তকেশী" যে কালিকা-মূর্তির বর্ণনা তন্ত্রে (তন্ত্রসার) পাওয়া যায়, যিনি অখিলজগৎ একাই গ্রাস করিতে চাহিতেছেন, হস্তে ধারণ করিয়াছেন জলদনলসন্নিভ উগ্র পাশাস্ত্র, সেই ভদ্রকালী সাধককে রক্ষা করুন। তন্ত্রে তাঁহার ভয়ঙ্কর মূর্তির ধ্যান করা হইয়াছে। কিন্তু উগ্রচণ্ডা কালিকামূর্তির অনুরূপ দেবীপূজা একদা আর্যেতর সমাজে প্রচুর অনুষ্ঠিত হইত, এখনও আদিবাসী সমাজে এই ধরণের ভয়ঙ্করী দেবীমূর্তির পূজা হইয়া থাকে।

সাধারণ প্রচলিত বিশ্বাস মতে কালিকার নানাবিধ মূর্তির (রক্ষাকালী, শ্মশানকালী, ভদ্রকালী, দক্ষিণাকালী ইত্যাদি) পূজা হইয়া থাকে। অদ্যাপি মারীব্যাধি হইতে রক্ষার নিমিত্ত বাঙালী হিন্দু রক্ষাকালীর উপাসনা করিয়া থাকে। তন্ত্রের দেশ বাঙলায় কালিকার নানা রূপের পূজা হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? এখনও পর্যন্ত বাঙলার বাহিরে যেখানে কয়েক ঘর বাঙালী বাস করে, সেখানেই একটি করিয়া কালীবাড়ী আছে। এখানে কালিকার নিত্যসেবার ব্যবস্থা আছে, আবার দুর্গা, সরস্বতী প্রভৃতি অন্যান্য দেবীর পূজাও হয়। সাধারণতঃ বাঙলার বাহিরের কালীবাড়ীগুলি প্রবাসী বাঙালীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

বাঙলাদেশে আর একটি কৌতুককর ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। চোরদের সমাজে কালিকা ও কার্তিকের পূজাবিধি প্রচারিত আছে। চোরেরা নাকি দুষ্কর্মে বাহির হইয়াও কালিকা ও কার্তিকের কৃপায় সফল হইয়া নিরাপদে ঘরে ফিরিয়া আসে। বাঙলাদেশে 'চোরপাঁচালী'-ও রচিত হইয়াছিল। কালিকামঙ্গলে এই কালিকার প্রসাদে চোরচূড়ামণি সুন্দর প্রণয়ব্যাপারে সাফল্য লাভ করিয়াছিল। কালিকামঙ্গলের কালিকাও মূলতঃ চোর-কালী,

সুন্দরও নারীচোর। চৌরপঞ্চাশিকার প্রভাবে কালিকামঙ্গলের নায়ক চৌর্যবৃত্তির দ্বারাই বিদ্যাকে লাভ করিয়াছে।

কালিকামঙ্গলের কাহিনীতে প্রাচীন রোমান্টিক গল্পই অনুসৃত হইয়াছে। গল্পের মধ্যে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই। কালিকামঙ্গলগুলিতে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী অনুসৃত হইলেও অপ্রধানচরিত্রের নামধাম ও ঘটনার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। সংক্ষেপে কাহিনীটি কতকটা এই রূপ। রাজকুমার সুন্দর রাজা বীরসিংহের কন্যা বিদ্যার রূপগুণের কথা শুনিয়া তাহাকে পাইবার জন্য দেবী ভদ্রকালীর উপাসনা করিয়া তাঁহার বরলাভ করিল। অতঃপর সে নায়িকা বিদ্যার সন্ধানে যাত্রা করিয়া বীরসিংহের রাজপুরীতে উপস্থিত হইল এবং এক মালিনীর বাটীতে আশ্রয় লইয়া নিজ নাম ধাম গোপন করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিল। মালিনী কুমারী বিদ্যার পূজার ফুল যোগাইত। একদিন সুন্দর স্বয়ং মালা গাঁথিয়া তাহার মধ্যে কৌশলে নিজ পরিচয় দিয়া একখানি গুপ্ত চিঠি পাঠাইল। অনূঢ়া বিদ্যা সেই পত্রপাঠে মালিনীর নিকট সুন্দরের রূপগুণের পরিচয় পাইয়া তাহার সঙ্গে সমাগমের জন্য ব্যাকুল হইল। এদিকে সুন্দর মালিনীর অগোচরে কালিকার স্তব করিয়া তাঁহার আশীর্বাদে নিজ কক্ষ হইতে বিদ্যার শয়নমন্দির পর্যন্ত সিঁধকাঠির সাহায্যে সুড়ঙ্গ খনন করিল এবং গোপনে বিদ্যার নিকট হাজির হইল। সখীদের সাহায্যে উভয়ের গান্ধর্বমতে বিবাহ সম্পাদনের পর দম্পতি যথারীতি দাম্পত্য জীবন যাপন করিতে লাগিল—অবশ্য অতি গোপনে। ইতিমধ্যে বিদ্যা সসত্ত্বা হইলে রাণী সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া চিন্তিত এবং রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন। শেষে কোটালের বুদ্ধিকৌশলে চোর ধরা পড়িল। রাজা কন্যা-দূষক সুন্দর চোরকে প্রাণদণ্ডাদেশ দিলে বধের জন্য তাহাকে দক্ষিণ মশানে আনা হইল। সুন্দর মুক্তির জন্য পরম ভক্তিভরে কালিকার স্তব পাঠ করিতে লাগিল। তখন স্বয়ং কালিকা যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া ডাকিনীযোগিনীসহ মশানে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর বীরসিংহ সুন্দরকে দেবীর ভক্ত জানিয়া ক্রোধ ত্যাগ করিয়া বিদ্যার সহিত সুন্দরের মহাসমারোহে আনুষ্ঠানিক বিবাহ দিলেন এবং জামাতার প্রসাদে কালীমূর্তি দর্শন করিয়া ধন্য হইলেন। তারপর সুন্দর পত্নী ও পুত্রসহ (ইতিমধ্যে বিদ্যা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছিল) নিজ রাজ্যে ফিরিয়া গেল এবং দেবীর পূজা প্রচার করিয়া যথাকালে স্বামী স্ত্রী স্বর্গারোহণ করিল।

প্রত্যেক কালিকামঙ্গলেই কাহিনীটি মোটামুটি এই ধারা অনুসরণ করিয়াছে—অবশ্য রাজা, রাণী, মালিনী প্রভৃতির নামে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। কাব্যের মূল কাহিনী বিচার করিলে দেখা যাইবে, গুপ্ত প্রণয়ের গল্পের প্রতি কালিকামঙ্গলে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, ভক্তি বা ধর্ম-প্রচার-সংক্রান্ত যে অংশটুকু আছে, তাহা মূলকাহিনী হইতে বাদ দিলে আখ্যানভাগের ক্ষতি হয় না। সিঁধ কাটিবার জন্য এবং প্রাণদণ্ডাদেশ হইতে বাঁচিবার জন্যই সুন্দর কালিকা স্মরণ করিয়াছিল, দেবীও সুন্দরকে বিনা বাক্য-ব্যয়ে অনূঢ়া কন্যার শয়নমন্দিরে সিঁধ দিতে সাহায্য করিয়াছেন—সুন্দরের অপকর্মে তিনি বিন্দুমাত্র রুষ্ট হন নাই। মঙ্গলকাব্যে ভক্তের প্রতি অনুকূলতা দেখাইতে গিয়া দেবদেবীরা সাধারণতঃ ন্যায়-অন্যায় বোধ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যেনতেনপ্রকারেণ ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে, কারণ তাঁহারা নিজ নিজ পূজা প্রচারের জন্য ভক্তের সাহায্য-প্রত্যাশী। কিন্তু কালিকামঙ্গলে দেবী কালিকা সুন্দর-বিদ্যার প্রাগ্‌বৈবাহিক প্রণয়ে সাহায্য করিয়া কুমারীধর্ম দূষণেও আপত্তি করেন নাই। কবিগণ অবশ্য গান্ধর্ববিবাহের ব্যবস্থা করিয়া নলিচা আড়াল দিয়া তামাকু সেবনের কৌশল দেখাইয়াছেন, এবং গল্পকে কঠোর বাস্তব সমস্যার দিকে লইয়া গিয়া কুমারী-প্রেমের অবশ্যম্ভাবী পরিণামের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছেন। তাই এই কাব্যের দুই এক স্থলে ভক্তির উল্লেখ থাকিলেও আদিরসের উত্তপ্ত উল্লাসে ভক্তি একেবারে উবিয়া গিয়াছে। অন্য মঙ্গলকাব্য হইতে কালিকামঙ্গলের এই স্থানেই পার্থক্য। যাঁহারা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে আদিরসের বর্ণনার জন্য তৎকালীন সমাজ ও নীতি-আদর্শকে গালি দিয়া থাকেন, তাঁহারা বোধ হয় ভাবিয়া দেখেন না যে, ভারতচন্দ্রের দুই-তিনশত বৎসর পূর্ব হইতেই কালিকামঙ্গলের আখ্যানে আদিরসের উগ্র-উত্তেজক গল্প চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং বিদ্যাসুন্দরের তথাকথিত অশুচি প্রেমের আদর্শ অবক্ষয়ী সমাজের প্রভাব ও প্রয়োজনে পরিকল্পিত হয় নাই, কালিকামঙ্গল কাব্য মাত্রেই এই ধারা অনুসৃত হইয়াছিল, মধ্যযুগীয় এই সমস্ত কাহিনীতে বর্ণিত আদিরসের জন্য তৎকালীন সমাজ পরিপ্রেক্ষিতকে নিন্দা করা অযৌক্তিক। এক এক প্রকার মঙ্গলকাব্য পৃথক কনভেনশন বা রীতি-নীতি অবলম্বন করিয়াছে। ধর্মমঙ্গলের সঙ্গে মনসা-মঙ্গলের রীতি-পদ্ধতির অনেক পার্থক্য আছে। সেইরূপ

কালিকামঙ্গলের রূপ ও রীতি প্রকরণ অন্য মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে ততটা মিলিবে না। এবার সপ্তদশ শতাব্দীর কালিকামঙ্গলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে যে কয়জন কবি কালিকামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দ্বিজশ্রীধর, কবি কঙ্ক, সাবিরিদ খাঁ, প্রাণরাম চক্রবর্তী, কৃষ্ণরাম দাস ও কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে শেষোক্ত তিনজন কালিকামঙ্গলের আদর্শমতো সুন্দরকে কালীভক্তরূপে চিত্রিত করিয়া বিদ্যাসুন্দর গল্প রচনা করিয়াছিলেন। দ্বিজশ্রীধর মুসলমান সুলতানের মনোরঞ্জনের জন্য মর্ত্যজীবনকেন্দ্রিক বিদ্যাসুন্দর কাহিনীটুকুই লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সাবিরিদ খাঁ মুসলমান ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া বিদ্যাসুন্দরের গল্পটিকেই কাব্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কালিকার প্রসঙ্গ তাঁহার কাব্যে নাই। কবি কঙ্কের নামে যে বিদ্যাসুন্দর কাব্য আরোপ করা হইয়াছে, তাহাতে কালিকার স্থলে সত্যপীরের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। প্রাণরাম, কৃষ্ণরামদাস ও বলরাম চক্রবর্তীই যথার্থ কালিকামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তী শতকে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, ও রাধাকান্ত মিশ্র বিদ্যাসুন্দর রচনায় কৃষ্ণরামাদির আদর্শ নিজ নিজ রুচিবৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা অনুযায়ী গ্রহণ করিয়াছেন।

২

বিদ্যাসুন্দরের কবি পরিচয়

দ্বিজ শ্রীধর ॥

শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ চট্টগ্রাম হইতে দ্বিজ শ্রীধরের বিদ্যাসুন্দর বিষয়ক কাব্যের একখানি পুঁথির অতি সামান্য অংশ (২-৮ পৃষ্ঠা মাত্র) এবং আরও একখানি পুঁথির শুধু ২৭ সংখ্যক পত্রখানি পাইয়াছিলেন।[২২] এরূপ অবস্থায় শ্রীধরের কাব্য সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় না। তবে তাঁহাকে বাঙলাদেশের লৌকিকভাবের প্রথম কবি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।* কারণ তাঁহার কাব্যের যে খণ্ডিত অংশ পাওয়া গিয়াছে,

২২ সা—পা—প ১৩৪৪, (দ্বিজ শ্রীধরের বিদ্যাসুন্দর—আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ)
* মুসলমান কবি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইয়াছে।

তাহাতে কালিকা বা অন্যকোন দেবদেবীর মহিমার উল্লেখ নাই। বাস্তব নরনারীর রোমান্টিক প্রণয়গাথা রচনাই বোধহয় তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর'—শ্রীধরের কাব্য কোন্ নামে পরিচিত হইয়াছিল জানা যাইতেছে না। ইহাতে কালিকার কোন বর্ণনা বা মহিমা ছিলনা বলিয়া মনে হয়; তাই উপস্থিত ক্ষেত্রে শ্রীধরের কাব্যকে 'বিদ্যাসুন্দর' নামেই অভিহিত করিতে হইবে।

কবি 'দেশি ভাষায়' ও 'পরাকৃতে' (প্রাকৃত অসংস্কৃত বাংলাভাষা) বিদ্যাসুন্দর রচনায় আত্মনিয়োগ করেন :

সাবধান নরলোক পাএ জেন মতে।
দেসিভাসে পদবন্ধে গাহি পরাকৃতে॥

তাঁহার কয়েকটি ভণিতা উদ্ধৃত করিলেই কাব্যরচনা ও কবির আবির্ভাবের কাল মোটামুটি বুঝা যাইবে :

(ক) নৃপতি নাসির সাহা তনএ সোন্দর।
নাম ছিরি পেরোজ সাহা রসিক শেখর॥
* * * [২৩]
দ্বিজ ছিরিধর কবি রচিলেক পুনি॥

(খ) নৃপতি নসির যাহার নন্দনে
ভোগপুরে মেদনি মদনে।
রাজা শ্রীপেরোজ সাহা জানে
ছিরিধর কবিরাজ ভাণে॥

(গ) শীরি পেরোজ সাহা বিদিত জুবরাজ।
কহিল পাঞ্চালি ছন্দে ছিরি কবিরাজ॥

এখানে এই ভাণিতা হইতে কবির নাম পাওয়া যাইতেছে। তিনি এখানে সুলতান নসরৎ শাহের (হুসেন শাহের পুত্র) এবং তাঁহার পুত্র যুবরাজ ফিরুজশাহের নাম করিয়াছেন। নসরৎ শাহ্ ১৫১৯-১৫৩২ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি যখন যুবরাজ ছিলেন ("শীরি পেরোজ সাহা বিদিত যুবরাজ"), তখন শ্রীধর ইঁহার নির্দেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় এবিষয়ে একটু দ্বিধাগ্রস্ত। তাঁহার মতে "শ্রীধরের পোষ্টা ফেরোজশাহা যে হুসেন শাহার নাতিই সে

২৩ এই পংক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সম্বন্ধে—সম্পূর্ণ পুঁথি না দেখিলে—স্থিরনিশ্চয় করা উচিত নয়।"[২৪] কিন্তু পূর্বে আমরা কবির যে তিনটি ভণিতা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে নরসৎ শাহের পুত্র যুবরাজ 'পেরোজশাহা' কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নসরৎ শাহা হুসেনের পুত্র। সুতরাং ফিরুজ যে হুসেনের নাতি তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? যাহা হউক আমাদের অনুমান, এই কাব্য নসরৎ শাহের রাজত্বকালের মধ্যে অর্থাৎ ১৫৩২ খ্রীঃ অব্দের মধ্যেই রচিত হইয়াছিল। আমাদের মতে ইহাই সর্বপ্রাচীন বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাব্য। আশ্চর্যের কথা এই যে, মধ্যযুগে চৈতন্যতিরোধানের পূর্বে একখানি মর্ত্যরসের কাব্য রচিত হইয়াছিল—যাহাতে বিশেষ কোন ধর্মীয় প্রভাব ছিল না। কেহ কেহ মনে করেন যে, জৌনপুরের শর্কীবংশীয় সুলতান হুসেন দিল্লীর সম্রাটের কাছে পরাভূত হইয়া বিহার হইতে বাঙলায় পলাইয়া আসেন (১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) এবং গৌড়ের সুলতান হুসেনশাহের দরবারে আদরে গৃহীত হন। প্রসিদ্ধ সুফী কবি কুতবনও তাঁহার সঙ্গে বাঙলায় আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। অবধীভাষায় কুতবন 'মৃগাবতী' শীর্ষক একখানি রোমান্টিক প্রেমের কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। হুসেন এবং তাঁহার পুত্র (নসরৎ) ও পৌত্রের (ফিরুজ) সভায় কুতুবনের কাব্যের সমাদর হওয়াই স্বাভাবিক। হয়তো ফিরুজের অনুগত ব্রাহ্মণকবি শ্রীধরও কুতুবনের মৃগাবতীর আদর্শে বিদ্যাসুন্দরকাব্যে পার্থিব জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন।[২৫] ডঃ সেনের এই অনুমান অযৌক্তিক নহে। তবে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালী হিন্দুসমাজের গড়ন বিচার করিলে পাঠক-শ্রোতৃবৃন্দের নিকট রোমান্টিক জীবনকেন্দ্রিক আখ্যানের সমাদর হওয়া সহজ ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে বিদ্যাসুন্দর গল্পের সঙ্গে কালিকামঙ্গলের যোগাযোগ ঘটিয়াছিল; তা' না হইলে সপ্তদশ শতাব্দীর কৃষ্ণরাম তাঁহার কালিকামঙ্গলের কাহিনীটিকে সংহত আকারে পরিবেশন করিতে পারিতেন না। যাহা হউক, শ্রীধর বিদ্যাসুন্দর কাব্যে (যেটুকু পাওয়া গিয়াছে) কালিকা বা অন্য কোন দেবদেবীর মহিমা প্রচার করেন নাই—তাহাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। মুসলমান পাঠান নৃপতির অনুগ্রহভাজন কবি

---

২৪ ডঃ সুকুমার সেন, বা. সা. ইতি. ১ম (অপরার্ধ), পৃ ৩১৭ (পা. টী.)

২৫ ঐ, পৃ ৯৬

কাব্যে হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস বা অনুরূপ আখ্যায়িকা বর্জন করিবেন, এইরূপ অনুমানই স্বাভাবিক।

কবি শ্রীধর সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন, পুঁথিতে মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যায়। খণ্ডিত পুঁথির আবিষ্কর্তা আবদুল করিম সহিত্যবিশারদ অনুমান করিয়াছেন যে, শ্রীধরের কাব্য কোন সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ।[২৬] কিন্তু সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। পুঁথিতে দেখা যাইতেছে, সুন্দরের পিতার নাম বীরসিংহ, মাতার নাম শীলা এবং নিবাস কাঞ্চীদেশ। চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত পুঁথিটির মাত্র দুইচারিখানি পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়াছে বলিয়া এ কাব্যের বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। ধর্মপ্রভাবিত মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বাহিরে এই লৌকিক প্রেমের কাব্য স্বাদবৈচিত্র্যের জন্য এযুগের পাঠকেরও বিস্ময়দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিত; কিন্তু এখন আর এ পুঁথি প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই, বিশিষ্ট কাব্যটি চিরকালের জন্য লোকলোচনের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

সাবিরিদ খাঁ ॥

সাবিরিদ খাঁয়ের বিদ্যাসুন্দরের পুঁথিও চট্টগ্রামের চান্দগাঁও গ্রামের এক মুসলমানের বাড়ী হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে।[২৭] প্রাপ্ত পুঁথিটি কিঞ্চিদধিক শতখানেক বৎসরের পুরাতন বলিয়া মনে হইতেছে। মধ্যযুগে বাঙলাদেশে অনেক মুসলমান কবি হিন্দুর সাহিত্য-পুরাণপাঠে হিন্দুর মতোই অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন; কেহ কেহ রোমান্টিক প্রণয়-গাথা লিখিয়াছিলেন, কেহ সুফী সাধনার পটভূমিকায় হিন্দুকাহিনী রচনা করিয়াছিলেন, কেহ-বা প্রেমভক্তির বশে উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব পদ লিখিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে এই মুসলমান কবি বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করিয়া উৎকৃষ্ট কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য একাব্যও মানবীয় রসের জন্যই রচিত, কালিকার সঙ্গে ইহার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। তাই একথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, সাবিরিদের বিদ্যাসুন্দর কাব্য মর্ত্যরসের কাব্য।

---

২৬ সা—প—প ১৩৪৪

২৭ ভারতবর্ষ, কার্তিক ১৩২৫ (আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ—'মুসলমান কবির বিদ্যাসুন্দর')

ইসলামি কিস্‌সার[২৮] মধ্য দিয়া একপ্রকার মর্ত্যজীবনের গালগল্প তুর্কী-শাসনকাল হইতেই বাঙলার মুসলমান সমাজে প্রচার লাভ করিতেছিল।[২৯] সুফী সাধকগণ আবার নরনারীর রোমান্টিক গল্প গুলিকে অধ্যাত্মসাধনার রূপক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং মুঘল আগমনের পূর্ব হইতেই বাঙলার মুসলমান সমাজে ও সুলতানের দরবারে রোমান্টিক প্রেমের গল্পের সমাদর হইয়াছিল। নামমাত্র দেবীপ্রভাব বাদ দিলে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী মূলতঃ মানবজীবনের আদিরসের কাব্য—সংস্কৃত চৌরপঞ্চাশিকার প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাঙলাদেশে এই ধরণের গল্পকাহিনী রচিত হইয়াছিল। মুসলমান সমাজেও যে একাব্যের খুব চল হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ উর্দু ও ফার্সীতে মুসলমান কবি বিদ্যাসুন্দর কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্রের নিকট নাকি উর্দুভাষায় লিখিত বিদ্যাসুন্দরের একখানি পুঁথি ছিল। ১৮২৫-২৬ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে চট্টগ্রামের নেজারেত উল্লা নামে এক কবি ফার্সী ভাষায় বিদ্যা-সুন্দর লিখিয়াছিলেন।[৩০] বিদ্যাসুন্দরের প্রসঙ্গ মুসলমান কবিগণ নিজ নিজ কাব্যেও পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ সুফী মতাবলম্বী মুসলমান কবি বিদ্যা ও সুন্দরের রূপকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনেরই ইঙ্গিত পাইতেন। দৌলৎ কাজির 'লোরচন্দ্রানী'-তে এবং আলাওলের 'ছয়ফুল-মুলুক বদিউজ্জমাল'-এ এই প্রসঙ্গ আছে:

(১) চন্দ্রানীর তোমার মিলন মনোরম।
বিদ্যা সঙ্গে সুন্দরের যেমন সমাগম॥

(দৌলৎ কাজির 'লোরচন্দ্রানী')

(২) বিদ্যার সুরঙ্গ আদি সিন্ধু জগন্নাথ নদী
একে একে সব বিচারিল।

(আলাওলের 'ছয়ফুল-মুলুক বদিউজ্জমাল')

এই দৃষ্টান্ত হইতে মনে হইতেছে, সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই মুসলমান সমাজে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী প্রবেশ করিয়াছিল।

সাবিরিদ খাঁয়ের পুঁথিটিও চট্টগ্রামে পাওয়া গিয়াছে, কবি এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। হুসেন শাহের সেনাপতি লস্কর পরাগল

২৮ আরবি 'কিস্‌সাহ্'—গল্প কাহিনী, বাংলায় 'কেচ্ছা'।

২৯ পরে বাঙলার মুসলমান কবি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

৩০ ভারতবর্ষ, ১৩২৫, কার্তিক (আবদুল করিম সাহেবের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এই কাব্যের বিবরণ 'নোয়াখালি' পত্রিকার ১ম বর্ষ—৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।)

খাঁ ও তাঁহার পুত্র ছুটি খাঁ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হইয়া এই অঞ্চলে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দরবারে হিন্দু-মুসলমান কবিদের গতায়াত ছিল, তাঁহাদের দরবারি আদর্শে চট্টগ্রামের মুসলমানসমাজে বিদ্যানুরাগ ও সংস্কৃতির চর্চা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহার প্রমাণ চট্টগ্রাম আরাকান রাজসভায় প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন মুসলমান কবির আবির্ভাব হইয়াছিল।[৩১] সাবিরিদ খাঁও এই ঐতিহ্যেরই ধারাবাহক।

প্রাপ্ত পুঁথিটি দেড়শত বৎসরের পুরাতন, এবং আদ্যন্ত খণ্ডিত। ইহার কি নাম ছিল তাহা জানা যাইতেছে না। কাব্যের মধ্যে কালিকার দোহাই নাই বলিয়া ইহাকেও কালিকামঙ্গল না বলিয়া বিদ্যাসুন্দর বলা উচিত। কবিও ইহাতে হিন্দুর কালিকা দেবীর কোন উল্লেখ করেন নাই। কাব্যের অন্ত্যভাগ খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া ইহার রচনাকাল জানা যায় না। তবে ভাষা দৃষ্টে ইহাকে সপ্তদশ শতাব্দীর পরবর্তী বলিয়া মনে হয় না। বরং অল্প পূর্ববর্তীও হইতে পারে। কারণ ইহাতে পুরাতন ভাষারীতির কিছু কিছু চিহ্ন আছে। যেমন—বিহাসিআ, ভেল, পেখি, তছু, কৈছন, করন্তি, খণ্ডই, দিলুঁ, বোলোঁ, কুঞর ইত্যাদি। এই কাব্যের তুলনায় সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলের ভাষায় বরং কিছু অর্বাচীনত্বের ছাপ আছে। যাহা হউক, সাবিরিদ খাঁয়ের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী বিষয়ক কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নহে।

কবির ব্যক্তিগত পরিচয় কাব্যের প্রথমেই পাওয়া যাইতেছে :

পীআর মল্লিকসুত বিজবর শাস্ত্রযুত
উজীআল মল্লিক প্রধান।
তান পুত্র জি-ঠাকুর তিন সিক সরকার
অনুজ মল্লিক মুছাখান ॥
রসেত রসিক অতি রূপে জিনি রতিপতি
দাতা অগ্রগণ্য অর্কসুত।
ধৈর্যবন্ত যেন মরু জ্ঞানেতে বাসবগুরু
মানে কুরু ধর্ম্মে ধর্ম্মসুত ॥
তান সুত গুণাধিক নাসু রাজা মরাল্লিক
জগত প্রচার জগখ্যাতি।

৩১ পরে আলোচনা করা হইয়াছে।

তাল সুত অজ্ঞান হিন সাবিরিদ খান
পদবন্ধে রচিত ভারতি

কবি সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কৌলিক উপাধি ('জি-ঠাকুর') এবং হিন্দুর সাহিত্য-সংস্কৃতিতে অভিজ্ঞতা হইতে মনে হয়, তাঁহার পূর্বপুরুষ উচ্চবংশোদ্ভব হিন্দুই ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা বোধ হয় মগ মুসলমানের সংশ্রবে আসিয়াছিলেন। কারণ মগ-মুসলমানদের মধ্যে 'ঠাকুর' উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়।—যেমন আরাকানের সুপ্রসিদ্ধ মাগন ঠাকুর। সাবিরিদেরা 'তিন সিকের সরকার' ছিলেন। 'সিক' পরগণা বিভাগ নোয়াখালি অঞ্চলে চলিত। তাই আবদুল করিম সাহেব অনুমান করেন, কবি সম্ভবতঃ নোয়াখালির অধিবাসী ছিলেন। সাবিরিদের কাব্য বিদ্যাসুন্দর ঘটিত তথ্যে কিছু নূতনত্ব আছে। সুন্দরের জন্ম হইয়াছিল রত্নাবতী নগরীতে, পিতার নাম গুণসার, মাতার নাম কলাবতী। বিদ্যার জন্মস্থান উজানী কাঞ্চীপুর—তাহার পিতার নাম বীরসিংহ।

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি, মুসলমান কবিগণ বিদ্যাসুন্দর কাব্যকে মানবীয় রসের কাব্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাবিরিদও সেই পথাবলম্বী—যদিও রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ এবং সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। কবি গ্রন্থরচনার প্রারম্ভেই কয়েকটি স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক সংযোজিত করিয়াছেন :

অস্ত্যোত্তরে শুভদেস সর্ব্ব সাস্ত্রে সমান্বিত।
পুরা রত্নাবতী নাম্নী বহু রত্ন বিভুসিতা॥
গুণসার নৃপপুত্র নীতিধর্ম্ম পরায়ণ।
তস্য কলাবতেনাম্নী ভার্য্যাশ্চ গুণশালিনী॥
তস্যা গর্ভে সুত কালিকাআ প্রসাদেত।
সুন্দরেতি সমাক্ষাত সর্ব্ব সাস্ত্রে বিসারদ॥৩২

এখানে 'কালিকাআ প্রসাদেত' শব্দে বুঝা যাইতেছে, সাবিরিদ খাঁ কালিকা মঙ্গলের আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, তবে নিজে কালিকামঙ্গলের রীতি অনুসরণ করেন নাই। কবির সংস্কৃতগন্ধী রচনা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। যেমন বিদ্যার রূপ বর্ণনা :

মুখবিধু পূর্ণ ইন্দু কিএ অরবিন্দ।
মৃগবৎস নেত্র কিবা নীল মত্ত ভৃঙ্গ॥

৩২ পুঁথির পাঠ অত্যন্ত বিকৃত।

বালেন্দু জিনিআ ভাল শ্রীমন্ত (সীমন্ত ?) উজ্জ্বল।
বান্ধুলি প্রসূন নিন্দি অধরযুগল।
রদপাঁতি মুতি জোতি বাচি সুমধুর।
ভুরুভঙ্গে কামশর নিন্দে প্রচুর॥

সেই বিদ্যার প্রতিভার কথা শুনিয়া সুন্দর মাধব ভাটকে বলিতেছে :

সুনরে মাধব ভট্ট না করিঅ রোস।
শাস্ত্রবাদে ধনি জিনি কোন পরিতোস॥
জোসিতা হইলে ধীর সুরগুরু তুল।
জদি আহ্মি জাই তথি দর্প হৈব চূর॥
অধীর চপলা বালা জিনি কোন কাজ।
অবহেলে তুহ্ গুরু জিনি দিমু লাজ॥
জে দেসে নিবসে বিদগ্ধ বরনারী।
জাইমু গোপত বেসে কথনে তোহ্মারি॥

সুন্দর মালিনী সুচরিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বাসা প্রার্থনা করিতেছে :

আহ্মা জান বৈদেসি নিশ্চিত।
দ্বিজবর তনয় পণ্ডিত॥
পাঠ পড়ি ভ্রমিএ নগর।
পণ্ডিতার্নী করিতে বিচার॥
দেলি দেসে অন্ত জাএ সুর।
বাসখানি মাগি তোহ্মা পুর॥

প্রথমে বাসা দিতে অস্বীকার করিয়া সুচরিতা মালিনী বলিল :

বিদেসি কুমার হের তোহ্মাকে বুঝাই।
নৃপতি ডুব্বার বাসা দিবারে ডরাই॥
... ...
কোতোআলে দেখে তোহ্মা মোর গৃহে।
কি বুঝি ভণিআ তাক রাখিলাম তোহে॥

ইহার পর পুঁথি খণ্ডিত হইয়াছে পুরা পুঁথিটি পাওয়া গেলে কবির রচনাশক্তি ও প্রতিভার প্রশংসনীয় পরিচয় পাওয়া যাইত।

তাঁহার কাব্যে সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, হয়তো কোন সংস্কৃত কাব্য অবলম্বনে ইহা রচিত হইয়া থাকিবে।[৩৩] অবশ্য এরূপ অনুমানের পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ নাই।

৩৩ "সাবিরিদ খান কোন সংস্কৃত কাব্য বা কবিতা অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাই মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত আছে, এবং সেই শ্লোক ব্যাখ্যারূপে কবি পয়ারত্রিপদী জুড়িয়া দিয়াছেন।"—ডঃ সুকুমার সেন (বা. সা. ইতি. ১ম (অপরার্ধ)

সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুর শাস্ত্র-মহাকাব্য পুরাণে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল, উপরন্তু তিনি সংস্কৃত চৌরপঞ্চাশিকার সংবাদও হয়তো জানিতেন। তাই কবির বিদ্যাবত্তার প্রমাণ হিসাবেই তাঁহার কাব্যে কিছু কিছু সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যায়। বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যেমন কবি স্বয়ং কিছু কিছু সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া সে গুলিকে মূল কাব্যের সংযোজক হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন, তেমনি সাবিরিদ খানও সেই রীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন।

কঙ্ক ॥

ময়মনসিংহের কবি কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কথা অনেকেই জানিতেন না। দীনেশচন্দ্রের উপদেশে ময়মনসিংহের অধিবাসী প্রাচীন সাহিত্যামোদী চন্দ্রকুমার দে ঐ অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পালাগান সংগ্রহের সময় কবি কঙ্কের সন্ধান পান। কঙ্ক ও লীলার প্রণয় ও প্রণয়ভঙ্গের রোমান্টিক গল্প ব্যালাডের আকারে এখনও কৃষাণ সমাজে ও সাধারণ পরিবারে প্রচলিত আছে ; তাহা 'লীলার বারমাসী' নামে দীনেশচন্দ্র সঙ্কলিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় স্থান পাইয়াছে। এই 'লীলার বারমাসী' গাথাটিতে কঙ্কের জীবনকথা চমৎকার বাস্তব ও আধুনিক সহৃদয় দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত বিবৃত হইয়াছে।[৩৪]

লীলা নাম্নী এক ব্রাহ্মণকন্যার সঙ্গে কঙ্ক নামক এক ব্রাহ্মণ তরুণের (চণ্ডাল কর্তৃক লালিতপালিত) ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী 'লীলার বারমাসীতে' বর্ণিত হইয়াছে। ইহাব ঘটনা, এবং কঙ্ক রচিত বলিয়া দীনেশচন্দ্র ও চন্দ্রকুমার দে প্রচারিত বিদ্যাসুন্দরের প্রারম্ভে প্রদত্ত কবির জীবনকথার মধ্যে মোটামুটি সাদৃশ্য আছে। সুতরাং 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় কঙ্ক লীলার আখ্যানের কঙ্ক এবং বিদ্যাসুন্দরের কবি কঙ্ক—একই ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। কঙ্কের জীবনকাহিনী এই ভাবে তাঁহার বিদ্যাসুন্দরে বর্ণিত হইয়াছে :

পিতা বন্দি গুণরাজ মাতা বসুমতি।
যার ঘরে জন্ম লইলাম আমি অল্পমতি ॥
শিশুকালে বাপ মইল মাও গেল ছাড়ি।
পালিলা চণ্ডাল পিতা মোরে যত্ন করি ॥
জানযাবে খাই অন্ন চণ্ডালের ঘরে।
চণ্ডালিনী মাতা মোর পালিলা আদরে ॥

৩৪ পরে গাথা প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গ ও ময়মনসিংহ গীতিকা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

গঙ্গার সমান তার পবিত্র অন্তর।
সেও ত রাখিল মোর নাম কঙ্কধর ॥[৩৫]

* * * *

মুরারি চণ্ডাল পিতা পালে অন্ন দিয়া
পালিলা কৌশল্যা মাতা স্তন দুগ্ধ দিয়া ॥
মুরারি আমার পিতা ভক্তির ভাজন।
বার বার বন্দি তাই তাঁহার চরণ ॥
গর্গ পণ্ডিতে বন্দুম পরম গিয়ানী।
যার আশ্রমে থাকিয়া ধেনু চরাইতাম আমি ॥

এই গর্গের কন্যা লীলার সঙ্গে কঙ্কের করুণরসাত্মক প্রেমের আখ্যায়িকা ময়মনসিংহে এখনও প্রচলিত আছে। এই আত্মকথা হইতে মোটামুটি দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণকবি শিশুকালে অনাথ হইলে এক চণ্ডাল দম্পতী তাঁহাকে লালনপালন করেন। ব্রাহ্মণ হইয়াও কৃতজ্ঞ কবি চণ্ডাল পিতামাতাকে দেবতাজ্ঞানে চরণ বন্দনা করিয়া চিত্তের অসাধারণ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। কবি কঙ্ক শুধু চণ্ডালের প্রতি উদার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি নিজেও এক মুসলমান পীরকে বিশেষ ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। এই পীর বা সত্যপীরের প্রত্যাদেশের ফলেই তিনি বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন। অবশ্য এ কাব্যের বহু স্থলে বিশেষ ভক্তি সহকারে চৈতন্যদেবের উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহার জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং কবিকে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রথম কবি বলিতে চাহেন।[৩৬]

কঙ্ক নামে যে প্রকৃতই একজন কবি বর্তমান ছিলেন এবং বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কবিকৃতির চাক্ষুষ

৩৫ ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন, কবি কঙ্কের প্রকৃত নাম কবিকঙ্কণ—"নামটি অদ্ভুত। নিশ্চয়ই অশিক্ষিত অর্বাচীন পল্লীকবির কাছে "কবিকঙ্কণ" ণকার ত্যাগ করিয়া "কবিকঙ্ক" হইয়াছে।" (বা. সা. ই. অপরার্ধ, পৃ. ৪৭২) ডঃ সেনের এ অনুমান ঠিক নহে। কবিকঙ্কের প্রকৃত নাম কঙ্কধর। বিদ্যাসুন্দরের গোড়ার দিকে সংযোজিত এই পংক্তিতে 'কঙ্কধরই আছে—সংক্ষেপে কঙ্ক। কবিকঙ্কণ নাম অপেক্ষা উপাধি হওয়াই অধিকতর সম্ভব। তাঁহার উপাধি কবিকঙ্কণ হইলে বিদ্যাসুন্দরের কোথাও না কোথাও অথবা পল্লীগীতিকায় আসল নাম থাকিত। সুতরাং কবির নাম কবিকঙ্কণ নহে, কবিকঙ্কও নহে—কঙ্কধর, সংক্ষেপে হইয়াছে কঙ্ক।

৩৬ "কবিকঙ্ক চৈতন্যের সমকালবর্তী এবং ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন।" (দীনেশচন্দ্র—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

প্রমাণ হস্তগত হয় নাই বলিয়া এ বিষয়ে কিছু কিছু সন্দেহ সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিদ্যাসুন্দরে চৈতন্যের উল্লেখ আছে ; পালাগানেও দেখা যাইতেছে, কবি নাকি চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য নবদ্বীপধামে যাত্রা করিয়াছিলেন। এই প্রমাণের বলে কেহ কেহ তাঁহাকে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর আরম্ভ ভাগের কবি বলিতে চাহেন। বিদ্যাসুন্দরে তিনি বলিয়াছেন :

কবে বা হেরিব আমি গোরার চরণ।
সফল হইবে মোর মনুষ্য জনম ॥
পাপীতাপী মুক্রি প্রভু আমি অল্পমতি।
হইবে কি প্রভুর দয়া অভাগার প্রতি ॥
হউক বা না হউক পদ না ছাড়িব।
বাজন্ত নূপুর হইয়া চরণে লুটিব ॥

চৈতন্যের প্রতি এই ভক্তিব্যঞ্জিত উক্তি হইতে কবিকে চৈতন্যের সমসাময়িক মনে করা যায় না, পালাগানের ঘটনাকেও ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণে বিপদ আছে। ষোড়শ শতাব্দী হইতে চৈতন্য যে ভাবে বাঙলার সর্বত্র পূজিত হইয়াছিলেন, তাহাতে বৈষ্ণব ভাবাবিষ্ট কঙ্ক তাঁহার প্রতি ভক্তিরসার্দ্র উক্তি করিবেন তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রতিকূল প্রমাণ, কবি এই কাব্যে কালিকার স্থলে সত্যপীরের মহিমা প্রচার করিয়াছেন। এক পীরের আদেশেই কবি বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন—কাব্যের সর্বত্র পীরমাহাত্ম্য জাজ্জ্বল্যমান, কোথাও কালিকার নামগন্ধও নাই। সত্যপীরের উদ্ভব কবে হইয়াছিল, তাহা বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞের[৩৭] মতে সত্যপীরের পাঁচালী-উপাসনার উদ্ভব সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে যাইতে পারে না। অবশ্য কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন, সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বেও যে সত্যপীরের উপাসনা প্রচলিত হয় নাই তাহা কি জোর করিয়া বলা যায়? কারণ স্কন্দপুরাণেও তো সত্যপীরের উল্লেখ আছে।[৩৮]

এখানে বলিয়া লওয়া ভাল যে, ব্রহ্মবৈবর্ত, স্কন্দ প্রভৃতি পুরাণে অনেক অর্বাচীন অংশ পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন পুরাণে মুসলমান

৩৭ ডঃ সেনের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ৪৭২

৩৮ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ ৬৬৪ (দ্রষ্টব্য স্কন্দপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ)

সংস্পর্শজনিত সত্যপীরের আখ্যান থাকিবে, তাহা কল্পনাও করিতে পারা যায় না। আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যে যে কী পরিমাণে গোঁজামিল আছে, এবং কতটা অর্বাচীন অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে এখনও তাহার বৈজ্ঞানিক-ভাবে অনুসন্ধান হয় নাই। যাহা হউক, বাংলা সাহিত্যে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে কোথাও সত্যপীরের উল্লেখ পাওয়া যায় না। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মনসামঙ্গলে হাসান-হুসেনের প্রসঙ্গে সত্যপীরের উল্লেখ থাকা সম্ভব ছিল। কিন্তু বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস, নারায়ণদেব—কেহই সত্যপীরের উল্লেখ করেন নাই। এইজন্য আমাদেব দৃঢ়বিশ্বাস, হিন্দু-মুসলমানের শ্রেণীগত সমন্বয় অধিক দূর অগ্রসর হইবার পর সত্যপীরের উদ্ভব হইয়াছে। এই ব্যাপার সপ্তদশ শতাব্দীতে আরম্ভ হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে পূর্ণতা লাভ করে। কবি কঙ্ক সত্যপীরের পাঁচালী রচনার অভিপ্রায়ে বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কাহিনীটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাব্যের একাধিক স্থলে কবি বলিয়াছেন, "গুরুর (মুসলমান গুরু) আদেশে গাহি পীরের পাঁচালী।" পীরমাহাত্ম্যবিষয়ক এই কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীতে—সম্ভবতঃ শেষের দিকে, বা আরও পরে রচিত হইয়া থাকিবে। লোচনদাসের পদের ("বাজন নূপুর হয়্যা চরণে রহিব") অনুকরণে কঙ্ক লিখিয়াছিলেন, "বাজন্ত নূপুর হয়্যা চরণে লুটিব।" সুতরাং তিনি যে লোচনদাসের (ষোড়শ শতাব্দী) অনেক পরবর্তী কবি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এখন কাব্যটির প্রামাণিকতা বিচার করা যাক। পূর্ববঙ্গের পালাগান সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত 'সৌরভ' পত্রিকায় (১৩২৪-২৬ বঙ্গাব্দ) কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের বিস্তারিত পরিচয় দিবার পূর্বে স্থানীয় জনসাধারণ ব্যতীত আর কেহ এ কাব্য সম্বন্ধে কিছু জানিতেন না। চন্দ্রকুমার নিজে একখানা পুঁথি সংগ্রহ করেন। তিনি দীনেশচন্দ্রের নিকটেও নাকি আর একখানি পুঁথি দেখিয়াছিলেন। বলাই বাহুল্য তিনি এই পুঁথি অবলম্বনে 'সৌরভ' পত্রিকায় কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এবং দীনেশচন্দ্র ব্যতীত আর কেহ চর্মচক্ষুতে এই পুঁথি দেখিয়াছিলেন কি না সন্দেহ হয়। চন্দ্রকুমার দে মহাশয় পূর্ববঙ্গ হইতে বহু পালাগান সংগ্রহ করিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সংগৃহীত অধিকাংশ পালা গায়েন বা

কথকদের মুখ হইতে লিখিয়া লওয়া হইয়াছিল। এই সমস্ত পালাগান পূর্ববঙ্গের, বিশেষতঃ ময়মনসিংহ, নোয়াখালির হিন্দু-মুসলমান কৃষাণসমাজে দুই তিন শত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে—এখনও তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে নাই। কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর সেইরূপ কোন ছড়া-পাঁচালী ধরণের রচনা, অথবা পুরাদস্তুর পুঁথি, তাহা বুঝা যাইতেছে না। যাঁহারা পুরাতন বাংলা সাহিত্য লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহাবা কেহ কঙ্কের পুঁথি চক্ষে দেখেন নাই। 'সৌরভ' পত্রিকায় প্রকাশিত চন্দ্রকুমার দে-র গোটাকয়েক প্রবন্ধ ব্যতীত এই কাব্যের কোনরূপ পুঁথিগত প্রমাণ নাই। গবেষণা কার্যে চাক্ষুষ প্রমাণ ব্যতিরেকে চূড়ান্ত মীমাংসা হইতে পারে না। অতএব চন্দ্রকুমার দে-র সাক্ষ্য মাত্র অবলম্বন করিয়া এই কাব্যকে প্রামাণিক বলা যায় না। যদি দে মহাশয় কথক, পাঁচালী গায়ক বা কোন কৃষকের নিকট শুনিয়া ইহা লিখিয়া লইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহাকে পুঁথিসাহিত্য না বলিয়া মৌখিক সাহিত্যেব অন্তর্ভুক্ত কবিতে হইবে। মৌখিক সাহিত্যের কোন নির্দিষ্ট বচনাকাল নাই, রচনাকার বলিয়াও কোন কবিবিশেষকে চিহ্নিত করা যায় না। জনপ্রিয় কাহিনী লোক মুখে বদল হইতে হইতে কালক্রমে আধুনিক রূপলাভ কবিয়া থাকে। কঙ্কেব বিদ্যাসুন্দর কতকটা এই শ্রেণীর মৌখিক সাহিত্য—পূর্ববঙ্গ ও ময়মনসিংহেব পালাগানগুলিব সঙ্গেই ইহার ঘনিষ্ঠ যোগা-যোগ। আবও একটা কথা, চন্দ্রকুমাব 'সৌবভ' পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধে এই কাব্য হইতে যে সমস্ত উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহার ভাব ও ভাষা অতিশয় অর্বাচীন—হাল আমলের রচনা বলিয়া মনে হয়। যথা—

নয়নে নয়নে হইল আনন্দপ্রদান।
অন্তরে বাজিল বিব মন্মথেব বাণ॥
কায়ামাত্র লইয়া কন্যা পশিলা মন্দিরে।
ছায়ারূপে মন গেল মাল্যানীব ঘরে॥

এ ভাষা ভারতচন্দ্রেব পূর্বে যাইতে পারে কি? ভাষা, ছন্দ ও শব্দ প্রয়োগে যেরূপ মার্জনা, বৈদগ্ধ্য ও সুরুচিব পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে এই কাব্যের পুঁথির অন্তরালে যেন একজন আধুনিক ব্যক্তি উঁকি দিতেছেন বলিয়া মনে হয়। আমাদের অনুমান, চন্দ্রকুমার দে কোন পালাগায়কেব কাছে গাথাটি শুনিয়া নিজ রচনাচাতুর্য সহ ইহা পত্রস্থ করিয়াছিলেন। সেযুগে যাঁহারা পুঁথি সংগ্রহ করিতেন, তাঁহাদের কেহ কেহ অর্বাচীন পুঁথির প্রাচীনতা প্রমাণের

জন্য যে পন্থা অবলম্বন করিতেন তাহার রহস্য আমরা অনেকেই জানি লেখা পুঁথির যখন এই হাল, তখন মৌখিক সাহিত্যের তো কথাই নাই কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরের যেটুকু চন্দ্রকুমার দে মহাশয় তাঁহার ধারাবাহিক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাচীনত্বের প্রভাব নাই বলিলেই চলে কথা উঠিবে, পুরাতন কাব্য দীর্ঘ দিন ধরিয়া জনসমাজে প্রচলিত থাকিলে অনেক সময়ে তাহাতে নানা পরিবর্তন দেখা যায়। সেরূপ ক্ষেত্রে সে পুঁথির বহু অনুলিপি পাওয়া যায়। কিন্তু কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরের মাত্র দুইখানি পুঁথি (যদি চন্দ্রকুমার দে-র কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়) ব্যতীত আর কোন লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, এবং সে দুইখানি পুঁথিও আমরা দেখি নাই, তাহার সন্ধানও নাই। এরূপ অবস্থায় কঙ্ককে কোনক্রমেই প্রাচীন কবি বলা যায় না। ষোড়শ শতাব্দী দূরের কথা তাঁহার ভাষা ও রচনা-রীতি দেখিয়া মনে হয়, এ কাব্য সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়া থাকিবে।

ইতিপূর্বে আমরা বলিয়াছি যে, মূল কাব্যখানির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। চন্দ্রকুমার দে 'সৌরভ' পত্রিকায় ইহার যেটুকু প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার অতিরিক্ত আর কোন তথ্য বা সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পূর্বতন ও পরবর্তী বিদ্যাসুন্দর কাব্যগুলির সঙ্গে ইহার প্রধান পার্থক্য—ইহা পীরমাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্য। সুন্দর সত্যপীরের কৃপাতেই বিদ্যাকে লাভ করিতে পারিয়াছিল এবং পরিশেষে সত্যপীরের পূজা প্রচার করিয়াছিল।

অপুত্রক মাল্যবান রাজা পীরের আশীর্বাদে একটি শিশুকে কুড়াইয়া পান এবং তাহাকেই নিজ পুত্ররূপে লালনপালন করেন—তাহার নাম হয় সুন্দর। রাণী পীরের কৃপায় পুত্রটিকে লাভ করিলেও কালক্রমে পীরের পূজা ভুলিয়া গেলেন, তাহার ফলে পীর ক্রুদ্ধ হইলেন। অতঃপর সুন্দর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অরণ্যে শিকার করিতে গেলে পীর ছলনা পাতিয়া বনের সব পশু লুকাইয়া ফেলিলেন। অবশেষে সুন্দর সেই অরণ্যমধ্যে পীরের দর্শন লাভ করিল এবং পীরকে শীর্ণি মানিয়া চম্পক নগরে যাত্রা করিল। অতঃপর চম্পক নগরে গিয়া মালিনীর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ, বিদ্যার সাক্ষাৎ লাভ, মালা গাঁথিয়া কৌশলে পত্র প্রেরণ, বিদ্যাসুন্দরের মিলন প্রভৃতি কাহিনী কালিকামঙ্গলের ধরণেই বর্ণিত হইয়াছে। রচনার পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া অনুমিত

হয়, পীরমাহাত্ম্য বাদ দিলে ইহা প্রচলিত বিদ্যাসুন্দর কাহিনীকেই অনুসরণ করিয়াছে, যে সামান্য পার্থক্য আছে তাহা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নহে—এক কবির কালিকামঙ্গল হইতে অপর কবির কালিকামঙ্গলের সেরূপ পার্থক্য প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয়। সুন্দর, সুন্দরের পিতা, মালিনী, সুন্দরের নিবাস—ইত্যাদি বিষয়ে কালিকামঙ্গল কাব্যসমূহের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। সুতরাং কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরে যে দুই-একটা নূতনত্ব আছে, নামেরও কিছু কিছু পার্থক্য আছে, তাহার মৌলিকতার জন্য কবিকে অতি-প্রশংসার মাল্যচন্দনে ভূষিত করিবার প্রয়োজন নাই। একথা অবশ্য সত্য যে, "এই বিদ্যাসুন্দরের ভাষা অতি সরল ও মধুর, ইহার অনেক স্থলে বেশ কবিত্ব আছে"; কিন্তু ইহার সঙ্গে একথাও মানিয়া লইতে হইবে যে, প্রাপ্ত কাব্যের ভাষাভঙ্গিমায় আধুনিকতার ছাপ অতি প্রকট ; উপরন্তু ইহার কোন পুঁথিও আমরা দেখি নাই। দীনেশচন্দ্রের নিকট নাকি ইহার একখানি পুঁথি ছিল।[৩৯] কিন্তু তাহার সম্বন্ধেও কিছু জানা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে চন্দ্রকুমার দে-র আলোচনাকেই একমাত্র উৎস বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে। যাহা হউক, 'সৌরভ' পত্রে চন্দ্রকুমার আলোচনা প্রসঙ্গে কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরের যেটুকু প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে কবির পরিচ্ছন্ন ও সুললিত রচনা প্রশংসা করিতে হইবে। আখ্যান মোটামুটি অন্যান্য কালিকামঙ্গলের অনুরূপ হইলেও পীরমাহাত্ম্য বর্ণনার চেষ্টাই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া ইহাকে কালিকা-মঙ্গলের পরিবর্তে 'পীরমঙ্গল' বলা যাইতে পারে। পল্লীগাথা শ্রেণীর এই কাব্যের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ থাকিলেও ইহার যেটুকু প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যে সুখপাঠ্য তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পুরাতন পুঁথির

---

৩৯ দীনেশচন্দ্র বলিয়াছেন, "পুস্তকখানি এখনও প্রকাশিত হয় নাই ; একখানি হস্তলিখিত পুঁথি আমার নিকট আছে" (ব. ভা. সা. পৃ ৩২৭)। এই কাব্যের পুঁথি, যাহা নাকি একদা অতি জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহা দুর্লভ হইয়া পড়িল কেন, সে প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র বলিয়াছেন যে, কঙ্ক ব্যক্তিগত জীবনে ব্রাহ্মণদের দ্বারা অতিশয় নিন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে নাকি ষড়যন্ত্রও হইয়াছিল—"এই ষড়যন্ত্রের দরুণ কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর সমস্ত দেশ হইতে বিতাড়িত হয় এবং গোঁড়া হিন্দুরা ঘরে ঘরে উহা জ্বালাইয়া ফেলিলেন" (ব. ভা. স)। পল্লীগাথার বর্ণনাকে ইতিহাসের মর্যাদা দিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

সন্ধান পাইলে (আদৌ কোন পুঁথি ছিল কি?) পীরমাহাত্ম্য-বিষয়ক 'পীরমঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর' কাব্যটির অভিনব স্বরূপ বুঝা যাইত।

কৃষ্ণরাম ॥

কবি কৃষ্ণরাম দাসের বিদ্যাসুন্দর বিষয়ক কালিকামঙ্গল সপ্তদশ শতাব্দীর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইতিপূর্বে আমরা কৃষ্ণরামের জীবন ও অন্যান্য কাব্য সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছি, এখানে সে বিষয়ের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ভারতচন্দ্রের উপযুক্ততর কবিপ্রতিভার যশে কৃষ্ণরাম ঢাকা পড়িয়া গিয়াছেন—দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির ইহাই অনিবার্য পরিণাম। তথাপি পূর্ববর্তী কালিকামঙ্গলসমূহের তুলনায় কৃষ্ণরামের রচনা যে উৎকৃষ্টতর তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

কৃষ্ণরামের অনেকগুলি কাব্যের মধ্যে কালিকামঙ্গল সর্বপ্রথম এবং সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। ইহার পরে রচিত তাঁহার কাব্যে বিশেষ কোন প্রতিভার চিহ্ন দেখা যায় না। যাহা হউক, কালিকামঙ্গলের রচনাকাল সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ নাই। কাব্যের প্রারম্ভ ভাগে কৌশলে কবি গূঢ়ার্থের সাহায্যে কাব্যের রচনাকাল এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন :

সারসাসানের নেত্র ভীমাক্ষি বর্জিত মিত্র
ভেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে
বিধুর মধুর ধাম রচনাতে কহিলাম
বুঝ শাক বিচারিয়া সভে ॥

অর্থাৎ এ কাব্য ১৫৯৮ শক বা ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।[৪০] উপরন্তু কবি আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বাঙলার সুবাদার শায়েস্তা খাঁ ও দিল্লীশ্বর ঔরংজেবের

---

৪০ ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য এই হেঁয়ালির এইভাবে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন—"ভীম মহাদেবের একটি নাম। তাঁহার তিন অক্ষি অর্থাৎ চোখ। মিত্র অর্থাৎ দ্বাদশ সূর্য হইতে তিন বাদ গেলে থাকে 'নয়'। সারসাসান অর্থাৎ ব্রহ্মার নেত্রসংখ্যা 'আট'। ঋষির অর্থাৎ সাত হইতে পক্ষ অর্থাৎ দুই ত্যাগ করিলে অবশিষ্ট থাকে পাঁচ। বিধু অর্থাৎ এক। সুতরাং রাশিগুলি হইল ৮৯৫১। 'অঙ্কস্য বামাগতিঃ' রীতি অনুসারে শকাব্দ হয় ১৫৯৮। ইহার সহিত ৭৮ যোগ করিলে ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। গ্রন্থটির রচনাকাল ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দ।"—কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী ভূমিকা, পৃঃ ॥৵০

নাম উল্লেখ করিয়াছেন।[৪১] শায়েস্তা খাঁয়ের সুবাদারী কাল ধরিয়াও প্রায় একই সন-তারিখে উপনীত হওয়া যায়।

মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে ("বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর") কৃষ্ণরাম এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন—ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য কৃষ্ণরামের কাব্য-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত কালিকামঙ্গল সম্পাদনে যে চারিটি পুঁথি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে নানা বিশৃঙ্খলা আছে। কবি কাব্যের শেষে সংক্ষেপে ঘটনার যে তালিকা ও পারম্পর্য দিয়াছেন পুঁথির মধ্যে তাহা অনুপস্থিত। দক্ষযজ্ঞ কাহিনী হইতে তারকাসুর ও তাহার পুত্র সুলোচন বধ, পতিশোকাতুরা সুলোচনপত্নী তারাবতীর কালিকার নিকট প্রার্থনা এবং সুলোচন ও তারাবতীর যথাক্রমে সুন্দর ও বিদ্যারূপে জন্মগ্রহণ—এ ঘটনা পুঁথির মধ্যে নাই। বস্তুতঃ পুঁথিটিতে শুধু বিদ্যাসুন্দরের গল্প এবং প্রসঙ্গক্রমে প্রভাবতীর পৌরাণিক আখ্যান বিবৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের অনুমান যুক্তিসঙ্গত। তাঁহার মতে, পূর্বের পুঁথিতে পৌরাণিক কাহিনীও ছিল, কিন্তু কালক্রমে শুধু বিদ্যাসুন্দর আখ্যানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইলে পৌরাণিক আখ্যান অপ্রচলিত হইয়া পড়ে।[৪২]

এই দীর্ঘ কাব্যটি তরুণ কবির রচনা হইলেও ইহাতে মুন্সিয়ানার অভাব নাই। মোটামুটি কাহিনীতে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের একই ধারা অনুসৃত হইয়াছে। শুধু নামধামে সামান্য নূতনত্ব আছে। যেমন সুন্দরের দেশ—কাঞ্চন, পিতার নাম গুণসিন্ধু। সুন্দর বিদ্যার সন্ধানে গৌড়ে আসিয়া বিমলা মালিনীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিদ্যার সঙ্গে গুপ্তপ্রণয়ে তাহার যে পুত্র জন্মে তাহার নাম পদ্মনাভ। দেবী কালিকার বরেই সে বিদ্যার শয়নমন্দিরে উপস্থিত হয়, এবং পরে ধরা পড়ে। কোটাল কৌশলে চোরের পরিচয় জানিবার জন্য কলাবতী নাম্নী এক ব্রাহ্মণীকে নিয়োগ করে। ব্রাহ্মণী আসিয়া সুকৌশলে চোরের পরিচয় জানিতে চাহিলে বিদ্যা ও তাহার সখীরা তাহাকে যেভাবে লাঞ্ছিত করিয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। কবি অন্য কাব্যেও অশ্লীল গ্রাম্য-

৪১ অরংসাহা ক্ষিতিপাল রিপুর উপরে কাল
রামরাজা সর্ব্বজনে বলে।
নবাব সায়িস্তা খাঁ অধিকারী সাতগাঁ
বহু সরকার করতলে ॥

৪২ ডঃ সেনের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, অপরার্ধ, ২৯৩

দূষিত শব্দ ব্যবহারে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই—এই বর্ণনায় তাহা উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে।

ঘটনা বর্ণনা নিতান্তই মামুলি ধরণের, চরিত্রগুলিতেও বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই। মালিনী বিমলার চরিত্রে "মুকুন্দরামের উজ্জ্বলতা নাই বটে, তবে ভারতচন্দ্রের আতিশয্যও নাই"।[৪৩] ডঃ সেনের এ মন্তব্যের অর্থ বোধ হয়, চরিত্রটি মোটামুটি স্বাভাবিক এবং প্রশংসনীয়। এ সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়, কৃষ্ণরাম মাটির ঢেলা সাজাইয়া ইমারত গড়িতে গিয়াছিলেন, মুকুন্দ-রাম তাহা দিয়া নিপুণ পরিচ্ছন্ন 'বাংলাঘর' নির্মাণ করিয়াছিলেন, আর ভারতচন্দ্র মাটির ঢেলাকে সোনার ইঁটে পরিণত করিয়া তাহার দ্বারা চিত্র-বিচিত্র প্রাসাদপুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণরামের বিমলা মুকুন্দরামের দুর্বলা ও ভারতচন্দ্রের হীরার বেসাতির বর্ণনা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। ভারতচন্দ্র সম্ভবতঃ কাহিনী গ্রন্থনে কৃষ্ণরাম হইতে কিছু কিছু উপাদান গ্রহণ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু অধমর্ণ উত্তমর্ণকে প্রতিভায় বহু গুণে ছাড়াইয়া গিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

কবি কৃষ্ণরাম শাক্ত কাব্য লিখিলেও বৈষ্ণবপ্রভাব স্বীকার করিয়াছিলেন :

রাধার সহিত কৃষ্ণ বন্দিব প্রথমে।
মৎস্য আদি অবতার বন্দি ক্রমে ক্রমে ॥
গোপ গোপী গোকুলে গোধন ধন্য অতি।
বৃন্দাবন আদি যথা কৃষ্ণের বসতি ॥
বন্দিলাম যশোদানন্দ পরম সাদরে।
পুত্র ভাবে আপুনি আছিলা যার ঘরে ॥
বসুদেব দৈবকী বন্দিলাম জোর হাথ।
পাইল পরমানন্দ অখিলের নাথ ॥
পুরন্দর শচী বন্দো ভাগ্যের নাহি ওর।
নবদ্বীপে চৈতন্যগোসাঞী অবতার ॥
নিত্যানন্দ ঠাকুর অপর পারিষদ।
বন্দিনু পরমভক্ত সকলের পদ ॥

কৃষ্ণরামের ছন্দজ্ঞান প্রশংসনীয়। এখানে দুইটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যাইতেছে :

---

৪৩ ঐ

(১) শম্ভুর উপর চরণকোর,
সজল জলদ বরণ ঘোর
মৌল মুকুত চিকুর ছন্দ
করণে কুণ্ডল সোহিনী।
জুহ লোলনা সঘন লার
লিহ পিবই রুধির ধার
ভুঙ্গ বদন মুখবিথার
অসুর বিসর মোহিনী ॥

(২) সুন্দর গুণের রাশি শুনিয়া কহিল হাসি
না যায় খণ্ডন বিধির বন্ধন
তুমি হইলা মোর মাসি ॥

কবির পয়ার-ত্রিপদীগুলিও বেশ পরিচ্ছন্ন। ব্রজবুলিতে যে তাঁহার কিঞ্চিৎ পারদর্শিতা ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য কোন কোন স্থল এত মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন যে, স্বতই সন্দেহের উদ্রেক করে। যেমন :

তিতিয়া নয়নজলে জামাতা করিলা কোলে
বিনয়বচনে বলে রায়।
পূর্বে যত অপবাদ না লবে দীনের নাথ
অনুগত জানিয়া আমায় ॥
শ্বশুরের শুনি বাণী সুন্দর জুড়িয়া পাণি
বুঝাইয়া বিশেষ ভারতী।
নৃপতির অগ্রগণ্য তোমা বিনে কেবা অন্য
পুণ্যজন্ম ধন্যবর অতি ॥

এ স্বচ্ছ স্বচ্ছন্দ রচনায় আধুনিকতার চিহ্ন অতি প্রকট। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলের প্রাপ্ত পুঁথিগুলির মধ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ও পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।[৩৪] পরবর্তী কালে এই কাব্যে যে প্রচুর হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। যাহা হউক, ভারতচন্দ্রের পূর্বেই তিনি যে কাব্যখানিকে পূর্বাপর সঙ্গতি বজায় রাখিয়া একটা সর্বাঙ্গীণ মূর্তি দান করিতে পারিয়াছিলেন, ভাষা-ছন্দ-চরিত্র প্রভৃতিতে আংশিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা মানিতে হইবে। বিশেষতঃ এ কাব্য নিতান্ত তরুণ বয়সের রচনা, ইহাতে অধিকতর ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিলেও

৩৪ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ও ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, পৃ. ১৪৭—৪৮

আমরা বিস্মিত হইতাম না। অবশ্য প্রতিভার স্পর্শমণি তাঁহার ছিল না। তাই তিনি লোহাকে সোনা করিতে পারেন নাই, গ্রাম্যতাকে নাগরিকতার ছাপ দেওয়াও তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই, শিল্পমূর্তি নির্মাণের বাস্তব উপাদানকেও তিনি যথোপযুক্তরূপে ব্যবহার করিতে পারেন নাই। জান্তব রিরংসাকে সূক্ষ্ম রসে পরিণত করিয়া ভাঁড়ামিকে রঙ্গরহস্যের বৈদগ্ধ্যদানও তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে ছিল। সে প্রতিভার যোগ্য অধিকারী ছিলেন প্রায় শতাব্দীকাল পরে আবির্ভূত রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। শিল্পসৃষ্টির অক্ষমতাসত্ত্বেও কৃষ্ণরামই সর্বপ্রথম বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গলের কাহিনীকে একটা সংহত আকার দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সর্বোপরি এ কাব্য আদি-রসের রোমান্টিক আখ্যান হইলেও কবি কালিকার প্রসঙ্গ 'নম নম' করিয়া সারেন নাই, অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুসারে ইহাতে কালিকার প্রাধান্যই বজায় রাখিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্মের প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা থাকিলেও শাক্ত ভক্তিও তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে কালিকার যৎসামান্য প্রভাব আছে; যেটুকু ভক্তি ও দেবীমাহাত্ম্য প্রচারের কথা আছে, সেটুকু না থাকিলেই ভাল হইত—আমরা একখানা পুরা রোমান্টিক প্রেমের আখ্যানকাব্য পাইতাম। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর মূলতঃ মানবীয় রসের উত্তপ্ত কাহিনী[৪৫], আর কৃষ্ণরামের কাব্য প্রধানতঃ মঙ্গল-কাব্য। দুইজন কবি দুই শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণরামের সময়েও (সপ্তদশ শতাব্দী) মঙ্গলকাব্যের পুরাতন ঐতিহ্য কথঞ্চিৎ বজায় ছিল।

---

৪৫ কেহ কেহ বলেন যে, কৃষ্ণরাম নাকি কালিকামঙ্গলে "ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক প্রণয়কাব্য" রচনা করিয়াছিলেন এবং সমালোচক ইহাকে "তাঁহার ভক্তিভাবের অভাবের একটি প্রমাণ" বলিয়া মনে করেন (কবি কৃষ্ণরামের, গ্রন্থাবলীর ভূমিকা, পৃ. ১৸০—৸/০)। কিন্তু কোন কালিকামঙ্গলই ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক প্রণয়কাব্য নহে। ইহার মূল সংস্কৃত চৌরপঞ্চাশিকা-ই যথার্থ লৌকিক প্রণয়কাব্য ছিল। "উপরের বাক্স কালিকামঙ্গল, ভিতরের গল্প বিদ্যাসুন্দর" (চিন্তাহরণ বাবু সম্পাদিত বলরামের কালিকামঙ্গলে মহাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভূমিকা)—ইহা সত্য বটে, কিন্তু উপরের বাক্সকে ফেলিয়া দিবার উপায় নাই। কবি কঙ্ক তাঁহার বিদ্যাসুন্দরে কালিকামাহাত্ম্য উল্লেখ না করিলেও মুসলমান ধর্মাদর্শে পীরমাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন। কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দরে লৌকিক প্রণয়গাথা প্রাধান্য পাইলেও বিশুদ্ধ লৌকিকতা ইহার আদর্শ নহে। কোথাও প্রকাশ্যে, কোথাও বা প্রচ্ছন্নভাবে ইহাতে কালিকা-মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে।

সেই জন্য অন্যান্য কালিকামঙ্গলের তুলনায় তাঁহার কাব্যে কালিকার মাহাত্ম্য অধিক স্থান অধিকার করিয়াছে। আমাদের মনে হয় তাঁহার পুরাতন পুঁথিগুলিতে সতী-হর-পার্বতী, তারকাসুর বধ প্রভৃতি পৌরাণিক ঘটনা আরও অনেকটা অংশ জুড়িয়া ছিল। কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীতে লোকরুচির চাহিদার ফলে এই সমস্ত পৌরাণিক শাক্ত অংশসমূহ বর্জিত হয়, এবং বিদ্যা-সুন্দর আখ্যানের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়। এইজন্য কৃষ্ণ-রামের কালিকামঙ্গলে মঙ্গলকাব্যের ধারাটি অতিশয় স্পষ্ট হইয়াছে। কৃষ্ণ-রামের গ্রাম্য দূষিত রুচি, অভব্য অনুচ্চার্য শব্দের প্রতি পক্ষপাত ক্ষমার যোগ্য নহে বটে ; কিন্তু তাঁহার রচনাশক্তি নিতান্ত নিম্নস্তরের নহে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী ॥

রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের বেশ কিছুকাল পূর্বে, সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী বিশুদ্ধ মঙ্গলকাব্যের আদর্শে কালিকামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যটি প্রতিভাবর্জিত হইলেও রচনা বেশ পরিচ্ছন্ন। তথাপি ইহা কোন দিন কিছুমাত্র জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই, অন্য কোথাও এই কবির উল্লেখও পাওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় এই কবিকে অজ্ঞাতবাস হইতে উদ্ধার করিয়া কাব্যখানিকে লোকসমাজে প্রকাশ করিয়া কালিকামঙ্গলের আর একজন স্বল্প প্রতিভাধর কবিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন। এই কাব্যের একখানি খণ্ডিত পুঁথি সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় পড়িয়াছিল। চিন্তাহরণ বাবু এই কাব্য সংগ্রহ করিয়া ১৩৩৩ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ইহার সম্বন্ধে সর্বপ্রথম কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন এবং ১৩৩৭ সালে সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে তিনি এই কাব্য সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন।

এই অনতিদীর্ঘ কাব্যের প্রথম দিকে কবি যৎসামান্য আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাহা হইতে দেখা যাইতেছে, কবির পিতামহ—চৈতন্য, পিতা—দেবীদাস, মাতা—কাঞ্চনী। কিন্তু তাঁহারা কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী, তাহার কোনো ইঙ্গিত কাব্যমধ্যে পাওয়া যায় না। কাব্যের শেষাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া ইহার প্রকৃত রচনাকাল জানিবার উপায় নাই। তাঁহাকে কেহ কেহ

পূর্ববঙ্গের অধিবাসী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, কারণ "তাঁহার পুস্তকের অনেক স্থানে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত শব্দাদি ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।"[৪৬] এই অভিমত আবার কেহ কেহ মানিয়া লইতে পারেন নাই।[৪৭] কবি দেবদেবী ও দিগ্‌বন্দনায় যে সমস্ত লৌকিক দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষতঃ দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত।[৪৮] উপরন্তু তিনি কাশীজোড়ার ভূস্বামী লক্ষ্মীনারায়ণের (১৬৬৯-১৬৯২) সভাসদ ছিলেন। কারণ কোন কোন পুঁথিতে কবি স্বয়ং তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা মনে হয়, তিনি রাঢ়দেশের কবি ছিলেন।

কবি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমানের পক্ষে যুক্তি আছে। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় উল্লিখিত লক্ষ্মীনারায়ণের কাল (১৬৬৯-১৬৯২) ধরিয়া মনে করেন যে, কবি সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। এই কালনির্ণয় অযৌক্তিক নহে।

বলরাম কবিশেখর উপাধি পাইলেও এ কাব্য বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ ইহার পুঁথির সংখ্যা অতি অল্প। কালিকামঙ্গলের আর এক কবি প্রাণরাম চক্রবর্তী (ভারতচন্দ্রের পরবর্তী) কালিকামঙ্গলের কবিদের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে কবিশেখর বলরামের নাম নাই। ইহাতেও মনে হইতেছে, প্রাণরাম চক্রবর্তীর সময়ে নিশ্চয় এ কাব্য অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা না হইলে কবি প্রাণরাম বলরামের নাম উল্লেখ করিলেন না কেন?

এ কাব্য রচনা হিসাবে কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে। ঘটনা ও চরিত্রগত বিশেষ কোন নূতনত্ব বা বৈচিত্র্য নাই। শুধু সুন্দরের পরিচয়ে একটু আধটু নূতনত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সুন্দরকে মাণিকানগরের (দ্রাবিড় বা উৎকল) অধিবাসী বলা হইয়াছে। কালিকার ভক্ত সুন্দর বিদ্যার কথা শুনিয়া রাজা বীরসিংহের রাজত্বে পড়ুয়ার বেশে উপস্থিত হইল—এবং তার পরের ঘটনা অন্যান্য কালিকামঙ্গলের ধারাই অনুসরণ করিয়াছে; দুই এক স্থলে

৪৬ বলরাম চক্রবর্তীর কালিকামঙ্গলে চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর ভূমিকা, পৃ.—৸৶৹

৪৭ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৬৭৭

৪৮ ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ইতি—অপরার্ধ, পৃ. ৪৭২—৭৩

গৌণ বিষয়ে যৎসামান্য পার্থক্য আছে। ভাষা, কাহিনী-গ্রন্থন, চরিত্র সৃষ্টি—কোন দিক দিয়াই ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। কবি সংস্কৃত সাহিত্য, পুরাণ ও তন্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন ; গ্রন্থের শেষে তিনি তন্ত্রসাধনার প্রক্রিয়াও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কাব্যটি পুরাপুরি মঙ্গলকাব্যের ছাঁচে রচিত এবং নরনারীর চরিত্র বর্ণনা অপেক্ষা কালিকামাহাত্ম্যের প্রতি কবির অধিক-তর আকর্ষণ ছিল। কবি যদিও চৈতন্যবন্দনা গাহিয়াছেন, বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি তিনি যে শাক্ত ভক্ত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাব্যের শেষের দিকে বিদ্যাসুন্দরের বিবাহের পরও তিনি কালিকামাহাত্ম্য প্রচারের জন্য কাহিনীকে অনাবশ্যক দীর্ঘ, জটিল ও নীরস করিয়া ফেলিয়াছেন। সুন্দর বধূসহ দেশে ফিরিয়া গেল, যথাকালে তাহার একটি পুত্র (সদানন্দ) হইল, কিন্তু দেবীপূজায় তাহার কিঞ্চিৎ অবহেলা দেখিয়া কালিকা এক রাক্ষসকে পাঠাইয়া দিলেন সুন্দরের বালকপুত্রকে খাইয়া ফেলিবার জন্য। পুত্র মারা পড়িলে সুন্দরের টনক নড়িল। সে কালীসাধনা করিয়া পুত্রকে ফিরিয়া পাইল এবং ঘটা করিয়া কালিকার পূজা প্রচার করিল। শুধু এইখানেই কবি থামিয়া যান নাই : মৃত্যুর পর বিদ্যা-সুন্দরকে স্বর্গে লইয়া যাইবার কালে কালিকার সঙ্গে যম ও অন্যান্য দেবদেবীর বিষম লড়াই বাধিয়া গেল। কারণ দেবী কালিকা দুইজন পাপীকে স্বর্গে লইয়া যাইতেছেন—ইহাতেই দেবসমাজের আপত্তি। যমদূত বিদ্যা ও সুন্দরের স্বর্গযাত্রায় বাধা দিয়া কালিকাকে বলিল :

পাপীদের লইয়া রথে চল্যাছ বৈকুণ্ঠপথে
কোন পুণ্য কৈল কোন দান ॥
এই যে পুরুষ নারী চিরকাল পাপ করি
পাপিষ্ঠ নাহিক ইহা সম।
হেন (জন) স্বর্গে যায় এ দুঃখ কহিব কায়
বান্ধ্যা নিতে আজ্ঞা দিল যম ॥

বাধ্য হইয়া কালিকা যমের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যমকে খেদাইয়া দিলেন। ইন্দ্র-নারায়ণ-শিব—সকলেই কালীর কাছে হার মানিয়া পলাইয়া গেলেন। মহাদেব কালিকার সঙ্গে যুদ্ধে চলিয়াছেন—এই বর্ণনাটি এই নীরস কাব্যে কিছু বৈচিত্র্য সঞ্চার করিতে পারিয়াছে :

বৃষভে চাপিয়া আইসে মহাদেব শূলী।
অট্ট অট্ট হাসিতে লাগিলা ভদ্রকালী॥
ঈষতে হাসিলা মাতা পরশে গগন।
প্রলয়ের মেঘ যেন করিছে নিস্বন॥
শুটিল শিবের বৃষ পায়্যা মহা ডর।
গগনে ফিরয়ে শিব বলে ধর ধর॥
দূরে গেল ডম্বরু নিশান লাঠিখান।
কোথা গেল সিদ্ধি ঝুলি নন্দী মহাকাল॥
শিবের দুর্গতি দেখি বলে ভদ্রকালী।
সামাল সামাল এইবার প্রভু শূলী॥

ইহার পর পুঁথি খণ্ডিত হইয়াছে; তাহা না হইলে বাঘাম্বর লইয়া শিব কিরূপ বিড়ম্বনার মধ্যে পড়িয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত 'সামাল' দিতে পারিয়াছিলেন কিনা তাহার কৌতুকাবহ বর্ণনা পাওয়া যাইত।

কবি কাব্যের অনেকটা অংশে বিদ্যাসুন্দরের মর্ত্যকাহিনী ছাড়িয়া দেব-দেবীদের এই প্রকার লীলাকাহিনী বর্ণনায় অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কাজেই তিনি যেমন শাক্তভক্ত ছিলেন, তেমনি কালিকামঙ্গলকে যথাযথ মঙ্গলকাব্যের রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন। বিদ্যাসুন্দরের রোমান্টিক কাহিনী এই কাব্যেও বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু দেবলোকের প্রতি তাঁহার পক্ষপাত সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে। কাব্যটির বিশেষ কোন প্রশংসনীয় শিল্পগুণ নাই, কেবল কবির সংস্কৃতজ্ঞান কিঞ্চিৎ প্রশংসা দাবি করিতে পারে। ইহাতে কিছু ভক্তির প্রকাশ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে গভীরতা নাই, মা কালী নিতান্ত ফরমায়েসীভাবে ভক্ত সুন্দরের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। বিদ্যা ও সুন্দরকেও পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে মিলাইয়া দিয়া এবং মর্ত্যজীবনের পর তাহাদের স্বর্গযাত্রার বর্ণনা দিয়া কবি মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক আদর্শের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। প্রতিভা না থাকিলে কাব্য কিরূপ বিড়ম্বিত হয়, বলরাম কবিশেখরের কালিকামঙ্গলই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

কবি তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। সুন্দরের তন্ত্রসাধনার বর্ণনাটি কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা স্মরণ করাইয়া দেয়:

কূর্মচক্র৪৯ নিরমিঞা তাহে সব থুয়্যা।
তাহার উপরে বৈসে সুসজ্জিত হৈয়া॥

৪৯ নানা তন্ত্রগ্রন্থে কূর্মচক্র নির্মাণের বিধি বর্ণিত হইয়াছে।

একে একে ন্যাস করে যার যত বীজ।
শোষণ দহন বৃষ্টি উৎপাতন নিজ ॥
করিলেক ভূতশুদ্ধি একান্ত হইয়া।
পঞ্চদশ দলে পূজে মাতৃ আরোপিয়া ॥

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া অনুমিত প্রাণরাম চক্রবর্তীর কালিকামঙ্গল সম্বন্ধে রীতিমতো সংশয় আছে। ১২৪৩ সালে এই কাব্য মুদ্রিত হইয়াছিল। ১২৭৯ সালের 'এডুকেশন গেজেটে' (মাঘ, ৫, ১২, ১৯, ২৬ তারিখে প্রকাশিত) অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'বিদ্যাসুন্দর' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি প্রাণরামকে কালিকামঙ্গলের সর্বপ্রাচীন কবি বলিয়াছিলেন। এই কাব্য নাকি "১২৪৩ সালে রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার শর্মা কর্তৃক সংশোধিত শিবালহে (অর্থাৎ শিয়ালদহে) মুদ্রিত" হইয়াছিল। লঙ্ সাহেব তাঁহার তালিকায় এই কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

কাব্যের রচনাকাল হিসাবে এই শ্লোকটি পাওয়া গিয়াছে :

বসুদ্বয় বাণ চন্দ্র শক নিরূপণ।
কালিকামঙ্গল গীত হৈল সমাপন ॥

বসুদ্বয় অর্থাৎ ৮৮—এইরূপ অর্থ হইলে উল্লিখিত শ্লোক হইতে ১৫৮৮ শক (১৬৬৬ খ্রীঃ অঃ), এবং ৮২ অর্থ করিলে ১৫২৮ শক (১৬০৬ খ্রীঃ অঃ) পাওয়া যাইবে। ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মনে করেন—ইহা ১৫২৮ শকই হইবে।[৫০] অবশ্য চিন্তাহরণ বাবু বলরাম কবিশেখরের কালিকামঙ্গলের ভূমিকায় (পৃ. ॥৵—॥৶০) বলিয়াছেন, "ইনি (অর্থাৎ প্রাণরাম চক্রবর্তী) ভারতচন্দ্রের পরে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অবলম্বনে যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহাতে কৃষ্ণরাম দাস ও ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের উল্লেখ আছে।" দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' যে তথ্য আছে তাহা হইতেই চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। দীনেশচন্দ্র বলিয়াছেন, "ভারতচন্দ্রের পরে প্রাণরাম চক্রবর্তী নামক জনৈক কবি বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন।"[৫১] কিন্তু তাঁহার পুঁথিতে উপরি-উদ্ধৃত শ্লোক মিথ্যা না

৫০ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৫০

৫১ মুদ্রিত গ্রন্থে (১২৪০) নাকি এই কয় ছত্র ছিল

বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম প্রকাশ।
তদন্তর কৃষ্ণরাম নিরতা যাঁর যাস ॥

হইলে তাঁহাকে এত অর্বাচীন বলা যায় কিনা সন্দেহ। কেহ কেহ তাঁহাকে মুকুন্দরামের পুত্র বলিয়া মনে করেন। কারণ কবি একস্থলে এইরূপ ভণিতা দিয়াছেন, "মুকুন্দনন্দন ভণে নৃপবৈশ্য দুইজনে চলিল মুনির সন্নিধান।" তিনি যদি মুকুন্দরামের পুত্র হন, তাহা হইলে তাঁহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আনিয়া ফেলা যায় না। কিন্তু প্রাণরাম নামে মুকুন্দরামের কোন পুত্র ছিল না। ইঁহার কাব্যে যদি ভারতচন্দ্র প্রভৃতি পরবর্তী কবিদের নাম থাকে, তবে ইনি অবশ্যই অর্বাচীন কালের কবি হইবেন। ইঁহার কাব্য সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্রের মন্তব্য উল্লেখ করিয়া আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর কালিকা-মঙ্গলের কথা সমাপ্ত করিব: "এই ব্যক্তি পাগলের ন্যায় নদীর তীরে বসিয়া কূপ খনন করিয়াছিলেন।"

৩

শি বা য় ন

ভূমিকা॥

শুধু বাঙলাদেশেই নহে, সমগ্র ভারতে—উত্তরে কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে কুমারিকা, পশ্চিমভারত হইতে পূর্বভারতে আসাম পর্যন্ত বিরাট ভূভাগে শিল্পসাহিত্য, ধর্মকর্ম, শীল-সদাচার—জীবনের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে শিবপ্রমথেশের সর্বব্যাপী প্রভাব লক্ষ্য করা যাইবে। বস্তুতঃ বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব—এই ত্রিধারাতেই ভারতের মনঃপ্রবাহ বহিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে শাক্ত ও শৈব ধর্ম কোথাও পৃথকভাবে, কোথাও বা যুগনদ্ধভাবে এদেশে প্রচার লাভ করিয়াছে। কারণ মহাশক্তি গৌরী শ্মশানবাসী প্রমথেশেরই গৃহিণী।

… … … … … …

পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে।

রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥

কিন্তু ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (১০৫০) 'প্রাণরাম চক্রবর্তীর কালিকা-মঙ্গল' প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, এই কয়ছত্র উক্ত ছাপা গ্রন্থের প্রকাশক রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার জুড়িয়া দিয়াছিলেন। ছত্রকয়টির রচনারীতি দেখিয়া তাহাই মনে হয়। উপরন্তু পুঁথিতে 'বসুঋষু বাণচন্দ্র' ইত্যাদি শ্লোকে যখন স্পষ্টই সপ্তদশ শতাব্দীর ইঙ্গিত রহিয়াছে, তখন কবিকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্থাপন করিবার পক্ষে যুক্তি নাই।

ভারত সভ্যতার উৎস সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, বৈদিক যুগের রুদ্র, পৌরাণিক যুগের মহেশ্বর এবং পরবর্তী কালের লোকজীবনে জনপ্রিয় দেবতা শিব—ইঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ভারতের বাহিরেও শিবের অনুরূপ উপাসনাপ্রণালী এবং লিঙ্গোপাসনা একদা জনসমাজে প্রকাশ্যে ও গোপনে অনুষ্ঠিত হইত। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলিয়াছেন, "ঐ বুড়ো শিব ষাঁড়ে চড়ে ভারতবর্ষ থেকে একদিকে সুমাত্রা, বোর্নিও, সেলিবিস, মায় অস্ট্রেলিয়া আমেরিকার কিনারা পর্যন্ত ডমরু বাজিয়ে এককালে বেড়িয়েছেন, আর একদিকে তিব্বত, চীন, জাপান, সাইবেরিয়া পর্যন্ত বুড়ো শিব ষাঁড চরিয়েছেন, এখনও চরাচ্ছেন" ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য')।

ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঋগ্বেদের দেবতা রুদ্র পৌরাণিক যুগে শিবে যাঁহার পরিণতি, তাঁহার ভাবাদর্শ প্রাগ্‌বৈদিক বহির্ভারতেও প্রচলিত ছিল। মিশর, ব্যাবিলন, নীনেভ, গ্রীস-রোমে রুদ্র বা ভয়ানক দেবতার নানা উল্লেখ আছে। মনে হয় আর্যগণ ভারতে প্রবেশ কালে যেসমস্ত দেবসংস্কৃতি সঙ্গে লইয়া আসেন, তন্মধ্যে রুদ্রদেবতার সঙ্গে ভারতের বাহিরের সংস্কৃতির বিশেষ সংযোগ ছিল। বৈদিক রুদ্রদেবতা একাধারে রুদ্র-ভয়ানক এবং শান্ত-শিব। সে যুগে ভীত আর্যেরা তাঁহার ক্রোধ শান্তির জন্য প্রার্থনা করিত, তাঁহার আশীর্বাদ লাভ করিয়া জীবন, গোধন, গ্রামীণ পরিবেশকে সুস্থ রাখিতে সচেষ্ট হইত। পরবর্তী কালে এই রুদ্রই শঙ্কর, ত্র্যম্বক (যজুর্বেদ) এবং মহাদেব (শতপথ ব্রাহ্মণ) নামে অভিহিত হইয়াছেন। বৈদিক সাহিত্যে রুদ্র যেমন ভয়ঙ্কর দেবতা (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ), তেমনি আবার তাঁহার কল্যাণময় শান্তরূপও (অথর্ববেদ) শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিল। ক্রমে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বজন-আরাধ্য দেবতারূপে পূজিত হইলেন।

কেহ কেহ বলেন, বৈদিক রুদ্র ও পৌরাণিক শিব-পরিকল্পনায় আর্যেতর সংস্কৃতির ছাপ পড়িয়াছে। ভস্মভূষিত, নরকপালধারী, শ্মশানবাসী ও প্রমথ-সেবিত মহেশ্বরের সঙ্গে আর্যেতর কল্পনা ও দেববাদের সংযোগ সহজেই অনুমিত হইতে পারে। প্রলয়ঙ্কর মহেশ্বরের গৃহিণী ডাকিনীযোগিনী-সেবিতা ভয়ঙ্করী কালিকা। তাই পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, ভারতীয় শৈবধর্মে

দ্রাবিড়-কোলগোষ্ঠীর ভাবনা-চিন্তার প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক।[৫২] বিশেষতঃ পার্বত্য অঞ্চলের সঙ্গে শিবোপাসনার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে বলিয়া অমরনাথ, পশুপতিনাথ প্রভৃতি শৈব তীর্থ পার্বত্য অঞ্চলেই অবস্থিত। কেহ কেহ মনে করেন যে, আর্যেতর শিবোপাসনা সর্বপ্রথম পার্বত্যজাতির মধ্যেই বিকাশলাভ করিয়াছিল।

রুদ্রের পত্নী বা সহচরী রূপে শ্রৌতসূত্রে ভবানী, শর্বাণী, ঈশানী, ও রুদ্রাণীর উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগ ও সংস্কৃতি পিতৃ-অনুগামী হইলেও কালক্রমে ইহাতেও নারী-প্রাধান্য আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। কাজেই বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে দেবতাদের সঙ্গে দেবীদেরও স্থান হইল। বিশ্বপিতা 'প্রজাপতি' এবং বিশ্বমাতা 'অদিতির' পরিকল্পনা ঋগ্বেদেই লক্ষ্য করা যাইবে। সুতরাং পরবর্তী কালে শিবের সঙ্গে শিবানীর সংযোগ, এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া শিব-সতী-পার্বতীর কাহিনীর সৃষ্টি ও বিকাশের স্বাভাবিক কারণ রহিয়াছে। গৃহ্য সূত্রে দেবী দুর্গাকে মহাকালী ও মহাযোগিনী বলা হইয়াছে। ভবানী-শর্বানী-ঈশানী, মহাকালী, মহাযোগিনী —সকলেই রুদ্রের পত্নী বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন।

কিন্তু পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, আর্য রুদ্রের মতো আর্যেতর সমাজে যে শিবদেবতার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল, লোককল্পনা তাঁহারও জন্য একটি প্রকৃতি বা গৃহিণীর পরিকল্পনা করিয়াছিল। পুরাণে যাঁহাকে শবর-পুলিন্দ-বর্বর জাতি কর্তৃক পূজিতা ("শবরৈর্বর্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা"—হরিবংশ) বলা হইয়াছে, তিনি মূলতঃ আর্যেতর গোষ্ঠীর শিবোপাসকদের পরিকল্পিত। আগম গ্রন্থেও তাঁহাকে শূদ্রদের গ্রামদেবতা ("শূদ্রাণাং গ্রামদেবতাঃ") বলা হইয়াছে। ভূত-ভৈরব-প্রমথ-সেবিত শিব, ডাকিনীযোগিনী পরিবেষ্টিতা কালিকা এবং অনার্য কিরাত-পুলিন্দ-শবর-শূদ্র-সেবিতা দুর্গার পরিকল্পনা বৈদিক রুদ্র-রুদ্রাণীকে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত করিয়া ভারতীয় পুরাণ ও শৈব-শাক্ত তন্ত্র-সাহিত্যে শিবশিবানী-হরপার্বতী প্রভৃতি দেবতন্ত্রের পরিকল্পনা ও উদ্ভাবনায় সাহায্য করিয়াছে। বাঙলাদেশের শিবমঙ্গল বা শিবায়ন সাহিত্যে তাই পৌরাণিক ও লৌকিক—উভয় প্রকার সংস্কৃতির স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

---

৫২ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত *The Cultural History of India* (Vol. 2) গ্রন্থে নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী লিখিত প্রবন্ধ (পৃ. ২১) দ্রষ্টব্য। এবিষয়ে হরিদাস ভট্টাচার্য প্রণীত *The Foundation of Living Faiths* (পৃ. ২২৩) পঠিতব্য।

লিঙ্গোপাসনার সঙ্গে শিবসংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও কৌতূহল-জনক। আদিম যুগে মানুষের নিকট সৃষ্টিরহস্য দুর্জ্ঞেয় ও বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইত। তাই প্রজনন শক্তিকে প্রাচীন মানুষ উপাস্য দেবশক্তি বলিয়া মনে করিত ; তাই কখনও লিঙ্গশরীরের উপাসনা, কখনও-বা যুগনদ্ধ উপাসনা একদা আদিম সমাজে প্রচারলাভ করিয়াছিল। পরবর্তী কালে শিক্ষা ও সভ্যতার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইলেও এই লিঙ্গোপাসনা ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গিয়া ঐতিহ্যবান মানবসমাজেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হইয়াছিল। সুসভ্য হেলেনীয় সমাজে এবং উত্তর-বৈদিক যুগের ভারতীয় আর্যসমাজে শিশ্নোপাসনার দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু শিবের সঙ্গে লিঙ্গোপাসনা, বিশেষতঃ লিঙ্গকে শিবের প্রতীকরূপে সমাজে প্রচার কোন্ সূত্র ধরিয়া হইল, লিঙ্গোপসনা ও শিবোপাসনা কেমন করিয়া এক হইয়া গেল, তাহার স্পষ্ট বিকাশধারার ইতিহাস একটু আচ্ছন্ন হইয়া আছে। সৃষ্টির গূঢ় শক্তি, তথা প্রজনন ও শস্যসংস্কৃতির সঙ্গে লিঙ্গোপাসনার সহজ যোগ আবিষ্কার দুরূহ নহে, কিন্তু শিবসংস্কৃতির সঙ্গে শিশ্নসংস্কৃতির যোগাযোগ প্রত্যক্ষ হইলেও তাহার ক্রমবিকাশের স্তরটি সর্বদা পরিস্ফুট নহে। কিন্তু পৌরাণিক যুগ হইতে বিভিন্ন শৈবসম্প্রদায়ের মধ্যে এবং শিবপুরাণ, শাক্ত পুরাণ ও তন্ত্রে এই লিঙ্গোপাসনা কখনও সূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্ব-রূপে, কখনও-বা শিবের প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ শিবকাহিনী, শৈব মত, শাক্তপুরাণ, শক্তিতন্ত্র ও লিঙ্গোপাসনার সঙ্গে প্রাচীন আর্যেতর সমাজের প্রজননশক্তি উপাসনার যে প্রচ্ছন্ন যোগাযোগ রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।[৫৩]

ভারতীয় সভ্যতা প্রাগ্‌বৈদিক যুগ হইতে বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক ভাবধারার মধ্যে যেভাবে গ্রহণ-বর্জনের দ্বারা অগ্রসর হইয়াছে, আর্য ধারা ও আর্যেতর ধারা মিলিত হইয়াছে, বহু বিচিত্র বিষম-বিদৃশ ব্যাপার ক্রমে মিশ্রিত হইয়াছে, তাহার শ্রেষ্ঠ পরিচয় ভারতীয় শিবসংস্কৃতির মধ্যে পাওয়া যাইবে। কেহ কেহ মনে করেন, শিবসংস্কৃতির মধ্যেই ভারতধর্ম নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

---

৫৩ বিস্তারিত আলোচনার জন্য ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্যের 'বাংলা কাব্যে শিব' ('ভারতশিব' ও 'শিবরূপ' অধ্যায়) দ্রষ্টব্য।

কালিদাস ছিলেন শৈব,
সেই পথের পথিক কবিরা। ('কালের যাত্রা')

শুধু কবিরা নহেন, সমগ্র ভারত সভ্যতাই শৈবতন্ত্রের দিকেই অগ্রসর হইয়াছে। বেদের যিনি রুদ্র, তিনিই পুরাণের শিবপ্রমথেশ, শঙ্কর, মহাদেব। তিনি একাধারে তমোগুণে সংহারক, রজোগুণে অন্নপূর্ণার মহেশ্বর, ধনদা লক্ষ্মী, জ্ঞানদা সরস্বতী, সিদ্ধিদাতা গণপতি ও দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের জনক, দেবসভামণ্ডলীর ভক্তিভাজন, আদিদেব এবং সত্ত্বগুণে ব্রহ্মস্বরূপ। তাই পরম বৈদান্তিক শঙ্করাচার্য শিবোপাসক। ধ্যানস্তিমিত, নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার মতো আত্মস্থ আত্মারাম মহেশ্বরের সঙ্গে ধ্যানী বুদ্ধেরও বিশেষ সাদৃশ্য আছে। অন্নদা যাঁহার গৃহিণী, তিনি অন্নরিক্ত ভিখারী; ষড়ৈশ্বর্যময়ী লক্ষ্মী যাঁহার কন্যা, শ্মশান তাঁহার বিলাসশয্যা; কুবের ভাণ্ডারী হইলেও ভস্মই যাঁহার একমাত্র ভূষণ; যিনি পরমযোগীর ধ্যানের বিষয়, তিনিও স্বয়ং ধ্যাননিমগ্ন; যিনি কামারি, তিনিই আবার উমাসঙ্গে কামরঙ্গের অধীন; যিনি যজ্ঞভাগের আদি দেবতা, তিনিই আবার যজ্ঞভঙ্গকারী কালান্তক। এই বৈপরীত্য, বিষম জীবনচর্যা ও আদর্শ—ইহা মুখ্যতঃ মানবজীবনেরই আদর্শ—ভাবজীবনের প্রতীক। তাই শিল্পে, সংস্কৃতিতে, পুরাণে, লোককল্পনায়—ভারতীয় জীবনধারার প্রতি পর্বে শিবের প্রভাব সুগভীর ও সুচিরস্থায়ী। শিবই বিভিন্ন যুগে ভারত সংস্কৃতি ও লোকজীবনকে ঐক্য দান করিয়াছেন, বিপরীতের মধ্যে সমতা আনিয়াছেন, যতিধর্ম ও গার্হস্থ্যধর্মকে এক সূত্রে গাঁথিয়াছেন, লৌকিক ও অলৌকিককে জীবনবাদী প্রত্যয়ের সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। কোন একটি মত ও বিশ্বাসের দ্বারা যদি সমগ্র ভারতকে চিহ্নিত করা যায়—তবে তাহা এই শৈবধর্ম। হরপার্বতী ভারতের দেবদেবী, 'জগৎপিতরৌ'—উমানাথ এ জাতির মনোধর্ম ও জীবনাদর্শের প্রতীক।

এবার বাঙলাদেশের শিবায়ন-আশ্রিত শিবকাহিনীর স্বরূপ সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। একথা অতি সত্য যে, বাঙলাদেশে খ্রীষ্টীয় অব্দের দিকে পুরাণীকরণের ধারা আরম্ভ হইলে পৌরাণিক দেবদেবীরা বাঙলার মিশ্র সমাজে উত্তরাপথের সংস্কৃতির সঙ্গেই স্বীকৃত হইয়াছিলেন। গুপ্ত যুগ হইতে ইহার সূচনা, শশাঙ্কের শাসন, পালযুগ, সেনপর্ব—এই কয় শত বৎসর ধরিয়াই (খ্রীঃ ৫ম—১২শ শতাব্দী) শিবোপাসনা, লিঙ্গোপাসনা এবং হর-

পার্বতী-সংক্রান্ত বর্ণনা লিপিলেখন ও বাঙালীর রচিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত রচনায় স্থান পাইতে থাকে। পরবর্তী বাংলা কাব্যে কোথাও প্রধানভাবে, কোথাও-বা অপ্রধান দেবতারূপে শিবের আবির্ভাব হইলেও তাঁহার অনেক পূর্বে মূলতঃ উত্তরভারতীয় পৌরাণিক সংস্কৃতির আশ্রয়ে বাঙলাদেশে হর-পার্বতী প্রবেশ করিয়াছিলেন। চণ্ডী ও মনসামঙ্গলে, রামায়ণ প্রভৃতি অনুবাদ-সাহিত্যে এই পৌরাণিক শিব ও পার্বতীর ঘর-গৃহস্থালীর বর্ণনা পাওয়া যাইবে। কিন্তু মধ্যযুগের শিবপ্রধান বাংলা সাহিত্য বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে লৌকিক শিবের জন্য, পৌরাণিক শিবের জন্য ততটা নহে।

চণ্ডী ও মনসামঙ্গলে বর্ণিত শিবের কাহিনী কিয়দংশে শিবপুরাণ হইতে গৃহীত, বাকিটুকু লৌকিক আদর্শে রচিত হইয়াছে। তাই বাংলা সাহিত্যের শিবচরিত্র পরিকল্পনায় বহু স্থলে লৌকিক ভাব-ভাবনা লক্ষ্য করা যাইবে। সমাজের উচ্চ কোটিতে পুরাণের হরপার্বতী শ্রদ্ধা লাভ করিলেও সমাজের যে স্তরে এই শ্রেণীর সাহিত্য রচিত ও গীত হইত, সেই স্তরে পৌরাণিক শিবকে বহুলাংশে লৌকিকীকরণের দ্বারা নব রূপান্তর লাভ করিতে হইয়াছিল।

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, অতি প্রাচীনকালে আর্যেতর সমাজে শিবের অনুরূপ কোন দেবতার প্রভাব ছিল; পরে বৈদিক রুদ্র ও পার্বত্য শিবের সংমিশ্রণের ফলে পৌরাণিক শিবপার্বতী কাহিনীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঙলাদেশে এই পৌরাণিক শিবের অঙ্গে আর একটি লৌকিক ও গ্রামীণ দেবতার ভস্মভূষণ দেখা যাইতেছে। বোধহয় পাল-সেনযুগ হইতেই এই পৌরাণিক ও লৌকিক শিবের সমন্বয় হইতেছিল, এবং বাঙালী সমাজে সেই আদর্শ প্রবেশ করিতেছিল। 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র হরপার্বতী-বিষয়ক শ্লোকগুলি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

শিবায়ন ও মঙ্গলকাব্যে শিবের যে লোকচিত্তরঞ্জক বর্ণনা আছে, তাহা হইতে মনে হয়, এদেশে আর্যাচার ও পৌরাণিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে আর্যেতর জনসমাজে কৃষিদেবতারূপে কোন ক্ষেত্রপাল দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল। এই লৌকিক দেবতাই কাব্যে, ব্রতছড়ায়, গ্রাম্য বৃক্ষমূলে, 'বাবার থানে', গাজন উৎসবে এবং ক্ষেত্রকর্মে এখনও জীবিত আছেন। অস্ট্রিক-অধ্যুষিত কৃষিসভ্যতায় কৃষিদেবতার উদ্ভাবন একটা সাধারণ স্বাভাবিক

সমাজ-ঐতিহ্য। বাঙলাদেশে এরূপ কোন দেবতা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আর্যধর্মবহির্ভূত গৌড়বঙ্গের গ্রামীণ সভ্যতাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। পরে যখন পুরাণীকরণের যুগে উত্তরাপথের হরপার্বতী পুত্রকন্যাদি লইয়া হিমগৃহ ত্যাগ করিয়া আর্দ্রভূমিতে নামিয়া আসিলেন, তখন তাঁহাদিগকে অতি সহজেই এই লৌকিক দেবতার সহিত মিলাইয়া দেওয়া সম্ভব হইল। অবশ্য এ মিলন পুরাণ পুঁথি ঘাঁটিয়া শাস্ত্রের নজির মিলাইয়া করা হয় নাই ; লোক-জীবন ও লোকসংস্কৃতির ধারাবাহিকতার পথ ধরিয়া এইরূপ পরিবর্তন আসিয়াছে। এই লৌকিক দেবতার ধরণধারণ, আচার-আচরণ পৌরাণিক হিন্দুসমাজে একদা নিশ্চয়ই জুগুপ্সার উদ্রেক করিত। ইনি বৃদ্ধ, অতি দরিদ্র, ইঁহার ভার্যা তরুণী, অনেকগুলি সন্তান,—ভিক্ষাই ইঁহার একমাত্র উপ-জীবিকা। আবার মাদক সেবনে তাঁহার নিষ্ঠা অসাধারণ, ততোধিক নিষ্ঠা পরস্ত্রীর প্রতি—কোচবধূদের সঙ্গে রঙ্গভঙ্গে ইঁহার বিশেষ উল্লাস। অপরদিকে ইনি কৃষিদেবতা : সঙ্গী ভীমকে (মতান্তরে ভাগিনা) লইয়া ইনি কৃষিকার্যে ব্যাপৃত হন, বাগ্দিনী যুবতীকে দেখিয়া মত্ত হইয়া ওঠেন। তাহার সঙ্গ কামনা করিয়া হাঁটুজলে নামিয়া মাছ ধরিতেও তাঁহার আপত্তি নাই।

বাঙলাদেশে চণ্ডী ও মনসামঙ্গলে যে শিবের বর্ণনা আছে, তাহাতে পৌরাণিক শিবের কাহিনীর সঙ্গে এই লৌকিক দেবতার কাহিনী ও বৈশিষ্ট্য জড়াইয়া গিয়াছে। শিবের ভিক্ষা, গৌরীর সঙ্গে কলহ, ভিক্ষার্থে শিবের বিদায়, কোচবধূ সাহচর্য—এই অংশগুলি পূর্বতন লৌকিক স্মৃতি জাগাইয়া তোলে। অবশ্য এই লৌকিক প্রভাব পৌরাণিক শিব-সাহিত্যকেও যে যথেষ্ট দূষিত করিয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। শিব-সংহিতা ধরণের সংস্কৃত পুরাণে পুরাণকারগণ শিবের আসঙ্গলিপ্সা বর্ণনার সময় কোনও প্রকার নীতির বল্গা স্বীকার করেন নাই। শিবলিঙ্গের ভক্তিপূর্ণ বর্ণনার সঙ্গে কামক্লিন্ন জুগুপ্সা মিশিয়া গিয়াছে। যে শিব কামারি, রুদ্র ললাটে যাঁহার সর্বখর্বতা দহনকারী বহ্নিজ্বালা, পৌরাণিক শৈব সাহিত্যের অনেক স্থলে সেই শিবের ললাটবহ্নি নিভাইয়া সেখানে লাম্পট্য ও রিরংসার ভস্মতিলক লেপন করা হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের অধঃপতন, তন্ত্রের প্রভাব এবং আর্যেতর লিঙ্গোপাসনার ছায়ায় পড়িয়া শিবপুরাণের শিবচরিত্র মহিমা হারাইয়া কামুক চরিত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। ইহা ভারত সংস্কৃতির এক অবক্ষয়ী যুগের দৃষ্টান্ত।

পুরাণ সাহিত্য, সংস্কৃত আখ্যান ও কথাসাহিত্যের সেই নীতিভ্রষ্ট, কামসর্বস্ব, অসামাজিক মনোভাব শিবচরিত্রকেও বহুস্থলে তামসিক পঙ্কোল্লাসে উদ্দাম করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে শিবচরিত্রের স্থূল ভাবগুলিকে শুধু গ্রামীণ বাঙালীর অশালীন মনোভাব বলিয়া গ্রহণ করা উচিত হইবে না। পবিত্র দেবভাষায় রচিত শৈব ও শাক্ত পুরাণগুলিতে আদিরসের যেরূপ উতরোল বর্ণনা আছে, বাংলা শিবায়নের বর্ণনা তাহার কাছে হার মানিবে।

বাঙলাদেশের শিবকাহিনীতে পূর্বে আমরা যে পৌরাণিক ও লৌকিক ভাবের কথা বলিয়াছি, তাহাতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যাইবে। পৌরাণিক কাহিনীগুলি মূলতঃ বিবিধ শিবপুরাণ, শাক্ত পুরাণ বা অন্যান্য পুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে।‌) মৃগলুব্ধ নামীয় শিবকাহিনীগুলিও অর্বাচীনকালের সংস্কৃত পুরাণ হইতেই কায়া গ্রহণ করিয়াছে। লৌকিক কাহিনীর মধ্যে নাথ-সাহিত্যে গোরক্ষনাথের মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে শিবের কথা বর্ণিত হইয়াছে, অপরগুলি বাংলা শিবায়নে পল্লবিত আকারে গৃহীত হইয়াছে। নাথসাহিত্যে শিবের প্রভাব সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শিবায়নে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও লৌকিক অব্রাহ্মণ্য কাহিনীর সম্পর্ক আলোচনা করিয়া দেখা যাক। এখানে উদাহরণস্বরূপ সপ্তদশ শতাব্দীর রামকৃষ্ণ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর রামেশ্বরের শিবায়ন কাহিনী অনুসৃত হইতেছে।

রামকৃষ্ণের শিবায়নে লৌকিক শিবের কাহিনী অনতিবিস্তৃত, কিন্তু রামেশ্বরের কাব্যের শেষাংশের সবটাই লৌকিক শিবকাহিনীর আদর্শে রচিত। পৌরাণিক আখ্যানের মধ্যে দক্ষযজ্ঞ, গৌরীর জন্ম ও মহাদেবের সঙ্গে বিবাহ, রুক্মিণীহরণ, হরিহরের যুদ্ধ, তারকাসুরের আখ্যান, অন্ধক আখ্যান, পরশুরাম ও বাণরাজার গল্প—যাহার সঙ্গে শিবের সংস্পর্শ আছে, পুরাণের সেই আখ্যানগুলি ইহাতে অনুসৃত হইয়াছে। শিব-চতুর্দশীর ব্রতকথাও রামেশ্বরের শিবায়নে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। 'মৃগলুব্ধ' নামীয় শিবকাহিনীগুলিতে মূলতঃ শিবরাত্রি বা শিবচতুর্দশীর প্রচলিত কাহিনী স্থান পাইয়াছে।

শিবায়নে লৌকিক কাহিনীর মধ্যে হরগৌরীর বিবাহ, শিবের ঘরগৃহস্থালীর বর্ণনা, শিবের সঙ্গে গৌরীর কলহ, চাষের জন্য শিবের কৃষিকার্য গ্রহণ, শিবকে ছলনার জন্য দেবীর বাগ্‌দিনী বেশ ধারণ, পরিশেষে শঙ্খপরিধানের

আখ্যানে লৌকিক শিবকাহিনী সমাপ্ত হইয়াছে। অবশ্য রামেশ্বর ও শঙ্কর কবিচন্দ্রের কাব্যেই অধিকতর লৌকিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রামকৃষ্ণের শিবায়নে হরগৌরীর বিবাহপ্রসঙ্গ ব্যতীত আর কোথাও বড় একটা লৌকিক প্রভাব নাই। ধর্মমঙ্গলকাব্যে, বিশেষতঃ শূন্যপুরাণ-অনিলপুরাণ ধরণের ধর্মপূজাসংক্রান্ত পুঁথিতে শিবের লৌকিক কাহিনীর ঈষৎ ছায়াপাত হইয়াছে। বাঙলাদেশের জনসমাজে শিবের দুইটি কাহিনী বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে—একটি শিবচতুর্দশীসংক্রান্ত কাহিনী, আর একটি হরগৌরীর লৌকিক কাহিনী—অর্থাৎ হরগৌরীর বিবাহ, শিবের কৃষিকার্য, দেবীর বাগ্‌দিনী বেশে মহাদেবকে ছলনা ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ববঙ্গে যে সূর্যের পাঁচালী পাওয়া যায়, তাহাতেও শিবের প্রচ্ছন্ন প্রভাব আছে।

বাঙলাদেশে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে শুধু শিবকে লইয়া পৃথক কোন কাব্য রচিত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। বিদ্যাপতির নামে মিথিলায় যে সমস্ত শিবগীতি পাওয়া গিয়াছে,[৫৪] তাহাতেও লৌকিক প্রভাব প্রচুর আছে। বিদ্যাপতির এই পদগুলি প্রায় বাঙলাদেশের শিবায়নে বর্ণিত লৌকিক শিব-দুর্গার কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়া যায়। বিদ্যাপতি মিথিলায় শৈব বলিয়া পরিচিত; তাঁহার এই শিবগীতিগুলিকে অবাঙালীরা অতিশয় শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। বরং তাঁহারা বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলির প্রতি কিঞ্চিৎ যেন অপ্রসন্ন। এ বিষয়ে আমরা অন্যত্র বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি,[৫৫] এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে পরম স্মার্ত বিদ্যাপতিও যে লৌকিক শিবকাহিনীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার এই পদটি হইতেই বুঝা যাইবে:

বেরি বেরি অরে শিব মোঁয় তোয় বোলোঁ
কিরিষ করিয়া মন লাই
বিনু শরমে হর ভীখ পএ মাঁগিয়
গুণগৌরব দূর জাই॥
নিরধন জন বোলি সবে উপহাসয়
নহি আদর অনুকম্পা।

---

৫৪ সুধীরচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত—বিদ্যাপতির শিবগীতি (ক. বি.)

৫৫ লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (প্রথম খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

তোঁহে শিব আক ধথুর ফুল পাওল
হরি পাওল ফুল চম্পা ॥
খটাঙ্গ কাটি হর হল জে বনারিয়
ত্রিশূল তোড়িয় করু ফার।
বসহা ধুরন্ধর হর লয় জোতিয়
পাটয় সুরসরি ধার ॥
ভণহি বিদ্যাপতি সুনহু মহেসর
ঈ লাগি করল তুঅ সেবা।
এতয় জে বরু সে বরু হোয়ল
ওতয় শরণ জনি দেবা ॥

অনু : ওহে শিব, আমি বারে বারে তোমাকে বলি যে, মন দিয়া কৃষি-কার্য কর। লজ্জাহীন হইয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষা কর, গুণগৌরব সব দূর হইয়া যায়। নির্ধন জন বলিয়া সকলে উপহাস করে, কোথাও আদর অনুকম্পা নাই। শিব, তুমি অর্ক ও ধুতুরা ফুল পাইলে, আর হরি চাঁপা ফুল পাইল। হে হর, তুমি খট্টাঙ্গ কাটিয়া হল বানাও, ত্রিশূল ভাঙিয়া ফাল বানাও। হে হর, ধুরন্ধর বৃষ লইয়া জোত এবং গঙ্গার জল সেচ। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মহেশ্বর, শুন; ইহার জন্যই তোমার সেবা করিয়াছি। ইহকালে তো যেমন ভালমন্দ হইল, কিন্তু পরকালে যেন শরণ দিও।[৫৬]

বিদ্যাপতি এই যে কৃষক শিবের বন্দনা করিয়াছেন, ইনিই বাংলা শিবায়ন কাব্যের নায়ক। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, পূর্বভারতে কৃষিসভ্যতার শেষচিহ্ন এই কৃষক শিব চরিত্রে কথঞ্চিৎ রক্ষিত হইয়াছে। যাহা হউক, এখন সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বাংলা শিবায়ন কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

শঙ্কর কবিচন্দ্র ॥

সপ্তদশ শতাব্দীতে মোট দুইজন শিবায়ন কাব্যের কবি, শঙ্কর কবিচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শঙ্করের কবিপ্রতিভা আরও নানা শাখায় বিস্তার লাভ করিয়াছে। ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, শীতলা-মঙ্গল প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়া শঙ্কর বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন।

---

৫৬ সুধীরচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত বিদ্যাপতির শিবগীত

এ বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে কবি কৃষ্ণরামের কিছু সাদৃশ্য আছে। শঙ্করের ভাগবতামৃত (ভাগবতের ভাবানুবাদ) এখনও বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত আছে।

এই কবি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে বিষ্ণুপুরের এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নানা কাব্যে প্রদত্ত ভণিতা হইতে কবির মোটা-মুটি পরিচয় পাওয়া যায়।[৫৭] ১৬৮০ খ্রী: অব্দের দিকে তাঁহার শিবায়ন রচিত হয়। তাঁহার অন্যান্য কাব্যেও রচনাকাল উদ্ধৃত হইয়াছে। বিষ্ণুপুর-রাজ গোপাল সিংহের (১৭১৮-৪৮) সভাকবি শঙ্কর ভাগবতের ভাবানুবাদ, রামায়ণপাঁচালী, সংক্ষিপ্ত মহাভারত পাঁচালী প্রভৃতি রচনা করিয়া কিছু খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

শঙ্করের শিবায়ন বা শিবমঙ্গলের পুরা পুঁথি পাওয়া যায় নাই। আমরা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের পুঁথি বিভাগে রক্ষিত শঙ্করের 'মর্চ্ছধরা পালা' শীর্ষক শিবায়নের একটি জনপ্রিয় পালা দেখিয়াছি (পুঁথি সংখ্যা-৪১২)। মাখনলাল মুখোপাধ্যায় শঙ্করের 'ভাগবতামৃত'-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যে (পৃ. ||.) 'শঙ্খপরা' শীর্ষক শিবায়নের আর একটি পালার উল্লেখ করিয়াছেন। কবির পুরা শিবায়ন কাব্য পাওয়া যায় নাই বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার উপায় নাই। তবে সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত 'মর্চ্ছধরা পালা' হইতে মনে হইতেছে, কবি এ কাব্যে লৌকিক আদর্শের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে রামেশ্বরও পূর্বগামীর আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন। শঙ্করের 'মর্চ্ছধরা' পালাটি রামেশ্বরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। 'ভাগবতামৃতে'র সম্পাদক মাখনলাল মুখোপাধ্যায়ের মতে 'শঙ্খপরা' পালাটিও রামেশ্বরের কাব্যে গৃহীত হইয়াছিল। কেবল শঙ্করের সমসাময়িক কবি রামকৃষ্ণের শিবায়নে লৌকিক ভাবের বিশেষ কোন প্রভাব নাই। আমাদের মনে হয়, শঙ্কর শিবায়নে পৌরাণিক আদর্শ অনুসরণ করিলেও তাঁহার লৌকিক লীলাকাহিনীগুলি অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছিল,

৫৭ শঙ্করের 'মর্চ্ছধরা পালা' নামক শিবায়নের এক পালার পুঁথিতে শ্রীকবিকঙ্কণ, শ্রীকবিশঙ্কর, সুকবি শঙ্কর, দ্বিজ কবিচন্দ্র প্রভৃতি ভণিতা পাওয়া যায়। কবি কোন কোন ভণিতায় শুধু কবিচন্দ্র ব্যবহার করিয়াছেন। লিপিকর প্রমাদে তাহা হইয়াছে কবিকঙ্কণ। (সাহিত্য পরিষদ পুঁথি—৪১২। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৬১)

এবং তাঁহার পুরা কাব্য পাওয়া না গেলেও লৌকিক পালা দুইটি রক্ষা পাইয়াছে।

'মর্চ্ছধরা' (মৎস্তধরা) পালাটি শিবায়নের লোকপ্রচলিত কাহিনীর প্রথম লিখিত রূপ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। লোকজীবনে শিবের এইরূপ ধূলি-ধূসর ও কামরঙ্গমুখর গল্পকথা প্রচলিত ছিল। শিব ভাগিনা ভীমকে সঙ্গে লইয়া কৈলাস ত্যাগ করিয়া গেলেন চাষবাস করিবার জন্য। কারণ গৌরী নিষ্কর্মা ভিক্ষোপজীবী বৃদ্ধ স্বামীকে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়াছিলেন। এদিকে দেবী রাত্রিতে মহাদেবকে স্বপ্ন দেখিয়া, উতলা হইলেন, পদ্মার পরামর্শে মৎস্য ধরিবার ছলে বাগ্‌দিনী বেশে শিবের ক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নানা কৌশলে ছলাকলায় ভোলামহেশ্বরকে ভুলাইয়া কৈলাসে লইয়া আসিলেন। আত্মবিস্মৃত শিব বাগ্‌দিনী-বেশিনী পার্বতীকে দেখিয়া কিরূপ মুগ্ধ হইলেন তাহার একটু নমুনা উদ্ধৃত হইতেছে :

সাক্ষাতে হইলা মাতা বাগদিনি বেশ।
সই সই বলি প্রভু হাসে ব্যোমকেশ ॥
বিরলে শিবের সঙ্গে রক্ষিলেন নিশা
দেখিতে দেখিতে মূর্তি হইল সুবেশা ॥
শ্রুতিমূলে পিঠে দোলে দুই কানে সোনা।
কপালে সিন্দূরবিন্দু নাকে নাকচনা ॥
বাগদিনি বেশ করি উভ করি খোঁপা।
ফুলমালা তাতে শোভে স্বর্ণের ঝাঁপা ॥
কাক্ষেতে চুনসি জাল ইসাদের কড়ি।
পরিপাটি কান্ধে সাজে মছের চুপড়ি ॥
ঠমক করি দাণ্ডাইল শিব পড়ে ভোলে।
সই সই বলি প্রভু করিলেন কোলে ॥ (সা. প. পুঁথি-৪১২)

এ বর্ণনা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন ; বাগ্‌দিনী বেশিনী দেবীর বর্ণনা বাস্তব চিত্রধর্মে উজ্জ্বল হইয়াছে। কবি শঙ্কর ভাগবত, রামায়ণাদিতে যেরূপ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, এই পালাটিতে তাহার বিশেষ পরিচয় নাই। যে লোকজীবনের দৃষ্টি হইতে তিনি কাব্যটির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, যাহাতে কৃষাণ শিব ও বাগ্‌দিনী শিবানীর অতিপরিচিত বাস্তবচিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, আমাদের কবিই তাহার আদি প্রবক্তা কিনা বুঝা যাইতেছে না। তবে তাঁহার ঈষৎ পরবর্তী কবি রামকৃষ্ণ শিবায়নে শিবের লৌকিক আদর্শ অনুসরণ

করেন নাই, এবং পরবর্তী শতাব্দীর রামেশ্বর শঙ্করের এই আদর্শই বিস্তারিত আকারে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন।[৫৮] ইহাতে মনে হইতে পারে যে, এই ধরণের কৃষাণ ও জালিক শিবের প্রথম পূর্ণাঙ্গ চরিত্রাঙ্কনের কৃতিত্ব শঙ্কর কবিচন্দ্রের প্রাপ্য।

রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র ॥

সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের সম্বন্ধে বাঙলা-দেশের পাঠকসমাজ বিশেষ কৌতূহলী নহেন। তাঁহার কাব্যের মাত্র দুইখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে একখানি আবার খণ্ডিত এবং অতিশয় অর্বাচীন কালে লিপিকৃত। অথচ কবিত্বশক্তি, পাণ্ডিত্য, পুরাণজ্ঞান, ষড়্‌দর্শন-তন্ত্রে বিশেষ অধিকার ইত্যাদি গুণপণা বিচার করিলে রামকৃষ্ণকে শুধু শিবায়ন কাব্যের নহে, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেরই একজন উল্লেখযোগ্য রচনাকার বলিতে হইবে। বোধ হয় পরবর্তী কালের জনপ্রিয় কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নের প্রভাব ও প্রচারের ফলে এই কাব্য জনবল্লভতার গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। আরও একটা কারণ, রামেশ্বর অনেকটা জনরুচির দিকে চাহিয়া লোকচিত্তরঞ্জনের অভিপ্রায়ে ঈষৎ লঘু সুরে শিবায়ন রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। অপর দিকে রামকৃষ্ণ নানা পুরাণ-উপপুরাণ, সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য, বিশেষতঃ কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' অবলম্বনে সংযত ভাষায় সংহত আকারে শিবমহিমাবিষয়ক পুরাণ-শ্রেণীর সুদীর্ঘ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, যাহাতে কাহিনীর সঙ্গে নানা গূঢ় তত্ত্বকথা ও পৌরাণিক তথ্য অবিরোধে স্থান পাইয়াছে। সর্বোপরি রামকৃষ্ণের শিবায়নে জনরুচি নন্দনের অনুকূল লোককান্ত শিবের ধূল্যবলুণ্ঠিত রঙ্গরসের গালগল্প নাই বলিলেই চলে। তাঁহার রচনাভঙ্গীও তরল আবেগবর্জিত: ইহাতে লঘু সুরের চাপল্য নাই। বাক্‌রীতিতে ক্লাসিক সংযম পাঠকের দৃষ্টি

৫৮ সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত রামকৃষ্ণের শিবায়নের ভূমিকায় (পৃ. ৵৹) সম্পাদকদ্বয় বলিয়াছেন যে, শঙ্করের মৎস্যধরা পালা ও শঙ্খপরা পালা দুইটির ধারা রামকৃষ্ণ অনুসরণ করেন নাই। বোধহয় এই দুই পালা কবি শঙ্কর লৌকিক আদর্শ অনুসারে বাঙলাদেশে উদ্ভাবন করিয়া থাকিবেন, অথবা তিনি ইহার রচনাকার হইলেও লোকসমাজে এরূপ গালগল্প তাঁহার পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল।

এড়াইবে না। এই ঘনপিনদ্ধ বাকরীতি পাঠের সামগ্রী—বিদগ্ধ পণ্ডিত পাঠকেই ইহার মর্যাদা বুঝিবেন। কিন্তু শিবায়ন প্রধানতঃ গীত হইত, তাহার শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত থাকিত অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণ। রামকৃষ্ণের সংযত, নিয়মানুগ ভাষা গানের অনুকূল নহে। তাই শিবায়ন কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইয়াও তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দীর্ঘদিন বিস্মৃতির নির্বাসন যাপন করিয়াছেন। সম্প্রতি কবির বংশধর শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল রায়ের উদ্যোগে এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের আনুকূল্যে এই বিশিষ্ট শিব-কাহিনীবিষয়ক কাব্য প্রকাশিত হইবার ফলে প্রাচীন সাহিত্যামোদী পাঠক-পাঠিকা কবি রামকৃষ্ণের কবিপ্রতিভা যাচাই করিয়া দেখিবার অবকাশ পাইবেন।

এপর্যন্ত রামকৃষ্ণের শিবায়নের মোট দুইখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। প্রথমখানি ১৩০৬ সনের পূর্বে বিশ্বকোষ কার্যালয়ে নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণবের হেফাজতে ছিল। ঐ ১৩০৬ সালেরই সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ ও মৃণালকান্তি ঘোষ এই কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছিলেন। এখন এই খণ্ডিত পুঁথিটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় (পুঁ. সং. ২৪৫৯) রক্ষিত আছে। পুঁথিটির লিপিকাল ১০৯১ সাল ১১ শ্রাবণ (১৬৮৪ খ্রীঃ অঃ)। কেহ কেহ এই তারিখের সততায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।[৫৯] ১৩৪৮ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল রায় উক্ত কাব্যের অধিকতর প্রামাণিক, ও পূর্ণাঙ্গ পুঁথির পরিচয় দিয়াছেন। রায় মহাশয় কবি রামকৃষ্ণের বংশধর। তাঁহার যত্নে এই কাব্যের প্রামাণিক সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে। এই পুঁথিটি ১৩৪৮ শকাব্দে (১৭২৬ খ্রীঃ অঃ) অনুলিখিত হইয়াছিল। এই পুঁথির পুষ্পিকায় সবিস্তারে সন-তারিখ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। পুষ্পিকার প্রারম্ভটি এইরূপ—"শ্রীকবিচন্দ্র বিরচিতা শিবসঙ্গীত পুস্তক সমাপ্তা"। ইহাতে দেখা যাইতেছে, রামকৃষ্ণের উপাধি কবিচন্দ্র। পুঁথির লেখক পুষ্পিকায় কবির উপাধিটি মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। সে সময়ে কবি পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের জন্য উপাধির দ্বারা অধিকতর পরিচিত

---

৫৯ ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় সাহিত্য পরিষদ হইতে রামকৃষ্ণের শিবায়ন প্রকাশিত হইয়াছে। ভূমিকার পৃ. ।৶০ দ্রষ্টব্য।

হইয়াছিলেন।[৬০] আরও একটা উল্লেখযোগ্য সংবাদ—কাব্যটিকে লিপিকার 'শিবসঙ্গীত' বলিয়াছেন। অবশ্য কবি এক স্থলে এই কাব্যকে 'শিবমঙ্গল' বলিয়াছেন,[৬১] কোথাও-বা 'শিবায়ন'ও[৬২] বলিয়াছেন। কাব্যটির বিশিষ্ট সাহিত্যগুণ সত্ত্বেও তৃতীয় কোন পুঁথি না পাইবার কারণ—"সম্ভবতঃ দ্বিজ কবিচন্দ্র ও রামেশ্বরের গ্রন্থ সুপ্রচারিত হওয়ার ফলে খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে রামকৃষ্ণের গ্রন্থ বিরলপ্রচার হয়। বর্ধমান রাজের জবরদস্তি, বর্গীর হাঙ্গামা, কবির বংশাবনতি প্রভৃতি অন্যকারণও বিদ্যমান ছিল।"[৬৩] সম্পাদকের শেষ মন্তব্যটি সম্বন্ধে সংশয়ের কারণ থাকিলেও রামেশ্বরের প্রভাবে রামকৃষ্ণের খ্যাতি যে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রামকৃষ্ণের পূর্বপুরুষের বাস হাওড়া জেলার আমতার নিকট দামোদরের তীরে অবস্থিত রসপুর গ্রাম। তাঁহারা দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ বংশীয়, কৌলিক উপাধি দেব, পরে তাঁহারা 'রায়' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহের নাম যশশ্চন্দ্র রায়, মাতামহের নাম—সূর্য মিত্র, পিতা কৃষ্ণরায়, মাতা রাধাদাসী,—এই সমস্ত তথ্য তাঁহার কাব্যের আরম্ভ ভাগেই পাওয়া যাইবে। কবির পিতা নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, পুত্রও পৈতৃক অধিকার স্বরূপ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই কাব্য রচনা করিবার পূর্বেই তিনি সমাজে 'কবিচন্দ্র' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। বোধহয় পরিণত যৌবনে এ কাব্য রচিত হইয়াছিল—যদিও রচনার মধ্যে পরিপক্ব প্রবীণতার ছাপ বিশেষ ফুটিয়া উঠিয়াছে; বরং যৌবনসুলভ আবেগবাহুল্য বা আদিরসের উচ্ছলতা ইহাতে সংযত হইয়াছে। এই ধরণের কাব্যে যেরূপ আদিরসের বাহুল্য এবং রুচির শিথিলতা স্বাভাবিক, রামকৃষ্ণের শিবায়নে তাহার একান্ত অনুপস্থিতির জন্য মনে হয়, কবি যখনই ইহা রচনা করিয়া থাকুন, ইহার ভাষাভঙ্গিমার মধ্যে একটি পরিশীলিত ও মার্জিত প্রবীণ বুদ্ধির

---

৬০ কবিও কোন কোন স্থলে শুধু উপাধিটি ব্যবহার করিয়াছেন, "কবিচন্দ্র ভণে শিব হইল সাক্ষাৎ।" (মুদ্রিত গ্রন্থ, পৃ. ১২)

৬১ "রামকৃষ্ণ দাস গান শিবের মঙ্গল"—মুদ্রিত গ্রন্থ, পৃ ৮

৬২ "রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন"—ঐ পৃ. ১০

৬৩ মুদ্রিত গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ. ৶০

স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কবি তরুণ বয়সেই পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন, আর পরিমিত কবিত্ব-শক্তির সাহায্যে সেই বিদ্যাকে যথাযথ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। জমিদারের সভাপণ্ডিতের নিকটেও কবি অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কবি নানা পুরাণ, তন্ত্র ও দর্শন পাঠ করিয়া সু-অভিজ্ঞ হইলেও সর্বদা বিনয়ে নম্র হইয়া থাকিতেন। ব্রাহ্মণসমাজ পাছে কায়স্থের শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া কাব্যের প্রতি বিরূপ হন, এইজন্য তিনি পুনঃ পুনঃ বিপ্রদের নিকট সবিনয়ে পরিহার প্রার্থনা করিয়াছেন :

দ্বিজগণে রামকৃষ্ণ করে নিবেদন।
শূদ্রে . রচনা বলি না করিবে ভ্রম ॥

শিব আজ্ঞায় তিনি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ("শিবের পরম আজ্ঞা মস্তকে বন্দিয়া"), কেহ যেন ইহাকে শূদ্র রচিত বলিয়া ঘৃণা না করেন। কারণ কোন ভগবদ্‌ভক্ত শূদ্র হইতে পারেন না ("ন শূদ্র ভগবদ্ভক্ত কহেন পুরাণে")।

কবির বংশধর শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল রায় তাঁহাদের বাড়ীতে রক্ষিত দলিল-পত্রাদির দ্বারা অনুমান করিয়াছেন যে, ১৬১৮ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে কবির জন্ম হয়। ইহা সত্য হইলে কাব্যটি ১৬৫০ খ্রীঃ অব্দের দিকে রচিত হইতে পারে। কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থের সম্পাদকগণ নানা তথ্য হইতে অনুমান করিয়াছেন যে, ১৫৯০ খ্রীঃ অব্দের দিকে কবির জন্ম হইয়া থাকিবে। কবির বৃদ্ধ বয়সে একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম একদা রসপুরে হামলা করিয়া বলপূর্বক কবির গৃহদেবতাকে কাড়িয়া লইয়া যান। এই ব্যাপারে কবি নাকি অতিশয় দুঃখ পাইয়া লজ্জা, অপমান ও শোকে অচিরে প্রাণত্যাগ করেন। দলিলে এই ঘটনার উল্লেখ আছে, এবং তাঁহাদের বংশপরম্পরাক্রমে ইহা চলিয়া আসিতেছে। এই প্রমাণ হইতে সম্পাদকদ্বয় মনে করেন যে, ১৬৮৪ খ্রীঃ অব্দের দিকে কবি দেহত্যাগ করেন।

রামকৃষ্ণ শিবমঙ্গল কাব্য রচনাকালে কাশীখণ্ড, হরিবংশ, কালিকাপুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, মহাভারতের শান্তিপর্ব, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি হইতে আখ্যান তত্ত্বকথা ও নীতিদর্শন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত পুরাণ ও কাব্যাদিতে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল তাহা স্বীকার্য।

এখানে সংক্ষেপে শিবমঙ্গলের কাহিনী-সূচী আলোচনা করা যাইতেছে।

মোট ২৬ পালায় বিভক্ত শিববিষয়ক এই বিরাট কাব্য মঙ্গলকাব্য অপেক্ষা সংস্কৃত পুরাণ শ্রেণীর রচনার অধিকতর নিকটবর্তী। কবি যে সংস্কৃত পুরাণে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন তাহা এই কাব্যের পালানির্বাচন ও অধ্যায়বিভাগ হইতেই বুঝা যাইবে।। প্রথম তিনটি পালায় মূলকাহিনী অপেক্ষা সৃষ্টিতত্ত্ব, কালবিভাগ ও তীর্থমাহাত্ম্য বিস্তারিত আকারে বর্ণিত হইয়াছে। ৪র্থ-৫ম পালায় সতীর দেহত্যাগ ও দক্ষযজ্ঞ বিনাশ, ৬ষ্ঠ পালায় তারকাসুর বধ, ৭ম-৮ম পালায় কুমারসম্ভব অনুসরণে মহাদেবের তপোভঙ্গ, মদনভস্ম, পার্বতীর তপস্যা এবং মহাদেবের গৌরীকে পত্নীরূপে গ্রহণের ইচ্ছা বর্ণিত হইয়াছে। ৯ম-১৫শ পালায় হরগৌরীর বিবাহ, ১৬শ পালায় মনসার উপাখ্যান (পুরাণানুযায়ী), ১৭শ পালায় সমুদ্রমন্থন, ১৮শ পালায় বলিরাজার কাহিনী, ১৯শ-২০শ পালায় সগর রাজার উপাখ্যান ও গঙ্গা আনয়ন, ২১শ পালায় ত্রিপুরাসুর ও তারকাসুরের কাহিনী, ২২শ পালায় শিবদুর্গার কোন্দল, ২৩শ পালায় অন্ধকের গল্প, ২৪শ পালায় অন্ধকবধ, ২৫শ পালায় পরশুরাম ও রাবণের গল্প এবং ২৬শ পালায় বাণরাজের কন্যা ঊষা ও কৃষ্ণনন্দন অনিরুদ্ধের প্রণয়, ফলে বাণের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ, পরিশেষে হরি-হরের সখ্য এবং ঊষা-অনিরুদ্ধের মিলনে কাব্য সমাপ্ত হইয়াছে।

এই বিশালকায় কাব্যের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলে ইহাতে তিনটি প্রায় পৃথক ধারা লক্ষ্য করা যাইবে। একটি—পুরাণের অনুরূপ নানা তথ্য, তত্ত্ব, সৃষ্টিরহস্য, মন্বন্তর প্রভৃতির বর্ণনা, অপরটি—শিবকাহিনী ও তাহার আনুষঙ্গিক নানা পৌরাণিক উপকাহিনী এবং লৌকিক শিবায়ন শ্রেণীর 'রঙ্গধামালি'। বলা বাহুল্য শেষোক্ত অংশটির পরিমাণ স্বল্পতম। প্রথমাংশে কবি বিভিন্ন পুরাণ অবলম্বনে দেবদেবীর মূর্তি বর্ণনা, বন্দনা, সৃষ্টি ব্যাখ্যা, জীবতত্ত্ব বিশ্লেষণ প্রভৃতির বর্ণনা দিয়াছেন—ইহাতে কবির পুরাণ-সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সূচিত হইতেছে। শৈব-শাক্ত পুরাণ ছাড়িয়া দিলেও বৈষ্ণব পুরাণেও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, তাঁহার মত ও আদর্শ অনেকটা বৈষ্ণবধর্মের অনুকূল ছিল। হরি ও হরের মিলন-ঐক্য সাধন তাঁহার গ্রন্থরচনার অন্যতম উদ্দেশ্য :

শুন প্রভু চন্দ্রচূড় তোমারে না চিনে মূঢ়
ভেদ করে শঙ্কর কেশবে।

কাব্যারম্ভে কবি এই কথা বলিয়াছেন। কাব্যসমাপ্তির মুখেও ইহাই প্রচার করিয়াছেন—"হরিহর দুঁহে এক শরীর অভেদ"। আবার ব্রহ্মবাদীর মতো তিনি জানেন :

এক ব্রহ্ম সনাতন নিরাকার নিরঞ্জন
নিত্য নির্গুণ নির্বিকার।

তাই তিনি দেববন্দনার সময় মীননাথ-গোরক্ষনাথের যেমন বন্দনা করিয়াছেন, তেমনি আবার চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দকেও ভক্তিভরে বন্দনা কবিয়াছেন :

ধরাতলে যাহারে করবে ধন্য ধন্য।
নবদ্বীপে বন্দিলাঙ ঠাকুর চৈতন্য॥
খড়দহে বন্দিলাঙ প্রভু নিত্যানন্দ।
যাহা হইতে জগতে ছিণ্ডিল কর্মবন্ধ॥

শিবের বন্দনা করিতে গিয়া তিনি শ্রুতিমধুর ছন্দে কৃষ্ণকেও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন :

নীপ সমীপ নব নীরদ
তড়িতলতা তথি সঙ্গ।
রাধা অঙ্গে অঙ্গ অবলম্বন
পীতাম্বর ত্রিভঙ্গ।
বন্দহুঁ বৃন্দাবনে ব্রজবেশ।
নয়ন ইন্দীবর মুখশশী সুন্দর
চন্দ্রক চুম্বিত কেশ॥

কবি মূলকাহিনীর সঙ্গে অনেক উপকাহিনী জুড়িয়া দিয়া মঙ্গলকাব্যকে প্রায় পুরাণের পর্যায়ে তুলিয়া ধরিয়াছেন। শিব ও কৃষ্ণ সম্পর্কে অনেকগুলি উপকাহিনী ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। লক্ষণীয় যে, শিব ও দুর্গার বিবাহিত জীবনসংক্রান্ত কাহিনী ১২শ-১৫শ পালায় বর্ণিত হইয়াছে। শুধু দুর্গার কোন্দল (১২শ পালা) ছাপা গ্রন্থের মোট দশটি পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করিয়াছে। উপকাহিনীগুলিব মূল বিভিন্ন পুরাণে নিহিত—উপস্থাপনে কবির বিশেষ কৃতিত্ব নাই, মৌলিক শক্তি দেখাইবারও তিনি বিশেষ অবকাশ পান নাই, প্রয়োজনও বোধ করেন নাই। তবে দক্ষযজ্ঞনাশ, শিবের ধ্যানভঙ্গ, হরপার্বতীর বিবাহ এবং শিবদুর্গার কোন্দল বর্ণনায় তাঁহার মুন্সিয়ানা স্বীকার করিতে হইবে। মদনভস্মের অংশটুকু কুমারসম্ভবের অনুগামী হইলেও রচনাশক্তিতে নিকৃষ্ট নহে। মদনভস্মের পর পতিশোকাতুরা রতির বর্ণনা :

অনাথ করিয়া মোরে যাও প্রভু কোথাকারে
আর না দেখিব চান্দমুখ।
কোথায় সহায় মধু কারে দিয়া যাহ বধু
ইন্দ্র মোরে দিল এত দুখ ॥
প্রাণনাথ, সংহতি করিয়া লও দাসী।
কি হইল হায় হায় পুড়িলে পতঙ্গ প্রায়
কপোতপাণ্ডুর ভস্মরাশি ॥

ইহার তুলনায় ভারতচন্দ্রের রতিবিলাপ

পতিশোকে রতি কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে
হায় হায় গোঁসাই গোঁসাই।

অত্যন্ত কৃত্রিম বলিয়া বোধ হইবে।

পুরাণ-প্রধান কাহিনী ও উপকাহিনী আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সাধারণতঃ মঙ্গলকাব্য ও শিবকাহিনীগুলিতে যেমন একটা অবিচ্ছিন্ন গল্পধারা অনুসৃত হয় ইহার মূল আখ্যানটি সেরূপ সরল রেখায় অগ্রসর হয় নাই। শিবের পৌরাণিক কাহিনী বলিতে বলিতে কবি গল্পকে থামাইয়া দিয়া নানা প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক[৬৪] তত্ত্বকথা ব্যাখ্যায় অগ্রসর হইয়াছেন। অনেক উপকাহিনীর সঙ্গে মূল গল্পের বিশেষ যোগ নাই। তাই আমরা রামকৃষ্ণের শিবায়নকে পূর্বেই পুরাণ ধরণের রচনা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, পুরাণের মতো ইহাতে মূল গল্পবহির্ভূত অনেক প্রসঙ্গরহিত গল্প, তত্ত্বাদর্শ, তথ্যবিবৃতি স্থান পাইয়াছে। তাহা হইলেও কবি শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব পুরাণের আদর্শটি যে শিবমাহাত্ম্য বিষয়ক আখ্যানকাব্যে ভালই প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত লৌকিক কাহিনী-গুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমেই আমাদের অবহিত হইতে হইবে যে, রামকৃষ্ণের শিবায়ন ঠিক প্রচলিত ধারার শিবায়ন কাব্য নহে, ইহাতে লৌকিক শিবলীলার বর্ণনা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নহে। শঙ্কর কবিচন্দ্রের শিবায়নের যতটুকু উদ্ধার করা গিয়াছে, এবং রামেশ্বরের শিবায়ন হইতে যাহা মনে হইতেছে, তদনুসারে একথা বলা চলিতে পারে যে, শিবায়নের কবি মাত্রেরই

৬৪ পার্বতীর পুষ্পবনে যাত্রা, পরীক্ষার ব্যাপার প্রভৃতির সঙ্গে তন্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলের বর্ণনার কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে।

লৌকিক শিবকাহিনীর প্রতি অধিকতর আকর্ষণ ছিল। রামেশ্বর পুরাণের নানা কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মূল রচনার প্রায় অর্ধেকটাই কৃষাণ শিব ও বাগ্‌দিনী পার্বতীর গ্রাম্য গল্পে পরিপূর্ণ, ভারতচন্দ্রের দূষিত আদর্শের পূর্বাভাস রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্তনে আবিষ্কার করা দুরূহ নহে। সেদিক দিয়া কবি রামকৃষ্ণ একটা উচ্চতর শিল্পাদর্শের নীতি অনুসরণ করিয়াছেন, ফেনিল আদিরসের অবকাশ সত্ত্বেও তিনি কোথাও সংযমের বন্ধন ছিন্ন করেন নাই। "কবি রামকৃষ্ণের সাধনাভাবে কিংবা রূপায়নে, কোন দিক দিয়াই কোন প্রকার গ্রাম্যতা স্পর্শ করিতে পারে নাই। বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে মঙ্গলকাব্য রচনার ক্ষেত্রে সকল দিক দিয়া এই প্রকার গ্রাম্যতা হইতে মুক্তির নিদর্শন আর কোথাও পাওয়া যায় না।"[৬৫] এই মন্তব্য অতিশয় যুক্তিসঙ্গত। ইহার কারণ ততটা কবির "আত্মকেন্দ্রিক জ্ঞানসাধনা"[৬৬] নহে, যতটা কবির পৌরাণিক সাহিত্যপ্রীতি। যাহা হউক প্রথামতে তাঁহাকেও যৎসামান্য লৌকিক আদর্শ অনুসরণ করিতে হইয়াছে।

কবি মোট পাঁচটি পালায় শিবকাহিনীর লৌকিক আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। ৯ম পালা (বিবাহেব পূর্বে পুষ্পোদ্যানে শিবগৌরীর সাক্ষাৎকার) ১২শ পালা (শিববিবাহে বিড়ম্বনা ও মেনকার খেদ), ১৩শ-১৪শ পালা (শিবদুর্গার দাম্পত্যজীবনের আরম্ভ), ১৬শ পালা (পুরাণানুযায়ী মনসার উপাখ্যান), ২২শ পালা (দুর্গার কোন্দল)—মোট এই কয়টি পালায় হরপার্বতীর লৌকিক কাহিনী অনসৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৯ম পালার বর্ণনার অনুরূপ ঘটনা তন্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে আছে। ১২শ পালায় হরপার্বতীর বিবাহে নারদের মহাদেবকে বরবেশে সাজাইতে গিয়া রঙ্গরহস্য, মেনকার জামাই দেখিয়া ক্ষোভ প্রকাশ ইত্যাদি বর্ণনায় কবি লৌকিকভাবের বশীভূত হইয়া কিঞ্চিৎ লঘু রস পরিবেশন করিয়াছেন। নারদের কারসাজিতে মেনকা জামাতা বরণ করিতে গেলে বরণডালায় ঈশানমূলের গন্ধ পাইয়া মহাদেবের বাঘছালের বন্ধনীরূপ সর্পগুলি পলাইয়া গেল এবং মহাদেবের বাঘাম্বর খসিয়া পড়িল :

৬৫ রামকৃষ্ণের শিবায়নের ভূমিকায় (পৃ ৸৶৹) সম্পাদকীয় মন্তব্য।

৬৬ ঐ, পৃ. ৸৶৹

হর হইলা দিগম্বর . মুনি বলে ধর ধর
মেনকা পালায় পাছে রড়ে
আইলা তথা তীম নাথ বহে ঘুরনিয়া বাত
বসন উড়িয়া লোলে ঝড়ে ॥
লাজ পাইয়া যত নারী প্রবেশিল অন্তঃপুরী
নাকে হাতে দাঁতে জিভ চাপে।
কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ বা গিরিরে নিন্দে
মেনকা মরিতে চাহে তাপে ॥

এয়োরাও বরের নিন্দা করিতে লাগিল :

আই আই আই আই কি লাজ কি লাজ গো
গৌরীর বর নাকি এইটা ॥
বরের ঘর নাঞি দ্বার নাঞি আঁত নাঞি দাঁত নাঞি
আব নাঞি ভাব নাঞি দাব।
পরিছে বাঘ ছাল গলায় হাড়ের মাল
বিভূতি মাখ্যায়ে গায় ॥

অবশ্য পরে মহাদেব ভুবনমোহন রূপ ধারণ করিলে সব গোলযোগ ফুরাইল।

মনসার আখ্যানে চণ্ডী, গঙ্গা, মনসার বাদানুবাদ প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ লঘু সুরের আমদানি করা হইলেও কবি ইহাতে পুরাণের মনসা-জরৎকারু ঋষির কাহিনী অনুসরণ করিয়াছেন—বাঙলাদেশের মনসামঙ্গল কাব্যের ধারা নহে। কিন্তু লৌকিক ভাবের বিশেষ প্রভাব আছে হরপার্বতীর দৈনন্দিন জীবন বর্ণনায়। তাঁহাদের দারিদ্র্যের সংসার, ক্ষুধার্ত কার্তিক-গণেশের অনুযোগ, পরিশেষে হরপার্বতীর তীব্র কলহ (২২শ পালা)—এই পালায় কবি খাঁটি শিবায়নের ঢঙে বর্ণনা করিয়াছেন। পার্বতী মহাদেবকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিয়া বলিলেন, তোমার পাশে নিদ্রা যাওয়া একান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। একে জটায় গঙ্গার অনুক্ষণ কলধ্বনি, তাহার উপর আবার সাপের ফোঁস ফোঁস শব্দ, শয্যায় সাপের কিলিবিলি :

এমত সুখের শয্যা ইথে পতি পরিচর্যা
বন্দি করে নারী তাবে বলি।

তাই তিনি মর্মান্তিক দুঃখ জানাইয়া বলিয়াছেন :

ভোলানাথ, আমি যেই ভেঁজি সে সম্বরি।
অঙ্গে সহে হেন তাপ স্বামীরে বলিয়া বাপ
পালাইত হৈয়া দিগম্বরী ॥

পতিনিন্দায় দেবী কোচিনীপ্রসঙ্গও উত্থাপন করিয়াছেন :

কোচিনী ভুলাও তালে   নাগরালি বুড়া কালে
লোকমুখে শুনি বিপরীত ॥

শেষপর্যন্ত দুই জনে গালাগালির 'চৌত্রিশা' আরম্ভ করিলেন :

কন্দলে কে আঁটে তোমা কার্তিকের মা
খাঁড়া ছাড়ি থব তুমি থব কাতরা ॥
...   .
চণ্ডিকা বলেন নাথ চাপন তোমার।
ছিদ্র চাহিবা বুল ছড়া ছাড়িবাব ॥
জননী দেখিতে যাই জয়া চল সাথে।
ঝুলি কাঁথা গতাইবা ঝাট উঠ রথে ॥
পঞ্চানন বলে শুন পার্বতি প্রবলা।
ছাকড়া কন্দলে কত ফুরে স্ত্রীকলা ॥

দেবীব কলহেব দাপটে মহেশ্বরও স্বীকাব করিলেন :

শঙ্কব কহেন বোষে   তোমাব মৌখর্যদোষে
বহিতে না পাবি আমি বাসে
এই কন্দলেব ঝড়ে   সকল সম্পত্তি উড়ে
পাড়াব পড়সী সব হাসে ॥

ইহার পব পার্বতী ও গঙ্গার কলহ ঘনাইয়া আসিল। দুই জনেই গালিতে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ কবিলেন। কলহ আরও পাকাইয়া তুলিবার জন্য নারদ 'দোকাটি' বাজাইতে লাগিলেন ("নাচেন নারদ ঋষি দোকাটি বাজাইয়া")। দেবদেবী, অপ্সর কিন্নরী কৌতুকপ্রদ দুই সতীনের কলহ দেখিতে অকুস্থলে হাজির হইলেন। দুর্গা-গঙ্গা পরস্পরের চরিত্রের প্রতি অতি অশ্রাব্য ভাষায় কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিত করিতে ছাড়িলেন না।[৬৬] দুর্গা রাগ করিয়া বাপের বাড়ী চলিলেন। শেষে ভাগিনা নারদের উপদেশে দেবী ক্রোধ ত্যাগ করিয়া শান্তমূর্তি ধরিলেন। ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া মহাদেব মন্দর পর্বতে কিঞ্চিৎ গা ঢাকা দিয়া রহিলেন, পরে নারদের মধ্যস্থতায় হরগৌরীর পুনর্মিলন হইল

---

৬৬ নারদ একস্থলে জামাতা শিব ও শাশুড়ী মেনকাকে জড়াইয়া অভব্য গ্রাম্য রসিকতা করিয়াছেন :

নারদ বলিল গোসাঞি ভেটিলে শাশুড়ী।
জরযুবতী আছে কিবা আধবুড়ী ॥

এই সমস্ত বর্ণনায় রামকৃষ্ণ লৌকিক শিবকাহিনীর ধারা কিঞ্চিৎ অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু দেবীর বাগ্‌দিনীরূপ ধারণ ও আদিরসাত্মক কৌশলে শিবকে ছলনা, শিবের কুচনী পাড়ায় যাত্রা, দেবীর শঙ্খ পরিবার ইচ্ছা ইত্যাদি গ্রাম্য শিবকাহিনীর বিশেষ প্রভাব ইহাতে লক্ষণীয় নহে। কবি দেশাচার ও জনপ্রিয়তার চাহিদা দেখিয়াই হয়তো যৎসামান্য লৌকিক শিবকৌতুকরস পরিবেশন করিয়াছেন। কিন্তু রামেশ্বর যেরূপ লৌকিক শিবলীলা বর্ণনায় বিশেষ উল্লাস বোধ করিতেন, উত্তেজক রিরংসা-উত্তপ্ত পট-ভূমিকায় পার্বতী পরমেশ্বরকে স্থাপন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না, কবি রামকৃষ্ণের মনোভঙ্গী সেরূপ নহে। পুরাণের শান্ত সংযত পরিবেশকে স্বীকার করিয়া নানা নীতি, তত্ত্ব ও দর্শনের পটভূমিকায় বহু কাহিনী উপ-কাহিনীর সংযোগে রামকৃষ্ণ যথার্থই বাংলা শিবপুরাণের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার এই ধারাটি পরে আর অনুসৃত হয় নাই, রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্রই পরবর্তী শতাব্দীর শিব ও শক্তিকে মৃত্তিকাতলচারী করিয়া লৌকিক মনোভাবকেই অধিকতর প্রাধান্য দিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণের ভাষা, শব্দসম্পদ ও পরিপাটি ছন্দপ্রয়োগ বিশেষ প্রশংসা দাবি করিতে পারে। অবশ্য ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি, কবি আবেগোচ্ছল ভাষা বেশী ব্যবহার করেন নাই, কৌতুকতরল ভাবও বিশেষ নাই। এই গম্ভীর সংযত রচনা বিদগ্ধ পণ্ডিতের উপলব্ধির বিষয়, জনসাধারণ ইহা হইতে বিশেষ রস আহরণ করিতে পারিবে না, কাব্যটির বিশেষ প্রচার না হইবার ইহাও অন্যতম কারণ। ইহার রচনাভঙ্গিমা কিছু নীরস এবং তত্ত্বের বর্ণনাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। ফলে বিবৃতিমূলক রচনায় কবিত্ব অপেক্ষা গদ্যাত্মক ঢঙ অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে।

এই কবি সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ—কবি পয়ার-ত্রিপদী বলিতে বলিতে কয়েকছত্র গদ্য লিখিয়া এক ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার সংযোগ স্থাপন করিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে বাংলা গদ্যের ব্যবহার বোধ হয় এই প্রথম। ষোড়শ শতাব্দীতেও চিঠিপত্রাদিতে অল্পস্বল্প গদ্যের ব্যবহার থাকিলেও সাহিত্যে ইহার বিশেষ প্রয়োগ ছিল না। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর রামকৃষ্ণের গদ্য-ভাষার অন্বয় অতি পরিপাটি, অনভ্যস্ততা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যথা :

(১) মহিষ পর্বতে গিয়া পূর্বকল্পের কথা ক্রৌঞ্চকে কহিতেছেন, অবধান করহ।

(২) তাইরে, নারদের পরিহাসে মেনকা রোদন করিতেছেন, এমত সময়ে কেমন স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা সকল আসিতেছেন অবধান করহ।

(৩) অতঃপর তারা প্রভৃতি দেবতারাসকল শিবের করে প্রহেলিকা প্রবন্ধে গৌরীকে সমর্পণ করিয়া কথোপকাল পালন করিবা হরকে ইঙ্গিত করিতেছেন, অবধান করহ।

(৪) পার্বতী ভাগীরথী স্নান করিতে গেলেন, এমত সময়ে শঙ্কর মনের দুঃখ নারদকে কহিতেছেন, অবধান করহ।

এই কয়টি ছত্র হইতে বুঝা যাইতেছে যে, রামকৃষ্ণ গদ্যেও কাহিনী রচনা করিতে পারিতেন। পংক্তিগুলির শব্দগ্রন্থন, বাক্যরীতি ও পদের অন্বয় প্রায় আধুনিক কালের সাধুভাষার অনুরূপ। এইজন্য নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে—আধুনিক কালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মুন্সীর দল এবং কেরী সাহেবের সহকারিবৃন্দ বাংলা সাধুগদ্যের স্রষ্টা নহেন। সপ্তদশ শতাব্দীতেও যে ইহার একটা বাঁধাবাঁধি রূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে

মৃগলুব্ধ ॥

শিবায়ন প্রসঙ্গে চট্টগ্রামে প্রচলিত মৃগলুব্ধ নামক শিবমাহাত্ম্যবিষয়ক পুঁথি সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই এক কথার অবতারণা করা উচিত। অবশ্য প্রাপ্ত পুঁথিগুলি সাহিত্যাংশে এমন অকিঞ্চিৎকর যে, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা নিরর্থক। যাহা হউক চট্টগ্রামের প্রাচীন সাহিত্যরসিক অক্লান্তকর্মা মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের অতন্দ্র সন্ধানের ফলেই এ পর্যন্ত দুইজন কবির 'মৃগলুব্ধ' কাব্যের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। করিম সাহেবেরই সম্পাদনায় উক্ত কবিদ্বয়ের পুঁথি দুইখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।[৬৭]

চট্টগ্রাম শৈবতীর্থের কেন্দ্র। একদা এখানে বৌদ্ধ কেন্দ্র ছিল, এখনও সে বৈশিষ্ট্য একেবারে লুপ্ত হয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রনাথ শিব (স্বয়ম্ভূনাথ) এই চট্টগ্রামের অধিদেবতা। এখানে চৈত্রমাসে মহা সমারোহে শৈব-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কাজেই এখানে শিবমহিমা বিষয়ক কাব্য রচিত হওয়াই

৬৭ দ্বিজ রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ' ১৩২২ সালে প্রকাশিত।
রামরাজা বিরচিত 'মৃগলুব্ধ সংবাদ' ১৩২২ সালে প্রকাশিত।

স্বাভাবিক। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত শিবায়ন বা শিবমঙ্গল নামক মঙ্গল-কাব্য শ্রেণীর বহু প্রচলিত কাব্য রচিত হইয়াছে, কিন্তু চট্টগ্রাম অন্যতম প্রধান শৈবতীর্থ হইলেও এই অকিঞ্চিৎকর 'মৃগলুব্ধ' কাব্য দুইখানি ব্যতীত আর কোন পূর্ণাঙ্গ শিবকাহিনী এই অঞ্চলে রচিত হয় নাই।

নানা শৈবপুরাণে শিবচতুর্দশীর ব্রতকথার গল্প আছে। কি প্রকারে এক ব্যাধ শিবের কৃপায় উদ্ধার লাভ করিল, রাজা মুচকুন্দ ও তাঁহার রাণী শিব-চতুর্দশীর ব্রত উপলক্ষে শিবমাহাত্ম্য শুনিয়া সশরীরে স্বর্গে গেলেন—ইত্যাদি আখ্যান এই 'মৃগলুব্ধ' পুঁথিতে বর্ণিত হইয়াছে। মৃগলুব্ধ অর্থাৎ ব্যাধের মুক্তি লাভ ইহাব প্রধান বর্ণিত বিষয়। শিবের উপাসনার সঙ্গে নিষাদ জাতির যে বিশেষ সম্পর্ক ছিল, তাহা সংস্কৃত শিবপুরাণে ব্যাধের উল্লেখ হইতেই বুঝা যাইবে।

চট্টগ্রামে শিবচতুর্দশীর ব্রতকথা ধরণের তিনখানি মৃগলুব্ধ পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে—তিনজন কবি উহার রচয়িতা। আবিষ্কার করিয়াছেন মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মহাশয়। এই তিনজনের মধ্যে দুইজন জ্ঞাতপরিচয়—(১) রামরাজা, (২) রতিদেব। তৃতীয় জনের নাম জানা যায় না।[৬৮]

সম্পাদক করিম সাহেব ১৩২২ সনে সাহিত্য পরিষদ হইতে দ্বিজ রতি-দেবের মৃগলুব্ধ প্রকাশ করিয়া ভূমিকায় বলিয়াছিলেন যে, তিনি মৃগলুব্ধের তৃতীয় আর একজন কবির পরিচয় পাইয়াছেন, যিনি সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর রচনার আদি কবি। সাহিত্য বিশারদ মহাশয় 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণী'-তে ৩৮১ সংখ্যক যে পুঁথির বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাই এই অজ্ঞাতনামা কবির পুঁথি। করিম সাহেব এই কবির একখানি পুঁথি চট্টগ্রামের দিগম্বর সেনের বাড়ীতে দেখিয়াছিলেন এবং তাহার কিয়দংশ টুকিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু পরে পুঁথিখানির বিস্তৃত বর্ণনা দিবার জন্য সন্ধান করিতে গিয়া দেখেন,

---

৬৮ দীনেশচন্দ্র রঘুনাথ রায় নামক 'মৃগলুব্ধের' আর এক কবির উল্লেখ করিয়াছেন—"মৃগলুব্ধ রতিদেবের দ্বারা বিরচিত হওয়ার পর পুনশ্চ রঘুরাম রায় কবি সেই প্রসঙ্গে কাব্য রচনা করেন" (ব. ভা. স)। আমরা এ পুঁথির সন্ধান পাই নাই। করিম সাহেবও এ বিষয়ে আলোক সম্পাত করিতে পারেন নাই। তিনি শুধু দীনেশচন্দ্রের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "মাননীয় দীনেশবাবু বলেন, এই উপাখ্যান রতিদেবের দ্বারা বিরচিত হওয়ার পর পুনশ্চ রঘুরাম সেই প্রসঙ্গে কাব্য রচনা করেন।"—রতিদেবের মৃগলুব্ধ, পৃ ২-৩

উক্ত দিগম্বর সেনের মৃত্যুর পর সে সমস্ত পুঁথি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পূর্বে তিনি ইহার যে যৎসামান্য নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া এই কাব্য সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার উপায় নাই। পুঁথিটির বর্ণনা হইতে মনে হয়, ইহার আকার খুবই ক্ষুদ্র, রচনাও অপরিণত। তাই এই অজ্ঞাতনামা কবিকে করিম সাহেব 'মৃগলুব্ধে'র প্রাচীনতম কবি বলিয়াছেন। এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিবার নাই; এই সমস্ত অতি অকিঞ্চিৎকর পুঁথির রাশি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের জঞ্জাল বাড়াইয়াছে মাত্র।

আবদুল করিম সাহেবের মতে রতিদেব ও রামরাজার মধ্যে রতিদেব অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের কবি।[৬৯] অবশ্য উক্ত অজ্ঞাতনামা কবি ইঁহাদের সকলের পূর্ববর্তী কিনা, এবং ইঁহারা এই কবির নিকট কতদূর ঋণী তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

রামরাজা ও রতিদেবের পুস্তিকায় বিষয় একই প্রকার, উভয়ের রচনার মধ্যেও ঘটনাবিন্যাসে এইরূপ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাইবে—সম্পাদক রামরাজার 'মৃগলুব্ধ সংবাদের' ভূমিকায় দুইজনের রচনার সাদৃশ্য দেখাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন, রতিদেবই রামরাজার পুঁথি অনুকরণ করিয়াছিলেন। করিম সাহেবের এ মন্তব্য অযৌক্তিক নহে। রামরাজার পুঁথিটি আকারে ক্ষুদ্রতর, বিন্যাসপদ্ধতি ও ভাষা শিথিল। ইহাতে পুরাতন রীতির বাগ্‌ধারাও লক্ষিত হইবে। আমরা দুইখানি পুস্তিকা মিলাইয়া দেখিয়াছি, যাহাকে ঠিক অনুকরণ-নকল-plagiarism বলে, রতিদেব সেরূপ অপরাধে অপরাধী নহেন। তবে তিনি বিন্যাসের ধারাটি রামরাজার পুঁথি হইতে পাইয়াছিলেন, মাঝে মাঝে দুই চারিটি বাক্যপংক্তি নিজের বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যেমন, রামরাজার—

---

৬৯ "মৃগলুব্ধ (রতিদেব) ও ঐ পুঁথি (রামরাজা) একত্র পাঠ করিলে স্বতই মনে হয়, যেন এক কবি অন্য কবির চিত্ররেখার উপর রং ফলাইয়াছেন। রতিদেবের রচনা প্রায় সরল ও বিশুদ্ধ; রামরাজার রচনা অপেক্ষাকৃত জটিল ও অস্পষ্ট। রতিদেব অনেক স্থলে অনেক কথা ফেনাইয়া তুলিয়াছেন, রামরাজা সে সব স্থলে কথাটা সংক্ষেপে সারিয়াছেন। অনেক স্থানে উভয়ের রচনার সাদৃশ্য আছে, আবার অনেক স্থানে পরস্পরের অনুকরণ বলিয়াও বোধ হয়। এ সব বিবেচনা করিয়া আমার মনে হয়, রতিদেবের গ্রন্থ রামরাজার গ্রন্থের পরবর্তী রচনা।" (রতিদেবের মৃগলুব্ধের ভূমিকা, পৃ. ৭)

ধর্ম্মহীন ব্যাধপাপী মতি নাহি এড়ে।
অঙ্গার শত ধৌত মলিন নাহি ছাড়ে ॥

রতিদেবের—

যার যে স্বভাবধর্ম কভু নাহি ছাড়ে।
অঙ্গার ধবল নহে পাখালিলে ক্ষীরে ॥

প্রায় একই প্রকাব। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, অনেক স্থলে তিনি রাম-রাজার ধনভাণ্ডারে হাত বাড়াইয়াছিলেন। অবশ্য রতিদেবেব কিঞ্চিৎ কবিপ্রতিভা ছিল, সত্যেব অনুবোধে তাহা স্বীকাব কবিতে হইবে।

আবদুল করিম রামবাজার 'মৃগলুব্ধ সংবাদেব' দুইখানি পুঁথি অবলম্বনে (একখানি ১১৪২ মঘী সনের পুঁথি, আব একখানিতে ১১৯৬ মঘী সন ও ১৭৫৬ শকের উল্লেখ) এই পুঁথিটি প্রকাশ কবেন। তন্মধ্যে প্রধান পাঠ ১১৪২ মঘী সনের পুঁথি হইতে গৃহীত হইযাছে, পাঠান্তরগুলি দ্বিতীয় পুঁথি হইতে পাদটীকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

কবি রামরাজা 'শঙ্কব কিঙ্কব রামবাজা' ভিন্ন অন্য কোনরূপ ভণিতা দেন নাই।[১০] করিম সাহেবের মতে, ইনি সম্ভবতঃ কোন মঘ বংশে জন্মগ্রহণ কবেন। বোধ হয় ইনি হিন্দুব আচারধর্ম গ্রহণ কবিয়াছিলেন। করিম সাহেবের এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণেব কাবণ, "সাধাবণতঃ চট্টগ্রামেব বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বড়ুয়া মগদের মধ্যেই নামেব সহিত 'রাজা' শব্দের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অধিক দেখা যায়; যথা—ধর্মরাজ বড়ুয়া, অঙ্গরাজ বড়ুয়া, নবরাজ বড়ুয়া, মহারাজ বড়ুয়া, শুকবাজ বড়ুয়া, জয়রাজ বড়ুয়া ইত্যাদি" (রাম-রাজার মৃগলুব্ধ সংবাদ, পৃ ২-৩)। চট্টগ্রামে বাংলাভাষী ও হিন্দুর ধর্মেকর্মে বিশ্বাসী মগদের সংখ্যা একদা নিতান্ত অল্প ছিল না। ইঁহাবা পূর্বে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য (বৌদ্ধ) হারাইয়া হিন্দু বা মুসলমানদের দলে মিশিয়া গিয়াছেন। তখন ইঁহাদের সম্প্রদায় হইতে 'চাইমিতা' নামক এক বৌদ্ধ সংস্কারক উত্থিত

১০ ডঃ সুকুমার সেন এই কবিকে 'শিশুরাম রায' বলিয়াছেন (বা. সা. ইতি—১ম, অপরার্ধ)। কবি একস্থানে ভণিতায় বলিয়াছেন—"শঙ্কর কিঙ্কর শিশু রামরাজে গাএ"। ইহা হইতে ডঃ সেন মনে করেন, কবির নাম শিশুরাম রায। কিন্তু এ অনুমান যুক্তিযুক্ত নহে। কবি সর্বত্র 'শঙ্কর কিঙ্কর' এবং 'রামরাজা' ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। একস্থান ব্যতীত আর কোথাও 'শিশুরাম' নাই। এখানে 'শিশু' বিশেষণ অর্থে (শিশুর মতো অবোধ) নিজ নামের পূর্বে প্রয়োগ করিয়া কবি শিবের নিকট আত্মনিবেদন করিয়াছেন।

হইয়া ইঁহাদিগকে আবার নিজ নিজ ধর্মে ফিরাইয়া আনেন। ইঁহাদেরই কেহ কেহ হিন্দুর দেবদেবীর প্রতি আস্থা-ভক্তি সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। করিম সাহেব চট্টগ্রামবাসী অখিলচন্দ্র বড়ুয়া নামক এক মগের বাড়ী হইতে উক্ত পুঁথিখানি উদ্ধার করেন। পুঁথির শেষে যে লিপিকারের নাম আছে ("শ্রীধুউচাঙ্গ বড়ুয়া। সাকিন রুতুরা"), তিনিও মগ বংশোদ্ভূত। সুতরাং দেখা যাইতেছে বহু মগের নামে 'রাজা' সংযুক্ত আছে। আলোচ্য পুঁথিটি একজন মগ ভদ্রলোকের বাটী হইতে পাওয়া গিয়াছে, এবং লিপিকারও জনৈক মগ। এই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা আবদুল করিম সাহেব রামরাজাকে মগ বলিয়াছেন। দৃঢ়তর প্রমাণের অভাবে তাঁহার এ সিদ্ধান্তের সপক্ষে বা বিপক্ষে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না।

রামরাজার পুঁথিতে এক ব্যাধের কাহিনী এবং হস্তিনাপুরীর রাজা মুচকুন্দ এবং তাঁহার রাণী রুক্মিণীর শিবভক্তির গল্প বলা হইয়াছে—মূল উদ্দেশ্য শিব-চতুর্দশীর মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা। পুস্তিকায় দুইটি গল্প এবং একটি গল্পের মধ্যে আর একটি গল্প নিহিত আছে। একদা পার্বতী মহাদেবকে বলিলেন, প্রভু, তোমার নিকট উত্তম কথা শুনিব—"নানা উত্তম কথা শুনি তোহ্মা হৈতে।" তখন শিব বলিলেন হস্তিনাপুরীর পরম ধার্মিক রাজা মুচকুন্দ ও তাঁহার রাণী রুক্মিণী ফাল্গুন মাসে রাত্রি জাগিয়া শিবচতুর্দশীর ব্রত করিতেছেন। রাজা যাহাতে চারি-প্রহর রাত্রি জাগিয়া অতিবাহিত করিতে পারেন ("জাগিয়া পোহাইমু রাত্রি চারি প্রহর"), তাহার জন্য রুক্মিণী স্বামীকে মৃগলুব্ধ অর্থাৎ এক ব্যাধের গল্প বলিলেন। অতঃপর ব্যাধের গল্প আরম্ভ হইল। ইন্দ্রশাপে এক বিদ্যাধর ব্যাধ হইয়া মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করে এবং যথারীতি কদাচারে রত হয়। মহাদেবের কৃপায় অধর্মাচারী ব্যাধও মুক্তি পাইল। একদা ঝড়বৃষ্টিতে কাতর হইয়া সে বেলগাছে চড়িয়া রাত্রি কাটাইতেছিল, এবং দুই চারিটি বিল্বপত্র তলায় ফেলিয়া দিতেছিল। বৃক্ষতলে ছিল শিবলিঙ্গ। সেদিন আবার শিবচতুর্দশী—আকস্মিকভাবে শুভ যোগাযোগ ঘটিয়া গেল। এই গল্পটি রাণী রুক্মিণী স্বামী মুচকুন্দকে বলিলেন। অতঃপর পরমভক্ত রাজা যখন জানিলেন, যে, শিবের কৃপায় পাপী ব্যাধও মুক্তিলাভ করিতে পারে, তখন তিনি চন্দ্রভাগা নদী তীরে (বিন্ধ্যপর্বত) মহাদেবের লিঙ্গমূর্তি আরাধনা করিলেন। এই পুণ্যের ফলে শুধু রাজা-রাণী নহেন, তাঁহার গোটা রাজ্যটাই শিবভ

লাভ করিল, সকলেই কৈলাসে স্থান পাইয়া পুণ্যসুখ ভোগ করিতে লাগিল। বলাই বাহুল্য এই আখ্যানটি সংস্কৃতে রচিত শিবপুরাণের অন্তর্ভুক্ত শিব-চতুর্দশীরই বাংলা সংস্করণ। বর্ণনা, চরিত্র প্রভৃতি কোন দিক দিয়াই উল্লেখ-যোগ্য নহে। তবে দুই একটি বর্ণনা আকস্মিকভাবে উৎকৃষ্ট কবিত্ব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। সতীকে হারাইয়া মহাদেব কিরূপ বেদনা পাইয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গে গৌরীকে বলিতেছেন :

আপ্ত বিস্মরিলুম মুঞি তোক্ষার বাপের শাপে।
সেই হেতু তোক্ষা লইআ ভ্রমি শোকতাপে॥
সেই কথা স্মরিলে মনে চক্ষুর জল পড়ে।
হারাইয়া পাছি তোক্ষা ধরিবার করে॥
তবে তোক্ষার শব লইয়া ভ্রমি দিগন্তর।
হা হা প্রিয়া বোলি আহ্মি কান্দি নিরন্তর॥

এখানে সতীহারা মহাদেবের বেদনাটি দুইচারি কথায় মন্দ হয় নাই। এইরূপ দুইচারি ছত্র ব্যতীত রামরাজার ক্ষুদ্র পুঁথিটি অন্যকোন দিক দিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে।

দ্বিজ রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ' পুঁথিটিও মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংগৃহীত এবং গ্রন্থাকারে সাহিত্য পরিষদ হইতে তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীনতর কবি রামরাজার 'মৃগলুব্ধ সংবাদ' রতি-দেবের এই কাব্য প্রকাশের কয়েকমাস পরে উক্ত করিম সাহেবের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছিল। করিম সাহেব চট্টগ্রাম হইতে রতিদেবের মৃগলুব্ধের দুইখানি পুঁথি সংগ্রহ করেন—তন্মধ্যে একখানি ১২০৩ মঘী সনে, এবং অপর-খানি ১২১৩ মঘী সনে (১০৭৬ শকাব্দের উল্লেখও আছে) অনুলিখিত হইয়া-ছিল। অপরখানি তাহা হইলে ১৭৬৩ শকে (অর্থাৎ প্রথম পুঁথিখানি ১৮৪১ এবং দ্বিতীয়খানি ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে অনুলিখিত) নকল করা হইয়াছিল। সম্পাদক রামরাজার গ্রন্থের ভূমিকায় প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন যে, রতি-দেবের গ্রন্থ রামরাজার কিছু পরবর্তী; ভাষা ও রচনা প্রণালী দেখিয়াই তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার এ সিদ্ধান্ত অমূলক নহে। রতিদেবের দুইখানি পুঁথিতেই সন-তারিখ জ্ঞাপক পয়ার আছে :

রস অঙ্ক বাউ শশী শকের সময়।
তুলামাসে সপ্তবিংশতি শুক্রবার হএ॥

অর্থাৎ ১৫৯৬ শকাব্দের কার্তিকমাসে (১৬৭৪ খ্রীঃ অঃ) এই কাব্য রচিত হয়। দ্বিতীয় পুঁথিতে কালজ্ঞাপক ইঙ্গিতটি এইভাবে প্রদত্ত হইয়াছে :

রস অঙ্ক রবিশশী শকের সময়।
তুলা মাসে সপ্তবিংশতি শুক্রবার হএ ॥

এখানে রবি শব্দটির কোন সংখ্যাবাচক ব্যবহার নাই। মনে হয় দ্বিতীয় পুঁথির অজ্ঞ লিপিকার শশীর সঙ্গে সমতা রাখিয়া 'বাউ'কে (বায়ু) রবি করিয়া দিয়াছেন। এই সন-তারিখে কোন কারচুপি না থাকিলে রতিদেবকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের কবি বলিতে বাধা নাই।

পুঁথির প্রারম্ভে কবি এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা মধুমতী।
জন্মস্থল সুচক্রদন্ডী চক্রশালা খ্যাতি ॥
জ্যেষ্ঠ দুই ভাই চন্দ্র রাম নারায়ণ।
ধরণী লোটাইয়া বন্দম জথ গুরুজন ॥
অন্নপূর্ণা শাশুড়ী বন্দম মহেশ শ্বশুর।
মন্ত্রগুরু দয়াশীল মোক্ষদা ঠাকুর ॥

কবি মাতাপিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, গুরু—মায় শ্বশুর-শাশুড়ীরও নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আধুনিক চট্টগ্রামের 'পটিয়া বাকলা' গ্রামে (পুরাতন নাম চক্রশালা) কবি জন্মগ্রহণ করেন।

কাব্যটির বিষয়বস্তু সংস্কৃত পুরাণোক্ত শিবচতুর্দশীর ব্রতের অনুরূপ। কাহিনী গ্রন্থনে তাঁহার নৈপুণ্য রামরাজা অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয়। এই সামান্য অকিঞ্চিৎকর কাহিনীটি তাঁহার রচনার প্রসাদগুণে তবু কথঞ্চিৎ পাঠযোগ্য হইয়াছে। যমদ্বারের বর্ণনা শব্দসম্পদে প্রশংসার যোগ্য :

যমের দক্ষিণদ্বার অবিশ্রাম হাহাকার
যেন ডাকে সমুদ্রের জল।
সদাএ ঘোর অন্ধকার নিশিদিন কাট মার
রাত্রিদিন করে হাহাকার।
বৈতরণী মহানদী অগ্নি জলে নিরবধি
রক্ত মাংস অস্থিএ পুর্ণিত।
ক্ষুরের সাঁকোআ দড়ি কেশের ধরণি ধরি
তবে জাএ যমের পুরীত ॥

ব্যাধের বর্ণনাও বেশ প্রত্যক্ষ :

কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বতনু বিকট দর্শন।
পিঙ্গল মাথার কেশ পিঙ্গল লোচন ॥
অতিশয় অনাচারী দেখিতে ঘৃণা করে।
মাংস বিনে ভক্ষ্য নাহি উভ ধরা পৈরে ॥
জন্মিয়া অবধি ব্যাধ পশু হিংসা করে।
পশু মারি শৃঙ্গ কৈরি বিক্ষ্য গিরিবরে ॥
হাতে শর ধনু ব্যাধ কাঁধে জাল দড়ি।
ত্রিভুবনে নাহি ব্যাধ সম দুরাচারী ॥

কবি পাপের শাস্তি ও নরক বর্ণনায় বেশ গাঢ় বর্ণে অপরাধের চিত্র আঁকিয়াছেন। রতিদেবের ভণিতায় 'মনসার ধূপাচার' শীর্ষক যে ছোট রচনাটি পাওয়া যায়, তাহা এই রতিদেবের হইতে পারে। মনসামঙ্গলে শিবের অযোনিজা কন্যা মনসার কাহিনী এবং পুরাণের জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিবাহ ও আস্তিকের উৎপত্তি—এই দুইটি গল্পই সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাপ্ত পুঁথিটি ১১৭৯ মঘী সনে নকল করা হইয়াছিল।

চট্টগ্রাম একদা বৌদ্ধকেন্দ্র ছিল, পরে হিন্দুর শৈবধর্ম বৌদ্ধধর্মকে বহুলাংশে গ্রাস করিয়া ফেলে। আদিনাথ ও চন্দ্রনাথ তীর্থ কয়েকশত বৎসর পূর্বেও বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া পরিচিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে এই তীর্থগুলি শৈবতীর্থে পরিণত হইলেও বাংলা সাহিত্যে তাহার বিশেষ চিহ্ন পাওয়া যায় না। রামরাজা ও রতিদেবের ক্ষুদ্র দুইখানি পুঁথিতে শিব মহিমা যৎসামান্য রক্ষিত হইয়াছে। জনসাধারণে বিশেষভাবে শিবভক্ত হইলেও চট্টগ্রামের সাহিত্যে তাহার বিশেষ প্রভাব পড়ে নাই। অথচ হুশেন শাহী আমল হইতেই চট্টগ্রামে একটি শক্তিশালী কবিগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল। দীনেশচন্দ্র রতিদেবের মৃগলুব্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন, "মৃগলুব্ধ গীতি শৈব ধর্মের প্রাবল্য সময়ে লিখিত; উক্ত ধর্ম শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্মের আড়ালে পড়িয়া যাওয়াতে শিবগীতির আর বিকাশ হইতে পারে নাই" (ব. ভা. সা.)। মৃগলুব্ধের পুঁথিগুলি সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে, এবং সপ্তদশ শতাব্দীকে শৈবধর্মের প্রাধান্যের যুগ বলা যায় না। আসল কথা শিবচতুর্দশী বিষয়ক পৌরাণিক কাহিনীটিতেই কাব্যগুণের বিশেষ অভাব আছে। শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের চাপে পড়িয়া শৈবধর্ম কোনদিনই গণধর্মরূপে আত্মপ্রকাশ করে নাই। অবশ্য শিবের গাজনে জনসাধারণের যোগদান অনেক পূর্ব হইতে চলিয়া

আসিতেছে এবং বাঙলাদেশে 'শিব কাল্ট' বা শিবপ্রধান উপধর্মের প্রভাব নিতান্ত অল্প ছিল না। কিন্তু শিবায়নে বর্ণিত পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী-গুলি বিষয়বৈচিত্র্যের জন্য জনসাধারণের বিশেষ মনোরঞ্জন করিয়াছিল। মৃগলুব্ধের আখ্যানে জননন্দনের উপযোগী উপাদানের অভাব আছে বলিয়া এই ধরণের কাব্যের সংখ্যা অতি পরিমিত এবং চট্টগ্রামের বাহিরে এই কাব্যের বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায় না। দীনেশচন্দ্র রতিদেবের মৃগলুব্ধ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "উহা (মৃগলুব্ধ) শৈবধর্মের ভগ্নধ্বজা।" কথাটা যুক্তিসঙ্গত। বাংলা সাহিত্যে শৈবধর্ম কোনদিনই আকাশচুম্বী মহিমা লাভ করিতে পারে নাই। নাথ সাহিত্যে ধর্মের অনুষ্ঠানে (রামাই পণ্ডিতের আগমপুরাণ, ধর্মপূজা বিধান, সহদেব চক্রবর্তীর অনিল পুরাণ) এবং মঙ্গল কাব্য শ্রেণীর শিবায়নে শিবের যে মূর্তি অঙ্কিত হইয়াছে, উচ্চতর তত্ত্বদর্শন সত্ত্বেও তাহাতে পৌরাণিক শিবের মহিমা বিশেষ স্পষ্ট হয় নাই। বাঙালীর শিবকল্পনা গঞ্জিকা-ধুস্তুরসেবী ও পরদারে-আসক্ত কৃষক মহেশের ধূলিধূসর মলিনরূপকেই মলিনতর করিয়াছে। রজতগিরিনিভ ত্র্যম্বকের অট্টহাস্য ফুটাইয়া তোলা বাঙালীর সাধ্য ছিল না। শিবদুর্গার বিড়ম্বিত দাম্পত্য জীবন, দারিদ্র্য, কলহ চারিত্রিক ভ্রষ্টাচার—এই চিত্রগুলির সঙ্গে বাঙালীর মনের যোগ আছে। ফলে নাথ সাহিত্য. ধর্মের পূজাপদ্ধতি ও শিবায়নে শিবচরিত্রের চরিত্রগত মহত্ত্ব আদৌ ফুটে নাই। অথচ শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ও ব্যাপকতর আদর্শ হইতে ঈশ্বরসত্তা প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন। যে কোন কারণেই হোক কৃষাণ শিব বাঙালীর রস ও রুচিকে অধিকতর তৃপ্ত করিয়াছিলেন, এবং এই জন্যই বোধহয় পৌরাণিক আদর্শে পরিকল্পিত মৃগ-লুব্ধের ঐতিহ্য অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ও সঙ্কুচিত সমাজে প্রচলিত ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মমঙ্গল কাব্য

১

ভূমিকা : ধর্মঠাকুর ও ধর্মসম্প্রদায়

সূচনা ॥

বাঙলাদেশে ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া যে কাল্ট্ বা উপসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদের সম্প্রদায়গত পরিচয় যেমন বিস্ময়কর, তেমনি তাহাদের সাহিত্য বিচিত্র ও অভিনব তথ্যে পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ সামান্য পরিচয় লইলেই অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলকাব্যের বিশেষ পার্থক্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে। গোটা মধ্যযুগেই ব্রাহ্মণ্য, পৌরাণিক ও উত্তর ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রভাব ও ভাবের আদান-প্রদান সত্ত্বেও এই পূর্বপথের জনসাধারণ চর্যা, অধ্যাত্ম-প্রণালী ও জ্ঞানবিশ্বাসে তাহাদের আদিম সংস্কারের দ্বারা বহুলাংশে চালিত হইত: মঙ্গলকাব্যসমূহের মধ্যে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় রহিয়া গিয়াছে, যদিও ইহার উপরে ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক সংস্কারের বিস্তর পলিমাটি পড়িয়াছে। মনসা ও চণ্ডী-সম্প্রদায় একদা গোটা বাঙলা দেশে এবং এদেশের পূর্ব ও পশ্চিমের প্রান্তীয় অঞ্চলে জনমনে ভয়-ভক্তির প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—বিশেষ ধরণের ব্রতকৃত্য ও সাহিত্য এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছিল। চণ্ডী-মনসার দেখাদেখি আরও অনেক উপধর্ম-সম্প্রদায় মহোৎসাহে ধর্মপ্রচারমূলক সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। রায়মঙ্গল, বাসুলিমঙ্গল, সত্যপীরের পাঁচালী—এই ধরণের মঙ্গল সাহিত্যের অন্তরালে উপধর্মসম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব উপলব্ধি করা যাইবে। তার পরে কালের ব্যবধানে ও উদ্বেল যুগসমস্যার চাপে বাঙলাদেশের মধ্যযুগীয় সংস্কার রূপান্তরিত হইতে আরম্ভ করিল, কোথাও-বা আধুনিকতার আঘাতে ইহা বিলুপ্ত হইয়া গেল। এখনও বাঙলাদেশে মনসার ভাসান গান হয়, রাত্রি জাগিয়া দলে-বাঁধিয়া-ভক্তের দল বেহুলার কাহিনী, মনসার প্রচণ্ড রোষ, চাঁদ সদাগরের দাম্ভিকতার গল্প শুনে, বিষহরীর পূজা দেয়, অঞ্চল বিশেষে অরন্ধন

পালন করে, মনসার মেলা হইতে সর্পভূষিতা মনসার ছবি-সরা-হাঁড়ি-কুলা তৈজসপত্রাদি কিনিয়া আনে, শোলার মনসামূর্তি ভক্তি ভরে ঘরে রাখিয়া দেয়। অবশ্য এখন চণ্ডীর বিশেষ ধরণের পূজা-উপাসনা লোপ পাইয়া গিয়াছে, যদিও উৎসব-অনুষ্ঠানে এখনও চণ্ডীর মঙ্গলগান হয়। কিন্তু মঙ্গল সাহিত্যের অন্তরালে যে বিশেষ ধরণের 'চণ্ডী কাল্ট্' ছিল, তাহাদের ব্রতকৃত্যাদি ছিল, এখন আর তাহার বড় একটা প্রচার নাই, কেবল নারীসমাজের কোন কোন স্থলে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতানুষ্ঠানে পূর্বতন ধারাব ভগ্নাংশ মাত্র রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ধর্মঠাকুরের উৎসব এখনও সজীব ; (এই সম্প্রদায়ের ব্রতকৃত্যাদি গ্রামবাসীরা অদ্যাপি অতি ভক্তিভরে পালন করিয়া থাকে, তাহার জটিল পূজা-পদ্ধতির নিয়মাবলী, আর্য-অনার্য-বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার সংমিশ্রণে গড়িয়া-ওঠা ধর্মঠাকুর এখনও জাগ্রত দেবতা ; তাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত বৃক্ষতলা, মন্দির অঞ্চলবিশেষ এখনও আছে।) বর্ধমান বিভাগ ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের নানা-স্থানে (চব্বিশ পরগণা ও যশোহর) আমরা এখনও ধর্মপূজা (নিত্যপূজা ও নৈমিত্তিক পূজা) হইতে দেখিয়াছি। (ধর্মেব গাজন গ্রামাঞ্চলে জাতীয় উৎসব বিশেষ। সে উৎসবের ইতর ভদ্র সকলেই যোগদান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণেরা যেমন ধর্মের মন্দিরে বা বৃক্ষতলায় গিয়া ধর্মের অর্চনাদি করিয়া থাকেন, তেমনি আবার ডোম, পোদ প্রভৃতি সমাজের নরনারীরাও ধর্মের পূজা উপলক্ষে উপাসনা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ চৈত্র মাসে ধর্মের গাজন উৎসবের সময় ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের আর কোন বাছবিচার থাকে না। তখন ধর্ম ও শিব এক হইয়া যান, গৌরী যুগপৎ ধর্মের কামিল্যা (কামিনী) ও শিবের শঙ্করী হইয়া পূজা লাভ করেন। চব্বিশ পরগণায় ও যশোহরের প্রান্তে আমরা দেল (∠ দেউল) পূজা ও ধর্মের সন্ন্যাস বা গাজন দেখিয়াছি। এখনও হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণেরা কোন কোন স্থলে ধর্মের গাজনকে শিবের গাজন বলিয়া উৎসব-অনুষ্ঠানে পরম নিষ্ঠাভরে যোগ দিয়া থাকেন) (অনেক গ্রামবৃদ্ধা ধর্মকে শিব বলিয়াই পূজা দিয়া থাকেন। ধর্মপূজা জাগ্রতপূজা, ধর্মোৎসব পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের কিয়দংশের সামাজিক উৎসব। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর সঙ্গে ধর্মঠাকুরের এইখানে বিশেষ পার্থক্য।)

(আরও একটা বৈশিষ্ট্য, ধর্মোৎসব মূলতঃ পশ্চিমবঙ্গের উৎসব, পশ্চিম-

রাঢ়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত দক্ষিণবঙ্গের মঙ্গলেও ইহার কিছু সম্পর্ক আছে। মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলের প্রভাব গোটা বাঙলাদেশেই পরিব্যাপ্ত, কিন্তু ধর্মঠাকুর আঞ্চলিক দেবতা।

মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীর মূর্তি ছিল, একদা মূর্তি পূজা হইত, এখনও হয়। এখনও লোকে কুমারবাড়ী হইতে মনসামূর্তি কিনিয়া আনিয়া পূজা করে। পূর্বে চণ্ডীর মূর্তি গড়াইয়াও পূজা হইত। বাঙলাদেশ হইতে পুরাতন যুগের সর্পভূষণা মনসা ও স্বর্ণগোধিকাচিহ্নিত চণ্ডীর পাষাণ মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ধর্মঠাকুরের কোন প্রাচীন মূর্তি পাওয়া যায় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে কোথাও প্রত্যক্ষভাবে ধর্মঠাকুরের উল্লেখ পর্যন্ত নাই।[১] ধর্মমঙ্গল কাব্যে তাঁহার যে বর্ণনা আছে, তাহা অনেকটা ধবল বর্ণের মহাবিষ্ণুর মতো। কিন্তু এখন বাঙলাদেশের অধিকাংশ স্থলে ধর্মপূজায় মূর্তি ব্যবহৃত হয় না, স্থানে স্থানে তাঁহার শিলামূর্তি (একখণ্ড পাথর—কোথাও ডিমের আকার, কোথাও চৌকা, কোথাও-বা গোলাকার কূর্মমূর্তি) পূজা হয়।[২] ধর্মঠাকুরের বীরমূর্তির বর্ণনা ধর্মমঙ্গলকাব্যে লক্ষ্য করা যায়। ধর্মোপাসকগণ তাঁহার মূর্তি গড়াইবার প্রয়োজন বোধ করিলে রায়মঙ্গলের দক্ষিণরায়ের মতো ধর্মঠাকুরের জামা-জুতা ('মোজা') পরা বীরমূর্তি অথবা বিষ্ণুর মতো মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করিতে পারিতেন। কিন্তু দুই একটি মন্দির বাদ দিলে অধিকাংশ ধর্মমন্দিরে বা অনুষ্ঠানে ধর্মের শিলামূর্তি ভিন্ন অন্য কোন

---

১ ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে, বর্ধমান জেলার মল্লসারুল গ্রামে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রশাসনে (৬ষ্ঠ শতাব্দী) যে, "সত্যতপোময়মূর্তির্লোকদ্বয়সাধনো ধর্মঃ" উল্লেখ আছে, তাহা ধর্মদেবতারই ইঙ্গিত। কিন্তু আমাদের মতে, ইহা ধর্মঠাকুরের বর্ণনা নহে, ইনি হইতেছেন মঙ্গল লোকনাথ অর্থাৎ বুদ্ধদেব। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে 'মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে'—ডঃ সেন এখানেও যক্ষকে ধর্ম বলিতে চাহেন। ইহাও তাঁহার অনুমান মাত্র। —দ্রষ্টব্য ডঃ সেন সম্পাদিত রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৪—১৫

২ কিন্তু চব্বিশ পরগণার কোন কোন অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিরাট পুরুষমূর্তি দেখা যায়। জয়নগরের নিকটবর্তী বহড়ু গ্রামে ধর্মঠাকুরের মূর্তি আছে, বিশাল রূপবিষ্ট মূর্তি, গোলাকার চক্ষু, পাকানো গোঁফ—দেখিলে ভয় হয়। যোগী জাতীয় পূজারীরা এই ধর্মরাজের পূজা করিয়া থাকে। দক্ষিণ-বারাসত, ময়দা, সোনারপুর অঞ্চলেও ধর্মরাজের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। চব্বিশ পরগণার এই অঞ্চল ব্যতীত আর কোথাও ধর্মরাজের মূর্তি পাওয়া যায় না।

মূর্তির পূজা অনুষ্ঠান হয় না।[৩] বাঙলাদেশের লোকধর্মে ও পূজানুষ্ঠানে ইহাও একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

চতুর্থতঃ, ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর পশ্চাদভাগে ইতিহাসের 'ছিটেফোঁটা' উল্লেখ আছে ; স্থানীয় নামধামের সঙ্গেও ধর্মমঙ্গলে উল্লিখিত নামের বেশ মিল আছে। অবশ্য ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর আদলটি অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতোই পুরাণ ধরণের ; কিন্তু তাহাতে ইতিহাস ও আদিম যুগের বীররসাত্মক মহাকাব্যের অনেক বৈশিষ্ট্য মিশ্রিত আছে। তাই কেহ কেহ ইহাকে রাঢ়ের 'জাতীয় মহাকাব্য' (National Epic) বলিতে চাহেন। মোট কথা ধর্মঠাকুরের পূজা-উপাসনা ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু যে অন্য মঙ্গলকাব্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক তাহাতে সন্দেহ নাই। এবার ধর্মঠাকুর ও ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

ধর্মঠাকুরের স্বরূপ ॥

যদিও পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরিয়া ধর্মঠাকুরের পূজা, উৎসব, ব্রতকৃত্যাদি চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু রামগতি ন্যায়রত্নের পূর্বে কোন সাহিত্যরসিক ব্যক্তি ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন না। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' ঘনরামের ধর্মমঙ্গল সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আলোচনা করিলেও ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে বিস্তারিত পরিচয় দেন নাই—ডোমসংস্পর্শজনিত ধর্মঠাকুরের প্রতি তাঁহার হয়তো ব্রাহ্মণপণ্ডিতসুলভ কিছু সঙ্কোচ ছিল। যাহা হউক, ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তদানীন্তন বঙ্গীয় সরকারের দ্বারা পুঁথি সন্ধানে প্রেরিত হইয়া ধর্মঠাকুর ও ধর্মমঙ্গল কাব্য সম্বন্ধে সর্বপ্রথম সন্ধানীর দৃষ্টি লইয়া অনুসন্ধান চালাইয়াছিলেন। ১৩০৪ সনের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় এবং ১৮৯৪ সালের Royal Asiatic Society-র মুখপত্রের ডিসেম্বর সংখ্যায় (Proceedings for December 1894, p. 136, Journal, pt. I,

---

৩ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, "ধর্মঠাকুরের কোন মূর্তি নাই। তাহার পরিবর্তে একখণ্ড স্বাভাবিক প্রস্তরই এই নামে পূজিত হয়।...ধর্মঠাকুরের অন্য কোন প্রতিমা নাই" (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস)। কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের কোন কোন গ্রামে ধর্মের বীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

No. I, pp. 55-56, 65-68) ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে[৪] ঘোষণা করেন যে, ইনি বৌদ্ধ দেবতা। তাঁহার মতে বাঙলাদেশে বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি ধর্মঠাকুর; শূন্যমূর্তি বুদ্ধদেবই করচরণহীন কূর্মমূর্তিস্বরূপ ধর্মশিলায় পরিণত হইয়াছেন।) ইহার পরে সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত 'হাজার বছরের পুরাতন বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহাতে' তিনি সেই সিদ্ধান্তে অবিচল রহিলেন। ১৩১২ সনের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ব্রজসুন্দর সান্যাল একটি প্রবন্ধে ('মাণিকরাম ও ধর্মমঙ্গল') মাণিকরামের কাব্যে ধর্মকে 'শূন্যমূর্তি' বলা হইয়াছে বলিয়া এই দেবতাকে প্রবন্ধকার বৌদ্ধ বলিয়া সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিলেন। ইতিমধ্যে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে 'রামাইপণ্ডিতের শূন্যপুরাণ' বলিয়া যে বিচ্ছিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র কাব্য প্রকাশ করিলেন, তাহাতেও তিনি জানাইলেন যে, রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে শূন্যরূপী বুদ্ধদেবের বর্ণনাই প্রচ্ছন্নভাবে গৃহীত হইয়াছে। ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'ধর্মপূজা-বিধান' (১৩২৩) শীর্ষক আর একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া ধর্মঠাকুর যে সম্পূর্ণ বৌদ্ধ দেবতা তাহা তিনি নানা গবেষণার সাহায্যে প্রমাণের চেষ্টা করিলেন। দীনেশচন্দ্রও 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' এই সমস্ত সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া শূন্যপুরাণে ও ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত ধর্মঠাকুরকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদেবতা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। কিছু পরে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে 'শূন্যপুরাণে'র যে দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৩৬) প্রকাশিত হইল, তাহাতে সম্পাদক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—এই তিন জন বিশেষজ্ঞ তিনটি বিস্তারিত ভূমিকা লিখিয়া ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধ প্রমাণ করিলেন।[৫] শিক্ষিত সমাজ তাঁহাদের এই

---

৪ "With the materials obtained up to this time, I humbly believe a case has been made out for considering the worshippers of Dharma to be ancient Buddhists of India." (H. P. Sastri—*Discovery of Living Buddhism in Bengal*)

৫ সাহিত্য পরিষদ হইতে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণ বলিয়া যে কাব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন (যাহা কদাপি ময়ূরভট্ট নামীয় কোন কবির রচনা নহে—এবিষয়ে পরে আলোচনা করা হইয়াছে), তাহার ভূমিকাতেও তিনি শূন্যমূর্তি সম্বন্ধে বৌদ্ধ প্রভাবই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

সিদ্ধান্ত মোটামুটি মানিয়া লইলেন। কারণ ইতিপূর্বে পাশ্চাত্য গবেষকগণ প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, পৌরাণিক যুগ হইতে শুরু করিয়া আধুনিক যুগ পর্যন্ত হিন্দুর উপাসনা, অধ্যাত্ম সংস্কার, জীবনচর্যা প্রভৃতি ব্যাপার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়া আর কিছু নহে,—এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই উদ্ভট মতবাদ সে যুগের শিক্ষিত বাঙালীরা একপ্রকার বিনা প্রতিবাদেই মানিয়া লইয়াছিলেন। ধর্মঠাকুরের বর্ণনায় বহু স্থলে শূন্য-নিরঞ্জনের প্রতীক ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া এই অনুমান অনেকের কাছে সন্দেহাতীত মনে হইল।

ধর্মঠাকুরের স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে অনুসন্ধান করেন অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এবং সেই পন্থা কিয়ৎপরিমাণে অনুসরণ করেন ডঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় নৃতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসহ পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বহু অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া ধর্মঠাকুরের ও ধর্মসম্প্রদায় (কাল্ট্) সম্বন্ধে যে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন, তাহা গবেষণার আকারে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায়[৬] প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চিম রাঢ়ের ধর্মঠাকুর ও সেই সংক্রান্ত উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় নিজে সন্ধান করিয়া যে চমকপ্রদ তথ্য উদ্‌ঘাটন করেন, ডঃ সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত রূপরামের ধর্মমঙ্গলের দুইটি সংস্করণের ভূমিকায় সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে ধর্মঠাকুরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'র প্রথম খণ্ডে ধর্মমঙ্গল অধ্যায়ে তিনি ধর্মঠাকুরের স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই। ইহার চার বৎসর পরে তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত রূপরামের ধর্মমঙ্গলের (প্রথম সংস্করণ) ভূমিকায় তিনি ধর্মঠাকুরের স্বরূপ সম্বন্ধে বিস্তারিত পরিচয় দেন। নানা প্রমাণ সহযোগে তিনি দেখাইয়াছেন যে, শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নহে, বঙ্গের বাহিরে ছটপরবের অন্তরালে ধর্মঠাকুরের প্রভাব আছে। তাঁহার মতে, ধর্মঠাকুর বৌদ্ধদেবতা নহেন। ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের ১২৯ সূক্তের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্বের গভীর সাদৃশ্য আছে। তিনি মনে করেন, "ধর্মঠাকুর বৈদিক সূর্য দেবতা। ইনি শ্বেত-অশ্বারোহী ('ধবল-খচর') সিপাহী বেশধারী (ঈরাণীয়) সূর্যও বটেন।"

---

৬ 'Dharma Worship' by K. P. Chattopadhyay (Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, 1942, Vol. VIII.)

শুধু তাই নয়, ইহার সঙ্গে বৈদিক বরুণ দেবতা, ডোম-চাঁড়াল জাতির রণ-দেবতা, অনার্যের শিলাদেবতা, ফকির বেশধারী দেবতা—ইত্যাদি নানা প্রভাব রহিয়াছে। ১৯৪৪ সালের দিকে ডঃ সেনের বিশ্বাস ছিল, ধর্মঠাকুর কদাচ বৌদ্ধ দেবতা নহেন। বৈদিক সূর্য ও বরুণ, অনার্য কোলগোষ্ঠীর প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদির সহযোগে ধর্মঠাকুরের উৎপত্তি হইয়াছে। পরিশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ধর্মঠাকুর এমন একটি মিশ্র-দেবতা যাঁহার মধ্যে বৈদিক ধর্মাচার, প্রাচীন আর্যেতর সংস্কার, ব্রাত্য শৈব ধর্ম, নাথধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিষ্ণু উপাসনার সঙ্গে ধর্মোপাসনা এক হইয়া গিয়াছে। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত রূপরামের ধর্মমঙ্গলের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি এই মতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আরও দুই চারিটি নূতন তথ্য সংযোজনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঋগ্বেদের যম-যমীর উপাখ্যানের সঙ্গে ধর্ম ও মনসা কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। 'ধর্ম' শব্দটি অনার্য কোলগোষ্ঠীর কূর্মবাচক শব্দ 'দড়ম' বা 'দরম' হইতে কল্পিত। ধর্মের মধ্যে যম ও বরুণ লুকাইয়া আছেন। বিশেষতঃ বেদের বরুণের সঙ্গে ধর্মের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে হরিশ্চন্দ্রের আখ্যানের সঙ্গেও ধর্মমঙ্গলে হরিশ্চন্দ্র-লুইচন্দ্রের গল্পের সাদৃশ্যও উল্লেখযোগ্য। যাহা হউক উক্ত দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি বৈদিক সূর্যদেবতার সঙ্গে ধর্মঠাকুরের ঐক্য সম্বন্ধে দুই চারিকথা বলিয়া বরুণের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সাদৃশ্য দেখাইতে অধিকতর চেষ্টা করিয়াছেন।[৭] অবশ্য তাঁহার পূর্বে অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় সর্ব প্রথম প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, বৈদিক দেবতা বরুণের বিশেষ প্রভাব বাঙলার লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় লক্ষ্য করা যাইবে।[৮] সম্প্রতি ডঃ সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের

৭ ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় (Gaekwad Oriental Series) প্রকাশিত বৌদ্ধ মহাযান গ্রন্থ 'সাধনমালায়' "যমারিসাধন" নামক যে ব্রতকৃত্যের কথা আছে, সেখানে একই মন্ত্রে যম ও বরুণের উল্লেখ আছে। বেদ ও আবেস্তা গ্রন্থে যম সূর্যের পুত্র। এই যম ও সূর্যের প্রভাব ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় দেখা যায়। (দ্রষ্টব্য—ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত রূপরামের ধর্মমঙ্গলের ভূমিকা, ২য় সংস্করণ, পৃ ৯)

৮ অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যের কিয়দংশ, "We may therefore, say, that the ancient records reveal a cult of Varuna with a human sacrifice as in the case of Dharma in much later times. It is not apparent when

ইতিহাসে'র প্রথম খণ্ডে (অপরার্ধ) তিনি ধর্মঠাকুরকে বৈদিক বরুণ দেবতা-রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন।[১] তবে ধর্মঠাকুরের মূল বরুণ দেবতা হইলেও ইহাতে লৌকিক শৈবমত, পুরাণের বিষ্ণুমত, পরবর্তী কালের মুসলমান-সমাজের পীরফকিরের আদর্শ—সবই অল্পবিস্তর স্থান পাইয়াছে। এখন সংক্ষেপে ইঁহাদের মতের যাথার্থ্য আলোচনা করা যাক।

ধর্মঠাকুরের স্বরূপ আলোচনা করিতে গেলেই 'ধর্ম'-সম্প্রদায়ের কথা, বিশেষতঃ আধুনিক যুগে 'ধর্ম'-সম্প্রদায় যেভাবে এই উৎসব পালন করিয়া থাকেন, ধর্মের পূজা-ব্রতাদি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া থাকেন—তাহাও আলোচনার যোগ্য। ডঃ সুকুমার সেন ও অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনার পূর্বে বাংলা সাহিত্যের সমালোচকগণ সকলেই ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধধর্মের শেষ ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে করিতেন। রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণে, 'ধর্মপূজাবিধান' ও ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসরণ করিয়া মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বসু, যোগেশচন্দ্র রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—সকলেই ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধ বলিয়াছেন। শূন্যপুরাণ ও 'ধর্মপূজাপদ্ধতি' অবলম্বনে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁহাদের যুক্তির ধারাটি কতকটা এইরূপ :

শূন্যপুরাণের বহুস্থলে ধর্মঠাকুরকে শূন্যমূর্তি বলা হইয়াছে। যথা—

শূন্যরূপং নিরাকারং সহস্রবিঘ্নবিনাশনম্।
সর্বপরঃ পরো দেব তস্মাৎ ত্বং বরদো এব ॥ শূন্যপুরাণ, ২য় সং

অথবা—

ওঁ অধো ন ঊর্দ্ধং শিরো ন শক্তিঃ
নারী ন পুরুষো ন চ লিঙ্গমূর্ত্তিঃ।
হস্তং ন পাদং ন রূপং ন ছায়া
তস্মৈ নমস্তে নিরঞ্জনায় ॥ (নবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ধর্মপূজাবিধান, পৃ, ১৭—১৮)

Varuna was replaced by Dharma; but it is a fact that this last named deity has taken Varuna's place in the tales of Harishchandra as it has come down to us," JRASB, 1942, Vol VIII.

১ ডঃ সেনের মতে, "ধর্মঠাকুরের পূজায় হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান সর্ব ধর্মেরই অনুষ্ঠান অল্পবিস্তর নেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অবয়বে ধর্ম হইলেন বৈদিক দেবতা বরুণ। তবে তাহার সঙ্গে আদিত্য (যম সমেত), সোম প্রভৃতি অপর বৈদিক দেবতাও মিশিয়া গিয়াছে।" (বা. সা. ইতি.)

কিংবা—

শূণ্যত ভবমন পসভূব শূন্তে কবি ভর। (শূ. পূ.)

বা—

শূণ্যে পুজএ হবিচন্দ্র বিসাদ ভাবিআ মতি। (শূ. পূ.)

বা

সাড়ী মোব বহুকাব।
পূজা শ্রীনিবাকাব॥
শূণ্য মূর্ত্তি ধ্যান কবি।
সাকাব মূর্ত্তি ভজি॥ ('ধমপূজাবিধান')

ধর্মঠাকুরের মন্ত্রে সর্বদা 'চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্তিং', এইরূপ উল্লেখ আছে। এই 'ধর্মপূজাবিধানে' ধর্মকে শূন্যমূর্তি সূর্য ও বলা হইয়াছে—

মণ্ডলং বর্ত্তুলাকাবং শূন্যদেহং মহাবলম্।
একচক্রধরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্॥

এখানে ধর্ম ও সূর্য এক হইয়া গেলেও ধর্ম প্রধানতঃ 'শূন্যদেহ', তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্মপুরাণ ও ধর্মমঙ্গলেব "নিরঞ্জনের কল্পনায় বৌদ্ধদের শূন্যবাদ ও আদিবুদ্ধ মতের প্রভাব স্পষ্ট দেখা যায়"—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ইহাই অভিমত।[১০] অবশ্য তিনি মনে কবেন যে, নিরঞ্জনের কল্পনা ও সৃষ্টিতত্ত্ব ভিন্ন ধর্মপূজায় আর কোন বৌদ্ধ প্রভাব দেখা যায় না।[১১]

ধর্মঠাকুরের উৎপত্তি যে বৌদ্ধধর্ম হইতেই হইয়াছে, এ বিষয়ে কেহ কেহ আরও কিছু কারণ দেখাইয়া থাকেন। প্রথমতঃ শূন্যপুরাণে আছে, সিংহলে ধর্মদেবতার (অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম) প্রাধান্য—"সিংহলে ধর্মের বহুত সম্মান।" 'ধর্মপূজাবিধানে' ধর্মপূজকদিগকে সদ্ধর্মী বলা হইয়াছে। হরপ্রসাদেব মতে ধর্মঠাকুর ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তির সহিত অভিন্ন। তাঁহার এই অভিমত, একটু দীর্ঘ হইলেও, এখানে উদ্ধৃত হইতেছে—"ধর্মঠাকুরের মূর্তি কচ্ছপের ন্যায়। এইটি বুঝিতে হইলে বৌদ্ধধর্মের অনেক কথা বুঝিতে হয়। বৌদ্ধদের তিনটি রত্ন ছিল। তিনটিই উপাসনার বস্তু—বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ। বুদ্ধ বলিতে উপাসনা বুঝাইত; ধর্ম বলিতে গ্রন্থাবলী বুঝাইত; এবং সঙ্ঘ বলিতে ভিক্ষুকমণ্ডলী বুঝাইত। কোন কোন সম্প্রদায় বুদ্ধকে প্রথম স্থান না দিয়া ধর্মকেই প্রথম

১০ শূন্যপুরাণ, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১১
১১ ঐ

স্থান দিতেন। তাঁহাদের মতে ত্রিরত্ন হইল—ধর্ম, বুদ্ধ ও সঙ্ঘ। ক্রমে ধর্ম বলিতে স্তূপ বুঝাইত। মহাযান মতে শাক্যসিংহ কেবলমাত্র লেখক দাঁড়াইয়াছেন—ত্রিরত্নের মধ্যে তাঁহার স্থান নাই। সেখানে ধ্যানীবুদ্ধেরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই সকল ধ্যানী বুদ্ধ অনাদি ও অনন্ত। ধ্যানী বুদ্ধগণের মন্দির ক্রমে স্তূপের গায়েই আসিয়া উপস্থিত হইল। অর্থাৎ ধর্ম ও তথাগত এক হইয়া গেল। স্তূপের গায়ে কুলুঙ্গী কাটা হইতে লাগিল।...... পাঁচটি কুলুঙ্গীওয়ালা স্তূপ দেখিতে ঠিক কচ্ছপের মতো হইল। আমাদের ধর্মঠাকুর কচ্ছপাকৃতি। সুতরাং তিনি এই শেষকালের স্তূপেরই অনুকরণ। স্তূপ আবার ধর্মের প্রতিমূর্তি; সুতরাং স্তূপ, ধর্ম এবং কচ্ছপাকৃতি তিনই এক হইয়া গেল। ইহাতে মনে হয় কচ্ছপাকৃতি ধর্মঠাকুর পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের সহিত ধর্মমূর্তির স্তূপ—আর কেহ নহে।...ত্রিরত্ন এখন আর নাই। আছেন কেবল ধর্মঠাকুর—কচ্ছপাকৃতি।"[১২]

ধর্মমন্দিরে যে পাঁচজন দ্বারপালের (সেতাই পণ্ডিত, নীলাই পণ্ডিত, কংসাই পণ্ডিত, রামাই পণ্ডিত ও গোঁসাই পণ্ডিত) উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁহারাও নাকি পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের আদর্শে পরিকল্পিত।[১৩]

আলোচকদের উল্লিখিত মতসমূহ একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। শূন্যপুরাণ ও ধর্মপূজাবিধানে এমন সমস্ত উক্তি আছে যে, তাহার দ্বারা ধর্মঠাকুরকে শূন্যরূপী, সুতরাং বৌদ্ধ—এরূপ অনুমান করা যায়। অবশ্য কোন কোন স্থলে তাঁহাকে নারায়ণের সঙ্গেও একীভূত করিবার চেষ্টা লক্ষ্য করা যাইবে। সম্প্রতি বিশ্বভারতী হইতে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের সম্পাদনায় রামাই পণ্ডিতের ভণিতাযুক্ত যে 'অনাদ্যের পুঁথি' (সাহিত্য প্রকাশিকা, ৩য় খণ্ড) মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে ধর্মকে কখনও নারায়ণ, কখনও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব

---

১২ দ্রষ্টব্য—নারায়ণ, ১৩২২ মাঘ ('বৌদ্ধধর্ম এখনও আছে'—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)। স্যার চার্লস্ ইলিয়টও প্রায় এই মতাবলম্বী—"The Dharma or Niranjana of the Sunya Purana seems to be equivalent to Adi-Buddha,"- *Hinduism and Buddhism* vol, II, p. 32

১৩ প্রবাসী ১৩২৯; পৃ. ১৫৮, ৩২১, ৬৫০ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অপেক্ষাও পুরাতন সনাতন দেবতা বলা হইয়াছে বটে,[১৪] কিন্তু রামাইয়ের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম তাঁহাকে নিজ শূন্যমূর্তিই দেখাইয়াছিলেন :

ভকতবচ্ছল প্রভু ভক্তের কারণে
নৈরাকার মূর্তি হইলা ততক্ষণে।
হস্তপদ নাঞ প্রভুর নাঞ কন্ধ মাথা।
বাটুল সমান হইলেন ত্রিলোক্যের ধাতা।
নৈরাকার মূর্ত্তি হৈলেন প্রভু নিরঞ্জন
একদিটে রামাঞি করিছে নিরক্ষ্যণ।

এখানে ধর্মের শূন্যমূর্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে ধর্মবন্দনায় তাঁহাকে "শূন্যগতি নিরন্তর শূন্যরূপী সদানন্দময়" বলা হইয়াছে।[১৫] মাণিক গাঙ্গুলীর মতে নিরাকার ধর্মই সাকার হইয়া দশ অবতার রূপ ধারণ করেন।[১৬] যাদুনাথের ধর্মপুরাণের প্রারম্ভে ধর্মকে "আদি অনাদি ধর্ম তুমি পুরুষ ব্রহ্ম"[১৭] বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু একাধিক

১৪ আদি অনাদি তুমি সভাকার পর।
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিবাকর।
তুমি হর তুমি হরি তুমি বৃহস্পতি।
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত্য তুমি দিবারাতি।
দেবের দেবতা তুমি পুরুষ পুরাতন।
ভকতের প্রাণ তুমি জীবের জীবন। (অনাদ্যের পুঁথি, সাহিত্য-প্রকাশিকা—৩য়, পৃ. ১১৫)

১৫ ডঃ বিজিত দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত, মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল, পৃ. ১০

১৬ ঐ, পৃ. ১১

১৭ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণে আছে :—

ব্রহ্মবিষ্ণু ভব দেবদেবী সব
তব অংশে উপাদান।
মৎস্যাদি আকার দশ অবতার
মূর্ত্তিভেদে ভগবান ॥
কভু নিরাকার কখন আকার
নির্ব্বিকার নারায়ণ।
যেরূপে যে জন করয়ে ভজন
কর সে রূপ ধারণ ॥—পৃ. ২৮

ময়ূরভট্ট একস্থলে "ধর্মশিলা স্বয়ং নারায়ণ" বলিয়াছেন। এই নারায়ণের কথা তিনি অন্য স্থানেও বলিয়াছেন। যথা :

স্থলে "জয় জয় প্রভু ধর্ম প্রভু নইরাকার", "কহেন প্রভু নইরাকার" এইরূপও উল্লেখ রহিয়াছে। যথা—

একান্ত ভাবিয়া নইরাকার
ধর্মের কৃপার ফলে জানুপরিমাণ জলে
হিমসাগর নদী হইল পার।

(সাহিত্য প্রকাশিকা, ৩য়, পৃ. ৩২)

রূপরামের ধর্মমঙ্গলে ধর্মের মূর্তি নারায়ণের সঙ্গে প্রায় অভেদ হইয়া পড়িয়াছে। কখনও কখনও তিনি ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া ভক্তকে দেখা দেন বটে, কিন্তু কবি মাঝে মাঝে শূন্যরূপী ধর্মের কথাও বলিয়াছেন। যথা :

এক ব্রহ্ম সনাতন নিরাকার নিরঞ্জন
নিয়ম করিতে কিছু নাঞি। (ডঃ সেন সম্পাদিত রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ১ম সং, পৃ. ৩)

অথবা

না ছিল সয়াল ক্ষিতি বিষম প্রলয় অতি
জীবজন্তু কেহ কোথা নাঞী।
রবিশশী নাঞী রয় সব ধুন্ধুকার ময়
সভেমাত্র আপুনী গোসাঞী॥
বিধিবিষ্ণু পুরন্দর অমর অসুর হর
কেহ জীবজন্তু নাই মনে।
রবিশশী নাহি হয় ঘোর অন্ধকার ময়
আদিমূর্ত্তি তার মধ্যখানে॥ (রূপরামের ধর্মমঙ্গল, পৃ. ২২)

ঘনরাম ধর্মবন্দনায় স্পষ্টই ধর্মকে শূন্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন :

বন্দি পরাৎপর ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত ধর্ম
বিশ্ববীজ অখিল আধান।

বিষপানে প্রহ্লাদে রাখিলে নিরঞ্জন।
সুধন্যারে তপ্ত তৈলে করিলে তারণ॥
সভামধ্যে দ্রৌপদীর লজ্জা কৈলে নাশ।
পূর্ণ কর প্রভু আমাদের অভিলাষ॥
তুমি ধর্ম বৃষধ্বজ বিরিঞ্চি কেশব।
অনাদি অনন্ত নাম অনাথ বান্ধব॥
জতুঘরে পাণ্ডবে রাখিলে ভগবান।
ক্ষীরোদ সমুদ্রে গজে দিলে প্রাণ দান॥

শূন্য শূন্য সনাতন নৈরাকার নিরঞ্জন
নিত্যানন্দ নির্গুণ নির্ব্বাণ ॥
(ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, পীযুষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, পৃ, ৩)

আর এক স্থলে :

এক ব্রহ্ম সনাতন নৈরাকার নিরঞ্জন
নির্গুণ নিদান শূন্য ভরে। (ঐ)

এখানে লক্ষণীয় ধর্মমঙ্গলে ধর্মের বন্দনায়, শূন্যপুরাণে, ধর্মপূজাবিধানে, রামাই পণ্ডিতের অনাদ্য মঙ্গলে, ধর্মনিরঞ্জনকে প্রায়শঃই নৈরাকার, শূন্য, নিরঞ্জন ইত্যাদি বলা হইয়াছে। দশাবতার বর্ণনায় তাঁহাকে বুদ্ধও বলা হইয়াছে (যাদুনাথের ধর্মপুরাণ)। কিন্তু এই 'শূন্য' 'নিরাকার'কে বাদ দিলে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শ প্রমাণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের সঙ্গে ধর্মের দ্বারপাল শ্বেতাই-নীলাই পণ্ডিতদের সাদৃশ্যও আকস্মিক। চৈত্যের সঙ্গে ধর্মশিলার সর্বত্র সাদৃশ্য নাই। ধর্ম কূর্মের উপর আসন করিয়া আছেন ; সুতরাং কোন কোন স্থলে ধর্মশিলাকে কূর্মও বলা হইয়াছে। তবে সর্বত্র ধর্মশিলার আকৃতি কূর্মের মতো নহে। কোথাও ইহা প্রায় গোলাকার, কোথাও ডিম্বাকৃতি, কোথাও দীর্ঘাকৃতি, অনেকটা কাঁকড়াবিছার মতো[১৮]। কূর্মের পৃষ্ঠে আসন করিলেও, ধর্ম কোথাও কোথাও স্বয়ং কূর্ম হইয়া গিয়াছেন। তখন তাঁহার কূর্মরূপী শিলামূর্তিকে খুরা দেওয়া সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। ধর্মের সঙ্গে কূর্ম টোটেমের (Totem) যোগ থাকিলেও কূর্মকে বৌদ্ধ চৈত্য বা স্তূপের সঙ্গে মিলাইয়া লওয়া যায় না। অতএব কূর্মের দৃষ্টান্ত ধরিয়া ধর্মঠাকুরকে কোনও দিক দিয়াই বৌদ্ধ বলা যায় না। তবে তাঁহাকে যে অনেক সময় শূন্য, নিরাকার, নিরঞ্জন বলা হইয়াছে, এবং এখনও অধিকাংশ স্থলে তাঁহার সাকার বিগ্রহ পূজা হয় না—ইহাও প্রণিধান যোগ্য।

অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শূন্যপুরাণ, ধর্মপূজা বিধান ও অনাদ্যের পুঁথিতে (ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত) শূন্যমূর্তির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। ধর্মমঙ্গলের দুইচারি স্থলে ধর্মের শূন্যমূর্তির উল্লেখ থাকিলেও কবিগণ যখন ধর্মের বর্ণনা করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে হিন্দুর পুরাণের অনুযায়ী আকার

১৮ "গোপালপুরের কাঁকড়াবিছা বন্দিব তার পায়"—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল, পৃ. ১৫ (ডঃ বিজিত দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত)।

দিয়াছেন। কখনও তিনি ব্রাহ্মণের বেশে[১৯] কবিকে দেখা দিয়াছেন, কখনও ধবল পাদুকা, ধবল বসন, ধবল উপবীত গলে ধারণ করিয়া শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী[২০] রূপে রঞ্জাবতীকে দেখা দিয়াছেন, এবং রঞ্জার অনুরোধে কৃষ্ণরূপ ধরিয়াছেন—

ভক্তের অধীন সদা ভক্তির ঠাকুর।
পূর্বরূপ কৃষ্ণতনু হইল প্রভুর॥ (মাণিক গাঙ্গুলি)

কোথাও বা তিনি পায়ে জুতা পরিয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া 'রাউতের' বেশে আবির্ভূত হইয়াছেন :

হাঁসা ঘোড়া খাসা জোড়া পায়ে দিয়া মোজা।
অবশেষে বোলাইল গৌউড়ের রাজা॥ (রূপরাম)

অথবা :

হাতে নিল তীরকামঠা পায়ে দিয়া মোজা।
গৌউড়ে বলান গিয়া ধর্মমহারাজা॥ (ধর্মপূজাবিধান)

ধর্মমঙ্গলকাব্যে তাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া মনে হয়।[২১] অথচ ধর্মপুরাণ ও ধর্ম-মঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্বে দেখা যাইতেছে, আদিতে ধর্ম ছিলেন নিরাকার, শূন্যরূপী, নিরঞ্জন। তবে পরে তিনি নীল ও অনিল দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন, নীলের সংস্পর্শে অনিলের গর্ভে ডিম্বের জন্ম হইল, এবং ডিম্ব ভাঙ্গিয়া আকারযুক্ত ধর্ম বাহির হইলেন; তাঁহার নিশ্বাস হইতে জাত উলুকের উপর ভর করিয়া তিনি চৌদ্দযুগ কাটাইয়া দিলেন। তাহার পর তিনি মেদিনী সৃষ্টি করিলেন; অতঃপর তাঁহার অঙ্গজ স্বেদ হইতে আদ্যাদেবীর জন্ম হইল। আদিদেবের সঙ্গে আদ্যাদেবীর বিবাহের পর আদিদেব আদ্যাকে ছাড়িয়া তপস্যা করিতে

১৯ "ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম হাতে দিলা ফুল"—রূপরামের ধর্মমঙ্গল পৃ. ১১ (ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত)

২০ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ময়ূরভট্টের 'শ্রীধর্মপুরাণে'ও (কাব্যটির প্রামাণিকতা তর্কসাপেক্ষ) ধর্মের শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী মূর্তি বর্ণিত হইয়াছে—"শঙ্খচক্রগদাপদ্ম শোভে চারিহাতে"।

২১ "ধর্মঠাকুর শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ পুরুষ। তিনি বৈকুণ্ঠ বা দ্বারিকায় বাস করেন। তাঁহার ভক্তগণের মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠ গমন হয়।...উলুকবাহন হইলেও বহুস্থলেই তিনি গরুড়বাহন। এই সকল কারণে রামাই পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত ধর্মঠাকুরকে আমি প্রধানতঃ বিষ্ণুঠাকুর বলিয়াই অনুমান করি।"—চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শূন্যপুরাণ'—২য় সংস্করণ, পৃ. ৬৩। এই ভূমিকায় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "শিব ও ধর্মঠাকুর অভিন্ন নহেন।" পৃ. ৬১

গেলেন। এদিকে দেবী আদিদেবের বিরহে ব্যাকুল হইয়া বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে চাহিলেন—কিন্তু বিষপানের ফলে তিনি গর্ভবতী হইলেন। কালে তাঁহার তিন পুত্র হইল—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। জন্মিয়াই তাঁহারা বল্লুকা নদীর তীরে তপস্যা করিতে গেলেন। তখন ধর্মঠাকুর (আদিদেব নিরঞ্জন) তিন পুত্রকে পরীক্ষা করিবার জন্য গলিত শবের আকারে তপস্যারত পুত্রদের কাছে ভাসিয়া আসিলেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু ঘৃণাভরে মহাদেবকে দূরে সরাইয়া দিলেন; কিন্তু শিব পিতাকে চিনিতে পারিয়া আর দুই ভাইয়ের দ্বারা পিতার সৎকার করিলেন। ইহাতে ধর্ম শিবের প্রতি খুশি হইয়া আদ্যাদেবীকে বিবাহ করিয়া সৃষ্টি করিতে বলিলেন। আদ্যাদেবী (অবশ্য আদ্যাদেবী শিবেরও জননী) আদিদেবের চিতানলে প্রাণত্যাগ করিয়া পুনরায় দুর্গারূপে জন্মাইলেন, এবং দুইজনে পৃথিবীর নরনারীর দেহে অবস্থান করিয়া জীবযাত্রা রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ধর্মমঙ্গল ও ধর্ম-পূজাবিধান বা সাংযাতখণ্ডে অল্পাধিক বৈচিত্র্যসহ বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি চণ্ডীমঙ্গল-মনসামঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনাতে কোন কোন কবি এই তথ্যটি গ্রহণ করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল এবং জগজ্জীবন ঘোষাল ও বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসামঙ্গলের কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। এই সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনায় কেহ কেহ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ সূত্রের 'নারদীয়' সূক্তের গভীর সাদৃশ্য দেখিয়াছেন, পলিনেশীয় জাতিদের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং মধ্যভারতীয় গোণ্ডজাতীয় আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্বের সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছেন।[২২] অবশ্য এই সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সঙ্গে ঋগ্বেদের কোন কোন সূক্তের মিল আছে,[২৩] তেমনি মনুসংহিতা[২৪], মার্কণ্ডেয়

২২ রূপরামের ধর্মমঙ্গল (ডঃ সেন সম্পাদিত) পৃ. ।৶০—॥৴০

২৩ একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—"তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেহপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্। তুচ্ছ্যেনাভ্ পিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্ মহিনা জায়তৈকম্।" অর্থাৎ—"সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিক জলমগ্ন ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন"। (রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত)

২৪ আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ॥ (মনু—১ম)

অনু: এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসার এককালে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ছিল, তখনকার অবস্থা প্রত্যক্ষের

পুরাণে[২৫] আদ্যাশক্তি হইতে ব্রহ্মা প্রভৃতির জন্মকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বৃহদ্ধর্ম পুরাণেও ব্রহ্মাদির জন্ম ও তাঁহাদের পরীক্ষার বৃত্তান্ত আছে।[২৬] শুধু তাহাই নহে, নেপালী বৌদ্ধ মতে ('বিশ্বকোষ'—সৃষ্টিতত্ত্ব) ত্রিকাণ্ডশেষ, কারণ্ডব্যূহ, মহাদেব দাসের ধর্ম গীতা (ওড়িয়া), ময়ূরভঞ্জের মহিমাধর্ম ইত্যাদিতে যে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে ধর্মমঙ্গল ও শূন্যপুরাণের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।[২৭] কেহ কেহ আবার এই সৃষ্টিতত্ত্বে গৌতমীয় শূন্যবাদ, সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব এবং বেদান্তের মায়াবাদের প্রভাবও লক্ষ্য করিয়াছেন।[২৮]

সুতরাং উল্লিখিত তথ্যাদি হইতে ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনার মূলে বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্ব, পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব, পরবর্তী কালের বৌদ্ধদর্শন, আদিবাসীদের ধর্মাচার, নাথধর্ম, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র প্রভৃতির বিশেষ প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ধর্মঠাকুরকে পুরাপুরি বৌদ্ধদেবতা কোনক্রমেই বলা যায় না। অবশ্য যাঁহারা ধর্মঠাকুরকে বৈদিক সূর্য ও বরুণ দেবতার সঙ্গে একীভূত করিতে চাহেন, তাঁহাদের যুক্তিও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহাদের মতে ধর্মঠাকুর মূলতঃ প্রাগার্য সূর্যদেবতা।[২৯] কেহ বা ইঁহাকে বৈদিক সূর্যদেবতা[৩০], বা ঈরাণীয় সূর্যদেবতা[৩১] বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন। আবার আর এক মতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ যে সূর্যোপাসনা সূচনা করিয়াছিলেন, তাহারই সঙ্গে নাকি ধর্মঠাকুরের মিল আছে।[৩২] ধর্মঠাকুর কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন—ধর্ম-ভক্তের তাহাই

গোচরীভূত নয় ; কোন লক্ষণা দ্বারা অনুমেয় নয় ; তখন ইহা তর্ক ও জ্ঞানের অতীত হইয়া সর্বতোভাবে যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল। (পঞ্চানন তর্করত্ন অনূদিত)

২৫ বিষ্ণুঃশরীর গ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥
(মার্কণ্ডেয়, ৮১ অধ্যায়

অনু: তুমি আমাকে, ঈশান ও বিষ্ণুকে শরীর গ্রহণ করাইয়াছ। অতএব কে তোমার স্তব করিতে সমর্থ ?

২৬ বৃহদ্ধর্মপুরাণ, মধ্য খণ্ড, ১ম অধ্যায়, ৮-৩৩ শ্লোক

২৭ বিস্তারিত আলোচনার জন্য শূন্যপুরাণের (২য় সংস্করণ) ৩১-৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য,

২৮ ঐ, পৃ, ৬১

২৯ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

৩০ ডঃ সেন সম্পাদিত রূপরামের ধর্মমঙ্গল (ভূমিকা)

৩১ ঐ, পৃ. ৮০

৩২ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৫৭ (অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস লিখিত 'ভারতীয় সূর্যপূজার একটি বৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

বিশ্বাস। ভারতীয় পুরাণেও সূর্যদেবতার এই শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। ধর্মপূজা বিধানেও ধর্মকে শুধু শূন্য বলা হয় নাই, তাঁহাকে সূর্যও বলা হইয়াছে।[৩৩] এখনও অনেক স্থলে ধর্মকে সূর্য মূর্তি বলিয়া পূজা করা হয়।[৩৪] ঐতিহাসিকগণও বিশ্বাস করেন যে, ধর্মশিলা সূর্যের প্রতীক। ধর্মশিলায় যে রক্তচন্দন অনুলিপ্ত থাকে, তাহাকেও আধুনিক গবেষকগণ সূর্য্যকিরণের প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন।[৩৫] বাঙলাদেশে বহু রেবন্ত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। অর্বাচীন পুরাণের মতে ইনি সূর্যপুত্র, ইঁহার কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করিবার ক্ষমতা আছে। পশ্চিমবঙ্গে স্ত্রীসমাজে প্রচলিত ইতুপূজা, পূর্ববঙ্গের করম-পূজা ময়মনসিংহ-শ্রীহট্টে মেয়েলি সমাজের সূর্যের ব্রত ইত্যাদি নানা উপাদান উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ ধর্মঠাকুরকে সূর্য বলিয়াই মানিয়া লইয়াছেন।[৩৬] ধর্মমঙ্গলকাব্যের নায়ক কশ্যপ-পুত্র, ধর্মপূজা প্রচারের জন্য মর্ত্যে জন্ম গ্রহণ করেন। সূর্যও কশ্যপ তনয় (কাশ্যপেয়)। রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়া প্রাণ ত্যাগে উদ্যত হইলে, স্ত্রীহত্যার পাপ সূর্যকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ভারতের নানা স্থানে যে সমস্ত সূর্য মন্দির আছে, সেখানে কুষ্ঠব্যাধি নিরাময়ের জন্য বহু রোগী সমাগত হয়। ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসী ওঁরাও জাতির 'ধর্মেশ' সূর্যদেবতা রূপেই পূজিত হন। বাঙলাদেশে সূর্যব্রতে (রাল দুর্গাব্রত) সূর্য কুষ্ঠরোগ আরোগ্যকারী বলিয়া বর্ণিত। ময়ূরভট্ট নামক কোন এক প্রাচীন কবি নিজের কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য করিবার জন্য সংস্কৃতে সূর্য-শতক রচনা করিয়াছিলেন। ধর্মের চড়ককেও কেহ কেহ সূর্য্যাবিবর্তনের প্রতীক বলিয়া বিশ্বাস করেন। আদিম যুগের প্রাগৈতিহাসিক সমাজে বৃষ্টিপাতের জন্য সূর্যের পূজানুষ্ঠান বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। ধর্মমঙ্গলকাব্য

---

৩৩ ডঃ সেন রূপরামের ধর্মমঙ্গলের প্রথম সংস্করণে ধর্মকে বৈদিক সূর্যদেবতা বলিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে তাহাতে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন—"ধর্মঠাকুর সূর্যদেবতাও বটেন। তবে এবিষয়ে জোর করে কিছু বলা অযৌক্তিক"। আবার অল্প পরেই তিনি হাকন্দে লাউসেনের স্বহস্তে শিরশ্ছেদের আখ্যানে "কিছু তান্ত্রিক সূর্যোপাসনার ব্যাপার" লক্ষ্য করিয়াছেন।

৩৪ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের উক্ত গ্রন্থ পৃ ৫০৫

৩৫ ঐ, পৃ ৫১৭

৩৬ ঐ, পৃ ৫৫১-৫১

ধর্মকে সর্বশুক্ল বলা হইয়াছে।[৩৭] বৈদিক বা পৌরাণিক সূর্য সর্বশুক্ল নহেন, তিনি 'জবাকুসুম সঙ্কাশং'। কিন্তু অর্বাচীনদের সমাজে সূর্যকে শ্বেতরূপেই পূজা করা হয়, তাঁহার নিকট সাদা রঙের পশুপাখী বলি দেওয়া হয়। এই সমস্ত নানা উপাদান হইতে অনেকে মনে করেন যে, বাঙলার ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনার মূলে সূর্যোপাসনা বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছে। আদিম সূর্যোপাসনা, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের আনীত সূর্যপূজা, বৈদিক সূর্য, পৌরাণিক সূর্য, ছড়াব্রতকথার সূর্য আরাধনা—ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার সূর্যের প্রভাব ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনার মূলে একদা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কেহ কেহ নিঃসন্দেহ।[৩৮]

আধুনিক কালে কোন কোন গবেষক ধর্মঠাকুরের সঙ্গে বৈদিক বরুণের সাদৃশ্য ও প্রভাব আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। ১৯৪২ সালে এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে[৩৯] অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 'Dharma Worship' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, বাঙলার ধর্মঠাকুর বৈদিক বরুণেরই আধুনিক সংস্করণ। ইহার পর ডঃ সুকুমার সেন ১৯৪৪ সালে রূপরামের ধর্মমঙ্গলের ভূমিকায় ধর্মঠাকুরকে পুত্রবর-প্রদানকারী বৈদিক বরুণদেবতা বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং দেখাইলেন যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রোহিত-শুনঃশেফের কাহিনীর সঙ্গে ধর্মমঙ্গলে হরিশ্চন্দ্র-লুইচন্দ্রের আখ্যায়িকার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এমন কি ধর্মের গাজনে যে ছাগ বলি দেওয়া হয়, ডঃ সেনের মতে তাহাও বরুণের উদ্দেশে প্রদত্ত বলির হুবহু অনুরূপ।[৪০] রূপরামের ধর্মমঙ্গলের দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি এই তথ্যটি

---

৩৭ ধবল অঙ্গের জোতি ধবল মাথার ছাতি
ধবল বরণে বাড়ীঘর।
ধবল ভূষণশোভা অনুপম মুনিলোভা
আলো কৈলে পরম সুন্দর॥ (রূপরামের ধর্মমঙ্গল)

৩৮ বিস্তারিত আলোচনার জন্য ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস এবং ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের *Obscure Religious Cults as the Background of Bengali Literature* দ্রষ্টব্য।

৩৯ JRASB, 1942, Vol. VIII (ইতিপূর্বে উল্লেখ উদ্ধৃত হইয়াছে।)

৪০ রূপারামের ধর্মমঙ্গল (১ম সং), ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

বিস্তারিতভাবে নানা তথ্য উদ্ধৃতিসহ প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার উপস্থাপিত তথ্যগুলি হইতে দেখা যাইবে যে, ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ও ধর্মোৎসবের কোন কোন কৃত্যের সঙ্গে বৈদিক বরুণের ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ও ধর্মোৎসবের কোন কোন কৃত্য এবং বৈদিক বরুণের পূজা ও কাহিনীর কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে যে, রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণের বরে রোহিতাশ্ব নামক এক পুত্র লাভ করেন। কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার অপুত্রক নাম ঘুচিলে পুত্রকে বরুণের নিকট বলি দিবেন। রোহিতাশ্ব বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সমস্ত বুঝিতে পারিল এবং দৈববাণীর আদেশে পথে বাহির হইল। তখন হরিশ্চন্দ্র বরুণের রোষ শান্ত করিবার জন্য ঋষি অজীগর্তের দ্বিতীয় পুত্র শুনঃশেফকে কিনিয়া লইয়া তাহাকেই তিনি পুত্রের পরিবর্তে বলিদানের উদ্যোগ করিলেন। তাহাকে যখন বলির জন্য উপস্থিত করা হইল, তখন শুনঃশেফ বরুণের নিকট প্রার্থনা জানাইতে লাগিল, ফলে বরুণের কৃপায় তাহার বন্ধন স্খলিত হইল—তাহাকে বলি হইতে হইল না। এই আখ্যানটি সমস্ত ধর্মমঙ্গলকাব্যে 'হরিশ্চন্দ্র পালা' নামে বর্ণিত হইয়াছে—ঘটনা-বস্তুও প্রায় একপ্রকার। শুধু ধর্মমঙ্গল কাব্যেই নহে, রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচারিত শূন্যপুরাণেও এ কাহিনী আছে, যাদুনাথের ধর্মপুরাণে লাউসেনের কিছুমাত্র উল্লেখ না থাকিলেও হরিশ্চন্দ্রের গল্প বিস্তারিত আকারে বর্ণিত হইয়াছে। ডঃ সেন আরও দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে যেমন বরুণের শোভাযাত্রা উৎসব হইত (মৈত্রায়ণী সংহিতায় বর্ণিত), ধর্মোৎসবে বর্ণিত ধর্মের 'সাংযাত' অবিকল সেইরূপ। ডঃ সেন ধর্মের পরিকল্পনায় সূর্য-তনয় যমেরও কিছু কিছু প্রভাব দেখিয়াছেন। অতঃপর প্রাপ্ত তথ্যাদি হইতে ধর্মঠাকুরের স্বরূপ সম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

(১) শূন্যপুরাণ, অনাদ্যমঙ্গল, ধর্মপূজাবিধান ও বিবিধ ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মের বর্ণনায় বহুস্থলে শূন্যমূর্তির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে বৌদ্ধপ্রভাব প্রমাণ করা দুরূহ।

(২) প্রাগার্য অস্ট্রিক সমাজের সূর্যোপাসনা, বৈদিক সূর্যোপাসনা, বহির্ভারতীয় সূর্যোপাসনার আদর্শ এবং বাঙলার পল্লীকন্যাদের সূর্যের ব্রতকথা-

পাঁচালী হইতে মনে হয়, ধর্মঠাকুরের সঙ্গে প্রাচীন-অর্বাচীন, বৈদিক-অবৈদিক সৌর'কাল্টের' কিছু কিছু যোগাযোগ ছিল।

(৩) বৈদিক শুনঃশেফের গল্প ও ধর্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র পালা হইতে মনে হয়, বৈদিক বরুণ দেবতারও কিছু কিছু প্রভাব ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনার মূলে নিহিত ছিল। ধর্মমঙ্গলের বা শূন্য পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্বের সাদৃশ্যও লক্ষণীয়।

(৪) পরবর্তী কালে ধর্মমঙ্গল কাব্যের ধর্ম পুরাণের বিষ্ণুর সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছিলেন।

(৫) শৈব ও নাথধর্মেরও কিছু কিছু প্রভাব ধর্মপরিকল্পনায় লক্ষ্য করা যায়। পল্লী বাঙলার শিবের গাজন ও ধর্মের গাজন অনেক স্থলে এক প্রকার বলিয়া মনে হয়।

(৬) ধর্মশিলা ও ধর্মোৎসবের নানা কৃত্য দেখিয়া মনে হয়, আদিম বাঙলার কোলগোষ্ঠীর শিলা-'টোটেম' জাতীয় ধর্মাচার এই উৎসব অনুষ্ঠান ও উপাসনা প্রণালীর অন্তরালে কার্যকরী হইয়াছে। পরবর্তী কালে অবশ্য ইহাতে শিবলিঙ্গ ও নারায়ণশিলার প্রভাবও দুর্লক্ষ্য নহে।

(৭) পরবর্তী কালে ইহাতে ইসলামের প্রভাবও প্রত্যক্ষ করা যায়। শূন্য-পুরাণের 'নিরঞ্জনের রুষ্মা', ধর্মের ব্রত-উপাসনায় 'জালালি কলিমা'র[৪১] আবৃত্তি (ছোট জালালি ও বড় জালালি),[৪২] ফকিরের বেশে নিরঞ্জনের

---

৪১ কলিমা জালাল—রুদ্রবাক্য (আঃ)। ধর্মপূজাবিধানে আছে, "হংস অথবা কবুতরং নিত্বা পশ্চিমাভিমুখং কিম্বা পঠেৎ।" কবুতর শব্দটি আরবী, পশ্চিমদিক মুসলমানদের নিকট পবিত্র। সুতরাং ধর্মপূজায় কিঞ্চিৎ পরিমাণে ইসলামি প্রভাব পড়িয়াছিল। কলিমা জালালে বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণদের ধ্বংস করিবার জন্য নিরঞ্জন আজপুরে যবনবেশে প্রবেশ করিলেন। ইহাতে খোদা ও ধর্ম, মুহম্মদ ও ব্রহ্মা, পেকাম্বর (পয়গম্বর) ও বিষ্ণু, আদম ও শিব, হাওয়া ও চণ্ডী, নুরবিবি (ফতিমা) ও পদ্মাবতী, গাজি ও গণেশ, কাজি ও কার্তিককে এক করা হইয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে মুসলমানেরা দেবতা হইয়াছেন, ফকিরগণ মুনি, শেখ হইয়াছেন নারদ এবং ইন্দ্র হইয়াছেন মৌলানা। (দ্রষ্টব্য, শূন্যপুরাণ, ২য় সং, পৃ. ১৬)

৪২ নিরঞ্জনের রুষ্মা বড়জালালি এবং দরবেশদের আধ্যাত্মিক ছড়া ছোট জালালি নামে পরিচিত।

আবির্ভাব,[৪৩] প্রভৃতি ইঙ্গিত হইতে দেখা যাইতেছে যে, মুঘলযুগে, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মনিরঞ্জনের পরিকল্পনায় কিছু কিছু ইসলামি প্রভাব পড়িয়াছিল।

পরিশেষে আমরা ধর্মঠাকুরের স্বরূপ সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মন্তব্যকেই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহি—"ধর্মঠাকুরের আদিতমরূপ যাহাই হউক না কেন, যেরূপে তাঁহাকে পাইতেছি তাহা আধুনিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট" (রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ১ম সংস্করণ)। এই পরিপুষ্টি সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। অবশ্য একথাও স্বীকার্য, ধর্মমঙ্গল-কাব্যের ধর্মনিরঞ্জন প্রত্যক্ষভাবেই বিষ্ণু-নারায়ণে রূপান্তরিত হইলেও শূন্য পুরাণ ও ধর্মপূজাবিধানে[৪৪] শূন্যমূর্তি ও লৌকিক শৈবধর্মের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়।

'ধর্ম'-সম্প্রদায় ॥

বাঙলাদেশে ধর্মের পূজা-উৎসব-অনুষ্ঠান ও ব্রতকৃত্য যে একান্ত অভিনব ও বিচিত্র ধর্মাচরণের দ্বারা জটিলতর হইয়াছে তাহা সকলে একপ্রকার জ্ঞাত আছেন। ধর্মঠাকুরের নিত্য, বার্ষিক ও মাসিক—তিনপ্রকার অনুষ্ঠান পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গে অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয়। প্রায় গ্রামেই বিভিন্ন ধর্মঠাকুরের মন্দিরে, আটচালায়, বৃক্ষমূলে বিভিন্ন নামে গ্রামরক্ষক ধর্মঠাকুরের পূজা-উপাসনা হয়। কোন্ দূরবর্তী ইতিহাসের সঙ্গে ইহার যোগাযোগ! তারপর কত ধর্মকৃত্যের বিবিধ বিচিত্র স্রোত এই প্রাগৈতিহাসিক ধর্মঠাকুরের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে—মহাযান বৌদ্ধ, তন্ত্র, পৌরাণিক হিন্দু, বৈদিক সংস্কারের ছিটেফোঁটা, কোলগোষ্ঠীর বিস্মৃতপ্রায় অধ্যাত্ম বৈশিষ্ট্য—সব কিছু মিলিয়া মিশিয়া শিলামূর্তি ধর্মঠাকুরের পূজা-উপাসনাকে এখনও জিয়াইয়া

৪৩ "ফকিরের বেশে ধর্ম দেখা দিল রনে"—সীতারামদাসের ধর্মমঙ্গল

৪৪ ডঃ শহীদুল্লাহের মতে "ধর্মপূজা হিন্দুধর্মের সহিত বৌদ্ধমতের (মূলতঃ শূন্যবাদের) মিশ্রণে উৎপন্ন।...ধর্মপূজাবিধান হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্মপূজায় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব গণেশ সূর্য প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতার পূজা আছে, ব্রহ্মাণী, মহেশ্বরী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি শক্তির পূজা আছে; বিষহরী বাশুলী মঙ্গলচণ্ডিকা ষষ্ঠী বিশালাক্ষী—এই লৌকিক দেবতাগুলির পূজা আছে।"—শূন্যপুরাণ, ২য় সং, পৃ. ৭-৮

রাখিয়াছে, এখনও ধর্মের পূজারী ও ভক্তসম্প্রদায় বর্তমান আছেন। সমাজের নিম্নশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণী, ডোম-নমশূদ্র-যুগী হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থাদি সর্বশ্রেণীর ভক্ত ধর্মঠাকুরের পূজা উৎসবে যোগদান করেন, অংশ গ্রহণ করেন, মানত করেন, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে ঘটা করিয়া পূজা ও বলি দিয়া থাকেন। কেবল এই একটি উপাসনায় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সমাজের ভেদ ঘুচিয়া যায়, ডোম পূজারীকেও ব্রাহ্মণভক্ত ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া থাকেন।)

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, চব্বিশ পরগণার বারুইপুর অঞ্চলের কোন কোন স্থলে ধর্মের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইলেও বর্ধমান বিভাগের অন্তর্গত গ্রামে বা ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্ভুক্ত গ্রামে ধর্মপূজায় ধর্মের মূর্তি ব্যবহৃত হয় না। শিলামূর্তিগুলি বিভিন্ন নামে নানা অঞ্চলে পূজিত হয়। ধর্মমঙ্গলকাব্যের কবিগণ দিগ্‌বন্দনা অংশে এই সমস্ত গ্রাম্য দেবতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতেন। এখানে মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল হইতে ধর্মদেবতার তালিকা দেওয়া যাইতেছে :

সেলডিহার বাঁকুড়া রায় বন্দি একমনে।
অসংখ্য প্রণতি শীতল সিংহের চরণে॥
ফুলুয়ের ক্ষেতে সিংহ বৈতলের বাঁকুড়া রায়।
শুদ্ধভাবে বন্দি দোঁহে নত হয়ে কায়॥
পাণ্ডু গ্রামের বুড়া ধর্মে বন্দিয়া সাদরে।
শ্যামবাজারের দলুরায়ে দিয়া জয় জয়কারে।
দেপুরের জগৎ রায়ে যোড় কর্যা কর।
গোপালপুরের কাঁকড়া বিছায়[৪৫] বন্দি তারপর॥
সিয়ামের কালাচাঁদ শ্রিদাসের বাঁকুড়া রায়।
বন্দিব নিরন্তর নতি কর্যা নত কায়॥
গোপুরের স্বরূপ নারায়ণ স্বর্ণসিংহাসনে।
বন্দিয়া বন্দিব মঙ্গলপুরে রূপনারায়ণে॥
পশ্চিমপাড়ার যাত্রাসিদ্ধি বন্দিয়ে তাঁহার।
বরুণাগ্রামের বন্দিব মোহন রায়॥

৪৫ এ বিষয়ে ডঃ ভট্টাচার্যের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, "বলা বাহুল্য গোপালপুর গ্রামের ধর্ম শিলাটি দেখিতে কাঁকড়াবিছার আকৃতি ছিল বলিয়াই ইহা কাঁকড়াবিছা ধর্মঠাকুর নামে পরিচিত।"—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

গুচুড়ে গ্রামের বন্দিব শীতল নারানে।
আলগুচিন্তার ক্ষুদিরায়ে বন্দি সাবধানে ॥
আকুটি কুলেমালার ধর্মে করিয়া স্তবন।
বন্দিপুরের শ্যামরায়ের বন্দিব চরণ ॥
জাড়াগ্রামে কালুরায়ে কামিন্তা সহিত।
যাজপুরে দেহারা বন্দি দার্ঢ্য করি চিত ॥

এখানে মাণিক গাঙ্গুলি ধর্মঠাকুরের বিশেষ বিশেষ নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "স্থানে স্থানে মূর্তিভেদ মহিমা বিস্তর"।[৪৬] ধর্মমঙ্গলের কবিগণ বেশ উদারহৃদয় ও অসাম্প্রদায়িক ছিলেন : তাঁহারা ধর্মের বন্দনাপ্রসঙ্গে নানা গ্রামদেবতার পূজাবন্দনাও সারিয়া লইতেন (দ্রষ্টব্য—রূপরাম ও মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল)।

এই প্রসঙ্গে ধর্মের সঙ্গে কূর্মমূর্তির সম্পর্কের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, ধর্মঠাকুরই যে কূর্মমূর্তি তাহা মনে হয় না। কারণ, "সকল ধর্মঠাকুরই প্রকৃত কচ্ছপাকৃতি নয়, অধিকাংশই সুগোল কিংবা ডিম্বাকৃতি।" কিন্তু বহু ধর্মশিলার আকারই কচ্ছপাকৃতি, কোথাও-বা কচ্ছপাকৃতি প্রস্তরাসনের উপর ধর্মশিলা প্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি আমরা হাওড়া-হুগলী-বর্ধমানের কিছু কিছু ধর্মমন্দিরের পরিচয় লইয়া দেখিয়াছি যে, এই অঞ্চলের অধিকাংশ ধর্মমন্দিরে হয় কূর্মাকৃতি ধর্মশিলা আছে, অথবা কূর্মাসনে চতুষ্কোণ, গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি ধর্মশিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। ময়ূরভট্টের নামে প্রচারিত শ্রীধর্মপুরাণে দেখা যাইতেছে (পৃঃ ৩১—৩৩) ধর্মঠাকুর রামাই পণ্ডিতকে ধর্মশিলা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—যাবতীয় ধর্মশিলা কূর্ম ও কমঠাকৃতি। ধর্মশিলা কূর্মমূর্তি কেন, রামাইয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে মার্কণ্ডেয়

---

৪৬ এখনও পশ্চিমবঙ্গের এক এক গ্রামের ধর্মঠাকুরের এক এক প্রকার নাম লক্ষ্য করা যায়। আমরা এখানে বাঁকুড়া ও হুগলী জেলার কয়েকটি গ্রামের নাম ও সেই গ্রামের ধর্মশিলার উল্লেখ করিলাম :—রঘুনাথপুর—যাত্রাসিদ্ধি রায় ; তাজপুর—ক্ষুদিরায় ; বেজ্রাই—ক্ষুদিরায় ; খাটো গাঁ—বাঁকুড়া রায় ; নস্কর দীঘি—যাত্রাসিদ্ধি রায় ; গোহাট—স্বরূপনারায়ণ ; আমোদপুর—বুড়ো রায় ; বেউড় গ্রাম—বাঁকুড়া রায়। সাঙ্কিরা—চিন্তামণি ও শীতল নারান ; মরিরা—কাঁকড়া বিছা ; গেলিয়া—দোলুরায় ; রঘুনাথপুর—ক্ষুদিরায় ; ভারাহাট—যাত্রাসিদ্ধি রায় ; মদিনাপুর—কত্তে সিং ; শ্রীপুর—সন্ন্যাসী রায় ; দুর্গাপুর—বংশী রায় ; গোপালপুর—কাঁকড়া বিছা ; চটড়া—কালুরায়।

মুনি ব্যাখ্যা করিলেন—সাগর মন্থনে শ্রীহরি কূর্মরূপ ধরিয়া মন্দর পর্বত ধারণ করিয়াছিলেন, দেবগণও মন্থনের পর মহানন্দে কূর্মরূপী নারায়ণের পূজা করিয়াছিলেন। দেবগণের প্রার্থনায় নারায়ণ বলিলেন যে, তাঁহার কূর্মমূর্তি নরলোকে প্রচারিত হইবে (পৃঃ ৫২-৫৪)। অবশ্য এই কাব্যের প্রামাণিকতা অতি সন্দেহজনক বলিয়া ইহার তথ্যাদি অতি সাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে। তবে পশ্চিমবঙ্গের ধর্মমূর্তির সঙ্গে কূর্মের যে সংযোগ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।[৪৭]

একদা ধর্মঠাকুর নিম্ন সমাজে পূজিত হইতেন, এবং এখনও সেই ধারা বর্তমান আছে। ডোমজাতির সেবকগণ 'পণ্ডিত' উপাধি ধারণ করিয়া যজ্ঞোপবীতের পরিবর্তে তাম্রদীক্ষার (অর্থাৎ তামার তাগা ও অঙ্গুরীয় ধারণ) পর ব্রাহ্মণপুরোহিতের পর্যায়ে উন্নীত হইয়া ধর্মের প্রধান পূজক রূপে সকলের শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণও ডোমপণ্ডিতকে ধর্মপূজার সময় বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তবে ইদানীং শুধু ডোমসমাজে নহে, অন্যান্য জল-অচল হীনবৃত্তির সমাজেও ধর্মপূজার প্রচার আছে। চণ্ডাল ব্যতীত জেলে, নাপিত, যুগী, কৈবর্ত, স্বর্ণকার, বাগ্‌দী, মাঝি, সদ্‌গোপ, কুমোর, ধোপা, মোদক, শুকলি, বাইতি, আগুরি[৪৮] প্রভৃতি নানা নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেও

---

৪৭ অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এই সমস্ত ধর্মশিলা "were shaped like tortoises" (JRASB, vol. VIII, 1942)

৪৮ ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণে নিম্নলিখিত জাতিসমূহ তাম্রদীক্ষা লইয়া ধর্মের আরাধনা করিয়াছিল :

সদ্‌গোপ কৈবর্ত আর গোয়ালা তাম্বুলি।
উগ্রক্ষেত্রী কুম্ভকার একাদশ তিলি॥
যোগী ও আশ্বিন তাঁতী মালী মালাকর।
নাপিত রজক দুলে আর শঙ্খধর॥
হাড়ি মুচি ডোম কলু চণ্ডাল প্রভৃতি।
মাজি ও বাগদী মেটে নাহি ভেদ জাতি॥
স্বর্ণকার সুবর্ণবণিক কর্মকার।
সূত্রধর গন্ধবেণে ধীবর পোদ্দার॥
ক্ষত্রিয় বারুই বৈদ্য পোদ পাকমারা।
পরিল তাম্রের বালা কায়স্থ কেওরা॥

ধর্মপূজার বিশেষ প্রচার আছে। তবে এখন বহু স্থলে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য স্থাপিত হইতেছে। ধর্মোৎসবে ব্রাহ্মণপুরোহিতও নেতৃত্ব করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের অধিকার স্থাপিত হইলেও ডোমপুরোহিতকে বাদ দিয়া ধর্মোৎসব হইতে পারে না। তাই ব্রাহ্মণপুরোহিতের পূজার পর, পূজামণ্ডপে যথারীতি ডোমপুরোহিতের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ধর্মপূজার ইহা একটি নূতন বৈশিষ্ট্য যাহা নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

ধর্মপূজার অনুষ্ঠানে একাধিক শিলামূর্তির পূজা ও স্থাপনা হয়,—একটি স্বয়ং ধর্ম, আর একটি 'কামিন্যা' বা তাঁহার কামিনী (স্ত্রী ?), আবরণদেবতার শিলামূর্তি স্থাপন করা হয়। পুরাণোক্ত ও অন্যান্য অপৌরাণিক গ্রাম্য দেবদেবীর পূজাও এই অনুষ্ঠানে বাদ যায় না। যেখানে মন্দিরে শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানে নিত্যপূজায় কোন বাধা নাই ; কিন্তু যেখানে মাসিক বা বার্ষিক পূজার অনুষ্ঠান হয়, সেখানে ডোমপণ্ডিতদের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত ধর্মশিলাকে মহাসমারোহে উৎসব প্রাঙ্গণে আনয়ন করা হয়। সে অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণও যোগ দিয়া থাকেন। ভোগরাগ আরাত্রিক অনেক সময় তাঁহাদের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়। এই পূজা-অনুষ্ঠানের বিচিত্র জটিল ব্যবস্থা ও প্রকরণ অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক। ধর্মঠাকুরের মোটামুটি তিন প্রকার পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। একটি—নিত্যসেবা ; প্রতিষ্ঠিত ধর্মমন্দিরে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত (ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামে) বা ডোমপুরোহিত যৎসামান্য নৈবেদ্য দিয়া প্রত্যহ পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু দেবতার বাৎসরিক উৎসব খুব ঘটা করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মমণ্ডপে প্রায় বারো দিন ধরিয়া উৎসব চলে, চৈত্র-সংক্রান্তি হইতে শ্রাবণী পূর্ণিমা পর্যন্ত সার্বজনীন উৎসব হইয়া থাকে। তবে অধিকাংশ স্থলেই বৈশাখ মাসে উৎসব সমাধা হইয়া যায়।) ধর্ম রাজা বলিয়া রাজোচিতভাবেই তাঁহার উৎসব হয়। তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ, সেবা,

---

এবিষয়ে শূন্যপুরাণে (২য় সং) বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। অধ্যাপক ক্ষিতীশ-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দেখিয়াছেন যে, মেদিনীপুরের ধর্মের উপাসকগণের প্রায় সকলেই ডোম। বাঁকুড়ার ডোমপণ্ডিতগণ পঁড়িত নামে পরিচিত। বীরভূমে কৈবর্ত, স্বর্ণকার, বর্ণব্রাহ্মণ (গ্রহবিপ্র), কলিকাতার কাছাকাছি ধর্মের পুরোহিত বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে আসিয়া থাকেন। গড়িয়া, চাকুরিয়া, বেলপুকুর অঞ্চলের পুরোহিতগণ ডোমসম্প্রদায়ভুক্ত, চেতলায় ধর্মের পুরোহিতটি যুগী সম্প্রদায়ের।—JRASB, vol. VIII, 1942

ভোগরাগ, কামিন্যার সঙ্গে বিবাহ, স্নানযাত্রা প্রভৃতি ব্যাপারের একটা সুদীর্ঘ কৃত্য ভক্তগণ অতিশয় কঠোর কৃচ্ছ্রতাসহ পালন করিয়া থাকেন। এই উপলক্ষে গাজনের বিপজ্জনক আচার-অনুষ্ঠান, আগুনের উপর দিয়া হাঁটা, হাতের তালুতে আগুন লইয়া লোফালুফি খেলা, কাঁটাগাছে গড়াগড়ি দেওয়া, পরস্পরে যুদ্ধের অভিনয়, লাউসেনের অঙ্গ কাটিয়া ধর্মপূজার অনুকরণের অভিনয়, শূন্যপুরাণ অর্থাৎ রামাই পণ্ডিতের কড়চা আবৃত্তি, ধর্মমঙ্গলের কাহিনী পালাক্রমে প্রতি রাত্রিতে পাঠ, বলিদান, ইত্যাদি গ্রাম্য ও প্রাচীন কৌমের অনেক অনুষ্ঠান ধর্মপূজার উৎসবে এখনও চলে। তৃতীয় প্রকার পূজা গৃহভরণ বা 'ঘরভরা'। বারো দিন ধরিয়া এই উৎসব হয় বলিয়া ইহাকে 'বারমাতি'ও বলে। এই বারো দিন বারো পর্যায়ে ধর্মমঙ্গল কাব্যও আবৃত্তি করা হয়। এই 'ঘরভরা' উৎসবে বেশ ঘটা হইয়া থাকে, এবং সেই প্রসঙ্গে গোটা ধর্মমঙ্গল কাব্যখানা পড়া হইয়া থাকে। কেহ মানসিক করিয়া সিদ্ধকাম হইলে এই উৎসবে বহু ব্যয় করিয়া ধর্মের পূজা দিয়া থাকেন। বারো দিন বারোটি শিলামূর্তি, বারো প্রকার উপকরণের সাহায্যে এই উৎসবে বহু ভক্ত যোগদান করিয়া থাকেন। সেই অনুষ্ঠানে জাতিপাঁতির ভেদ একেবারে মুছিয়া যায়, বরং ডোম সম্প্রদায়ই তাহাতে অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকেন। ভোগরাগ নিবেদনে ব্রাহ্মণপুরোহিত সংস্কৃতে মন্ত্র বলিলেও পরে ডোমপুরোহিত আসিয়া বাংলা মন্ত্র আবৃত্তি করিবার পর অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয়। এই 'ঘরভরা' উৎসবের প্রতিটি অনুষ্ঠানে রামাই পণ্ডিতের ছড়া কাটিয়া পুরোহিতগণ পূজাদি নির্বাহ করেন। অপুত্রক রমণীরা পুত্র লাভ করিবার জন্য দেবতার কাছে ধর্ণা দিয়া, সংযম পালন করিয়া, বলি-দেওয়া ছাগের কর্তিত মুণ্ডটি হাঁড়িতে ভরিয়া, তাহা কোলে ধরিয়া সারারাত্রি জাগিয়া ধর্মের কাহিনী শুনিয়া থাকেন, কুষ্ঠব্যাধি ও আরও নানা দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের জন্য শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ইতরভদ্র, ব্রাহ্মণশূদ্র—সকলেই পরম ভক্তিভরে ধর্মদেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতে উৎসব প্রাঙ্গণে সমবেত হন। যদিও ধর্মোৎসবে ব্রাহ্মণদের হস্তক্ষেপের জন্য পৌরাণিক প্রভাব ও শিবের গাজন ইহাকে যুগ ও কালের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে, তবু ইহাতে গ্রাম্য আদিম সংস্কার এখনও অনেকটা বজায় আছে। বস্তুতঃ ধর্ম-মঙ্গলের ধর্মঠাকুরকে নারায়ণে রূপান্তরিত করিবার জন্য ধর্মমঙ্গলের কবিগণ

(প্রায়ই ব্রাহ্মণ) চেষ্টা করিলেও নিম্নবর্ণদের প্রাধান্য ও প্রভাব এই জীবন্ত লোকধর্ম হইতে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। ইহার জটিল পূজা-পদ্ধতি, আচার-কৃত্য, প্রভৃতিতে যেমন লোকজীবনের বিশেষ প্রভাব আছে, তেমনি আবার প্রাচীন বৈদিক বা পৌরাণিক সংস্কারও ইহার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া গিয়াছে। বাঙলাদেশে যথার্থ ধর্মসমন্বয় সন্ধান করিতে হইলে ধর্মপূজার মধ্যেই তাহার স্বরূপ পাওয়া যাইবে।

২

'ধর্ম'-সাহিত্য

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ষোড়শ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ধর্ম-ঠাকুরের পূজা ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীসংক্রান্ত বহু পুঁথি রচিত হইয়াছে, অনেক পুরাতন পুঁথির অজস্র নকল করা হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই সর্বপ্রথম এই ধর্ম সাহিত্যের রহস্যোদ্ধার করিয়া এই বিচিত্র কাল্ট্ ও সাহিত্যকে শিক্ষিত সমাজে পরিবেশন করেন—অবশ্য ধর্ম-ঠাকুর বৌদ্ধধর্মেরই শেষ পরিণতি—তাঁহার এই অভিমত পরবর্তী কালে প্রায় পরিত্যক্ত হইলেও, তিনি যে এই সাহিত্যের আবিষ্কার ও মূল্য নির্ণয়ে বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার আদর্শেই পরবর্তী-কালের গবেষকগণ পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কোন কোন অঞ্চল হইতে ধর্মমঙ্গল কাব্য ও ধর্মানুষ্ঠানবিষয়ক বহু পুঁথিপত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সমস্ত সাহিত্যনিদর্শন কাব্যগুণবিচারে উৎকৃষ্ট না হইলেও একটা প্রায় অজ্ঞাতপরিচয় ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মসাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া একটা অঞ্চলের সমাজ-ঐতিহ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মূলতঃ বর্ধমান বিভাগ এবং চব্বিশ পরগণা ও যশোহর-খুলনার কিয়দংশে (দক্ষিণরাঢ়ের কিয়দংশ) এই ধর্মসম্প্রদায় কেন্দ্রীভূত, 'ধর্ম'সাহিত্যও এই অঞ্চল হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। উত্তরবঙ্গে প্রত্যক্ষতঃ ধর্মঠাকুরের উপাসনা প্রচলিত নাই বটে, কিন্তু গাজন ও গম্ভীরা গানে (মালদহ) এবং

কোন কোন মনসামঙ্গলের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বর্ণনায় (তন্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবন ঘোষাল) ধর্মঠাকুরের প্রভাব লক্ষ্য করা যাইবে। ধর্মের পূজক সম্প্রদায় অঞ্চল বিশেষে সীমাবদ্ধ, ধর্মমঙ্গলকাব্যও সেই অঞ্চলে উদ্ভূত হইয়াছে। তাই এই অঞ্চলের সমাজ, দেশ ও কালের ছাপ ধর্মমঙ্গল কাব্যেও কিছু কিছু প্রতিফলিত হইয়াছে। রাঢ় ভূমি এই সম্প্রদায়ের আকর স্থান। তাই ইহাতে রাঢ়ের ইতিহাস ও জীবনের বিচিত্র গাঢ় প্রভাব আছে, এবং সেই জন্য এই সমস্ত কাব্যকে রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য (National Epic) বলা হয়। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিয়াছি। এখন ধর্ম-সাহিত্যের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া যাক।

'ধর্ম'-সাহিত্য, মূলতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—(১) ধর্মপূজাবিধান (সাংজাত খণ্ড), (২) ধর্মপূজার ইতিবৃত্ত (শূন্যপুরাণ বা আগম পুরাণ), (৩) ধর্মমঙ্গল কাব্য (লাউসেন কাহিনী)।

ধর্মপূজা বিধান ॥

ধর্মপূজার নিয়মাবলী, মন্ত্র ও কৃত্যের বর্ণনা সহ সংস্কৃত ও বাংলা ছড়া এবং পূজার্চনার ইতিকর্তব্যের বিস্তারিত বর্ণনা ধর্মপূজাবিধান বা সাংজাত খণ্ড নামে ধর্মপূজকসমাজে পরিচিত। ধর্মসাহিত্যে রামাই পণ্ডিতের নাম সর্বজন-পরিচিত। ধর্মমঙ্গলের প্রায় কবিই এমন শ্রদ্ধাভরে রামাই পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, এবং এমন বর্ণনা দিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাকে ধর্মপূজার আদি প্রচারক বলিয়া মনে হয়। তাঁহার ভণিতায় ধর্মপূজাবিধান-সংক্রান্ত পুঁথিগুলি পাওয়া গিয়াছে। শূন্যপুরাণ প্রসঙ্গে আমরা রামাই পণ্ডিতের বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, ডোমবংশে জন্মলাভ করিয়া রামাই ধর্মপূজায় প্রায় অবতারের স্থান লাভ করিয়াছেন। ধর্মপূজার মন্ত্র আচারাদির বর্ণনাযুক্ত ছড়াগুলি তাঁহার ভণিতায় চলিতেছে।

ধর্মপূজাবিধানের পুঁথিগুলি 'সাংজাতখণ্ড' নামে পরিচিত। বোধ হয় ধর্মের সংযাত্রা বা বিজয়গৌরব ও শোভাযাত্রা এই সঙ্কলনে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া পূজাবিধান সাংজাত নামে পরিচিত। এই সমস্ত মন্ত্র ও পূজাপদ্ধতির পুঁথি

অবলম্বনে ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য পরিষদ হইতে 'ধর্মপূজাবিধান' (১৩২৩) শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাঁহার এই গ্রন্থ সম্পাদনার পূর্বেই নগেন্দ্রনাথ বসু রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ মুদ্রিত করিয়া ধর্মঠাকুরের কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে অনেকেই রামাই সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। ইহার পরে ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় দুইখানি পুঁথি অবলম্বনে 'ধর্মপূজাবিধান' সম্পাদনা করেন। পুস্তিকাটির প্রথম খণ্ডে সংক্ষেপে ধর্মপূজার ব্যবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ডে পূজাপদ্ধতির বিস্তারিত আলোচনা আছে। প্রায় সর্বত্র রামাইয়ের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে, তাঁহার দোহাই আছে—যেন তিনিই বলিতেছেন। পুঁথিটিকে পুরাণ বা স্মৃতির মর্যাদা দিবার জন্য, শ্রীরঘুনন্দন বলিতেছেন—প্রথমেই এইরূপ উক্তি আছে। যদিও অনেক স্থলে ধর্মের মন্ত্রে 'শূন্য' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে,[৪৯] কিন্তু কোন কোন স্থলে দেখান হইয়াছে—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও ধর্মের সেবা করিতেছেন—"ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরং সেবা করে নিরন্তরং।"[৫০] কোথাও তাঁহাকে স্বয়ং মহাদেব বলা হইয়াছে—"দেবদেবো মহাদেবঃ শিব স্ত্রৈলোক্যপূজিতঃ" কোথাও-বা ('স্থাপনা ডাক' অধ্যায়) তাঁহাকে বিষ্ণু-নারায়ণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। 'অথ ধর্মপূজা লিখ্যতে' অংশে এইভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে—"ওঁ মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।" আবার পূজাবিধান ও মন্ত্রে নানা দেবদেবীর উল্লেখ ও বন্দনা[৫১] আছে।

'ধর্মপূজাবিধানে'র দুইটি বিচিত্র বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। একটি—'কলিমাজালাল'[৫২], আর একটি—শিবের কৃষিকার্য। ধর্মনিরঞ্জনের উপাসনায় ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজও কথঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল,

---

৪৯ (১) বাড়া মোর বন্ধুকার।
পূজি শ্রীনৈরাকার।
শূন্য মূর্তি ধ্যান করি॥ (ধর্মপূজাবিধান)
(২) "তত্রৈকোপি নিরঞ্জনোঽমরবরঃ পাতু মাং শূন্যমূর্তিঃ"। (ঐ)

৫০ কোন কোন স্থলে তাঁহাকে সূর্য বলিয়া প্রণাম করা হইয়াছে ("সর্ব্বশূন্যময়ং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্")। কোথাও-বা তাঁহাকে বলা হইয়াছে—"নিরঞ্জনং নিরাকারং মহাদেবং মহেশ্বরম্।"

৫১ আদ্যক্ষেত্রের রক্ষক দেবতা পঁড়াসুরকেও (পণ্ডাসুর) নমস্কার করা হইয়াছে।

৫২ ইতিপূর্বে এবিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এই 'কলিমা জালাল' শূন্যপুরাণে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। 'সদ্ধর্মী'-দের প্রতি ব্রাহ্মণদের অত্যাচার দূর করিবার জন্য ধর্মনিরঞ্জন ও অন্যান্য দেবদেবী মুসলমান পীরপয়গম্বরের বেশ ধরিয়া অত্যাচারী ব্রাহ্মণদের যথোচিত শাস্তি দিলেন। এই ব্যাপারটি 'ধর্মপূজাবিধান', শূন্যপুরাণ এবং সহদেব চক্রবর্তীর অনিলপুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে, চতুর্দশ শতাব্দীর দিল্লীর বাদশাহ ফিরুজশাহ তুঘলক উড়িষ্যা ও বাঙলায় যে অত্যাচার চালাইয়াছিলেন,[৫৩] এই ছড়াগুলি বোধ হয় সেই স্মৃতিবহ। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মনিরঞ্জনের সঙ্গে ইসলামি একেশ্বরবাদের তত্ত্বগত সাদৃশ্যের জন্য মুসলমান সমাজও ধর্মের প্রভাব স্বীকার করিয়াছিল এবং ধর্মপূজাবিধান, শূন্যপুরাণাদিতে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' বা কলিমা জালালের মতো হিন্দুবিরোধী মনোভাবও স্থান লাভ করিয়াছে।[৫৪]

'কলিমা জালালে'র (অর্থাৎ রুদ্রবাক্য) আর একটি অংশে স্পষ্টতঃ হিন্দুর তুলনায় ইসলামধর্মের অধিকতর গৌরব প্রচারিত হইয়াছে :

কে হিদু কে মুছলমান।
হিন্দু পূজন্তি কাষ্ঠ পাষাণ।
মুছলমান পূজন্তি খোদার
পূর্ণ রূপরেক নাই। (ধর্মপূজাবিধান)

খোদার "পূর্ণ রূপরেক নাই" বলিয়া মুসলমানসমাজের পক্ষে রূপরেখাহীন শূন্যনিরঞ্জনের ভজনা করা সম্ভব হইয়াছে। ধর্মোপাসনায় কিভাবে মুসলমান সমাজ অনুপ্রবেশ করিতেছিল, তাহা এই ধর্মপূজাবিধানে 'কলিমা জালাল' হইতে বুঝা যাইবে। ইহাতেও শূন্যপুরাণের অনুরূপ শিবের কৃষিকার্য, ধান্যের জন্ম, তাম্রের জন্ম, ছাগের জন্ম প্রভৃতি এমন সমস্ত বর্ণনা আছে যে, মনে হয় ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় কৃষিসমাজের শিবদেবতারও বিশেষ প্রভাব ছিল। কেহ কেহ ধর্মঠাকুরকে ধর্মরাজ বলিয়াছেন; তাই তাঁহার উৎসবে রাজোচিত মহিমা ও আড়ম্বরের বিশেষ আয়োজন হইয়া থাকে। একদা যুদ্ধব্যবসায়ী ডোমজাতির (এবং ক্ষত্রিয় লাউসেন) সঙ্গে তাই

---

৫৩ ডঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম (অপরার্ধ)

৫৪ শূন্যপুরাণে (২য় সংস্করণ) ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃ. ১৩

ইঁহার বিশেষ সম্পর্ক। কিন্তু ধর্মপূজাবিধান ও শূন্যপুরাণে কৃষক শিবের কৃষিকার্যের বর্ণনা এবং বিভিন্ন ধান্যের গুণব্যাখ্যানে এই ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে কৃষিসমাজের যোগাযোগও দুর্লক্ষ্য নহে। যাহা হউক, ধর্মপূজাবিধান ঠিক সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না, ধর্মঠাকুরের উপাসনার জন্য ছড়া ও কথিকার সংগ্রহ, যাহা রামাই পণ্ডিতের নামে চলে, তাহা হইতে এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে, ষোড়শ শতাব্দীর দিকে যখন ধর্মসমাজ উচ্চশ্রেণীর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, তখন হইতেই ধর্মের পূজকগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছড়া-কৃত্যগুলিকে সংগ্রহের চেষ্টা করেন। স্বভাবতঃ সমাজের এই সমস্ত ভদ্রেতর ব্যক্তিগণের বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে এই পূজাবিধান রচিত হইয়াছিল। তাই ইহার সংস্কৃত মন্ত্রে হাস্যকর ভুলভ্রান্তি আছে, বাংলা ছড়াগুলিও সাহিত্য-গুণ বর্জিত। তবু ধর্মসাহিত্যের উপাদান ও সোপান হিসাবে 'ধর্মপূজা বিধানের'ও কিছু মূল্য আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থ ॥

রামাই পণ্ডিত নামটি ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মসাহিত্যে একটা প্রাচীন শ্রদ্ধাপূর্ণ ঐতিহ্যলাভ করিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন, রামাইপণ্ডিত ধর্ম-প্রচারের আদিপুরোহিত, তিনি নাকি স্বয়ং ধর্মের বরলাভ করিয়াছিলেন। ধর্মঠাকুরের ভক্তগণ বলেন, রামাই ছিলেন স্বয়ং ধর্মের অবতার। ধর্মমঙ্গল-কাব্যেও তিনি রঞ্জাবতীর গুরু; তাঁহাকে ধর্মমাহাত্ম্য শিখাইতেছেন। এই কবিকে কেহ ঐতিহাসিক চরিত্র বলেন, কেহ-বা মনে করেন, ইহা সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক চরিত্র—পরবর্তী কালের লিপিকারদের লেখনী মুখে ইঁহার জন্ম। এবিষয়ে পরে আমরা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু রামাই পণ্ডিত ভণিতাযুক্ত 'শূন্যপুরাণ' ('আগমপুরাণ') এবং 'অনাদ্যের পুঁথি'[৫৫] নামক কয়েকখানি অর্বাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই পুঁথিগুলি কদাচিৎ সাহিত্যের পর্যায়ে উঠিয়াছে। কিন্তু ধর্মপূজা ও ধর্মের উপাসকদের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্য ইহাদিগকে সাহিত্যের ইতিহাসেও আলোচনা করা কর্তব্য। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রামাই পণ্ডিত বিরচিত

৫৫ ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ও বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'সাহিত্য প্রকাশিকা'—৩য়

বলিয়া প্রচারিত শূন্যপুরাণ সম্পাদনা করিলে বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ রামাই পণ্ডিত সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। তারপর অনুসন্ধানের ফলে ধর্মের পুরোহিত ডোমসম্প্রদায়ের নিকট হইতে রামাই পণ্ডিত সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া গিয়াছে, অনেক উপকাহিনীও সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার কোন্‌টি প্রামাণিক, কোন্‌টি-বা নহে, তাহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এখনও হয় নাই।

১৩১৪ সনে সাহিত্য পরিষদ্ হইতে নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় শূন্যপুরাণ প্রকাশিত হইবার পর স্বয়ং সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য) বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণ এবং শূন্যপুরাণের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা), যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৮ সালে প্রকাশিত 'শূন্যপুরাণ' প্রবন্ধ), ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ('ধর্মপূজাবিধানের' ভূমিকা) ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (শূন্যপুরাণের দ্বিতীয় সংস্করণের সংযোজিত প্রবন্ধ) এবং চারু বন্দ্যোপাধ্যায় (শূন্যপুরাণের দ্বিতীয় সংস্করণে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ)—ইঁহারা রামাই পণ্ডিতের ব্যক্তিত্ব, ঐতিহাসিকতা, প্রাচীনতা ও জীবনকথার সত্যতা প্রমাণের জন্য বহু বস্তু-উপাদান এবং কল্পিত উপাদানের সাহায্য লইয়াছিলেন। সম্প্রতি ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল রামাই পণ্ডিত সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।[৫৬]

রামাই পণ্ডিত সম্বন্ধে নানা গালগল্প সত্য-কল্পিত-অতিরঞ্জিত আকারে 'ধর্ম'-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। তাহা হইতে পণ্ডিতের যথার্থ জীবনকথা উদ্ধার করা সহজ নহে। বাস্তবিক তিনি কোন প্রকৃত ব্যক্তি ছিলেন, অথবা তাঁহাকে ধর্মের অবতাররূপে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে কিনা তাহাও বুঝা যাইতেছে না। তবে নানা উপাদান বাহুল্যের মধ্যে যতই বিরোধিতা থাক না কেন, রামাই পণ্ডিত নামে ধর্মপ্রচারক কোন ডোম পণ্ডিত বর্তমান ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হইতেছে।

ধর্মপূজা-সংক্রান্ত ছড়া-পাঁচালী ধরণের পুঁথি ও ধর্মমঙ্গলকাব্যেও রামাই পণ্ডিত সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ আছে; অবশ্য তাহা হইতে পণ্ডিতের জীবনকথা (নানা পারস্পরিক বিরোধিতা সত্ত্বেও) অল্পবিস্তর জানা গিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার ঐতিহাসিকতা ও অন্যান্য পরিচয়ের যাথার্থ্য প্রমাণ করা দুরূহ। এ

৫৬ ঐ, 'অনাদ্যের পুঁথি'র ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।

পর্যন্ত শূন্য পুরাণ, ধর্মপূজাবিধান, যাত্রাসিদ্ধিরায়ের পাঁচালী,[৫৭] ময়ূরভট্টের নামে প্রচারিত শ্রীধর্মপুরাণ, অনাদ্যের পুঁথি এবং মাণিকরাম-ঘনরাম-যাদুনাথ[৫৮] প্রভৃতি কবিদের ধর্মমঙ্গলকাব্যে রামাই পণ্ডিত সম্বন্ধে নানা গালগল্প স্থান পাইয়াছে, যাহাতে অলৌকিকতাই বেশী, বাস্তব মানুষের কাহিনী নামমাত্র।

রামাই পণ্ডিতের কাহিনীটি প্রথম সংগ্রহ করেন বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ। বিষ্ণুপুর হইতে বারো মাইল পূর্বে ময়নাপুর গ্রামে যাত্রাসিদ্ধি রায় ধর্মঠাকুরের সেবায়েত এক ডোমপণ্ডিতের নিকট কাব্যতীর্থ মহাশয় রামাইয়ের জীবন-কাহিনীমূলক যে ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়া আনেন, নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শূন্যপুরাণ (প্রথম সংস্করণ) সম্পাদনা কালে সেই ছড়াগুলি ভূমিকায় উল্লেখ করেন। ১৩৩৭ সালে প্রকাশিত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ময়ূর ভট্টের 'শ্রীধর্মপুরাণে' বর্ণিত রামাইয়ের কাহিনীর সঙ্গে ইহার মোটামুটি ঐক্য আছে। যাদুনাথের ধর্মপুরাণ ও অনাদ্যের পুঁথিতে (লেখক অজ্ঞাতনামা) রামাই সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন সংবাদ আছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যাদিতেও তাঁহাকে রঞ্জাবতীর গুরু বলা হইয়াছে। এই সমস্ত গালগল্পকে ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া যায় না, এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও দুরূহ। গল্পের কাঠামো বিচার করিলে দেখা যাইবে দ্বারকাধামে বিশ্বনাথ নামক এক ব্রাহ্মণ ধর্মপূজা করিতে গিয়া সামান্য অপরাধে বনবাসে যান।[৫৯] ধর্ম বলিলেন, দ্বাদশ বৎসর বিষ্ণুর চরণ পূজা করিলে তাঁহার এক সর্বগুণধর পুত্র জন্মিবে। পুত্র হইলে ধর্ম তাহার নাম রাখিতে বলিলেন 'পণ্ডিত রামাই'। যথাকালে ব্রাহ্মণের পত্নী এক পুত্র প্রসব করিলেন। তাহার নাম রাখা হইল রামাই। পিতামাতার মৃত্যুর জন্য বালক রামাইয়ের চূড়াকরণ হইতে পারিল না। বালকের পনের বৎসর বয়স হইলে স্বয়ং ধর্মনিরঞ্জন তাহাকে তাম্রদীক্ষা দিলেন, তখন হইতে রামাই ভক্তি ভরে বল্লুকাতীর্থে ধর্মপূজা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি বৃদ্ধ হইলেন। অপুত্রক অবস্থায় রামাইয়ের মৃত্যু হইলে জগতে কে ধর্মপূজা প্রচার

---

৫৭ শূন্যপুরাণের ১ম সংস্করণের ভূমিকায় উল্লিখিত।

৫৮ ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ।

৫৯ ময়ূরভট্ট এরূপ কোন অপরাধের উল্লেখ করেন নাই।

করিবে ? এই জন্য ধর্মনিরঞ্জন বৃদ্ধ রামাইকে বিবাহ করিবার নির্দেশ দিলেন। রামাই অনেক আপত্তি করিয়াও অগত্যা বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। ধর্মের দক্ষিণ চরণ হইতে একটি কন্যা জন্মলাভ করিল, তিনিই কেশবতী—ইঁহার সঙ্গে বৃদ্ধ রামাইয়ের বিবাহ হইল। রামাইয়ের নির্দেশে ধর্মের পুষ্পার্ঘ্য-সিক্ত জলপান করিয়া কেশবতী এক সন্তান প্রসব করিলেন। রামাই পুত্রের নাম রাখিলেন ধর্মদাস।[৬০] কেশবতীর অনুরোধে রামাই পুত্রকে তাম্রদীক্ষা না দিয়া ব্রাহ্মণের উপবীত দান করিলেন। ধর্মদাসও যথাকালে ধর্মের সেবক হইলেন। কিন্তু ছদ্মবেশী কলির স্তোকবাক্যে ভুলিয়া ভ্রমক্রমে তিনি সুরা-পান ও মাংস আহার করেন। ইহা জানিতে পারিয়া রামাই পুত্রকে অভিশাপ দিলেন, "হইবি ডোমের পুরোহিত।" যাহা হউক পরে রামাই যখন বুঝিলেন পুত্রের কোন দোষ নাই, ধর্মের সেবকের সর্বনাশ করিবার জন্য মহাপাপী কলি ছদ্মবেশে এই দুষ্কর্ম করিয়াছে, তখন তিনি পুত্রকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বলিলেন, একমনে ধর্মের উপাসনা করিলে এবং সকলকে ধর্মশিলা বিতরণ করিলে তাহার কল্যাণ হইবে। কালক্রমে রামাই পুত্র ধর্মদাসের বিবাহ দিলেন। ধর্মদাস সকলকে তাম্রদীক্ষা দিয়া এবং ধর্মশিলা বিতরণ করিয়া ধর্মের সেবা করিতে লাগিলেন। একদা সদা ডোমের নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্মদাস তাহাকে তাম্রদীক্ষা দিতে চাহিলেন। কিন্তু সদা ডোমের তখন পিতৃ-অশৌচ কাল; পুরোহিতের অভাবে সে দায়মুক্ত হইতে পারিতেছে না। সুতরাং এই অবস্থায় সে ধর্মসেবা কেমন করিয়া করিবে? তখন ধর্মদাস নিজেই পুরোহিত হইয়া তাহার পিতৃশ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু ডোমের নিকট ব্রাহ্মণের দক্ষিণা লইতে নাই তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, ভুল করিয়া তিনি সদার নিকট দক্ষিণা গ্রহণ করিলেন। এই সংবাদে রামাই পুত্রকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন :

করিলি ডোমের শ্রাদ্ধ বেদের বিহিত।
দক্ষিণা গ্রহণ করি হলি পুরোহিত॥

---

৬০ 'অনাদ্যের পুঁথি'তে (সাহিত্য প্রকাশিকা—৩য়, পৃ. ১০৭) এই পুত্রের নাম শ্রীধর। শ্রীধর ধর্মপ্রচারের জন্য গৌড়সভায় উপস্থিত হইলে গৌড়ের সুলতান ইঁহাকে মারিয়া ফেলেন। রামাই ধর্মের নিকট প্রার্থনা করিয়া পুত্রের পুনর্জীবনলাভের চেষ্টা করেন। অনাদ্যের পুঁথিটি খণ্ডিত বলিয়া শেষ পর্যন্ত রামাই মৃত পুত্রকে কি ভাবে বাঁচাইলেন তাহা জানা যাইতেছে না।

তোমার নাহিক দোষ বিধির লিখন।
কলিতে হইবে তুমি ডোমের ব্রাহ্মণ॥ (ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণ)

ধর্মদাসের শিরে যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল—নিজের বুদ্ধির দোষেই তিনি ছুঁইবার পিতার কাছে অভিশপ্ত হইলেন—তাঁহাকে ডোমের ব্রাহ্মণ বা ডোম-পণ্ডিত হইতে হইবে। অবশ্য রামাই মর্মাহত পুত্রকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, চিন্তার কোন কারণ নাই, ধর্মদাস ডোমপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইলেও সকলেই তাঁহাকে ব্রাহ্মণের মতোই শ্রদ্ধা করিবে। ধর্মদাস অতঃপর সকলকে তাম্রদীক্ষা দিতে লাগিলেন এবং ধর্মশিলা বিতরণ করিলেন। কলিঙ্গে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, পাঁচ বৎসর ধরিয়া রাজা রণজিৎ গালব প্রভৃতি ঋষিদের সাহায্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিতেছেন। ধর্মদাসকে ডোমপণ্ডিত জানিয়া সমাগত ঋষি-ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে অপমান করিয়া গালি দিলেন। ফলে তাঁহারা কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিলেন। তখন ধর্মদাসের কথায় তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইল, তাঁহারা ধর্মের স্তব করিয়া কোনও প্রকারে রোগমুক্ত হইলেন। তারপর ধর্মদাসের নির্দেশে পুত্রলাভ করিবার জন্য কলিঙ্গরাজ মহাসমারোহে ধর্মের গাজন করিলেন এবং যথাকালে পুত্রলাভ করিলেন। কালক্রমে ধর্মদাসেরও মাধব, মধুসূদন, সত্য ও সনাতন নামে চারিটি সন্তান হইল। ডোমপণ্ডিতের বংশ বৃদ্ধি পাইল—ডোমজাতির পুরোহিতের অভাব ঘুচিয়া গেল।

এই আখ্যানে ধর্মপূজকগণ রামাইকে ব্রাহ্মণকুমার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কোন এক অপরাধের ফলে দুর্বাসা ঋষি তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন :

করিছিস মম অহিত না পাইবি উপবীত
মম বাক্য না হইবে আন॥

তাহার জন্য রামাইয়ের উপনয়ন সংস্কার হয় নাই, তাম্র সংস্কার হইয়াছিল—অর্থাৎ তিনি তামার তাগা-আঙটি পরিধান করিতেন—ইহার নাম তাম্র সংস্কার। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তিনি ব্রাহ্মণকুমার হইলেও ব্রাহ্মণত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিলেন। অবশ্য পুত্র ধর্মদাসকে তিনি উপবীত দান করিয়াছিলেন ; কিন্তু নিজের বুদ্ধির দোষে ধর্মদাস ডোমপণ্ডিত হইলেন। 'ধর্ম' সম্প্রদায় বলিতে একদা ডোম সমাজকেই বুঝাইত ; তারপর তাহাতে অন্যান্য জল-অচল সঙ্কীর্ণ শূদ্রের দল প্রবেশ করিতে লাগিল। ডোমগণ

নিজেদের জাতে তুলিবার জন্ত রামাইকে ব্রাহ্মণ বানাইতে চাহিয়াছেন কিন্তু ডোম-পুরোহিত যে ব্রাহ্মণ নহেন, অথবা ভ্রষ্টাচার ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের তাম্রধারণেই তাহা বুঝা যাইতেছে।

রামাই নামে কোন ব্যক্তি কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন কিনা তাহা লইয়া একদা ঐতিহাসিকগণ অনেক বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। রামাইকে কখনও ধর্মের অবতার বলা হইয়াছে[৬১], কখনও-বা তিনি রামাইয়ের সখা হইয়াছেন।[৬২] রামাই নামে কোন ধর্মপূজক বর্তমান থাকিলেও ক্রমে ক্রমে তিনি ধর্মের অবতারে পরিণত হইয়াছেন। ধর্মপুরাণের মতে চারিযুগে ধর্মের চারিজন প্রচারক। সত্যযুগের প্রচারক সেতাই পণ্ডিত, ইঁহার গতির (শিষ্য সংখ্যা—চার শ'; ত্রেতাযুগে নীলাই—তাঁহার শিষ্য আট শ'; দ্বাপরে কংসাই —তাঁহার শিষ্যসংখ্যা—বারো শ'; কলিযুগে রামাই—তাঁহার শিষ্য সংখ্যা— ষোল শ'। কলিযুগের পরেও আর একটা যুগ কল্পিত হইয়াছে। ইহার নাম শূন্যযুগ—প্রচারকের নাম গোঁসাই পণ্ডিত—ইঁহার শিষ্য সংখ্যা হইবে অগণিত।

ধর্মপুরাণের গালগল্প ও জনশ্রুতি ছাড়িয়া দিলে রামাই পণ্ডিতের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করা দুরূহ। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা সেরূপ দুরূহ কার্যেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যে রামাই পণ্ডিত রঞ্জাবতী ও লাউসেনের পুরোহিত গৌড়েশ্বর ধর্মপালের পুত্রের সমসাময়িক। ধর্মপাল খ্রীঃ নবম, এবং তাঁহার পুত্র দেবপাল দশম শতাব্দীতে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহা হইলে লাউসেনও এই দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, এবং লাউসেনের এই সন-তারিখ ঠিক হইলে রামাই পণ্ডিতকেও দশম শতাব্দীতেই আবির্ভূত বলিতে হইবে। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এই জন্যই বলিয়াছেন, "এই সকল কারণে আমি লাউসেন ও রামাই পণ্ডিতকে খ্রীষ্টীয় দশম শতকের লোক

---

৬১ কলির অবতারে আপুনি নিরঞ্জন
রামাঞি পণ্ডিত নাম। (যাদুনাথের ধর্মপুরাণ, সাহিত্য-প্রকাশিকা—৩য়, পৃ. ২৫)

৬২ রামাঞি পুলকিত হইঞে পড়ে অনাদ্যের পাএ
বাহু পসারিঞা কোলে নিল ধর্মরাএ।
আমি সখা থাকিতে তোর কিসের ভাবনা।
বাঞ্ছা পূর্ণ করিব তোর মনের বাসনা॥ (অনাদ্যের পুঁথি, সাহিত্য-প্রকাশিকা, ৩য়, পৃ. ১১২)

বলিয়া মনে করিয়াছি।”[৬৩] ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব নানা গবেষণা করিয়া এবং লামা তারনাথের তিব্বতী ভাষায় লেখা ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসকে ভিত্তি করিয়া[৬৪] অনুমান করেন যে, লবসেন বা লাউসেন রামপালের পর খ্রীঃ দ্বাদশ শতকের প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন।[৬৫] রামাই রঞ্জাবতীর গুরু। তাহা হইলে তাঁহারও আবির্ভাবকাল দ্বাদশ শতাব্দী হইবে। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণের নজির তুলিয়া বলেন যে, রামাই পণ্ডিত চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে আবির্ভূত হন নাই।[৬৬]

ঐতিহাসিকদের এই সমস্ত গবেষণা নিতান্তই অনুমানের উপর দাঁড়াইয়া আছে। যেহেতু ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মপালের নাম আছে, লাউসেন ধর্মপালের পুত্রের শ্যালিকাপুত্র, রামাই এই লাউসেন ও রঞ্জাবতীর গুরুস্থানীয়, অতএব রামাই পণ্ডিত দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান হাস্যকর। অর্ধশিক্ষিত লেখকের লেখা শূন্যপুরাণ ধরণের ছড়াপাঁচালী জাতীয় পুঁথিপত্রে বা ধর্মপুরাণে উল্লিখিত কোন একটি তথ্যকে ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।[৬৭] সমস্ত তথ্যাদি হইতে অনুমিত হইতেছে, বর্ধমানের বল্লুকা নদীর কাছে কোন স্থানে ধর্মপূজা প্রচারক রামাই পণ্ডিতের জন্ম হওয়া সম্ভব। পৌরাণিক গালগল্প ছাড়িয়া দিলে তাঁহাকে যদি বাস্তব মানুষই বলিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে বিশেষ পুরাতন যুগে লইয়া যাইবার আবশ্যকতা কোথায়? সেরূপ অনুমানের আশ্রয়ই-বা কেন লইতে হইবে?

৬৩ শূন্যপুরাণের (২য় সংস্করণ) ভূমিকা, পৃ. ৬০

৬৪ এই ইতিহাসে আছে যে, রামপালের পর যক্ষপাল গৌড়ের রাজা হন। পরে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া লবসেন রাজা হন। শহীদুল্লাহ্ সাহেব লবসেনকেই লাউসেন বলিতেছেন। বলা বাহুল্য যক্ষসেন বা লবসেন নামে কোন রাজা গৌড়ে রাজত্ব করেন নাই।

৬৫ শূন্যপুরাণ (২য় সংস্করণ) পৃ. ৩৬

৬৬ শূন্যপুরাণের ৯১-৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কিন্তু মনে করিতেন, নবম শতাব্দীরও পূর্বে রামাই পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল (প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩৪)। ডঃ বিনয়চন্দ্র সেন রামাই পণ্ডিতকে দশম শতাব্দীর ব্যক্তি মনে করেন। (দ্রষ্টব্য—*The Calcutta Review*, August, 1924)

৬৭ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ও রামাইয়ের প্রামাণিকতা লইয়া দোটানায় পড়িয়াছিলেন। একবার তিনি বলিতেছেন, “রামাই পণ্ডিতের ব্যক্তিত্ব বিষয়েও সন্দেহের অবসর আছে।” আবার পরের পংক্তিতেই দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছেন, “কিন্তু আমি রামাই পণ্ডিতের ব্যক্তিত্বে সন্দেহ করি না।” (শূ. পু. ২য় সংস্করণ, পৃ. ৫৭)

শূন্যপুরাণের মতো কাব্যরসবর্জিত ছড়াগুলির বয়স আদৌ প্রাচীন নহে। একদা এগুলির উপর অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করিয়া রামাই পণ্ডিতের চতুর্দশ পুরুষের কুলুজি বাহির করিবার জন্য অনেক পরিপক্ক মস্তিষ্ক বৃথাই আলোড়িত হইয়াছিল। ডোমবংশীয়েরা নিজেদের অগৌরবের ইতিহাস ভুলিবার জন্য তাঁহাদের বংশে আবির্ভূত রামাই পণ্ডিত নামক কোন ধর্ম-পূজককে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়াছিলেন এবং আমাদের দেশের আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বাল-লোভন অতিরঞ্জনকে ইতিহাসের মর্যাদা দিবার জন্য স্বর্গমর্ত্য চুঁড়িয়া চষিয়া ফেলিয়াছিলেন। রামাই পণ্ডিতের ডোমবংশে জন্ম, ধর্মঠাকুরের কিছু কিছু ছড়া-পাঁচালী তাঁহার নামে চলে—ধর্মপূজার আদি প্রবর্তক সম্বন্ধে[৬৮] ইহার অধিক আর কোন বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় নাই।

(ধর্ম-সাহিত্যে সর্বত্র রামাই পণ্ডিতের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। শূন্যপুরাণ, ধর্মপূজাবিধান, অনাদ্যের পুঁথি—এই পুঁথিসমূহে অনেক স্থলে রামাইয়ের নাম-ভণিতা আছে বলিয়া অনেকে এগুলি রামাইয়ের নিজের রচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পুঁথিগুলির কোনখানিই একজন ব্যক্তির রচনা নহে।[৬৯]) ধর্মপূজার বিধান বর্ণনা করিবার সময় নানা জনে দুই চারি পংক্তি যোগ করিয়া দিয়া এই সমস্ত পুঁথির কলেবর বাড়াইয়া ফেলিয়াছেন। যাহা হউক, এখানে রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচারিত পুস্তিকাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া যাইতেছে।

প্রথমেই শূন্যপুরাণের কথা ধরা যাক। ১৩০৩ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সর্বপ্রথম শূন্যপুরাণের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু তিনি ইহাকে 'শূন্যপুরাণ' বলেন নাই, ইহার নাম দিয়াছিলেন, 'রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি'। পরে নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই পুঁথি সম্পাদনাকালে ইহার নাম দেন শূন্যপুরাণ। ইহাতে শূন্যরূপী ধর্মনিরঞ্জনের কথা আছে বলিয়াই বোধ হয় নগেন্দ্রনাথ ইহার এইরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দুইটির কোনটিই পুঁথির প্রকৃত নাম নহে। শূন্যপুরাণের বহু স্থলে 'আগমপুরাণ' বলা হইয়াছে

---

৬৮ শ্রীধর্মপুরাণ মতে মার্কণ্ডেয় ঋষি ধর্মপূজার আদি প্রচারক।

৬৯ ডঃ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন, শূন্যপুরাণ আদিম আকারে রামাই পণ্ডিত কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। পরে তাহাতে নানা জনের হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে।

("রামাই পণ্ডিত কহে আগমপুরাণ')—কোথাও 'শূন্যপুরাণ' শব্দ নাই। সাহিত্যপরিষদের পুঁথিশালায় আগমপুরাণের কয়েকখানি পুঁথি আছে।

নগেন্দ্রনাথ বসু শূন্যপুরাণের তিনখানি পুঁথি অবলম্বনে বাংলা ১৩১৩ সালে শূন্যপুরাণ প্রকাশ করেন। এই পুঁথিগুলিতে নানা পাঠান্তর ও বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। কোন দুইখানি পুঁথির মধ্যেই ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য নাই। নগেন্দ্রবাবু ও বসন্তবাবুর নিকটে শূন্যপুরাণের যে পুঁথি ছিল তাহাতেও এই একব্যাধি লক্ষ্য করা যায়। বসন্তবাবুর একথা সত্য—"রাঢ়দেশেও বহু কালে এবং বহু স্থানে বহু রামাই পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"[৭০] অর্থাৎ নানা জনে মিলিয়া শূন্যপুরাণের কলেবর নির্মাণ করিয়াছিলেন—রামাই নামক কোন ব্যক্তি বা ধর্ম-প্রচারক রচিত এক পংক্তিও ইহাতে আছে কিনা সন্দেহ।[৭১]

নগেন্দ্রবাবু যে-পুঁথি অবলম্বনে শূন্যপুরাণ সম্পাদনা করেন তাহা কাহাকেও দেখান নাই বলিয়া তাঁহার অবলম্বিত পুঁথি কতদূর বিশুদ্ধ তাহা বুঝা যাইতেছে না। বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের (এখন এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পত্তি) পুঁথির সঙ্গে ইহার অনেক গরমিল। বহু স্থলে সম্পাদক অযথা হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। বোধহয় এই কারণেই তিনি পুঁথিখানিকে লোক-চক্ষের গোচরীভূত করেন নাই। শূন্যপুরাণ কোন একজন কবির রচনা নহে, ধর্মপূজাপ্রচার-সংক্রান্ত নানা এলোমেলো বিশৃঙ্খল বর্ণনায় পূর্ণ পুঁথিখানিতে কোনও প্রকার ঐক্য বা সঙ্গতি নাই। মনে হয়, ধর্মের পুরোহিতেরা প্রয়োজন মতো আচার-কৃত্য বর্ণনা করিয়াছিলেন, বা ধর্ম-বিষয়ক বিচ্ছিন্ন ছড়া লিখিয়াছিলেন। ধর্মের গাজনের প্রয়োজনে এই সব ছড়া রচিত হইত, সন্ন্যাসীরা ধর্মের উৎসবে ইহা আবৃত্তি করিত।

পঞ্চান্নটি উপচ্ছেদে বিভক্ত এই শূন্যপুরাণ সংস্কৃত পুরাণের অনুকরণে গ্রাম্য কবিদের দ্বারা রচিত লৌকিক কৃত্য-আচার-বিষয়ক নানা শ্লোক-সংগ্রহ। প্রথমে সৃষ্টি পত্তনে 'ধর্ম' সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুলভাবে প্রচারিত সৃষ্টিকাহিনী বিশৃঙ্খল, গ্রাম্য ও অশিক্ষিত ভাষায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অবশ্য এই জাতীয় সৃষ্টিতত্ত্ব 'ধর্ম'সম্প্রদায়ের নিজস্ব মৌলিক চিন্তা হইতে উদ্ভূত নহে। পূর্বে

৭০ শূন্যপুরাণ (২য় সংস্করণ), পৃ. ৫৭

৭১ চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে রামাই শূন্যপুরাণ ও ধর্মপূজাবিধান পুঁথি দুইখানির প্রকৃত রচয়িতা। কিন্তু তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তের কোন কারণ দেখান নাই।

আমরা দেখিয়াছি যে, প্রাগ্‌বৈদিক অনার্য, বৈদিক আর্য, বৌদ্ধ, লোকশ্রুতি, তন্ত্র প্রভৃতি মিলিয়া মিশিয়া গিয়া 'ধর্ম'সম্প্রদায়ের সৃষ্টিতত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছে। এই ধরণের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব দেখা যাইবে মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলে। ইহার পর ধর্মপূজা ও কৃত্যবিষয়ক খুঁটিনাটি কয়েকটি বিবৃতি আছে। যেমন—জলপাবন, টাকাপাবন, পুষ্পতোলন, দ্বার-মোচন, চন্না পাবন, মন্দির নির্মাণ, ধর্মস্থান, অধিবাস, বেডামন্থই, হোম, যজ্ঞ, তাম্রধারণ—ইত্যাদি। এই ছড়াগুলির মধ্যে কিন্তু একপ্রকার সংযোগ ও সংহতি লক্ষ্য করা যায়। ধর্মের স্থাপনা, ব্রত-উপবাস, নানা-প্রকার কৃত্য, বলিদান প্রভৃতি ধর্মপূজার জটিল অঙ্গ-উপাঙ্গ এখানে ছড়ার আকারে বলা হইয়াছে। তবে রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধর্মপূজা এবং 'শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা'ব (কলিমা জালাল) বৈচিত্র্য স্মরণীয়।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী সুপরিচিত। এখানে সেই কাহিনীটি নাই, কিন্তু তাহার আভাস ও পরিণতি আছে। নিরঞ্জনের রুষ্মা ইতিপূর্বে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধে হিন্দুর নির্যাতন এবং তাহাতে 'ধর্ম'সম্প্রদায়ের উল্লাস—ইহাতে মনে হইতেছে, একদা 'ধর্ম'-সম্প্রদায় উচ্চতর ব্রাহ্মণ বা অভিজাত সম্প্রদায়ের দ্বারা নিগৃহীত হইত। তাই মুসলমানগণ হিন্দু সমাজের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলে 'সদ্ধর্মি'গণ তাহাতে পুলকিতই হইয়াছিল। উপরন্তু একেশ্বরবাদের উপর স্থাপিত ধর্ম-ঠাকুরের উপাসনার সঙ্গে মুঘলযুগে মুসলমান সম্প্রদায়ও কিছু কিছু জড়াইয়া গিয়াছিলেন। বাঙলাদেশে প্রধানতঃ জল-অনাচরণীয় সঙ্কীর্ণ শূদ্র ও অস্পৃশ্য সমাজ—যাহাদের মধ্যে ধর্মপূজা কেন্দ্রীভূত ছিল, তাহারাই নিজ ধর্ম ত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা রাতারাতি অন্য ধর্ম গ্রহণ করিলেও পূর্বতন আচার-বিচার সম্পূর্ণরূপে ছাড়িতে পারে নাই। তাই ধর্মের উৎসবে একদা মুসলমানসমাজের কেহ কেহ যোগদান করিতেন। এখনও তাঁহারা ধর্মের মন্দিরে মানত করেন, সফল হইলে দেবতাকে ভক্তি ভরে সেবা করেন। যাহা হউক, ধর্মপূজার গ্রন্থ ও কোন কোন ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত নিরঞ্জনের রুষ্মার দ্বারা এক যুগে বাঙলার হিন্দু-মুসলমান সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধ বুঝা যাইতেছে—যাহা ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপাদান হিসাবে অতিশয় মূল্যবান।

ইহাতে 'চাষ' উপচ্ছেদে মহাদেবের চাষবাসের বৃত্তান্ত এবং বিভিন্ন ধান্তের বর্ণনার দ্বারা মনে হয়, এই 'ধর্ম'সম্প্রদায় মূলতঃ ছিল কৃষিজীবী। কৃষিবৃত্তিধারী লৌকিক শিবও (শিবায়নে তাঁহার চাষের কাহিনী বেশ ফলাও করিয়া বলা হইয়াছে) ধর্মপূজার গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছেন। ধর্মপূজায় হিন্দুর পুরাণোক্ত দেবদেবীর বর্ণনাও আছে; কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন দেবাদিদেব ধর্ম-নিরঞ্জন।

এই 'চাষ' উপচ্ছেদে দরিদ্র ক্ষুধাতুর ভিখারী মহাদেবকে চাষবাস করিয়া সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করিতে ভক্ত অনুরোধ করিতেছে :

আহ্মার বচনে গোসাঞি তুহ্মি চস চাষ।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস॥
... ...
ঘরে অন্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুখ পাব॥
কাপাস চসহ পরভু পরিব কাপড়।
কত না পরিব গোঁসাঞি কেওদা বাঘের ছড়॥
তিল সরিসা চাস কর গোঁসাই বলি তব পাএ।
কত না মাখিব গোঁসাই বিভূতি গুলা গাএ॥

ভক্ত ভগবানের দুরবস্থা দর্শনে কাতর হইয়া তাঁহাকে চাষবাস করিতে অনুরোধ করিতেছে—এ বর্ণনা একটু নূতন।

শূন্য পুরাণকে কেহ কেহ অতিশয় প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মতে, "ভাষা হিসাবে ইহাকে ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগের বলিয়া বোধ হইবে" (শূ. পু.—ভূমিকা)। ইহাতে নাকি তিন স্তরের ভাষা ও হস্তক্ষেপ আছে। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় অবশ্য দেখাইয়াছেন যে, "মুদ্রিত শূন্যপুরাণের ভাষায় সম্পাদক মহাশয় (নগেন্দ্রনাথ বসু) হস্তক্ষেপ করিয়া অনেক আধুনিক শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন" (ঐ, পৃ ৪৩-৪৬)। তাঁহার মতে শূন্যপুরাণের ভাষা অন্য গ্রন্থের ('ধর্মপূজাবিধান' ধরণের পুঁথি) ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন (ঐ, পৃ ৫৯)। ইহার 'আহ্মি' 'তুহ্মি' প্রভৃতি দুই চারিটি শব্দ ষোড়শ শতাব্দীর হইতে পারে, কিন্তু আর সমস্ত শব্দ ও বাক্যগঠনপ্রণালী নিতান্তই অর্বাচীনকালের। তবে অনেক সময় শব্দগুলি যে অপরিচিত মনে হয়, তাহার কারণ অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লিপি-

কারের হাতে পড়িয়া বর্ণাশুদ্ধির ফলে পরিচিত শব্দ প্রাচীন ও দুরূহ আকার ধারণ করিয়াছে। ত্রিপিনী (ত্রিবেণী), পরভু (প্রভু), ছিষ্টি (সৃষ্টি), পৈরাগ (প্রয়াগ) এইরূপ বিকৃত তৎসম শব্দ, কিছু আঞ্চলিক শব্দ, কিছু-বা অশুদ্ধ শব্দ পুঁথিটির প্রাচীনত্বের আভাস দিয়াছে। কিন্তু বাক্যগঠনরীতি আদৌ প্রাচীন নহে। এ বিষয়ে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথাই যুক্তিসঙ্গত—"ইহার সমগ্র গ্রন্থখানিই যেরূপ ব্যাকারণানুসারিণী ভাষায় লিখিত, এরূপ ভাষায় লিখিত কোনও পুঁথি এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।"[৭২]

কেহ কেহ ইহাতে আদিতম বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্ত দর্শনে পুলকিত হইয়াছেন।[৭৩] 'অথ বারমাসি' অধ্যায়ে এইরূপ কিছু দৃষ্টান্ত আছে। যথা—

কোন মাসে কোন রাসি। বৈশাখ গেলে জৈট মাস বৃস রাসি। হে হরিহর, বারভাই বার আদিত্ত, হাত পাতি নেহ সেবকর অর্ঘ্য পুষ্প পানি.........

ইহাতে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গদ্যাত্মক রীতি অনেকটা বজায় আছে। ধর্মোৎসবে ছড়া কাটার সময় ছড়াগুলি গদ্যের আকারে পড়া হয়। উল্লিখিত দৃষ্টান্তটি সেইরূপ। তবে মূলে প্রচ্ছন্নভাবে পয়ারের প্রভাব আছে। যেমন—

পশ্চিম দুআরে পরভু দিলা দরসন। পশ্চিম দুআরে চন্দ্র পহরীক পাড়িল হুঁকার ॥
আস বাছা চন্দ্র পহরি, বাটায় তাম্বুল খাব, রূপার রঞ্জিত খাট নির্মাণ করি দিব ॥

এখানে গদ্য পংক্তিতেও পয়ারের সুর রহিয়াছে। যাহা হউক শূন্যপুরাণ ও ধর্ম-পূজাবিধানকে কোন ক্রমেই প্রাচীন বলা যায় না। ষোড়শ শতাব্দীর দিকে এ ধরণের ছড়া সংগ্রহ 'ধর্ম' সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও পরে অর্ধ শিক্ষিত লোকের পুনঃপুনঃ হস্তক্ষেপের ফলে ইহার ভাষাগত প্রাচীনতার চিহ্ন অধিকাংশ স্থলেই লুপ্ত হইয়াছে। ইহাতে যে বার তিনেক হস্তক্ষেপ

---

৭২ শূন্যপুরাণ, ২য় সং, পৃ. ৪৩। কিন্তু—

স্নান করি বসাইল রত্নসিংহাসনে।
অখণ্ড তুলসী দিল ধর্মের চরণে ॥
নীলাই পণ্ডিত আইল আটসএ গতি।
হনুমন্ত কোটাইল আইল চরিত্রা ঘটদাসী ॥

শূন্যপুরাণের এ ভাষা কদাপি প্রাচীন হইতে পারে না, ১৮শ-১৯শ শতাব্দীর পুঁথিতে এইরূপ ভাষা দেখা যায়।

৭৩ দীনেশচন্দ্র সেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য) এবং নগেন্দ্রনাথ বসু (শূন্যপুরাণ—১ম সংস্করণ) ইহার কিছু কিছু পংক্তিকে গদ্য পদবিন্যাস বলিতে চাহিয়াছেন।

হইয়াছে—অর্থাৎ ইহাতে কালগত তিনটি রচনাস্তর লক্ষ্য করা যায়, সে সম্বন্ধে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শহীদুল্লাহের মতে শূন্যপুরাণ আদিম আকারে রামাই পণ্ডিত কর্তৃক রচিত হইয়াছিল; দ্বিতীয় স্তরে নাথধর্ম ও ইসলামেরও প্রভাব পড়িয়াছিল। এই দ্বিতীয় স্তরের রচনা নাকি ১৪৩৪ খ্রীঃ অব্দের পরের রচনা।[৭৪] শূন্যপুরাণের তৃতীয় স্তরে সংস্কৃত শ্লোকগুলি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালে যুক্ত হইয়াছে। 'ধর্মপূজা বিধান'ও এই তৃতীয় স্তরের রচনা। নগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছিলেন, "এই পুঁথির মধ্যেই কোন কোন স্থানের ভাষা অতি প্রাচীন ও কোন কোন অংশ নিতান্ত অপ্রাচীন বলিয়া মনে হয়" (শূঃ পুঃ, ১ম সংস্করণের ভূমিকা)। কিন্তু বসন্তকুমার মুদ্রিত গ্রন্থের ভাষায় আধুনিক শব্দ বিন্যাস দেখিয়া প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের সততায় কিছু সন্দিহান হইয়াছিলেন।[৭৫] যাহা হউক শূন্যপুরাণ সম্বন্ধে উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে, ইহা আদৌ প্রাচীন গ্রন্থ নহে। সাহিত্য পরিষদে রামাইয়ের প্রসঙ্গ ও ভণিতাযুক্ত এই ধরণের যে পুঁথিগুলি আছে, তাহার ভাষাও সপ্তদশ-শতাব্দী অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হওয়াই স্বাভাবিক। নানা জনে, পুরোহিতে, ভক্তে মিলিয়া ইহাতে ধর্মপূজা সংক্রান্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শব্দ ও বাক্যাদি জুড়িয়া দিয়া ইহার এমন এক আকার দান করিয়াছে যে, মিশ্রধরণের এই ছড়া-সঙ্কলনটির প্রাচীনত্ব সংশয়-সঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে রচনাকারের ভণিতা থাকিলেও ইহা রামাই পণ্ডিতের রচনা নহে; ভক্তের দল ধর্মপূজার আদি প্রবর্তকের দোহাই দিয়া বিচিত্র ছড়াসমূহ রচনা করিয়াছিলেন। রামাই পণ্ডিতের ব্যক্তিত্ব লইয়াই যখন সন্দেহ রহিয়াছে, তখন শূন্যপুরাণের গ্রন্থ-কর্তৃত্ব লইয়া নিঃসংশয়-রূপে যে কিছুই বলা যাইবে না, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অশিক্ষিত

---

৭৪ শহীদুল্লাহ্ সাহেব বলেন যে, 'নিরঞ্জনের রুষ্মায়' যে "দম্বদার" শব্দ আছে, তাহার প্রকৃত রূপ—দম্মাদার। ফকিরশাহ্ মাদারের শিষ্যগণ এই কথা বলিতেন। ফকিরশাহ্ ১৪৩৪ খ্রীঃ অব্দে দেহ রক্ষা করেন। সুতরাং শূন্যপুরাণের নিরঞ্জনের রুষ্মা অংশটুকু এই সময়ের পরবর্তী রচনা। শহীদুল্লাহ্ সাহেব শুধু 'দম্বদার' শব্দ ধরিয়া শূন্যপুরাণের একাংশের রচনাকাল সম্বন্ধে যে সময় নিরূপণ করিয়াছেন তাহা অনুমান মাত্র।

৭৫ এরূপ সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নহে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথি ও কৃত্তিবাসের আত্ম-পরিচয় শীর্ষক ছত্রগুলি লইয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব যেরূপ লণ্ডভণ্ড করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু বিবরণ এই লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' (১ম) 'কৃত্তিবাস' অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

কৃষিজীবী ও হীনবৃত্তিজীবী সমাজে প্রচলিত ধর্মোৎসবের সঙ্গে জড়িত এই ধরণের পুঁথিগুলির না আছে প্রামাণিকতা, আর না আছে উল্লেখযোগ্য কোন কাব্যগুণ। লোকধর্ম ও ব্রতকৃত্যগুলির সামাজিক পরিচয় লইতে গেলেই এই ছড়া হইতে অনেক উপাদান সংগ্রহ করা যাইতে পারে—শূন্যপুরাণ সম্বন্ধে এইটুকুই উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ধর্মপূজাবিধান' শীর্ষক পুস্তিকাটিই আলোচনার যোগ্য। ১৩২৩ সনে ইহা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়। বলাই বাহুল্য ইহা ধর্মপূজাবিষয়ক সংস্কৃত (ভুল সংস্কৃত) ও বাংলা ছড়ার একখানি অর্বাচীন পুঁথি। ইহাতেও বহু স্থলে রামাইয়ের প্রসঙ্গ ও নাম আছে; কোন কোন অংশে শূন্যপুরাণের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। প্রারম্ভেই "বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ" বলিয়া পুস্তিকাটিকে স্মৃতিকার রঘুনন্দনের নামের সঙ্গে জড়াইয়া ইহাকে প্রাচীনত্বের গৌরব ও স্মার্ত মর্যাদা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে—যেন পূজাবিধানটি রঘুনন্দন বলিতেছেন। অবশ্য নানাস্থানে শ্রদ্ধার সঙ্গে রামাই পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রন্থটি মোট দুইখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে সংক্ষেপে পূজার কথা বলিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত আকারে ধর্মের অর্চনা ও ব্রতনিয়মের বর্ণনা, উপকরণ সংগ্রহ, সঙ্কল্প পাঠ প্রভৃতি বিষয় বলা হইয়াছে। কিছু কিছু সংস্কৃত গদ্যবাক্য (অধিকাংশই সঙ্কল্পবাক্য) আছে বটে, কিন্তু ইহাতে বহু ভুলভ্রান্তি আছে। কোথাও কোথাও বাংলা ও সংস্কৃত মিশিয়া গিয়া একপ্রকার হাস্যকর খিচুড়ি-ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে।[৭৬] ইহা হইতে পরবর্তী কালের ধর্মঠাকুরের রূপান্তরও সহজে ধরা পড়িবে। তিনি যে কূর্মমূর্তি তাহা ইহাতে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, কোন কোন স্থলে প্রত্যক্ষ বৌদ্ধপ্রভাব আছে—ভূমিকায় সম্পাদক তাহা জানাইয়াছেন। একস্থলে আছে:

জলধির তিরে স্থান বৌদ্ধরূপে ভগবান
হয়্যা তুমি কৃপাবলোকন।

সম্পাদকের মতে এখানে ধর্মকে বুদ্ধদেব বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কিন্তু

---

৭৬ যেমন—

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরং সেবা করে নিরন্তরং
ইন্দ্র আদি ভজেন্নিত্যং সেই দেব নিরঞ্জনং।

দ্বিমতের অবকাশ আছে। আসলে ইহা বিষ্ণুর দশাবতার বর্ণনার শেষ অংশ—বিষ্ণু বুদ্ধ-অবতার হইয়াছিলেন, পদকারের ইহাই বক্তব্য। তাই এই কয় ছত্রকে বৌদ্ধপ্রভাবের উদাহরণ বলা যায় না। বরং বলা চলিতে পারে যে, ধর্মপূজাবিধানে পুরাণের বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাবন্দনা আছে—বিষ্ণুর বর্ণনাই অধিক। প্রায় প্রত্যেক সঙ্কল্প বাক্যের প্রারম্ভে "শ্রীবিষ্ণুরোতৎসদস্ত অমুকে মাসি শুক্লপক্ষে" ব্যবহার করা হইয়াছে। সম্পাদক যতই বলুন না কেন, "ধর্ম শিব নহেন, হিন্দুর কোন দেবতা নহেন, সাক্ষাৎ বুদ্ধদেব"—'ধর্ম-পূজাবিধান' হইতে কিন্তু সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং ইহাতে ধর্মকে শিব—অধিকাংশ স্থলে বিষ্ণু বলিয়া মনে হয়। শূন্যপুরাণের মতো ইহাতেও কলিমা জালালের (অর্থাৎ 'নিরঞ্জনের রুষ্মা') কৌতূহলপ্রদ বর্ণনা আছে। সুতরাং ধর্মপূজার সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের দীর্ঘস্থায়ী কোন সামাজিক বিরোধের ইতিহাস লুকাইয়া আছে। যাহা হউক, এ পুস্তিকাও সাহিত্যাংশে উপেক্ষার যোগ্য; কিন্তু ধর্মসম্প্রদায়ের পূজাপদ্ধতি এবং হিন্দুর পৌরাণিক সংস্কার ও ধর্মের অপৌরাণিক সংস্কার কিরূপ সমন্বয় লাভ করিতেছিল তাহার আভাস পাইতে হইলে 'ধর্মপূজাবিধান' পুঁথি হইতে তাহার অনেক উপাদান সংগ্রহ করা যাইবে। ইহাও রামাই পণ্ডিত নামক কোন একজন ব্যক্তির রচনা নহে, নানা সময়ে একাধিক ডোমপণ্ডিতে মিলিয়া ইহার কলেবর পূর্ণ করিয়াছিলেন। পুঁথিটির অসংখ্য অশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহা কাহাদের জন্য রচিত এবং কাহারা ইহার রচানাকার।

সম্প্রতি বিশ্বভারতীর পুঁথিশালার অধ্যক্ষ ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল 'অনাদ্যের পুঁথি' নামক একখানি পুঁথি ছাপাইয়া রামাইঘটিত কাহিনীর আরও একটু পরিচয় দিয়াছেন।[৭৭] অনাদ্যের পুঁথির মূল পাওয়া যায় না, কিন্তু অনুমান হয়, অষ্টাদশ শতকের একখানি খণ্ডিত পুঁথি অবলম্বনে ডঃ মণ্ডল ইহার সম্পাদনা করিয়াছেন। অর্বাচীনকালের এই পুঁথি পশ্চিম-বর্ধমান অঞ্চলে—প্রায় বাঁকুড়ার সীমান্তে পাওয়া গিয়াছে। ভাষাতেও আঞ্চলিক উপভাষার বিশেষ প্রভাব আছে। সম্পাদক যে ইহার মূল পুঁথিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর

৭৭ বিশ্বভারতী প্রকাশিত সাহিত্য প্রকাশিকা—৩য়

পূর্ববর্তী বলিতেছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই।[৭৮] পুঁথিটির শেষাংশ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত। সুতরাং অনুমান করা হইয়াছে যে, ইহার কোন পূর্ণ পুঁথি ছিল। কিন্তু তাহা যে প্রাপ্ত পুঁথি অপেক্ষা পুরাতন হইবে, এমন কোন পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্পাদক মহাশয় দেখাইতে পারেন নাই। এই ছড়ার লেখক রাঢ় অঞ্চলের ব্যক্তি, কারণ পুঁথিতে পশ্চিম রাঢ়ের প্রচুর উপশব্দ আছে, তাহা যে-কোন পাঠকই বুঝিতে পারিবেন।[৭৯] পুঁথির কোনখানেই কবির বা গ্রন্থের কোন নাম নাই। ইহাতেও রামাই পণ্ডিতের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। রামাইয়ের পুত্র শ্রীধর গৌড়ে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচার করিতে গেলে গৌড়ের যবনরাজা তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন। তখন দুঃখিত চিত্তে রামাই ধর্মের ধ্যান করিলেন। অতঃপর ধর্ম আবির্ভূত হইয়া পরমভক্ত রামাইকে বর দিলেন এবং তাঁহাকে ধর্মের উপাসনা-পূজাদি লইয়া গৌড়ে যাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহার মৃত পুত্র বাঁচিয়া উঠিবে—রামাই ধর্মের নিকট এই বর মাগিয়া লইলেন। গৌড়ের এই যবনরাজা পূর্ব জন্মে শূদ্র বংশে জন্মিয়া দারুণ কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া ধর্মের দেখা পাইয়াছিলেন। ধর্ম তাঁহাকে গৌড়ের যবনরাজা হইবার আশীর্বাদ করেন। সেই ব্যক্তি পরজন্মে গৌড়ের যবনরাজা হইয়া ধর্মপূজারী রামাই পণ্ডিতের পুত্রকে শূলে দিয়া মারিয়া ফেলেন। আরও তিনজন ধর্মপণ্ডিত এই একই প্রকার শাস্তি লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম বলিলেন যে, আগে তিনি রামাইয়ের পুত্রকে বাঁচাইবেন, তারপর যবনরাজাকে দারুণ কুষ্ঠ ব্যাধি দিয়া উচিত শাস্তি দিবেন। যাহা হউক অনেক আপদবিপদ পার হইয়া রামাই, হরিহর বাইতি প্রভৃতি ধর্মসেবকেরা গৌড়ের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে দীপক বলিয়া একটি বাঘ রামাইকে খাইতে গিয়া উচিত শাস্তি পাইল, এক বিষধর অজগরও রামাইকে পুনঃপুনঃ দংশন করিয়াও কিছু করিতে পারিল না। পরিশেষে

---

৭৮ সম্পাদক অনাদ্যের পুঁথির যে পৃষ্ঠাটির আলোকচিত্র মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহার অক্ষর-গঠন বিশেষ প্রাচীন নহে, ১৯শ শতাব্দীর পুঁথির অক্ষরের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে।

আমাদের কাছে তন্ত্রবিভূতির মনসামঙ্গলের ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিপিকৃত যে পুঁথি আছে, তাহার অক্ষর পঞ্চানন বাবুর ১৮শ শতাব্দীর পুঁথি অপেক্ষা কোন কোন দিক দিয়া প্রাচীনতর।

৭৯ দ্রষ্টব্য—পুঁথি পরিচয় (বিশ্বভারতী), ১ম, পৃ. ১১১—১১৪

সেই সাপ রামাইয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ইহার পর পুঁথি খণ্ডিত হইয়াছে। অবশ্য পরের অংশটুকু অনুমান করিতে পারা যায়। সমস্ত বাধা-বিপত্তি এড়াইয়া রামাই দলবলসহ গৌড়ের যবনরাজার রাজত্বে উপনীত হইয়া ধর্মের কৃপায় নিজ পুত্রকে পুনর্জীবিত করিবেন, যবনরাজা ধর্মের ভক্তের প্রাণহানি করিয়া ধর্মের অসম্মান করিয়াছিল বলিয়া সেও দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধিতে ভুগিয়া তারপর হয়তো ধর্মের আরাধনা করিয়া রোগমুক্ত হইবে —কাহিনীর শেষাংশ বোধ হয় এইরূপ।

পুঁথিটির ভাষায় বহুস্থলে আধুনিক শব্দ ও বাক্য ব্যবহার লক্ষ্য করা যাইবে, কিছু কিছু আঞ্চলিক শব্দ, কিছু পুরাতন শব্দ এবং ভদ্রেতর সমাজের ভাষাভঙ্গিমা ইহাতে নির্বিচারে স্থান পাইয়াছে। ধর্মের কৃপায় রামাই সব আপদবিপদ জয় করিয়া পুত্রের প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন—ইহাই আখ্যানটির মূল বক্তব্য। পরবর্তী কালে রামাইকে কেন্দ্র করিয়া নানা গালগল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল—অনাদ্যের পুঁথিতে সেইরূপ একটি গল্প স্থান পাইয়াছে। ডোম-সমাজের জন্য রচিত হইলেও ধর্মের নিরাকার মূর্তির নানা প্রসঙ্গ ইহাতে আছে, লৌকিকের সঙ্গে পৌরাণিকের প্রভাবও আছে। এখানে লক্ষ্য করা যাইবে রামাই ধর্মনিরঞ্জনের শুধু মুখের কথাতেই তাঁহাকে ছাড়িবার পাত্র নহেন, প্রভুর অনেক 'কেরামত' দেখিয়া তবে তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পুঁথিটির আর একটা বৈশিষ্ট্য, এক ধর্মসেবক শূদ্র বেদপাঠ করিয়া ভয়ঙ্কর কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা ধর্মের বরলাভ করিল, কিন্তু সে গৌড়ের যবন রাজা হইয়া জন্মাইল, এবং জন্মাইয়া ধর্মের কথা বেমালুম ভুলিয়া গেল। শুধু ভুলিয়া গেল না, ধর্মের সেবকদের (রামাইয়ের পুত্র ও আরও অনেককে) শূলে চড়াইয়া মারিয়া ফেলিল। মনে হয় একদা মুসলমান রাজশক্তি ধর্ম-সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করিয়াছিল। তাই গৌড়ের যবনরাজাকে শাস্তি দিবার জন্য রামাই সদলবলে যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং ধর্মও এই অনাচারী যবনরাজার উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কুষ্ঠ ব্যাধি দিয়া যথাযোগ্য শাস্তি দিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র পুঁথিটি নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মতো নহে। বর্ণনার মধ্যে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত সমাজের সরল বলিষ্ঠতা, ধর্মের সঙ্গে ভক্তদের মানবিক সম্পর্ক, ধর্মের প্রতি রামাইয়ের মাঝে মাঝে সংশয় প্রকাশ ইত্যাদি অংশগুলি কোন যথার্থ কবিপ্রতিভাধারী-ব্যক্তির হাতে

পড়িলে এই বিভিন্ন উপাদান ধর্ম-সাহিত্যের একটা অমুক্ত অধ্যায় পূর্ণ করিতে পারিত।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী ॥

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর মধ্যে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে যে, যে-কোন পাঠকের কৌতূহলী দৃষ্টি ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইবেই। ধর্মপূজা বর্তমানে যে আকারে চলিতেছে, তাহা দুই-তিন শতাব্দার পূর্ববর্তী নহে, ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিও খুব বেশী প্রাচীনতা বা প্রবীণতার গৌরব দাবি করিতে পারে না, কোন কোনটি অতিশয় অর্বাচীন। উপরন্তু রাঢ় অঞ্চলেই এই পূজা ও তৎসংক্রান্ত কাব্যের বিশেষ প্রচার হইয়াছে। পূর্ববঙ্গে মনসামঙ্গলের কবির আবির্ভাব হইলেও ধর্মমঙ্গল বা ধর্মঠাকুরের কোন অস্তিত্ব সেখানে পাওয়া যায় না। এই জন্য কেহ কেহ ধর্মমঙ্গল কাব্যকে 'রাঢের জাতীয় কাব্য' বলিয়া থাকেন।

ধর্মমঙ্গলের প্রধান কাহিনী লাউসেন পালাই যাবতীয় ধর্মমঙ্গলের একমাত্র উপজীব্য। কেবল যাদুনাথের ধর্মপুরাণ[৮৩] এবং ময়ূর ভট্টের নামে প্রচারিত শ্রীধর্মপুরাণে লাউসেনের কাহিনী নাই। ধর্মমঙ্গলের মূলকাহিনীতে একদিকে যেমন ধর্মের মহিমা, অপরদিকে তেমনি ধর্মের সেবক লাউসেন ও তাঁহার জননী রঞ্জাবতীর গৌরবচিত্র বর্ণিত হইয়াছে। কাহিনীতে বীররসাত্মক উপকথার (Heroic Ballad) মতো অনেক অদ্ভুত বীরত্বব্যঞ্জক গল্প আছে, তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে ধর্মঠাকুরের কৃপাকরুণা এবং মাহুদা (মহামদ) নামক এক খলচরিত্রের ধূর্ততা ও তাহার অন্তিম পরিণতি। ধর্মমঙ্গলের প্রধান কবিগণ (রূপরাম, ঘনরাম, মানিক গাঙ্গুলী প্রভৃতি) প্রধান কাহিনীটিকে মোটামুটি যথাযথ অনুসরণ করিয়াছেন, নামধামে বড় একটা বিশৃঙ্খলা নাই। আঞ্চলিক প্রভাবের জন্য এই কাব্য মনসা-চণ্ডীমঙ্গলের মতো দূর-দূরান্তরে বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই, উপরন্তু ইহার ধারাটি বিশেষ প্রাচীনও নহে। এই সমস্ত কারণে বিভিন্ন কবির আখ্যানের মধ্যে বিশেষ কোন গরমিল নাই।

ধর্মমঙ্গলে নানা দেবদেবীর উল্লেখের সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে রঞ্জাবতীর নামও

৮৩ পরে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

উল্লিখিত হইয়াছে। রঞ্জাবতী যে শালে ভর দিয়া ধর্মের পূজা করিয়াছিলেন, তাহার নিয়মও রামাই পণ্ডিত রঞ্জাবতীকে শিখাইয়াছিলেন।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনীটি ধর্মোৎসবে বারো রাত্রি ধরিয়া পঠিত হইত। তাই ইহার অপর নাম বারোমতি বা বার্মাতি।[৮১] অধিকাংশ ধর্মমঙ্গলকাব্যে বারো দিনে বিভক্ত কাহিনীকে এক এক 'মতি' বলা হইয়াছে। নিম্নে প্রতি মতিতে বিভক্ত কাহিনীর সংক্ষিপ্ত সূত্র উল্লেখ করা যাইতেছে :—

প্রথম মতি—রঞ্জার জন্ম

দ্বিতীয় মতি—হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান

তৃতীয় মতি—শিশু লাউসেনকে অপহরণের চেষ্টা, লাউসেনের আখড়ায় দুর্গার আবির্ভাব এবং লাউসেনের চরিত্রবল পরীক্ষা।

চতুর্থ মতি—মল্লবধ, ফলক নির্মাণ, কুম্ভীর-ব্যাঘ্রাদি বধ।

পঞ্চম মতি—বারুই পাড়ার বর্ণনা ও সুরিক্ষার দম্ভনাশ।

ষষ্ঠ মতি—হস্তিবধ ও লাউসেনের দেশে প্রত্যাবর্তন।

সপ্তম মতি—কামরূপে কলিঙ্গার সঙ্গে লাউসেনের বিবাহ।

অষ্টম মতি—লৌহগণ্ডার ক্ষয়।

নবম মতি—ইছাই ঘোষ বধ।

দশম মতি—গৌড়ে অতিবৃষ্টি নিবারণ।

একাদশ মতি—লাউসেন কর্তৃক ধর্মের সেবা ও ময়না নিধন।

দ্বাদশ মতি—পশ্চিমে সূর্যোদয়।

এই সমস্ত ধর্মমঙ্গলকাব্যে প্রধানতঃ রাণী রঞ্জাবতীর কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা পুত্র লাউসেন লাভ এবং ধর্মের বরে লাউসেনের অপূর্ব বীরত্বের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তাই ইহাতে কতকটা আদিম মহাকাব্যের (Primitive Epic) লক্ষণ আছে। দেবকৃপাশ্রিত লাউসেন এই কাব্যের নায়ক এবং তাহার বীরত্বের অদ্ভুতরসের গল্পই ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান আকর্ষণ। ধর্মের সেবক লাউসেন ঠাকুরের কৃপায় শৈশব হইতেই কিভাবে রক্ষা পাইয়াছে, পরে দেব-কৃপায় অসাধারণ বীরত্ব ও অবিশ্বাস্য অপ্রাকৃত শক্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহার সুবিস্তৃত বর্ণনা ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান অবলম্বন। আখ্যানটি একটু

৮১ শূন্যপুরাণ, ২য় সং, পৃ ৬৭

শিথিল ধরণের হইলেও মূল বক্তব্যের মধ্যে বেশ সংহতি আছে। লাউসেন ইহার নায়ক, তাহার বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী ও চরিত্রগৌরব বর্ণনার দ্বারা কবিগণ ধর্মঠাকুরের মহিমা ঘোষণা করিতে চাহিয়াছেন। ইহা "নায়ক-অধিনায়ক সূত্রে গ্রথিত কতকগুলি গল্পের গুচ্ছ"[৮২] হইলেও মনসামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গলের মতো "অতটা ঘনবিন্যস্ত নয়"[৮৩] একথা বলা সঙ্গত নহে। বরং কাহিনীর গতিপ্রকৃতি বিচার করিলে উপকাহিনীগুলিকে মূলকাহিনীর উপাঙ্গ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। ধর্মের সেবক লাউসেনের দেহ ও মনের বীরত্ব ও চরিত্রশুদ্ধি ব্যাখ্যানই ধর্মমঙ্গল আখ্যানের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই জন্য ইহাতে এমন সমস্ত ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে যাহার দ্বারা লাউসেনের চরিত্রের উল্লিখিত গুণগুলি স্পষ্টরূপে ফুটিয়া ওঠে। ইহাতে খানিকটা আদিম গল্প আখ্যান, কিছু-বা দুঃসাহসিকতার কাহিনী, আবার কোথাও কোথাও বাস্তব সমাজজীবনের নানাকথা খুব নিপুণতার সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। আখ্যানের মধ্যে একটু রূপকথা-ঘেঁষা বর্ণনাও আছে। যেমন—লাউসেন কর্তৃক বাঘ-কুমীর বধ ও লোহার গণ্ডার দ্বিখণ্ডিতকরণ। তবু একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, যাবতীয় ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে একটা ঘনপিনদ্ধ কাহিনীবৈচিত্র্য আছে। তন্মধ্যে একটি উপকাহিনী সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আকারে আলোচনা করা প্রয়োজন।

সমস্ত ধর্মমঙ্গলের গোড়ার দিকে রাজা হরিশ্চন্দ্র ও রাণী মদনার লুইচন্দ্র (বা লুইধর) পুত্রলাভের বর্ণনা আছে। এ গল্পটি ধর্মমঙ্গলের মূল গল্পের ফাঁকে প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হইয়াছে—মূলকাহিনীর সঙ্গে ইহার ততটা অন্তরঙ্গ যোগ নাই। ধর্মের কৃপায় অপুত্রক রাজা হরিশ্চন্দ্র যেমন পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রঞ্জাবতীও পুত্রলাভ করিবেন—এইটুকু মাত্র সংযোগ। কিন্তু এই আখ্যানটি বোধ হয় ধর্মোপাসনার আদিম আখ্যান, ধর্মমঙ্গলের লাউসেনঘটিত প্রধান কাহিনীটির বোধহয় পরে উদ্ভব হইয়াছে। ধর্মপূজার প্রধান পুরোহিত ও প্রচারক ডোমপণ্ডিত রামাইয়ের উপদেশে রঞ্জাবতী বল্লুকার তীরে শালে ভর দিয়া পুত্রলাভের জন্য দুশ্চর প্রাণঘাতী কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা ধর্মের আরাধনায় প্রস্তুত হইলে রাজা কর্ণসেন পত্নীকে এই সুকঠিন কর্ম হইতে

৮২ ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম (অপরার্ধ), পৃ ১৪৫
৮৩ ঐ

নিযুক্ত করিতে বহু চেষ্টা করিলেন, এবং ধর্মপূজা করিলেই পুত্রলাভ হইবে, ইহাতেও সংশয় প্রকাশ করিলেন। তখন রঞ্জাবতী তাঁহাকে পৌরাণিক যুগের হরিশ্চন্দ্র রাজার আখ্যান বলিয়া ধর্মপূজায় পুত্রলাভের অমোঘতা প্রমাণ করিলেন এবং স্বামীর অনুমতি লইয়া শালে ভর দিতে গেলেন। গল্পটি সংক্ষেপে এইরূপ :

রাজা হরিশ্চন্দ্র (কোন কোন পুঁথিতে হরিচন্দ্র) ও তাঁহার পত্নী মদনার কোন সন্তান হয় না, লোকে তাঁহাদিগকে আঁটকুড়া বলিয়া গালি দেয়। তখন স্বামীস্ত্রীতে মিলিয়া অরণ্যভূমিতে ঘুরিতে ঘুরিতে বল্লুকার তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভক্তেরা ধর্মপূজা করিতেছে। তাঁহারাও পরম ভক্তি-ভরে ধর্মপূজা করিয়া প্রভুর কৃপা লাভ করিলেন। ধর্ম পুত্রবর দিলেন বটে, কিন্তু একটা কঠিন সর্ত আরোপ করিলেন। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে ধর্মের নিকট বলি দিতে হইবে। রাজা ও রাণী তাহাই স্বীকার করিলেন। কালক্রমে তাঁহাদের একটি সুলক্ষণযুক্ত পুত্র হইল। তাহার নাম রাখা হইল লুইচন্দ্র বা লুইধর। ক্রমে রাজা ও রাণী তাঁহাদের পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলেন। তখন ধর্ম ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ হইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং উপবাস ভঙ্গের পর মাংসাহার করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। সে মাংস লুইচন্দ্রের দেহের মাংস। তাহাকে কাটিয়া তাঁহারই মাংস রাঁধিয়া দিতে হইবে। রাজা ও রাণী কত কাকুতি-মিনতি করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ কোন অনুরোধেই কর্ণপাত করিলেন না, তিনি লুইচন্দ্রের মাংস ব্যতীত আর কিছুই আহার করিবেন না। তখন চোখের জল মুছিয়া মা মদনা বালক লুইচন্দ্রকে শেষবারের মতো যাবতীয় আভরণ পরাইলেন ; তারপর ব্রাহ্মণের নির্দেশে রাজা ও রাণী স্বহস্তে একমাত্র বংশদীপ বালক লুইচন্দ্রকে খড়্গাঘাতে বধ করিলেন। ব্রাহ্মণের জন্য বাধ্য হইয়া মদনা পুত্রের মাংস রাঁধিয়া ব্রাহ্মণকে ধরিয়া দিলেন। কিন্তু নির্মম ব্রাহ্মণ বলিলেন, তোমাদিগকেও আমার সঙ্গে বসিয়া পুত্রের মাংস-ব্যঞ্জন খাইতে হইবে, তা নহিলে আমি অভুক্ত থাকিব। প্রতিজ্ঞাপাশবদ্ধ রাজা ও রাণী আহারের পূর্বে গণ্ডূষ করিলে ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং নিজ মূর্তি প্রকাশ করিলেন। লুইচন্দ্র মরে নাই, তাহাকে কেহ কাটেও নাই। ঠাকুরের মায়ায় রাজা হরিশ্চন্দ্র মায়া-লুইধরকে সত্য-লুইধর মনে করিয়াছিলেন। এদিকে পুত্রকে

নিজের কোলে লুকাইয়া রাখিয়া তিনি রাজা-রাণীকে পরীক্ষা করিতেছিলেন। পুত্রকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়া পাইয়া মাতাপিতা আনন্দে উল্লসিত হইলেন এবং মহাসমারোহে ধর্মের পূজা করিলেন।

এই আখ্যানটি যে অতিশয় প্রাচীন তাহার নানা প্রমাণ আছে। আমাদের অনুমান, পূর্বে ধর্মপূজানুষ্ঠানে এই গল্পটিই গীত হইত। এখনও ধর্মের উৎসবে দ্বিতীয় দিন এই আখ্যান আবৃত্তি হইয়া থাকে। সমস্ত ধর্মমঙ্গলকাব্যেই এ কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি কোন কোন ধর্মপুরাণে লাউসেনের গল্পটি নাই বটে, কিন্তু হরিশ্চন্দ্র (হরিচন্দ্র) রাজার গল্পটি গৃহীত হইয়াছে। ময়ূর ভট্টের নামে প্রচারিত শ্রীধর্মপুরাণের যেটুকু মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে শুধু হরিশ্চন্দ্রের আখ্যান আছে। কবি চরিতখণ্ডে (অর্থাৎ লাউসেনের গল্প কাহিনী—যাহা যথার্থ ধর্মমঙ্গল) এই গল্পটি বিস্তারিত আকারে বলিবেন, তাহা জানাইয়াছিলেন।[৮৪] সম্প্রতি প্রকাশিত যাদুনাথের (যাদবনাথ রায়) ধর্মপুরাণেও শুধু হরিশ্চন্দ্রের আখ্যায়িকা আছে। নিজ পুত্রকে কাটিয়া তাহার মাংস রাঁধিয়া ছদ্মবেশী ধর্মকে প্রদান—এই জাতীয় কৃচ্ছ্রতামূলক কাহিনীই পূর্বে ধর্মের মহিমাপ্রচারে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহারই প্রভাবে তাহার পরবর্তী কাহিনীতে লাউসেন পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখাইতে গিয়া হাকন্দে নিজ দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ধর্মের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়াছিল। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীটি লাউসেন অপেক্ষা অধিকতর পুরাতন এবং ধর্মঠাকুরের মহিমা বিস্তারের গোড়ার দিকে এই আখ্যানটিই প্রচলিত হইয়াছিল। তারপর তাহার সঙ্গে স্থানীয় কোন কাহিনী আর ইতিহাসের ছিটে-ফোঁটা যুক্ত হইবার ফলে লাউসেনের সুদীর্ঘ কাহিনী ধর্মমঙ্গলকাব্যের মূল কাহিনীরূপে গৃহীত হইয়াছে এবং পূর্বতন হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী লাউসেনের আখ্যানের মধ্যেই ঈষৎ সঙ্কুচিত আকারে

---

৮৪ দ্বিতীয় চরিত্র খণ্ড সুধার সমান।
শুনিবে বিস্তৃত হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান॥

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণের শুধু 'পুরাণ' (অর্থাৎ রামাই পণ্ডিতের কাহিনী) অংশটুকু পাওয়া গিয়াছে, লাউসেনের কাহিনীর কোন সন্ধান সম্পাদক দিতে পারেন নাই। তবে তথাকথিত ময়ূরভট্ট লাউসেনের কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন এইরূপ মনে হয়। ময়ূরভট্টের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইয়াছে।

বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের অনুমান ধর্মঠাকুরের উপাসনা বিষয়ক যে ধর্মপুরাণগুলি প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতেই রামাই পণ্ডিত ও হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী বর্ণিত হইত; তাহাতে বোধহয় লাউসেনের কোন উল্লেখ থাকিত না। পরবর্তী কালে ধর্মমঙ্গল কাব্য যখন ধর্মঠাকুরের উৎসবে বারো দিন ধরিয়া পঠিত হইত, তখন তাহাতে লাউসেনের কাহিনীটি প্রাধান্য লাভ করিল। তাই ধর্মপুরাণের আখ্যানে পুরাণের ছাঁদটি রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু ধর্মমঙ্গলে বাররসাত্মক ও ইতিহাসাশ্রয়ী মহাকাব্যের প্রকরণটি নিতান্ত দুর্লক্ষ্য নহে।

এই হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীর জড় কিন্তু অনেক দূর গড়াইয়াছে। প্রাচীন বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে হরিশ্চন্দ্রের আখ্যায়িকা আছে। ধর্মপুরাণ-ধর্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্রের মূল সুদূর বৈদিক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণে হরিশ্চন্দ্রের প্রাচীনতম উপাখ্যান পাওয়া যায়। ইক্ষাকু বংশীয় অপুত্রক রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণের অনুগ্রহে রোহিতাশ্ব নামক পুত্র লাভ করেন। তিনি দেবতার নিকট স্বীকৃত হইয়াছিলেন যে, পুত্রকে বলি দিয়া বরুণের পূজা দিবেন। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও রাজা স্নেহবশতঃ নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষায় উদ্যোগী হইলেন না। পরে সমস্ত ব্যাপার জানিয়া রোহিতাশ্ব ঘর ছাড়িয়া গেল। এদিকে নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করায় বরুণ রাজার উপর ক্রুদ্ধ হইলেন—ফলে রাজা উদরী রোগে আক্রান্ত হইলেন। তখন পুত্রের পরিবর্তে এক ব্রাহ্মণের শুনঃশেফ নামক বালকপুত্রকে বলিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বরুণের ক্রোধ শান্তির উদ্যোগ করিলেন এবং সেই লোভী ব্রাহ্মণকে তাহার পুত্রের বিনিময়ে অর্থ দান করিলেন। এদিকে বলিদানের জন্য ঘাতক পাওয়া যায় না। তখন সেই লোভী নির্মম ব্রাহ্মণ মুদ্রা পাইয়া নিজ পুত্রকেই কাটিতে সম্মত হইল। হস্তপদ বদ্ধাবস্থায় যজ্ঞক্ষেত্রে শুনঃশেফ আনীত হইল এবং সে মুক্তির জন্য বরুণের নিকট প্রার্থনা জানাইল। অতঃপর বরুণের কৃপায় বালকের বন্ধনপাশ ছিন্ন হইল। তখন ঋষি বিশ্বামিত্র বালকটিকে নিজ পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। শুনঃশেফ পরে বেদমন্ত্র রচনা করিয়া দেবরাত বিশ্বামিত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

পুরাণ ও মহাভারতেও এই গল্পটি কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া স্থান লাভ করিয়াছে। হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের গল্প সুপরিচিত। দাতাকর্ণের

গল্পটির সূত্র এই বৈদিক হরিশ্চন্দ্রের কহিনীতেই নিহিত। ধর্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্রের গল্পে বৈদিক হরিশ্চন্দ্র রোহিতাশ্ব শুনঃশেফের কাহিনী এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণের শৈব্যা-রোহিতাশ্ব বিশ্বামিত্রের গল্প-আখ্যানের ধারা অনুসৃত হইয়াছে। রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণেও হরিশ্চন্দ্রের গল্প একটু রূপান্তরিত আকারে বর্ণিত হইয়াছে। ধর্মপুরাণের মধ্যে যাদুনাথের কাব্যে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীই একমাত্র কাহিনী, ইহার বিস্তারও সমধিক। যাদুনাথের মতে হরিশ্চন্দ্র প্রথম দিকে ধর্ম-বিদ্বেষী ছিলেন, ধর্মের মন্দিরও ভাঙিয়া ফেলিয়াছিলেন।[৮৫] শেষে তিনি ধর্মের সেবা করিয়া পুত্র লাভ করেন।

বৈদিক যুগের হরিশ্চন্দ্রের গল্পের প্রভাবেই বাঙালাদেশে কর্ণের পুত্র বৃষকেতুর গল্প গড়িয়া উঠিয়াছে—ইহা নিতান্তই একটা পুরাতন গল্প কাহিনী। কিন্তু কোন কোন সমালোচক একদা হরিশ্চন্দ্রকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি মনে করিয়া তাঁহার বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ডঃ শহীদুল্লাহ্ হরিশ্চন্দ্রের সময় নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে কিংবদন্তীতে হরিশ্চন্দ্র (হরিচন্দ্র) নাকি রাজা গোপীচন্দ্রের শ্বশুর। তাঁহার মতে গোপীচন্দ্রের সময় ৭০০ খ্রীঃ অব্দের কাছাকাছি হইবে।[৮৬] ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী অনুমান করিয়াছিলেন যে, হরিশ্চন্দ্র ঢাকা জেলার সাভারের রাজা ছিলেন ; তাঁহার দুই কন্যা অদুনা-পদুনার সঙ্গে মাণিকচন্দ্র-ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। তারনাথ তাঁহার ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক তিব্বতী গ্রন্থে বঙ্গেশ্বর হরিচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাপক বিনয়চন্দ্র সেন [৮৭] আবার হরিচন্দ্রকে দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত বলিয়াছেন। কিন্তু এ সমস্ত কল্পনা ঐতিহাসিকদের অলস জল্পনা মাত্র। ধর্মমঙ্গলের ধর্ম-ভক্ত হরিশ্চন্দ্রকে ঢাকায় টানিয়া আনা হাস্যকর। কারণ পূর্ববঙ্গে ধর্মের পূজা প্রচলিত নাই, কোন ধর্মমঙ্গল কাব্যও রচিত হয় নাই। এই জন্য ধর্মসেবক হরিশ্চন্দ্রকে ইতিহাসের পটে স্থাপন করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র।

---

৮৫ তোমার মন্দির যে জন ভাঙ্গিল
আর মানা কৈল পূজা। (সাহিত্য প্রকাশিকা—৩য়)

৮৬ শূন্যপুরাণ, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩৬। শহীদুল্লাহ্ সাহেব *Les Chants Mystiques de Kanha et de Saraha.* গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

৮৭ *The Calcutta Review* August, 1924

অন্ধকার কক্ষে অনুপস্থিত কালো বিড়াল খুঁজিবার মতো উপহাসাস্পদ চেষ্টা বাঙলাদেশের অনেকেই করিয়াছেন।[৮৮] সুতরাং ধর্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্রকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি না বলিয়া বরং বলা চলিতে পারে যে, বৈদিক যুগের হরিশ্চন্দ্র-শুনঃশেফ কাহিনী, পৌরাণিক যুগের হরিশ্চন্দ্রের গল্প এবং বাঙলাদেশে প্রচলিত দাতাকর্ণের কাহিনী মিলিয়া-মিশিয়া গিয়া ধর্মমঙ্গল ও ধর্মপুরাণের হরিশ্চন্দ্র-লুইচন্দ্রের কাহিনীর উৎপত্তি হইয়াছে।

এবার সংক্ষেপে লাউসেনের আখ্যানের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যাইতেছে। এই আখ্যানকে কবি খেলারাম "গৌড়কাব্য" বলিয়াছেন—কথাটা নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। এ কাহিনী নানা বৈচিত্র্যময় ও বীররসাত্মক হওয়া সত্ত্বেও শুধু রাঢ়ভূমি ব্যতীত বাঙলাদেশের অন্যত্র ইহা প্রচলিত হয় নাই; উত্তরবঙ্গে মনসামঙ্গলের গোড়ার দিকে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বর্ণনায় ধর্মের যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহা ধর্মমঙ্গলের আদর্শবহ। মালদহের গাজন ও গম্ভীরা উৎসব বাহ্যতঃ শৈব হইলেও উহার অন্তরালে ধর্ম উপাসনার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। লাউসেনের আখ্যানটি উপযুক্ত কবির হাতে পড়িলে মধ্যযুগের শুধু 'ধর্ম' কাব্য নহে, যথার্থ Epic of Growth হইতে পারিত; ইহাতে সে সম্ভাবনা পুরামাত্রায় ছিল। মনসা ও চণ্ডীর কাহিনীর তুলনায় লাউসেনের কাহিনী অনেক বলিষ্ঠ, ঋজুগতি, সংহত ও বাস্তবধর্মী—অবশ্য মনসামঙ্গলের সূক্ষ্ম মানবরস, ব্যাকুলতা, বেদনা ও আবেগ ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে ততটা নাই। অদ্ভুত, অনৈসর্গিক ও বীরত্বের নানা গল্প লাউসেনের চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে—এবং সে গল্পগুলির কিছু কিছু স্থানীয় সমাজ ও ইতিহাস হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, এ অনুমানও নিতান্ত মিথ্যা নহে। অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, চণ্ডী-মনসা প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য বাঙলার সর্বত্র, এমন কি প্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিলেও ধর্মমঙ্গলের মতো একটা বলিষ্ঠ ও বৈচিত্র্যময় কাহিনী অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়াছিল। মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যগুলি একান্তভাবে বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। মঙ্গলকাব্য বিশেষ ধরণের দেবদেবীর

৮৮ এ বিষয়ে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণীয়, "এই বৈদিক ও পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে কল্পনা করিয়া ঢাকা জেলায় টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।" (ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণ, ভূমিকা, পৃ ২৸/০)

পূজা-উপাসনাতেই ব্যবহৃত হইত, নিছক পাঠ বা সারস্বত আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য এই জাতীয় কাব্য কেহ পড়িত না, রচনা করিত না।

ধর্মমঙ্গলকাব্যের প্রধান কাহিনী লাউসেনের বীরত্ব ও অলৌকিক গল্পকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছে। এই সমস্ত কাহিনী-উপকাহিনীর পশ্চাতে আঞ্চলিক প্রভাব ও বাস্তব ঘটনার কিঞ্চিৎ ছায়াপাত হওয়া অসম্ভব নহে। ধর্মের সেবক লাউসেনের গল্প শুরু হইয়াছে তাহার জননী রঞ্জাবতীকে কেন্দ্র করিয়া। এই আখ্যানের মধ্যে বেশ কয়েকটা স্তর সহজেই লক্ষ্য করা যাইবে। সমগ্র আখ্যানটি ধর্মোৎসব উপলক্ষে বারো দিন ধরিয়া গীত ও আবৃত্তি হইত--বারো দিনে প্রত্যহ দুই পালা করিয়া মোট চব্বিশ পালায় বিভক্ত এই কাহিনীর মধ্যে একটা সমগ্রতা আছে—তাহা ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে। এই চব্বিশ পালাকে [৮৯] কাহিনীর গতি, বিকাশ ও পরিণতি হিসাবে এই কয়টি উপচ্ছেদে ভাগ করা যায়:—(১) রঞ্জাবতীর বিবাহ, (২) লাউসেনের জন্ম, (৩) বয়ঃপ্রাপ্ত লাউসেনের সাহসিক কর্ম সম্পাদন ও চরিত্রবলের পরীক্ষা, (৪) মাতুল মহামদ বা মাহুদ্যা কর্তৃক তাহার ক্ষতি করিবার চেষ্টা, (৫) লাউসেনের চারিটি পত্নী লাভ, (৬) লাউসেন কর্তৃক দুর্বিনীত ইছাই ঘোষ বিনাশ, (৭) পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখাইবার জন্য লাউসেনের হাকন্দে গিয়া দুশ্চর তপস্যা, ধর্মের কৃপায় পশ্চিমে সূর্যোদয় সম্ভব, (৮) কুকর্মের জন্য ধর্মের নিকট মাহুদ্যার উচিত শাস্তি লাভ, (৯) লাউসেন কর্তৃক ধর্মপূজা প্রচারান্তে পুত্র চিত্রসেনকে রাজ্য দিয়া স্বর্গযাত্রা।

এই কাহিনীর মধ্যে তান্ত্রিকমতের সুকঠোর তপস্যা, নিজ দেহের প্রতি ভয়াবহ পীড়ন (যাহা ধর্মের গাজনে বাণফোঁড়া, কাঁটাঝাঁপ প্রভৃতি বিপজ্জনক অনুশীলনে পরিণত) প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। লাউসেনের সুস্থ সবল চরিত্র ও তাহার সাহায্যে ধর্মপূজা প্রচার—কাহিনীকারের ইহাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। ধর্মপালের পুত্র তখন গৌড়েশ্বর। কোন ধর্মমঙ্গল কাব্যে এই গৌড়েশ্বরের নাম নাই—যদিও সব কবি ধর্মপালের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পাল বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ধর্মপাল লোকস্মৃতিতে দীর্ঘকাল বাঁচিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীতে সর্বত্র ধর্মপালের উল্লেখ দেখা যায়। যাহা হউক, এই ধর্মপালের পুত্র তখন

৮৯ ইতিপূর্বে বারো দিনে গীত বারো পালার উল্লেখ করা হইয়াছে।

গৌড়েশ্বর। তাঁহার মহামাত্র তাঁহারই শ্যালক মহামদ, সংক্ষেপে বা তুচ্ছার্থে মাহুদ্যা—এ কাব্যের প্রধান খলচরিত্র (villain)। সংস্কৃত নাটকে রাজ-শ্যালকের একটা বিশিষ্ট চতুর ও কুটিল ভূমিকা ছিল (যেমন 'মৃচ্ছকটিকে'র শকার); ধর্মমঙ্গলের মাহুদ্যাও সেই ঐতিহ্যের পরিণাম। গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে তাঁহার এক বৃদ্ধ সামন্ত কর্ণসেনের বিবাহ হইল। কর্ণসেন গৌড়েশ্বরের আর এক দুর্দান্ত সামন্ত ইছাই ঘোষের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রগুলিও ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়। তখন কর্ণসেনকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গৌড়েশ্বর সুন্দরী শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই বিবাহের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী হইল রঞ্জাবতীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহামাত্র মহামদ (মাহুদ্যা)। সে অপুত্রক কর্ণসেনকে আঁটকুড়া বলিয়া গালি দিয়া অপমান করিল। ইহার প্রতিকারের জন্য রঞ্জা সচেষ্ট হইলেন এবং ধর্মের পণ্ডিত রামাইয়ের উপদেশে বল্লুকার তীরে গিয়া ধর্মের আরাধনা করিয়া শালে ভর দিয়া প্রাণত্যাগ করিতে চাহিলেন। ধর্ম তখন রঞ্জাকে পুত্রবর দিলেন। যথাকালে রঞ্জা বৃদ্ধ স্বামীর দ্বারা পুত্র লাভ করিলেন। তাহার নাম হইল লাউসেন (লবসেনের অপভ্রংশ ?)। রঞ্জা ধর্মের কৃপায় আর একটি পুত্র লাভ করিলেন, অবশ্য সে তাঁহার গর্ভস্থ সন্তান নহে। তাহার নাম কর্পূরধবল। লাউসেন ও কর্পূরধবল ক্রমে নানা শিক্ষা আয়ত্ত করিল, মল্লবিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যায় তুল্য অধিকার অর্জন করিল। ইতিমধ্যে মহামদ কংস মাতুলের মতো ভাগিনা লাউসেনের প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ধর্মের কৃপায় লাউসেন প্রতিবারই রক্ষা পাইল এবং অল্প বয়সেই বীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিল। তখন সে গৌড়েশ্বরের রাজসভায় চলিল নিজ বলবীর্য দেখাইবার জন্য। পথে দুর্দান্ত বাঘ ও কুমীর বধ করিয়া সে যেমন অসাধারণ শারীরিক বলের পরিচয় দিল, তেমনি আবার জামতী নগরের বারাঙ্গনা ও গোলাহাটের মোহিনী রমণীর মোহপাশ হইতেও অবলীলাক্রমে মুক্তি পাইল। কর্পূরধবল অবশ্য বিপদ দেখিলেই দাদাকে ছাড়িয়া গা ঢাকা দিয়া পলাইত এবং বিপদ কাটিয়া গেলেই সগর্বে অগ্রজের পাশে আসিয়া দাঁড়াইত।

লাউসেন গৌড়ে পৌঁছিলে মহামদ তাহাকে বিপদে ফেলিবার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াও ব্যর্থ হইল। গৌড়েশ্বর রঞ্জাবতীর পুত্রের পরিচয় পাইয়া ভারী

খুশি হইলেন। তখন মহামদ এক চাল চালিল ; মূঢ়বুদ্ধি গৌড়েশ্বরের অনুমতি আদায় করিয়া কিশোর লাউসেনকে কামরূপরাজকে দমন করিতে পাঠাইল। কামরূপরাজ লাউসেনের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহার সঙ্গে নিজ কন্যা কলিঙ্গার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর ফিরিবার সময় লাউসেন আরও দুইটি পত্নী-লাভ করিল। মঙ্গলকোটের রাজকন্যা অমলা ও বর্ধমানের রাজকন্যা বিমলা— মোট তিনটি বধূ লইয়া লাউসেন ময়না নগরে (পিতার জমিদারী) ফিরিল। আরও এক ব্যাপারে নিজ বীর্যের পরিচয় দিয়া সে সিমুলার রাজা হরিপালের সাহসিকা কন্যা কানাড়াকে বিবাহ করিল। এই রূপসী বীরাঙ্গনাকে গৌড়েশ্বরের বিবাহ করিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু কন্যা পণ করিয়াছিল, একটা লোহার গণ্ডারকে যে এককোপে দুইখান করিতে পারিবে, তাহাকেই সে বিবাহ করিবে। বুড়া গৌড়েশ্বর তাহা পারিবেন কেন ? কিন্তু যুবক লাউসেন অবলীলাক্রমে লোহার গণ্ডার কাটিয়া ফেলিল। তখনও তাহার বীর্যের পরীক্ষা শেষ হয় নাই। দেবী চণ্ডিকার রক্ষিত কানাড়ার সঙ্গে ধর্মের সেবক লাউসেনের দারুণ যুদ্ধ চলিল—আসলে দুই দেবতার যুদ্ধ। যাহা হউক বিধাতার নির্বন্ধে লাউসেন কানাড়ার কাছে হারিয়া গেল এবং তাহাকে বিবাহও করিয়া ফেলিল। তাহাতে অবশ্য কানাড়ার বড় একটা আপত্তি দেখা গেল না। লাউসেনের চারি পত্নী শশিকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। মাহুদ্যা আরও নানা ভাবে লাউসেনের ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ধর্মের সেবকের সে কি করিবে ? গৌড়েশ্বর তখন দুর্দান্ত ইছাই ঘোষকে দমন করিবার জন্য লাউসেনকে পাঠাইয়া দিলেন। এই ইছাই ঘোষের হাতেই কর্ণসেনের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত সমস্ত পুত্র নিহত হইয়াছিল। লাউসেন অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া ঢেকুর গড়ের অধিপতি সামন্ত ইছাই ঘোষের মাথা কাটিয়া ফেলিল। মাঝে লাউসেনের অনুপস্থিতিতে ময়না গড় আক্রমণ করিতে গিয়া মাহুদ্যা ভাগিনা-বধূদের নিকট বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া বেত্রাহত কুকুরের মতো পলাইয়া আসিল। এক সময়ে গৌড়ে ভীষণ বর্ষা নামিল, চারিদিক ভাসিয়া গেল, সব নষ্ট হইবার উপক্রম হইল। তখন লাউসেনকে বলা হইল, রাজ্যের সমস্ত পাপ দূর করিয়া দাও, দেখি কেমন তুমি ধর্মের সেবক। লাউসেন সুকঠোর তপস্যার দ্বারা পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখাইল, ধর্মের কৃপাতেই এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সমাধা হইল।

কুব্যবহারের জন্য মাহুদ্যা ধর্মের কোপে পড়িল, এবং কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হইয়া পাপের ফলভোগ করিতে লাগিল। শেষে মাতুলের অবর্ণনীয় কষ্ট দেখিয়া লাউসেন দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে নিরাময় করিয়া তুলিল। অতঃপর মুখে কুষ্ঠব্যাধির দুরপনেয় ক্ষতচিহ্ন লইয়া মহামদ লাউসেনের বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ করিল। লাউসেন সর্ববিষয়ে গৌরবলাভ করিয়া মর্ত্যে ধর্মপূজা প্রচার করিল, পরে কাল পূর্ণ হইলে পুত্র চিত্রসেনকে রাজ্য ভার দিয়া স্বর্গারোহণ করিল।

ইহাই কাহিনীটির সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র। কাহিনী ও চরিত্র বিচার করিলে ধর্মমঙ্গল-কাব্যকে এক প্রকার অসাধারণ সাহিত্য বলিতে হইবে; ধর্মঠাকুরের মহিমা প্রচার ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও মধ্যযুগীয় য়ুরোপীয় ব্যালাড ও রোমান্সের মতো ইহার মূল বক্তব্য—যুদ্ধবিগ্রহ ও বীররস। মঙ্গলকাব্যের এই শাখাটি মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলের পরে প্রচারিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে ডোম সম্প্রদায় ব্যতীত উচ্চবর্ণেরা ধর্মের পূজা করিত না, ডোমপণ্ডিত ব্যতীত ব্রাহ্মণাদি উপরের স্তরের কবিরা জাতি যাইবার ভয়ে ধর্মের গান গাহিতেন না। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী হইতে নীচবর্ণের দেবতা ধর্মঠাকুর উচ্চবর্ণেরও শ্রদ্ধা সম্মান লাভ করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ কবিরাও ধর্মের মঙ্গলগান রচনা করিতে আর সঙ্কোচ বোধ করিলেন না। যাহা হউক এই কাহিনীতে রক্তমাংসের জীবন্ত নরনারীর যে সমস্ত বিচিত্র চরিত্র আছে, তাহাদের বীরত্ব ত্যাগ, প্রেম, কৃচ্ছ্রসাধনা ও মহত্তম আদর্শ যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, নারায়ণদেব বা মুকুন্দরামের মতো প্রতিভাবান কবির হাতে পড়িলে, এই কাব্য মধ্যযুগীয় ভাবাবেগাপ্লুত কাব্যক্ষেত্রে বীররসের অস্ত্রঝনঝনা সৃষ্টি করিতে পারিত।

ধর্মমঙ্গলে অসাধারণ চরিত্র আছে, বাস্তবতাও আছে। কবিগণ মাজিয়া ঘষিয়া বেশ বড় মাপের চরিত্র ফাঁদিয়াছেন বটে, কিন্তু সে চরিত্রগুলিতে কালোত্তরণের বিশেষ চেষ্টা দেখা যায় না। কোন কোন সমালোচক ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ; কিন্তু মনসামঙ্গলের মতো প্রচণ্ড শক্তির ব্যর্থ আক্রোশের পরিচয় ইহাতে নাই, সর্বস্বত্যাগ করিয়া মৃত্যুসাগর মন্থনের পর স্বামীর প্রাণ ফিরিয়া পাইবার জন্য ভূলোক-দ্যুলোকলঙ্ঘী চরিত্রও ইহাতে নাই, চণ্ডীমঙ্গলের মতো স্নিগ্ধমধুর প্রতিভাসোজ্জ্বল জীবন্ত সামাজিক নরনারীর ছবি ইহাতে কিছু নিষ্প্রভ। অথচ বড় বড় চরিত্র, প্রচণ্ড

কলরব, যুদ্ধবিগ্রহ, নারীর বীরপণা, খলের দারুণ ষড়যন্ত্র, দেবতার কৃপায় ভক্তের অসাধ্য সাধন—এই সমস্ত ব্যাপার ধর্মমঙ্গলকাব্যে বেশ ফলাও করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু উপাদানের প্রাচুর্যে চরিত্রগুলির সূক্ষ্ম ভাববৈচিত্র্য বিকশিত হইতে পারে নাই। উপরন্তু দীর্ঘ কাহিনীটিকে কবিরা প্রায় একই ভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন, বাঁধা ছকের বাহিরে বড় কেহ যাইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। মৌলিকতা দেখাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও তাঁহারা সে সুযোগ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই আঞ্চলিক কাব্যগুলি বোধ হয় এই কারণেই বাঙলাদেশে ব্যাপক বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। শুধু উপাদান নহে, রচনাসৌকর্য, তির্যকতা ও চারুত্ব কাব্যকে দীর্ঘজীবী করিতে পারে। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির কিন্তু সেদিক দিয়া বিশেষ কোন শিল্প-কলাগত কাব্যসমুৎকর্ষ দেখা যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘ, নীরস ও পর্যুসিত বর্ণনা পাঠকের বিরক্তিকর ক্লান্তি সৃষ্টি করে। এই সমস্ত কারণে ধর্ম-মহিমাজ্ঞাপক বৃহদায়তন এই কাব্যগুলি পাঠকের মনে কোন গভীর আলোড়ন তুলিতে পারে না।

কেহ কেহ ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত কাহিনীতে ইতিহাসের ইঙ্গিত আবিষ্কার করিয়াছেন, কেহ ইহাতে ভৌগোলিক বর্ণনার যাথার্থ্য আবিষ্কার করিয়া পুলকিত হইয়াছেন, ইহাকে "রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য" (The National Epic of Rarha) বলিয়াছেন। চণ্ডী, মনসা ও কালিকামঙ্গলের কাহিনীগুলি সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং কাল্পনিক বলিয়াই একজন কবির বর্ণনার সঙ্গে অপর কবির বর্ণনার বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। স্থানীয় বর্ণনা ও ভৌগোলিক তথ্যেরও অনেক গোলমাল বিশৃঙ্খলা রহিয়াছে, কিন্তু ধর্মমঙ্গলের কাহিনী কেবল অঞ্চলবিশেষে সীমাবদ্ধ, এবং এ কাহিনীর মূলে কোন-না-কোন দিক দিয়া ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কিঞ্চিৎ সম্পর্ক আছে বলিয়া কাব্যকাহিনীটি নিতান্ত কল্পলোকে উধাও হয় নাই। বর্ণনা, স্থানের নাম-ধাম-পরিচয়, আচার-ব্যবহার, জীবনচিত্র, সমাজ-পরিবেশ প্রভৃতি সমস্তই রাঢ় অঞ্চলের ব্যাপার—এখনও ইহার কিছু কিছু বজায় আছে। ধর্মপাল, ইছাই ঘোষ (মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরী ঘোষ), ঢেকুর গড় (ঢেক্করী বিষয়)—এ সমস্ত মামধার পালযুগের ইতিহাস খুঁজিলে সহজেই পাওয়া যাইবে। তাই ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর পশ্চাতে কেহ কেহ ইতিহাসের অস্থিপঞ্জর

লক্ষ্য করিয়াছেন। এখন দেখা যাক, মধ্যযুগে যেমন মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দী সাহিত্যে ঐতিহাসিক বীররসের কাহিনী লইয়া উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হইয়াছিল, ধর্মমঙ্গল কাব্যের আখ্যানও সেইরূপ কিনা, ইতিহাসের সঙ্গে ইহার কোন যোগাযোগ আছে কিনা।

লাউসেনের কাহিনীর পশ্চাতে কোন স্থানীয় ঘটনার কিঞ্চিৎ ছায়াপাত হইতে পারে। কারণ সমস্ত ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের কাহিনীর ছাঁদটি প্রায় একই প্রকার। (স্থানীয় সুপরিচিত ঘটনা যখন সাহিত্যে স্থান পায়, তখন তাহাতে কিছু সত্য থাকিয়া যায়। লাউসেনের বীরত্ব-ব্যঞ্জক গল্পকাহিনীটি সেই দিক দিয়া স্থানীয় সত্যঘটনার উপর বোধহয় যৎকিঞ্চিৎ নির্ভর করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে আর যে সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনুমান মাত্র, কোন একটা ঐতিহাসিক ঘটনা, স্থান বা ব্যক্তির নামের সঙ্গে কাব্যে বর্ণিত কাহিনীর দুই একটি সাদৃশ্য দেখা গেলেও তাহা আকস্মিক বলিয়াই ধরিতে হইবে। অথবা এমনও হইতে পারে, পাঁচ-ছয় শত বৎসরের পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক ঘটনা লোকজীবনের ভাবনাচিন্তার মধ্য দিয়া পরিস্রুত ও পল্লবিত হইয়া আসিয়াছে। কাজেই এই কাব্যে রাঢ়ের ইতিহাসের ঘটনার দুই একটি উল্লেখ থাকিলে গোটা-ব্যাপারটাকে ঐতিহাসিক বলিবার কারণ নাই।)

ধর্মমঙ্গল কাব্যের বর্ণনানুসারে এই কাব্যের পটভূমিকা হইতেছে পালযুগের গৌরবময় ইতিহাস—যখন ধর্মপালের পুত্র গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কোন ধর্মমঙ্গলেই ধর্মপালের পুত্রের নাম উল্লিখিত হয় নাই। ধর্মপালের পুত্র দেবপাল (আঃ ৮১০-৮৫০ খ্রীঃ অঃ) উৎকল ও কামরূপের রাজাদের পরাজিত করেন। লাউসেন কামরূপরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করিয়াছিল—এ ঘটনা ধর্মমঙ্গলকাব্যে আছে বটে, কিন্তু কলিঙ্গ জয়ের কোন উল্লেখ নাই। এমন হইতে পারে যে, দেবপালের কোন সামন্ত অথবা তাঁহার খুড়তুতো ভাই জয়পাল কামরূপ ও কলিঙ্গ জয়ে গিয়াছিলেন।[১০] কালক্রমে সেই কাহিনী লাউসেন নামক কোন কাল্পনিক চরিত্রের উপর বর্তাইয়াছে। কলিঙ্গা নামটি কলিঙ্গদেশীয় রাজকন্যাকেই বুঝাইতেছে।

১০ ঐতিহাসিক বিবরণে এই সমস্ত অভিযানে সৈনাপত্য করিয়াছিলেন দেবপালের খুড়তুতো ভাই জয়পাল।

হয়তো মূল ঘটনার প্রায় সাত-আট শত বৎসর পরে ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল বলিয়া ধর্মমঙ্গলের কবিগণ ঐতিহাসিক পারম্পর্যের কিঞ্চিৎ গোলমাল করিয়া ফেলিয়া বলিয়াছেন যে, কামরূপরাজের কন্যা কলিঙ্গাকে লাউসেন বিবাহ করেন। কলিঙ্গা হয়তো পরাভূত কলিঙ্গরাজের কন্যাই ছিল, এবং দেবপালের অভিযানকারী সামন্ত (অথবা খুড়তুতো ভাই জয়পাল) সেই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেবপালকেই ধর্মমঙ্গলের গৌড়েশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং লাউসেন ও ইছাই ঘোষকে তাঁহার দুই সামন্ত বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন।[৯১] শাস্ত্রী মহাশয়ের এ অনুমান ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বারা প্রমাণ করা যায় না—কারণ পালসাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক বিবরণের কোথাও দেবপালের দুই সামন্ত লাউসেন ও ইছাই ঘোষের (ঈশ্বরী ঘোষ) উল্লেখ নাই। (ঢেক্করী বিষয়ের অধিপতি মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরী ঘোষ এক ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর হিসাবে দান করিতেছেন—এই মর্মে একখানি তাম্রলিপি পাওয়া গিয়াছে।[৯২] এই তাম্রশাসনে সন-তারিখ নাই, সুতরাং এই ঈশ্বরী ঘোষের ঐতিহাসিক সময় নির্ণয় করা দুরূহ।) তবে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ইহার লিপি দেখিয়া অনুমান করেন যে, ইহা দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়া থাকিবে। এ অনুমান সত্য হইলে দ্বাদশ শতকের ঈশ্বরী ঘোষকে নবম শতকের দেবপালের যুগে লওয়া যায় না। কিন্তু ধর্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষ গৌড়েশ্বরের সামন্ত ছিলেন এবং ঢেকুর গড়ে রাজত্ব করিতেন—এই তথ্যের সঙ্গে তাম্রশাসনে উল্লিখিত ঢেক্করী বিষয়ের শাসক ঈশ্বর ঘোষের নামসাদৃশ্য আছে, ইহাও তো অস্বীকার করা যায় না। তাম্রশাসনে দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরী ঘোষের পিতার নাম ধবল ঘোষ, ধর্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষের পিতার নাম সোম ঘোষ। সুতরাং তাম্রশাসনের ঈশ্বরী ঘোষ এবং ধর্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষ কি এক ব্যক্তি হইতে পারেন? কেহ কেহ আবার ঈশ্বরী ঘোষকে লক্ষ্মণসেনের সামন্ত বলিতে চাহেন।[৯৩] কিন্তু ইহাও কল্পনামাত্র। আমাদের মনে হয়, ঈশ্বরী ঘোষ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলেও ধর্মমঙ্গলের কবিগণ এই

৯১ সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতের ভূমিকা।

৯২ N. G. Majumdar—*Inscriptions of Bengal, III*

৯৩ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৮ (যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির প্রবন্ধ)

নামটি ব্যবহারের সময় ঐতিহাসিক ক্রমের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন নাই। রামপালের (দ্বাদশ শতাব্দী) সময়ে ঢেকরীর সামন্ত প্রতাপসিংহকেও কেহ কেহ ঈশ্বর ঘোষ বলিতে চাহেন—কিন্তু তাহাও অনুমান মাত্র। অজয় নদের তীরে কেন্দুবিল্বের পূর্ব দিকে শ্যামরূপার গড় বলিয়া একটি বিশাল অরণ্য আছে। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে ইহাই ঢেকুর বা ত্রিষষ্ঠীর গড—ইছাইয়ের রাজধানী। এই অরণ্যে ইছাই-প্রতিষ্ঠিত ভবানীর ভগ্নমন্দির এখনও আছে। ইহার নিকটেই নাকি কর্ণসেনের রাজধানী কর্ণগড ছিল।[২৪] পশ্চিমবাঙলার সীমান্তে বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চলে সেনপাহাড়ী পরগণার অন্তর্ভুক্ত গৌরাণ্ডিতে ইছাইয়ের রাজধানী ছিল, এরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে। কারণ ধর্মমঙ্গলে ইছাইয়ের রাজধানী পর্বত ও জঙ্গলবেষ্টিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক ঢেকরী বিষয়ের অধিপতি ঐতিহাসিক ঈশ্বরী ঘোষ নামটি ধর্মমঙ্গলে ইচাই ঘোষরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহার অতিরিক্ত আর কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। গৌড়েশ্বর তাঁহার এই দুর্দান্ত সামন্তকে বিনাশ করিবার জন্য আর এক সামন্তকে নিযুক্ত করিয় ছিলেন কিনা, তাহার ঐতিহাসিকতাও প্রমাণ করা দুরূহ। তবে পালবংশের গৌড়ার দিকে রাঢ়ের দুর্বিনীত সামন্তদের সঙ্গে গৌড়েশ্বর পালরাজাদের যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত। সেইরূপ কোন সংঘর্ষের কাহিনী ইতিহাসের ক্ষীণসূত্রে ধর্মমঙ্গলে উল্লিখিত হইয়াছে।

কেহ কেহ লাউসেনকেও ঐতিহাসিক পর্যায়ে তুলিয়া ধরিতে চাহেন।[২৫]

---

২৪ রামচরিতের ভূমিকা—মহাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত প্রবন্ধ

২৫ ধর্মমঙ্গলের একজন নাতিপরিচিত কবিও ইহাতে যোগ দিয়াছেন। বিশ্বভারতীর পুঁথি-শালায় রক্ষিত শ্যাম পণ্ডিতের 'নিরঞ্জন মঙ্গলে' (পুঁ. সং—৪০৮) বল্লাল সেনের নাম উল্লেখ করিয়া লাউসেনকে কবি ঐতিহাসিক মহিমা দিতে চাহিয়াছেন (দ্রষ্টব্য—ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'পুঁথি পরিচয়,' ১ম, পৃ. ৯৬)। উক্ত কাব্যে লাউসেন নিজ পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছে :

শুন মোর পূর্বকথা নিবাস আছিল যথা
কহি তোরে করিয়া নিশ্চয়॥
কনকসেন পিতামহ সেনভূমে ছিল গেহ
কর্ণসেনের আমি তোক।
বল্লাল সেনের গোষ্ঠী, যার সৃষ্টি অনাসৃষ্টি
যার কীর্তি ঘোষে সর্বলোক॥

লামা তারনাথের ইতিহাস গ্রন্থের উল্লেখ হইতে ডঃ শহীদুল্লাহ্ অনুমান করেন যে, লাউসেনের প্রকৃত নাম লবসেন। ইনি রামপালের পর দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। বাঙলা দেশের পঞ্জিকাতেও গ্রহবিপ্রগণ কলিকালের রাজচক্রবর্তীদের তালিকায় লাউসেনকেও গণ্য করিয়া থাকেন।[৯৬] বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ধর্মমঙ্গলে উল্লিখিত ধর্মপাল এবং তাঁহার পুত্রের (দেবপাল)[৯৭] ঐতিহাসিক কাল ধরিয়া লাউসেনকে দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত বলিতে চাহেন।[৯৮] ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণের ভূমিকায় এবং সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায় (১৩৩৬) বসন্তবাবু কিন্তু লাউসেনকে চতুর্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়াছেন।[৯৯] ময়ূরভট্টের মুদ্রিত গ্রন্থানুসারে লাউসেনের পৌত্র ধর্মসেন ; ময়ূরভট্ট ইঁহার সময়ে শ্রীধর্মপুরাণ রচনা করেন। ময়ূরভট্ট যদি লাউসেনের পৌত্রের সমসাময়িক হন, তাহা হইলে, "লাউসেন ও রামাই ময়ূরভট্টের শতবর্ষ পূর্ববর্তী। ময়ূরভট্টের পুঁথির ভাষা ও ছন্দ কৃত্তিবাস ও গুণরাজ খাঁয়ের যুগের ভাষা ও ছন্দের অনুরূপ। অতএব ময়ূরভট্ট ১৫শ শতকের লোক। রামাই পণ্ডিত বস্তুতঃ যদি কাল্পনিক নাম মাত্র না হন, তাহা হইলে তাঁহার আবির্ভাবকাল ১৪শ শতকের পূর্বে নয়।" অর্থাৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে লাউসেন চতুর্দশ শতাব্দী বা পরবর্তী কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাও কষ্টকল্পিত। উপরন্তু যে ময়ূরভট্টের মুদ্রিত গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া তিনি সন-তারিখ নির্ণয় করিয়াছেন তাহা যে কতটা অপ্রামাণিক, তাহা আমরা ময়ূরভট্ট প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং বসন্তবাবু কর্তৃক লাউসেন-সংক্রান্ত কাল নির্ণয়ের চেষ্টা নির্ভরযোগ্য নহে। অতএব লাউসেন নামে কোনও সময়ে কোন সামন্ত বর্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত না হইলেও[১০০] ঐতিহাসিক সত্য পরীক্ষার মতো কোন উপাদান পাওয়া যায় নাই। ধর্মমঙ্গল কাব্যে ময়নাপুর বা ময়না নগরের উল্লেখ আছে। ময়নাপুরে নাকি রামাইপণ্ডিত বর্তমান ছিলেন এবং

৯৬ শূন্য পুরাণ, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩৬

৯৭ কিন্তু ধর্মমঙ্গলে দেবপালের নাম নাই, সর্বত্র গৌড়েশ্বরের পুত্র বলা হইয়াছে, কোন নাম উল্লেখ করা হয় নাই।

৯৮-৯৯, শূ. পু. ২য় সং, পৃ. ৩০ এবং পাদটীকা ৯১-৯২

১০০ কারণ পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে লাউসেন সম্বন্ধে নানা প্রবাদ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। অজয়নদের দক্ষিণে 'লাউসেনের কুণ্ড' নামক এক পুকুর আছে, যেখানে স্থানীয় ধর্মসম্প্রদায় ধর্ম-

প্রবাদ মতে এই ময়না নগরই ছিল লাউসেনের রাজধানী ছিল। ময়নাপুর গ্রাম বিষ্ণুপুর স্টেশন হইতে ১২।১৩ মাইল দূরে এখনও আছে, এখানে ধর্মঠাকুরের খুব আধিপত্য, ধর্মের মন্দিরও আছে। ধর্মশিলাটি যাত্রাসিদ্ধিরায় নামে এখনও পূজিত হন। এখানে যে ডোমপণ্ডিতেরা পূজাদি নির্বাহ করেন, তাঁহারা নিজেদের রামাইয়ের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এখানে একটি দীঘি আছে, তাহার নাম হাকন্দ দীঘি। ইহার পাড়ের উপর লাল পাথরের মন্দিরটি হাকন্দ মন্দির নামে পরিচিত। অবশ্য এই হাকন্দ মন্দিরে এখন আর ধর্মশিলা পূজিত হয় না, স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ ইহাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বসন্তকুমারের মতে বিষ্ণুপুরের এই ময়নাপুরই ধর্মমঙ্গলের ময়নানগর—লাউসেনের রাজধানী। হাকন্দ দীঘি ও হাকন্দ মন্দির তাহাই প্রমাণ করিতেছে। অপরদিকে তমলুক অঞ্চলেও (তমলুকের ৯ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে) ময়না নামক একখানি গ্রাম আছে। ইহাতে ময়নাগড়ের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বর্তমান আছে। মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের সম্পাদক ও' ম্যালি সাহেব এই ময়নাগড়কেই লাউসেনের রাজধানী বলিয়াছেন।[১০১] অবশ্য বসন্তকুমার এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, তমলুক অঞ্চলের ময়নাগড়ের সন্নিহিত কোন স্থানে ধর্মশিলা বা ধর্মপূজক বংশের কোন প্রাধান্য নাই। যাহা হউক এই সমস্ত নামমাত্র ঐতিহাসিক উপাদান ও লোকশ্রুতি অনুসরণ করিয়া লাউসেনকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং ধর্মমঙ্গলের কাহিনীকে যথার্থ ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

মঙ্গলের কালুবীরের স্মৃতিতর্পণ করিবার জন্য প্রতি বৎসর ১৫ই বৈশাখ সমবেত হয় (সা. প. পত্রিকা, ১৩৩৮)। অবশ্য রাঢে নবজাতকের নাম যে লুই বা লুইধর রাখা হয়, লাউসেন হইতে সেই 'লুই' শব্দটি পরিকল্পিত হয় নাই। বরং ধর্মপুরাণের হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীর লুইচন্দ্রের নামের প্রভাবেই নবজাত শিশুর নাম লুইচন্দ্র বা লুইধর নাম রাখার রীতি চলিয়া আসিতেছে। দ্রষ্টব্য—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

১০১ According to the family records, the fort was originally. constructed by one semi-mythical hero of Midnapore, Raja Lausen, in the days when the district was under the dominion of the kings of Gaur. At the time of the Maratha ascendency the descendant of Lausen was ousted, tribute, and the possession of Mayna was made over to Bahubalendra, the founder of Maynaraj."—*Bengal District Gazeteer*, Midnapore, Compiled by L. S. S. O' Malley, pp. 207-208

ও' ম্যালি সাহেব লাউসেনকে যে 'Semi-mythical hero' বলিয়াছেন—ইহাই যথার্থ। রাঢ়দেশে প্রচলিত নানা যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনীর সঙ্গে ধর্মপূজার প্রভাব জড়াইয়া গিয়া লাউসেনের আখ্যান গড়িয়া উঠিয়াছে, এই আখ্যানে কিছু কিছু ভৌগোলিক নামধামও আছে। যেমন—বল্লুকা, চাঁপাই, ময়না, ঢেকুর গড় ইত্যাদি। কিন্তু কোন্ স্থানীয় জমিদার, সামন্ত বা বীরপুরুষের কাহিনী লাউসেনের গল্পের সহিত মিশিয়া গিয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার মতো কোন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান এখনও পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, ধর্মমঙ্গল কাব্যকে যে রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য বলা হয়, সে সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে।* প্রথমতঃ, এই কাব্যধারা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে অর্বাচীন, দ্বিতীয়তঃ, ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের সমাজে পরে ধর্ম-উপাসনা কথঞ্চিৎ গৃহীত হইলেও জাতীয় মহাকাব্য বলিতে সমগ্র জাতির অন্তরে-বাহিরে যেভাবে কাহিনীটির ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া যাওয়া উচিত, ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ঠিক সেভাবে রাঢ়ের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের সমাজে গৃহীত হয় নাই। এই সমাজে বৈষ্ণব সংস্কৃতি, শাক্ত আদর্শ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির যেরূপ প্রভাব, ধর্মমঙ্গলের সেরূপ প্রভাব নাই। এখনও উচ্চবর্ণের অনেকেই ধর্মকে ডোমের ঠাকুর বলিয়াই জানেন, ধর্মের বার্ষিক উৎসবে ডোমপণ্ডিতের অগ্রাধিকারও অদ্যাপি স্বীকৃত হইয়া থাকে। য়ুরোপে যেমন স্থানীয় বীরপুরুষদের কেন্দ্র করিয়া বীররসাত্মক ব্যালাড গড়িয়া উঠিয়াছে, লাউসেনের কাহিনী প্রায় কতকটা সেইরূপ হইলেও রাঢ়ের সর্বসমাজে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের সমাজে ইহার সেরূপ প্রভাব নাই। চব্বিশ-পরগণা ও যশোহরের ধর্মপূজা সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ অবহিত আছি।* এখানে বৈশাখ মাসে ঘটা করিয়া ধর্মের যে পূজা হইয়া থাকে, তাহাতে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ মহিলারা ভক্তিভরে নৈবেদ্য, মানসিক, পূজাদি দিলেও ধর্মঠাকুর হিন্দুসমাজের অন্যান্য দেবদেবীর মতো এখনও উচ্চপর্যায়ে গৃহীত হন নাই। লাউসেনের কাহিনীর পশ্চাদপটে রাঢ়ের বিস্মৃত যুগের কাহিনী নিহিত থাকিলেও জাতীয় মহাকাব্য হইতে গেলে যেরূপ সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাপকতা প্রয়োজন, ধর্মমঙ্গলের আঞ্চলিক কাহিনী সেরূপ ব্যাপকতা লাভ করিতে [illegible]। এবার সংক্ষেপে [illegible] শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল [illegible]

* [illegible]

৩

ধর্মমঙ্গলের কবি

ধর্মঠাকুর যে অঞ্চলবিশেষে জাগ্রত দেবতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ—সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বহু কবি ধর্মের মঙ্গলগান রচনা করিয়াছিলেন; সংখ্যা প্রায় বিশজন। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দী—এই তিন শত বৎসরের মধ্যে এতগুলি কবির আবির্ভাব অল্প ব্যাপার নহে। প্রথমদিকে ব্রাহ্মণ কবিরা ডোমের ঠাকুরের বন্দনা গাহিতে বিশেষ সঙ্কোচবোধ করিয়াছিলেন। পরে কিন্তু ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, বর্ণের গুরু ও ডোমপণ্ডিত, উভয়েই যোগদানের ফলে ধর্মের সেবায় আর কোন বাছবিচার রহিল না। চৈতন্য প্রভুও যাহা করিতে সমর্থ হন নাই, ধর্ম-উপাসনায় তাহা সম্ভব হইল। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল—সকলেই ভক্তিভরে ধর্মের মণ্ডপে হাজির হইল। ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায়ও তাই ব্রাহ্মণ-কৈবর্ত—সর্ব-শ্রেণীর কবিই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত কোন ধর্মমঙ্গল কাব্যের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ধর্মমঙ্গলের সংখ্যা সর্বাধিক, উনবিংশ শতাব্দীর দুই-একজন দুঃসাহসিক কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য লিখিয়া ধর্মের কৃপা লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই কবিদের মধ্যে ধর্মমঙ্গলের আদি-কবি বলিয়া পরিচিত ময়ূরভট্ট সম্বন্ধে বিশেষ সংশয় আছে; খেলারাম চক্রবর্তীর কাব্যও সংগ্রহ করা যায় নাই। এতদ্ব্যতীত প্রায় আঠার জন কবির ধর্মমঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে দুইচারিখানি ব্যতীত সবই খণ্ডিত, কাহারও-বা দুইচারিখানি পৃষ্ঠা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে যাদুনাথের শ্রীধর্মপুরাণ ও ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণে ধর্মমঙ্গলের প্রধান কাহিনী লাউসেন পালা অনুপস্থিত। ময়ূরভট্টের মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে মনে হইতেছে, ধর্মপুরাণ (হরিশ্চন্দ্র-লুইচন্দ্রের কাহিনী) রচনার পর তিনি ধর্মমঙ্গল বা চরিতখণ্ড (লাউসেনের কাহিনী) রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাদুনাথের ধর্মপুরাণ নিছক হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী—ইহাতে লাউসেনের উল্লেখমাত্র নাই। সমস্ত কবির রচনা অতি অল্প পরিমাণে উপভোগ্য কাব্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে।

রূপরাম, মাণিক গাঙ্গুলি ও ঘনরামকে বাদ দিলে, ধর্মমঙ্গলে আর সমস্ত কবিরা কোন দিক দিয়াই কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

অধিকাংশ ধর্মমঙ্গলের গোড়ার দিকে মুকুন্দরামের আত্মকথার অনুকরণে কবিগণ নিজ নিজ জীবনকথা এবং ধর্মদেবতার স্বপ্নাদেশ বা চাক্ষুষ পরিচয়-লাভের কৌতূহলজনক বিবরণ দিয়াছেন। তন্মধ্যে রূপরাম, রামদাস আদক, সীতারাম, নরসিংহ বসু, প্রভুরাম, হৃদয়রাম সাউ, মাণিক গাঙ্গুলি, রামকান্ত রায়—ইঁহাদের আত্মবিবরণীগুলি বহুস্থলে বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ; অলৌকিকতা বাদ দিলে দুই-তিন শত বৎসর পূর্বেকার রাঢ়দেশের গ্রাম্য ছবি ও গ্রাম্য মানুষের চরিত্রগুলি এই আত্মপরিচয় শীর্ষক কবি-কাহিনীতে চমৎকার ফুটিয়াছে। তবে এই ধরণের কাহিনীর সাধারণতঃ যে পরিণাম স্বাভাবিক, ধর্মমঙ্গলের কবিদের এই বর্ণনাগুলি তাহা হইতে রক্ষা পায় নাই। সকলের জীবনেই অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনা ঘটিতেছে, সকলেই পারিবারিক নিগ্রহ ভোগ করিতেছেন, ঝড় জলে কষ্ট পাইতেছেন, জ্বরের ঘোরে পুকুর পাড়ে অচৈতন্য হইয়া পড়িতেছেন, বাড়ীতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তর্জনের ভয়ে পলাইয়া যাইতেছেন, পথিমধ্যে কখনও ব্রাহ্মণবেশী, কখনও রাজবেশী ধর্মঠাকুরের সাক্ষাৎ পাইতেছেন, তাঁহার গান লিখিবার জন্য আদিষ্ট হইতেছেন—এইরূপ বর্ণনার পুনরাবৃত্তি প্রায় প্রত্যেক কবির মুদ্রাদোষে পরিণত হইয়াছে। দুই একজনের আত্মপরিচয় যেখানে মধ্যযুগীয় সাহিত্যে ব্যক্তিস্পর্শ সঞ্চার করিতে পারিত, সেখানে গতানুগতিকতার মোহে প্রায় অর্ধডজনের অধিক কবির একই প্রকার অতিরঞ্জিত, অবিশ্বাস্য, ব্যক্তিগত বর্ণনা অপ্রত্যাশিত চমকের কোন সুযোগ রাখে নাই। যে-কোন কবির আত্ম-জীবনীর দুইচারি ছত্র পড়িবার পরই পাঠক দেখিবেন, পূর্বতন কবির বর্ণনাই যেন অন্য ভাষায় ও একটু অন্যরূপ বর্ণনায় কবি কর্তৃক উপস্থাপিত হইয়াছে। এই পুচ্ছগ্রাহিতা দোষ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মারাত্মক ত্রুটি—তাহা ধর্মমঙ্গলের কবির আত্মপরিচয় শীর্ষক দীর্ঘ বিবরণীগুলি হইতেই বুঝা যাইবে। এইবার কয়েকজন কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া যাক।

খেলারাম চক্রবর্তী ॥

খেলারাম চক্রবর্তীর কাব্যের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আদৌ

তিনি কোন ধর্মমঙ্গল কাব্য লিখিয়াছিলেন কিনা গভীর সন্দেহ হয়।) পরোক্ষ সূত্রে এমন একটা সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, খেলারাম চক্রবর্তী নামক ধর্মমঙ্গলের এক কবি ১৪৪৯ শকে (১৫১০ খ্রীঃ অঃ) 'গৌড়কাব্য' নামে নাকি ধর্মমঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহা সত্য হইলে খেলারামের কাব্যই প্রথম ধর্মমঙ্গল কাব্য। বৈষ্ণব সাহিত্যালোচনায় সুপরিচিত হারাধন দত্ত ১৩০২ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'জন্মভূমি' পত্রিকায় "গড়মান্দারণ ও জাহানাবাদের ইতিবৃত্ত" শীর্ষক প্রবন্ধে সর্বপ্রথম খেলারামের বিস্তৃত পরিচয় এবং তাঁহার কাব্য হইতে কথঞ্চিৎ উদ্ধার করিয়া উক্ত প্রবন্ধে মুদ্রিত করেন। হুগলীর বদনগঞ্জের নিকটে শ্যামবাজার গ্রামে ধর্মঠাকুরের জেলে-পুরোহিতের বাড়ীতে দত্ত মহাশয় খেলারামের ধর্মমঙ্গলের পুঁথি দেখিয়াছিলেন, এবং তাহা হইতে কিয়দংশ টুকিয়া লইয়াছিলেন। তিনি কিভাবে উক্ত পুঁথির সন্ধান পাইলেন তাহা ঐ প্রবন্ধে সবিস্তারে বলিয়াছেন। বদনগঞ্জ গ্রামের নিকট শ্যামবাজার বলিয়া আর একটি গ্রাম আছে। উক্ত গ্রামে তারাচাঁদ মালী নামক এক অশিক্ষিত ব্যক্তি খেলারামের কাব্যের চার-পাঁচটি পালা গান করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে ঐ পুঁথি ধীবর জাতীয় ধর্মপুরোহিতের বাটীতে স্থানান্তরিত হয়; সেখানে যে খট্টার উপর ধর্মশিলা (দলু রায়) পূজিত হইতেন, সেখানেই এই পুঁথিখানি দীর্ঘদিন ছিল। রক্ষণশীল ধর্মবিশ্বাসের জন্য উঁহাদের কেহ ঐ পুঁথির ডোর খুলিতেন না। দত্ত মহাশয় তাঁহাদিগকে বহু অনুরোধের পর গ্রন্থের বন্ধন মোচন করিয়া পুঁথি পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, শেষের অনেক পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। লেখক দত্ত মহাশয় যেটুকু লিখিয়া লইয়াছিলেন তাহাই প্রকাশ করেন। তিনি পুরা গ্রন্থখানির সন্ধান দিলেন বটে; কিন্তু মনে হইতেছে, তিনি উহার পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর খেলারাম প্রসঙ্গে যবনিকা পড়িল। সম্প্রতি ডঃ সুকুমার সেন এবং ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল হারাধন দত্তের সূত্র ধরিয়া পুনরায় সন্ধানপর্ব চালাইয়াছেন। তাহাতে ডঃ মণ্ডল এইটুকু তথ্য উদ্ধার করেন—শ্যামবাজার গ্রামের অদূরে ভাবুক-পশ্চিমপাড়া গ্রামে কেহ কেহ একখণ্ড পতিত জমিকে খেলারামের বাস্তু বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। তবে এই খেলারাম কোন কবি, না গায়েন ব্রাহ্মণ, না ধীবর, তাহার কোন সন্ধান ঐ গ্রামের কাহারও নিকট পাওয়া যায় নাই। হারাধন দত্ত

নাকি উক্ত পুঁথিতে খেলারামের আত্মপরিচয়জ্ঞাপক এই শ্লোকগুলি পাইয়াছিলেন :

ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন ॥
হে ধর্ম্ম এ দাসের পুরাও মনস্কাম।
গৌড়কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম ॥

ইহা হইতে ১৪৪৯ শকাব্দ (১৫১০ খ্রীঃ অঃ) পাওয়া যায়। ডঃ সুকুমার সেন এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, হারাধন দত্ত-আবিষ্কৃত বলিয়া প্রচারিত এই খেলারামের কবি-অস্তিত্ব বিশেষ সংশয়স্থল। উপরন্তু মুদ্রিত অংশে অত্যন্ত আধুনিক ছাপ রহিয়াছে। 'তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ পূর্ণ হয়'—এই ধরণের বাক্‌রীতি ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না—ডঃ সেনের এই অভিমত অতিশয় যুক্তি-সঙ্গত। তদুপরি পুরাতন সাহিত্যামোদী হারাধন দত্ত মহাশয় প্রাপ্ত গ্রন্থাদির অনেক অংশ বদলাইয়া নিজেই রচনা করিয়া দিতেন—এরূপ অভিযোগও শুনিতে পাওয়া যায়।[১০২] ডঃ সেনের মতে হারাধন দত্ত ধীবর ধর্মপূজকের গৃহে হয়তো কোন একখানি ধর্মমঙ্গল কাব্য দেখিয়াছিলেন। কিন্তু উহা যে খেলারাম চক্রবর্তী নামক কোন একজন প্রাচীন কবির রচনা, হারাধন দত্ত তাহার কোন প্রমাণ রাখিয়া যান নাই। তবে ঐ অঞ্চলে এখনও খেলারাম চক্রবর্তীর নাম শুনা যায়। ডঃ সেন সন্ধান লইয়া দেখিয়াছেন যে, ঐ অঞ্চলের গ্রামবৃদ্ধেরা এখনও খেলারামের নাম করিয়া থাকেন। এইরূপ ছড়াও লোকমুখে চলিয়া থাকে :

খেলারাম চক্রবর্তী শণ কাটিছেন বসে।
ধর্ম্ম এসে দেখা দিলেন কুষ্ঠরোগীর বেশে ॥

ধর্মমঙ্গলের কোন কোন পুঁথিতে খেলারাম নামে ধর্মের এক গায়েনের নাম পাওয়া যায়। রূপরামের ধর্মমঙ্গলের এক পুঁথিতে আছে :

খেলারাম গাএন করিল বহু হিত।
হাতে যন্ত্র দিঞা শিখাইল নাটগীত ॥
ধর্ম্মের চরণে মাগিঞা নিএ বর।
খেলারামের কল্যাণ করিবে মায়াধর ॥

---

১০২ দ্রষ্টব্য—ডঃ সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, অপরার্ধ, পৃ. ১৫২

এখানে খেলারামকে গায়েন বলিয়া মনে হইতেছে। যাহা হউক ধর্মপূজা বা ধর্মমঙ্গলের সহিত জড়িত খেলারামের অস্তিত্বে হয়তো সন্দেহ করা যাইবে না, কিন্তু তাঁহার পুঁথি আবিষ্কৃত না হইলে হারাধন দত্তের রসোদ্বেল কবিপ্রশস্তি [১০৩] প্রমাণেরও কোন উপায় নাই।

ময়ূরভট্ট ॥

'ধর্ম' সাহিত্যে ময়ূরভট্টের নাম এবং তাঁহার রচিত বলিয়া পরিচিত কাব্য 'শ্রীধর্মপুরাণ' [১০৪] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারদের দুরারোগ্য শিরঃপীড়ার কারণ হইয়াছে। গোবিন্দদাসের কড়চা লইয়া একদা যেমন ঘোঁট পাকাইয়াছিল—এখনও যাহার জড় মিটে নাই, ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণও ঠিক সেইরূপ সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। অবশ্য সে সমস্যা সমাধানের পন্থাটা তত দুরূহ মনে হইতেছে না।

বাংলা ১৩৩৭ সনে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩১০ সনের নকল করা একখানি পুঁথি (যাহাকে তিনি ধর্মমঙ্গলের প্রাচীনতম কবি ময়ূরভট্টের বহুশ্রুত কাব্য বলিয়া মনে করেন) ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণরূপে প্রকাশ করিলে এই কবিকে লইয়া প্রাচীন সাহিত্যামোদীসমাজে বিষম গণ্ডগোল দেখা দিল। ছাপা গ্রন্থের ভাষা প্রভৃতি দেখিয়া অনেকেই মনে করিলেন—ইহা একখানি অর্বাচীন পুঁথি, জাল গ্রন্থ। এ বিষয়ে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রায় প্রত্যেক ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি প্রারম্ভে ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্টের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন।[১০৫] ইহা হইতে কেহ কেহ

---

১০৩ "আহা! কবিবরের কাব্যখানি অতি অলৌকিক রসভাবসমন্বিত। ইহাতে গৌড়বৃত্তান্ত অনেক আছে। ইহা সাহিত্যসংসারে আদর্শ।" (১৩১২ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'জন্মভূমি' পত্রে দত্ত মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

১০৪ মুদ্রিত কাব্যের আখ্যাপত্র :— শ্রীধর্মপুরাণ / ময়ূরভট্ট বিরচিত / শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ / কর্তৃক সম্পাদিত / ১৩৩৭ (সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাবলী সং ৬৮)

১০৫ (১) বন্দিব ময়ূরভট্ট কবি সুকোমল।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে শ্রীধর্মমঙ্গল ॥ (মাণিক গাঙ্গুলি)
(২) ময়ূরভট্ট বন্দিব সঙ্গীত আদ্যকবি। (ঘনরাম)
(৩) আদ্যকবি ময়ূরভট্ট সুকবি পণ্ডিত। (রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যা)

অনুমান করেন যে, ময়ূরভট্টই ধর্মমঙ্গলের আদিকবি।) বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লাউসেনকে ঐতিহাসিক চরিত্ররূপে এবং দেবপালের সমসাময়িক (৯ম-১০ম শতাব্দ) বলিয়া ধরিয়া লইয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ময়ূরভট্ট লাউসেনের পৌত্র ধর্মসেনের সভাকবি ছিলেন। সুতরাং ময়ূরভট্ট একাদশ শতাব্দীর ব্যক্তি হইবেন।[১০৬] এ বিষয়ে পূর্বে আমরা দেখাইয়াছি যে, লাউসেন কদাপি ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন, দেবপালের সময় ধরিয়া তাঁহার সময় নির্ধারণও বাতুলতা মাত্র। সুতরাং ময়ূরভট্টের কাল নির্ণয়ে বসন্তকুমার যে সন-তারিখ বাহির করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসের দিক দিয়া কদাচ গ্রাহ্য হইতে পারে না। ময়ূরভট্ট যদি একাদশ শতকের কবি হন, তাহা হইলে মুদ্রিত শ্রীধর্মপুরাণের যে কিরূপ হাস্যকর অবস্থা হইয়া পড়ে তাহা বসন্তকুমার ভাবিয়া দেখেন নাই। একাদশ শতাব্দীর গ্রন্থের ভাষা এতটা আধুনিক হইল (বিংশ শতাব্দীর মতো) কি করিয়া, বসন্তবাবুর মতো ভাষাতত্ত্বে-প্রাজ্ঞ পণ্ডিত কেন তাহা ভাবিয়া দেখিলেন না তাহা বুঝা যাইতেছে না। যাহা হউক ময়ূরভট্ট নামক 'সূর্যশতকের' এক কবি কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত। শুনা যায় তিনি কোন অপরাধের জন্য কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তার পরে তিনি সূর্যের আরাধনা করিয়া সুকঠিন তপস্যা ও কৃচ্ছ্র সাধনা করেন এবং 'সূর্যশতক' নামক সূর্যবন্দনাবিষয়ক কাব্য লিখিয়া সূর্যের কৃপায় কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করেন। ইনি বাঙালী নহেন, গুজরাট অঞ্চলে ইঁহার সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। মেরুতুঙ্গের 'প্রবন্ধ চিন্তামণি' এবং বালম্ভট্টের সূর্যশতক টীকায় ময়ূরভট্ট সম্বন্ধে লোকপ্রচলিত গালগল্পের উল্লেখ করা হইয়াছে।[১০৬ক]

(৪) ময়ূরভট্ট বন্দ দ্বিজ রূপরাম গায়। (রূপরাম)

(৫) ময়ূরভট্টকে বন্দিয়া মস্তকে
সীতারাম দাস গায়। (সীতারাম দাস)

(৬) ময়ূরভট্ট দ্বিজবরে প্রণাম করিয়া তারে
পুন রচে শ্রীশ্যাম পণ্ডিত। (শ্যামপণ্ডিত)

(৭) আছিল ময়ূরভট্ট সুকবি পণ্ডিত।
রচিল পয়ার ছাঁদে অনাদ্যের গীত। (গোবিন্দরাম বন্দ্যো)

১০৬ শ্রীধর্মপুরাণের ভূমিকা, পৃ. :/,

১০৬ক ডঃ সেনের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের ১৪২-৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সংস্কৃত 'সূর্যশতকের' কবি ময়ূরভট্ট বাঙলার বাহিরেই পরিচিত। এখন কেহ কেহ সূর্যশতকের ময়ূরভট্ট ও শ্রীধর্মপুরাণের ময়ূরভট্টকে একই ব্যক্তি বলিতে চাহেন।[১০৭] ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেব কুলপঞ্জিকা ও নানা তথ্যের সাহায্যে মনে করেন, ধর্মপুরাণের ময়ূরভট্ট দ্বাদশ শতকের শেষভাগে বর্তমান ছিলেন, অতএব তাঁহার ধর্মমঙ্গলকাব্য ঐ সময়েই রচিত হইয়া থাকিবে। বসন্তকুমার-সম্পাদিত ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণের প্রামাণিকতায় বিশ্বাস করিয়া শহীদুল্লাহ্ সাহেব[১০৮] মনে করেন যে, ময়ূরভট্ট লাউসেনের পৌত্র ধর্মসেনের সভাকবি, এবং তিনি শ্রীধর্মপুরাণ রচনা করেন। তাঁহার মতে লাউসেন দ্বাদশ শতকে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং ময়ূরভট্টের কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যাইতে পারে। কিন্তু মেরুতুঙ্গের 'প্রবন্ধ চিন্তামণি'তে দেখা যায়, সূর্যশতকের ময়ূরভট্ট ও কাদম্বরীর বাণভট্টের মধ্যে ভগিনীপতি-শ্যালক সম্বন্ধ ছিল। ইহা সত্য হইলে 'সূর্যশতকে'র কবি ময়ূরভট্ট ৭ম শতাব্দীর বাণভট্টের সমসাময়িক হইবেন। তাহা হইলে বাঙলাদেশের ময়ূরভট্ট এবং সূর্যশতকের ময়ূরভট্টের মধ্যে কোন যোগাযোগ স্থাপন করা যায় না। বাঙলার ময়ূরভট্ট সম্বন্ধে দুই চারিটি তথ্যও পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন পুঁথিতে ময়ূরভট্টকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে।[১০৯] মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী 'বারেন্দ্রকুল-পঞ্জিকায়' ভট্টশালীবংশে ময়ূরভট্টের জন্মের কথা বলিয়াছিলেন।[১১০] নগেন্দ্র-

---

১০৭ ডঃ সেন এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন—"কিংবদন্তীতে বলে সূর্যশতক লিখিয়া ময়ূরভট্ট কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রোগমুক্তির তপস্যার যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত "শালে ভর" ও "হাকন্দ" তপস্যার অনুরূপ।" বলাবাহুল্য ডঃ সেনের এ মন্তব্য যথেষ্ট যুক্তিসহ নহে। বরং ইহাই মনে হয় যে, বাঙলাদেশের ধর্মমঙ্গলের কবিগণ 'শালে ভর' ও 'হাকন্দ' পালা রচনায় সংস্কৃত সূর্যশতকের কবি ময়ূরভট্টের গ্রন্থ হইতে সাহায্য লইয়াছিলেন। কেহ কেহ হয়তো তাঁহাকে ধর্মসেবকও মনে করিয়া থাকিবেন। কারণ ধর্মমঙ্গল কাব্যের ধর্মঠাকুর কখনও কখনও সূর্যস্বরূপ, এবং কুষ্ঠরোগ দান ও নিরাময় ক্ষমতার অধিকারী।

১০৮ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৬০ (ডঃ শহীদুল্লাহ্ লিখিত 'ময়ূরভট্ট' প্রবন্ধ)

১০৯ ময়ূরকুলুকভট্ট আচার্য উদয়ন।
আদি কবি শিরোমণি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ॥ (রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৮)

১১০ এই বংশে সরস্বতী চিরদয়াবতী
ময়ূরভট্টের নামে বংশে ছিল খ্যাতি।
ময়ূর ভট্ট পূর্ব্ব কবি ময়ূর সদৃশ।
আজও নাহি দেখি তাঁর কিছু বিসদৃশ॥ (বারেন্দ্রকুল পঞ্জিকা)

নাথ বসু 'কুলমঞ্জুরী' নামক কুলপঞ্জিকা হইতে[১১১] দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ৬৫৫ শকে আদিশূরের রাজ্য প্রাপ্তি, ৬৬৮ শকে বা ৭৪৬ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গে তাঁহার চারি ব্রাহ্মণ আনয়ন। ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেব মনে করেন যে, ৭৪৬ খ্রীঃ অব্দে ময়ূরভট্টের আদিপুরুষের কাল। তাহার ত্রয়োদশ পুরুষ পরে ময়ূরভট্টের জন্ম—অর্থাৎ ময়ূরভট্ট ১০৭৯-৮০ খ্রীঃ অব্দে বর্তমান ছিলেন।

শহীদুল্লাহ্ সাহেব কুলপঞ্জিকার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যে রীতিতে ময়ূরভট্টের কাল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কারণ আধুনিক কালের ঐতিহাসিকগণ আদিশূরের বৃত্তান্ত কল্পিত গালগল্প বলিয়া বাতিল করিয়াছেন। কুলপঞ্জিকাগুলিও সন-তারিখ ও তথ্যপ্রমাণের দিক দিয়া একেবারে নিরঙ্কুশ। অতএব ডঃ শহীদুল্লাহ্ নগেন্দ্রনাথ বসুর মতানুসারে কুলপঞ্জিকার উপর ভিত্তি করিয়া ময়ূরভট্টকে যে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়াছেন, তাহা স্বীকার করা যায় না।

এখন স্বয়ং বসন্তবাবু, যিনি ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণ সম্পাদনা করিয়া মধ্যযুগীয় 'ধর্ম' সাহিত্যের ইতিহাসে মৌলিক আবিষ্কারের গৌরব লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার তথ্যপ্রমাণাদি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নাকি ময়ূরভট্টের একখানি ধর্মমঙ্গলকাব্য দেখিয়াছিলেন। তারপর ঐ পুঁথির আর কোন হদিশ মিলে নাই। সেই পুঁথিখানি নাকি রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও দেখিয়াছিলেন। কিন্তু বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় রাখালদাসের নিকট পরে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গিয়া বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। বীরভূমের শিবরতন মিত্র সিউড়ির নিকটবর্তী গ্রাম সুড়াই হইতে নাকি ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গলের একখানি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুঁথিসংগ্রাহক রাখালদাস কাব্যতীর্থকে দিয়াছিলেন। ১৩০৭ সনের 'বীরভূমি' পত্রে ইহারই বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তারপর এ পুঁথির আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। মধ্যযুগীয় বাঙলার পুঁথি সন্ধান করিতে গিয়া আমরা একটা কৌতুকজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছি। যে সমস্ত পুঁথি লইয়া সংশয়-সন্দেহ উঠিয়াছে, সেগুলি যারেকের জন্য কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির কাছে গুণ্ঠন মোচন করিয়া

১১১ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃ ৯২

রহস্যজনকভাবে উধাও হইয়া যায়। অর্বাচীন পুঁথিকে প্রাচীন বলিয়া প্রচার এবং একের পুঁথিকে অপরের নামে চালাইবার জন্য আধুনিক কালের পুঁথি-সংগ্রাহকগণও যে কিরূপ চাতুরী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা এই পথের পথিকেরা জানেন। এমন কি, এই অন্যায় অনৃতাচরণের দায় হইতে পুঁথি-গবেষক পণ্ডিতগণও অব্যাহতি পাইতে পারেন না।

১৩০৭ সনের 'বীরভূমি' পত্রিকায় (আষাঢ় সংখ্যা) ময়ূরভট্টের পুঁথির যে বিবরণী বাহির হইয়াছিল, বিশ্বভারতীর গবেষক ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয় তাহা হইতে প্রমাণ করেন যে, উহা শ্যাম পণ্ডিত নামক অপর এক কবির রচনা, ময়ূরভট্টের নহে।[১১২] বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণ সম্বন্ধেও গবেষণা করিয়া ডঃ মণ্ডল দেখাইয়াছেন যে, মুদ্রিত কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলের কবি রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জের রচনা। দ্বিজ রামচন্দ্র নামটি ছাপা গ্রন্থে 'দ্বিজ ময়ূরক' আকার ধারণ করিয়াছে। ডঃ সেন ও ডঃ মণ্ডলের মতে লোকশ্রুত ময়ূরভট্ট নামক কোন কবি ধর্মমঙ্গলের চরিত খণ্ডটি বোধহয় সর্বপ্রথম রচনা করেন। কারণ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলের কবিগণ এই ব্যাপারে ময়ূরভট্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন, এই বলিয়া কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন। তবে তাঁহারা ময়ূরভট্টের কোন গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন কি না সন্দেহ।[১১৩] অর্থাৎ ডঃ মণ্ডলের মতে প্রাচীন বাঙলার কিংবদন্তী অনুসারে ধর্মমঙ্গলের ময়ূরভট্ট নামীয় কোন কবির বর্তমান থাকা সম্ভব ; কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কথিত পুঁথি এবং বসন্তকুমার সম্পাদিত ময়ূরভট্টের ধর্মপুরাণ আদৌ প্রামাণিক গ্রন্থ নহে। এখন বসন্তকুমারের যুক্তি বিচার করিয়া দেখা যাক।

হুগলী জেলার গোঘাট থানার অন্তর্গত ভেউটে গ্রামনিবাসী আশুতোষ

---

১১২ বর্ধমান সাহিত্য সভা প্রকাশিকা, ২য় সংখ্যা (ময়ূরভট্ট রহস্য—ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল)

১১৩ সীতারাম দাস লিখিয়াছিলেন—

ময়ূরভট্ট মহাশয়ের সুন্দর পাঁচালী।
আনন্দে হইল নষ্ট দুষ্ট এক কলি॥ (বিশ্বকোষ, ১৮, পৃ, ৩৫)

অর্থাৎ সীতারাম দাসের সময়েই ময়ূরভট্টের কাব্যের দুইচার পংক্তি হারাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু 'আনন্দে' নষ্ট হইল কেন বুঝা যাইতেছে না।

পণ্ডিত ময়ূরভট্টের সাংঘাতখণ্ড নকল করিয়াছিলেন।[১১৪] ময়নাপুরের (বাঁকুড়া) যাত্রাসিদ্ধি রায়ের মন্দিরের পুরোহিত ভূতনাথ পণ্ডিত বসন্তবাবুকে আশুতোষ পণ্ডিতের ১৩১০ সনে নকল করা এই পুঁথিটি দিয়াছিলেন। বসন্তকুমার দেখিলেন যে, এতদিন ধরিয়া ময়ূরভট্টের যে ধর্মমঙ্গল কাব্যের কথা শুনা গিয়াছিল, ইহাই সেই কাব্য। ইহাতে কিন্তু শুধু ধর্মপুরাণের রামাই পণ্ডিত সম্পর্কিত গল্প এবং হরিশ্চন্দ্র রাজার গল্প আছে—লাউসেনের আখ্যানটি একেবারেই অনুপস্থিত। কিন্তু পুঁথির মধ্যভাগে ও সমাপ্তিতে কবি বলিয়াছেন যে, তিনি পরে দ্বিতীয় খণ্ড লিখিয়াছিলেন।[১১৫] আশুতোষ পণ্ডিতের নকল করা পুঁথিতে এই দ্বিতীয় খণ্ড নাই, ইহার অন্য কোন পুঁথিও পাওয়া যায় নাই।

পুঁথিটি প্রকাশিত হইলে বসন্তবাবু ভূমিকায় এই গ্রন্থকেই ময়ূর ভট্টের ধর্মপুরাণ বলিয়া প্রচার করিলেন এবং কবি যে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত, তিনি তাহাও প্রমাণের চেষ্টা করিলেন। পুঁথির ভাষা যে আধুনিক, ইহার ভাবেও আধুনিকতা আছে, তাহা তিনিও স্বীকার করিয়াছেন।[১১৬] ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখাইলেন যে (চর্যা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় যেরূপ প্রাচীনতা রক্ষিত হইয়াছে, "ময়ূরভট্টের পুঁথিখানির ভাষা তাহা অপেক্ষা আধুনিক।") এই আধুনিকতার কারণ কি? তাঁহার মতে (চণ্ডীদাস-কৃত্তিবাস প্রভৃতির কাব্য যেমন গায়ক সম্প্রদায়ের মুখে মুখে পরিবর্তিত হইয়াছে, ময়ূরভট্টের প্রাচীন ভাষাও নাকি সেই ভাবে আধুনিক হইয়া পড়িয়াছে।) তাঁহার মন্তব্য উদ্ধৃত হইল, "এই গ্রন্থের ভাষায় কারকবিভক্তি,

---

১১৪ পুঁথির পুষ্পিকাটি এইরূপ :— লিখিতং শ্রীআশুতোষ পণ্ডিত/সাকিম ভেউটে/জেলা হুগলী/থানা গোঘাট/বহু পুরাতন কীটদষ্ট পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করা হইল/তজ্জন্য অশুদ্ধ থাকিলে সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন/লিখিতং বহু যত্নেন চোরেন হ্রিয়তে যদি/মাতা চ শূকরী তস্য পিতা তস্য চ গর্দ্দভঃ/ইতি সন ১৩১০ সাল/তারিখ ১৫ই বৈশাখ

১১৫ দ্বিতীয়ে চরিত্রখণ্ড অতি সুললিত।
তাহাতে আছয়ে লাউসেনের চরিত॥
* * * *
দ্বিতীয় খণ্ডের কথা অমিয় সমান।
ভক্তিযুত মনেতে শুনহ মতিমান॥ (মুদ্রিত গ্রন্থ, পৃ ১৫১-৫২)

১১৬ "পুঁথিখানি আধুনিক এবং ইহার ভাবটিও আধুনিকত্ব প্রাপ্ত।" (ভূমিকা, পৃ. ১/০)

ক্রিয়াবিভক্তি বা ঐ প্রকার ব্যাকরণঘটিত রূপসমূহ কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষার ন্যায় আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া মূল গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে উত্তরকালে সংযোজিত বহু অংশ ইহাতে থাকিতে পারে, ইহাও একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ। আবার কেবলমাত্র শব্দসমূহ লইয়াও ভাষার প্রকৃতি বিচার হয় না; কারণ, লিপিকরের দুর্বোধ শব্দ লিপিকর পরিহার করিয়া থাকে।"[১১৭] এই গ্রন্থের আধুনিক ভাষা সম্বন্ধে ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। কিন্তু এ যুক্তি যে কত দুর্বল তাহা তাঁহার মতো ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত কেন ধরিতে পারেন নাই তাহা বিস্ময়ের ব্যাপার। যে গ্রন্থ অত্যন্ত জনপ্রিয়, পুনঃ পুনঃ পঠিত ও লিপিকৃত হয়, শুধু তাহার ভাষাই আধুনিকতা লাভ করে। চর্যা-শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যে-কোন কারণে হোক পরবর্তী যুগে পঠিত ও লিপিকৃত হয় নাই। তাই তাহার ভাষায় প্রাচীন লক্ষণ অনেকটা বজায় আছে। ময়ূরভট্ট অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিলে তাঁহার কাব্যের অনেক পুঁথি মিলিত—বিশেষতঃ তাঁহাকে ধর্মমঙ্গলের কবিগণ যখন এত প্রশংসা করিয়াছেন। সুতরাং বসন্তকুমার বক্ষ্যমাণ পুঁথির ভাষায় অর্বাচীনত্বের জন্য যে কারণ দেখাইয়াছেন, তাহা অত্যন্ত দুর্বল যুক্তি। সম্পাদক ইহাতে যে দুই-চারিটি প্রাচীন শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আঞ্চলিক শব্দ। সর্বোপরি এ পুঁথিতে দশটি ইসলামি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে কোন প্রকারে প্রামাণিক কাব্য বা ধর্মমঙ্গলের প্রাচীনতম কবি ময়ূরভট্টের রচনা বলা যায় না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা আলোচনার যোগ্য। বসন্তবাবু মনে করেন যে, ময়ূরভট্টের মূল গ্রন্থ সম্ভবতঃ সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল। এরূপ অনুমানের হেতু দুইটি। উক্ত পুঁথির দুইস্থলে আছে:

(১) গিয়া ধর্ম মন্দিরেতে শ্রীধর্ম শিলা সাক্ষাতে
অতিশয় কাতর অন্তরে।
অশ্রুজলে বক্ষ সিক্ত স্তবপাঠে বেদ উক্ত
ভাষাতে নিষেধ লিখিবারে॥

(২) অতি গুহ্য ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতে।
ভাষায় রচিনু পুথি ধর্মের প্রীতিতে॥

এই পংক্তিগুলি হইতে তাঁহার মনে সংশয় জাগিয়া উঠিল, "ইহা হইতে আমার

১১৭ ঐ, পৃ. ১৮/০

মনে একটা সন্দেহ জাগিয়া ওঠে যে, ময়ূরভট্ট বঙ্গভাষায় তাঁহার পুরাণ লিখিয়াছিলেন, না সংস্কৃত ভাষায়?” সঙ্গে সঙ্গে তিনি সদুত্তরও পাইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার পুঁথিসংগ্রাহক ভূতনাথ পণ্ডিত নিজ বাড়ী হইতে ময়ূরভট্টের মূল সংস্কৃত ধর্মপুরাণ হইতে কয়েকছত্র টুকিয়া আনিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিলেন। তিনিও প্রাপ্ত সংস্কৃত শ্লোকগুলির সঙ্গে বাংলা পয়ারগুলি মিলাইয়া দেখিলেন যে, “শ্লোকগুলির বর্ণনীয় বিষয় ময়ূরভট্টের বাংলা পুঁথির সহিত প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যায়।” ব্যাপার বড় রহস্যময়। এ যেন কোন যাদুখেলোয়াড় কালো টুপির মধ্য হইতে দর্শকের ইচ্ছামতো যাহা খুশি তাহাই বাহির করিতেছে। কখনও দর্শক বলিতেছে, ময়ূরভট্টের প্রাচীনতম ধর্মপুরাণ বাহির কর। অমনি টুপির মধ্য হইতে কাব্যখানা সশরীরে বাহিরে আসিল—হউক না তাহা অর্বাচীন কালের খাতায় লেখা! আবার দর্শক বলিল, উহাতে হইবে না। আমার মনে হইতেছে টুপির মধ্যে আরও মাল মজুত আছে। অমনি যাদুকর টুপির মধ্য হইতে সংস্কৃতে লেখা ময়ূরভট্টের ধর্মপুরাণ বাহির করিল। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো পণ্ডিত ব্যক্তি ভূতনাথ পণ্ডিতের বিশুদ্ধ ‘ফক্কিকা’ ধরিতে পারেন নাই—বড়ই পরিতাপের বিষয়। তিনি যেই অনুমান করিলেন যে, ময়ূরভট্ট বোধ হয় সংস্কৃতেও ধর্মপুরাণ রচনা করিয়াছিলেন (যদিও গায়ে পড়িয়া সেরূপ অনুমানের হেতু নাই), অমনি ভূতনাথ পণ্ডিত ভৌতিক উপায়ে ময়ূরভট্টের সংস্কৃত ধর্মপুরাণ, যাহা তাঁহার বাড়ীতে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা হইতে কিছু কিছু শ্লোক টুকিয়া আনিয়া হাজির করিলেন। বসন্তবাবু গবেষকের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া মূল সংস্কৃত পুঁথিখানি দেখিতে চাহিলে ভূতনাথ অম্লানবদনে বলিলেন যে, সংস্কৃত পুঁথিখানি তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ বলিয়া ইহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করায় তাঁহাদের আপত্তি আছে।[১১৮] কাজেই বসন্তবাবু সংস্কৃত পুঁথিখানি চর্মচক্ষে দর্শন করেন নাই, শুধু ভূতনাথের মুখের কথার উপর নির্ভর করিয়া দৃঢ়সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ময়ূরভট্ট মূল ধর্মপুরাণ সংস্কৃতে রচনা করিয়াছিলেন।[১১৯] যিনি এরূপ জলের লিখনকে শিলালিপি

---

১১৮ ময়ূরভট্ট ধর্ম পুরাণ—ভূমিকা, পৃ ১৷০

১১৯ ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন, বক্ষ্যমাণ বাংলা পুঁথিটি সংস্কৃত ধর্মপুরাণের অনুবাদ (বা, স, ই, ১ম, পৃ ৬৮০)। কিন্তু এবিষয়ে তিনি আর কোন প্রমাণ বা তথ্য উদ্ধৃত করেন নাই বলিয়া তাঁহার অনুমান মানিতে পারা যায় না।

বলিয়া চালাইতে চাহেন, তিনি যে একখানি অর্বাচীন (সম্ভবতঃ জাল) গ্রন্থকে ধর্মমঙ্গলের প্রাচীনতম কবি ময়ূরভট্টের প্রামাণিক গ্রন্থ বলিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি ?

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এ বিষয়ে গুরুতর অভিযোগ আনিয়াছিলেন। ১৩৩৮ সনের সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় তিনি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যেভাবে প্রতিকূল মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহাতে ছাপা পুঁথির হাস্যকর অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়িয়াছে। ছাপা বহির "থিয়েটারী ভাষা পড়িয়া নব্য কবির বৃত্তান্ত জানিতে কৌতূহলী হইয়াছিলাম। এই প্রবন্ধ (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ) সমাপ্ত হইবার পর জানিতে পারিলাম, [১২০] পুথীলেখক শ্রীআশুতোষ পণ্ডিত কলিকাতা অঞ্চলে ও আরামবাগে ২।৩ বৎসর করিয়া যাত্রার দলে ছিলেন। এখন (১৩৩৭ সাল) তাঁহার বয়স ৩২ বৎসর। অর্থাৎ তিনি ৫ বৎসর বয়সে "বহু পুরাতন কীটদষ্ট পুস্তক" হইতে 'সঞ্জাত খণ্ড' উদ্ধার করিয়াছিলেন। সে "কীটদষ্ট পুস্তক" আর নাই, ছাপা হইয়া গিয়াছে ! সে ছাপা পুস্তক, এই ময়ূরভট্ট। তাঁহার নিবাস গোঘাট থানায় বটে, কিন্তু বদনগঞ্জের তিনমাইল দক্ষিণে ভেউটা বা ভেঙটে গ্রামে। তিনি ডোম-পণ্ডিত, বাংলা লেখাপড়া ভাল জানেন, ইস্কুলে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন।"

অতঃপর ময়ূরভট্ট প্রসঙ্গে যবনিকা পড়া উচিত। যোগেশচন্দ্রের সন্ধানের ফলে দেখা গেল, ময়ূরভট্টের ধর্মপুরাণ বলিয়া যাহা ছাপা হইয়াছে, তাহা ভূতনাথ পণ্ডিত বলিয়া একজন আধুনিক ডোমপণ্ডিতের রচনা। যে খাতায় লেখা ছিল, যাহা নাকি ১৩১০ সালে পণ্ডিত মহাশয় পুরাতন পুঁথি হইতে নকল করিয়াছিলেন, তাহাও মিথ্যা। কারণ যোগেশচন্দ্রের মতে তখন ভূতনাথের বয়স পাঁচ বৎসর। সুতরাং গবেষকগণ নিশ্চয় এই সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে, বসন্তকুমার-সম্পাদিত ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণ একখানি জাল গ্রন্থ, একজন আধুনিক ব্যক্তি ইহাকে ময়ূরভট্টের প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া চালাইতে চাহিয়াছিলেন—বসন্তবাবু সেই কলে পা দিয়াছিলেন। যোগেশ-চন্দ্রের অনুসন্ধানের ফলে আসল সংবাদ ফাঁস হইয়া গিয়াছে।

---

১২০. যোগেশচন্দ্র কোন্ উৎস হইতে এই সংবাদ সংগ্রহ করিলেন, তাহার আভাস দিলে ভবিষ্যৎ গবেষকদের আলোচনার পক্ষে সুবিধা হইত।

কিন্তু এবিষয়ে আরও একটি চমকপ্রদ সংবাদ আছে। বিশ্বভারতীর গবেষক ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল ময়ূরভট্ট সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মুদ্রিত গ্রন্থটি অষ্টাদশ শতাব্দীর রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যার ধর্মমঙ্গলেরই হুবহু নকল। ভণিতায় যেখানে 'রামচন্দ্র' ছিল, সেখানে 'ময়ূরক' ছাপা হইয়াছে—ভূতনাথ পণ্ডিত মহাশয়েরই কীর্তি! সুতরাং যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মূল প্রস্তাবের উপর আর একটু সংশোধনী প্রস্তাব আনা যাইতে পারে যে, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত শ্রীধর্মপুরাণ কদাচ ময়ূরভট্টের রচিত নহে, রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যা নামক অষ্টাদশ শতাব্দীর এক কবির রচনা। ভূতনাথ পণ্ডিত রামচন্দ্রের পুঁথিটি কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া নকল করিবার সময় রামচন্দ্রের ভণিতা কাটিয়া ময়ূরভট্টের ভণিতা বসাইয়া দেন। তাঁহার এই চাতুরীতে বসন্তবাবুও বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন এবং ময়ূরভট্টকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল তোলপাড় করিয়াছিলেন।[১২১]

যেখানে কাব্যের প্রামাণিকতা লইয়াই বিষম সংশয়, এবং স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইয়াছে, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যার রচনার সঙ্গে প্রায় মিলিয়া যাইতেছে, সেখানে এ কাব্যের স্বতন্ত্র মর্যাদা দিবার প্রয়োজন নাই। এ কাব্যের ভাব-ভাষা ও শব্দ প্রয়োগ যে কত আধুনিক ও অর্বাচীন, তাহা ইহার যে কোন অংশ পড়িলেই বুঝা যাইবে। এখানে শুধু দুই-চারিটি শব্দ ও বাক্‌রীতির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

(১) চরিদিকে বৃক্ষ লতা গুল্ম নানা জাতি।
আলোক অনিল শূন্য ভয়ঙ্কর অতি ॥

(২) এত বলি নারায়ণ খুলে পাঁজি পুথি।
বিচার করিয়া দেখে ভূমে খড়ি পাতি ॥

(৩) রহিবে ইহার কীর্ত্তী ভারত ভুবনে।

(৪) রক্ত বস্ত্রে সুশোভিতা মৌলী চন্দ্র বিভূষিতা
সোমাদিত্য সম নেত্র আভা।

(৫) সানুকূল বুঝি বিধি তাই তুমি গুণনিধি
মম সনে মিলিতে হেলায়।

(৬) অজ্ঞান কুমতি ঘোরে নারিনু চিনিতে।
দয়া করি জননি হইবে মুক্তি দিতে ॥

---

১২১ সহিত্য পরিষদের ৬৬৬ সংখ্যক পুঁথিটি রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যার ধর্ম পুরাণ। ইহার সঙ্গে মুদ্রিত ময়ূরভট্টের হুবহু সাদৃশ্য আছে।

(৭) ক্ষুধের ভাণ্ডারী হল ধর্মের ভাণ্ডারে।

(৮) শাশুড়ী জেঠাই মাসী গুরুজায়া খুড়ী পিসী

রসিকতা ভাগ্নেবৌ সঙ্গে।

(৯) এই সব কদাচারে রত হলে যত নরে

সুর পুরে যাবে সুরধুনী।

দেবদেবী না পূজিবে পূর্বকীর্ত্তী উঠে যাবে

তীর্থ ছাড়া হইবে অবনী॥

এ ভাষা একেবারে হাল আমলের। ইহাকে যিনি দ্বাদশ শতকের রূপান্তর বলিয়া চালাইতে চাহিয়াছেন, তাঁহার ভাষাতত্ত্ব জ্ঞান সম্বন্ধে পাঠকের [illegible] জন্মিতে পারে। যাহা হউক এই অর্বাচীন কবির আধুনিক ধর্মপুরাণ মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচনার যোগ্য নহে।

রামাই পণ্ডিত ও তাঁহার পুত্র ধর্মদাসের দ্বারা ধর্মঠাকুরের মহিমা প্রচার এই কাহিনীর প্রধান বিষয়—মাঝে মাঝে বিস্তারিত আকারে ধর্মের ঘরভরণ উৎসবেরও বিবরণী আছে। ভাষা বেশ আধুনিক, পরিচ্ছন্ন, পুঁথির লেখক আশুতোষ পণ্ডিত যে "বাংলা লেখাপড়া ভাল জানেন" এবং তিনি "ইস্কুল ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন", যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির এই তথ্যে অবিশ্বাসের কারণ নাই। যাহা হউক, আধুনিক কালে যে কয়খানি প্রাচীন বাংলা কাব্য প্রাচীন বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের সেই প্রাচীনত্বের গৌরব ধূলিসাৎ হইয়াছে, ময়ূরভট্টের নামে প্রচারিত মুদ্রিত শ্রীধর্মপুরাণ সেইরূপ একখানি সংশয়পূর্ণ কাব্য। ইতিপূর্বে[১২২] আমরা দেখাইয়াছি যে, গোবিন্দ-দাসের কড়চাও একখানি জাল গ্রন্থ—কিন্তু তাহার জালিয়াতির সূত্রটি খুব সূক্ষ্ম, স্পষ্টভাবে তাহার কারচুপি ধরা যায় না। কিন্তু বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এই গ্রন্থের অর্বাচীনত্ব প্রমাণের জন্য অধিক তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন নাই। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয় 'বর্ধমান সাহিত্য প্রকাশিকা'য় (২য়) যে চমকপ্রদ সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন, এবং পূর্বে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই কাব্যকে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হইতে বহিষ্কৃত করা উচিত। সেই কথাটি ব্যাখ্যা করিবার জন্য আমাদিগকে এতটা কাগজকালির অপব্যয় করিতে হইল।

১২২. এই লেখকের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

রূপরাম চক্রবর্তী ॥

ধর্মমঙ্গল কাব্যের অধিকাংশ কবি গতানুগতিকতার পথ ধরিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাব্যে নূতন বৈচিত্র্যের অভাব বড়ই দৃষ্টিকটু বলিয়া মনে হয়। প্রায় বিশ জনের মতো কবির পুরা বা খণ্ডিত কাব্য পাওয়া গেলেও এগুলির অতি অল্পই প্রাচীন। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচনা অধিক সংখ্যায় হইয়াছিল। একদা উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক আলোকোজ্জ্বলতার যুগে এবং ছাপাখানার রাজ্যেও কেহ কেহ মধ্যযুগীয় ধর্মমঙ্গলের প্রাচীন পন্থা ধরিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলেব শ্রেষ্ঠ কবি, রূপরাম চক্রবর্তী, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শক্তিমান কবি ঘনবাম চক্রবর্তী: এই শতাব্দীর মাণিকরাম গাঙ্গুলির কাব্যও নিন্দনীয় নহে। কিন্তু এই কযখানি কাব্য বাদ দিলে, আব কাব্যগুলিতে প্রতিভাব বিশেষ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলেই বাঁধা ছক অনুসবণ কবিয়া ফলাও করিয়া আত্মকথার পরিচয় দিয়াছেন, স্থাপনা পালা হইতে শুরু কবিযা লাউসেনেব স্বর্গারোহণ পর্যন্ত বিচিত্র ঘটনাসমূহকে প্রায একইভাবে সাজাইয়াছেন। ফলে কাহিনীব বৈচিত্র্য, কবিপ্রতিভার মৌলিকতা ও অনাস্বাদিতপূর্ব অভিনবত্ব ধর্মমঙ্গল-কাব্যে বড একটা আশা কবা যায় না। যাহা হউক ইঁহাদের মধ্যে রূপরামের প্রতিভা স্বীকৃতিব যোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দীতে মোট চারিজন কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা কবিযাছিলেন: রূপরাম. বামদাস আদক, সীতাবাম দাস এবং যাদুনাথ রায়। ইঁহাদেব মধ্যে যাদুনাথ বায় ধর্মমঙ্গলে আত্মপরিচয় দেন নাই এবং তাঁহাব কাব্যে শুধু হবিশ্চন্দ্র পালা বর্ণিত হইয়াছে—লাউসেনের কাহিনীর কোন উল্লেখ নাই। তাই তাঁহাব কাব্য ধর্মপুবাণ নামেই পরিচিত, ইহার নাম ধর্মমঙ্গল কাব্য নহে।

রূপবামের ধর্মমঙ্গলের পুঁথিব মধ্যে কোথাও কোথাও 'অনাদ্যমঙ্গল' আখ্যাও আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পুঁথিতে (নং—৩৬৩৯) আমবা 'ধর্মায়ন' পাইয়াছি। কবিও কয়েকস্থানে ধর্মনিরঞ্জনকে 'অনাদ্য' বলিয়াছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্য ও ধর্মের পূজাসংক্রান্ত পুস্তিকায ধর্মের প্রতিশব্দ হিসাবে 'নিরঞ্জন' ও 'অনাদ্য' দুইটি শব্দই পাওয়া যায়। নিরঞ্জন হইলেন নির্গুণ নিরাকার, আর তাঁহার সাকার বিগ্রহ হইলেন ধর্ম। অনেক কবি ধর্মকে অনাদ্য বলিয়াছেন। রূপরামের মতো প্রতিভাধর কবির কাব্যটির অতি

সামান্য অংশ কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। ডঃ সুকুমার সেনের সম্পাদনা ও ভূমিকাসহ প্রকাশিত 'রূপরামের ধর্মমঙ্গল' (১ম খণ্ড, ১৩৫১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত) ছাপা হইবার পর সাধারণ পাঠক এই কবি সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছে। ইহার কয়েক বৎসর পরে কাব্যটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কাব্যের অতি সামান্য অংশ মুদ্রিত হইয়াছে। লাউসেনের সমগ্র জীবনকাহিনীর মধ্যে বাল্য কৈশোরের কয়েক বৎসর যে তিনটি পালায় বর্ণিত হইয়াছে, সম্পাদক শুধু সেই কয়টি পালাকে 'প্রথম খণ্ড' নাম দিয়া লাউসেনের জন্ম হইতে আখড়া পালা[১২৩] পর্যন্ত—মূল কাব্যের এক তৃতীয়াংশেরও কম অংশ মুদ্রিত করিয়াছেন। অবশ্য একদা-জনপ্রিয় কবি রূপরামের অনেক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান সাহিত্য সভা, বিশ্বভারতী—এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে রূপরামের বহু পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে।[১২৪] তবে পুঁথিগুলির পাঠ এত বিভিন্ন যে, পূর্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া পূর্ণাকারের কাব্য প্রকাশও সম্ভব নহে। যাহা হউক, ডঃ সেনের সম্পাদনায় রূপরামের কাব্যের যে খণ্ডিতপরিমাণ অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে রূপরামের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে মোটামুটি অবহিত হওয়া যায়।

রূপরামের কালনিরূপণের সংকেত তাঁহার পুঁথির মধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। আত্মপরিচয়ের শেষে বা সমাপ্তিতে কবি প্রহেলিকাময় ভাষায় শকের নির্দেশ দিয়াছেন। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সর্বপ্রথম এই প্রহেলিকা ভেদ করিয়া কাব্যের রচনাকাল উদ্ধার করেন।[১২৫] রূপরামের কোন কোন পুঁথিতে কালজ্ঞাপক এই ছত্র কয়টি পাওয়া গিয়াছে :

---

১২৩ প্রথম সংস্করণে 'শিশু লাউসেনের চুরি' পালা পর্যন্ত ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে আর একটা পালা 'আখড়া পালা' নামে যুক্ত হইয়াছে। মোট ১২ পালায় বিভক্ত বিরাট কাহিনীর মাত্র এক তৃতীয়াংশ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইলে গোটা কাব্য প্রকাশিত হইতে কত বিলম্ব হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

১২৪ ডঃ সেনের হিসাব মতে রূপরামের মোট ৩০ খানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য অধিকাংশ পুঁথি খণ্ডিত এবং দু' একটি পালার সংগ্রহ মাত্র। এক পুঁথির সঙ্গে অপর পুঁথির পাঠেরও নানা পার্থক্য আছে। ডঃ সেনের মতে, "কোন কোন পুঁথিতে এতদূর অমিল যে ভণিতা ছাড়া কিছুই মেলে না।" এরূপ অবস্থায় Composite text-এর জিলোত্তমা মূর্তি ভিন্ন কবির প্রামাণিক সংস্করণ বাহির করাও দুরূহ।

১২৫ প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৬ ('কবি শকাব্দ—যোগেশচন্দ্র রায়)

শাকে শীমে জড় হইলে যত শক হয়।
তিন বাণ চারযুগ বেদে যত রয়॥
রসের উপরে রস তারে রস দেহ।
এই শকে গীত হইল লেখা কর‍্যা নেহ॥

কবি তো 'লেখা কর‍্যা' লইবার নির্দেশ দিয়াই দায়িত্ব মুক্ত হইয়াছেন, এবং নিজের বুদ্ধির চাতুরীতে বোধ হয় নিজেই মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই চারিছত্র হইতে সন-তারিখ নির্ণয় যে সহজ নহে, তাহা অবশ্য সকলে বুঝিবেন। যাহা হউক যোগেশচন্দ্র অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে ইহার মর্মোদ্ধার করিয়া ইহা হইতে ১৫২৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬০৪-৫ খ্রীঃ অঃ পাইয়াছেন।[১২৬] কিন্তু ডঃ সেনের মতে এই সন হইবে ১৫৭১ শক বা ১৬৪৯ খ্রীঃ অঃ। ডঃ সেন সন-তারিখঘটিত আরও কয়েকটি তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন। একখানি প্রাচীন পুঁথিতে[১২৭] শাহ্ সুজার উল্লেখ[১২৮] আছে, এবং কোন কোন পুঁথিতে কালবাচক পয়ারে 'তিনবাণ চারযুগে'র স্থলে 'চারিবাণ তিনযুগ' (৫ × ৪ + ৪ × ৪ = ৩৬) আছে। ইতিপূর্বে রাজন্যবৃত্তের বিবরণীতে (প্রথম অধ্যায়) আমরা দেখিয়াছি যে, সুজা ১৬৩৯ হইতে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙলার সুবাদারী করিয়াছিলেন, এবং অধিকাংশ সময়েই তিনি আর্দ্র ভূমি ঢাকা অপেক্ষা ঈষৎ শুষ্ক রাজমহলকেই অধিকতর পছন্দ করিতেন। সেই সময় হইতে রূপরাম ধর্মের গীত গাহিয়া আসিতেছেন—"সেই হইতে গীত গাই আসর ভিতর।" তাহা হইলে এই কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রচিত

---

১২৬ বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রহেলিকা সমাধান ডঃ সেনের মতে কতকটা এই প্রকার :—

শাকে × শীমে = ১০ × ১১ × ১২ = ১৩২০
তিন বাণ + চারি যুগ + বেদ = ১৫ + ১৬ + ৪ = ৩৫
রস × রস × রস = ৬ × ৬ × ৬ = ২১৬
মোট—১৫৭১ শক বা ১৬৪৯ খ্রী অঃ।

দশমী ও দ্বাদশীতে পুঁই ও কলমী শাক খাইতে নাই, একাদশীতে কেহ কেহ আবার সিম খায় না। সুতরাং শাক = ১০,১২, সিম = ১১। তিনবাণ (৩ × ৫), চারিযুগ (৪ × ৪), বেদ (৪), রস ইত্যাদি = ৬ × ৬ × ৬—এই হিসাব যুক্তি সঙ্গত বটে।

১২৭ ডঃ সেন এই পুঁথিকে অবলম্বন করিয়া রূপরামের ধর্মমঙ্গল সম্পাদনা করিয়াছেন

১২৮ রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল শুজা।
পরম কল্যাণে যত আছিল প্রজা॥ (ডঃ সেনের সম্পাদিত গ্রন্থ)

হইয়াছে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। অন্য পুঁথির পাঠান্তর ('চারিবাণ তিন যুগ') যথার্থ হইলে এই শকাব্দ হইবে ১৫৭২ (১৬৫০ খ্রীঃ অঃ)। অর্থাৎ ডঃ সেন যে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে কবিকে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পাওয়া যাইতেছে। যোগেশচন্দ্রের সঙ্কেত অনুসারে ১৫২৬ শক, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ১৬৪১ শক[১২৯] এবং দীনেশ চন্দ্রের মতে রূপরাম পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন[১৩০]।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্নের কথা উত্থাপন করা যাইতে পারে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, দুইজন রূপরাম ছিলেন। একজন আদি রূপরাম, আর একজন পরবর্তী রূপরাম—যাঁহার কাব্য একদা পশ্চিমবঙ্গে সুপ্রচারিত হইয়াছিল। মাণিকরাম গাঙ্গুলি (অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ) তাঁহার কাব্যে আদিরূপরামের উল্লেখ করিয়াছেন :

বন্দিয়া ময়ূরভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্মগুণগান।।'

ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, যখন মাণিক গাঙ্গুলি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তখন দুইজন রূপরামের কাব্য প্রচলিত ছিল বলিয়া

---

১২৯ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণ, ভূমিকা, পৃ. ।৵০

১৩০ দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয় (১ম)। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন যে, রূপরামের মুদ্রিত পুঁথিতে (ডঃ সুকুমার সেনের সম্পাদিত সংস্করণ) কালজ্ঞাপক যে পয়ারগুলি আছে (পূর্বে উল্লিখিত), তাহার বিশুদ্ধ পাঠ হইবে এইরূপ :

তিন বাণ চারিযুগ বেদ যত রয়।
শাকে সনে জড় হইলে কত শক হয়।।
রসের উপরে রস তাহে রস দেহ।
এই শকে গীত হৈল লেখা কইরা লেহ।।

ডঃ ভট্টাচার্যের মতে, এখানে শকাব্দ (শাকে) এবং সন (হিজরী সন)—দুই প্রকার সনই আছে। তিন বাণ (৩×৫), চারিযুগ (৪×৪) অর্থাৎ ১৫১৬ শক, তাহা হইতে বেদ (৪) বাদ দিলে ১৫১২ শক পাওয়া যাইবে। রস+রস+রস—ইহাকে ডঃ ভট্টাচার্য হিজরী সন ধরিয়া ৯৯৯ অব্দ পাইয়াছেন। তাহা হইলে শকাব্দ দাঁড়াইতেছে ৯৯৯ হিজরী=১৫১২ শকাব্দ =১৫৯০ খ্রীঃ অব্দ। এই সন-তারিখ হিসাবের দিক দিয়া অযৌক্তিক নহে। কিন্তু পুঁথিতে লিখিত পয়ারকে অঙ্কের খাতিরে এইভাবে বদলাইয়া লওয়া যায় কিনা তর্কসাপেক্ষ। উপরন্তু প্রাপ্ত পুঁথিগুলির ভাষা একটু পরবর্তী কালের বলিয়াই মনে হইতেছে। যাহা হউক প্রকৃষ্ট প্রমাণাভাবে আদিরূপরাম বলিয়া কোন কবিকে স্বীকার করা যায় না। দ্রষ্টব্য : ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (আদিরূপরাম ও রূপরাম)

তিনি প্রাচীনতর কবিকে আদিরূপরাম বলিয়াছেন। (মাণিক গাঙ্গুলির কাব্যে রূপরামের পদ স্থান করিয়া লইয়াছে, অথবা তিনি রূপরামের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।)

(রূপরামের পূর্ববর্তী ধর্মমঙ্গলকাব্যের আর কোন কবির প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।) রূপকথার ময়ূরভট্টের কথা ছাড়িয়া দিলে ধর্মঠাকুরের মহিমাবিষয়ক লাউসেনের চরিতকথার আদিপ্রবর্তক হিসাবে রূপরামকে স্বীকার করা যাইতে পারে। অবশ্য তাঁহার পূর্বেও লাউসেনের গল্প-কাহিনী ছড়া-পাঁচালী-ব্রত-কথার আকারে ডোমসমাজে প্রচলিত ছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। কিন্তু লোকমুখে প্রচলিত অসম্বদ্ধ ব্যালাডকে রূপরামই সম্ভবতঃ একটা দীর্ঘ বীররসাত্মক আখ্যানকাব্যের রূপ দিয়াছিলেন, যাহাতে ধর্মাচরণ ও ভক্তিরস অপেক্ষা দুঃসাহসিক ঘটনা ও বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। (ধর্মপূজা বিষয়ক ব্রত-কৃত্য জাতীয় পুঁথি এবং রামাই পণ্ডিত ও হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনীতে ('সাংযাত খণ্ড') ধর্মঠাকুরের অপার্থিব নারায়ণ মূর্তিই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু ধর্মমঙ্গল বা চরিতখণ্ডে কাহিনীর পশ্চাদপটে দেব মহিমা থাকিলেও মানুষের চরিত্র-বীর্য-ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কৃচ্ছ্র-সাধনাই বিস্ময়কর সমুন্নতি লাভ করিয়াছে। রূপরাম এই বৈশিষ্ট্যটির আদি প্রবর্তক কি না বলা যায় না; কিন্তু তিনি দেবমহিমাকে আচ্ছন্ন না করিয়াও যে মানুষের মহত্ত্ব ও বীর্যকে কাব্যরূপ দিয়াছেন, ইহা অবশ্য স্বীকার্য।)

(এই কাব্যের পুরা পুঁথির সংখ্যা অতি অল্প, প্রায়ই একটি দুটি পালার পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে।) ডঃ সুকুমার সেন রূপরামের কাব্যের দুইটি সংস্করণ সম্পাদনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি পুরাকাব্যের অতি সামান্য অংশ পাঠকের দৃষ্টিগোচর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কাজেই অনেকেই এই কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ততটা অবগত নহেন। (কিন্তু রূপরামের কবিত্বশক্তির বর্ণনাকৌশল, চরিত্রসৃষ্টি প্রভৃতি বিচার করিলে তাঁহাকে মধ্যযুগের একজন প্রতিভাবান কবি বলিতে হইবে।) কোন কোন দিক দিয়া তিনি মুকুন্দরামের সমকক্ষ। ধর্মমঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে ছাপাখানার যুগে ঘনরামের ব্যাপক প্রচার হইলেও উভয় কবির কাব্য তুলনা করিলে দেখা যাইবে, (ঘনরাম কৃত্রিম কাব্যকলায় পারদর্শী হইলেও যথার্থ সৃষ্টি-প্রতিভায় রূপরাম অধিকতর সার্থক।)

প্রথমে কবির আত্মপরিচয়টুকু ধরা যাক। বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দরাম, ক্ষেমানন্দ ও ভারতচন্দ্রের আত্মপরিচয় অংশ বেশ বিস্তারিত আকারে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এই ব্যাপারে ক্ষেমানন্দ মুকুন্দরামকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন। রূপরাম, রামদাস আদক, সীতারাম প্রভৃতি কবিদের আত্মপরিচয়মূলক পয়ারগুলিতে বাস্তবজীবনের বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মুকুন্দরাম পরিণত বয়সে অভয়ামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, কাব্যের প্রারম্ভে নিজ দুঃখদুর্জয় যাযাবর জীবনের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে একাধারে মানবজীবনরস ও ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের কাহিনী উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। ক্ষেমানন্দও তাঁহার মনসামঙ্গলে নিজ জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে মুকুন্দরামের আত্মপরিচয়ের বিশেষ প্রভাব আছে, তাহা পূর্বে আমরা দেখাইয়াছি। রূপরাম ক্ষেমানন্দের সমকালে বা ঈষৎ পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাল্য-কৈশোর জীবনের দুষ্টামি, আবার বাল্যেই ধর্মঠাকুরের কৃপালাভ—রূপরামের আত্মপরিচয়ের এই ছাঁদটি ক্ষেমানন্দের রীতি অনুসরণ করিয়াছে।

বর্ধমান জেলার দক্ষিণে কাইতি শ্রীরামপুর গ্রামে রূপরামের জন্ম হয়। পিতা অভিরাম ছিলেন বড় পণ্ডিত, তাঁহার বাড়ীতে অনেক পড়ুয়া পড়িত। কবিরা তিন ভাই, দুই বোন। বড় ভাই রত্নেশ্বর যেন "জলন্ত আগুন"; মধ্যম ভ্রাতা রূপরামকে পড়াশুনায় অনবধানতার জন্য প্রায়ই কর্কশ বাক্যে গঞ্জনা দিয়া থাকেন। ছোট রামেশ্বরকে কবি বড় ভালবাসেন, ছোট বোন দুটিও (সোনা, হীরা) কবিকে খুব মান্য করে, কবি উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য গেলেন পাসণ্ডা গ্রামে রঘুরাম ভট্টাচার্যের নিকট। সেখানে গুরুর সঙ্গে তর্ক হইলে, গুরু ক্রুদ্ধচিত্তে কবিকে পুঁথির বাড়ি দিয়া প্রহার করিলেন ("ঐমনি পুঁথির বাড়ি বসাইল গায়") এবং তাঁহাকে নবদ্বীপে যাইয়া বিদ্যা অর্জন করিতে বলিলেন। কবি নবদ্বীপের অভিমুখে যাত্রা করিয়া শনিবার দুপুর বেলা পলাশনের বিলের নিকট আসিয়া বিপদে পড়িলেন। প্রথমে "গোটা দুই কাছাড় খাইল গোপাল দীঘির পাড়ে", আবার অদূরে "দুটা বাঘ দুদিগে বসিয়া লেজ নাড়ে"। এই বিপদের সময় স্বয়ং ধর্ম ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া কিশোর কবির সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং পরিচয় দিয়া বলিলেন, "আমি ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায় নাম"। ঠাকুর রূপরামকে ধর্মের গীত গাহিতে

আদেশ দিলেন, এবং কবির কানে 'মহাবিদ্যা' মন্ত্র দিয়াই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কিশোর কবি ভীত বিস্মিত হইয়া দিশাহারা অবস্থায় ঘুরিতে লাগিলেন। যাহা হউক নবদ্বীপ যাইবার পূর্বে মাতৃচরণ দর্শন করিবার জন্য বাড়ীতে আসিতেই কোপমূর্তি অগ্রজের সঙ্গে কবির দেখা হইয়া গেল। তিনি কবিকে ভর্ৎসনা করিয়া ("কালি গিয়াছে পাঠ পড়িতে আজি আইলা ঘরে") কবির পুঁথি পত্রাদি ফেলিয়া দিলেন। কবির আর মায়ের সঙ্গে দেখা করা হইল না—সেই অবস্থায় দামোদর পার হইয়া দিগম্বর গ্রামে পৌছিলেন। ভাগ্যের পরিহাসে খাওয়া জুটিল না। চিঁড়া ভাজা বাতাসে উড়িয়া গেল, দক্ষিণাব দশগণ্ডা কড়ি আবার কানা—বাজারে চলিবে না। অতঃপর গোপভূমের রাজা ব্রাহ্মণবংশীয় গণেশরায় ধর্মের স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ কবিকে দ্বাদশ পালায় ধর্মের গান রচনা করিতে বলিলেন। তখন রাজমহলে বাঙলার সুবাদার শাহ সুজা বাস করিতেছিলেন। "সেই হইতে গীত গাই ধর্মের আসরে।" কবি শুধু কাব্য রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি নিজে দোহারদের সহযোগিতায় আসরে দাঁড়াইয়া মহানন্দে ধর্মের গানেও যোগ দিয়াছিলেন।

এই আত্মপরিচয়টুকুতে বাল্যকৈশোরের সহজ স্বাভাবিক জীবন, লৌকিকতার প্রতি আকর্ষণ, গার্হস্থ্যজীবন ও সামাজিক পটভূমিকার যে জীবন্ত রেখাচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা মুকুন্দরামের সমকক্ষ। তবে ধর্মের আবির্ভাবের জন্য ক্ষেত্র প্রশস্ত করিতে গিয়া কবি বিড়ম্বিত দুর্ঘটনা ও অনৈসর্গিকতার বড় বেশী সাহায্য লইয়াছেন—মনে হয় কবি যেন বাহবা পাইবার জন্য, বা আসর জমাইবার জন্য একটার পর একটা বর্ণনায় অসম্ভাবিতের উপর রং চড়াইয়া চলিয়াছেন। পলাশনের বিলের ধারে দুটা বাঘ লেজ নাড়িতেছে, সহসা ব্রাহ্মণবেশী ধর্মের আবির্ভাব, দিবাদ্বিপ্রহরে দিশা লাগিয়া কবির ঘুরিয়া বেড়ানো, বাড়ীতে ফিরিয়া অগ্রজের কাছে লাঞ্ছনালাভ, চিঁড়া ভাজা উড়িয়া যাওয়াতে কবির নৈরাশ্য—ইত্যাদি বর্ণনায় কিছু কিছু অতিরঞ্জন আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বর্ণনার স্বাদে, স্বাভাবিকতা ও বালসুলভ কৌতূহল ছাড়িয়া দিলে, মুকুন্দরামের সে সহৃদয় অভিজ্ঞতা ও দুঃখকষ্টের পীড়ন নাই। অবশ্য মুকুন্দরাম পরিণত বয়সে কাব্য লিখিতে বসিয়া দুঃখের দিনগুলি স্মরণ করিয়াছিলেন, আর

(রূপরাম সম্ভবতঃ প্রথম যৌবনে কাব্যরচনায় অগ্রসর হইয়া অনতিক্রান্ত কৈশোরজীবনের আলোআঁধারি দিনগুলির ছবি আঁকিয়াছেন।) আরও একটা কথা, ধর্মমঙ্গলের কবিগণ তাঁহাদের জীবনে সশরীরে ধর্মের আবির্ভাব দেখাইবার জন্যই এই পটভূমিকাস্বরূপ তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের সুবিস্তৃত খুঁটিনাটি পরিচয় দিতেন। তাঁহাদের লৌকিক জীবনের ছায়াপটে অলৌকিক ঘটনাগুলি একে একে ঘটিয়া গিয়াছে। অপর দিকে মুকুন্দরাম স্বপ্নে দেবী চণ্ডীর প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন। শুধু এইটুকু বাদ দিলে তাঁহার আত্মপরিচয়ের আর কোথাও অলৌকিকতার প্রভাব নাই। তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, মুকুন্দরামের আত্মপরিচয় যেরূপ ঐতিহাসিক ও বাস্তব, রূপরামের আত্মকাহিনীটি সেরূপ নহে, (অতিপল্লবিত হইয়া ইহার স্বাভাবিক বর্ণনা অবিশ্বাস্য রূপকথায় পর্যবসিত হইয়াছে।)

রূপরামের মুদ্রিত কাব্য এবং আরও কিছু কিছু পুঁথি দেখিয়া মনে হইতেছে, (কবির দৃষ্টিশক্তি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ঘনরামের শিল্পরীতি বিচক্ষণ হইলেও চরিত্রসৃষ্টি, স্বচ্ছন্দ বর্ণনা, সহজ আলঙ্কারিতা, শোক ও পরিহাস সৃষ্টিতে রূপরাম প্রায় মুকুন্দরামের কাছাকাছি গিয়া পড়িয়াছেন।) বাৎসল্যরসে তাঁহার আন্তরিকতা লক্ষণীয়। লুইচন্দ্রপ্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র সন্ন্যাসীর আজ্ঞায় নিজ পুত্রকে কাটিয়া ফেলিলেও পরে যখন জানিলেন তাঁহার পুত্র অক্ষত রহিয়াছে, তখন তাঁহাদের স্বামী-স্ত্রীর পুত্রস্নেহব্যাকুলতা কবি এইভাবে ফুটাইয়াছেন :

এত শুনি গাজনে ধাইলা রাজারাণী,
লুঞা লুঞা বল্যা ডাকে চক্ষে পড়ে পানি ॥
বাপধন বাছা কোপা গেলা ভাই বলে।
লুইচন্দ্র তখন ধাইয়া পড়ে কোলে ॥
আচল ধরিঞা লুঞা হাসে খল খল।
মদনা বুকের মাঝে ঝাপিল আঁচল ॥
(লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিলা পুত্রের বদনে।
রাজরাণী হরিষ আনন্দ বড় মনে ॥)
কোলে কর্যা বাছাকে উল্লাস কথা কয়।
চুম্ব দিয়া বদনে বদনে রাণী রয় ॥
নয়ান ভরিয়া বাপু দেখি চাঁদমুখ।
এতক্ষণে ঘুচিল মনের মহা দুঃখ ॥

বাছা বাছা বলিয়া বদনে চুম্ব দেই।
মদনার কোল হতে রাজা কেড়ে নাই ॥
কোলে কর‍্যা ভূপতি বদনে চুম্ব খায়।
আনন্দ সাগরে ভাসে হরিচন্দ্র রায় ॥

ভাগিনা লাউসেনকে বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে মাতুল মাহুদ্যার সদম্ভ উক্তি :

গোকুল মথুরা কৈল গৌড় মধুপুর।
লাউসেন হইল কৃষ্ণ আমি কংসাসুর ॥

অবশ্য ভাগবতে কংসের শেষ পরিণাম মাহুদ্যা ক্রোধের বশে খেয়াল রাখিতে পারে নাই।

রাত্রিকালে নবজাত লাউসেনকে অপহরণ করিতে গিয়া চোরচূড়ামণি ইন্দা মেটে নিদালি মন্ত্র পড়িয়া দিলে স্থাবর জঙ্গম সমস্তই কালঘুমে অচেতন হইল :

নিন্দাটি লাগিল গিয়া ময়নার গড়ে।
আছুক অন্যের কাজ পাতা নাই নড়ে ॥
নিরাতঙ্কে নিদ্রা যায় ময়না নগর।
প্রহরী ঘুমায় যত চৌকির উপর ॥
সিন্ধাল চোর সিন্ধ কাটে গৃহস্থের বাড়ি।
নিন্দ্যাটি পাইয়া তারা যায় গড়াগড়ি ॥
কাক পক্ষ কোকিল ঘুমায় বক্ষা ডালে।
মকর কুম্ভীর মৎস্য নিদ্রাগত জলে ॥
নিন্দাটি লাগিল গিয়া সভাকার গায়।
আছুক অন্যের কাজ জাম্বুকী ঘুমায় ॥

শিশু লাউসেনের বর্ণনা :

নির্ম্মল সুধীর যেন শিরিষের ফুল।
পঙ্কজ সদৃশ দৃষ্টি চরণ রাতুল ॥
তিলফুল উন্নতি নাসিকা অনুপাম।
তনুরুচি শোভে যেন দূর্বাদল শ্যাম ॥

এগার বৎসর বয়সের মধ্যে লাউসেন কিরূপ বিদ্যা লাভ করিল, কবি তাহারও তালিকা দিয়াছেন :

ক খ আদি পড়িল অক্ষর যথোচিত।
চৌত্রিশ অক্ষর আগে পড়িল ত্বরিত।
পড়িল আঠার ফলা হইয়া সাবধান।
আঙ্ক আঙ্ক পড়ে আর সিদ্ধি বানান ॥

পরস্মৈপদ পড়ে আত্মনেপদে মন।
তরাতরি ভাবপদ পড়িল তখন॥
কর্মপদ পড়িলেন শতৃপদ তার।
আনন্দে লাউসেন পড়ে ময়নার রায়॥
তিনকাণ্ড সুবন্ত পড়িল তিন দিনে॥
মঞ্জরী[১৩১] পড়িতে মন হইল শুভক্ষণে।
... ...
যার তার সনে করে টীকার বাখান।
পড়িল নিগম শাস্ত্র ভারথ পুরাণ॥
জ্যোতিষ পড়িল কিছু রাজার কোঙর।
লাউসেন পড়ে আর কর্পূর পাত্তর॥

মধ্যযুগে বাঙালাদেশে পড়ুয়া ছাত্রকে কিভাবে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে হইতে, এই তালিকা হইতে তাহার স্বরূপ বুঝা যাইবে।

কবির রচনা আলঙ্কারিক বাহুল্য ও চমৎকারিত্ব বর্জিত সহজ ধরণের; পয়ার বিবৃতি মন্দ নহে। প্রশংসনীয় কবিত্ব প্রকাশের বিশেষ অবকাশ না থাকিলেও বিবৃতিমূলক রচনা হিসাবে কাব্যটি নিন্দনীয় নহে। জাম্বতী নর্তকীর কাজল ও সিন্দূর বর্ণনা কিছু প্রশংসা দাবি করিতে পারে:

মোহন কাজল পরে মোহন সিন্দূর।
প্রভাতের তপন তিমির করে দূর॥

দৃষ্টান্ত অলঙ্কার:

দ্বিজে দান নাহি দিনু না বলিনু হরি।
মকরন্দ থাকিতে গরল খ্যায়া মরি॥

এইরূপ দুই একটি উপমার চিত্ররীতি উপভোগ্য। কবির প্রতিভা বিচার প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, কবির "জীবনের সম্বন্ধে খানিকটা সচেতনতা কল্পনার উদ্দামতা ও উচ্ছলতাকে সংযত করিয়াছে।" (বা. সা. ইতি. অপরার্ধ, পৃ. ১৬০)। অবশ্য কোন কোন সময়ে অক্ষমতাকে স্বাভাবিকতা বলিয়া মনে হয়। জীবন সম্বন্ধে মুকুন্দরাম যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচনা উদ্দাম ও উচ্ছল না হইয়াও যেরূপ রসনিষ্ঠ হইয়াছে, রূপরামের রচনাশক্তি ও কবিদৃষ্টি সেরূপ গভীর নহে।

---

১৩১ অর্থাৎ ছন্দমঞ্জরী।

কবির সমগ্র কাব্য প্রকাশিত হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাহিত্য পরিষদে কবির যত পুঁথি আছে সবই খণ্ডিত—দু' একটির বেশি পালাও পাওয়া যায় নাই। কোন দিন পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গেলে এবং তাহা গ্রন্থাকারে ছাপা হইলে কবির যথার্থ স্বরূপ বুঝা যাইবে। যেটুকু মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা হইতে কবিপ্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে এই মাত্র অনুমান করা যাইতে পারে যে, কবির খ্যাতি বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছিল বলিয়াই পরবর্তী কালের কবিগণ তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন। আধুনিককালের বিচারে রূপরামের কাব্যের যেরূপ মূল্যই হোক না কেন, ১৭শ শতাব্দীর প্রতিভাবান কবিদের মধ্যে তাঁহাকেও গণ্য করিতে হইবে।

রামদাস আদক ॥

(সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলের আর একজন কবি রামদাস আদক বাঁধা পথে অগ্রসর হইয়া কিছু প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।) ১৩১১ সালের 'সাহিত্য সংহিতা'য় (১০ম-১১শ সংখ্যা) মধুসূদন অধিকারী 'অনাদিমঙ্গলের কবি' শীর্ষক প্রবন্ধে সর্বপ্রথম রামদাস আদকের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেন। তিনি ঐ প্রবন্ধে কিছু কাব্যরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন এবং পুঁথি ও মৌখিক ছড়া হইতে কাব্য রচনার কালও নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার অনেক পরে ১৩৪৫ সনে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য পরিষদ হইতে 'রামদাসের অনাদিমঙ্গল'[১৩২] কাব্য সম্পাদনা করেন। পূর্বে মধুসূদন অধিকারী যখন রামদাসের কাব্যের প্রথম পরিচয় দিয়াছিলেন, তখন তিনি পুরা পুঁথি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। যাহাও-বা পারিয়াছিলেন তাহারও অনেক স্থান নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি উক্ত প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "প্রাচীন গ্রন্থের যে যে অংশ অপাঠ্য ও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা মৌখিক গান দ্বারা পূরণ করিয়া দিয়াছি।" তখনও রামদাসের বংশধরগণ ধর্মের গান গাহিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। প্রবন্ধকার তাঁহাদের মুখে শুনিয়া অনেক অংশ সংগ্রহ পূর্বক প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে বসন্তকুমারও সেই মৌখিক উপাদান মুদ্রিত গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন—যদিও এই মৌখিক উপাদানের

১৩২ গ্রন্থের মধ্যে কোথাও কোথাও 'অনাদ্য মঙ্গলও' বলা হইয়াছে।

যাথার্থ্য সম্বন্ধে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সংশয় ছিল।[১৩৩] তিনি যাহা অবলম্বনে রামদাসের এই কাব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা কোন প্রাচীন পুঁথি নহে। ইদানীং ধর্মের গায়কেরা নিজ নিজ খাতায় রামদাসের ধর্মের গান লিখিয়া রাখেন, তাহা অবলম্বনে আসরে গান গাহেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এরূপ একখানি আধুনিক খাতা অবলম্বনে রামদাসের অনাদিমঙ্গল সম্পাদনা করেন।[১৩৪]

আত্মপরিচয়সূচক পয়ারপংক্তিতে কবির ব্যক্তিগত জীবনকথা ও ধর্মের কৃপালাভের সংবাদ অন্যান্য ধর্মমঙ্গলের ন্যায় একই ছাঁচে বর্ণিত হইয়াছে। ধর্মমঙ্গলের কবিদের আত্মকথা লেখা একটা ফ্যাশনে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। অধিকাংশ কবি কাব্য রচনায় যতটা দড় হউন আর নাই হউন, আত্মকথাটি বেশ ফলাইয়া লিখিয়াছেন। রামদাস আদক ও নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ অদ্ভুত ঘটনার সাহায্যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, যাহার ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য খানিকটা স্বীকার করা যাইতে পারে। ভুরশুট পরগণার রাজা প্রতাপ নারায়ণের (ভারতচন্দ্রের পূর্বপুরুষ) রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত আরামবাগের নিকটবর্তী হায়াৎ-পুরে কবির জন্ম হয়। তাঁহারা জাতিতে চাষীকৈবর্ত। চাষবাসই তাঁহাদের বৃত্তি ছিল। অতি অল্প বয়সে কবির পিতৃবিয়োগ হইবার ফলে বাল্যে তিনি বিশেষ লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পান নাই। চৈতন্য সামন্ত নামক এক রাজকর্মচারীর দ্বারা পীড়িত হইয়া কবি কিছুকাল কাছারি ঘরে আটক হইয়াছিলেন। পরে তিনি কোনও প্রকারে মুক্তি লাভ করিয়া মাতুলালয়ে পলায়ন করেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি এক সিপাহির কোপে পড়িলেন, সিপাহি ভয় দেখাইয়া কবির শিরে একটা গুরুভার মোট

---

১৩৩ "কিন্তু উহাতেও ভ্রমপ্রমাদের অবসর নাই বলা যায় না।" (ঐ, ভূমিকা, পৃ. ১/০)

১৩৪ ডঃ সুকুমার সেনের গ্রন্থের (অপরার্ধ) ১৬২ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। বসন্তকুমার গ্রন্থ সম্পাদনা করিতে গিয়া পুঁথির কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার সম্পাদিত ময়ূর ভট্টের শ্রীধর্মপুরাণ যেমন একখানি আধুনিক পুঁথি অবলম্বনে সম্পাদিত হয়, তেমনি রামদাসের অনাদিমঙ্গলও আধুনিক ধর্মগায়কের খাতার পাঠ অবলম্বনে সম্পাদিত হইয়াছে। মধ্যযুগীয় কাব্য-সম্পাদনের ইহা যে আদর্শ রীতি নহে তাহা বলাই বাহুল্য। রূপরামের তুলনায় সপ্তদশ শতাব্দীর কবি বলিয়া প্রচারিত রামদাসের মুদ্রিত কাব্যে প্রাচীনতার আদৌ কোন চিহ্ন নাই কেন, বসন্তকুমার তাহার স্বাভাবিক কারণ ভাবিয়া দেখেন নাই।

চাপাইয়া দিল, পরক্ষণে সিপাহি অদৃশ্য হইয়া গেল—কবি বড়ই বিস্মিত হইলেন। তাঁহাকে দুঃখিত দেখিয়া স্বয়ং ধর্মদেবতা ব্রাহ্মণের বেশে কবিকে কৃপা করিলেন এবং তাঁহাকে ধর্মের গান রচনা করিতে ও গাহিতে আদেশ দিলেন—"ধর্মের সঙ্গীত গাও শুনি কিছু আমি।" কিন্তু কবি যে মূর্খ, কি করিয়া ধর্মের গান গাহিবেন? তাঁহাকে দুঃখিত দেখিয়া স্বয়ং ধর্মঠাকুর নিজ পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, তিনি জাড় গ্রামের ধর্মদেবতা কালু রায়। তাঁহার আশীর্বাদে মূর্খ রামদাসও কবিত্বশক্তি লাভ করিলেন। ধর্ম দ্বাদশ অক্ষর মহামন্ত্র কবির দক্ষিণ করতলে লিখিয়া দিলেন এবং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু মূর্তি দেখাইলেন। অতঃপর কবি দেবতার কৃপায় কাব্য রচনা করিয়া রাজারাম ও অভিরাম নামক দুইজন দোহারের সাহায্যে আসরে দাঁড়াইয়া ধর্মের গান গাহিয়া প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। যাদবচন্দ্র রায় নামক এক ব্রাহ্মণ জমিদার রামদাসের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে জমিদারীর পদস্থ কর্মচারীরূপে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

কোন কোন পুঁথিতে কাব্য রচনার সময় সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে। একখানি পুঁথিতে এইভাবে সন-তারিখ উল্লিখিত হইয়াছে:

বেদসহ তিন বাণ শকে সুপ্রচার।
ভাদ্র আদ্য পক্ষে আট দিবস তাহার॥

অর্থাৎ ১৫৮৪ শকে (১৬৬২ খ্রীঃ অঃ) ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর দিনে এই কাব্য সমাপ্ত হয়। কবি নিজ গ্রাম হায়াৎপুরে সর্বপ্রথম এই গান গাহিয়াছিলেন। কাব্যের মধ্যে ভারতচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ও স্থানীয় ভূস্বামী প্রতাপ নারায়ণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার মাতা রাণী ভবশঙ্করী ভুরশুটের স্থানীয় প্রবাদে 'রায়বাঘিনী' নামে উল্লিখিত হইয়া থাকেন। পাঠান সেনাপতি ওসমান রাণী ভবশঙ্করীর হাতে নিদারুণভাবে পরাজিত হন। তখন আকবর শাহ্ বাঙলাদেশে পাঠান শক্তির দমনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। পাঠান নায়ক ওসমান ভবশঙ্করীর হস্তে নাস্তানাবুদ হইলে আকবর খুশি হইয়া নাকি রাণীকে 'রায়বাঘিনী' উপাধি দিয়াছিলেন—এ সব গল্প বাঙলাদেশে এখনও চলিয়া থাকে। অনুমান ১৬০০ খ্রীঃ অব্দের কাছাকাছি সময়ে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। তখন প্রতাপ নারায়ণ বালক মাত্র, পরে পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাণী ভবশঙ্করী কাশীবাস করেন। প্রতাপ নারায়ণের রাজত্বকালে রামদাস

বালক। সুতরাং ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন অনাদিমঙ্গল রচনা করেন তখন তিনি পরিণত বয়স্ক যুবক।

'অনাদি মঙ্গল' কাব্যটি পুরা মুদ্রিত হইয়াছে। কিছু পুঁথি, কিছু মৌখিক সংগ্রহ সংযোজন করিয়া এই কাব্য সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থ সম্পাদনায় এমন কোন নির্দেশ দেন নাই যাহাতে বুঝা যাইতে পারে যে, কোনটুকু পুঁথির অংশ, কোনটুকু বা মৌখিক সংগ্রহ। টানা পড়িয়া গেলে গোটা কাব্যখানিই প্রায় এক হস্তের ও এক সময়ের রচনা বলিয়া মনে হয়। মোটামুটি আদক কবির কবিত্বশক্তি প্রশংসারই যোগ্য। কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টিতে সংহত রচনাকৌশল, পরিচ্ছন্ন প্রবাহ, ক্লাসিক গঠন এবং স্নিগ্ধ পদলালিত্য এই কাব্যে নিতান্ত দুর্লভ নহে। নিম্নে এইরূপ প্রশংসনীয় বাক্‌রীতির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে :—

(১) চিনিতে রোপিয়া নিম দুগ্ধের সিঞ্চনে।
জেতের স্বভাব তিক্ত না ছাড়ে কখনে॥

(২) নলিনীদলের জল জীবনচঞ্চল।
জলেতে বিম্বোক যেন করে টলমল॥

(৩) যশকীর্তিবিহীন জীবন অকারণ।
যশ যার নাই তার জীবন্তে মরণ॥

(৪) যুবক স্বামীর কথা পীযুষের কণ।
বৃদ্ধ সোয়ামির কথা ছেঁচা ঘায়ে নুন॥

(৫) দশা খাটো হলে পুরুষ এমন দুঃখ পায়।
মহামত্ত বারণে বেঙের লাথি খায়॥

(৬) জানিলাম জামাতা ভাগিনাগুলা পর।

(৭) দুঃসুখ যত পাক সহোদর ভাই।
কখন বা দুঃখ আছে কভু সুখ পাই॥

কাব্যটির ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গিমায় লোশমাত্র প্রাচীনত্বের চিহ্ন নাই, উপরন্তু রচনাপ্রকরণে মার্জিত বুদ্ধি ও সংস্কৃত অলঙ্কারের যেরূপ গাঢ় প্রভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে ভাষা (এবং প্রামাণিকতা) সম্বন্ধে সংশয় সৃষ্টি হইয়াছে। 'কদলী বিছায় যেন বৈশাখের ঝড়ে', 'পূর্ণিমার চন্দ্র যেন রাহুর গ্রাসেতে', 'ঝাঁপিয়া বদনচন্দ্র বসন অম্বরে', 'স্বদেশ পাইয়া ভুলে প্রবাসের দুখ,' 'চাঁদ পেয়ে চকোর যেমতি পায় সুখ', 'সজারুর হাতে যেন সিংহের মরণ,' 'দিনে দিনে বাড়ে শিশু পূর্ণ শশিকলা', 'শশকে মশকে কোথা শার্দূল শৃগালে'

ইত্যাদি পরিপাটি অলঙ্কারগুলি ভারতচন্দ্রকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।) বিশেষতঃ কাহিনীটি এমন সুবিন্যস্ত যে, বক্ষ্যমাণ কাব্যে অর্বাচীনত্বের সংশয় উঁকি দিতেছে। সম্পাদক কোন্ কোন্ পুঁথি অবলম্বনে এই কাব্য সম্পাদনা করিয়াছিলেন, সেই পুঁথির প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতাই বা কতদূর গ্রাহ্য, সেই সমস্ত তথ্য এই কাব্যের ভূমিকা হইতে জানিবার উপায় নাই। তাই এই মার্জিত বুদ্ধির কাব্যখানি প্রামাণিক ও প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে কিঞ্চিৎ দ্বিধা হয়।

ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় এই কাব্য সম্বন্ধে আরও একটি মারাত্মক সংবাদ দিয়াছেন। তাঁহার মতে রামদাসের কাব্যের "বারো আনাই রূপরামের পুঁথির বস্তু, ভণিতা শুধু রামদাসের।") তাঁহার এ মন্তব্য অযৌক্তিক নহে। বাস্তবিক রামদাসের কাব্যের পালাসন্নিবেশ—এমন কি, ভাষার সঙ্গে রূপরামের সাদৃশ্য আছে। কোথাও হুবহু মিল দেখা যাইবে, কোথাও-বা দুইচারি পংক্তির বিচ্ছিন্ন ঐক্যও লক্ষ্য করা যাইবে। নিম্নে এইরূপ একটু সাদৃশ্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

রামদাস আদকের অনাদি মঙ্গল

সম্ভাব করিয়ে সবে হরি বল বন্ধুজন।
মন দিয়ে শুন সভে চৈতন্যবন্দন ॥
সংসারের সার পুরী আছে নবদ্বীপ।
পতিতপাবনী গঙ্গা যাহার সমীপ ॥
ধন্য শচী ঠাকুরানী মিশ্র পুরন্দর।
যাহার ভবনে জন্মিলেন গদাধর ॥
লক্ষ্মীর সহিত হরি গোলোকে বসিয়ে।
ব্রহ্মা তারে স্তব করে চরণ ধরিয়ে ॥

রূপরামের ধর্মমঙ্গল

মন দিয়া শুন সভে চৈতন্য বন্দনা।
ধর্ম্মের পিরীতে হরি বল সর্ব্বজনা ॥
জম্বুদ্বীপের সার পুরী বন্দো নবদ্বীপ।
পতিতপাবনী গঙ্গা যাহার সমীপ ॥
ধন্য শচী ঠাকুরাণী মিশ্র পুরন্দর।
যাহার উদরে জন্ম লইলেন গদাধর ॥

লক্ষ্মীর সহিত হরি বৈকুণ্ঠে বসিয়ে।
নিবেদন করে ব্রহ্মা চরণে ধরিয়া॥

এইরূপ প্রায় পংক্তিতে পংক্তিতে মিল আরও বহু স্থলে লক্ষ্য করিয়াছি।[১৩৫] আমাদের অনুমান, রূপরামের কাব্যরচনার কিছু কাল পরে রামদাসের কাব্য রচিত হইয়াছিল এবং ইহা অতি অল্পকালের মধ্যেই বর্ধমান, হুগলী প্রভৃতি অঞ্চলে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। রামদাস পূর্বগামী খ্যাতিমান কবির দ্বারা যে প্রগাঢ়ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং সানন্দে অনেক পংক্তি নিজ গ্রন্থে স্থান দিয়াছিলেন, আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই এরূপ অনুমান করিতে হয়, অথবা পরবর্তী কালের গায়েন ও পুঁথিলেখকেরা রূপরামের অনেক পংক্তি রামদাসের কাব্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন—এ অনুমানও অযৌক্তিক নহে। রামদাস আদকের আবিষ্কারক মধুসূদন অধিকারী কবির কাব্য সম্বন্ধে সোচ্ছ্বাসে বলিয়াছিলেন, "অমর কবি রামদাস মহানুভব বিরচিত এই মহাকাব্যের তুলনা নাই। কি আশ্চর্য কৌশলে—কি সুগঠিত শব্দ বিন্যাসে এই মহাকাব্য বিরচিত হইয়াছে।" রূপরামের রচনার সঙ্গে রামদাসের রচনার এত অধিক সাদৃশ্য না ঘটিলে এই মন্তব্যের কিয়দংশ গ্রহণ করা যাইত। তবে প্রশংসার বিষয়, কবি সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেই পরিবেশে লালিত পালিত হইয়া এরূপ একখানি মার্জিত রুচি ও রীতির কাব্য রচনায় সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষা, পুরাণ ও সাহিত্যে তাঁহার অধিকার যে-কোন ব্রাহ্মণ কবির সমতুল্য, তাহা সানন্দে স্বীকার করিতে হইবে। সর্বোপরি কবির অসাম্প্রদায়িক উদার মন ও রুচির শুচিতা বিশেষ প্রশংসা দাবি করিতে পারে।

---

১৩৫ ধর্মদাস ভণিতাযুক্ত এক কবির ধর্মমঙ্গলের পুঁথিতে দেখা যাইতেছে, এই ধর্মদাস রূপরামের কাব্যকেই সংক্ষেপে প্রচার করিয়াছিলেন। ধর্মদাস তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া বলিতেছেন—

সিথিল জাতেক তার কত দিব নাম।
বিস্তার করিয়া গেছেন রূপরাম॥
তাহা শুনি সভাকার হইল উল্লাস।
সংক্ষেপ করিয়া কহে বৈদ্য ধর্ম্মদাস॥

শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের নিরঞ্জনমঙ্গলেও রূপরামের রচনাংশ স্থান পাইয়াছে।

সীতারাম দাস ॥

যাঁহারা মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবহিত, তাঁহারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, কাহিনী, বিষয়বস্তু, ভাব ও রচনা-চমৎকারিত্ব প্রভৃতি ব্যাপারে মধ্যযুগীয় কবিরা মৌলিকতা দেখাইতে বিশেষ উৎসাহী হন নাই। 'মহাজনো গত যেন সঃ পন্থা'—এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহারা সর্বদা পূর্বসূরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। ফলে বহু স্থলে বৈচিত্র্যহীন ক্লান্তিকর নীরস কাহিনীর পৌনঃপুনিক আবৃত্তি হইয়াছে, কিন্তু জীবন্ত কবিমনের স্পর্শ অনেক সময়েই হারাইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে ধর্মমঙ্গলের কবিদের পুচ্ছগ্রাহিতা প্রায়ই বিরক্তির পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। ধর্মমঙ্গল কাব্য ও ধর্ম 'কাল্ট্' অঞ্চলবিশেষে ব্যাপক ছিল বলিয়া ইহাতে দূর দূরান্তরের কবিমনের সংস্পর্শ লাগে নাই। ফলে কাহিনীর ছাঁচ প্রায়ই একরূপ, অনেক সময় একের রচনা অপরের হুবহু নকল। সীতারাম দাসও সেই গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল কাব্যের আর একখানি সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন—একমাত্র আত্মকাহিনী ব্যতীত কবি অন্যত্র সহজ সুন্দর কবিপ্রতিভার বড় একটা পরিচয় দিতে পারেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অনুলিখিত তাঁহার ধর্মমঙ্গলের কয়েকখানি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। একটি পুঁথিতে কাব্য রচনার কাল হিসাবে ১০০৪ অব্দ পাওয়া যাইতেছে। কাব্যটি মল্লভূমে রচিত হইয়াছিল, সেখানে মল্লাব্দই চলিত। ১০০৪ মল্লাব্দ[১৩৬] হইলে (অর্থাৎ ১৬৯৮-৯৯ খ্রীঃ অঃ) সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষাঙ্কে কাব্যটি রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই সন যদি বঙ্গাব্দ হয় তাহা হইলে সীতারামের কাব্যের রচনাকাল হইবে ১৫৯৭ খ্রীঃ অব্দ। কিন্তু কাব্যের ভাষা হইতে ইহাকে এত পুরাতন মনে হয় না। উপরন্তু যে অঞ্চলে এই কাব্য রচিত হইয়াছিল, সেখানে বঙ্গাব্দ চলিত না, মল্লাব্দ চলিত। অতএব কাব্যটি সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষাংশে রচিত হইয়াছিল, তাহা উপস্থিত প্রসঙ্গে ধরিয়া লওয়া গেল।

---

১৩৬ এসিয়াটিক সোসাইটির (বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের পুঁথি—৪৯৯৮) এক পুঁথিতে আছে :—

> সীতারাম দাস গান ধর্ম্মপদতলে।
> এই পুঁথি হৈল হাজার চারি সালে॥

কবি আত্মপরিচয়সূচক দীর্ঘ পয়ার বিবৃতিতে যে উপাদেয় কাল্পনিক কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যায়। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামে মাতুলালয়ে কবি সীতারামের জন্ম হয়—এই ইন্দাসের ধর্মঠাকুর ও ঠাকুরের দেহারা অতি প্রসিদ্ধ। কবিরা জাতিতে রাঢ়ীয় কায়স্থ।[১৩৭] কবির পিত্রালয় সুখসাগর গ্রামে। পিতার নাম দেবীদাস, মাতার নাম কেশবতী।[১৩৮] গজলক্ষ্মী তাঁহাদের গৃহদেবী, কবি দেবীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। এই দেবীর কৃপাতেই কবি ধর্মঠাকুরের মহিমা বর্ণনায় অগ্রসর হন। কিন্তু সেই যুগে সমাজের উচ্চবর্ণেরা বোধ হয় ধর্মঠাকুরের প্রকাশ্য পূজা-উপাসনা করিতে ভয় পাইতেন—পাছে ডোমের দেবতার পূজা করিয়া পতিত হইতে হয়। যাহা হউক, ধর্মনিরঞ্জন কবির নিকট আবির্ভূত হইয়া কবিকে তাঁহার মহিমাবিষয়ক গান লিখিতে নির্দেশ দিলেন। একদা সীতারাম স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পাইলেন এবং পুনরায় ধর্মের গীত রচনার জন্য আদিষ্ট হইলেন। অতঃপর কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য মাঠে গিয়া তিনি এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইলেন, এবং সেই সন্ন্যাসী স্বয়ং ইন্দাসের ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায়। নারায়ণ পণ্ডিতের ঘরে তাঁহার বিগ্রহশিলা ছিল। তারপর তিনি আদেশ দিলেন, "আমার মঙ্গলগীত কর গিয়া তুমি।" কবি এই প্রস্তাবে সঙ্কুচিত—ভীতও হইলেন। তিনি নিতান্ত শিশুমতি, কি করিয়া ধর্মের 'গীতনাট' করিবেন? তখন দেবতা বলিলেন যে, সীতারাম দেবতার বরে যাহা লিখিবেন, তাহাই উৎকৃষ্ট কাব্য হইবে, "তোর পুঁথি নিন্দিতে নারিবে কোন নরে।" এই বলিয়া কবিকে পরজন্মে উদ্ধারের আশা দিয়া দেবতা অন্তর্হিত হইলেন। এক চণ্ডীমণ্ডপে কবি রাত্রি যাপন করিতে গেলে তাঁহাদের কুলদেবী গজলক্ষ্মী মাতাও কবিকে ধর্মসঙ্গীত লিখিতে স্বপ্নে আদেশ দিলেন, "উঠ বাছা সীতারাম, গীত লেখ গা"। কবি উদ্বিগ্নচিত্তে কাব্য

১৩৭ কবি একস্থলে নিজেকে 'কায়স্থ সীতানাথ' বলিয়াছেন। কিন্তু একখানি পুঁথি হইতে মনে হয়, সীতারাম বোধ হয় অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যসমাজভুক্ত ছিলেন। এক স্থানে তিনি বলিতেছেন :—

শ্যামদাস মাতামহ গোত্র বাল্মীকে।
ইন্দাসের অম্বগোষ্ঠী জানে সর্ব্বলোকে ॥

১৩৮ কবি মনসামঙ্গলও রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার পিতা ও মাতার নাম আছে।

রচনা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু "যত লিখি পুঁথি, তত পদ ভেঙ্গে যায়।" কবি মনের চাঞ্চল্য বশতঃ পুঁথি লিখিতে পারেন না, যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ান। তখন ইন্দাস গ্রামের ধর্মের পুরোহিত নারায়ণ পণ্ডিত তাঁহাকে সযত্নে ধরিয়া রাখিলেন। তাঁহারই অনুরোধ ও উপদেশে সীতারাম পুঁথি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। যাহা হউক কবির খুড়া সংবাদ পাইয়া কবিকে বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। কবি বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া চল্লিশ দিন ধরিয়া ক্রমাগত লিখিয়া ধর্ম্মমঙ্গলকাব্য সমাপ্ত করিলেন।

এই আত্মকাহিনী স্বচ্ছন্দগতি, স্বভাববর্ণনায় চিত্রধর্মী; তবে ইতিপূর্বে ধর্ম-মঙ্গলের কবিরা আত্মকথা লিখিবার রীতিটিকে যেভাবে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, কবি প্রায় সেই পরিচিত পথটিই অবলম্বন করিয়াছেন। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনা এবং যথাযথ পরিবেশ রচনা সীতারামের একটি পরিচিত রীতি-ভঙ্গিমা। যাহা হউক, তাঁহার আত্মপরিচয়জ্ঞাপক দীর্ঘ বর্ণনাটি গতানুগতি-কতার উর্ধ্বে উঠিতে না পারিলেও অনেক সময়ে ইহাতে সজীব বাস্তব জীবনের ছোট ছোট চিত্র বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে।

(কবি কাব্যারম্ভে ময়ূরভট্টের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনি কাব্য লিখিতেছেন,) ইহাও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন:

/ ময়ূর ভট্ট মহাশয়ের সুন্দর পাঁচালী।
আনন্দে হইল নষ্ট দুই এককলি॥)
ভুলভ্রান্তি গীত যদি গেছি এড়াইয়া।
নিদ্রার আলসে যদি না গেছি গাইয়া॥

(ইহাতে মনে হইতেছে, কবি বোধ হয় ময়ূরভট্টের পাঁচালীর অনুকরণ করিয়াছিলেন।) অবশ্য তাঁহার সময়েই ময়ূরভট্টের কাব্যের কিছু কিছু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই সংবাদে কেহ কেহ মনে করেন, কবির কালে ময়ূরভট্টের কাব্যের কিয়দংশ অন্ততঃ প্রচলিত ছিল, কবি তাহা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে ময়ূরভট্টের প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, বাঙলা দেশে ময়ূরভট্ট নামক কোন প্রামাণিক কবির ধর্মমঙ্গল কাব্য পাওয়া যায় নাই। সুতরাং কবি এখানে ময়ূরভট্টের কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে সমস্যার সমাধান করা সহজ নহে। বোধ হয় কবি পূর্ব হইতেই ময়ূরভট্টের নাম শুনিয়া আসিতেছিলেন, কাব্য রচনাকালে তাঁহাকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ

করিয়াছেন। সীতারামের সময়ে ময়ূরভট্টের কোন কাব্য-প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না।[১৩৯] সকলেই লোকস্মৃতি হইতে ময়ূরভট্টের দোহাই দিয়াছেন। সীতারাম দাসের রচনা বিবৃতিমূলক, পরিচ্ছন্ন; কাহিনী বা চরিত্রে নূতনত্বের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। আমরা এপর্যন্ত তাঁহার যতগুলি খণ্ডিত পুঁথি দেখিয়াছি, সেগুলি কয়েকটি পৃথক্‌পালার সমষ্টি মাত্র, এবং অধিকাংশই অর্বাচীন কালের ডোমপণ্ডিতের নকল। ধর্মমঙ্গলের বাঁধা ছকের মধ্যে মৌলিক কবিপ্রতিভা বিকাশের বিশেষ সুযোগ ছিল না। সুতরাং সীতারামের আত্মপরিচয়টুকু বাদ দিলে কাব্যটির মধ্যে বিশেষ কোন গ্রন্থন-নৈপুণ্য দেখা যায় না। অবশ্য দুই একস্থানের বর্ণনা মন্দ নহে। যথা—লাউসেনের গৌড় যাত্রার বিবরণ:

ব্রাহ্মণে মঙ্গল গায় ঘোড়ায় চড়িয়া রায়
হুলাহুলি দেই রামাগণ।
.........যথায় সিঙ্গাদার পাছু জায়
পাছু করে ময়না ভুবন॥
একরূপে অনেক স্থান রজনি দিবসে জান
গড় মান্দারণ দুই ভিত॥
উচালন মগলমারি যামিন্যা পর্ছাত করি
........................পার।
বর্দ্ধমান রাখে রাজা করিয়া দেবির পুজা
কঞ্জনা হৈল পারাপার॥ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি—২৪৭২)

নৃত্যের তালভঙ্গের ফলে অম্বুবতীর অভিশাপ:

তালভঙ্গ দেখিয়া কোপিল দেবগণ।
তালভঙ্গ করিলি কেমন বিবরণ॥
অম্বুবতী বলে গোসাঞি ব্রহ্ম সাঁপ হলা।
ব্রহ্ম সাঁপ ক্ষমা হেতু তালভঙ্গ কৈল॥
যুখের সময় ভঙ্গ দিলি মনরামা।
ব্রহ্ম সাঁপ কাহার জোগ্যতা করে ক্ষমা॥ (ক. বি. পুঁ.—২৪৬৯)

১৩৯ কেহ কেহ অনুমান করেন ময়ূরভট্টের কোন কাব্য যথার্থ ই প্রচলিত ছিল, পরবর্তী কালের ধর্মমঙ্গলের কবিরা তাঁহাকে ভাঙাইয়াই ধর্মমঙ্গল কাব্যের আসর জাঁকাইয়াছিলেন। অবশ্য এ অনুমান প্রমাণ করিবার মতো কোন তথ্য এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

লাউসেনের নিকট ইছাই ঘোষের দম্ভ প্রকাশ :

বাহুবলে গৌউড় করিতে পারি জয়।
সুন ২ আমার নামের পরিচয় ॥
একনাম ইছাই দিতিএ দসানন।
ত্রিতিয় লবণ বির চেরেতে দুর্য্যধন ॥
পাঁচনাম তারক ছএতে ইন্দ্রজিত।
সাতনাম মহিধরি জগতে বিদিত ॥
আট নাম সিত্রাহর নব নামে বাণ।
বাপ বলে বাছা তুমি ইন্দ্রের সমান ॥
দশনাম জোরাসিন্ধু আর কত আছে।
হাসিঞ্যা লাউসেন কহে ইছাএর কাছে ॥ (ক. বি. পুঁ.—২৪৭৬)

যাহা হউক এই সমস্ত উদাহরণ হইতে সীতারামদাসের সহজ বিবৃতিমূলক অনলঙ্কৃত ভাষার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

যাদুনাথ (যাদবনাথ) ॥

কিছুকাল পূর্বে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের সম্পাদনায় বিশ্বভারতী হইতে যাদুনাথের ধর্মপুরাণ প্রকাশিত[৪০] হইবার ফলে ধর্মমঙ্গল কাব্যের আর একজন কবি সম্বন্ধে কিছু নূতন তথ্য পাওয়া গিয়াছে। ইহার একখানি পুরা পুঁথি বিশ্বভারতীর হেফাজতে আছে। ১১৪৭ বঙ্গাব্দে (১৭৪০ খ্রীঃ অঃ) নকল করা এই পুঁথিখানি হাওড়া জেলার ডোমজুড় গ্রামের এক তাঁতীর বাড়ী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কবি বিস্তারিতভাবে আত্মপরিচয় না দিলেও কাব্যরচনার যে ঐতিহাসিক সঙ্কেত করিয়াছেন, তাহা হইতে রচনা কাল নির্ধারণ করা যাইতে পারে। বিদ্রোহী শোভাসিংয়ের হস্তে বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামের নির্যাতনের ইঙ্গিত হইতেই কাব্যরচনার সন-তারিখ নির্ধারণ করা যায়। কবি অবশ্য বলিয়াছেন : "আঁকশক নাঞি জানি কইনু মূর্খ ভাষা," তবু তাঁহার গ্রন্থে স্পষ্টভাবে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে :

কৃষ্ণরামের নামে পাপতাপ বিমোচনে।
চিরকাল রাজুতি কবেন বর্ধমানে ॥

শোভাসিংয়ের হস্তে কৃষ্ণরাম নিহত হন, তাঁহার দেওয়ান আততায়ীর দাসত্ব

স্বীকার করেন এবং কৃষ্ণরামের রাণী ও অন্তঃপুরিকাগণ বন্দী হন, সেই সময়ে কবির কাব্য সমাপ্ত হয় :

> ভার্য্যাবন্দী দাস হয়ে করোড়ি তাহার।
> সেই কালে গীত সাঙ্গ হইল আমার॥

রাজা কৃষ্ণরাম বাংলা ১১০৩ অব্দে (১৬৯৬ খ্রীঃ) পৌষমাসে বিদ্রোহী শোভাসিংয়ের হস্তে নিহত হন।[১৪১] এই সময়ে যাদুনাথের কাব্য সমাপ্ত হয়। কবি খুব সম্ভব বর্ধমান রাজের নিকট কোন বিশেষ কারণে কৃতজ্ঞ ছিলেন। গ্রন্থমধ্যে অনেক স্থলে কৃষ্ণরামের গুণকীর্তনও করিয়াছেন। কবির আত্মপরিচয় হইতে জানা যায়, তাঁহার পিতামহের নাম দামোদর পতি, পিতা—বিনোদনাথ। কবির নাম যাদবনাথ, কিন্তু পুঁথিতে তিনি অধিকাংশ স্থলে 'যাদুনাথ' ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন।[১৪২] তাঁহাদের নিবাস দোম গ্রামে। সম্পাদকের মতে ইহা হাওড়া জেলায় ডোমজুড় গ্রাম—সেখান হইতেই বর্তমান পুঁথিখানি একজন তাঁতীর বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে। তিনি নাথ সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন ("বনবাসে যাও যোগী যাদুনাথ বলে")—এরূপ অনুমানের কারণ আছে। ডোমজুড়ে এক যোগীসম্প্রদায়ভুক্ত তাঁতীর বাড়ী হইতেই পুঁথিখানি উদ্ধার করা হইয়াছে, ইহাও কবিকে গৌণতঃ যোগীসম্প্রদায়ভুক্ত বলিতে সাহায্য করিয়াছে। (অবশ্য কবি কাব্যমধ্যে অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, বৈষ্ণব মতের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল, তাহা চৈতন্য বন্দনা হইতে সুপ্রমাণিত হইয়াছে। অবশ্য চণ্ডীর প্রতিও তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন।) এই ধর্মকাব্যকে 'আগমপুরাণ' নাম দিয়া এবং চণ্ডীর বিস্তারিত পরিচয় দিয়া কবি ধর্ম-'কাল্ট্' ও শাক্ত 'কাল্ট্'-এর সংমিশ্রণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

সংযত ভাষায় রচিত এই ধর্মপুরাণ সম্প্রতি লোকলোচনের গোচরীভূত হইবার ফলে কবির রচনা শক্তি সম্বন্ধে বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে কেবল রামাই পণ্ডিত ও হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, লাউসেনের

---

১৪১ রাখালদাস মুখোপাধ্যায়—বর্দ্ধমান রাজবংশানুচরিত।

১৪২ ভণিতায় কবি নানাভাবে নিজের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—যাদু-ধর্মদাস শ্রীযাদুনাথ, যাদবপণ্ডিত, যাদবনাথ ইত্যাদি। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মনে করেন, কবির নাম ছিল যাদবনাথ পণ্ডিত।

কোন উল্লেখ ইহাতে নাই। সুতরাং ইহা তথাকথিত ময়ূরভট্টের 'শ্রীধর্ম-পুরাণের' মতো ধর্মপুরাণ কাব্য—ধর্মমঙ্গল কাব্য নহে। ইহাতে বহু স্থলে রামাইয়ের সশ্রদ্ধ উল্লেখ থাকিলেও [১৪৩] কবি কোথাও ময়ূরভট্টের নাম উল্লেখ করেন নাই।

কাব্যটিকে কবি বহু স্থলে 'মঙ্গল', 'পুরাণ', 'আগম' ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু ইহা যে ধর্মপুরাণ জাতীয় কাব্য তাহাতে সন্দেহ থাকে না। উপরন্তু (ধর্মপূজার রীতি-প্রকরণও বিস্তারিত আকারে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা একাধারে 'ধর্মপূজাবিধান' ও ধর্মপুরাণের সমাহার।)

শুধু ধর্মঠাকুর নহে, কবি ইহাতে পৌরাণিক শাক্ত ও লৌকিক দেবদেবী এবং মুসলমান পীর-ফকির-গাজী—সকলের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্র, মদনা ও লুইধরের সর্বপ্রাচীন পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যায়িকাটি কবির একমাত্র বর্ণনীয় বিষয়। এই কাব্যে হরিশ্চন্দ্রকে প্রথমে ঘোরতর ধর্মবিরোধী রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। তিনি ধর্মের উপাসকদের উপর অত্যাচার করিয়া এবং ধর্মের দেউল দেহারা ভাঙিয়া চুরিয়া ধর্মের বিরোধিতা করিলেন, ফলে অপুত্রক হইয়া রহিলেন। অতঃপর তাঁহাকে স্ত্রী মদনার সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়া বনে বনে সন্ন্যাসীর বেশে বেড়াইতে হইল। পরে তিনি বল্লুকার তীরে উপনীত হইলেন এবং প্রথমে শক্তির আরাধনা করিয়া পরে ধর্মের কৃপায় পুত্রবর লাভ করিলেন। তাহার পরের কাহিনী ধর্মপুরাণের অনুরূপ।

রাজার ধর্ম-বিরোধী উদ্ধত চরিত, মদনার ভক্তিনত মন—অবশেষে ধর্মের নিকট হরিশ্চন্দ্রের নতি স্বীকার ও তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভক্তে রূপান্তরিত হইবার কাহিনী কবি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। ছদ্মবেশী ধর্মের নির্দেশে পুত্র লুইচন্দ্রকে কাটিয়া তাহার মাংস রাঁধিয়া সন্ন্যাসীকে দিবার গল্পটিও একাধারে নির্মমতা ও করুণ রসের মিশ্রণে চমৎকার ফুটিয়াছে। লুইচন্দ্রকে পুনরায় জীবিতাবস্থায় কোলে পাইয়া মদনার ব্যাকুলতাও অন্তর স্পর্শ করে:

১৪৩ কবির মতে নিরঞ্জন নিজেই রামাই পণ্ডিত রূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হন।

যশোদা সন্তুষ্ট যেন পাইয়া শ্রীহরি।
রামেরে পাইল যেন কৌশল্যা সুন্দরী॥
তেমনি হইল রাণী পুত্র পাইয়া কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদনমুণ্ডলে॥
মুখে মুখ দিয়া রাণী চুম্বেন বয়ান।
বুক ভরি কোলে করি জুড়াগ পরাণ॥
আইস আইস আরে বাছা মোর প্রাণধন।
তোমারে চাহিয়া বাছা বিফল জীবন॥
যতক্ষণ ইচ্ছা রাণী পুত্র নিল কোলে।
সুখে মুখ পাখালিল সুবাসিত জলে॥

(যাদুনাথের কাব্যটির বিষয়-বৈচিত্র্য ও মার্জিত রচনা বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য।) তিনি তাঁতী বা নাথ সম্প্রদায়, যে সম্প্রদায় ভুক্ত হউন না কেন, সংস্কৃত পুরাণাদিতে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। বহু স্থলে নিপুণতার সঙ্গে পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া কাব্যের বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে তাহাকে সুষ্ঠুভাবে মিলাইয়া দিয়াছেন।[১৪৪] শাক্ত, বৈষ্ণব ও নাথ সম্প্রদায়-উপ-সম্প্রদায়কেও তিনি বিস্মৃত হন নাই—ধর্মপুরাণ-সংক্রান্ত কাহিনী কিভাবে পৌরাণিক সংস্কারের কবলিত হইতেছিল, যাদুনাথের ধর্মপুরাণেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। তাঁহার রচনা রীতি অতিশয় সংযত, তৎসম শব্দবহুল, কিন্তু স্থানে স্থানে ভাষা বেশ কমনীয় ও আবেগপূর্ণ। জননী মদনা বালক পুত্র লুইচন্দ্রকে বনে বনে বেড়াইতে নিষেধ করিয়া বলিতেছেন :

(বাছা না যাইয় বল্লুকার বনে।
কি জানি আছয়ে ভালে নিশি অবসানকালে
বিপরীত দেখিনু স্বপনে॥)
কোলে বইস দেখি চাঁদমুখ।
তোমার বিপদবাণী কহিতে বিদরে প্রাণী
মনে বড় পাইয়াছি দুখ॥

মদনার এ ব্যাকুলতা বৈষ্ণবপদাবলীর বাৎসল্য চিত্র স্মরণ করাইয়া দেয়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে নানা ধর্ম-উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত সাধারণ সমাজ কী পরিমাণে ভাবরসে আর্দ্র হইয়াছিল, তাহা উল্লিখিত সহজ রসের ছত্রগুলি হইতেই বুঝা যাইবে। কবি ধর্মনিরঞ্জনের সেবক হইলেও বৈষ্ণব মতের

---

১৪৪ উদাহরণস্বরূপ (মুদ্রিত গ্রন্থের ৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) হরিশ্চন্দ্র-বিশ্বামিত্রের উপাখ্যান উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রতি তাঁহার আন্তরিক আকর্ষণ এই কাব্যের যত্রতত্র ছড়াইয়া আছে। তবে কবির রচনারীতি, প্রকাশভঙ্গিমা এবং মনের শান্ত স্নিগ্ধ ভাবরূপটি সংযত হইয়াছে ; তাই এই কাব্য সাধারণ শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট জনপ্রিয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ ইহাতে জনমনোলোভন চিত্তচমৎকারিত্বের ভাব বিশেষ নাই।

শ্রীশ্যাম পণ্ডিত ॥

সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত বলিয়া অনুমিত আর একজন কবির নাম উল্লেখ করিয়া আমরা এই আলোচনায় ছেদ রেখা টানিয়া দিব। এই কবির নাম শ্রীশ্যাম পণ্ডিত। বীরভূম ও বর্ধমান অঞ্চল হইতে তাঁহার ধর্মমঙ্গলের অল্প কয়েকখানি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। (সেই পুঁথিতে কবি নিজের কাব্যকে ধর্মমঙ্গল না বলিয়া 'নিরঞ্জনমঙ্গল' বলিয়াছেন।) কবির 'পণ্ডিত' উপাধি দৃষ্টে মনে হয়, তিনি ডোমপণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাব্যের মধ্যে বীরভূমের স্থানীয় প্রবাদ ও কাহিনীর উল্লেখ হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, কবি এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। একখানি পুঁথিতে ১৬২৫ শকাব্দ (১৭০৩-৪ খ্রীঃ অঃ) আছে বলিয়া মনে হয়, কবি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন—তবে ইহা নিছক অনুমান মাত্র। এখনও বর্ধমান জেলার কোন কোন অঞ্চলে ধর্মের গাজন উপলক্ষে শ্যাম পণ্ডিতের কাব্যের কোন কোন অংশ গীত বা পঠিত হয়।[১৪৫] তাঁহার ভণিতাযুক্ত কোন কোন পুঁথিতে রূপরাম ও ধর্মদাসের ভণিতাও পাওয়া যায়। মনে হয় এই অঞ্চলের কবিদের রচনায় এইরূপ মিশ্রণ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল।

একদা এই ধরনের ছোট-বড়, খণ্ডিত-অখণ্ডিত নানা পুঁথি নানা অঞ্চলে-ছড়াইয়া ছিল, বহু নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইদানীং এই বিপুল পুঁথিসাহিত্যের যৎসামান্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। অবশ্য ইহাদের কাব্যমূল্য যৎসামান্য, স্থানীয় জীবনের সঙ্গে ইহার যোগাযোগ ছিল বলিয়া অঞ্চল-বিশেষে এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর পুঁথি নকল করা হইয়াছিল, যাহার তরঙ্গ আমাদের কালেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শ্যাম পণ্ডিতের দুই একখানি খণ্ডিত

১৪৫ ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ইতি.—১ম (অপরার্ধ), পৃ. ১৫৬

পুঁথিতে দু'একটি নূতন কথা যে নাই তাহা নহে।[১৪৬] এমন কি কোন কোন অংশে ভাষা বেশ শাণিত—তাহাও স্বীকার করিতে হইবে।[১৪৭] কিন্তু কাব্য বিচারে এবং মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ইহার সংযোগ বিশ্লেষণে মনে হয়, এই প্রকার সাধারণ রচনা ও কাহিনী পূর্বতন ধারারই নিষ্প্রভ বিবৃতি মাত্র। চরিত্রে কোন নূতন বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন নাই, ভাষাও স্বাদ-গন্ধহীন জলীয় ব্যাপার। সাহিত্যের ইতিহাসে এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর পুঁথিপত্রের আলোচনা করিবার অবকাশ নাই।

সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মঠাকুরের পূজা-উৎসব, ধর্মপূজা উপসম্প্রদায় এবং ধর্মঠাকুরের মহিমাবিষয়ক ধর্মমঙ্গল জাতীয় কাব্যসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইল। ধর্মোৎসব মধ্যযুগের পূর্বে প্রচলিত ছিল, এরূপ অনুমান করিবার স্বাভাবিক কারণ আছে। মধ্যযুগে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে এই পূজা-অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি সমাজেও গৃহীত হয়, এবং কবিপ্রতিভাধারী ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভক্তগণও ধর্মমঙ্গল কাব্য ও ধর্মপুরাণ রচনা করিয়া উচ্চতর সমাজে ধর্মঠাকুরের প্রভাবের পরিচয় দিয়াছেন। পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গের সীমাবদ্ধ অঞ্চলে এই উপাসনা বা 'কাল্ট্'-এর বিশেষ প্রভাব ছিল, এখনও আছে; ফলে কাহিনীগুলিতে অঞ্চলবিশেষের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক উপাদানের ছিটেফোঁটা প্রভাব থাকিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে ইতিহাসের মর্যাদা দিবারও প্রয়োজন নাই। এই কাব্যসমূহ আঞ্চলিক হইলেও ইহার চরিত্রগুলিতে সারা বাঙলা দেশেরই ছায়া পড়িয়াছে। ধর্ম-মঙ্গল কাব্যে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য যে নাই তাহা নহে। প্রত্যেক কাব্যেই, কোথাও সংক্ষেপে, কোথাও-বা ঈষৎ বিস্তারিত আকারে ধর্মের গাজন বা আচার-অনুষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু পুরুষের বল-বীর্য, নারীর পাতিব্রত্য ও বীরাঙ্গনা মূর্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শাঠ্য-ষড়যন্ত্র প্রভৃতি বাস্তব ধরনের বিষয়গুলি মধ্যযুগীয় কাব্যের মধ্যে ধর্মমঙ্গলের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়াছে। উপযুক্ত প্রতিভাবান কবির সাহায্য পাইলে ধর্মমঙ্গল কাব্য যথার্থই 'জাতীয়

---

১৪৬ একখানি পুঁথিতে লাউসেন নিজের পরিচয় দিতে গিয়া নিজেকে "বল্লাল সেনের গোষ্ঠী" বলিয়াছে। বলাই বাহুল্য এই সমস্ত তথ্য স্থানীয় কবিদের মস্তিষ্কপ্রসূত।

১৪৭ ডঃ সুকুমার সেন—পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, অপরার্ধ, পৃ. ১৫৫

মহাকাব্যে', পরিণত হইতে পারিত। চণ্ডী ও মনসামঙ্গলে পুরাতন পৌরাণিক ধরনের কাহিনী অনুসৃত হইয়াছে, বাস্তবের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ অতি ক্ষীণ। কিন্তু ধর্মমঙ্গলের কাহিনী কল্পনাপ্রসূত হইলেও সে কল্পনা দেশকালাতীত নহে। মাটির সঙ্গে এই কাব্যের আত্মিক যোগ বিস্ময়ের সঙ্গেই লক্ষ্য করিতে হইবে। উপরন্তু কাব্যগুলির উৎপত্তি স্থল দূরদূরান্তরবর্তী নহে, রচনাকালও খুব প্রাচীন নহে। ফলে সমস্ত ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ও বিষয়বস্তুর মধ্যে মোটামুটি ঐক্য আছে—প্রায় সর্বত্র একই 'প্যাটার্ন' অনুসৃত হইয়াছে। তাই কাহিনীর আকার সংহত হইয়াছে, ঘটনা-বিবৃতির মধ্যে বিশৃঙ্খলা বড় বেশী নাই। তবে এ কাব্য প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভার সংস্পর্শে আসিতে পারে নাই বলিয়া মনসা-চণ্ডীমঙ্গলের মতো ইহা সমগ্র বাঙালী-জীবনের কাব্য হইয়া উঠিতে পারে নাই—যদিও পশ্চিমবঙ্গে এখনও এই কাব্য ধর্মোৎসবে পঠিত হয়, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকলেই ধর্মপূজা করে। এই দিক দিয়া মনসা ও চণ্ডী 'কাল্ট্'-এর সঙ্গে ধর্ম কাব্য ও ধর্মসম্প্রদায়ের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়িবে।

—

পঞ্চম অধ্যায়

নাথ ধর্ম ও নাথ সাহিত্য

ইতিপূর্বে আমরা ধর্মমঙ্গলকাব্য প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, ধর্মঠাকুরের উপাসনা অদ্যাপি বাঙলা দেশের অঞ্চলবিশেষে জীবন্ত ধর্মরূপে প্রচারিত আছে। আর একটি উপধর্ম ও সেই উপধর্মাশ্রিত সাহিত্য শুধু বাঙলা দেশে নহে, বাঙলার বাহিরে বৃহত্তর ভারতবর্ষে এখনও জনসমাজে চলিতেছে। বাঙলায় যোগী-সম্প্রদায় (যুগী) এখনও তাহাদের বিহিত কার্যাদি করিয়া যায় এবং বিশেষ ধরনের ধর্মকৃত্য পালন করিয়া থাকে। বাঙলার বাহিরেও এই নাথ ধর্ম গোরক্ষনাথের নামে প্রায় সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে; গোরক্ষপন্থী সাধুসন্ত ও সম্প্রদায়-সমাজের বাহুল্য ইহাই প্রমাণিত করে যে, একদা এই নাথ ধর্মমত, বিশেষতঃ গোরক্ষনাথের নামযুক্ত বিশেষ ধরনের যোগপন্থী আধিদৈহিক ধর্ম-সাধনা সমাজের উর্ধ্বতন ও নিম্নতন—সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণী-উপশ্রেণী, এমন কি মুসলমান সম্প্রদায়েরও কেহ কেহ গোরক্ষপন্থী নাথধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কায়াকে মায়া বলিয়া পরিত্যাগ না করিয়া যে মোক্ষলাভ, নির্বাণ, সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্বের সংহার—নাথধর্মাবলম্বীরা তাহারই সাধনা করিয়াছিলেন, ইহার সাধনতত্ত্ব সারা ভারতেই বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় বিপুল-কলেবর সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে। লোকগাথা, নাটক, আখ্যানকাব্য, তত্ত্বরসের ছড়াপাঁচালী বাঙলা ও বাঙলার বাহিরে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ও উপভাষায় দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুশীলিত হইয়া আসিয়াছে, এখনও সে ধারার বিলোপ হয় নাই, আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এই গোরক্ষ-পন্থায় আস্থা স্থাপন করিয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। বাঙলার সহিত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের আধ্যাত্মিক যোগের বড় উপাদান এই নাথ ধর্ম ও নাথ সাহিত্য। বাঙলার বৈষ্ণব, শাক্ত ও পৌরাণিক ধারা ভারত হইতে প্রাণরস আহরণ করিয়া বাঙালীর নিজস্ব ধাতুধর্মের রসায়নে তাহার আর একটা বিচিত্র রূপমূর্তি

নির্মাণ করিয়াছে। কিন্তু বাঙলায় প্রচলিত নাথ ধর্ম ও নাথ সাহিত্য ভারত-ভাবধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে অনুস্যূত। কেহ-বা বলেন বাঙলা দেশের নাথধারা ভারতীয় ধারার দ্বারা যেমন নবজন্ম লাভ করিয়াছে, তেমনি আবার উত্তরাপথ ও পশ্চিম ভারতের নাথ সাহিত্য ও কাহিনী বাঙলা দেশের প্রচলিত ঐতিহ্যের দ্বারাও কোন কোন দিক দিয়া প্রভাবিত ও রূপান্তরিত হইয়াছে।

১

নাথ ধর্মের বিকাশধারা

বাঙলা ও বাঙলার বাহিরে যোগীসম্প্রদায় গোরক্ষনাথের নামে নিজ নিজ সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করিয়া থাকেন এবং বিচিত্র, জটিল ও গোপনীয় ধর্ম-কৃত্য অনুসরণ করেন—যাহার মূল অর্থসঙ্কেত 'কায়া সাধনা'র মধ্যে নিহিত আছে। তন্ত্র, হঠযোগ প্রভৃতি আধিদৈহিক ও আধিমানসিক ধারাকে গ্রহণ ও স্বীকরণ করিয়া নাথ ধর্ম অধ্যাত্মমার্গে উন্নীত হইয়াছে—সর্বাগ্রে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। নাথধর্ম প্রসঙ্গে দেখা যাইবে যে, পতঞ্জলির আধিমানসিক চর্যা, যাহা 'যোগ' নামে পরিচিত, এবং অন্যান্য অধিদৈহিক কৃত্য মিশ্রিত হইয়া গিয়া প্রাচীনভারতে ষড়্‌দর্শনের অন্তর্ভুক্ত একটি বিচিত্র কায়াবাদী সাধনপ্রণালী পরিকল্পিত হইয়াছিল। মধ্যযুগীয় নাথ ধর্মের মূল রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিলে এই যোগশাস্ত্রের মধ্যেই তাহার জড় পাওয়া যাইবে। পতঞ্জলির নামে যে যোগ-'সূত্র' অদ্যাপি প্রচলিত আছে তাহা বোধ হয় খ্রীঃ তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ববর্তী রচনা।[১] যোগশাস্ত্রের নিয়মানুগ বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনার আদি সূত্রগ্রন্থ এই যোগসূত্রে সর্বপ্রথম এমন একটি সাধন-প্রণালীর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, যাহার সঙ্গে মানুষের দীর্ঘ কালের সম্পর্ক। মৃত্যুর পর মানুষের মোক্ষ, নির্বাণ, মুক্তি—যাহাই লাভ হোক না কেন, তাহার দেহকে সে তো ভুলিয়া থাকিতে পারে না; অথচ সে দেখে সজীব দেহ কালের স্পর্শে জীর্ণ হইয়া অবশেষে বিনষ্ট হয়। দেহের বিনাশের পরে মানবাত্মার যেরূপই সদ্‌গতি হোক না কেন, নিজ দেহের প্রতি মানুষের মমতা

১ Dr. Radhakrishnan—*Indian Philosphy*, vol. II p. 341 (foot note)

জীবনসত্তার আদিমতম প্রেরণা। তাই প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত মানুষ এমন অমৃত রসায়নের সন্ধান করিয়াছে যাহার সাহায্যে তাহার ভঙ্গুর দেহটা মৃত্যুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবে, মৃত্যুর পরে নহে—এই দেহের মধ্যে মরজগতেই সে অমৃতত্ব লাভ করিবে। এই জন্য কত মন্ত্রতন্ত্র, ঔষধ, রসায়ন, আলকেমির আবিষ্কার, কত বিচিত্র ধর্মপ্রণালী ও আচার-আচরণের সৃষ্টি। মানুষ মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়া জরামরণশীল দেহকে অবশ্যম্ভাবী বিনাশের কবল হইতে রক্ষা করিয়া মর্ত্যলোকেই অমর হইবার কামনা করিয়াছে। পতঞ্জলির পূর্বে বৈদিক যুগেও ভারতবর্ষে এইরূপ একটা লোকধর্ম বা লোক-প্রতীতির প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। দেহ ও মনকে বশীভূত করিয়া ব্যক্তি কালের উর্ধ্বে উঠিয়া যাইতে পারে। পিণ্ডদেহকে সিদ্ধপক্ব দেহে পরিণত করিয়া ইহাকে চিরন্তন করিবার আকাঙ্ক্ষা সর্বকালের মানুষেরই একটা বড় রকমের মানসিক প্রবণতা। তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড়ফুঁক এবং ঔষধাদির সাহায্যে এদেশের মুমুক্ষু ব্যক্তি সেইরূপ অমৃতত্বলাভের চেষ্টাই কবিয়াছেন। বেদ, বিশেষতঃ অথর্ববেদ, উপনিষদ (কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মৈত্রায়নী), বৌদ্ধ গ্রন্থ 'ললিতবিস্তর' বৌদ্ধধর্মের যোগাচার সম্প্রদায়, মহাভারত—প্রভৃতি বিভিন্ন মত ও গ্রন্থের মধ্য দিয়া যোগানুশীলনের ধারা চলিয়া আসিয়াছে। সুকঠোর ব্রহ্মচর্য, দেহমনের সংযম, অনুশালন, কৃচ্ছ্রতা ইত্যাদি দ্বারা মানুষ অদ্ভুত, অলৌকিক শক্তি অর্জন করিতে পারে—এরূপ বিশ্বাস প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে যেমন স্বীকৃত হইয়াছিল, তেমনি আবার এই যোগানুশীলনের দ্বারা মোক্ষলাভ বা মুক্তিও অনায়াসলভ্য—এরূপ বিশ্বাসও চিন্তাশীল দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীরভাবে অনুস্যূত হইয়াছিল, বৈদিক, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক যুগে এই যোগপন্থা বুদ্ধিজীবী ও অধ্যাত্মপন্থী—উভয় সমাজেই বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল।

পতঞ্জলিই সর্বপ্রথম এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত যোগপন্থাকে একটি নীতি-নিয়মের মধ্যে বাঁধিয়া পুরুষার্থকে নূতনতর সার্থকতা ও সিদ্ধির পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন। চিত্তবৃত্তি নিরোধ যোগের প্রধান লক্ষ্য—চিত্তবৃত্তির অর্থ চিত্তচাঞ্চল্য—চিত্তচাঞ্চল্যই বিনাশের কারণ। এই চিত্তচাঞ্চল্য দূর করিতে হইলে দেহ ও মনকে শাসন করিয়া আত্মস্থ চিত্তকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবার পন্থা যোগশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। আধুনিক কালের পরিভাষায় যোগশাস্ত্রকে একপ্রকার

সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রও বলা যাইতে পারে। মন দেহ ছাড়া নহে; দেহকে পরিত্যাগ না করিয়া ইহাকেই অবলম্বন করিয়া ইহার বাধা ও বিনাশ উত্তীর্ণ হইতে হইবে। তাই যোগশাস্ত্র আটটি পন্থার দ্বারা স্থূলদেহকে অধ্যাত্মমার্গে উন্নীত করিয়াছে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা এবং অবশেষে সমাধি—ইহাই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য। যম হইতে প্রত্যাহার —ইহা প্রধানতঃ দেহঘটিত শাসন, এবং ধ্যান হইতে সমাধি—ইহা মূলতঃ মনের ব্যাপার। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, প্রথমে দেহকে স্ববশে আনিয়া চিত্তচাঞ্চল্যের মূল কাটিয়া দিতে হইবে, এবং তাহার পরে চিত্ত স্থূল ভূমি ত্যাগ করিয়া অধ্যাত্মচেতনায় অধিরোহণ করিবে। সমাধির অর্থ যোগসমাধি—বাহ্যিক জগৎ হইতে সত্তার নির্বাসন, দেশকালহীন অবাধ মুক্তির জগতে মনঃসংযোগ—ইহাই যোগসাধনার চূড়ান্ত পরিচয়। এই সমাধি—যাহার সূক্ষ্ম পথ দিয়া মন অনন্তে লীন হয়, তাহাকে যোগশাস্ত্রে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে মন বস্তু সম্বন্ধে সচেতন থাকে, কর্মবন্ধন শিথিল হইয়া যায়, সর্বপ্রকার দুঃখপীডনের বোধ লুপ্ত হয়। কিন্তু জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বোধ পার্থক্য থাকে। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বস্তুবোধের চেতনা অর্থাৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের কোন পার্থক্য থাকে না, কোন চিদ্‌বৃত্তিই থাকে না। বৌদ্ধ দর্শনের ভাষায় ইহাই অচিত্ততা। অবশ্য দেহচেতনায় সম্পূর্ণ বিলুপ্তি না হইলে এ সমাধি স্থায়ী হয় না। প্রকৃতিচেতনা পুরুষকে আবার বিকল্পের জগতে টানিয়া আনে। তাই দেহকে সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত করিতে না পারিলে চূড়ান্ত মোক্ষলাভ হয় না। এই মোক্ষচেতনার নাম কৈবল্য—ছলনাময়ী প্রকৃতির কর্মশৃঙ্খলের সম্পূর্ণ বিনাশ এবং জীবের স্ব-ভাবে অবস্থিতি।

(পরবর্তী কালে যোগের সঙ্গে নানাপ্রকার রহস্যবাদ, তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্র মিশিয়া গিয়াছিল। অনেকে বিশ্বাস করিতেন যে, যোগানুশীলনের দ্বারা দেহ-মন শাসিত হইলে সাধক অনেক অনৈসর্গিক অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিতে পারেন।[২] ঔষধ, মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধির দ্বারা সিদ্ধি বা সিদ্ধাস্থিতা লাভ হয়,

---

২ ইহাকে অষ্টসিদ্ধি বলে—অণিমা (অণুতম হইবার শক্তি), লঘিমা, (লঘুতম হইবার শক্তি), মহিমা (বৃহত্তম হইবার শক্তি), গরিমা (গুরুভার হইবার শক্তি), প্রাপ্তি (যে কোন বস্তু ইচ্ছামাত্র প্রাপ্তি), প্রকাম্য (আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে যথেচ্ছা লাভ করিবার শক্তি), ঈশিত্ব (প্রাধান্য অর্জনের শক্তি) এবং বশিত্ব (বশীভূত করিবার শক্তি)।

এ কথা যোগভাষ্যে স্বীকার করা হইয়াছে।) অবশ্য পতঞ্জলি, চিত্তশাসন বা যোগানুশীলনের জন্য ঔষধ ব্যবহারের ব্যবস্থা আবশ্যিক, একথা বলেন নাই। কিন্তু পরবর্তী কালে লোকজীবনের আদর্শ হইতে মাদকসেবন, সুকঠোর কৃচ্ছ্রতা সাধন প্রভৃতির সাহায্যে চিত্তশাসন এবং তদ্দ্বারা অদ্ভুত শক্তি লাভের কথা যোগানুশীলনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। হঠযোগ, তন্ত্রমন্ত্র প্রভৃতির প্রভাবের ফলে আধিমানসিক দেহতত্ত্বের অনুশীলনে দেহচেতনা পরবর্তী কালেই প্রাধান্য লাভ করে। দেহকে যোগচর্যার দ্বারা কীভাবে সিদ্ধপক্ব করা যায়, এই চিন্তা এক যুগের সাধকদের ভাবাইয়া তুলিয়াছিল। মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শন সংগ্রহে' "রসেশ্বর দর্শন" বলিয়া যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, মধ্যযুগীয় য়ুরোপীয় আলকেমি-বিশারদের মতো এদেশেও এক-দল আধা-দার্শনিক আধা-বৈজ্ঞানিক যোগপন্থিগণ 'রসের' সাহায্যে দেহের অমরত্বলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই দার্শনিক গোষ্ঠী বা রসায়ন-সম্প্রদায় রস বা পারদের সাহায্যে দেহকে জরামরণ বিরহিত করিবার পন্থা সন্ধান করিতেন—তাহাকে বলা হইত জীবনমুক্তি, দেহপিণ্ডেই অনন্তের উপ-লব্ধি, সশরীরেই মোক্ষলাভ। এই মতাবলম্বীরা বিশ্বাস করিতেন যে, মৃত্যুর পরে মোক্ষলাভ হয় কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। সুতরাং দেহ থাকিতে থাকিতেই দেহকে অমৃতত্ব দান করিতে হইবে। রসায়নবাদী যোগীদের 'রসার্ণব' শীর্ষক গ্রন্থে মহাদেব দুর্গাকে জীবনমুক্তি-তত্ত্ব শিক্ষা দিতে গিয়া বলিয়াছেন :

অজরামর-দেহস্থ শিব-তাদাত্ম্য-বেদনম্।
জীবনমুক্তির্মহাদেবি দেবানামপি দুর্লভা॥
পিণ্ডপাতে চ যো মোক্ষঃ স চ মোক্ষো নিরর্থকঃ।
পিণ্ডে তু পতিতে দেবী গর্দভোঽপি বিমুচ্যতে॥[৩]

দেহকে জরামরণাদি রহিত ও পরিবর্তনহীন করিলেই জীবনমুক্তি লাভ হইতে পারে। হঠযোগ ও তন্ত্রে এই জীবনমুক্তি লাভের নানা পন্থা-প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ এবং শিরঃস্থিত সহস্রারে পার্বতী-পরমেশ্বরের সামরস্যসম্ভূত দিব্যানুভূতি অথবা খেচরী মুদ্রা বা বজ্রোলী মুদ্রার

৩ অনুবাদ—অজর অমর দেহের মধ্যেই শিবত্ব আছে এইরূপ জানিবে, দেবতারাও জীবনমুক্তি লাভ করিতে পারেন না। দেহের বিনাশে যে মোক্ষ, তাহা নিরর্থক। দেহের বিনাশে মুক্তি হইলে গর্দভও মুক্ত হইত।

দ্বারা পিণ্ডদেহেই অমৃতের আস্বাদন—এ সমস্ত দৈহিক প্রক্রিয়ার কথা তন্ত্র ও হঠযোগের গ্রন্থেই পাওয়া যাইবে।) ক্রমে ক্রমে বিন্দুধারণই যোগের একমাত্র তাৎপর্য হইয়া দাঁড়াইল। পবনবিজয়, বিন্দুধারণ ও কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণের দ্বারা সাধক পিণ্ডদেহকে সিদ্ধদেহে (অর্থাৎ perfect বা জরামরণ পরিবর্তন-হীন) পরিণত করেন—তখন যোগী জরামরণের কর্মকর্তৃত্বের পরপারে গিয়া অমরত্ব লাভ করে ; পরে সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠিয়া সিদ্ধদেহ দিব্যদেহে পরিণত হয়, যাহা যোগশাস্ত্রে কৈবল্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ সমস্ত দ্বৈতের বিলোপ, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের চেতনাবিরহিত ও বাক্‌পথাতীত ভূমানন্দ বা দিব্যানুভূতি লাভ—ইহাই যোগীর সর্বশেষ লক্ষ্য।

কেহ কেহ যোগশাস্ত্রকে নিরীশ্বরবাদী বলিয়াছেন ; কথাটা কোন কোন দিক দিয়া মিথ্যা নহে। যোগের মূলকথা মানবদেহ ও মন, সেই দেহ-মনকে যম-নিয়মাদির দ্বারা সংযত করিয়া দ্বৈতানুভূতির পরপারে গিয়া প্রাতি-ভাসিকের অতীত হওয়াই সাধকের শেষ কথা—সুতরাং ঈশ্বরত্ব লাভ, ঈশ্বর কৃপা—ইহা মুখ্যতঃ যোগের বিষয় নহে। দেহ শাসন ও চিত্তবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের দ্বারা মোক্ষলাভ—ইহাই যোগধর্মের মূল উদ্দেশ্য, ঈশ্বরত্ব লাভ একমাত্র বেদান্ত ভিন্ন অন্য দর্শনের অনুসন্ধানের প্রধান বিষয় নহে। মোক্ষ, নির্বাণ, পুনর্জন্মের বিনাশ, আত্যন্তিক দুঃখ নাশ—এককথায় সাধকের জন্মজরাচক্রের অতীত নিত্যস্বরূপে বা স্ব-ভাবে প্রত্যাবর্তন ও অবস্থানই ভারতীয় সাধনার মূল রহস্য। ষড়দর্শনের মধ্যে কোন প্রস্থান পুরাপুরি অনীশ্বরবাদী, কেহ ঈশ্বর সম্বন্ধে বিকল্পবাদী, কেহ-বা পুরাপুরি-ঈশ্বর কৃপাপ্রার্থী ভক্তিবাদী। কিন্তু সকলেই মোক্ষপ্রয়াসী ; তাহা ব্যক্তিগত সাধনার দ্বারা লাভ করা যাইতে পারে, ঈশ্বর চিন্তন-মননের দ্বারাও ('ঈশ্বর প্রণিধানাৎ বা') হইতে পারে, অথবা ঈশ্বরকৃপার দ্বারাও জীব ত্রিবিধ দুঃখ (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক) ও জরামরণাদি জয় করিয়া স্বস্থ হইতে পারে। জীবের ব্যক্তিগত মুমুক্ষাই ষড়দর্শন ও ভারত-সাধনার মূল উদ্দেশ্য। এই জন্য ভারতীয় বুদ্ধিবাদী দর্শন-প্রস্থানসমূহ সব সময়ে ঈশ্বরবাদী না হইলেও অনাত্ম-বাদী নহে। আত্মার মুক্তি সাধনার চূড়ান্ত পরিণাম বলিয়া ষড়দর্শনেও স্বীকৃত। এমন কি নাস্তিক্য ও নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনও সূক্ষ্ম-ভাবে অধ্যাত্মবাদী। একমাত্র বার্হস্পত্য দর্শনই জড়বাদী। নশ্বরস্বভাব

পাঞ্চভৌতিক জড়বস্তুর অতীত ইঁহারা অপর কোন নিত্যবস্তুতে বিশ্বাসী নহেন। অতিপ্রত্যক্ষ বস্তু-দর্শনই লোকায়ত মতের বশবর্তী হইয়া শেষ পর্যন্ত ঐহিক সুখবাদ বা হেডোনিজ্‌ম্‌-এ (Hedonism) পর্যবসিত হয়। কিন্তু ষড়দর্শনের সেরূপ কোন বিকার না হইবার কারণ, ইহাতে মানবজীবনের মূল লক্ষ্য—জড়ের অতীত একপ্রকার বিশুদ্ধ চিন্ময় অধ্যাত্ম উপলব্ধি। এই উদ্দেশ্যের বশেই জীব-ব্রহ্মতত্ত্ব, পুরুষ-প্রকৃতি প্রভৃতি নানাবিধ দার্শনিক প্রত্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং তাহা হইতেই মানব মনে ঈশ্বরচেতনা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। অবশ্য এই যে ঈশ্বর, মোক্ষ প্রভৃতি লইয়া দার্শনিক সমাজের সূক্ষ্ম আলোচনা, ইহা প্রধানতঃ বুদ্ধিজীবী মোক্ষপন্থী সমাজেই সংগুপ্ত ছিল। জনসাধারণে রুচিপ্রবণতা অনুসারে ঈশ্বরবাদকেই অবলম্বন করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরবাদ পুরাপুরি স্বীকৃত না হইলেও ইহাকে নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিক্যধর্মী শাস্ত্র বলা যায় না। কারণ যোগসূত্রকার পতঞ্জলি মোক্ষের জন্য ঈশ্বর প্রণিধানের কথাও বলিয়াছেন। ঈশ্বর সাহায্যে সাধক মোক্ষপথের বাধা দূর করিয়া নিজ লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে পারে। ঈশ্বরই প্রকৃতির বিবর্তনের দিক নির্দেশ করিতেছেন। তাঁহার মধ্যেই সমস্ত জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সম্পর্ক পূর্ণতা লাভ করে—"তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ববীজম্" (যোগভাষ্য, ১ম, ২৫)। সেই জন্য পতঞ্জলির মতে ঈশ্বরভক্তি দ্বারা মোক্ষলাভও মুক্তিলাভের আর একটি উপায় বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। অবশ্য তাঁহার মতে ঈশ্বর জীবকে মুক্তি লাভে সাহায্য করিতে পারিলেও, মোক্ষ দানে তাঁহার কোন শক্তি নাই। এই জন্য যোগে ঈশ্বরচেতনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই, এবং যোগের মূল বক্তব্যের সঙ্গে এই ঈশ্বরচেতনার যেন অঙ্গাঙ্গিভাবের সম্পর্ক দেখা যায় না। অবশ্য পরবর্তী কালে যোগদর্শনে গুরুর আধিপত্য স্বীকৃত হইল, এবং জীবের ঈশ্বরপ্রপত্তিই মোক্ষ—তাহাও প্রচারিত হইল। তখন সমাধির অর্থ হইল ঈশ্বরচেতনার মধ্যে জীবচেতনার বিলোপ। ইহাতে গীতার ভক্তিবাদই স্বীকৃত হইল। যোগদর্শনের শেষ পরিণাম বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার 'যোগসার সংগ্রহে' বলিয়াছেন যে, ধ্যান-ধারণা-সমাধির মধ্যে ঈশ্বরধ্যানই সর্বশ্রেষ্ঠ।[৪]

৪ এইজন্য গার্বে তাঁহার *The Philology of Ancient India*-তে বলিয়াছেন, "We can even say that the Yoga Sutras, i. e. 23-27, 11,45, which treat of the person of God, an unconnected with the other parts of the text-book, nay, even contradict the foundation of the system."

পরবর্তী কালে সমগ্র ভারতেই বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যোগ-দর্শনের নানা উপাদান গৃহীত হয়। কোন কোন ধর্মসম্প্রদায় চিত্তবৃত্তি নিরোধ-কল্পে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগরণ, বিন্দুধারণ, উল্টা পদ্ধতি এবং খেচরী মুদ্রার দ্বারা সিদ্ধদেহকে দিব্যদেহে পরিণত করিয়া পিণ্ডদেহেই জন্ম-জরার অতীত মোক্ষ লাভের সাধনা করিতেন, কেহ-বা ঈশ্বরপ্রণিধানের দ্বারা ঈশ্বরত্ব-শিবত্ব লাভকেই মোক্ষ বলিয়া মনে করিতেন। এই সমস্ত ধর্ম-উপধর্মের মধ্যে নানা ভেদ-পার্থক্য থাকিলেও এই মতের সাধকেরা সকলেই যোগী নামে অভিহিত হইতেন। হঠযোগ ও তন্ত্রের কায়াসাধনার দ্বারাই ইঁহারা অকায়ত্ব ও অচিন্ত্যতায় পৌঁছাইবার জন্য দুরূহ গোপনীয় আধিদৈহিক ও আধিমানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্য লইতেন। শিবকে কেন্দ্র করিয়া যে মোক্ষাভিপ্রায়ী যোগাবলম্বী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশ হইল তাহা নাথযোগীসম্প্রদায় নামে পরিচিত। শিব ইঁহাদের আদিগুরু বা আদিনাথ; তাই ইঁহারা নাথসম্প্রদায় নামে আজও উল্লিখিত হইয়া থাকেন। তবে সেকালে ইঁহারা তন্ত্রের প্রভাবে কৌলমার্গী বলিয়াই সমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। নাথপন্থ শব্দটি আধুনিক কালের পণ্ডিতসমাজ ব্যবহার করিয়া থাকেন, মধ্যযুগে শৈবযোগী সম্প্রদায় এই নামে অভিহিত হইতেন না।

এই নাথসম্প্রদায় মধ্যযুগীয় সংস্কৃত ও প্রাদেশিক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ (১ম স্কন্ধ, ৮ম-৯ম অধ্যায়), আগম সংহিতা, বৃদ্ধশাতাতপ সংহিতা, মহাবিরাট তন্ত্র, পরাশর, কৌলজ্ঞাননির্ণয়, তন্ত্রালোক প্রভৃতি গ্রন্থে [৫] এই শৈব নাথ ধর্মের নানা উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। মধ্যযুগের পূর্ব হইতেই এই নাথ ধর্ম সমগ্র ভারতবর্ষে জীবন্ত ধর্মরূপে অনুশীলিত হইত, এখনও ইহা লুপ্ত হইয়া যায় নাই। সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষায় ইঁহাদের ব্রতকৃত্য, সাধনভজন ও গুরুপরম্পরার কাহিনী সম্বন্ধে বহু পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হইয়াছে। ভারতের নানা স্থানে ইঁহাদের কেন্দ্র, মঠ ও সাধনভজনালয় আছে। শিব আদিনাথ হইলেও গুরু গোরক্ষনাথই এই সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য, তাঁহার নামেই ইঁহারা গোরক্ষপন্থী নামে পরিচিত। গোরক্ষনাথের নামে নানা গল্প কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে; শৈব, তন্ত্র, বৌদ্ধ প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে, এখনও শৈব যোগিগণ সেই সমস্ত গান গাহিয়া

৫ ডঃ কল্যাণী মল্লিকের 'নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী' দ্রষ্টব্য।

ভিক্ষা করিয়া থাকেন। এই পন্থায় হিন্দু, বৌদ্ধ—এমন কি মুসলমানও অবিরোধে গৃহীত হইয়াছেন। তাই দেখা যাইতেছে নাথপন্থ যেমন সর্বভারতীয় মানসকে ধারণ করিয়াছে তেমনি বিবিধ বিচিত্র ধর্মমতও ইহাতে অবলীলাক্রমে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

নাথ ধর্মের প্রচলিত গুরুপরম্পরা অনুসারে গবেষকগণ এই মতাদর্শের সিদ্ধাদিগকে ঐতিহাসিক সন-তারিখের মধ্যে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য বিভিন্ন গ্রন্থে এই গুরুপরম্পরা বিভিন্ন আকারে তালিকাবদ্ধ হইয়াছে। বৌদ্ধ সহজিয়া মত ও নাথ ধর্মের সংমিশ্রণের ফলে সহজিয়া মতে ৮৪ সিদ্ধার তালিকায় কয়েকজন নাথগুরুর নাম পাওয়া যাইতেছে। 'বর্ণনরত্নাকরে' (চতুর্দশ শতাব্দীর মৈথিলী লেখক জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের রচনা) চৌরাশি সিদ্ধার তালিকায়[৬] মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, চামারীনাথ, জালন্ধরপাদ প্রভৃতির নাম আছে। 'হঠযোগ প্রদীপিকা'য় আদিনাথ (শিব), মৎস্যেন্দ্রনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চর্পটিনাথ ও বিন্দুনাথের নাম পাওয়া যাইতেছে। তিব্বতী গ্রন্থাদিতে[৭] চৌরাশি সিদ্ধার তালিকায় লুহিপা (মৎস্যেন্দ্র বা মৎস্যান্ত্রাদ), মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ ও কাহ্নপাদের উল্লেখও আছে। এই সিদ্ধাচার্যদের পরিচয় দক্ষিণ-ভারতেও অজ্ঞাত নহে। এমন কি যবদ্বীপেও ইঁহাদের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে।[৮] উত্তর ও পশ্চিমভারতে সূফী সাহিত্যেও এই সাধকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাইবে।

চৌরাশি সিদ্ধার সঙ্গে নয়জন নাথেরও পূজা প্রচলিত আছে। কানফাটা যোগীরা এখনও নয়জন নাথকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা করিয়া থাকেন। 'গোরক্ষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহে' দেখা যাইতেছে, নয়জন নাথ বিভিন্নদেশে তন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। 'তন্ত্র মহার্ণবে' এই নয়জন নাথের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে —পূর্বে গোরক্ষনাথ, জালন্ধর উত্তরাপথে (জ্বালামুখী), দক্ষিণে নাগার্জুন (গোদাবরীর কাছে), পশ্চিমে দত্তাত্রেয়, দক্ষিণ-পশ্চিমে দেবদত্ত, উত্তর-

৬ ইহাতে মোট ছিয়াত্তর জনের নাম আছে।

৭ শূন্যপুরাণ, ২য় সং. (পৃ. ৩—৪)

৮ Dr. Sashibhusan Dasgupta—*Obscure Religious Cults as the Background of Bengali Literature.*

পশ্চিমে জড়ভরত, কুরুক্ষেত্র ও মধ্যদেশে আদিনাথ এবং সমুদ্রোপকূলে দক্ষিণপূর্বে মৎস্যেন্দ্রনাথ।[৯] কাপালিক সমাজে মৎস্যেন্দ্রনাথ, চর্পটিকনাথ, মঙ্গলনাথ, ঘুগোনাথ, গোপীনাথ, প্রাণনাথ, সূরতনাথ, এবং চম্বনাথ এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হইয়া থাকেন। নানা ধর্ম-উপধর্ম-সম্প্রদায়ে এই নয়জন নাথের নাম পাওয়া যাইতেছে। এক তালিকার সঙ্গে অন্য তালিকার অনেক স্থলে পার্থক্য আছে। 'যোগীসম্প্রদায়াবিষ্কৃতি'তে বলা হইয়াছে যে, নয়জন নারায়ণের অবতাররূপে নয়জন নাথের আবির্ভাব হয়। শিবের আদেশে নয়জন নারায়ণ[১০] নয়জন নাথগুরু রূপে জন্মগ্রহণ করেন। যথা--মৎস্যেন্দ্র, গোরক্ষ, গহিনি, জালেন্দ্র, কারিণ-পা, চর্পট, রেবণ, ভর্তৃ, গোপীচন্দ্র। স্বয়ং মহাদেব মৎস্যেন্দ্রকে দীক্ষা দিলেন, মৎস্যেন্দ্র দীক্ষা দিলেন গোরক্ষ, চর্পটি এবং রেবণকে, গোরক্ষ দীক্ষা দিলেন গহিনিকে; করিণপা, ভর্তৃ ও গোপীচন্দ্র দীক্ষা লাভ করিলেন জালেন্দ্রের নিকট। মারাঠী প্রবাদ অনুসারে ('জ্ঞানেশ্বরী'র গুরু পরম্পরা অনুসারে) দেখা যাইতেছে, আদিনাথ শিবের নিকট উমা, মৎস্যেন্দ্র ও জালন্ধরনাথ মহাজ্ঞান শিক্ষা করেন। মৎস্যেন্দ্রের দুই শিষ্য—গোরক্ষনাথ ও চৌরঙ্গীনাথ। জালন্ধরের দুই শিষ্য—কানিফা ও ময়নাবতী (গোপীচন্দ্রের মাতা), গোরক্ষনাথের দুই শিষ্য—গৈনীনাথ, চর্পটিনাথ। গৈনীনাথের শিষ্য নিবৃত্তিনাথ। নিবৃত্তিনাথের তিন শিষ্য—জ্ঞানেশ্বর, সোপানদেব ও মুক্তাবাঈ। বহিনাবাঈয়ের তালিকানুসারে নাথধর্মের গুরু-পরম্পরা এইরূপ:—আদিনাথ (শিব)—মৎস্যেন্দ্রনাথ (গৌরীকে শিব যখন যোগরহস্য ব্যাখ্যা করেন, তখন গোপনে মৎস্যেন্দ্রনাথ তাহা শুনিয়া লন)—গোরক্ষনাথ—গহিনি—নিবৃত্তিনাথ—জ্ঞানেশ্বর—সচ্চিদানন্দ—বিশ্বম্ভর—রাঘবচৈতন্য—কেশবচৈতন্য—ভাবাজিচৈতন্য তকোবা (তুকারাম)—বহিনাবাঈ (ইনি ১৭০০ খ্রী: অব্দে বর্তমান ছিলেন)। আর একটি মারাঠী তালিকায় দেখা যায়:—শক্তি—শিব—উদে—রুদ্রগণ—জালন্ধর—মৎস্যেন্দ্র ও জালন্ধরপা—ভর্তৃনাথ ও কানুপা। মৎস্যেন্দ্রের

৯ এই তালিকার আট জনের নাম আছে, ঈশান কোণে কোন নাথের নাম নাই।

১০ এই নয়জন নারায়ণ ঋষভরাজের নয় পুত্র। ইঁহাদের নাম: কবি নারায়ণ, করভাজন নারায়ণ, অন্তরীক্ষ নারায়ণ, প্রবুদ্ধ নারায়ণ, অবির্হোত্রী নারায়ণ, পিপ্‌লায়ন নারায়ণ, চমস নারায়ণ, হরি নারায়ণ, দ্রুমিল নারায়ণ।

চারি শিষ্য—গোরক্ষনাথ, নীমনাথ, পংগলনাথ ও পরেশনাথ। ইঁহাদের মধ্যে নীমনাথ ও পরেশনাথ নাকি মৎস্যেন্দ্রনাথের দুই পুত্র—দুইজনেই জৈন।

বাঙলা দেশের নাথপরম্পরা এইরূপ:—শিব, মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ (বাঙলাদেশে মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ একই ব্যক্তি) ও জালন্ধরিপা বা হাড়ীসিদ্ধা। মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ; ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্য; কানুপা বা গাভুর সিদ্ধা জালন্ধরিপাদের শিষ্য। হাড়িপা গোপীচন্দ্রকেও দীক্ষা দিয়াছিলেন। কানুপার শিষ্য বাইল ভাদাই।[১১] ধর্মমঙ্গল কাব্য, বিশেষতঃ সহদেব চক্রবর্তী ও লক্ষ্মণের অনাদি পুরাণে (অনিলপুরাণে) এই নাথধর্মগুরুর কাহিনী অনুসৃত হইয়াছে। নাথ গুরুদের নামধামে নানা পার্থক্য সত্ত্বেও দেখা যাইতেছে যে, খ্রীঃ নবম শতাব্দীর নিকটবর্তী সময়ে গোরক্ষনাথের নেতৃত্বে এই নাথযোগীধর্ম ভারতের সর্বত্র প্রচারলাভ করিয়াছিল। মৎস্যেন্দ্রনাথ বা অন্যান্য নাথগুরু অধিকাংশ স্থলেই রক্তমাংসের মানুষ নহেন, সিদ্ধদেহী ও অমৃত-আত্মা। কিন্তু গোরক্ষনাথকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এত কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে যে, মনে হয়, এই ধর্মগুরু একদা মানবশরীরেই বর্তমান ছিলেন। দশম শতাব্দীরও পূর্ব হইতে গোরক্ষনাথের নানা উল্লেখ লক্ষ্য করা যাইতেছে। বাঙলা দেশে ও বাঙলার বাহিরে যে বিপুলকলেবর নাথসাহিত্য রচিত হইয়াছে, তাহার কিছু সংস্কৃত, কিছু বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, নেপালী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় পাওয়া যায়। এই নাথসাহিত্য মূলতঃ তিনভাগে বিভক্ত: (১) ধর্মদর্শন ও সাধনভজন প্রণালী, (২) গোরক্ষনাথের কাহিনী, (৩) হাড়িপা-ময়নামতীগোবিন্দ-(গোপী) চন্দ্রের কাহিনী। ধর্মদর্শন অর্থাৎ নাথপন্থের মত ও আদর্শ সংস্কৃত ও হিন্দী প্রভৃতি গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।[১২] বাঙলা দেশে শুধু গোরক্ষপন্থীর ধর্মদর্শন ব্যাখ্যা করিয়া বিশেষ কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। অন্যান্য নাথযোগীরা নিজ নিজ প্রয়োজনানুসারে গোরক্ষবাণীকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া এখনও ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল

---

১১ Dr. S. B Dasgupta,—*Op. cit*

১২ গোরক্ষ বোধ (হিন্দী), গোরক্ষ বিকাশ (হিঃ), গোরক্ষপদ্ধতি (হিঃ), গোরক্ষ সংহিতা (সংস্কৃত), গোরক্ষ বাণী (হিঃ), গোরক্ষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ (সংস্কৃত), হঠযোগ (সং) সিদ্ধসিদ্ধান্ত সংগ্রহ (সং) প্রভৃতি প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থে গোরক্ষপন্থীদের যোগধর্ম ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

মহাশয় তৎসম্পাদিত 'গোর্খবিজয়ে' নাথধর্ম-সংক্রান্ত এই রূপ কিছু কিছু পুঁথি ও ছড়ার উল্লেখ করিয়াছেন ('যোগীর গান', 'যোগচিন্তামণি', 'গোর্খ সংহিতা' [১৩])। এই অকিঞ্চিৎকর রচনাগুলি বাদ দিলে বাঙলায় নাথ সাহিত্য দুইটি বৃত্তকে অবলম্বন করিয়াছে—(১) গোরক্ষবৃত্ত, (২) ময়নামতী-গোবিন্দ (গোপী)-চন্দ্র বৃত্ত। ভারতেব অন্যান্য প্রদেশেও এই দুইটি কাহিনী, বিশেষতঃ ময়নামতীর কাহিনী লোকসাহিত্য, নাটক, চিত্রশিল্পে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন কবিয়াছিল। এবার আমবা বাঙলা দেশে নাথ সাহিত্যেব স্বরূপ ও বিকাশ আলোচনা কবিব।

২

বা ঙ লা র না থ সা হি ত্য

ইতিপূর্বে আমবা দেখিয়াছি যে, উত্তব ও পশ্চিমভাবতে খ্রীঃ দশম বা তাহাব পূর্ব হইতে যোগীসম্প্রদায়েব এক শাখা শৈবনাথযোগী নামে বিশেষ দেহমানসিক মোক্ষতত্ত্ব উপলব্ধিব জন্য একপ্রকাব সিদ্ধদর্শন সৃষ্টি কবিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের বিপুলকলেবব সাহিত্য ও দর্শন আধুনিক-কালেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বাঙলা দেশে প্রায় একই সময়ে নাথধর্ম যোগী-সমাজে এবং সাধারণ স্তরে হঠযোগ, তন্ত্র সহজিয়া বৌদ্ধ, কৌলজ্ঞানী প্রভৃতির সংমিশ্রণে একপ্রকাব বিচিত্র ধর্ম ও সাধন প্রণালী সৃষ্টি করিয়াছিল। চর্যাপদের টীকায় ভিন্নশাখাভুক্ত মীননাথের দার্শনিকমত উদ্ধৃত হইয়াছে ("তথাহি পরদর্শনে মীননাথঃ") চর্যার সিদ্ধাচার্যদের তালিকায় জালন্ধরিপা, কাহ্নপা, লুইপার (কেহ কেহ বলেন ইনি বোহিতপা অর্থাৎ মীননাথ) উল্লেখও আছে। সুতরাং বাঙলা দেশে নাথগুরুদের উল্লেখ চর্যার টীকাতেও (১৪শ শতাব্দী) পাওয়া যাইতেছে। পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যের নানা শাখায় গোরক্ষনাথ ও গোরক্ষপন্থীদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গল ও ঐরূপ গ্রন্থে শুধু নাথগুরুদের উল্লেখ নহে, তাঁহাদের লীলাকাহিনীরও অনেক গল্প আছে। বৈষ্ণবগ্রন্থে ('ভক্তমাল') এই নাথ

---

১৩ দ্রষ্টব্য: ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ও বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'গোর্খবিজয়ে'র খ, গ, ঘ ও ঙ পরিশিষ্ট।

গুরুদের বৈষ্ণব বলা হইয়াছে। শাক্তদের সঙ্গেও নাথগুরুদের যোগাযোগ নিতান্ত অস্পষ্ট নহে। কলিকাতার কালীঘাটের কালীমন্দির নাকি নাথগুরু গোরক্ষনাথ প্রতিষ্ঠিত। এখনও বাঙলা দেশে শৈব নাথযোগীদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। প্রাচীনযুগের নাথসম্প্রদায়ের সাহিত্য ও সাধনভজন-সংক্রান্ত পুঁথিপত্র বাঙলা দেশেও রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সেরূপ কোন প্রাচীন নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নাই। গ্রীয়ার্সন ও বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য উত্তরবঙ্গের কৃষকদের মুখ হইতে মাণিকচন্দ্র-ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী লিখিয়া লইয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেগুলি সম্পাদনা করিতে গিয়া 'ময়নামতীর গান' সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ইহা পূর্ববর্তী যুগেব প্রাকৃত-প্রধান বাঙালা।" 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'ব প্রথম সংস্করণেই তিনি এই সমস্ত মৌখিক ছড়াপাঁচালীকে আদিম যুগেব বাংলা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি চর্যাগীতি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কারের পরেও তিনি এই সমস্ত অর্বাচীন ছড়াব ভাষাকে প্রাচীনতম বাংলা ভাষা প্রমাণের জন্য বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সামান্য ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান হইতেই এই মৌখিক ছড়াগুলিকে আদৌ প্রাচীন বলিযা মনে হইবে না। সে যাহা হউক, নাথ সাহিত্য-সংক্রান্ত কিছু কিছু পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে—অতিশয় অর্বাচীন কালের পুঁথি। সেই সমস্ত পুঁথি ও মৌখিক ঐতিহ্য অবলম্বনে নাথ সাহিত্যেব সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। আলোচনাব সুবিধার জন্য বাঙলার নাথসাহিত্যকে তিনটি বৃত্তে ভাগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে—(১) গোরক্ষ-নাথ বৃত্ত, (২) ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র বৃত্ত, (৩) নাথধর্মদর্শন-বিষয়ক ছড়া।

গোরক্ষনাথ বৃত্ত ॥

নাথ সাহিত্যের দুইটি ধারা—গোরক্ষনাথ ও ময়নামতীর গান। বাঙলার বাহিরেও এই দুইটি ধারার পরিচয় নানা প্রাদেশিক ভাষায় অনুসৃত হইয়াছে। গোরক্ষনাথ কর্তৃক অধঃপতিত গুরু মীননাথকে উদ্ধারের বৃত্তান্ত গোরক্ষ-বৃত্তের কাহিনীগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে এবং ময়নামতীর বৃত্তে গোরক্ষনাথের শিষ্য রাণী ময়নামতীর নির্বন্ধাতিশয্যে তাঁহার পুত্র তরুণ গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের জালন্ধরিপাদ বা হাড়িসিদ্ধার (ময়নামতীর গুরুভাই) শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন—ইহাই মূল বর্ণিত বিষয়।

গোরক্ষনাথ নাথ-গুরুপরম্পরায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিলেও তাঁহার কীর্তিকাহিনী ও পুণ্যচরিত ভারতের সর্বত্র প্রচলিত। নাথধর্ম গোরক্ষনাথ-প্রচারিত তত্ত্বাদর্শনানুসারে প্রচারিত হইয়াছে, তাঁহার নীতি, দর্শন ও ধর্মচর্যা-সম্বলিত সাধনভজনপ্রণালী সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষায় মধ্যযুগ হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত প্রচার লাভ করিয়াছে। এক কথায় শিব ও মীননাথ অপেক্ষা গোরক্ষনাথের জীবনকথার প্রাধান্যই নাথধর্ম ও সাহিত্যে বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

কাহারও কাহারও মতে গোরক্ষনাথ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। গ্রীয়ার্সনের মতে তিনি অষ্টম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।[১৪] কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে অষ্টম শতাব্দীতে গোরক্ষের আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব নহে।[১৫] কেহ কেহ তাঁহাকে দশম-একাদশ শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন।[১৬] একাদশ শতাব্দীর মারাঠী সাধক ও গীতাভাষ্যকার জ্ঞানেশ্বরের পিতামহ গোবিন্দপন্থকে গোরক্ষনাথ নাকি তত্ত্বোপদেশ দান করিয়াছিলেন।[১৭] সুতরাং এই মতে গোরক্ষ এই সময়ের কিছু পূর্ববর্তী হইতে পারেন। গিরনারের সাধক বাবা ফরিদের সঙ্গে নাকি গোরক্ষনাথের যোগাযোগ ছিল। ফরিদ ১২৪৪ খ্রীঃ অব্দে গিরনারে গিয়াছিলেন। এই মতে গোরক্ষনাথ ত্রয়োদশ শতাব্দীর ব্যক্তি। কচ্ছ প্রদেশের ধর্মনাথ নাকি গোরক্ষের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। ধর্মনাথ চতুর্দশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ইহা সত্য হইলে গোরক্ষনাথ চতুর্দশ শতাব্দীর ব্যক্তি হইয়া পড়েন। ষোড়শ শতাব্দীর কবীর নাকি গোরক্ষনাথের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। নানকও গোরক্ষনাথের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, এরূপ জনশ্রুতিও আছে। সেই জনশ্রুতি অনুসারে উইলসন মনে করিয়াছিলেন গোরক্ষনাথ পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে, কারণ 'কবীর বীজকে' উল্লিখিত আছে যে, গোরক্ষনাথ বহু পূর্বে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। তবে গোরক্ষের সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে কবীরের আধ্যাত্মিক আলোচনা হইয়াছিল,

---

১৪ Hastings—*Encyclopaedia of Religion and Ethics*, vol. VI. (*Gorakhnath*—by Grierson.)

১৫ G. W. Briggs—*Gorakhnath and the Kanphata Yogis*

১৬ The Calcutta Review, August, 1924 (An essay by Dr. B. C. Sen)

১৭ Briggs—*Op. cit.*

এইরূপ উক্তি আছে। এইরূপ নানাবিধ পরস্পরবিরোধী সন-তারিখ হইতে গোরক্ষনাথকে অষ্টম-নবম হইতে পঞ্চদশ-ষোড়শ—যে-কোন শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

গোরক্ষনাথ কোন্ অঞ্চলে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা লইয়া যেমন নানা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তেমনি এই বিষয়ে ঐতিহাসিক গবেষণাও নিতান্ত অল্প হয় নাই। কিন্তু প্রাপ্ত উপাদানসমূহের যাথার্থ্য বিচার করিবার মতো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। উপরন্তু পৌরাণিক প্রবাদ ও লোকশ্রুতির পরস্পর-বিরোধী তথ্যের ফলে এ বিষয়ে কিছু নিশ্চয় করিয়া বলা দুরূহ। পৌরাণিক সংস্কার অনুসারে গোরক্ষনাথ সত্যযুগে পাঞ্জাবে, ত্রেতাযুগে গোরখপুরে, দ্বাপরে দ্বারকায় এবং কলিযুগে কাথিওয়াড়ে অবির্ভূত হন। নেপালী জনশ্রুতি মতে গোরক্ষ পশ্চিম নেপালের এক গুহায় বাস করিতেন। কেহ কেহ গুর্খা নামটিকেও গোরক্ষ হইতে উৎপন্ন মনে করেন। অপর মতে তিনি উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরেরই অধিবাসী, স্থানটির নামেই তাঁহার পরিচয়। অবশ্য গোরখপুর এখনও কানফাটা যোগীদের প্রধান কেন্দ্র। তিনি পাঞ্জাব হইতে নেপালে (কাঠমুণ্ডু) অবস্থান করিয়াছিলেন—ইহাও কোন কোন নেপালী জনশ্রুতিতে প্রচলিত আছে। গোরখপুরের যোগী সম্প্রদায়ও মনে করেন যে, গোরক্ষনাথ আসলে পাঞ্জাবের অধিবাসী, সেখান হইতে আসিয়া গোরখপুরে বাস করিয়াছিলেন। নাসিকের যোগীরাও বলেন যে, গোরক্ষনাথ নেপাল হইতেই পাঞ্জাবে গিয়াছিলেন এবং পরে ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। আধুনিক কালে নাথপন্থের ঐতিহাসিক ও গবেষক ডঃ মোহন সিং বলেন যে, প্রকৃত পক্ষে গোরক্ষনাথ পেশোয়ার অঞ্চলেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন।[১৮] এই সমস্ত উপাদান ও উল্লেখ হইতে মনে হইতেছে, গোরক্ষনাথ খুব সম্ভব পাঞ্জাবের অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু এদেশের সাধকদের মতো তিনি ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পূত চরিত্রকথা অবলম্বনে ভারতবর্ষের নানা স্থানে গালগল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ভক্তের দল গুরুকে নিজ নিজ অঞ্চলের বলিয়া দাবি করিয়াছেন। সেইজন্ত আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল, সিন্ধু,

---

১৮ Dr. Mohan Singh—*Gorakhnath and Medieval Hindu Mysticism*

গুজরাট, মহারাষ্ট্র, সিংহল, আসাম, বাঙলা—ভারতের সর্বত্র, এমনকি ভারত-বর্ষের উপান্ত প্রদেশেও তাঁহার আবির্ভাব ও কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে।[১৯]

বাঙলা দেশের নাথসাহিত্যে গোরক্ষনাথকে মীননাথের শিষ্য এবং রাণী ময়নামতীর গুরুরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ডঃ মোহন সিং অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে,[২০] সারা ভারতেই গোরক্ষনাথ-সংক্রান্ত গুরুশিষ্য-পরম্পরা ছড়াইয়া আছে। গোরক্ষনাথ শিয়ালকোটের রাজা সালবাহনের পুত্র পুরণের শিক্ষক ছিলেন।[২১] উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের বৈমাত্রেয় ভাই ভর্তৃহরি, উজ্জয়িনীর আর এক রাজা গোপীচাঁদ (ইঁহাকে রংপুর, ধরণগিরি, কাঞ্চনপুরের রাজাও বলা হইয়াছে), রাণী লুনা চমরী ও রাণী, সুন্দরন (আসাম), গগ্‌সপীর (রাজপুতানা), পেশোয়ারের বাবা রতন, পশ্চিম-ভারতের ধর্মনাথ, রাজা অজয়পাল ও বেনপাল, কপিলমুনি, বলনাথ, মদরের অধিবাসী মুহম্মদ জায়সীর 'পদ্মাবতে'র নায়ক রত্নসেন—এমন কি, কবীর-নানকের সঙ্গে জড়াইয়া গোরক্ষনাথের অনেক গল্প বাঙলার বাহিরে যোগী সমাজে সুপ্রচারিত হইয়াছে।[২২] এই সমস্ত কাহিনী ও জনশ্রুতি পুরাপুরি ঐতিহাসিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। শঙ্করাচার্য যেমন ঐতিহাসিক কালে আবির্ভূত হইয়াও অলৌকিক মানব রূপে সমগ্র ভারতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তেমনি নাথগুরু গোরক্ষনাথও ধর্ম ও সাধনার জগতে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-জৈন সমাজে, বিশেষতঃ নাথপন্থী শৈব যোগী সমাজে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা ও শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তের দল কখনও তাঁহাকে শিবের অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কখনও-বা ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরকেও তাঁহার নিম্নে স্থান দিয়াছেন।[২৩] নাথধর্ম শৈব, এবং গোরক্ষনাথ শিবের অবতার, এরূপ কথা যোগীসমাজে সর্বত্র প্রচারিত আছে। বৌদ্ধ জনশ্রুতি মতে, তিনি পূর্বে তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারনাথের মতে, বৌদ্ধ গোরক্ষনাথের নাম ছিল অনঙ্গবজ্র।

১৯ Dr S. B. Dasgupta—*op. cit.*

২০ ডঃ মোহন সিং হিন্দী বিশ্বকোষে (১৭শ খণ্ড, পৃ. ৭৪৫) 'গোরক্ষনাথ' প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, গোরক্ষনাথ পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।

২১ গিরিশচন্দ্রের 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকে এই পুরণের চরিত্র আছে।

২২ Dr. Mohan Singh—*op. cit.* and Dr. S. B. Dasgupta—*op cit.*

২৩ গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ—Edited by Pt. Gopinath Kaviraj, Benares

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, এই নাম অনঙ্গবজ্র নহে, রমণবজ্র ('বৌদ্ধগান ও দোঁহা'র ভূমিকা)। পরে তিনি বৌদ্ধমত ত্যাগ করিয়া শৈব যোগী হন। তাই নেপালী বৌদ্ধেরা গোরক্ষনাথ দলত্যাগী বলিয়া তাঁহার নিন্দা করিয়া থাকেন। এই সমস্ত উল্লেখ হইতে মনে হইতেছে, গোরক্ষনাথের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা নানা ধর্ম-উপধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কতরূপ বিচিত্র লোককথা সৃষ্টি করিয়াছিল।

এবার বাঙলা দেশে প্রাপ্ত গোরক্ষচরিতবিষয়ক কাহিনী সম্পর্কে সংক্ষেপে দুই-এক কথা আলোচনা করা যাইতেছে। এ পর্যন্ত গোরক্ষমহিমা-বিষয়ক তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে: (১) ঢাকা সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ও ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত শ্যামদাস সেনের 'মীনচেতন' (১৯১৫), (২) মুন্সি আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত) শেখ ফয়জুল্লার 'গোরক্ষ বিজয়' (১৯১৭), (৩) ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ও বিশ্বভারতী প্রকাশিত ভীমসেনের 'গোর্খবিজয়' (১৯৪১)। এই তিনখানির মধ্যে মুন্সি আবদুল করীম শেখ ফয়জুল্লার কাব্য প্রকাশের পূর্বেই বাংলা ১৩২০ সনে প্রকাশিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণে' সর্বপ্রথম শেখ ফয়জুল্লা প্রণীত গোরক্ষবিজয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। গোরক্ষনাথ বৃত্তের প্রথম প্রকাশিত কাব্য নলিনীকান্ত সম্পাদিত 'মীনচেতন' ১২২৪ সনের (ইং ১৮১৮) একখানি মাত্র জীর্ণ পুঁথি অবলম্বনে প্রকাশিত হয়। পুঁথিটির দুইস্থলে শ্যামদাসের ভণিতা আছে, অন্যত্র আর কোন কবির ভণিতা নাই। সেই জন্য গ্রন্থসম্পাদক ডঃ ভট্টশালী শ্যামদাসকেই এই কাব্যের রচয়িতা বলিয়া মনে করেন তাঁহার মতে—গোরক্ষমহিমা বিষয়ক এই কাব্যখানির নাম 'মীনচেতন'। কারণ "জীর্ণ প্রথম পাতাখানার উপরে গ্রন্থের নাম লিখা ছিল 'মীনচেতন' এবং মাঙ্গলিক চিহ্নের পরে 'অথ মীনচেতন লিখ্যতে' বলিয়া গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছিল" (ভূমিকা)। মুন্সি আবদুল করীম ইহার পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত প্রাচীন বাংলা পুঁথির বিবরণে এই কাব্যকে 'গোরক্ষবিজয়' বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার মতে শেখ ফয়জুল্লা ইহার রচয়িতা। সে সম্বন্ধে ডঃ ভট্টশালী বলিয়াছেন, "এই কাব্যের নাম গোরক্ষবিজয় হইতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু আমাদের প্রাপ্ত পুঁথিতে নাম মীনচেতন পাইয়াছি। তাই ইহার নাম মীনচেতন দিতে হইয়াছে। গোর্ক্ষবিজয় পাইলে গোর্ক্ষবিজয়ই দিতাম" (ভূমিকা)।

ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে মুন্সি আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে যে 'গোরক্ষবিজয়' প্রকাশিত হয়, তাহা তিনখানি পুঁথি অবলম্বনে মুদ্রিত। পুঁথি সম্পাদনার পর করীম সাহেব আরও পাঁচখানি পুঁথি পাইয়াছিলেন। মোট আটখানি পুঁথি অবলম্বনে এই কাব্য মুদ্রিত হয়। পুঁথিগুলিতে কবীন্দ্র দাস, শেখ ফয়জুল্লা, ভীমদাস ও শ্যামদাস সেনের ভণিতা পাওয়া যায়। এই পুঁথিগুলির অধিকাংশ খণ্ডিত এবং অর্বাচীন কালের নকল। একখানি (৫ম পুঁথি) ১৮৬১ সালে নকল করা হইয়াছিল। করীম সাহেব যে আদর্শ পুঁথির পাঠ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার লিপিকাল ১১৮৪ সন (১৭৮৭)। এই আটখানি পুঁথির মধ্যে আদর্শ পুঁথির পুষ্পিকায় কবির নাম না থাকিলেও কাব্যের নাম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "গোরখবিজয় পুস্তক সমাপ্ত" (পৃঃ ১৯৯)। দ্বিতীয় পুঁথির পুষ্পিকায় আছে, "ইতি মিননাথ চৈতন্য গোর্খবিজয় সমাপ্ত"—ইহা ১২৫৬ সালে চট্টগ্রামে অনুলিখিত হইয়াছিল। করীম সাহেবের মতে "উক্ত পুঁথি (অর্থাৎ ডঃ ভট্টশালীর মীনচেতন) ও সমালোচ্য "গোরক্ষবিজয়" (শেখ ফয়জুল্লা) অভিন্ন পুঁথি বই আর কিছুই নহে। পুঁথি দুইখানি পাশাপাশি রাখিলে স্বতঃই তাহাদিগকে যমজ বলিয়া পাঠকবর্গের ভ্রম হইবে" (গোরক্ষবিজয়ের ভূমিকা, পৃঃ ৫)। তাই তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, "সম্ভবতঃ আদৌ পুঁথিখানির পূর্ণ নাম "মীনচেতন গোরক্ষবিজয়" অথবা "গোরক্ষবিজয় মীনচেতন" ছিল। হয়তো সংক্ষিপ্ত হইয়া তাহাই অবশেষে কোথাও 'গোরক্ষবিজয়' নামে এবং কোথাও-বা 'মীনচেতন' নামে পরিচিত হইয়াছে" (ভূমিকা, পৃঃ ৫)। করীম সাহেব তাঁহার গোরক্ষবিজয় ও ভট্টশালীর মীনচেতন, উভয় নামের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার আটখানি পুঁথির একখানিতে "মিননাথ চৈতন্য গোর্খবিজয়" এই পংক্তিটি আছে বলিয়া তিনি এইভাবে গোরক্ষবিজয় ও মীনচেতনের মধ্যে আপোষ-রফা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কবি সম্বন্ধে তিনি ভট্টশালীর মত স্বীকার করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার আটখানি পুঁথির ভণিতা বিচার করিয়া দেখাইলেন যে, ফয়জুল্লা, কবীন্দ্র, কবীন্দ্রদাস, ভীমদাস, শ্যামদাস সেন, ভীমসেন রায়—এতগুলি নাম আছে। তন্মধ্যে কবীন্দ্র ও কবীন্দ্রদাস এবং ভীমদাস ও ভীমসেনকে না হয় চারিজন কবি না বলিয়া দুই জন কবি বলা

গেল। তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত এই কাহিনীর কবি হিসাবে পাইতেছি শেখ ফয়জুল্লা, কবীন্দ্রদাস- ভীমদাস ও শ্যামদাস সেন। তাহার মধ্যে শেখ ফয়জুল্লার ভণিতা সংখ্যাই অধিক—প্রায় ১৩টি ভণিতা পাওয়া যায়। কোন কোন পুঁথিতে শুধু তাঁহার ভণিতাই আছে। সুতরাং মুন্সি করীম সাহেবের মতে এই কাব্যের কবি শেখ ফয়জুল্লা। অন্য সকলে সম্ভবতঃ গায়েন ছিলেন। প্রাপ্ত কাব্যে অধিক সংখ্যক মুসলমানী শব্দ দৃষ্টে ইহা কোন মুসলমান কবির রচনা বলিয়াই মনে হয়। অন্য নামগুলি পরবর্তী কালের কোন কবি বা গায়েনের হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং তাঁহাব মতে, "প্রত্যেক পুঁথিতেই যখন ফয়জুল্লার ভণিতা পাওয়া যাইতেছে, তখন তাঁহাকে সমালোচ্য পুঁথির প্রকৃত প্রণেতা বলিয়া মানিতে আমরা বাধ্য" (গোবক্ষবিজয়ের ভূমিকা, পৃঃ ১৪)। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'[২৪] এবং 'Dacca Review ও সম্মিলনে' (১৩২৩, ভাদ্র-আশ্বিন) শেখ ফয়জুল্লাকেই গোরক্ষ-বিজয়ের প্রকৃত কবি বলিয়াছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন ভীমসেন, শ্যামদাস ও ফয়জুল্লা—তিন জনকেই গোরক্ষবিজয়ের কবি বলিতে চাহেন। তবে তাঁহার মতে 'শ্যামদাস ও ফয়জুল্লাব বচনার মধ্যে ঐক্য এতটা গভীব যে, দুইজনকে স্বতন্ত্র কবি ভাবা দুরূহ। হয় দুইজনেই পূর্ববর্তী ছড়ার গায়েন ছিলেন, নতুবা একজন ছিলেন ছড়াব লেখক, আর একজন গায়ক" (অপরার্ধ, পৃঃ ২:৮)। কে গায়ক, আব কে লেখক, তাহা ডঃ সেন স্পষ্টতঃ বলেন নাই। ফয়জুল্লা যে প্রকৃত একজন কবি ছিলেন, তাহার প্রমাণ

২৪ দীনেশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "ফযজুল্লাকে আমবা 'গোবক্ষবিজয বা মীনচেতন' পুস্তকের আদিলেখক বলিযা মাল্যচন্দন দিতে প্রস্তুত, কিন্তু 'আদি লেখক' অর্থে আমবা শুধু সঙ্কলযিতা বুঝাইতে চাই।... 'গোবক্ষ বিজয' ছড়াব মত দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গীয গ্রাম্য সাহিত্যের এক কোণে পড়িযাছিল, ফযজুল্লা প্রভৃতি লেখকগণ হযত পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাহা কুড়াইয়া লইযা সেগুলি কাব্যে পবিণত কবিযাছেন।" অর্থাৎ তাঁহার মতে গোরক্ষ বিজয়ের কাহিনী ও বচনাব জড় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত, ফয়জুল্লার মতো অন্যান্য কবিরা তাহাকেই কাব্যে রূপ দিযাছেন। এই অনুমান নিতান্ত মিথ্যা নহে। বোধ হইতেছে, এই ধরণের কাহিনী অনেক পূর্ব হইতে মৌখিক সাহিত্যের আকারে লোকসমাজে চলিয়া আসিতে-ছিল। ফয়জুল্লার দল তাহাকেই পরবর্তী কালের ভাষায় গাঁথিয়াছেন। তবে ফয়জুল্লা পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি এবং তাহার কাব্য ঐ শতাব্দীতে রচিত, দীনেশচন্দ্রের এ অভিমত গ্রহণযোগ্য নহে। ফয়জুল্লা এবং তাঁহার কাব্য নিশ্চয়ই অনেক পরবর্তী-কালের।

ফয়জুল্লা ভণিতা যুক্ত পুঁথিতে অধিক সংখ্যায় মুসলমানী শব্দ পাওয়া গিয়াছে।[২৫]

গোরক্ষনাথ-সংক্রান্ত সর্বশেষ গ্রন্থখানি (ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত) 'গোর্খবিজয়' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনে রক্ষিত একটি পূর্ণাঙ্গ কিন্তু অর্বাচীনকালের পুঁথি (পুঁথি সংখ্যা—১৪, ১২৬৩ সালের অনুলিপি) ইহার প্রধান উপাদান। ডঃ মণ্ডলের মতে এই কাব্যের নাম হওয়া উচিত 'গোর্খবিজয়'—গোরক্ষবিজয় নহে। কারণ এ পর্যন্ত কোন পুঁথিতেই 'গোরক্ষ' নাম পাওয়া যায় নাই। সর্বত্র গোর্খ আছে, কদাচিৎ গুর্খ বা গোর্খ পাওয়া যায়। তাই সম্পাদক ডঃ মণ্ডল এ কাব্যের নাম দিয়াছেন 'গোর্খবিজয়'। কিন্তু সারা ভারতেই এই নাম গোরক্ষনাথ—গোর্খ বা গুর্খ নহে। অবশ্য জনসাধারণের উচ্চারণে গুর্খ-গোর্খও হইতে পারে, যেজন্য কেহ কেহ গুর্খা জাতির সঙ্গে গোরক্ষনাথের সম্পর্ক ধরিয়াছেন। তাই আমাদের অনুমান, নামটি প্রকৃতই গোরক্ষনাথ, কিন্তু অজ্ঞলোকের মুখে তাহার বিকৃতি ঘটাতে গোর্খ হইয়া গিয়াছে। ভণিতা সম্বন্ধে ডঃ মণ্ডল দেখিয়াছেন, এই পুঁথিতে তিন স্থানে ভীমসেন রায়ের উল্লেখ আছে, কিন্তু তিনিই যে ইহার রচয়িতা এরূপ কোন উল্লেখ নাই। এ বিষয়ে ডঃ মণ্ডল কয়েকটি নূতন প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, ভট্টশালীর মীনচেতনের সমাপ্তি হইয়াছে 'কদলীবিজয়ে'।[২৬] অর্থাৎ গোরক্ষনাথ কদলীর দেশে গিয়া কদলী নারীদের কবল হইতে গুরু মীননাথকে রক্ষা করিলেন 'মীনচেতন' এইভাবে শেষ হইয়াছে। কিন্তু মুন্সি আবদুল করীম সাহেব সম্পাদিত গোরক্ষবিজয় সমাপ্ত হইয়াছে 'মীনচেতনে'।[২৭] ডঃ মণ্ডলের ভীমসেনের পুঁথির সহিত এই দুইখানি মুদ্রিত কাব্যের "আক্ষরিক সাদৃশ্য আছে তাল-মান-রাগরাগিণী সমেত।"[২৮] কিন্তু গোরক্ষবিজয়ের সমাপ্তিতে

২৫ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ১২৩২ বঙ্গাব্দে লিপিকৃত ফয়জুল্লা ভণিতাযুক্ত গোরক্ষ বিজয়ের যে পুঁথিখানি আছে তাহাতে প্রচুর মুসলমানী শব্দ পাওয়া যায়।

২৬ সেন সাম দাসে কহে গোর্ক্ষ মহাশয়।
আনন্দে করিল তবে কদলি বিজয়। (মীনচেতন)

২৭ গুরুর চরণে মোর সহস্র প্রণাম।
সমাপ্ত হইল গান মীনের চেতন। (গোরক্ষ বিজয়)

২৮ ডঃ মণ্ডল সম্পাদিত 'গোর্খ বিজয়ের' ভূমিকা (ভূমিকায় পত্রাঙ্ক নাই)।

যুগপৎ 'মীনচেতন' এবং 'গোর্খের বিজয়'—দুই প্রকার উল্লেখই আছে।[২৯] আবদুল করীম তাঁহার পুঁথির নাম দিয়াছিলেন 'গোরক্ষবিজয়', নলিনীকান্ত ভট্টশালী দিয়াছিলেন 'মীনচেতন'। এই দুইটি বাক্যাংশই গোরক্ষবিজয়ে মিলিতেছে। সুতরাং "তাঁহাদের কোন যুক্তিই আর খাটে না"—ডঃ মণ্ডলের এ মন্তব্যের যৌক্তিকতা মানিয়া লওয়া যায় না। তিনি বলিতেছেন, "বহু বিঘোষিত ফয়জুল্লা ও শ্যামদাস সেন অথবা আমাদের ভীমসেন রায় সকলেই মূল গোর্খগীতিকার গায়ক মাত্র; রচয়িতা নহেন।" তাঁহার মতে নানা জনে (গায়ক) নিজ নিজ ভণিতা চালাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং 'গোরক্ষ-বিজয়' (আবদুল করীম সম্পাদিত), 'মীনচেতন' (নলিনীকান্ত সম্পাদিত) ও 'গোর্খবিজয়' (ডঃ মণ্ডল সম্পাদিত) তিনখানি কাব্যেরই রচনাকার নাই, ফয়জুল্লাদি ইহার গায়ক মাত্র। ভণিতাগুলি বিচার করিয়া ডঃ মণ্ডল দেখিয়াছেন যে, ইহাতে কোন শ্রীছাঁদ নাই, ধারা অনুসরণ নাই, কবিরা যেন ঠেলাঠেলি করিয়া নিজ নিজ ভণিতা চালাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং ডঃ মণ্ডলের মতে, গোর্খগীতিকার ভণিতাগুলি "জোড়াতাড়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং ইঁহারা সকলেই প্রচলিত গোর্খগীতিকার গায়ক ছিলেন" (ভূমিকা)। অর্থাৎ ডঃ মণ্ডলের মতে, প্রচলিত গোর্খ গীতিকার কে প্রকৃত কবি, তাহা জানা যাইতেছে না। ফয়জুল্লা, ভীমসেন, কবীন্দ্র—ইঁহাদের ভণিতা থাকিলেও ইঁহারা গীতিকার গায়েন ভিন্ন রচনাকার নহেন। অথচ ডঃ সুকুমার সেন ভীমদাসকে গোর্খ গীতিকার প্রাচীনতম কবি বলিয়াছেন।[৩০] আবদুল করীমও কবীন্দ্রদাসকে এই গীতিকার প্রাচীনতম প্রচারক বলিতে

---

২৯ জোগ সাধে মীননাথে স্থির কৈল কায়া।
সুন সুন গুণিজন গোর্খের বিজয়া॥ (পৃ. ১৯৮)

এবং গুরুর চরণে মোর সহস্র প্রণাম।
সমাপ্ত হইল গান মীনের চেতন॥ পৃঃ ১৯৯

কিন্তু ফয়জুল্লার গ্রন্থে ইহাকে 'গোর্খ বিজয়' বলা হইয়াছে। যথা—"এহি তত্ত্ব পুরাণে কহিছে গোর্খের বিজয়"। (আবদুল করীম সম্পাদিত পৃ. ১০)

৩০ ডঃ সেন ঠিক এইরূপ ভাষা ব্যবহার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "গোরক্ষ বিজয়ের প্রাচীনতম কবিদের একজন হইতেছেন ভীমসেন রায়।" তাঁহার মতে, "গোরক্ষ বিজয়ের কবি (বা প্রাচীন গায়ক) পাইতেছি অন্ততঃ তিন জন—ভীমসেন রায়, শ্যামদাস সেন ও ফয়জুল্লা।" (বা. সা. ইতি. ১ম, অপরার্ধ)

চাহেন।[৩১] তাঁহার মতে কবীন্দ্রদাসই আসল গায়েন-কবি, ভীমসেন নামটি প্রক্ষিপ্ত (গোরক্ষবিজয়, ভূমিকা, পৃঃ ১১)

ইঁহাদের মতামত হইতে কে যে গোরক্ষবিজয়-মীনচেতনের প্রকৃত রচনাকার তাহা জানা যাইতেছে না। যে ভণিতাগুলি পাওয়া যাইতেছে, তাহা গায়েনদের ভণিতা হওয়াই সম্ভব। শেষ পর্যন্ত দুইজন দাবিদার দাঁড়াইতেছেন—ভীমসেন (বা কবীন্দ্র) ও শেখ ফয়জুল্লা। কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। এ সমস্ত গান সমাজের নিম্নস্তরেই প্রচলিত ছিল। বিষয়বস্তুর মধ্যে যোগসাধনার কথা থাকিলেও ইহার মধ্য দিয়া একটি স্থূল গ্রাম্য মনের ধারা বহিয়া গিয়াছে। কাজেই পুরাণ-শাসিত শাক্ত-বৈষ্ণব পঞ্চোপাসক সমাজে ঈশ্বরচেতনায়-উদাসীন যুগীদের যোগসাধনাদি বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হয় নাই। অন্ততঃ সর্বদা ইহাতে মন্ত্রগুপ্তির ভাব থাকিত। কাজেই প্রকৃতপক্ষে কে ইহার রচয়িতা তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। তবে মুদ্রিত কাব্য তিনখানি দেখিয়া মনে হইতেছে, শেখ ফয়জুল্লা ইহার রচনাকার যদি নাও হন, তবু তিনি লোকধর্ম ও লোকসাহিত্যের অন্তর্গত গোরক্ষমহিমা-বিষয়ক গ্রাম্য মৌখিক ছড়াকে পুঁথির আখরে স্থায়িত্ব দান করিয়াছিলেন। যোগী নাথসমাজের এই কাহিনীতে নানা জনে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, অনেক পংক্তি যোগ করিয়াছে, অনেক পংক্তি ছাড়িয়া গিয়াছে। এই জন্য মুন্সি সাহেব তাঁহার পুঁথিগুলির মধ্যে এত অমিল দেখিয়াছিলেন।[৩২] তাই কেহ ইহাকে বলিয়াছেন গোরক্ষবিজয়, কেহ নাম দিয়াছেন মীনচেতন কেহ-বা লিখিয়াছেন গোর্খ-বিজয়। কিন্তু লোকসমাজে ও সাহিত্যে গোরক্ষনাথ-মীননাথের মূল কাহিনীটি নানা জনের হস্তক্ষেপের ফলে নানা পাঠবৈষম্য সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু মুদ্রিত তিনখানি কাব্যের মধ্যে এত সাদৃশ্য দেখা যায় যে, ইহাদিগকে একই কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। শুধু নানা সময়ে নানা জনের হাতে পড়িয়া ইহাতে এতটা পার্থক্য ঘটিয়াছে।

এই কাব্য যুগপৎ 'গোরক্ষবিজয়' ও 'মীনচেতন'। যতিশ্রেষ্ঠ গোরক্ষনাথ

---

৩১ "আমাদের মনে হয়, কবীন্দ্র দাস এই (মৌখিক) গাথার আদি রচয়িতা ছিলেন, কিন্তু শেখ ফয়জুল্লাই তাহা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।" (গোরক্ষবিজয়ের ভূমিকা, পৃ. ৪)

৩২ তৎসম্পাদিত গোরক্ষবিজয়ের পরিশিষ্ট (ক), পৃ. ২০১ দ্রষ্টব্য।

কীভাবে আত্মভ্রষ্ট গুরু মীননাথকে কদলীরাজ্যের স্ত্রীলোকদের কবল হইতে রক্ষা করিলেন ইহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। গোরক্ষনাথ বাঙলা বা পাঞ্জাব, যেখানেই আবির্ভূত হউন না কেন,[৩৩] মীননাথ-সংক্রান্ত কাহিনীটি বাঙলা দেশের গল্প, এদেশেই বিকশিত ও পল্লবিত হইয়াছে। অবশ্য বাঙলার বাহিরে পৃথকভাবে মীননাথ (মৎস্যেন্দ্রনাথ) ও গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। 'যোগিসম্প্রদায়াবিষ্কৃতি' (হিন্দী) গ্রন্থে নাথগুরুপরম্পরা এবং বাঙলা দেশে আসিয়া গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে শিষ্য গোরক্ষনাথের মিলিত হইবার আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। নেপালী আখ্যানে দেখা যায়, শিষ্য গোরক্ষকে নিজের স্থূলদেহ রক্ষার ভার দিয়া মৎস্যেন্দ্রনাথ সূক্ষ্মশরীরে এক মৃত রাজার দেহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার রাণীর মায়াপাশে বদ্ধ হন। তখন গোরক্ষনাথ গুরুকে সেই কুহকিনীর কবল হইতে রক্ষা করেন।[৩৪] 'যোগিসম্প্রদায়াবিষ্কৃতি'তে দেখা যাইতেছে যে, গিরনার পর্বতে মৎস্যেন্দ্রনাথ যখন যোগস্থ ছিলেন, তখন সিংহলের এক রাণী তাঁহাকে মায়াপাশে বন্দী করেন। তাঁহার সহিত মিলনে মৎস্যেন্দ্রনাথের পরশুরাম ও মীনরাম নামে দুই পুত্র হয়। গোরক্ষনাথ তখন সেখানে গিয়া তবলার ধ্বনির সাহায্যে গুরুকে প্রবুদ্ধ করেন।[৩৫] দক্ষিণ ভারতেও 'লিঙ্গধারণচন্দ্রিকা' গ্রন্থে দাক্ষিণাত্যের সাধক সিদ্ধ আলমপ্রভুর (দ্বাদশ শতাব্দী) সঙ্গে গোরক্ষনাথের আলোচনার বর্ণনা পাওয়া যায়। গোরক্ষনাথ গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথকে কোন এক মায়াবিনীর কবল হইতে উদ্ধার করেন—বাঙলার বাহিরে এরূপ কাহিনীও প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু বাঙলা দেশে প্রচলিত গোরক্ষনাথ ও মীননাথের কাহিনীটি যেরূপ পূর্ণাবয়ব, সুগঠিত এবং পূর্বাপর সঙ্গতিপূর্ণ, তাহাতে এ গল্পের উৎপত্তিস্থান বাঙলা দেশ, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

---

৩৩ ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, গোরক্ষনাথ পাঞ্জাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি প্রবল। কিন্তু ডঃ মোহন সিং নানা উপাদান বিচার করিয়া গোরক্ষনাথকে পূর্বাঞ্চলে আবির্ভূত বলিয়াছেন (হিন্দী বিশ্বকোষ—'গোরক্ষনাথ' প্রবন্ধ)। সম্প্রতি ডঃ সুকুমার সেন বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া 'গোরক্ষ বিজয়' নাটকের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাহার খণ্ডিত পুঁথিও দেখিয়াছেন। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বাঙলার বাহিরেও গোরক্ষ-মীননাথের কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছিল। দ্রষ্টব্য—শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়—বাংলার নাথসাহিত্য

৩৪ G. W. Briggs—*Gorakhnath and the Kanphata Yogis*, p. 233

৩৫ ডঃ কল্যাণী মল্লিকের 'নাথ সম্প্রদায় ও সাহিত্য' দ্রষ্টব্য

বাঙলা দেশের গোরক্ষনাথ-মীননাথের আখ্যানটি একদা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, এখনও যুগী-সম্প্রদায়ের ভিখারিগণ এই আখ্যান ও তত্ত্বকথা গাহিয়া থাকে। কাহিনীটিতে গুরু মীননাথ অপেক্ষা শিষ্য গোরক্ষনাথের গৌরবই অধিকতর প্রচারিত হইয়াছে, গোরক্ষনাথ নিজ গুরু মীননাথকে ভ্রষ্টাচার হইতে রক্ষা করিয়া পুনরায় যোগানুশীলনের মধ্যে ফিরাইয়া আনেন, ললামভূতা প্রকৃতির মায়াপাশ, যাহা নারীরূপে আসিয়া সাধককে ভ্রষ্ট করে, তাহা হইতে তিনি গুরু মীননাথকে রক্ষা করেন। তাই এই কাব্য একাধারে গোরক্ষবিজয় ও মীনচেতন। গোরক্ষনাথ আত্মবিস্মৃত মীননাথের মনে আত্মচৈতন্য পুনর্জাগ্রত করিয়া গুরুকে যোগমার্গে ফিরাইয়া আনেন। তাই ইহাতে গুরু অপেক্ষা শিষ্যের গৌরব অধিকতর প্রচার লাভ করিয়াছে।

নিরঞ্জনের মুখ হইতে যোগীরূপে শিব, নাভি হইতে মীননাথ, হাড় হইতে হাড়িপা (জালন্ধরিপা) কর্ণ হইতে কানিফা (কানুপা) এবং জটা হইতে গোর্খনাথ জন্মিলেন। নিরঞ্জনের সর্বশরীর হইতে জন্মিলেন গৌরী। নিরঞ্জনের নির্দেশে শিব গৌরীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিলেন। পরে মীননাথ হাড়িপা মহাদেবের, গোরক্ষনাথ মীননাথের এবং কানুপা হাড়িপার শিষ্য হইলেন এবং যোগাভ্যাসে রত হইলেন। একদা গৌরী শিবকে প্রশ্ন করিলেন, "তুহ্মি কেনে তর গোঁসাই আহ্মি কেনে মরি?" তখন মহাদেব গুহ্যাতিগুহ্য গূঢ় যোগশাস্ত্রকথা দেবীকে গোপনে বুঝাইবার জন্য ক্ষীরোদ সাগরের জলটুঙ্গি ঘরে গিয়া তত্ত্বকথা বলিতে লাগিলেন। বোধ হয় অন্য চারিসিদ্ধা তখনও যোগশাস্ত্রের নিগূঢ় কথা 'মহাজ্ঞান' শিবের নিকট শিখিতে পারেন নাই—মীননাথও পারেন নাই। তাই মীন গোপনে 'মহাজ্ঞান' শিখিবার জন্য মহাদেবের অজ্ঞাতসারে জলটুঙ্গির তলে জলের মধ্যে মীনরূপে থাকিয়া ফাঁকি দিয়া হরগৌরীর কথোপকথন শুনিয়া লইলেন। দেবী ইতিমধ্যে নিদ্রাবিষ্ট হইয়া কিছুই শুনিতে পান নাই। জলটুঙ্গির তলা হইতে মীননাথ 'হাঁ' 'হুঁ' দিয়া সুকৌশলে মহাদেবের মুখনিঃসৃত মহাজ্ঞান শিখিয়া লইলেন। কিন্তু অচিরে মহাদেব এই বঞ্চনা ধরিয়া ফেলিলেন এবং মীননাথকে শাপ দিলেন, "এককালে হউক বিস্মরণ"। যাহা হউক মহাদেব সস্ত্রীক কৈলাসে গৃহবাসে চলিয়া গেলেন, পূর্বদেশে গেলেন হাড়িপা বা জালন্ধরিপাদ, দক্ষিণে কানুপা,

পশ্চিমে গোরক্ষনাথ এবং উত্তরে মীননাথ। একদিন গৌরী শিবকে বলিলেন, তোমার শিষ্যদের ঘর-সংসারী না করিলে পৃথিবী রক্ষা পাইবে কি প্রকারে? মহাদেব বলিলেন, তাঁহার যোগী-শিষ্যেরা জিতেন্দ্রিয় কামক্রোধাদিবর্জিত। সুতরাং তাঁহাদিগকে বিবাহ দিয়া ঘর-সংসারী করা অসম্ভব। দেবী বলিলেন, পুরুষের মন বশ করা নারীর পক্ষে কি এতই কঠিন? কারণ "কটাক্ষে ছলিতে পারি সে সবার মন।" পরীক্ষা করিবার জন্য শিব ধ্যানস্থ হইয়া চারি সিদ্ধাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শিবানী আমন্ত্রিত শিষ্যদের অন্ন পরিবেশন করিতেছেন। আহার কালে দেবীর ছলনায় তিনজন শিষ্যই আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। মীননাথ ভাবিলেন, এমন সুন্দরী স্ত্রী পাইলে "রঙ্গ-কৌতুকে তবে রজনি গোঞাই"। দেবী অভিশাপ দিলেন, কদলীর দেশে (স্ত্রীরাজ্য) গিয়া ষোলশ' কদলী লইয়া বাস কর। হাড়িপা ভাবিলেন, যদি এমন সুন্দরী পাই, "হাড়িকর্ম করি যদি থাকি তার পাশ।" দেবী তাঁহাকেও শাপ দিলেন, যাও—রাণী ময়নামতীর কাছে গিয়া কোদাল ঝুড়ি লইয়া হাড়ির কর্মই কর। কানুপা ভাবিলেন, এমন স্ত্রী পাইলে মৃত্যুতেও আপত্তি নাই। দেবী বলিলেন, তুমি ডাহুকের দেশে চলিয়া যাও, সেখানে যাইয়া বধূ লইয়া ক্রীড়া কর। তখন কানুপা মনে মনে ভাবিলেন, এমন স্ত্রী পাইলে, আমার হাত পা কাটা গেলেও শালবান রাজার ছেলে হইতে রাজি আছি। তাহা বুঝিতে পারিয়া দেবী বলিলেন, "সংমাএ ভজিব তুহ্মি দেখিয়া জোয়ান।" তজ্জন্য প্রচুর অপমান পাইবে। পরিশেষে যতিশ্রেষ্ঠ গোরক্ষনাথ দেবীকে দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, আমার যদি এরূপ জননী থাকিতেন, তাহা হইলে "তাহার কোলেতে বসি সুখে দুগ্ধ খাই।" যে মা ঘৃণাবিরহিত হইয়া সন্তানকে পালন করেন, আমি সেই মায়ের স্নেহলাভ করিতে চাই :

তবে ভাবিলেক মনে গোর্খ করি সার।
এমত জননী যদি থাকএ আমার ॥
তাহার কোলেতে বসি সুখে দুগ্ধ খাই।
এমত জননী যদি কভু আমি পাই ॥
মলমূত্র সহিয়া যদি পালে কাখে কোলে।
তার স্তনের দুগ্ধ খাইয়া থাকি কুতুহলে ॥

দেবী আদিরসের ফাঁদ পাতিয়া জ্যেষ্ঠ মীননাথ হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠ কানুপা বা গাভুর সিদ্ধাকে লূতাতন্তুপাশে-বদ্ধ মক্ষিকার মতোই ধরিয়া

ফেলিলেন। কিন্তু গোরক্ষনাথের নিকট তাঁহার ছলাকলার পরাজয় হইল। গোরক্ষ ছলনাময়ী আদ্যাসুন্দরীকে মাতৃভাবে দেখিলেন।[৩৬] কিন্তু তখনও তাঁহার পরীক্ষা শেষ হয় নাই, ভয়ানক বিপজ্জনক পরীক্ষা বাকি। দেবী পথিমধ্যে বিবস্ত্রা হইয়া লালসাময়ীরূপে শায়িত রহিলেন। ভাবিলেন, আত্মার জয়, না দেহের জয়—দেখা যাক। দেবীকে সেই অসম্বৃত অবস্থায় দেখিয়া গোরক্ষনাথ ভাবিলেন—"অতিবড় লঘু বেটি কি কর্ম করিল।" এই বলিয়া বিবস্ত্রা ও অত্রপা দেবীকে বৃক্ষপত্রের দ্বারা আবৃত করিলেন। দেবী লজ্জিত ও পরাস্ত হইয়া গোরক্ষকে শাস্তি দিবার জন্য তাঁহার উদরে মাছিরূপে প্রবেশ করিলেন। তাহা বুঝিতে পারিয়া গোরক্ষনাথ যোগবলে দশমী দুয়ার বন্ধ করিলেন, তাহাতে দেবীর প্রাণ যায়-যায় হইল। তখন বাহির হইবার জন্য তিনি কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন। গোরক্ষনাথ পার্বতীকে খুব জব্দ করিয়া তারপর বাহির করিয়া দিলেন, কিন্তু বাহির হইবার সময় দেবীর কাঁকাল ভাঙিয়া গেল। তিনি সেই অবস্থায় রাক্ষসীর আকার ধরিয়া পথে পড়িয়া রহিলেন এবং প্রতিদিন একটি করিয়া মনুষ্য আহার করিতে লাগিলেন। এদিকে শিব নিজ ঘরণীকে না পাইয়া গোরক্ষকে পথে ধরিলেন, "কথা গেল মোর নারী তুমি কি করিলা।" যাহা হউক গোরক্ষনাথ দেবীকে রাক্ষসীরূপ হইতে মুক্তি দিলেন। ইতিমধ্যে গর্ভেশ্বর রাজার কন্যা স্বামী লাভের জন্য সুকঠোর তপস্যা করিতেছে জানিয়া শিব ভাবিলেন, গোরক্ষনাথ দুর্গার বড় অপমান করিয়াছে, এই বালিকার সঙ্গে গোরক্ষের বিবাহের ব্যবস্থা করিতে পারিলে এই অপমানের কিঞ্চিৎ শোধ লওয়া যাইবে। বালিকাকে তিনি যতি গোরক্ষনাথের স্ত্রী হইবার বর দিলেন। শিবের নির্দেশে গোরক্ষনাথ সেই বালিকার স্বামী হইলেন বটে, কিন্তু শিশুর রূপ ধরিয়া দুগ্ধ খাইবার জন্য ওয়া-ওয়া করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।[৩৭] তাঁহার বালিকাপত্নী

৩৬ এই বিষয়ে কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয় চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন: "বৈরাগ্যের মহাশত্রু মহামায়া। তিনি মায়ায় মুগ্ধ করিয়া জীবকে লালন করেন, এবং তাহার দ্বারা সৃষ্টি রক্ষা করেন। মীননাথ মহামায়ার ছলনায় ভুলিলেন।......মহামায়ার মোহিনীমূর্তি দেখিয়া গোরক্ষনাথের মনে হইল, এমন জননী পাইলে 'তাহার কোলেতে বসিয়া সুখে দুগ্ধ খাই।' মহামায়া মোহিনী মূর্তিতে সকলকেই মোহিত করিতে আসেন, যে মা বলিয়া তাঁহার চরণে শরণ লয়, সেই বাঁচিয়া যায়।" (প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, ৩য় খণ্ড)

৩৭ গোরক্ষনাথ একটু বেশী পরিমাণে দুগ্ধপোষ্য ছিলেন! পার্বতীকে দেখিয়াও তিনি দুগ্ধ পান করিতে চাহিয়াছিলেন।

এই ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলে গোরক্ষনাথ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে, তিনি যোগী, অতএব তাঁহার যোগপূত রসশুষ্ক তনুতে স্ত্রীলোকের কোন লাভ নাই। স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় তিনি বলিয়া গেলেন, আমার কর্পটী (কৌপীন) ধুইয়া পান করিলে তোমার পুত্র হইবে। বধূ তৎক্ষণাৎ কর্পটী ধোওয়া জল পান করিয়া গর্ভবতী হইলেন এবং "দশদণ্ড পশ্চাতে ছাওয়াল জন্মিল।" গোরক্ষনাথ এই পুত্রের নাম রাখিলেন কর্পটীনাথ। তারপর তিনি স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়া বকুল তলে যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন কানুপার সাক্ষাৎ পাইলেন। হাড়িপার শিষ্য কানুপা মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথকে মীননাথের কদলীরাজ্যে গিয়া অধঃপতনের কথা বলিলেন, এবং মীননাথকে উদ্ধার করিবার জন্য গোরক্ষনাথকে অনুরোধ করিলেন। গোরক্ষও কানুপাকে তাঁহার গুরুর (হাড়িপা) পরিচয় দিয়া বলিলেন, তোমার গুরু হাড়িপাও খুব একটা ভালো অবস্থায় নাই। মেহেরকুলের ময়নামতী নাম্নী এক ডাকিনীর নিকট বাস করিবার কালে হাড়িপাকে ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্র মাটির তলে পুঁতিয়া রাখিয়াছে। এই কথা শুনিয়া কানুপা মেহেরকুলে গিয়া বন্দী গুরুকে মৃত্তিকার তলা হইতে উদ্ধার করিলেন। সে কাহিনী গোপীনাথের গানে বিবৃত হইয়াছে।

অতঃপর গোরক্ষনাথ ষোল শত কদলী-রমণীদের হাত হইতে গুরুকে উদ্ধার করিয়া আত্মজ্ঞানে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য সেই দেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, গুরু নারীসঙ্গে বাস করিয়া যোগতনু নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন, একটি সন্তান (বিন্দুনাথ) হইয়াছে—তাঁহার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই। তখন গোরক্ষ নারীর ছদ্মবেশে গুরুর কাছে উপস্থিত হইয়া মাদলে ঘা দিয়া নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। কিন্তু গুরু কিছুতেই প্রবুদ্ধ হন না, পঙ্কলিপ্ত কামসরোবরের তলদেশে ডুবিয়া রহিয়াছেন। যাহা হউক গোরক্ষনাথ যোগশাস্ত্রের কায়াসাধন ('নাদবিন্দু সাধনা') সম্বন্ধে গূঢ় কথা গানের সাহায্যে গুরুকে ইঙ্গিত দিতে লাগিলেন, বার বার মাদলে ঘা দিয়া বলিলেন, "কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলেতে বোলে।" তাঁহার মূল বক্তব্য—যোগশাস্ত্রে, বিশেষতঃ হঠযোগশাস্ত্রে বিন্দুধারণ বা বিপরীতে বিন্দুসঞ্চরণ মোক্ষের একমাত্র উপায় বলা হইয়াছে, কিন্তু গুরু সেই অমূল্য সম্পদ নষ্ট করিয়া 'মহাজ্ঞান' হারাইয়া "ষোল শত কদলী লৈয়া কৈলা গাভুরালি।"

আপনার ধন দিয়া কর কৈলা খালি।
আছিল যতেক ধন সব দিলা ডালি ॥
প্রদীপ নিবিলে গুরু কি করিব তৈলে।
আইল বান্ধি ফল নাই জল শুখাই গেলে ॥

কৌশলে তিনি গুরুকে 'চারিচন্দ্র'[৩৮] সাধনার কথা বলিলেন, উল্টা যোগের কথা বলিলেন.[৩৯] ক্রমে গুরু মীননাথ প্রবুদ্ধ হইলেন। কিন্তু বার বার যোগ-সাধনে অক্ষমতা জানাইতে লাগিলেন, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন—কি করিয়া এই যোগরহস্য সাধন করিবেন? দুঃখের সঙ্গে শিষ্যকে বলিলেন, মৃত্যুকালে তোমাকে দেখিলাম, বড় আশ্বস্ত হইয়াছি। শুধু গাভুরের (কানুপা) মুখ দেখিলাম না, এই বড় দুঃখ। "আমি মৈলে তুমি আসি দিয় মোরে মাটি।" তবু গোরক্ষনাথ আত্মবিস্মৃত গুরুর মনে মহাজ্ঞান স্মরণ করাইতে চাহিলেন। তখন গোরক্ষ অনেকগুলি প্রহেলিকা[৪০] আবৃত্তি করিয়া যোগাচার ব্যাখ্যা করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ উল্টাসাধনপদ্ধতি অবলম্বন করিতে ও পবন বিজয় করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলিতে লাগিলেন। পরে মীননাথের মনে মহাজ্ঞান লাভের বাসনা উদিত হইলে কদলী-যুবতীগণ বিন্দুনাথকে কোলে করিয়া আনিয়া মীননাথের মন আবার ব্যাকুল ও চঞ্চল করিয়া তুলিল। তখন

---

৩৮ গুরু চারিচন্দ্র হয়ে শরীর ব্যাপিয়া রয়ে
তাহার সাধিলে পরিত্রাণ।

যোগীসমাজ, সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউল সমাজে চারিচন্দ্র সাধনার (মলমূত্র ও রজোবীর্য) কথ প্রচারিত আছে।

৩৯ উলটিয়া ধর আপনা ত্রিবেণীতে দেয় হানা
খালে জল ভরিতে কারণ।

এই উল্টাসাধনপদ্ধতি ও 'ত্রিবেণী'র পারিভাষিক তাৎপর্যের জন্য ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের *Obscure Religious Cults as the Background of Bengali Literature* এবং ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলার বাউল ও 'বাউল গান' দ্রষ্টব্য।

৪০ পুকুরেতে জল নাই পাড় কেনে বোড়ে।
বাসার মধ্যে ছাও থুই আড়ি-মুড়া করে ॥
নগরে মনুষ্য নাই ঘর চালে চালে।
আন্ধলে দোকান দেয় খরিদ করে কালে ॥

কদলীর মায়া হইতে গুরুকে রক্ষা করিবার জন্য গোরক্ষ গুরুপুত্র বিন্দুনাথকে মারিয়া ফেলিলেন। কদলী রমণীগণ ও গুরু পুত্রশোকে ব্যাকুল হইলে গোরক্ষ আবার গুরুপুত্রকে বাঁচাইয়া দিলেন। অতঃপর কদলীর মায়া হইতে গুরুকে রক্ষা করিবার জন্য কদলী রমণীদিগকে বাদুড়ে রূপান্তরিত করিয়া উড়াইয়া দিলেন :

কদলী সকল গেল মীননাথ এড়ি।
উড়িল কদলী সব শূন্য হইল পুরী ॥

মীননাথের যৌবনস্বপ্ন ভাঙিয়া গেল—"স্বপ্ন হতে মীন যেন উঠিল জাগিয়া"। মায়াপাশবদ্ধ মীননাথ শিষ্যের সাহায্যে পুনর্বার যতিজীবনে ফিরিয়া গেলেন, বিস্মৃত আত্মজ্ঞান আবার ফিরিয়া আসিল, পুত্র বিন্দুনাথ যোগী-সন্ন্যাসী হইল।

গোরক্ষবিজয়ের কাহিনী, চরিত্র ও তত্ত্বকথার উচ্চপ্রশংসা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং এখন সমালোচকদের মধ্যে এই ধারণা একপ্রকার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। দীনেশচন্দ্র প্রমুখ প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহাসিক-গবেষকগণ নানা প্রসঙ্গে নাথসাহিত্যের, বিশেষতঃ গোরক্ষবিজয়ের গুণ-ব্যাখ্যানে পঞ্চমুখ হইয়াছেন।[৪১] গোরক্ষবিজয়ের কাহিনী উচ্চস্তরের সন্দেহ নাই। ভ্রষ্টাচার গুরুকে উদ্ধার করিবার জন্য একনিষ্ঠ শিষ্যের আপ্রাণ চেষ্টা—ইহা সব দেশেই শ্রদ্ধালাভ করিবে। বিষয়টি একটু বিচিত্র বটে। সাধারণতঃ অধঃপতিত শিষ্যকেই গুরু উদ্ধার করিয়া থাকেন, কিন্তু এখানে

---

৪১ দীনেশচন্দ্রের মতে, "গোরক্ষ বিজয়ের মত এরূপ অপূর্ব গ্রন্থ যে বঙ্গসাহিত্যের আদি যুগে রচিত হইয়াছিল ইহা আমাদের গৌরবের কথা। গোরক্ষযোগীর চরিত্র শরৎ শেফালিকা বা যূথিকার ন্যায় শুভ্র...।" (ব. ভা. সা.) ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন, "Bengali Literary traditions make him the purest and strongest of all Yogins" (*Obscure Religious Cults* etc.) ডঃ সুকুমার সেনের অভিমতটিও লক্ষণীয়, "গোরক্ষ বিজয়ের মূল ভাবটি—জীবন্মুক্ত শিষ্য কর্তৃক মোহমুগ্ধ গুরুকে চৈতন্যদান—বড় মহনীয়। সর্ব ভূমিক সাহিত্যে বাঙ্গালার একটি বিশিষ্ট এই কাহিনীটি" (বা. সা. ইতি. ১ম, পরার্ধ)। আর একস্থলে এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "এই যে বিপরীতমুখী বৃত্তি—সিদ্ধ গুরুকে শিষ্য শিখাইতেছেন এবং রাজারাণী পুত্রকে সন্ন্যাস লওয়াইতেছেন—ইহাই নাথ সিদ্ধ কাহিনীকে মহিমান্বিত করিয়াছে। বস্তুতঃ সমগ্র পুরানো বাঙ্গলা সাহিত্যে এমন মহনীয় কাহিনী আর নাই, এবং বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসেও ইহা অদ্বিতীয় বলিয়া মনে করি।" (ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'গোর্খ বিজয়ের' ভূমিকায় লিখিত 'নাথপন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য' দ্রষ্টব্য) আধুনিক গবেষকদের মধ্যে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় 'বাংলার নাথসাহিত্যে' গোরক্ষ নাথের চরিত্র ও কাহিনীর উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

তাহার বিপরীত ব্যাপারটাই লক্ষ্য করা যাইবে। মীননাথ প্রথম হইতেই সহজ পথের পথিক, শিবকে ফাঁকি দিয়া মহাজ্ঞান আদায় করিয়া লওয়ার কাহিনীতেই তাহা বুঝা যাইবে; তাঁহার পক্ষে তাই গৌরীর ছলনাকে বাধা দেওয়া সম্ভব হয় নাই, এবং অতি সহজে তিনি মহাজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া ও যোগীর আদর্শ ভুলিয়া ষোল শত স্ত্রীলোক লইয়া পুরাদস্তুর ঘরসংসারী হইয়াছেন। গোরক্ষের নৃত্যগীতের প্রচ্ছন্ন উপদেশে যখন তাঁহার পূর্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিল, তখনও তিনি বৃদ্ধ বয়স ও অশক্ত দেহের দোহাই দিয়া যোগপন্থা গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। যদিও-বা শিষ্যের ভর্ৎসনায় তাঁহার মনে সংসার ত্যাগের বাসনা যৎসামান্য জাগিয়া উঠে, কিন্তু কদলী রমণীগণ যখন তাঁহার নিকট কাঁদিয়া পড়িল, এবং তাঁহার কোলে পুত্র বিন্দুনাথকে অর্পণ করিল, তখন তাঁহার মন আবার ঘুরিয়া গেল, সংসার না ছাড়িবার অভিপ্রায়ে তিনি কুযুক্তির আশ্রয় লইলেন। পরিশেষে শিষ্য তাঁহার সংসার-বাসনা সমূলে ভস্ম করিবার জন্য পুত্র বিন্দুনাথকে মারিয়া ফেলিলেন এবং ষোল শত কদলী-রমণীকে বাদুড় করিয়া উড়াইয়া দিলেন। বিন্দুনাথ বাঁচিয়া উঠিল, কিন্তু বাদুড়ের দল আর ফিরিল না; তখন শূন্য পুরীতে মীননাথ আর কি করিবেন? যেন স্বপ্ন ভঙ্গের পর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শিষ্যনির্দিষ্ট পথে চলিলেন, পুত্রও যোগপন্থা গ্রহণ করিল।

মীননাথের চরিত্রটি যেন বাস্তব মায়াপাশবদ্ধ দেহ-দুর্বল মানুষের প্রতীক। মানুষ দেহের আক্রমণ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিতে পারে না, যোগপন্থ সাধকও ছলনাময়ী প্রকৃতির প্রতীক নারীর কটাক্ষে ধ্যান-জ্ঞান, মুক্তি-মোক্ষ ধূলায় ফেলিয়া প্রাকৃত সংসারে এমনভাবে লিপ্ত হইয়া পড়েন যে, যোগধ্যান কিছুই আর স্মরণে থাকে না। তখন গোরক্ষনাথের মতোই উপযুক্ত শিষ্য গুরুর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন, বিস্মৃত গুরুর মায়াবরণ ছিঁড়িয়া তাঁহার স্ব-ভাবকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করেন। এই দিক দিয়া গুরু মীননাথ হইয়াছেন বাস্তব চরিত্র, আর গোরক্ষনাথ কুটিল প্রকৃতির কটাক্ষকে উপেক্ষা করিয়া আত্মার জয় ঘোষণা করিয়াছেন। যেখানে তিনি বুঝিয়াছেন, সংঘাতের মধ্য দিয়া ছলনাময়ীকে জয় করা যাইবে না, সেখানে তাহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া তাহার বিষদাঁত ভাঙিয়া দিয়াছেন। এই দিক দিয়া প্রাচীন বাঙলার অশিক্ষিত গ্রাম্য কবি শেখ ফয়জুল্লা, ভীমদাস সেন,

কবীন্দ্র, ভবানীদাস প্রভৃতি গায়কগণ উচ্চতম চরিত্রধর্ম ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। মহাদেব, পার্বতী, গোরক্ষনাথ, মীননাথ, কদলী রমণীগণ, গোরক্ষনাথের পত্নী (যাঁহাকে তিনি মাতৃভাবে দেখিয়াছিলেন) প্রভৃতি চরিত্রগুলি ও সাধনভজন-সংক্রান্ত আখ্যান-কাব্যের কাহিনী অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান যোগীসমাজেই প্রচার লাভ করিয়াছিল। রচনাকার ও শ্রোতৃমণ্ডলী শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অনগ্রসর হইলেও উল্লিখিত চরিত্রগুলি যে এক একটি বিশেষ গুণ ও ভাবের প্রতীকে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এ যেন বাস্তব জীবনের সঙ্গে আদর্শান্বিত জীবনের, ভোগ-সুখময় জীবনের সঙ্গে যোগক্ষেম-জীবনের, দেহের সঙ্গে বৈদেহী চেতনার, স্নেহ-ভালবাসার মায়াবী জগতের সঙ্গে মায়ামমতাহীন নিঃস্পৃহ মুমুক্ষু জীবনের প্রচণ্ড সংগ্রাম, বেনিয়নের *Pilgrim's Progress*-এর যাত্রীটির মতো আত্মিক জয় লাভই এই কাব্য ও চরিত্রের মূল লক্ষ্য।

এই আখ্যানের মধ্যে নাটক ও মহাকাব্যের বীজ থাকিলেও, কবিদের মানসিক পরিবেশের সঙ্কীর্ণতা এবং শ্রোতৃসমাজের সাংস্কৃতিক জড়তার জন্য উচ্চ ভাবাদর্শ সার্থক কাব্যে পরিণত হইতে পারে নাই। এত উচ্চভাব ও আদর্শ অনেক সময় কৃষক পরিবার ও কৃষাণ কবিদের কল্পনাকে যথার্থ উদ্দীপিত করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহারা উচ্চতর চিত্তসমুৎকর্ষের পরিচয় দিলেও চরিত্রগুলির মধ্যে সঙ্গতির যোগসূত্রটি সর্বদা রক্ষা করিতে পারেন নাই—শিক্ষা-দীক্ষা ঐতিহ্যের অভাবই তাহার কারণ বলিয়া মনে হয়। পার্বতী কর্তৃক শিষ্যদের ছলনার দৃশ্যটি যদিও কথঞ্চিৎ সহ্য করা যায়, কিন্তু তার পরের দৃশ্যে গোরক্ষনাথের প্রতি দেবী পার্বতীর বিলজ্জ ও জুগুপ্‌সিত ব্যবহার, শুধু নীতি আদর্শের মাপকাঠিতে নহে, সাহিত্য ও শিল্প বিচারেও অপ্রাসঙ্গিক, অন্যায় ও কুরুচিপূর্ণ মনে হইবে। যতি গোরক্ষনাথ যখন দেবীকে দেখিয়া মা বলিয়া গ্রহণ করিলেন, সেখানেই কবিগণ কল্পনার রাশ টানিতে পারিতেন, তাহা হইলে সঙ্গতিও বজায় থাকিত। কিন্তু গোরক্ষের তুষারকঠিন চরিত্রের আরও উজ্জ্বল পরিচয় দিবার জন্য তাঁহারা দেবী কর্তৃক ছলনায় আয়োজন করিলেন —ইহাতে গ্রাম্য, অশিক্ষিত ও অমার্জিত রুচিই জয়ী হইয়াছে। গোরক্ষ দেবীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য যাহা করিলেন, তাহা অসুচার্য, প্রাকৃত

জনোচিত নীচকর্ম বলিয়া সাধারণ পাঠকও তাহাতে বিতৃষ্ণা বোধ করিবেন। শিবচরিত্রও উল্লেখযোগ্য নহে। আসল কথা, যোগীসমাজ প্রধানতঃ ব্যক্তিগত মোক্ষাভিপ্রয়াসী ছিলেন এবং তাহার জন্য একপ্রকার সুকঠোর যম-নিয়মের শাসনে দেহভাণ্ডের সিদ্ধ আধারে হাতে হাতে মোক্ষ-মুক্তি ভোগ করিতেন। ঈশ্বর নহে, ব্রহ্ম নহে,—সাধকের মনপ্রাণবিজয়ী অচঞ্চল চিত্ত ও যোগপূত পঞ্চদেহের মধ্যেই মোক্ষ উপলব্ধি—ইহাই যোগী-সমাজের উদ্দেশ্য। এই হিসাবে তাঁহারা আত্মপন্থী ও মোক্ষবাদী—ঈশ্বরপন্থী নহেন। তাঁহাদের আদিগুরু শিবও শ্রেষ্ঠযোগী মাত্র—ব্রহ্ম বা ঈশ্বরস্বরূপ নহেন।

যোগীদের মধ্যে একদল নারীকে ছলনাময়ী প্রকৃতির স্বর্ণশৃঙ্খল মনে করিয়া সর্বদা তাহার সান্নিধ্য হইতে দূরে অবস্থান করিতেন, এবং স্ত্রীলোককে নরকের দ্বারস্বরূপ ও যোগস্থ চেতনা হইতে অধঃপতনের প্রধান কারণ বলিয়া মনে করিতেন। তাই তাঁহারা একান্তভাবে ছিলেন নারীবিদ্বেষী। গোরক্ষনাথকে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য সুকঠিন সুতাক্ষ্ণ 'ক্ষুরস্য ধারা'র উপর দিয়া যাইতে হইয়াছে। নারীর প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা ছিল বলিয়া ইঁহারা আদিগুরু শিব ও গুরুপত্নী শিবানীকেও খুব শ্রদ্ধা করিতে পারেন নাই। গোরক্ষনাথ তো পার্বতীকে রাক্ষসীতে পরিণত করিয়াছিলেন। শিবকেও মাদকসেবী বলিয়া গালি দিয়াছেন :

> ভাঙ ধুতুরা খাও কি বলিব তোরে।
> কথাত হারাইয়াছ নারী ধর আসি মোরে॥

অবশ্য একথা ঠিক যে, যোগীসমাজে একদল নারীবিমুখ সাধক নারীকে ছলনা-ময়ী জানিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিয়া সাধনা করেন। পুরুষযোগীর অধঃপতনের কারণ নারী, তাহা মীননাথ, হাড়িপা, গাভুর সিদ্ধা বা কানুপার সাময়িক অধঃপতনের দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে। গোরক্ষ-বৃত্তের মধ্যে তাহার বিবরণ দেখা যায়। মনে হয় একদল যোগীসম্প্রদায়, যাঁহাদিগকে ডঃ সুকুমার সেন 'অবধূত যোগীসম্প্রদায়'[৪২] বলিয়াছেন (ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত গোর্খবিজয়ের ভূমিকা), তাঁহারা সর্বপ্রকারে নারীসঙ্গ বর্জন করিয়া সাধনা

৪২ নাথ ধর্মে ছয় প্রকার সন্ন্যাস স্বীকৃত হইয়াছে :—(১) কুটিচক, (২) বহূদক, (৩) হংস, (৪) পরমহংস, (৫) তুরীয়াতীত, (৬) অবধূত। 'গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে' এই ছয় প্রকার সম্প্রদায়ের মধ্যে 'অবধূত' পন্থাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

করিতেন। কারণ যোগপন্থায় 'বিন্দু ধারণ'-ই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, এই পন্থাই দেহের মধ্যে পরামুক্তি আনয়ন করে। কিন্তু নারীর সাহচর্যে বিন্দু-ধারণ কোনও প্রকারে সম্ভব নহে। অতএব এই অবধূত মার্গীয় পন্থায় নারী বিষবৎ পরিত্যাজ্য। কিন্তু মীননাথ-হাড়িপা-কানুপার কাহিনীতে নারী-সংস্পর্শের ইঙ্গিত আছে। তাহা হইলে যোগপন্থায় বোধহয় কাপালিকদের মতো তন্ত্রের প্রভাবে নারী-সাহচর্যজনিত আর একটি পন্থা নির্দিষ্ট হইয়াছিল—ইহাকে ডঃ সেন বলিয়াছেন কাপালিক যোগী। ডঃ সেনের এই অভিমত অংশতঃ যথার্থ। তবে কৌলশাস্ত্র বা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রভাব যোগপন্থায় বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছিল।[৪৩] এই শেষোক্ত যোগী-সম্প্রদায়ই শৈব মতের সঙ্গে এতটা অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া গিয়াছিল যে, কেহ কেহ সমস্ত যোগীসম্প্রদায়কে শৈব বলিতে চাহেন। কিন্তু একমাত্র কুলা-চারপন্থী বিশুদ্ধ তান্ত্রিক যোগীরাই শৈব, গোরক্ষপন্থীরা নহে। গোরক্ষপন্থীরা আদিগুরু শিবের প্রতি বড় একটা শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। তবে নাথ সাহিত্যে এই তান্ত্রিক শৈব পন্থা বা কাপালিক পন্থা স্বীকৃত হয় নাই। যাহা হউক, কাহিনী ও চরিত্রগুলি উপযুক্ত প্রতিভাধর কবির সংস্পর্শে আসে নাই বলিয়া ইহার মধ্যে লোকজীবন ও লোকসাহিত্যের কিছু কিছু স্পর্শ রহিয়া গিয়াছে, উচ্চতম চরিত্রাদর্শ ও জুগুপ্‌সিত বর্ণনা অবিরোধে ইহাতে পাশাপাশি ঠাঁই পাইয়াছে।

ইহা মূলতঃ যোগপন্থার গ্রন্থ; গোরক্ষনাথ ও মীননাথের কথোপকথনের মধ্য দিয়া গোরক্ষপন্থী যোগীদের গুহ্যতত্ত্ব, কোথাও খোলাখুলিভাবে, কোথাও-বা আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে। অপক্ক দেহকে কি করিয়া যোগদেহে পরিণত করিতে হইবে, কেমন করিয়া মোক্ষ বা মুক্তিলাভ করিতে হইবে, মরদেহের মধ্যে অমর হইতে হইবে, সেই সমস্ত গুহ্যাতিগুহ্য মহাজ্ঞানের কথা গোরক্ষ নিজ গুরু মীননাথকে শুনাইয়া প্রবুদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। এই মতের মূল আদর্শ 'মহারস' সংরক্ষণ (বিন্দুধারণ) ও উল্টাসাধন। এই তত্ত্বটি অতি প্রাচীন যুগ হইতে প্রকাশ্যে বা গোপনে ভারতবর্ষীয় সমাজে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। জড়দেহকে অজড়স্বভাব ও অমর করিবার জন্য এই প্রকার দেহমানসিক চর্যা তন্ত্রে স্বীকৃত ও ব্যাখ্যাত

---

[৪৩] Dr. Prabodh Ch. Bagchi—*Kaula Jnana Nirnaya*

হইয়াছে। তাহাই কখনও ব্রাহ্মণ্যমত, কখনও বৌদ্ধমত, কখনও সুফীমত, কখনও-বা যোগীমতে গৃহীত হইয়াছে। বিন্দুধারণের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে—যোগে পরবর্তী কালে এই ধরণের হঠযোগসাধনা প্রবিষ্ট হয়—সমগ্র মধ্যযুগীয় ধর্ম-উপধর্ম ও সম্প্রদায়ে এই মত কিছু কিছু পরিবর্তনসহ গৃহীত হয়। খেচরীমুদ্রার দ্বারা বিন্দুধারণ সাধক নিজেই করিতে পারেন, অথবা বজ্রোলী মুদ্রার দ্বারা নারীসাহচর্যেও তাহা লাভ করা সম্ভব। এই শেষোক্ত পন্থা পরবর্তী কালের তন্ত্র, হঠযোগ, কৌলপন্থা ও সহজিয়া বৈষ্ণবসমাজে স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু গোরক্ষপন্থায় বজ্রোলীমুদ্রা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। কারণ নারীসঙ্গে মহাসাধকও 'মহারস' অবিচলিত রাখিতে পারেন না।[৪৪] বোধ হয় মীননাথের অধঃপতনের দৃষ্টান্তের দ্বারা গোরক্ষপন্থীরা পুনঃ পুনঃ তাহারই নির্দেশ দিয়াছেন।

এইরূপ গভীর তত্ত্বকথা গোরক্ষনাথ যে প্রহেলিকার রীতিতে গুরুকে শুনাইয়াছেন, তাহার রচনা গাঢ়বদ্ধ ও গূঢ় অর্থবহ। অবশ্য এই জাতীয় আচার-আচরণকে অনধিকারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সাম্প্রদায়িকগণ নানারূপ গূঢ়ার্থ ও প্রহেলিকা জাতীয় শব্দপরম্পরার দ্বারা ইহার বাহ্যিক অর্থ অজ্ঞ ও অনধিকারীর নিকট লুকাইয়া রাখিতেন। চর্যাগীতি হইতে আরম্ভ করিয়া নাথসাহিত্য, বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউলসম্প্রদায় প্রভৃতি নানা দলের মধ্য দিয়া এই প্রহেলিকার ধারা চলিয়াছিল। নাথ সাহিত্যে গোরক্ষনাথের উক্তিতে[৪৫] সেই প্রহেলিকা স্বল্পকথায় চমৎকার ফুটিয়াছে।

আখ্যানটির মূল উদ্দেশ্য যতি গোরক্ষনাথের মাহাত্ম্য ঘোষণা এবং নাথযোগী সম্প্রদায়ের কায়াসাধনতত্ত্ব ও উল্টাসাধনার রহস্য দুর্জ্ঞেয় ভাষায় ব্যাখ্যা। ফলে গ্রন্থের শেষাংশে সাধ্যসাধনার কথা গুরুতর আকার ধারণ করিয়া অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে। শিষ্য গোরক্ষনাথ গুরু মীননাথকে দুইবার যোগ-

---

৪৪ অবশ্য 'হঠযোগপ্রদীপিকা'র ১।৯৪ শ্লোকের টীকায় মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি আচার্যগণ সহজোলী ও বজ্রোলী মুদ্রাকে শ্রদ্ধা করিতেন এরূপ বর্ণনা আছে। পুরুষের বীজ এবং নারীর রজঃ—উভয়ের অচিন্ত্য যোগে (নাদবিন্দুর একতা) পুরুষ ও নারী উভয়েই পিণ্ডদেহেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, এরূপ বর্ণনা হঠযোগ ও তন্ত্র গ্রন্থাদিতে দেখা যায়।

৪৫ ময়নামতীও তাঁহার পুত্রকে সন্ন্যাস লইতে উপদেশ দিতে গিয়া এইরূপ প্রহেলিকার পদ উল্লেখ করিয়াছেন।

সাধন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং দুইবারই প্রায় একপ্রকার উপমারূপক প্রতীক ব্যবহার করিয়াছেন। ফলে বর্ণনায় পুনরাবৃত্তি দোষ ঘটিয়াছে। আজিকার দিনে পাঠক হয়তো এই কাব্য হইতে আখ্যানরস ও চরিত্রবৈশিষ্ট্য পাইতে পারেন, কিন্তু সে যুগের যোগীসমাজে ইহার তত্ত্বাংশের মর্যাদাই ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক কালের সমালোচকগণ গোরক্ষনাথের চরিত্রের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত কবির স্বভাবপটুত্ব না থাকিলে এরূপ একটি আদর্শ চরিত্রের সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারা যাইত না। দেবীর সঙ্গে গোরক্ষনাথের সংঘর্ষের অংশ বাদ দিলে চরিত্রটির উচ্চতম আদর্শ ও মহত্ত্ব এযুগের পাঠকের নিকটও বিস্ময়কর মনে হইবে। কিন্তু মীননাথের চরিত্রই অধিকতর লিপিকুশলতা দাবি করিতে পারে, এবং আধুনিক পাঠক এই চরিত্রেই মনস্তত্ত্বসঙ্গত বিকাশ, দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করিতে পারিতেন। বস্তুতঃ গোরক্ষনাথের চরিত্রটি চরিত্র হয় নাই, হইয়াছে সদ্‌গুণের সমষ্টি, আদর্শ যতিচরিত্রের অপাপবিদ্ধ প্রতীক, বহির্ঘটনার আঘাতে তাঁহার চরিত্র ক্রমেই জ্যোতির্ময় মহিমা লাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ পার্বতীর ছলনা, দ্বিতীয়তঃ, এক রাজকন্যাকে পত্নীত্বে গ্রহণ, তৃতীয়তঃ, কদলীর দেশে গিয়া নানা কৌশলে গুরুর সাক্ষাৎলাভ এবং গুরুকে প্রবুদ্ধ করা—ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁহাকে অনেক প্রলোভন, অনেক বাধা জয় করিয়া তবে গুরুকে 'ব্যাঘ্রী'দের কবল হইতে উদ্ধার করিতে হইয়াছে। কিন্তু এ সমস্ত বাধাই আসিয়াছে বাহিরের দিক হইতে; তাঁহার অন্তরের কোন সঙ্কট, কোন দুর্বলতা ইহাতে প্রকাশিত হয় নাই। পত্নীকে মাতৃসম্বোধন এবং নিজ সিদ্ধদেহকে সংসারযাত্রার, বিশেষতঃ দাম্পত্যজীবনের পক্ষে অক্ষম বলিয়া বর্ণনা, কদলীর দেশে গিয়া এক রমণীর নির্দেশে গুরু মীননাথের নিকটে যাইবার উপায় লাভ ইত্যাদি বর্ণনায় তাঁহার মনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু যে যোগিশ্রেষ্ঠ যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া মহাজ্ঞানের সাহায্যে সম্ভোগদেহকে সিদ্ধদেহ এবং সিদ্ধদেহকে দিব্যদেহে পরিণত করিয়া 'দশমী দুয়ারে তালা' দিয়াছেন, তাঁহার নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপশিখার মতো অচঞ্চল মনঃপ্রকৃতি যে জগৎপ্রপঞ্চের দ্বারা কিছুমাত্রও বিচলিত হইবে না—ইহাই স্বাভাবিক। সে দিক দিয়া নাথপন্থিগণ মাত্রাজ্ঞানের যথার্থ পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু

মীননাথের চরিত্রই রচনাকৌশলের দিক দিয়া অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে এবং ইহার মনস্তত্ত্বানুকূল ও মনোবিকলনতত্ত্বসঙ্গত একটি অতীব বিস্ময়কর পরিণতি লক্ষ্য করা যাইতেছে।

মীননাথ গোপনে ফাঁকি দিয়া মহাজ্ঞান শুনিয়া লইয়াছিলেন, এই স্থানেই তাঁহার চরিত্রের প্রথম দুর্বলতার সূচনা। শিবের পরেই তাঁহার গুরুপদবী, অথচ তিনি সাধারণ মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা হইতে মুক্ত নহেন। নিজ সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভের কঠোর পথ ত্যাগ করিয়া তিনি চাতুরীর সহজপন্থা ধরিয়াছিলেন। পরিবেশনরত পার্বতীকে দেখিয়া তিন সিদ্ধারই পদস্খলন হইয়াছিল; তন্মধ্যে তাঁহার মানসিক বিকারই চূড়ান্ত।[৪৬] তাঁহার মনের এই দিকটি অর্থাৎ কামবাসনা কদলীর দেশে গিয়া উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। নারী-সঙ্গে তাঁহার অধঃপতন যোগীসমাজের পক্ষে ভয়াবহ হইলেও তাঁহার সংসার-বাসনা মর্ত্যচেতনাকেই স্বীকৃতি দিয়াছে। গোরক্ষনাথ তাঁহাকে এই সংসার-বাসনা, বিশেষতঃ নারীসঙ্গ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মাদলে ঘা দিয়া 'কায়া সাধ, কায়া সাধ' বলিলেও মীননাথ কামকুণ্ডের বিলাসপঙ্ক কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রবুদ্ধ হইয়া তিনি বুঝিলেন যে, মায়া তাঁহাকে ভ্রষ্ট করিয়াছে, প্রকৃতি তাঁহাকে ছলনা করিয়াছে, সংসারের স্নেহপ্রেমঘটিত দুর্বলতা তাঁহার মোক্ষের পথে কাটা দিয়াছে। তবু তিনি সেই পঙ্কপল্বল হইতে উঠিতে চাহিতেছেন না, অশক্ত শরীরের দোহাই দিয়া নির্দিষ্ট যোগপন্থা পরিহার করিতে চাহিতেছেন। তখন তিনি সুবুদ্ধ; কিন্তু তখনও তাঁহার কামবাসনা কিরূপ তীব্র তাহা গোরক্ষনাথের নর্তকীর বেশ গ্রহণের কৌশল হইতেই বুঝা যাইতেছে। তিনি বহুকাল ষোল শত নারী-বেষ্টিত হইয়া আছেন, আকণ্ঠ বাসনা চরিতার্থ করিয়াছেন; তবু যেই নর্তকী-বেশী গোরক্ষনাথকে দেখিলেন, অমনি মজিয়া গিয়া বলিলেন:

এই রূপযৌবন ভুঞ্জি না কর নিফল।
আহ্লাদে ভজিয়া রূপ করহ সকল॥

---

৪৬ কহিলেক মীননাথ মনে মায়া ধরি।
জগতেও পাই যদি এমন সুন্দরী॥
বিচিত্র শয্যাতে থাকি হেন নারী লই।
রঙ্গ কৌতুকরসে রজনী পোহাই॥

আমি হেন রাজা নাই এ তিন ভুবন।
আমারে ভজিয়া কর সফল যৌবন ॥

যদিও তাঁহার "পাকিছে মাথার কেশ আয়ু হইছে শেষ" এবং "উঠিয়া বসিতে নাই শকতি", তবু এই কামাতুর অশক্ত বৃদ্ধ নটীবেশী গোরক্ষনাথকে স্ত্রীলোক মনে করিয়া বলপ্রয়োগের ভয় দেখাইলেন। অবশ্য ক্রমে ক্রমে গোরক্ষনাথের প্রহেলিকা-সঙ্গীতের সাহায্যে তাঁহার চেতনা হইল, কিন্তু তখনও তিনি কামকূপেই ডুবিয়া রহিলেন, তাহা হইতে পরিত্রাণের কোন ইচ্ছা নাই। সর্বোপরি, তাঁহার সন্তান হইয়াছে; তাহার প্রতি স্নেহবাৎসল্য তাঁহাকে আরও বেশী করিয়া ঘরসংসার আঁকড়াইয়া ধরিতে প্রেরণা জোগাইয়াছে। গোরক্ষনাথ বুঝিলেন, অশক্ত দেহের দোহাই দিয়া হয়তো বৃদ্ধের বিকৃত কামনা দূর করা যায়, কিন্তু পুত্রস্নেহের কবল হইতে কি করিয়া উদ্ধার করা যায়? তখন গোরক্ষনাথ মীননাথের পুত্র বিন্দুনাথকে মারিয়া ফেলিয়া গুরুকে প্রচণ্ড মানসিক আঘাত দিতে চাহিলেন—যদি এই আঘাতের চিকিৎসায় গুরুর ভবব্যাধি দূর হয়। পুত্রকে মৃত দেখিয়া মীননাথ যেভাবে বিলাপ করিয়াছেন,[৪৭] তাহাতে তাঁহার উপর আমাদের করুণাই হয়। মীননাথের চরিত্রের ধর্মীয় তাৎপর্য—যোগীর অধঃপতন এবং তাহা হইতে তাঁহাকে আবার যোগপথে আনয়ন—এ সমস্ত বর্ণনা সে যুগের যোগীসমাজে সাহিত্যরসের অতিরিক্ত সাধ্যসাধন-সংক্রান্ত তত্ত্বকথা রূপেই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছিল। কিন্তু আধুনিককালের পাঠকপাঠিকা এই চরিত্রে বাসনাজর্জর মানুষেরই চিত্তসঙ্কটের পরিচয় পাইবে, একটা মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ ও পরিণাম লক্ষ্য করিতে পারিবেন। অবশ্য এ সমস্ত সাহিত্য মূলতঃ ছিল ধর্মীয় সাহিত্য, এবং গুহ্য-গুহাহিত। লিখিয়াছিলেন অর্ধশিক্ষিত যোগীসম্প্রদায়—ফলে ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের যে সমস্ত সম্ভাবনা ছিল, তাহা কদাচিৎ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

---

৪৭ কোথায় গেল বিন্দুনাথ না দেখি নয়নে।
কিরূপে মারিল তরে পাপিষ্ঠ দুর্জনে ॥
রৌদ্র মধ্যে বিন্দুনাথ দেখিল শয়ানে।
মুখে মুখে দিয়া মীন করয়ে ক্রন্দনে ॥
... ...
কান্দিতে কান্দিতে মীন হইল অচেতন।
পুত্র পুত্র বলি রাজা কাটিল নয়ন ॥

কেহ কেহ 'গোরক্ষবিজয়'কে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন না,[৪৮] কারণ ইহা কোন এক-ব্যক্তির রচনা, এবং রচনার মধ্যে একটা পূর্বাপর সঙ্গতি বজায় আছে। অবশ্য পরিভাষিক অর্থে গোরক্ষবিজয়কে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা না গেলেও লোকচেতনাই ইহার উৎসভূমি ; রচনা, বর্ণনা, মন ও মেজাজের দিক দিয়া ইহাতে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যরূপের চেয়ে লোকসাহিত্যের প্রভাবই অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কারণ নাথ ধর্ম মূলতঃ যোগদর্শনের উপর ভিত্তি করিলেও ইহা অশিক্ষিত সমাজে কিয়ৎ-পরিমাণে লোককৃত্যে পরিণত হয়। তাই গোরক্ষবিজয়কে উচ্চতর কাব্য-কলা ও সাহিত্যগুণের আদর্শে বিচার করা যায় না, লোকমত এবং লোক-সমাজে প্রচলিত একপ্রকার দেহঘটিত রহস্যবাদী চর্যার পটভূমিকায় এই সমস্ত কাহিনীর পরিকল্পনা হইয়াছিল। উচ্চতর প্রতিভাযুক্ত কোন কবি এই কাহিনী অবলম্বন করিলে হয়তো উৎকৃষ্ট কাব্যগুণান্বিত গ্রন্থ পাওয়া যাইত। কিন্তু যে আকারে ইহা আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে ইহা হইতে গ্রাম্য পরিবেশ ও রুচির স্থূলতা কোনক্রমেই লোপ পায় নাই, পাওয়া সম্ভবও ছিল না। যাহা হউক, গ্রাম্য মনের পটভূমিকায় এবং অ-নাগরিক পরিবেশে পরিকল্পিত হইলেও ইহার আদর্শের মধ্যে যে একটা উচ্চতর জীবনের আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা গোরক্ষনাথের চরিত্রের দ্বারা সুপ্রমাণিত হইয়াছে।

ময়নামতী-গোপীচন্দ্র বৃত্ত ॥

নাথ সাহিত্যের আর একটি প্রধান শাখা ময়নামতী ও তাঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে (গোপীচন্দ্র) কেন্দ্র করিয়া একদা বাঙলা দেশে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল, এবং এই গল্পকাহিনী শুধু বাঙলা দেশে নহে, অল্পাধিক পরিবর্তন সহ ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। গোরক্ষমহিমাবিষয়ক কাহিনীটি আদর্শের দিক দিয়া অধিকতর উচ্চমার্গের হইলেও ইহাতে নাথ ধর্মের রীতিনীতি ও ধর্ম-তত্ত্বের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে—যাহার প্রধান লক্ষ্য—সম্প্রদায়-বিশেষের জনসাধারণ, একটি বিশেষ ধর্মচর্যার জনগোষ্ঠী। কিন্তু ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের ছড়া-পাঁচালী-গানগুলি নাথধর্মের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহার মধ্যে

---

৪৮ শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়—বাংলার নাথ সাহিত্য, পৃ. ১৫৭

অসাম্প্রদায়িক মানবরসের ধারা অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে, যাহার সঙ্গে সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকলেরই যোগাযোগ থাকিতে পারে। অবশ্য এই নাথ সাহিত্য উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য নহে, বিদগ্ধমহলে ইহার কোন প্রভাবও ছিল না। সাধারণ স্তরের লোকসাহিত্যের আদর্শেই এই সাম্প্রদায়িক ছড়া-পাঁচালী বিচার্য।

ত্রিপুরার অন্তর্গত মেহারকুলের রাজা মাণিকচন্দ্রের পত্নী নাথ ধর্মের প্রচারিকা ময়নামতী এবং পুত্র গোপীচন্দ্রের (গোবিন্দচন্দ্র) কাহিনী নাথ সাহিত্যের সুপরিচিত আখ্যান। ময়নামতীর নির্দেশে আসন্ন অকাল-মৃত্যু হইতে বাঁচিবার জন্য পুত্র গোপীচন্দ্রের নাথগুরু জালন্ধরিপাদ বা হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে গৃহত্যাগ এবং কাল উত্তীর্ণ হইলে পুনরায় দেশে ফিরিয়া সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাজ্যপরিচালনা—ইহাই ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের যাবতীয় কাহিনীর মূল আখ্যানরেখা। তরুণ বয়সে মাতার নির্দেশে পুত্রের সংসারত্যাগ অতি শোকাবহ ঘটনা; ফলে এই কাহিনী সকলেরই সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছিল। এবং এইজন্য এই কাহিনী সারা ভারতেই প্রচারলাভ করিয়াছে। বাঙলার নানাস্থানে (বিশেষতঃ রঙপুর ও ত্রিপুরায়) গোপীচন্দ্র ও ময়নামতীর স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজেন্দ্রচোল ও গোবিন্দচন্দ্রের শিলা-লিপিতে উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাকে ময়নামতীর গানের গোপীচন্দ্রের সঙ্গে মিলাইয়া দিবার জন্য ঐতিহাসিকের শিরঃপীড়ারও অন্ত নাই। গোপীচন্দ্রের কাহিনী সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে, যখন পত্রপত্রিকায় কাহিনীগুলি মুদ্রিত হইতে আরম্ভ করিল। অবশ্য অনেক পূর্ব হইতে গ্রাম্যসমাজে, বিশেষতঃ শৈব নাথপন্থী যুগীসমাজে এই গল্পকাহিনী প্রচলিত ছিল, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও লোকসাহিত্য ও লোকাভিনয়ে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল।

একথা অবশ্য সত্য যে, "বঙ্গদেশ হইতে প্রথমে পশ্চিম বিহারে, তৎপরে পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মধ্যভারত, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রদেশে গোপীচাঁদকাহিনী প্রচারিত হইতে থাকে ও রামায়ণ মহাভারতের ন্যায়ই জনপ্রিয় হইয়া উঠে।"[৩১] বাস্তবিক গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস বিষয়ক আখ্যায়িকা বা উহার সহিত সম্পৃক্ত কাহিনী সারা ভারতবর্ষেই ছড়াইয়া আছে; ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান

৩১ ডঃ কল্যাণী মল্লিক—নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী, পৃ. ৫৩

ও সাধনতত্ত্ব বাদ দিলেও এই কাহিনীর অভ্যন্তরে যে করুণরসের ধারা বহিয়া গিয়াছে, তাহাই সর্বশ্রেণীর নর-নারীর হৃদয়-মনকে দ্রবীভূত করিয়াছে।

নেপালে প্রাপ্ত 'গোপীচন্দ্র নাটকে' গোপীচন্দ্রকে বঙ্গের রাজা বলা হইয়াছে। পাঞ্জাবে গোপীচাঁদ সম্পর্কে যে কাহিনী প্রচলিত আছে (রিচার্ড কার্নাক্ সংগৃহীত), তাহাতে তাঁহাকে উজ্জয়িনীর রাজা বলা হইয়াছে। মাতা ময়নামতীর বিবাহ হয় গৌড়বঙ্গে। রাজা ভর্তৃহরি তাঁহার ভ্রাতা। গোরক্ষনাথের গৌরবসূচক 'পিঙ্গল' কাহিনীতে আছে যে, ভর্তৃহরি গোরক্ষনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার বরেই রাজা মাণিকচাঁদের মৃত্যুর আঠারো মাস পরে ময়নামতীর একটি পুত্র জন্মলাভ করে—তিনিই গোপীচাঁদ—বাঙলার নহেন, উজ্জয়িনীর রাজা। তাঁহার মাতুলালয় বাঙলা দেশ।

মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দী 'পদুমাবতে' গোপীচন্দ্রের কাহিনী আছে। ইহাতে কবি গোপীচাঁদকে বাঙলার রাজা বলিয়াছেন।[৫০] লক্ষণ দাস ও পুরুষোত্তম দাসের হিন্দী কাব্যে তিলকচন্দ্র, ময়নামতী ও গোপীচাঁদের আখ্যান আছে। আর এক কাহিনীতে আছে, ময়নার ভ্রাতা ভর্তৃহরি গোপীচাঁদকে গোরক্ষনাথের শিষ্য করিয়া দিয়াছিলেন। গুজরাটী মতে গোপীচন্দ্রের পিতা তিলকচন্দ্র জালন্ধরিপাদের অভিশাপে মৃত্যুমুখে পতিত হন। গুজরাটী উপাখ্যানসমূহে তিলকচন্দ্রকে বঙ্গের রাজা বলা হইয়াছে। বিখ্যাত মারাঠী শিল্পী রবিবর্মা গোপীচাঁদের সন্ন্যাস অবলম্বনে একখানি বিরাট চিত্রও অঙ্কন করিয়াছিলেন। উড়িষ্যাতেও এ কাহিনী প্রচলিত আছে। নগেন্দ্রনাথ বসু ময়ূরভঞ্জ হইতে এই কাহিনী প্রথম সংগ্রহ করেন। দীনেশচন্দ্র-সঙ্কলিত 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে' (১ম) ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই কাহিনীটি পুরাপুরি বাঙলা দেশের অনুরূপ, ইহাতেও গোপীচন্দ্র 'বঙ্গের রায়' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে গোরক্ষনাথের বর্ণনা থাকিলেও গোপীচাঁদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। উত্তর-ভারতে এখনও বাউলজাতীয় গায়কেরা সারঙ্গী বাজাইয়া গোপীচাঁদের গান গাহিয়া থাকে, ভিখারী বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই গানের বিশেষ প্রচলন আছে।

৫০ বিস্তারিত আলোচনার জন্য ষষ্ঠ ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্সের (পাটনা, ১৯৩০) কার্য-বিবরণীতে গোপাল হালদার মহাশয়ের গোপীচন্দ্র বিষয়ক নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এই সমস্ত উপাদানের অধিকাংশ স্থলেই গোপীচন্দ্রকে বাঙলার রাজা এবং গোপীচন্দ্রের কাহিনীকে বাঙলা দেশের কাহিনী বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। বাঙলা দেশের কাহিনী ও নাথ ধর্মের সহিত বাঙলার বাহিরের আখ্যানের মোটামুটি সাদৃশ্য আছে। এইজন্য আধুনিক কালের গবেষকগণ মনে করেন যে, গোরক্ষনাথের কাহিনীর উৎপত্তি যেখানেই হোক না কেন, গোপীচাঁদের কাহিনী ও পাত্রপাত্রী বাঙলা দেশের অন্তর্ভুক্ত।[৫১] ঐতিহাসিকের মতে এ কাহিনী ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই বাঙলা দেশ হইতে বহির্বঙ্গে প্রচার লাভ করিয়াছিল।[৫২] অবশ্য লোকমুখে যে সমস্ত ছড়া-পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে তাহা অর্বাচীন কালের সৃষ্টি। পুঁথির আকারেও যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাও প্রাচীন নহে—বড় জোর সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা।

গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসই ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের কাহিনীর মূল বক্তব্য-বিষয়। গল্পটির জড় হইতেছে পূর্বোল্লিখিত গোরক্ষবিজয়-মীনচেতন আখ্যান। ইতিপূর্বে আমরা গোরক্ষবৃত্তে দেখিয়াছি যে, দেবী পার্বতীর ছলনায় একমাত্র গোরক্ষনাথ ব্যতীত আর তিনজন সিদ্ধারই পদস্খলন হইয়াছিল। তাহার মধ্যে মীননাথের অধঃপতন ও তাহা হইতে উদ্ধারের কাহিনী 'গোরক্ষবিজয়ে' বর্ণিত হইয়াছে। জালন্ধরিপা বা হাড়িপার অধঃপতনের কাহিনী গোপীচন্দ্র আখ্যানে খুবই সংক্ষেপে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। পার্বতীর অভিশাপে হাড়িপাকে মেহারকুলে (বা পাটিকাভুবন বা পট্টিকের) আসিয়া রাণী ময়নামতীর নিকট তাঁহাকে হাড়িবৃত্তি করিতে হইল। তাঁহার সঙ্গে ময়নামতীর সম্পর্ক গুরুভাই-গুরুভগিনীর মতো। কারণ তাঁহারা দুই জনেই এক গুরুর (গোরক্ষনাথ) শিষ্য। ময়নামতীকে কেহ কেহ 'সিদ্ধ ডাকিনী' বলিয়াছেন।[৫৩] তাহা না বলিয়া তাঁহাকে নাথধর্মসেবিকা এবং সিদ্ধায়িতা বিদ্যার অধিকারিণীরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

একদা রাণী ময়নামতী দেখিলেন যে, তাঁহার ঘোড়াশালের হাড়িটি অদ্ভুত সিদ্ধশক্তির অধিকারী। ইতিপূর্বে ময়নামতীর স্বামী মাণিকচন্দ্রের মৃত্যু

---

৫১ "গোপীচন্দ্রের প্রচলিত কাহিনীর মূল বঙ্গদেশে; বঙ্গদেশ হইতেই সমগ্র ভারতে এই করুণ কাহিনীটি ছড়াইয়া পড়ে।...কাহিনীটির মূল চট্টগ্রাম বা ত্রিপুরায় এইরূপ মতবাদও প্রচলিত আছে।"—ডঃ কল্যাণী মল্লিকের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ

৫২ ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ইতি, ১ম (অপরার্ধ)

৫৩ ঐ

হইয়াছিল। স্বামীকে তিনি 'মহাজ্ঞান' দিয়া অমর করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পৌরুষে ঘা লাগিবে বলিয়া স্বামী সম্মত হইলেন না। ফলে যমে তাঁহার প্রাণ লইয়া গেল—অনেক চেষ্টা করিয়াও রাণী ইহার অন্যথা করিতে পারিলেন না। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার গোপীচন্দ্র নামে এক পুত্রের জন্ম হইল। কালক্রমে পুত্রের বিবাহের সময় হইল। রাজমাতা ময়নামতী অদুনা-পদুনা দুই ভগিনীর সঙ্গে পুত্র গোপীচন্দ্রের বিবাহ দিলেন। গোপীচন্দ্রের আরও স্ত্রী ছিল। ইতিমধ্যে ময়নামতী জানিতে পারিলেন যে, পুত্র গোপীচন্দ্র আঠারো বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে তাহার বাঁচিবার কোন উপায় নাই, তাহারও পিতার দশা হইবে। ময়নামতী অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হাড়িসিদ্ধার পরিচয় পাইলেন, এবং বুঝিলেন তাঁহারা একই গুরুর শিষ্য। তখন তিনি পুত্রকে এই হাড়িসিদ্ধার নিকট মন্ত্র লইয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ-উপরোধ করিতে লাগিলেন। তা' না হইলে পুত্রের তরুণ বয়সে মৃত্যু হইতে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।

এদিকে গোপীচন্দ্রের বধূগণ এই ব্যাপারে সর্বপ্রকারে বাধা দিতে লাগিল। গোপীচন্দ্রেরও সন্ন্যাসগ্রহণে আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তরুণ যৌবনে ভোগসুখ ত্যাগ করিয়া কে-ই বা দুশ্চর সন্ন্যাস লইতে চাহে? ময়নামতীর প্রতি গোপীচন্দ্রের মন এত বিষাইয়া গেল যে, সে হাড়িসিদ্ধা সম্পর্কে মাতৃচরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতেও দ্বিধা করিল না। পুত্র মাতাকে বলিল, তুমি যদি এতই সতী হও, তাহা হইলে আমার পিতার মৃত্যুর পর তুমি 'সতী' হও নাই কেন?

হাট গ্যাছেন বাজার গ্যাছেন কিনিয়া খাইছেন খই।
আমার পিতার মরণের দিন সতি গ্যাছেন কই॥

পুত্র মাতৃচরিত্রে সন্দেহ করিয়া গুরুতর অভিযোগ করিতেছে:

হাড়ির খাইছ গুআ মা হাড়ির খাইছ পান।
ভাব করিয়া শিখিয়া নিছ ঐ হাড়ির গেয়ান॥
হাড়ির গেয়ানে তোমার গেয়ানে জননি একত্র করিয়া।
আমার পিতাকে মারিছেন মা জহরবিস খোয়াইয়া॥
বুদ্ধি পরামর্শে আমায় বনবাসে পাঠায়া।
আসে বিটি খাবেন তুমি ঐ হাড়ি নিয়া॥

দুই স্ত্রী অদুনা-পদুনার নির্বন্ধাতিশয্যে গোপীচন্দ্র মাতৃচরিত্রের বিশুদ্ধি প্রমাণের

জন্ত সুকঠোর পরীক্ষার আয়োজন করিল, ময়নামতীকে সতীত্বের পরীক্ষা দিয়া পুত্রের সন্দেহ দূর করিতে হইবে। ময়নামতী সুকঠোর দুশ্চর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, নিজের আধ্যাত্মিক শক্তিরও পরিচয় দিয়া পুত্রের সন্দেহ দূর করিলেন। তখন গোপীচন্দ্র হাড়িপার নিকট সন্ন্যাসগ্রহণে সম্মত হইল—যদিও অদুনা-পদুনা নানাপ্রকার ছলচাতুরীর আশ্রয় লইয়া স্বামীর সন্ন্যাসগ্রহণ বানচাল করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ময়নামতীর সিদ্ধান্তই কার্যকর হইল।

রাজা গোপীচন্দ্র মাথা মুড়াইয়া ভিখারী যোগীর বেশ গ্রহণ করিয়া হাড়িপাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং দ্বাদশ বৎসরের জন্য ঘর ছাড়িলেন। হাড়িসিদ্ধা তারপর শিষ্যকে বহু দুঃখকষ্ট দিয়া হীরা নটীর নিকট তাঁহাকে বারো কড়া কড়িতে বাঁধা রাখিয়া এবং 'না তিরি না পুরুষ' করিয়া চলিয়া গেলেন। হীরা নটী গোপীচন্দ্রকে কামপাশে বন্দী করিতে গিয়া পরাজিত হইল এবং প্রত্যাখ্যানের অপমান ভুলিবার জন্য গোপীচন্দ্রকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিতে লাগিল। এই ভাবে বহুদিন কাটিয়া গেল, ইতিমধ্যে হাড়িসিদ্ধা শিষ্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। অতিদুঃখে গোপীচন্দ্র কোনও প্রকারে মা ময়নামতী ও স্ত্রী অদুনা-পদুনাকে এই সংবাদ দিলেন। ময়নামতী গুরুভাই হাড়িসিদ্ধার কাছে এই সংবাদ পাঠাইলেন। অতঃপর হাড়িপা হীরা নটীর নিকট উপস্থিত হইয়া শিষ্যের মুক্তি চাহিলেন এবং বারো কড়া কড়ি ফেলিয়া দিলেন। যখন তিনি শুনিলেন যে, হীরা নটী গোপীচন্দ্রের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে, তখন তিনি সক্রোধে তাহাকে বাদুড় হইতে অভিশাপ দিলেন। শিষ্য সহ দেশে ফিরিবার কালে হাড়িপা গোপীচাঁদকে নানা কঠোর পরীক্ষার পর আড়াই অক্ষরের মহাজ্ঞান শিখাইলেন। গোপীচন্দ্র দীর্ঘকাল পরে নিজ রাজ্যে ফিরিলে অন্য কেহ চিনিতে না পারিলেও তাঁহার পোষা কুকুর ও হাতী প্রভুকে ঠিক চিনিতে পারিল। যাহা হউক পরে স্ত্রীগণ ও ময়নামতী গোপীচন্দ্রের পরিচয় পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। গোপীচন্দ্র অতঃপর সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। পালা-গায়কেরা এই বলিয়া ছড়া শেষ করিয়াছেন :

> শিব গোরক্ষনাথ আবগণ গ্যাল কৈলাসক লাগিয়া।
> রাজা আপন রাজাই করুক পাটতে বসিয়া॥

রাজা রানি থাউক রাজ্য করিয়া।
গুপিচন্দ্রের গান গ্যাল সম্পন্ন হইয়া॥

এখানে আমরা রঙপুর অঞ্চলের কৃষকসমাজে প্রচলিত ছড়াটির সংক্ষিপ্ত কাহিনী বিবৃত করিলাম। কিন্তু মৌখিক ছড়ার সঙ্গে এই কাহিনীর আর একটি মার্জিত সংস্করণ দুর্লভ মল্লিক, ভবানীদাস, সুকুর মামুদ প্রভৃতি কবিদের পুঁথিতে পাওয়া যায়। তাহাতে যে গল্পটি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে মৌখিক ছড়ার কোন কোন দিক দিয়া কিছু পার্থক্য দেখা যায়। ছড়াটিতে রূপকথার মতো 'আমার কথাটি ফুরুলো নটে গাছটি মুড়ুলো' ধরণের সমাপ্তি, এলোমেলো বিশৃঙ্খলা, অসঙ্গতি, এক‌ই কথার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি, অনাবশ্যক দীর্ঘ বর্ণনা, শিশুসুলভ সারল্য, এবং গ্রাম্য বিশ্বাস—এককথায় পল্লীপ্রাণ কবির অশিক্ষিতপটুত্ব এই ছড়াগুলিতে বিশেষ ভাবে পাওয়া যাইবে। কিন্তু পুঁথি মারফতে যে গীতি-আখ্যায়িকা আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে, তাহাতে লৈখিক বৈশিষ্ট্য, সমাপ্তিতে নীতিমার্গীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা, অসঙ্গতির স্থলে গ্রন্থন নৈপুণ্য, ভাষা-ভঙ্গিমার মধ্যে একপ্রকার নিয়মশৃঙ্খলা ও পারিপাট্য লক্ষ্য করা যাইবে। অশিক্ষিত গ্রাম্য যোগীসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা মৌখিক ছড়াটির রচনাকার, শ্রোতারাও তদনুরূপ। কিন্তু পুঁথি-আশ্রয়ী, 'গোবিন্দচন্দ্র-গীত' আখ্যায়িকার রচনাকারগণ নিতান্ত অশিক্ষিত ছিলেন না, এবং তাঁহারা যে-সমাজের জন্য এই সমস্ত পুঁথিপত্র রচনা করিয়াছিলেন, সে সমাজও নিতান্ত মূর্খ ছিল না। যাহা হউক গোপীচন্দ্রের মৌখিক ছড়া-পাঁচালীর সঙ্গে পুঁথিটির কাহিনীর যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।

পুঁথির (দুর্লভ মল্লিকের 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত') কাহিনীতে দেখা যায়, গোবিন্দচন্দ্র (এই কাব্যে গোপীচন্দ্রকে গোবিন্দচন্দ্র বলা হইয়াছে) পাকা পাকিভাবে সংসার ত্যাগ করিবার পূর্বেই হাড়িপার উপদেশে যোগী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। দ্বাদশ বর্ষ পরে গোবিন্দচন্দ্র পুনরায় সংসারে ফিরিয়া স্ত্রীদের নানারূপ যোগবিভূতি দেখাইয়া মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিলে হাড়িসিদ্ধা ক্রুদ্ধ হইয়া গোবিন্দচন্দ্রের এই অলৌকিক ক্ষমতা কাড়িয়া লইলেন; গোবিন্দচন্দ্র স্ত্রীদের আর অদ্ভুত কেরামত দেখাইতে পারিলেন না, নারী-সমাজে বড়ই অপ্রস্তুত হইলেন। তিনিও ক্রুদ্ধ হইয়া অদুনা-পদুনার কুমন্ত্রণায় হাড়িকে মাটির তলায় পুঁতিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন। হাড়িসিদ্ধা

বারো বৎসর সেই ভাবে মাটির তলায় রহিলেন। ইহার পরের কাহিনীটুকু আবার গোরক্ষবিজয়ের সঙ্গে যুক্ত। গোরক্ষবিজয়ে দেখা যায়, একদা গোরক্ষনাথ বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। তখন আকাশ-পথে গাভুরসিদ্ধা বা কানুপা উড়িয়া যাইতেছিলেন। তাঁহারা পরস্পর নিজেদের গুরুর দুরবস্থার কথা শুনিলেন। কানুপাকে গোরক্ষনাথ বলিলেন, তোমার গুরু হাড়িপা ময়নামতীর মোহে মেহারকুলে মাটির তলে গাড়া রহিয়াছেন। কানুপাও বলিলেন, তোমার গুরু মীননাথ কদলীর দেশে স্ত্রীরাজ্যে পুরা সংসারী হইয়া বাস করিতেছেন। অতঃপর কানুপা শিশুযোগীর রূপ ধরিয়া মেহেরকুলে উপস্থিত হইলেন এবং গোবিন্দচন্দ্রের নিকট গিয়া হুঙ্কার ছাড়িলেন। গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার যোগবিভূতির পরিচয় পাইয়া তাঁহার শরণ লইলেন। রাজা যখন হাড়িপাকে মাটির তলা হইতে উদ্ধারের আয়োজন করিলেন তখন তাঁহাকে হাড়িপার ক্রোধ হইতে বাঁচাইবার জন্য কানুপা রাজার অনুরূপ তিনটি পুতুল তৈয়ারি করাইয়া সামনে রাখিয়া দিলেন। হাড়িপাকে মাটির তলা হইতে তোলা হইলে ধ্যানভঙ্গের পর হাড়িপা সক্রোধে চোখ মেলিলেন—সম্মুখে পুতুলগুলি প্রথমে তাঁহার চোখে পড়িল, এবং তদ্দণ্ডে সেগুলি ভস্মীভূত হইয়া গেল। রাজা গোবিন্দচন্দ্র কোনও প্রকারে হাড়িসিদ্ধার ক্রোধ হইতে রক্ষা পাইলেন। অতঃপর রাজা সংসারবাসনা ও স্ত্রীদের ত্যাগ করিয়া গুরুর নির্দেশে দক্ষিণদেশে সমুদ্র তীরে যোগী হইয়া সাধনা করিতে লাগিলেন—বৎসরে একবার করিয়া তিনি দেশে আসিতেন। পুত্রকে যোগী হইতে দেখিয়া মাতা ময়নামতী আনন্দিত হইলেন।

পুঁথিটি গোবিন্দচন্দ্রের পুরাপুরি যোগসন্ন্যাস গ্রহণে সমাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু মৌখিক ছড়াসংগ্রহে তিনি দ্বাদশ বৎসর পরে হীরা নটীর কবল হইতে রক্ষা পাইয়া দেশে ফিরিয়া পুরাদস্তুর ঘরসংসার করিয়াছেন। ইহার জন্য মৌখিক কাহিনীটির প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধান্বিত হইবার প্রয়োজন নাই। মৌখিক ছড়ায় ধর্মতত্ত্ব অপেক্ষা মানব-জীবনরস অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ এই ধরণের ছড়া-পাঁচালীকে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু মৌখিক ছড়া-পাঁচালী মৌখিক লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। তাহাতে গভীর কোন ধর্মতত্ত্ব (যদিও মৌখিক সাহিত্যেও ময়নামতী পুত্রকে যোগ সম্বন্ধে গূঢ়তত্ত্ব শিখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন) থাকিবার কথা নহে।

ব্যালাডে একটা ধারাবাহিক কাহিনী থাকে, তত্ত্বকথার স্থান ব্যালাড সাহিত্যে নিতান্ত সঙ্কুচিত। সেই হিসাবে মৌখিক গোপীচন্দ্রের গানের প্রবণতা মূলতঃ গল্পের অভিমুখী, অনেকটা রূপকথাজাতীয়—যাহা উচ্চতর সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। তাই মৌখিক ছড়াপাঁচালীর শেষাংশে গোপীচন্দ্রকে আবার সংসারে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে—যেন কাঁড়া কাটাইবার জন্যই ময়নামতী এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কাজেই ছড়াটি নাথ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও নাথ ধর্মের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। নাথ ধর্মে নারী-সাহচর্য সর্বথা পরিত্যাজ্য, অথচ গোপীচন্দ্র স্ত্রীদের লইয়া মহাসুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এদিক দিয়া পুঁথির কাহিনীতে অধিকতর সঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছে। গোবিন্দচন্দ্র কাব্যের শেষাংশে যোগীসিদ্ধ হইয়াই গৃহত্যাগ করিয়াছেন—আর ঘরে বাস করেন নাই। আরও একটা কথা, পুঁথির কাহিনী, বিশেষতঃ দুর্লভ মল্লিকের 'গোবিন্দচন্দ্র গীতে' কাহিনী সন্নিবেশ অনেক সংহত, অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক অংশ একেবারে বর্জিত হওয়াতে কাহিনীর একমুখী গতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুঁথির বর্ণনাতে রুচিবিগর্হিত বর্ণনা অনেক কম, বর্ণনাভঙ্গিমা ও ভাষার মধ্যেও কিঞ্চিৎ শিক্ষিত মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজা গোপীচন্দ্রের ঐতিহাসিকতা লইয়া একদা সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মহলে প্রচুর ঝড়-তুফান উঠিয়াছিল। গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের নামটির সঙ্গে ঐতিহাসিক ব্যক্তির নামসাদৃশ্যের জন্য নানা ঐতিহাসিক গবেষণার পথ খুলিয়া গিয়াছে। শরৎচন্দ্র দাস ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দের এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় *Antiquity of Chittagong* প্রবন্ধে সর্বপ্রথম গোবিন্দচন্দ্রকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া ইঙ্গিত করেন। তারপর ১৩০৬ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় এ বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা প্রকাশিত হয়। এই জাতীয় পুঁথির প্রথম আবিষ্কারক শিবচন্দ্র শীল এবং নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্ত করেন যে, দক্ষিণীয় রাজেন্দ্র চোল বাঙলার কোন এক রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাভূত করিয়াছিলেন, এরূপ উক্তি তিরুমল্ল পাহাড়ের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে। তখন তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শিলালিপির গোবিন্দচন্দ্রই নাথ সাহিত্যের গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র।[৫৪]

৫৪ "১০২৩ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রচোল বাঙ্গালার এক রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন;

তিরুমলয় পাহাড়ে যে রাজেন্দ্র চোলের শিলালিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাঁহার রাজ্যকাল ৯৮৫—১০৩৪ শক (১০৬৩-১১১২ খ্রীঃ অঃ)। ইনি বাঙলার গোবিন্দচন্দ্রকে পরাভূত করেন, এরূপ উল্লেখ শিলালিপিতে আছে তাহা যথার্থ বটে। রাজেন্দ্রচোলের রাজত্বকালে পূর্ববঙ্গে চন্দ্র উপাধিধারী এক রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই রাজবংশের ইতিহাসে এইরূপ বংশধারা পাওয়া যায়—পূর্ণচন্দ্র-সুবর্ণচন্দ্র-ত্রৈলোক্যচন্দ্র-শ্রীচন্দ্র। মহারাষ্ট্রীয় কাহিনীতে গোবিন্দচন্দ্রের পিতার নাম ত্রৈলোক্যচন্দ্র বা তিলকচন্দ্র। দুর্লভ মল্লিকের পুঁথিতে মাণিকচন্দ্রের পিতামহের নাম ধাড়িচন্দ্র, পিতার নাম সুবর্ণচন্দ্র। ইহা হইতে অবশ্য কোন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কিন্তু এইটুকু বুঝা যায় যে, রাজেন্দ্রচোল যখন বাঙলার গোবিন্দচন্দ্রকে পরাভূত করেন, তখন পূর্ববঙ্গে চন্দ্রবংশ রাজত্ব করিতেছিলেন। এইজন্য কেহ কেহ অনুমান করেন, পুঁথির গোবিন্দচন্দ্র ও শিলালিপির গোবিন্দচন্দ্র এক ব্যক্তি। বাঙলা দেশে ষষ্ঠ শতাব্দীর একখানি তাম্রলিপিতে গোপীচন্দ্রের[৫৫] উল্লেখ আছে। অনেকে পুঁথির গোবিন্দচন্দ্র ও তাম্রলিপির গোপচন্দ্রকেও এক বলিয়া অনুমান করেন। 'শব্দপ্রদীপ' রচয়িতা বলিয়াছেন যে, তাঁহার পিতামহেরা রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজবৈদ্য ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, এখানে একই গোবিন্দচন্দ্রের কথা বলা হইতেছে। যাহা হউক ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শিলালিপি ও তাম্রলিপির চন্দ্রবংশের বিবরণ অনুসারে একাদশ শতাব্দীর দিকে যে গোবিন্দচন্দ্র বাঙলার রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, তিনিই পুঁথিসাহিত্যের গোবিন্দচন্দ্র। এখন এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। রঙপুর হইতে সংগৃহীত লোকমুখে প্রচারিত ছড়াতে ময়নামতী-গোপীচন্দ্র সংক্রান্ত স্থানসমূহ রঙপুরেই অবস্থিত বলিয়া মনে হয়।[৫৬]

তিরুমলয় পাহাড়ের শিলালিপিতে এই যুদ্ধ বিবরণ খোদিত আছে। এতদ্ভিন্ন নালন্দা-বড়গাঁও অঞ্চলে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং ঐতিহাসিক রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও এই পুঁথির গোবিন্দচন্দ্র এক হইতে পারেন।"—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩০৬ (৩য় সংখ্যা)

৫৫ Indian Antiquity, 1910

৫৬ গোপীচন্দ্রের গান ২য় খণ্ড (১ম সংস্করণ) দ্রষ্টব্য। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মৌখিক গাথা অনুসারে স্থির করিয়াছিলেন, রঙপুর জেলায় পাটিকাপাড়ায় গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী ছিল। কিন্তু পুঁথির প্রমাণ দেখিয়া তাঁহার অভিমত বদলাইয়া যায়। অবশ্য রঙপুরে ময়নামতীর কোট, পাটিকাপাড়া গ্রাম, কীরা নটীর স্থান, উদিনাপুদিনা বিল—সমস্তই গোবিন্দচন্দ্রের গীতে বর্ণিত স্থানের মধ্যে মিলিয়া যাইতেছে।

আবার পুঁথি হইতে মনে হইতেছে, ত্রিপুরা জেলার মেহেরকুল পরগণার অন্তর্গত লালমাই পাহাড়ের কিয়দংশ এখনও ময়নামতীর পাহাড়রূপে পরিচিত, এখানেই গোপীচন্দ্রের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, অদুনামুড়া, পদুনামুড়া, গোরক্ষ-নাথ-ময়নামতীর সুড়ঙ্গ, হাড়িপার বাসস্থান (শালবানপুর) প্রভৃতি অবস্থিত, একথা লোকে বলিয়া থাকে। এই অঞ্চলে 'যুগী' সম্প্রদায়েরও অনেক লোক বাস করে। উপরন্তু মেহারকুল ও পাটিকারা পরগণা দুইটি এখনও ত্রিপুরা-জেলায় অবস্থিত, এই দুইটি নামই দুর্লভ মল্লিকের পুঁথিতে পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্র দাসের মতে গোপীচন্দ্রের পিতা বিমলচন্দ্র তিরহুত, বঙ্গ ও কামরূপের রাজা ছিলেন। যাহা হউক গান ও পুঁথি অনুসারে কোন বিশেষ সুনিশ্চিত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।[৫৭] ক্ষীণতম ইতিহাস আর ক্ষীণতর লোকস্মৃতির সঙ্গে জড়াইয়া গিয়া এই সমস্ত কাহিনীর উৎপত্তি হইয়াছে। তবে কেবল রঙপুর এবং ত্রিপুরাকে কেন্দ্র করিয়া গোপীচন্দ্র-সংক্রান্ত কাহিনী গড়িয়া উঠিল কেন তাহা অবশ্য জানা যায় না। অথচ প্রায় গোটা বাঙলা দেশেই যুগীসম্প্রদায়ের বাস। তবে এইটুকু বলা যায় যে, এ কাহিনীর ধারা অনেক পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং কাহিনীটি বাঙলা দেশেরই, তাহা বহির্বঙ্গের এই ধরনের অন্যান্য আখ্যান হইতে জানা যাইতেছে। পুঁথি-গুলি অবশ্য অনেক পরবর্তী কালের রচনা, কোন পুঁথিই এক শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। আমাদের মনে হয়, পুঁথি-আশ্রয়ী কাহিনীগুলি দুই-তিনশত বৎসরের পূর্বে রচিত অথবা সঙ্কলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এবার প্রাপ্ত উপকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লওয়া যাক।

গোপীচন্দ্রের গান-সংক্রান্ত যে সমস্ত বস্তু-উপাদান পাওয়া গিয়াছে তাহাকে যথাক্রমে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—মৌখিক উপাদান ও পুঁথির উপাদান। লোকমুখ হইতে যাহা লিখিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা মৌখিক উপাদান, এবং পুঁথির মধ্যে যে কাহিনী অনুসৃত হইয়াছে তাহা পুঁথির উপাদান বলিয়া গৃহীত হয়। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় পর্বের কোন কোন

৫৭ বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন, "আমরা আপাততঃ গোপীচন্দ্রকে গন্ধবণিক জাতীয় এবং খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া গ্রহণ করিলাম। তিনি যদি শিলালিপির গোবিন্দচন্দ্র না হন, তবে আরও পূর্ববর্তী হইতে পারেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ের লোক হওয়ার কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না।" (গোবিন্দচন্দ্রের গান, ২য়, ১ম সংস্করণ)

অংশে একই সঙ্গে মৌখিক ও পুঁথির উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। বিদ্যাপতির পদ, বৈষ্ণব পদসংগ্রহ, শাক্ত পদ, বাউল গান—যেমন পুঁথি-পত্রাদিতে পাওয়া যাইতেছে, তেমনি আবার লোকমুখে বা সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে প্রচলিত মৌখিকরূপেও পাওয়া যাইতেছে। নাথ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত গোপীচন্দ্রের কাহিনীবিষয়ক এইরূপ দুই প্রকার উপাদানই ইদানীং আমাদের যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

প্রথমে মৌখিক উপাদানের কথা আলোচনা করা যাক। ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দের [৫৮] এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন সাহেব দেবনাগরী হরফে একটি মৌখিক গীতিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাই 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান'। যোগীসম্প্রদায়ের গায়েনেরা রঙপুর অঞ্চলে এখনও গোপীচন্দ্র রাজার কাহিনী গাহিয়া বেড়ায়। সাধারণতঃ তাহারা এই সমস্ত গান ও আখ্যান একখানি খাতায় টুকিয়া রাখে। ইহাকে 'যোগীর পুথি' এবং এই প্রকার কাহিনীকে 'যোগীযাত্রা' বলে। ডঃ গ্রীয়ার্সন উত্তরবঙ্গের রঙপুর অঞ্চলের এক যোগী গায়কের নিকট এই গীতিকাটি সংগ্রহ করেন এবং এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশ করেন। গ্রীয়ার্সন কাহারও মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন, অথবা কেহ পুঁথির মুখস্ত পাঠ আওড়াইয়া গিয়াছিল, তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না। আমাদের মনে হয়, রঙপুর অঞ্চলে যে সমস্ত 'যোগীর পুথি' প্রচলিত আছে, গ্রীয়ার্সন-সংগৃহীত 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' [৫৯] সেইরূপ একটি আখ্যানের অংশ। সুতরাং গ্রীয়ার্সনের গানটিকে পুরাপুরি মৌখিক সংগ্রহ বলা যায় কিনা সন্দেহ। এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হইলেও এই জাতীয় যোগীসাহিত্য সেযুগের শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। গানটি একটি স্বল্পপ্রচারিত ইংরাজী পত্রিকায় দেবনাগরী হরফে মুদ্রিত হইবার জন্য ইহা সাধারণ শিক্ষিত সমাজেও প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। এবিষয়ে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন দীনেশচন্দ্র তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের'

---

৫৮ সাহিত্যের কোন কোন ঐতিহাসিক ভ্রমক্রমে ১৮৭৮-এর স্থলে ১৮৭৩ ছাপিয়াছেন।

৫৯ গ্রীয়ার্সন ইহাকে মাণিকচন্দ্র রাজার গান বলিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার যথার্থ নাম হওয়া উচিত গোপীচন্দ্রের গান। কারণ ইহাতে মাণিকচন্দ্রের কাহিনী যৎসামান্য, গোপীচন্দ্রের কাহিনীই দীর্ঘতর।

'প্রথম সংস্করণে (১৮৯৬)। তখন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় বৌদ্ধ প্রভাবের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হইতেছিল। শরৎচন্দ্র দাস, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙলা দেশের বৌদ্ধ উপাদান সম্বন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এমন সমস্ত প্রাচীন তথ্য আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন যে, সেযুগের শিক্ষিত সমাজ মনে করিয়াছিলেন, প্রাচীন বাঙলার সাহিত্য সংস্কৃতি—সবই বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত। এই সময়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বৃহদায়তন গ্রন্থ লিখিয়া শিক্ষিত বাঙালীর মনে এই অনুমান দৃঢ়তর করিয়াছিলেন। তাই দীনেশচন্দ্র গ্রীয়ার্সন সংগৃহীত আখ্যান পাঠে অনুমান করিয়াছিলেন, "এই গীতির ভাব বৌদ্ধ জগতের। বহু স্থলেই বৌদ্ধগণের ধর্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয়···।" তাঁহার এ অনুমান সত্য নহে, নাথ ধর্ম প্রধানতঃ যোগীদের (যুগী) ধর্ম : ধর্মমঙ্গলের ধর্মের সঙ্গে নাথ ধর্মের অল্পবিস্তর যোগাযোগ থাকিলেও বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে ইহার তত্ত্ব বা আখ্যানগত কোন সম্পর্ক নাই। যাহা হউক, দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থ প্রকাশের পর শৈব নাথযোগীদের ধর্মমত ও সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয়; অনেকেই পুঁথির মধ্যে এই জাতীয় নাথ সাহিত্যের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ চুঁচুড়ার শিবচন্দ্র শীল 'গোবিন্দচন্দ্র গীত' নামক একখানি পুঁথি সংগ্রহ করেন। ১৩০৬ সালের সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় সে বিষয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা প্রকাশিত হয়। পরে ১৩০৭ সালে (১৯০১) তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়া ১৩০৮ সালে উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তখন অনেকেই বুঝিতে পারিলেন যে, গ্রীয়ার্সনের সংগৃহীত গোপীচন্দ্র বিষয়ক মৌখিক গীতি এবং শিবচন্দ্র শীল সংগৃহীত 'গোবিন্দচন্দ্রের গীতি'র পুঁথি একই বস্তু, অর্থাৎ নাথ ধর্মের মহিমাবিষয়ক যুগীসম্প্রদায়ের সাহিত্য।[৬০]

মৌখিক নাথ সাহিত্যের আরও একটু আবিষ্কৃত হইল রঙপুর জেলায় নীলফামারী মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয়ের দ্বারা। অনুমান ১৯০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তিনিও রঙপুর-নীলফামারী অঞ্চলের তিনজন যোগী ভিখারীদের মুখ হইতে গোপীচন্দ্রের গানের বিস্তৃততর আখ্যান লিখিয়া লইয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুইজনের পাঠ সুবিস্তৃত, আর একজনের পাঠ সংক্ষিপ্ত

৬০ শিবচন্দ্র শীল সম্পাদিত এই গ্রন্থ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হইয়াছে।

ও আংশিক।[৬১] গ্রীয়ার্সন সাহেবের প্রকাশিত পাঠ ও বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সংগৃহীত পাঠে দেখা যাইতেছে যে, গ্রীয়ার্সনের পাঠটি সম্পূর্ণ হইলেও অতিশয় সংক্ষিপ্ত, এবং বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের পাঠ সুবিস্তৃত। অবশ্য ভট্টাচার্য মহাশয় তিন জন যোগীগায়কের পাঠকে নিজে সাজাইয়া প্রকাশিত করিয়াছেন (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৫)। ইহাতে তিনি কিছু কিছু হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, অথবা শ্রুত আখ্যানকে কাহিনীর পৌর্বাপর্য অনুসারে সাজাইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহা লইয়াও কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত সুকুর মহম্মদের 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে'র ভূমিকায় স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "ইহা (অর্থাৎ বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সংগৃহীত গোপীচন্দ্রের পাঁচালী) গান নহে, গানের বিষয়টি বিশ্বেশ্বরবাবু নিজের ভাষায় বলিয়াছেন।"[৬২] অবশ্য সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (১৩১৫) প্রকাশিত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের প্রবন্ধে কাহিনীটি সংক্ষেপে সংগ্রাহকের নিজের ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ঠিক বটে, কিন্তু মুদ্রিত সংস্করণে প্রকাশিত পালা হইতে মনে হয় ইহাতে বিশ্বেশ্বরবাবু কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই। অতঃপর দীনেশচন্দ্র, বসন্তরঞ্জন রায় ও বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় ১৯২২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গোপীচন্দ্রের গানের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহাই বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের সংগ্রহ, যাহা তিনি কাহিনীর পৌর্বাপর্য রক্ষা করিয়া সাজাইয়াছিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে ১৯২৪ সালে গোপীচন্দ্রের গানের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়, তাহাতে দুইখানি আখ্যান মুদ্রিত হইয়াছিল:—(১) ভবানীদাস বিরচিত গোপীচন্দ্রের পাঁচালী—ইহা কয়েকখানি পুঁথির পাঠ মিলাইয়া প্রস্তুত হয়। (২) সুকুর মহম্মদ রচিত গোপীচন্দ্রের

---

৬১ গোপীচন্দ্রের গান (কলি. বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ও ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত নূতন সংস্করণ, পৃ. ৪I/) দ্রষ্টব্য। এই ভূমিকায় সম্পাদক বলিয়াছেন যে, নাথ সম্প্রদায়ে প্রায় পুরা পালা গীত হয় না, দু' একটি পালাই গাথা আকারে প্রচলিত আছে। "বৃহৎ গানের সকল অংশ সকলে আয়ত্ত করিতে পারে না; সুতরাং গায়কের সামর্থ্য, রুচি ও প্রয়োজনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন পালার সৃষ্টি হইয়াছে। কোথাও-বা গানের নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদ মাত্র গীত হয়, কোথাও-বা শাখাপ্রশাখা কর্তন করিয়া মূল কাণ্ডটি স্থির রাখিয়া যথাসম্ভব একটি সম্পূর্ণ চিত্র উপস্থিত করার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়।" (ভূমিকা, পৃ. ৪I/০)

৬২ ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত ও ঢাকা সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত সুকুর মহম্মদের গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, পৃ. ১

সন্ন্যাস (যোগীর পুঁথি)—ইহা একখানি ছাপা পুঁথির পুনর্মুদ্রণ, কোন মূল পুঁথির মুদ্রণ নহে। যাহা হউক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত গোপীচন্দ্রের গানের প্রথম খণ্ডটি পুরাপুরি মৌখিক ঐতিহ্য অবলম্বনে মুদ্রিত হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় খণ্ডটিতে পুঁথি ও মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ অবলম্বিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম খণ্ডের গাথাটি লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত; ইহার কোন কবি নাই, নানা জনের চেষ্টায় ইহার কলেবর গঠিত হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত আখ্যান দুইটি দুইজন কবির রচিত।

গ্রীয়ার্সন সংগৃহীত এবং বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সংগৃহীত ও সম্পাদিত মৌখিক আখ্যানটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, গ্রায়ার্সনের পাঠ অতিশয় সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সম্পূর্ণ। অপরদিকে বিশ্বেশ্বরবাবুর পাঠ দীর্ঘ বিস্তারিত—সাড়ে পাঁচ হাজার পয়ার-পংক্তিতে পাঁচটি খণ্ডে (জন্ম খণ্ড, বুঝান খণ্ড, পণ্ডিত খণ্ড, নাপিত খণ্ড, সন্ন্যাস খণ্ড) বিভক্ত এই সুদীর্ঘ পালা গান লোকসাহিত্যের আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসাবে গৃহীত হইতে পারে। এ বর্ণনা ক্লান্তিকর, বহু স্থলে কাব্যরসের সঙ্গে কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই, ইহা অশিক্ষিত গ্রাম্য মনের উপযোগী। বরং গ্রায়ার্সনের সংগৃহীত কাহিনী সংক্ষিপ্ত ও সংহত বলিয়া অধিকতর চিত্তাকর্ষী। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের সংগ্রহে সন্ন্যাস খণ্ডই সর্বাপেক্ষা ক্লান্তিকর ও মুন্সিয়ানা বর্জিত। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ ও হীরা নটীর নিকট দীর্ঘকাল নিগ্রহভোগ এবং পরিশেষে দেশে ফিরিয়া সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাজ্যপাট নির্বাহ—ইহাই এই অংশে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু অতিশয় বাগবাহুল্য, পুনঃ পুনঃ একই কথা ও বর্ণনার বিরক্তিকর বিবৃতি এবং ভাষাবিন্যাসে শিল্পবোধের একান্ত অভাব সমগ্র কাহিনীর মধ্যে এই অংশকে সর্বাপেক্ষা ত্রুটিজনক করিয়াছে। অবশ্য ময়নামতী, অদুনা ও পদুনার চরিত্রগুলির স্বাতন্ত্র্য উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এইরূপ বাস্তবধর্মী নারী-চরিত্রের এতটা স্বাতন্ত্র্য বড় একটা দেখা যায় না। অদুনা-পদুনার স্বামীকে সন্ন্যাস হইতে নিবৃত্ত করার চেষ্টা এবং শাশুড়ীর বিরুদ্ধে কুটিল ষড়যন্ত্র প্রভৃতির বর্ণনা বেশ চমকপ্রদ হইয়াছে। গোপীচন্দ্রের চরিত্রেও অশিক্ষিত গ্রাম্য গায়ক মনস্তত্ত্বের বৈচিত্র্য ও বিকাশ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। অবশ্য সন্ন্যাস কালের সমাপ্তির পর গোপীচন্দ্র আবার সংসারে ফিরিয়া পুরাদস্তুর সংসারী বনিয়া গেলেন—এইরূপ বর্ণনায় নাথ ধর্মের উদ্দেশ্য ও মাহাত্ম্য রক্ষিত হয়

নাই। বস্তুতঃ ইহা গ্রাম্য জনসাধারণের জন্য রচিত লোকগাথা মাত্র ; ধর্মীয় পরিণাম বা ধর্মশাস্ত্রের নিদান ইহার লক্ষ্য নহে। গাথাসাহিত্যের পরিসমাপ্তিতে এইরূপ সুস্থ স্বাভাবিক বাস্তবজীবনের পরিণতিই প্রাধান্য লাভ করে। সেই দিক হইতে ইহার পরিণতি লোকগাথার অনুকূল হইয়াছে। লোকগাথা অনেকাংশে শিশুধর্মী : অর্থাৎ শিশু যেমন রূপকথার শেষে নানা দুঃখ-কষ্টের পর রাজপুত্রকে সুখী দেখিতে চাহে, এই লোকগাথাটিতেও সেইরূপ একটা শিশুমনের উপযোগী রূপকথাধর্মী সমাপ্তি লক্ষ্য করা যাইবে।

এই আখ্যান রঙপুর অঞ্চলে প্রচলিত, সুতরাং ইহার ভাষায় উত্তরবঙ্গের অপরিচিত শব্দের বিশেষ প্রভাব আছে।[৬৩] ভাষা বিষয়ে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত, "গানটি রঙ্গপুরে সংগৃহীত হইয়াছিল। ভাষা দেখিলেও রঙ্গপুরের উত্তরাংশের বোধহয় ;...রঙ্গপুরের গ্রাম্য ভাষায় রাজবংশী ভাষা মিশিয়া গিয়াছে।"[৬৪] যাহা হউক ভাষার উপলকঠোরতা পার হইতে পারিলে এই গ্রাম্য গাথাটিতে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য কাব্যগুণ লক্ষ্য করা যাইবে। বিশেষতঃ গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্পে অদুনা-পদুনার বিলাপ করুণরসের দ্বারা অন্তরঙ্গতা লাভ করিয়াছে :

---

৬৩ দীনেশচন্দ্র মনে করিতেন, "ইহা পূর্ববর্তী যুগের প্রাকৃত-প্রধান বাঙ্গালা" (ব. ভা. সা.)। কিন্তু সামান্য ভাষাতাত্ত্বিক সন্ধানের দ্বারাই বুঝা যাইবে, ইহার ভাষা অতি অর্বাচীনকালের ; বড় জোর শতখানেক বৎসরের প্রাচীন হইতে পারে। এই জাতীয় আখ্যান বহুকাল হইতে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও ইহার ভাষা আধুনিক যুগের ; যে সমস্ত শব্দকে অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা আদৌ প্রাচীন নহে, আধুনিক যুগে অঞ্চলবিশেষে এখনও ব্যবহৃত হয়। আঞ্চলিক শব্দের সঙ্গে অপরিচয়ের জন্যই দীনেশচন্দ্র এই ভাষাকে "সংস্কৃত প্রভাবচিহ্নিত যুগের পূর্ববর্তী ভাষা" বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

৬৪ দ্রষ্টব্য—ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, পৃ. ৫। গল্পটি যে অশিক্ষিত মুসলমানের গ্রন্থনা, তাহার প্রমাণ ইহাতে বহু মুসলমানী শব্দ ও ভুল পৌরাণিক তথ্য আছে। মুসলমানী শব্দের দুই চারিটির দৃষ্টান্ত—পাপগুনা, কমবক্তা, হাজামৎ, জাগা, ছোকরান (ছোকরা সকল), সাইবানী (সাহেবের স্ত্রীলিঙ্গ), বান্দী ইত্যাদি। ভুল পৌরাণিক তথ্যের মধ্যে দুর্গার ভাই শনি, চিত্রগুপ্তের স্থলে চিত্রগোবিন্দ, ক্ষীরোদ সাগরের স্থলে সরঙ্গি সাগর, হাড়িপার নাম—হাড়িলঙ্কেশ্বর। সুতরাং মনে হয়, গল্পটি কোন মুসলমান গায়েনেরই রচনা, সঙ্কলন বা গ্রন্থনা।

কান্দে রত্নুনা রানি ধরিয়া রাজার পাও।
এ হ্যান বয়সের ব্যালা ছাড়িয়া না যাও॥
ছাড়িয়া না জাইও রাজা দুর দেশান্তর।
কার জন্য বান্দিলেন সয়ালমন্দির ঘর॥
সয়ালমন্দির ঘর বান্ধিছ নাই পড়ে কালি।
এমত বয়সে ছাড়ি যাও ত্রথায় গাবুরালি॥
... ...
নিন্দর স্বপনে রাজা হব চৈতন।
পালঙ্গে হস্ত ফ্যালায়া দেখিব নাই প্রাণধন॥

শেষ দুই পংক্তিতে প্রাণের গভীর বেদনা চমৎকার ফুটিয়াছে। এইরূপ দুই-চারি স্থলে কবিত্বশক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অশিক্ষিতপটুত্ব বলিয়া কিঞ্চিৎ প্রশংসা দাবি করিতে পারে। তবে এতকাল এই পালাগানের উপরে যে প্রচুর প্রশংসাবাণী বর্ষিত হইয়াছে তাহা ততটা যুক্তিসঙ্গত নহে। দীনেশচন্দ্রই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন, "জঙ্গলে ঢুকিয়া কাঠুরিয়া যেরূপ মাণিক পাইয়াছিল আমরা প্রাচীন সাহিত্যের জঙ্গলের মধ্যে তেমনই এই অমূল্য রত্ন কুড়াইয়া পাইয়াছি। বাঙ্গালার কুঁড়েঘরের যে কত দাম, জগতের কোন রাজ-প্রাসাদের কাছে যে তাহা খাট নহে—এই গীতিগুলি তাহা প্রমাণ করিবে। এই সকল গানের কথা মাঝে মাঝে এত স্পষ্ট, এত অন্তরছোঁয়া যে, আধুনিক কবিরা এত সংক্ষেপে ও এত জোর দিয়া একটা কথা বুঝাইতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।" আধুনিক পাঠক বুঝিবেন—দীনেশচন্দ্রের এই উক্তি মুগ্ধভক্তের পূজারতি, সমালোচকের বিশ্লেষণ নহে।

ইদানীং কোন কোন সমালোচক এই পালাগানকে 'এপিকধর্মী রচনা,' 'মৌখিক মহাকাব্য' (oral epic) ইত্যাদি বলিয়াছেন।[৬৫] ফিনল্যাণ্ডের মৌখিক মহাকাব্য 'কালেওয়ালা' বা এস্টোনিয়ার লোকমহাকাব্য 'গিলগামেশ' মৌখিক মহাকাব্য হইলেও, তাহার বিশালতা, যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনা, চরিত্রের

৬৫ গোপীচন্দ্রের গানের নূতন সংস্করণের সম্পাদক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য (ভূমিকা—পৃ.৷/০) দ্রষ্টব্য। ডঃ সুকুমার সেনও বলিয়াছেন, "ময়নামতী গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনীতে এপিক উপাখ্যানের সৌন্দর্য ও মহিমা আছে (বা. সা. ই. অপরার্ধ)"। অবশ্য সেরূপ মহিমা এই লোকগাথাতে বিশেষ পরিস্ফুট হইতে পারে নাই।

বীররস প্রভৃতি মহাকাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু গোপীচন্দ্রের গান নিতান্তই ছড়া-পাঁচালী জাতীয় রচনা। গোদা যমের সঙ্গে ময়নামতীর সংঘর্ষ বীররস অপেক্ষা হাস্যরসেরই অধিকতর উপযুক্ত। হীরা নটীর প্রলোভনে আটক গোপীচন্দ্রকে খানিকটা মহাকাব্যের নায়কের উপযুক্ত করা যাইত। কিন্তু পালাতে দেখিতেছি, হাড়িপা হীরা নটীর নিকট গোপীচন্দ্রকে বাঁধা রাখিবার সময়ে তাহাকে "না পুরুষ না স্ত্রী" করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং হীরা নটীর প্রলোভনকে প্রত্যাখ্যান করিয়া গোপীচন্দ্র এমন কীই-বা মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন? এই ছড়া পাঁচালীর মধ্যে দুই-চারি স্থলে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য বর্ণনা আছে, চরিত্রগুলিতেও বৈচিত্র্যের অভাব নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, মৌখিক মহাকাব্য—ইত্যাকার প্রশংসাবাণীর দ্বারা অলঙ্কৃত করা যায় না।

এবার পুঁথিতে-গ্রথিত গোপীচন্দ্রের কাহিনী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক। এপর্যন্ত তিনজন কবির গোপীচন্দ্রের কাহিনী-সংক্রান্ত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, এবং সেগুলি সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিতও হইয়াছে—(১) বাংলা ১৩০৮ সালে শিবচন্দ্র শীলের সম্পাদনায় সর্বপ্রথম 'গোবিন্দচন্দ্র গীত' প্রকাশিত হয়। (২) ১৩২১ সালে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্তের সম্পাদনায় ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ হইতে ভবানীদাসের 'ময়নামতীর গান' মুদ্রিত হয়। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত গোপীচন্দ্রের গানে (২য় খণ্ড) ইহা পুনর্মুদ্রিত হয়। (৩) ১৩৩২ সালে নলিনীকান্ত ভট্টশালীর সম্পাদনায় আবদুল সুকুর মহম্মদের 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' ঢাকা সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়। অবশ্য তাহার কিছু পূর্বে দীনেশচন্দ্র উক্ত অংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'গোপীচন্দ্রের গানে' প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গ্রীয়ার্সনের ছড়া-সংগ্রহ ও দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠে প্রাচীন সাহিত্যামোদিগণ গোপীচন্দ্র সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়াছিলেন এবং এই বিষয়ে কোন পুঁথি পাওয়া যায় কিনা সে সম্পর্কে সন্ধান করিতেছিলেন। চুঁচুড়ার শিবচন্দ্র শীল স্থানীয় এক বৈষ্ণবীর নিকট এইরূপ একখানি গোপীচন্দ্রবিষয়ক পুঁথি সংগ্রহ করেন—গোপীচন্দ্র বিষয়ক ইহাই প্রথম পুঁথি। পুঁথিটি ১২০৬ সালে লিখিত—দুর্লভ মল্লিকের

'গোবিন্দচন্দ্রের গীত'। এবিষয়ে শিবচন্দ্র একটি প্রবন্ধ লিখিয়া সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশের জন্ত প্রেরণ করেন এবং সাহিত্য পরিষদের নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অনুরোধে পুঁথিখানি সাহিত্য পরিষদে সমর্পণ করেন। ১৩০৬ সালের ১লা শ্রাবণ পরিষদেব অধিবেশনে উক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া শিবচন্দ্র "বৌদ্ধতান্ত্রিক যোগিমতেব কাব্য" দুর্লভ মল্লিকের এই কাব্যের বিস্তারিত পরিচয় দেন। তাঁহাব মতে এ কাব্য বৌদ্ধ মতাদর্শেই রচিত হইয়াছিল। যাহা হউক ১৩০৮ সালে তাঁহার সম্পাদনায় বিস্তারিত ভূমিকা ও টীকাটিপ্পনী-সহ এই কাব্য প্রকাশিত হইল। প্রাপ্ত তথ্যাদির দ্বারা শীল মহাশয় কাব্যটির ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও ধর্মতত্ত্বেব স্বরূপ আবিষ্কারের চেষ্টা করিলেন। তাঁহার তথ্যানুসন্ধিৎসা ও নিপুণ গবেষণাশক্তি এখনও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ইদানীং নূতন তথ্যাদি আবিষ্কারে হয়তো শিবচন্দ্র শীলের অনেক সিদ্ধান্ত পবিত্যক্ত হইবে, কিন্তু বহু পূর্বে তিনি গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ শক্তিব সাহায্যে স্বল্প উপাদান হইতে যেরূপ তথ্য ও তত্ত্বেব পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাব গবেষকসুলভ নিষ্ঠা বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য।

মোট ৭২২ পয়ার পংক্তিতে সমাপ্ত এই কাব্য ১২০৬ সালে (১৮০০খ্রী: অ:), কলিকাতার এণ্টালী অঞ্চলে নকল করা হইয়াছিল তাহা প্রাপ্ত পুঁথির পুষ্পিকা হইতে জানা যাইতেছে। 'দুর্লভ মল্লিক' কবি সম্বন্ধে আর কোন পরিচয় কাব্য মধ্যে পাওয়া যায় না। এই কাব্য আকারে অতি সংক্ষিপ্ত, এবং বর্ণনার রীতিও বেশ সংহত। পূর্বতন ছড়া-পাঁচালীর সহিত এই পুঁথির একটা বড় পার্থক্য, ছড়া-পাঁচালীতে লোকরঞ্জক গালগল্পই অধিক, নাথধর্মের মূল আদর্শ তাহাতে রক্ষিত হয নাই। কিন্তু দুর্লভ মল্লিকের কাব্য নাথধর্মের প্রচার-গ্রন্থ রূপেই রচিত হইয়াছিল। তাই ইহাতে আখ্যানভাগের বৈচিত্র্য অপেক্ষা যোগধর্মের ব্যাখ্যাই অধিক স্থান জুড়িয়া আছে। উপরন্তু এই কাব্যের সমাপ্তিতে গোপীচন্দ্র (গোবিন্দচন্দ্র) সংসার ত্যাগ করিয়া যোগধর্মের মহিমা স্বীকার করিয়াছেন, মৌখিক ছড়ার মতো পুনরায় ঘরে ফিরিয়া সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন নাই। মোটামুটি এ কাহিনীতে খুব একটা বৈচিত্র্য বা বিশেষ ধরনের কাব্যগুণ নাই; মধ্যম প্রতিভার কবি তরল পয়ারে এই কাব্য লিখিয়াছেন; সুতরাং ইহাতে উচ্চ-

শ্রেণীর কবিত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে না।[৬৬] দুই-এক স্থলে কবি চরিত্র-মাহাত্ম্য বর্ণনায় কিঞ্চিৎ রচনাকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। হীরা নটী গোপীচন্দ্রকে লালসামত্ত করিবার জন্য প্রলুব্ধ করিলে গোপীচন্দ্র বলিয়াছিলেন :

কর্ণে হাথ দিয়া বলে রাজা গোবিন্দাই।
তুমী মোর জননী এমন বল্য নাই॥
জেমন আপন মাতা সেইরূপ বাঁদী।
দুখ্ অবসানে গুরু লয়্যা যাবে আসি॥

এই উক্তি গোপীচন্দ্রের চরিত্রের পবিত্রতাই প্রমাণ করিতেছে। যাহা হউক এ কাহিনী যে লোকসাহিত্য হইতেই গৃহীত তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকসাহিত্যের অযথা-দীর্ঘ পাঁচালীর বর্ণনা এই পুঁথিতে অনেক সংক্ষিপ্ত হইয়াছে—যদিও অপ্রাসঙ্গিকভাবে যোগীসিদ্ধার তত্ত্বকথা ইহাতে অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে, এবং সমাপ্তির দিকে কাব্যরস অপেক্ষা যোগসাধনের কথাই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। তথাপি কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বেশ তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়াছে।

ভবানীদাসের ময়নামতীর গান ১৩২১ সনে ঢাকা সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়; সম্পাদনা করেন ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত। ১৩১৯ সালে এই সম্পাদনা কার্য আরম্ভ হয়।[৬৭] দুইখানি পুঁথি অবলম্বনে ভট্টশালী মহাশয় ইহা সম্পাদনা করেন। প্রথম পুঁথিখানি ত্রিপুরার ময়নামতী পাহাড়ের উত্তরদিকস্থ শোভন গাজি নামক কোন এক স্কুলশিক্ষকের নিকট হইতে সংগৃহীত হয়। দ্বিতীয় পুঁথিখানিও এক মুসলমান ভদ্রলোকের বাটী হইতে উদ্ধার করা হয়। প্রথম পুঁথিতে কিছু কিছু মুসলমানী পদ ও বৈষ্ণব কবিতা ছিল। সম্পাদক নলিনীকান্ত সেগুলি কেন বাদ দিলেন বুঝা যাইতেছে না। এই পুঁথিতে দেখা যাইতেছে, কাব্যটি প্রথমেই ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্রের যোগতত্ত্ববিষয়ক আলাপের দ্বারা শুরু হইয়াছে—এবং সে বর্ণনা

---

৬৬ এই পুঁথিটি পড়িয়া সাহিত্য পরিষদের রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী বলিয়াছিলেন, "পুস্তকের সাহিত্যাংশ অপেক্ষা ঐতিহাসিকত্ব বড় বেশী।" (শিবচন্দ্র শীলের 'গোবিন্দচন্দ্র গীতে'র ভূমিকা, পৃ. ।১/০) কথাটা ঠিকই। তবে ইহার ঐতিহাসিকত্ব অধুনা ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে অনেক স্থলে অলীক প্রমাণিত হইয়াছে।

৬৭ ১৩১৯ সালে বৈকুণ্ঠ দত্ত ত্রিপুরা হইতে ভবানীদাসের ময়নামতীর গাথা আবিষ্কার করেন।—নলিনীকান্ত সম্পাদিত স্কুর মহম্মদের গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, পৃ. ৭৫

যেন অকস্মাৎ আরম্ভ হইয়াছে—পূর্বাপর সঙ্গতি নাই। সম্পাদক অনুমান করেন, "গ্রীয়ারসনের সংগ্রহে মাণিকচন্দ্রের গানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই পালাতেও বোধ হয় মাণিকচন্দ্রের কথাই আগে ছিল।"[৬৮] ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন, গ্রীয়ার্সনের গানটি "ভবানীদাসের গীতেরই সংক্ষিপ্ত রূপ।"[৬৯] এ মন্তব্য ঠিক নহে। কারণ ভবানীদাসের কাব্য অপেক্ষা মাণিকচন্দ্রের গান সংক্ষিপ্ত নহে, প্রায় সমান-সমান। উভয়ের সাদৃশ্যও খুব ঘনিষ্ঠ নহে। সুতরাং ভবানীদাসের কাহিনী অবলম্বনেই গ্রীয়ার্সনের মাণিকচন্দ্রের গান পরিকল্পিত, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নহে। মনে হয় লোকমুখে যে সমস্ত ছড়া-পাঁচালী চলিত, ভবানীদাস তাহা অবলম্বনেই এই পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন।[৭০] কারণ গ্রীয়ার্সন ও বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের ছড়াসংগ্রহের সঙ্গে ভবানীদাসের পরিকল্পনাগত সাদৃশ্য ও গ্রন্থনবিন্যাসের ঐক্য সহজেই চোখে পড়িবে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এই পুঁথি সম্বন্ধে কিছু নূতন তথ্য দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই কাব্যের মাত্র চারি স্থানে ভবানীদাসের ভণিতা আছে, কিন্তু এই ভণিতা মূল ছন্দের সহিত মিশ খায় নাই, কেহ কেহ অন্য ভণিতা পাল্টাইয়া ভবানীদাস বসাইয়া দিয়াছে, ইহাতে শঙ্খিনী-চিত্রিণী ইত্যাদি নারী জাতির লক্ষণ দুইবার বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইলে কি প্রাপ্ত কাব্য দুইজন কবির রচনা? যোগেশচন্দ্র ইহাতে আবার অনেক মুসলমানী শব্দ পাইয়াছেন (উল্লা, আলিম, মিরাশ, রজু, গেলাপ, দিনদুনিয়া, দখল)। তাই তিনি অনুমান করেন, "ভবানীদাসের 'ময়নামতীর গানে' মুসলমান কবি বিলক্ষণ হাত চালাইয়াছিলেন। এমনও হইতে পারে মূলগান মুসলমানের রচিত। তাহাতে ভবানীদাস নিজের নাম জুড়িয়া দিয়াছেন।"[৭১] এ অনুমান অযৌক্তিক নহে।

১৯২৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গোপীচন্দ্রের গানের যে

---

৬৮ ঐ, প্রথম পৃষ্ঠার পাদটীকা।

৬৯ ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ইতি. ১ম (অপরার্ধ)

৭০ নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলিয়াছেন যে, ভবানীদাসের পুঁথি বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ত্রিপুরা হইতে আবিষ্কার করেন।

৭১ ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত ময়নামতীর গানে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে এই পুঁথিটি 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী" নামে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, নলিনীকান্ত ভট্টশালীর সহযোগী সম্পাদক বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত দুইজন মুসলমান ভদ্রলোকের নিকট ভবানীদাসের দুইখানি পুঁথি দেখিয়া তাহা হইতে মিলাইয়া 'ময়নামতীর গান' প্রকাশ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুঁথি (শোভনগাজির সম্পত্তি) তাঁহারা দ্বিতীয় বার হাতে পান নাই। ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে যখন গোপীচন্দ্রের গান মুদ্রিত হইতেছিল, তখন চট্টগ্রামের মুন্সি আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ এই পুঁথিখানি শোভনগাজির নিকট হইতে হস্তগত করিয়া[৭২], এবং আরও তিনখানি পুঁথির সহিত পাঠ মিলাইয়া উহা মুদ্রণের জন্য দীনেশচন্দ্রের হস্তে দিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত গোপীচন্দ্রের গানের অন্যতম সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ উহা অবলম্বনে মুদ্রণের পাঠ তৈয়ারি করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভবানীদাস সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের কবি ; তাঁহার চারিখানির পুঁথির মধ্যে দুইখানি পূর্বেই নলিনীকান্তের সহযোগী বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত দেখিয়া তাহা অবলম্বনে ময়নামতীর গানের পাঠ প্রস্তুত করেন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে মুন্সি আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ আরও দুইখানি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া সেই চারিখানি পুঁথির পাঠ মিলাইয়া যে পাঠ প্রস্তুত করেন, তাহাই বসন্তরঞ্জনের দ্বারা সংশোধিত ও সম্পাদিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে গোপীচন্দ্রের গানের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এইস্থানে উল্লেখযোগ্য যে, চারিখানি পুঁথিই মুসলমানের বাটী হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। নলিনীকান্ত-

---

৭২ বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয়, যিনি প্রথমে ভবানী দাসের পুঁথি আবিষ্কার করেন, তিনি উক্ত গাজির নিকট হইতে এই পুঁথি দুইখানি অবলম্বনে পাঠ তৈয়ারি করিলেও পুঁথি আর হাতে পান নাই। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উক্ত কাব্য সংগ্রহ করিতে গিয়া মুন্সি আবদুল করীম সাহেব উক্ত শোভনগাজির নিকট পুঁথিটি পাইয়াছিলেন। ইহাতে একটু ক্ষুব্ধ হইয়া নলিনীকান্ত ভট্টশালী তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত সুকুর মহম্মদের 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে'র সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলিয়াছেন, "বৈকুণ্ঠবাবু এই পুঁথিখানি শোভনগাজির নিকট আদায় করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু চট্টগ্রামের স্কুলসমূহের পরিদর্শকের অফিসের কেরাণি শ্রীযুক্ত মুন্সি আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয়, সহজেই ক্ষুদ্রপ্রাণ পাঠশালার শিক্ষকের নিকট হইতে এই পুথি আদায় করিয়া লইয়া যান।"—পৃ. ৭৩

সম্পাদিত ময়নামতীর গান এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত গোপীচন্দ্রের পাঁচালীর মূল অবলম্বন একই পুঁথি; সুতরাং বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মুন্সি আবদুল করীমকে যে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়াছেন, তাহার অনেকটা নলিনীকান্ত ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্তের প্রাপ্য। কারণ তাঁহারাই প্রথমে এই পুঁথির পাঠ লোকলোচনের সমক্ষে আনিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের কাব্য প্রকাশের পর তবে আবদুল করীম ভবানীদাসের পুঁথির সন্ধান করিয়াছিলেন।

ভবানীদাসের পুঁথির কাহিনী অনেকটা লোকসাহিত্য ও ছড়াপাঁচালীর অনুরূপ তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। ভাষা ও কলাশিল্পের বিচারে এইকাব্য আদৌ উল্লেখযোগ্য নহে। সমাপ্তিতে দেখা যাইতেছে, গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসজীবনের পর ঘরে ফিরিয়া সংসারীর জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।[৭৩] দুর্লভ মল্লিকের কাহিনীর মতো ইহাতে গোপীচন্দ্রের পুনরায় সংসার ত্যাগের কোন কথা নাই। লোককথা-জাতীয় এই কাহিনীটি অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই ইহার একমাত্র গুণ। রচনা, ভাষা, চরিত্রসৃষ্টি—কোনটিই কাব্য পদবাচ্য হইতে পারে নাই।

সর্বশেষে আর একখানি গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস বিষয়ক পুঁথি-আশ্রয়ী কাব্যের কথা উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১৩৩২ সালে আবদুল সুকুর মহম্মদের 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের গোড়ার দিকে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় মুখবন্ধে ('কবি আবদুল সুকুর মহম্মদের গোপীচান্দের গীত') এবং ভূমিকায় গ্রন্থকার, গ্রন্থ, নাথধর্ম, গোপীচন্দ্রবৃত্ত, ভাষা ও অন্যান্য তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। এই মুখবন্ধে ও অন্যান্য অংশে যোগেশচন্দ্র ইতিপূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত গোপীচন্দ্রের গানের অনেক স্থানের ঘোর প্রতিবাদ করেন এবং উহার সম্পাদক দীনেশচন্দ্র ও বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের অনেক মন্তব্যের যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করেন। এই কাব্যের পরিশিষ্টে সম্পাদকীয় মন্তব্যে ডঃ ভট্টশালী মহাশয় (তখন তিনি ডক্টর হন নাই) নানা প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই আক্রমণের একটা কৌতুকজনক হেতুও ছিল। তাহা পরে আমরা উল্লেখ করিব।

---

৭৩ নানা দ্রব্য নানা বস্তু করিল ভোজন।
সেই দিনি গোয়াইল আনন্দিত মন॥

বাংলা ১৩২০ সালের মাঘমাসে ভট্টশালী মহাশয় দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমার অন্তর্গত ফকণ্ডা গ্রামের এক মুসলমান গৃহস্থের বাড়ী হইতে স্কুর মহম্মদের গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস আবিষ্কার করেন। পুঁথিটির প্রথম দিকে পাঁচখানি ও শেষের দিকে কয়েকখানি পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়াছিল। আবিষ্কর্তা পুঁথিখানিকে প্রাচীন পুঁথি সম্পাদনার রীতিতেই প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে তাহা মুদ্রিত করিতে পারিলেন না, ঢাকা ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ও ঐ একই কারণে মুদ্রণকার্যে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। যাহা হউক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অর্থানুকুল্যে এবং যোগেশচন্দ্রের ভূমিকা ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা সহ ১৩৩২ সালে আষাঢ় মাসে (১৯২৫) ঢাকা সাহিত্যপরিষদের গ্রন্থাবলীরূপে সুকুর মহম্মদের 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' প্রকাশিত হইল। ইহার সামান্য কিছু পূর্বে ১৯২৪ সালের মাঝামাঝি বা শেষার্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দীনেশচন্দ্র, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ও বসন্তরঞ্জনের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া গোপীচন্দ্রের গানের যে দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত হয়, তাহাতে স্কুর মহম্মদের গোপীচাঁদের সন্ন্যাস মুদ্রিত হইয়াছিল। এই ব্যাপার লইয়া নলিনীকান্ত ও দীনেশচন্দ্রের মধ্যে একটু মনান্তর সৃষ্টি হইয়াছিল। নলিনীকান্তের পুঁথি মুদ্রিত হইয়া বাহির হইবার পূর্বেই দীনেশচন্দ্র বটতলা হইতে স্কুর মহম্মদের একখানা ছাপাগ্রন্থ অবলম্বনে তাড়াতাড়ি গোপীচন্দ্রের গান প্রকাশ করিয়া নলিনীকান্তকে খুব জব্দ করিলেন মনে করিয়াছিলেন। কারণ তিনি গোপীচন্দ্রের গানের মুখবন্ধে ভট্টশালীকে খোঁচা দিয়া লিখিয়াছিলেন, "ঢাকা মিউজিয়াম হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই দুর্লভ পুঁথি প্রকাশ করিবেন বলিয়া আমাদিগকে লোভ দেখাইয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি না ছাপাইলে যে এই পুঁথি আর লোকলোচনের বিষয়ীভূত হইবে তাহা হয়তো অনেকেরই মনে ছিল না, কিন্তু স্তর আশুতোষের আশীর্বাদ ও কল্যাণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ইহার সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণের কার্যভার লঘু করিয়া দিলেন। আশা করি ইহাতে তিনি ক্ষুব্ধ না হইয়া বরঞ্চ আমাদের কার্যে প্রীতি প্রদর্শন করিবেন।"

দীনেশচন্দ্র ও বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য স্কুর মহম্মদের কোন পুঁথি পান নাই, বটতলা হইতে ছাপা নির্ভরের অযোগ্য পুস্তিকা হুবহু বিশ্ববিদ্যালয়ের গোপী-

চন্দ্রের গানে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। নলিনীকান্ত পুরাতন পুঁথি অবলম্বনে সুকুর মহম্মদের কাব্য মুদ্রিত করিতেছেন জানিয়াও দীনেশচন্দ্র অশোভন দ্রুততার সঙ্গে বিনা পুঁথিতেই সুকুরের কাব্য ছাপিয়া আগে প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় নলিনীকান্তের প্রতি কিঞ্চিৎ বক্রকটাক্ষ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন। অবশ্য নলিনীকান্তও এ জন্য তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থের পরিশিষ্টে সম্পাদকীয় মন্তব্যে দীনেশচন্দ্রের খোঁচাটুকু সুদ-সমেত ফিরাইয়া দিয়া লিখিয়াছিলেন, "এই দীন ব্রাহ্মণের কার্যভার লঘু করিয়া দিবার প্রয়াসের জন্য দীনেশবাবু ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ গ্রহণ করুন।" নলিনী-কান্তের সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে মনে হইতেছে, দীনেশচন্দ্র তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিবার জন্যই যোগেশচন্দ্রের ভূমিকা ছাপা হইতেছে সংবাদ পাইয়া এবং উহার এক ফর্মা চাহিয়া লইয়া (নলিনীকান্তের সম্পাদকীয় মন্তব্য—পৃ. ৭৩) গিয়া স্বাভাবিক সৌজন্য বিসর্জন দিয়া "সুকুর মামুদের গাথার একটা বটতলার ছাপা পুথি পাইয়া অমনি তাহা ছাপিয়া দিয়া দীনেশবাবু যে ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্যিকবৃন্দ তাঁহাকে অগণিত সাধুবাদ প্রদান করিবেন সন্দেহ নাই।…তবে বঙ্গে সাহিত্যিক শীল শীঘ্রই মহানন্দে মহাপথে প্রস্থিত হইবে, এইমাত্র আশঙ্কা।" নলিনীকান্তের এই ক্ষুব্ধ উক্তির যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। দীনেশচন্দ্র মূল পুঁথির সন্ধান না করিয়া বটতলা প্রকাশিত ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ অপদার্থ বহির অপপাঠ হুবহু ছাপিয়া-ছেন, এবং ভট্টশালীকে কিঞ্চিৎ বিমূঢ় করিবার জন্য তাঁহার নিকট হইতে উপাদান ও তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার কিছু পূর্বে 'গোপীচন্দ্রের গানে' (২য়) সুকুর মহম্মদের পালা ছাপাইয়া সাহিত্যিক শুভবুদ্ধি বিসর্জন দিয়াছিলেন, তাহা দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করিতে হইবে।

নলিনীকান্ত দিনাজপুর জেলা হইতে সুকুর মহম্মদের যে পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বড় জোর একশত বৎসরের পুরাতন হইবে।[৭৪] কবির পুরা নাম আবদুল মহম্মদ সুকুর, পিতার নাম সেখ আনার ফকির। বালুরঘাটের সিন্দূর-কুসুম গ্রামে কবির নিবাস ছিল। কবি হিন্দুর পুরাণ শুনিয়াই

৭৪ ভূমিকায় বলা হইয়াছে, "উপস্থিত পুঁথির লিপিকালও ১২৫০ সাল।"

গোপীচন্দ্রের কাহিনী লিখিয়াছিলেন, তাহাও তিনি জানাইয়াছেন। "কবির ভাষা প্রাঞ্জল। কিন্তু নারীর বেশভূষা ও রূপ বর্ণনা করিবার সময় তিনি সংস্কৃত শব্দের লোভ ছাড়িতে পারেন নাই। অনেক শব্দের অপপ্রয়োগ করিয়াছেন, বর্ণনাও ব্যর্থ হইয়াছে। তথাপি তাঁহার রচনায় সংযম আছে; অন্যান্য কবির ন্যায় গ্রাম্যজনসুলভ অশ্লীলতা নাই। ভাষা দেখিলে কবিকে দুই একশত বৎসরের অধিক পুরাতন বোধহয় না।" যোগেশচন্দ্রের এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সুকুর মহম্মদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। কাব্যটির যথার্থ কি নাম ছিল জানা যাইতেছে না। প্রথমে নলিনীকান্ত মনে করিয়াছিলেন, ইহার নাম বুঝি গোপিচান্দের গীত। পরে যোগেশচন্দ্রের নির্দেশে ইহা 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' নামে মুদ্রিত হয়।

দীনেশচন্দ্র 'গোপীচন্দ্রের গানের' দ্বিতীয় খণ্ডে সুকুর মহম্মদের যে আখ্যান মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহার নাম দেন যোগীর পুঁথি [৭৫]—যদিও তিনি কোন পুঁথির পাঠ মুদ্রিত করেন নাই। তিনি রঙপুরের জমিদার নলিনীকান্ত রায়চৌধুরীর নিকট ১৩১৯ সালে মুদ্রিত এই কাব্যের একটি খণ্ড সংগ্রহ করেন। মুখবন্ধে এ সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র বলিয়াছেন, "শুকুর মামুদ প্রণীত যোগীর পুঁথি নামক এই গানের যে পাঠ মুদ্রিত হইল, তাহা রংপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত রায়চৌধুরী মহাশয় আমাকে দিয়াছেন। যদিও মাত্র বাঙ্গলা ১৩১৯ সালে এই পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছিল, তথাপি এখন ইহা একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে।. এই পুঁথির প্রকাশক শ্রীযুক্ত মুন্সী গোলাম রছুল খোনকার।" এখানে দীনেশচন্দ্র পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই যে, দ্বিতীয় খণ্ডে গৃহীত যোগীর পুঁথির পাঠ ছাপা গ্রন্থ হইতে, না পুঁথি হইতে গৃহীত হইয়াছে। আসল কথা ভাঙিয়া বলিয়াছেন অন্যতম সম্পাদক বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য—"তৃতীয় খণ্ডে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস নামে যে সুকুর মামুদ প্রণীত পুস্তক প্রকাশিত হইল, উহার এক মুদ্রিত সংস্করণ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। অন্যতম সম্পাদক রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের চেষ্টায় এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।" এ বিষয়ে আমাদের মনে হয়, নলিনীকান্ত সম্পাদিত সুকুর মহম্মদের গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস অধিকতর নির্ভরযোগ্য, কারণ তিনি একটি

৭৫ ছাপা গ্রন্থে আছে 'যোগান্ত পুঁথি' (বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ গোপীচন্দ্রের গান, পৃ. ৩৯০)।

একশত বৎসরের পুরাতন পুঁথির পাঠ যথাযথভাবে মুদ্রিত করিয়াছেন। অপরদিকে দীনেশচন্দ্র বটতলায় ছাপা একখানি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ গ্রন্থ 'যদ্দৃষ্টং তচ্ছাপিতং' করিয়াছেন।

নলিনীকান্তের পুঁথি-আশ্রয়ী 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' এবং দীনেশচন্দ্রের ছাপাগ্রন্থের পুনর্মুদ্রিত অংশে কিছু কিছু বৈষম্য আছে। অনেক স্থলে বটতলার গ্রন্থের প্রকাশক যথেচ্ছা পাঠ বদলাইয়া আধুনিক শব্দ জুড়িয়া দিয়াছেন। নিম্নে এইরূপ কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে:

॥ নলিনীকান্তের পুঁথি অবলম্বিত পাঠ ॥

এহিত নামের গুণ শাবধান হইয়া শুন
পূর্বে জপিল রঘুনাথ।
শেহি নিজ নামের বলে পাথার ভাসিল জলে
সমরে রাক্ষস করিল নিপাত॥
শতেক প্রস্তরের শেতু বান্ধিল রামের হেতু
ভল্লুক বানোর হৈল পার।
নিজ নাম জাপন করে ভক্ষকে রাক্ষস মারে
শোবর্ণপুরি লঙ্কা কৈল ছারখার॥

॥ দীনেশচন্দ্রের সম্পাদিত গ্রন্থে বটতলার পাঠ ॥

এহিত নামের গুণ কর্ণ পাতিয়া শুন
প্রথমে জপিল রঘুনাথ।
নিজ নামের বলে পাথর ভাসিল জলে
সবংশে রাবণে কৈল পাত॥
শত প্রস্তরের সেতু বান্ধিল নামের হেতু
ভালুক বানর হৈল পার।
নিজ নামের জোরে বানরে রাক্ষসে মারে
লঙ্কাপুরী কৈল ছারখার॥

এইরূপ পাঠ-বৈষম্যের জন্য নলিনীকান্ত যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা অযৌক্তিক নহে, "কৌতূহলী পাঠক পাঠ মিলাইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বটতলার পুঁথি পদে পদে স্পষ্ট ভুল পাঠে ভরা ছিল,—বটতলার পুঁথির প্রকাশক অনেক স্থানেই প্রাচীন পুঁথির পাঠোদ্ধার করিতে না পারিয়া অর্থশূন্য যা' তা' পাঠ ছাপিয়াছিলেন।"[৭৬] সুকুর মামুদ সংস্কৃত ভাষা ও পুরাণাদির কাহিনী সম্বন্ধে

৭৬ গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, সম্পাদকীয় মন্তব্য, পৃ. ৭২-৭৩

নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন না, তাহা পুঁথির মধ্যে নানা উল্লেখ হইতে বুঝা যাইবে। দুই চারিটি আরবী ফারসী শব্দ থাকিলেও কাব্যটির গঠনরীতি বিশেষভাবে সংস্কৃত প্রভাবিত। কিন্তু অজ্ঞ লিপিকার অনেক সময় অজ্ঞতার জন্য ঠিক শব্দটি বুঝিতে পারে নাই। যাহা হউক মাঝে মাঝে ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গী অন্তর স্পর্শ করে। যেমন অদুনা-পদুনার বিলাপ :

কান্দিয়া উদুনা চলে রাজার শদনে।
নারির জৌবন প্রভু স্বামির কারণে॥
স্বামি বিনে নারিলোকের নাহি জাতি কুল।
পতি বিনে নারি যেন ধুতুরার ফুল॥
বাতাসে ম্রিতিকার তির্ন্ন গগনে উড়ি তোলে।
পতিবিনে যুবতিক বাপ মাএ মন্দ বোলে॥
উদুনা বোলেন স্বামি কহি তোমার স্থান।
শমুখ হৈয়া কহ কথা যুড়াউক প্রাণ॥
তোমার শন্ন্যাশ স্বামি দেখিয়া নয়নে।
কেমনে ধরিব প্রাণ নারি চারি জনে॥
শিশের শেন্দুর আমার নয়ানের কাজল।
তোমার শন্ন্যাসে প্রভু শকল বিফল॥

(নলিনীকান্ত সম্পাদিত গোপীচাঁদের সন্ন্যাস)

এই বিলাপের আন্তরিকতা নিতান্ত শূন্যগর্ভ নহে। কাব্যের শেষাংশে গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস লইয়া ঘর ছাড়িয়াছেন, কবিও সর্বশেষেসবিস্তারেযোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া এবং পাথর পূজা নিষেধ করিয়া দেহের মধ্যে নিরঞ্জনের উপলব্ধি করিতে নির্দেশ দিয়া কাব্য শেষ করিয়াছেন।[৭৭] এই বর্ণনা হইতে সুকুর মামুদকে যোগপন্থী বলিয়াই মনে হয়, কারণ তিনি যেভাবে অতি নিপুণতার সঙ্গে যোগপন্থা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে সে বিষয়ে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অধিকার ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। যাহা হউক এই সংক্ষিপ্ত কাহিনীতে নূতন কোন বিষয়-বৈচিত্র্য না থাকিলেও, ভাষা ও বিন্যাস পদ্ধতির জন্য কবিকে বেশ শিক্ষিত বলিয়াই মনে হইতেছে। বটতলায় ছাপা গ্রন্থটির সমাপ্তিতে স্বয়ং প্রকাশক পয়ারে তাঁহার নামধাম, পিতা ও ভ্রাতার পরিচয় দিয়া বেশ মুন্সিয়ানা দেখাইয়াছেন :

৭৭ এই অংশ নলিনীকান্তের খণ্ডিত পুঁথিতে নাই, দীনেশচন্দ্র যে ছাপা গ্রন্থ হইতে পাঠ মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহাতে এই অংশটুকু আছে।

খোন্দকার জহিরদ্দিন বাবাজীর নাম।
বংশতে রইস বটে গরীবানা ধাম॥
এক ভ্রাতা নাম তার রইস উদ্দিন।
বাছাল ইমানে রাখে এলাহি আলমিন॥
... ...
মুন্সি পাড়া গ্রাম মাঝে বসতি আমার।
সে গ্রাম অধীন হয় জেলা নদীয়ার॥
মসূহুর জুনিয়াদহে আছে ডাকঘর।
মেলায় দোকান মম আছে বরাবর॥

প্রকাশকও বেশ কবিত্ব করিয়া নিজের নামধাম জ্ঞাতিগোত্র, মায় ডাকঘর পর্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন। তাই আমাদের বিশেষ সন্দেহ হইতেছে, তিনি কিঞ্চিৎ কবিত্বশক্তির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া খুব সম্ভব মূল পুঁথিতে যথেচ্ছা হাত চালাইয়াছিলেন এবং দীনেশচন্দ্র সেই রূপান্তরিত মার্জিত কাব্যখানির প্রাচীনত্বের দোহাই দিয়া মহানন্দে সেই পুস্তিকা ছাপিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে গোপীচন্দ্র ময়নামতী বিষয়ক আর দুইখানি পুঁথির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। পুঁথি দুইখানির সন্ধান দিয়াছেন ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়। তন্মধ্যে একখানি প্রাচীন নাটক, আর একখানি পুরাদস্তুর কাব্য। এই দুইখানির অনুলিপি তাঁহার নিকটে আছে, অন্য কেহ দেখেন নাই। সুতরাং তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ হইতে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

নেপাল হইতে 'গোপীচন্দ্র নাটক' নামে নেওয়ারী গদ্যে রচিত একখানি নাটকের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। প্রথমে ডঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহার একখানি কপি সংগ্রহ করেন, পরে ডঃ সুকুমার সেন ইহার প্রতিলিপির অনু-আলোকচিত্র (microfilm) আনাইয়াছেন। নাটকটি নেপালী বা নেওয়ারী গদ্যে রচিত হইলেও ইহার প্রধান কাহিনী গানে বিবৃত এবং সেই গানের ভাষা বাংলা। নাটিকাটি ১৬২০-৫৭ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল।[৭৮] সুতরাং এই দিক দিয়া গানগুলির বিশেষ মূল্য আছে। মোটামুটি কাহিনী একই প্রকার, তবে খেতুকে এই নাট্যকাব্যে গোপীচন্দ্রের বিরোধী ও বিদ্রোহী রূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। খেতু নাকি বঙ্গকুমার নামক রাজার

৭৮ ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ইতি. ১ম (অপরার্ধ), পৃ. ২৪০

সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া গোপীচন্দ্রের সমস্ত সৈন্ত ধ্বংস করে। গোপীচন্দ্র তখন খেতুর প্রাণদণ্ডাদেশ দিলেন। যাহা হউক রাণীরা খেতুকে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিলেন। তারপর মাতা ময়নামতীর নির্দেশে গোপীচন্দ্র হাড়িপার শিষ্য হইলেন—রাণীদের উপরোধ-অনুরোধ গ্রাহ্য করিলেন না। অবশ্য শেষাংশটি নাটকীয় সম্ভাবনায় পূর্ণ। রাজা যখন যোগীর বেশে অদুনাপদুনার নিকট ভিক্ষা চাহিতে গেলেন, তখন রাণীরা তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিলেন। তখন গোপীচন্দ্র গুরুর নিকট গিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার যোগী বেশ সত্ত্বেও রাণীরা তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে—এখন কি করা যায়। জালন্ধর তাঁহাকে গৃহবাসী হইতে আজ্ঞা দিলেন। এখানেও দেখা যাইতেছে, সর্বশেষে গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস লইয়া গৃহত্যাগ করেন নাই। অভিনয়ের শেষাংশে অদুনা-পদুনার বিলাপজনিত করুণ রস সৃষ্টি হয়তো নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল না। তাই তিনি গোপীচন্দ্রকে ঘরে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। এই নাটকটি সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা, তাহা ডঃ সুকুমার সেন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং সনতারিখ অনুসারে সে সিদ্ধান্ত যথার্থ বলিয়া মনে হয়।[৭৯] কিন্তু ভাষা এত আধুনিক ধরনের যে স্বতঃই সন্দেহ হয়। যেমন—

চন্দ্রকেতু নাম রাজা এই রাজ্যে ছিল।
রাজ্যখানি আছে বাবা, রাজা কোথা গেল ॥
যদি বাবা শিখিবে ব্রহ্ম গেয়ান।
হস্তী ঘোড়া পয়দল ব্রাহ্মণে কর দান ॥

কিংবা

প্রভাতে বিহান হৈল ঘৃত অন্ন যোগাইব
ভৃঙ্গার ভরিয়া দিব পানি।
সুন্দিয়াকে শয্যা দিব এ খাট পালঙ্কে রে
যোগী হৈয়া কোন সুখ জানি ॥

এ ভাষা অতি অর্বাচীন কালের। প্রথম উদ্ধৃতির 'বাবা' সম্বোধন মধ্যযুগে কখনই চলিত না, ইহার স্থলে 'বাপা' বা 'বাপু' ব্যবহৃত হইত। ডঃ সেন যেটুকু দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাতে ভাষাকে একশত বৎসরের অধিক প্রাচীন মনে হইতেছে না। ভাষার উৎকট আধুনিকতাই গ্রন্থটি অর্বাচীন বলিয়া সাক্ষ্য দিবে। 'না মারহ কোটবাল না মার পরাণে', 'দুধ এড়িয়া রাজা খাইল

৭৯ ঐ, পৃ. ২৪০

কালাবিষ,' 'গঙ্গা যার শিরে রহে দুর্গা যার নারী', 'সরোবর শুখায়িল মাছ নিবে চিলে', 'ডাক দিয়া আন ব্রাহ্মণ সজ্জন', 'মা ময়নামতী কাঁদে অন্তঃপুরে,' 'মাথা মুড়িয়া রাজা মনে মনে হাসে', প্রভৃতি বাক্য-বাক্যাংশ যে অতি আধুনিক কালের স্বাদগন্ধ বিশিষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। ডঃ সেন এবিষয়ে মন্তব্য করিয়াছেন, "নাটকটির মূলে ছিল বাঙ্গালা রচনা এবং সে রচনা তাহা সেকালের কবিতা হিসাবে নিন্দনীয় ছিল না। ভাষার সারল্যে ও ঋজুতায় প্রাচীনত্ব প্রকটিত।" আমাদের মতে বরং এই সারল্য ও ঋজুতাই ইহার অর্বাচীনত্ব সুস্পষ্ট করিয়াছে। যাহা হউক এই বিচিত্র নাটিকাটি প্রকাশিত না হইলে আর কোন মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

ডঃ সেন গোপীচন্দ্র বিষয়ক আরও একখানি নামধামহীন পুঁথির সন্ধান দিয়াছেন।[৮০] শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল মহাশয় এবিষয়ে কয়েকখানি বিক্ষিপ্ত পত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহারও বিস্তারিত বর্ণনা ডঃ সেন তাঁহার সাহিত্যের ইতিহাসের নবতম সংস্করণে দিয়াছেন। এই পুথির ভাষা প্রভৃতি দেখিয়া ইহাকেও অত্যন্ত অর্বাচীন মনে হইতেছে—অনেকটা গোপীচাঁদের মৌখিক পাঁচালীর মতো। গোপীচন্দ্রের সঙ্গে রাণীদের পুনর্মিলনে ইহা সমাপ্ত হইয়াছে। ইহা কোন বিশেষ কবির রচনা হইলে ভণিতায় কোন-না-কোন স্থলে তাঁহার নাম থাকিত। এইরূপ গালগল্প যুগী সমাজে সেযুগে প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। যাহা হউক পুঁথিটির ভাষা অত্যন্ত আধুনিক হইলেও বর্ণনারীতি বেশ পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি। যেমন—

আমারে ছাড়িয়া তুমি যাইতে নারিব।
বাজননূপুর হৈয়া চরণে বাজিব॥
রাজা বলে বিধি নির্বন্ধ বোঝ মনে।
যথাতথা যাই আমি দেখিবা শয়নে॥
তোমার মুক্তি করিনু সাধিনু বরদান।
আমারে পাইবে তুমি পার্বতীর স্থান॥
সংসারের মাতা তিনি জগৎ জননী।
তোমারে রাখিয়া তথা আসিব এখনি॥

---

৮০ ডঃ সেন, ঐ গ্রন্থ, পৃ. ২৩৫

নাথদর্শন বিষয়ক ছড়া ॥

নাথদর্শন এখনও ভারতবর্ষের যোগীসমাজে জীবন্ত চর্যা ও মোক্ষ সাধনা-রূপে প্রচলিত আছে। দেহের অমরত্ব ও দেহপিণ্ডেই মোক্ষ উপলব্ধি—যোগ সাধনার এই ধারাটি সংস্কৃত ও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার মধ্য দিয়া সমাজের নানা স্তরে নানা রূপে প্রবাহিত হইয়াছে। বাঙলা দেশের নাথসাহিত্যে, গোরক্ষবিজয় ও গোপীচন্দ্রের গানেও সেই সাধনার মহিমা ঘোষিত হইয়াছে, সে সাধনায় অনেক খুঁটিনাটি তথ্য বিবৃত হইয়াছে। জরা-মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়া যোগস্থ নিত্যতনু লাভের কথাই এই সমস্ত প্রচারসাহিত্যে যেভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, সমাজের নিম্নস্তরেও এই দুরূহ চর্যার ধারা অব্যাহত বেগে বহিত। এই ধর্মচর্যা মূলতঃ ঈশ্বরাশ্রয়ী নহে। সে যুগের য়ুরোপের আলকেমি তত্ত্ব ও প্রাচীন ভারতের 'রসেশ্বর' প্রস্থানের মতো নাথ-যোগীসম্প্রদায় দেহপিণ্ডকে অমরত্ব দিবার পন্থাই খুঁজিয়াছেন। তাহার জন্য তন্ত্রমন্ত্র, যোগশাস্ত্র, হঠযোগ প্রভৃতি অবলম্বন করিতেন। গোপীচন্দ্রের কাহিনী বিষয়ক ছড়া-পাঁচালীতেও এই ধর্মমতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ আছে। অনিচ্ছুক পুত্রকে যোগপন্থী সন্ন্যাস লওয়াইবার জন্য ময়নামতী এই কায়া-সাধনার কথা বলিয়াছেন, গোরক্ষনাথও মোহাচ্ছন্ন গুরু মীননাথকে এই তত্ত্ব-দর্শনের দ্বারাই প্রবুদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। গোপীচন্দ্রের কাহিনীবিষয়ক পুঁথিপত্রেও এই ধর্মসাধনার কথা নানা রূপকের দ্বারা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এই ধর্মসাধনার প্রচারের জন্যই নাথ সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছিল, শুধু কাব্যরসের জন্য নহে।

গোরক্ষ বৃত্ত ও গোপীচন্দ্র-ময়নাবতীর বৃত্তের বাহিরেও নাথ ধর্মসাহিত্যের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এখনও বাঙলা দেশের যোগীসমাজে নাথ-যোগমার্গের পুঁথিপত্রাদি ও ধর্মসাধনার উপদেশ-নির্দেশ সংবলিত অনেক-পদ, প্রহেলিকা, রূপককবিতা প্রচলিত আছে। অনেক উপধর্মাশ্রিত সম্প্রদায়—যাঁহারা বিশুদ্ধ নাথ ধর্মাবলম্বী নহেন, তাঁহারাও এই 'কায়া-সাধনা', নাদবিন্দুসাধন প্রভৃতি আধিদৈহিক প্রক্রিয়ার দ্বারা অমরত্ব লাভের সাধনা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল এইরূপ কিছু কিছু যোগী সিদ্ধদের ছড়া-কবিতা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্পাদিত 'গোর্খবিজয়ে'র পরিশিষ্টে মুদ্রিত করিয়া এই প্রকার আলোচনার পথ সুগম করিয়াছেন। তাঁহার

সঙ্কলনে এই প্রকার চারিটি পুঁথি বা সংগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে—(১) যোগীর গান, (২) যুগীকাচ, (৩) গোর্খ সংহিতা, (৪) যোগ চিন্তামণি। বলা বাহুল্য এই চারিটি সংগ্রহই নাথযোগ সংক্রান্ত পদের সমাহার। প্রথম সংগ্রহটি (যোগীর গান) রবীন্দ্রনাথ কুমারখালির বাউল সম্প্রদায়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। তাহা বিশ্বভারতীর তদানীন্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সংরক্ষিত ছিল। এই সংগ্রহে দীননাথ, এছা (ইসাক), শ্যামাচরণ ও গোপালধারীর ভণিতা পাওয়া যায়। ইঁহারা হয়তো যথার্থ রচয়িতা নহেন, পদে নিজ নিজ নাম চালাইয়া দিয়াছেন। অনেকগুলি পদে হরি, শিব, দুর্গা, রামচন্দ্র প্রভৃতি দেবদেবীর বন্দনা আছে। তাহার পর ধর্মমঙ্গলের অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যাও আছে। তারপর 'আত্মবোধ' অংশে মানবশরীরের নশ্বরতা এবং 'দেহতত্ত্বে' জড়পিণ্ড মানবদেহকে অমৃত করিবার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে—হঠযোগ ও তন্ত্রের ছিটাফোঁটা সহযোগে রূপকের ছলে যে তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে—তাহা যোগীসমাজের বিন্দুরক্ষা ও পবনবিজয় ব্যতীত আর কোন নূতন ধর্ম প্রণালী নহে। এই সমস্ত পদ মুসলমান সাধকেরাও রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাতে প্রচুর মুসলমানী শব্দ আছে। যেমন—

মুরিদ আরজ করে সাহজি আমার।
রাত্রিদিনে দম বহে কত যে বান্দার॥
ইহার সুমার মোরে বতাইবে আপ।
তবে তো দেলের যায় সব মনস্তাপ॥

কোন কোন পদকর্তা আবার রাধাকৃষ্ণের রূপকেও এই সাধন প্রণালী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহার দুইটি অংশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। একটি 'যোগিনীর বিলাপ', আর একটি 'বোলান'। যোগিনীর গানে যোগীহারা কোন এক যোগিনীর বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে যোগ সাধনার প্রচ্ছন্ন কোন তাৎপর্য থাকিলেও ইহার সরল করুণ রস চমৎকার ফুটিয়াছে:

যোগীহারা হয়ে আমি সুধাই গো তোমারে।
আমার নীলকান্তমণি রইল কোন্ সহরে॥
আমার প্রাণ সদাই কাঁদে যোগীর কারণে।
আমার নীলকান্তমণি রইল কোন স্থানে॥

যোগী আমার প্রাণেশ্বর, যোগী প্রাণপতি।
পতি বিনে চেয়ে দেখ আমার এ দুর্গতি॥

'বোলান' ধর্মের উৎসবে বর্ণিত বোলানের অনুরূপ। দুই পংক্তিতে প্রশ্ন এবং দুই পংক্তিতে উত্তর। বিষয়—সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেহ সাধনার নিগূঢ় রহস্য। যথা :

প্রশ্ন—যোগী হলে যোগ সাধিলে গুণিয়া হলে সারা।
শরীরেতে আছে তোমার কয় ভুরু কয় তারা॥
উত্তর—যোগী হলাম, যোগ সাধিলাম গুণিয়া হলাম সারা।
শরীরেতে আছে আমার এক ভুরু দুই তারা॥
প্রশ্ন—কোথায় গেলে পাব যোগী বিনা ধানের খৈ।
কোথায় গেলে পাব আমি বিনা দুধের দৈ॥
উত্তর—চোখের কোণায় দেখ সেথা বিনা ধানের খৈ।
মস্তকেতে আছে তোমার বিনা দুধের দৈ॥

ঠিক এই রূপ বর্ণনা উত্তর বঙ্গ হইতে সংগৃহীত 'যুগীকাচের' পুঁথি এবং বর্ধমানসাহিত্য সভায় রক্ষিত 'গোরক্ষ সংহিতা' ও 'যোগচিন্তামণি'র পুঁথিতে এই কায়াসাধনামূলক যোগপন্থাই রূপকের সাহায্যে বিবৃত হইয়াছে। এই সমস্ত পুঁথিতে দেহতত্ত্বের কথাই নানা দিক হইতে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং সাহিত্য বিচারে ইহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। ইঁহারা একই তত্ত্বকথা, পবনবিজয়, বিন্দুধারণ ও উল্টাসাধন—নানা ভাবে নানা জনে বলিয়াছেন। এই বক্তব্য আধুনিককালে এমন কিছু অদ্ভুত মনে হইবে না; রূপকের খোলস ছাড়াইয়া ফেলিলে দেখা যাইবে, ইহাতে হঠযোগ ও তন্ত্রের বহুপ্রচলিত প্রক্রিয়াই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। স্থানে স্থানে ইঁহাদের ভাষা মন্ত্রগুপ্তির জন্য বেশ তির্যকতা লাভ করিয়াছে, রূপকাশ্রয়ী প্রচ্ছন্ন অর্থ সংগোপনে ইঁহারা বেশ চাতুর্য দেখাইয়াছেন। তবে এই সমস্ত গুহ্য বিদ্যা গুরুমুখী অবস্থায় ছিল। অনধিকারীদের হাতে পড়িয়া যাহাতে এ সাধনা নষ্ট হইয়া না যায়, এই জন্য ইঁহারা অত্যন্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করিতেন, গোপনে গোপনেই ইহা এক আখড়া হইতে অন্য আখড়ায় প্রসৃত হইয়াছে। উল্টাসাধনা, বিন্দু ধারণ প্রভৃতি প্রক্রিয়া প্রকাশ্য সমাজে নিন্দিত হইতে পারে মনে করিয়া এই সম্প্রদায় সাধনপ্রক্রিয়াসমূহ গোপনে রক্ষা করিতেন। ফলে ইহা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এইরূপে পুঁথিতে পুনঃ পুনঃ সাবধান করা হইয়াছে :

পাষণ্ড পুরুষে গ্রন্থ না দিবে সহসা।
আছয়ে নিষেধ উক্তি দেবতার ভাসা ॥[৮১]

এইজন্য যোগসাধনা বিষয়ক বহু পুঁথি ও তথ্যাদি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আমরা নাথধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ে বাঙলা দেশের মনের বিকাশ আলোচনা করিলাম। বস্তুতঃ অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত সমাজে প্রচলিত এই সমস্ত ছড়া উপমার মূল্য উচ্চস্তরের সাহিত্যাদর্শের দ্বারা বিচার করা ঠিক হইবে না। একদা এই সাহিত্যের যথার্থ মূল্য সম্বন্ধে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় রসিকতা করিয়া লিখিয়াছিলেন, "ভাবগৌরবে যে এগুলির (অর্থাৎ ময়নামতীর গান ইত্যাদি) অসাধারণত্ব কিছু নাই তাহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন।...বসন্তবাবুকে[৮২] একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মহাশয়, অধীত-সেক্সপীয়ার-কালিদাস ছাত্রবর্গকে ময়নামতীর গান হইতে কি পড়ান? বসন্তবাবু অপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিয়াছিলেন, 'কেন? শব্দের আধুনিক রূপের প্রাচীন রূপগুলি বলিয়া দি'!"[৮৩] "নিতান্ত আধুনিক, কবিত্ববৈশিষ্ট্য বিবর্জিত ময়নামতী গানগুলি" এম, এ, ক্লাসে কি করিয়া অধ্যাপনা হইয়া থাকে, সে বিষয়ে ভট্টশালী মহাশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তিটি এইরূপ— প্রাচীন সাহিত্যে উচ্চতর কলাকৌশল না থাকিলেও প্রাচীন ভাষা প্রভৃতির জন্য তাহার একটা মূল্য আছে। কিন্তু এই সমস্ত নাথসাহিত্য নিতান্ত অর্বাচীন কালের ব্যাপার, অশিক্ষিত গ্রাম্যসমাজের বস্তু। ইহার না আছে কোন উৎকৃষ্ট কাব্যসম্পদ, আর না আছে কোন প্রাচীন ভাষা-বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এই সমস্ত পুঁথি ও ছড়াপাঁচালী আর যাহাই হউক, উচ্চতর রুচি ও মার্জিত বুদ্ধির চাহিদা মিটাইতে পারে না। অপরদিকে দীনেশচন্দ্র মনে করিতেন যে, এই ধরণের গ্রাম্য গাথাই সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্য—"ইহারা ভাষা-পল্লব দিয়া ভাবকে লুকাইবার ফন্দি জানে না......সাহিত্য-সভ্যতা-ভব্যতার ইহারা বড় ধার ধারে না...।"[৮৪] তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত প্রভাবিত

৮১ ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত গোর্খ বিজয়, পৃ. ২১০

৮২ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—গোপীচন্দ্রের গানের (কলি. বিশ্ব.) অন্যতম সম্পাদক ও তদানীন্তন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক।

৮৩ ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, পৃ. ৭৫

৮৪ গোপীচন্দ্রের গান (কলি. বিশ্ব.)

ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য অপেক্ষা তিনি "এই হেলে চাষা যুগের" সাহিত্যের অধিকতর অনুরাগী। ডঃ ভট্টশালীর মন্তব্য সম্বন্ধে মনে হয়, তিনি শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক সাহিত্যের আদর্শে অকিঞ্চিৎকর নাথসাহিত্যের বিচার করিতে গিয়াছিলেন। সেক্সপীয়র-কালিদাসের সঙ্গে পল্লীগ্রামের নিরক্ষর কৃষাণ সমাজের 'যুগীর কাচ' তুলনা করিতে যাওয়া উচিত নহে। কারণ উভয়ের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। অপরদিকে দীনেশচন্দ্র আবার বিপরীত দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনা করিয়া যাবতীয় নাগরিক সাহিত্য ও ক্লাসিক ঐতিহ্য শূন্যে উড়াইয়া দিয়া ময়নামতীর পুঁথিকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আর একপ্রকার যুক্তিহীন ভাবালুতার পরিচয় দিয়াছেন। ইদানীং এই সমস্ত গ্রাম্য সাহিত্য ও ছড়াগান বিচার করিয়া ইহার প্রতি আমাদের আর কোন অযৌক্তিক মোহ বা ভক্তি নাই। অন্ত্য-মধ্যযুগের (১৭শ-১৮শ শতাব্দী) দিকে যোগী নাথধর্মকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত ছড়াপাঁচালী ও কাহিনী রচিত হইয়াছিল, লোকসাহিত্য ও লোকধর্মের স্বরূপ নির্ণয়ে তাহার কথঞ্চিৎ ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্য আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যথার্থ সাহিত্যের আদর্শে ইহারা যে অতীব প্রশংসনীয় কাব্যোৎকর্ষ বহন করিতেছে তাহা মনে হয় না। প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিতে গিয়া ভাবাতিরেকে উদ্বাহু হওয়া কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অনুবাদ-সাহিত্য ঃ রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত

ভূমিকা ॥

সপ্তদশ শতাব্দীতে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের যে সমস্ত ভাবানুবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা হইতে একটা কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, অদ্ভুত আচার্য এবং কাশীরাম দাসের রামায়ণ ও মহাভারতের ভাবানুবাদগুলি সপ্তদশ শতাব্দীতে জনসমাজে বিশেষভাবে প্রচারলাভ করিয়াছিল, বিশেষতঃ (মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাস মহাভারতের কাহিনী ও রসকে বাঙালী জীবনের আধারে পরিবেশন করিয়া কৃত্তিবাসের সমতুল্য অক্ষয় মহিমা লাভ করিয়াছেন।) হিন্দী সাহিত্যে তুলসীদাসের খ্যাতি, কাব্যোৎকর্ষ ও রসচেতনা কৃত্তিবাস অপেক্ষা গভীরতর—একথা সমালোচকেরা বলিয়া থাকেন; কিন্তু উত্তরাপথের প্রাদেশিক সাহিত্যে মহাভারতের কোন অনুবাদক বাঙালী কাশীরামকে প্রতিভা ও খ্যাতিতে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। অবশ্য (এই যুগে রামায়ণ-মহাভারত পাঁচালীগানের আকারে অর্ধশিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট প্রচারলাভ করিলেও ভাগবতের অল্প কয়েকজন অনুবাদক ঠিক সেই অনুপাতে গৌরব বা জনপ্রিয়তার শীর্ষচূড়া লাভ করিতে পারেন নাই) ভাগবতের অনুবাদ সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রামায়ণ-মহাভারতের মতো গুরুত্ব ও প্রসারলাভ করিতে পারিল না কেন, তাহা আমরা ভাগবত উপচ্ছেদে আলোচনা করিব। কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, কাশীরাম দাসকে বাদ দিলে সপ্তদশ শতাব্দীর অনুবাদ-সাহিত্যে বিশেষ কোন মৌলিকতা ও বৈচিত্র্য ফুটিবার অবকাশ পায় নাই। মঙ্গলকাব্যের সমারোহ ও বৈষ্ণব পদসাহিত্যের বিচিত্র ঐশ্বর্য অনুবাদ-সাহিত্যকে কথঞ্চিৎ কোণঠাসা করিয়া রাখিয়াছিল মনে হয়। (অবশ্য পুরাণী-করণের ধারা রামায়ণ-মহাভারতাদির অনুশীলনের সাহায্যে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতিকে যে নিত্যই উর্বর করিয়া তুলিতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং সেই পুরাণ-ঐতিহ্য মঙ্গলকাব্যের গ্রামীণ ধারাকেও কখনও প্রত্যক্ষভাবে,

কখনও-বা পরোক্ষ ভাবে নূতন জীবনবেগ দান করিতেছিল। কিন্তু তখনও বৈষ্ণব ভাবপ্রবাহের উদ্দাম বন্যা সমগ্র দেশের মাটিকে আবেগের রসে আর্দ্র করিয়া রাখিয়াছিল। এই সমস্ত কারণে সপ্তদশ শতাব্দীতে বহু অনুবাদকের আবির্ভাব হইলেও দুই-একজনকে বাদ দিলে আর কেহ উচ্চতর কলাশক্তি ও কবিকৃতির পরিচয় দিতে পারেন নাই। অবশ্য যে দুই-একজন অনুবাদক বাঙালীর মনোজীবনকে পৌরাণিক প্রভাবের সাহায্যে সুদৃঢ়ভাবে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কৃতিত্বও ভুলিয়া থাকা যায় না। যাহা হউক রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইয়া দেখা যাক, সপ্তদশ শতাব্দীর অনুবাদ-সাহিত্য বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর মনোধর্মকে কতদূর প্রভাবিত করিতে পারিয়াছে, শিল্পসৃষ্টিতেই-বা এই অনুবাদ-সাহিত্য কতদূর সার্থক হইয়াছে।

১

রা মা য় ণ পাঁ চা লী

সপ্তদশ শতাব্দীতে কয়েকজন রামায়ণ পাঁচালীকারের কিছু কিছু অনুবাদের নমুনা অধুনা আমাদের হস্তগত হইয়াছে।[১] কিন্তু কৃত্তিবাসের কাব্য এই শতাব্দীতেও যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার রামায়ণের নানা কাণ্ড, পালা, অধ্যায় প্রভৃতি লিপিকারের দল নকল করিয়া কৃত্তিবাসী পুঁথির সংখ্যা প্রায় গগনস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ—গৌড়-বঙ্গের সর্বত্র কৃত্তিবাসের পুণ্যনাম ও প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফলে তাঁহার রামায়ণের বিভিন্ন কাণ্ডের সম্পূর্ণ বা খণ্ডিত পুঁথি ভূরিপরিমাণে নকল হইয়াছিল, অনেক সময় তাঁহার রচনার অংশ সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যান্য অনুবাদকের রচনার সঙ্গে বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে, কোথাও-বা শক্তিমান কোন অনুবাদকের রচনা তাঁহার পুঁথির মধ্যে আত্মগোপন করিয়া তাঁহার নামের অন্তরালে অমরত্ব লাভের চেষ্টা করিয়াছে। তাঁহার বিভিন্ন কাণ্ড ও পালাগান যেভাবে অসংখ্য পুঁথি ও নকলের মধ্যে

১ রামায়ণ সম্বন্ধে নানা তথ্য এই লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' (১ম) আলোচনা করা হইয়াছে।



মন্দির-তোরণে রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য

বীরভূমের রায়পুর নারায়ণ মন্দিরের তোরণ—প্রায় আড়াইশত বৎসরের পুরাতন)

পৃঃ ৪২৩

স্থান লাভ করিয়াছে, তাহাতে নানা প্রক্ষেপ ও পরিবর্তন-পরিবর্জন স্বাভাবিক। তাই প্রাপ্ত পুঁথিগুলির একটির সহিত অন্যটির বিস্ময়কর পার্থক্য লক্ষিত হয়। নকলকারীরা, বা পাঁচালী গায়কেরা শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য কৃত্তিবাসের পুঁথিতে অন্যের রচনা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে লিখিয়া দিয়া কৃত্তিবাস সমস্যাকে জটিলতম করিয়া তুলিয়াছেন। কৃত্তিবাসের ভণিতায় যে 'রামরাসের' পদ পাওয়া গিয়াছে,[২] তাহা কদাপি কৃত্তিবাসের রচনা হইতে পারে না। কোন বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবি এই পদটিকে রাধাকৃষ্ণের পদাবলীর ছাঁচে রচনা করিয়া কৃত্তিবাসের নামে চালাইয়া দিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত কৃত্তিবাসের ভণিতাযুক্ত অদ্ভুত রামায়ণের দুইখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে (পুঁথি সংখ্যা—২৪০, ২৪২)। ইহাতে সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণের ধারা অনুসৃত হইয়াছে। ভাষাতে কৃত্তিবাসী সুর যে নাই তাহা নহে। কিন্তু ইহাতে কৃত্তিবাসকে যেরূপ ভক্তি করা হইয়াছে,[৩] তাহাতে এই অদ্ভুত রামায়ণ মুরারি ওঝার নাতির রচনা হইতে পারে না। হয়তো কোন কবি স্বকৃত অদ্ভুত রামায়ণের ভাবানুবাদটিকে গৌরব ও দীর্ঘায়ু দিবার জন্য নিজ ভণিতা গোপন করিয়া কৃত্তিবাসের ভণিতা জুড়িয়া দিয়া থাকিবেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে কয়েকজন কবি রামায়ণের কিয়দংশ বা উহার সম্পূর্ণ ভাবানুবাদে অগ্রসর হইলেও কৃত্তিবাসের গৌরব এই

---

২ ১৩১১ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় এই পদটি প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার কিয়দংশ :

দেখ সখি আজু রঘুনাথ কি আরে শোভাবনি।
কনক সিংহাসনে বৈঠল রঘুবর বামে জনকনন্দিনী॥
দহিনে লছমন ছত্রধর তাই বরণ কাঁচসোনা জিনি।
ভরত শত্রুঘ্ন চাঙর করতহি বেদ পড়ত সব মুনি॥
... ...
সীতাক কটিতে কিঙ্কিনী বাজ রাতুল চরণে বঙ্করাজ।
রুনুঝুনু ঝুনু স্বররাজ গায়ত পঞ্চম তানকি।
ভণতহি কবি কীর্ত্তিবাস জানকীরমণ চরণ আশ।
রামরূপ দেখি জানকী মাতল যেন চাতকী॥

৩ ২৪২ নং পুঁথির একস্থলে আছে :

কৃত্তিবাস পণ্ডিত বন্দো মুরারি ওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে কেলি করে দেবী-সরস্বতী॥

শতাব্দীতেও যে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই তাহা কৃত্তিবাসের অসংখ্য পুঁথি হইতেই প্রমাণিত হইবে। যাহা হউক সপ্তদশ শতাব্দীর রামায়ণ অনুবাদক-দের সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই-চারি কথা বলা যাইতেছে।

অদ্ভুত আচার্য ॥

উত্তর ও পূর্ববঙ্গে একদা অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণের বিশেষ প্রচার থাকিলেও তাঁহার গ্রন্থ লইয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিস্তারিত আলোচনার অভাব আছে। একমাত্র ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই রামায়ণ ও রামায়ণের অনুবাদক সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়া গবেষণা ও অনুসন্ধানের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার লোকান্তরের পর এ বিষয়ে আর কোন নূতন তথ্য সংগৃহীত বা আলোচিত হয় নাই। ভট্টশালী মহাশয় দেশমান্য ঐতিহাসিক ও সতর্ক গবেষক হইয়াও এই আলোচনায় সব সময়ে নিঃস্পৃহতা রক্ষা করিতে পারেন নাই, কবি অদ্ভুত আচার্যকে কৃত্তিবাসের উপরে স্থান দিতে গিয়া তিনি অনেক সময় বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তথ্য পরিত্যাগ করিয়া নিজস্ব মনগড়া থিয়োরী প্রমাণের জন্য বাছিয়া বাছিয়া তথ্য সন্নিবেশ করিয়াছেন। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য আলোচনায় অনেকেই এইরূপ কোন-না-কোন বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। ডঃ ভট্টশালীর অদ্ভুত আচার্য সম্বন্ধে অদ্ভুত মন্তব্য সেই কথাটাই শোচনীয়-ভাবে প্রমাণ করিয়াছে। প্রথমে এবিষয়ে প্রাপ্ত উপকরণাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া যাক।

১৩০৫ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রাপ্ত প্রাচীন পুঁথির বিবরণ দিতে গিয়া রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সর্বপ্রথম বাঙালী পাঠকসমাজে অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণের কয়েকখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছিলেন। দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎচন্দ্র রায় অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণের আদিকাণ্ডের দুইখানি ও উত্তরকাণ্ডের দুইখানি—মোট চারিখানি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া ত্রিবেদী মহাশয়কে প্রদান করেন। ইহার মধ্যে একখানি পুঁথি খণ্ডিত। রামেন্দ্র-সুন্দর ১৩০৫ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় 'পুঁথির বিবরণে' এই চারি-খানি পুঁথির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া মন্তব্য করেন যে, উত্তরকাণ্ডের পুরা পুঁথিতে যখন প্রায় দুই শত পত্র রহিয়াছে, তখন অদ্ভুত আচার্যের গোটা

রামায়ণের আকার কৃত্তিবাস অপেক্ষা অনেক বৃহৎ হইবে। তখনও অদ্ভুত আচার্যের পুরাপুঁথি দূরের কথা, এদেশে কেহ তাঁহার নামও জানিত না। এই পুঁথির পরিচয় হইতে জানা যায়, কবির প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ। মাত্র পাঁচবৎসর বয়সে তিনি নাকি রামায়ণ রচনা করেন; তাই তিনি পরবর্তী কালে অদ্ভুত আচার্য নামে পরিচিত হন। উক্ত প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর রসিকচন্দ্র বসুর নিকটে রক্ষিত কয়েকখানি পুঁথির উল্লেখ করেন। প্রাচীন সাহিত্যামোদী রসিকচন্দ্র বসু নামক এক ব্যক্তির নিকট অদ্ভুতআচার্যের অনেকগুলি পুঁথি ছিল। তন্মধ্যে যে খানিতে অদ্ভুত আচার্যের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল, তাহার নকলের তারিখ—১৭৬৪ শকাব্দ (১৮৪২ খ্রীঃ অঃ)।[৪] রসিকচন্দ্র বসু প্রদত্ত অদ্ভুত আচার্যের আত্মবিবরণী জ্ঞাপক যে উদ্ধৃতিটুকু রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় উদ্ধৃত করেন তাহা হইতে কবি সম্বন্ধে এই টুকু পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। নিত্যানন্দের পিতামহের নাম প্রচণ্ড, পিতার নাম শ্রীনিবাস। নিত্যানন্দেরা চারিভাই, নিত্যানন্দ জ্যেষ্ঠ। নিত্যানন্দের তিন পুত্র—জয়, বিজয়, শিবানন্দ। মাঘমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে ভগবান রামচন্দ্র কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি রামায়ণ অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। রামেন্দ্রসুন্দর এই আত্মপরিচয়টুকু প্রকাশ করিয়া অদ্ভুত আচার্যের সম্বন্ধে আলোচনার পথ খুলিয়া দেন। অবশ্য তাঁহার কাছে যে পুঁথিগুলি ছিল, তাহাতে কবির কোন পরিচয় ছিল না, শুধু মাঝেমাঝে কবির এইরূপ ভণিতা আছে—"অদ্ভুত আচার্যের কবিত্ব মধুর ভারতী"।

এই প্রসঙ্গে ফ্রান্সিস বুকাননের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডক্টর ফ্রান্সিস বুকানন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ১৮০৭ খ্রীঃ অব্দে উত্তর বঙ্গ জরিপের জন্য প্রেরিত হন। বুকানন জমি জরিপের ফাঁকে ফাঁকে বহু পরিশ্রম করিয়া উত্তরবঙ্গের অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে এই বিবরণ তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়।[৫] ইহার তৃতীয় খণ্ডে বুকানন অদ্ভুত আচার্য সম্বন্ধে যে মূল্যবান সংবাদ দেন, তাহাই এই কবি সম্বন্ধে ছাপার

৪ এই পুঁথি টাঙ্গাইলে পাওয়া গিয়াছে।

৫ *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India, comprising the Districts of Behar, Shaabad, Bagalpore, Gorokhpore, Dinajpore, Porniya, Rangpur and Assam.*

অক্ষরে প্রথম উল্লেখ। রঙপুর জেলার বিবরণী প্রসঙ্গে বুকানন লিখিয়াছিলেন যে, এই জেলায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণও জনসমাজে প্রচলিত ছিল।

১৩১৬ সনের সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় রজনীকান্ত চক্রবর্তী 'অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ' শীর্ষক প্রবন্ধে এই কবি সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি কবিপ্রণীত অযোধ্যা, অরণ্য ও উত্তরকাণ্ডের পুঁথি পাইয়াছিলেন এবং তাহা অবলম্বনে উক্ত প্রবন্ধ রচনা করেন। চক্রবর্তী মহাশয় বোধহয় ১৩০৫ সনের সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত রামেন্দ্রসুন্দরের 'পুঁথির বিবরণ' তালিকাটি দেখেন নাই, কারণ তাঁহার প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের কোন উল্লেখ নাই। তিনিও উক্ত পুঁথি তিনখানি হইতে[৬] কবি সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য দিতে পারেন নাই। ভণিতাতে তিনি শুধু "অদ্ভুতের কণ্ঠে বসে আপনি সরস্বতী" এইরূপ উক্তি পাইয়াছিলেন। তিনি আবার কবির ভণিতার সঙ্গে 'অদ্ভুত নরসিংহ বলে', 'অদ্ভুত মাধব ভণে', 'নীলমাধব ভণে'—এইরূপ উল্লেখও করিয়াছেন—এগুলি মালদহের পুঁথিতেই পাওয়া যায়। রজনীকান্ত ইহার কারণস্বরূপ জানান যে, মালদহের গায়েনদের রীতি অনুসারে ওস্তাদেরা অনেক সময় গান বাঁধিয়া শিষ্যদের ভণিতাতেও চালাইতেন। হয়তো অদ্ভুত আচার্য ভণিতাতে শিষ্যের নাম জুড়িয়া দিয়াছেন। পুঁথিতে কিছু কিছু পুরাতন শব্দ থাকিলেও ('করিলেন্ত', 'শুনিলাঙ' ইত্যাদি) প্রবন্ধ লেখকের মতে "রচনা দেখিলে বোধহয় অদ্ভুত আচার্য কৃত্তিবাসের পরবর্তী লোক।" তিনি অনুমান করিয়াছিলেন, "আমাদের অনুমান হয় কবি চৈতন্যদেবের নিকটবর্তী লোক।"[৭]

---

৬ পুঁথি তিনখানির নকলের তারিখ: অযোধ্যাকাণ্ড (১১২২ সাল), অরণ্যকাণ্ড (১২১৮ সাল), উত্তরকাণ্ড (১১৫০ সাল)।

৭ ১৩১৫ সালের রঙপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (পৃ. ৬৯) কালীকান্ত বিশ্বাস ১১৪৩ সনে নকল করা অদ্ভুত আচার্যের পুঁথির বিবরণ প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে, কবি সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। সেই পুঁথিতে এইভাবে কবির পরিচয় বিবৃত হইয়াছে:

সেরশাবাদ সরকার সোনাবাজু গ্রাম।
অমৃতকুণ্ড নাম সে যে অতি অনুপাম॥

অতঃপর ১৩২০ বঙ্গাব্দে (১৯১৩) রজনীকান্ত চক্রবর্তীর সম্পাদনায় রঙপুর সাহিত্য-পরিষদ হইতে 'অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ' (আদ্যকাণ্ড) প্রকাশিত হইলে এই কবি এবং তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে আরও কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল। মোট ৭৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণের আদিকাণ্ডের সম্পাদনায় রজনীকান্ত রঙপুর হইতে সংগৃহীত দুইখানি পুঁথির পাঠ অবলম্বন করেন, প্রসঙ্গক্রমে তিনি মালদহ হইতে সংগৃহীত পুঁথিরও উল্লেখ করিয়াছেন। মালদহ ও রঙপুরের পুঁথি হইতে কবির ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। মালদহের পুঁথিতে কবির পরিচয় এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে :

পিতামহ গুরু বন্দো নামেতে মার্তণ্ড।
যাহার প্রসাদে পাইলাম রামায়ণ সপ্তকাণ্ড॥
তাহার তনয় হইল নামে শ্রীনিবাস।
গুণে মহাজন তেঁহো নারায়ণের দাস॥
তাহার ঘরেতে হইল মেনকা জঠরে।
চারি পণ্ডিত ভাল জন্মিলা তার ঘরে॥
চারি সহোদর তারা পণ্ডিত গুণনিধি।
ভারতি প্রসাদে পাইল অপেক্ষিত নিধি॥
করতোয়া কূলে বাড়ী অমৃতকুণ্ড গ্রাম।
শুভক্ষণে হইল বটু নিত্যানন্দ নাম॥

আত্রাইর তীর সেহি কুরুক্ষেত্র সম।
করতিয়ার পশ্চিমভাগ জাহ্নবীর সম॥
করতিয়ার পশ্চিমে আত্রাই উত্তর কূলে।
মহাপুণ্য স্থান সেই পুরাণেতে বলে॥
অমৃতকুণ্ডা গ্রাম নাম অধিকারী তার।
ভূমে ব্যাসাচার্য ঋষির সদাচার॥
তার ঘরে জনমিল এ চারি কুমার।
মেনকা উদরে চারি ব্যাস অবতার॥
জ্যেষ্ঠ তিন জন তার অতি বিচক্ষণ।
অতি মূর্খ আছিল কনিষ্ঠ নিত্যানন্দ॥

রঙপুরের এই পুঁথি অনুসারে করতোয়ার পশ্চিমে আত্রেয়ী নদীর উত্তরকূলে সেরশাবাদ সরকারের অন্তর্গত সোনাবাজু গ্রামের নিকট অমৃতকুণ্ড গ্রামে নিত্যানন্দের জন্ম হয়। তিনি সর্বকনিষ্ঠ, এবং বাল্যকালে মূর্খ ছিলেন।

এই নিত্যানন্দই আমাদের কবি অদ্ভুত আচার্য। পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তিনি বহু শাস্ত্র পাঠ করেন, কিন্তু সাত বৎসর বয়সে তাঁহার উপনয়ন সংস্কার হয় নাই। তিনি বনে বনে গোরক্ষক হইয়া ফিরিতে লাগিলেন। একদিন নারায়ণ বালক নিত্যানন্দের নিকট ব্রাহ্মণের বেশে আবির্ভূত হইয়া গান করিতে আদেশ করিলে বালক বলিলেন, "রাখালের গান ভিন্ন অন্য নাহি জানি।" ব্রাহ্মণবেশীর আজ্ঞায় তিনি তাহাই গান করিলে নারায়ণ হৃষ্টচিত্তে বালকের মাথায় হাত দিয়া বর দিলেন এবং জিহ্বার উপর মহামন্ত্র লিখিয়া 'মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে' কবিকে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করিলেন :

রাম আজ্ঞা করিল রচিতে রামায়ণ।
অদ্ভুত আচার্য নাম তাহার কারণ॥

স্বয়ং রামচন্দ্র ব্রাহ্মণ বেশে আবির্ভূত হইয়া কবিকে রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন—এই জন্য নিত্যানন্দের নাম হইল অদ্ভুত আচার্য। ক্রমে তিনি সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করিলেন। প্রভু রামচন্দ্রের আশীর্বাদে তাঁহার তিন পুত্র হইল—জয়, বিজয় ও শিবানন্দ। ইতিপূর্বে রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রাচীন পুঁথির তালিকায় ইহার পুঁথির যে বিবরণ দিয়াছিলেন, তাহাতে উল্লিখিত কবিপরিচয়ের সঙ্গে এই ছত্রগুলির বেশ মিল আছে। অবশ্য রঙপুরের পুঁথির সঙ্গে এই বিবরণের কিছু পার্থক্য আছে। রঙপুরের পুঁথিতে আছে নিত্যানন্দের পিতামহের নাম মার্কণ্ড। কবির বাসস্থান প্রসঙ্গে রঙপুরের পুঁথিতে সেরশাবাদ সরকারের অন্তর্গত সোনাবাজু গ্রামের উল্লেখ আছে। আবার আত্রাই নদীর কূলে অমৃতকুণ্ডা গ্রামের নামও রঙপুরের পুঁথিতে পাওয়া যায় :

করতোয়ার পশ্চিমে আত্রাইর উত্তর কূলে।
মহাপুণ্য স্থান সেই পুরাণেতে বলে॥
অমৃতকুণ্ডা নাম গ্রাম অধিকারী তার।
শ্রীনিবাস আচার্য সাধুর আচার॥

এই গোলমাল মিটাইবার জন্য রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলিয়াছেন, "উল্লিখিত নদী দুইটির অবস্থিতি অনুসারে কবির জন্মস্থান বগুড়া বা রাজশাহী জেলার উত্তরাংশের কোন স্থানে ছিল বলিয়া বোধহয়।"[৮] ইহাতে উল্লিখিত কয়েকটি

৮ রজনীকান্ত চক্রবর্তী সম্পাদিত অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ, আদ্যকাণ্ড, মুখবন্ধ।

নদীও উত্তরবঙ্গে প্রবাহিত—পূনর্ভবা, ধবলা, আত্রেয়ী, করতোয়া, নারদী (রাজশাহী জেলার মধ্যে প্রবাহিত)। গঙ্গার মর্ত্যে আগমন সম্পর্কে কবি তুলসীর ঘাটের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সম্পাদকের মতে মালদহের সাদুল্যাপুরের ঘাটের নিকট অবস্থিত। আমাদের মতে তাঁহার সিদ্ধান্ত সংশয়পূর্ণ। যে প্রসঙ্গে এই বর্ণনা রহিয়াছে, সেই স্থলে বারাণসীধামের ঘাটের বর্ণনা চলিতেছিল (বেনীমাধবের ঘাটে, মণিকর্ণিকা ঘাট)। তুলসীঘাট বারাণসী ধামের সুপ্রসিদ্ধ তুলসীদাস গোস্বামীর ঘাট হওয়াই সম্ভব।

রজনীকান্ত চক্রবর্তীর সম্পাদনায় এই কাব্য প্রকাশের পর এবিষয়ে আর কেহ বড় একটা আলোচনা করেন নাই। অতঃপর ঢাকা মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ পরলোকগত ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবিষয়ে নূতন আলোচনার সূত্রপাত করেন বঙ্গাব্দ ১৩৪০-৪১ সালের দিকে। ১৩৪১ সালের মাঘসংখ্যার 'ভারতবর্ষে' "অদ্ভুত আচার্যের পরিচয়" প্রবন্ধে ডঃ ভট্টশালী এবিষয়ে সর্বপ্রথম গবেষকের দৃষ্টি লইয়া আলোচনা করেন। ইতিপূর্বে তিনি ১৩৪০ সালের ভাদ্র মাসের 'বঙ্গশ্রী'তে এই বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। সোনাবাজু পরগণা ও অমৃতকুণ্ডা গ্রাম সম্পর্কে রজনীকান্ত চক্রবর্তী স্পষ্ট কোন নির্দেশ দিতে পারেন নাই। শুধু বগুড়া জেলায় কোন একস্থানে ইহা অবস্থিত—এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ডঃ ভট্টশালী 'আইন-ই-আকবরী', পাবনা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ও যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর 'বারেন্দ্রকুলশাস্ত্র দীপিকা' হইতে অদ্ভুত আচার্যের প্রকৃত পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা করেন। সোনাবাজু পরগণা আকবরের আমলে 'সরকার বাজুহার' পরগণা নামে পরিচিত ছিল। অধুনা ইহার সবটাই পাবনা জেলায় পড়িয়াছে। পাবনা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার অনুসারে উক্ত পরগণা তিনটি থানা (আটঘরিয়া, চাটমোহর ও ফরিদপুর) জুড়িয়া আছে। বর্তমান পাবনা শহরের উত্তরপূর্ব ভাগ জুড়িয়া প্রাচীন সোনাবাজু পরগণা অবস্থিত ছিল বলিয়া ডঃ ভট্টশালী অনুমান করেন। চাটমোহর থানার যে জমিজরীপ-সংক্রান্ত মানচিত্র ছাপা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, চাটমোহর রেল স্টেশনটি অমৃতকুণ্ডা গ্রামেই অবস্থিত। ঐ মানচিত্র অনুসারে চাটমোহরের উত্তরে করতোয়া নদীর খাত, দক্ষিণে আত্রেয়ীর চিহ্ন এখনও আছে। ডঃ ভট্টশালী স্থির

করিলেন, পাবনা জেলায় চাটমোহর স্টেশনের কাছে অমৃতকুণ্ডা গ্রামে কবি নিত্যানন্দ (অদ্ভুত আচার্য) জন্মগ্রহণ করেন।

যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত 'বারেন্দ্রকুলশাস্ত্রদীপিকা' গ্রন্থে অমৃতকুণ্ডা গ্রামনিবাসী শাণ্ডিল্য গোত্রোদ্ভূত কষ্টশ্রোত্রিয় সিহরি গ্রামীণ ব্রাহ্মণদের বংশধারা বিবৃত হইয়াছে। এই বংশের আদিপুরুষ আতাই। এই বংশেই নিত্যানন্দের জন্ম। ইঁহাদের এক শাখা পার্শ্ববর্তী ডেমরা গ্রামে চলিয়া যায়। এই তালিকায় দেখান হইয়াছে যে, নিত্যানন্দের পুত্র অদ্বৈত, অদ্বৈতের তিনপুত্র, বিজয়, কানাইকান্ত ও শিবানন্দ। কিন্তু অদ্ভুত আচার্যের পুঁথিতে দেখা যায়, তাঁহার তিনপুত্র—জয়, বিজয় ও শিবানন্দ। অবশ্য অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণে প্রদত্ত বংশাবলির সঙ্গে 'কুলশাস্ত্রদীপিকা'র তালিকার পুরাপুরি মিল না হইলেও উহা হইতে অদ্ভুত আচার্যকে পাবনা জেলার অন্তর্গত অমৃতকুণ্ডা গ্রামবাসী—এইরূপ সিদ্ধান্ত অবশ্য স্বীকার্য হইয়া পড়ে। আরও একটা প্রমাণ, নিত্যানন্দের বংশোদ্ভূত রঘুনাথের কন্যা শর্বাণীর সঙ্গে সাঁতৈলের রাজা রামকৃষ্ণের বিবাহ হয়। ১৭১১ খ্রীঃ অব্দে রাণী শর্বাণী নিঃসন্তান অবস্থায় অতিবৃদ্ধ বয়সে পরলোকগমন করেন। এইরূপ হিসাব অনুসারে ডঃ ভট্টশালী অনুমান করেন যে, ১৬৪৭ খ্রীঃ অব্দের দিকে নিত্যানন্দের জন্ম হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহার মতে অদ্ভুত আচার্য ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন; তাঁহার কাব্যও ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত হওয়াই অধিকতর সম্ভাবনা।

উত্তর ও পূর্ববঙ্গে কৃত্তিবাস অপেক্ষা অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণেরই নাকি অধিকতর প্রচার হইয়াছে। এমন কি, কেহ কেহ বলেন, কৃত্তিবাসী রামায়ণেও অদ্ভুত আচার্যের কিছু কিছু রচনাংশ চলিয়া গিয়াছে। আমরাও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত অদ্ভুত আচার্যের পুঁথিতে দুই-এক স্থানে কৃত্তিবাসের ভণিতা দেখিয়াছি। অবশ্য একথা ঠিক যে, অদ্ভুত আচার্য অঞ্চল-বিশেষে কিছু জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে জনপ্রিয়তা কৃত্তিবাসের তুলনায় উল্লেখযোগ্য নহে। সারা বাঙলা দেশ হইতে কৃত্তিবাসের অসংখ্য পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, সম্পূর্ণ অখণ্ডিত পুঁথিও দুর্লভ নহে। কিন্তু অদ্ভুত আচার্যের পুঁথির সংখ্যা কৃত্তিবাসের তুলনায় নগণ্য মাত্র। এ পর্যন্ত একখানিও সম্পূর্ণ কাণ্ডের পুঁথি পাওয়া যায় নাই—কেবল আস্তকাণ্ডটি রজনীকান্ত চক্রবর্তী

রঙপুর হইতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে মুদ্রিত ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তারপর সাধারণ পাঠকসমাজ এ বিষয়ে আর কোন কৌতূহল প্রকাশ করে নাই, গবেষকেরাও এই সম্পর্কে খুব বেশী অনুসন্ধিৎসা দেখান নাই। অদ্ভুত আচার্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রঙপুর সাহিত্যপরিষদের খান দশ-বারো পুঁথির তলে অদ্যাপি চাপা পড়িয়া রহিয়াছেন। অপরদিকে বাঙলাদেশে কৃত্তিবাসী রামায়ণের জনপ্রিয়তা অন্য সমস্ত অনুবাদকেই ছাড়াইয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে তাঁহার অসংখ্য পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। সাধারণ পাঠক ও গবেষকেরা কৃত্তিবাস সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিয়া এ বিষয়ে নূতন নূতন আলোকপাতের চেষ্টা করিতেছেন। এমন কি, অবাঙালী গবেষকও কৃত্তিবাস সম্পর্কে কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা দেখাইয়া কৃত্তিবাসের গৌরব প্রচার করিতেছেন। ডঃ রমানাথ ত্রিপাঠী রচিত "কৃত্তিবাসী বাংলা রামায়ণ ঔর রামচরিত মানস কা তুলনাত্মক অধ্যয়ন" গ্রন্থটিতে হিন্দী ভাষায় কৃত্তিবাস সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব ও তথ্য আলোচনা আছে।[৯]

ডঃ ভট্টশালী অদ্ভুত আচার্যের প্রতি অতি-শ্রদ্ধা বশতঃ কৃত্তিবাসের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, "সমগ্র উত্তর বঙ্গ এবং (ঢাকা) ময়মনসিংহ ত্রিপুরাতেও অদ্ভুতাচার্যের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল—এই অঞ্চলে প্রধানতঃ তাঁহারই রামায়ণ পঠিত ও গীত হইত।"[১০] অথচ সেই অদ্ভুত আচার্যের অধিকসংখ্যক পুঁথি আবিষ্কৃত হয় নাই কেন তাহা ডঃ ভট্টশালী ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহার মতে শ্রীরামপুরের মিসনারীদের তৎপরতায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুদ্রিত হইয়া বহুল প্রচারের জন্যই অদ্ভুত আচার্যের মতো একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর কবি অপেক্ষা নিকৃষ্টতর প্রতিভাসম্পন্ন কৃত্তিবাসের অধিক জনপ্রিয়তা দেখা দিয়াছে; কিন্তু সব গৌরবটুকু অদ্ভুত আচার্যেরই

---

৯ কিছুকাল পূর্বে রেভারেণ্ড ফাদার কামিল বুল্কে, এস. জে., এম. এ, ডি. ফিল. মহাশয়ের হিন্দী ভাষায় 'রামকথা—উৎপত্তি ঔর ইতিহাস' শীর্ষক ডি. ফিল. গবেষণাটি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে রামায়ণকথা সম্বন্ধে সুবিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আছে বটে, কিন্তু বাংলা রামায়ণ সম্বন্ধে ডঃ বুল্কের জ্ঞান যে অতিশয় সীমাবদ্ধ, তাহা উক্ত গ্রন্থে শোচনীয় রূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

১০ ভারতী, ভাদ্র, ১৩৩০ (ডঃ ভট্টশালীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

প্রাপ্য—ইহাই ডঃ ভট্টশালীর অভিমত। সাধারণতঃ আমাদের দেশের গবেষকগণ objective ভাবে অর্থাৎ নিঃস্পৃহভাবে গবেষণায় অভ্যস্ত নহেন। নিজ নিজ চিত্তপ্রবণতা অনুসারে বাছিয়া বাছিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়া নিজ অভিমত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস তাঁহাদের এক প্রকার অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। ডঃ ভট্টশালীও তাহা হইতে মুক্ত নহেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের জনপ্রিয়তা ও বহুল প্রচারের মূলে যদি শুধু শ্রীরামপুরের মিসনের কারসাজিই একমাত্র কারণ হইত, তাহা হইলে কৃত্তিবাসের এত অধিকসংখ্যক পুঁথি মিলিবার কারণ কি? ভট্টশালী মহাশয় এই প্রশ্নটি সুকৌশলে এড়াইয়া গিয়াছেন। অনেক নকলনবিশ কৃত্তিবাসের পুঁথিতে অদ্ভুত আচার্যের অনেক অংশ জুড়িয়া দিয়াছে তাহা মিথ্যা নহে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আরও অনেক কবির রচনাংশ বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আর সকলের পুঁথি বাদ দিয়া নকলকারীরা শুধু কৃত্তিবাসী রামায়ণে অন্যের রচনাংশ গ্রহণ করিলেন কেন? কৃত্তিবাসের মতো কোন কবি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করিবার পর অল্প প্রতিভাধর কবিদের কিছু কিছু উৎকৃষ্ট অংশ কৃত্তিবাসী পুঁথিতে চলিয়া যাইবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই, পুঁথিলেখকদেরও কোন দোষ নাই। কৃত্তিবাস শ্রীরামপুরের মিসনারীদের পূর্বেই গৌরব ও জনপ্রিয়তার তুঙ্গশীর্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন। মিসনারীগণ যখন বাংলা রামায়ণ মুদ্রণের প্রয়োজন বোধ করিলেন, তখন সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি কৃত্তিবাসকেই গ্রহণ করিলেন। অদ্ভুত আচার্যের সংবাদ তখন এদেশে কেহ জানিত না। আচার্যের কবিপ্রতিভাও এমন কিছু বিস্ময়কর নহে যে, তাহা ভূগোল-ইতিহাসের সীমা পার হইয়া আমাদের যুগেও আসিয়া পৌঁছাইবে। মালদহের রজনীকান্ত চক্রবর্তী এবং দিঘাপতিয়ার জমিদার কুমার শরৎচন্দ্র রায় আঞ্চলিক গৌরবের বশে (তাঁহারা মনে করিতেন, কবি উত্তরবঙ্গের লোক) অদ্ভুত আচার্যের পুঁথি সংগ্রহ, মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী কৃত্তিবাসের প্রতি বৈরাগ্য বশতঃ এবং পূর্ববঙ্গে অদ্ভুত আচার্যের কিঞ্চিৎ জনপ্রিয়তার জন্য এই কবিকে বিস্মরণীর জলতল হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই। (অদ্ভুত আচার্য সমগ্র বাঙলার পাঠকসমাজে বিশেষ কোন

গৌরব বা জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারেন নাই। সাহিত্যের ইতিহাসে দুই-চারি পৃষ্ঠায় তাঁহার সম্বন্ধে যে আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে গবেষকেরও প্রয়োজন মিটিবে না, রসিক পাঠকও তাহা হইতে কিছুমাত্র লাভবান হইবেন না।

অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ 'অদ্ভুত রামায়ণ' বলিয়া পরিচিত হইলেও মূল সংস্কৃতে রচিত অদ্ভুত রামায়ণের সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব নাই।[১১] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অদ্ভুত আচার্যের 'শতস্কন্ধ রাবণবধ' শীর্ষক যে পুঁথি (পুঁথি সংখ্যা—১০৬১) আছে, তাহাতে সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণ কাহিনী অনুসৃত হইয়াছে। এই শতস্কন্ধ রাবণের গল্পটি কৃত্তিবাসের ভণিতাযুক্ত একটি পুঁথিতেও মিলিতেছে (কলি. বিশ্ব. পুঁথি সংখ্যা—২১৭)। অদ্ভুত আচার্য রামায়ণের সাতকাণ্ডেরই ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ পুঁথিতে তিনি একাধিকবার সেইরূপ ইঙ্গিত দিয়াছেন।

তাঁহার কাব্য কৃত্তিবাসের কাব্য অপেক্ষা বৃহদায়তন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কবির বর্ণনারীতি কৃত্তিবাস অপেক্ষা খুব বেশী উৎকৃষ্ট নহে।[১২] অদ্ভুত আচার্যের মুদ্রিত আদিকাণ্ড এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত খান কয়েক পুঁথি হইতে মনে হইতেছে, কবি সহজ ভাষায় বাল্মীকির ধারাটি অনুসরণ করিয়াছেন—মাঝে মাঝে অবশ্য বর্ণনাগুলি পল্লবিত আকারে গৃহীত হইয়াছে। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দগুলি নিতান্ত মন্দ নহে, মাঝে মাঝে

১১ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (১৩০৫) রামেন্দ্রসুন্দর মন্তব্য করিয়াছিলেন, "অদ্ভুত রামায়ণ নামে শতস্কন্ধ রাবণের উপাখ্যানমূলক যে সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, তাহার সহিত এই অদ্ভুত আচার্যের কোন সম্বন্ধ আছে বোধ হইল না।"

১২ এবিষয়ে কয়েক জনের মন্তব্য: "যতদূর দেখিলাম কৃত্তিবাসের প্রণালী হইতে পৃথক বোধ হইল না।"—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩০৫ (রামেন্দ্র সুন্দরের প্রবন্ধ) রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেন, "কবিতাংশে তুলনা করিলে অদ্ভুতাচার্যের অপেক্ষা কৃত্তিবাসকে উচ্চ আসন প্রদান করিতে হয়। অদ্ভুতাচার্যের শব্দাড়ম্বর বড় বেশী, কিন্তু রচনায় প্রসাদ ও মাধুর্যগুণের অভাব দৃষ্ট হয়।"—সা. প. প—১৩১৩। অবশ্য তিনি ১৯১৩ সালে অদ্ভুত আচার্যের আদিকাণ্ডের ভূমিকায় বলিয়াছিলেন, "কৃত্তিবাসের রামায়ণ অপেক্ষা এই রামায়ণ আকারে অনেক বৃহৎ, কিন্তু কবিত্বসম্পদে হীন। মোটের উপর ইহার বর্ণনা প্রসাদগুণ বিশিষ্ট।" (মুখবন্ধ, পৃ. ৩)

আধুনিক শব্দেরও প্রচুর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ রামের বনগমনে কৌশল্যার বিলাপ উল্লেখযোগ্য :

রাজার কুমার রাম কেবল যুখের কায়া।
প্রচণ্ড রবির তাপে কেবা দিবে ছায়া॥
বৃক্ষ্যছাল পরিধান হাতে সরধনু।
কিমতে হাটিবা বনে মাএর প্রাণতনু॥
আমাকে ছাড়িয়া তুমি জাবা দেসান্তরে।
শ্রীরামের মাও বলি কে ডাকিবে মোরে॥
ঘর সন্ত করি রাম এড়ি যাও মোরে॥ (কলি. বিশ্ব. পুঁথি—১২০২)

এ বর্ণনা করুণ রসে সার্থক এবং সহজ প্রাণের আবেগে কম্পমান। সীতাহরণে রামচন্দ্র :

সীতা সীতা বুলি রাম ডাকেন উচ্চ স্বরে।
হাহাকার শব্দ হৈল অমর নগরে॥
রাম বোলেন শুন ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ।
ফল আনিবারে গেলা সীতা হেন লয় মন॥
নগড় দিঞা বনে গেল ভাই দুই জন।
চতুর্দ্দিকে বন প্রভু করে নিরীক্ষণ॥
সীতাকে না দেখেন প্রভু বনের ভিতর।
গোদাবরীর তীরে গেলেন দুই সহোদর॥
চতুর্দিকে নদীর ঘাট করে নিরীক্ষণ।
সীতাকে না দেখিয়া প্রভুর আকুল জীবন॥

এ বর্ণনা কৃত্তিবাসের তুলনায় ততটা সরস না হইলেও স্বাভাবিক বলিয়া প্রশংসার্হ।

রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের চেষ্টায় সীতার বিলাপ :

মোর প্রভুর সেবিত ভাই লক্ষ্মণ হের রে ঝাট আই
ঝাট আয় লক্ষ্মণ আগবাড় ঝাট।
দুরাচার নারীচোর কলঙ্ক রাখিল মোর
তুমি বেড়িঞা রাবণের মুণ্ড কাট॥
তুমি বলিলে যত বোল মুই না কইনু উতরোল
না শুনিনু তোমার মন্ত্রণা।
ঘর হনে বাহির হৈতে তুলিঞা লইল রথে
মোকে চুরি করি নিঞা যায় রাবণা॥

সীতার এই বিলাপ সহজ বলিয়া হৃদয়গ্রাহী—যদিও কলাকুশলতা এখানে কিছুমাত্র নাই।

রামের সীতানির্বাসন সম্বন্ধে কবি অনেকটা লোকসাহিত্যের ধারা অনুসরণ করিয়াছেন। অযোধ্যায় ফিরিয়া কিছুকাল সুখে-শান্তিতে অতিবাহিত করিয়া রামচন্দ্র শুনিলেন যে, প্রজারা নাকি সীতার চরিত্র লইয়া কানাকানি করিতেছে :

আমি লক্ষ্মণসীতা নিঞাছিলাম বনে।
তারা নাকি ভালমন্দ কথা কহে কোনজনে॥

সভাসদেরা চুপ করিয়া থাকিলেও ভদ্রমুনি নামক এক কটুভাষী মুনি রামচন্দ্রকে একান্তে বলিলেন :

ভাতিজানধ্ না ছাড়িল পাপিষ্ঠ রাবণ।
দশ মাস ছিল মাতা তাহার সদন॥
সীতাকে লঞা ঘর তুমি কর নারায়ণ।
তে কারণে মন্দ তোমাক বলে প্রজাগণ॥

ইহাতে রামচন্দ্র দুঃখিত হইলেন। শুনিলেন, প্রজারা তাহাদের স্ত্রীদের বলিতেছে, "মনে ভাবিআ বুঝ আমি নহি রাম।" অতঃপর একদিন সীতা ভগিনীদের অনুরোধে মৃত্তিকায় রাবণের মূর্তি অঙ্কন করিয়া তাহাদের কৌতূহল দূর করেন এবং নিদ্রাবিষ্ট হইয়া সেই চিত্রের উপর ঘুমাইয়া পড়েন। এই দৃশ্য দেখিয়া সন্দেহাতুর রাম সীতাকে বনবাস দিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। চন্দ্রাবতীর লৌকিক রামায়ণেও এই কাহিনীর ধারা অনুসৃত হইয়াছে। কবি লোকসাহিত্যের গালগল্পও পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বচ্ছন্দ বর্ণনায় কবি কোনও কোনও ক্ষেত্রে সংস্কৃত অলঙ্কারের সাহায্য লইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ সীতার রূপবর্ণনা উল্লেখযোগ্য :

শ্যাম চামর চারু নিন্দিত চিকুর।
নিবন্ধ কবরীভার তাহে নানা ফুল॥
ভুবনমোহন বেশ যেন চন্দ্রকলা।
নিবিড় মেঘত যেন চমকে চপলা॥
ললাটে নির্মিত বিন্দু সুন্দর সিন্দুর।
পাকা বিম্বাধর তাঁর দেখিতে মধুর॥
দীর্ঘ নয়নে শোভে কজ্জল উজ্জ্বল।
মেঘ যেন শোভা করে গগনমণ্ডল॥

কম্বুকণ্ঠে মুক্তা মালা দোলে পয়োধরে।
সুরেশ্বরী ধারা যেন সুমেরু শিখরে॥
কণ্টকবিহীন যেন মৃণাল বাহুলতা।
কনককঙ্কন তাথে পরাইছে ধাতা॥

এখানে কবি সংস্কৃত অলঙ্কারের সুর লাগাইয়া গদ্যাত্মক বর্ণনাকে কাব্যে রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অদ্ভুত আচার্য মোটামুটি কৃত্তিবাসের ধারা অনুসরণ করিলেও বহুস্থলে তাঁহার বিবৃতি রূপরঙহীন বর্ণনার উর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। সীমাবদ্ধ পরিবেশে চরিত্র বর্ণনাতেও তিনি বিশেষ কোন মৌলিকতা দেখাইতে পারেন নাই। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী কৃত্তিবাসের তুলনায় অদ্ভুত আচার্যের কবিত্বশক্তির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। অদ্ভুত আচার্যের চরিত্রচিত্রণনৈপুণ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন।[১৩] কিন্তু এই কবির বর্ণনায় এমন কোন অদ্ভুত নৈপুণ্য ফুটিয়া উঠে নাই। কুব্জী ও কৈকেয়ীর চরিত্র প্রসঙ্গে ভট্টশালী মহাশয় যে বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, পূর্বেই কৃত্তিবাস তাহাতে অধিকতর নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। না হইলে অদ্ভুত আচার্য কিছু প্রশংসা দাবি করিতে পারিতেন।[১৪] কৃত্তিবাস অদ্ভুত আচার্যের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ ভট্টশালীর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "কৃত্তিবাস সাধারণতঃ বাল্মীকিকে অনুসরণ করিয়াছেন, প্রয়োজন মত নানা রামবিষয়ক কাব্য ও নাটক হইতে সুন্দর সুন্দর অংশ আনিয়া নিজের অনুবাদে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। অদ্ভুতাচার্য কিন্তু ঠিক সে পথে যান নাই। তিনি যেখানে যত অদ্ভুত কাব্যরসপূর্ণ আসরজমান কাহিনী পাইয়াছেন, সমস্তই আনিয়া নিজের রামায়ণে ঢুকাইয়াছেন।"[১৫] তাঁহার এই মন্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। কৃত্তিবাসের প্রতিভা অধিকতর সার্থক ও সমন্বয়ধর্মী। বাঙালী-চিত্ত ও উত্তরাপথের পৌরাণিক রামসংস্কারকে এক

---

১৩ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত 'মহাকবি কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ', পৃ. ৩।৶০

১৪ অদ্ভুতের কবিত্ব সম্বন্ধে—ডঃ ভট্টশালী একবার বলিয়াছেন, "কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অদ্ভুতের রামায়ণে বিষয়বৈচিত্র্য অনেক বেশী, চরিত্রচিত্রণও নূতনতর।" আবার পরক্ষণেই কৃত্তিবাস ও অদ্ভুত আচার্যকে প্রায় একাসনে বসাইয়া বলিতেছেন, "রামায়ণ রচক হিসাবে অদ্ভুতের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কৃত্তিবাস অপেক্ষা বড় কম নহে।"—ঐ

১৫ নলিনীকান্ত সম্পাদিত 'মহাকবি কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ' (ভূমিকা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত।

সঙ্গে মিলাইবার দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী কৃত্তিবাস সংস্কৃত সাহিত্যাদিতেও অতিশয় নিপুণ ছিলেন। কাজেই পৌরাণিক যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত-হইয়া-আসা রামপ্রবাহকে তিনি ভগীরথের মতো বাঙলার ঘাটে ঘাটে লইয়া গিয়াছেন। অপরদিকে অদ্ভুত আচার্য পাঁচ বৎসর বয়সে (?) শাস্ত্রগ্রন্থ আয়ত্ত করিলেও কাব্যরচনায় কৃত্তিবাসের সমকক্ষ ছিলেন না। তাই ক্লাসিক আদর্শ অপেক্ষা লোকসাহিত্যের গালগল্পের দিকে তাঁহার আকর্ষণ ছিল অধিক। আসর-জমান উদ্ভট গল্পে তিনি অঞ্চলবিশেষের শ্রোতার মনোরঞ্জন করিলেও এযুগে তাঁহার প্রভাব আসিয়া পৌঁছাইতে পারে নাই। অদ্ভুত আচার্য একটা বিশেষ যুগের ও অঞ্চলের শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য, বাল্মীকি, অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, লোকসংস্কৃতি—যেখান হইতে পারিয়াছেন, সেখান হইতেই চমকপ্রদ ও চটকদারী গল্প সংগ্রহ করিয়াছেন। ডঃ ভট্টশালীর এই মন্তব্য কিয়দংশে সত্য—"চরিত্রচিত্রণে যথেষ্ট স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর মনের মত করিয়া চরিত্রগুলিকে তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন",—কিন্তু সে বাঙালী উত্তর ও পূর্ববঙ্গের অধিবাসী এবং তাহার পটভূমিকা সপ্তদশ শতাব্দী। কাব্যকারুকর্মে অদ্ভুত আচার্যের বিশেষ কোন পারদর্শিতা ছিল না। শব্দসম্পদ, ছন্দঃ কৌশল, অলঙ্কার সন্নিবেশ কোন দিক দিয়াই তিনি কৃত্তিবাসের সমকক্ষ নহেন। এরূপ বিবৃতিধর্মী গদ্যাত্মক রচনাপাঠে ধৈর্য রক্ষা করাই সুকঠিন। তাঁহার অধিকাংশ রচনাই পুঁথির মধ্যে বন্দী হইয়া আছে। মালদহের রজনীকান্ত চক্রবর্তী শুধু আদি কাণ্ডটি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ যুগের পাঠক সেই মুদ্রিত অংশটি পাঠ করিলেই বুঝিবেন, "কীর্তিবাস এ বঙ্গের অলঙ্কার"—মাইকেল কেন এই বাক্যাংশে কৃত্তিবাসের স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, এবং কেনই-বা নলিনীকান্তের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও অদ্ভুত আচার্যের সমগ্র কাব্য মুদ্রিত হয় নাই।[১৬] কৃত্তিবাস

---

১৬ ডঃ ভট্টশালী সক্ষোভে বলিয়াছেন, "দুঃখ এই যে, এমন যে অদ্ভুতাচার্যের রচনা, তাহা আজ পর্যন্তও জীর্ণ পুঁথির স্তূপে আবৃত হইয়াই রহিয়া গেল—উহার সম্পাদক এবং প্রকাশক মিলিল না।" (পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ. ৩৸৶০) প্রকাশক না জুটিবার কারণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণে-প্লাবিত বাঙলা দেশে কৃত্তিবাস অপেক্ষা প্রতিভার-খর্ব কোন কবির রামায়ণের পাঠক সংখ্যা অতি সীমাবদ্ধ। এইজন্য ব্যবসায়ী প্রকাশকেরা এইরূপ গ্রন্থ ছাপাইতে প্রবৃত্ত হন না।

বাঙালীর প্রাণের চাহিদা বুঝিয়াছিলেন। কখনও নামভক্তিবাদ প্রচার করিয়া, কখনও বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনকে অধিকতর মূল্য দিয়া, কখনও করুণরসের বন্যা বহাইয়া, কখনও-বা হাস্যকৌতুকের রঙ্গরহস্য সৃষ্টি করিয়া কৃত্তিবাস বাঙালীর অন্তর লুঠ করিয়া লইয়াছেন। হয়তো তাঁহার পুঁথিতে নানা জনের হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে; কবিচন্দ্র, অদ্ভুত আচার্য প্রভৃতি কত খ্যাত-অখ্যাত কবির রচনা নামগোত্র হারাইয়া কৃত্তিবাসী রামচরিত-মানসসরোবরে স্বকীয় অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে, জয়গোপাল-মোহন-চাঁদের দলও ইহার কোন কোন অংশে যথেচ্ছা কলম চালাইয়াছেন। তবু কৃত্তিবাস আজ বাঙালীর ঘরের ঐতিহ্য, কৃত্তিবাস বাঙলার জাতীয় কবি। অদ্ভুত আচার্য কোন দিনই সে গৌরব লাভ করিতে পারিবেন না। শুধু ঘটনা-বিবৃতি ও নানাপ্রকার গালগল্প জুটাইয়া অদ্ভুত আচার্য একদা কিছু জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভক্তির আবেগ ও করুণরসের অভাবে তাঁহার কাব্য স্তিমিতগতি হইয়া পড়িয়াছে; হাস্য-কৌতুক তাঁহার রচনায় সুলভ নহে; ভাষার ঝঙ্কার, প্রসন্নতা, ক্লাসিক গাম্ভীর্য, তৎসম শব্দের যথাযথ প্রয়োগ এবং দেশী শব্দের সার্থক ব্যঞ্জনা যাহা কৃত্তিবাসের সম্পদ, অদ্ভুত আচার্য সে ধনে ধনী নহেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় কৃত্তিবাসের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন এবং অদ্ভুত আচার্যকে অধিকতর গৌরবের আসনে বসাইতে চাহিয়াছেন। সব দিক দিয়া বিচার করিলে ডঃ ভট্টশালীর এরূপ সিদ্ধান্ত অতিশয় একদেশদর্শী বলিয়া মনে হয়। কৃত্তিবাসের প্রায় দেড়শত বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়া এবং সম্মুখে কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদর্শ দেখিয়াও অদ্ভুত আচার্য প্রশংসনীয় কবিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই, কারণ প্রতিভা বিচারে তিনি উচ্চাসনের অধিকারী নহেন।

রামায়ণের অন্যান্য অনুবাদক ॥

বিশাল বটতরু বিপুল শাখা বিস্তারে চারিদিকে এমন ছায়া বিতরণ করিয়া থাকে যে, সেই ছায়ায় ছোট ছোট গুল্ম বাড়িবার অবকাশ পায় না। কৃত্তিবাস সেই প্রকার এমন একটি ছায়াতরু, যাহার প্রভাবের ফলে রামায়ণের অপরাপর অনুবাদকগণের প্রতিভা সত্ত্বেও তাঁহাদের সমস্ত প্রচেষ্টা দুই চারি-খানি খণ্ডিত ছিন্ন পুঁথির মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে। কৃত্তিবাসের সর্বগ্রাসী

প্রভাব সত্ত্বেও অদ্ভুত আচার্য তবু সীমাবদ্ধক্ষেত্র ও সঙ্কীর্ণ পরিবেশে কথঞ্চিৎ প্রচার লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে আরও এমন কয়েকজন রামকথাকারের আবির্ভাব হইয়াছিল, যাঁহারা প্রতিভায় অদ্ভুত আচার্য অপেক্ষা কোন দিক দিয়া নিকৃষ্ট ছিলেন না, বরং কেহ কেহ কাব্যরচনা কৌশলে কোন কোন ক্ষেত্রে অদ্ভুত আচার্যকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের অনেকেই পুরা রামায়ণের অনুবাদে অগ্রসর হন নাই। অধিকাংশ কবি রামায়ণের কোন একটি জনপ্রিয় পালা অবলম্বন করিয়াছিলেন, শুধু দম ছিল না বলিয়া ইঁহারা আসর জমাইতে পারেন নাই। কেহ কেহ আবার সংস্কৃত অদ্ভুতরামায়ণ ও অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বন করিয়াছিলেন, যাহার সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণে অভ্যস্ত পাঠকসাধারণের বিশেষ যোগ ছিল না। অদ্ভুত রামায়ণে বর্ণিত শতস্কন্ধ রাবণ বধ ও বাল্মীকির কবিত্ব লাভের বিবরণটি পাঠক সমাজে কিছু জনপ্রিয় ছিল বলিয়া অন্যান্য রামায়ণকার এই কাহিনী দুইটির প্রতি বিশেষ প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। কোন কোন লেখক আবার মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত ও জৈমিনী ভারতে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত রামকাহিনীও স্বল্পাকারে রচনা করিয়াছিলেন।

নিঃসংশয়রূপে নির্দেশ করা না গেলেও সপ্তদশ শতাব্দীতে রামায়ণের অন্ততঃ আটখানি পুরা অনুবাদ বা খণ্ডিত অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ, গুণরাজখান, ঘনশ্যামদাস, ভবানীদাস, দ্বিজ লক্ষ্মণ, রামশঙ্কর, কৈলাস বসু, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি কবিগণের ভণিতায় রামায়ণের যে সমস্ত খণ্ডিত বা অখণ্ডিত রামায়ণ কাব্য পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে। ইতিপূর্বে কৃত্তিবাস ও অদ্ভুত আচার্য অন্যান্য স্থান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিলেও তাঁহারা বাল্মীকির কাহিনীই মূলতঃ অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর কয়েকজন রামকথাকার বুঝিয়াছিলেন যে, কৃত্তিবাসের পর বাল্মীকি রামায়ণে পাড়ি জমানো দুরূহ। তাই তাঁহারা বৈচিত্র্যের লোভে ও কিঞ্চিৎ মৌলিকতা দেখাইবার জন্য রামকথা-সংবলিত অন্যান্য সংস্কৃত রামায়ণ অনুসরণ করিয়াছিলেন। বৈয়াসকি ও জৈমিনী মহাভারতে প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে যে রামকথা বিবৃত হইয়াছে, অনেক বাঙালী অনুবাদক তাহাই অবলম্বন করিয়া স্বল্প পরিসরে পুরা রামায়ণ কাহিনী বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ অদ্ভুত রামায়ণ ও অধ্যাত্ম রামায়ণ কাহিনীর তত্ত্বাংশকে বাদ দিয়া আখ্যান ভাগ অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। (কেহ বা বাল্মীকি ও অদ্ভুত-অধ্যাত্ম রামায়ণের কাহিনীকে মিলাইয়া-মিশাইয়া নূতন ভাবে রামায়ণের কথাবস্তুকে পাঠকসমাজে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে চন্দ্রাবতীর রামায়ণ উল্লেখযোগ্য।[১৭] বাঙলা দেশের অনুবাদকগণ সংস্কৃত রামায়ণের কাহিনী মোটামুটি অনুসরণের চেষ্টা করিলেও লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত একপ্রকার গ্রামীণ রামকাহিনী জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত চন্দ্রাবতীর মৌখিক রামায়ণে পাওয়া যাইবে)।

কৈলাস বসু, রামশঙ্কর, দ্বিজ লক্ষ্মণ ও ভবানীদাস—ইঁহারা অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কৈলাসচন্দ্র বসু অদ্ভুত রামায়ণের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৫০৭ শকে (১৫৮৬ খ্রীঃ অঃ) ইঁহার 'মহাভাগবত পুরাণ' নামক একখানি ভাগবত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। মনে হয় তাঁহার অদ্ভুত রামায়ণ ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হয়। তাঁহার এই গ্রন্থ (সাহিত্য পরিষদ পুঁথি—৫৬৬) নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ তাঁহার পূর্বে রামায়ণ-মহাভারতের কোন অনুবাদকই মূল সংস্কৃতের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, প্রায় অধিকাংশ স্থলেই মূলকে অবলম্বন করিয়া নিজ ভাষায় কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু কৈলাস বসু অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মূল সংস্কৃতে রচিত অদ্ভুত রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন। সে যুগের আদর্শমতো অদ্ভুত রামায়ণের কাহিনী নিজ ভাষায় বিবৃত করাই ছিল সাধারণ রীতি। কিন্তু তিনি মূলগ্রন্থকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করিয়াছিলেন; অনুবাদও প্রশংসনীয়। যথা—

> আরণ্যানাং মুনীনাং বৈ স্তোকং স্তোকঞ্চ শোণিতম্
> কলসা পুরিতং ভক্ষেদ্রাক্ষসী যা চ কামতঃ।
> তস্যা গর্ভে ভবিষ্যামি তচ্ছোণিতসমুদ্ভবা। (অদ্ভুত রামায়ণ, ৬।২৫)

অনুবাদ:

> অরণ্যনিবাসী যত ঋষি মুনিগণ।
> তাঁদের শোণিতে হবে কলসী পূরণ।

১৭ পরে আলোচনা করা হইয়াছে।

কামনা করিয়া কোন যেই নিশাচরী।
ভক্ষণ করিবে তাহা বিবজ্ঞান করি ॥
সেই তো শোণিতে আমি উদ্ভব হৈয়া।
জনম লভিব রাক্ষসীর গর্ভে গিয়া ॥ (সাহিত্য পরিষদ পুঁথি)

এ অনুবাদ মূলানুগ, স্বচ্ছ ও সংহত। সপ্তদশ শতাব্দীতে এরূপ পরিচ্ছন্ন অনুবাদ অতীব প্রশংসনীয়। অবশ্য কবি মূলকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করিতে গিয়া অনেক সময় ভাষাকে কিঞ্চিৎ কৃত্রিম ও জড়তাগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। আক্ষরিক অনুবাদে অনুবাদকের কৃতিত্ব দেখাইবার সুযোগ নাই বলিয়া এ অনুবাদ নিষ্ঠাপূর্ণ হইলেও সর্বত্র সুখপাঠ্য হয় নাই। কবির সম্পূর্ণ গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই ; অনুমান তিনি অদ্ভুত রামায়ণের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদের দৃষ্টান্ত হিসাবে কৈলাস বসুর খণ্ডিত পুঁথিখানির মূল্য অবশ্য স্বীকার্য।

ভবানীদাসের (ঘোষ) 'রামের স্বর্গারোহণ' শীর্ষক যে পালা (কলি. বিশ্ব. পুঁথি—১৫১৪) পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রারম্ভে কবি সংক্ষেপে নিজ পরিচয় দিয়াছেন। যদিও ইহাতে বাল্মীকির উত্তরাকাণ্ডের আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন স্থলে তিনি অদ্ভুত রামায়ণকে অনুসরণ করিয়াছেন। ভাষা ও রচনা কোন দিক দিয়াই প্রশংসনীয় বা উল্লেখযোগ্য নহে। একটু দৃষ্টান্ত :

রাজা বিনে সোভা নাহি প্রিথিবির ভিতর।
বিষ্ণু বিনে শূন্য দেখি অমরা নগর ॥
বিষ্ণু বিনে দেবগণের গতি নাহি আর।
হেন পদ না দেখিয়া করে হাহাকার ॥

ইঁহার ভণিতায় 'রাধা বিলাস' শীর্ষক যে পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ১০৫৬ বাংলা সনের (১৬৪৯ খ্রীঃ অঃ) উল্লেখ আছে। তাই মনে হয় তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে বর্তমান ছিলেন।

পূর্ববঙ্গের মাণিকগঞ্জের অধিবাসী রামশঙ্করের রামায়ণ নানা দিক দিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্বপ্রথম এই কবির বিবরণ প্রকাশিত হয় 'Dacca Review ও সম্মিলন' পত্রিকায় (২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা)। পরে দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে' (১ম) ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বাংলা পুঁথির বিবরণীতে (Descriptive Catalogue, Vol. I) এই কবির রামায়ণ হইতে কিঞ্চিৎ উদাহরণ মুদ্রিত হইয়াছে। কবির পুরা

নাম রামশঙ্কর দত্তরায়। খুব সম্ভব কবি বৈদ্যবংশীয় ছিলেন। কারণ আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"পদবন্ধ করি কহে ভিষক শঙ্কর।" বোধহয় সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বা পরবর্তী কালে[১৮] তিনি অধ্যাত্ম রামায়ণের কাহিনীকে অনুসরণ করিয়া এবং বাল্মীকি, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ প্রভৃতি হইতে অল্পাধিক কাহিনী সংগ্রহ করিয়া পুরা রামায়ণকাব্য লিখিয়াছিলেন মনে হইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও এই কবির কিষ্কিন্ধ্যা ও অরণ্যকাণ্ডের পুঁথি আছে। কবির কাব্য রচনায় যে বিশেষ প্রবণতা ও প্রতিভা ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কাব্যটির সংহত পরিচ্ছন্ন আকার-আয়তন প্রশংসা দাবি করিতে পারে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ইদানীন্তন কালে বাংলা কাব্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু কবি পূর্বেই এই ছন্দে বেশ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। যথা :

হেদে হে নাবিকি আমার বচন শ্রবণ করহ ভাই।
বারে তরণী আনহ এখানে উপারে আমরা যাই॥
রামের বদন হেরিয়া নাবিকি মোহিত হৈয়া মনে।
কমললোচনে নাবিকি কহেন এমন দেশেতে কেনে॥
... ...
চরণযুগল পাখালি রাঘব চাপহ আসিয়া নায়।
নাবিকি বচন শুনিয়া কমললোচন কহেন তায়॥
নিকটে তরণী আনহ চরণ পাখালি তাহাতে উঠি।
তরণী আনিয়া নাবিকি রামের ধুয়াইল পদ দুটি॥
তরণি উপরে বসিলা রাঘব জানকী লক্ষ্মণ সাথে।
নাবিকি তরণী বাহিয়া উপারে রাখিলা কমলানাথে॥
ভাবিয়া রাঘব চরণ কমল শ্রীরামশঙ্করে ভাষে।
নাবিকে আশীষ করিয়া গমন করিল মুনির বাসে॥

এ ভাষা ও ছন্দ সপ্তদশ শতাব্দীর হইলে কবিকে অত্যন্ত শক্তিশালী বলিতে হইবে। কিন্তু ভঙ্গিমা দেখিয়া ইহাকে পুরাতন বলিয়া মনে হইতেছে না।

দ্বিজ লক্ষ্মণ সংস্কৃত অধ্যাত্ম রামায়ণ ও অদ্ভুত রামায়ণের কাহিনী সংমিশ্রিত করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীতে বোধ হয় পুরা মাপের রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের পুঁথিশালায় ইঁহার রামায়ণের প্রায় সমস্ত পুঁথিই রক্ষিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর

১৮ মণীন্দ্রমোহন বসু—বাঙ্গালা সাহিত্য, ২য়, পৃ. ১৩৮

পুরাণ পাঠক-সমাজে অদ্ভুত রামায়ণ ও অধ্যাত্ম রামায়ণের যে বেশ প্রচার হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ—দ্বিজ লক্ষ্মণ উভয় কাব্য হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়া পুরা আকারে রামায়ণ রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য বলাই বাহুল্য যে, কবি এই দুই কাব্যের হুবহু অনুসরণ বা যথাযথ অনুকরণ করেন নাই ; কোন কোন স্থলে তিনি দুই একটি আখ্যায়িকা নিজ কল্পনা হইতেও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। 'শিবরামের যুদ্ধ' পালা তাঁহার ভণিতায় একদা বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল, কারণ এ পালার একাধিক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার ভণিতাযুক্ত 'শিবরামের পালা'র একখানি পুঁথিতে ১০৬১ বঙ্গাব্দ (১৬৫৪ খ্রীঃ অঃ) পাওয়া যাইতেছে ; তাই মনে হয় কবি সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বর্তমান ছিলেন। ইঁহার রচনা বিশেষভাবে কাব্য গুণান্বিত না হইলেও সরল রচনায় নিতান্ত নিন্দনীয় নহে। যথা—

> শ্রীরাম বলেন মিতা তুমি প্রাণাধিক।
> তোমা হেন বন্ধু মোর নাহিক অধিক ॥
> পিতৃ বোলে প্রভু রাম তুলিলেন তারে।
> বিদায় হইল গুহ প্রণমি সভারে ॥

দ্বিজ গঙ্গানারায়ণের (কৃত্তিবাসের বংশে আবির্ভূত) 'রামলীলা' ও ঘনশ্যাম দাসের 'সীতার বনবাস' ক্ষুদ্রাকারের পালাগানের সমষ্টি। তন্মধ্যে ঘনশ্যাম দাসের রামায়ণে জৈমিনী ভারতে বর্ণিত কাহিনী অনুসৃত হইয়াছে। গঙ্গা-নারায়ণের রামলীলা কবিত্বগুণে উল্লেখযোগ্য নহে, কিন্তু ঘনশ্যামের কবিত্ব কিঞ্চিৎ প্রশংসার দাবি রাখে। ঘনশ্যামের একখানি পুঁথি ১০৩৫ বঙ্গাব্দ (১৬১৮ খ্রীঃ অঃ) পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং কবি সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, অথবা ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ভাষা ও বর্ণনার মধ্যে উচ্চ প্রশংসনীয় কবিত্বের বড় একটা সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

গুণরাজ-উপাধিক কোন কবি সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে মহাভারতের বনপর্বে বর্ণিত রামায়ণ কাহিনী অবলম্বনে এই ক্ষুদ্রকাব্য রচনা করেন। ইহা 'ভারত রামায়ণ' (যেহেতু মহাভারত হইতে উপাদান সংগৃহীত হইয়াছিল) নামেও পরিচিত। কাব্যের প্রারম্ভভাগে মহাভারতের বনপর্ব অর্থাৎ পাশাক্রীড়ায় পরাভূত যুধিষ্ঠিরের বনগমন বর্ণিত হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাহিত

পরিষদে রক্ষিত পুঁথি হইতে মনে হয়, কবির প্রকৃত নাম ছিল ষষ্ঠীবর দত্ত। এই নামে আরও দুইজন কবি ছিলেন বলিয়া কোন্ ষষ্ঠীবর প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া কিছু সংশয় সৃষ্টি হইয়াছিল। ইঁহার রামায়ণে অদ্ভুত রামায়ণের ঈষৎ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রচনা ভঙ্গিমা ও পারিপাট্য নিতান্তই সাধারণ স্তরের বলিয়া এই গুণরাজ খাঁ উপাধিক কবি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নাই।

এবার আমরা একখানি বিচিত্র রামায়ণের উল্লেখ করিয়া বিষয়ান্তরে প্রবেশ করিব। ইহা চন্দ্রাবতীর রামায়ণ। ১৯৩২ সালে দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় (চতুর্থখণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা) এই গাথারামায়ণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে আমরা বংশীদাস চক্রবর্তীর মনসামঙ্গল আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার বিদুষী কন্যা চন্দ্রাবতীর নাম উল্লেখ করিয়াছি। চন্দ্রকুমার দে নামক এক প্রাচীন সাহিত্যামোদী ব্যক্তির সহায়তায় দীনেশচন্দ্র ময়মনসিংহ হইতে যে সমস্ত মৌখিক ছড়া, কাহিনী ও গ্রাম্য গাথা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর রচিত বলিয়া প্রচারিত রামায়ণ কাহিনীটি মূলতঃ সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণের আদর্শে পরিকল্পিত হইলেও, ইহাতে ছড়ার সুর ও মেয়েলি হাতের রচনার স্পর্শ পাওয়া যাইতেছে। চন্দ্রকুমার দে ময়মনসিংহের স্ত্রীলোকদের মুখ হইতে এই রামায়ণ কাহিনী সংগ্রহ করেন এবং 'সৌরভ' পত্রিকায় (২য় বর্ষ) "মহিলাকবি চন্দ্রাবতী" শীর্ষক প্রবন্ধ এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করেন। চন্দ্রাবতীর মর্মন্তুদ কাহিনী লইয়া অনেক ছড়া এখনও ময়মনসিংহে প্রচলিত আছে, তাহার কিছু কিছু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'ময়মনসিংহ গীতিকা'য় (১।১) প্রকাশিত হইয়াছে। বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী যে কবিপ্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। দস্যু কেনারামের পালাটিতেও তাঁহার ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। আমরা বংশীদাসকে নানা প্রমাণের বলে সপ্তদশ শতাব্দীর কবি বলিয়া স্থির করিয়াছি।[১৯] সুতরাং তাঁহার কন্যাও ঐ একই সময়ে বা কিছু পরে আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন। চন্দ্রাবতীই বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা

১৯ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'বংশীদাস চক্রবর্তী' দ্রষ্টব্য।

কবি।[২০] চন্দ্রকুমার দে বহু আয়াস স্বীকার করিয়া এই অজ্ঞাত-পরিচয় কবিকে বাঙলার সারস্বত সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। "মেয়েরাই ইহার গায়ক, ইহার কবি স্ত্রীলোক, ইহার শ্রোতা ও গায়কেরাও অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীলোক।"[২১]

এই পালাগানটি সম্পূর্ণ সংগৃহীত হইতে পারে নাই। সীতার বনবাসের প্রাক্কালে কাহিনী অর্ধপথে খণ্ডিত হইয়াছে। চন্দ্রকুমার দে পালাটিকে মোট তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে রাবণের দিক হইতে কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে রাবণের স্বর্গমর্ত্যাদি অভিযান এবং রামের জন্ম, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সীতার বারমাসী এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে সীতার বনবাসের পূর্ব-সূচনায় আখ্যান খণ্ডিত হইয়াছে। অনুমান, পালাটিতে সীতার পাতাল প্রবেশ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছিল। স্ত্রীসমাজে প্রচলিত এই মেয়েলি ছড়াটিতে ধারাবাহিক কাহিনী নাই, দুই-একটি ঘটনা অবলম্বনে পালার পৃথক পৃথক পর্ব বিন্যস্ত হইয়াছে। কাজেই এই রামায়ণকথা লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, অনুবাদ-সাহিত্যের সমপর্যায়ে ইহার স্থান হইতে পারে না।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণের ভাষা, বর্ণনা ও বাগ্‌ভঙ্গিমা নারীসুলভ কোমলতায় পূর্ণ, প্রায় ছত্রেই ছড়ার সুরটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। যথা :

শয়ন মন্দিরে একা গো সীতা ঠাকুরাণী।
সোনার পালঙ্কোপরি গো ফুলের বিছানী॥
চারিদিকে শোভে তার গো সুগন্ধি কমল।
সুবর্ণ ভৃঙ্গার ভরা গো সরযুর জল॥
নানা জাতি ফল আছে গো সুগন্ধে বসিয়া।
যাহা চায় তাহা দেয় গো সখীরা আনিয়া॥
ঘন ঘন হাই উঠে গো নয়ন চঞ্চল।
অঙ্গ অবশ অঙ্গ গো মুখে উঠে জল॥

২০ দীনেশচন্দ্র চণ্ডীদাসের রামীকে সেই গৌরব দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু আমরা সহজিয়া চণ্ডীদাসকে পরবর্তী কালের কবি বলিয়া মনে করি, তাই চন্দ্রাবতীকেই সেই গৌরব দিবার পক্ষপাতী। সহজিয়া চণ্ডীদাস সম্পর্কে লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (২য় খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

২১ পূর্ববঙ্গ গীতিকা (কলি. বিশ্ব. প্রকাশিত), চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩১১

এ ভাষা বেশ পরিচ্ছন্ন। ইহাতে অল্পবিস্তর অদ্ভুত রামায়ণের প্রভাব থাকিলেও লোকসংস্কৃতিই ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কুকুয়া মনস্বিনী ও সীতা-প্রসঙ্গে লোকজীবনের প্রভাব স্পষ্টতঃ বোধগম্য হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। চন্দ্রকুমার দে-র পূর্বে কোন ময়মনসিংহবাসী এই রামায়ণ সম্বন্ধে কোথাও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই—ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। যাঁহারা বংশীদাসের মনসামঙ্গল প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও চন্দ্রাবতীর রামায়ণ সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখিতেন না। পরে চন্দ্রকুমার দে মহাশয় ময়মনসিংহের স্ত্রীসমাজের মুখ হইতে শুনিয়া এই পালার অনেকটা উদ্ধার করেন। ইহার ভাষা বেশ পরিচ্ছন্ন ও সুললিত, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু ইহার আধুনিক ধরণের ভাষা হইতেই এই পালাগানের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক ভাষার একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

জয় জয় শব্দ হৈল গো মিথিলা ভবন।
নৃত্যগীত করে যত গো সহচরীগণ॥
মন্দ নর বন্দ লাগে গো কেউ বলে কালী।
কেউ বলে মেঘের গায়ে গো শোভিছে বিজলী॥

এ ভাষা সপ্তদশ শতাব্দীর নহে—বিংশ শতাব্দীর পরিপক্ক কবিহস্ত ইহার অন্তরাল হইতে উঁকি মারিতেছে। চন্দ্রকুমার দে পল্লীনারীদের কণ্ঠ হইতে এই পালাগান সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। অথচ ইহাতে প্রায় কোথাও পূর্বাঞ্চলের ভাষা ও বাগ্‌ধারা গৃহীত হয় নাই। বিশুদ্ধ পশ্চিম-বঙ্গীয় সাধুভাষার রীতিতে পয়ার জাতীয় ছন্দে রচিত এই আধুনিক ধরনের বাগ্‌বিন্যাস কিছুতেই পুরাতন রচনার ধ্বংসাবশেষ নহে। স্থানীয় ভাষারীতি ইহাতে অনুসৃত হয় নাই কেন, তাহাও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। সুলেখক চন্দ্রকুমার দে ইহার গ্রাম্য অংশকে ভব্যতাযুক্ত করিতে গিয়া কী পরিমাণে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলেন তাহা বুঝা যাইতেছে না। একথা অবশ্য ঠিক যে, তিনি স্থানীয় স্ত্রীলোকদের ভাষার কিয়দংশ ইহাতে বজায় রাখিয়াছিলেন। কিন্তু লোকগাথাকে প্রায় নাগরিক সাহিত্যের পর্যায়ে তুলিয়া ধরিবার জন্য দে-মহাশয় ইহার গ্রাম্যভাব বিনষ্ট করিয়া বিংশ শতাব্দীর ভাষারীতিতে গল্পটিকে রূপান্তরিত করিতে গিয়া ইহার সাহিত্যিক মূল্য একেবারে মাটি

করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার হস্তক্ষেপের একটা কৌতুকজনক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। রাবণ কর্তৃক হরণের ঘটনা সীতা তাঁহার ননদীকে বলিতেছেন :

আমি কি গো জানি সখী কালসর্পবেশে।
এমনি করিয়া সীতায় গো ছলিবে রাক্ষসে॥
প্রণাম করিনু আমি গো পড়িয়া ভূতলে।
উড়িয়া গরুড় পক্ষী গো সর্প যেমন গেলে॥
রথেতে তুলিল মোরে গো দুষ্ট লঙ্কাপতি।
দেবগণে ডাকি কহি গো দুঃখের ভারতী॥
অঙ্গের আভরণ খুলি গো মারিনু রাক্ষসে।
পর্ব্বতে মারিলে ঢিল গো কিবা যায় আসে॥
কতক্ষণ পরে গো আমি হইলাম অচেতন।
এখনো স্মরিলে কথা গো হারাই চেতন॥

ইহার সঙ্গে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চতুর্থ সর্গের সীতার উক্তি তুলনীয় :

হায় সখি, জানিতাম যদি
ফুলরাশি মাঝে দুষ্ট কালসর্পবেশে,
বিমল সলিলে বিষ, তাহলে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে ?

আরও নানা স্থানে মধুসূদনের ভাবভঙ্গিমার প্রভাব আছে, যাহাকে প্রায় plagiarism বলা যাইতে পারে। এই উৎকট ব্যাপার মীমাংসা করিতে গিয়া 'পূর্ববঙ্গ গীতিকার' সম্পাদক দীনেশচন্দ্র ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন। আধুনিক মধুসূদন ও মধ্যযুগের চন্দ্রাবতীর রচনার মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখিয়া দীনেশচন্দ্র অধিকতর বিস্ময়কর মন্তব্য করিয়াছিলেন, "এই রামায়ণের অনেকাংশের সঙ্গে মেঘনাদবধ কাব্যের আশ্চর্য রকমের ঐক্য দৃষ্ট হয়, আমার ধারণা, মাইকেল নিশ্চয়ই চন্দ্রাবতীর রামায়ণ গান শুনিয়াছিলেন···।"[২২] দীনেশচন্দ্রের এরূপ অদ্ভুত ধারণা কি করিয়া হইল তাহা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অতীত। কলিকাতাবাসী মধুসূদন মন্ত্রবলে ময়মনসিংহে গিয়া স্ত্রী-সমাজের ছড়াগান শুনিয়া তাহা মেঘনাদবধ কাব্যে বেমালুম চালাইয়া দিয়াছিলেন, এরূপ ধারণা যে কতদূর হাস্যকর তাহা বুঝাইতে হইবে না।

---

২২ পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪।২, পৃ. ২৪৬ (পাদটীকা)

দীনেশচন্দ্র পূর্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত গাথাগুলিকে নাগরিক সাহিত্যের উর্ধ্বে স্থান দিতে গিয়াই যুক্তিবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া এরূপ অদ্ভুত কথা বলিয়াছেন। চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত পালাগানগুলিতে এইরূপ আধুনিক হস্তক্ষেপ সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। খুব সম্ভব স্বয়ং দে মহাশয় গ্রাম্যগাথাগুলিকে কলিকাতার সাহিত্যিক সমাজের বৈঠকখানায় পেশ করিবার সময় এগুলির পূর্ববঙ্গীয় ভাষাগত গ্রাম্যতা চাঁচিয়া ছুলিয়া 'ভদ্রস্থ' করিয়া দিয়াছিলেন, কোন কোন স্থলে লেখনী-কণ্ডূয়নবশতঃ বেশ কিছু অংশ 're-write' করিয়াছিলেন, এ সন্দেহও অমূলক নহে। আমাদের দেশে লোকসাহিত্য সংগ্রহে কোন বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসৃত হয় না। ভাড়াকরা লোক দিয়া বা বেতনভুক কর্মচারীকে গ্রামে পাঠাইয়া লোকসাহিত্য সংগ্রহ করা হয়। যিনি সংগ্রহ করেন, তিনি যদি আবার সাহিত্যামোদী হন তাহা হইলে আরও বিপদ। গ্রাম্য স্থূলরুচির গাথাকে মাজিয়া ঘষিয়া আধুনিক করিতে গিয়া অনেক সময় তিনি ইহার প্রাণ নষ্ট করিয়া ফেলেন। চন্দ্রকুমার দে মহাশয় ছড়া সংগ্রহের সময় নিজে কিছু কিছু পংক্তি রচনা করিয়া দেন নাই, বা ভাষাকে মার্জিত করেন নাই, এরূপ কথা হলফ করিয়া বলা যায় না। তাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ময়মনসিংহগীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকার পালাগানগুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে।[২৩] ইহার কতটুকু পল্লীঅঞ্চল হইতে সংগৃহীত, আর কতটুকু শহরে বসিয়া পরিকল্পিত ও পরিমার্জিত তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। যাহা হউক, ময়মনসিংহে প্রচলিত চন্দ্রাবতীর রামায়ণের মুদ্রিত রূপ এবং স্ত্রীসমাজে প্রচলিত কাহিনীতে যে বিশেষ প্রভেদ আছে, তাহা মনে করিবার কারণ আছে। যদি কেহ বৈজ্ঞানিক রীতি ও যান্ত্রিক কৌশলে ঐ অঞ্চলের কাহারও মুখ হইতে পালাগানকে যথাযথ রেকর্ড করিয়া আনিতে পারেন তবেই তাহাকে লোকসাহিত্যের মর্যাদা দেওয়া যাইবে। সপ্তদশ শতাব্দীর চন্দ্রাবতীর মৌখিক রামায়ণ নানা ভাষাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আধুনিক কালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহাতে আবার ছড়া সংগ্রাহকের 'কবিজনোচিত' হস্তাবলেপ—ফলে মুদ্রিত চন্দ্রাবতীর রামায়ণ পালাকে কোন প্রকারেই প্রাচীনত্ব বা লোক-সাহিত্যের গৌরব দেওয়া যায় না। কাব্যটিকে কোন চতুর আধুনিক লেখক স্বচ্ছন্দে পয়ারে সাজাইয়া মাঝে মাঝে একটি 'গো' বসাইয়া দিয়া ইহাকে

২৩ পরে এবিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

লোক-সাহিত্যের মোড়ক দিবার চেষ্টা করিলেও ইহা যে আধুনিককালের শব্দসম্ভারে পরিপূর্ণ, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

২

ম হা ভা র ত ক থা

সপ্তদশ শতাব্দীতে কাশীরাম দাসের ভারত-পাঁচালীর নানা পর্ব বাঙলা-দেশে প্রচুর প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই শতাব্দীতে অনুলিখিত পুঁথির সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই কাশীরামের কাব্যের আকার নানাজনের রচনার সংযোগে বিরাট সংহিতার আকার ধারণ করে এবং বাঙালীর জীবন ও সাধনার সঙ্গে জড়াইয়া গিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঁচালীর মতোই গৌরব ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু ইতিপূর্বে[২৪] আমরা দেখিয়াছি, শ্রীকরনন্দী ও কবীন্দ্রের মহাভারত ষোড়শ শতাব্দীর দিকে পূর্ববঙ্গে বেশ প্রচলিত ছিল। সঞ্জয়ের ভণিতাযুক্ত এবং সন্দেহজনক বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতও[২৫] পূর্ব ও পশ্চিম—উভয় বঙ্গেই প্রচলিত ছিল। শুধু তাই নয়, ষোড়শ শতাব্দীতে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কাশীরামের সমসাময়িক কালে বা কিছু পূর্বে আরও কয়েকজন কবি মহাভারতের দু' একটি পর্বের যে ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন তাহার প্রচারও নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মতো নহে। কেহ কেহ মনে করেন যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে পাণ্ডববিজয় বা ভারত-পাঁচালী "বহু প্রচলিত ও জনসমাদৃত ছিল না।" "আসলে পড়িবার জন্যই বাঙ্গালা মহাভারত যাহা ছাপা হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে কাশীদাসের নামের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া গিয়াছে—তাহার প্রয়োজনীয়তা অষ্টাদশ শতাব্দে ভালো করিয়া এবং উনবিংশ শতাব্দে একান্ত করিয়া অনুভূত হইয়াছিল।"[২৬] উনবিংশ শতাব্দীতে ছাপাখানার কল্যাণে কৃত্তিবাসী রামায়ণ যেমন জনপ্রিয় হইয়াছিল, তেমনি মহাভারতও—বিশেষতঃ কাশীদাসী মহাভারত শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মহলে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল তাহা সত্য বটে। কিন্তু সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে শুধু

২৪-২৫ লেখকের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ) দ্রষ্টব্য।

২৬ ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম—পূর্বার্ধ)

কাশীরাম কেন, অন্যান্য রচনাকারেরাও মহাভারতের দুই চারিটি পর্ব অনুবাদ বা অনুসরণ করিয়া পাঠকসমাজে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং রামায়ণের মতো মহাভারতের ধারাও এইজাতির অন্তঃপ্রকৃতির অন্তরাল দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

কাশীরামের পূর্বে মহাভারত রচনা ॥

কাশীরাম ঠিক কবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা একটু কঠিন। কারণ ষোড়শ ও সপ্তদশ, দুই শতাব্দীতেই তাঁহার আবির্ভাব-কাল ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কাশীরাম ছাড়াও আরও কয়েকজন কবি যে মহাভারতের আংশিক অনুবাদের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ইদানীং-আবিষ্কৃত কিছু কিছু পুঁথি হইতে অনুমিত হইতে পারে। অবশ্য এ সমস্ত রচনাকারের কেহই পুরা মহাভারত রচনার মতো বিপুল পরিশ্রম করিতে পারেন নাই, রচনাতেও বিশেষ কবিকৃতির পরিচয় রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাই পরবর্তী কালে কাশীরামই লোকস্মৃতিতে বাঁচিয়া রহিয়াছেন, আর তাঁহার সমকালীন বা পরবর্তী কবির দল আজ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছেন ; গবেষকের গবেষণাগার ভিন্ন ইঁহাদের আর জীবন্ত কোন অস্তিত্ব নাই। কাশীরাম দাসের মতো পূর্ণতর প্রতিভা ইঁহাদিগকে কখনও নিশ্চিহ্ন করিয়াছে, কখনও-বা কাশীরামের গ্রন্থের মধ্যেই অনেক কবির রচনা মিশিয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও এখনও যে দুই-চারিজন মহাভারতকারের দুই-একটি পর্ব হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা একদা বাঙালী-সমাজে নিতান্ত অপরিচিত ছিলেন না।

কাশীরামের পূর্বে বা সমকালে মহাভারতের অনুবাদক রূপে দৈবকীনন্দন, দ্বিজ অভিরাম, রঘুনাথ, রামচন্দ্র খাঁ, দ্বিজ হরিদাস, ঘনশ্যামদাস ও নিত্যানন্দ ঘোষের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে নিত্যানন্দের মহাভারত সম্বন্ধে পরে বিস্তৃততর আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া এখানে অন্যান্য মহাভারতকার সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলা যাইতেছে।

এই কবিদের প্রায় কেহই পুরা মহাভারত রচনায় সাহসী হন নাই। অষ্টাদশ পর্বে সমাপ্ত এবং লক্ষশ্লোকে গ্রথিত বলিয়া প্রচারিত বৈয়াসকি মহাভারতকে শুধু মহাকাব্য না বলিয়া সংহিতা ও ইতিহাস বলা যাইতে

পারে। সুতরাং এরূপ একখানি বিরাট সাহিত্যকর্মকে সংক্ষেপে অনুবাদ করিতে গেলে বহু সময় ও বিপুল পরিশ্রমের প্রয়োজন—সেরূপ শক্তিসামর্থ্য অনেক কবিরই ছিল না। যাহা হউক দেখা যাইতেছে যে, দৈবকীনন্দনের নামে শুধু কর্ণপর্বের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; দ্বিজ অভিরাম, রামচন্দ্র খাঁ, রঘুনাথ এবং দ্বিজ হরিদাসের প্রত্যেকের শুধু অশ্বমেধ পর্বের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। মনে হয়—ইঁহাদের কেহই দুই একটি পর্বের বেশী অনুবাদে অগ্রসর হন নাই। ঘটনার ঘনঘটা ও উপসংহারের জন্য ইঁহারা অশ্বমেধ পর্বকেই বাছিয়া লইয়াছিলেন। পূর্বতন কবি শ্রীকরনন্দীও [২৭] শুধু অশ্বমেধ পর্বেরই অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। মহাভারতীয় আখ্যানের কৃষ্ণচরিত্রের প্রাধান্যের জন্য বাঙলা দেশে সপ্তদশ শতাব্দীতে মহাভারতের মারফতে বৈষ্ণবমত, বিশেষতঃ কৃষ্ণচরিত্রাদর্শ বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। কর্ণপর্বের অনুবাদক দৈবকীনন্দন বৈষ্ণবপদ-সাহিত্যে নিতান্ত অপরিচিত নহেন। অবশ্য বৈষ্ণবপদকর্তা দৈবকীনন্দন ও মহাভারত-কর্ণপর্বের দৈবকীনন্দন এক ব্যক্তি কিনা বুঝা যাইতেছে না। ব্যাস-ভারত অবলম্বন করিয়া দৈবকীনন্দন এই কর্ণপর্বে কর্ণের মহত্তর চরিত্রের সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। ভাষা সপ্তদশ শতাব্দীর হওয়া অসম্ভব নহে। যথা—

কর্ণ বলে নকুল তুমারে কহি সার।
তোমাকে মারিতে মোর নাক্রিক বিচার॥
মনে মনে চিন্তে কর্ণ পূর্ব বিবরণ।
করিয়াছি কুন্তি মাকে অভয় দান॥
এ সত্য কেমনে আমি করিব লঙ্ঘন।
বিসেসে মাএর বাক্য মহাগুরু জন॥ (কলি. বিশ্ব. পুঁথি)

এতদ্ব্যতীত পূর্বোল্লিখিত সমস্ত কবি অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন। দ্বিজ অভিরাম খুব সম্ভব ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি অশ্বমেধপর্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইঁহার পুঁথিতে চৈতন্যদেব ও রায় রামানন্দের উল্লেখ আছে। চৈতন্যদেব ও রায় রামানন্দের যোগাযোগ ঘটিয়াছিল ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার

২৭ 'লেখকের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'র প্রথম খণ্ডে (২য় সংস্করণ) শ্রীকর নন্দী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

দিকে। সুতরাং মনে হয়, কবি ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই পর্ব অনুবাদ করিয়াছিলেন। কবির ভাষার গাম্ভীর্য ও ঝঙ্কার প্রশংসার যোগ্য :

ইন্দুকুন্দ জিনি বর্ণ পীতপুচ্ছ শ্যামকর্ণ
পবন জিনিঞা মন্দগতি ॥
রাঙা চারি খুর শোভা তাম্র অধর আভা
নীলরুচি নয়ন চঞ্চল।
সুরাসুর বিদ্যাধরে তুরঙ্গ রাখিতে নারে
বেগ বায় কাঁপে ভূমণ্ডল ॥ (কলি. বিশ্ব. পুঁথি—২৩০৪)

অশ্বমেধের অশ্ববর্ণনায় কিঞ্চিৎ লিপিকুশলতা লক্ষ্য করা যাইতেছে।

রঘুনাথের অশ্বমেধপর্ব ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সমাপ্ত হইয়াছিল। কারণ ইঁহার পুঁথিতে দেখা যাইতেছে, কবি উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবের সভায় এই গ্রন্থ পাঠ করিতেন। মুকুন্দদেব ১৫৬৭ খ্রী: অব্দে পাঠানদের হস্তে পরাজিত হইয়া রাজ্য হারাইয়াছিলেন। সুতরাং রঘুনাথের কাব্য ১৫৬৭ খ্রী: অব্দের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, রঘুনাথের রচনার অনেকটা কাশীরাম দাসের কলেবর পূর্ণ করিয়াছে।[২৮] কাশীরামের বিরাট গ্রন্থে অন্য কবির রচনাংশ অল্পবিস্তর স্থান পাইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই কবির রচনা বা তাহার মধ্যে এমন কোন চিত্তাকর্ষী ব্যাপার নাই যাহার জন্য তিনি বিশেষ গৌরব দাবি করিতে পারেন।

কবি রামচন্দ্র খাঁয়ের অশ্বমেধ পর্বের পুঁথিতে কিছু কবিত্ব লক্ষ্য করা যায়। রাঢ়দেশের জঙ্গিপুর শহরে কায়স্থ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। জৈমিনী ভারত অবলম্বনে কবি ষোড়শ শতাব্দীর দিকে এই পর্বটি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন কোন পুঁথিতে কালজ্ঞাপক নির্দেশ আছে ; তাহা হইতে ১৫৫২ বা ১৫৭২ খ্রী: অব্দ পাওয়া যায়।[২৯] কবির পরিচ্ছন্ন রচনার ক্ষমতা প্রশংসনীয়। একটু দৃষ্টান্ত :

উদ্দালক কহেন চণ্ডীর বরাবর।
আসিব শাণ্ডিল্যমুনি কালি মোর ঘর ॥
আসন ভক্ষণ তাক কিছুত না দিহ।
আদর গৌরব তাক কিছু না করিহ ॥

---

২৮ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ১৩০৭

২৯ রবীন্দ্রমোহন বসু—বাঙ্গালা সাহিত্য (২য়), পৃ. ৫৯

দ্বিজ হরিদাসের অশ্বমেধ পর্বও কৃষ্ণগুণগানের জন্যই রচিত হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যে একাধিক পদকর্তা হরিদাস নামে পরিচিত ছিলেন। মহাভারতের এই অংশ কোন্ হরিদাসের রচনা তাহাতে সংশয় আছে। 'নরোত্তম বিলাস' ও 'ভক্তিরত্নাকরে' যে দ্বিজ হরিদাসের উল্লেখ আছে ইনিই বোধহয় এই অশ্বমেধ পর্বের রচয়িতা। তাঁহার নামে আরও অনেকগুলি পুঁথি (মুকুন্দমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম) মিলিতেছে। চৈতন্যভক্ত দ্বিজ হরিদাস ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি বর্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কবি কেন সংস্কৃত ছাড়িয়া বাংলা ভাষায় অশ্বমেধ পর্ব রচনা করিতেছেন, সে সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

সংস্কৃত নাহি বুঝে সাধারণ জনে।
ভাষাকথা কহি আমি তথির কারণে॥
ভাষাকথা কহি বীর না করিহ হেলা।
হাথ দিলে আগুনে না পোড়ে কোন্ বেলা॥

জৈমিনী ভারত অবলম্বনে রচিত এই পুস্তিকায় কৃষ্ণভক্তিই অধিক পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছে। ভাষা কিন্তু অত্যন্ত আধুনিক, সেইজন্য ইহার প্রামাণিকতায় বিশেষ সংশয় জাগে।

ঘনশ্যামও সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জৈমিনী ভারত অবলম্বনে সংক্ষিপ্ত কাহিনী লিখিয়াছিলেন। জৈমিনী ভারতে অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে আবার রামায়ণ কাহিনীরও কিছু বর্ণনা আছে। কবি ঘনশ্যামও বোধহয় এই অংশ অবলম্বনে রামায়ণ কাহিনী-সংক্রান্ত ক্ষুদ্রাকারের কোন পৃথক কাব্য লিখিয়াছিলেন, কারণ স্বতন্ত্রভাবে রচিত রামায়ণ কাহিনী তাঁহার ভণিতায় মিলিতেছে। কেহ কেহ মনে করেন, এই ঘনশ্যাম কবি গোবিন্দদাসের পৌত্র বিখ্যাত পদকর্তা ঘনশ্যামদাস। এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কারণ গোবিন্দদাস ছিলেন সেন উপাধিক বৈদ্য, ঘনশ্যামও তাই; উপরন্তু ঘনশ্যাম অশ্বমেধ পর্বে তাঁহাদের গুরু শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাকে পদকর্তা ঘনশ্যামদাস রূপেও গ্রহণ করা যায়। তাঁহার ভাষার সংযম ও অলঙ্করণ সেই অনুমানই সুদৃঢ় করে। যথা:

বিম্বফল জিনি তোমার অধর সুরঙ্গ।
দেখিয়া বদনশশী লাজে দিল ভঙ্গ॥

মৃণাল বিহিত বাহু ভুরু রামধনু।
পদকর সরসিজ হরিমধ্য জনু॥

উপরে যাঁহাদের মহাভারতের পুঁথি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল,[৩০] সমগ্র জাতি ও সমাজে ইঁহাদের প্রভাব যে খুব বেশী বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ইঁহারা মহাভারতের দুই এক পর্বের ভাবার্থ পয়ার-ত্রিপদীতে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া স্থানীয় পাঠক-শ্রোতার সঙ্গে মহাভারতের কোন চিত্তাকর্ষী ব্যাপারের যোগাযোগ ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন, এইটুকুই ইঁহাদের কৃতিত্ব। কিন্তু কাশীরাম দাসের বিরাট মহাকাব্যে ইঁহাদের অনেকেরই রচনা মিশিয়া গিয়াছে। ফলে কাশীরামের মহাভারত বিশাল মহাকাব্যে পরিণত হইয়াছে। যেমন আর্ষ মহাভারত অনেক অজ্ঞাতনামা কবি কর্তৃক বর্ধিত ও লালিত হইয়াছে, সেইরূপ এই সমস্ত পরিমিত প্রতিভার কবিদের যৎসামান্য রচনার পৃথক গৌরব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কাশীরামের মহাভারত-সাগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিৎধারা মিলিত হইয়া আপন আপন স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। যাহা হউক এই পর্যায়ে আর একজন কবির একটু স্বতন্ত্র উল্লেখ করা প্রয়োজন—ইনি কবি নিত্যানন্দ ঘোষ।

নিত্যানন্দ ঘোষ॥

কাশীরামের মতো এতটা জনপ্রিয়তা লাভ করিতে না পারিলেও নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব যে একদা বেশ প্রচার লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ দুর্লভ নহে। কারণ তাঁহার ভণিতাযুক্ত অনেকগুলি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে এবং তাঁহার রচনাশক্তি ও কাব্যগুণ কাশীরাম অপেক্ষা খুব যে একটা ন্যূন ছিল তাহা মনে হয় না।

পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যে নিত্যানন্দকে কাশীরামের পূর্ববর্তী বলিয়াছেন:

অষ্টাদশ পর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ॥

ইহাতে মনে হয়, নিত্যানন্দ ঘোষ কাশীরামের কিছু পূর্বে সমগ্র মহাভারত অথবা মহাভারতের কয়েকটি বিশেষ পর্ব পয়ারে বাঁধিয়াছিলেন।

৩০ বিস্তারিত আলোচনার জন্য মণীন্দ্রমোহন বসুর 'বাঙ্গালা সাহিত্য' (২য়) দ্রষ্টব্য।

ডঃ সুকুমার সেন নিত্যানন্দের পুঁথি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "পুথিগুলির কোনটাই অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেকার নয়।"[৩১] কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় নিত্যানন্দের মহাভারতের (স্ত্রী পর্ব) যে পুঁথিটি আছে, তাহা ১০৮৩ বঙ্গাব্দে (১৬৭৬ খ্রীঃ অঃ) অনুলিখিত হইয়াছিল।[৩২] যাহা হউক নিত্যানন্দের সভা, ভীষ্ম, শল্য, স্ত্রী, শান্তি প্রভৃতি বিভিন্ন পর্বের পুঁথি পাওয়া গেলেও মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পুঁথিতে কবির কোন ব্যক্তিগত পরিচয় বা কাব্যরচনার সন-তারিখের কোন উল্লেখ নাই। তবে ১৬৭৬ খ্রীঃ অব্দের পুঁথি দৃষ্টে মনে হইতেছে, তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বর্তমান ছিলেন।

নিত্যানন্দ প্রসঙ্গে যে জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে, আপাততঃ তাহার জড় মিটাইবার উপায় পাই। কাশীরামের অনেক পুঁথিতে নিত্যানন্দের রচনা বেমালুম চলিয়া গিয়াছে, কোথাও কোথাও কাশীরামের পুঁথির অংশ-বিশেষের সঙ্গে নিত্যানন্দের পুঁথির বেশ সাদৃশ্য আছে। যেমন,

কাশীরাম :

কৃষ্ণের প্রবোধ বাক্য মনেতে বুঝিয়া।
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া॥
কহে কিছু কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা।
বিচিত্র বীর্যের বধূ রাজার বণিতা॥ (মুদ্রিত সংস্করণ)

নিত্যানন্দ ঘোষ :

কৃষ্ণের প্রবোধবাক্য মনেতে বুঝিয়া।
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া॥
পুনঃ বলে কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা।
বিচিত্র বীর্য্যের বধূ রাজার বনিতা॥

এ সাদৃশ্য কিছু গাঢ়তর। সন্ধান করিলে এরূপ সাদৃশ্য আরও বহু স্থলে দেখা যাইবে। এমন কি, একই পুঁথিতে কাশীরাম ও নিত্যানন্দ উভয়ের ভণিতা পাওয়া যায়।[৩৩] সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর

---

৩১ ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ইতি. (১ম) অপরার্ধ, পৃ. ১১৫

৩২ কলি. বিশ্ব. পুঁথি—২৭১৩

৩৩ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত *Descriptive Catalogue* (vol. III)-এর ৭৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গোড়ার দিকে কাশীরামের অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্য এইরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়াছিল। মহাভারতের গায়ক, পাঠক, লিপিকার (এবং কাশীরামের নিকট-আত্মীয়েরাও) সকলে মিলিয়া কাশীরামের কাব্যকে স্ফীতকায় করিবার জন্য এইরূপ অনেক কবির রচনাংশ কাশীরামের পুঁথিতে প্রবেশ করাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিত্যানন্দের রচনা উৎকৃষ্টতর বলিয়া লিপিকারগণ তাঁহার রচনার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাই উল্লেখযোগ্য প্রতিভার অধিকারী হইয়াও নিত্যানন্দ ঘোষ মুদ্রাঙ্কিত হইবার গৌরব লাভ করিতে পারেন নাই। করুণরস বর্ণনায় নিত্যানন্দ কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাহা নিম্নে-বর্ণিত স্ত্রীপর্বে বিধবা কুরু-স্ত্রীগণের বিলাপেই বুঝা যাইবে :

যুবতী ধাইয়া বুলে লাজ নাহি বাসে।
ভয়হীন হৈল পতি-দরশন-আশে॥
কার কার পতির না হইল্য দরশন।
মুক্তকেশে রণভূমে করএ ভ্রমণ॥
হস্তপদহীন কেহ আছয়ে পড়িয়া।
কেহো পতি বিনে বুলে উদ্দেশ করিয়া॥
মাংস খায় কাক চিল গৃধিনী কুকুর।
মহা কোলাহল করে শব্দ যায় দূর॥
ভয় তেজি কুরুবধূ যত নারীগণ।
মৃতপতি কোলে করি করয়ে রোদন॥
... ...
এই মত নারীগণ করিয়া রোদন।
বদনে বদন দিয়া করয়ে চুম্বন॥

বাহুল্যবর্জিত এই বর্ণনায় যুদ্ধের বীভৎসতা ও করুণ বেদনা এমন চমৎকার-ভাবে মিশ্রিত হইয়াছে যে, কবি এখানে কাশীরাম দাসের মতোই শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, এবং এইজন্য তাঁহার রচনার বহু অংশ কাশীরামের কাব্যে মিশিয়া গিয়াছে। সহজ সংযত পরিচ্ছন্ন রচনায় তাঁহার কবিত্বশক্তি অধিকতর স্ফূর্তি পাইয়াছে। কাশীরামের মতো তৎসম শব্দের ঘনঘটা তাঁহার মধ্যে বিশেষ নাই, আবেগ-উচ্ছ্বাসও অতিশয় সংযত। পরিমিত রচনায় যে তিনি বিশেষ প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কাশীরামের যশে তাঁহার গৌরব নিষ্প্রভ

হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা মহাভারতের একজন শক্তিশালী কবির রচনা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

১.৩

কাশীরাম দাস (দেব) ॥

(কৃত্তিবাসের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত হইয়া এই কায়স্থ-কবি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়েরও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। মধ্যযুগে বৈষ্ণব সাহিত্য ছাড়িয়া দিলে, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের মতো অখণ্ড ও অক্ষুণ্ণ গৌরব এবং জনপ্রিয়তা লাভ আর কোন্ কবির ভাগ্যে সম্ভব হইয়াছে? বস্তুতঃ বাঙালীর সমস্ত জাতি-মানস, ব্যক্তি-জীবন, সামাজিক আদর্শ ও নীতি-কর্তব্যকে এই দুইজন কবি যে-ভাবে প্রভাবিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে ব্যাস-বাল্মীকির মতো আর্ষ কবি বলিতে ইচ্ছা করে।)

অবশ্য কাশীরামের নামে প্রচলিত অষ্টাদশ পর্বে সুগ্রথিত বৃহৎ মহাভারতের কতটুকু তাঁহার নিজের রচনা, কতটুকু তাঁহার পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্র-জামাতার সংযোজনা, কতটুকুই-বা অন্যকবির লেখনীর ফসল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কাশীরাম অনেকের গৌরব নিজে আত্মসাৎ করিয়া কবিখ্যাতির স্তূপীকৃত ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছেন—এমন কথাও কেহ কেহ বলিতেছেন। সে যাহা হউক, কাশীরাম দাসের নামের এমন মহিমা যে, অনেক ছোট-বড় কবির রচনা তাঁহার কাব্যে আত্মদান করিয়া ধন্য হইয়াছে। মধুসূদন বলিয়াছিলেন—

> মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
> হে কাশী, কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান॥

সেই কাশীরাম এই অপার্থিব পুণ্যফল সমগ্র বাঙালী জাতিকে ন্যাস স্বরূপ অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভারত-পাঁচালীতে যতই ভেজাল চলিয়া যাক না কেন, তবু তাহার গৌরব ও মহিমার খর্বতা ঘটে নাই।

একদা কাশীরামের জন্মস্থান, সন-তারিখ, কাব্যে প্রক্ষেপ ইত্যাদি লইয়া বেশ প্রখর আলাপ-আলোচনা চলিয়াছিল। এখনও যে সে বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। প্রথমে কাশীরামের পরিচয় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

কাশীরাম তাঁহার মহাভারতের দুই-চারি স্থলে নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বংশ-পরিচয় অন্য উৎস হইতেও সংগ্রহ করা যায়।

তাঁহারা তিন ভাই—কৃষ্ণদাস, কাশীরাম ও গদাধর দাস—কাশীরামের অগ্রজ ও কনিষ্ঠের কাব্যও পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে তাঁহাদের কিছু কিছু কৌলিক পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সমস্ত মিলাইয়া তাঁহার পরিচয় ও সন-তারিখ সম্বন্ধে একপ্রকার মোটামুটি সিদ্ধান্ত করা যায়। কোন কোন পুঁথিতে তিনি এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন :

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গি গ্রাম।
প্রিয়ঙ্করদাস পুত্র সুধাকর নাম॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
পাঁচালি প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ॥

ইন্দ্রানীর অন্তর্গত সিঙ্গিগ্রামে তাঁহাদের বাস, কবির জন্ম হইয়াছিল কায়স্থ বংশে। প্রিয়ঙ্কর দাসের পুত্র সুধাকর, তাঁহার পুত্র কমলাকান্ত। কমলাকান্তের তিন সন্তান—কৃষ্ণদাস, কাশীরাম ও গদাধর। কৃষ্ণপাদপদ্মে মধুকর হইবার জন্য মধ্যম পুত্র কাশীরাম ভারত-পাঁচালী রচনা করেন—ইহাই তাঁহার সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়।

আর একস্থলে তিনি নিজ গুরু বা শিক্ষকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন :

হরিহরপুর গ্রাম সর্ব্বগুণধাম।
পুরুষোত্তম নন্দন মুখুটি অভিরাম॥
কাশীদাস বিরচিল তাঁর আশীর্ব্বাদে।
সদা চিত্ত রহে যেন দ্বিজপাদপদ্মে॥

মুখুটি বংশোদ্ভব অভিরামের আশীর্বাদে কবি কাব্যরচনায় ব্রতী হন। আর একস্থলে তাঁহার উপাধি যে 'দেব' তাহাও বলিয়াছেন :

মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে॥

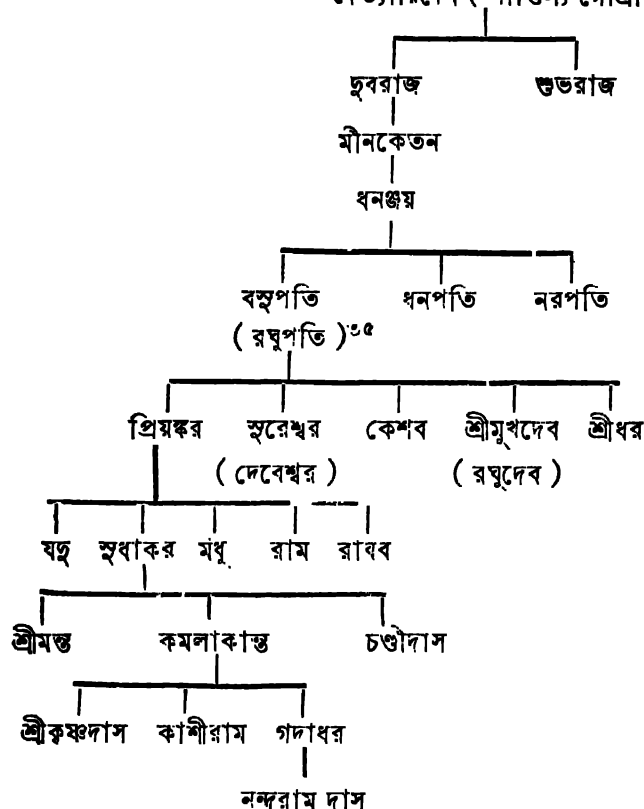
কিন্তু তাঁহারা তিনভাই-ই পুঁথিতে প্রায় সর্বত্র 'দেব' স্থলে 'দাস' ব্যবহার করিয়াছেন—বোধহয় বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনুসরণে। কারণ ধর্মবিশ্বাসের দিক হইতে তাঁহারা পুরামাত্রায় বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন।

কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস তাঁহার 'জগৎ মঙ্গলে' বিস্তারিত আকারে নিজের বংশধারার পরিচয় দিয়াছেন :

ভাগীরথী তটে বাটী ইন্দ্রাইনি নাম।
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি শিঙ্গি গ্রাম॥
অগ্রদ্বীপ গোপীনাথ রায় পদতলে।
নিবাস আমার সেই চরণকমলে॥
তাহাতে শাণ্ডিল্যগোত্র দেব দৈত্যারি।
দামোদর পুত্র তার সদা সেবে হরি॥
ভুবরাজ শুভরাজ তাহার নন্দন।
ভুব রাজ পুত্র হৈল মানকেতন॥
তাহার নন্দন হৈল নাম ধনঞ্জয়।
তাহা হইতে হৈল এই তিনটি তনয়॥
বসুপতি ধনপতি দেব নরপতি।
বসুপতি পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠিত-মতি॥
প্রিয়ঙ্কর সুরেশ্বর কেশব সুন্দর।
চতুর্থে শ্রীমুখদেব পঞ্চমে শ্রীধর॥
প্রিয়ঙ্কর হৈতে হল্যো এ পঞ্চ উদ্ভব।
যদু সুধাকর মধু শ্রীরাম রাঘব॥
সুধাকর নন্দন এ তিন পরকাশ।
শ্রীমন্ত কমলাকান্ত দেব চণ্ডীদাস॥
দেব শ্রীকমলাকান্ত তেজিয়া নিবাস।
জগন্নাথ দেখিয়া সে ওড্রে কৈল বাস॥
কমলাকান্তের হল্যো এ তিন কোঙর।
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর॥
দ্বিতীয়ে শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবান।
রচিল পাঁচালি ছন্দে ভারত পুরাণ॥
তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস।
জগৎমঙ্গল কথা করিল প্রকাশ॥[৩৪]

৩৪ বঙ্গবাসী প্রকাশিত গদাধর দাসের 'জগৎ মঙ্গল', পৃ. ৫

'জগৎমঙ্গল' অনুসারে কাশীরামের বংশলতিকা প্রদত্ত হইতেছে।



কাশীরামের পুঁথিতে প্রাপ্ত তালিকা এবং তাঁহার কনিষ্ঠের পুঁথিতে প্রাপ্ত তালিকার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। কাশীরাম সিঙ্গি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা যেমন নানা পুঁথিতে পাওয়া যাইতেছে, তেমনি লোকস্মৃতিতেও এই গ্রামের নাম আজও জীবিত আছে। কোন কোন পুঁথিতে সিঙ্গির স্থলে 'সিদ্ধি' নামও পাওয়া যায়। তবে প্রাচীন বাংলা পুঁথিতে 'ঙ্গ' ও 'দ্ধ'-এর মধ্যে অনেক সময় পার্থক্য থাকিত না বলিয়া সিঙ্গি-কে কেহ কেহ সিদ্ধি-ও বলিয়া থাকেন। পুঁথিতে যেমন সিঙ্গি ও সিদ্ধি পাওয়া যায়[৩৬],

৩৫ কোন কোন পুঁথিতে 'রঘুপণ্ডিত' পাওয়া যায়।

৩৬. ডঃ সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ) দ্রষ্টব্য।

তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর ছাপা মহাভারতেও এই দুই নাম পাওয়া যাইতেছে। বিপদ হইয়াছে, এই দুই নামেই দুইটি গ্রামের অস্তিত্ব আছে। তন্মধ্যে সিদ্ধি গ্রাম অগ্রদ্বীপের নিকট ছিল, এখন তাহা গঙ্গাগর্ভে অদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু সিঙ্গি গ্রাম এখনও আছে—বর্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমায় অবস্থিত। এখানে প্রতিবৎসর কাশীরামের স্মরণোৎসব হইয়া থাকে, স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। এই দুইটি গ্রামের মধ্যে কোন্‌টি কাশীরামের প্রকৃত জন্মস্থান তাহা লইয়া কিছু কিছু বাদানুবাদ সৃষ্টি হইয়াছে।

জনপ্রবাদ ও বহুল প্রচারকে প্রমাণ হিসাবে ধরিলে কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রামকেই সেই গৌরব দিতে হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৮৮০-৮১ খ্রীঃ অব্দে এই গ্রাম পরিদর্শন করেন। এই গ্রামের পুরাতন বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া তিনি এক প্রকার নিশ্চিন্ত হন যে, সিঙ্গি গ্রামই কাশীরামের জন্মভূমি। এখনও সে গ্রামে 'কেশের' দীঘি'[৩৭], কাশীরামের পাঠশালা, কাশীরামের ভিটা আছে। প্রাচীন গ্রামবাসীরা শাস্ত্রী মহাশয়কে সেগুলি যত্ন করিয়া দেখাইয়াছিলেন। কাশীরামের ভিটায় তখনও একখানি চালাঘর ছিল। কাশীরামের প্রপৌত্র নাকি সেই ভিটা ও ঘরবাড়ী এক গন্ধবণিককে বিক্রয় করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন। যখন হরপ্রসাদ এই গ্রামে গিয়াছিলেন, তখন ঐ ভিটার মালিক গন্ধবণিকের প্রপৌত্র জীবিত ছিলেন। সেখানে শাস্ত্রী মহাশয় লোকমুখে শুনিলেন, কাশীরামের প্রপৌত্র ঐ বাড়ী বিক্রয় করিয়া মেদিনীপুরে বসবাস করিয়াছিলেন। জগদ্দল মিউনিসিপ্যালিটির এক কমিশনারের সঙ্গে আলাপ করিয়া হরপ্রসাদ জানিতে পারিলেন যে, তখনও কাশীরামের উত্তরপুরুষ জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ সুন্দরবনের আবাদে কাজকর্ম করিতেন। তাঁহারা যে মেদিনীপুরেই বাস করিতেন, সে সংবাদও উক্ত

---

৩৭ ডঃ সেনের মতে—"কাশীরাম দেশে ফিরিয়া আসিয়া নিজের ডাক-নামে পুকুর কাটাইয়াছিলেন কিনা, তাহা উপন্যাস লেখকেরাই নির্ধারণ করিতে পারেন। তবে অনেক গ্রামেই "কেশে পুকুর" আছে। মজা দীঘিতে প্রচুর কাশ জন্মাইলে "কেশে পুকুর" নাম পায়।" (বা. সা. ইতি.--১ম, পরার্ধ, পৃ. ১০৮) কিন্তু সিঙ্গি গ্রামে শুধু 'কেশে পুকুর'ই নাই, কাশীরামের ভিটাও আছে। তাহাকে এত সহজে উপন্যাস বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

কমিশনারের নিকট শাস্ত্রী মহাশয় সংগ্রহ করিলেন।[৩৮] ইহার কিছু পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কাটোয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারকচন্দ্র রায়ের উৎসাহে সিঙ্গিগ্রামে কাশীরামের স্মৃতিরক্ষার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। শুনা যায়, কাশীরামের দীঘি ও পাঠশালার জমির মালিকেরা ঐ অংশ স্মৃতিরক্ষার জন্য সাহিত্য পরিষদকে দান করিতেও চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তখন এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। এই দীঘির অদূরে ওকড়সা হাইস্কুল অবস্থিত, উক্ত দীঘির পাড়ে স্কুলের ছেলেরা খেলাধূলা করিয়া থাকে।

কিন্তু সিদ্ধি গ্রামকেও একেবারে ফেলিয়া দেওয়া যায় না। কারণ পুঁথিতে ও কাশীরামের ছাপা গ্রন্থে সিদ্ধি গ্রামের উল্লেখও আছে। কাশীরামের কনিষ্ঠ গদাধর দাস ইন্দ্রাইনি পরগণা, অগ্রদ্বীপ ও সিদ্ধিগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন।[৩৯] এই প্রমাণ হইতে ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন, "গদাধরের উক্তি অনুসারে মনে হয় সিদ্ধি (অথবা সিঙ্গি গ্রাম) অগ্রদ্বীপের নিকটবর্তী ছিল।"[৪০] গদাধর লিখিয়াছেন:

ভাগীরথী তটে বাটী ইন্দ্রাইনি নাম।
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গি গ্রাম॥
অগ্রদ্বীপ গোপীনাথ রায় পদতলে।
নিবাস আমার সেই চরণ কমলে॥

এখানে ইন্দ্রাইনি পরগণার অন্তর্গত সিঙ্গির সঙ্গে অগ্রদ্বীপের সংযোগ প্রমাণ করা যাইতেছে না। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ রায়ের (কবির গুরু বা পৃষ্ঠপোষক?) নিকট কবি গদাধর বাস করিতেন। কিন্তু রূপকার্থে তাঁহার চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন, এরূপ অর্থই যুক্তিসঙ্গত। উপরন্তু সিদ্ধি গ্রাম এখন গঙ্গাগর্ভে লুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং সে বিষয়ে গবেষণা চালানোও নিষ্ফল। কাটোয়ার সিঙ্গিগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া যেরূপ জনশ্রুতি সৃষ্টি হইয়াছে, তথাকথিত সিদ্ধিগ্রাম বা ঐ অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া সেরূপ কোন জনপ্রবাদ গড়িয়া ওঠে নাই। সুতরাং কাটোয়ার অন্তর্গত বর্তমান সিঙ্গি গ্রামকেই কাশীরাম দাসের গ্রাম বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

৩৮ কাশীরামের মহাভারত (আদি পর্ব)—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত ও সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত।

৩৯ গদাধরের জগন্নাথ মঙ্গল (বঙ্গবাসী সংস্করণ), পৃ. ৫

৪০ ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ইতি—১ম (অপরার্ধ), পৃ. ১০৮

কাশীরামের পিতা কমলাকান্ত জগন্নাথ দর্শনে গিয়া পুরীধামেই বাস করিয়াছিলেন।[৪১] মনে হয় কাশীরাম সিঙ্গি গ্রামে বাস করিতেন। কারণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শুনিয়াছিলেন যে, কাশীরামের প্রপৌত্র এক গন্ধ-বণিকের নিকট বাস্তুবাড়ী বিক্রয় করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন, কাশীরামের মহাভারত সিঙ্গি গ্রামে বসিয়া রচিত হয় নাই। তিনি নাকি আত্রাসগড়ের রাজার বাড়ীতে শিক্ষকতা করিতেন।[৪২] এ সমস্ত নিতান্তই অনুমান মাত্র।

হরিহরপুরের অভিরাম মুখুটীর আশীর্বাদ ও নির্দেশে কাশীরাম ভারত-পাঁচালী রচনা আরম্ভ করেন।[৪৩] কাশীরামের ভণিতায় সমগ্র মহাভারত পাঁচালী পাওয়া গেলেও ইহার কতটুকু তাঁহার নিজস্ব রচনা, কতটুকুই-বা অপরের সংযোজনা তাহাতে সন্দেহ আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ-পাঁচালীতেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। কিন্তু কাশীরামের ভারত-পাঁচালীতে যেরূপ প্রত্যক্ষভাবে অপরের হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে, কৃত্তিবাসে ঠিক সেই পরিমাণে অপরের রচনাকে (অঙ্গদের রায়বার বাদ দিলে) হাতে-নাতে ধরা যায় না। কাশী-

---

৪১ তিনি মেদিনীপুরে বাস করিয়াছিলেন, কেহ কেহ এরূপ সিদ্ধান্তও করিয়া থাকেন (দ্রষ্টব্য—ডঃ সুকুমার সেন, ঐ গ্রন্থ, পৃ. ১১৮) কিন্তু গদাধরের উক্তি হইতে মনে হয়, কমলাকান্ত জগন্নাথ দর্শনের পর ওড্রে বাস করিয়াছিলেন। যদিও তখন মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল, তবু এই স্পষ্ট 'ওড্র'-কে মেদিনীপুর বলা যায় না। বরং গদাধরের 'জগৎমঙ্গল' হইতে মনে হইতেছে, কমলাকান্তের কনিষ্ঠ পুত্র উড়িষ্যার কটকের অন্তর্গত মাখনপুরে অবস্থান করিয়া 'জগৎ মঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। কারণ তিনি এই গ্রন্থ শেষে লিখিয়াছিলেন :

উৎকলে উত্তম গণি কটক নগর।
মাখনপুরেতে গ্রাম তাহার ভিতর॥

এখানে ব্রাহ্মণের নিকট পুরাণ শুনিয়া গদাধর জগৎমঙ্গল রচনা করেন। যদি তাঁহারা মেদিনীপুরে বাস করিতেন, তাহা হইলে 'জগৎমঙ্গলে' স্পষ্টতঃ মেদিনীপুরের উল্লেখ থাকিত। মেদিনীপুরে তাঁহাদের পরবর্তী বংশধরগণ বাস করিয়াছিলেন, জনশ্রুতি হইতে তাহাই মনে হয়।

৪২ বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক, পৃ. ৮৪

৪৩ হরিহরপুর গ্রাম সর্ব্বগুণধাম।
পুরুষোত্তম-নন্দন মুখটি অভিরাম॥
কাশীরাম বিরচিল তাঁর আশীর্ব্বাদে।
সদা চিত্ত রহে যেন দ্বিজ পাদপদ্মে॥

রাম যে গোটা মহাভারত অনুবাদ করেন নাই, এরূপ বহু প্রমাণ পুঁথির মধ্যেই আছে। এই পুঁথির উল্লেখ হইতে মনে হয়, তিনি বোধহয় তিন বা চার পর্ব রচনার পর লোকান্তরিত হন, এবং বাকি অংশ তাঁহার জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র মিলিয়া সম্পূর্ণ করেন। নানা পুঁথিতে এইরূপ প্রসঙ্গ রহিয়াছে :

(ক) ধন্য ছিল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।
তিনপর্ব্ব ভারতের করিল প্রকাশ॥
আদি সভা (বনের) যে রচিল পাঁচালী।
যাহা শুনি সর্ব্বলোক ধন্য ধন্য বলি॥
পূর্ব্বে তিঁহ আরম্ভিয়া ছিল এই পুঁথি।
পরম বৈষ্ণব তেঁহো হইল সর্ব্বগতি॥[৪৪]

(খ) ধন্য ধন্য কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।
চারিপর্ব্ব ভারতের করিল প্রকাশ॥
আদিসভা বন বিরাট রচিয়া পাঁচালী।
যাহা শুনি সর্ব্বলোক ধন্য ধন্য বলি॥[৪৫]

দ্রোণপর্বের এক পুঁথিতে আছে :

কাশীরাম দাসর তিঁহ জ্যেষ্ঠতাত।
মৃত্যুকালে আজ্ঞা কৈল শিরে দিয়া হাত॥
আয়ু অবশেষ বাপু যাই পরলোকে।
রচিতে না পারিলাম পুঁথি পাই বড় শোকে॥
আশীর্ব্বাদ করি আমি বলিহে তোমারে।
পাণ্ডব চরিত বাপু রচিবে আদরে॥
তাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি ভাবি রাধাশ্যাম।
দ্রোণ পর্ব ভারত রচিল নন্দরাম॥[৪৬]

নন্দরাম কাশীরামের ভ্রাতুষ্পুত্র, কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের পুত্র। কবি মৃত্যুকালে কাব্য অসমাপ্ত রাখিয়া যাইবার সময় ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামকে বাকি অংশ পূর্ণ করিতে বলিয়া যান—এবং নন্দরামও মধ্যম তাতের আজ্ঞানুযায়ী এই কাব্য সমাপ্ত করেন। ১২৮২ সনের একখানি পুঁথিতে আছে যে, পিতার আজ্ঞা-

৪৪ *Descriptive Catalogue* (vol III), p. 710 (C. U. Publication)

৪৫ পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর সম্পাদিত কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতে উদ্ধৃত।

৪৬ এই উদ্ধৃতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত একখানি মুদ্রিত মহাভারতের ভূমিকা হইতে গৃহীত হইয়াছে। মহাভারতটির আখ্যাপত্র বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া ইহা কে সম্পাদন করেন বুঝা যাইতেছে না।

ক্রমে কাশীরাম-নন্দন মহাভারতের কিয়দংশ রচনা করেন।[8৭] ১৮৬৬ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রকাশিত মূল মহাভারতের বঙ্গানুবাদের উপসংহারে এই চারি ছত্র মুদ্রিত হইয়াছিল :

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর॥

আর একটি ঈষৎ আধুনিক কালের পুঁথিতে আছে :

ধন্য ছিল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।
চারি পর্ব মহাভারত করিল প্রকাশ॥
আদ্য সভা বিরাটের রচিল পাঁচালি।
তাহা শুনি সর্ব্বলোক ধন্য ধন্য বলি॥[8৮]

এই সমস্ত উল্লেখ হইতে অনুমিত হয় যে, কাশীরাম আদি, সভা ও বনপর্ব পুরা এবং বিরাট পর্বের কিয়দংশ রচনা করিয়া পরলোকগত হন। কিন্তু কেহ কেহ আবার মনে করেন যে, কাশীরাম সমগ্র মহাভারত রচনা করেন নাই এরূপ কোন প্রমাণ নাই, বরং বিপরীত প্রমাণই আছে। পূর্বে উল্লিখিত 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যে আছে :

অষ্টাদশ পর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ॥

কাশীরামের কনিষ্ঠ গদাধর দাসও 'জগৎ মঙ্গলে' বলিয়াছেন :

দ্বিতীয়ে শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবান।
রচিল পাঁচালি ছন্দে ভারত পুরাণ॥

এখানে তো মনে হইতেছে কাশীরাম প্রায় সমগ্র মহাভারতই অনুবাদ করিয়াছিলেন।[8৯] কিন্তু কাশীদাসের ভণিতায় যাহা রচিত হইয়াছে তাহার সবটা তাঁহার রচিত নহে, তাহার নানা প্রমাণ আছে। এ পর্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মহাভারতের আদি-সভা-বন-বিরাট পর্বগুলি কাশীরামের নিজস্ব রচনা হইতে পারে ; কিন্তু তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও অপর কবিরা অন্য পর্বগুলির সম্পূর্ণতা সাধন করেন। দ্রোণপর্ব তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র

8৭ দ্বিজপদরজ লয়্যা কাশীর নন্দন।
জনকের আজ্ঞামত করিল রচন॥ (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত কাশীরাম দাসের মহাভারত, ভূমিকা, পৃ. ।/০)

8৮ ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ইতি ১ম (অপরার্ধ), পৃ. ১১০

8৯ মণীন্দ্রমোহন বসু—বাঙ্গলা সাহিত্য (২য়), পৃ. ৭৯

নন্দরামের রচনা, শল্য ও নারী পর্ব ভৃগুরামদাসের রচনা, অশ্বমেধ পর্ব দ্বিজ রঘুনাথের রচনা। অন্যান্য পর্বে নিত্যানন্দ ঘোষ, গদাধর দাস, গঙ্গাদাস সেন, রাজেন্দ্র দাস, গোপীনাথ দত্ত প্রভৃতি কবিদের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেক কবির রচনা যে তাঁহার নামে গ্রথিত হইয়া বিরাট মহাভারত-সংহিতার কলেবর ধারণ করিয়াছে, তাহা ইঁহাদের নামে প্রচারিত বিভিন্ন পর্বের সঙ্গে কাশীদাসের মহাভারতের উক্ত পর্বের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। প্রথম চারিটি পর্বের ভাষা পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত, অলঙ্কার-সন্নিবেশ সংস্কৃতানুসারী; মোটামুটি আদি-সভা-বন-বিরাটের রচনা যে এক হাতের সৃষ্টি তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কিন্তু যুদ্ধপর্ব হইতেই বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, শান্তিপর্বের রচনাই নিকৃষ্টতম। মনে হয়, কাশীরামের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামই মধ্যম তাতের অসম্পূর্ণ রচনার অনেকটা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। কিছু তিনি নিজে রচনা করিয়াছিলেন, কিছু-বা অন্যান্য কবিদের রচনা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই উক্ত চারি পর্ব ছাড়িয়া দিলে অন্যান্য পর্বের নিকৃষ্ট কবিত্ব সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে। সাক্ষ্য প্রমাণাদি দৃষ্টে মনে হইতেছে, উক্ত চারি পর্ব ব্যতীত কাশীরাম অন্য কোন পর্ব রচনা করেন নাই। তাঁহার আত্মীয়স্বজনের চেষ্টায় অন্যান্য কবির রচনা কাশীরামের মহাভারতে প্রবেশ করিয়া কাশীরামের ভণিতায় মিশিয়া গিয়াছে। পরবর্তী কালে শ্রীরামপুর হইতে যে কাশীদাসী মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছিল * (১৮০২-৩ খ্রীঃ অঃ), তাহাও এই একই উৎস হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে।

এইবার কাশীরামের আবির্ভাব সময় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস এইভাবে তাঁহার 'জগৎ মঙ্গল' রচনার সন তারিখের নির্দেশ করিয়াছেন :

চতুঃষষ্ঠি শকাব্দা সহস্রপঞ্চশত।
সহস্র পঞ্চাশ সন লেখা লিখা মত॥

অর্থাৎ ১৫৬৪ শকাব্দ বা ১০৫০ বঙ্গাব্দে (১৬৪২-৪৩ খ্রীঃ অঃ) এই কাব্য রচিত হয়। ইহাতে কাশীরামের মহাভারতের উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং কাশীরামের মহাকাব্য ইহার পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু কত পূর্বে?

* মুদ্রিত আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।

মহাভারত

Mhbrts.

ব্যাসোক্ত।—

পদাবলি ছন্দে।

কাশীরাম দাস বিরচিত।——

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—

১৮০১।—

১৮০১ সালে শ্রীরামপুর মিসনের মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা কাশীরাম দাসের
মহাভারতের প্রথম মুদ্রণ (আখ্যাপত্র)

[পৃঃ ৪৬৬

সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত কাশীরামের বিরাট পর্বের একখানি পুঁথিতে আছে :

চন্দ্রবাণ পক্ষ ঋতু শাক সুনিশ্চয়।
বিরাট হৈল সাঙ্গ কাশীদাস কয়॥[৫০]

এখানে অঙ্কের দক্ষিণগতি ('অঙ্কস্য বামা গতি' খাটিবে না) ধরিলে উক্ত পয়ার হইতে ১৫২৬ শক (১৬০৪ খ্রীঃ অঃ) পাওয়া যাইবে। সুতরাং কাশীরামের কাব্য অন্ততঃ ১৬০৪ খ্রীঃ অব্দ বা তাহার পূর্বে রচিত হইয়া থাকিবে। আর একটি পুঁথিতে এইরূপ সনের উল্লেখ আছে :

শশাঙ্ক বিধুযুগ রহিলা তিনগুণে।
রুক্মিণী নন্দন অঙ্কে জলনিধি সনে॥[৫১]

ইহা হইতে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ১৫২৫ শকাব্দ (১৬০২-৩ খ্রীঃ অব্দ) পাইয়াছেন। সুতরাং কবির মহাভারত (চারি পর্ব) ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে ৯৮৫ সালে লিখিত কাশীরামের একখানি পুঁথি পান। ৯৮৫ বঙ্গাব্দ হইতে ১৫৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যাইবে। তিনি এই পুঁথি অবলম্বনেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে কাশীরামের মহাভারতের আদি পর্ব মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই তারিখ যদি মল্লাব্দ না হয়, [৫২] তাহা হইলে কাশীরামের প্রাচীন পুঁথিটি ১৫৭৮ খ্রীঃ অব্দে নকল করা হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। হয়তো কবি ইহারও পূর্বে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু হরপ্রসাদের অবলম্বিত পুঁথির সন-তারিখের স্থলে যে কিঞ্চিৎ কারচুপি আছে তাহা পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহাতে নাকি পূর্বে ১০৮৫ সাল ছিল। কোন পুঁথি-বিক্রেতা '১০' মুছিয়া ফেলিয়া সেই স্থলে '৯' লিখিয়া পুঁথির বয়স একশত

---

৫০ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩০৭

৫১ ঐ, ১৩১০

৫২ বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজারা ৬১৮ শকাব্দ (৬৯৪ খ্রীঃ অব্দ) হইতে যে অব্দ চালাইয়া আসিতেছেন, তাহাই মল্লাব্দ। মল্লাব্দ বঙ্গাব্দ অপেক্ষা একশত বৎসর আগাইয়া আসিয়াছে। ৯৮৫ মল্লাব্দ হইলে বাংলা সনে ইহা হইবে ১০৮৫, অর্থাৎ ১৬৭৮ খ্রীঃ অব্দ। কিন্তু হরপ্রসাদের পুঁথিতে কোথাও মল্লাব্দের উল্লেখ নাই। সুতরাং তিনি ইহাকে বঙ্গাব্দই ধরিয়াছেন। উক্ত মহাভারতের ভূমিকার পৃ. ৶০ দ্রষ্টব্য।

বৎসর পিছাইয়া দিয়া পুঁথিটিকে[৫৩] অতিশয় প্রাচীন বলিয়া চালাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় কাশীরাম দাসের মহাভারতের কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি আছে। নিম্নে এইরূপ কয়েকখানি পুঁথির সন-তারিখ উল্লিখিত হইতেছে :

(১) ৩৫৬০ সংখ্যক পুঁথি (স্ত্রীপর্ব)—১০০২ বঙ্গাব্দ—১৫৯৫ খ্রীঃ অঃ
(২) ২৭৪৯ ,, ,, (সভাপর্ব)—১০২০ বঙ্গাব্দ—১৬১৬ খ্রীঃ অঃ
(৩) ২১৮৬ ,, ,, (বিরাটপর্ব)—১০৫০ বঙ্গাব্দ—১৬৪৩ খ্রীঃ অঃ
(৪) ৩৪৬২ ,, ,, (কর্ণপর্ব)—১০৫৯ বঙ্গাব্দ ১৬৫২ খ্রীঃ অঃ

এতদ্ব্যতীত আর সমস্ত পুঁথি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনুলিখিত হইয়াছিল। উল্লিখিত পুঁথিগুলির সন-তারিখ কতটা নির্ভরযোগ্য তাহাও বিবেচনা করা দরকার। উক্ত চারিখানি পুঁথির মধ্যে শুধু বিরাট পর্বের পুঁথিটি (পুঁথি সং. ২১৮৬) ১৬৪৩ খ্রীঃ অব্দের অনুলিপি। আদি-সভা-বন-বিরাটের রচনাকার কাশীরাম অন্য পর্বগুলি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ১৫৯৫ খ্রীঃ অব্দের স্ত্রীপর্বের পুঁথিটি (পুঁ. সং. ৩৫৬০) চারিশত বৎসরের প্রাচীন কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। উপরন্তু অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ যেভাবে পুঁথিটির সন-তারিখ পাল্টাইবার ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে প্রাচীন সন-তারিখ-যুক্ত পুঁথিকে আর নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায় না। যাহা হউক দ্বিমতের অবকাশ রাখিয়া এ কথা বলা চলিতে পারে যে, কাশীরাম দাস (দেব) ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করেন ; তাঁহার মহাভারতের চারিপর্বও বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, অন্ততঃ ১৬৪২ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে (এই সময় তাঁহার কনিষ্ঠ গদাধরের 'জগৎমঙ্গল' রচিত হয়) রচিত হইয়া থাকিবে। অবশিষ্টাংশ তিনি সমাপ্ত করিতে পারেন নাই—অকাল মৃত্যুই বোধ হয়

---

৫৩ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন, "৯৮৫ সালের কাশীরামের পুঁথি দেখিয়া বিশেষ সন্দেহ হইল। সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালা হইতে পুঁথিখানি বাহির করিয়া দেখিলাম। পুষ্পিকার তারিখে কারচুপি হইয়াছে। পুঁথিবিক্রেতারই কাজ বলিয়া মনে হইল। পূর্বে পুঁথিতে ১০৮৫ সাল ছিল। '১০' অঙ্কটিকে ছুরি দিয়া চাঁচিয়া '৯' করা হইয়াছে। পরিবর্তিত অংশের কালির পার্থক্যও বেশ স্পষ্ট। এই '৯'-টি আবার পুঁথির লিপিকরের অন্যান্য পত্রাঙ্কের কোন '৯'-এর সহিতই মিলে না। লিপিকরের '৯' সম্পূর্ণ অন্যরূপ।" (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত মহাভারতের ভূমিকা, পৃ. ৷৷০—৷৷/০) ইহার পরে শাস্ত্রী মহাশয়ের অবলম্বিত পুঁথির প্রাচীনতা সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

তাহার কারণ। পরবর্তী কালে তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্য কবির রচনা মিলিয়া মিশিয়া তাঁহার কাব্যের বিরাট কলেবর সৃষ্টি করিয়াছে। আপাততঃ ইহার অধিক নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

অষ্টাদশ শতকেও কাশীরামের ভণিতাযুক্ত বহু পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীরামপুর মিসনের কেরী প্রভৃতি খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের উদ্যোগে সর্বপ্রথম কাশীরামের পুঁথি সংগ্রহ ও মুদ্রণের চেষ্টা হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মুদ্রণের সঙ্গে সঙ্গে ১৮০২-৩ খ্রীঃ অব্দে কাশীরামের মহাভারতের আদিপর্ব মুদ্রিত হইতে থাকে। মোট চারিখণ্ডে প্রকাশিত কাশীদাসী মহাভারতের আদি পর্বের প্রথম সংস্করণ বাঙালী পণ্ডিতগণ কি রীতি অনুসারে সম্পাদনা করিয়াছিলেন, তাহার কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। অনুমান হয় শ্রীরামপুরের মিসনের বেতনভুক পণ্ডিতগণ হাতের কাছে যে সমস্ত পুঁথি পাইয়াছিলেন, তাহা অবলম্বনেই প্রথম সংস্করণের পাঠ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল এই সংস্করণের পাঠ সংশোধিত, মার্জিত ও সম্পাদিত করিলে কাশীরামের ভণিতাযুক্ত সমগ্র মহাভারত (আদি—স্বর্গারোহণ পর্ব) শ্রীরামপুর মিসন হইতে একখণ্ডে ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। জয়গোপাল সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন; তাই কেরী তাঁহার উপর দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনের ভার দিয়াছিলেন। নিম্নে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অবলম্বিত আদিপর্বের প্রাচীন পাঠ, শ্রীরামপুরের অজ্ঞাতনামা পণ্ডিতদের সম্পাদিত প্রথম সংস্করণ এবং জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ উল্লিখিত হইতেছে।

হরপ্রসাদ সম্পাদিত পুঁথি (সপ্তদশ শতাব্দীর অনুলিপি)

অর্জ্জুন চলিআ জায় ধনুকের ভিতে।
দেখি দ্বিজগণ সব লাগিল পুছিতে॥
কোথাকারে জাহ দ্বিজ কিসের কারণ।
সভা হৈতে উঠি জাহ কোন প্রয়োজন॥
অর্জ্জুন বলিল জাই লক্ষ্য বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হইআ সভে আজ্ঞা কর মোরে॥
স্থনিঞা হাসিল জত ব্রাহ্মণ মণ্ডল।
কন্তারে দেখিআ দ্বিজ হইল পাগল॥

শ্রীরামপুর মিসন প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ (১৮০৩)

অর্জ্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে।
দেখি দ্বিজগণ সব লাগিল পুছিতে॥
কোথাকারে যাহ দ্বিজ কিসের কারণ।
সভা হৈতে উঠি যাহ কোন প্রয়োজন॥
অর্জ্জুন বলিল পারি লক্ষ বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হৈয়া সভে আজ্ঞা দেহ মোরে॥
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণ মণ্ডল।
কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল॥

শ্রীরামপুর মিসন প্রকাশিত ও জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮৩৬)

অর্জ্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে।
দেখিয়াত দ্বিজগণ লাগে জিজ্ঞাসিতে॥
কোথাকারে যাহ দ্বিজ কিসের কারণ।
সভা হৈতে উঠি যাহ কোন প্রয়োজন॥
অর্জ্জুন বলিল যাই লক্ষ বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হইয়া সভে আজ্ঞা দেহ মোরে॥
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণ মণ্ডল।
কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল॥

আধুনিক সংস্করণ (১৩১৮)

অর্জ্জুন যে চলি যান ধনুকের ভিতে।
দেখিয়া ত' দ্বিজগণ লাগে জিজ্ঞাসিতে॥
কোথাকার দ্বিজ তুমি কিসের কারণ।
সভা হৈতে যাহ কোথা কোন প্রয়োজন॥
অর্জ্জুন বলেন যাই লক্ষ্য বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে॥
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণ মণ্ডল।
কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল॥[৫৪]

এই চারিটি উদ্ধৃতি হইতে দেখা যাইবে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর পুঁথি, শ্রীরামপুর মিসনের মহাভারতের দুই সংস্করণ এবং আধুনিক সংস্করণের মধ্যে

৫৪ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত।

মহাভারত।

আদি পর্ব্ব।

সর্ব্ব শাস্ত্র বীজ হরি নাম দুই অক্ষর
আদি অন্ত নাহি তাহা বেদে অগোচর।
পুণ্যময় পুস্তক ভারত নামধির
যার নাম লইলে নিষ্পাপি হয় নর।
পরাশর শুত মুখে হইল সম্ভব
অমল কোমল দিব্য ত্রৈলোক্য বল্লভ।
গীতি ছন্দ কৈল তাহে সুললিত নির্ম্মাণ
বেশাস রচিতে তাহে বিবিধ আখ্যান।

শ্রীরামপুর মিসনের মুদ্রাযন্ত্রে প্রথম ছাপা কাশীদাসী মহাভারতের আদিপর্ব্বের প্রথম পৃষ্ঠা।

খুব বড় রকমের পার্থক্য নাই। জয়গোপাল রামায়ণের পাঠে তবু যৎকিঞ্চিৎ হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাভারতে সেরূপ হস্তক্ষেপ ও পরিবর্তনের পরিমাণ খুবই অল্প। সুতরাং অনেকটা নিশ্চয়তাসহ এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, কাশীরামের মহাভারতের অন্ততঃ প্রথম চারিপর্ব, যাহা প্রকৃতপক্ষে কাশীরামের নিজের রচনা,—তাহাতে কালবশে বিশেষ বিকৃতি প্রবেশ করিতে পারে নাই। কৃত্তিবাসের তুলনায় কাশীরামে ভাষাগত বিশৃঙ্খলার সংখ্যাও পরিমিত।

কাশীরাম দাস সংস্কৃত জানিতেন না, কথকঠাকুরদের কাছে মহাভারত কথা শুনিয়া মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন—এরূপ একটা অমূলক কথা কোন কোন মহলে চলিয়া আসিতেছে। মেদিনীপুরের আওয়াসগড়ের ভূস্বামীর নিকট বাস করিবার কালে মহাভারতের আখ্যান শুনিয়াই নাকি কবি ভারতপাঁচালী রচনায় উদ্যোগী হন।[৫৫] এই বিষয়ে প্রমাণ হিসাবে এই দুই ছত্র উল্লিখিত হইয়া থাকে :

> শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
> অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥

'শ্রুতমাত্র'-কে কেহ কেহ মনে করেন, কবি মহাভারত শুনিয়াই রচনা করিয়াছিলেন—ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য। কিন্তু উহার যথার্থ অর্থ বোধ হয়, "আমি এমন কবিত্বশক্তি সম্পন্ন যে, যাহা শুনি তাহা অনায়াসে পয়ারাদি ছন্দে প্রকাশ করিতে পারি।"[৫৬]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একখানি প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে কাশীরামের মহাভারতের যে আদিপর্ব সম্পাদনা করেন, তাহার প্রথমে এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে :

> প্রণমোহ পুস্তক ভারথ নাম ধর।
> জার নাম করিলে নিষ্পাপ হয় নর ॥
> পরাশর-সুত মুখে হইল সম্ভব।
> অমল কমল দিব্য ত্রৈলোক্য দুর্লভ ॥
> গীত অর্থে কৈল তাহা সুগন্ধি নির্মাণ।
> কেশব রচিল তাহে বিবিধ আখ্যান ॥

৫৫ দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

৫৬ মণীন্দ্রমোহন বসু—বাঙ্গলা সাহিত্য, ২য়

হরি সে উদ্ভব—সেই প্রচণ্ড তপনে।
ভারতপঙ্কজ ফুটে জাহার বদনে॥
সুবুদ্ধি সুজন লোক হৈয়া ষট্‌পদী।
ভারত-পঙ্কজ মধু পিয় নিরবধি॥

শাস্ত্রী মহাশয় এই কয়ছত্রের একটা অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়াছেন, "সুগন্ধি নামে একজন লোক 'গীত অর্থে' অর্থাৎ বাঙ্গালা ছড়ায় মহাভারত নির্মাণ করিল। কেশব নামে আর একজন লোক তাহাতে বিবিধ আখ্যান জুটাইয়া দিল। তাহার পর হরি নামে একজন হইলেন; তিনি প্রচণ্ড সূর্যের ন্যায়; তাঁহার মুখে ভারতপঙ্কজ ফুটিয়া উঠিল। অর্থাৎ তিনি মহাভারতের গল্প ও অন্যান্য গল্প একত্র লইয়া মহাভারতখানিকে ফুটাইয়া তুলিলেন। কাশীরাম দাস এই সকল বই ধরিয়া তাঁহার বই লিখিয়াছেন।"[৩৭] তাঁহার এই ব্যাখ্যা ও মন্তব্য হইতে মনে হইতেছে, তিনি বোধহয় বিশ্বাস করিতেন, কাশীরাম মূল সংস্কৃত মহাভারতের বড় একটা ধার ধারিতেন না, তাঁহার পূর্বগামী কবিদের রচিত বাংলা মহাভারত অবলম্বনেই নিজ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অমূলক, তিনি উক্তছত্র গুলির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা কষ্টকল্পিত। ঐ ছত্রগুলি গীতাধ্যানের সপ্তম শ্লোকের সরল বাংলা পয়ারে অনুবাদ:

পারাশর্যবচঃ-সরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানক-কেশরং হরিকথা-সম্বোধনা-বোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্‌পদৈরহরহঃ পেপিয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে॥

অনুবাদ: পরাশর পুত্র ব্যাসদেবের বাক্যরূপ সরোবর জাত, হরিকথা প্রসঙ্গ দ্বারা প্রস্ফুটিত, নানা আখ্যানরূপ কেসরযুক্ত, যে পদ্মের মধু এই জগতের সজ্জনরূপ ভ্রমরগণ নিত্য পান করেন, কলিকলুষ-নাশক, গীতারূপ তীব্র সুগন্ধযুক্ত অমল মহাভারতরূপ সেই পদ্ম আমাদের কল্যাণের কারক হউক। (স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত এবং উদ্বোধন প্রকাশিত গীতা)

এই শ্লোক হইতে দেখা যাইতেছে যে, সুগন্ধি, হরি, কেশর—এই তিনটি কোন লোকের নাম নহে। সুতরাং শাস্ত্রীমহাশয়ের মত (অর্থাৎ কাশীরাম সংস্কৃত জানিতেন না, অন্যান্য বাংলা মহাভারত অবলম্বনে নিজ কাব্য রচনা

৩৭ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত কাশীরাম দাসের মহাভারতে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সংযোজিত ভূমিকা, পৃ. ॥/০

করেন) সরাসরি বাতিল করা চলিতে পারে। কাশীরামের মহাভারতের চারিপর্বে ভাষা ও বাগবিন্যাসের সংস্কৃতগন্ধী রীতি, তৎসম শব্দ প্রকরণ ও অলঙ্কার সন্নিবেশের ক্লাসিক রীতি কবির প্রগাঢ় সংস্কৃত জ্ঞান সূচিত করিতেছে· অবশ্য সংস্কৃত ভাষায় কবির অতিপাণ্ডিত্য কোন কোন সময়ে কাব্যে উৎকট আতিশয্যও প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। কাশীরাম এদিক দিয়া তৎসম শব্দ সম্ভারে কৃত্তিবাসকে বহু দূরে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সিদ্ধান্ত অতিশয় যুক্তিসঙ্গত, "অনেকের ধারণা কাশীরাম দাস সংস্কৃত জানিতেন না, কথকদিগের নিকট পুরাণপাঠ শ্রবণ করিয়া মহাভারত রচনা করিয়াছেন। এ কথার কোন মূল্য নাই। বেদব্যাস রচিত মূল সংস্কৃত মহাভারতের সঙ্গে তুলনা করিলে কাশীরামের কৃতিত্ব বুঝা যাইবে।.......মূল সংস্কৃত মহাভারত অবলম্বন করিয়া তাহাকে যথাসম্ভব সংক্ষেপ করিয়াছেন। সংস্কৃত না জানিলে এরূপ করিতে পারিতেন না। তিনি যেভাবে সার সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়।" মূল মহাভারতের সঙ্গে এই কাব্যের বহুস্থলে আক্ষরিক মিল আবিষ্কার এমন কিছু দুরূহ ব্যাপার নহে। নিম্নে মূল মহাভারত ও কাশীদাসী মহাভারতের ভাষাগত সাদৃশ্য ও কবির অনুবাদ-কৃতিত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে :

বৈয়াসকী মহাভারত—

কিং স্বিৎ সুপ্তং ন নিমিষতি কিং স্বিজ্জাতং ন চোপতি।
কস্য স্বিদ্ হৃদয়ং নাস্তি কিং স্বিদ্ বেগেন বর্ধতে॥

কাশীরাম—

নিদ্রা গেলে কে না করে নয়ন মুদ্রিত।
ভূমিষ্ঠ হইয়া কেবা না হয় স্পন্দিত॥
কাহার হৃদয় নাই বলহ আমায়।
পাইলে প্রবল বেগ কেবা বৃদ্ধি পায়॥

বৈয়াসকী মহাভারত—

অর্থানামর্জনে দুঃখং বর্ধনে রক্ষণে তথা।
স্তেবাং হি বৈরিণো জাতি বহ্নি তস্করপার্থিবাঃ॥

কাশীরাম—

উপার্জনে যত কষ্ট ততেক পালনে।
ব্যয়ে হয় যত দুঃখ ক্ষয়েতে দ্বিগুণে ॥
অর্থ যার থাকে তার সদা ভীত মন।
তার বৈরি রাজা-অগ্নি-চোর-বন্ধুজন ॥

এরূপ সাদৃশ্য প্রথম চারিপর্বে সর্বদা দৃষ্টিগোচর হইবে। তিনি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণববংশে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার অগ্রজ কৃষ্ণদাস ও কনিষ্ঠ গদাধর সুকবি ও পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, কাব্য রচনাও করিয়াছিলেন। সেই বংশে জন্মলাভ করিয়া কাশীরাম সংস্কৃত জানিতেন না, ইহা যুক্তিযুক্ত মনে হইতেছে না। তিনি এই চারিপর্বের কোন কোন স্থলে, বিশেষতঃ গূঢ়ার্থবহ বাক্যগুলিকে প্রায় হুবহু অনুবাদ করিয়াছিলেন। তবে কাহিনীর বিপুল বিস্তার কিঞ্চিৎ হ্রাস করিবার জন্য কাহিনীকে বহু স্থলে সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সে সংক্ষেপীকরণের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, কবি মূল সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনীকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন—অবশ্য প্রথম চারিপর্ব, যাহা তাঁহার রচনা বলিয়া ইদানীং গৃহীত হইয়াছে, তাহাতেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী অন্যান্য পর্বে ক্রমেই সেই ক্লাসিক সংযম, ভাবগম্ভীর রচনারীতি ও মূলের নিপুণ অনুসরণ হ্রাস পাইয়াছে। যাহা হউক, পূর্বের প্রমাণ দৃষ্টে এ সম্বন্ধে প্রায় নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে কাশীরাম মহাভারতের যতটুকুই রচনা করুন না কেন, মূল সংস্কৃত মহাভারতকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন—ভাবে ও ভাষায় এই অনুসরণ ও আনুগত্য অতি সহজেই বুঝা যাইবে। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার যে বিশেষ অধিকার ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

কাশীরাম দাসের মহাভারতের গুণব্যাখ্যা বা কাব্যধর্ম বিচার বিশ্লেষণ প্রায় অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতেছে। তিনশতাব্দী ধরিয়া তাঁহার মহাগ্রন্থ সংহিতার আকারে সারা বাঙলাদেশে প্রচলিত, বর্ণজ্ঞানহীন ব্যক্তি হইতে কৃতবিদ্য পণ্ডিতসমাজের সর্বত্রই কাশীরাম কৃত্তিবাসের সঙ্গে সমান শ্রদ্ধা ও জনপ্রিয়তা লাভ করিয়া আসিতেছেন। অথচ তাঁহার নামে প্রচলিত মহাভারতের গোড়ার দিকে চারিটি পর্ব ব্যতীত অবশিষ্ট বিপুলায়তন রচনা তাঁহার নহে। অন্য কবির রচনা তাঁহার অসম্পূর্ণ কবিকৃতিকে সম্পূর্ণতা দিয়া এমন এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়াছে যে, বাঙালীর মধ্যযুগীয় সংস্কারের

সার্থক প্রতিনিধি কাশীদাসী মহাভারতের গৌরবময় স্থান অবশ্যস্বীকার্য।" ব্যাসভারত ও জৈমিনি ভারতের কাহিনীর প্রভাবে কাশীরামের নামে প্রচলিত মহাভারতের কাহিনীপর্যায় বিন্যস্ত হইয়াছে। কবি যদিও সর্বত্র আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, কোনও কোনও স্থলে মৌলিক গল্পও গ্রথিত করিয়াছেন (যেমন শ্রীবৎস-চিন্তার কাহিনী), তবু মূল মহাভারতীয় কাহিনীর রস ইহাতে প্রায় কোথাও খর্ব হয় নাই। কৃত্তিবাসের রচনায় যেমন একটা সরল পাঁচালীর লক্ষণ আছে, কাশীরামের রচনা সেইরূপ পাঁচালীজাতীয় হইলেও, তাহার ভাষাভঙ্গিমায় ক্লাসিক তৎসম শব্দাঢ্য গ্রন্থননৈপুণ্য বিশেষ প্রশংসনীয়। এখানে কবির কৃতিত্ব হিসাবে দুইটি রূপবর্ণনা উল্লিখিত হইল—

অর্জুনের রূপবর্ণনা—

অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি আনন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজযুগ নিন্দে নাগ আজানুলম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুবলিত॥

দুর্যোধন-কন্যা লক্ষ্মণার রূপ বর্ণনা—

অনুপম মুখ তার জিনি শরদিন্দু।
ঝলমল কুন্তল কমল-প্রিয়বন্ধু॥
সম্পূর্ণ মিহির জিনি অধর-রঙ্গিমা।
ভ্রূভঙ্গ অনঙ্গ চাপ জিনিয়া ভঙ্গিমা॥
খঞ্জনগঞ্জন চক্ষু অঞ্জনে রঞ্জিত।
শুকচঞ্চু নাসা শ্রুতি গৃধিনী নিন্দিত॥
নির্ধূমাগ্নি কিম্বা যেন রচিল বিদ্যুতে।
বালাসূর্য উদয় হইল পূর্বভিতে॥

এখানে কবি রূপবর্ণনায় সংস্কৃত অলঙ্কারকে প্রায় হুবহু নকল করিয়াছেন—এবং এইজন্য কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কাশীরামের মৌলিকতা কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতো প্রশংসনীয় নহে। কৃত্তিবাস সহজ গ্রামীণ চিত্রকল্পের দ্বারা

এক একটি পূর্ণচিত্র ফুটাইয়া তুলিতেন। সেদিক দিয়া কাশীরাম বিশেষ মৌলিকতা দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু কাশীরাম যখন কাব্যরচনা আরম্ভ করেন, তাহার কিছু পূর্ব হইতে চৈতন্য প্রভাবের ফলে উত্তরাপথের আদর্শ. বিশেষতঃ তৎসম শব্দ মধ্যযুগীয় গ্রামীণ বাংলা কাব্যচ্ছন্দকে বিশেষভাবে রূপান্তরিত করিতেছিল। কাশীরাম এই পর্বের কবি। কাজেই স্বাভাবিক-ভাবেই তাঁহার রচনায়, ভাষাপ্রয়োগ ও অলঙ্কার সন্নিবেশে উত্তরা-পথের প্রভাব অধিকতর অনুভূত হইবে। ক্লাসিক সাহিত্য, বিশেষতঃ অনুবাদাশ্রয়ী ক্লাসিক মহাকাব্যে এইরূপ আভিধানিক শব্দের (যেমন 'চলৎ-চপলা', 'কমলাংঘ্রিতল', 'নিষ্কলঙ্ক ইন্দুজ্যোতিঃ' প্রভৃতি) বাহুল্য ঘটাই স্বাভাবিক। মূল মহাভারতীয় রস ও ধ্বনি-ঝঙ্কার যতটা অনুবাদ-কাব্যে রক্ষা করা সম্ভব, কাশীরাম তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। কাজেই মহাভারতের প্রথম চারিপর্বে তৎসম শব্দের সুবিহিত প্রয়োগের চেষ্টাকে কৃত্রিম বলা উচিত নহে। ক্লাসিক মহাকাব্য, বিশেষতঃ Epic of Art বা পৌরাণিক যুগের মহাকাব্যের রচনায় এইরূপ একটা ঝঙ্কারমুখর শব্দশৃঙ্খলার প্রয়োজন। কাশীরাম সেই জাতীয় কৃত্রিম কাব্যকলার অনুসরণ করিয়াছেন, এইরূপ কাব্যে যাহার প্রয়োগ অস্বীকার করা যায় না। কৃষ্ণের বিশ্বরূপ বর্ণনায় তিনি তৎসম শব্দবহুল যে ঘনপিনদ্ধ বাক্রীতি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য :

সহস্র মস্তক শোভে সহস্র নয়ন।
সহস্র মুকুটমণি কিরীট ভূষণ॥
সহস্র শ্রবণে শোভে সহস্র কুণ্ডল।
সহস্র নয়নে রবি সহস্র মণ্ডল॥
বিবিধ আয়ুধ ধরে সহস্রেক করে।
সহস্র চরণে শোভে কত শশধরে॥
সহস্র সহস্র যেন সূর্যের উদয়।
শ্রীবৎস কৌস্তভমণি শোভিত হৃদয়॥

ইহার সঙ্গে গীতার

অনেক বক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেক দিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥

কিংবা

অনাদিমধ্যান্তমনন্ত বীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্ত হুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥

প্রভৃতি গাঢ়াক্ষর বাক্সংহতি যৎকিঞ্চিৎ উপমিত হইতে পারে। তাঁহার কোন কোন উক্তি প্রায় সূক্তির মতো সংযত ও ভূয়োদর্শনজনিত অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। যেমন—

আপন অর্জিত যদি বিষবৃক্ষ হয়।
কাটিতে আপন হস্তে সমুচিত নয়॥

ইহা সংস্কৃত "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্"-এর চমৎকার অনুবাদ। কিংবা—

প্রলয়সমুদ্র কিসে রাখিবেক কূলে।
বালিবান্ধে কি করিবে নদীস্রোত জলে॥

পরবর্তী কালে ভারতচন্দ্রের হস্তে এই ধরনের 'এপিগ্রাম' আরও মার্জিত রূপলাভ করিয়াছে।

(কবি কাশীরাম ভক্তবংশের সন্তান ; বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাঁহার গাঢ় নিষ্ঠা ছিল। যাবতীয় পুরাণ ও ভক্তিদর্শনেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তাই মহাভারতের বহু স্থলে কবির বৈষ্ণবভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—

কারণ করণ কর্তা দেব গদাধর।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর॥)

ভারতবর্ষের জীবনদর্শন তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত ত্রিপদীতে চমৎকার ফুটিয়াছে :

অপূর্ব বিধির কর্ম কেবা তার বুঝে মর্ম
সৃজন পালন তাঁর হাত।
একবার হয় অংশ আরবার করে ধ্বংস
কর্মযোগে করে যাতায়াত॥

(সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে চৈতন্যপ্রবর্তিত ভক্তিবাদ সমাজে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, কাশীরামের রচনা হইতে তাহার ভূরি পরিমাণ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।)

(কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালীতে স্থানে স্থানে বাঙালী সমাজ ও পারিবারিক জীবনের যে প্রভাব পড়িয়াছে তাহাতে আর্ষ রামায়ণ কখনও কখনও বাঙালীর ঘরের কাহিনী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কাশীরাম প্রায় পুরামাত্রায় আর্যরীতি অনুসরণ করিয়াছেন, সংক্ষেপে কাহিনী রচনা করিলেও

তাঁহার ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গিমায় মূলের বেশ গাঢ় ছাপ লক্ষ্য করা যায়। তবে দুই এক স্থলে তিনি বাঙালীর ঘরের কথাকে দু' একটি রেখার টানে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সভাপর্বে দ্রৌপদী ও হিড়িম্বার যে কলহ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজের দুই সতীনের কলহ স্মরণ করাইয়া দেয়। সভাস্থলে দ্রৌপদীর সঙ্গে হিড়িম্বা আসন গ্রহণ করিলে কৃষ্ণা দ্রৌপদী সপত্নীসুলভ ঈর্ষা বশে হিড়িম্বাকে কটুভাষায় গালি দিলেন :

কৃষ্ণা বলে, নহে দূর খলের প্রকৃতি।
আপনি প্রকাশ হয় যার যেই রীতি॥
কি আহার কি বিচার কোথায় শয়ন।
কোথায় থাকিস তোর না জানি কারণ॥

তাহার উত্তরে হিড়িম্বাও দ্রৌপদীকে যথোপযুক্ত কথা শুনাইয়া দিলেন :

কুপিল হিড়িম্বা দ্রৌপদীর বাক্যজালে।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কৃষ্ণাপ্রতি বলে॥
অকারণে পাঞ্চালি করিস অহঙ্কার।
পরে নিন্দা নাহি দেখ ছিদ্র আপনার॥

তারপর হিড়িম্বা পুত্র ঘটোৎকচের বিশেষ প্রশংসা করিলে কৃষ্ণা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "পুত্রের কর্হ গর্ব খাও পুত্রমাথা।" এইরূপে দুই সতীনে যখন প্রায় কেশাকেশি বাধিবার উপক্রম হইল, তখন "আপনি উঠিয়া কুন্তী দোঁহে সান্ত্বনাইল।" এ বর্ণনা কৌতুকরসসিক্ত বাস্তবজীবনকেই অনুসরণ করিয়াছে বলিয়া প্রশংসনীয়।)

শিল্পাদর্শের বিচারে কাশীরামদাস মধ্যযুগীয় অনুবাদ-সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি বলিয়া উচিত মর্যাদা পাইবেন। একটু তৎসম শব্দসঙ্কুল হইলেও পরিমিত বাগ্‌বন্ধনের জন্য তাঁহার ভারতপাঁচালী কিঞ্চিৎ পরিমাণে মহাকাব্যের ধার ঘেঁষিয়া গিয়াছে। তাঁহার রচনারীতিও বিশেষ প্রশংসনীয়। "ভারতপঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস"—এইরূপ গাঢ়রীতির শব্দ সন্নিবেশ বহু স্থলেই লক্ষ্য করা যাইবে। মাইকেল মধুসূদনের "লঙ্কার পঙ্কজ রবি" শব্দসংযোগ কাশীরামের অনুসরণ। কৃত্তিবাস নিছক পাঁচালী লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, কাশীরাম পাঁচালীর ঢালা গ্রামীণ সুরের সঙ্গে দুই-চারিটি তৎসম শব্দবহুল ধ্রুপদী তান লাগাইয়া মধ্যযুগীয় এলায়িত পয়ার-লাচাড়ী ছন্দের মধ্যেও একপ্রকার পৌরাণিক আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে

পারিয়াছিলেন। অবশ্য কৃত্তিবাস যেমন দৃষ্টিভঙ্গী ও বাক্‌বিন্যাসে একপ্রকার নিজস্ব মৌলিকতার আমদানী করিয়াছিলেন, কাশীরামে ঠিক সেইরূপ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিমা ততটা সুলভ নহে। কবি পুরাণ-কথকতার ছাঁদ গ্রহণ করিলেও বৈয়াসকী আদর্শ সম্পূর্ণরূপে পরিহার না করিয়া তাহাতে কিছু কিছু প্রাচীন অলঙ্করণের মোড়ক দিয়া পাঁচালী কাব্যকে বিশালতর পট-ভূমিকায় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহাকে সৃষ্টিশীল ক্রিয়াবান প্রতিভা বলে, তাহা বোধহয় কৃত্তিবাসেই অধিকতর লক্ষ্য করা যায়। যাহা হউক, কাশীরাম চৈতন্য-পরবর্তীযুগে আবির্ভূত হইয়া মূল ব্যাস বা জৈমিনিকে সম্মুখে রাখিয়া সংক্ষেপে মহাভারতের যে চারিপর্বের ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন, এবং যাহাতে পরবর্তী কালের অন্যান্য কবিদের রচনা প্রক্ষিপ্ত হইয়া খণ্ড কাশীরামকে পূর্ণত্ব দিয়াছে, তাহাতে তাঁহার প্রতিভা বাঙালীর মনোজীবনকে গঠন করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। একথা অবশ্য সত্য যে, পূর্ববঙ্গে মধ্যযুগে মহাভারত রচনাকার হিসাবে সঞ্জয়-কবীন্দ্রাদির অধিক জনপ্রিয়তা ছিল, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে, বিশেষতঃ ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ছাপাখানার যুগে কাশীরাম দাসের মহাভারত সারা বাঙলাদেশেই বিপুল বিস্তারলাভ করিলে সঞ্জয় প্রভৃতি পূর্ববর্তী মহাভারতকারদের গ্রন্থ বিবর্ণ পুঁথিপত্রের মধ্যেই বন্দী হইয়া রহিল। স্বচ্ছন্দ সরল পয়ার-ত্রিপদীতে বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসের পটভূমিকায় পুরাণাশ্রয়ী সংস্কৃতির আলোকে বৈয়াসকী মহাভারতকে (মাত্র চারিপর্ব) বাংলা ভাষায় প্রচার করিয়া কাশীরাম কৃত্তিবাসের মতোই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

কাশীরামের নামে আরও পৃথক কয়খানা পুঁথি পাওয়া গিয়াছে—সত্যনারায়ণের পুঁথি, স্বপ্নপর্ব, নলপর্ব, নলোপাখ্যান। এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর-রচনা কাশীরামের লেখনীপ্রসূত কিনা বলা দুষ্কর। বিখ্যাত কবির ভণিতায় নিজ নিজ কাব্য-কবিতা চালাইয়া কোন কোন স্বল্পপ্রতিভার কবি অমরত্ব লাভের সুলভ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত রচনা প্রায়ই ছদ্মবেশী নিকৃষ্ট কবির সৃষ্টি। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে আরও অনেক কবি মহাভারতের দুই-একপর্ব অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কিছু কিছু পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে। চন্দনদাসের কিয়দংশ, বিশারদের বিরাট পর্ব, দ্বৈপায়ন দাসের কিয়দংশ[৩৮],

৩৮ কেহ কেহ ইঁহাকে কাশীরামের পুত্র বলিয়া মনে করেন। কারণ ইঁহার পুঁথির

দ্বিজ শ্রীনাথের বিরাট-ভীষ্ম-দ্রোণপর্ব[৫৯], কৃষ্ণরামের অশ্বমেধপর্ব (জৈমিনি ভারতের অনুবাদ)—এইরূপ বহু পর্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁথি পাওয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই কবিগণ মহাভারতের অনুসরণে বিভিন্ন পর্ব রচনা করিয়াছিলেন—হয়তো কাশীরামেরই প্রভাবে। ইঁহাদের রচনা অধিকাংশ স্থলে কবিত্বরস বর্জিত; অবশ্য দু'একজনের কিছু কিছু কবিত্বশক্তি ছিল বটে, কিন্তু কাশীরামের প্রভাবে তাঁহারা চাপা পড়িয়া গিয়াছেন। মাত্র চারিপর্ব সংক্ষেপে রচনা করিয়া সমগ্র মহাভারতের রচনাকাররূপে কাশীরাম যে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত দুর্লভ। কেহ-বা বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য জৈমিনি ভারত অবলম্বন করিয়াছিলেন, কেহ ভাগবতাদি হইতে আখ্যান গ্রহণ করিয়া পুঁথির কলেবর বাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু পুণ্যবান কাশীরামই বাঙালীর চিত্ত জয় করিয়া সাহিত্যের ইতিহাসে এবং সর্বশ্রেণীর পাঠকসমাজে অদ্যাপি বাঁচিয়া আছেন।

৩

ভাগবত-কৃষ্ণায়ন-বৈষ্ণব অনুবাদ-কাব্য

(ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া গোটা সপ্তদশ শতাব্দীতেই ভাগবতের কয়েক স্কন্ধের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ও ভাগবতের আদর্শে রচিত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক দু'একটি কাব্য রচিত হইয়াছিল। চৈতন্যপ্রবর্তিত রাগানুগাভক্তি এবং ভাগবতবর্ণিত ঐশ্বর্য-মিশ্রা ভক্তির সঙ্গে তত্ত্বাদর্শঘটিত পার্থক্য আছে। তাই সপ্তদশ শতাব্দীতে ভাগবতের কয়েকটি অধ্যায় অনূদিত হইলেও রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদের মতো কোন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধারী কবি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্যে অবতীর্ণ হন নাই। তথাপি ভাগবত বৈষ্ণব-

---

কয়েক স্থলেই আছে—"দ্বৈপায়ন দাস বলে কাশীর নন্দন।" কাশীরামের রচনার সঙ্গে তাঁহার রচনার ভাবের দিক হইতে কিছু সাদৃশ্যও আছে। যাহা হউক এ সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। (দ্রষ্টব্য—মণীন্দ্রমোহন বসুর বাঙ্গলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০—১০২)

৫৯ ইনি কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণের আদেশে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মহাভারতের অনুবাদ করেন।

সম্প্রদায়ের উপনিষদ, এবং ভাগবত ও চৈতন্যতত্ত্বের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত বা বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবিগণ ভাগবত অনুসরণে কিছু কিছু কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, যাহার অধিকাংশই কাব্য হিসাবে উপেক্ষার যোগ্য। কিন্তু ঐতিহাসিক ক্রম রক্ষার জন্য এখানে স্বল্প পরিসরের মধ্যে দুই চারি কথা আলোচিত হইতেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর কৃষ্ণায়নকাব্য আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখা যাইতেছে যে, বৈষ্ণবপদাবলীতে যেমন বৈষ্ণব ভক্তিবাদ গৌড়ীয় আদর্শ অনুসরণ করিয়াছে, তেমনি কৃষ্ণ আখ্যান বর্ণনায় একাধারে ভাগবতাদির প্রভাব এবং বাঙলার লোকজীবনাদর্শ ও গ্রাম্য ঐতিহ্যের প্রভাব ভাগবত ধরনের কাব্য পুঁথিগুলিতে একপ্রকাব বিশেষ আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে। এই কৃষ্ণায়ন কাব্যের মধ্যে দুই একজন কবি মূল ভাগবতকে সংক্ষেপে লিখিয়াছেন, কেহ শুধু কৃষ্ণলীলা সংক্রান্ত স্কন্ধগুলির অনুবাদ করিতেন, কেহ-বা ঐ সমস্ত অনুবাদ-অনুসরণগুলিতে স্থানীয় গ্রাম্য কৃষ্ণকথাও (যথা দানলীলা, নৌকালীলা, আরও অনেক আদিবসাত্মক নর্মলীলা) কিছু কিছু যোগ করিয়া দিতেন। আর একপ্রকার কৃষ্ণকথা একদা খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল—যাহাতে ভাগবতের ছিটেফোঁটা থাকিলেও আসলে তাহাতে গ্রামীণ বাঙালীর লোকসংস্কৃতিজাত কৃষ্ণলীলার রঙ্গতামাশি অধিকতর প্রাধান্য পাইত। ইহাদের কিছু কিছু পাঁচালীর ঢঙে আবৃত্তি হইত, কিছু-বা কীর্তনের সুরে তালে গীত হইত। অধিকাংশ স্থলে লাচাড়ী ছন্দগুলিকে গীতে-সুরে গাওয়া হইত। ফলে এই সমস্ত ভাগবত-অনুসারী কাব্য বা কৃষ্ণকাহিনীকেন্দ্রিক পুঁথিতে কিছু কিছু প্রশংসনীয় বৈষ্ণবপদাবলীও গৃহীত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে রামায়ণ ও মহাভারতের অনুকরণে রচিত পাঁচালীগুলি সর্বসাধারণের মধ্যে যেরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, ভাগবতের অনুসরণ বা গ্রামীণ কৃষ্ণলীলাকথাগুলি সেরূপ ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে নাই। একটা কারণ বোধ হয়, চৈতন্যপ্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম, সাহিত্য ও রসতত্ত্বের বিপুল প্রভাব। রাগানুগা প্রেম-ভক্তির অতি-প্রাধান্যের জন্য ভাগবতে বর্ণিত ঐশ্বর্যমিশ্রা-ভক্তির বর্ণনা চৈতন্য-পন্থী বৈষ্ণবসমাজে কিছু শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, বৈষ্ণব রসানুকূল প্রেমভক্তি আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণবপদাবলীর জন্ম হইয়াছিল। সপ্তদশ

শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদাবলীর অত্যন্ত জনপ্রিয়তার জন্য ভাগবতাশ্রয়ী কৃষ্ণলীলা-কাহিনীর প্রভাব কিছু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, যদিও অনুরূপ ভাবের কবির সংখ্যা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। শুধু সপ্তদশ শতাব্দীতেই কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক অনুবাদকাব্য ও আখ্যানকাব্যের অন্ততঃ বারোজন কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। তন্মধ্যে পরশুরামের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'র কিয়দংশে এবং ভবানন্দের 'হরিবংশে' প্রায় পুরাপুরি গ্রামীণ লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত কৃষ্ণকথার গোষ্ঠ-লীলা অনুসৃত হইয়াছে। অতঃপর আমরা দুইটি উপচ্ছেদে এই শতাব্দীর কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্যকাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইব: (১) ভাগবতের অনুসরণে রচিত কৃষ্ণলীলা, (২) ভাগবত বহির্ভূত কৃষ্ণলীলা।

ভাগবতের অনুসরণে রচিত কৃষ্ণলীলা ॥

ষোড়শ শতাব্দীতে যে সমস্ত কাব্যে ভাগবতের ধারা অনুসৃত হইয়াছিল, তাহাতে পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের রীতি গৃহীত হয় নাই। বস্তুতঃ ভাগবতাচার্যের 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যে ভাগবতের সম্পূর্ণ অনুবাদ অতি অল্পই অনুসৃত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ভাগবতের অনুসরণে ও অনুবাদের রীতিতে রচিত কাব্যগুলির সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে—অবশ্য আদ্যন্ত ও আক্ষরিক অনুবাদে বড় কেহ অগ্রসর হন নাই। সনাতন বিদ্যাবাগীশ, কৃষ্ণদাস (কাশীরামের অগ্রজ), কৃষ্ণকিঙ্কর, দ্বিজ হরিদাস, অভিরাম দত্ত (দাস), দুর্লভনন্দন, কবিচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণ খুব সম্ভব সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ইঁহারা সকলেই ভাগবতকে অবলম্বন করিয়া কখনও দুই একটি স্কন্ধের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেন, কখনও-বা শুধু আখ্যানটিকে নিজের ভাষায় বর্ণনা করেন। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে তত্ত্বকথা সম্পূর্ণ এড়াইয়া গিয়াছেন, দার্শনিক উক্তিও যথাসম্ভব বাদ দিয়াছেন। কেহ কেহ অন্যান্য পুরাণ-উপপুরাণ হইতেও দুই চারিটি কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের ভাগবত-অনুসারী পুঁথিগুলির একটা বৈশিষ্ট্য—ভাগবতের অনুসরণ হইলেও ইহাতে লৌকিক কাহিনীও (অর্থাৎ দানলীলা, নৌকালীলা, রাধাচন্দ্রাবলী, বড়াই-বুড়ীর চরিত্র) অনুসৃত হইয়াছে। সুতরাং সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, রাধাকৃষ্ণ সংক্রান্ত লৌকিক গ্রাম্যকাহিনীগুলি সমাজে এতদূর প্রচলিত ছিল এবং সামাজিক মনে ইহার এত গভীর প্রভাব ছিল যে, যাঁহারা পৌরাণিক

ভাগবত অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও লৌকিক আখ্যানের মোহ ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

সনাতন বিদ্যাবাগীশ ভাগবতের সমস্ত স্কন্ধেরই সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহার কয়েকটি স্কন্ধের পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার বিভিন্ন স্কন্ধেই রচনাকাল প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় গোটা কাব্যটি রচনা করিতে বিশ বৎসরের মতো সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রথম স্কন্ধ রচিত হইয়াছিল ১৬০১ শকাব্দ (১৬৭৯ খ্রীঃ)।

সপ্তদশ শতাব্দীর কৃষ্ণলীলার কবিরূপে প্রায় তিনজন কৃষ্ণদাসের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শ্রীনিবাস আচার্যের অনুচর এক কৃষ্ণদাস, যিনি গঙ্গার তীরে বাস করিতেন। তিনি ভাগবতের দশম স্কন্ধের কৃষ্ণজন্মলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ স্কন্ধের কিয়দংশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধের পরীক্ষিতের কাহিনী পর্যন্ত ভাগবতের কাহিনীগুলি নিজের ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। এই কাব্যকে কবি 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' আখ্যা দিয়াছেন। কবির ভাষা বেশ পরিচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে অলঙ্কার সন্নিবেশও প্রশংসনীয়। অবশ্য কবি পূর্ববর্তী মাধবাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'কে আদর্শ করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা স্বীকারও করিয়াছেন। তবে কবি যেমন ভাগবতের কয়েকটি স্কন্ধের কাহিনী অনুসরণ করিয়াছেন, তেমনি আবার ভাগবত-বহির্ভূত অন্যান্য লৌকিক কাহিনীগুলিও (যথা—দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, রাধা কর্তৃক কৃষ্ণের বংশী চুরি, কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার ভার বহন ইত্যাদি) বেশ সবিস্তারে বলিয়াছেন। কিন্তু কবি এই লৌকিক কাহিনী কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন তাহার উৎসস্বরূপ হরিবংশকে নির্দেশ করিয়াছেন।[৬০] অথচ সংস্কৃত হরিবংশে এই সমস্ত লৌকিক কৃষ্ণলীলার নামগন্ধ নাই। আরও কয়েকজন কবি ভাগবতের ধারা অনুকরণ করিতে গিয়া যখন লৌকিক লীলার দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়াছেন, তখন তাঁহারা এইরূপ হরিবংশের দোহাই পাড়িয়াছেন। লোকচিত্তরঞ্জক মুখরোচক দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদিকে শিষ্ট সভায় পেশ করিবার জন্যই তাঁহারা এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন।[৬১]

---

৬০ দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে।
অন্য নহি কিছু কহি হরিবংশ মতে ॥

৬১ ভবানন্দের 'হরিবংশ' প্রসঙ্গে এবিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

কাশীরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাস ভাগবতের দশম স্কন্ধের ভাবাবলম্বনে যে 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে। কাব্যটি ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত হইয়া থাকিবে। পুঁথিতে কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর' নামে কবি ভণিতা দিয়াছেন। তাঁহার গুরু জয়গোপাল দাস এই নাম প্রদান করেন। অবশ্য কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'র রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ও কাশীরামের অগ্রজ শ্রীকৃষ্ণদাস এক ব্যক্তি নহেন।

শ্রীকৃষ্ণবিলাসের ভণিতায় কবি নিজেকে কৃষ্ণকিঙ্কর রূপেই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, গুরুই তাঁহার কৃষ্ণকিঙ্কর নাম দিয়াছিলেন।[৬২] তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাসও 'জগৎমঙ্গলে' জ্যেষ্ঠ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
রচিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর ॥

ইহা হইতে 'শ্রীকৃষ্ণবিলাসে'র সম্পাদক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 'কৃষ্ণবিলাস' কাব্যপ্রণেতা কৃষ্ণকিঙ্কর ও কাশীরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাস একই ব্যক্তি। অবশ্য প্রাপ্ত প্রমাণ যে একেবারে সংশয়রহিত তাহা বলা যায় না। যাহা হউক অন্য কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা কাশীরামের অগ্রজ কৃষ্ণদাসকেই 'শ্রীকৃষ্ণবিলাসে'র রচনাকার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। মুদ্রিত পুঁথিটি ভাগবতের দশম স্কন্ধের কিঞ্চিৎ অনুসরণে রচিত। কবির মূল কাব্য মুদ্রিত কাব্য অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী এমন কিছু উচ্চ শ্রেণীর নহে। কাশীরামের অগ্রজ বলিয়া তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে, নচেৎ বড় কেহ তাঁহার সন্ধান রাখিত না।

ঘনশ্যাম নামে আর এক কবি কৃষ্ণকিঙ্কর ভণিতাসহ 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' রচনা করেন। দুইজনেরই গুরুদত্ত নাম এক, রচিত কাব্যের নামও এক। ফলে দুইজনের কাব্য ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু সংশয় সৃষ্টি হইয়াছে। এই কবি কিন্তু রচনা শক্তিতে কিছু উচ্চতর কাব্যবোধের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতেও ভাগবত হইতে কাহিনী সংগৃহীত ও সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

---

৬২ সেইখানে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নাম থুয়া।
আজ্ঞা কৈলে শ্রীনন্দনন্দন ভজ গিয়া ॥

আর এক কৃষ্ণদাসের ভণিতায় 'গোবিন্দবিজয়' নামক যে পুঁথিটি পাওয়া গিয়াছে,[৬৩] তাহাতেও কৃষ্ণলীলার কিয়দংশ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ণিত প্রহ্লাদচরিত্র উল্লেখযোগ্য।

কবিশেখরের 'গোপালবিজয়' ভাগবত অনুসারী কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একখানি স্বতন্ত্রকাব্য। একদা এ কাব্য বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, কারণ ইহার অনেকগুলি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কবি 'গোপালবিজয়ে'র প্রথমে বিস্তারিত আকারে নিজ বংশ পরিচয় ও অন্যান্য রচনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সেই বর্ণনায় দেখা যাইতেছে, তাঁহার পিতার নাম চতুর্ভুজ, মাতার নাম হীরাবতী। 'গোপালবিজয়' রচনার পূর্বে তিনি নাকি গোপাল চরিত, গোপালের কীর্তনামৃত ও 'গোপীনাথবিজয়' নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কবির আসল নাম দৈবকীনন্দন সিংহ। কিন্তু কবিত্বশক্তির জন্য কবিশেখর নামে অভিহিত হইতেন।[৬৪] বৈষ্ণব সাহিত্যে রায়শেখর বা শেখররায় সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা বলিয়া পরিচিত।[৬৫] এই কবিশেখর ও পদাবলীর রায় শেখর একব্যক্তি নহেন।* তবে পরবর্তী কালে লিপিকরদের অজ্ঞতার জন্য এই দুই নামে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া গিয়াছে।

'গৌরপদতরঙ্গিণী'র প্রথম সম্পাদক জগদ্বন্ধু ভদ্র 'গোবিন্দ বিজয়ে'র একখানি পুঁথিতে ২৫০০ শ্লোক দেখিয়াছিলেন। প্রাপ্ত পুঁথিগুলির আকৃতি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। ইহাতে কৃষ্ণজন্ম হইতে উদ্ধবসংবাদ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন পুঁথিতে কংসবধের পরবর্তী কাহিনীও অনুসৃত হইয়াছে—এমনকি সবিস্তারে দানলীলা ও নৌকালীলার পদও স্থান পাইয়াছে। এই কাব্যে ভাগবতের অনুসরণে কৃষ্ণলীলা এবং লোকসংস্কৃতির অনুসরণে দানলীলাদি বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনাবিন্যাস, চরিত্র সন্নিবেশ ও ও কাব্যশিল্পে দৈবকীনন্দন বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। বিশেষতঃ অলঙ্কার প্রয়োগে তিনি কোথাও কার্পণ্য করেন নাই।[৬৬]

---

৬৩ কলি বিশ্ব. পুঁথি—১৮২৯

৬৪ সিংহ বংশে জন্ম নাম দৈবকী নন্দন।
শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্বজন॥ (কলি. বিশ্ব. পুঁথি—৯৬৩)

৬৫ এবিষয়ে এই লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (২য়) দ্রষ্টব্য।

৬৬ বিস্তারিত আলোচনার জন্য মণীন্দ্রমোহন বসুর 'বাঙ্গলা সাহিত্য' (২য়) দ্রষ্টব্য।

* পরবর্তী অধ্যায়ে রায়শেখর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

অভিরাম দত্তের (দাস) 'গোবিন্দবিজয়' কখনও কখনও 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' নামেও অভিহিত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, দত্তকুলোদ্ভব এই কবি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।[৬৭] সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত ভাগবতাশ্রয়ী রচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিশঙ্কর কবিচন্দ্রের কাব্যে অভিরাম দত্তের কিছু কিছু পদ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সুতরাং অভিরামের আবির্ভাব কাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগ হইতে পারে। অধিকাংশ স্থলে তিনি অভিরাম দত্তের ভণিতা দিলেও বৈষ্ণবীয় রীতিবশতঃ দুইএক স্থলে কবি নিজেকে 'দাস' বিশেষণেও চিহ্নিত করিয়াছেন। ভাগবতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ ও দশম স্কন্ধের অনেকটা এই রচনায় স্থান পাইয়াছে। এই পুঁথিতে অন্যান্য গ্রন্থের মতো দানলীলা-নৌকালীলার বর্ণনা না থাকিলেও একস্থানে কৃষ্ণের বাঁশী হারাইবার আখ্যান আছে। কবির বর্ণিত রাসলীলা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন ও সরস এবং পরবর্তী কালের কেহ কেহ এই রাসলীলার পদ নিজ নিজ রচনার মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন।

✓ এই পর্বের মধ্যে সাহিত্যিক উৎকর্ষ বিচারে কবিচন্দ্র উপাধিক শঙ্কর চক্রবর্তী কৃত 'গোবিন্দমঙ্গল' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুপুরের নিকটে পানুয়া গ্রামে কবির জন্ম হইয়াছিল। কবি আপনার কাব্যকে 'ভাগবতামৃত', 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' ইত্যাদি নামেও অভিহিত করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহের আমলে এই কাব্য রচিত হয়। ভাগবতাশ্রয়ী এই কাব্যটি ছাড়াও তিনি রামায়ণ ও শিবায়ন কাব্য রচনা করেন। গোপাল সিংহের রাজত্বকাল—১৭১২-১৭৪৬ খ্রীঃ অব্দ; সুতরাং এ কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত হইয়া থাকিবে। তবে আলোচনার ক্রম রক্ষা করিবার জন্য আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর পর্বের মধ্যেই এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

কবিচন্দ্র ভাগবতের কিছু কিছু কাহিনীকে পালার আকারে সাজাইয়া এই কাব্য রচনা করেন। সুতরাং ইহা ঠিক অনুবাদের পর্যায়ে পড়ে না—সপ্তদশ শতাব্দীর ভাগবতাশ্রয়ী রচনাসমূহ প্রায় এই একই আদর্শ অনুসরণ করিয়াছে। ইহাতে প্রথম স্কন্ধ, চতুর্থ স্কন্ধ, পঞ্চম স্কন্ধ, ষষ্ঠ স্কন্ধ, সপ্তম স্কন্ধ,

---

৬৭ ঐ, পৃ. ২১৮

অষ্টম স্কন্ধ, নবম স্কন্ধ, দশম স্কন্ধ—প্রত্যেক স্কন্ধ হইতে কিছু কিছু কাহিনী অবলম্বন করিয়া কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য পুরাণ হইতেও দু'একটি পালা গৃহীত হইয়াছে। কবি কখনও সহজ সরল ভাষায়, কখনও-বা আলঙ্কারিক ভাষায় বেশ নিপুণতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার দাতাকর্ণ, রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন প্রভৃতি পালা পৃথক ভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। কবি কিন্তু লৌকিক ধারা বিশেষ অনুসরণ করেন নাই।—যদিও দু' এক স্থলে বড়াই বুড়ীর কথা বলিয়াছেন। যাহা হউক কবিচন্দ্রের 'গোবিন্দমঙ্গলে'র বহু পুঁথি পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে মনে হইতেছে একদা কবি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন। সন্ধান করিলে আরও কয়েকজন কবির খোঁজ পাওয়া যাইতে পারে, যাঁহারা ভাগবতের দু' একটি পালা অবলম্বনেও কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আর এক খানি কাব্যের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। কবি পরশুরামের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দাশগুপ্তের সম্পাদনায় কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩৩৩ সালের দিকে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও নলিনীকান্ত দাশগুপ্তের মধ্যে, পরশুরাম নামে কয়জন কবি ছিলেন, তাহা লইয়া যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা হইতে মনে হইতেছে, প্রায় একই সময়ে পরশুরাম নামে দুইজন কবি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। যিনি অধিক পরিচিত এবং ভাগবত অবলম্বনে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম পরশুরাম চক্রবর্তী। তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় বিশেষ জানা যায় নাই। মনে হয় এই কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত হইয়া থাকিবে। কবি ভাগবতের বিভিন্ন স্কন্ধের পালাগুলিকে ইচ্ছামতো সাজাইয়া গুছাইয়া নিজের কথায় বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম, চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম এবং দশম স্কন্ধের কিছু কিছু গল্প আখ্যান এই কাব্যে গৃহীত হইয়াছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দাশগুপ্ত যথার্থই বলিয়াছেন, "দশম স্কন্ধেও কবি ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, মোটামুটিভাবে ভাগবতকে উপজীব্য করিয়া কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন" (ভূমিকা, পৃঃ ॥৶০)। কবি যদিও ভাগবতের কাহিনী ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করিয়া এই বৃহদায়তন কাব্য রচনা করিয়াছেন, কিন্তু দোললীলা, দানলীলা ও নৌকালীলার বর্ণনায় তিনি কখনও কখনও

রাশ ছাড়িয়া দিয়া গ্রাম্য রঙ্গরসের ধারাটিকেই অনুসরণ করিয়াছেন। কবির ভাষায় বহু গ্রাম্য শব্দ আছে, "হেলায় ছের্দায় জেবা কৃষ্ণকথা কয়"—এইরূপ উক্তি বহু স্থলেই পাওয়া যাইবে। কবি ইচ্ছাকৃত কবিত্ব না দেখাইয়া সহজভাবে কাহিনীটিকে বিবৃত করিতে চাহিয়াছেন,—নিরাভরণ বর্ণনাধর্মী রচনা হিসাবে ইহার কিছু মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। 'মাধবসঙ্গীত' রচয়িতা আর এক পরশুরাম পরবর্তী কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কবির প্রকৃত উপাধি ছিল রায়। কবি দীর্ঘকাল উড়িষ্যায় বাস করিয়াছিলেন বলিয়া রচনার মধ্যে দুই চারিটি উড়িয়া শব্দ রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে দ্বিজ পরশুরাম বলিতে চক্রবর্তী উপাধিক পরশুরামকেই বুঝায়—যাঁহার কথা পূর্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি।

সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেক কবি বা কবিযশঃপ্রার্থী ভক্ত ভাগবতের মূল কাহিনীকে নিজ নিজ ভাষায় কোথাও সংক্ষেপ, কোথাও ভাবানুবাদ করিয়া, কোথাও বা লৌকিক রস-রুচি ও কাহিনীর মিশাল দিয়া ভাগবতের একপ্রকার নূতন আদর্শ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। মূল ভাগবতের সমস্ত স্কন্ধের যথাসম্ভব ভাবানুবাদে যে শক্তি ও ধৈর্য প্রয়োজন, এযুগে খুব অল্পসংখ্যক কবিই সেরূপ ধৈর্যের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। উপরন্তু এই যুগের কবিগণ প্রতিভাতে এমন কোন বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য বা প্রশংসনীয় রচনারীতির পরিচয় দিতে পারেন নাই। ভাগবতের দুই চারিটি জনপ্রিয় কাহিনীকে নিজ নিজ ভাব ও ভাষায় সরল-তরল আকারে বর্ণনা করিয়াই ইঁহারা ভাগবতধারা রক্ষা করিয়াছিলেন। তাই সপ্তদশ শতাব্দীর ভাগবতাশ্রয়ী কোন কাব্যই প্রশংসনীয় কবিত্ব বা তত্ত্বগভীরতা প্রকাশ করিতে পারে নাই। কিন্তু যাঁহারা ভাগবতের ভাবানুবাদের দিকে অগ্রসর না হইয়া গ্রামীণ কৃষ্ণায়ন রীতিকেই প্রাধান্য দিয়া রুচির শুচিতার বিশেষ ধার ধারেন নাই, বরং তাঁহারাই গ্রামীণ কৃষ্ণকাহিনীর মধ্যে কিছু মৌলিকতা সঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরবর্তী উপচ্ছেদে এইরূপ দুইজন কবির বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে।

ভাগবত বহির্ভূত কৃষ্ণলীলা ॥

বাংলায় প্রায় চতুর্দশ শতাব্দী হইতে ভাগবতপুরাণ বিশেষ জনপ্রিয়তা

লাভ করিয়াছিল, পরবর্তী বৈষ্ণব প্রাধান্যের যুগে ভাগবত কাহিনী ও আদর্শ শুধু বৈষ্ণব সমাজে নহে, হিন্দুসমাজের নানা শাখা-প্রশাখার মধ্যেই অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে একমাত্র ভাগবত পুরাণই সর্বশ্রেণীর বাঙালীর চিত্ত জয় করিয়াছিল। অবশ্য ভাগবতের যে অংশে কৃষ্ণলীলার বিস্তৃত বর্ণনা আছে, সমাজে তাহারই অধিক প্রচার হইয়াছিল। চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তিধর্ম ও ভাগবতেব আদর্শের মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যবধান থাকিলেও ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণচবিতকথা সমাজের প্রায় সর্বস্তরে ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্মরণীয়। শিবকে কেন্দ্র করিয়া যেমন একশ্রেণীর কৃষিসংস্কৃতি-নির্ভব শিবায়ন সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহা মূলতঃ নিষাদসংস্কৃতি বা আদিম অস্ট্রিক 'কৌমের' সঙ্গে কৌলিক বন্ধনে সংযুক্ত—ঠিক তেমনি গোষ্ঠগাথা, রাখালী সঙ্গীতকথা বা আভীর পল্লীব গালগল্পসমন্বিত একপ্রকার গ্রামীণ কাহিনী, শুধু বাঙলা দেশেই নহে, প্রায় সমগ্র ভারতেই বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বাঙলাদেশেও পুরাণ-সংস্কৃতির তলেতলে এই অপৌরাণিক গ্রামীণ কৃষ্ণলীলার ধারা বহমান ছিল—যাহার কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যাইবে 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। রাধাকৃষ্ণের মাতুলানী ভাগিনেয় সম্পর্ক, আয়ানঘোষ, বড়াইবুড়ী, দান-নৌকা-ভারলীলা, রাধাকৃষ্ণের 'রঙ্গঢামালি', অসামাজিক নীতিরুচিবর্জিত অনঙ্গরঙ্গ —এই সমস্ত ব্যাপার অসংস্কৃত অমার্জিত জনচিত্তের কাছে খুব লোভনীয় সামগ্রী বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। তাই দেখা যাইতেছে পৌরাণিক কৃষ্ণকথার পার্শ্বেই গ্রামীণ কৃষ্ণকথার ধারা প্রচলিত ছিল। বরং বলা যাইতে পারে, বাঙলাদেশে গ্রামীণ কৃষ্ণকথাই অধিকতর পুরাতন, সাধারণ বাঙালীর ধাতু ও সংস্কারের অধিকতর নিকটবর্তী। এই মতে মনে হইতেছে, ভূভার হরণের জন্য যদিও বিষ্ণুর কৃষ্ণরূপে নরদেহ গ্রহণের প্রয়োজন হইয়াছিল, তবু লোকগুরু যদুপতি কৃষ্ণকে বৃন্দাবনের কুঞ্জবিতানেই যেন অধিকাংশ সময়ে বিচরণ করিয়া রহঃরহস্যে মত্ত থাকিতে দেখা যাইতেছে। আয়ান ঘোষের (<অভিমন্যু) ধর্মপত্নী রাধাকে প্রাকৃত সম্পর্কে মাতুলানী জানিয়াও গুণধর ও অপরিণত বয়স্ক ভাগিনেয় তাঁহাকে কৌশলে হস্তগত করিতেছেন, মাতুলানীও গম্যা-অগম্যা সম্পর্ক বিস্মৃত হইয়া স্বচ্ছন্দে আত্মদান করিতেছেন। মাতামহী বড়াইবুড়ী আবার পঞ্চবাণের সঙ্গে যোগসাজস

করিয়া অসামাজিক প্রেমরসের দূতিয়ালীতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শুধু রাধা নহেন, ষোল শ' গোপীদিগকেও একা কৃষ্ণ তৃপ্ত করিতেছেন, মহানন্দে লীলা-লাম্পট্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতেছেন, শাস্ত্র quote করিয়া অগম্যা-গমন সমর্থন করিতেছেন, রাধা ও সখীদিগকে সঙ্গে লইয়া কখনও দানলীলা, কখনও নৌকালীলার অভিনয় করিতেছেন, কখনও একান্তে একাকিনী রাধাকে লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছেন, আবার পরক্ষণেই মাতা যশোদার গুণগান করিতে করিতে দুধের শিশু সাজিতেছেন। গ্রাম্য ও অসংস্কৃত মন যাহাতে তৃপ্তি পায়, উল্লাস বোধ করে, এই ধরনের গ্রাম্য কাহিনীতে তাহার প্রচুর উপকরণ রহিয়াছে। এমন কি যাঁহারা প্রধানতঃ ভাগবতের কাহিনী অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ভাগবত বহির্ভূত দান-নৌকালীলার মুখরোচক কাহিনী পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কবিশেখরের দানলীলার পালা, দুঃখী শ্যাম দাসের[৬৮] 'গোবিন্দমঙ্গলের' অন্তর্ভুক্ত দানলীলা, দ্বিজমাধবের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে' দানখণ্ড,[৬৯] মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' দানলীলার স্বল্প উল্লেখে দেখা যাইতেছে যে, একদা এই ধরনের বাধাবন্ধহীন দানলীলার গল্প সমাজে কিরূপ জনপ্রিয় ছিল। দান ও নৌকাখণ্ড লইয়া শুধু বড়ু চণ্ডীদাসই কাব্য সূচনা করেন নাই, পরবর্তী কালে বৃন্দাবনের গোস্বামী প্রভুরাও সংস্কৃতে এই বিষয়ে কাব্য ও নাটক রচনা করিয়াছিলেন। রূপগোস্বামীর 'দানকেলিকৌমুদী'তে এই দানলীলাই বর্ণিত হইয়াছে। আধুনিক রুচির নিকট এই ধরনের দান-নৌকালীলায় একই রীতির বর্ণনা "তাল-মাত্রা-লয়হীন পদার্থ" এবং "অসহ্য ন্যাকামি"[৭০] মনে হইলেও একদা কবি ও শ্রোতৃবৃন্দ এই গ্রাম্য বর্ণনায় অতিশয় আনন্দ লাভ করিত, ভক্তও ইহাতে ভগবানের অচিন্ত্য প্রাকৃত লীলা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। যাহা হউক, এবার আমরা লৌকিক ভাবপূর্ণ আর একখানি কৃষ্ণকথা কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইব। ইহার নাম 'হরিবংশ', কবি—ভবানন্দ। অবশ্য প্রথমেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, ইহার নাম হরিবংশ হইলেও ইহাতে সংস্কৃত 'খিলহরিবংশে'র কোন প্রভাব নাই—ইহা পুরাপুরি গ্রামীণ সংস্কারের [illegible] বাহক।

৬৮-৬৯ লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' (২য়) আলোচনা করা হইয়াছে।

৭০ [illegible]কার দাশগুপ্ত সম্পাদিত পরশুরামের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'র ভূমিকা (পৃ. ৭।/০) দ্রষ্টব্য।

ভবানন্দের 'হরিবংশ' নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য হইলেও ইহার পুঁথির সংখ্যা অতি অল্প এবং তাহা অবলম্বনে 'হরিবংশ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৩৩৯ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত 'পদকল্পতরু'র বিখ্যাত সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় মোট ছয় খানি পুঁথির পাঠ অবলম্বন ও বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া হরিবংশের পাঠ সম্পাদন করেন। তৎপূর্বে ১৯২২-২৪ সালের দিকে ভবানন্দের একখানি খণ্ডিত পুঁথি পাবনা জেলা হইতে তিনি সংগ্রহ করেন। উক্ত পুঁথিখানির কিয়দংশে আবার ভবানীদাসের ভণিতাও পাওয়া গিয়াছে। মনে হয়, ভবানন্দের পুঁথির খানিকটা নষ্ট হইয়া গেলে উক্ত নামীয় কেহ নষ্ট অংশ লিখিয়া দিয়াছিলেন। পরে সতীশচন্দ্র ত্রিপুরায় অনুলিখিত ভবানন্দের হরিবংশের একখানি পুরা পুঁথি সংগ্রহ করেন, যাহাতে প্রথম পুঁথির নষ্ট অংশটুকুও ছিল। এই দুই পুঁথির পাঠ অবলম্বনে সতীশচন্দ্র ১৩২৮ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যার 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' পত্রে ভবানন্দ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৩৩২ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় "পূর্ববঙ্গের কবিশ্রেষ্ঠ ভবানন্দের হরিবংশ" শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি বিস্তারিত ভাবে এই কাব্যের স্বরূপ আলোচনা করেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে পূর্ববঙ্গের অনেকেই তাঁহাদের অঞ্চলের এই শক্তিশালী কবি সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। ঢাকা মিউজিয়মের অধ্যক্ষ ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী স্বয়ং উৎসাহিত হইয়া আরও চারিখানি পুঁথি সংগ্রহ করিলেন। নলিনীকান্ত সংগৃহীত চারিখানি পুঁথির মধ্যে একখানি ১০৯৬ বঙ্গাব্দে (১৬৮৯ খ্রীঃ অঃ) অনুলিখিত হইয়াছিল।

ছয়খানি পুঁথি হইতে কিন্তু কবি ভবানন্দের কোনও প্রকার পরিচয় উদ্ধার করা যায় নাই, বা এ কাব্য কবে রচিত হইয়াছিল তাহারও স্পষ্ট কোন নির্দেশ পাওয়া যায় নাই। দুই-এক স্থলে শুধু কবি নিজেকে 'শিবানন্দ সুত' বা 'দীন ভবানন্দ' বলিয়াছেন—ইহার অতিরিক্ত কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। সতীশচন্দ্র কবির পরিচয় ও কুলজী আবিষ্কারের জন্য এমন সমস্ত অসম্ভব অনুমানের ইঙ্গিত করিয়াছেন, যাহার কোন সার্থকতা নাই।[৭১] তাঁহার মতে, "হরিবংশের ভাষায় ও রসভাবের আলোচনা দ্বারাও কাব্যখানা

৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ভবানন্দের হরিবংশ, ভূমিকা, পৃ. ৪৬৮/০

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ও শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্তী কালে পূর্ববঙ্গের পূর্ব-ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও পশ্চিম-শ্রীহট্টে রচিত হওয়া অনুমিত হইয়াছে।"[৭২] আরও একস্থানে বলিতেছেন, "হরিবংশের কথাবস্তুর আলোচনা দ্বারাও উহা শ্রীমহাপ্রভুর কিঞ্চিৎ পরে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতির সংস্কৃত রসগ্রন্থ ও কাব্যাদি সুদূর পূর্ববঙ্গে সুপ্রচারিত হওয়ার পূর্বেই উক্ত খানা রচিত হইয়াছিল।" সতীশচন্দ্রের মতে চৈতন্যতিরোধানের পরে উত্তর-চৈতন্যযুগে—বোধহয় ষোড়শ শতাব্দীতে এই কাব্য রচিত হইয়া থাকিবে। প্রাপ্ত পুঁথিগুলির প্রাচীনতম কপিতে ১০৯৬ বঙ্গাব্দ (১৬৮৯ খ্রীঃ অঃ) পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং কবি নিশ্চয় সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বর্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমানই যুক্তিসঙ্গত। সতীশচন্দ্র স্পষ্টতঃ কবির সময় সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার অনুমান হইতে মনে হইতেছে এই কবি "শ্রীচৈতন্যের কিঞ্চিৎ পরে" (ভূমিকা, পৃ. ৪ ৸৶০) বর্তমান ছিলেন। কিঞ্চিৎ পরে, বা বেশ কিছু পরে, কি অনেক পরে—ভবানন্দের ভাষা প্রভৃতি হইতে সতীশচন্দ্র কি প্রকারে এরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন বুঝা যাইতেছে না। ১৫৩৩ খ্রীঃ অব্দে মহাপ্রভু অপ্রকট হন। 'কিঞ্চিৎ পরে'-র অর্থ ১৫৫০ খ্রীঃ অব্দের কাছাকাছি। আবার তিনি বলিতেছেন "কৃষ্ণকীর্তন ও মহাপ্রভুর পরবর্তী কালে" নাকি এই কাব্য রচিত হয়। কৃষ্ণকীর্তন বোধ হয় পঞ্চাশ শতাব্দীর শেষের দিকে রচিত হয়, এবং ষোড়শ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে মহাপ্রভু লীলা সংবরণ করেন। এখানে তিনি কেন কৃষ্ণকীর্তন কথাটি যোগ করিলেন বুঝা যাইতেছে না। কৃষ্ণকীর্তন তো মহাপ্রভুর সমসাময়িক কাব্য নহে—অন্ততঃ অর্ধশতাব্দী পূর্ববর্তী। ভবানন্দের ভাষার প্রমাণ ব্যতিরেকে প্রাচীনত্ব প্রমাণের অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যাইতেছে না। বর্ণনার স্বচ্ছতা, বিশেষতঃ বৈষ্ণব পদগুলির পরিচ্ছন্ন মার্জিত ভাষা দৃষ্টে কবিকে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী মনে করিবার কোন কারণ নাই। একথা অবশ্য ঠিক যে, ইহাতে যেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ধারাই অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু রুচির দিক হইতে না হইলেও ভাষা যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অপেক্ষা অনেক আধুনিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

---

৭২ ঐ, পৃ. ৪৸৶০। ঐ অঞ্চলে পুঁথিগুলি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া সতীশচন্দ্র এরূপ অনুমান করেন। কিন্তু সর্বপ্রথম তিনি যে পুঁথিটি পাইয়াছিলেন, তাহার প্রাপ্তিস্থান পাবনা, এবং তাহাতে পাবনার ভাষা ভঙ্গিমাই অনুসৃত হইয়াছে (ভূমিকা, পৃ. ৶০)। তাহা হইলে পাবনা জেলার অধিবাসীরাই বা কবিকে দাবি করিবেন না কেন?

ভবানন্দ "পূর্ববঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি" কিনা[৭৩] তাহাতে সন্দেহ থাকিলেও তিনি যে মৌলিক রচনায় বেশ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কবি কাব্যের প্রারম্ভে সংস্কৃত পুরাণের ধারা অনুসরণ করিয়া জনমেজয়ের হরিবংশ জিজ্ঞাসা দিয়া আরম্ভ করিয়াছেন এবং পরে সম্পূর্ণ লোক-আদর্শের বশে দীর্ঘ কাহিনীর সাহায্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা সম্পূর্ণরূপে পুরাণবহির্ভূত। শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের শৃঙ্গার রসের মিলন, গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণেব নানা রঙ্গঢামালি, ইত্যাদির বর্ণনাই হরিবংশের প্রায় সমস্ত অংশ অধিকার করিয়াছে। ভাগবতের যৎসামান্য অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন—মাত্র এই টুকু বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু দ্বারকায় গিয়া রাধাব শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ এবং শ্রীকৃষ্ণের শরীরে শ্রীমতীব লয় প্রাপ্তি—এসব অভিনব ব্যাপার ভবানন্দের নিজস্ব পরিকল্পনা।

কবি মাঝে মাঝে সংস্কৃত হবিবংশের দোহাই দিয়া লিখিয়াছেন :

সত্যবতাসুত ব্যাস নাবাযণ-অংশ।
সংক্ষেপে বচিল পুণ্য-শ্লোক হবিবংশ॥
সেই শ্লোক বাখান করিযা পাদবন্ধ।
লোকে বুঝিবাবে বোলে দীন ভবানন্দ॥

অর্থাৎ ভবানন্দ ব্যাসদেব প্রণীত হরিবংশকেই লোকের বুঝিবার জন্য বাংলা পদবন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ সেরূপ নহে। ভবানন্দেব হরিবংশের সঙ্গে সংস্কৃত হরিবংশের কিছুমাত্র যোগ নাই। কবি লোকবঞ্জনের জন্য ব্যাস-হরিবংশের দোহাই পাড়িয়া গ্রাম্য গল্পের ধারা অনুসবণে রাধাকৃষ্ণের লীলা-খেলা বর্ণনা কবিয়াছেন। কিন্তু পাঠক ও শ্রোতার চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া কবি বিচিত্র ছলনার আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার হরিবংশের সঙ্গে মূল হরিবংশের আসমান-জমিন ফারাক দেখিয়া পুরাণজ্ঞ ব্যক্তি প্রশ্ন করিতে পারেন যে, মূল হরিবংশে রাধাকৃষ্ণ ব্যাপার কিঞ্চিন্মাত্রও উল্লিখিত হয় নাই, অথচ ভবানন্দের কাব্যের সাড়ে পনের আনা রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে—ইহার কারণ কি? বুদ্ধিমান কবি তাহা পূর্বেই অনুমান করিয়া সংশয়ীদের সংশয় দূর করিবার জন্য আর একটি ছলনার আশ্রয় লইয়াছেন। 'হরিবংশের রহস্যকথন'

---

৭৩ ভূমিকা, সতীশচন্দ্র রায়।

শীর্ষক অনুচ্ছেদে তিনি বলিয়াছেন যে, জনমেজয় নাকি ব্যাসদেবকে প্রশ্ন করিলেন—হরিবংশে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হয় নাই কেন? তদুত্তরে মুনিবর ব্যাসদেব বলিলেন:

একদিন শ্রীকৃষ্ণ আমার ঘরে আসি।
কহিলেন মোর ঠাঞি মৃদু মৃদু হাসি॥
রাধার আমার প্রেম বর্ণিছ আপনে।
এহি কাথ কবিবা যেন অন্তে না বাখানে॥
একান্ত ভক্তিযে যদি শুনে কোন জনে।
তবে মোর প্রীত যদি বাখানে আপনে॥

অর্থাৎ "শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা গুহ্যাতিগুহ্য বলিয়া শ্রদ্ধাবান্ ভক্ত ব্যতীত অন্যের শ্রোতব্য নহে; এজন্য শ্রীকৃষ্ণের নিষেধে ব্যাসদেব তাঁহার হরিবংশে সেই প্রেমলীলা বর্ণিত করেন নাই।"[৭৪] সতীশচন্দ্র ভবানন্দের এই সমস্ত বালসুলভ উক্তি অম্লানবদনে বিশ্বাস করিয়া এই লোককাব্যকে "একখানা গীতিকাব্য, কথাকাব্য ও মহাকাব্যের" গৌরব দিয়াছেন।[৭৫] ভবানন্দ "দীক্ষিত বৈষ্ণব"[৭৬] হউন আর নাই হউন, তিনি যে লোকপ্রচলিত রাধাকৃষ্ণের আদিরসাত্মক লীলাকে সংস্কৃত হরিবংশের নামে চালাইয়া লোকায়ত কাহিনীকে জাতে তুলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবিষয়ে উক্ত কাব্যের সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কবিকে অনৃতাচারের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কবির পক্ষ লইয়া বলিয়াছেন, "তিনি (ভবানন্দ) কেবল শাস্ত্রবিশ্বাসী ছিলেন না, লৌকিক হিন্দুধর্মের বিশেষতঃ বৈষ্ণবধর্মের প্রচলিত কিংবদন্তীও তিনি পুরাণাদির মতই বিশ্বাস করিতেন; তাই সংস্কৃত হরিবংশের শূন্য ভিত্তির উপর নিজের ব্রজলীলার বিশাল সৌধের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াও একটু ভীত বা সন্দিহান হন নাই এবং সংক্ষিপ্ত হরিবংশের 'বাখান' নাম দিয়াই নিজের গ্রন্থখানা চালাইয়া দিয়াছেন।"[৭৭] সতীশচন্দ্র যাহাই বলুন, ভবানন্দ সংস্কৃত হরিবংশের দোহাই দিয়া এবং চাতুর্যের আশ্রয় লইয়া রাধাকৃষ্ণের গ্রাম্যলীলাকে শিষ্টতার গৌরব

---

৭৪ ভবানন্দের হরিবংশের (ঢা. বিশ্ব.) ভূমিকা, পৃ. ৫৲

৭৫ ঐ, পৃ ৫/০

৭৬ ঐ

৭৭ ঐ

দিতে চাহিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি কোনও প্রকার পুরাণের 'রেফারেন্স' না টানিয়া নিজ জ্ঞানবুদ্ধিকেই কাব্যটির রস নিষ্পত্তির জন্য দায়ী করিয়াছেন। সতীশচন্দ্রেরও প্রকাশ্যেই ঘোষণা করা উচিত ছিল যে, ভবানন্দের হরিবংশ একখানি পুরাপুরি লৌকিক কাব্য, ইহার সঙ্গে সংস্কৃত হরিবংশের কোন সম্পর্ক নাই। কবি ছল-চাতুরীর সাহায্যে ইহাকে মূল সংস্কৃত হরিবংশের সঙ্গে জড়াইতে চাহিলেও তাঁহার কৌশল যে-কোন পুরাণ পাঠকের নিকট হাস্যকর ভাবে ধরা পড়িয়া যাইবে।

এই প্রসঙ্গ বাদ দিলে ভবানন্দের কাহিনী বয়নের শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। মনে হয়, এই আখ্যানে যেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গাঢ় ছায়া পড়িয়াছে —অবশ্য রাধাকৃষ্ণের আদিরসের লীলা ইহাতে আরও অনাবৃত ভাবে অনুসৃত হইয়াছে, যেজন্য ডঃ সুকুমার সেন বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, "ভবানন্দ সাধারণ পাঠককে খুশি করিবার জন্য কৃষ্ণের ব্রজলীলার মধ্যে প্রেমলীলাকেই প্রদর্শন করিয়াছেন। অত্যন্ত সাধারণ পাঠকের জন্য লেখা তাই প্রেমলীলার মধ্যে কামভাবের সম্পূর্ণ অধিকার।" আর একস্থলে ডঃ সেনের মন্তব্য কঠোর হইলেও সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত—"কাব্যটি অত্যন্ত আদিরসাল (erotic) এবং স্থানে স্থানে কামসূত্রের উদাহরণের মতো।"[৭৮] যে ভাবে রাধিকা কৃষ্ণের সঙ্গে কৃষ্ণের মাসী মহোদার (রাধার অবিবাহিতা ননদিনী) সম্ভোগ ঘটাইয়াছেন এবং প্রিয়সখী শ্রীমতীর সঙ্গে কৃষ্ণকে ভাগাভাগি করিয়া ভোগ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, ভবানন্দের রুচি প্রায় বর্বরতার ধার ঘেঁষিয়া গিয়াছে। বস্ত্রহরণ, বাঁশিচুরি, রাস প্রভৃতি বাঁধা গতের বর্ণনায় কিছু বৈচিত্র্য আছে বটে, কিন্তু কামোত্তপ্ত বর্ণনায় কবি অধিকতর আনন্দ বোধ করিতেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিছু পৌরাণিক কাহিনী এবং অবশিষ্টাংশে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ গ্রামীণ গোষ্ঠ গাথার ধারা অনুসরণ করিয়া ভবানন্দ কৃষ্ণের ব্রজলীলা বিষয়ক এই যে সুদীর্ঘকাহিনী লিখিয়াছেন, তাহাকে সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায়মহাশয় উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, "ভাষার লালিত্যে ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কোন বাঙ্গালী কবিই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই।"[৭৯] এমন কি

৭৮ ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ইতি. (১ম অপরার্ধ)

৭৯ হরিবংশের ভূমিকা, পৃ. ২৸/০

ভবানন্দের রচনা নাকি জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।[৮০] এইরূপ অতিপ্রশংসা যুক্তিহীন পক্ষসমর্থনের মতো শুনাইলেও ভবানন্দের ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার সম্বন্ধে বেশ নিপুণ অভিজ্ঞতা ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। উপরন্তু কামশাস্ত্রের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধেও তিনি বেশ নাগরকসুলভ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহা মহোদার বৃত্তান্তেই প্রকাশ পাইয়াছে। রাধার আক্ষেপানুরাগের এই উক্তিটি যদিও সুপরিচিত বৈষ্ণবপদাবলীর অনুকরণ, তবু কবির গীতিরসসিক্ত রচনাকৌশল হিসাবে উল্লেখযোগ্য :

কি বোলিমু আরে নাথ—কি বোলিমু আর।
পরিণাম ভাবিতে না ছাড়ি লোকাচার ॥ (ধ্রু)
নিশাস ছাড়িতে অবসর নাহি ঘরে।
সুখে তোমা সম্ভাষি শাশুড়ি যদি মরে ॥
* * *
ঘর কৈলু বাহির—বাহির কৈলু ঘর।
পর কৈলু আপন—আপন কৈলু পর ॥
রাত্তি কৈলু দিবস—দিবস কৈলু রাতি।
অন্তরে ভাঙ্গিব জানি যোগের পিরিতি ॥

কবি একাব্যে অনেকগুলি সুললিত বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়াছেন, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিদের অনুকরণ বলিয়া মনে হইতেছে। এই উদাহরণটুকুতে বেশ মুন্সিয়ানার পরিচয় আছে :

আরে সোনার বন্ধু কি বোলিমু তোরে।
প্রেম বারাইয়া বনে দোষ পাইয়া
তে কেনে ছাড়িলা মোরে ॥ (ধ্রু)
সহজে অভাগী মিছা ভাব লাগি
দুখানি কুল খাইলু।
প্রেমেতে ভাসিয়া জাতি কুল দিয়া
ভাবিতে ভাবিতে মৈলু ॥
কুলশীল জাতি তেজি নিজ পতি
না দেখিলে প্রাণ ফাটে।
যেন শঙ্খকারে করাতের ধারে
আসিতে যাইতে কাটে ॥

কবি পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদাবলীর রচনারীতি অনুকরণে বেশ পটু ছিলেন

তাহা বুঝা যাইতেছে। দুই একটি নাম নির্বাচনে কবি মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন—যেমন রাধার আর এক নাম তিলোত্তমা, রাধার ননদিনীর মহোদা নামটিও নূতন। কাহিনীর মধ্যে যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাইতেছে, তাহাতে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কিত গ্রাম্য গীতিধারার সুস্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পূর্ব হইতে বাঙলাদেশে যে আদিরসাত্মক কৃষ্ণলীলা লোক-চিত্তকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহার জড় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেরও পূর্বযুগে নিহিত, দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতি কৃষ্ণলীলায় যাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, কবি ভবানন্দ সেই আদর্শকেই 'হরিবংশ' আখ্যান কাব্যে পুরাণের ছিটেফোঁটা ছোঁয়াইয়া গ্রহণ করিয়াছেন। উক্তকাব্যের সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় কাব্যটি সম্বন্ধে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাক্যের নির্ঝর বহাইয়া দিয়াছেন, তাহার অনেকটাই মুগ্ধ-বিবশ চিত্তের অতিশয়োক্তি বলিয়া পরিহর্তব্য। কিন্তু ভবানন্দ আলঙ্কারিক কৌশল, স্বচ্ছন্দ ছন্দ প্রবাহ ও চরিত্র-সৃষ্টিতে (বিশেষতঃ রাধা ও কৃষ্ণচরিত্র) যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতে হইবে—রুচির কথা না হয় নাই তুলিলাম।

৩

বিবিধ অনুবাদাশ্রয়ী বৈষ্ণব সাহিত্য

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি ভাগবতের কয়েক স্কন্ধের কাহিনী অবলম্বনে কয়েকখানি বাংলা কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীতে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কথঞ্চিৎ জন-প্রিয়তা লাভ করিয়াছিল এবং লোকচিত্তরঞ্জক গ্রামীণ কৃষ্ণলীলাবিষয়ক অপৌরাণিক কাহিনীও,কিঞ্চিৎ স্থূল রস সত্ত্বেও,বেশ প্রচার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ভাগবত প্রভৃতি পুরাণাদি ছাড়াও এই শতাব্দীতে আরও কিছু অনুরূপ গ্রন্থের বাংলা রূপান্তর, সাধারণ সমাজে না হইলেও, অন্ততঃ বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত ছিল।

চৈতন্যদেবের পরে বৃন্দাবনের গোস্বামী সম্প্রদায় সংস্কৃত ভাষায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ভক্তিশাস্ত্র ও স্মৃতির যে সুদৃঢ় বনিয়াদ নির্মাণ করিলেন, বাঙলা-

দেশের ভক্ত কবিগণ চৈতন্যমার্গ অনুসরণ করিয়া রাধাকৃষ্ণ এবং স্বয়ং গৌরচন্দ্রের ভাগবতী কথাকে কেন্দ্র করিয়া যে বিশাল পদাবলী সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন, তাহার প্রভাবে, শুধু বৈষ্ণব সমাজ নহে, পঞ্চোপাসক সাধারণ বাঙালী সমাজেও বৈষ্ণবীয় মনন ও দর্শনের ধারা প্রবেশ করিয়াছিল। ফলে বৈষ্ণব মনোভাবব্যঞ্জক সংস্কৃত গ্রন্থাদিও পয়ার-ত্রিপদীতে প্রচুর পরিমাণে অনূদিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ তত্ত্বাদর্শ ও স্মৃতি-সংহিতার জন্য বৃন্দাবনের গোস্বামী সম্প্রদায়ের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত। সনাতন-রূপ-জীব-গোপালভট্ট-রঘুনাথ দাস প্রভৃতি আচার্যদের সংস্কৃতে রচিত ভাগবত ব্যাখ্যা, নাটক, কাব্য ও অলঙ্কারতত্ত্ব এবং বৈষ্ণবস্মৃতি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচুর পরিমাণে বাংলা পয়ার-ত্রিপদীতে অনূদিত হইয়াছে। খুব সম্ভব সাধারণ অ-সংস্কৃতজ্ঞ বৈষ্ণবসমাজে বৃন্দাবন-নিঃসৃত বৈষ্ণবদর্শন ও তত্ত্বকথাকে সহজ ও সুলভে প্রচার করিবার জন্যই গোস্বামীদের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাদি ভাষায় অনুবাদ করার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। বৈষ্ণব সমাজ ও আদর্শের আকরগ্রন্থ ভাগবতের অনুবাদের কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও বিল্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' বাঙলার বৈষ্ণব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। অবশ্য গীতগোবিন্দ লীলাগীতি বৈষ্ণবসমাজের সর্বত্র এরূপ প্রচলিত হইয়াছিল যে, ইহা এক প্রকার ঘরের সামগ্রী হইয়া গিয়াছিল। তাই ইহার অনুবাদ সংখ্যা সুপ্রচুর নহে। বিল্বমঙ্গলের নামে প্রচারিত 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' ক্ষুদ্র কাব্যখানি চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য হইতে বাঙলাদেশে আনয়ন করেন—যাহাতে বৈষ্ণব প্রেমভক্তিরসের ধারাটি চমৎকারভাবে বিকশিত হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার পূর্বেও এই কাব্যটি বাঙলাদেশে একেবারে অপরিচিত ছিল না, দ্বাদশ শতাব্দীর 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' ইহা হইতে শ্লোক গৃহীত হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহার একখানি সংস্কৃত টীকা রচনা করেন—'সারঙ্গরঙ্গদা'। যদুনন্দন দাস কৃষ্ণকর্ণামৃত ও 'সারঙ্গরঙ্গদা'—উভয়েরই কবিতায় অনুবাদ করেন। ইহার নামও 'কৃষ্ণ-কর্ণামৃত'। বৈষ্ণব সংস্কৃত গ্রন্থের কবিতায় অনুবাদে কবি যদুনন্দনের বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। তিনি রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের বাংলা অনুবাদ করিয়া নাম দেন 'রসকদম্ব'। রূপের 'দানকেলিকৌমুদী'র যে অনুবাদ করেন তাহার নাম 'দানলীলাচন্দ্রামৃত'। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দ-

লীলামৃত' কাব্যের অনুবাদও ('গোবিন্দবিলাস') তাঁহার কৃত। যদুনন্দন এই সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থের সুললিত বাংলা পয়ার-ত্রিপদীতে অনুবাদ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের প্রভূত উপকার করেন। পরবর্তী কালে তাঁহার এই অনুবাদগুলি বিশেষ প্রচারলাভ করিয়াছিল।[৮১]

মহাপ্রভুর পরিকর উড়িষ্যার রায় রামানন্দের 'জগন্নাথবল্লভ' শীর্ষক সংস্কৃত নাটক চৈতন্যদেবের প্রীতিলাভ করিয়াছিল। পরবর্তী কালে বাঙলাদেশে ইহার একাধিক অনুবাদ হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর লোচনানন্দ দাস এবং সপ্তদশ শতাব্দীর অকিঞ্চনদাস এই নাটকের ভাবানুবাদ করেন। তন্মধ্যে লোচন নাটকে উল্লিখিত গানগুলির শুধু অনুবাদ করিয়াছিলেন—মূল নাটকের অনুবাদ নহে।

ভাগবতে দশটি শ্লোকে (১০।৪৭ অধ্যায়) বিরহিণী গোপীরা কৃষ্ণের নিকট একটি ভ্রমরকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছিল। ইহা 'ভ্রমরগীতা' নামে পরিচিত। এই কয়টি শ্লোক অবলম্বনে যদুনন্দন দাসের 'ভ্রমরগীতা' রচিত হয়। আরও কয়েকজন 'ভ্রমরগীতা' অনুবাদে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রূপের কাব্যনাট্যাদির অনুবাদের সংখ্যাই অধিক। তাঁহার 'উদ্ধবসন্দেশ', 'হংসদূত' প্রভৃতিও বাঙলা ছন্দে অনূদিত হইয়াছিল এবং বৈষ্ণবসমাজে বেশ প্রচারলাভ করিয়াছিল। অবশ্য সর্বাগ্রে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'ই যাবতীয় সংস্কৃত বৈষ্ণবগ্রন্থের সার সংগৃহীত হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী প্রাচীন ও তৎসমসাময়িক যাবতীয় ভক্তিশাস্ত্র মন্থন করিয়া এই মহাগ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে বহু সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার সুললিত অনুবাদ দিয়া কবি সংস্কৃত ভক্তিগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ অংশগুলিকে স্বল্পশিক্ষিত বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত করিয়াছিলেন।

এই শতাব্দীতে সংস্কৃত মহাকাব্য, অন্যান্য কাব্যনিবন্ধ ও তন্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ বাংলা সাহিত্যের সীমা যে অনেক দূর সম্প্রসারিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের গভীরতর পরিচয়ের ফলে বাঙালী-মানসের উৎকর্ষ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

---

৮১ পরবর্তী অধ্যায়ে পদকর্তা ও কর্ণানন্দের অনুবাদক যদুনন্দন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে উত্তরাপথের সংস্কৃত-ভাষাবাহী আর্যসংস্কারের টানাপোড়েনের বয়নে বাঙালী সংস্কৃতির বিচিত্ররূপ ঐতিহাসিকের বিস্ময়ের বিষয়। সপ্তদশ শতাব্দীর অনুবাদ-সাহিত্যে, উৎকৃষ্ট প্রতিভার আবির্ভাব না হইলেও, ইহার দ্বারা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিভূমি যে দৃঢ়তর হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

বৈষ্ণব সাহিত্য

ভূমিকা ॥

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া বাঙলাদেশে বৈষ্ণব সাহিত্যের নানা শাখা-প্রশাখা যে বিচিত্র বিকাশধারা অনুসরণ করিয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিত ও স্বরূপ সন্ধানের জন্য তদানীন্তন বৈষ্ণবসমাজ ও সম্প্রদায়ের কিছু কিছু পরিচয় লওয়া প্রয়োজন। কারণ বাঙলাদেশের বৈষ্ণবসাহিত্য ও দর্শন একটা বিশেষ সম্প্রদায়গত আচার, আচরণ, কৃত্য এবং আধিমানসিক গঠন-প্রকৃতির উপর এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, ধর্ম-সমাজ-সম্প্রদায়নিরপেক্ষ বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা একপার্শ্বিক—কখনও-বা অসঙ্গত ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে। মধ্যযুগীয় অন্ত্যপর্বের অন্তর্গত বৈষ্ণব পদসাহিত্য, মোহান্ত জীবনী, তত্ত্বকথা প্রভৃতির মধ্যে প্রেম-প্রীতি-করুণা-বেদনা নিষিক্ত মানব-চিত্তের অযুত কান্তি ফুটিয়া উঠিলেও একটি বিশেষ ধরনের দেবতত্ত্ববাদ ইহার মূল নিয়ামক শক্তি বলিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় গ্রহণ প্রয়োজন।

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গৌড়-বঙ্গের বৈষ্ণবসমাজ নেতৃত্বের অভাবে দিগ্‌ভ্রান্ত, বিমূঢ় ও বিষণ্ন হইয়া পড়িয়াছিল—তাহার কারণ চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্যের তিরোধান। যাঁহাদের পূত পবিত্র জীবন-কথাকে কেন্দ্র করিয়া বাঙলায় একটি বিরাট ধর্মসম্প্রদায় নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সংহতি ও শক্তি অর্জনে উন্মুখ হইয়াছিল, এই নেতৃত্রয়ের তিরোধানে এই নব্য সম্প্রদায় যে, ক্ষণকালের জন্য বেদনায় স্তব্ধ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তারপর, মরা নদীতে যেমন বান ডাকে, তেমনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন জীবনোচ্ছ্বাস, ভাবাবেগ ও নব আদর্শ প্রবল বেগে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর, শ্যামানন্দ, বীরভদ্র (বীরচন্দ্র) জাহ্নবাদেবী, শ্রীখণ্ডসম্প্রদায়, শান্তিপুরগোষ্ঠী প্রভৃতি বৈষ্ণব নেতা ও

সম্প্রদায়ের প্রভাব ও সক্রিয় প্রচারকার্যের ফলে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় মূর্চ্ছাতুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় আবার চৈতন্য লাভ করিল। ইহাদের সংহতিশক্তি ফিরিয়া আসিল, ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। সমাজের অভিজাত, বণিক ও সামন্তশ্রেণীর মধ্যে বিস্ময়কর প্রভাবের ফলে গৌড়বঙ্গে এবং এদেশের পূর্ব ও পশ্চিম প্রত্যন্তসীমায় চৈতন্যধর্ম শুধু দৃঢ় মূল হইল না, সহস্র শাখা বিস্তারে জনমানসকে আশ্রয় দিল। বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায়ের এই প্রভাব যেমন অবৈষ্ণব সমাজে প্রবল শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল, তেমনি বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশাল বনস্পতির শাখায় শাখায় কত যে নামগোত্রহীন বিহঙ্গের কূজন আরম্ভ হইয়া গেল, তাহার হিসাব নিকাশ নাই। বস্তুতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতেই বাঙলার বৈষ্ণবসাহিত্য অসাধারণ শক্তি ও ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল। গুণগত উৎকর্ষের কথা ছাড়িয়া দিলে সংখ্যাধিক্যের দিক দিয়া এই যুগে বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রসার যে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

ইহাতে কোন দ্বিমত নাই যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সমগ্র সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শক্তি এবং বৈষ্ণব কবির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু সাহিত্যের উৎকর্ষ ও নিষ্ঠার ঐকান্তিকতা বিচার করিলে সপ্তদশ শতাব্দীর স্ফীতকায় বৈষ্ণব সাহিত্যের অনেকটাই শূন্যগর্ভ মনে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন্ দিকে?" ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কেও ইহার পুনরাবৃত্তি করা যাইতে পারে। যাঁহাদের তিরোধানে সমগ্র দেশ মধ্যে যে হতাশা সৃষ্টি হইল, পরবর্তী কালের আচার্যদের চেষ্টায় তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইতে পারিয়াছে কি?

অবশ্য বঁধু গেলেও তখনও বৃন্দাবন যায় নাই। গোপালভট্ট, লোকনাথ গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং সর্বোপরি শ্রীজীবগোস্বামী তখনও জীবিত ছিলেন। লোকনাথ গোস্বামী ও গোপালভট্টের নিকট নরোত্তম-শ্যামানন্দ বৈষ্ণব শাস্ত্রসংহিতা শিক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসের শিক্ষা-দীক্ষার মূলে ছিল জীবগোস্বামীর প্রেরণা। বৃন্দাবনের রূপ-সনাতন-জীবের অধ্যাত্ম চিন্তা ও মননে নিষ্ণাত হইয়া এই তিনজন আচার্য এদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং উক্ত

গোস্বামী ত্রয়ের গ্রন্থে বর্ণিত মূল তথ্যগুলিকে তাঁহারা সমাজের মধ্যে প্রচার করিয়া আবেগমুখর ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে সুদৃঢ় মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। রূপ-সনাতন-গোপালভট্ট ও জীবগোস্বামীর গ্রন্থ হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ আদর্শ ও তত্ত্বকথা গ্রহণ করিয়াছিল। জীবগোস্বামী সপ্তদশ শতাব্দীতেও গৌড়ের বৈষ্ণব সমাজের সঙ্গে রীতিমতো সংযোগ রক্ষা করিতেন, উদ্বুদ্ধ করিতেন, সুপথে পরিচালিত করিতেন। রামচন্দ্র কবিরাজ (গোবিন্দদাস কবিরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা), শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সঙ্গে লিখিত পত্র ব্যবহার করিয়া এবং বৃন্দাবনের আচার্য গোস্বামীদের গ্রন্থাদি বাঙলায় পাঠাইয়া দিয়া শ্রীজীবগোস্বামী বৃন্দাবন ও গৌড়ের যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার এইরূপ সক্রিয় নির্দেশ, উপদেশ ও সহযোগিতা না পাইলে সপ্তদশ শতাব্দীতে গৌড়ের বৈষ্ণবসমাজ এতটা প্রসারলাভ করিতে পারিত না। পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে মৌলিক প্রতিভার বিশেষ সংস্পর্শ বা প্রভাব না থাকিলেও বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি ও অবৈষ্ণবসমাজে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার তৎকালীন বাঙলার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের যে একটা বিস্ময়কর ও সামাজিক অবদান, তাহা বিশেষভাবে স্বীকার করিতে হইবে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন আচার্যের প্রভাবে গৌড়ে যে সমস্ত বৈষ্ণব-কেন্দ্র স্থাপিত ও পরিচালিত হইয়াছিল তাহার দ্বারাই বৈষ্ণব মতাদর্শ ও চৈতন্যতত্ত্ব সমাজে এত দ্রুতবেগে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এবং প্রত্যেকটি বৈষ্ণবকেন্দ্রের মূলে ছিল এক-একজন অক্লান্তকর্মা আচার্যের আত্মদান। প্রথমে আমরা কয়েকজন আচার্য ও কয়েকটি কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইয়া এই যুগের বৈষ্ণবধর্ম ও সম্প্রদায়ের স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিব। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে গোটা সপ্তদশ শতাব্দী ধরিয়া যাঁহারা বিভিন্ন কেন্দ্র, সম্প্রদায় ও পরিকরের দ্বারা গৌড়বঙ্গে বৈষ্ণবমতের প্রচারে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্য (বনবিষ্ণুপুর), বীরচন্দ্র-জাহ্নবাদেবী (খড়দহ), অদ্বৈতপুত্র অচ্যুতানন্দ (শান্তিপুর), নরহরি-রঘুনন্দন (শ্রীখণ্ড) এবং উত্তরবঙ্গের নরোত্তম ঠাকুরের (খেতুরী) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্যামানন্দ উৎকলে অনুরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনায় চৈতন্যধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন—পরবর্তী কালে উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্যের কারণ শ্যামানন্দের কৃতিত্ব।

১

আচার্য, কেন্দ্র ও সম্প্রদায়

সপ্তদশ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিতে হইলে তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজ, সম্প্রদায় ও আচার্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ কর্তব্য, তাহা আমরা ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করিয়াছি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া বিভিন্ন আচার্য ও আচার্য-প্রভাবিত বৈষ্ণবকেন্দ্র-সমূহ শুধু বৈষ্ণবসমাজ ও জনচিত্তেই প্রভাব বিস্তার করে নাই, এই দেড়শত বৎসরের বৈষ্ণব সাহিত্যের বিকাশের মূলেও তাঁহাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রহিয়াছে। শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও উৎকলে বৈষ্ণবমতবাদ কিরূপ প্রচার লাভ করিয়াছিল তাহার নানা কাহিনী 'প্রেমবিলাস', 'ভক্তিরত্নাকর', 'নরোত্তম বিলাস' ও 'কর্ণানন্দে' বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বৃন্দাবনের গোস্বামী-সম্প্রদায়ের সতর্ক নির্দেশে এই তিনজনের শিক্ষাদীক্ষা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। ইঁহারা আচার্যদের (লোকনাথ গোস্বামী, গোপালভট্ট, জীবগোস্বামী) সাক্ষাৎ উপদেশ এবং রূপ-সনাতন-জীবের সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া এদেশে প্রত্যাবর্তনের পর সেই আদর্শ প্রচারকার্যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, শিষ্য ও পরিকর সম্প্রদায়কেও সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ত্রি-গোস্বামীর প্রভাবের সময় গৌড়ে আরও কয়েকজন আচার্য ও উপসম্প্রদায়ের প্রাধান্য লক্ষণীয়। খড়দহে নিত্যানন্দের কনিষ্ঠা পত্নী জাহ্নবাদেবী এবং নিত্যানন্দের খ্যাতনামা পুত্র বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র (নিত্যানন্দের জ্যেষ্ঠা পত্নী বসুধার গর্ভজাত) স্থানীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। অবশ্য তখন অদ্বৈত আচার্যের তিরোধানের পরে শান্তিপুরগোষ্ঠী কিঞ্চিৎ হতাশ হইয়া পড়িলেও আচার্যের জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুতানন্দের চারিদিকেও একটি ক্ষুদ্রতর বৈষ্ণবগোষ্ঠী সমবেত হইয়াছিল।

প্রসঙ্গ ক্রমে কাটোয়ার নিকটবর্তী শ্রীখণ্ড বৈষ্ণবসম্প্রদায়েরও নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। নাগরীভাব সাধনার [১] কেন্দ্র শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকারঠাকুর ও রঘুনন্দন এবং তাঁহাদের শাখাভুক্ত সাম্প্রদায়িকগণ চৈতন্য-

১ লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের' (২য়) ২৮৮-২৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দেবকে আদিরসের পটভূমিকায় রাখিয়া যে অভিনব নাগরীভাবের সাধনার প্রচলন করিয়াছিলেন তাহার প্রভাবও কিছু অল্প ছিল না। বস্তুতঃ সপ্তদশ শতাব্দী হইতে যে সহজিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের উত্থান হইয়াছিল, তাহার মূলে নিত্যানন্দ ও বীরচন্দ্রের প্রভাব থাকিলেও শ্রীখণ্ডসম্প্রদায়ের আদিরসাত্মক ভাব-ভাবনা এই ধরনের বৈষ্ণব সহজিয়াদের উৎসাহ জোগাইয়াছিল। যাহা হউক, বর্তমান প্রসঙ্গে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপর বৈষ্ণব নেতৃবৃন্দের প্রভাব সম্পর্কে প্রধানতঃ পাঁচটি উপচ্ছেদে আলোচনা করা যাইতেছে:— (ক) শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ; (খ) বীরচন্দ্র ও তাঁহার বিমাতা জাহ্নবাদেবী; (গ) শান্তিপুরের অদ্বৈতপুত্র অচ্যুতানন্দ; (ঘ) নরহরি সরকার ঠাকুর ও রঘুনন্দন প্রভাবিত শ্রীখণ্ডসম্প্রদায়, (চ) সহজিয়া সম্প্রদায়।

শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ ॥

এই তিনজন আচার্য তিন স্থানে আবির্ভূত হইলেও ইঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছিল বৃন্দাবনে গোস্বামীদের সাক্ষাৎ প্রভাবে। উপরন্তু পরবর্তী কালে তাঁহাদের মধ্যে একটা নিবিড় প্রীতিঘন বন্ধুত্বও গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং তাঁহাদের প্রভাবে বাঙলার হীনবল বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল—তাঁহারাই পরবর্তী কালে নূতন বৈষ্ণব কেন্দ্রের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তঁহাদের আবির্ভাবের পূর্বে নবদ্বীপ, খড়দহ ও শান্তিপুর গৌড়ের প্রধান বৈষ্ণবকেন্দ্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ ত্যাগের পর বিশেষতঃ তিরোধানের পর নবদ্বীপ কেন্দ্র ক্রমে ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। অবশ্য জাহ্নবাদেবীর মতো বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী প্রকাশ্যে গোস্বামিনী হইয়া বার দিয়া বসিতে পারিলে নবদ্বীপের কেন্দ্র চৈতন্য-তিরোধানের পরেও প্রাধান্য অব্যাহত রাখিতে পারিত। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া লোকসংঘট্ট বর্জন করিয়া সেই যে অন্তঃপুরবাসিনী হইলেন, আর কখনও প্রকাশ্যে বৈষ্ণব-সমাজে বাহির হন নাই।[২] অদ্বৈতের মৃত্যুর পর শান্তিপুরও কিছুকাল হীন-

---

২ চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী স্বেচ্ছায় লোকচক্ষুর অগোচরে বাস করিয়াছিলেন—তিনি কীভাবে নবদ্বীপে শ্বশুরের ভিটায় বাস করিতেন, 'অনুরাগবল্লী'তে মনোহরদাস তাহার বিচিত্র বর্ণনা দিয়াছেন:

প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। পরে অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুতানন্দের নেতৃত্বে আবার ইহা বৈষ্ণব শাখাসম্প্রদায়ের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। খড়দহপাট নিত্যানন্দের লীলাস্থল, এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া এই গ্রাম ভাগীরথীর চতুস্পার্শ্বের বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রধান মিলনস্থান হইয়াছিল। তাঁহার তিরোধানের পর কনিষ্ঠা পত্নী জাহ্নবাদেবী ও পুত্র বীরচন্দ্রের নেতৃত্বে খড়দহ কেন্দ্রের প্রাধান্য বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শ্রীখণ্ডকেন্দ্র চৈতন্যের জীবিতকালেই বিশেষ মতাশ্রয়ী বৈষ্ণব ভক্তদের আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ—বিশেষতঃ প্রথম দুইজনের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গে বনবিষ্ণুপুরে (আধুনিক বিষ্ণুপুর) এবং উত্তরবঙ্গে খেতুরীতে (রাজশাহী জেলা) যে দুইটি বৈষ্ণবকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা হইতেই বৃন্দাবনী আদর্শ ও মতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল এবং এই আদর্শ গৌড়বঙ্গের নৈষ্ঠিক ভক্তদের আচার-আচরণের একমাত্র নিয়ামক হইয়াছিল। বস্তুতঃ এই দুইটি নূতন বৈষ্ণবকেন্দ্র এবং আচার্যদের প্রভাব সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর সমগ্র বৈষ্ণব সমাজে দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। শ্যামানন্দ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের ইচ্ছাক্রমে উৎকলে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া বৃন্দাবনের আদর্শ অনুযায়ী ঐ অঞ্চলে বৈষ্ণব মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য ॥ 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'প্রেমবিলাসে' শ্রীনিবাসের জীবন ও নীতিকথা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু একের বর্ণনার সঙ্গে অপরের বর্ণনার অনেক পার্থক্য আছে। 'প্রেমবিলাসে'র রচয়িতা নিত্যানন্দদাস শ্রীনিবাসের সমসাময়িক ছিলেন, আচার্যের সাযুজ্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কোন কোন সমালোচক পরবর্তীকালে রচিত 'ভক্তিরত্নাকর' (নরহরি চক্রবর্তী) অপেক্ষা 'প্রেমবিলাসে'র বর্ণনাকে অধিকতর প্রামাণিক মনে করিয়া থাকেন।

প্রভু অপ্রকটে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী।
বিরহসমুদ্রে ভাসে দিবস রজনী॥
বাড়ীর বাহির দ্বার মুদ্রিত করিয়া।
ভিতরে রহিলা দাসী জন কথো লঞা॥
দুই দিগে দুই মই ভিতে লাগা আছে।
তাহে চড়ি দাসী আইসে যায় আগে পাছে॥

কোন পুরুষ বাড়ীর ভিতরে যাইতে পারিত না। শুধু মহাপ্রভুর পরম ভক্ত দামোদর পণ্ডিত গঙ্গা জল বহিয়া দিবার জন্য ভিতরে যাইতেন।

কাটোয়ার ৬-৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ভাগীরথী তীরে অবস্থিত চাখন্দী গ্রামে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য নামক এক চৈতন্যভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার চৈতন্যভক্তির জন্য তিনি সমাজে চৈতন্যদাস নামেই অধিকতর পরিচিত হইয়াছিলেন। অপুত্রক চৈতন্যদাসকে নাকি মহাপ্রভু পুত্রবর দিয়াছিলেন এবং তাহার ফলেই চৈতন্যদেবের তিরোধানের বেশ কিছু পরে চৈতন্যদাসের গৃহে শ্রীনিবাসের জন্ম হয়। এ বিষয়ে 'প্রেমবিলাস' ও 'ভক্তিরত্নাকরে' নানা বর্ণনা আছে। 'ভক্তিরত্নাকরে'র মতে স্বয়ং জগন্নাথ চৈতন্যদাসকে স্বপ্নে পুত্র বর দিয়াছিলেন। 'প্রেমবিলাসে'র বর্ণনা হইতে মনে হয়, নীলাচলে মহাপ্রভু যখন সংবাদ পাইলেন যে, অদ্বৈতপ্রভুর পুনরায় জ্ঞানবাদ প্রচারে গৌড়ে ভক্তি-ধর্মের গতি রুদ্ধ হইতে চলিয়াছে, তখন তিনি চিন্তিত হইলেন। এ দিকে জগন্নাথদেব তাঁহাকে স্বপ্ন দিলেন যে, চিন্তার কোন কারণ নাই, চৈতন্যদাসকে তিনি পুত্রবর দিয়াছেন, চৈতন্যদেব তাঁহার প্রেম (প্রভাব) চৈতন্যদাসের পুত্রে সমর্পণ করুন—চৈতন্যদাসের নবজাত পুত্রই চৈতন্যের প্রেমধর্মকে গৌড়ে অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। তখন চৈতন্যদেব স্বপ্নে চৈতন্যদাসের পত্নীকে জানাইলেন যে, তাঁহার গর্ভে শ্রীনিবাস নামক যে পুত্রের জন্ম হইবে, তাহার দ্বারাই ভক্তিধর্ম সুপ্রচারিত হইবে।

শ্রীনিবাসের জন্মের সময় খুব সম্ভব চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত কেহই জীবিত ছিলেন না। তাঁহার জন্মের পূর্বেই যে চৈতন্যদেব লীলা সংবরণ করিয়াছিলেন তাহা প্রেমবিলাসেই পাওয়া যাইতেছে :

> ভক্তগণ সহিত না শুনিল সঙ্কীর্তন।
> হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখন॥ (প্রেমবিলাস, ৪র্থ)

অর্থাৎ ভক্তগণের সঙ্গে চৈতন্যদেব যখন লীলাসঙ্কীর্তন করিতেন, তখন শ্রীনিবাসের জন্ম হয় নাই। কিন্তু মনোহর দাসের 'অনুরাগবল্লী'র দ্বিতীয় মঞ্জরীতে দেখা যাইতেছে, শ্রীনিবাস কৈশোরকালে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য পুরীধামে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার অপ্রকট হইবার বার্তা পাইলেন :

> পথে যাইতে শুনি মহাপ্রভুর অন্তর্ধান।
> মুর্চ্ছিত পড়িল ভূমে গড়াগড়ি যান॥"

বাঙলায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি শুনিলেন যে, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত দুই জনেই লীলা সংবরণ করিয়াছেন :

তাঁহারা কহিল এই অতি সুনিকট।
শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত দুই প্রভু অপ্রকট।

যাহা হউক, 'অনুরাগবল্লী' অপেক্ষা 'প্রেমবিলাস'কেই ঐতিহাসিকগণ অধিকতর মান্য করিয়া থাকেন।

চৈতন্য-ভক্ত পিতার নিকট চৈতন্যপ্রবর্তিত ভক্তিধর্মে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি নরহরি সরকারের নির্দেশে বৃন্দাবন গিয়া রূপসনাতনের নিকট শিক্ষালাভের জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু তাহার পূর্বে তিনি পুরীধামে বৃদ্ধ গদাধরের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহার নিকট ভাগবত অধ্যয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গদাধর ভাগবতের উৎকৃষ্ট পাণ্ডুলিপির জন্য তাঁহাকে গৌড়ে পাঠাইয়া দেন। এইরূপে যাতায়াত করিতে করিতে তিনি শুনিলেন, গদাধরও দেহরক্ষা করিয়াছেন। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে তিনি অদ্বৈতের বিধবা সীতা-দেবী, নিত্যানন্দের কনিষ্ঠা পত্নী জাহ্নবাদেবী ও নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর চরণ দর্শন করিয়া তাঁহাদের উপদেশ লাভের পর সেই তরুণ বয়সে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পথেই শুনিলেন রূপ-সনাতন পূর্বেই দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল না, বিখ্যাত বৈষ্ণব আচার্যদের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্য হইতে তিনি বঞ্চিত হইলেন। অবশ্য তখনও বৃন্দাবনে গোপালভট্ট, লোক-নাথ গোস্বামী, জীবগোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি আচার্যগণ জীবিত ছিলেন। জীবগোস্বামী এই তরুণের বিদ্যাবুদ্ধিতে চমৎকৃত হইয়া গোপাল ভট্টের হস্তে তাঁহার শিক্ষাভার অর্পণ করিলেন। এই স্থলে আরও দুই জন শিক্ষার্থীর সঙ্গে শ্রীনিবাসের ঘনিষ্ঠতা হইল। একজন নরোত্তম দত্ত, খেতুরীর ধনাঢ্য ভূস্বামীর বৈরাগী পুত্র, আর এক জন উৎকলের ভক্ত শ্যামানন্দ দাস। যাহা হউক তিন সুহৃৎ বৃন্দাবনে ভারতবিখ্যাত বৈষ্ণব আচার্যদের চরণতলে বসিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের স্মৃতি-সংহিতা, দর্শন ও রসশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্মকুশলতায় শ্রীনিবাস বোধ হয় অধিকতর তৎপর ছিলেন। তাই বৃন্দাবনের গোস্বামীসম্প্রদায় তাঁহাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মে নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিলেন। একথা অবশ্য স্বীকার্য

যে চৈতন্যের তিরোধানের পর যখন অল্পকালের ব্যবধানে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্য দেহ রক্ষা করিলেন, তখন গৌড়ের বৈষ্ণব ভক্তগণ প্রায় অনাথ হইয়া পড়িয়াছিলেন, উপযুক্ত নেতার অভাবে এখানে প্রেমধর্মপ্রবাহ মন্থর হইয়া পড়িতেছিল। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর এবং তাঁহার ভ্রাতা রঘুনন্দন তখন জীবিত থাকিলেও তাঁহাদের সাধনভজন কিছুটা গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক এবং আদিরসাত্মক বলিয়া কিয়দংশে গোপনীয়তা অবলম্বন করিয়া থাকিবে। এদিকে খড়দহ ও শান্তিপুর গোষ্ঠীর মধ্যেও খুব একটা হৃদ্যতা ছিল না। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের জীবৎকালের মধ্যেই উভয় সম্প্রদায়ের প্রীতি৷ সম্পর্কে ফাটল ধরিয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় বৃন্দাবনের গোস্বামীসম্প্রদায় যথার্থই অনুমান করিয়াছিলেন যে, বৈষ্ণবধর্ম ও আদর্শের পীঠস্থান ও মূলকেন্দ্র হইতেছে গৌড়; গদাধরের তিরোধানের পর পুরীধামের বৈষ্ণব কেন্দ্রও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তাই বৃন্দাবনের আচার্যেরা গৌড়ে বৈষ্ণব ধর্মকে সুদৃঢ় করিবার জন্য রূপ-সনাতন-জীবগোস্বামী রচিত স্মৃতি-দর্শন-রসশাস্ত্র ও কাব্যনাট্যাদি এদেশে প্রচারের জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাঁহারা জানিতেন বৈষ্ণবসম্প্রদায় কোনরূপ সুদৃঢ় দার্শনিক মত ও বৈষ্ণব স্মৃতিসংহিতার বাঁধন স্বীকার না করিলে গৌড়ের চৈতন্যধর্ম উপধর্ম হইয়াই থাকিবে। তাই তাঁহারা শ্রীনিবাসকেই সেই গুরুতর কর্মের ভার দিলেন। তাঁহার সহকর্মী হইলেন নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ।

একখানি সুরক্ষিত পেটিকায় বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মূল্যবান গ্রন্থসমূহ [৩] ভরিয়া দেওয়া হইল। অস্ত্রধারী সিপাহীরা সেই পেটিকা পাহারা দিয়া চলিতে লাগিল। সঙ্গে চলিলেন তিন বন্ধু—শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। ইতিপূর্বে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা শ্রীনিবাসকে 'আচার্য' এবং নরোত্তমকে 'ঠাকুর মহাশয়' উপাধি দিয়াছিলেন। বৃন্দাবন ছাড়িতে তাঁহাদের কিছু মাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দীক্ষাগুরুর আদেশ অমান্য করা যায় না। সুতরাং নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহারা ন্যস্তভার তুলিয়া লইয়া বৃন্দাবন হইতে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করিলেন। গৌড়ই তাঁহাদের গন্তব্যস্থল।

---

৩ এই পেটিকায় হরিভক্তিবিলাস, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, উজ্জ্বলনীলমণি, ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, দানকেলিকৌমুদী প্রভৃতি ১২১ খানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ছিল।—দীনেশচন্দ্র সেন—বৃহৎ বঙ্গ, ২য়, পৃ. ৭৫২

অবশ্য বৃন্দাবনের গোস্বামীরা কোন বিশেষ স্থান নির্দেশ করিয়া দেন নাই। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, নরোত্তমাদির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শ্রীনিবাস ধর্মপ্রচারের কর্মকেন্দ্র বাছিয়া লইবেন। সেই সময় পথে বহু বিপদ-আপদ ঘটিত; বিশেষতঃ বৃন্দাবন হইতে গৌড়ভূমির দূরত্ব নিতান্ত অল্প নহে, পথও দুর্গম। যাহা হউক, তাঁহাদের গোযান ক্রমে ক্রমে বাঙলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের নিকট উপস্থিত হইল। তার পরে যে দুর্ঘটনা ঘটিল, তাহার বিস্তারিত ইতিহাস 'ভক্তিরত্নাকর', 'প্রেমবিলাস' প্রভৃতি বৈষ্ণব-ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।[৪] বনবিষ্ণুপুরের মল্লবংশীয় রাজা বীর হাম্বীর[৫] তখন প্রবল প্রতাপে রাজত্ব ও ডাকাতি করিতেছেন। সে যুগে অধিকাংশ জমিদারই ডাকাত; নিজের ভূমিতে জমিদারী এবং পরের জমিতে ডাকাতি—ইহাই অনেক ভূস্বামীর স্বাভাবিক বৃত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাজা বীরহাম্বীর রাজত্ব করিতেন, এবং ডাকাতদলের সাহায্যে লুণ্ঠনও করিতেন। তাঁহার অনুচরেরা সুরক্ষিত পেটিকাতে ধনরত্ন আছে মনে করিয়া রক্ষকদিগকে আক্রমণ করিল এবং গাড়ীটিকে সরাসরি বীর হাম্বীরের কোষাগারে তুলিল। শ্রীনিবাস ও তাঁহার দুই সঙ্গী ইহাতে বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা এই মনে করিয়া শঙ্কিত হইলেন যে, ডাকাতদল রত্নভ্রমে পুঁথির পেটিকা খুলিয়া যখন ধনরত্নের পরিবর্তে পুঁথি দেখিবে, তখন হয়তো তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া পুঁথিগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলিবে। শ্রীনিবাসের অনুরোধে নরোত্তম ও শ্যামানন্দ দুঃখিত চিত্তে নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু শ্রীনিবাস পুঁথি-উদ্ধারের আশা একেবারে ত্যাগ করিতে পারিলেন না, তিনি বিষ্ণুপুরেই কিছুদিন অবস্থান করিতে

---

৪ মনোহর দাসের 'অনুরাগবল্লীতে' গ্রন্থ চুরির কোন প্রসঙ্গ নাই। সেখানে শুধু বলা হইয়াছে:

পূর্ববৎ ভক্তিশাস্ত্র কৈল প্রবর্তন।
বীর হাম্বীর আদি শিষ্য হৈল বহু জন॥ (অনুরাগবল্লী, ৬ষ্ঠ মঞ্জরী)

৫ বিষ্ণুপুরের রাজবংশ মল্লবংশের আদিপুরুষের নাম আদিমল্ল—ইনি সম্ভবতঃ বাগদী সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ইঁহার বংশধরেরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবি করেন। বীর হাম্বীর ১৫৮৭ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসন লাভ করেন এবং বোধ হয় ১৬০০ খ্রীঃ অব্দের কাছাকাছি কোন এক সময়ে শ্রীনিবাসের শিষ্য হন। ইঁহার পুত্রের নাম ধাড়ী হাম্বীর। বীর হাম্বীরের ভণিতায় দুই একটি বৈষ্ণবপদ পদসংগ্রহে পাওয়া গিয়াছে।

লাগিলেন। একদা তিনি বীর হাম্বীরের সভাতে উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রভাবে বীর হাম্বীর অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পুঁথির পেটিকা অক্ষত অবস্থাতেই পাওয়া গেল দেখিয়া শ্রীনিবাস আনন্দিত হইয়া সে সংবাদ বৃন্দাবনে ও নরোত্তমের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। পরে বীর হাম্বীর কদাচার ত্যাগ করিয়া সপরিবারে শ্রীনিবাসের শিষ্য হইলেন, বৈষ্ণব আদর্শ ও আচরণ গ্রহণ করিলেন—এমন কি গোটা বিষ্ণুপুর রাজ্যেই বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হইল —প্রজাগণ এই ধর্ম গ্রহণ করিয়া শাক্তমত ছাড়িয়া দিল। অসাধারণ চরিত্র ও বিচক্ষণ বুদ্ধির অধিকারী শ্রীনিবাস তাঁহার রাজ-শিষ্য ও বিষ্ণুপুর রাজ-পরিবারের উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, বাঙলাদেশে সেরূপ দৃষ্টান্ত বড় দেখা যায় না। শ্রীনিবাস পরে দুইটি বিবাহ করেন। 'ভক্তি-রত্নাকরে'র মতে তিনি অদ্বৈত প্রভুর স্বপ্নাদেশের ফলে এবং শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ও তাঁহার ভ্রাতা রঘুনন্দনের উপদেশে প্রথম বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করেন। 'প্রেমবিলাসে'ও আছে যে, রঘুনন্দন ও সুলোচন ঠাকুর তাঁহাকে বিবাহ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। যাজিগ্রাম নিবাসী (তাঁহার মাতুলালয়) গোপালদাস চক্রবর্তীর কন্যা দ্রৌপদী (পরে ইঁহার নূতন নামকরণ হইয়াছিল—ঈশ্বরী) শ্রীনিবাসের প্রথমা পত্নী। তাঁহার শ্বশুর জামাতার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়া পত্নী বনবিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী গোপালপুর গ্রামের রাঘব চক্রবর্তীর কন্যা, নাম—পদ্মাবতী। বিবাহের পর ইঁহার নূতন নাম দেওয়া হয়—গৌরাঙ্গপ্রিয়া। গুরুর বিবাহে শিষ্য বীর হাম্বীর প্রচুর অর্থব্যয় ও বিশেষ আড়ম্বরের আয়োজন করিয়াছিলেন।[৬] কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভজাতপুত্র গতিগোবিন্দ বা গোবিন্দগতি পরবর্তী কালে বৈষ্ণব-সমাজের অন্যতম নেতা হইয়াছিলেন। যাহা হউক শ্রীনিবাস রাজবংশের সংস্পর্শে আসিয়া ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় খানিকটা ঐশ্বর্যের আবিল আবহাওয়ার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায় না।[৭] তাঁহার বিবাহ

---

৬ ভক্তিরত্নাকরে আছে :

গোষ্ঠী সহ রাজার উল্লাস অতিশয়।
আচার্য বিবাহে বহু অর্থ কৈল ব্যয়॥ (১৩শ তরঙ্গ)

৭ তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধেও বীর হাম্বীরের অর্থে বিরাট আয়োজন করা হইয়াছিল।

ও বিবাহের আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনা শুনিয়া তাঁহার গুরু গোপালভট্ট নাকি শুধু কয়েকবার 'স্খলৎ স্খলৎ' এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন।[৮] গুরুর এই অপ্রীতি-যুক্ত ভর্ৎসনাবাক্য লোকমুখে শ্রীনিবাসের কাছে আসিয়া পৌঁছিলে তিনি দুঃখিত ও বিচলিত হইয়াছিলেন।

শ্রীনিবাসের সময় হইতে কোন কোন বৈষ্ণব আচার্যের আচার-আচরণে ঐশ্বর্যভাব প্রকাশ পাইতেছিল। পূর্বযুগে নিত্যানন্দ অলঙ্কার ধারণ করিতেন, তাঁহার পুত্র বীরচন্দ্র রাজবৎ আচরণ করিতেন। রাজন্যবর্গ, সামন্ত, জমিদার ও ধনী বণিকদের (সপ্তগ্রামের বিখ্যাত সুবর্ণবণিক উদ্ধরণ দত্তকে নিত্যানন্দ শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন) শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া এই যুগের বৈষ্ণব আচার্যগণ, বিশেষতঃ শ্রীনিবাস একটা বড় পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম তাঁহার সময়ে আর হীন পতিতের ধর্ম হইয়া রহিল না, উচ্চসমাজে—বিশেষতঃ ধনী ও অভিজাতসমাজে এই ধর্মাচার শ্রদ্ধার আসন লাভ করিল। শ্রীনিবাসকে ইঁহাদের সাহচর্যে থাকিতে হইত বলিয়া তাঁহার শুদ্ধ যতিধর্মে রাজসিক ভাবের কিঞ্চিৎ ছায়া পড়িয়াছিল। ব্যক্তিগত শুদ্ধাচার বৈষ্ণবধর্মের মূলকথা। তাহাতে যে সূক্ষ্ম ফাটল ধরিয়াছিল, শ্রীনিবাসের দৃষ্টান্তই তাহার প্রমাণ। রাজসিকতার কথা থাক, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গে তাঁহার দ্বারা চৈতন্য ধর্ম যে বিশাল ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার প্রভাবেই বিষ্ণুপুর ও চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বৈষ্ণবধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা ও সঙ্গীত বাদ্যাদির কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বৈষ্ণবধর্ম অভিজাত সমাজে প্রবেশাধিকার না পাইলে এত দ্রুতবেগে সমাজের সর্বস্তরে ছড়াইয়া পড়িতে পারিত না। যাহা হউক, শ্রীনিবাসের বাহ্যিক জীবনে ঐশ্বর্য বিলাসের কিঞ্চিৎ মালিন্য লাগিলেও, অন্তরে অন্তরে তিনি উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি ভাবে সমাহিত হইয়া পড়িতেন, একটা গোটা দিন কাটিয়া গেলেও তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইত না, সেই সমাধিস্থ অবস্থায় তিনি রাধাকৃষ্ণলীলা দর্শনে এমনই আত্মলীন হইয়া থাকিতেন যে, পত্নীদ্বয় ও ভক্তগণ তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িতেন।[৯] তখন শ্রীনিবাসের ভক্তশিষ্য রামচন্দ্র

৮ প্রেমবিলাস, ১৩শ

৯ পরে 'কর্ণানন্দ' আলোচনা দ্রষ্টব্য।

কবিরাজ তাঁহার কর্ণমূলে হরিধ্বনি করিলে তাঁহার বাহ্যিক চেতনা ফিরিয়া আসিত। ব্যক্তিগত সাধনা ও অনুভূতিতে তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন। উত্তর-চৈতন্যযুগে অর্থাৎ মধ্যযুগের অন্ত্যপর্বে বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করিয়া এবং ভূস্বামী ও ধনিসম্প্রদায়কে বৈষ্ণবমতের ছত্রছায়াতলে আনিয়া শ্রীনিবাস বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতিকে নূতন সম্ভাবনায় উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। শুধু বৈষ্ণব সাহিত্য নহে, বাঙালীর বৃহত্তর সমাজেও তাঁহার প্রভাব ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে স্বীকার করা কর্তব্য। তাঁহার কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীও বৈষ্ণবসমাজ ও সম্প্রদায়ে অতিশয় মান্যা হইয়াছিলেন।

নরোত্তম ঠাকুর ॥ শ্রীনিবাসের বান্ধব ও সতীর্থ নরোত্তম ঠাকুরমহাশয় (দত্ত) উত্তরবঙ্গে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ধনী জমিদার শ্রেণীর উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। নিজে কায়স্থ সমাজভুক্ত হইলেও তিনি অনেক ব্রাহ্মণকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের শিরে চরণধূলি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনাদর্শ নানা দিক দিয়া বৈষ্ণব সমাজকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত রামপুর বোয়ালিয়ার বারো মাইল দূরে গড়ের হাট পরগণার[১০] অন্তর্গত পদ্মার তীরবর্তী খেতুরী গ্রামের নিকট অবস্থিত গোপালপুরে কৃষ্ণানন্দ দত্ত (মজুমদার) নামক এক সম্পন্ন ভূস্বামী বা সামন্ত বাস করিতেন। নরোত্তম তাঁহারই একমাত্র সন্তান। বাল্যকাল হইতেই নরোত্তম চৈতন্য-আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণব আচার্য ও গুরুগণের সাক্ষাৎ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন এবং রঘুনাথদাস গোস্বামীর মতো তিনিও ধনী পিতার সহস্র ঐশ্বর্যের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া নিতান্ত তরুণ বয়সে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধ লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এখানে শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ও সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইতিপূর্বে শ্রীনিবাস প্রসঙ্গে গ্রন্থচুরির যে কাহিনী বলিয়াছি, সেখানে দেখা যাইতেছে, শ্রীনিবাসের নির্দেশে দুঃখিত চিত্তে তিনি নিজ বাসভূমি গোপালপুরে ফিরিয়া আসেন এবং যাবতীয় ঐশ্বর্য ও ভোগসুখ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কিঞ্চন বৈরাগীর জীবনব্রত অবলম্বন

১০ এই অঞ্চলের নামানুসারে 'গড়ের হাটী' বা 'গরানহাটী' কীর্তনের উৎপত্তি হয়।

করেন। শ্যামানন্দ এই গ্রামে কিছুদিন তাঁহার সাধনভজনের সঙ্গী হইয়াছিলেন। তাঁহাকে 'বিরক্ত' সন্ন্যাসী দেখিয়া তাঁহার পিতৃব্যপুত্র জমিদারী কর্ম পরিচালনা করিতেন। ইতিমধ্যে তিনি শ্রীনিবাসের এক পত্রে জানিতে পারিলেন যে, অপহৃত গ্রন্থাদি ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে। বিষ্ণুপুর সমাজে শ্রীনিবাসের অভূতপূর্ব প্রভাবের পরিচয় পাইয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

নরোত্তমের জীবনকথা এক আশ্চর্য কাহিনী। শ্রীনিবাস দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান হইয়া বিপুল ঐশ্বর্য ও রাজসিকতার মধ্যে সগৌরবে বাস করিয়াছিলেন। নরোত্তম রাজপুত্র হইয়া স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যের মধ্যে পরমানন্দে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসকে রাজসিকতা স্পর্শ করিয়াছিল, বৈরাগী নরোত্তম বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক জীবন যাপন করিয়াছিলেন। বৃহত্তর হিন্দুসমাজে চৈতন্যধর্মের প্রভাব বিচার করিলে তাঁহার দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে। ধনী ভূস্বামী, দুর্দান্ত নরঘাতক ডাকাত, বিদ্যামদোদ্ধত ব্রাহ্মণ—সকলেই তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। অথচ এই চিরকুমারের স্ফটিকশুভ্র চরিত্রে বিন্দুমাত্র মলিনতার ছাপ পড়ে নাই। বাঙলাদেশের মধ্যযুগীয় চরিত্রাদর্শরূপে নরোত্তমের অপাপবিদ্ধ পূত জীবনকথা চিরদিন শ্রদ্ধা লাভ করিবে।

চাঁদরায় নামক এক দুর্দান্ত দস্যু-জমিদার নির্মম বৃত্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রভাবে তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন—ইনি জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ।[১১] ইঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ অনেক ব্রাহ্মণ-ডাকাতও[১২] তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া ধন্য হয়। তিনি যে ব্রাহ্মণ শিষ্যদের মস্তকে চরণরেণু স্পর্শ দান করিতেন, ইহাকে তৎকালীন সমাজের পক্ষে একটা বড় রকমের সমাজবিপ্লব বলিতে হইবে। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত নিত্যানন্দ ও বীরচন্দ্রকে সমাজবিপ্লবী বলিয়াছেন, কারণ তাঁহারা নীচজাতি, বিশেষতঃ জাতিচ্যুত নেড়ানেড়ী অর্থাৎ বৌদ্ধ সহজিয়াদের

১১ নরোত্তম হরিচন্দ্র রায় নামক এক ব্রাহ্মণ-ডাকাতকে শিষ্য করিয়াছিলেন।

১২ কতিপয় ব্রাহ্মণ-ডাকাতের নাম 'প্রেমবিলাসে' (১৯শ বিলাস) উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—গোবিন্দ বাড়ুজ্যা, ললিত ঘোষাল, কালিদাস চট্ট, নিবারণ চক্রবর্তী, রামজয় চক্রবর্তী, হরিনাথ গাঙ্গুলী, শিব চক্রবর্তী।

বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।[১৩] কিন্তু নরোত্তমের ক্রিয়াকর্ম অধিকতর দূরপ্রসারী। তাঁহার নেতৃত্বের পূর্বে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে কোন কোন দিক দিয়া ব্রাহ্মণ্যের প্রাধান্য অব্যাহত ছিল। চৈতন্যদেব-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত আচার্য, রূপ-সনাতন-জীব-শ্রীনিবাস—ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ। যবন হরিদাস, রঘুনাথদাস, নরহরি সরকার—ইঁহারা বৈষ্ণব সমাজে অতিশয় শ্রদ্ধেয় হইলেও ইতিপূর্বে ইঁহাদের মতো অব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আচার্যগণ নরোত্তমের মতো ব্রাহ্মণ-শিষ্যদের পদস্পর্শের অধিকার দেন নাই। তাঁহার যতিধর্মের আদর্শ ও সাত্ত্বিক চরিত্রের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। মধ্যযুগের রঘুনন্দন-শাসিত বর্ণাশ্রম সমাজের ব্রাহ্মণ্যপ্রাধান্য এভাবে আর কেহ সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ করিতে পারেন নাই—নরোত্তমের ইহাই সর্বপ্রধান কৃতিত্ব। অবশ্য ইহার জন্য তিনি কোন দিন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই, ব্রাহ্মণ সমাজই তাঁহার চরিত্রাদর্শে মুগ্ধ হইয়া স্বেচ্ছায় তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। এই অভাবনীয় ব্যাপারে সমাজের উচ্চস্তরে যে প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। পকপল্লীর কায়স্থ জমিদার নরসিংহ রায় ব্রাহ্মণ প্রতিপালক ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ধরিয়া পড়িলেন, কায়স্থ নরোত্তম ব্রাহ্মণদের শিরে পদধূলি দিয়া শিষ্য করিতেছেন—সমাজের ভিত্তিমূল যে ভাঙিয়া পড়িল। ইহাতে নরসিংহ বর্ণাশ্রম সমাজের মর্যাদা রক্ষার জন্য তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে লইয়া চলিলেন নরোত্তমকে পরাভূত করিতে, কিন্তু নিজেই সদলবলে নরোত্তমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলেন। ব্রাহ্মণকুলে না জন্মিয়াও নরোত্তম বর্ণশ্রেষ্ঠের গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, বিশুদ্ধ চরিত্রাদর্শই ইহার প্রধান কারণ।

অবশ্য মধ্যযুগের অন্ত্যপর্বে সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রভাব যে খুব খর্ব হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। ব্রাহ্মণগণ দলে দলে কায়স্থ নরোত্তমের শিষ্য হইতেছেন, তিনি ব্রাহ্মণদের শিরে চরণস্পর্শ দান করিতেছেন—এই রূপ বর্ণনায় আধুনিক ঐতিহাসিকগণ খুব উল্লাস বোধ করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব সমাজ-ইতিহাসে ব্রাহ্মণ প্রভাবকে খর্ব না করিয়া বরং নরোত্তমকে ব্রাহ্মণরূপে প্রচার করিবার বিশেষ প্রয়াস লক্ষ্য করা যাইবে।

---

১৩ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব

বীরচন্দ্র খেতুরী উৎসবে সর্বসমক্ষে নরোত্তমকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করেন।[১৪]

যাহা হউক নরোত্তমের সাত্ত্বিক চরিত্রাদর্শ উত্তরবঙ্গের বৈষ্ণবসমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যে শুভ ও স্বাস্থ্যপ্রদ মানসিক বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুসমাজে, বিশেষতঃ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে তাঁহার বিস্ময়কর সাত্ত্বিক চরিত্র বিপুল উদ্দীপনা সঞ্চারেও সার্থক হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার আর একটি গৌরবজনক কর্মৈষণার কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন—ইহা খেতুরী উৎসব। বৌদ্ধ 'সঙ্গীতি'র মতো নরোত্তম কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ মূর্তি স্থাপনের উপলক্ষে খেতুরী গ্রামে বাঙলার বৈষ্ণব আচার্য ও ভক্তদের আহ্বান করিয়া দুই দিন ব্যাপী যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, তাহা বৈষ্ণব-সমাজ ও সম্প্রদায়ের ইতিহাসে খেতুরী উৎসব নামে পরিচিত। বৈষ্ণবদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যদুনন্দনের উদ্যোগে কাটোয়াতে গদাধরের তিরোধান উৎসবে, দ্বিতীয় অনুষ্ঠান কয়েক মাস পরে শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দনের উদ্যোগে নরহরি সরকারের তিরোধান তিথি উপলক্ষে সংঘটিত হয়। তৃতীয় উৎসব এই খেতুরী উৎসব ইহার বৎসরখানেক পরে অনুষ্ঠিত হয়। গুরুত্বের দিক দিয়া তৃতীয় উৎসবই বৈষ্ণব সাহিত্য ও সমাজে বিশেষ পরিচিত।

---

১৪ বীরচন্দ্র নরোত্তমকে ব্রাহ্মণ প্রমাণ করিতে গিয়া 'হরিভক্তি বিলাসে'র এই শ্লোক উদ্ধৃত করেন:

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃনাম্॥

অর্থাৎ রসায়নের দ্বারা যেমন কাঁসা সোনায় পরিণত হয়, তেমনি দীক্ষার দ্বারা লোকে (অর্থাৎ অব্রাহ্মণ) ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। তার পর তিনি নরোত্তমকে দেখাইয়া বলেন:

কৃষ্ণ যার অন্তরে বাহিরে সদা স্থিত।
সেই সে ব্রাহ্মণ ইহা কহিনু নিশ্চিত॥
ব্রাহ্মণের গলে পৈতা সর্বলোকে দেখে।
সাধকের হৃদে পৈতা সদা থাকে গোপে॥

সদ্গোপ শ্যামানন্দের গলাতেও নাকি ভক্তগণ জ্যোতির্ময় পৈতা দেখিয়াছিলেন। নরোত্তমও খেতুরী উৎসবে ভক্ত সমক্ষে "হৃদয় চিরি দেখাইল শ্রীযজ্ঞোপবীত" (প্রেমবিলাস—১৯শ)। অবশ্য সেই দীপ্তিশালী সূর্যকিরণে'র মতো পৈতা পাষণ্ডীরা দেখিতে পায় নাই—যাহাদের দেখা সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল। ব্রাহ্মণের সূত্রখণ্ড লইয়া একদা বৈষ্ণবসমাজে কিরূপ [illegible] হইয়াছিল ইহাই তাহার প্রমাণ। ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগেও কলিকাতায় [illegible] পৈতা গ্রহণের আগ্রহের কথাও পাঠকের মনে পড়িতে পারে।

নরোত্তম পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ দত্তের সহায়তায় খেতুরীতে ছয়টি কৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপনের অভিপ্রায়ে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে[১৫] এই গ্রামে বাঙলা ও উৎকলের বৈষ্ণবদের এক বিরাট সম্মেলন আহ্বান করেন। উৎসবের প্রারম্ভে গৌড়বঙ্গ ও উৎকল হইতে বৈষ্ণব আচার্য, শিষ্য ও ভক্ত সম্প্রদায়, কীর্তনীয়া ও বাদ্যকরগণ সমবেত হইয়া খেতুরী উৎসবকে মুখরিত করিয়া তোলেন। অভ্যাগতদের তালিকায় উৎকলের সশিষ্য শ্যামানন্দ, খড়দহের বৃন্দাবনদাস, বলরামদাস, বীরচন্দ্রসহ জাহ্নবাদেবী, অম্বিকাকালনা হইতে শ্যামানন্দের গুরু হৃদয়চৈতন্য, নবদ্বীপ হইতে শ্রীপতি ও শ্রীনিধি (মহাপ্রভুর পার্ষদ), শান্তিপুর হইতে অদ্বৈত আচার্যের জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুতানন্দ ও গোপালদাস, শ্রীখণ্ড হইতে রঘুনন্দন, লোচনদাস এবং কাটোয়া হইতে সপার্ষদ যদুনন্দন দাস উপস্থিত হইলেন। কীর্তনীয়া দেবীদাস চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-নরহরির পদ গাহিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীতে বিপুল উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করিলেন। স্বয়ং সুকণ্ঠ নরোত্তম একটি বিশেষ ভঙ্গীতে কীর্তন গাহিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিলেন। এই কীর্তনের রীতিটি গরানহাটী বা গড়ের হাটী রীতি নামে পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।[১৬] শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধাকান্ত ও

---

১৫ খেতুরী উৎসবের সন-তারিখ লইয়া নানা মতভেদ আছে। সাধারণ বৈষ্ণবগণ মনে করেন যে, ১৫০৪ শকাব্দের (১৫৮২ খ্রীঃ অঃ) ফাল্গুন মাসে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দীনেশচন্দ্র তাঁহার গ্রন্থাদিতে এবিষয়ে নানা কথা বলিয়াছেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' তিনি ১৫০৪ শকাব্দ স্বীকার করিয়াছেন, আবার *The Vaisnava Literature of Mediaval Bengal*-এ বলিয়াছেন যে, ১৫৮২ খ্রীঃ অব্দে নহে, ১৬০২—১৬০৬ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 'বৃহৎবঙ্গেও' (২য়) তিনি কিঞ্চিৎ সন্দেহের অবকাশ রাখিয়া ১৬০৫ খ্রীঃ অব্দের কথা বলিয়াছেন। ডঃ সুকুমার সেনও *A History of Brajabuli Literature*-এ ১৫৮৩ বা ১৫৮৪ খ্রীঃ অব্দের নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থচুরি প্রসঙ্গে বীর হাম্বীরের উল্লেখে দেখা যাইতেছে মল্লরাজ বীর হাম্বীর ১৫৮৭ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসন (অভয়পদ মল্লিক প্রণীত *History of Vishnupur* দ্রষ্টব্য) লাভ করেন এবং ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বা তাহার ঈষৎ পূর্বে গ্রন্থ চুরির ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সুতরাং খেতুরীর উৎসব ১৭শ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই হইয়াছিল—এ অনুমান অযৌক্তিক নহে।

১৬ খেতুরী গড়ের হাট পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। শ্রীনিবাস আচার্যও যে নূতন কীর্তন রীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা মনোহরশাহী নামে পরিচিত। (দ্রষ্টব্য: অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়—শ্রীনিবাস আচার্য চরিত)

রাধারমণ—নরোত্তম এই ছয়টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন।[১৭] এই উৎসবে বৈষ্ণব গ্রন্থাদিও পঠিত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে যদিও কাটোয়া (গদাধরের স্মরণোৎসব), শ্রীখণ্ড (নরহরি সরকারের স্মরণোৎসব) এবং কাঞ্চনগড়িয়ায় (হরিদাস আচার্যের স্মরণোৎসব—'ভক্তিরত্নাকর') শ্রীনিবাস স্বয়ং উদ্যোগী হইয়াই বৈষ্ণব সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন, তথাপি খেতুরীর উৎসবের গুরুত্ব সমধিক। এই সময়ে নরোত্তম ব্রাহ্মণদের শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজ (পকপল্লীর জমিদার নরসিংহ কায়স্থ ছিলেন) প্রথম দিকে নরোত্তমের বিরোধী ছিলেন। এই বিরোধিতা কিরূপ প্রবল হইয়াছিল বৈষ্ণব-ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থে তাহার আভাসমাত্র আছে। এই বিরোধিতা প্রশমিত করিবার জন্য বৈষ্ণব লেখককে চণ্ডীর শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। দেবী চণ্ডী স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া নরোত্তমের বিরুদ্ধবাদী শাক্ত ব্রাহ্মণদের খুব ভৎর্সনা করিয়া তাহাদিগকে নরোত্তমের চরণে আশ্রয় লইতে আদেশ দিলেন—এরূপ বর্ণনা 'ভক্তিরত্নাকর' 'প্রেমবিলাস', 'নরোত্তমবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। (খেতুরী উৎসবেই সর্বসমক্ষে নরোত্তম ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিলেন—সম্ভবতঃ ইহার পরে নরোত্তমের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজের প্রতিকূলতা হ্রাস পাইয়াছিল।

খেতুরী উৎসবে গৌড়-বঙ্গ-উৎকলের চৈতন্যপন্থী আচার্য ও ভক্তদের সমাগম হইয়াছিল। বৈষ্ণব মতাদর্শ পুনঃ সংস্থাপন, পরস্পর ভাববিনিময়ের দ্বারা সঙ্ঘশক্তি বৃদ্ধি—সর্বোপরি ব্রাহ্মণ-প্রভাবিত বর্ণাশ্রমসমাজের বিরোধিতা হ্রাস করিতে এই উৎসব বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ঠিক এই ধরনের ব্যাপক বৈষ্ণব সম্মেলন ইহার পূর্বে বা পরে আর অনুষ্ঠিত হয় নাই) নরোত্তম ইহার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র সন্তোষদত্ত ইহার সাফল্যের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, শ্রীনিবাস আচার্য, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি নেতৃগণও সাগ্রহে ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন, নিত্যানন্দের কনিষ্ঠা পত্নী গোস্বামিনী জাহ্নবাদেবী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া উৎসবের গুরুত্ব ও মর্যাদা আরও বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। (বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বৈষ্ণবসাহিত্যে খেতুরী উৎসবের তাৎপর্য সুগভীর, এবং নরোত্তমের পরি-

---

১৭ শ্রীগৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত শ্রীব্রজমোহন।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকান্ত শ্রীরাধারমণ॥ (নরোত্তম বিলাস)

কল্পনার দ্বারাই এই বিরাট বৈষ্ণব সম্মেলন সম্ভব হইয়াছিল। যাহা হউক শুদ্ধভক্ত নরোত্তমও যে সম্প্রদায় ও সমাজের উন্নতির জন্য কতটা তৎপর হইতে পারিতেন, ইহাই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

শ্যামানন্দ॥ এই প্রসঙ্গে শ্যামানন্দের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন—অবশ্য উৎকলেই তাঁহার প্রভাব সর্বাধিক সম্প্রসারিত হইয়াছিল। শ্যামানন্দ শ্রীনিবাস-নরোত্তম অপেক্ষা নিম্নতর সমাজে—সদ্‌গোপকুলে আবির্ভূত হইয়া সেই কুল ধন্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা উৎকলের অধিবাসী হইলেও তাঁহার পূর্বপুরুষ বাঙালী ছিলেন। উড়িষ্যার দণ্ডকেশ্বরের অন্তর্ভুক্ত ধারেন্দা বাহাদুরপুর গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি। পিতার নাম কৃষ্ণমণ্ডল, মাতার নাম দুরিকা। দুরিকার অনেকগুলি সন্তান মারা গিয়াছিল বলিয়া নবজাতকের নাম রাখা হইল দুঃখী। সে যুগে সদগোপ বংশে জন্মিয়া সংস্কৃত বিদ্যাদি অর্জন করা কিরূপ দুরূহ ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। যাহা হউক 'দুঃখী' প্রথম বয়সেই বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরে ভক্তিভাববশে নানা স্থানে ঘুরিয়া তিনি অম্বিকা কালনায় নিত্যানন্দ-চৈতন্য মন্দিরে উপস্থিত হন। তখন হৃদয়চৈতন্য নামক এক ভক্ত এই মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত সেবায়েত ছিলেন। তিনিই এই গোপ তরুণকে দীক্ষা দিয়া দুঃখী নাম পাল্টাইয়া কৃষ্ণদাস নাম রাখেন। পরে কৃষ্ণদাস বহু তীর্থ ঘুরিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং জীবগোস্বামী তাঁহাকে বৈষ্ণব শাস্ত্রে অভিজ্ঞ করিয়া তোলেন। শুনা যায় তিনি নাকি ধ্যানযোগে রাধাকৃষ্ণলীলা প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিতেন। তাঁহার ভক্তিসাধনার এই অপূর্ব দিকটির পরিচয় পাইয়া জীবগোস্বামী তাঁহার কৃষ্ণদাস নাম পাল্টাইয়া শ্যামানন্দ দাস রাখেন। পরে তিনি এই নামেই পরিচিত হন। বৃন্দাবনে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সঙ্গে তাঁহার গভীর বন্ধুত্ব হয়। গ্রন্থবোঝাই যে গোযান গৌড়ে প্রেরিত হয়, তিনি তাহার অন্যতম রক্ষক ছিলেন। অপহৃত গ্রন্থ উদ্ধারের সংবাদ পাইয়া নিশ্চিন্ত মনে শ্যামানন্দ উড়িষ্যায় চৈতন্যধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। উৎকলের জমিদার, দস্যু, সামন্তগণও তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। বীরেন্দ্রগ্রামের বিখ্যাত অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত দামোদর স্বীয় মতবাদ ত্যাগ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শেরখাঁ নামে এক মুসলমান

ডাকাতও তাঁহার মহিমায় অভিভূত হইয়া দস্যুবৃত্তি ও মুসলমানধর্ম ত্যাগ করেন এবং শ্যামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গুরুর মহিমা প্রচার করেন। ইনিই বিখ্যাত চৈতন্যদাস—গুরু তাঁহার এই নূতন নামকরণ করেন। 'পদকল্পতরু'তে চৈতন্যদাস ভণিতায় কয়েকটি পদ এই মুসলমান ভক্তের রচিত বলিয়া মনে হয়। 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'প্রেমবিলাস' হইতে মনে হয় এই চৈতন্যদাস একজন ভাল কীর্তনীয়া হইয়াছিলেন। সুবর্ণরেখার নিকটবর্তী অঞ্চলের রাজা প্রসিদ্ধ রসিক মুরারি ক্ষত্রিয় হইয়াও সস্ত্রীক শ্যামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ফলে উড়িষ্যার অভিজাত ও সামন্ত শ্রেণীর মধ্যে চৈতন্যধর্ম দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এমন কি, কিছুকাল পূর্বেও ময়ূরভঞ্জের রাজবংশ রসিক মুরারির শিষ্যদের গুরু বলিয়া মানিতেন। চৈতন্য-তিরোধানের পর উড়িষ্যায় কিছু দিনের জন্য চৈতন্যধর্ম দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই শ্যামানন্দ ও তাঁহার শিষ্যদের দ্বারা চৈতন্যাদর্শ পুনরায় জনসমাজ ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সুপ্রচার লাভ করিয়াছিল। খেতুরী উৎসবে শ্যামানন্দ সদলবলে উপস্থিত ছিলেন।

জাহ্নবাদেবী ও বীরচন্দ্র ॥

জাহ্নবাদেবী—নিত্যানন্দের কনিষ্ঠা পত্নী জাহ্নবাদেবী ও পুত্র বীরচন্দ্র (বীরভদ্র)[১৮] খড়দহকে বৈষ্ণব কেন্দ্রে পরিণত করিয়া বৈষ্ণব সমাজে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। জাহ্নবাই সর্বপ্রথম ঈশ্বরী বা গোস্বামিনী বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে গৃহীত হন। আধুনিক কালেও যে 'খড়দহের মা

---

১৮ নিত্যানন্দ অম্বিকা কালনার সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাকে বিবাহ করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, জাহ্নবাকে তিনি বিবাহ করেন নাই, যৌতুক স্বরূপ পাইয়াছিলেন। অবশ্য এ বিষয়ে নানা মতভেদ আছে। নিত্যানন্দের জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান বীরচন্দ্র। বৈষ্ণব গ্রন্থে ইনি অধিকাংশ স্থলে বীরচন্দ্র, কোথাও-বা বীরভদ্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন :

প্রভু বীরভদ্র মহা আনন্দের কন্দ।
কেহ বীরভদ্র, কেহ কহে বীরচন্দ্র ॥ (ভক্তিরত্নাকর, ৯ম তরঙ্গ)

অবধূত নিত্যানন্দের পুত্রের নাম 'বীরভদ্র' হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? তবে বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই শৈব নাম অপেক্ষা 'বীরচন্দ্র' নামের অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন।

গোঁসাই' শব্দটি চলিতেছে, তাহার প্রথম সূত্রপাত করেন জাহ্নবাদেবী। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার সমাজে, বিশেষতঃ অন্তঃপুরে খড়দহের মা-গোঁসাইদের বিশেষ প্রভাব ছিল। ধনী পরিবারের বালিকা ও বধূরা খড়দহ হইতে আগত বৈষ্ণবী বা মা-গোঁসাইদের নিকট বাংলা ও সংস্কৃত শিখিতেন। একদা শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীও বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

জাহ্নবাদেবী শুধু খড়দহ কেন্দ্রেরই নেতৃত্ব করেন নাই, অনেক বৈষ্ণব ভক্ত তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'প্রেমবিলাসের' লেখক নিত্যানন্দদাস ও স্বয়ং বীরচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। পূর্বে বীরচন্দ্র শান্তিপুরে অদ্বৈত-পুত্রের নিকট মন্ত্র লইবার সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু নিত্যানন্দের ভক্তদের উপদেশে তিনি বিমাতা জাহ্নবাদেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১৯] খেতুরী উৎসবে জাহ্নবা সশিষ্য যোগদান করেন এবং সমবেত সকল ভক্তের শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করেন। এখান হইতে শিষ্য নিত্যানন্দদাসের সঙ্গে তিনি বৃন্দাবনে গিয়া গোস্বামীদের নিকট শাস্ত্রাদি শ্রবণ করেন। পথিমধ্যে কুতুবউদ্দিন নামক এক দস্যুদলপতি ঘৃণ্য পথ ত্যাগ করিয়া জাহ্নবাদেবীর নিকট কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। মোট কথা শ্রীনিবাস-নরোত্তম-রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি আচার্যগণের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া এবং বৃন্দাবনের বৃদ্ধ গোস্বামীদের শ্রদ্ধা প্রীতি লাভ করিয়া তদানীন্তন বৈষ্ণব সমাজে জাহ্নবাদেবী 'ঈশ্বরী' বলিয়া পরিচিত হন। অবশ্য তাঁহার আচার-আচরণে কিঞ্চিৎ বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। জাহ্নবার স্নানের সময় তাঁহার 'হেমাঙ্গ কলেবর' ব্রাহ্মণী পরিচারিকা "সূক্ষ্ম বসনেতে অঙ্গ পোছে ধীরি ধীরি", "পরিধেয় বস্ত্র আনি দিলা অন্ত—জনে।"[২০] নিত্যানন্দ প্রায় রাজবৎ আচরণ করিতেন, পুত্র বীরচন্দ্রও দারিদ্র্য

---

১৯ 'নিত্যানন্দ বংশ বিস্তারে'র বর্ণনা সত্য হইলে দেখা যাইতেছে, জাহ্নবা প্রথমে অপ্রাপ্তবয়স্ক বীরচন্দ্রকে দীক্ষা দিতে সম্মত হন নাই। তখন ক্ষুব্ধ বীরচন্দ্র দীক্ষা লইবার জন্য শান্তিপুরে প্রস্থানের উদ্যোগ করেন। কিন্তু অদ্বৈতবংশের নিকট দীক্ষা লইলে খড়দহগোষ্ঠীর গৌরব হ্রাস পাইবে মনে করিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনা হয়। অতঃপর তিনি বিমাতার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

২০ নরোত্তম বিলাস, ৭ম বিলাস

অবলম্বন করেন নাই। সুতরাং বৈষ্ণব সমাজের আচার্যা স্থানীয়া বহুমান্যা জাহ্নবাদেবীও যে কিঞ্চিৎ-পরিমাণে রাজসিক ভাব প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে ?

বীরচন্দ্র (বীরভদ্র) ॥ বীরচন্দ্র জাহ্নবাদেবের সপত্নী পুত্র, কিন্তু তাঁহার উপর বিমাতা অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। বাঙলার বৈষ্ণব সমাজবিবর্তনের ইতিহাসে বীরচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁহার জীবনকথা প্রেমবিলাস-নরোত্তমবিলাস ভক্তিরত্নাকরে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। 'নিত্যানন্দে'র বংশতালিকা ধরনের পুঁথিতেও[২১] তাঁহার সম্বন্ধে সামান্য কিছু তথ্য পাওয়া যায়। উপরন্তু বৈষ্ণব সহজিয়াগণ তাঁহার অলৌকিক কাহিনী বিষয়ে অনেক গাল-গল্প লিখিয়া গিয়াছেন এবং নিজেদের আচার-আচরণ-সংক্রান্ত সহজিয়া পুঁথিকে বীরচন্দ্রের রচনা বা উপদেশ বলিয়া চালাইয়াছেন। নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র যে বৈষ্ণবসমাজে শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হইবেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। হয়তো কেহ কেহ তাঁহার আচার-আচরণ ততটা পছন্দ করিতেন না, 'নেড়ানেড়ী' সংক্রান্ত ব্যাপারের জন্য রক্ষণশীল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কেহ কেহ তাঁহার ক্রিয়াকর্মের উপর ততটা প্রসন্ন হইতে পারেন নাই, তাঁহার বংশ-শাখাতে সমাজ-শাস্ত্রীরা 'বীরভদ্রী দোষ'[২২] নির্দেশ করিয়া তাঁহাদিগকে একটু পৃথক দৃষ্টিতে দেখিতেন। শান্তিপুরের অদ্বৈত শাখার সঙ্গেও খড়দহের নিত্যানন্দ শাখার ভিতরে ভিতরে মনোমালিন্য সৃষ্টি হইতেছিল। যাহা হউক, বীরচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু গল্পকাহিনী, কিছু দলাদলির বিবরণী, কিছু-বা ধর্মান্তরীকরণের সংবাদ বহু পরিবর্তন ও অতিরঞ্জনের মধ্য দিয়া এ যুগেও আসিয়া পৌঁছাইয়াছে।

অল্প বয়স হইতেই বীরচন্দ্রের অলৌকিক ব্যাপারের দিকে বিশেষ প্রবণতা ছিল, যাহা শেষ পর্যন্ত যাদুবিদ্যা ধরনের অনৈসর্গিক ভোজবাজিতে পরিণত হইয়াছিল। এ বিষয়ে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। নিত্যানন্দ জীবিত

---

২১ বোধ হয় 'প্রেমবিলাস' রচয়িতা নিত্যানন্দ দাস বীরচন্দ্রের জীবনকাহিনী বিষয়ক 'বীরচন্দ্রচরিত' রচনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু ইহার কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। এ বিষয়ে 'প্রেমবিলাস' সম্পর্কিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২২ লালমোহন বিদ্যানিধি—সম্বন্ধ নির্ণয়

থাকিতেই পুত্র পিতার আদর্শ ত্যাগ করিয়া অনেকটা অনৈসর্গিক ও অলৌকিক সিদ্ধাসিদ্ধতা অর্জনের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাহার জন্য পিতার নিকট ভর্ৎসিতও হইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ-বংশধর 'শ্রীমন্নিত্যানন্দ-বংশবল্লী'র লেখক ক্ষীরোদবিহারী গোস্বামী এবিষয়ে নানা কৌতূহলজনক সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন। নিত্যানন্দ প্রথম জীবনে শৈব ও তন্ত্রমতে বিশ্বাসী ছিলেন—ত্রিপুরাসুন্দরীর এক শিলামূর্তি খড়দহে স্থাপন করিয়াছিলেন।[২৩] সুতরাং তান্ত্রিক ব্যাপারের প্রতি পুত্র বীরচন্দ্রের কৈশোর-যৌবনে আকর্ষণ থাকাই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে পিতার সঙ্গে তাঁহার মতান্তর হইলে তিনি অভিমানে কিছুদিনের জন্য খড়দহ ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে গিয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।[২৪] সেখানে তিনি বহু বৌদ্ধ মতাবলম্বী ভিক্ষুদের দেখিয়াছিলেন—যাহারা হিন্দুসমাজে ঠাঁই না পাইয়া 'নেড়া-নেড়ী' এই অপনামে অভিহিত হইত ও অন্ত্যজের মতো ঘুরিয়া বেড়াইত—শীল-সদাচারের বড় একটা ধার ধারিত না। ইহাদের সংখ্যা নাকি বারো শত হইয়াছিল। বীরচন্দ্র ইহাদিগকে সংযত ও নিয়মাবদ্ধ করিয়া বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন এবং ইহাদের দাম্পত্য-জীবন নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মানুগ করিবার জন্য তেরো শত 'নেড়ী'ও নির্দেশ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে 'নিত্যানন্দ বংশবিস্তারে' আছে :

বারশত নাঢ়া আর তেরশত নেড়ি।
কেহো বহে গঙ্গাজল কেহো শোধে বাড়ি॥
বীর ২ করি নাঢ়া করে সিংহনাদে।
কারে নাহি ভয় বীরচন্দ্রের প্রসাদে॥
হেন লীলা বীরচন্দ্রের ইহাতে হৈল।
নাঢ়ি সৃষ্টি করি নাঢ়ার তেজ ক্ষয় হৈল॥
তথাপি নাঢ়ার তেজ ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়॥[২৫]

(নিত্যানন্দ বংশবিস্তার, পৃ. ২৩)

---

২৩ ক্ষীরোদবিহারী গোস্বামী—শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশবল্লী, পৃ. ১১৩

২৪ জানকীনাথ পালের 'শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতে' (গ্রন্থ) আছে—স্বয়ং নিত্যানন্দও নাকি পার্বত্য গারো অঞ্চলে হাজঙ প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যেও বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। "সুসঙ্গের মহারাজদের এলাকার পর্বতবাসী গারো হাজঙেরা প্রভু নিত্যানন্দ বংশীয় প্রভুদিগের শিষ্য; তাহারা হরি সঙ্কীর্তন করে, শ্রীগৌর-নিতাইর বিগ্রহ স্থাপন করিয়া সেবা করে, ও তাঁহাদের শ্রীত্যর্থে মহোৎসব করে।" (পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ১৬৩)

২৫ 'আনন্দভৈরব' শীর্ষক একখানি সহজিয়া পুঁথিতেও এই বারো শত নেড়া ও তেরো শত নেড়ীর উল্লেখ আছে :

ক্ষীরোদবিহারী গোস্বামীও তাঁহার গ্রন্থে ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।[২৬] এবিষয়ে নির্ভরযোগ্য বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব সমাজ-ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাদিতেও এ সম্পর্কে কোন আলোচনা পাওয়া যায় না। আমাদের অনুমান, নিত্যানন্দই রক্ষণশীল বৈষ্ণব সমাজের দ্বার মোচন করিয়া অন্যান্য সম্প্রদায়কেও ইহার মধ্যে আহ্বান করেন। তিনি নিজেও বর্ণাশ্রমের রীতিনিয়ম মানেন নাই; সুবর্ণবণিক উদ্ধারণ দত্তের পাককরা অন্ন গ্রহণেও তাঁহার কোন দ্বিধা সঙ্কোচ ছিল না। পুত্র বীরচন্দ্রও এই আদর্শে মানুষ হইয়াছিলেন। সুতরাং একদা বৌদ্ধ উপযানের কেন্দ্র পূর্ববঙ্গের হিন্দু-সমাজ বহিষ্কৃত 'নেড়ানেড়ী' নামে ঘৃণিত সহজিয়া বৌদ্ধসম্প্রদায়কে তিনি বৈষ্ণবধর্মে, বিশেষতঃ নিত্যানন্দ পন্থায় দীক্ষা দিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? ইহাদের উচ্ছৃঙ্খল যৌনজীবনকেও তিনি বৈবাহিক আনুগত্যের মধ্যে আনিয়া কতকটা পারিবারিক সংযম সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। পরে এই শ্রেণীই বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউলদের দল বৃদ্ধি করিয়াছিল। অবশ্য বীরচন্দ্রের ভক্তের দল (সহজিয়া সম্প্রদায়) এই 'নেড়ানেড়ী' শব্দকে তান্ত্রিক

বীরভদ্র গোসাঞি ভাব জানি আসি মন।
বৈরাগীকে শিখাইলেন আপন করণ॥
যদি এই বাক্যে প্রতীত না হয় মনে।
বারশ নেড়াকে তেরশত নেড়ী দিলেন কেনে॥

(মণীন্দ্রমোহন বসু—সহজিয়া সাহিত্য, পৃ. ১৪৮)

২৬ বীরচন্দ্র পূর্ববঙ্গে গিয়া "দেখিলেন বৌদ্ধগণের প্রবল অত্যাচারে হিন্দু একেবারে অবসন্ন প্রায়।...বিশেষ চেষ্টাতেও হিন্দুগণ তাহাদের স্থান দেয় নাই। সেই সময়ে তাহাদের সংখ্যা আনুমানিক ১২০০ ছিল। তাহাদের আকার ও পরিচ্ছদ বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা এইরূপ। কেশবিহীন মস্তকে শিখামাত্র অবশিষ্ট। শুক্লবাস (অর্থাৎ গড়া) পরিধান ও উত্তরীয় তদ্রূপ। হস্তে দণ্ড এবং ভিক্ষাপাত্র (কিস্তি)। বীরচন্দ্র দেখিলেন, এই উন্মূলন জাতিকুল হারাইয়া গৃহস্থের উপর যথাচিৎ (sic) অত্যাচার করিতেছে। অপারপর জ্ঞানশূন্য পরম দয়াল বীরচন্দ্র প্রভু তাহাদিগকে ডেকে উদ্ধার করিয়া আপন স্নেহময় ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং ভিক্ষার সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করিতে আদেশ করিলেন। ইহারাই নেড়া বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিল। কিছুদিন পরে নেড়ার দল অত্যন্ত বলবান হইয়া উত্তেজিত হইল। তখন প্রভু নেড়ি সৃষ্টি করিয়া বিবাহের আদেশ করিলেন। অদ্যাবধি তাহাদের সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে।" (শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশবল্লী, পৃ. ১৬৯—১৭১)

সাধনার 'নাড়ি'র রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'শ্রীবীরভদ্র গোস্বামীর শিষ্যশিক্ষা, যন্ত্রকারিকা গ্রন্থ' নামক একখানি সহজিয়া পুঁথিতে নেড়ানেড়ী প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে :

বারশত নাড়ি জগতে দেখ ভাল মতে।
ইহার ব্যবস্থা তুমি করহ সাক্ষাতে॥
তেরশত নাড়ি তোমার অঙ্গে প্রকাশ।
তবে হবে নাড়ানাড়ি জগতে উল্লাস॥[২৭]

এখানে স্পষ্টতঃ নেড়ানেড়ীর ব্যাপারকে সহজিয়া তন্ত্রমতের নাড়িতত্ত্বরূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যাহা হউক, ইহাতে বিশেষ সংশয় নাই যে, নিত্যানন্দ-বীরভদ্র প্রভাবিত খড়দহ গোষ্ঠী বর্ণাশ্রমবহির্ভূত এই সমস্ত তথা-কথিত কদাচারী সম্প্রদায়কেও দীক্ষা দিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২৮] এই ব্যাপারে 'দয়াল নিতাইচাঁদ' ও বীরচন্দ্রের উদার মনের পরিচয় পাওয়া গেলেও বৈষ্ণব সহজিয়া নামক যে উপসম্প্রদায় বৈষ্ণবসমাজ ও আদর্শে অনুপ্রবেশ করে তাহার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে বৈষ্ণব সমাজের ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। যৌনাচার-সংক্রান্ত গোপনীয় কৃত্যসমূহ এই সমস্ত সম্প্রদায়ের দ্বারা বাহিত ও অনুশীলিত হইয়া হিন্দুসমাজের মধ্যেও কথঞ্চিৎ প্রবেশ করিয়াছিল। কর্তাভজা, বাউল প্রভৃতি উপধর্মাশ্রয়ী দলের তত্ত্বাদর্শ অতিশয় উচ্চমার্গের হইলেও যৌনরূপকের জন্য ইহার পথ যে অত্যন্ত পিচ্ছিল ও বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সহজিয়াগণ বৈষ্ণব সমাজে প্রবেশের ছাড়পত্র পাইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য নিত্যানন্দ, বিশেষতঃ বীরচন্দ্রের কথা তাহাদের পুস্তিকায়, এবং সাধনভজন সংক্রান্ত কড়চাগ্রন্থে পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন, কোথাও-বা বীরচন্দ্রের ব-কলমে নিজেদের অনেক গূঢ় আচরণের কথা চালাইয়া দিয়াছেন। এই দিক দিয়া ইঁহাদের একটা বিশেষ সামাজিক ভূমিকা রহিয়াছে, যাহা শুধু বৈষ্ণব সম্প্রদায়কেই নহে, হিন্দুসমাজকেও যৎকিঞ্চিৎ স্পর্শ করিয়াছিল।

---

২৭ ইহার একখানি আবরণপত্রহীন ছাপা পুস্তিকা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে আছে।

২৮ শুনা যায় বর্তমান শতাব্দীতেও সহজিয়া নেড়ানেড়ী সম্প্রদায় খড়দহে বৎসরে একবার মিলিত হইয়া বীরচন্দ্রের স্মরণোৎসব করিতেন। (দ্রষ্টব্য—দীনেশচন্দ্র সেনের "*The Vaisnava Literature of Medieval Bengal*, p. 156)

ঝামটপুরের যদুনন্দনাচার্যের দুই কন্যার সঙ্গে বীরচন্দ্রের বিবাহ হয়—জাহ্নবাদেবীই এই বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যের মতো বীরচন্দ্রও নিজের শ্বশুরকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২৯] তাঁহার বিবাহেও প্রচুর ঘটা হইয়াছিল—'ভক্তিরত্নাকরে' সেইরূপ উল্লেখ আছে। বিবাহের পর তিনি গৌড়ের বৈষ্ণবতীর্থ পরিক্রমার পর বৃন্দাবন পরিদর্শন করেন।

বীরচন্দ্রের বিপুল প্রভাবের জন্য তাঁহার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে নানা গালগল্প চলিয়া আসিতেছে। তিনি নাকি কোন এক নবাবকে স্বীয় 'কেরামতে' মুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং নবাবের নিকট একখণ্ড প্রস্তর চাহিয়া লইয়াছিলেন। সেই প্রস্তরখণ্ড হইতেই তিনটি মূর্তি নির্মিত হয়—শ্যামসুন্দর (খড়দহ), নন্দদুলাল (স্বামীবন), বল্লভজী (বল্লভপুর)। মুসলমান শাসক তাঁহার উপর শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁহার অনেক ইচ্ছা পূরণ করিয়াছিলেন। বীরচন্দ্রও মন্দির শীর্ষে 'খুন্তি' (অর্থাৎ হিন্দুর ত্রিশূল ও মুসলমানের অর্ধচন্দ্র) প্রোথিত করিয়া মুসলমান শাসকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁহার যে বীতরাগ ছিল না, 'খুন্তি'ই তাহার প্রমাণ, এবং এই জন্য মুসলমানগণ খড়দহে শ্যামসুন্দরের মন্দির আক্রমণ বা মূর্তি অপবিত্র করে নাই।

'প্রেমবিলাসে' নিত্যানন্দদাস পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, তিনি বীরচন্দ্র-চরিত লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। 'প্রেমবিলাসে'র বিংশ বিলাসের পর বীরচন্দ্রের কাহিনী কিছু বিস্তারিত আকারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ এই অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। গোস্বামী সম্প্রদায় নিত্যানন্দের বংশধারা সম্বন্ধে নানা তথ্য বাঁচাইয়া রাখিলেও বীরচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহারা এতটা মিতবাক কেন, তাহা সন্দেহের বিষয়। নিত্যানন্দদাস বীরচন্দ্র-চরিতকথা অবলম্বনে কোন কাব্য নিশ্চয় লিখিয়াছিলেন, কিন্তু দলগত প্রভুত্ব বা গুরুপদ বজায় রাখিবার জন্য এইরূপ পুঁথি নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে—কেহ কেহ এরূপ সন্দেহও করিয়া থাকেন।[৩০] সে সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নহে। পরবর্তী কালে বৈষ্ণব

২৯ "যদুনন্দনের বীরচন্দ্র শিষ্য কৈল"—ভক্তিরত্নাকর, ১৩শ

৩০ D. C. Sen—"*The Vaisnava Literature of Medieval Bengal*, p. 169

সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা মতান্তর ও কুৎসিত স্বার্থকলহের সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহার কিছু কিছু উত্তাপ আমাদের যুগেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে।[৩১] সে যাহা হউক, উত্তরকালীন বৈষ্ণব সমাজবিবর্তনের ইতিহাসে বীরচন্দ্রের ঐতিহাসিক ভূমিকা যে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

শান্তিপুর গোষ্ঠী ॥

অদ্বৈত আচার্য এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দের নেতৃত্বে অদ্বৈত-পরিকরগণও একদা বৈষ্ণবসমাজে বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। চৈতন্যবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত হইবার পূর্বে অদ্বৈত আচার্য জ্ঞানমার্গী ও শঙ্করপন্থী বৈদান্তিক ছিলেন, এই কারণেই তিনি বোধ হয় অদ্বৈত নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।* মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত প্রভাব ও চরিত্রমাহাত্ম্যের প্রভাবে আচার্য প্রেমধর্ম গ্রহণ করিলেও অদ্বৈতবাদ ও জ্ঞানমার্গের প্রতি আকর্ষণ পুরাপুরি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। চৈতন্যদেব পুরীধামে বাস করিবার কালে নেতৃত্বের অভাবে গৌড়ে প্রেমধর্মের প্রভাব কিঞ্চিৎ দুর্বল হইয়াছিল, স্বয়ং অদ্বৈতও নাকি ভক্তি ছাড়িয়া পুনরায় জ্ঞান ও মুক্তি ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' এই সমস্ত প্রসঙ্গ আছে। এই সংবাদে চৈতন্যদেব বাঙলার ভক্তিধর্মের পরিণতি সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িলেন, এবং 'প্রেমবিলাস' ও 'ভক্তিরত্নাক'রের মতে বাঙলাদেশে পুনরায় প্রেমধর্ম প্রচারের জন্যই নাকি শ্রীনিবাসের জন্ম হইবে, একথা তিনি ভক্তদের নিকট বলিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু নীলাচলে থাকিতে শুনিলেন যে, অদ্বৈত আচার্য "ভক্তি না ছুঁইল, বাখানে পঞ্চবিধা মুক্তি।" প্রথমে তিনি ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, "ভক্তি ছাড়ি মুক্তি ব্যাখ্যা তাঁর নহে চিত।" কিন্তু ইতিমধ্যে খড়দহ হইতে নিত্যানন্দের পত্র আসিল, তাহাতে নিত্যানন্দও অভিযোগ করিলেন, "ভক্তিপথ ছাড়ি আচার্য মুক্তি বাখানিল।" মহাপ্রভু চিন্তিত হইয়া নিত্যানন্দের পত্রখানি কাশীমিশ্রের আবাসে গিয়া ভক্ত বাসুদেব ভট্টাচার্যকে

৩১ নিত্যানন্দবংশীয় ক্ষীরোদবিহারী গোস্বামী প্রণীত 'শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশাবলী' দ্রষ্টব্য।

* পরে অদ্বৈতজীবনী প্রসঙ্গে এই নামের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

(সার্বভৌম) দেখাইলেন। বাসুদেব একদা মুক্তিবাদী বৈদান্তিক ছিলেন, কিন্তু পরে মহাপ্রভুর প্রভাবে দ্বৈতবাদী ভক্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিত্যানন্দের পত্র পড়িয়া অদ্বৈতের প্রতি কিছু ক্রুদ্ধ হইলেন। চৈতন্যদেব তখন নিত্যানন্দকে একখানি ও অদ্বৈত আচার্যকে আর একখানি পত্র পাঠাইলেন। পত্রের মর্ম অবগত হওয়া যায় না। মনে হয় পুনরায় মুক্তি ও জ্ঞান ব্যাখ্যানের জন্য তিনি অদ্বৈতকে ভর্ৎসনা করিয়া এবং নিত্যানন্দকে প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য সচেষ্ট হইতে পত্র দিয়াছিলেন।

এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন সংবাদ হইতে মনে হইতেছে, শান্তিপুর গোষ্ঠীর সঙ্গে খড়দহ গোষ্ঠীর তত্ত্বগত প্রচ্ছন্ন বিরোধ ছিল—অদ্বৈত-নিত্যানন্দের জীবিত কালেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। জাতিহীন নিত্যানন্দকে অদ্বৈত রঙ্গরহস্য করিবার জন্য যে ব্যঙ্গোক্তি করিতেন, তাহাকে কেহ কেহ সত্য বলিয়া মনে করিতেন। দুই সম্প্রদায়ই বৈষ্ণব সমাজের নেতা ও গুরু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, এবং ইহার ফলে উভয়ের মধ্যে দৈবাৎ মতান্তর ঘটাও বিচিত্র নহে। এই মতান্তরের প্রমাণ—নিত্যানন্দের তিরোধানের পর খড়দহে যে স্মরণোৎসব হইয়াছিল, তাহাতে অনেক বৈষ্ণব যোগদান করেন নাই।[৩১]

জাহ্নবাদেবী প্রথমে অপ্রাপ্তবয়স্ক বীরচন্দ্রকে দীক্ষা দিতে অসম্মত হইলে তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়া শান্তিপুরে গিয়া দীক্ষা লইবার জন্য নৌকাযোগে যাত্রা করিয়াছিলেন। খড়দহের নিত্যানন্দ সম্প্রদায় দেখিলেন, নিত্যানন্দ-বংশধর শান্তিপুরে গিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলে তাঁহাদের অসম্মান হইবে। তখন তাঁহারা বীরচন্দ্রকে অনুরোধ-উপরোধ করিয়া ফিরাইয়া আনেন এবং জাহ্নবাদেবী তাঁহাকে যথারীতি দীক্ষা দান করেন।[৩২]

অদ্বৈত আচার্যের তিরোধানের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দ শান্তিপুর গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তিনি নাকি মহাপ্রভুর আহ্বানে নীলাচলে গিয়া কিছুকাল শ্রীচৈতন্যের সান্নিধ্যে বাস করিয়াছিলেন। সখী ভাবে

---

৩১ 'নিত্যানন্দ বংশবিস্তারে'র পুঁথি, বিষ্ণুপুর সাহিত্যপরিষদে রক্ষিত।

৩২ 'নিত্যানন্দ বংশবিস্তার' নামক মুদ্রিত পুস্তিকায় আছে যে, বীরচন্দ্র জাহ্নবাদেবীর মত লইয়া শান্তিপুরে গিয়া দীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়া নৌকাযোগে শান্তিপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু নিত্যানন্দের প্রধান শিষ্যগণ (মীনকেতন, রামদাস প্রভৃতি) তাহা মানিতে পারিলেন না। তাঁহারাই নৌকার মুখ ফিরাইয়া বীরচন্দ্রকে খড়দহ ফিরাইয়া আনেন।

তাঁহার নৃত্যগীতের বর্ণনা 'অদ্বৈতপ্রকাশে' (১৬শ অধ্যায়) দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি মহাপ্রভুর ভাবরসে প্লাবিত হইয়াছিলেন, মনেপ্রাণে সেই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অচ্যুত কাশীধামের এক চৈতন্যবিমুখ সন্ন্যাসীর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। তাঁহার নির্দেশে সেই সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবকে দর্শন করিয়া মহানন্দে ভক্তিধর্ম গ্রহণ করেন।

শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়॥

ইতিপূর্বে অন্যত্র[৩৩] আমরা শ্রীখণ্ড সম্প্রদায় সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে এই শ্রীখণ্ড (বৈদ্যখণ্ড) গ্রাম বৈষ্ণব সমাজে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এখানে প্রসঙ্গক্রমে সে বিষয়ে দুই-এক কথা বলা যাইতেছে।

নরহরি সরকার ঠাকুরের নেতৃত্বে শ্রীখণ্ডের বৈদ্য সমাজে মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করিয়া এক প্রকার আদিরসাত্মক ভাব ও সাধনা প্রচাবিত হইয়াছিল। ইহাই নাগরীভাবেব সাধনা বা গৌবনাগর সাধনা নামে প্রচারিত হইয়াছিল। নরহরি, বাসুদেব ঘোষ, লোচনদাস প্রমুখ কবিগণ নিজেদের নাগরী এবং গৌরাঙ্গদেবকে নাগররূপে দেখিতেন, সেইরূপ ভাবের অনেক পদও রচনা করিয়াছিলেন। তাই ইঁহাদের নিকট মুণ্ডিতমস্তক শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা চাঁচর-চিকুরধারী গৌরাঙ্গদেব অধিকতর আকর্ষণের পাত্র হইয়াছিলেন। এই ভাবসাধনার কেন্দ্র ছিল বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত কাটোয়ার নিকটবর্তী গ্রাম—শ্রীখণ্ড। পূর্বে ইহা শুধু খণ্ডগ্রাম বা বৈদ্যখণ্ডগ্রাম নামে অভিহিত হইত। অন্যান্য প্রাচীন বৈষ্ণব কেন্দ্রের মহিমা নিষ্প্রভ হইলেও শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব সম্প্রদায় এখনও পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত আছেন। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'ও শ্রীখণ্ডের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে।[৩৪]

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ, তাঁহার কনিষ্ঠ নরহরি এবং মুকুন্দের পুত্র নরহরির

---

৩৩ লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (২য়) দ্রষ্টব্য।

৩৪ মুকুন্দ শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন॥
এই সব মহাশাখা চৈতন্য কৃপাধাম।
প্রেম ফলফুল করেন যাঁহা তাঁহা দান॥

বিশেষ অনুরাগী রঘুনন্দন—শ্রীখণ্ডকে তাঁহারাই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত করেন। রঘুনন্দন পিতৃব্য কর্তৃক লালিত পালিত হইয়াছিলেন এবং নরহরির তিরোধানের পর ইনি শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। কবিরঞ্জন, যিনি 'ছোট বিদ্যাপতি' বলিয়া পরিচিত, এবং পদকর্তা রায়শেখর রঘুনন্দনের শিষ্য হইয়াছিলেন। শ্রীখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গবিগ্রহের বামে বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্তি স্থাপিত দেখা যায়। শুনা যায় রঘুনন্দনের পুত্র ঠাকুর কানাই ইহা স্থাপন করিয়াছিলেন।[৩৫] এই সম্প্রদায় গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল মূর্তির অধিকতর পক্ষপাতী। শুধু তাই নয়, গদাধর চৈতন্যদেবের প্রকৃতি বিবেচিত হইতেন বলিয়া নরহরি ও তাঁহার শিষ্যেরা গৌর-গদাধরের যুগল উপাসনাও অনুমোদন করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস-নরোত্তম নাগরীভাবের সাধনা না করিলেও তাঁহারা রঘুনন্দনের সঙ্গে শ্রদ্ধাপ্রীতির সম্পর্ক রক্ষা করিতেন। এই শ্রীখণ্ডের অধিবাসী প্রসিদ্ধ চৈতন্যভক্ত চিরঞ্জীব সেনের দুইটি বিখ্যাত পুত্র রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দদাস কবিরাজ বৈষ্ণব সমাজ ও সাহিত্যে সুপরিচিত। নরহরির তিরোধানের পর তাঁহার তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে শ্রীনিবাসের নেতৃত্বে শ্রীখণ্ডে বহু বৈষ্ণব মিলিত হইয়াছিলেন, রঘুনন্দন সযত্নে তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। খেতুরী সম্মেলনের পূর্বে ইহাই প্রথম বৃহৎ বৈষ্ণব সম্মেলন। এখনও সেই তিথিতে বৈষ্ণবগণ এই গ্রামে মিলিত হন।

রঘুনন্দন যদিও নাগরীভাবের সাধক ছিলেন, তবু অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁহার বেশ প্রীতির সম্পর্ক ছিল, জাহ্নবাদেবী তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার পুত্র ঠাকুর কানাই পিতার তিরোধান তিথি উপলক্ষে শ্রীখণ্ডে আর একটি বৈষ্ণব সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। রঘুনন্দনের জীবিত কালেই অনেক বৈষ্ণবভক্ত গৌরমন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছিলেন। তাঁহার লোকান্তরের পরেও এই গ্রামের মহিমা হ্রাস পায় নাই, আজও সে গৌরব অক্ষুণ্ণ আছে। তাঁহার বংশধরেরা দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রীখণ্ড বৈষ্ণবসমাজের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

নরহরি-রঘুনন্দনের গৌরনাগর মতবাদ এক শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়

---

৩৫ গৌরগুণানন্দ ঠাকুর—শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব, পৃ ১০৯

হইলেও শ্রীনিবাস-নরোত্তম এবং শান্তিপুর-খড়দহ সম্প্রদায় পুরাপুরি এই মতের সমর্থক ছিলেন না। তবু তাঁহারা খণ্ডগ্রামকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। বৃদ্ধ নরহরি তো সর্বজনমান্য ছিলেন। নাগরীভাবের সাধনার পটভূমিকায় যে ঐকান্তিকতা ছিল, বৈষ্ণব আচার্যগণ তাহার সাত্ত্বিক গৌরব নিশ্চয় স্বীকার করিতেন। কিন্তু নাগরীভাবের সাধনা গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শ সম্মত নহে—কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন মূলতঃ রূপসনাতন-গোপালভট্ট-জীবগোস্বামী নির্দেশিত পথেই অগ্রসর হইয়াছিল। উপরন্তু এই আদিরসাত্মক আবেগ-উচ্ছল ধর্মসাধনা যে সকলের জন্য নহে, তাহাও তাঁহারা নিশ্চয় বুঝিতেন। অধিকারীর নিকট যাহা সুপেয়, তাহাই অনধিকারীর হাতে পড়িলে মাদক দ্রব্যে পরিণত হইতে পারে। শ্রীখণ্ডের নাগরীভাবের আদর্শ আদিরসের ফেনোচ্ছ্বাসের জন্য দল বা ব্যক্তি বিশেষের নিকট বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। ভাবাবেগের অতিরেকের ফলে এই নাগরীভাবের সাধনাই তলে তলে সহজিয়া পন্থীদের সাহস বাড়াইয়া দিয়াছিল। বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল সম্প্রদায় প্রভৃতির মূলে শ্রীখণ্ডের নাগরী সাধনার যে বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

সহজিয়া সম্প্রদায় ॥

বাঙলাদেশে বর্তমান শতাব্দীতে পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞগণ সহজিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্ব ও আচার-আচরণ লইয়া নানা তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের ভজনগীতিকা ও তত্ত্বব্যাখ্যাসমন্বিত কড়চাজাতীয় গদ্য বা পদ্যের অনেক ছোট বড় পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে' (২য় ভাগ) সর্বপ্রথম এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন। ইহাদের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য উপসম্প্রদায় সম্বন্ধেও তিনি কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পরে আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখক, বৈষ্ণব পদাবলীর রসিক পাঠক এবং গবেষকগণ বৈষ্ণব সহজিয়াদের জীবনচর্যা ও সাধনভজন সংক্রান্ত নানা তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু এবং ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় এই পন্থার সাহিত্য ও ধর্মচর্চা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম গবেষকের

দৃষ্টি লইয়া তথ্যনির্ভর আলোচনা করেন।[৩৬] সম্প্রতি কেহ কেহ বাউলসম্প্রদায় লইয়া যে সমস্ত আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারাও কথাপ্রসঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণবদের সঙ্গে বাউলসম্প্রদায়ের যোগাযোগ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[৩৭] এই মত, পথ ও দর্শন এমন বিচিত্র ও রহস্যময় যে, সাগরপারের বিদেশী পণ্ডিতেরাও এ বিষয়ে নানা তথ্য সন্ধান করিতেছেন, কৌতূহল দেখাইতেছেন।[৩৮] সুতরাং দেখা যাইতেছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত অথবা উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহীত সহজিয়া সম্প্রদায় সম্বন্ধে বিদ্বৎ সমাজে নানা প্রশ্ন উদিত হইয়াছে। অবশ্য এই সম্প্রদায়ের সাধনভজন সংক্রান্ত যত আলোচনা হইয়াছে, উহাদের উৎপত্তি ও বিকাশধারার ঐতিহাসিকতা লইয়া ঠিক ততটা গবেষণা হয় নাই। এই সম্প্রদায় বরাবর নিভৃতচারী। ইহারা স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া নানাবিধ গোপনীয় যৌনপ্রক্রিয়া ও প্রতীকের সাহায্যে সাধনা করিয়া থাকেন—ইঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ একটা ধারণা নানা মহলে প্রচলিত আছে। ফলে ইঁহাদের আচার-আচরণের প্রতি সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ—সকলেই বিশেষ কৌতূহল বোধ করিয়া থাকেন। এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যে সমস্ত পুঁথিপত্র আছে তাহা হইতেই ইঁহাদের আচার-আচরণ ও মতাদর্শ সম্বন্ধে মোটামুটি জানা যাইবে। এইরূপ পুঁথির সংখ্যা প্রায় পাঁচশত। তন্মধ্যে অনেকগুলি খণ্ডিত ক্ষুদ্র রাগাত্মিকা পদাবলীসংগ্রহ এবং কিছু কিছু তত্ত্বগ্রন্থও আছে। ইঁহাদের তত্ত্বগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তিনটি পুঁথি—'আগম', 'আনন্দভৈরব' এবং 'অমৃতরসাবলী' অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু সঙ্কলিত 'সহজিয়া সাহিত্যে' মুদ্রিত হইয়াছে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এবং ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁহাদের গ্রন্থে এই সম্প্রদায়ের আরও অনেক পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সমস্ত পুঁথি হইতে

---

৩৬ মণীন্দ্রমোহন বসুর (ক) *Post Castanya Sahajiya Cult*, (খ) সহজিয়া সাহিত্য, (গ) রাগাত্মিকা পদের ব্যাখ্যা (কলিঃ. বিশ. প্রকাশিত JDL দ্রষ্টব্য) এবং ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের *Obscure Religious Cults as the Background of Bengali Literature* দ্রষ্টব্য।

৩৭ বাংলার বাউল—ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

৩৮ সম্প্রতি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক এডোয়ার্ড ডিমক সহজিয়া সাহিত্য সম্বন্ধে বিরাট গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন।

ইঁহাদের আলোচনায় অনেক শ্লোক উদ্ধৃতও হইয়াছে। চণ্ডীদাস এবং সহজিয়া মতের আরও অনেক কবি নিজেদের তত্ত্বসাধনা সম্পর্কে প্রহেলিকাপূর্ণ ভাষায় যে সমস্ত পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহাকে 'রাগাত্মিকা পদ' (যে পদে বিশুদ্ধ অনুরাগকেই সাধ্যসাধন বলিয়া গ্রহণ করা হয়) বলা হইয়া থাকে। এইরূপ বহু রাগাত্মিকা পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার কিছু কিছু ইতিপূর্বেই চণ্ডীদাস, লোচনদাস প্রভৃতি কবিদের ভণিতায় বৈষ্ণব-পদসংগ্রহে স্থান করিয়া লইয়াছে। কোন কোন পদে বিদ্যাপতি, রূপ-সনাতন প্রভৃতি লোকমান্য কবি ও সাধকের ভণিতা পাওয়া যায়। অনুমান হয়, সহজিয়া সাধকগণ নিজ নিজ মত ও আদর্শকে বিশিষ্ট সমাজে পাংক্তেয় করিবার জন্য বৈষ্ণব আচার্যদেব ভণিতাদি যথেচ্ছা ব্যবহার করিয়াছেন।

পালযুগে খ্রীঃ অষ্টম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাঙলাদেশে বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায় বেশ প্রবল ছিল। প্রাচীন বাংলা ও অপভ্রংশভাষায় ইঁহাদের রচিত ভজনগীতিকা ও তত্ত্বগ্রন্থ আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হইয়াছে। এই বৌদ্ধ সহজিয়ারা পরে ব্রাহ্মণ্যমতাশ্রয়ী সেনরাজত্বে আত্মগোপন করিয়া খুব সম্ভব সমাজের অন্তেবাসীদের মধ্যে আশ্রয় লয়, কেহ কেহ তুর্কী আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় বা হিন্দুসমাজের বিরোধিতায় নিজ নিজ পুঁথিপত্র লইয়া বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রস্থান করে। নেপাল-ভুটান অঞ্চল হইতে তাহারই সামান্যতম ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বৌদ্ধ সহজিয়া সাহিত্য বলে।

অনেকে মনে করেন যে, এই বৌদ্ধ সহজিয়ারাই কালক্রমে বৈষ্ণব-সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া 'বৈষ্ণব সহজিয়া' নাম গ্রহণ করে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিয়া গোপনে গোপনে নিজেদের গূঢ় সাধনভজনে আসক্ত হইতে থাকে। বৌদ্ধ সহজিয়াদের শেষ কথা প্রজ্ঞা ও উপায়ের (ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রমতে শিব ও শক্তি) সামরস্যসম্ভূত মহাসুখরূপী করুণাপূর্ণ, শূন্যতাজ্ঞাপক ও অদ্বয়স্বভাব নির্বাণ লাভ। বৌদ্ধ সহজিয়া মতে মহাসুখ বুঝাইতে বহুস্থলে যৌনপ্রতীক ও প্রক্রিয়ায় অনুরূপ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও যোগ-দর্শনের তত্ত্বকথাও প্রবেশ করিয়াছে। ফলে বৌদ্ধ সহজিয়া মতের একাংশে আধ্যাত্মিক, নির্বিকল্প মহাসুখসম্পদ, আর একদিকে পবনবিজয়ের দ্বারা যোগস্থাবস্থায় চিত্তপ্রবাহ স্থগিত করণ, এবং তন্ত্র ও হঠযোগের নাদবিন্দুসাধন

বজ্রোলী মুদ্রা প্রভৃতির দ্বারা দেহভাণ্ডেই ব্রহ্মাণ্ডের উপলব্ধি—শিরঃস্থিত সহস্রারে পার্বতীপরমেশ্বর বা প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলনজনিত অনন্ত আনন্দলাভ—যাহার ফলে ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ, দুঃখের কারণ পঞ্চস্কন্ধাত্মক পিণ্ডদেহের বিলুপ্তি, পূর্বজন্মের মূলোচ্ছেদ, পরিশেষে কৈবল্য লাভ। এই তত্ত্বকথা চিত্তের অদ্বয় অবস্থার দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, আবার শারীরিক ও মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারাও ইহা স্থূল দেহায়তনেই উপলব্ধ হইতে পারে।

পরবর্তী কালে সেনযুগে ব্রাহ্মণ্য মতের প্রাধান্যের ফলে এই জাতীয় কায়াসাধনা বোধ হয় উচ্চতর সমাজে নিন্দিত হইয়াছিল। শাসক শক্তি এবং ব্রাহ্মণ্য মত শাসিত অভিজাত সমাজের প্রতিকূলতার আশঙ্কায় বৌদ্ধ সহজিয়াগণ যে আত্মগোপন করিয়াছিল, এবং নাথধর্ম, তন্ত্র, কুলাচারের মধ্যদিয়া কোনক্রমে আত্মরক্ষা করিতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদের এক শাখা 'নেড়া-নেড়ী' নামে অভিহিত হইত। ইহারা বর্ণাশ্রমধর্মের বিরোধী জীবনযাপন করিত। ইহারা সামাজিক ও পারিবারিক নিয়ম-শৃঙ্খলার বড় একটা ধার ধারিত না, যৌন সম্পর্ককে সংহিতা ও সমাজপ্রয়োজনের দ্বারা সংযত করিবার প্রয়োজন বোধ করিত না। মুণ্ডিতমস্তক, ভিক্ষোপজীবী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষ স্বরূপ এই স্ত্রীপুরুষগণ অবাধে মেলামেশা করিত, রিপুর নির্বাধ চর্যাকেই রহস্যময় সাধনা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিত। বলা বাহুল্য হিন্দু সমাজের বড় কেহ ইহাদিগকে শ্রদ্ধা-সম্মানের চোখে দেখিত না, 'নেড়া-নেড়ী' অপনামে ইহাদিগকে ঘৃণাই করিত। এই সময়ে নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র ইহাদিগকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে স্থান দিয়া ইহাদের কদাচার দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।[৩৯] অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব নিবন্ধ, সমাজ ও ইতিহাস-সংক্রান্ত গ্রন্থে দেখা যাইতেছে বীরচন্দ্র বহু 'নেড়া-নেড়ীকে' চৈতন্য প্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর নাম দিয়া তাহাদিগকে বৈষ্ণব-সমাজে স্থান দিয়াছিলেন। এই সমস্ত অপাংক্তেয় ঘৃণ্য অবহেলিত সম্প্রদায়কে দয়াল চৈতন্যচন্দ্র ও নিতাইচাঁদের কৃপার দ্বারা উচ্চতর প্রেমের পরিমণ্ডলে আনয়ন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এই ব্যাপার শুরু হইয়াছিল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিক হইতে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি—অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই পূর্বোল্লিখিত 'নেড়া-নেড়ী'গণ বৈষ্ণব সমাজে প্রবেশ করিয়া বৈষ্ণব-

৩৯ পূর্বে বীরচন্দ্র উপচ্ছেদে এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

সম্প্রদায়ের মধ্যেই বৈষ্ণব সহজিয়া নামে একটি উপধর্মসম্প্রদায় রূপে পরিচিত হয়। ইহারা নিজেদের সহজ রসিক বা সহজ পথের পথিক বলিত—যে 'সহজ পথের' অর্থ প্রেম, যাহা মানুষের সহজ ধর্ম। সেই প্রেমসাধনায় সিদ্ধিলাভ করাই মানুষের শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ এবং সেই প্রেমসাধনার জন্ত মানবদেহই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কেমন করিয়া জড়দেহী মানবপ্রকৃতি 'রূপ', 'স্বরূপ' ও 'আরোপের' মধ্য দিয়া "জীয়ন্তে মরা" হইয়া কাম ও প্রেমকে একত্রে মিশাইয়া তুরীয়ানন্দে পৌঁছাইতে পারে—তাহাই এই উপসম্প্রদায়ের মূলকথা। ইঁহারা বাস্তবচেতনা ও ভূতদেহকে সূক্ষ্মতর চৈতন্তলোকে তুলিয়া ধরিয়া প্রেম ও রূপকে সাধনার সোপান হিসাবে ইহাকে ব্যবহার করিতেন; কেহ কেহ আরোপপন্থার দ্বারা পার্থিব নরনারীর দেহকে রাধাকৃষ্ণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া মর্ত্যদেহেই অমৃত ও আনন্দস্বরূপ প্রেমকে উপলব্ধি করিতেন। এই পন্থার জড় অতি-প্রাচীন। তন্ত্র, পরবর্তী কালের বৌদ্ধধর্ম, নাথধর্ম, যোগপন্থা ও কৌলপন্থীদের মধ্যে ইহা নানা নামরূপ লইয়া অনুশীলিত হইয়াছে। বৈষ্ণব সহজিয়ারা মূলতঃ বৌদ্ধ সহজিয়াদের ধ্বংসাবশেষ—তাহা একপ্রকার সুনিশ্চিত।[৪০] বৈষ্ণব সহজিয়াদের প্রেমতত্ত্ব ও বৌদ্ধ সহজিয়াদের নির্বাণরূপ মহাসুখের মধ্যে তত্ত্বগত সাদৃশ্য আছে। বৈষ্ণব সহজিয়াদের মূল আদর্শ রূপ-

৪০ অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু 'সহজিয়া সাহিত্যে' বলিয়াছেন, "আবার কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন যে, বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা হইতে বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে। কোন সহজিয়া গ্রন্থে এবং ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় ইহার সমর্থনযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।" (ভূমিকা, পৃ. ৷৵৹-৸৹) অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, "It is not difficult to find out both in thought and practice there is perfect agreement between the Euddhist and the Vaishnava Sahajiya doctrines on certain important points (*Post Caitanya Sahajiya Cult*, p. 140). অবশ্য বৌদ্ধ সহজিয়া ও বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে কোন কোন স্থলে বিশেষ মতপার্থক্য থাকিলেও মণীন্দ্রমোহন ঠিকই বলিয়াছেন, "We thus find that there was among the Buddhists a sect following the Sahajiya doctrine which in many of its characteristics resembled the modern Vaishnava Sahajiya doctrines of Bengal." (Ibid, pp. 141-42) ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই মতে বিশ্বাসী, "A close study of the literature of the Vaishnava Sahajiyas will leave no room for doubting the clear fact that it records nothing but the spirit and practice of the earlier Buddhist and Hindu Tantric cults, of course in a distinctly transformed form wrought through the evolution of centuries in different religious and cultural environments." (*Obscure Religious Cults as the Background of Bengali Literature*, pp. 134-35)

প্রেম-আনন্দ ; বৌদ্ধ সহজিয়ারা শূন্যতা, করুণা ও মহাসুখরূপ নির্বাণবাদী। উভয়ের মূল পার্থক্য, বৈষ্ণব সহজিয়াগণ জগৎকে স্বীকার করিয়াছেন, বৌদ্ধ সহজিয়াগণ জগৎকে উচ্ছেদ করিয়াছেন। তাহা হইলেও উভয়ের মধ্যে তত্ত্বগত সাদৃশ্য আছে।

সহজিয়া বৈষ্ণবগণ বহুস্থলে হরদুর্গার প্রসঙ্গে আগমপদ্ধতিতে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এমন কি শিব-পার্বতী, রাধা-কৃষ্ণ সহজ সাধনা করিতেছেন, সহজিয়াদের কোন কোন পুঁথিতে এরূপ বর্ণনাও আছে। কিন্তু কোথাও প্রত্যক্ষ ভাবে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত কোন উল্লেখ নাই। অপর দিকে ইঁহারা চৈতন্যদেবকে গুরুবৎ মান্য করিতেন। সমালোচকের একথা মিথ্যা নহে, "এমন একখানাও সহজিয়া গ্রন্থ নাই, যাহাতে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যদিও শৈবতন্ত্রের ধ্যান সহজিয়ারা অকপটে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।"[৪১] ইহার কারণ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন বৈষ্ণব সহজিয়ারা সমাজে ঠাঁই করিয়া লইয়াছিলেন এবং নিজেদের মতপ্রকাশক কিছু কিছু সাহিত্য রচনা করিতেছিলেন, তাহার বহু পূর্বেই বৌদ্ধপ্রভাবের প্রত্যক্ষ স্বরূপ বর্ণাশ্রমধর্মভুক্ত সমাজ হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। শুধু এই শ্রেণীর নেড়ানেড়ী-দের মধ্যে বৌদ্ধ সহজিয়াদের কায়াসাধনার ধারাটি বদ্ধ জলাশয়ের আকারে পড়িয়া ছিল। উপরন্তু এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৌদ্ধমতের যৎসামান্য সম্পর্ক ছিল বলিয়াই ইহারা সমাজে নিন্দিত হইয়াছিল, অপাংক্তেয় হইয়া পড়িয়াছিল। পরে ইহারা যখন বীরচন্দ্রের চেষ্টায় বৈষ্ণব সমাজের একান্তে ঠাঁই পাইল তখন চৈতন্য-নিত্যানন্দের প্রেমধর্মকেই সাধনার অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিল। তাহাদের যাবতীয় সাহিত্য এই সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাই তাহাতে হিন্দুধর্মঘেঁষা শৈব ও বৈষ্ণবমতের এত প্রাধান্য। যদি তাহাদের রচিত তৎপূর্ববর্তী সাহিত্য পাওয়া যাইত, তাহা হইলে তাহাতে নিশ্চয়ই কোন না কোন প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ থাকিত।

সহজিয়ারা মনে করেন, এ ধর্ম আবহমান কাল ধরিয়া চলিতেছে। মানবদেহকে স্বীকৃতি দিয়া ও অবলম্বন করিয়া অনুরাগাশ্রয়ী অধ্যাত্ম সাধনা পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত ছিল—এখনও আছে। ভারতের বৈষ্ণবমতাশ্রয়ী প্রেম-

৪১ মণীন্দ্রমোহন বসু—সহজিয়া সাহিত্য, পৃ, ।৶৹-।৶৹

ধর্ম শৈব-নাথ-ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও অন্যান্য লোকধর্মে এইরূপ রূপাশ্রয়ী আবেগমূলক অধ্যাত্মসাধনার কথা অবিদিত নহে। কিন্তু সহজিয়া বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবমত ও রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব একত্রে মিশাইয়া এবং নিমাই-নিতাইচাঁদের নাম স্মরণ করিয়া এই প্রেমধর্মের একটি বিচিত্র রূপ নির্মাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের সাধনভজনের দুইটি দিক—একটি মনোমার্গে বৈদেহী সাধনা, আর একটি দেহমার্গে মহাসুখোপলব্ধি। সহজ মতে নিত্যবৃন্দাবনের রস ও রতির প্রতীক-স্বরূপ কৃষ্ণ ও রাধার যে সহজ রসলীলা, তাহা শুধু স্বর্গের বস্তু নহে, তাহার সঙ্গে মর্ত্যেরও যোগ রহিয়াছে। পৃথিবীর নরনারীও আরোপতত্ত্বের দ্বারা সীমাবদ্ধ মানবদেহেই সেই রসরতির অপার্থিব স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ লীলাকে দেহী মিথুনের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। মানবকেই দেবপীঠস্থানে তুলিয়া ধরা সহজিয়া মতের প্রধান লক্ষ্য। দেহ-মনের দ্বারা অনুভূত সহজানন্দ—যাহা জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা এই জড়দেহেই লাভ করা যাইতে পারে; তখন 'আরোপ' পদ্ধতির দ্বারা ভৌমজীবনের স্ত্রী-পুরুষই রাধাকৃষ্ণে পরিণত হয়। এই জাতীয় ধর্মসাধনায় প্রায় সর্বত্র পরকীয়া রীতিই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়া থাকে—তাই পরবর্তী কালের সহজিয়া সাধনায় সর্বত্র পরকীয়া নায়িকা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বলাই বাহুল্য এই জাতীয় প্রেমসাধনায় সিদ্ধিলাভ 'কোটিকে গুটিক হয়'। বহু স্থলে পদস্খলনের সম্ভাবনাই অধিক। পরেও দেখা যাইতেছে সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়, কর্তাভজা, আউল-বাউল, সাঁই মত ইত্যাদি উপসম্প্রদায়গুলি সহজিয়াদের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও ইঁহাদের দেহঘটিত সাধনার সঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণবের প্রেমতত্ত্বের স্থূল দিক দিয়া কিছু সাদৃশ্য আছে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই পশ্চিমবঙ্গে এই সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রেমতত্ত্বকে একমাত্র জীবনদর্শনরূপে গ্রহণ করিয়া রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বকে মর্ত্যবাসী মানবমানবীর উপরে আরোপ করিয়া যে অভিনব সাধন-প্রণালীর অনুশীলন করিতে আরম্ভ করেন তাহার মূল যোগ-তন্ত্র-হঠযোগ-তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মেই নিহিত। কিন্তু দেহ লইয়া যেখানে প্রধান কারবার, সেখানে স্খলন-পতনের সম্ভাবনাও প্রচুর, এবং কায়াসাধনা শেষ পর্যন্ত নির্জলা রিপুর অনুশীলনে পর্যবসিত হয়। বৈষ্ণব সহজিয়াদের সম্পর্কে এই আশঙ্কা যে

সত্য হয় নাই তাহা নহে। মঠে-আখড়ায় অনুশীলিত সহজ সাধনা প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া বাঙলাদেশে গোপনে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আধুনিককালে ইহার ব্যাপক অনুশীলন ক্রমেই সঙ্কুচিত ও শীর্ণ সম্প্রদায়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়াছে। প্রথমতঃ সামাজিক অনুশাসনের কঠোরতার জন্য এই মত গোপনে অনুশীলিত হইত, এবং গোপনীয়তার ফলে সূক্ষ্ম প্রেমরস-সাধনা ক্রমেই স্থূল কামচর্যায় পরিণত হইয়াছে। ফলে শিষ্ট বৈষ্ণবসমাজ ও হিন্দুসমাজে সহজিয়া বৈষ্ণব মতবাদ শ্রদ্ধার পরিবর্তে অবহেলাই লাভ করিয়াছে। তন্ত্র ও যোগসাধনায় যেমন হঠযোগ প্রবেশ করিয়া মূল দার্শনিক প্রত্যয়কে কায়াসাধনার স্থূলত্বের মধ্যে বন্দী করিয়াছে, তেমনি বৈষ্ণব সহজিয়ার অতি সূক্ষ্ম প্রেমসাধনা শেষ পর্যন্ত আরোপতত্ত্বের খিড়কিপথে কামক্লিন্ন পঙ্ককুণ্ডে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সে যাহা হউক, ইঁহাদের তত্ত্বকথা-সংবলিত প্রকরণ-প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত পুঁথি (আগম, আনন্দভৈরব, অমৃতরসাবলী, বিবর্তবিলাস, দুর্লভসার, অমৃতরসাবলী, নিগূঢ়ার্থ প্রকাশাবলী প্রভৃতি) এবং বহু রাগাত্মিকা পদে গূঢ়ার্থ তত্ত্বকথা আভাসে ইঙ্গিতে, রূপকে উপমায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং পদগুলিতে অনেক স্থলে কাব্যরস সঞ্চারিত হইয়াছে।

সহজিয়া সাধক হিসাবে চণ্ডীদাসের নাম সুপরিচিত, রজককুমারী রামী ও ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাসকে কেন্দ্র করিয়া অনেক গালগল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।[৪২] তাঁহার নামে প্রচারিত সাধনভজন সংক্রান্ত অনেক রাগাত্মিকা পদে চিত্রসৃষ্টি ও কাব্যকলার যে সূক্ষ্মতা দেখা যায়, বৈষ্ণবপদাবলীর ইতিহাসে তাহার মূল্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। রক্ষণশীল ও নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবসমাজ বৈষ্ণব সহজিয়াদের দেহমার্গীয় প্রেমসাধনার আচার-আচরণকে কোন দিন স্বীকার করেন নাই, লোকচেতনাকে আশ্রয় করিয়া এইরূপ দেহকেন্দ্রিক রহস্যময় ধর্মচর্যা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির নিকটেও সম্মান লাভ করে নাই। কায়াসাধনার এই বিচিত্র গূঢ় পন্থা যে কোন কোন ক্ষেত্রে জাতীয় চরিত্রকে অধোগতির নিরয়গহ্বরে পাতিত করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। কিন্তু সমাজ ও নীতি ঘটিত প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলে সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাহিত্য, বিশেষতঃ রাগাত্মিকা পদাবলী মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দাবি করিতে পারে।

---

৪২ এ বিষয়ে লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের' দ্বিতীয় খণ্ডে "পদাবলীর চণ্ডীদাস" প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

২

বৈ ষ্ণ ব প দা ব লী

ভূমিকা ॥

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদাবলী অজস্র ধারায় প্রচারিত হইয়াছে। পদাবলী রচনা করিয়া অসংখ্য 'মহাজন' যে নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও কবিপ্রতিভা দেখাইয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাসে বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। 'পদকল্পতরু'তে প্রায় ১৭৫ জন কবির তিন হাজারেরও অধিক পদ সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ কবির আবির্ভাব হইয়াছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে। তখন বৈষ্ণব কেন্দ্রসমূহে সাধারণ ভক্তের ভিড় বাড়িতে শুরু করিয়াছে, হিন্দু সমাজেও বৈষ্ণব আচার্যদের সম্মান বাড়িতেছিল, ভূস্বামী ও সামন্তগণ বৈষ্ণব আচার্যদিগকে নিজ নিজ গুরু-পদে বরণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, বর্ণের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণব আচার্যের চরণধূলি স্পর্শ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন। বস্তুতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব মত ও আদর্শ সমগ্র বাঙলাদেশ ও বাঙলার প্রান্তীয় অঞ্চলে যেরূপ বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে যে অন্ততঃ অর্ধশত কবিকোকিলের কণ্ঠে রাধাকৃষ্ণের প্রেমগীতিকা ও গৌরচন্দ্রের মর্ত্যলোকের অমর্ত্যলীলা নব নব রসরূপে অজস্র আকারে ফুটিয়া উঠিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ষোড়শ শতাব্দী বৈষ্ণব মতাদর্শের সংহতি যুগ, সপ্তদশ শতাব্দী সেই আদর্শ সম্প্রসারণের যুগ—ইহা বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায়ের ইতিহাস হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে, পূর্ববর্তী উপচ্ছেদে আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। সেই সম্প্রসারণের বন্যাবেগ সপ্তদশ শতাব্দীতে পদসাহিত্যে নানা বৈচিত্র্য ও সংখ্যা-প্রাচুর্য সহ আত্মপ্রকাশ করিল।

একথা অবশ্য সত্য যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবপদসাহিত্য বিপুল প্রসার ও গতিবেগ লাভ করিয়াছে, কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বৈষ্ণব পদাবলীর সংখ্যাগত প্রাচুর্য সত্ত্বেও গুণগত উৎকর্ষ এই শতাব্দী হইতেই হ্রাস পাইতেছিল, যেন জীবনস্রোত মন্থর হইয়া আসিতেছিল। প্রথাপালন বা ধর্মাচারগত নিয়মপালনের জন্য অসংখ্য কবি রাশি রাশি পদ রচনা করিয়া-

ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে প্রাণের গভীর বেদনা ও উচ্ছ্বসিত উল্লাস অপার্থিব ও অনির্দেশ্য ব্যঞ্জনার আকারে আভাসিত হইতে পারে নাই। বৃদ্ধ গোবিন্দদাস কবিরাজ সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই লীলাসংবরণ করিলেন। তাঁহার পরে গোটা সপ্তদশ শতাব্দী ধরিয়া যে-সমস্ত পদকার নব নব পদসম্ভারের দ্বারা পুঁথিপত্র ও কীর্তন গানের দ্বারা সঙ্ঘ ও গোষ্ঠীকে মুখর করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের সে প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু শিল্প-নৈপুণ্য, স্বতোৎসারিত আবেগ ও ভক্তির নিবিড় আস্বাদন বিচার করিলে সপ্ত-দশ শতকের পদাবলী পূর্ব শতাব্দীর তুলনায় অতিশয় ম্লান মনে হইবে। প্রাচুর্য ও উৎকর্ষ যে সর্বদা একই রেখা ধরিয়া চলে না তাহার প্রমাণ—এই শতাব্দীর অসংখ্য, অজস্র, অপরিমেয় বৈষ্ণব পদাবলী। এই যুগে নানা কবিকণ্ঠ সু-উচ্চ হইয়াছে, কুশলী বাক্‌রীতি পল্লবিত আকার ধারণ করিয়াছে, ভাষাভঙ্গিমায় মণ্ডনকলা পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কিন্তু প্রাণের গভীরে তাহা যে সর্বদা সাড়া জাগাইয়া চেতনাকে সূক্ষ্ম অনুভূতির রসে ভরিয়া দিতে পারিয়াছে তাহা মনে হয় না। তাই বক্তব্যের সরলতার স্থলে ভাষণের কৌশল অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—এবং একই ধরনের ক্লান্তিকর বর্ণনা রসিক হৃদয়কে কাব্য ও শিল্পের প্রতি উদাসীন করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ গোবিন্দদাসের পদাবলীর কথা বাদ দিলে সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদাবলী সহজ রসিকের আনন্দরস উদ্রেকে ততটা সফল হইতে পারে নাই। দীক্ষিত ভক্তদের কথা স্বতন্ত্র; ভক্তির দৃষ্টিতে উচ্চাবচতার কোন আপেক্ষিক মূল্য নাই। কিন্তু বিশুদ্ধ কাব্যরসের দিক হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবপদাবলীর বিপুল কলেবরের মধ্যে স্পন্দমান সজীব প্রাণের লক্ষণ বড় একটা পাওয়া যায় না। যাহা হউক, উপস্থিত প্রসঙ্গে সাহিত্যের ইতিহাসের ক্রম রক্ষা করিবার জন্য এই শতাব্দীর পদকারদের মধ্যে যাঁহাদের রচনায় অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইয়াছে, এখানে সংক্ষেপে শুধু তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ ॥

ইতিপূর্বে এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে আমরা এই আচার্যত্রয় সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবসমাজ ও আদর্শ

ইঁহাদের দ্বারা কীভাবে এবং কতদূর প্রভাবিত হইয়াছিল তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সে যুগের প্রথামত এই আচার্যগণ কিছু কিছু পদও রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নরোত্তম প্রকৃত কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য পশ্চিমবঙ্গের বৈষ্ণবসমাজ, আদর্শ ও সম্প্রদায়কে পুনর্গঠিত করিবার জন্য এত ব্যস্ত ছিলেন যে, রচনাকর্মে তৎপরতা দেখাইবার বিশেষ অবকাশ পান নাই। তিনি ভাগবতের চতুঃশ্লোকী ভাষ্য করিয়াছিলেন বলিয়া রাধাকৃষ্ণ দাস গোস্বামীর 'সাধনদীপিকা'র নবম কক্ষায় উল্লিখিত আছে।[১] এ বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 'পদকল্পতরু'তে তাঁহার তিনটি পদ এবং অন্যত্র আর একটি পদ মোট চারটি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইটি প্রার্থনা বিষয়ক (গুণমঞ্জরী সখীর নিকট প্রার্থনা) একটি শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা, আর একটি আক্ষেপানুরাগের পদ। কবি সহজ সরল বাংলা ও ব্রজবুলিতে পদ লিখিতে পারিতেন, ছোট ছোট উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপকগুলি নিটোল লাবণ্যের মতো ফুটিয়াছে। কৃষ্ণ রূপের বর্ণনা :

এ বুক ভরিয়া মুঞি উহা না দেখিলুঁ গো
এ বড়ি মরমে মোর ব্যথা।

কিংবা রাধার আক্ষেপানুরাগ

দেহে বৈরি এ যৌবন বৈরি হৈল বৃন্দাবন
যাইবার নাহিক কোন ঠাঁই।

অথবা কবির আক্ষেপোক্তি

হই বামন তনু চাঁদ ধরিতে জনু
মঝু মন হেন অভিলাষে।

প্রভৃতি পংক্তিগুলির সংহত প্রকাশভঙ্গিমা মন্দ নহে। শ্রীরাধার দেহের বৈরী যৌবন, আর বৈরী বৃন্দাবন—এই উক্তি বেশ তির্যক হইয়াছে। শ্রীনিবাস আরও কিছু পদ রচনা করিলে তাঁহার যথার্থ কবিপ্রতিভা বুঝা যাইত। তিনি নাকি 'মনোহরশাহী' কীর্তন ঢঙের প্রবর্তক ছিলেন।[২] তাঁহার পুত্র গতিগোবিন্দ এবং বৃদ্ধ প্রপৌত্র—প্রসিদ্ধ সংগ্রাহক ও পদকর্তা রাধামোহন

১ শ্রীহরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য, ২।২৩
২ ঐ, পৃ. ২।২৩

ঠাকুরের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশ্য গতিগোবিন্দের যে তিনটি পদ 'পদকল্পতরু'তে এবং অন্যত্র পাওয়া গিয়াছে তাহার কাব্যগুণ উল্লেখযোগ্য নহে।

আচার্যত্রয়ের মধ্যে কবিত্ববিচারে নরোত্তম ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যতিব্রতধারী নরোত্তম কবিত্বে বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহার প্রার্থনাবিষয়ক পদেই লক্ষ্য করা যাইবে। তাঁহার কবিত্বের খ্যাতির জন্য অনেক ছোটখাট পুস্তিকাও তাঁহার নামে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রার্থনাবিষয়ক পদ ছাড়াও এই পুস্তিকাগুলিতে তাঁহার ভণিতা আছে—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, সিদ্ধভক্তিচন্দ্রিকা, সদ্ভাবচন্দ্রিকা, স্মরণমঙ্গল, কুঞ্জবর্ণন, রাগমালা, সাধকভক্তিচন্দ্রিকা, সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা, চমৎকারচন্দ্রিকা, সূর্যমণি, চন্দ্রমণি, প্রেমভক্তিচিন্তামণি, গুরুশিষ্যসংবাদ, হাটপত্তন ও উপাসনা পটল।[৩] বলাই বাহুল্য এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর পুস্তিকাগুলির দুই একখানি ব্যতীত কোনটিই নরোত্তমের রচনা নহে। জগদ্বন্ধু ভদ্র নরোত্তম ভণিতাযুক্ত 'হাটপত্তন' শীর্ষক পুস্তিকার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন।[৪] হাটবাজার ও অলঙ্কার নির্মাণের রূপকের ছলে প্রেমভক্তি ব্যাখ্যা নিতান্তই নিম্নস্তরের রচনা—ইহা নরোত্তমের রচনা বলিয়া মনে হয় না।[৫] অন্যান্য পুস্তিকা সম্বন্ধে ঐ একই প্রকার অভিমত প্রকাশ করিতে হয়। তবে

---

৩ জগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত—গৌরপদতরঙ্গিণী, ১ম সংস্করণ

৪ "আবার নরোত্তমের 'হাট পত্তন' নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধই-বা কি সুন্দর, কি ভাবশুদ্ধ, কি মনোহারী! যেন সমস্ত বৈষ্ণব শাস্ত্রের সারাংশ বিকশিত করিয়া এই "হাট পত্তনের" পত্তন হইয়াছে!" (গৌরপদতরঙ্গিণী)

৫ 'পদকল্পতরু'র ৫ম খণ্ডে (পৃ. ১৪০—৪১) সতীশচন্দ্র রায় নরোত্তম-নামাঙ্কিত এই সমস্ত রচনাকে সরাসরি বাতিল করিয়া দিয়াছেন। 'হাট পত্তন'কে হরিদাস দাসও ('গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য') নরোত্তমের রচনা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে হাট পত্তনে যে অসঙ্গতি আছে এবং ইহাতে যেভাবে স্বয়ং নরোত্তম নিজের গৌরব প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে ইহা কদাপি বিনয়াবনত নরোত্তম ঠাকুরের রচনা হইতে পারে না। হরিদাস দাস মহাশয় হাটপত্তনের কোন একখানি পুঁথিতে রামচন্দ্র দাসের ভণিতা দেখিয়াছিলেন। বোধ হয় ইনিই নরোত্তমের নামের অন্তরালে বসিয়া হাটপত্তন রচনা করিয়াছিলেন। (দ্রষ্টব্য—হরিদাস দাসের শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য, পৃ. ২১২৪) তাঁহার এ মত যুক্তিসঙ্গত।

একখানি পুস্তিকার নাম উল্লেখ কর্তব্য। ঈশ্বর বিশ্বাসী যে কোন সম্প্রদায়ের ভক্ত এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার অন্তর্গত ঈশ্বর প্রার্থনা বিষয়ক দশ শ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদে[৬] (সংপ্রার্থনা, স্বদৈন্য-বোধিকা, সাধকদেহের লালসা সূচিকা, মনঃশিক্ষা, বিলাপাত্মিকা, বৈষ্ণবমহিমাপ্রকাশিকা, শ্রীগুরুবৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তিরূপা, শ্রীধামবাসে লিপ্সাত্মিকা, সিদ্ধদেহের লালসাময়ী, আক্ষেপবোধিকা) নিজ নিজ ইষ্টসেবা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। পুস্তিকার নাম 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'। এই পুস্তিকায় গাঢ়বন্ধ উক্তির সাহায্যে কবি যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে শুধু ভক্তিভাবই প্রকাশিত হয় নাই, বুদ্ধিনিষ্ঠ জীবননীতি ও আদর্শের প্রতি কবির আকর্ষণও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। এই জাতীয় প্রবাদ-প্রবচন এবং ভূয়োদর্শনজনিত মত ও মন্তব্য ভারতচন্দ্রকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

(১) মহাজনের যেই পথ   তাতে হবে অনুগত
পূর্বাপর করিয়া বিচার।

(২) জলবিনে যেন মীন   দুঃখ পায় আয়ুহীন
প্রেমবিনা সেই মত ভক্ত।

(৩) তীর্থযাত্রা পরিশ্রম   কেবল মনের ভ্রম
সর্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।

(৪) জ্ঞানকাণ্ড কর্মকাণ্ড   কেবল বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।

নরোত্তমের কবিপ্রতিভা যে সামান্য ছিল না, তাহার প্রমাণ—তাঁহার প্রার্থনাবিষয়ক ও রাধাকৃষ্ণ লীলাঘটিত ৬৪টি পদ 'পদকল্পতরু'তে গৃহীত হইয়াছে। এই পদগুলির ঐকান্তিক ভক্তি ও নিরাভরণ শুদ্ধ কবিত্ব বিশেষ ভাবে প্রশংসার যোগ্য। বৈষ্ণব সমাজে তাঁহার এই সমস্ত ভজনগীতিকা

---

৬ ইহাতে ত্রিপদী ছন্দে ১১৯টি শ্লোক আছে। ডঃ সুকুমার সেন 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা'র নীতি ও আদর্শকে "the main tenets of New-Vaishnava Sadhana" বলিয়াছেন (HBBL p. 99), কিন্তু সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মতে "কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত—সকল সম্প্রদায়ের আস্তিক পাঠকদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক উপাদেয় ও সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ বাঙ্গলা সাহিত্যে নিতান্ত বিরল।...এই সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ সূক্তিগুলিতে যথার্থই সর্বশাস্ত্রের সার সঞ্চিত রহিয়াছে" (পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ. ১৪২)। সতীশচন্দ্রের মন্তব্যই অধিকতর যুক্তিপূর্ণ মনে হইতেছে।

অদ্যাপি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গীত হইয়া থাকে। তিনি নিজেও একজন সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। খেতুরী উৎসবে গরানহাটী (গড়েরহাটী) কীর্তনপদ্ধতির সূচনা করিয়া এবং এই পদ্ধতিতে গান গাহিয়া[৭] নরোত্তম শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনাপদের অনেকগুলিতে নীতি ও আদর্শের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, তিনি বৈষ্ণবভক্তের নিকট ব্যাকুলচিত্তে নিজ দীনদশা জানাইয়াছেন, তন্মধ্যে দুই একটির আন্তরিকতা বিশেষ প্রশংসনীয়। যথা :

(১) গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে ঝরে নীর॥
আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥

(২) ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করোঁ এই নিবেদন
মো বড় অধম দুরাচার।
এ সংসার জলনিধি তাহে ডুবাওল বিধি
চুলে ধরি মোরে কর পার॥
... ...
কামক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান সহ
আপন আপন স্থানে টানে।
আমার ঐছন মন ফিরে যেন অন্ধজন
সুপথ বিপথ নাহি মানে॥

নরোত্তম ঠাকুর সংসারের বিষপাকে না পড়িলেও সংসারের একপ্রান্তে বাস করিয়া রিপুতাড়িত জীবের ত্রিতাপজ্বালা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; তাই এই প্রার্থনা শুধু তাঁহার ব্যক্তিগত প্রার্থনা নহে, ইহাতে যেন প্রত্যেক মানুষের মনের কথাই নিহিত রহিয়াছে। তিনি যখন বলেন, "নরোত্তম দাস কয় দেখ্যা শুন্যা লাগে ভয়"—তখন সে ভয় তাঁহার ব্যক্তিগত সীমা ছাড়াইয়া বেদনাতুর মানুষের প্রত্যেকেরই অন্তরে সঞ্চারিত হয়। প্রার্থনাবিষয়ক

---

৭ মনোহরদাস 'অনুরাগবল্লী'তে এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :
যাঁহার নর্তন আস্বাদন অনুসার।
গড়ের হাটী কীর্তন বুলি খ্যাতি হৈল যার॥ (৬ষ্ঠ মঞ্জরী)

এই বাংলা পদগুলি কবিত্বসম্পদে এমন কিছু প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী নহে। বরং গোবিন্দদাস কবিরাজের প্রার্থনা বিষয়ক পদ বিশ্বের ভজন-সাহিত্যেও শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হইবে ; নরোত্তমের পদসমূহ কাব্যগুণে ততটা উৎকৃষ্ট নহে। কিন্তু নিরাভরণ কবিত্বে ও সহজ সুরে রচিত এই প্রার্থনা বিষয়ক পদ অধিকতর আন্তরিকতা পূর্ণ। সংসার-সমুদ্রতলে নিমজ্জমান কবি যখন ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলেন, "চুলে ধরি মোরে কর পার"—তখন এই সাদা সুর বড় গভীরভাবে আমাদের প্রাণে গিয়া আঘাত করে। কবির আন্তরিক নিষ্ঠার জন্যই তাঁহার ব্যক্তিগত কথা সকলের অন্তরের কথায় পরিণত হইয়াছে।

নরোত্তমের রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদগুলি সারস্বত গুণের জন্য ততটা প্রশংসনীয় না হইলেও সহজসুরে চিত্তাকর্ষী হইয়াছে। যথা—

আক্ষেপানুরাগের পদ :

কি ক্ষণে হৈল দেখা নয়নে নয়নে।
তোমা বন্ধু পড়ে মনে শয়নে স্বপনে॥
নিরবধি থাকি আমি চাহি পথপানে।
মনের যতেক দুখ পরাণে তা জানে॥

ভাবী বিরহে রাধার খেদোক্তি :

মাধব, তুমি আমার নিধনিয়ার ধন।
আমারে ছাড়িয়া তুমি মধুপুরে যাবে জানি
তবে আমি তেজিব জীবন॥

নরোত্তম এখানে বিদ্যাপতির "হাথক দরপণ মাথক ফুল" ইত্যাদি বাঁধা আলঙ্কারিক পথ পরিত্যাগ করিয়া 'নিধনিয়ার ধন' শব্দ দুইটি ব্যবহার করিয়া যে রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার গভীরতা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের বর্ণনাও উল্লেখযোগ্য :

ও মুখ শরদ সুধাকর সুন্দর
ইহ নলিনীদল গন্ধে।
ও তনু নব ঘন সুন্দর রঞ্জিত
ইহ থির-দামিনী পুঞ্জে॥

নরোত্তম রাধাকৃষ্ণের মিলনসংক্রান্ত কিছু কিছু পদ রচনা করিয়াছিলেন। আজীবন ব্রহ্মচারী কবি মিলনরভসের স্থূলত্ব বর্জন করিয়া সূক্ষ্ম উল্লাসকেই অধিকতর প্রাধান্য দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধার রূপে বিভোর হইয়া আছেন, সেখানে দেহের দৌত্য ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

দাসীগণ কর হৈতে চামর লইয়া হাতে
আপনে করয়ে মৃদু বায়।
দেখি রাইমুখশশী সুধা ঝরে রাশি রাশি
হেরি নাগর অনিমিখ চায়॥
ঐছন আরতি দেখি রাইয়ের সজল আঁখি
বাহু পসারিয়া করে কোরে।
দুঁহু হিয়ায় দুঁহু রাখি দুঁহু চুম্বে মুখশশী
দুঁহু প্রেমে দুঁহু ভেল ভোর॥

এ মিলনে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার জ্বালা নাই, গ্লানি নাই,—স্নেহের আর্তি ও সজল নয়নই এই অপার্থিব মিলনের রহঃসখী। নরোত্তমের প্রার্থনা পদগুলি বৈষ্ণবভক্ত ও রসিক মহলে সুপরিচিত, কিন্তু তাঁহার রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদও যে কতকগুলি বিষয়ে আধুনিক পাঠকেরও চিত্তাকর্ষী হইতে পারে, তাহা উল্লিখিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে।

শ্যামানন্দের ভণিতাযুক্ত তিনটি পদ 'পদকল্পতরু'তে স্থান পাইয়াছে। ইহাতে শ্যামদাস ভণিতায়ও ছয়টি পদ আছে। শ্যামানন্দের পূর্বনাম দুঃখী বা দুঃখিয়া। দীনদুঃখী কৃষ্ণদাস, দুঃখী কৃষ্ণদাস, দুঃখিনী প্রভৃতি ভণিতায়ও কয়েকটি পদ পাওয়া যাইতেছে। শ্যামদাস নামে আরেকজন বৈষ্ণবপদকর্তা ছিলেন—ইনি গোপাল চক্রবর্তীর পুত্র। সুতরাং শ্যামদাস ভণিতায় রচিত পদগুলি শ্যামানন্দের নহে বলিয়াই মনে হয়। যে পদগুলিতে ব্রজবুলির সঙ্গে কিছু কিছু ব্রজভাষার শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে,[৮] সেগুলি শ্যামানন্দের রচনা। কারণ তিনি কিছুকাল শ্রীনিবাস-নরোত্তমের সঙ্গে ব্রজধামে বাস করিয়াছিলেন। দুঃখী কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণদাস ভণিতাযুক্ত পদগুলিও তাঁহার রচনা হওয়া সম্ভব। কারণ এই সমস্ত পদে কবি কৃষ্ণদাস বা দুঃখী কৃষ্ণদাস

---

৮ "তাঁহার ব্রজবুলীর পদে বাঙ্গালার অজ্ঞাত ব্রজভাষার অনেক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।"—পদকল্পতরু (৫ম)-তে সম্পাদক সতীশচন্দ্রের মন্তব্য (পৃ. ২২০)।

শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের নিকট গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রতি কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন। গৌরীদাস পণ্ডিত শ্যামানন্দের গুরু হৃদয়চৈতন্যের গুরু। সুতরাং গুরুর গুরুর (পরমগুরু) জন্য তিনি যে কৃপা প্রার্থনা করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।[৯] শ্যামানন্দের দু-একটি বাংলাপদ সরল রচনাশক্তির উদাহরণ হিসাবে মন্দ নহে। যথা :—

রাধার বর্ণনা :

বিনোদিনী কনক মুকুর কাঁতি।
শ্যাম বিলাসে সুন্দর তনু
সাজাঞা কতেক ভাঁতি॥
রসের আবেশে গমন মন্থর
ঢুলি ঢুলি চলি যায়।
আধ ওড়নি ঈষৎ হাসনি
বঙ্কিম নয়নে চায়॥
সঁাথের সিন্দূর মদন মুগধ
তাহে চন্দনের রেখা।
নব জলধরে অরুণের কোরে
নবীন চাঁদের দেখা॥[১০]

কবি শ্যামানন্দ নাকি বৈষ্ণব কীর্তনের 'রেনেটি' (রাণীহাটি) রীতির প্রবর্তক।[১১] নরহরি চক্রবর্তী শ্যামানন্দের বিষয়ে যে দীর্ঘ কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই পদে শ্যামানন্দের অম্বিকায় গিয়া হৃদয়চৈতন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ হইতে উৎকলে পরিকর সঙ্গে হরিনাম প্রচারের কাহিনী পর্যন্ত অতি সুললিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইতেছে :

পাষণ্ডী অসুরগণে মাতাইল গোরাগুণে
কারে বা না কৈল ভক্তি দান।
অধম আনন্দে ভাসে শ্যামানন্দ কৃপালেশে
কেবা না পাইল পরিত্রাণ॥

---

৯ হেন প্রভু গৌরীদাস তার পদ করি আশ
কহে দীনহীন কৃষ্ণদাস॥ (পদকল্প—পদ সং. ২৩৫৯)

১০ এই পদটি মুকুন্দদাসের 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' শ্যামানন্দের ভণিতায় গৃহীত হইয়াছে।

১১ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য, পৃ. ২।২৪

কে জানিবে তাঁর তত্ত্ব   সদাসঙ্কীর্তনে মত্ত
অবনীতে বিদিত মহিমা।
যে বারেক দেখে তারে   সে ধৃতি ধরিতে নারে
কিবা সে মূরতি মনোহর।
নরহরি কহে কভু   রসিকানন্দের প্রভু
হবে কি-এ নয়নগোচর ॥ (গৌরপদতরঙ্গিণী)

গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

বৈদ্যবংশোৎপন্ন গোবিন্দদাস কবিরাজ (কৌলিক উপাধি সেন) বিচিত্র কবিপ্রতিভা, বিস্ময়কর কারুনির্মিতি, উদ্বেল আবেগ এবং অচিন্তিতপূর্ব বাক্‌পুঞ্জের দ্বারা ধ্বনিকেন্দ্রিক সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য, শুধু মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যে নহে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, ভক্তগোষ্ঠী এবং রসিক সমাজে যে শ্রদ্ধার্হ আসন লাভ করিয়াছেন, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-কৃত্তিবাস-কাশীরাম-দাসকে ছাড়িয়া দিলে সেরূপ গৌরব ও জনপ্রিয়তা মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যের আর কোন কবি দাবি করিতে পারিবেন না। স্বয়ং কবি গোবিন্দদাস নিজের রচনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

রসনারোচন শ্রবণবিলাস।
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস ॥

কবির রুচির পদসমূহ শুধু রসনারোচন ও শ্রবণবিলাস হইয়াই নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। শব্দজল্পনা, অলঙ্করণ, রূপ-রীতি ও মঞ্জুল ঝঙ্কারের বাহনে কবির সৌন্দর্যকামী ও ভক্তিনত চেতনা যে সূক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনা, চিত্রল প্রতীকতা ও সুরময় ধ্বনিরণন সৃষ্টি করিয়াছে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে তাহার কোন দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না। বস্তুতঃ গোবিন্দদাস ভক্তি-লীরিকের এক আশ্চর্য আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছেন।

কাব্যকবিতা, তাহা ভক্তিসম্পর্কিতই হউক, বা পার্থিব চেতনাসঞ্চারীই হউক, তাহাকে সর্বপ্রথমে একটি চারু বাক্‌নির্মিতিতে পৌঁছাইতে হইবে, সৌন্দর্যপিয়াসী ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রাথমিক আবেদন পরিতৃপ্ত করিতে হইবে। তার পর তাহা যদি ভক্তির পাখায় ভর করিয়া 'বাক্‌পথাতীত' আন্তররাজ্যে প্রয়াণ করিতে চাহে, তাহাতে কাহারও আপত্তি হইবার কথা নহে। কিন্তু

সর্বাগ্রে দেখিতে হইবে, কবিতা শুধু বিষয়গৌরবে জিতিবার চেষ্টা করিতেছে, না প্রকাশ-সুষমায় পাঠকের শ্রোত্রকে অবলম্বন করিয়া কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিতেছে। গোবিন্দদাস অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের মতো একই প্রকার *motif* অবলম্বন করিয়াছিলেন, একই সুরধুনীর নীরধারা পান করিয়াছিলেন, একই চন্দনবাসিত তুলসীমঞ্জরীর আঘ্রাণ লইয়াছিলেন। তবু তাঁহার একটা বিশেষ গুণগৌরব আছে। তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টিশক্তি ধ্বনিগুচ্ছে-সুসমঞ্জস পরিমিতিবোধ এবং শব্দের দ্বারা রূপনির্মাণের দুর্লভ কৃতিত্ব তাঁহার পদাবলীকে বিশুদ্ধ লীরিক কবিতায় এমনভাবে পরিবর্তিত করিয়াছে যে, বিশেষ সাম্প্রদায়িক মনবুদ্ধির অধিকারী না হইয়াও শুধু শিল্পচেতনার দ্বারাই তাঁহার পদের মাধুর্য আস্বাদন করা যায়। একথা অবশ্য যথার্থ যে, বৈষ্ণব ধর্মকে বাদ দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের, বিশেষতঃ পদাবলী সাহিত্যের আলোচনা চলিতে পারে না। কারণ বৈষ্ণব পদকারদের সকলেই এক বিশেষ দর্শনের ধর্মচর্যার কেন্দ্র হইতে পদাবলী রচনা করিয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দদাসের পদসমূহে এমন একটি সর্বজনীন সৌন্দর্যভোগের আমন্ত্রণ আছে যে, সাধারণ শিল্পবোধ ও স্বাভাবিক রসবোধের দ্বারাই কবিরাজের পদের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। গোবিন্দদাস দীক্ষিত বৈষ্ণব হইয়াছিলেন, ভক্তিভাববিমুগ্ধ পরিমণ্ডলে বাস করিয়াছিলেন—বৈষ্ণব সম্প্রদায়, সমাজ ও আচার্য মহলে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তবু তাঁহার মনটি যে বিশুদ্ধ লীরিক কবির অনুকূল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাম্প্রদায়িক কেন্দ্র হইতে আত্মার অন্নপানীয় গ্রহণ করিলেও তিনি সৌন্দর্যময় পার্থিব রূপরসের বাতায়ন হইতেই তাঁহার পদসমূহে অপার্থিব কায়া ও কান্তি দান করিয়াছেন। এই যে কান্তি, যাহা মূলতঃ ধ্বনির মারফতে আবির্ভূত হয়, ভক্ত গোবিন্দদাস সেই 'কান্তি'র কবি। Audio-visual বা দৃষ্টিশ্রবণের মারফতে তিনি যে রূপজগৎ গড়িতে চাহিয়াছিলেন মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে তাহা যেমন অভিনব, তেমনি ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

গোবিন্দদাসের জীবনকথা ॥ বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায়ের ইতিহাসে বর্ণিত গোবিন্দদাসের জীবনকথা সংক্রান্ত নানা তথ্যে অল্পস্বল্প পার্থক্য থাকিলেও মূল কাহিনীতে খুব বেশী অনৈক্য নাই। 'ভক্তমাল', 'প্রেমবিলাস,'

'ভক্তিরত্নাকর', 'সারাবলী', 'কর্ণানন্দ', 'মুক্তাচরিত','অনুরাগবল্লী', 'নরোত্তম-বিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া সারাংশ প্রদত্ত হইতেছে। প্রামাণিকতার জন্য প্রধানতঃ 'প্রেমবিলাস' ও 'ভক্তিরত্নাকরে' প্রদত্ত তথ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।

গোবিন্দদাসের মাতামহ দামোদর সেন কাটোয়ার নিকট শ্রীখণ্ডে বাস করিতেন। তিনি ধর্মমতে শাক্ত ছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত বলিয়া সর্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।[১২] সংস্কৃতে রচিত তাঁহার 'সঙ্গীতদামোদর' সঙ্গীতশাস্ত্রবিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি যে ধর্মমতে শাক্ত ছিলেন তাহার নানা উল্লেখ বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। 'ভক্তি-রত্নাকরে' তাঁহাকে পুরাদস্তুর শাক্ত বলা হইয়াছে।[১৩] যখন গোবিন্দদাস জননীজঠরে ছিলেন, তখন প্রসবকালে দামোদর সেন কন্যাকে শ্রীদুর্গার যন্ত্রধৌত জলপান করাইলে কন্যা বিনাকষ্টে গোবিন্দদাসকে প্রসব করেন। গোবিন্দদাসের পিতা—কুমারনগরনিবাসী প্রসিদ্ধ চৈতন্যভক্ত চিরঞ্জীব সেন কিছুকাল শ্রীখণ্ডে শ্বশুরালয়ে বাস করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ের মতে চিরঞ্জীব যেমন চৈতন্যভক্ত ছিলেন, তেমনই আবার বৈষয়িক ব্যাপারে হুশেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯) বা তাঁহার পুত্রের (নুসরৎ শাহ্—১৫১৯-১৫৩২) অমাত্য

---

১২ 'সঙ্গীতমাধব'-নামক সংস্কৃত নাটকে গোবিন্দদাস এইভাবে মাতামহের পরিচয় দিয়াছেন :

পাতালে বাসুকির্বক্তা, স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ।
গৌড়ে গোবর্ধনো বক্তা, খণ্ডে দামোদর কবিঃ॥

এই গোবর্ধন বোধ হয় লক্ষ্মণ সেনের আমলের 'আর্যাসপ্তশতী'র কবি গোবর্ধন আচার্য। গোবিন্দদাসের 'সঙ্গীতমাধব' নাটক পাওয়া যায় নাই, 'ভক্তিরত্নাকরে'র প্রস্তাবনায় উক্ত শ্লোকটি আছে। ঐ 'ভক্তিরত্নাকরে'র আর একস্থলে দামোদর সেন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে।
যেহোঁ মহাকবি নাম বিদিত জগতে॥

১৩ ভক্তিরত্নাকরে—শক্তি উপাসক মাতামহ দামোদর।
ভগবতী তাঁর বশীভূত নিরন্তর॥

ছিলেন।[১৪] ডঃ মজুমদারের অনুমান অমূলক নহে। কারণ 'ভক্তিরত্নাকরে' "গৌড়ভূপাধিপাত্রাদ্ব্রাহ্মণ্যাদ্বিষ্ণুভক্তাদপি সুপরিচিতাৎ শ্রীচিরঞ্জীবসেনাৎ"—গৌড়ভূপতির অধিপাত্র ব্রাহ্মণ ও বিষ্ণুর প্রতি ভক্তির জন্য সুপরিচিত চিরঞ্জীব সেনের ঔরসে ও মাতা সুনন্দার গর্ভে রামচন্দ্র কবিরাজের জন্ম হয়।[১৫] চিরঞ্জীব খুব সম্ভব গৌড়ের সুলতানের কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু তিনি কিছু-কাল শ্বশুরালয় শ্রীখণ্ডে বাস করিয়াছিলেন, এবং এইখানেই তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দদাসের জন্ম হয়।[১৬] বৈষ্ণব সাহিত্যে তিনি খণ্ডবাসী বলিয়াই পরিচিত।[১৭] ধর্মমতে তিনি নিশ্চয়ই বৈষ্ণব ছিলেন, যদিও তাঁহার শ্বশুর বিখ্যাত পণ্ডিত দামোদর সেন ছিলেন ঘোরতর শাক্ত। জগদ্বন্ধু ভদ্র 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র ভূমিকায় বলিয়াছেন, "শ্বশুরের সহিত কোন বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে চিরঞ্জীব দুই পুত্র লইয়া তিলিয়া-বুধরী গ্রামে যাইয়া বাস করেন।" শ্বশুরের সহিত মতান্তরের কারণ হয়তো চিরঞ্জীবের বৈষ্ণবমত। চিরঞ্জীব সেন বৈষ্ণব বংশে জন্মিয়াছিলেন কি না জানা যাইতেছে না, তবে তিনি যে একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ও মহাপ্রভুর বিশেষ ভক্ত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় তাঁহাকে 'গৌরাঙ্গের একান্ত শরণার্থী' ("গৌরাঙ্গৈকান্তশরণৈঃ") বলা হইয়াছে। বৈষ্ণব গ্রন্থাদির বর্ণনা হইতে তাঁহাকে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবভক্ত বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে—তিনি

---

১৪ ডঃ মজুমদার সম্পাদিত 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ', পৃ. ১৷৹

১৫ ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ১৮—১৯ (বহরমপুর হইতে প্রকাশিত ৩য় সংস্করণ)

১৬ 'প্রেমবিলাস' অনুসারে তেলিয়াবুধরী গ্রামে রামচন্দ্রের জন্ম হয়:

রামচন্দ্র মোর নাম অম্বষ্ঠ কুলে জন্ম।
কেবল লালসা মোর প্রভুর চরণ দর্শন ॥
তিলিয়া-বুধরী গ্রামে জন্ম মোর হয়।
পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন মহাশয় ॥

১৭ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে:

(ক) খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি দাস চিরঞ্জীব সুলোচন ॥১।১০

(খ) মুকুন্দদাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন ॥২।১১

দীক্ষিত বৈষ্ণব ছিলেন কিনা তাহাতে কিছু যায় আসে না।[১৮] তাঁহার অকালমৃত্যুর পর তাঁহার দুই সন্তান[১৯] রামচন্দ্র ও গোবিন্দদাস পুনর্বার শ্রীখণ্ডে মাতামহের আলয়ে লালিতপালিত হইতে থাকেন। নৈয়ায়িক ও শাক্ত মাতামহের নিকট দুই ভ্রাতাই বোধহয় প্রথম যৌবনে শাক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ চিকিৎসা শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্র-সংহিতা-কাব্য-ব্যাকরণ-অলঙ্কারে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। একদা তিনি যখন দোলায় চড়িয়া বিবাহ করিতে যাইতেছিলেন, তখন শ্রীনিবাস আচার্যের কথায় তিনি আচার্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে তিনি শ্রীনিবাসের প্রভাবে বৈষ্ণব মত গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব সমাজে অতিশয় মান্য হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস তাঁহার গুরু এবং নরোত্তম ঠাকুর তাঁহার অভিন্নহৃদয় মিত্র ছিলেন। বৈষ্ণবপদসাহিত্যে তাঁহার কয়েকটি পদ বেশ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল।

গোবিন্দদাস কবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা লইয়া নানা জল্পনা-কল্পনা আছে। তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে 'ভক্তিরত্নাকরে' একটা অলৌকিক গল্পও আছে। তিনি নাকি শাক্ত মাতামহের শাক্ত মন্ত্রপ্রসাদেই নির্বিঘ্নে মাতৃজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। যাহা হউক গোবিন্দদাস বোধহয় ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যে তিরোহিত হন। জগদ্বন্ধু ভদ্র 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র ভূমিকায় বলিয়াছেন যে গোবিন্দদাস ১৪৫৯ শকে (১৫৩৭ খ্রীঃ অঃ) জন্ম গ্রহণ করেন, ১৪৯৯ শকে (১৫৭৭ খ্রীঃ অঃ) শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, এবং ১৫৩৭ শকে (১৬১৫ খ্রীঃ অঃ) তিরোহিত হন। কিন্তু জগদ্বন্ধু ভদ্র এই সনতারিখ কোথা হইতে পাইয়াছিলেন তাহা কিছু বলেন নাই।

---

১৮ সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় (পদকল্প. ৫ম. পৃ ৬১, পাদটীকা) চিরঞ্জীবকে দীক্ষিত বৈষ্ণব না বলিয়া তাঁহার জন্ম শাক্ত বংশে এইরূপ একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, "চিরঞ্জীব সেন যে দীক্ষিত বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা নিশ্চিত বুঝা যায় না।" কিন্তু ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার অনুমান করেন, চিরঞ্জীব গৌরাঙ্গভক্ত, সুতরাং বৈষ্ণব ছিলেন। (দ্রষ্টব্য—গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পৃ. ৩৯৫)

১৯ 'অনুরাগবল্লী'র মতে গোবিন্দ কবিরাজ জ্যেষ্ঠ, রামচন্দ্র কনিষ্ঠ :

বড় কবিরাজ ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজ নাম।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু তাঁর গুণগ্রাম॥ (৬ষ্ঠ মঞ্জরী)

কিন্তু অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থে রামচন্দ্রকেই জ্যেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

'ভক্তিরত্নাকরে'আছে, গোবিন্দদাস মাতামহের প্রভাবে উত্তর-যৌবনকাল পর্যন্ত শাক্তমত গ্রহণ করিয়া দুর্গা-চণ্ডীর উপাসনা করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম মহামায়া এবং পুত্রের নাম দিব্যসিংহ—ইহাও শাক্ত প্রভাব স্মরণ করাইয়া দেয়। অতঃপর তিনি দুরারোগ্য গ্রহণীরোগে মরণাপন্ন হইয়া শ্রীনিবাসের চরণে শরণ লন এবং আচার্যের কৃপায় রোগমুক্তির পর সপরিবারে বৈষ্ণব হন। ১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দে কবি কর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' রচিত হয়। উহাতে গোবিন্দদাসের কোন উল্লেখ নাই। ইহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, ১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দেও গোবিন্দদাস বৈষ্ণব কবি হিসাবে পরিচিত হন নাই। সুতরাং তিনি খুব সম্ভব ইহার কিছু পরে শ্রীনিবাসের নিকট বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স অন্ততঃ চল্লিশ। কারণ তখন তাঁহার পুত্র দিব্যসিংহ সর্বকর্মক্ষম হইয়া উঠিয়াছেন।[২০] অপর দিকে তাঁহার পদে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ আছে।[২১] ১৬১২ খ্রীঃ অব্দে প্রতাপাদিত্যের পতন হয়, এবং অল্প পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সুতরাং প্রতাপাদিত্যের অবসানের কিছু পূর্বে গোবিন্দদাস বর্তমান ছিলেন, পরেও জীবিত থাকা সম্ভব। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে "১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের তিন চার বৎসরের মধ্যে শ্রীনিবাস প্রথমে রামচন্দ্র কবিরাজকে ও পরে গোবিন্দদাসকে মন্ত্রদীক্ষা দেন।" তখন গোবিন্দের বয়স অন্যূন চল্লিশ। শ্রীনিবাস কর্তৃক বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে গোবিন্দদাস যে কবিতা পদ রচনা করেন নাই তাহা মনে হয় না। বোধ হয় তিনি চণ্ডীর পদ রচনা করিয়া থাকিবেন। 'প্রেমবিলাসে' শাক্ত গোবিন্দদাসের হরগৌরী বিষয়ক একটি পদ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

না দেব কামুক না দেবী কামিনী
কেবল প্রেম পরকাশ।
গৌরীশঙ্কর চরণে কিঙ্কর
কহই গোবিন্দদাস॥

---

২০ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' পৃ. ৩০৮

২১ প্রতাপ আদিত ও রস গাহক
দাস গোবিন্দ ভাণ॥

এই খণ্ডিত পদটি পরে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীখণ্ড হইতে সংগৃহীত 'রসনির্যাস' নামক পদসংগ্রহে পাইয়াছেন।[২২] এই পদটি হইতে মনে হইতেছে, শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার পূর্বেই শাক্ত গোবিন্দদাস হরগৌরী বিষয়ে পদ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব মত গ্রহণ করিবার পর তাঁহার রচিত বৈষ্ণবপদ যেরূপ জনপ্রিয় হইয়াছিল, শাক্তপদ বোধহয় সেরূপ হয় নাই, বৈষ্ণবদের মতো শাক্তগণ কোন সঙ্কলনেও ঐ পদ সংগ্রহ করেন নাই। সুতরাং গোবিন্দদাস কয়টি শাক্তপদ লিখিয়াছিলেন তাহা অনুমান করা যাইতেছে না। প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি শ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তাহার পর যাবতীয় বৈষ্ণবপদ রচিত হইয়াছে। ইহার পূর্বে তিনি কিছু রচনা করেন নাই এমন হইতে পারে না। কারণ যখন তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তখনই তাঁহার কবিত্বের খ্যাতি ছড়াইতে শুরু করিয়াছিল। 'প্রেমবিলাসে' শ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব গ্রহণের পূর্বেই গোবিন্দদাসকে 'কবিরাজ ঠাকুর' বলা হইয়াছে।[২৩] শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা লইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ প্রসিদ্ধ পদটি রচনা করিয়া পাঠ করেন :

ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুর্লহ মানব দেহ সাধুসঙ্গ
তরইতে এ ভবসিন্ধু রে॥

অতঃপর তিনি শ্রীনিবাসের নিকট গৌরাঙ্গলীলা বর্ণনার অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু আচার্য বলিলেন যে, ইতিপূর্বে গৌরাঙ্গভক্ত বাসুদেব ঘোষ চৈতন্যলীলাকথা অতি চমৎকারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, গোবিন্দদাস বরং রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করুন :

প্রভু কহে যে মাগিলে শুন কহি তায়।
কৃষ্ণলীলা বর্ণন কর আনন্দ হিয়ায়॥
গৌরপ্রিয় বাসুদেব ঘোষমহাশয়।
নির্যাস বর্ণন কৈল যত গুণচয়॥
স্বচ্ছন্দে বর্ণন কর রাধাকৃষ্ণলীলা।
আনন্দে মগন হৈয়া এই আজ্ঞা দিলা॥ (প্রেমবিলাস, ১৪শ)

---

২২ ডঃ মজুমদার সম্পাদিত ঐ গ্রন্থ, পৃ. ৬৯৮

২৩ পড়ি আছে গোবিন্দ কবিরাজ ঠাকুর!
পুত্রেরে ডাকিয়া কহে আনন্দ প্রচুর॥ (প্রেমবিলাস, ১৪শ বিলাস)

শ্রীনিবাস গোবিন্দকে রূপগোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' অধ্যয়ন করিতে নির্দেশ দিলেন :

পড়হ গোবিন্দদাস রসামৃতসিন্ধু।
সর্বত্র মঙ্গল যার স্পর্শি এক বিন্দু॥
উজ্জ্বল পড়হ যাতে রাধাকৃষ্ণলীলা।
সর্বরস লীলাচয় তাহাতেই দিলা॥ (ঐ)

অতঃপর গোবিন্দদাস বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গস্তবাবলী বর্ণনা করেন—"গৌরলীলা কৃষ্ণলীলা করিল বর্ণন।" ইহার পর তিনি ছত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হইতেছে।[২৪] ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের অভিমত অনুসারে মনে হয়, গোবিন্দদাস সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত (১৬১৬ ?) বর্তমান ছিলেন। অসংখ্য পদাবলী ছাড়াও তিনি সংস্কৃতে 'সঙ্গীতমাধব' শীর্ষক একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা পাওয়া যায় নাই। শুনা যায় ইহা নাকি নরোত্তমের পিতৃব্যপুত্র সন্তোষদত্তের অনুরোধে রচিত হয়। বিদ্যাপতির কোন কোন খণ্ডিত পদ শ্রীনিবাসের অনুরোধে পূর্ণ করিয়া[২৫] তিনি 'কবিরাজ' উপাধি লাভ করেন এবং তাহার পর হইতে 'গোবিন্দদাস কবিরাজ' নামেই পরিচিত হন।[২৬] 'ভক্তিরত্নাকরের' দুইস্থলে তাঁহার 'কবিরাজ' উপাধিসংক্রান্ত দুইপ্রকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীনিবাস গোবিন্দের ভবনে অবস্থান কালে

---

২৪ কতেক সাধন কৈল কতেক বর্ণন।
এইরূপে ছত্রিশ বৎসর কৈল যাপন॥ (প্রেমবিলাস, ১৪শ)

ইহা হইতে বিমানবিহারী বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গোবিন্দদাস ১৬১৬ খ্রীঃ অব্দের কাছাকাছি সময়ে জীবিত ছিলেন। কারণ ডঃ মজুমদার দেখাইয়াছেন, ১৫৮০ খ্রীঃ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে গোবিন্দদাস শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাহার পর তিনি, 'প্রেমবিলাসে'র মতে, ছত্রিশ বৎসর (১৫৮০+৩৬=১৬১৬ খ্রীঃ অঃ) বাঁচিয়া ছিলেন।

২৫ রাধামোহন ঠাকুর 'পদামৃতসমুদ্রে'র টীকায় স্পষ্টই এই নির্দেশ দিয়াছেন—"বিদ্যাপতিকৃত ত্রিচরণগীতং লব্ধ্বা শ্রীগোবিন্দ কবিরাজেন চরণৈকং কৃত্বা পূর্ণং কৃতং।"

২৬ 'কর্ণানন্দে' কবিরাজ উপাধিক আটজন কবির নাম আছে—

শ্রীরামচন্দ্র-গোবিন্দ-কর্ণপূর-নৃসিংহকাঃ।
ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণগোকুলৈঃ॥
কবিরাজা ইমে খ্যাতা জয়ন্ত্যষ্টৌ মহীতলে।
উত্তমা ভক্তি-সদ্রত্নমালাদান-বিচক্ষণাঃ॥

রামচন্দ্র, গোবিন্দদাস, কর্ণপূর, নৃসিংহ, ভগবান, বল্লবীদাস, গোপীরমণ ও গোকুল—এই আটজন বৈষ্ণব কবিরাজ উপাধিধারী।

তাঁহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'কবিরাজ' উপাধি দিয়াছিলেন।[২৭] দ্বিতীয় উপাখ্যানে দেখা যাইতেছে, জাহ্নবাদেবী বৃন্দাবনে উপনীত হইলে গোবিন্দও নাকি তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। গোস্বামিগণ গোবিন্দের 'সঙ্গীতমাধব' নাটক ও পদাবলী শুনিয়া মুগ্ধচিত্তে তাঁহাকে 'কবিরাজ' উপাধি দিয়াছিলেন।[২৮] তাঁহার পদাবলী পাঠে উল্লসিত হইয়া শ্রীজীব তাঁহাকে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, "স্নেহসূচক পত্রস্য সমুপলব্ধত্বাত্তদেব মুহুর্বাঞ্ছতামি, তত্র যন্ময়ি স্নেহং বিধায় শ্রীমন্তি গীতানি প্রস্থাপিতানি তেন তু অতীব মঙ্গল সঙ্গতোঽস্মি।" অর্থাৎ, স্নেহসূচক পত্র প্রাপ্তির জন্য পুনরায় তাহাই ইচ্ছা করি। সেই পত্রে আমার প্রতি স্নেহ দেখাইয়া যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর গীত পাঠাইয়াছেন, তাহাতে অত্যন্ত কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছি।[২৯] আর একখানি পত্রে জীবগোস্বামী গোবিন্দদাসকে লিখিয়াছিলেন, "সম্প্রতি যৎ শ্রীকৃষ্ণবর্ণনাময়স্বীয়ানি গীতানি প্রস্থাপিতানি পূর্বমপি যানি তৈরমৃতৈরিব

---

২৭ পদকর্তা বল্লভদাসের মতে শ্রীনিবাসই গোবিন্দদাসকে কবিরাজ উপাধি দিয়াছিলেন:

শুনহ আদেশ ক্রমে শ্রীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে
সে সকল করিল পূরণে।
এমন সুন্দর তাহা আচার্য রত্ন শুনি তাহা
চমৎকার ভাবে মনে মনে ॥
তাই গুরু মহানন্দে কবিরাজ শ্রীগোবিন্দে
উপাধিটি করিলা প্রদান। (গৌরপদতরঙ্গিণী)

কিন্তু 'ভক্তিরত্নাকরে'র একস্থলে আছে:

গোবিন্দ শ্রীরামচন্দ্রানুজ ভক্তিময়।
সর্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ কবি সবে প্রশংসয় ॥
শ্রীজীব শ্রীলোকনাথ আদি বৃন্দাবনে।
পরমানন্দিত যার গীতামৃত পানে ॥
'কবিরাজ' খ্যাতি সবে দিলেন তথাই।
কত শ্লাঘা কৈল শ্লোকে বৃন্দস্থ গোসাঞি ॥ (ভক্তিরত্নাকর—১ম)

২৮ পদকল্পতরু, ৫ম, ৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কবি বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তবে শ্রীজীবের সঙ্গে তাঁহার চাক্ষুষ পরিচয় না থাকিলেও উভয়ের মধ্যে পত্র ব্যবহার হইত তাহার প্রমাণ আছে।

২৯ ডঃ মজুমদার সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃ. ১০৩৪

তৃপ্ত বর্তামহে, পুনরপি নূতনতত্ত্বদাশয়া মুহুরপ্য তৃপ্তিমঞ্চ লভামহে, তস্মাত্তত্র চ দয়াবিধানং কর্তব্যং।"[৩০] অর্থাৎ, সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণবর্ণানাত্মক আপনার স্বরচিত গীত সকল যাহা পূর্বেই পাঠাইয়াছেন, তাহার অমৃতের দ্বারা তৃপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি। পুনরায় নূতন নূতন তাদৃশ সঙ্গীতের আশায় আবার পুনঃ পুনঃ অতৃপ্তি বোধ করিতেছি। অতএব সে বিষয়ে দয়া করিয়া অবহিত হউন।[৩১]

বৃন্দাবনের গোস্বামী ও ভক্তেরা গোবিন্দদাসের পদের বিশেষ প্রশংসা করিতেন। জীবগোস্বামীর অনুগত ব্রজধামের কোন এক ভক্ত গোবিন্দ-দাসের উদ্দেশে এই শ্লোকটি রচনা করিয়াছিলেন :

শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্র চন্দনগিরেশ্চঞ্চদ্বসন্তানিলেনানীতঃ
কবিতাবলীপরিমলঃ কৃষ্ণেন্দু সম্বন্ধভাক্।
শ্রীমজ্জীবসুরাঙ্ঘ্রি পাশ্রয়জুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্ সর্বস্তাপি
চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎ পরম্ ॥ (অনুরাগবল্লী)

অনু: চঞ্চল বসন্তসমীরণে আনীত শ্রীগোবিন্দকবিরাজ-রূপ চন্দনগিরির কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিশিষ্ট কবিতাবলীর পরিমল শ্রীমৎজীবরূপ কল্পতরুর আশ্রিত ভক্তরূপ ভৃঙ্গসমুদয়কে উন্মাদিত করিয়া ব্রজবনের সকলকেই চমৎকৃত করিয়াছিল। (ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার অনূদিত)

তাঁহার অপূর্ব পদাবলীর ভক্তি ও রসমাধুর্যে সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিল তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝা যাইবে। খেতুরী উৎসবে গোকুলদাস কীর্তনীয়া গোবিন্দদাসের পদ গান করিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া নিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্দ্র এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, কবির দুই হাত ধরিয়া বলিয়াছিলেন :

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের দুটি করে ধরি।
কহে তুয়া কাব্যের বালাই লৈয়া মরি ॥ (ভক্তিরত্নাকর)

আরও বহু কবি ও পদকর্তা গোবিন্দদাসকে বন্দনা ও প্রশংসা করিয়া পদ লিখিয়াছিলেন। এখানে এইরূপ দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

---

৩০ ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ১০৩৬

৩১ অনুবাদ—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার

(১) বল্লভদাস—

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বন্দিত কবিসমাজ
কাব্যরস অমৃতের খনি।
বাগ্দেবী যাহার দ্বারে দাসী ভাবে সদা ফিরে
অলৌকিক কবি শিরোমণি॥
ব্রজের মাধুরী লীলা যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হইতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি॥ (গৌরপদতরঙ্গিণী)

বিদ্যাপতির অসম্পূর্ণ পদ গোবিন্দদাস পূরণ করেন, তাহাও বল্লভদাস নির্দেশ করিয়াছেন :

অসম্পূর্ণ বহু পদ রাখি বিদ্যাপতি পহু
পরলোকে করিলা গমন।
গুরুর আদেশক্রমে শ্রীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে
সে সকল করিল পূরণ॥ (ঐ)

(২) নরহরি চক্রবর্তী :

জয় গোবিন্দ বিদিত মহী মাঝ।
প্রেমরতন ধন বিতরণ পণ্ডিত
নিরুপম মধুর চরিত কবিরাজ॥
পরম বিচিত্রকাব্য বিন্যাস কি রচব
সুকৌশল নহ অবগাহ।
তিখিণ বা ণসম বেধই হিয় শির
ঘুমই রসিকগণ শুনই উচ্ছাহ॥ (ভক্তিরত্নাকর)

(৩) বৈষ্ণব দাস :

জয় কবিরাজ রাজ রসসায়র
শ্রীযুত গোবিন্দদাস।
ঐছন কথিহঁ না হেরিয়ে ত্রিভুবনে
প্রেম-মূরতি পরকাশ॥
যাকর গীতে সুধারস বরিখয়ে
কবিগণে চমকয়ে চীত।
শুনাইতে গর্ব খর্ব তব হোয়ত
ঐছন রসময় গীত॥ (পদকল্পতরু)

(৪) রাধামোহন ঠাকুরের মঙ্গলাচরণ :

শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্রোঽয়ং সিদ্ধকৃষ্ণকবীন্দ্রকঃ।
পৃথিব্যাং ধন্যধন্যাস্তে বর্তন্তে সিদ্ধরূপিণঃ॥ (পদামৃতসমুদ্র)

একথা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে যে, গোবিন্দদাস বাক্‌মূর্তি নির্মাণে বিদ্যাপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেও পরবর্তী কালের বাঙলার বৈষ্ণবপদাবলী, বিশেষতঃ ব্রজবুলিতে রচিত পদাবলী তাঁহার আদর্শের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়াছে। তাই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাকে কাব্যাদর্শের গুরু বলিয়া অশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন।

গোবিন্দদাস খেতুরীর ভূস্বামী সন্তোষদত্তের অনুরোধে 'সঙ্গীতমাধব' নামক যে সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়াছিলেন তাহার কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই।[৩২] তিনি স্বরচিত বৈষ্ণব পদগুলিকে সংগ্রহ করিয়া পুঁথিতে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন এরূপ অনুমানের হেতু আছে। 'ভক্তিরত্নাকরে' দেখা যাইতেছে:

নির্জনে বসিয়া নিজ পদরত্নগণে।
করেন একত্র অতি উল্লসিত মনে॥

রাধামোহন ঠাকুর সঙ্কলিত 'পদামৃতসমুদ্রে'র টীকায় "তৎকৃতে গ্রন্থে"—এই উল্লেখ হইতে মনে হয়, তিনি বোধ হয় নিজের পদসমূহ একত্রে গ্রথিত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তবে তাহার নাম 'গীতাবলী',[৩৩] অথবা 'গীতামৃত,[৩৪], কিনা তাহা বুঝা যাইতেছে না। তাঁহার পদে যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ আছে।[৩৫] তাঁহার কোন কোন পদে পঞ্চকোটের রাজা হরিনারায়ণের

---

৩২ 'ভক্তিরত্নাকরে' "সঙ্গীত মাধবের" কিয়দংশ উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু আর কোথাও এই নাটক সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

৩৩ হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য, পৃ. ২।২৬

৩৪ HBBL, p. 108 (গোবিন্দদাসের নামে 'একান্নপদ' শীর্ষক অষ্টকালীয় লীলা প্রচলিত আছে। ইহা তাঁহার সঙ্কলন, অথবা অন্য কেহ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। দ্রষ্টব্য—পদকল্পতরু ৫ম, পৃ. ৬১, পাদটীকা)

৩৫ (১) প্রতাপ আদিত এ রসে ভাসিত
দাস গোবিন্দ গান॥ (পদকল্প—১৭২০)
(২) প্রতাপ আদিত ও রস গাহক
দাস গোবিন্দ ভণে॥ (পদকল্প—৫৩৮)

(১৫৮৯-১৫৯৫) নাম আছে, ইঁহার সঙ্গে কবির বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। এতদ্ব্যতীত কবি মুর্শিদাবাদের (নশিপুর) রাজা নৃসিংহ (রূপনারায়ণ), রায় রামচন্দ্র, নরোত্তমের পিতৃব্যপুত্র রাজা সন্তোষ দত্ত ও রায় চম্পতির উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই ধনী ভূস্বামী ছিলেন। গোবিন্দদাস শুধু বৃন্দাবন ও গৌড়ের বৈষ্ণব ভক্তদের শ্রদ্ধা লাভ করেন নাই, অভিজাত শ্রেণীর অনেক ভক্তের সঙ্গেও তাঁহার বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল। সেই প্রীতির পরিচয় রহিয়াছে তাঁহার পদে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের উল্লেখে। তিনি বিদ্যাপতির অনেক খণ্ডিত পদ পূরণ করিয়াছিলেন—বিদ্যাপতির পদাবলীর আদর্শই তাঁহাকে ব্রজবুলিতে পদ লিখিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তিনি একটি পদে বলিয়াছেন যে, মতিমান বিদ্যাপতি, যিনি কবিকুলশ্রেষ্ঠ, তিনি লাখগীতে গোবিন্দ ও গৌরাঙ্গী রাধার গান লিখিয়া জগতের মনোহরণ করেন। কিন্তু মন্দমতি গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির এমন সুখসম্পদ থাকিতে আবার অন্য পদ রচনা করিতে চাহেন—যেমন বামন চাঁদ ধরিতে চাহে :

কবিপতি বিদ্যাপতি মতিমানে।
লাখগীতে জগ- চীত চোরায়ল
গোবিন্দ-গোরি—সরস রসগানে॥
* * * *
গোবিন্দদাস মতিমন্দে।
এত সুখসম্পদ রহইতে আনমন
যৈছন বামন ধরবহি চন্দে॥ (পদকল্প, পদ—২৬৮৬)

তিনি তাঁহার সাতটি পদে[৩৬] নিজ নামের সঙ্গে বিদ্যাপতির ভণিতাও উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :

পাপ পরাণ আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রসপুর॥

বাস্তবিক, তাঁহাকে যে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' বলা হইয়াছে অযথার্থ নহে। তিনি যে বিদ্যাপতির কোন কোন পদ পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ

---

৩৬ পদামৃতসমুদ্রের ৯৯ পৃষ্ঠায় একটি, পদকল্পতরুতে পাঁচটি (৩১, ৯৩, ২২১, ১৬৪০, ১৬৭১) এবং গীতচন্দ্রোদয়ে একটি (৭৮৩)—মোট সাতটি, পদে বিদ্যাপতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

পাওয়া যাইতেছে 'পদামৃতসমুদ্রে'র টীকাকার রাধামোহন ঠাকুরের ইঙ্গিতে "বিদ্যাপতিকৃত ত্রিচরণগীতং লব্ধ্বা শ্রীগোবিন্দ কবিরাজেন চরণৈকং কৃত্বা পূর্ণং কৃতং"—বিদ্যাপতির তিনটি চরণ পাইয়া কবিরাজ গোবিন্দ তাহাতে আর এক চরণ যোগ করিয়া পদটিকে পূর্ণ করেন।[৩৭]

গোবিন্দদাসের পিতা ছিলেন চৈতন্যসেবক বৈষ্ণব এবং মাতামহ ছিলেন শাক্ত। প্রথম জীবনে পিতৃবিয়োগ হইলে মাতামহের প্রভাবে আসিবার পর তিনি শাক্ত ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি তিনি উত্তরযৌবনে (অন্ততঃ ৪০ বৎসর বয়সে) শ্রীনিবাসের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁহার অগ্রজ রামচন্দ্র কবিরাজ ও স্বয়ং কবি নিজে বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ সম্মানের আসন লাভ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব পদগুলি হইতে কবিকে নিষ্ঠাবান ভক্ত ও 'মঞ্জরী' ভাবের সাধক বলিয়া মনে হয়।[৩৮] যাহা হউক তাঁহারা চারিপুরুষ বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আসক্তি এবং সহজাত কবিপ্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পিতা চিরঞ্জীব সেন বৈষ্ণব ছিলেন, পদও লিখিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র ও কনিষ্ঠ গোবিন্দদাস যুগপৎ বৈষ্ণব ও ভক্ত কবি। গোবিন্দদাসের পুত্র দিব্যসিংহ ও পৌত্র ঘনশ্যামদাস—ইঁহারাও বৈষ্ণবধারা ও বৈষ্ণব সাহিত্যের আদর্শ বহন করিয়া চলিয়াছিলেন।

গোবিন্দদাসের পদাবলীর উৎস॥ প্রায় আটশত পদের রচনাকার বিদ্যাপতির উত্তরসূরী গোবিন্দদাসের পদের বিশুদ্ধি নির্ণয় ও প্রামাণিকতা বিচার সহজ ব্যাপার নহে। তদুপরি আরও দুই-তিনজন গোবিন্দদাস পদ

---

৩৭ 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র ভূমিকার জগদ্বন্ধু ভদ্র লিখিয়াছেন, "কথিত আছে, শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন কালে গোবিন্দদাস মিথিলাদেশের অন্তর্গত বিসপী (বিসফী) গ্রামে বিদ্যাপতির সমাধিমন্দির সন্দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। এবং তথায় কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া বিদ্যাপ[illegible] অনেকগুলি পদ উদ্ধার করিয়া লইয়া আসেন।" জগদ্বন্ধু ভদ্র কোথা হইতে এই তথ্য [illegible] করেন তাহা জানা যাইতেছে না। অতএব এই জনশ্রুতি অগ্রাহ্য করা হইল। [illegible] বিদ্যাপতির পদের কয়েকটি বিলুপ্ত পংক্তি যোগ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং পদে নিজে[illegible] বিদ্যাপতিরও ভণিতা দিয়াছেন বলিয়া এইরূপ জনশ্রুতির উদ্ভব হইয়াছে।

৩৮ পরে 'গোবিন্দদাসের ভক্তিবাদ' উপচ্ছেদে মঞ্জরীভাবের সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

রচনা করিয়া গোবিন্দদাস কবিরাজের পদ নির্ণয়ে আরও গোল পাকাইয়া তুলিয়াছেন। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক গোবিন্দ আচার্য, গোবিন্দ ঘোষ (বাসুঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) এবং গোবিন্দদাস কবিরাজের সমসাময়িক ও শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য গোবিন্দ চক্রবর্তীও অনেক পদ রচনা করিয়াছিলেন —বৈষ্ণব সঙ্কলনে সে সমস্ত পদের কিছু কিছু গৃহীত হইয়াছে। অনেকেই বৈষ্ণবীয় বিনয়বশতঃ ভণিতায় 'দাস' ব্যবহার করিতেন। ফলে কবিশ্রেষ্ঠ গোবিন্দদাসের পদের সঙ্গে অন্য গোবিন্দদাসের পদের সংমিশ্রণ ঘটিয়া গিয়াছে। অবশ্য কবিরাজের পদের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণপূর্বক তাঁহার পদ হইতে অপর গোবিন্দদাসদের পদকে পৃথক করা দুরূহ নহে। যেমন—গোবিন্দ আচার্য চণ্ডীদাস-মুরারিগুপ্ত-নরহরি সরকারের মতো সরল ভাষায় পদ লিখিতেন,[৩৯] কিন্তু গোবিন্দদাসের পদে বিদ্যাপতির অনুসরণ এবং ভাষা ও ছন্দের আলঙ্কারিক ঐশ্বর্য—এই দুই লক্ষণ অতি প্রকট। গোবিন্দ ঘোষও গোবিন্দ আচার্যের মতো সরল ভাষায় পদ রচনা করিয়াছিলেন এবং তিনি আচার্যের সমসাময়িক ছিলেন। তাই তিনি নিজ পদগুলিকে গোবিন্দ আচার্য হইতে পৃথক করিবার জন্য নিজ কৌলিক উপাধিসহ 'গোবিন্দ ঘোষ' এইরূপ পূর্ণ ভণিতা দিতেন। ইঁহার পদের সঙ্গে গোবিন্দদাসের পদের পার্থক্য নির্ণয়ও অতি সহজ। কিন্তু গোল বাধিয়াছে গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদ লইয়া। তিনি গোবিন্দদাস কবিরাজের সমসাময়িক এবং পরস্পরে গুরুভাই। সর্বোপরি তিনি গোবিন্দদাসের মতো ব্রজবুলিতে কিছু কিছু পদ লিখিয়াছেন এবং ভণিতায় শুধু 'গোবিন্দ দাস' উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি গীতবাদ্যেও খুব নিপুণ ছিলেন, কীর্তন গাহিতে গাহিতে দশা প্রাপ্ত হইতেন। যদুনন্দন দাসের 'কর্ণানন্দে' কবিকে "ভাবক চক্রবর্তী" অর্থাৎ ভাবগ্রস্ত বা ভাবব্যাকুল বলা হইয়াছে। 'পদামৃতসমুদ্রে'র সঙ্কলক রাধামোহন ঠাকুর পদের টীকায় কোন্ পদ গোবিন্দ-চক্রবর্তীর তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং 'পদামৃতসমুদ্রে' উল্লিখিত গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদগুলির হদিশ পাওয়া যায়। তাঁহার অনেক পদ বাংলায় রচিত, এবং তাহাতে গৌরনাগরীভাবের সাধনার বিশেষ প্রভাব আছে। এই সমস্ত লক্ষণ ধরিয়া ডঃ বিমান-বিহারী মজুমদার তাঁহার সঙ্কলিত 'গোবিন্দ

---

৩৯ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত ঐ গ্রন্থ, ভূমিকা, পৃ. ।৶০

দাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগে' গোবিন্দ চক্রবর্তী রচিত পদের সংখ্যা ধরিয়াছেন—২৪ (তাঁহার সঙ্কলনে ৭৬১ হইতে ৭৮৪ সংখ্যক পদ)। গোবিন্দদাসের ব্রজবুলি পদগুলি ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে এমন উজ্জ্বল যে, তাহার সঙ্গে অন্যান্য গোবিন্দদাসের বিশেষ গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তিনি কিছু কিছু পদ বাংলায় লিখিয়াছিলেন এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।[৪০] ডঃ মজুমদারও গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত কয়েকটি বাংলা পদকে গোবিন্দদাস কবিরাজের রচনা বলিয়া মনে করেন। নিম্নলিখিত পদগুলিতে তিনি চিরপরিচিত গোবিন্দদাসের স্পর্শ পাইয়াছেন :

১। শুন শুন সুন্দর সুজন কানাই।

২। যমুনা যাইতে পথে রসবতী রাই।

৩। কাহারে কহিব কানুর পিরীতি
তুমি সে বেদনা সই।

৪। পিয়া কথা কি পুছসি সে সখি
পরাণ নিছনি দিয়ে।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "এই ছন্দ ও শব্দঝঙ্কার গোবিন্দদাস কবিরাজের স্বকীয়।"[৪১] এই জন্য তিনি গোবিন্দদাসের যে ৭০৭টি পদ সঙ্কলন করিয়াছেন তন্মধ্যে ২০-২২টি বাংলা পদকেও গোবিন্দদাস কবিরাজের বলিয়া ধরিয়াছেন। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন, "এই সকল উৎকৃষ্ট বাংলা

---

৪০ ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "None of the poems which Radhamohana ascribes to the Kaviraja, are written in Bengali, from which it might be concluded that the poet did not write any poem in Bengali" (HBBL, p. 108), কিন্তু পদকল্পতরুর সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় 'চিকণকালা গলায় মালা' (পদকল্প—১৪৯), 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি' (১৫২), 'তুমি যদি বলো'. পাসরো কান, মনে সে না লয় আন' (৯০০), 'অবলা কি জানি গুণ ধরে' (৮৬১), 'এই ত মাধবী তলে' (১৬৭৯) প্রভৃতি বাংলা পদগুলিকে গোবিন্দদাস কবিরাজের রচনা বলিয়াই ধরিয়াছেন (পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ. ৭৮)। ডঃ সেনও গোবিন্দদাসের বাংলা পদগুলিকে একেবারে নাকচ না করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন, "But this conclusion seems, on the very face of it, absurd that a great Bengali poet should not write in Bengali" (HBBL). কারণ গোবিন্দদাসের ভণিতাযুক্ত বাংলা পদগুলি ব্রজবুলির মতো ততদূর উৎকৃষ্ট না হইলেও ইহাতে গোবিন্দদাসের পরিপক্ক রচনাশক্তির স্পর্শ পাওয়া যায়।

৪১ ডঃ বিমানবিহারী সম্পাদিত ঐ গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ. ১।৵০

পদেও আমরা সেই শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাসেরই নিজস্ব ভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। বাঙ্গালী পদকর্তা জ্ঞানদাসের মতো গোবিন্দদাসও বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি পদ রচনায় তুল্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন; সুতরাং ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কোনও কারণ নাই..." (পদকল্প, ৫ম, পৃ. ৭৮)। অল্প কয়েকটি বাংলা পদ ছাড়িয়া দিলে গোবিন্দদাসের আর সমস্ত পদই ব্রজবুলিতে রচিত।

কবিরাজের পদে তৎসম শব্দের বাহুল্য অন্যান্য বৈষ্ণব কবি অপেক্ষা অনেক বেশি, পদসমূহে পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টাও অপ্রকট নহে। দামোদর সেনের দৌহিত্র গোবিন্দদাস যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইবেন তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে? তাঁহার কোন কোন ব্রজবুলি পদ বিভক্তি-বর্জিত সংস্কৃত মাত্র। তিনি নিজেও বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় একটি পদ রচনা করিয়াছিলেন। যথা—

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজকলিতম্।
ব্রজবনিতাকুচ-কুঙ্কুমললিতম্॥
বন্দে গিরিবরধর-পদকমলম্।
কমলাকর কমলাঞ্চিতমমলম্॥
মঞ্জুল মণি নূপুর রমণীয়ম্।
অচপল-কুল-রমণী-কমনীয়ম্॥
অতিলোহিত-মতিরোহিত-ভাসম্।
মধুমধুপীকৃত গোবিন্দদাসম্॥ (পদকল্প, পদ—৩৭৯)

এখন দেখা যাক পদসঙ্কলন গ্রন্থাদিতে গোবিন্দদাসের পদ কি পরিমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। একথা অবশ্য সত্য যে, অদ্যাপি কীর্তনের আসরে গোবিন্দদাসের পদই অধিক ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত পদে সূক্ষ্ম কারুকার্য ও ভক্তির গম্ভীরতা প্রচুর আছে বলিয়া কীর্তনীয়ারা ব্রজবুলিকে অবলম্বন করিয়া বাংলা আখর দিতেও বিশেষ আনন্দ বোধ করিয়া থাকেন। এই জন্য শুধু গোবিন্দদাসের পদযুক্ত গোটা পুঁথিও কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। ডঃ মজুমদার কলিকাতার অন্তঃপাতী বরাহনগর পাঠবাড়ীর গ্রন্থাগারে কেবল গোবিন্দদাসের পদযুক্ত ২৫ খানি পুঁথি দেখিয়াছেন।[৪২] তন্মধ্যে একখানি পুঁথির পদ নাকি গোবিন্দদাসের স্বনির্বাচিত।[৪৩]

---

৪২ ঐ, ভূমিকা, পৃ. ১।৴০

৪৩ ঐ

প্রাচীন ও নবীন পদসঙ্কলনে গোবিন্দদাসের বহু পদ শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হইয়াছে, বৈষ্ণব বাবাজী ও কীর্তনীয়াদের কাছে এখনও এইরূপ বহু পুঁথি আছে। রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী'তে (১৬৪৩ খ্রীঃ অঃ) এবং তাঁহার পুত্র সঙ্কলিত 'রসমঞ্জরী'তে (১৬৬০-৭০ খ্রীঃ অঃ) গোবিন্দদাসের পদ প্রথম গৃহীত হয়। 'রসমঞ্জরী'তে গোবিন্দদাসেয় পদ সংখ্যা-২৪ ; তন্মধ্যে কোন কোনটি অবশ্য গোবিন্দ আচার্যেরও হইতে পারে। মুকুন্দদাস সঙ্কলিত 'সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ে' গোবিন্দদাসের ৯টি পদ পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সঙ্কলিত 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'তে (১৭০৪ খ্রীঃ অব্দের সঙ্কলিত) গোবিন্দদাসের ৭৭-৭৮টি পদ গৃহীত হইয়াছে ; নরহরি চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়ে' ৬৫টি পদ আছে। 'পদামৃতসমুদ্রে'র (অষ্টাদশ শতাব্দী) সঙ্কলক রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থে গোবিন্দদাসের (২৭০টি পদ) বহুপদ সংগ্রহ করেন, (মূল পদামৃতসমুদ্রের প্রায় এক তৃতীয়াংশ)। তিনি উক্ত সঙ্কলনে গোবিন্দদাসের পদের সংস্কৃত টীকাও করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলীর বৃহত্তম সঙ্কলন 'পদকল্পতরু'তে (অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সঙ্কলিত) সঙ্কলক বৈষ্ণবদাস গোবিন্দদাসের প্রায় ৪৬০টি পদ [৪৪] সঙ্কলন করিয়াছিলেন। কোন সঙ্কলনেই গোবিন্দদাসের এত অধিকপদ সংগৃহীত হয় নাই। দীনবন্ধু-দাস সঙ্কলিত 'সংকীর্তনামৃতে' (১৭৭১ খ্রীঃ অঃ) এবং গৌরসুন্দরদাসের 'কীর্তনানন্দে' (১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ) গোবিন্দদাসের পদসংখ্যা যথাক্রমে ১৫৪ ও ২০১। যাহা হউক অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে সঙ্কলিত বৈষ্ণবপদাবলীর পুঁথিতে গোবিন্দদাসের পদের সংখ্যা সাড়ে চারি শতেরও অধিক—তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। ছাপাখানার যুগেও অনেকগুলি মুদ্রিত সঙ্কলনে গোবিন্দ-দাসের পদসমূহ গৃহীত হইয়াছে—অবশ্য সমস্ত পদই পূর্বতন পুঁথি হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সঙ্কলিত 'পদরত্নাবলী'তে (১৮৮৫) গোবিন্দদাসের পদসংখ্যা—১১, বসুমতীসাহিত্য-মন্দির প্রকাশিত 'প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী'র দ্বিতীয় ভাগে (১৮৯৭) গোবিন্দ-

৪৪ 'পদকল্পতরু'তে গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত পদের সংখ্যা মোট ৪৭৩ ; কিন্তু বোধহয় তেরোটি পদ গোবিন্দদাস কবিরাজের নহে। দশটি পদের গোবিন্দদাস অন্য কবি। একটি পদ গোবিন্দ চক্রবর্তী এবং তিনটি পদে গোবিন্দ দাস ও বিদ্যাপতির যুক্ত ভণিতা পাওয়া যাইতেছে।

দাসের ৪৩১টি পদ সংগৃহীত হয়, শান্তিপুর নিবাসী কালিদাস নাথ যে 'গোবিন্দদাসের পদাবলী' (১৯০২) সঙ্কলন করেন তাহাতে মোট ২৯০টি পদ সংগৃহীত হয়। দুর্গাদাস লাহিড়ী সঙ্কলিত 'বৈষ্ণবপদলহরী' (১৯০৫) গোবিন্দদাসের পদের মধ্যে ৪৮৮টি পদ যথার্থ গোবিন্দদাসের রচিত। 'পদকল্পতরু'র সম্পাদক সতীশ চন্দ্র রায় মহাশয় 'পদকল্পতরু' ও 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'তে গৃহীত গোবিন্দদাসের ভণিতাযুক্ত পদ মিলাইয়া সিদ্ধান্ত করেন, "গোবিন্দ কবিরাজের প্রায় পাঁচ শত পদ পাওয়া যায়।"[৪৫] সম্প্রতি ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে গোবিন্দদাসের পদাবলীর যে উপাদেয় সংস্করণ ('গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ') সম্পাদনা করিয়াছেন তাহাতে গোবিন্দদাস কবিরাজের ৭২৮টি, পদ এবং পরিশিষ্টে গোবিন্দ আচার্যের ৩১টি, গোবিন্দ চক্রবর্তীর ২৩টি, গোবিন্দদাস নামধারী কোন অর্বাচীন কবির ৬৯টি, মৈথিল কবি গোবিন্দদাসের ২টি পদ সংগ্রহ করিয়া গোবিন্দদাসের বৃহত্তম পদাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ সম্পাদনা করিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের পদপরিচয় ॥ বিদ্যাপতির বাকরীতি ও অলঙ্করণ এবং সংস্কৃত প্রেমভক্তিরসের 'উদ্ভট' কবিতাকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া গোবিন্দদাস যে প্রায় সাতশত পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে অল্প-কিছু বাংলা ও মিশ্রবাংলা পদ থাকিলেও তাঁহার অধিকাংশ পদই ব্রজবুলিতে রচিত। তাঁহার আবির্ভাবের অর্ধশতাব্দী পূর্বেই মৈথিল ও বাংলার সংমিশ্রণে 'ব্রজবুলি' নামক কৃত্রিম কবিভাষা বৈষ্ণবপদের বাহন হিসাবে গোটা পূর্বভারতেই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। গোবিন্দদাসের কবিতার বাণীভঙ্গিমা ব্রজবুলির মধুর সরস চিত্র ও সঙ্গীতধর্মকে আশ্রয় করিয়া ভক্তিসাধনার সারস্বত সাক্ষ্য হিসাবে বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়াছে। বিদ্যাপতির মৈথিল পদের দার্ঢ্য ও বাংলা পদের অন্তর্নিহিত সুকোমল রসধ্বনি মিলিত হইয়া শ্রোত্ররসায়ন স্বরূপ এই যে পদসমূহ রচিত হইয়াছে, ইহার বাণীমূর্তি ও রসমূর্তি ভক্তিসাধনার একটি তুঙ্গ শীর্ষ লাভ করিয়াছে, যাহাতে ভুক্তি ও মুক্তি, প্রেম ও সৌন্দর্য, রং ও রূপ—সমস্তই একত্রে মিলিত হইয়া মধ্যযুগীয় বাঙালী 'কবিমনীষী'র সুচিরস্থায়ী প্রতিভাকে সুপ্রসারিত করিয়াছে। গোবিন্দদাস প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে মাতামহ প্রভাবিত শাক্ত

---

৪৫ পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ. ৬৯

মত ত্যাগ করিয়া শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট বৈষ্ণবমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে, ইহার পরেই তাঁহার বৈষ্ণব পদসমূহ রচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ যৌবনের উচ্ছল ঐশ্বর্য অপেক্ষা পরিণত বয়সের পরিপক্ক রসস্ফূর্তি তাঁহার পদসাহিত্যের নিয়ামক হইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই যুক্তি সঙ্গত। অবশ্য ইহাও অনুমানসিদ্ধ যে, চল্লিশ বৎসর বয়স হইবার পূর্বেও তিনি পদ রচনা করিয়াছিলেন, সে সমস্ত পদ শাক্ত ধর্মানুকূল হওয়াই অধিকতর সম্ভব। দুঃখের বিষয় গোবিন্দদাসের একটি ব্যতীত কোন শাক্ত পদ পাওয়া যায় না। অবশ্য কৃষ্ণলীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে কোন কোন অর্বাচীন কবি গোবিন্দদাস ভণিতা গ্রহণ করিয়া যে কৃষ্ণকালীর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ('গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' পদ ৮৪২-৮৪৫) শাক্ত ধরনের বর্ণনা থাকিলেও[৪৬] তাহা যে গোবিন্দদাস কবিরাজের রচনা নহে তাহাতে আমরা নিঃসন্দেহ। শুনা যায় শ্রীনিবাসের কৃপায় সুস্থ হইয়া তিনি সর্বপ্রথম এই বৈষ্ণব পদটি রচনা করিয়াছিলেন, "ভজহুঁ রে মন নন্দ-নন্দন অভয় চরণারবিন্দ রে"।[৪৭] পরিপক্ক ব্রজবুলিতে রচিত এই পদটি যে তাঁহার সর্বপ্রথম রচনা তাহা বিশ্বাস হয় না। সে যাহা হউক, তাঁহার সমস্ত বৈষ্ণব-পদ প্রবীণ বয়সের প্রারম্ভ হইতে রচিত হইতে আরম্ভ করে এরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত।

গোবিন্দদাসের পদের শ্রুতিমাধুর্যের জন্য কীর্তনীয়া সমাজে উহাদের অত্যধিক জনপ্রিয়তা দেখা দিয়াছিল। ফলে তাঁহার অধিকাংশ পদ কালের কবল হইতে

---

৪৬ কালিরূপ দেখি তখন যত সখিগণ।
আনন্দে করয়ে সভে পূজার আয়োজন॥
গঙ্গাজল বিল্বদল জবাদল আদি।
মহামায়া পূজিবাবে আছে যেই বিধি॥
রক্ত বস্ত্র আদি করি রক্ত চন্দন।
নানাবিধ মতে করে পূজার আয়োজন॥
(ডঃ মজুমদারের সংস্করণ, পদ— ৮৪৪)

এই পদে গোবিন্দদাসের ভণিতা থাকিলেও ইহা কবিরাজের রচনা নহে, পরবর্তী কালের কোন নিকৃষ্ট কবির রচনা।

৪৭ এই পদটিকে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ও 'ভক্তিরত্নাকরে'র নজিরে গোবিন্দদাসের রচিত প্রথম পদ বলিয়াছেন। (পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ ৬৫)

রক্ষা পাইয়াছে, আমাদের যুগেও আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁহার সঙ্কলনে ('গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ') গোবিন্দদাসের ভণিতাযুক্ত যে পদগুলিকে প্রামাণিক মনে করিয়াছেন সেগুলিকে তিনি পৃথক করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। গোবিন্দদাস 'উজ্জ্বলনীলমণি' ও 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন তাহা 'প্রেমবিলাসের' সাক্ষ্য হইতে বুঝা যাইতেছে।[৪৮] শ্রীনিবাস তাঁহাকে 'রসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বল' পড়িতে নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং তাহাতে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণলীলা অনুসরণ করিতে বলিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস সেই আদর্শে তাঁহার পদাবলীর বিষয়বিভাগ করিয়াছিলেন এবং সেই গ্রন্থ অবলম্বনেই তিনি রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ে পদ রচনা করিয়াছিলেন।[৪৯] সঙ্কলনগ্রন্থে তাই ডঃ মজুমদার সেই ধারা অনুসরণ করিয়া লীলাপর্যায় সাজাইয়াছেন, প্রথমে বন্দনা-অংশে চৈতন্যবিষয়ক অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পদ সংগৃহীত হইয়াছে। বিখ্যাত পদগুলির কয়েকটি ('চম্পক-শোণ-কুসুম-কনকাচল', 'জম্বুনদতনু বদন অম্বুজে সঘনে হরি হরি বোল', 'পতিত হেরিয়া কান্দে', 'নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে পুলক মুকুল অবলম্ব', 'প্রেমভরে ঢর ঢর কনয়া কলেবর', 'ভাবে ভরল হেম তনু অনুপাম রে', 'সুরধুনি বারি ঝারি ভরি ঢারই পুন ভরি পুন ভরি ঢারি') এই অংশে স্থান পাইয়াছে। কখনও চৈতন্যদেবের বিরহব্যাকুল মূর্তি, কখনও প্রেমোল্লাসে পুলকশিহরণ, কখনও নিজ শিষ্যগণ সহ নদীয়া বিহার, এবং ভক্তগণকে প্রেমকল্পতরু হইতে ভক্তিফল বিতরণ প্রভৃতি বর্ণনা অতি নিপুণ আলঙ্কারিক বৈচিত্র্যসহ রচিত হইয়াছে। চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ মূর্তিটির রেখাচিত্র যে-কোন প্রথম শ্রেণীর গীতিকবির সাধনার বিষয়:

লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে।

---

৪৮ প্রেমবিলাস, ১৪শ বিলাস

৪৯ শুভক্ষণ করি পুঁথি পড়িতে লাগিলা।
বিষয়বিভাগ তার সকল কহিলা॥
শুনিতেই মাত্র গ্রন্থের যেমত আভাস।
অনুভবি বহু অর্থ করিল প্রকাশ॥

কিংবা

নীরদ নয়ন নীরঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চূয়ত
বিকশিত ভাবকদম্ব॥

অথবা

অরুণদিঠি জলে অবনি ভাসল
সুমেরু সিঞ্চিত জম্বু।

প্রভৃতি পদে শ্রীচৈতন্যের ভাবোন্মত্ত মূর্তিটি কবি নিপুণ চিত্রকরের মতো ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ভাষার ঝঙ্কার ও রূপকল্পের তীক্ষ্ণতার সঙ্গে কবির আত্মনিবেদনমূলক ভক্তি এই পদগুলিতে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়াছে বলিয়া গৌরাঙ্গস্তববিষয়ক পদাবলীতে কবির অসাধারণ নৈপুণ্য স্বীকার করিতে হইবে।

কতকগুলি পদে গোবিন্দদাস নিজের গুরু শ্রীনিবাস আচার্য[৫০] ও অদ্বৈত-প্রভুর অভিষেক[৫১], রঘুপতি রামচন্দ্র[৫২] ও জয়দেবের বন্দনা[৫৩] করিয়া পদ লিখিয়াছিলেন। একটি পদে নরোত্তম ঠাকুরের বন্দনায় ঠাকুর মহাশয়কে কবি বলিয়াছেন:

---

৫০ পহু মোর শ্রীশ্রীনিবাস গুণধাম।
দীনহীন-তারণ প্রেমরসায়ন
ঐছন মধুরিম নাম॥ (পদকল্প, পদ—১০)

৫১ পদকল্পতরু, পদ—১৫৭৯

৫২ জয় জয় রাম রাম রঘুনন্দন
জনকসুতা নিজ কান্ত।
সুরনর বানর খচর নিশাচর
যতুগুণ গায় অনন্ত॥ (পদকল্পতরু, পদ—২৪০৭)

এই পদটিতে পঞ্চকোটের রাজা হরিনারায়ণের উল্লেখ আছে। ইনি রামমন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছিলেন এবং কবির বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

৫৩ (১) শ্রীজয়দেব কবি কবিকুলভূষণ
পদ্মাবতী-হৃদয় বিলাসী॥ (গৌরপদতরঙ্গিণী)

(২) শ্রীজয়দেব কবীশ্বর সুরতরু
যছু পদপল্লব ছাহ।
তাপ তাপিত মধু হৃদয় বিয়াকুল
জুড়াইতে করু অবগাহ॥ (ঐ)

জয় রে জয় রে জয় ঠাকুর নরোত্তম
প্রেম ভকতি মহারাজ।

এই বন্দনা অংশে দুইজন কবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ভাষা ও ভাবরসের দ্বারা অনুপ্রাণিত, প্লাবিত ও রসার্দ্র হইয়াই বৈষ্ণব পদসাহিত্যে আবির্ভূত হন, বিদ্যাপতির কোন কোন খণ্ডিত পদ পূর্ণ করেন, কোনটিতে-বা বিদ্যাপতির প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করেন। বিদ্যাপতির বন্দনাসূচক তাঁহার দুইটি পদ প্রসিদ্ধ। একটি পদে (পদকল্প-.২) তিনি বিদ্যাপতির প্রতি অন্তরের ভক্তি নিবেদন করিয়া বলিতেছেন :

বিদ্যাপতি পদ যুগল সরোরুহ
নিস্যন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর
পিবইতে করু অনুবন্ধে॥

এই পদে তিনি বিদ্যাপতিকে পরম ভক্তরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। আর একটি পদে (পদকল্প-২৩৮৬) তিনি কবিকুলশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতিকে এইভাবে বন্দনা করিয়াছেন :

কবিপতি বিদ্যাপতি মতিমানে।
লাখগীতে জগ চীত চোরায়ল
গোবিন্দ-গোরি-সরস রসগানে॥

বিদ্যাপতি হইতেছেন রসমেঘ—"সো আনন্দরস জগভরি বরিখল," স্বয়ং রাধামাধব পর্যন্ত 'কি সুন্দর কি সুন্দর'[৫৪] বলিয়া যে কবির গানের প্রশংসা করেন, আর মন্দমতি গোবিন্দদাস কিনা বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে চাহেন! অর্থাৎ বিদ্যাপতির উৎকৃষ্ট পদ থাকিতে তিনি আবার পদ রচনা করিতে চাহেন. ইহাই তাঁহার বিড়ম্বনা—

গোবিন্দদাস মতিমন্দে।
এত সুখসম্পদ কহইতে আনমন
যৈছন বামন ধরবহি চন্দে॥ (পদকল্প—২৩৮৬)

বিদ্যাপতির ভাবাদর্শের দ্বারা তিনি কতদূর প্রভাবিত হইয়াছিলেন ইহাই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ। অবশ্য বিদ্যাপতির অলঙ্করণ ও চিত্রকল্পই তাঁহাকে

---

৫৪ সো রস শুনি নাগর বরনারী
কিয়ে কিয়ে করিয়া চীত চমকাওই॥

অধিকতর আবিষ্ট করিয়াছিল ; রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদে বিদ্যাপতি মর্ত্যজীবন-রসের প্রচণ্ড উল্লাস ও বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের কবি তাহা হইতে উজ্জ্বলরসের নির্যাসটুকু ছাঁকিয়া লইয়াছিলেন।

গোবিন্দদাস শুধু বিদ্যাপতির নহে, পদাবলীর চণ্ডীদাসের চরণ শিরে ধারণ করিয়াও পদ রচনা করিয়াছেন :

চণ্ডীদাসচরণ চিন্তামণিগণ
শিরে করি ভূসা।
শরণাগত জনে হীন অকিঞ্চনে
করুণা করি পূরব আশা॥ (বৈষ্ণবপদলহরী)

চণ্ডীদাসের মতো দীনতা অবলম্বন করিয়া গোবিন্দদাস চণ্ডীদাসের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন,—রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব চরিতকথা বদন ভরিয়া গাহিব ; হে কবি, আমার এ সাধ পূরাও—

দুহুঁক চরিত বদন ভরি গাওব
রসিক ভকতগণ পাশ।
ক্ষমহ অপরাধ সাধ মরু পূরহ
কহ দীন গোবিন্দদাস॥

পদাবলীর চণ্ডীদাসের সঙ্গে গোবিন্দদাসের মনোভঙ্গী ও প্রকাশ রীতির সাদৃশ্য নাই ; তিনি শিল্পীর মতো ভাব ও বর্ণনার বিচিত্র অলঙ্কারে পদাবলী সাজাইয়াছিলেন। সংস্কৃত পদ ও সাহিত্যের বাণীমূর্তি তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, এবং বিদ্যাপতির ব্রজবুলির আকারে রূপান্তরিত পদাবলী তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার পদে আদিরসাশ্রিত সংস্কৃত 'উদ্ভট' ও ভক্তির কবিতা এবং বিদ্যাপতির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ প্রভাবই দৃষ্টিগোচর হয়। চণ্ডীদাস অলঙ্কৃত বাক্‌রীতিকে অনাবৃত প্রাণের বেদনা-শতদলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহার পদে গ্রামীণ জীবনের শান্ত, স্নিগ্ধ মাধুরীটি অপরূপ হইয়াছে। কিন্তু গোবিন্দদাসের পদে এমন একটা মার্জিত, উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ নাগরিকতা আছে যে, তাহার একমাত্র তুলনাস্থল কবি বিদ্যাপতি। তাহা হইলেও গোবিন্দদাস পদাবলীর চণ্ডীদাসকে প্রণাম নিবেদন করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র সৌজন্য প্রকাশ বা প্রথাপালন নহে। কবিরাজ ঝঙ্কারমুখর বাকনির্মিতি ও তির্যক বৈদগ্ধ্যের সাহায্য লইলেও তাঁহার অন্তর্লোকে খুব সম্ভব চণ্ডীদাসের সহজ কথায়-

প্রকাশিত প্রাণের গভীর বাণী একপ্রকার অনাস্বাদিতপূর্ব আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার বাংলা পদের বাণীরূপ ও চিত্রকল্পের কোন কোন স্থলে চণ্ডীদাসের প্রতীকদ্যোতনার স্পর্শ অনুভব করা যায়। গোবিন্দদাসের শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধাকে বলেন:

এ গজগামিনি তো বড়ি সিয়ান।
বলে ছলে যাচসি গিরিধর দান॥
চিকুরে চোরায়সি চামর কাঁতি।
দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি॥
অধরে চোরায়সি সুরঙ্গ পঙার।
বরণে চোরায়সি কুঙ্কুম ভার॥

কিংবা কবি যখন শ্রীরাধার রূপ বর্ণনা করেন:

যাঁহা যাঁহা নিকসই তনু তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থলকমলদল খলই॥
* * * *
যাঁহা যাঁহা ভঙুর ভাঙু বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দি হিলোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল ভরই॥

তখন তাহার রূপ ও রস বিদ্যাপতিকে স্মরণ করাইয়া দেয়।[৫৫] কিন্তু কবি যখন রাধার জবানীতে বলেন,

এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।

---

৫৫ গোবিন্দদাসের উল্লিখিত পদটি বিদ্যাপতির একটি প্রসিদ্ধ পদের অনুকরণে রচিত:

জহাঁ জহাঁ পদজুগ ধরই।
তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই॥
জহাঁ জহাঁ ঝলকত অঙ্গ।
তঁহি তঁহি বিজুরি তরঙ্গ॥
* * *
জহাঁ জহাঁ নয়ন বিকাস।
তঁহি তঁহি কমল পরকাস॥

না জানি কি জানি হয় পরিণামে
দাস গোবিন্দ কয় ॥

কিংবা যখন তিনি কৃষ্ণের আর্তি বর্ণনা করেন :

একেলা যাইতে যমুনাঘাটে।
পদচিহ্ন মোর দেখিল বাটে ॥
প্রতি পদচিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি বিকল আকুল প্রাণ ॥

এই সহজ প্রাণের নিরাভরণ প্রকাশ তখন চণ্ডীদাসের সুরের প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়।

পালা বিন্যাসের ধারা ॥ গোবিন্দদাসের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পদাবলী-সংগ্রহে সঙ্কলিত পদে এবং শুধু তাঁহারই পদের পুঁথিতে রাধাকৃষ্ণ লীলার একটা ক্রম বা স্তর-পরম্পরা আবিষ্কার দুরূহ নহে। 'উজ্জ্বলনীলমণি' ও 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু'তে রাধাকৃষ্ণলীলা যেভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে রসের যেরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে, গোবিন্দদাস তাহার ধারা অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া রাধাকৃষ্ণের গীতিকা যে রীতি অবলম্বনে সজ্জিত হইয়াছিল, তিনি সেই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। বৈষ্ণবপদাবলী একাধারে গীতিকবিতা, ভজনগীতিকা ও আখ্যায়িকা—এই ত্রিবিধ রূপরীতির সমন্বয়ে এই পদসাহিত্য বিকশিত হইয়াছে। তাই এই সমস্ত পদ মূলতঃ লীরিক হইলেও ইহার মধ্য দিয়া একটা কাহিনীর স্রোতও প্রবাহিত—ইহাই পালাকীর্তন। কৃষ্ণ ও রাধার জন্ম হইতে এই পালার শুরু এবং ক্রমে ক্রমে কাহিনীর অগ্রগতি ও বিকাশ, রাধাকৃষ্ণের রূপবর্ণনা, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা, রাধা ও কৃষ্ণের পূর্বরাগ, প্রথম মিলনরভস, রাধার অভিসার, বাসকসজ্জা; খণ্ডিতা রাধার মনোবেদনা, অভিমানিনী রাধা কর্তৃক অপরাধী কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা, অনুতপ্তচিত্তে কৃষ্ণের প্রস্থান, কলহান্তরিতা রাধার খেদ, দান-নৌকা-দোল-রাসলীলা, প্রেমবৈচিত্ত্য, বিরহ (মাথুর) ও ভাবোল্লাস (ভাবসম্মিলন)—ইহাই বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ লীলার মোটামুটি কাহিনী-সূত্র। কবিগণ গীতিরসসিক্ত বিচ্ছিন্ন পদাবলী লিখিলেও সমস্ত পদের মধ্যেই এইরূপ একটি কাহিনীর ধারা লক্ষ্য করা যাইবে। ভাগবত বিষ্ণুপুরাণ-গীতগোবিন্দ ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণাদিতে কৃষ্ণলীলা যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বিশেষতঃ কিশোর কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা—বৈষ্ণবপদকারগণ তাহা হইতেই কাহিনীর সূত্র গ্রহণ করিয়া

এবং রাধা চরিত্রের প্রাধান্য দিয়া এই সমস্ত পদ রচনা করিয়াছেন, গোবিন্দদাসের পদাবলীর উৎসও তাহাই। তিনিও বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্ন পদাবলী রচনা করিলেও রাধাকৃষ্ণলীলাকে একটি ক্রমবিকাশশীল কাহিনীর দ্বারাই গ্রন্থন করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার পদাবলীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণলীলা ব্যতীত আরও দুই চারটি নূতনত্ব আছে, যাহা অন্যান্য পদকারদের মধ্যেও মিলিবে। বৈষ্ণব আচার্য ও কবিদের বন্দনা, রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা 'চিত্রগীতি' (অর্থাৎ অকারাদি ক্রমে পদ রচনা), প্রার্থনা এবং মনঃশিক্ষা (অর্থাৎ নীতি ও ভক্তির দ্বারা মনকে প্রবুদ্ধকরণ)—এই পর্যায়ের পদগুলি 'বিবিধ' আখ্যায় আখ্যাত হইতে পারে, যদিও মূল পদের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ের মতে গোবিন্দদাস শ্রীধরদাসের সঙ্কলিত (লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক) 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ও রূপগোস্বামী সঙ্কলিত 'পদ্যাবলী' পাঠ করিয়াছিলেন। কারণ 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' "শৃঙ্গার প্রবাহবীচিতে" প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার মিলনবিরহের যে-ধরনের ভাব ও আবেগের পরিচয় এবং সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, গোবিন্দদাস সেই প্রথা অনুসরণ করিয়াছেন। এবিষয়ে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে নায়ক-নায়িকার যেরূপ ব্যাখ্যান আছে গোবিন্দদাসও সেই পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং তৎকালে প্রচলিত গৌড়ীয় ভজনাদর্শ ও 'মহাজন'দের আদর্শের দ্বারা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রজ্ঞানকেও মার্জিত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রভৃতি পদকারগণ ঐ একই লীলাপর্যায় অনুসরণ করিয়াছিলেন—তবে ব্যক্তি ও যুগভেদে তাঁহাদের পালার মধ্যে যৎসামান্য বিষয়বৈচিত্র্য আছে। যেমন 'অষ্টকালীয় লীলা' গোবিন্দদাসেরই পরিকল্পনা, অন্য পদকর্তারা এই ধরনের পদ অল্পই লিখিয়াছেন। তিনি বোধ হয় রূপগোস্বামী নির্দিষ্ট বৈষ্ণব সাধনার ধারাকে পদাবলীর আকার দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ডঃ মজুমদার গোবিন্দদাসের পালাবিন্যাসরীতির উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, "গোবিন্দদাস ইঁহাদেরই (অর্থাৎ বিদ্যাপতি জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবি) মতন বিষয় লইয়া পদ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু ইঁহারা কেহই বিষয় বৈচিত্র্যে গোবিন্দদাসের সমকক্ষ নহেন।" [৫৬] গোবিন্দদাসের

৫৬ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ', পৃ. ৪৭৩

বিষয়-বৈচিত্র্যের প্রমাণ হিসাবে তিনি 'অষ্টকালীয় লীলা' ও শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণনার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই দুই লীলা কবিপ্রতিভার উৎকৃষ্ট পরিচায়ক নহে। পালাবিন্যাসে গোবিন্দদাস যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রভৃতি পদকর্তাদের অপেক্ষা অধিকতর মৌলিকতা ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা মনে হয় না। এ বিষয়ে তিনি বৈষ্ণবসমাজ ও কবিমহলে প্রচলিত সাধারণ সংস্কারের দ্বারাই চালিত হইয়াছিলেন। তবে রচনাবৈচিত্র্য হিসাবে এই লীলাপর্যায়ের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা ও বিরহের পর্যায়ের পদসন্নিবেশ প্রশংসা দাবি করিতে পারে। তন্মধ্যে অভিসারের পদগুলি নিবিড় রসানুভূতি ও বর্ণনার চমৎকারিত্বে বৈষ্ণবপদসাহিত্যে অতুলনীয়, এ বিষয়ে বিদ্যাপতিও তাঁহার সমকক্ষ নহেন।

এই পালাবিন্যাসে কবি প্রাচীন পুরাণ ও তাঁহার সমসাময়িক বাঙলাদেশের সামাজিক পটভূমিকার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কৃষ্ণ যেন গৌড়ভূমির কোন প্রধান নায়ক, যাঁহার চারিদিকে তৎকালীন বাঙলাদেশের সামাজিক পরিমণ্ডলের আবরণ রহিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের সম্পর্ক বিচারেও কবি তৎকালীন বাঙালী হিন্দুর পারিবারিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। রাধা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবার জন্য গুরুজনভীতিকে যে পুনঃ পুনঃ তুচ্ছ করিয়াছেন, তাহাতে একযুগের শুদ্ধান্তঃপুরবাসিনী কুলমানভীতা নারীসমাজের ছবিটি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে।[৫৭]

কীর্তনীয়া সমাজ গোবিন্দদাসের পদাবলীকেই রসকীর্তনে অধিকতর প্রাধান্য দিয়া থাকেন এবং শ্রোতৃমণ্ডলীও গোবিন্দদাসের কীর্তনে অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।[৫৮] গোবিন্দদাসের অসাধারণ নির্মিতিকৌশল

---

৫৭ (১) পহিলহি ফুল ভুল সম উয়ল যাকর বেণুক ফুকে। (যাহার বেণুর রবে আমার কুলগৌরব তুলার মতো উড়িয়া গেল।)

(২) গুরুজন গৌরব চৌর সদৃশ ভেল দূরহি দূরে রহু ভাগি। (গুরুজনের গৌরববোধ যেন চোরের মতন দূরে দূরে পলাইয়া রহিয়াছে।)

(৩) গুরুজন বচন বধির সম মানই আন শুনই কহ আন। (গুরুজনের বাক্যে বধিরের মতো ব্যবহার করিতেছেন, এক কথা শুনিয়া অন্য কথার জবাব দিতেছেন।)

৫৮ "বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের পদাবলী সমুদ্র বিশেষ হইলেও গোবিন্দদাসের অন্ততঃ বাছা বাছা দুই চারিটা পদ উত্তমরূপে আখর দিয়া গান করিতে না পারিলে কীর্তনের কোন পালাই জমে না।" পদকল্পতরু, ৫ম (সতীশচন্দ্র রায়ের মন্তব্য)

ও ভক্তিভাবের গাঢ়তাই তাহার একমাত্র কারণ হইলেও তাঁহার পদাবলী হইতে রাধাকৃষ্ণলীলার পূর্বাপর সঙ্গতি ও যোগাযোগপূর্ণ ধারাবাহিক কাহিনীর বিকাশ ও পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এই কাহিনীসূত্র বয়নে তিনি প্রায় কোথাও কোন নূতনত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই, পূর্বসূরীদের পদাঙ্কই অনুসরণ করিয়াছেন। ইহার কারণ তিনি বিশুদ্ধ ধরনের লীরিক পন্থার সাধক; ভাবে, ভাষায়, চিত্ররীতি ও ধ্বনিমাধুর্যে এরূপ একটি গীতিরসসিক্ত কবি ও ভক্তের আবির্ভাব বাঙলাদেশে মধ্যযুগে দ্বিতীয় বার হয় নাই—এবং এই জন্যই তিনি কাহিনীগ্রন্থনে মৌলিকতা দেখাইবার চেষ্টা না করিয়া বরং ভাবাবেগের লীরিক উচ্ছ্বাস ও সঙ্গীতমাধুর্যকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন।[৫৯]

গোবিন্দদাসের কবিত্বের বৈশিষ্ট্য ॥ *গোবিন্দদাসকে কোন বৈষ্ণব* কবি 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'[৬০], কেহ-বা "তিখিন বাণ সম বেধই হিয়শির" (তীক্ষ্ণ বাণের মতো হৃদয় ও বুদ্ধিকে বিদ্ধ করে)[৬১], বলিয়াছেন, তাঁহার গীতে সুধারস বর্ষিত হয়, কবিগণের চিত্ত চমকিত হয়—

যাকর গীতে সুধারস বরিখয়ে
কবিগণ চমকয়ে চীত। (বৈষ্ণবদাস, পদকল্প, ১৮)

বিদ্যাপতিকে বাদ দিলে তাঁহার সমধর্মা কোন কবি মধ্যযুগে আবির্ভূত হন নাই। আধুনিক কালেও তাঁহার পদঝঙ্কার আমাদের কানে আসিয়া বাজিতে থাকে। তাঁহার বাক্‌রীতি, ছন্দ ও অলঙ্কারের মধ্যে এমন একটা রূপরসকল্পগত ঐশ্বর্যের সমারোহ আছে যে, মনের গভীরে ভাবের আলোড়ন উঠিবার পূর্বেই শ্রুতিপথ রমণীয় ধ্বনিরসে ভরিয়া যায়। এইজন্য কেহ কেহ জ্ঞানদাসের

---

৫৯ এ বিষয়ে সতীশচন্দ্র রায় বলিয়াছেন, "গোবিন্দদাস স্বরচিত পদাবলীর দ্বারা চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ন্যায় পালা সাজাইয়া গিয়াছেন কিনা, জানা যায় নাই। সেইরূপ করিয়া থাকিলেও আমরা এ পর্যন্ত তাহা পাই নাই।" (পদকল্প, ৫ম) আমাদের মনে হয়, নানা পালা বা লীলাপর্যায় ধরিয়া পদ রচনা করিলেও গোবিন্দদাস কোন পালাগান রচনা করেন নাই। তাঁহার নামে প্রচারিত 'একান্নপদ' শীর্ষক পদে কাহিনীর ধারাবাহিকতা আছে বটে, কিন্তু উহা তাঁহারই রচনা কিনা বলা যায় না (দ্রষ্টব্য: পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ. ৬৯, পাদটীকা)

৬০ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

৬১ নরহরি চক্রবর্তী

নিরাভরণ কিন্তু ব্যঞ্জনাবহুল পদের উচ্চ প্রশংসা করিয়া গোবিন্দদাসকে একটু নিম্নস্থান দান করিতে চাহেন। তাঁহাদের মতে গোবিন্দদাস পণ্ডিত, বিদগ্ধ কবি, কিন্তু সাদা প্রাণের নিরাভরণ কথায় চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস অধিকতর গৌরব লাভ করিয়াছেন। কাব্যরসভোগের প্রবণতা ও মানসিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে কেহ অনলঙ্কৃত সহজ সুর পছন্দ করেন, কেহ-বা অলঙ্কৃত বাগ্‌বৈদগ্ধ্য-পূর্ণ রচনার প্রশংসা করিয়া থাকেন। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, "গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর পরবর্তী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইলেও তাঁহার রচনায় ভাবের গূঢ়তা, অলঙ্কার ও ধ্বনির প্রাচুর্য ও সমাসবাহুল্যের জন্য তাঁহার রচনা সাধারণ পাঠকের তো কথাই নাই, অধিকাংশ শিক্ষিত ও সৌখীন কাব্যরসামোদী পাঠকের পক্ষেও দুরধিগম্য হইয়া রহিয়াছে" (পদকল্প. ৫ম, পৃ. ৬৮)। এই মন্তব্য নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। বাস্তবিক তাঁহার পদের রসাস্বাদন করিতে হইলে শুধু সহজ রসবোধ থাকিলেই চলিবে না, তাহার সঙ্গে একটি তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বিদগ্ধ মনও প্রয়োজন। তাই হয়তো কেহ কেহ তাঁহাকে ভবভূতি বা ব্রাউনিং-এর মতো ব্যাখ্যাগম্য কবি বলিয়া তাঁহার কবিপ্রতিভাকে কিঞ্চিৎ খর্ব করিতে চাহিবেন। পরে তাঁহার কবিকর্ম সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি, এখানে সে প্রসঙ্গের অবতারণার প্রয়োজন নাই। কিন্তু গোবিন্দদাস বিচিত্র ভাবৈশ্বর্য, রূপকল্প ও রাধাকৃষ্ণ চরিত্র উপস্থাপনে বিশিষ্ট প্রতিভার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিদ্যাপতি অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকতর প্রশংসনীয়। সূক্ষ্ম ভাবের ব্যঞ্জনা আবেগানুসারে যে কী পরিমাণে চিত্র-সঙ্গীত-ময় হইতে পারে, তাহার অসংখ্য নিদর্শন গোবিন্দদাসের পদাবলীর সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। চৈতন্যদেবের বন্দনায়—

অভিনব হেম- কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনি তীরে উজোর।

উক্তিটি একটি আশ্চর্য চিত্রপদ্ধতি, যাহা ফরাসী প্রতীকী গোষ্ঠীভুক্ত কবিদের স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহার ভাবব্যঞ্জনা দূরপ্রসারী ও গূঢ় অর্থবহ। চৈতন্য-প্রভু শুধু কল্পতরু নহেন, অভিনব হেম কল্পতরু। চৈতন্যদেবের গৌরবর্ণের সঙ্গে হেম কল্পতরুর সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু কবি 'অভিনব' শব্দটি প্রয়োগ করিয়া স্বর্গের কল্পতরুর সঙ্গে কলিযুগের এই হেম কল্পতরুর পার্থক্য নির্দেশ

করিতেও ভুলেন নাই। এ কল্পতরু স্থাবর নহে, ইহা সুরধুনী তীরে পরিভ্রমণ করিতেছে। উপরন্তু স্বর্গের কল্পতরু ঐহিক কাম্যফল প্রদান করে, আর নবদ্বীপের হেমকল্পতরুটি তাহা অপেক্ষা বহুগুণে আদরণীয় প্রেমভক্তি বিতরণ করিতেছে। এই ভাবে সুরসিক ও বিদগ্ধ মনের কাছেই কবির সূক্ষ্ম ভাবের ব্যঞ্জনা ধরা পড়িবে। এমন কি নিধুবন-বিলাসের মত্ততা বর্ণনা করিবার সময় কবি গোবিন্দদাস বলিতেছেন :

নারী পুরুষ দুহুঁ লখই না পারিয়ে
অপরূপ দুহুঁজন রঙ্গ।

সে বর্ণনাতেও স্থূল দেহসম্ভোগ ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময়াবহ সৌন্দর্য-উল্লাসে পরিণত হইয়াছে। রাধার কেশের বর্ণনা :

সো ঘন চিকুর- তিমির ঘন চুম্বিত
ইহ অতি অপরূপ ভাতি।

রাধার ঘনকেশরাশিকে যেন ঘন তিমির চুম্বন করিতেছে। শুধু সাদৃশ্যবোধক উৎপ্রেক্ষাই ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য নহে, ঘন কেশ ও গাঢ়তম তিমিরের সাদৃশ্য নিতান্ত সাধারণ বর্ণনা নহে।

রাধা কানু-অনুরাগে কুলমান বিকাইয়া দিলে সখীগণ কুলধর্ম স্মরণ করাইয়া রাধাকে ভর্ৎসনা করিলে তিনি বলেন :

সজনি, অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর তনু মন মাতল
না গুনে ধরম-ভয় লেশ॥

কানু অনুরাগে যাহার তনুমন মত্ত হয় সে কখনও কুলধর্মের ভয় করে না—রাধা বলেন, সজনি, আর আমাকে উপদেশ দিয়া কি করিবে? এই তনুমন মত্ত হওয়ার ব্যঞ্জনা রাধার সর্বসমর্পণমূলক আর্তিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। রাধা কৃষ্ণের কর ধরিয়া বারণ করিলে তাঁহার করস্পর্শে কৃষ্ণের মনে অনুরাগ জন্মিল, যেন দরিদ্র ব্যক্তি ঘটভরা সোনা পাইল :

করে কর বারইতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘটভরি পাওল হেম॥

কিংবা বিরহিণী রাধার আক্ষেপোক্তি :

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা।

প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনি
সুখলব হৈ গেল নৈরাশা ॥

প্রেমের অঙ্কুর জন্মিতে না জন্মিতেই প্রচণ্ড রৌদ্র উঠিল, ফলে তাহার কোমল পত্র দুইটি আর গজাইতে পারিল না। যেন রাত্রিতে প্রতিপদের চাঁদ উদিত হইয়াই অস্ত গেল, সুখলাভের কণামাত্র আশা নৈরাশ্যে পরিণত হইল। এ বর্ণনায় আলঙ্কারিক নিপুণতার সঙ্গে রাধার নৈরাশ্য পীড়িত চিত্তের বেদনা গভীর ভাবগর্ভ হইয়াছে।

কৃষ্ণ মথুরায় (মধুপুর) চলিয়া গিয়াছেন, তাহার ফলে গোকুল বৃন্দাবনের কি অবস্থা হইয়াছে, কবি কয়েকটি পারিপার্শ্বিক বর্ণনার দ্বারা চমৎকার ফুটাইয়াছেন :

তোহে রহল মধুপুর।
ব্রজকুল আকুল গোকুল কলরব
কানু কানু করি ঝুর ॥
যশোমতী নন্দ অন্ধসম বৈঠত
সঘনে উঠিতে নাহি পারে।
সখাগণ ধেনু বেণু নাহি পূরত
বিছুরল নগর বাজারে ॥
কুসুম ত্যজি অলি ভূমিতলে লুঠত
তরুগণ মলিন সমান।
সারী শুক পিক ময়ূরী না নাচত
কোকিল না করতহি গান ॥
বিরহিণী বিরহ যে কি কহব মাধব
দশ দিশে বিরহ-হুতাশ।
সোই যমুনাজল অনল অধিক ভেল
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট transferred epithet-এর দৃষ্টান্ত আর কোথায় পাওয়া যাইবে? কৃষ্ণবিরহে মাতাপিতা যশোদা-নন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত স্থাবরজঙ্গম ব্যাকুল হইয়াছে। পরিশেষে কবি বলিতেছেন, বিরহিণীর দশদিক বিরহ হুতাশে ভরিয়া গিয়াছে, তাহার নিকট যমুনার জল অনল বলিয়া মনে হইতেছে—এই সমস্ত বর্ণনার দ্বারা রাধার অন্তর্ব্যথাই ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গোবিন্দদাসের পদাবলীর মধ্যে কাহিনীগত ঐক্য একেবারে অনুপস্থিত না হইলেও উহাতে এক প্রকার ঘটনার পারম্পর্য আছে, তাহা আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি। কিন্তু সমস্ত পদ বিশ্লেষণ করিলে রাধাচরিত্রেরও যে একটা বিকাশ ও পরিণতি লক্ষ্য করা যাইবে তাহাও উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দদাস রাধার প্রথম অনুরাগ, কৃষ্ণের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ, তাহার জন্য গুরুজনের নিন্দা ও পরিজনের হিতোপদেশ উপেক্ষা, পরিশেষে দুশ্চর তপস্যার মতো অভিসারে বাহির হওয়া—যে রাধা বাড়ীর ভিত্তিগাত্রে অঙ্কিত সাপের ছবি দেখিলে ভীত হইয়া পড়েন, তিনিই কৃষ্ণপ্রেমের আকর্ষণে নিশীথরাত্রে পথে বাহির হইয়া সাপের মাথার মণি স্বহস্তে আচ্ছাদন করেন এবং চারিদিক অধিকতর অন্ধকার করিয়া কৃষ্ণের অভিসারে পথ চলেন :

ভীতক চীত ভুজগ হেরি যে ধনি
চমকি চমকি কাঁপ।
অব আন্ধিয়ারে আপন তনু ছাপই
কর দেই ফণি-মণি ঝাঁপ॥

সত্যই রাধার এ প্রেম অতি বিচিত্র—"প্রেমক গতি অনিবার"। দুর্নিবার কৃষ্ণপ্রেম তাঁহাকে দুর্জয় সাহস দিয়াছে। রাধার চরিত্রাঙ্কনে কবি তাঁহাকে কখনও লাস্যময়ী করিয়াছেন,[৬২] কখনও তিনি নির্মমভাবে কৃষ্ণের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন,[৬৩]

---

৬২ কেশ পসারী যব তুঁহু আছলি
উরপর অম্বর আধা।

(হে রাধা, তুমি যখন কেশ প্রসারিত করিয়া বুকে আধখানা কাপড় দিয়াছিলে, তখন কৃষ্ণ তোমার অসম্বৃত সৌন্দর্য দেখিয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন।)

৬৩ খণ্ডিতার পদে বহুবল্লভ কৃষ্ণকে রাধা বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন :

যো পরবঞ্চক বিহি তাহে বঞ্চউ
দুরজন দেখি না দেখ॥
তুঁহু রসসাগর বিদগধ নাগর
হামে মুগাধিনী কুলনারী।

(হে প্রবঞ্চক, বিধি তোমাকে বঞ্চনা করুক। তুমি রসের সাগর বিদগ্ধনাগর, আর আমি তো মূঢ় কুলবধূ মাত্র।) কখনও-বা রাধা ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে বিমুখ করিয়া বলেন :

শুন নাগর কান।
এতহুঁ করায়সি কাহ অপমান॥

কখনও রসালসে উতরোল,[৬৪] কখনও বর্ষার রাত্রিতে বিরহব্যথায় রাধা একেলা অনিদ্ররজনী যাপন করেন :

নৈরাশ বাসর রজনি দশদিশ
গগনে বারিদ ঝম্পিয়া।
ঝলকে দামিনি পলকে কামিনী
হেরি মানস কম্পিয়া॥
পাপ ডাহুকি ডাহুকে ডাকই
মউর নাচত মাতিয়া।
একলি মন্দিরে অনিদ লোচনে
জাগি সগরহি রাতিয়া॥[৬৫]

কখনও কখনও তিনি মৃতবৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন, তখন সখীগণ দেখে, শ্বাস বহিতেছে কিনা :

নিঝর নয়নে সব সখীগণে
খোঁজত বহে না শ্বাস।

পরে যখন জানিতে পারিলেন, অনুতপ্ত কৃষ্ণ দূতীকে মথুরা হইতে বলিয়া পাঠাইলেন :

কাহে তুঁহু পুনু পুনু দগধসি মোয়।
যাহ চলি তুঁহু যাহা নিবসয়ে সোয়॥

(হে নাগর আমাকে এত অপমান করিতেছ কেন? কেন পুনঃ পুনঃ আমাকে পোড়াইতেছ, সে (অর্থাৎ প্রতিনায়িকা) যেখানে আছে সেখানে যাও।)

৬৪ রতিরঙ্গে রাধার স্বাতন্ত্র্য ও প্রাগল্ভ্যের বর্ণনা :

রতিরণ তুমুল পুলকাকুল সঙ্কুল
ঘন ঘন মঞ্জির বোল।
নিজ মদে মদন পরাভব পাওল
কুণ্ডল গণ্ড হিলোল॥
অনুখন কঙ্কণ কিঙ্কিণী ঝঙ্কৃত
রতিজয় মঙ্গল তুর।
মন্মথ কেতু মকর গড়ি যাওত
গোবিন্দদাস কহ ফুর॥

(পুলক ব্যাকুল রতিরণে ঘন ঘন মঞ্জীর বাজিতে লাগিল, মদনের অহঙ্কার পরাভূত হইল, গণ্ডে কুণ্ডল হিল্লোলিত হইল, রাধার কঙ্কণ ও কিঙ্কিণী জয়সূচক তূরীবাদ্য করিতে লাগিল, আর মন্মথরূপ কৃষ্ণের মকরকুণ্ডল গড়াগড়ি গেল।—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারকৃত অনুবাদ)

৬৫ বিদ্যাপতির "ই ভরাবাদর মাহ ভাদরের" আদর্শেই বোধহয় এই পদটি রচিত হইয়া থাকিবে।

তুয় এক দিবস মাঝে হাম যায়ব
তুঁহু পরবোধবি তাত ॥

তখন শ্রীরাধা উল্লসিত হৃদয়ে কল্পনা করিতে লাগিলেন :

হামরি মন্দিরে যব আয়ব কান।
আঁখি ভরি পেখব সো চাঁদবয়ান ॥

যখন কৃষ্ণ রাধাকে কুশল প্রশ্ন করিবেন তখন রাধার যে কী আনন্দ হইবে তাহা তিনি ভাষায় বলিতে পারিতেছেন না—

সো কি কহব আনন্দ ওর।
পহিলহি পুছব কুশল মোর ॥

তাই তিনি সোল্লাসে সখীদের ডাকিয়া বলেন :

শুন সজনি আজু মোর শুভ দিন ভেল।
সুখ সম্পদ বিহি আনি মিলায়ব
ঐছন মতিগতি ভেল ॥

এবং

নব নব রঙ্গিনি দেউ হুলাহুলি
বসনভূষণ করু শোভা।
প্রাণ প্রাণ হরি নিজঘর আওব
গোবিন্দদাস মনে লোভা ॥

রাধাগতপ্রাণ কৃষ্ণ নিজ ঘরে ফিরিতেছেন জানিয়া সখীগণ আনন্দে উলুধ্বনি করিল—এই পুনর্মিলনের উল্লসিত আনন্দের মধ্যে রাধা চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। বিচ্ছিন্ন পদের মধ্যেও রাধার এরূপ পূর্ণাঙ্গ চরিত্র সৃষ্টি অসাধারণ কবিকর্মের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

রাধা চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতির কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্যান্য নানা বিষয়ে গোবিন্দদাস কবি হিসাবে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অপূর্ব বাণীঝঙ্কার, চিত্ররীতি, অলঙ্কার নৈপুণ্য, ছন্দের কারুকর্ম—কাব্যের বহিরঙ্গ বা প্রসাধন কলায় তাঁহার পারঙ্গমত্ব মধ্যযুগীয় যে কোন বাঙালী কবির ঈর্ষার বস্তু। শ্রোত্র ও রসনার মধুর আস্বাদজনক তাঁহার পদাবলীর বাক্‌মূর্তি সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই এক অভিনব সম্পদ। ব্যঞ্জন ধ্বনিগুচ্ছের ঝঙ্কার সুরতরঙ্গকে যে কিরূপ রূপময়তা দান করে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। নিম্নে এইরূপ অনুপ্রাসযুক্ত বাণীবয়নের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

(১) নন্দনন্দন চন্দচন্দন
গন্ধনিন্দিত অঙ্গ।
জলদসুন্দর কম্বুকন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ॥
প্রেম-আকুল গোপগোকুল
কুলজকামিনি কন্ত।
কুসুমরঞ্জন মঞ্জু বঞ্জুল
কুঞ্জ মন্দির সন্ত॥

(২) কঞ্জ চরণযুগ যাবকরঞ্জন
খঞ্জনগঞ্জন মঞ্জির বাজে।
নীলবসন মণি কিংকিনি রণরণি
কুঞ্জর-গমন দমন খিন মাঝে॥

(৩) কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল কোকিল শোকিল
বৃন্দাবন বনদাব।
চন্দ মন্দ ভেল চন্দন কন্দন
মারুত মারত ধাব॥

* * * *

কঙ্কণ ঝঙ্কণ কিঙ্কিণি শঙ্কিনি
কুণ্ডল কুণ্ডলিভাণ।
যাবক পাবক কাজর আগর
মৃগমদ মদকরি মান॥

(৪) শারদচন্দ পবনমন্দ বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যুথি
মত্ত মধুকর ভোরণী॥

উল্লিখিত ছত্রসমূহের অনুপ্রাসগুচ্ছ মনের মধ্যে যে ধ্বনির মাদকরস সৃষ্টি করে, একমাত্র জয়দেব ও বিদ্যাপতিকে ছাড়িয়া দিলে, ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত মধ্যযুগে বড় একটা সুলভ নহে। অবশ্য কেহ কেহ এই 'তুড়ি দেওয়া' অনুপ্রাসযুক্ত বাক্‌রীতিকে হয়তো প্রীতির সহিত গ্রহণ করিতে চাহিবেন না। কিন্তু অনুপ্রাস যে বাক্যের সঙ্গীতধর্মকে বর্ধিত করে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। পরিমিত ক্ষেত্রে এইরূপ ধ্বনিগুচ্ছ একপ্রকার শব্দানুকারী ঝঙ্কার সৃষ্টি করে, যাহা কাব্যের বহিরঙ্গ নির্মাণ ও অলঙ্করণের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। অবশ্য অনুপ্রাসের মাদকতা কোন কোন সময়ে কৃত্রিম কারুকর্মকে আশ্রয় করে

বলিয়া এই নেশা কবিকে একবার পাইয়া বসিলে ইহা শেষ পর্যন্ত হানিকর মুদ্রাদোষে দাঁড়াইয়া যায়। জয়দেব ও বিদ্যাপতি প্রচুর অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে কৃত্রিম কারুকলা অপেক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত ধ্বনিব্যঞ্জনাই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে, কিন্তু গোবিন্দদাস অনুপ্রাসে অজস্র ঐশ্বর্য সৃষ্টি করিলেও, কোন কোন স্থলে তাঁহার অকারণ শব্দালঙ্কার ও ব্যঞ্জনগুচ্ছের বাহ্বাস্ফোট কবিতার রসহানির কারণ হইয়াছে। যেমন—

মৃগবিত মুর'ল মিলিত মুখমোদনে
মরকত-মুকুর মৈলান।
মানিনি-মান মথন মুচুকায়নি
মুনিমানস মুবছান॥
মাই মোহন-মূরতি মুরারি।
মনইতে মরমে মনোরথ মাধুরি
মনমথ-মন মথ নারি॥

এখানে কবি বক্তব্য বিষয় ছাড়িয়া অনুপ্রাসের বৃথা আন্দোলনে মত্ত হইয়াছেন। রূপ গোস্বামীর 'স্তবমালায়' আছে :

ধরে ধারাধরধরং ধরাধরধুরারুধি।
ধীবধীরাররাধাধিরোধং রাধাধুরং ধরম্॥[৬৬]

ইহা একপ্রকার শাব্দিক ব্যায়াম মাত্র। গোবিন্দদাসও অনুরূপ অনুপ্রাসের অকারণ অনুশীলনে নিজ প্রতিভার কিয়দংশকে নষ্ট হইতে দিয়াছেন। তাঁহার 'চিত্রগীত' শীর্ষক অনুপ্রাসবহুল পদগুলিতে এইরূপ বৃথাশক্তির অপব্যয় লক্ষ্য করিয়া বিষণ্ণ হইতে হয়।

ছোড়ল সুখময় কুসুমশয়ান।
ছোরত হিমকরকর মুরছান॥
ছিরকত মলয়জে জলতহিঁ আগি।
ছটফটি শয়নে গোঙায়ই জাগি॥
ছৈল কানু তুহুঁ সহজই ভোরি।
ছুটত কৈছে বিরহ জ্বরে গোরি॥

---

৬৬ "রাধা ধরে অর্থাৎ গোবর্ধন পর্বতে ধরাধরধর অর্থাৎ গিরিধারীকে আরাধনা করিয়াছিলেন। সেই রাধা ধীর অর্থাৎ স্থিরমতি। তিনি পূজা করিয়াছিলেন কেন? না, মানসিক ব্যথা নিবারণের জন্য। গোবর্ধন পর্বত কিরূপ? না, ইন্দ্রপ্রেরিত মেঘদের উপদ্রব সেখানে বন্ধ হইয়াছে।"—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার অনূদিত ('গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ')

'ছ' কারের এই ছড়াছড়ি রসসৌন্দর্যকে যে নয়ছয় করিয়া দিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কবি এখানে ইচ্ছা করিয়া লীলাচ্ছলে শব্দকৌশলের কৃতিত্ব দেখাইতেছেন। কিন্তু এরূপ ইচ্ছাকৃত শব্দচর্চা ছাড়িয়া দিলে গোবিন্দদাস স্বয়মাগত ও স্বতঃস্ফূর্ত অনুপ্রাসের সাহায্যে একই সঙ্গে ধ্বনিমাধুর্য ও রূপমূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন।

নানা রূপ সাদৃশ্যবোধক অর্থালঙ্কারের সাহায্যে কবি এক একটি আশ্চর্য নিপুণ চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, বিশেষতঃ অভিসারের পদে তাঁহার চিত্র-নির্মিতি-কৌশল পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। পৌষমাসের গভীর রাত্রিতে রাধা অভিসারে বাহির হইয়াছেন :

পৌখলি রজনি পবন বহে মন্দ।
চৌদিশে হিম হিমকর করু বন্ধ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপি।
জগজন শয়নে নয়ন রহু ঝাঁপি॥

পৌষমাসের শীতার্ত রাত্রির হিমময় বর্ণনা এখানে শব্দ অপেক্ষা স্পর্শেন্দ্রিয়কেই অধিকতর সজাগ করিয়াছে। ঘরের মধ্যে থাকিয়াও সকলের তনু কাঁপিতেছে, সকলে চক্ষু মুদিয়া শুইয়া আছে—রাধা উত্তপ্ত শয্যা ত্যাগ করিয়া এইরূপ প্রতিকূল পরিবেশে পথে বাহির হইয়াছেন। বর্ষাভিসারের বর্ণনা আবার শব্দপ্রতীককে অধিকতর প্রাধান্য দিয়াছে :

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তঁহি অতি দরদর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
এ সখি কৈছে করবি অভিসার॥
হরি রহ মানস সুরধুনি পার॥[৬৭]

৬৭ এই মানস-সুরধুনীকে কেহ কেহ আধ্যাত্মিক অর্থে গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেন যে, হরি আছেন মানসগঙ্গার অপর পারে, অর্থাৎ বাক্য ও মনের অতীত লোকে 'যতো বাচঃ নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'। কিন্তু এই বর্ষাভিসারের অপূর্ব রোমান্টিক দৃশ্য ও পরিবেশে আধ্যাত্মিক অর্থ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। মানসসুরধুনী অর্থাৎ গোবর্ধন গ্রামের নিকট অবস্থিত মানসগঙ্গা—যেখানে কৃষ্ণ রাধার জন্য অপেক্ষা করিতেন। এই মানবিক ও বাস্তব অর্থই গোবিন্দদাসের পদে যথার্থ কাব্যধর্মী হইয়াছে। এখানে আধ্যাত্মিক অর্থ আনিয়া ফেলিলে রসাভাস ঘটিবে।

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনাইতে শ্রবণ মরম জরি যাত॥

ঘরের বাহিরে দ্বার রুদ্ধ, পঙ্কিল পথে চলাই দায়, দরদর ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, রাধার নীল নিচোল কি অঝোরঝরণ বারণ মানে? চারদিকে ঘনঘন বজ্রপাত হইতেছে, শুনিলে শ্রবণ ও মর্ম যেন জ্বলিয়া যায়—সখীরা প্রশ্ন করেন, হে সুন্দরী, কেমন করিয়া অভিসার করিবে? হরি যে মানসগঙ্গার ওপারে রহিয়াছেন।

দশ দিশ দামিনি দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচনভার॥

দশ দিকে দামিনীর দহনজ্বালা চোখ ধাঁধিয়া দেয়। তাই সখী প্রশ্ন করেন, হে রাধে, এরূপ দুর্যোগেও তুমি ঘর ছাড়িয়া অভিসারে চলিয়াছ, তুমি কি প্রেমের জন্য দেহত্যাগ করিবে?

ইথে জনি অব তুঁহু তেজবি নেহ।
প্রেমক লাগি উপেখলি দেহ॥

গোবিন্দদাস বলেন, 'ছুটলবাণ কিয়ে যতনে নিবার?' ছোড়া বাণকে কি আর নিবারণ করা যায়? এই পদটিতে সমস্ত বর্ষা রজনীর অশান্ত বেদনা যেন শব্দ ও বর্ণের মধ্যে ঘনীভূত হইয়াছে। বিদ্যাপতিও ভরা ভাদ্রের বর্ষণমুখর রাত্রিতে রাধার বুকফাটা বিলাপের অশান্ত বেদনা ফুটাইয়াছিলেন। পদাবলীর চণ্ডীদাসের রাধা সকলের অলক্ষ্যে এমনি এক বর্ষার রাত্রিতে কষ্টে ভাঙিয়া পড়িয়াছেন, যখন তিনি দেখিয়াছেন, তাঁহার সঙ্কেত অনুসারে আসিয়া বর্ষার ধারাপ্রবাহে "আঙিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে দেখিয়া পরাণ ফাটে।" গোবিন্দদাসের এ পদও সমস্ত বৈষ্ণব পদসাহিত্যের অতুলনীয় বস্তুবিশেষ। আর একপদে সখীদের বারণ সত্ত্বেও দুর্যোগের রাত্রে পথে বাহির হইয়া রাধা বলিয়াছেন:

প্রেম দহনদহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরক আগি।

প্রেমের বহ্নিতে যাহার হৃদয় দগ্ধ হয়, সে কি আর বজ্রের আগুনকে ভয় করে? তাঁহাকে যে দুর্যোগের রাত্রি ও দুঃসহ বর্ষণ মাথায় করিয়া অভিসারে বাহির হইতে হইবে। কারণ হরি যে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া পথ চাহিয়া আছেন—'পন্থ হেরত হরি সোঙরি সোঙরি মন ঝুর'। আর একটি বর্ষা

বর্ণনায় উতলা বাতাসের মাতামাতি একালের মহাকবি রবীন্দ্রনাথকেই স্মরণ করাইয়া দেয় :

চৌদিশে অথির পবন ভোর দোল।
জগভরি শীকর নিকর হিলোল॥

চারিদিকে অস্থির বায়ু দোলা দিতেছে, জগৎ ভরিয়া জলকণাসমূহ হিল্লোলিত হইতেছে, ঘরে ঘরে দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, 'মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট'। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় এই রূপপ্রতীকের ধারাসারে সিক্ত হইয়া লিখিয়াছিলেন—

আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে,
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে—

এই বর্ষাভিসারের আর একটি পদ—বিশ্বসাহিত্যের খবর জানি না, কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে দুর্লভ বটে। এ পদে বর্ষার পিচ্ছিল পথে অভিসারে বাহির হইবার জন্য রাধার ঘরে বসিয়া দুশ্চর তপঃব্রতের অনুশীলন এক বিচিত্র রস সৃষ্টি করিয়াছে। বর্ষার পিছলপথে অভিসারে বাহির হইবার জন্য শ্রীরাধা—

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥

কাঁটায় ঢাকা পিছলপথে অন্ধকার বর্ষার রাত্রিতে রাধাকে যে শ্যাম-অভিসারে বাহির হইতেই হইবে। তাই বাড়ীর অঙ্গনে কাঁটা বিছাইয়া, ঘড়ার জলে পিছল করিয়া, এবং পাছে শব্দ হয় বলিয়া কাপড়ে মঞ্জীর বাঁধিয়া রাধা আঙুল টিপিয়া টিপিয়া চলা অভ্যাস করিতেছেন। রাত্রিতে চলা অভ্যাস করার জন্য তিনি চোখ বুজিয়া চলেন, আর রাত্রিতে সাপের দংশন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ওঝার কাছে গিয়া করকঙ্কণ পণ দিয়া সাপের মুখবন্ধ করিতে শিখেন।

করযুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির পয়ানক আশে।
করকঙ্কণ পণ ফণিমুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে॥

গুরুজনের কথা তিনি শুনিয়াও শুনেন না, পরিজনের বচনে নির্বোধ রমণীর মতো হাসেন—

গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচন মুগধি সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমান॥

বস্তুতঃ বর্ষাভিসারের পদগুলির মধ্যে সমস্ত বর্ষাপ্রকৃতির গর্জনবর্ষণ, দামিনীর দহনবিস্তার—যাবতীয় শব্দ ও দৃশ্য যেন মেঘস্তনিত আকাশে গুরু-গর্জনে শিহরিয়া উঠিয়াছে, আর রাধা সেই দারুণ দুর্যোগের মধ্যে কণ্টকাকীর্ণ পিছলপথে 'চলতহি অঙ্গুলি চাপি'—প্রেমের এ আর্তি আবেগ ও তাহার পটভূমিকাস্বরূপ বর্ষণমুখর অমানিশীথিনীর এ ভয়াতুর রহস্যময় বর্ণনা যে-কোন প্রথম শ্রেণীর গীতিকবির ঈর্ষার বস্তু। এই দিক দিয়া কি মধ্যযুগ, কি আধুনিক কাল—ঠিক এইরূপ কবিকর্মের কচিৎ সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

রসোদ্গারের কয়েকটি পদে গোবিন্দদাসের আর একপ্রকার রচনারীতির পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে ভাষাভঙ্গিমার কারুকার্য অপেক্ষা প্রাণের গভীর আনন্দ-বেদনা অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে।

হৃদয়মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম প্রহরি রহু জাগি।
গুরুজন গৌরব চৌর সদৃশ ভেল
দূরহি দূরে রহু ভাগি॥

রাধা বলিতেছেন—আমার হৃদয়মন্দিরে কানু ঘুমাইতেছে, প্রেমরূপ প্রহরী জাগিয়া আছে। গুরুজনের গৌরব চোরের মতো দূরে ভাগিল। আর একটি পদে শ্যামকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াও রাধার রোদন :

রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর॥[৬৮]

এ যেন পদাবলীর চণ্ডীদাসের 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।'

---

৬৮ এই মনোভাবকে বৈষ্ণব রসসাহিত্য 'প্রেমবৈচিত্ত্য' বলে :

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্তিঃ স্যাৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমিষ্যতে॥

প্রিয়ের নিকটে থাকিয়াও প্রেমোৎকর্ষের জন্য বিরহে আকুল হওয়ার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য।

গোবিন্দদাস সম্ভোগ-মিলন ও বিরহ-প্রেমবৈচিত্ত্যেরও কিছু কিছু পদ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সে সম্ভোগে বিলাস বেশী, বিলাসে উল্লাস বেশী—উল্লাসের পরিণাম—ক্লান্তি। রাধা যখন অভিসারে বাহির হন, নানা বিপদের মধ্যে প'ড়িয়াও কৃষ্ণের মিলনের জন্য অগ্রসর হন, তখন তাহা একপ্রকার দুশ্চর তপস্যা বলিয়াই মনে হয়—

একে কুলকামিনী তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝরঝর
হাম যাওব কোন পুর॥

তবু তাঁহার ভয় নাই, পদপঙ্কজ কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে, পঙ্কে ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু তাঁহার কোন দুঃখ নাই। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি যখন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল তখন তিনি গৃহসুখের আশা ছাড়িয়া এবং পথের দুঃখকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া শ্যামের নিকট আসিলেন :

একে পদপঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জর জর ভেলা।
তুয়ামুখ দরশনে সব সুখ পায়লহুঁ
চির দুখ সব দূরে গেলা॥
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লু গৃহসুখ আশ।
পন্থক দুখ তৃণহুঁ করি না গণনু
কহতহি গোবিন্দদাস॥

কিন্তু মিলনে পৌঁছাইয়া কবি গোবিন্দদাস জয়দেব ও বিদ্যাপতির পথরেখা ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। উদ্দাম অনঙ্গরঙ্গের নির্বাধ বর্ণনায় তিনি ক্লান্তি বোধ করেন নাই। এই বর্ণনা কোন কোন স্থলে কিছু প্রাকৃত ভাবাপন্ন বলিয়া মনে হয় :

মাতল মদন- রাজমদকুঞ্জর
অলক-অঙ্কুশ নাহি মানে।
তোড়ল নিবিবন্ধ নীমক বন্ধন
নিজপর দুহুঁ নাহি জান॥

এ বর্ণনায় কোনরূপ অপ্রাকৃত ব্যঞ্জনার অবকাশ নাই, যেমন নাই জয়দেবের গীতগোবিন্দের দ্বাদশ অধ্যায়ের রাধামাধবের উন্মত্ত রহঃকেলিতে।

বা বিদ্যাপতির মিলনসম্ভোগের পদে। রাধাকৃষ্ণের অভিসারে গোবিন্দদাস যে ব্যঞ্জনার আভাস দিয়াছেন, মিলনের পদে বর্ণনাগত স্থূলত্বের জন্য তাহার আবেদন অনেকটা হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার বিরহের পদগুলিও গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। বরং প্রেমবৈচিত্ত্যের পদে পুনরায় ব্যঞ্জনার বেদনা লক্ষ্য করা যাইবে। এইদিক দিয়া বিদ্যাপতির বিরহের পদ অনেক উৎকৃষ্ট।

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের কবিকৃতির তুলনা করিয়া সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন, "বিদ্যাপতি তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি হইলেও রচনার লালিত্য, ছন্দের ঝঙ্কার ও অনুপ্রাস শ্লেষাদি নানাবিধ বিচিত্র অলঙ্কার প্রয়োগের নৈপুণ্যে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকেও পরাস্ত করিয়াছেন" (পদকল্প, ৫ম, পৃঃ ৬৮)। অর্থাৎ কাব্যের বাহ্যিক সম্পদে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতি অপেক্ষা অধিকতর ধনী। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, "গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির কাছে ঋণী বটে, কিন্তু বিদ্যাপতি প্রায়শই বহির্মুখী, সৌন্দর্যের আকর্ষণে তিনি চঞ্চল, আর গোবিন্দদাস অনেকটা অন্তর্মুখী—ভাবের আবেগে তিনি স্থির ও গম্ভীর" ('গো. পদাবলী ও তাঁহার যুগ' পৃ. ৪৮১) ডঃ মজুমদারের এ মন্তব্য সর্বত্র প্রযোজ্য নহে, অনেক স্থলে ইহার বিপরীতটাই সত্য। বিদ্যাপতির ভাবসম্মেলনের পদের মতো অন্তর্মুখী কয়টা পদ গোবিন্দদাস রচনা করিতে পারিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। মিলনের পদে আবার গোবিন্দদাস বহির্মুখী বর্ণনাতেও পিছপাও হন নাই। তবে বিদ্যাপতি নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব ছিলেন না, উপরন্তু রাজসভার কবিকে নাগরিক মনোভাবসহ রাজা ও রাজবংশের মনোরঞ্জন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দদাস উত্তর-চৈতন্যযুগের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তা, শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য, জীবগোস্বামীর মিত্র, বৈষ্ণব সমাজের 'মহাজন'। কাজেই দুইজনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। কিন্তু বিদ্যাপতি গভীর প্রাণের কথা বলেন নাই, একথা ঠিক নহে। গোবিন্দদাস তাঁহাকে গুরু বলিয়া মানিয়াছিলেন, বিদ্যাপতির উৎকৃষ্ট পদাবলী সত্ত্বেও তিনি আবার পদ রচনায় অভিলাষী হইয়াছেন, এ যেন বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার সাধনা ("যৈছন বামন ধরবহি চান্দ")। বিদ্যাপতি-চন্দ্রের তুলনায় তিনি বামন না হইলেও

তাঁহার কিরণমালা অনেক সময় বিদ্যাপতি হইতেই গৃহীত—তাহা কবিও স্বীকার করিয়াছেন।

দামোদর সেনের দৌহিত্র গোবিন্দদাস কবিরাজ সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যেও সুপণ্ডিত ছিলেন, সংস্কৃতে একখানি নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পদাবলীর কায়ব্যূহ গঠনে সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা ও পদসাহিত্যের বিশেষ প্রভাব আছে তাহা সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে। তাঁহার ভাষারীতি ও বাকনির্মিতি-কৌশল বিশেষভাবে তৎসম শব্দবহুল। বোধহয় বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব মহাজনগণ পর্যন্ত—কেহই পদসাহিত্যে এত তৎসম শব্দ ও সমাস-সন্ধিসমাকীর্ণ আলঙ্কারিক শব্দরাজি ব্যবহার করেন নাই। জয়দেব ও বিদ্যাপতির রচনারীতি, রূপকল্প নির্মাণ ও ভাবাবেগ সঞ্চারের কৌশল গোবিন্দদাসও কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ বিদ্যাপতিকে প্রণাম নিবেদন করিয়াই ('বিদ্যাপতি পদ যুগল সরোরুহ' ইত্যাদি পদটি স্মরণীয়) তিনি পদরচনায় ব্রতী হইয়াছেন। কয়েকটি পদে তিনি তাঁহার নামের সঙ্গে বিদ্যাপতির ভণিতা যোগ করিয়া দিয়াছেন এবং বিদ্যাপতির কয়েকটি খণ্ডিত পদকে সম্পূর্ণও করিয়াছেন। বিদ্যাপতির মনোভঙ্গীর সঙ্গে তাঁহার মানসিক প্রবণতার নিবিড় সাদৃশ্য না থাকাই স্বাভাবিক। কারণ গোবিন্দদাস মূলতঃ ভক্ত এবং নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব ভক্ত, অপরদিকে স্মার্ত বিদ্যাপতি রাজপাদানুধ্যাত ছিলেন। তাহা না হইলে তিনি এরূপ পদ কেন লিখিবেন?

ভণই বিদ্যাপতি অরে বর জৌবতি
জানল সকল মরমে।
সিবসিংঘ রায় তেরা মনে জাগল
কাহ্নু কাহ্নু করসি ভরমে॥

রাধা 'কানু কানু' করিয়া রোদন করিতেছেন, বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে বরযুবতী, তোমার মর্ম জানিলাম, তোমার মনে শিবসিংহ রায়ই জাগিয়াছেন, ভ্রমবশতঃ তুমি কানু কানু করিতেছ।—রাজসেবকের এই চাটুবাণী গোবিন্দদাসের চিত্তধর্মের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। কারণ বিদ্যাপতি মূলতঃ পঞ্চোপাসক বা শৈব ও স্মার্ত ধর্মানুমোদিত ক্রিয়াকর্মে আস্থাশীল রাজসভার নাগরিক কবি। তবে হরি-কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভক্তি নিবেদিত হইয়াছিল। কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে, তাহা গোবিন্দদাসের মতো নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবভক্তি

নহে। সে যাহা হউক, বাংলা ও ব্রজবুলির খাদ মিশাইয়া গোবিন্দদাস যে পদরাজির রূপনির্মাণ করিয়াছেন, বাহিরের সাজসজ্জার দিক হইতে তাহাতে বিদ্যাপতির প্রভাব বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হইবে।[৬৯]

বিদ্যাপতির মতো উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহারে গোবিন্দদাস সংস্কৃত কবিতার সাহায্য লইয়াছেন, বিশেষতঃ বৈষ্ণব রসের অনুকূল সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা তাঁহার পদাবলীকে অলঙ্কার সজ্জার দিক হইতে কিছু সহায়তা করিয়াছিল। বিদ্যাপতি যেমন 'শৃঙ্গার শতক', 'অমরু শতক' প্রভৃতি শৃঙ্গার রসের উদ্ভট কবিতা হইতে নানা সাহায্য পাইয়াছিলেন, তেমনি গোবিন্দদাসও নিজ মনোভাবের অনুকূল সংস্কৃত শ্লোকের সাহায্য লইয়াছিলেন। 'বিদগ্ধমাধব' (রূপগোস্বামী) নাটকের নিম্নলিখিত শ্লোকের আদর্শে তিনি একটি পদ রচনা করিয়াছিলেন :

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদ-পরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধ-ঘন-দ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ সকৃদ্বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী ॥

অনুবাদ—সখি, একজনের 'কৃষ্ণ' এই দুই অক্ষর নাম কর্ণে প্রবেশ করিয়া মতি বিলুপ্ত করিয়াছে, অন্য একজনের বংশীধ্বনি অত্যন্ত উন্মাদদশা ঘটাইতেছে, আবার আর

---

৬৯ বিদ্যাপতির দ্বারা গোবিন্দদাস কত দূর প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহার দু'একটি দৃষ্টান্ত :—

(১) বিদ্যাপতি— কনকলতা অবলম্বন উয়ল
হরিণহীন হিমধামা।
গোবিন্দদাস— কনকলতা তনু বদন ভানু জানু
উয়ল পুনমিক চন্দা।
(২) বিদ্যাপতি— জঁহা জঁহা কুটিল কটাখ।
ততহি মদনশর লাখ ॥
গোবিন্দদাস— যাঁহা যাঁহা ভঙুর ভাঙু বিলোল।
তঁহা তঁহা উছলই কালিন্দি হিলোল ॥
(৩) বিদ্যাপতি— আঁচরে বদন ঝাপারহ গোরি।
রাজ শুনৈছিঅ চাঁদক চোরি ॥
গোবিন্দদাস— এ ধনি আঁচরে বদনে ঝাঁপাও।
লুবধল মধুপ চকোর বিধুন্তুদ
অনত অনত চলি যাও ॥

এক স্নিগ্ধমেঘদ্যুতি পুরুষকে দেখিয়া আমার মনের মধ্যে তাঁহার চিত্র লাগিয়া রহিয়াছে। হা কষ্ট, হা ধিক, তিনজন পুরুষে প্রেম করার চেয়ে মৃত্যুও ভাল।—
(ডঃ মজুমদার অনূদিত)

গোবিন্দদাস ইহার অনুকরণে লিখিয়াছিলেন :

সজনি, মরণ মানিয়ে বহু ভাগি।
কুলবতী তিন পুরুষ ভেল আরতি
জীবন কিয়ে সুখ লাগি॥
পহিলে শুনলু হাম শ্যাম দু'আখর
তৈখনে মন চুরি কেল।
না জানি কোন ঐছে মুরুলি আলাপই
চমকই শ্রুতি হরি নেল॥
না জানি কোন উহ পটে দরশাওলি
নব জলধর জিনি কাঁতি।
চকিত হইয়া হাম যাহা যাহা ধাইয়ে
তাহা তাহা রোধয়ে মাতি॥

তাঁহার বিখ্যাত অভিসারের পদ 'কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল'—এই পদের সঙ্গে 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়ে'র "মার্গে পঙ্কিনি তোয়দান্ধ তমসে নিঃশব্দ সংচারকং গন্তব্য দয়িতস্য মেহদ্য বসতির্মুগ্ধেতি কৃত্বা মতিম্"—এই শ্লোকের আদর্শে রচিত।[৭০] অবশ্য মূল পদটির ভাবমাত্র তিনি অনুসরণ করিয়াছেন, অনেক স্থলে তাঁহার মৌলিক প্রতিভার চিহ্নও দেখা যায়।[৭১]

গোবিন্দদাসকে কেহ কেহ শাব্দিক কবি বলিয়া থাকেন। এইরূপ মন্তব্যের নিহিতার্থ—শব্দঝঙ্কারের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিতে গিয়া কবি অন্তর্নিহিত ভাবের প্রতি কিঞ্চিৎ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। বরং জ্ঞানদাস সহজ সুরে গভীর কথা বলিয়াছেন। যেমন একদা কেহ কেহ মনে করিতেন (এখনও করিয়া থাকেন), পদাবলীর চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কবি, তেমনি কাহারও কাহারও নিকট গোবিন্দদাসের অলঙ্কৃত বাক্য-

৭০ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত—শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ

৭১ অনুবাদক গোবিন্দদাস সম্বন্ধে ডঃ মজুমদারের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য : "মিলটনকে এক আলোচক greatest plagiarist বলিয়াছেন। মিলটনের মত গোবিন্দদাসও অপর কবির ভাবকে শুধু আপন করিয়া লন নাই, তাহাকে সুন্দরতর ও অধিকতর ভাবসমৃদ্ধ করিয়াছেন।" ('গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ', পৃ. ৪৭৭)

বিন্যাস অপেক্ষা জ্ঞানদাসের নিরাভরণ প্রাণের আবেগবেদনা অধিকতর চিত্তাকর্ষী। আধুনিক পাঠকসমাজের কাছে গোবিন্দদাসের পদাবলী যেরূপ মনে হউক না কেন মধ্যযুগের পদসাহিত্যে গোবিন্দদাস ছিলেন মধ্যমণিস্বরূপ। সে-যুগের কীর্তনীয়াসমাজ ও শ্রোতৃমণ্ডলী গোবিন্দদাসের পদকেই সর্বাধিক আদর করিতেন, এখনও করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব সঙ্কলনগ্রন্থসমূহে গোবিন্দদাসের পদের সংখ্যাই সর্বাধিক। রাধামোহন ঠাকুর সঙ্কলিত 'পদামৃতসমুদ্র' ও বৈষ্ণবদাস সঙ্কলিত 'পদকল্পতরুতে' গোবিন্দদাসের পদসংখ্যা সর্বাধিক, আধুনিক কালেও শুধু গোবিন্দদাসের পদ লইয়া অনেকগুলি সঙ্কলনগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। কবি অসাধারণ জনপ্রিয়তার অধিকারী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার পদে কর্ণসুখকর ধ্বনিঝঙ্কারের প্রাচুর্য আছে, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের নানা কলারীতিতেও বিস্ময়কর কবিকৃতিই প্রমাণ করিতেছে। শব্দালঙ্কারে তিনি জয়দেব এবং অর্থালঙ্কারে বিদ্যাপতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। অনেক সময় অনুপ্রাসাদির অতিরেকে অর্থহীন মনে হয়; অলঙ্কারশিঞ্জন কলালক্ষ্মীর বীণাযন্ত্রনিঃসৃত সুরতালকে কোন কোন ক্ষেত্রে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তাহা অস্বীকার করা যায় না। গোবিন্দদাস মাঝে মাঝে বিনা প্রয়োজনে অলঙ্কার ও শাব্দিক ব্যায়ামের প্রতি যে লুব্ধ হন নাই, এমন কথা বলা যায় না। মঙ্গলকাব্যের 'চৌতিশা'র[৭২]

---

৭২ গোবিন্দদাস বৈচিত্র্যের লোভে অকারাদিক্রমে অনেকগুলি চিত্রগীত লিখিয়াছিলেন, তাহার দুই একটির দৃষ্টান্ত :

(১) 'ক'-কার— কাঁচ কাঞ্চন কাঁতি কমলমুখী
কুসুমিত কানন জোই।
কুঞ্জকুটীরে কলাবতি কাতর
কানু কানু করি রোই॥

(২) 'ঝ'-কার— ঝর ঝর জলধর ধার।
ঝঞ্ঝা পবন বিথার॥
ঝলকত দামিনি মালা।
ঝামরি ভৈ গেল বালা॥

(৩) 'দ'-কার— দারু-দারুণ দরিদ্র-দূষণ
দলত দোলত হীর।
দুসহ দোসর দগধ দরপক
দহনে দহ দহ জীর॥

ছাঁদে রচিত অকারাদিক্রমে 'চিত্রগীত' পর্যায়ের পদগুলি যদি তাঁহার রচনা হয়, তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, কবির চমকপ্রদ ও চটকদারী বাকরীতির প্রতি একপ্রকার প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ ছিল। কবিরা লীলাচ্ছলে এরূপ বিচিত্র 'চিত্রগীত' রচনা করিয়া থাকেন, ইহাতে নিষ্ঠা ও আবেগ অপেক্ষা বৈচিত্র্য ও চাতুর্যই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়া থাকে। বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া এ যুগের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেক প্রথম শ্রেণীর কবি এইরূপ 'চিত্রগীত' রচনায় আনন্দ পাইয়াছেন। গোবিন্দদাসের এই পদগুলির উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব দিবার প্রয়োজন নাই, কারণ ইহাদের উপর তাঁহার কবিত্বের খ্যাতি নির্ভর করিতেছে না। তাঁহার অভিসার, রসোদ্গার, প্রেম-বৈচিত্ত্যের পদের ধ্বনিঝঙ্কার, শব্দলীলা ও অলঙ্কারের তির্যকতা যে শিল্পরূপ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার প্রতি উদাসীন হইয়া থাকা পাঠকের মানসিক জাড্যের লক্ষণ। সহজ সুরে চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস পাঠক-শ্রোতার মন লুঠ করিয়া লইয়াছেন, তাহা সত্য বটে; কিন্তু বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের বিশুদ্ধ শিল্প-মূর্তিসমুজ্জ্বল পদগুলির বাগ্‌বৈদগ্ধ্য যে রসিক সহৃদয় পাঠকমনে সাড়া জাগাইতে পারে না, তাই-বা কে বলিল? কাব্যরসভোগী রসিক পাঠকের চিত্তই প্রমাণ করিবে যে, গোবিন্দদাসের অলঙ্কৃত বাক্‌পুঞ্জও প্রথম শ্রেণীর শিল্পসৃষ্টি। বস্তুতঃ কাব্যের যথার্থ অর্থ—আবেগের শিল্পরূপ। যে কারণে অনেক সময়ে অধ্যাত্মমার্গের ওয়ার্ডসওয়ার্থ অপেক্ষা 'রূপদক্ষ' কোলরীজ আমাদের অধিকতর বিস্ময় আকর্ষণ করিয়া থাকেন, সেই একই কারণে গোবিন্দদাসের পদাবলী রসনার পথে যাত্রা করিয়া শ্রোত্রপথে সহজ প্রবেশাধিকার লাভ করে এবং শ্রুতিপথ হইতে হৃদপদ্মদলে স্থায়ী আসন লাভ করিতে দ্বিধা করে না। ধ্বনিঝঙ্কার, শব্দকৌশল, বাক্‌রীতি, চিত্ররূপনির্মিতি প্রভৃতি কাব্য-সাধনার বহিরঙ্গই বাক্যকে কাব্য করিয়া তোলে; বক্তব্যকে বক্রোক্তিতে পরিণত করে, বস্তুকে ধ্বনিব্যঞ্জনা দান করে, লৌকিক ভাবকে অলৌকিক রসে উত্তীর্ণ হইতে সহায়তা করে। রূপে-রসে, প্রতীকে-ঝঙ্কারে, ইন্দ্রিয়ময় রূপোল্লাসে ও ইন্দ্রিয়াতীত ইঙ্গিতে গোবিন্দদাস অনন্যসাধারণ, অননুকরণীয়, অনুপম কৃতিত্বের গৌরবে সমাসীন।

গোবিন্দদাসের ভক্তিবাদ॥ বৈষ্ণব ধর্ম লইয়াই বৈষ্ণব সাহিত্য, বৈষ্ণব সাধনাই বৈষ্ণব পদাবলীর অধ্যাত্মভূমি এবং বৈষ্ণব পদকারগণ একটা বিশিষ্ট

ভক্তিমণ্ডলের জ্যোতিষ্কস্বরূপ। সুতরাং গোবিন্দদাসের কবিত্ব ও রসসাধনা যে একপ্রকার ধর্মসাধনা তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য শুধু কাব্য-রস বা মর্ত্যরসের আধারেও বৈষ্ণব পদাবলীকে উপস্থাপন করা যায়, কিন্তু তাহাতে এমন সমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয় যে, সব সময়ে বৈষ্ণবপদাবলীর বিষয়বস্তু ও ভাবাদর্শের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। চৈতন্য ও উত্তর-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে তত্ত্বের দিক দিয়া রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তি বলিয়া গৃহীত হইলেও রসের দিক দিয়া তো তিনি কৃষ্ণের পরকীয়া নায়িকা। প্রাকৃত অর্থে এই ব্যাপার শুধু রসাভাস ঘটায় না, জুগুপ্সিত লাম্পট্যের ধার ঘেঁষিয়া যায়। বিদ্যাপতি হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবিরা পর্যন্ত সকলে যে ভাষা, চিত্রকল্প ও উদ্দাম আবেগের দ্বারা রাধা-কৃষ্ণের মিলনসম্ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন, রুচিবাগীশ ব্যক্তি তাহাতে অসামাজিক অপ্রীতিকর কামজৃম্ভণ লক্ষ্য করিয়া বিষণ্ণ হইবেন। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মদর্শন, রসতত্ত্ব ও সাধনার পটভূমিকায় এই সমস্ত বর্ণনা আর একটা মহিমা লইয়া দেখা দেয়। তাই চৈতন্যযুগের সমস্ত পদকর্তাই চৈতন্যভাব-মণ্ডলের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া ভক্তিধর্ম বাদ দিয়া তাঁহাদের কাব্যস্বরূপের যথার্থ বিশ্লেষণ হইতে পারে না।

গোবিন্দদাস বিদগ্ধ কবি, রুচির-রসিক এবং শান্তভক্ত। বাল্য-কৈশোর-যৌবনে তিনি মাতামহ দামোদর সেনের প্রভাবে শাক্ত মত ও আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, শাক্তমতাবলম্বী একটি পদও তাঁহার নামে পাওয়া যায়। প্রায় ৪০-৪২ বৎসর বয়সে প্রবীণ জীবনের প্রারম্ভে তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব ভক্তে পরিণত হন এবং প্রথমেই চৈতন্য-লীলা বিষয়ক পদাবলী রচনা করিতে ইচ্ছা করেন। পরে শ্রীনিবাস আচার্যের উপদেশে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' পাঠ করিয়া সেই রসতত্ত্বের আদর্শে ভক্তিবাদের বাতায়নে বসিয়া তিনি বিপুল সংখ্যক পদ রচনা করেন। 'ভক্তিরত্নাকর', 'প্রেমবিলাসাদি' হইতে এবং 'পদামৃতসমুদ্রে' বিধৃত তাঁহার পদের সংস্কৃত ব্যাখ্যা হইতে দেখা যাইতেছে, তিনি বৈষ্ণব তত্ত্বাদর্শে বিশেষ অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার কবিত্বের খ্যাতি সুদূর বৃন্দাবন পর্যন্ত ধাবিত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি যে সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শনের স্নাতকত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাধাকৃষ্ণের পদাবলীতে তিনি চৈতন্যযুগের পরকীয়া আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং রসের পর্যায়ে বৃন্দাবনের ধারা অনুশীলন করিয়াছিলেন। ভক্তির দিক হইতেও তিনি সাধারণভাবে নৈষ্ঠিক ভক্তির কথা বলিয়াছেন, এবং ব্যক্তিগত প্রবণতার দিক হইতে তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবভক্তদের মঞ্জরীভাবের পক্ষপাতী ছিলেন। নৈষ্ঠিক ভক্তির বর্ণনায় তিনি পূর্বতন সংস্কার মানিয়া চলিয়াছেন। যখন তিনি বলেন :

ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দ-নন্দন
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ জনম সত সঙ্গে
তরহ এ ভবসিন্ধু রে॥
* * * *
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন
ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমলদল-জল জীবন টলমল
ভজহুঁ হরিপদ নিত রে॥
শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন
পাদ সেবন দাসী রে।
পূজন সখিজন আত্মনিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষী রে॥

তখন তিনি ভক্তির বাঁধা পথ ধরিয়া চলিতেছেন তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তাঁহার আর একটি পদ :

ভজ কৃষ্ণ বৈষ্ণব ঠাকুর।
বৈষ্ণব ভজিলে ভাই পরম আনন্দ পাই
পাপ তাপ সব যায় দূর॥
বৈষ্ণবের শ্রীচরণ যে করয়ে প্রাণধন
ইহা যেবা সত্য করি বলে।
আর কিছু নাহি জানে কায় মন বাক্য সনে
অনায়াসে কৃষ্ণ তারে মিলে॥

এ সমস্ত পদে বৈধীভক্তির শুষ্ক বিধিনিষেধের বেষ্টনীর মধ্যে ভক্তির স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ বড় একটা স্থায়ী হইতে পারে নাই। এখানে তিনি যেন গুরুমহাশয় সাজিয়া শুষ্ক উপদেশ দিয়াছেন—ইহাকে বৈষ্ণব ভক্তের দল শিরোধার্য করিলেও সাধারণ রসিক সমাজ এই বাঁধা গতের ভক্তিতে তৃপ্তি লাভ নাও

করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার ভক্তির আর এক প্রকার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, যেখানে তিনি উপদেশ দেন নাই, শ্মশানযাত্রার পথটাকে বৈরাগ্যের গৈরিক রেণুরাশিতে চিহ্নিত করিয়া দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সেখানে তিনি শুধু রাধাকৃষ্ণ সেবারস কামনা করেন, মঞ্জরী সাজিয়া নিত্যবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত কিশোর-কিশোরীর অপার্থিব লীলার সাক্ষী হইতে চাহেন, কখনও রাধাকে সান্ত্বনা দেন, কখনও তাঁহার দুর্গম যাত্রার সাথী হইতে চাহেন, কখনও কৃষ্ণের চপল চরিত্রের জন্য রাধার হইয়া কৃষ্ণকেও দু'কথা শুনাইয়া দেন। ইহাই গৌড়ীয় ভক্তিসাধনার মঞ্জরীভাব। গৌড়ীয় ভক্তগণ কখনও নিজেদের রাধাতনু বলিয়া কল্পনাও করেন নাই, এরূপ ভাবিলে তাঁহাদের আদর্শানুসারে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়। তবে রাধাকৃষ্ণের লীলারসের তাঁহারা সহায়ক, সেবক—এইটুকু মাত্র তাঁহাদের কামনা। এই সখীসাধনা বাঙলাদেশে কোথা হইতে আসিল, তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। গোদাবরীতীরে চৈতন্যদেব রায় রামানন্দের সঙ্গে এই 'অকথ্য-কথন' সখীসাধনার মর্মরহস্য আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ মনে করেন, গৌড়ীয় সখীসাধনা মূলতঃ দক্ষিণ-ভারতের দান। রায় রামানন্দের নিকট শুনিয়াই নাকি চৈতন্যদেব সখীভাব সম্পর্কে সচেতন হন। এসব কথা ঐতিহাসিক উপাদানের সাহায্যে মিলাইয়া লইবার মতো প্রমাণ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। কাজেই গৌড়ীয় সখীসাধনা দক্ষিণ-ভারত হইতেই আসিয়াছে কিনা তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। সে যাহা হউক, ষোড়শ শতাব্দীর সপ্তম দশক হইতে সখীসাধনা, বিশেষতঃ চৈতন্য-পরিকরদের কৃষ্ণলীলার সখীরূপে বর্ণনা করিবার রীতি বৈষ্ণব সমাজে অতি প্রকট হইয়াছিল। কবিকর্ণপূর 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় গৌরাঙ্গ-শিষ্যানুশিষ্যদের পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, চৈতন্যভক্তগণ সকলেই পূর্বজন্মে কৃষ্ণ-রাধার সখী ছিলেন। কর্ণপূর একটি তালিকায় দেখাইয়াছেন, দ্বাপরের বৃন্দাবনলীলার সখীগণের মধ্যে কে কোন্ মর্ত্যরূপ ধরিয়া চৈতন্য-পরিকর রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কৃষ্ণ-রাধার সখী ও চৈতন্য-পরিকরদের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে :—

সনাতন গোস্বামী—লবঙ্গমঞ্জরী
জীবগোস্বামী—বিলাসমঞ্জরী

রূপগোস্বামী—শ্রীরূপমঞ্জরী
রায় রামানন্দ—বিশাখা বা ললিতা
গোবিন্দদাস কবিরাজ—কলাবতী

এই তালিকায় দেখা যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ চৈতন্যদেবকে যেমন কৃষ্ণাবতার বলিয়া মনে করিতেন, তেমন চৈতন্য-ভক্তদিগকে দ্বাপরের কৃষ্ণ-রাধার সখা-সখী বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে সখাভাবের সাধনার কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। পদ্মপুরাণে স্পষ্টতঃ সখী-সাধনার কথা বলা হইয়াছে :

রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবনপরায়ণাম্।
কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্বতিম্॥ (৫২ অধ্যায়)

অর্থাৎ সব সময়ে রাধিকার অনুচরী ও তাঁহার সেবাপরায়ণারূপে নিজেকে চিন্তা করিবে। শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও রাধাতে অধিক প্রীতি করিবে। এই উক্তি যথার্থ পদ্মপুরাণে ছিল, কি পরবর্তী বৈষ্ণবসমাজের কেহ এই শ্লোকগুলি রচনা করিয়া উক্ত পুরাণে প্রক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ সংশয় আছে। সে যাহা হউক, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার অনুমান করেন যে, রূপগোস্বামী তাঁহার 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তেই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গরূপে সখীসাধনা ও মঞ্জরীভাবের সাধনার কথা বলিয়াছেন। পরবর্তী কালের রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবসমাজের প্রধান ব্যক্তিগণ বৃন্দাবনের জীবগোস্বামীর নিকট পত্র লিখিয়া এই লীলাপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবগত হইতে চাহিয়াছিলেন।

রূপগোস্বামীর মতে সখী ও মঞ্জরীদের মধ্যে সাধনাসংক্রান্ত কিছু পার্থক্য আছে।[৭৩] কৃষ্ণের সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির অংশ বলিয়া তাঁহারাও কৃষ্ণের প্রণয়ভাগিনী, কৃষ্ণ তাঁহাদের সঙ্গেও বিলাস করিয়া থাকেন। কিন্তু মঞ্জরীগণের সেরূপ সৌভাগ্য হয় না; তাঁহারা শুধু রাধাকৃষ্ণের সেবার দাসীমাত্র। মর্ত্যের ভক্তগণ ঐ মঞ্জরীর মতো রাধাকৃষ্ণলীলার সেবা করিবার অধিকারী, সখীদের মতো কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শক্তির রূপ লাভ করিবার অধিকারী নহেন। এই মঞ্জরীভাবের সাধনা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ

৭৩ "মঞ্জরীরা সখী নহেন, সখীর অনুগা। সখীরা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পরিকর। তাঁহার স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গ শক্তির প্রকাশ। জীব ভগবানের তটস্থা শক্তির প্রকাশ। দুইকে এক করিয়া দেখিলে ভুল হইবে।" (ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ', পৃ. ৪৩১)

হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। রূপগোস্বামীর 'স্তবমালা'য় মঞ্জরীভাবের সাধনার অনেকগুলি শ্লোক সঙ্কলিত হইয়াছে। একটি পদে তিনি বলিয়াছেন :

ত্বাং সাধু মাধবীপুষ্পৈর্মাধবেন কলাবিদা।
প্রসাধ্যমানাং স্বিদ্যন্তীং বীজয়িষ্যাম্যহং কদা॥

অনু : কলাবিদ মাধব কর্তৃক মাধবী ফুলের দ্বারা তুমি অলঙ্কৃত হইতেছ এবং তোমার কলেবর তাঁহার স্পর্শের জন্য সাত্ত্বিকভাবের উদয়ে ঘর্মাক্ত হইতেছে এরূপ অবস্থায় তোমাকে আমি কবে বীজন করিব? [৭৪]

এখানে রূপগোস্বামী স্পষ্টতঃ মঞ্জরীভাবের কথা বলিয়াছেন। গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কবিরাজ মঞ্জরীভাবের সাধনার বর্ণনা করিয়া 'স্মরণদর্পণ' শীর্ষক একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন।[৭৫] নরোত্তম ঠাকুরও মঞ্জরী হইবার জন্য আর্তি প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন :

করি হরি কতদিনে হেন দশা হব।
শ্রীমণিমঞ্জরী সঙ্গে শ্রীরূপমঞ্জরী রঙ্গে
রূপের অনুগা পদ পাব॥
* * * *
সখীর আদেশ হবে চামর ঢুলাব কবে
তাম্বূল খাওয়াব চান্দমুখে।
আনন্দিত হব তথা ডগমগি প্রেমকথা
দোঁহার পিরীতি রসসুখে॥

এখানেও ঠাকুরমহাশয় মঞ্জরীভাবে (সখীভাবে নহে, কারণ সখীর আদেশ লইয়াই তিনি কৃষ্ণসেবা করিতে চাহেন) রাধাকৃষ্ণের সেবাধিকার প্রার্থনা করিয়াছেন।[৭৬] এখন দেখা যাক গোবিন্দদাস এই মঞ্জরীভাবের সাধনা কতদূর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, গোবিন্দদাস তাঁহার গুরু শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট ভক্তিমার্গের দুই স্বরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন। একটি—ভজনপূজন আরাধনার চিরাচরিত মার্গ, আর একটি—মঞ্জরীভাবের সাধনার ব্যক্তিগত দিক। ইতিপূর্বে আমরা দৃষ্টান্ত সহ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে,

৭৪ ও ৭৫, ঐ, পৃ. ৪৩০ ও ৪৩২

৭৬ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ডঃ মজুমদারের উল্লিখিত গ্রন্থের অন্তর্গত 'আধ্যাত্মিক আবেষ্টনী' শীর্ষক উপচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

গোবিন্দদাস চিরাচরিত পথ ধরিয়া বৈধীভক্তি সংক্রান্ত যে কয়টি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বাঁধাগতের ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, কবির নিগূঢ় প্রাণের কথা বড় একটা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক বহু পদে তাঁহার ভক্তিরসাশ্রিত মনের আবেগ-আর্তি প্রত্যক্ষ করা যাইবে। এ বিষয়ে তিনি বিশুদ্ধরূপে মঞ্জরীভাবের সাধক। তাঁহার গুরু শ্রীনিবাস আচার্যও বৃন্দাবনে এই শিক্ষাই পাইয়াছিলেন, তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু নরোত্তম ঠাকুরমহাশয় মঞ্জরীভাবের উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কবিরাজ পূর্বেই শ্রীনিবাসের নির্দেশে সেই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাই কেহ কেহ মনে করেন যে, রূপগোস্বামী যেমন বৃন্দাবনে মঞ্জরীভাবে সাধনার প্রধান প্রবক্তা, তেমনি শ্রীনিবাস-নরোত্তম ঠাকুর সেই ভাবাদর্শ প্রথমে সবিস্তারে গৌড়ে প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শিষ্যেরা এই পথই ব্যক্তিগত জীবনে অবলম্বন করিয়াছিলেন।[৭৭] শ্রীনিবাস একাধিক পদে নিজে মঞ্জরী হইয়া রাধাকৃষ্ণের সেবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন :

হরি হরি কবে মোর শুভদিন হোয়।
কিশোর-কিশোরীপদ সেবনসম্পদ
তুয়া[৭৮] সনে মীলব মোয় ॥

গোবিন্দদাস কৃষ্ণ-রাধার নানা লীলাকথা বর্ণনা করিয়া সর্বত্র মঞ্জরী হইয়া যুগলকিশোরের সেবা করিবেন, এরূপ উক্তি তাঁহার অনেক পদের ভণিতায় পাওয়া যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

(১) সুবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখত
মন্দিরে দুহুঁজন পাশে।
মন্দির নিকটে পদতলে শুতলি
অনুচরি গোবিন্দদাস ॥

রাধাকৃষ্ণের লীলাবসানে গোবিন্দদাস দুইজনের পার্শ্বে ঝারি ভরিয়া সুবাসিত জল রাখিলেন এবং ঘরের নিকটে দুইজনের অনুচর গোবিন্দদাস শুইয়া রহিলেন।

(২) সহচরি রাই লেই চলু মন্দিরে
গোবিন্দদাস পিছে যান।

---

৭৭ ডঃ মজুমদারের সম্পাদিত উল্লিখিত ঐ গ্রন্থ, পৃ. ৪৩২

৭৮ এখানে 'তুয়া' শব্দ দ্বারা তাঁহার গুরু গোপালভট্টকে নির্দেশ করা হইয়াছে।

সহচরীরা রাধাকে ঘরে লইয়া গেলেন, গোবিন্দদাসও পিছনে পিছনে চলিলেন।

(৩) তিমির পন্থ যব হোত সন্দেহ।
গোবিন্দদাসক সঙ্গে করি লেহ॥

অন্ধকারে পথ দেখিতে যদি সন্দেহ হয়, তবে, হে রাধা, গোবিন্দদাসকে সঙ্গে করিয়া লও।

(৪) রাধামাধব আনিতে দুর্লভ
সাজল গোবিন্দদাস।

দুর্লভ রাধামাধব অর্থাৎ কৃষ্ণকে মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আনিবার জন্য গোবিন্দদাস প্রস্তুত হইলেন।

(৫) হাহা প্রাণ রাই ভেল অচেতন
গোবিন্দদাস করু কোর॥

রাধা হাহাকার করিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, গোবিন্দদাস তাঁহাকে কোলে করিলেন।

(৬) সহই না পারই মদন হুতাশ।
চামর ঢুলায়ত গোবিন্দদাস॥

কৃষ্ণ রাধাবিরহে মদনহুতাশ সহ্য করিতে পারিতেছেন না, গোবিন্দদাস তাঁহাকে চামর ঢুলাইয়া বীজন করিতেছেন।

এইরূপ অসংখ্যপদে দেখা যায় যে, গোবিন্দদাস স্বয়ং মঞ্জরী হইয়া রাধাকৃষ্ণের মিলনলীলার শ্রমজল মুছাইতেছেন, বীজন করিতেছেন, কখনও রাধার হইয়া বহুবল্লভ কৃষ্ণকে কড়া কথা শুনাইতেছেন, রাধার শোকে সান্ত্বনা দিতেছেন, কখনও-বা দুশ্চর অভিসারে রাধাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন। এইরূপ পদগুলিকে কবি অপূর্ব ছন্দ, বিস্ময়কর অলঙ্কার, প্রগাঢ় আবেগ-অনুভূতির দ্বারা একটা বিশিষ্ট সারস্বত মূল্য দিয়াছেন বটে, কিন্তু সর্বত্র মঞ্জরীভাবে রাধাকৃষ্ণলীলার সহায়ক হিসাবেই নিজেকে কল্পনা করিয়াছেন। তাই সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন, "গোবিন্দদাস সাধনার অঙ্গরূপে পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন।"[৭৯] তাঁহার দীক্ষাজীবন, বৃন্দাবনের আচার্যদের সঙ্গে তাঁহার পত্রব্যবহার প্রভৃতি বিচার করিলে একথা মানিতে হইবে যে, কবি রাগানুগা পথে মঞ্জরীভাবের সাধক ছিলেন।

৭৯ ডঃ মজুমদারের ঐ গ্রন্থ, পৃ. ৪৪২

কবির সে ব্যক্তিগত ধর্মসাধনার আভাস তাঁহার পদের ভণিতাতেই লক্ষ্য করা যাইবে। চৈতন্যযুগ ও উত্তর-চৈতন্যযুগের সমস্ত বৈষ্ণবকবি একাধারে কবি ও সাধক; গোবিন্দদাস এই পন্থার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

মৈথিলী গোবিন্দদাস ॥ কিছুকাল পূর্বে বৈষ্ণবসাহিত্যরসিক মহলে এক জটিল বিতর্কের ঝড় উঠিয়াছিল। গোবিন্দদাস কবিরাজ বাঙালী না মৈথিলী? একদা দ্বারভাঙার কবি বিদ্যাপতিকে বাঙালীরা বাঙালী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে অবশ্য রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন—বিদ্যাপতি বাঙালী নহেন, মিথিলার কবি—তাঁহার মৈথিল পদই বাংলা ভাষার সংমিশ্রণে 'ব্রজবুলি' নামে পরিচিত হইয়াছে। তখন হইতে শিক্ষিত মহল ও সাহিত্যরসিক সমাজ বিদ্যাপতিকে আর বাঙালী বলিয়া দাবি করেন নাই—কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা কবিকে অবাঙালী বলিয়া পরিত্যাগও করেন নাই। মৈথিলী বিদ্যাপতি বাঙালীর ঘরের কবি হইয়া গিয়াছেন। গোবিন্দদাস সম্বন্ধেও অনুরূপ সমস্যা কিঞ্চিৎ পূর্বে প্রবলাকার ধারণ করিয়াছিল। মৈথিলী ও হিন্দীভাষী পণ্ডিত ও গবেষকের দল গোবিন্দদাস কবিরাজকে বিদ্যাপতির মতো মৈথিলী কবি বলিয়া দাবি করিয়াছেন—অনেকে ঐ মর্মে গবেষণা করিয়া কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টর' উপাধিও লাভ করিয়াছেন।[৮০]

বাংলা পদসঙ্কলন হইতে গোবিন্দদাসের পদ বাছিয়া বাছিয়া আত্মসাৎ করিয়া দুইজন অবাঙালী সম্পাদক দেবনাগরী হরফে দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। একখানির নাম 'গোবিন্দগীতাবলী'; সম্পাদক মথুরানাথ দীক্ষিত ১৯৩২ সালে উহা সম্পাদনা করেন। আর একখানির নাম 'শৃঙ্গার ভজন'; সম্পাদক রমানাথ ঝা ১৯৩৮ সালে গোবিন্দদাসের কতকগুলি পদ একত্র করিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহারা উভয়েই দাবি করেন যে, মৈথিলী কবি গোবিন্দ ঝা ঐ পদগুলির রচয়িতা। তাঁহাদের সম্পাদিত পদগুলির উৎস কোন মৈথিল গ্রন্থ নহে। মথুরানাথ দীক্ষিত বাংলা বৈষ্ণবপদ-সঙ্কলন হইতেই গোবিন্দদাসের পদগুলি লিখিয়া লইয়া ঈষৎ 'পাণ্ডিত্য'পূর্ণ পরিবর্তন সহ দেবনাগরী অক্ষরে ছাপাইয়া দেন। রমানাথ ঝা 'শৃঙ্গারভজনে' একখানি বাংলা পদসংগ্রহের পদ হুবহু ছাপাইয়া দিয়াছেন, মায় বাংলা গ্রন্থের

৮০ ঐ, পৃ. ২৮/০

ভুলভ্রান্তিগুলি পর্যন্ত! অবশ্য সেই বাংলা গ্রন্থটির কথা সম্পাদক মহাশয় যথারীতি চাপিয়া গিয়াছেন। এই বাংলা সঙ্কলনটি 'বৈষ্ণবপদলহরী' নামে পরিচিত। ইহা ১৯০৫ সালে দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গবাসী' মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে গোবিন্দদাসের ৪৯০টি পদ সঙ্কলিত হয়। ঝা-মহাশয় 'বৈষ্ণবপদলহরী'তে সঙ্কলিত গোবিন্দদাসের পদগুলিকে লইয়া 'শৃঙ্গারভজন' প্রকাশ করেন—কিন্তু কোথাও উত্তমর্ণের নাম করেন নাই। তাঁহারা গোবিন্দদাসকে মৈথিলী কবি বলিয়া দাবি করার অল্প পরেই ঐ দুইখানা সঙ্কলনগ্রন্থ পাটনা ও বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে মৈথিল সাহিত্যের এম. এ. পরীক্ষার প্রধান পাঠ্যগ্রন্থরূপে নির্ধারিত হইয়াছে। এখন যাঁহারা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে মৈথিলী ভাষায় এম. এ. পড়িয়া থাকেন, তাঁহারা মহানন্দে গোবিন্দদাস ঝার পদ অনুশীলন করেন, এবং মিথিলা যে বিদ্যাপতির সমতুল্য আর এক শ্রেষ্ঠ কবির জন্ম দিয়াছিল এই ভাবিয়া গৌরব বোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার এতদূর গড়াইল কি করিয়া তাহার কারণ সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, একজন বাঙালী বৈষ্ণব-সাহিত্যরসিকের উদ্ভট জল্পণই ইহার জন্য দায়ী। তিনিই গোলকটি গড়াইয়া দেন, মৈথিলী-হিন্দী লেখকগণ তাহা হাত পাতিয়া ধরিয়া লন—কিন্তু এখন আর তাঁহারা ইহার স্বত্বস্বামিত্ব ছাড়িতে চাহিতেছেন না।

এই ব্যাপারে সকল নাটের গুরু হইতেছেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদনা করিতে গিয়া তিনি প্রচুর খ্যাতি ও অখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। গ্রীয়ার্সনকে বাদ দিলে তিনিই ব্যাপকভাবে মিথিলা হইতে বিদ্যাপতির মৈথিলপদ উদ্ধারের চেষ্টা করেন, এবং তাহার জন্য প্রভূত পরিশ্রম করেন—এইজন্যই তাঁহার খ্যাতি। অখ্যাতি এই জন্য যে, বিদ্যাপতির ব্রজবুলির পদগুলিকেও তিনি মৈথিলী ভাষার আদর্শে পরিশুদ্ধ করিতে গিয়া গণ্ডগোল পাকাইয়া তুলিয়াছেন। তিনিই আবার গোবিন্দদাসকে মৈথিলী কবি বানাইতে গিয়াছেন। হিন্দী-মৈথিলী সাহিত্যিকেরা এই বাঙালী কবিকে যেনতেনপ্রকারেণ আত্মসাৎ করিতে চাহেন, আর ঐ বাঙালী সম্পাদক বাঙালী কবিকে মহানন্দে ভিন প্রদেশীদের হাতে তুলিয়া দিয়া অপ্রাদেশিকতার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু ক্ষতি যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মোট পাঁচটি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, ব্রজবুলি পদের লেখক গোবিন্দদাস বাঙালী নহেন, মৈথিলী কবি। তাঁহার উপাধি ঝা বা ঠকুর। ১৩৩১ সালের কার্তিক মাসের মাসিক 'বসুমতী'তে একটি, সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় (১৩৩৫) একটি, 'প্রবাসী'তে (১৩৩৬) দুইটি এবং *Modern Review*-তে (১৯৩০) একটি—এই পাঁচটি প্রবন্ধে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, ব্রজবুলির গোবিন্দদাস বাঙালী নহেন, বিদ্যাপতির স্বদেশবাসী মৈথিলী কবি।

নগেন্দ্রনাথ 'বসুমতী' পত্রে 'মিথিলার কবি গোবিন্দদাস' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ঘোষণা করেন, "গোবিন্দদাস নামে কয়েকজন পদকর্তা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি মিথিলার কবি। বিদ্যাপতির পরে ইনি মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন, এবং অনেকপদ বিদ্যাপতির অনুকরণে রচনা করেন।...ইঁহার পদাবলী বিশুদ্ধ আকারে মিথিলায় পাওয়া যায়, এবং মিথিলার কুলজীতে ইঁহার নাম আছে।...কবিরাজ গোবিন্দ ঠাকুর মিথিলার কবি। গোবিন্দদাস মিথিলার ব্রাহ্মণ, নাম গোবিন্দদাস ঝা অথবা ওঝা, কবিরাজ তাঁহার উপাধি।" তাঁহার এই বিস্ময়কর উক্তির ফলে বাঙলার সাহিত্যরসিক সমাজে সাড়া পড়িয়া গেল, এবং তাহার পর বাদপ্রতিবাদের কর্কশ কলহ শুরু হইল। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বৈষ্ণব সাহিত্যরসিকদের পক্ষ হইতে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের অযৌক্তিক মতের প্রতিবাদ করিয়া বীরভূম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে (১৩৩২) 'মহাকবি গোবিন্দদাস কি মৈথিল?' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন, পরে ইহা 'ভারতী' পত্রে (১৩৩৩ সাল, ৩য় ৫ম সংখ্যা) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। পদকল্পতরুর ৫ম খণ্ডে তাহাই সংক্ষিপ্তাকারে সঙ্কলিত হইয়াছে। অতঃপর ১৩৩৬ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় একটি প্রবন্ধে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মতামত যুক্তিসহ খণ্ডন করেন। কিন্তু তখন অবাঙালী লেখকগণ সজাগ হইয়া উঠিয়াছেন। গুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার কয়েক বৎসরের মধ্যে হিন্দী ও মৈথিলী সাহিত্যিকগণ তাঁহার মতামতের সূত্র ধরিয়া শ্রীখণ্ডের গোবিন্দদাস কবিরাজকে মৈথিলী কবি বানাইবার সর্ববিধ চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দেন। তন্মধ্যে দুইজন (মথুরানাথ দীক্ষিত এবং রমানাথ ঝা) বেশ ঘটা করিয়া বাঙলার গোবিন্দদাসের পদ হিন্দী হরফে ছাপিয়া দেন এবং এদেশের গোবিন্দদাসকে গোবিন্দ ঝা

বানাইয়া বাঙালী কবির শিরে মৈথিল পাগড়ি বাঁধিয়া দেন। বিহার প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বাঙালী-গোবিন্দদাস মৈথিল-গোবিন্দ ঝা সাজিয়া বেশ পূজা পাইতেছেন।

এখন দেখা যাক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং মৈথিল সম্পাদক কোন্ সূত্রবলে বাঙালী গোবিন্দদাসের স্থলে কল্পিত এক মৈথিলী কবিকে বসাইতে চাহেন। শুনা যায় আধুনিক কালে মৈথিলী কবি চণ্ডা ঝা[৮১] বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহ করিবার কালে গোবিন্দ দাসেরও কিছু কিছু পদ সংগ্রহ করেন। মিথিলার কুলজী বা রাজপঞ্জীতে আছে, দ্বারভাঙার লোহনা গ্রামে কৃষ্ণদাসের চার পুত্র ছিল—গঙ্গাদাস, গোবিন্দদাস, হরিদাস ও রামদাস। তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দদাসই নাকি কবি গোবিন্দদাস।

মিথিলায় গোবিন্দদাস নামে একজন কবি ছিলেন যিনি মৈথিলী ভাষায় কৃষ্ণবিষয়ক পদ লিখিয়াছিলেন। ইঁহার দুইটি পদ সপ্তদশ শতাব্দীর মৈথিলী সঙ্কলনগ্রন্থ 'রাগতরঙ্গিণী'তে উদ্ধৃত হইয়াছে। বোধহয় ইঁহারই রচিত অল্প কয়েকটি পদ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মিথিলা হইতে চণ্ডা ঝায়ের দ্বারা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই পদগুলি (২০-২৫টি) মৈথিলী ভাষায় রচিত এবং ভাবের দিক হইতে বাঙালী গোবিন্দদাসের অনুরূপ। এইখানেই গোল বাধিয়াছে। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই পদগুলির রচয়িতা মৈথিলী কবির শিরে বাঙালী গোবিন্দদাসের যাবতীয় গৌরবের ভূষণ পরাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। মিথিলায় গোবিন্দদাস নামে একজন কেন, একাধিক কবি থাকিতে পারেন। তাঁহার পদ পাওয়া গেলেও বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় আর এক গোবিন্দদাসের কথা বলিয়াছেন। ইনি মিথিলায় গোবিন্দ ঠাকুর নামে পরিচিত, তাঁহার অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল। তিনি বোধহয় কিছু কিছু পদও রচনা করিয়াছিলেন। 'মিথিলাগীত-সংগ্রহে'র দ্বিতীয় খণ্ডে গোবিন্দ ঠাকুর ভণিতায় একটি মাত্র গীত পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইলে মিথিলায় দুইজন গোবিন্দের নাম পাওয়া যাইতেছে। একজন গোবিন্দ ঝা—মৈথিলপঞ্জী বা মৈথিলবংশতালিকায়

---

৮১ রমানাথ ঝা সম্পাদিত 'শৃঙ্গারভজনে'র ভূমিকায় আছে, মৈথিলকবি চণ্ডা ঝা নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদের জন্য মিথিলা হইতে যখন বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহ করিতেছিলেন, তখন তিনি গোবিন্দদাসেরও পদ সংগ্রহ করেন।

ইঁহার নাম আছে। ইনি যে একজন বড় কবি ছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই। আর একজন গোবিন্দ ঠাকুর যিনি সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, তিনিই বোধ হয় কিছু কিছু পদ রচনা করিয়াছিলেন। পুঁথির প্রমাণ হিসাবে মোট তিনটি পদ ('রাগতরঙ্গিণী'তে দুইটি, 'মিথিলা গীতসংগ্রহে' একটি পদ) ইঁহার নামে উল্লেখ করা যায়। ইহা ছাড়া নগেন্দ্র নাথ মৈথিলী গোবিন্দদাসের যে কুড়ি-বাইশটি পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা বাঙালী গোবিন্দদাসেরই পদ। যেমন করিয়া বিদ্যাপতির পদ বাঙলাদেশে ছড়াইয়াছিল, ঠিক তেমনি করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙালী গোবিন্দদাসের অনেক পদ মিথিলায় ছড়াইয়াছিল। এই ব্যাপারে বাঙালী ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্রদের কিছু হাত ছিল বলিয়া মনে হয়। তাহারা মিথিলার ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে যাইত। যাইবার সময় তাহারা গোবিন্দদাসের পদ কণ্ঠে লইয়া যাইত। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির সমধর্মী কবি বলিয়া বিদ্যাপতির দেশে বিদ্যাপতির শিষ্য গোবিন্দদাসের পদাবলী ছড়াইবে তাহাতে আর বিস্মিত হইবার কি আছে? মৈথিলী গোবিন্দদাসের একটি পদের কয়েকছত্র উদ্ধৃত হইতেছে:

অগর উগর গারি মৃগমদরস
কএ অনুলেপন দেহ।
চললি তিমির মিলি নিমিষে অলখ ভেলি
কাচকমনি মসিরেহ॥
হে মাধব, হেরহ হরখি ধনি চান উগল জানি
মহিতলে মেটি কলঙ্ক।
ঘর গুরুজন হেরি পলটিতে কত বেরি
সসিমুখি পরম সঙ্ক॥ (রাগতরঙ্গিণী, পদ—১০১)

এইটি এবং আরও দুইটি পদ সম্পূর্ণ নূতন; ইহাদের সঙ্গে গোবিন্দদাসের কোন পদের ভাব বা ভাষাসাদৃশ্য নাই। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সংগ্রহে গৃহীত উক্ত ২০-২২টি পদ গোবিন্দদাসের ব্রজবুলির বিকৃতি মাত্র।

ব্রজবুলি ও বাংলা পদের কবি প্রসিদ্ধ গোবিন্দদাস কবিরাজ সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি। বাঙালী গোবিন্দদাস মৈথিলী-বাংলা মিশ্রিত ভাষা, যাহা 'ব্রজবুলি' নামে পরিচিত, তাহাতে অধিকাংশ এবং খাঁটি বাংলায় কিছু পদ লিখিয়াছিলেন। যাঁহারা নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রচারিত ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হইয়া বাঙালী গোবিন্দদাস কবিরাজকে মৈথিলী কবি বলিয়া মনে করেন,

তাঁহারা একটা কথা ভুলিয়া যান যে, গোবিন্দদাস অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বাংলা পদও লিখিয়াছিলেন।

কিরূপ দেখিনু মধুর মূরতি
পিরীতি রসের সার।
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক তার॥

এ পদ বাঙালী গোবিন্দদাস ভিন্ন অন্য কোন মৈথিলী বা হিন্দী কবির রচনা হইতেই পারে না। যাঁহারা ব্রজবুলির গোবিন্দদাসকে অবাঙালী বানাইতে চাহেন, তাঁহারা গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত এই বাংলা পদ সম্বন্ধে কি বলিবেন? উপরন্তু গোবিন্দদাস চৈতন্যবন্দনাবিষয়ক পদও লিখিয়াছিলেন। মঞ্জরী-ভাবের সাধনাবিষয়ক তাঁহার কয়েকটি প্রসিদ্ধ পদ সুপরিচিত, এবং পূর্বেই আমরা দেখাইয়াছি, সখীসাধনা বা মঞ্জরীভাবের সাধনা বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতি। সুতরাং চারিপাঁচশত ব্রজবুলি পদ এবং কিছু কিছু উৎকৃষ্ট বাংলা পদের রচনাকার গোবিন্দদাস কবিরাজ ('ভক্তিরত্নাকর' 'নরোত্তমবিলাসে' যাঁহার জীবনী বর্ণিত হইয়াছে) শ্রীখণ্ডের চিরঞ্জীব সেনের পুত্র, রামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা—মৈথিলী কবি নহেন।

এই গোবিন্দদাস যদি মিথিলার কবি হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার বিপুল পদভাণ্ডার ও পুরা পুঁথি মিথিলা হইতেই আবিষ্কৃত হইত। মৈথিলী সঙ্কলকগণ তাহা হইলে বাংলা পদাবলী হইতে পদ বাছিয়া লইয়া মাছিমারা কেরাণীর মতো তাহা ছাপাইতেন না। গ্রায়ার্সন সাহেব দীর্ঘকাল মিথিলা পরিভ্রমণ করেন এবং বিদ্যাপতির কিছু কিছু পদ সংগ্রহ করেন। কিন্তু তিনিও তো কোন মৈথিলী গোবিন্দদাসের উল্লেখ করেন নাই, তাঁহার কোন পদও তিনি সংগ্রহ করেন নাই। 'শিবসিংহসরোজ' নামক বিরাট মৈথিলী গ্রন্থেও গোবিন্দদাসের কোন উল্লেখ নাই। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত একটি প্রবন্ধ রচনার পর মৈথিলী লেখকগণ বুদ্ধিচাতুর্যের দ্বারা বাংলা পদসঙ্কলনগ্রন্থ হইতে গোবিন্দদাসের পদ টুকিয়া লইয়া আলাদা করিয়া গোবিন্দ ঝায়ের পদ বলিয়া ছাপাইয়া দিয়াছেন। যদি তাঁহারা খাস মিথিলা হইতে গোবিন্দদাসের ভণিতাযুক্ত অনেক পদ আবিষ্কার করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দাবি খানিকটা যুক্তিসঙ্গত হইতে। কিন্তু মিথিলা হইতে কোন পদ সংগ্রহ

করিতে না পারিয়া (কারণ মিথিলায় সেরূপ পদ নাই) বাংলা পদসঙ্কলন ও গোবিন্দদাসের মুদ্রিত বাংলা পদাবলীসংগ্রহ হইতে কিছু কিছু পদ বাছিয়া লইয়া কবিকে জোর করিয়া মৈথিলী বলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যাদি বিচার করিয়া নিশ্চিতভাবে মনে হইতেছে, মৈথিল কবি বা পণ্ডিত গোবিন্দ ঝা বা গোবিন্দ ঠাকুরের সঙ্গে বাঙলার গোবিন্দদাসের কোন সম্পর্ক নাই। নগেন্দ্রনাথের অযৌক্তিক, অপ্রামাণিক ও হাস্যকর উক্তির ফলে মৈথিলী ও হিন্দী লেখকেরা বলপূর্বক গোবিন্দদাসকে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিদ্যাপতিকে যদি কেহ বাঙালী কবি বলিয়া দাবি করেন তাহা হইলে কেহ সে অযৌক্তিক দাবি মানিবে না। ঠিক তেমনি মৈথিলী সমালোচকেরা গোবিন্দদাসকে নিজ নিজ ঝুলিজাত করিতে চাহিলে ইতিহাস তাহা স্বীকার করিবে না।

গোবিন্দদাস ব্রজবুলিতে পদ লিখিলেও তিনি বাঙালী, কাজেই তাঁহার তৎসম শব্দপ্রধান দুরূহ বাক্যবিন্যাস আমাদের কাছে ততটা দুর্বোধ্য নহে। কিন্তু মৈথিলী লেখকগণ বাংলা ভাষা না জানিবার জন্য অনেক স্থলে গোবিন্দ-দাসের বাক্যের অর্থ ধরিতে পারেন নাই, হাস্যকর ভুল করিয়াছেন। গোবিন্দ-দাসের বিখ্যাত পদ :

হৃদয়মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
মদনপ্রহরী রহু জাগি।

রাধার হৃদয়মন্দিরে কানু ঘুমাইয়া পড়িলেন, শুধু মদন প্রহরীরূপে জাগিয়া রহিল। কিন্তু মৈথিল-হিন্দী লেখকের পক্ষে নিদ্রা অর্থে বাংলা 'ঘুমান' ক্রিয়ার অর্থ করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহারা 'ঘুমাওল'-কে মৈথিলী ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ান অর্থে লইয়াছেন। 'শ্রীগোবিন্দগীতাবলীর' সম্পাদক অজ্ঞতাবশতঃ 'ঘুমাওল' শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 'ঘুমাইয়া, প্রদক্ষিণ করিয়া'। তাহা হইলে বাক্যটির অর্থ হইল—রাধার হৃদয়মন্দিরে কানু ঘুরিতে ফিরিতে লাগিলেন! ইহা কিরূপ হাস্যকর, তাহা মৈথিলী সম্পাদকগণ বুঝিতে পারেন নাই, নগেন্দ্র-নাথ জীবিত থাকিলে এই অর্থের বহর দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইতেন। যাহা হউক বাঙালী গোবিন্দদাস কবিরাজকে মৈথিলী-হিন্দী সাহিত্যিকেরা মৈথিলী বানাইবার চেষ্টা করিলেও, এরূপ জলের লিখন কখনও স্থায়ী হয় না। পাটনা ও বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ গোবিন্দদাস কবিরাজের

পদগুলিকে মৈথিলী কবি গোবিন্দ ঠক্কুর বা ঝার পদ মনে করিয়া মহানন্দে পাঠ করিতে থাকুন, আমরা ইতিমধ্যে গোবিন্দদাস প্রসঙ্গ সমাপ্ত করি।

গোবিন্দদাস কবিরাজের জীবন, সাধনা ও কবিত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল। অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, আবেগাপ্লুত ভাবরস, রচনারীতির নূতনত্ব ও ভক্তির গভীরতায় কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালী-মানসে দীর্ঘকাল স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

গোবিন্দ আচার্য ও গোবিন্দ চক্রবর্তী ॥

এতক্ষণ আমরা গোবিন্দদাস কবিরাজের কবিকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। কথাপ্রসঙ্গে মৈথিল গোবিন্দ ঠক্কুর বা গোবিন্দ ঝার কথাও উল্লেখ করিয়াছি এবং দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, মিথিলার গোবিন্দ ঝা বা ঠক্কুর নামে কোন কবি বা পণ্ডিত থাকিতে পারেন বটে, কিন্তু বাঙলার প্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজের সঙ্গে তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু গোবিন্দদাসের ঈষৎ পূর্বে এবং সমকালে গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত পদের রচনাকার রূপে একাধিক কবিকে পাওয়া যাইতেছে।[৮২] গোবিন্দদাসের বহু পূর্বে চৈতন্যদেবের সমকালে গোবিন্দ ঘোষ চৈতন্যলীলা-বিষয়ক কয়েকটি বাংলা পদ লিখিয়াছিলেন, তিনি মহাপ্রভুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ দুই ভাই মাধব ঘোষ ও বাসু (বাসুদেব) ঘোষও পদকর্তা ও চৈতন্যলীলাগায়করূপে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার কথা আমরা 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'র দ্বিতীয় খণ্ডে বলিয়াছি, এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। গোবিন্দ ঘোষকে ছাড়িয়া দিলে আরও দুইজন গোবিন্দদাসের পদ পদসঙ্কলনগ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। একজন গোবিন্দ আচার্য, আর একজন গোবিন্দ চক্রবর্তী। শ্রীনিবাস আচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র গতিগোবিন্দও একজন পদকর্তা ছিলেন।

---

৮২ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও কেহ কেহ একাধিক গোবিন্দদাসের কথা বলিয়াছিলেন। প্রাচীন বৈষ্ণবপদাবলীর সংগ্রাহক ও অনুরাগী অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার সম্পাদিত 'গোবিন্দদাস-কৃত পদাবলী'তে সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন, "অনেকগুলি পদকর্তার নাম গোবিন্দদাস।"

'পদকল্পতরু'তে গতিগোবিন্দের ভণিতায় একটিমাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে। ইনি গতিগোবিন্দ বা গোবিন্দগতি নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি যদি শুধু গোবিন্দ বা গোবিন্দদাস ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়া থাকেন তাহা হইলে গোবিন্দদাস-গোবিন্দআচার্য-গোবিন্দচক্রবর্তীর পদের সহিত ইঁহার পদ মিশিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে।

গোবিন্দ আচার্য নামে এক পদকর্তা চৈতন্যদেবের সময়ে বর্তমান ছিলেন। কবিকর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় ভক্তিভরে এই কবির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। 'অনুরাগবল্লী'তে গোবিন্দ আচার্যের বন্দনাসূচক উল্লেখ আছে।[৮৩] ইঁহার অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার পদাবলী হইতে মনে হয়, কবি চৈতন্যের সমসাময়িক ও চৈতন্যলীলার সাক্ষী ছিলেন। কারণ চৈতন্য-লীলাবিষয়ক পদে যেরূপ প্রত্যক্ষ-দর্শীর মতো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছাপ পাওয়া যায়, তাহাতে ঐরূপই অনুমিত হয়। কবি সরল সহজ ভাষায় যে সমস্ত পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহার কিছু কিছু গোবিন্দদাস কবিরাজের বাংলা পদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। সুতরাং ইঁহার পদ বাছিয়া লওয়াও সহজ ব্যাপার নহে। কারণ তিনি সমস্ত পদে শুধু 'গোবিন্দদাস' ভণিতা দিয়াছেন। তাই 'পদকল্পতরু'র সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় 'পদকল্পতরু'র পরিশিষ্ট খণ্ডে (৫ম খণ্ড) গোবিন্দ, গোবিন্দ ঘোষ ও গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদকে পৃথক ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ ৪৮-৪৯) এবং ভূমিকায় শুধু গোবিন্দ চক্রবর্তী সম্বন্ধে উল্লেখ করিলেও (পৃ. ৫৫) গোবিন্দ আচার্যের বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। 'পদকল্পতরু', 'গৌরপদতরঙ্গিণী', 'কীর্তনানন্দ', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি প্রভৃতিতে গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত বাংলা পদগুলির মধ্যে ৩২টি পদকে পৃথক করিয়া ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগে' গোবিন্দ আচার্যের পদ বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী'তে ২৮টি পদ (ঐ গ্রন্থের পৃ. ২৮৯-২৯৬) গোবিন্দ আচার্যের পদ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এখন এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা সুকঠিন। সেরূপ সম্ভাবনা থাকিলে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় 'পদকল্পতরু'র পরিশিষ্ট খণ্ডে তাহার উল্লেখ করিতেন। গোবিন্দ আচার্য স্বীয় পদে শুধু

---

৮৩ মাধবদাস ও দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনাতেও ইঁহার উল্লেখ আছে।

'গোবিন্দদাস' ভণিতা দিয়াছেন। গোবিন্দদাস কবিরাজ ও গোবিন্দ চক্রবর্তী—ইঁহারাও শুধু গোবিন্দদাস ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। গোবিন্দ ঘোষ ভণিতায় নিজের পূর্ণনাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাই কোন্ পদ গোবিন্দ আচার্যের, কোন্‌টি গোবিন্দ চক্রবর্তীর বা গোবিন্দদাস কবিরাজের তাহা নির্ণয় করা একটু দুরূহ। যাহা হউক ডঃ বিমানবিহারী বাবু সঙ্কলিত গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত ৩২টি পদকে (উক্ত গ্রন্থে পদ সংখ্যা—৭২৯-৭৬০) গোবিন্দ আচার্যের রচনা বলিয়া আপাততঃ ধরিয়া লওয়া গেল। এই ৩২টি পদের মধ্যে ৬টি পদ চৈতন্যলীলাবিষয়ক, অবশিষ্ট ২৬টি পদ রাধাকৃষ্ণ-লীলা অবলম্বনে রচিত। চৈতন্যলীলাবিষয়ক পদগুলিতে সরলভাষায় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বিশেষ কোন বিস্ময়কর কবিত্বগুণ না থাকিলেও[৮৪] সরল সহজ ঘটনাবিবৃতি মন্দ নহে। নাগরী-ভাবের ছায়াতলে বসিয়া রচিত গৌরাঙ্গরূপবর্ণনাবিষয়ক এই পদটি উল্লেখযোগ্য :

কি হেরিলাম অপরূপ গোরা গুণনিধি।
কতই চাঁদ নিঙাড়িয়া নিরমিল বিধি॥
উগারই সুধা জনু গোরা মুখের হাসি।
নিরখিতে গোরারূপ হৃদয়ে রৈল পশি॥
আঁখি পালটিতে কত যুগ হেন মানি।
হিয়ার মাঝে গাঁথি থোব গোরারূপ খানি॥

কৃষ্ণরাধাবিষয়ক পদগুলিও আভরণহীন প্রাণের সহজ প্রকাশ বলিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। কৃষ্ণবিরহে রাধার এই উক্তিটি আন্তরিক বলিয়া বিশিষ্ট কোন কাব্যগুণ না থাকিলেও আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া থাকে :

বঁধুর পিরীতে আমার না পুরিল সাধে।
কোন্ দেশে গেল পিয়া কোন্ অপরাধে॥

---

৮৪ ডঃ মজুমদার এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "গোবিন্দ আচার্যের রচনাশৈলী চণ্ডীদাস, মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার প্রভৃতির রচনারীতির তুল্য।" ('গো. পদাবলী ও তাঁহার যুগ', পৃ. ।৶০) কিন্তু আমাদের মনে হয়, গোবিন্দ আচার্যের রচনারীতি নিতান্তই সাধারণ স্তরের—আতিশয্য ও অলঙ্কার বর্জিত সরল বিবৃতি মাত্র। ইহার সহিত চণ্ডীদাস ও সরকার ঠাকুরের নিরাভরণ অথচ গভীর অনুভূতিব্যঞ্জক পদের গুণগত সাদৃশ্য অল্প।

মনে সাধ শুনহ বন্ধু হিয়াতে রাখিব।
ছাড়িয়া রহিব আমি পরাণে মরিব॥
মিনতি করিয়ে বন্ধু দন্তে তৃণ ধরি।
শ্যাম বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি॥
সঙরি বন্ধুর গুণ হৃদয় বিদরে।
মনে করি বুক চিরি রাখিব অন্তরে॥

পদকর্তা গোবিন্দ চক্রবর্তী বৈষ্ণব পদসাহিত্যে গোবিন্দ আচার্য অপেক্ষা অধিক পরিচিত। তাঁহার ব্রজবুলিতে গোবিন্দদাসের অনুরূপ ঝঙ্কার সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায়। যদুনন্দন দাসের একটি পদে আছে, গোবিন্দ চক্রবর্তী শ্রীনিবাসের শিষ্য ছিলেন। সেই হিসাবে তিনি গোবিন্দ কবিরাজের গুরু-ভাই। বোরাকুলি গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। কবি হিসাবে ইনি যেমন প্রসিদ্ধ ছিলেন, তেমনি গীতবাদ্য, বিশেষতঃ কীর্তনে বিশেষ দক্ষ ছিলেন।[৮৫] ভাবাবেগের অতিরেক বশতঃ তিনি কীর্তনগানে প্রায়ই দশা পাইতেন বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে ইনি "ভাবক চক্রবর্তী" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।[৮৬] শ্রীনিবাসের চক্রবর্তী উপাধিধারী যে ছয়জন প্রধান শিষ্য ছিলেন, গোবিন্দ চক্রবর্তী তাহার মধ্যে গণনীয়। বৈষ্ণবদাস তাঁহার পদে গোবিন্দ চক্রবর্তীর বন্দনায় বলিয়াছেন,—

জয় জয় যুগল- পিরীতিময়
শ্রীযুত চক্রবর্তী গোবিন্দ।

পদকর্তা উদ্ধবদাস এই কবির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,

শ্রীদাস গোকুলানন্দ চক্রবর্তী শ্রীগোবিন্দ
শ্রীরামচরণ শ্রীল ব্যাস।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন সম্পাদিত 'বৈষ্ণবপদাবলী'তে ৯৪টি পদকে গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু বিমানবিহারীবাবু তাঁহার গ্রন্থে মাত্র ২৪টি পদকে গোবিন্দ চক্রবর্তীর বলিয়া

---

৮৫ আচার্যের অতি প্রিয় শিষ্য চক্রবর্তী।
গীতবাদ্য বিদ্যায় নিপুণ ভক্তিমূর্তি॥ (ভক্তিরত্নাকর, ১৪শ তরঙ্গ)

৮৬ চক্রবর্তী গোবিন্দের দেখি ভাবাবেশ।
সবার অন্তরে হৈল উল্লাস অশেষ॥
শ্রীভাবক চক্রবর্তী হৈল তাঁর খ্যাতি।
কেবা না প্রশংসে দেখি প্রেমভক্তিরীতি॥ (প্রেমবিলাস, ৭ম বিলাস)

গ্রহণ করিয়াছেন। 'পদকল্পতরু'তে গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদের সংখ্যা—১০, সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সেইরূপই অনুমান। প্রাচীন পদসংগ্রহে গোবিন্দদাস-ভণিতাযুক্ত একাধিক কবির পদ মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে, এবং একের সঙ্গে অপরের পদের পৃথক করাও সম্ভব নহে। কিন্তু কয়েকটি সূত্র হইতে গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদ পৃথক করা যায়। 'পদামৃতসমুদ্রে'র সঙ্কলক রাধামোহন ঠাকুর পদগুলির সংস্কৃত টীকায় চারিটি পদকে 'গোবিন্দ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৮৭] 'পদকল্পতরুতে'ও ছয়টি পদ গোবিন্দ চক্রবর্তীর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই দশটি পদ যে গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচিত তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া গেল। তাঁহার বেশ কিছু পদ নাগরীভাব সংক্রান্ত। তিনি 'শ্যমরী গোবিন্দদাস' ও 'গোবিন্দ দাসিয়া'—প্রায়স্থলে এইরূপ ভণিতা দিয়াছেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় এই দুই বৈশিষ্ট্য ধরিয়া আর ১৪টি পদকে গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে গোবিন্দ চক্রবর্তীর মোট ২৪টি পদ পাওয়া গেল। অবশ্য 'গোবিন্দদাস' ভণিতা একাধিক কবি ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া গোবিন্দ চক্রবর্তী, গোবিন্দ আচার্য ও গোবিন্দদাস কবিরাজের পদ মিশিয়া গিয়াছে।[৮৮] এই পদগুলির মধ্যে অধিকাংশই চৈতন্যদেব-সম্পর্কিত এবং ইহাতে নাগরীভাবের প্রাধান্যই অধিক। এই কবি শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ও গোবিন্দদাসের বান্ধব ছিলেন, অথচ চৈতন্যবিষয়ক পদে শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের মতো গৌরনাগরী ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন কেন, তাহার যুক্তিসঙ্গত উত্তর পাওয়া যায় না। গৌরাঙ্গকে স্নানের ঘাটে দেখিয়া নদীয়া-নাগরীগোষ্ঠীর মনোভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন :

---

৮৭ ডঃ বিমানবিহারীর উল্লিখিত গ্রন্থে ৭৬১—৭৬৪ এবং ৭৭৩ সংখ্যক পদ।

৮৮ গোবিন্দদাস কবিরাজ যে কিছু কিছু বাংলা পদ লিখিয়াছিলেন তাহা ডঃ মজুমদার প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন একদা মনে করিতেন, "There is nothing to prove that the Koviraja had ever written any poem in Bengali". (HBBL) কিন্তু সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করিতেন—"বাঙ্গালী পদকর্তা জ্ঞানদাসের মতো গোবিন্দদাসও বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী পদরচনায় তুল্য কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন।"—
(পদকল্প, ৫ম, পৃ. ৭৮)

সুরধুনী তীরে গৌরাঙ্গসুন্দর
সিনান করয়ে নিতি :
কুলবধূগণ নিমগণ মন
ডুবিল সতীর মতি ॥
ঢল ঢল কাঁচা সোনার বরণ
লাবণি জলেতে ভাসে।
যুবতী উমতি আউদড় কেশে
রহই পরশ আশে ॥

চৈতন্যদেবও নদীয়া-নাগরীদের দেখিয়া আঁখি ঠারাঠারি করিলেন :

হাসিয়া রসিয়া সঙ্গিয়া সঙ্গে।
কৈল ঠারাঠোরি কি রস রঙ্গে ॥

কাহাকেও তিনি নয়নকটাক্ষ হানিলেন :

শচীর কোঁয়র গৌরাঙ্গ সুন্দর
দেখিলুঁ আঁখির কোণে।
অলখিতে চিত হরিয়া লইল
অরুণ নয়নের বাণে ॥

কোন রমণীর সঙ্গে তিনি 'রসময় কথা' বলিতে লাগিলেন :

রমণী দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া
রসময় কথা কয়।

এই ধরনের পদের রুচির কথা ছাড়িয়া দিলে কয়েকটি পদের রচনাবৈচিত্র্য নরহরি সরকারকে স্মরণ করাইয়া দেয়। রাধার ছয়মাসের দুঃখের কথা (আশ্বিন—ফাল্গুন) সম্বলিত ব্রজভাষায় লিখিত তাঁহার পদগুলি গোবিন্দদাস কবিরাজের মতো অতটা উৎকৃষ্ট না হইলেও রচনাভঙ্গিমা, ভাষার ঝঙ্কার ও ছন্দের হিল্লোলে নিতান্ত মন্দ নহে। যথা—

মাস গণি গণি আশ গেলহিঁ
শ্বাস রহু অবশেষিয়া।
কোন সমুঝব হিয়াক বেদন
পিয়া সে গেল পরদেশিয়া ॥
সময় শারদ চাঁদ নিরমল
দীঘ দীপতি রাতিয়া।
ফুটল মালতি কুন্দ কুমুদিনী
পড়ল ভ্রমরক পাঁতিয়া ॥

এই পদবিন্যাসে যুগপৎ বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের ছাপ পড়িয়াছে; তবে কবির রচনাভঙ্গিমা অন্য দুই মহাজন অপেক্ষা যে কিঞ্চিৎ খর্ব তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

রায়শেখর ॥

সপ্তদশ শতাব্দীতে গোবিন্দদাস ছাড়াও আরও অনেক পদকর্তার আবির্ভাব হইয়াছিল যাঁহাদের বিস্তারিত বর্ণনা বর্তমান প্রসঙ্গে ততটা প্রয়োজনীয় নহে। এই সমস্ত কবির দল গতানুগতিক পথ ধরিয়া চলিয়াছিলেন। কেহ চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস-নরহরির সরল ভাষার ঐতিহ্য বহন করিয়াছিলেন, কেহ-বা শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের আদর্শে ও সহজিয়া চণ্ডীদাসের প্রভাবে রাগাত্মিকা পদের অনুশীলন করিয়াছিলেন। এই শতাব্দীতে এইরূপ বহু মহাজনের আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু কেহই প্রায় স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। একই প্রকার রচনারীতি, চিত্রকল্প, ভাবাবেগের মুদ্রাদোষ ইঁহাদের পদগুলিতে বৈচিত্র্য ও বিস্ময়রস সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তাই বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা ইঁহাদের মধ্য হইতে প্রতিভাশালী কয়েকজন কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ করিব।

প্রথমে রায়শেখরের কথা আলোচনা করা যাক। তাঁহার সম্বন্ধে নানা বিপরীত মতের সম্ভাবনা আছে। কারণ তিনি শেখর কথাটিকে ধরিয়া নানাভাবে নিজ ভণিতা দিয়াছেন, যথা—রায়শেখর, কবি শেখররায়, শেখর, শেখর দাস, কবিশেখর, নৃপ কবিশেখর, নব কবিশেখর। 'পদকল্পতরু'তে শেখর ভণিতায়—৯৮, কবিশেখর ভণিতায়—৪২, শেখরকবি ও শেখর রায় ভণিতায়—১, শেখর দাস ভণিতায়—২, নৃপ কবিশেখর ভণিতায়—১, রায় শেখর ভণিতায়—৩৫,—মোট ১৭৯টি পদ স্থান পাইয়াছে। ইহার মধ্যে ব্রজবুলিতে রচিত পদের সংখ্যা প্রায় ৯০, অবশিষ্ট পদসমূহ বাংলায় রচিত।

শেখর বিভিন্নভাবে ভণিতা দিয়াছেন, অথবা এতগুলি শেখর ভণিতার অন্তরালে একাধিক কবি উঁকি দিতেছেন কিনা সন্দেহ হয়। বৈষ্ণব সাহিত্য ও সমাজে গোবিন্দদাসের ঈষৎ পরবর্তী কালে আবির্ভূত[৮৯] শেখর ভণিতাযুক্ত

৮৯ কবির সময় সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইয়াছে।

যে কবি কবিহিসাবে কিছু খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন—তিনিই কবি রায়শেখর নামে পরিচিত।

রায়শেখর সম্বন্ধে সর্বপ্রথম জগদ্বন্ধু ভদ্র কয়েকটি তথ্য দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে পদসঙ্কলনগ্রন্থে শেখর, রায়শেখর, কবি শেখর, দুঃখী শেখর ইত্যাদি ভণিতাযুক্ত পদগুলি খুব সম্ভব একই ব্যক্তির রচনা। ইঁহার প্রকৃত নাম নাকি শশিশেখর বা চন্দ্রশেখর। কবি নিত্যানন্দবংশোদ্ভূত ছিলেন এবং শ্রীখণ্ড কেন্দ্রের নেতা রঘুনন্দনের মন্ত্রশিষ্য হইয়াছিলেন। বোধ হয় ইনি গোবিন্দদাস কবিরাজের কিছু পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই কবি বর্ধমান জেলার পড়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার ভণিতার কোন কোন স্থলে 'রায়' ও 'নৃপ' বিশেষণ আছে বলিয়া জগদ্বন্ধু ইঁহাকে জমিদার বা ধনিসন্তান বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় এই সমস্ত তথ্য বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কারণ রায়শেখরের দণ্ডাত্মিকা পদাবলী হইতে কবিসম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁহার পদের একস্থলে রঘুনন্দনের চরণ বন্দনার উল্লেখ আছে বলিয়া তাঁহাকে শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শিষ্য বলিয়া মনে হইতেছে:

শ্রীরঘুনন্দন চরণ করি সার।
কহে কবিশেখরের গতি নাহি আর॥

তাঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য তথ্য জগদ্বন্ধু ভদ্র বোধহয় অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির নিকট সংগ্রহ করিয়াছিলেন।[৯০] যাহা হউক রায়শেখর যে ধনিসন্তান ছিলেন, বা নিত্যানন্দের বংশের সঙ্গে তাঁহার কোন যোগাযোগ ছিল, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির বিবরণ হইতে জগদ্বন্ধু ভদ্র রায়শেখরের সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহার প্রামাণিকতা সংশয়াতীত নহে। জগদ্বন্ধু বলিয়াছেন যে, কবির প্রকৃত নাম শশিশেখর বা চন্দ্রশেখর। কিন্তু সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বৈষ্ণবসমাজে শশিশেখর ও চন্দ্রশেখরের নাম নিতান্ত অপরিচিত নহে। 'নরোত্তমবিলাসে'

---

৯০ জগদ্বন্ধু ভদ্র বলিয়াছেন, "রায় শেখরকে তত্ত্বনিধি মহাশয় 'অতি বিখ্যাত পদকর্তা' বলিয়া একপত্রে আমাকে জানাইয়াছেন"—(গৌরপদতরঙ্গিণী)। ভদ্র মহাশয় এ বিষয়ে আর কোন আলোচনা করেন নাই বলিয়া তত্ত্বনিধি-প্রদত্ত এই তথ্য কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

যে চন্দ্রশেখরের উল্লেখ আছে, তিনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।[৯১] মহাপ্রভুর মেসো চন্দ্রশেখর রচিত গৌরাঙ্গবিষয়ক তিনটি পদে ('পদকল্পতরুতে' গৃহীত) চন্দ্রশেখরের পুরা ভণিতা রহিয়াছে। সুতরাং ইঁহার সঙ্গে শশিশেখরের পদের গোলমাল হইবার সম্ভাবনা নাই। চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর বলিয়া যে দুই ভ্রাতা পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পরবর্তী কালের কবি বলিয়া 'পদকল্পতরু'তে ইঁহাদের কোন পদ সংগৃহীত হয় নাই। সুতরাং চন্দ্রশেখর ও শশিশেখরের সঙ্গে রায়শেখরের পদ বা ভণিতার সংমিশ্রণ হইবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই। "দণ্ডাত্মিকা" নামক পদসংগ্রহে যে শেখরের ভণিতা আছে, তিনিই রায়শেখর, কারণ 'দণ্ডাত্মিকা' পদের সঙ্গে 'পদকল্পতরু'ধৃত রায়শেখর, শেখর ইত্যাদি ভণিতাযুক্ত পদের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য আছে। সুতরাং "দণ্ডাত্মিকা" পদাবলী ও 'পদকল্পতরু'র পাঠ মিলাইয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে—কবির যথার্থ নাম ছিল শেখর। রায়-নৃপ-কবি—সমস্তই কবি নিজ নামের বিশেষণ হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে কবির আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় মনে করিয়াছিলেন যে, রায়শেখর গোবিন্দদাসের পূর্ববর্তী কবি, "রায়শেখর গোবিন্দদাসের পরবর্তী কবি নহেন। তিনি খুব সম্ভবতঃ গোবিন্দদাসের জন্মের কিছু পূর্বে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার অন্তর্ধানের কয়েক বৎসর পূর্বেই অপ্রকট হইয়াছিলেন" (পদকল্প, ৫ম, পৃ. ২১৯)। কিন্তু জগদ্বন্ধু ভদ্রের মতে, "ইনি নিত্যানন্দবংশ সম্ভূত, শ্রীখণ্ডবাসী রঘুনন্দন গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য ও গোবিন্দদাসের পরবর্তী লোক" (গৌরপদতরঙ্গিণী)। এই কবি নিত্যানন্দবংশোদ্ভূত এরূপ কোন প্রমাণ নাই, এবং শ্রীখণ্ডবাসী রঘুনন্দন গোস্বামীবংশীয় নহেন, তিনি বৈদ্য। কিন্তু রায়শেখর যে গোবিন্দদাসের পরবর্তী কালে তাঁহার ব্রজবুলির আদর্শে পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সতীশচন্দ্র তাঁহাকে গোবিন্দদাসের পূর্ববর্তী বলিয়াছিলেন মাত্র একটি যুক্তির বলে। খেতুরীর মহোৎসবে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রঘুনন্দন (ইঁহার শিষ্য রায়শেখর) প্রভৃতি কবি ও

---

৯১ জয় ভক্তিরত্নদাতা শ্রীচন্দ্রশেখর।
প্রভু পাদপদ্মে যেঁহ মত্তমধুকর॥ (নরোত্তম বিলাস)

আচার্যেরা উপস্থিত ছিলেন। রায়শেখর উপস্থিত থাকিলে 'ভক্তিরত্নাকরে' তাহার উল্লেখ থাকিত। সতীশচন্দ্রের এই যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে। তখন হয়তো কবি তরুণ বয়স্ক ছিলেন, কিংবা বিখ্যাত পদকর্তাদের পার্শ্বে উল্লিখিত হইবার মতো প্রসিদ্ধি তখনও তিনি হয়তো অর্জন করিতে পারেন নাই। উপরন্তু প্রতিভাবিচারে তাঁহার স্থান গোবিন্দদাস-জ্ঞানদাসাদি অপেক্ষা অনেক নিম্নে। সেই জন্যই তিনি হয়তো 'ভক্তিরত্নাকরে' উল্লিখিত হন নাই।

সতীশচন্দ্রের আর একটি যুক্তি হাস্যকর: "গোবিন্দদাসের রচনায় ব্রজবুলি পদলালিত্যে, অনুপ্রাসে ও ছন্দের ঝঙ্কারে যেরূপ অতুলনীয় পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, রায়শেখরের ব্রজবুলি প্রশংসনীয় হইলেও তাহাতে সেরূপ উৎকর্ষ ঘটে নাই" (পদকল্প-৫ম)। সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, "ভাষার উন্নতির দিক দিয়া দেখিলেও মনে হয় যে, রায়শেখর বিদ্যাপতির অনুকরণে যে ব্রজবুলির প্রবর্তন করেন, সমধিক শক্তিশালী কবি গোবিন্দদাসের হাতে পড়িয়া উহাই উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল" (পদকল্প-৫ম)। যেহেতু রায়শেখরের পদ গোবিন্দদাসের পদ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, সেই হেতু তিনি গোবিন্দদাসের পূর্ববর্তী কবি, এ যুক্তি অতি অশ্রদ্ধেয়। তাহা হইলে তো গোবিন্দদাসের পরবর্তী কালের নিকৃষ্ট প্রতিভার কবিগণ সকলেই গোবিন্দদাসের পূর্ববর্তী হইয়া পড়িবেন। সুতরাং সতীশচন্দ্র যে যুক্তিবলে রায়শেখরকে গোবিন্দদাসের পূর্ববর্তী বলিয়াছেন, তাহা প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হইতে পারে না।

কিন্তু একটি গুরুতর সমস্যা—বিদ্যাপতির ভণিতার কোন কোন স্থলে 'কবিশেখর' ভণিতা আছে। সুতরাং বিদ্যাপতির মৈথিলী হইতে রূপান্তরিত ব্রজবুলির পদ এবং রায়শেখরের অনুরূপ ধরনের ব্রজবুলির মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটাই সম্ভব, এবং এইরূপ সংমিশ্রণ ঘটিলে বিদ্যাপতির লোকসান, কিন্তু রায়শেখরের লাভ। কারণ বিদ্যাপতির তুলনায় রায়শেখর নিকৃষ্ট প্রতিভার কবি। তাঁহার ভণিতায় বিদ্যাপতির পদ চলিয়া গেলে 'মৈথিল কোকিলে'র আপত্তি হইবার কথা। সমস্যার জড় মিটাইবার জন্য বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'কবিশেখর' ভণিতাযুক্ত সমস্ত পদকেই বিদ্যাপতির বলিয়া উক্ত সঙ্কলনে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমে দেখিতে হইবে বিদ্যাপতি কবিশেখর ভণিতার পদ লিখিয়াছিলেন কিনা।

অবশ্য সমস্যাটা এতটা জলবৎ তরল নহে। কারণ বিদ্যাপতি কবিশেখর বা নব-কবিশেখর ভণিতায় পদ লিখিয়াছিলেন ইহা একেবারে অমূলক কথা নহে। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলিয়াছিলেন, "কবিশেখর বিদ্যাপতির উপাধি। তাঁহার পূর্বে জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর কবিশেখরাচার্য নামে মিথিলায় সংস্কৃত কবি ছিলেন। এই কারণে কিছুদিন বিদ্যাপতিকে নব-কবিশেখর বলিত।" তাঁহার এ মন্তব্য অমূলক নাও হইতে পারে। নগেন্দ্রনাথ স্বয়ং মিথিলার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন, ঐ অঞ্চল হইতে তিনি যে সমস্ত জনশ্রুতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিদ্যাপতি 'নব-কবিশেখর' বা 'কবিশেখর' ভণিতায় যে মৈথিল পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ মৈথিল ও নেপালী পুঁথিতে পাওয়া যাইবে। তিনি যে কবিশেখর নামে পদ রচনা করিতেন, প্রাচীন পদসঙ্কলনেও সেরূপ প্রমাণ আছে। 'পদকল্পতরু'র ৬১০ সংখ্যক পদের ভণিতায় কবিশেখর আছে, কিন্তু 'পদরত্নাকরে' পদটির ভণিতায় স্পষ্টতঃ বিদ্যাপতির নাম আছে। ঐরূপ 'পদকল্পতরু'র ১৯৪৮ সংখ্যক পদে কবিশেখরের ভণিতা, কিন্তু 'পদরসসারে'র ঐ একই পদের ভণিতায় আছে বিদ্যাপতির নাম। সুতরাং ডঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন, "We do not know whether Kavi-Sekhara was a title of Vidyapati or not .." কিন্তু সে সন্দেহ অমূলক। 'পদকল্পতরু'র সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিদ্যাপতি-রায়শেখর-কবিশেখর-নবকবিশেখর ঘটিত অনেক অযৌক্তিক মতের প্রতিবাদ করিলেও, 'কবিশেখর' যে বিদ্যাপতির অন্যতম বিরুদ ছিল, তাহা তিনিও স্বীকার করিয়াছেন। "সুতরাং আমাদের বঙ্গীয় কবি রায়শেখরের রচিত 'কবিশেখর' ভণিতার পদের সহিত কবিশেখর বিদ্যাপতির অনেকপদ যে মিশিয়া গিয়াছে, এরূপ অনুমান সহজেই করা যাইতে পারে।"[৯২] 'পদকল্পতরু'তে শেখর ও কবিশেখর ভণিতায় বহু পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কোন কোন পদ যে বিদ্যাপতির রচনা সে সম্বন্ধেও সতীশচন্দ্র নিঃসন্দেহ। তিনি কিভাবে বিদ্যাপতি-কবিশেখর ও রায়শেখর-কবিশেখরের পদকে পৃথক করিয়া 'পদকল্পতরু'তে সন্নিবেশ করিয়াছেন সেই প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "পদকল্পতরু গ্রন্থে

৯২ পদকল্পতরু, পরিশিষ্ট (৫ম) খণ্ড, পৃ. ৩১

'শেখর' ও 'কবিশেখর' ভণিতায় বহু সংখ্যক পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ সকল পদের মধ্যে আমরা যে কয়েকটি পদ বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, কেবল উহাই 'কবিশেখর' বিদ্যাপতি শীর্ষকে এবং বাকি সমস্ত পদ শেখরকবি শীর্ষকে প্রদর্শিত হইয়াছে।"[৯৩] 'পদকল্পতরু'তে তিনটি পদ (২৪৪, ৬১০, ১৯৪৮) এবং কবিশেখর ভণিতায় চারটি পদ (১০২, ১৩২ ৩৮৬, ১৮৩২) সতীশচন্দ্র বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। আর অবশিষ্ট যত পদে শেখর-কবিশেখর ভণিতা আছে তাহা সমস্তই বাঙালী রায়শেখরের রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত শেখর, কবিশেখর, রায়শেখর ভণিতাযুক্ত অধিকাংশ ব্রজবুলির পদকেই বিদ্যাপতির বলিয়া তাঁহার সঙ্কলনে স্থান দিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্ত সতীশচন্দ্র স্বীকার করেন নাই—যুক্তি দিয়া স্বীকার করাও যায় না। নবকবিশেখর ও কবিশেখর ভণিতায় বিদ্যাপতি কিছু কিছু পদ লিখিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই; আবার অপর দিকে পরবর্তী কালের কবি রায়শেখর বিদ্যাপতি গোবিন্দদাসের অনুসরণে যে সমস্ত পদ লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও কবিশেখর ভণিতা পাওয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ ব্যতিরেকে শুধু বাহ্যিক ভাষার প্রমাণ ধরিয়া বিচার করিতে গেলে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মতোই ভ্রান্তিতে পড়িতে হইবে। একথা ঠিক যে, বিদ্যাপতির অনেক পদ বাঙলায় আসিয়া মৈথিল আকার ছাড়িয়া মিশ্রভাবে ব্রজবুলির আকার গ্রহণ করে। রায়শেখরও সেই ভাষার আদর্শে পদ রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং ভাষা ধরিয়া এই বিচারবিশ্লেষণে সুবিধা হইবে না।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় আন্তর প্রমাণ ধরিয়া এই সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন—তাঁহার সে পদ্ধতি যুক্তিবিরোধী নহে। তাঁহার মতে নবকবিশেখর-কবিশেখর-রায়শেখর প্রভৃতি ভণিতার গোলমাল মিটাইতে গেলে দুইটি প্রমাণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। যে সমস্ত পদে কবি সেবক-সেবিকা-দাসী-সখী ও মঞ্জরীভাবের কথা বলিয়াছেন, সেগুলি কদাপি বিদ্যাপতির রচনা হইতে পারে না। কারণ সখীসাধনা বা মঞ্জরী-সাধনার বৈশিষ্ট্য রূপগোস্বামী কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইবার পর সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ ও পদসাহিত্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ

৯৩ ঐ, পৃ. ঐ

করে।[১৪] যেমন শেখর ভণিতায় একটি পদের ("কাজর রুচিহর রয়নি বিশালা") ভণিতায় আছে :

লীলাকমল উপেখলি রামা।
মন্থরগতি চলু ধরি সখি শামা॥
যতনহি নিঃসরু নগর দুরন্তা।
শেখর অভরণ ভেল বহন্তা॥

গভীর রাত্রিতে রাধা অভিসারে বাহির হইয়াছেন, লীলাকমল ত্যাগ করিয়া সখী শ্যামাকে অবলম্বন করিয়া মন্থর গতিতে চলিয়াছেন—"পদকর্তা শেখর এখানে অভিসারিকা শ্রীরাধার সহচরী হইয়া তাঁহার পরিত্যক্ত আভরণগুলি বহন করিয়া সঙ্গে যাইতেছেন : এ সখীসুলভ সেবাকার্যের নিদর্শন চৈতন্য-প্রভুর পরবর্তী পদকর্তাদিগের রচনা ব্যতীত তাঁহার পূর্ববর্তী রচনায় কোথাও দেখা যায় না।"[১৫] সতীশচন্দ্রের এ মন্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, বিদ্যাপতির পদে কৃষ্ণ বা রাধার সখাসখীর কোন নাম ছিল না—কারণ রাধা ও কৃষ্ণের সখাসখীর বর্ণনা, নাম ইত্যাদি ব্যাপার চৈতন্য-পরিকরদের পরিকল্পনা। 'শেখর' ভণিতাযুক্ত যে সমস্ত পদে মধুমঙ্গল, শ্রীদাম, সুদাম, ললিতা-বিশাখা প্রভৃতির নাম আছে, সেগুলি যে বাঙালী রায়-শেখরের রচনা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। উপরন্তু সতীশচন্দ্র ভাষার কথাও তুলিয়াছেন। তাঁহার মতে বিদ্যাপতির পদের ভাষা এবং পরবর্তী কালে ব্রজবুলির লেখক বাঙালী পদকারদের ভাষার মধ্যে গুরুতর পার্থক্য আছে। ব্রজবুলি একপ্রকার মিশ্র, কৃত্রিম ও কেতাবী ভাষা। অপর দিকে বিদ্যাপতির ভাষা খাস মিথিলার জনসাধারণের কথ্য ভাষা। কাজেই বাঙালীর রচিত ব্রজবুলিভাষায় মৈথিল বাক্‌রীতি-ব্যাকরণের নানা

---

১৪ এ বিষয়ে সতীশচন্দ্রের এ মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত, "মধুরভাবে ভগবানের উপাসনা বা ব্রজ-গোপীর ভাবের মধ্য দিয়া, অন্ততঃ ব্রজগোপীর অনুগা বা সহচরীর ভাব লইয়া সাধনা করিতে হইবে—শ্রীচৈতন্যের একান্ত মর্মজ্ঞ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমৎ রূপগোস্বামী কর্তৃক এই রসতত্ত্ব দার্শনিক যুক্তি সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে সেইরূপ ধারণা এদেশে বোধ হয় কেহই করিতে পারেন নাই। সুতরাং চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কিংবা তাঁহার প্রায় সমকালবর্তী ব্রজভূমির কবি সুরদাস প্রভৃতির রচনায় ভক্তসুলভ বৈকল্যতার প্রচুর নিদর্শন বিদ্যমান থাকিলেও পরবর্তী পদকর্তাদিগের রচনায় সখীসুলভ সেবাধর্মের যেরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে—সেরূপ কোথাও দেখা যায় না।" (পদকল্পতরু, ৫ম, পৃঃ ৩৩)

১৫ সতীশচন্দ্র সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'র ভূমিকা (পৃঃ ৸৶০-১৲) দ্রষ্টব্য।

ভুলভ্রান্তি দেখা যায়। "এই তথাকথিত ব্রজবুলিতে যদিও ব্যাকরণ ও ছন্দবিষয়ে প্রায় সর্বত্র বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষাই অনুসৃত হইয়াছে, তথাপি বাঙালী পদকর্তাদিগের মৈথিল ভাষায় অনভ্যাস ও অনভিজ্ঞতা হেতু ব্যাকরণ ও ছন্দের ব্যতিক্রম তাঁহাদিগের রচনায় বিরল নহে।"[৯৬]

যাহা হউক সতীশচন্দ্রের এই সমস্ত মন্তব্য বিচার করিয়া রায়শেখরের-শেখর ঘটিত সমস্যা সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ রাখিয়া বলা যাইতে পারে যে, কবিশেখর ভণিতায় বিদ্যাপতি কিছু কিছু পদ লিখিয়াছিলেন বলিয়া রায়শেখরের (তিনিও কবিশেখর ভণিতা ব্যবহার করিয়াছিলেন) পদের সঙ্গে বিদ্যাপতির পদের সংমিশ্রণ ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু সতীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত সূত্রগুলির সাহায্যে এই সমস্যার একপ্রকার মীমাংসা করা যায়; শেখর-কবিশেখরের ভণিতা-যুক্ত যে সমস্ত পদে সখীসাধনা বা চৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমধর্মের ছায়া আছে, সেই পদগুলি বাঙালী রায়শেখরের রচনা—পঞ্চদশ শতাব্দীর মৈথিল কবি বিদ্যাপতির রচনা হইতে পারে না। ইহাই প্রধান সূত্র। দ্বিতীয় সূত্র—ভাষার প্রমাণ। যে সমস্ত পদের ব্রজবুলিতে তৎসম শব্দ বেশী, ভাষা ও বাক্‌রীতিতে মৈথিলী ভাষার বিশেষ কোন চিহ্ন নাই, যাহাতে বাংলা ভাষার মিশাল প্রবল, তাহাও বিদ্যাপতির রচনা হইতে পারে না—সেরূপ পদ রঘুনন্দন-শিষ্য রায়শেখরের রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে অন্যায় হইবে না।[৯৭] কিন্তু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এ সমস্ত প্রমাণ গ্রাহ্য না করিয়া "বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহের জন্য এতই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি কেবল 'শেখর' ও 'কবিশেখর' ভণিতায় পদসংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই:—তিনি অপ্রণিধানে অথবা জবরদস্তী করিয়া 'রায়শেখর' ও 'কবিশেখর রায়' ভণিতায় কয়েকটি পদও বিদ্যাপতির পদাবলী ভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন।"[৯৮] সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করিলাম যে, 'কবিশেখর' ভণিতার কিছু কিছু পদ বিদ্যাপতির হইতে পারে,

---

৯৬ পদকল্পতরু, ৫ম, পৃঃ ৩৩

৯৭ সতীশচন্দ্র 'সোনার গৌরাঙ্গ' মাসিক পত্রিকায় এ বিষয়ে 'বিদ্যাপতি-বিচার' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে ও যুক্তিসঙ্গত রীতিতে আলোচনা করিয়াছেন।

৯৮ পদকল্পতরু, ৫ম, পৃঃ ৩৫ দ্রষ্টব্য। কিন্তু ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তও আছে। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় 'বৈষ্ণবপদাবলী'তে শেখর ভণিতাযুক্ত বিদ্যাপতির সুপ্রসিদ্ধ পদসমূহকেও রায়শেখরের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। যেমন—বিদ্যাপতির 'সখি হামারি দুখক নহি ওর' পদটি তিনি রায়শেখরের রচনা বলিয়া ধরিয়াছেন।

কিন্তু রায়শেখর ও কবিশেখর রায় ভণিতা বিদ্যাপতির নহে, বাঙালী কবি রায়শেখরের ভণিতা। যাহা হউক নিম্নে সংক্ষেপে রায়শেখরের কবিত্ব সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলা যাইতেছে।

রায়শেখর তিন শ্রেণীর পদ রচনা করিয়াছিলেন—গোবিন্দদাসের অনুকরণে ব্রজবুলি, সরল বাংলায় রচিত বিবৃতিমূলক পদ এবং চটুলছন্দে লোচন দাসের 'ধামালি' অনুসরণে লেখা হালকা ভাষার পদ। রায়শেখর ব্রজবুলির পদে গোবিন্দদাসের আদর্শ অনুসরণ করিয়া ছন্দের চাতুর্য, শব্দালঙ্কারের আড়ম্বর ও শ্রুতিসুখকর ধ্বনিব্যঞ্জনার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। দুই-এক স্থলের রচনারীতি বিশেষ প্রশংসনীয় তাহাতে দ্বিমত নাই। যেমন—অভিসারিকা রাধার বর্ণনা :

কাজর-রুচিহর রয়নি বিশালা।
তছু পর অভিসার করু ব্রজবালা॥
ঘর সঞে নিকসয়ে বৈছন চোর।
নিশবদ পদগতি চললহি থোর॥
উনমত চিত অতি আরতি বিথার।
গুরুয়া নিতম্ব নবযৌবন ভার॥

এখানে 'কাজররুচিহর' বিশাল রজনী, চোরের মতো নিঃশব্দে রাধার ঘরের বাহির হওয়া এবং তাঁহার উন্মত্ত চিত্তের ব্যাকুল আর্তিই তাঁহাকে দুর্গম পথে অভিসারে পাঠাইয়াছে। গোবিন্দদাসের অনুকরণে তিনি বর্ষা-রজনীর যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার ধ্বনিঝঙ্কার প্রশংসার বিষয় :

গগনে অবঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই॥
সজনি আজু দুরদিন ভেল।
কান্ত হামারি নিতান্ত আগুসারি
সংকেত কুঞ্জহি গেল॥
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম মোহনে একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর॥

কিংবা—

ঝর ঝর বরিখে সঘনে জলধারা।
দশদিশ সবহুঁ ভেল আন্ধিয়ারা॥
* * * *
ঝলকই দামিনি দহনসমান।
ঝন ঝন শবদ কুলিশ ঝন ঝান॥

এই সমস্ত বর্ণনায় তিনি যথাসাধ্য শব্দঝঙ্কার ও চিত্ররূপের সাহায্যে গোবিন্দ-দাসের শিল্পরীতি অনুসরণ করিয়াছেন। গোষ্ঠবর্ণনায় তিনি যে রাখালী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার বাস্তব মাধুর্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

আওয়ে ছি- দামচন্দ্র
রঙ্গিয়া পাগুড়ি মাথে।
সুবলার্জ্জুন অংশুমান
দাম-বসুদাম সাথে॥
কটি কাছনি রঙ্গিম ধটি
বেণুবর নাম কাঁধে।
জিতি-কুঞ্জর গতি মন্থর
ভায়া ভায়া বলি ডাকে॥
গলে লম্বিত গুঞ্জাবলি
ভুজে অঙ্গদ বালা।
গো-ছান্দন ডুরি কান্ধেতে
কানে কুণ্ডল খেলা॥
স্ফুট চম্পক- দল নিন্দিত
উজ্জ্বল তনু শোভা।
পদপঙ্কজে নূপুর বাজে
শেখর মনোলোভা॥

এই বর্ণনায় যেমন ক্লাসিকাল শব্দসন্নিবেশ ('স্ফুটচম্পক দল নিন্দিত উজ্জ্বল তনুশোভা') হইয়াছে, তেমনি গোষ্ঠবালকদের বাস্তব কলরব ('জিতিকুঞ্জর গতিমন্থর ভায়া ভায়া বলি ডাকে') যেন আমাদের যুগেও আসিয়া পৌঁছায়। অবশ্য কবি কোন কোন স্থলে গোবিন্দদাসের শব্দালঙ্কারের কৃত্রিম নকল করিতে গিয়া কাব্যরস মাটি করিয়া ফেলিয়াছেন :

কুন্দনকনক- কমলরুচি নিন্দিত
সুরধুনী তীর বিহারী।

কুঞ্চিত কণ্ঠ- কলিত কুসুমাকুল
কুলকামিনী মনোহারী ॥
জয় জয় জগজীবন যশোধীর।
জাহ্নবী যমুনা যেন জলধর বরিখন
ঐছে নয়নে বহে নীর ॥

এখানে যে কাব্যপ্রকরণ অনুসৃত হইয়াছে একটু বাজাইলেই তাহার কৃত্রিমতা ধরা পড়িবে। অবশ্য কয়েক স্থলে সরল রচনা বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। রাধার আক্ষেপানুরাগের দুই একটি পদের সরল নিরাভরণ প্রকাশ-ভঙ্গিমা প্রশংসা দাবি করিতে পারে :

সখি, কেমনে দেখাব মুখ।
গোপত পিরীতি বেকত করয়ে
এ বড় মরম দুখ ॥

নরহরি সরকার ঠাকুরের লঘু ভঙ্গীতে রচিত ধামালির প্রভাবে কবি যে দু-একটি পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার বৈচিত্র্যও চিত্তাকর্ষী হইয়াছে :

ছন্দ ধরি বঙ্ক করি
কহে কুন্দলতা।
ভানুর কোলে কানু খেলে
এই যে ভাল কথা ॥
নষ্ট লোকে দুষ্ট কথা
কহিল বুড়ীর কানে।
রুষ্ট হৈয়া দুষ্ট মাগী
আইলা পূজার স্থানে ॥

'দণ্ডাত্মিকা পদে' কবি দীর্ঘ বর্ণনায় রাধাকৃষ্ণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী কালে বৈষ্ণব কবিসমাজে এই দণ্ডাত্মিকা পদাবলীর খুব জনপ্রিয়তা হইয়াছিল, অনেক কবিই ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। রায়শেখরের দণ্ডাত্মিকা পদে রাধাকৃষ্ণের প্রতিদণ্ডের যে লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার বাস্তবতা মন্দ নহে ; কিন্তু অতিশয় পরিচিত বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতের জন্য ভাবের সূক্ষ্মতা কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ স্থূল হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার ব্রজবুলির পদগুলিতে গোবিন্দদাসের অনুকরণে যে কৃত্রিম কাব্যকলা অনুসৃত হইয়াছে, তাহা অনেক সময় মাঝারি শ্রেণীরও নিম্নে নামিয়া গিয়াছে। বরং সহজ বাংলায় রচিত পদগুলি কিঞ্চিৎ পরিমাণে

চিত্তাকর্ষী হইয়াছে। কৃষ্ণবলরামকে গোষ্ঠে বিদায় দিতে গিয়া যশোদার মনোভাবটি সাদা কথায় সুন্দর ফুটিয়াছে :

সকালে আসিহ গোপাল ধেনুগণ লইয়া।
অভাগিনি রৈল তোর চাঁদমুখ চাইয়া॥
থাকিয়া শ্রীদামের কাছে চরাইও বাছুরি।
জোরে শিঙ্গা রব দিও পরাণে না মরি॥

রায়শেখরের প্রতিভা বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের ধারে-কাছে যাইতে না পারিলেও সপ্তদশ শতাব্দীর পদকারদের মধ্যে তাঁহার বিশিষ্ট স্থান স্বীকার করিতে হইবে। জগদ্বন্ধু ভদ্র তাঁহাকে গোবিন্দদাস-জ্ঞানদাসের পরেই স্থান দিয়াছেন। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তো সোচ্ছ্বাসে বলিয়াই ফেলিয়াছেন, "তিনি ব্রজবুলি পদ রচনায় প্রায় বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের ন্যায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।···ইঁহার রচিত অনেক ব্রজবুলির পদ সর্বাংশে গোবিন্দদাসের, এমন কি, বিদ্যাপতির পদের সহিত তুলনার যোগ্য" (পদকল্প, ৫-২)। কিন্তু ভাবাবেগ ছাড়িয়া যুক্তির দ্বারা বিচার করিলে তাঁহাকে এতটা প্রতিভাবান বলিয়া মনে হইবে না।

এই প্রসঙ্গে কবিশেখরের 'গোপালবিজয়' সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাইতে পারে। এই কবিশেখর এবং পদাবলীর রায়শেখর-কবিশেখর এক ব্যক্তি নহেন বলিয়াই অনুমিত হইতেছে। কারণ 'গোপালবিজয়ে'র কবির প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন, উপাধি ছিল কবিশেখর; কবিশেখর তাঁহার আর একটি নামও হইতে পারে। কিন্তু পদাবলীর রায়শেখর কোন কোন স্থলে ভণিতায় রায়শেখরের স্থলে কবিশেখর ভণিতা ব্যবহার করিলেও কোথাও দৈবকীনন্দন উল্লেখ করেন নাই। 'ভক্তিরত্নাকরে'ও সেরূপ কোন নির্দেশ নাই। ডঃ সুকুমার সেন 'গোপালবিজয়ে'র কবিশেখর ও পদাবলীর রায়শেখরকে একই ব্যক্তি বলিয়াছেন।[৯৯] জগদ্বন্ধু ভদ্র সর্বপ্রথম 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র ভূমিকায় কবিশেখরের 'গোপালবিজয়ে'র উল্লেখ করেন। কিন্তু সতীশচন্দ্র রায় তাহা মানিয়া লইতে পারেন নাই। তিনি এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "জগদ্বন্ধু বাবুর উল্লিখিত 'গোপালবিজয়' গ্রন্থ আমরা দেখি নাই। সুতরাং উহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিব না।[১০০] কিন্তু কলিকাতা

---

৯৯ ডঃ সেন—বা. সা. ইতি.—১ম (১ম সংস্করণ, পৃ. ৪১৪)

১০০ পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ. ২১৯

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি বিভাগে এই কাব্যের একখানি প্রায় পুরা পুঁথি (পুঁথি সংখ্যা—১৬৩) আছে, খণ্ডিত পুঁথিও দুর্লভ নহে। ইহাতে কবিশেখর উপাধিক দৈবকীনন্দন ভাগবতের কিয়দংশ অবলম্বনে (কৃষ্ণের মথুরা গমনের পূর্বপর্যন্ত কাহিনী) এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহার ভাষাভঙ্গিমা ও বর্ণনীয় বিষয় অনেকটা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো। তাই কৃষ্ণলীলাকাহিনীর এই কবি সম্ভবতঃ পদাবলীর রায়শেখরের পূর্ববর্তী অন্য কোন কবি হইবেন।

রায়বসন্ত ॥

গোবিন্দদাসের বান্ধব ও নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য রায়বসন্ত বা বসন্তরায় ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মিয়াছিলেন। কারণ গোবিন্দদাস একপদে তাঁহাকে 'ভুলল যাহে দ্বিজ বসন্ত' বলিয়াছেন। সুতরাং ইনি যে রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্তরায় নহেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।[১০১] 'ভক্তিরত্নাকরে' তাঁহার সম্বন্ধে যে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা হইতে মনে হয়, এই ব্রাহ্মণ কবি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। গোবিন্দদাসের সঙ্গে তাঁহার এতদূর ঘনিষ্ঠতা ছিল যে, কবিরাজ বন্ধু রায়বসন্তের নাম জড়াইয়া ব্রজবুলিতে তিনটি পদ লিখিয়াছিলেন। শেষ জীবনে রায়বসন্ত বৃন্দাবনে বাস করেন। তাঁহার মোট ৫১টি পদ 'পদকল্পতরু'তে সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে ২৯টি পদ ব্রজবুলিতে রচিত। দু'একটি পদে তিনি 'দাসবসন্ত' ভণিতাও ব্যবহার করিয়াছেন।

বাঙলাদেশে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ বসন্তরায়ের কবিত্ব লইয়া সবিস্তারে আলোচনা করেন। ১২৮৯ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় 'বসন্তরায়' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি এই অনাদৃত কবিকে বিদ্যাপতির অপেক্ষাও সম্মানীয় স্থান দান করিয়াছিলেন। একথা অবশ্য সত্য যে, রায়বসন্ত ব্রজবুলি ও বাংলা পদে সরল মনের কথাকে নিরাভরণভাবে বলিলেও তাহা সহানুভূতিপ্রবণ এক মন

১০১ কিন্তু বাঙলাদেশের অনেকের বিশ্বাস ইনি রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্তরায়। আধুনিক যুগে প্রতাপাদিত্য-বিষয়ক নাটকে সেইভাবেই ইঁহাকে চিত্রিত করা হইয়াছে। গোবিন্দদাসের উক্তি অনুসারে এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। কিছুকাল পূর্বে কেহ কেহ আবার বসন্তরায়কে বিদ্যাপতি বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় "বসন্তরায়" প্রবন্ধে দেখাইয়া দেন যে, বিদ্যাপতির ভাব ও ভাষার সঙ্গে বসন্তরায়ের কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। (দ্রষ্টব্য—রবীন্দ্ররচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২১)।

হইতে অন্যমনে সহজেই প্রবেশ করিতে পারে—কারণ কবির অনলঙ্কৃত ভাষারীতি ও সহজ আবেগ যে-কোন চিত্তকেই সরস করিয়া তোলে। তিনি যেন কোথাও রং রস ছড়াইবেন না বলিয়া পণ করিয়াছেন। এখানে এই-রূপ দু' একটি সহজ রসের পদ উল্লিখিত হইতেছে।

১। শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা :

সজনি কি হেরলুঁ নাগর কান।
কানড় কুসুমতুল নীলমণি ঢল ঢল
চরণ চিকণ অনুপাম॥
নবীন নীরধর কিয়ে মরকত বর
কি মোহন দারুণ ভাণ।
লাখ লাখ যুবতী দিবস নিশি আরতি
হেরই নহ পরিমাণ॥

২। রাস :

রাসমণ্ডল মাঝে বিলসই
সঙ্গে শত শত রঙ্গিণী।
রসিক নাগর সঙ্গে নাচত
রণিত নূপুর কিঙ্কিনী॥

৩। আক্ষেপানুরাগে রাধার উক্তি :

অহে নাথ না বোল এমন।
সহিতে না পারি হেন করুণ বচন॥
শপথ স্বরূপ কহি তুমি তনুমন।
তুমি সে নয়নমণি জীবনের জীবন॥
না দেখিলে মবিয়ে কেমন তনু ভীন।
পরাণে মরয়ে যেন জল বিনু মীন॥
তোমার পিরীতে আমি হইলাম ঋণী।
মূলে বিকাইলুঁ আর কি দিব নিছনি॥

৪। আক্ষেপানুরাগের আর একটি পদ—

প্রাণনাথ কেমন করিব আমি।
তোমা বিনে মন করে উচাটন
কে জানে কেমন তুমি॥
না দেখি নয়ন ঝুরে অনুখন
দেখিতে তোমায় দেখি।

সোঙরণ মন মূরছিত হেন
মুদিয়া রহয়ে আঁখি ॥১০২

কবির ভাষাভঙ্গিমা কৃত্রিম কাব্যকলা বর্জিত, মনোভঙ্গি আবেগবর্জিত। অধিকাংশ স্থলে তিনি দুই চারিটি উপমা-রূপকের সাহায্যে আভাসে-ইঙ্গিতে মনোভাব ফুটাইতে পারিয়াছেন।

পরশ লাগিয়া মোর হিয়া কাঁপে থরহর
নিমিষের ডরে আঁখি ঝুরে।

কিংবা

তোমার মিলন মোর পুণ্যপুঞ্জ রাশি।
না দেখিলে নিমিখে শতেক যুগ বাসি ॥

কিংবা বংশীনিনাদে ব্যাকুল রাধার উক্তি :

বাঁশরি নিসান শুনিতে পরাণ
নিকাশ হইতে চায়।
শিথিল সকল ভেল কলেবর
মন মুরছই তার ॥

এই সমস্ত পংক্তিগুলিতে কবিকৃতিত্ব সহজেই প্রতিভাত হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে কবিকে বিদ্যাপতিরও উপরে স্থান দিয়াছিলেন তাহা মানিয়া লওয়া কঠিন। রায়বসন্ত সহজ কথা ও সহজ রসের কবি। তাঁহার পদাবলীর ছন্দ অলঙ্কার, শব্দঝঙ্কার অল্প, ভাবাবেগ উচ্ছ্বাস—এ সবও অতিসঙ্কুচিত। রবীন্দ্রনাথ কবির

আলো ধনি, সুন্দরি, কি আর বলিব।
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব ॥

পদটি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, "এমন প্রশান্ত উদার গম্ভীর প্রেম বিদ্যাপতির কোন পদে প্রকাশ হইয়াছে কিনা সন্দেহ।"১০৩ 'প্রাণনাথ, কেমনে করিব আমি'—কবির এই উক্তির সঙ্গে বিদ্যাপতির 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখনু'র

---

১০২ এই পদটি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "ইহার প্রথম দুটি ছত্রে ভাবের অধীরতা, ভাষার বাঁধ ভাঙ্গিবার জন্ম ভাবের আবেগ কি চমৎকার প্রকাশ পাইতেছে! আমার প্রাণ তোমাকে লইয়া কি-যে করিতে চায় কিছু বুঝিতে পারি না। এত দেখিলাম, এত পাইলাম, তবু প্রাণ আজও বলিতেছে, 'প্রাণনাথ কেমন করিব আমি।"

(রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ২য়, পৃ. ১২৯)

১০৩ ঐ

তুলনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বিদ্যাপতি সমস্ত কবিতাটিতে যাহা বলিয়াছেন, ইহার এককথায় তাহার সমস্তটা বলা হইয়াছে এবং তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধীরতা ইহাতে ব্যক্ত হইতেছে।" অবশ্য একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, 'প্রাণনাথ, কেমন করিব আমি' ছত্রটি চণ্ডীদাসের 'বঁধু, কি আর বলিব আমি'র প্রতিধ্বনি মাত্র। রবীন্দ্রনাথ রায়বসন্ত সম্বন্ধে এখানে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পদাবলীর চণ্ডীদাসেই অধিকতর প্রযোজ্য। দ্বিতীয়তঃ —ভাষা, অলঙ্কার, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য যদি কৃত্রিম বলিয়া নিন্দিত না হয়, ভাবাবেগ যদি ভাবাতিরেক বলিয়া বর্জিত না হয় তাহা হইলে বিদ্যাপতি চিরদিন রসিক চিত্তহর হইয়া থাকিবেন, এবং রায়বসন্তের স্থান নিশ্চয়ই তাঁহার অনেক নিম্নে হইবে। বনফুলের যেমন একটা অযত্নসম্ভূত সৌন্দর্য আছে, তেমনি রায়বসন্তের অযত্নচেষ্টাপ্রসূত সহজপ্রাণের পদগুলির স্বভাব-সৌন্দর্য আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করে। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ "ফুল্লমল্লিকা মালতীযূথীর" (গোবিন্দদাস) মালিকা ফেলিয়া নির্গন্ধ বনফুলের মালা কণ্ঠে ধরিতে চাহিবে না। যাহা হউক রায়বসন্ত সহজ স্বভাবকবিত্বে আধুনিক পাঠকেরও যে চিত্ত গভীরভাবে আকর্ষণ করিতে পারেন, তাহার প্রমাণ— স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

কবিরঞ্জন (দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বা ছোট বিদ্যাপতি)॥

বৈষ্ণব পদসাহিত্যে 'কবিরঞ্জন' ভণিতা আর একটি জটিল সমস্যা, যাহা লইয়া এখনও বাদপ্রতিবাদ শুনা যায়। সে যুগে এবং এযুগেও বৈষ্ণব সাহিত্যের পাঠক এবং গবেষকগণ কবিরঞ্জন ভণিতাকে বিদ্যাপতির অপর নাম বা উপাধি বলিয়া মনে করেন। সতীশচন্দ্র রায় 'পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত কবিরঞ্জন ভণিতার পাঁচটি পদকে বিদ্যাপতির রচনা বলিয়াই অনুমান করিয়াছেন—"পদকল্পতরু গ্রন্থে 'কবিরঞ্জন' ভণিতার যতগুলি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার সকলগুলির সহিতই বিদ্যাপতির রচনার সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে।"[১০৪] তাই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, "কবিরঞ্জন ভণিতার পদগুলি বিদ্যাপতি রচিত বলিয়াই বৈষ্ণবসাহিত্যে প্রসিদ্ধি আছে। বাঙ্গালী পদকর্তাদিগের মধ্যে 'কবিরঞ্জন' উপাধির কোন পদকর্তা হইয়াছিলেন

১০৪ পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ. ৩০

বলিয়া জানা যায় নাই।"[১০৫] প্রমাণ স্বরূপ তিনি 'পদকল্পতরুর' ২৩৯০ সংখ্যক পদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই পদে আছে যে, সুরধুনীতীরে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলন হইয়াছিল, উভয়ে রসতত্ত্ব লইয়া অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলেন।[১০৬] কিন্তু পরে অনেকে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, এই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস লোকপ্রসিদ্ধ পদাবলীর বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস হইতে পারেন না। কারণ এইপদে যে সহজিয়া রসতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং রাগানুগা সাধনার ধারা বিশ্লেষিত হইয়াছে, তাহা মৈথিল বিদ্যাপতি ও পদাবলীর চণ্ডীদাসের অনেক পরবর্তী বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ধারা অনুসরণে পরিকল্পিত। মনে হয়, ঐ পথের কোন কবি গূঢ় রসতত্ত্বের আদর্শ বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন। 'পদকল্পতরু'তে কবিরঞ্জন ভণিতায় যে সাতটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে,[১০৭] তাহার মধ্যে দুইটি পদ ('উদসল কুন্তলভারা। মুরতি শিঙ্গার লখিমি অবতারা॥' এবং 'কি কহব রে সখি আজুক বিচার। সো সুপুরুখ মঝু করল শিঙ্গার॥') বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া সর্বত্র সুপরিচিত। ভাষাভঙ্গিমা ও বর্ণনারীতিও বিদ্যাপতিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। একটি পদ ('আরে সখি কবে হাম ব্রজে জায়ব') কদাচ বিদ্যাপতির রচনা হইতে পারে না। কারণ ইহাতে কৃষ্ণের যে সমস্ত সখাসখীর নাম আছে, তাহা বিদ্যাপতির অনেক পরে বৃন্দাবনের গোস্বামী সম্প্রদায়, বিশেষতঃ রূপগোস্বামী পরিকল্পিত। দুইটি পদ

১০৫ ঐ

১০৬ উক্ত পদের কয়েক ছত্র :

পুছত চণ্ডী- দাস কবিরঞ্জনে
শুনতহি রূপনরাণ।
কহ বিদ্যাপতি ইহ রস কারণ
লছিমা পদ করি ধ্যান॥

১০৭ কবিরঞ্জনের সাতটি পদ (২১২, ২৫৬, ৬৮০, ৯৬৪, ১০৭৮, ১১০৪, ১৭৬০) 'পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত হইয়াছে :—

(১) কি পুছসি রে সখি কানুক নেহ, (২) পুরুখ রতন হেরি মন ভেল ভোর, (৩) উদসল কুন্তলভারা, (৪) কি কব রাইয়ের গুণের কথা, (৫) আরে সখি কবে হম ব্রজে জায়ব (ইহাতে কৃষ্ণের সখাসখীর নাম আছে), (৬) আর কবে হবে মোর শুভক্ষণদীন, (৭) কি কহব রে সখি আজুক বিচার।

('কি কব রাইয়ের গুণের কথা' এবং 'আর কবে হবে মোর শুভখন দিন') বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় রচিত বলিয়া এই পদটিকেও বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। অবশিষ্ট দুইটি পদ ('কি পুছসি রে সখি কানুক নেহ' এবং 'পুরুখরতন হেরি মন ভেল ভোর') বিদ্যাপতির হইলেও হইতে পারে। সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নহে যে, কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির উপাধি হউক আর নাই হউক, বাঙলাদেশে পরবর্তী কালে উক্ত নাম বা উপাধিযুক্ত কোন কবির আবির্ভাব হইয়াছিল।[১০৮] বিদ্যাপতির ভণিতায় যে সমস্ত বাংলা পদ প্রচলিত আছে, তাহা কি মৈথিল বিদ্যাপতির রচনা হইতে পারে ?

শুনলো রাজার ঝি
তোরে কহিতে আসিয়াছি॥
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি
এ কাজ করিলা কি॥[১০৯]

ইহাও বিদ্যাপতির ভণিতায় চলিতেছে। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি মাতৃভাষা ছাড়িয়া বাংলাপদ লিখিয়াছিলেন এরূপ কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং এরূপ অনুমান বাধ্য হইয়াই করিতে হয় যে, একাধিক চণ্ডীদাসের মতো বোধহয় একাধিক বিদ্যাপতিও ছিলেন। তন্মধ্যে একজন খুব সম্ভব বাঙালী কবি, যিনি বিদ্যাপতির মতো কবিরঞ্জন উপাধিও ধারণ করিয়া ব্রজবুলি ও বাংলা-পদ লিখিয়াছিলেন—বোধ হয় এই বাঙালী বিদ্যাপতি রাগানুগা মার্গের

---

১০৮ নানা প্রমাণদৃষ্টে তাই ডঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন, "So we are forced to assume the existence of a second Vidyapati who was a Bengali Vaisnava of the school of Caitanya-deva." HBBL., p. 144

১০৯ বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত আরও কয়েকটি বাংলা পদের কয়েক ছত্র :—

(১) একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
আর দিন নাম ধরি মুরলি বাজায়॥
(২) কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয়॥
(৩) যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখিয় মোর নাম দুই চারি॥

এই সমস্ত পদ বিদ্যাপতির ভণিতায় 'পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা নিশ্চয় কোন বাঙালী কবির রচনা। হয়তো এই কবি ইচ্ছা করিয়াই বিদ্যাপতির ভণিতা ব্যবহার করিতেন।

পথিক ছিলেন। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় রাম-গোপালদাসের 'রসকল্পবল্লী' ও 'শাখানির্ণয়' হইতে প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন যে, শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের কবিরঞ্জন বলিয়া এক শিষ্য ছিলেন, যিনি বিদ্যাপতির অনুকরণে পদ লিখিতেন। তাই তিনি এই দুই পুস্তিকায় 'ছোট বিদ্যাপতি' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন—"ছোট বিদ্যাপতি বলিয়া যাহার খেয়াতি।"

এই কবিরঞ্জন যে শ্রীখণ্ডের নেতা রঘুনন্দনের শিষ্য ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ নানা পদে তিনি সে কথা উল্লেখ করিয়াছেন, "কবি-রঞ্জন ভণ, ঐছে নিবেদন, রঘুনন্দনপদদ্বন্দ্বে"। সুতরাং ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় অনুমান করেন যে, এই কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতি একটি পদে হুসেন শাহের পুত্র নুসরৎ শাহের উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত একটি পদে আছে :

বিদ্যাপতি ভাণি   বিশেষ অনুমানি
সুলতান নসির মধুপ ভুলে কমলাবাণী॥

কিন্তু এ বিদ্যাপতি কদাচ বাঙলার কবিরঞ্জন হইতে পারেন না। কারণ রঘুনন্দনের শিষ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন ; কিন্তু হুসেন শাহের পুত্র নুসরৎশাহ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ব্যক্তি। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অনুমান সত্য হইলে বিদ্যাপতি-কবিরঞ্জন সমস্যা অনেকটা সরল হইয়া আসিবে। তাঁহার মতে এই কবির নাম কবিরঞ্জন, ইনি ছোট বিদ্যাপতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বিদ্যাপতি ভণিতায় যত বাংলাপদ পাওয়া যায়, তাহা ইঁহারই রচনা। ইঁহার কিছু কিছু ব্রজবুলির পদও মিথিলার বিদ্যাপতি ভণিতায় বাংলা পদসঙ্কলনগ্রন্থে চলিয়া গিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে দেখা যাইবে যে, সুরধুনী তীরে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎকার ও রসতত্ত্ব লইয়া আলোচনা নিতান্ত কল্পিত ব্যাপার নাও হইতে পারে। কারণ সপ্তদশ শতাব্দীতে কবিরঞ্জন ও সহজিয়া চণ্ডীদাসের দেখাসাক্ষাৎ এবং রাগানুগা রসতত্ত্ব আলোচনা অসম্ভব ব্যাপার নহে। তবে এবিষয়ে এখনও পুরাপুরি তথ্য সন্ধান করা হয় নাই। একমাত্র রামগোপালদাসের 'রসকল্প-বল্লী' ও 'শাখানির্ণয়' বাদ দিলে বৈষ্ণব সমাজতত্ত্ব বিষয়ক অন্য কোন গ্রন্থে এরূপ কোন উল্লেখ নাই। সত্যকথা বলিতে কি, রায়শেখর, কবিশেখর, কবিরঞ্জন ও বিদ্যাপতির পদের গ্রন্থিমোচন খুব একটা সহজ ব্যাপার নহে এবং

এবিষয়ে চূড়ান্তভাবে 'রায়' দেওয়াও সম্ভব নহে। কারণ মিথিলার বিদ্যাপতি 'কবিরঞ্জন' ভণিতায় পদ লিখিতেন, তাহা বৈষ্ণব সাহিত্যিক মহলে একপ্রকার স্থির হইয়াছে। আবার রঘুনন্দন-শিষ্য কবিরঞ্জনও বিদ্যাপতি নামে অভিহিত হইতেন এবং মিথিলার বিদ্যাপতির আদর্শে পদ লিখিতেন। সুতরাং বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে কবিশেখর-রায়শেখর ও কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতির পদের গোলমাল হইয়া যাওয়াই সম্ভব। এখন কেহ কেহ মিথিলার বিদ্যাপতির অনেক উৎকৃষ্ট সুপরিচিত পদকে কবিশেখর বা কবিরঞ্জনের রচনা বলিতে চাহিতেছেন। বিদ্যাপতির সুবিখ্যাত পদ 'এ সখি হামারি দুখক নাহি ওর' এবং 'সখি কি পুছসি অনুভবি মোয়' নাকি মিথিলার কবির রচনা নহে, বাঙালী কবিরঞ্জন-কবিশেখরদের রচনা। এ বিষয়ে এখনও কেহ সুদৃঢ় প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই, যাহাতে উক্ত পদগুলির উপর বিদ্যাপতির দাবিদাওয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। বিশেষতঃ কবিরঞ্জন ও কবিশেখরের প্রতিভা আদৌ উচ্চ শ্রেণীর নহে। কবিরঞ্জন তো বিদ্যাপতির নকলের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং সেইজন্য 'ছোট বিদ্যাপতি' খেতাব লাভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আবিষ্কার অনুসারে উপস্থিত ক্ষেত্রে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন-শিষ্য বিদ্যাপতি নামে পরিচিত এক বাঙালী কবি মিথিলার বিদ্যাপতির অনুকরণে কিছু কিছু ব্রজবুলি এবং বাংলা পদ লিখিয়াছিলেন, তাহা না হইলে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত বাংলাপদের সমস্যা দূর করা যায় না। কিন্তু আরও তথ্য পাওয়া না গেলে এ বিষয়ে চূড়ান্ত কথা বলা যাইবে না।

কয়েকজন অপ্রধান পদকার ॥

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু বৈষ্ণব কবি বাংলা ও ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়া বৈষ্ণবপদ-সাহিত্যের কলেবর কত দূর বর্ধিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ 'পদকল্পতরু'—ইহাতে তিন হাজারেরও অধিক পদ স্থান পাইয়াছে, পদকারের সংখ্যা দেড় শতেরও অধিক। কিন্তু বিশালকায় পদরত্নমালা ও অসংখ্য পদকার সত্ত্বেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে উৎকৃষ্ট প্রতিভাধর বৈষ্ণব কবির সংখ্যা অতি অল্প। তন্মধ্যে যাঁহাদের পদে কিছু কবিত্ব ও বৈচিত্র্য

আছে, তাঁহাদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্তমান অনুচ্ছেদে আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর আরও কয়েকজন কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

গুণগত উৎকর্ষে এই কবিদের পদসমূহ নিতান্ত সাধারণ স্তরের বলিয়া ইঁহাদের জন্য দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ নাই যাহা হউক সংক্ষেপে ইঁহাদের সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা যাইতেছে।

১. **কবিবল্লভ ॥** বৈষ্ণব পদসাহিত্যে কবিবল্লভ, বল্লভদাস, বিদ্যাবল্লভ প্রভৃতি ভণিতায় কিছু কিছু পদ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কবিবল্লভ ভণিতায় 'পদকল্পতরু'তে মাত্র একটি পদ (৯৩৭) সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে পদটিতে তাঁহার ভণিতা আছে, তাহার গুরুত্ব বিবেচনায় এই কবি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা যাইতে পারে। সেই বিখ্যাত পদটি বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত :

সখি হে, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনু- রাগ বাখানিয়ে
অনুখন নৌতুন হোয় ॥১১০

এই পদটি বিদ্যাপতির সুপরিচিত পদ। সারদাচরণ মিত্র তাঁহার বিদ্যাপতির পদাবলীতে এই পদটিকে বিদ্যাপতির ভণিতায় মুদ্রিত করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মিথিলাতেও বিদ্যাপতির ভণিতায় এই পদটি পাইয়াছিলেন। সারদাচরণ বহরমপুর হইতে আনীত একখানি পুঁথিতে পদটিকে বিদ্যাপতির ভণিতাতেই পাইয়াছিলেন।[১১১] কিন্তু সতীশচন্দ্র রায় 'পদকল্পতরু'র ৫ম খণ্ডে এই পদটি বিদ্যাপতির রচিত কি না সে বিষয়ে সর্বপ্রথম সংশয় উত্থাপন করেন। তিনি রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে প্রেমের পরিণতি অনু-

---

১১০ 'পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত পাঠ এইরূপ। অন্যত্র ইহার নানা পাঠান্তর আছে।

১১১ "এই পদ এই আকারে শ্রীসারদাচরণ মিত্রের সঙ্কলনে প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি বহরমপুর হইতে আনীত একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে প্রাপ্ত হন। মিথিলায় এই পাঠ প্রচলিত আছে।" (নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি' সঙ্কলনের "পাঠনির্ণয়" অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য, পৃ. ২।৵০)

রাগ—এই পদটিতে এই তত্ত্বের প্রতিফলন দেখিতে পাইয়া[১১২] অনুমান করিয়াছেন যে, ইহা বিদ্যাপতির পরবর্তী কালে 'উজ্জ্বলনীলমণি'র আদর্শে রচিত হইয়াছিল। 'উজ্জ্বলে'র আদর্শেই 'অনুরাগ' তত্ত্বের পটভূমিকায় ও প্রভাবে কবিবল্লভ নামক কোন কবি ইহা রচনা করিয়া থাকিবেন। সতীশচন্দ্র মনে করেন, "এই পদটি সুন্দর ও প্রশংসনীয় হইলেও আমাদিগের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা হওয়া দূরে থাকুক, ইহা বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিদিগের শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়াও গণ্য হইতে পারে না।"[১১৩] ইতিপূর্বে আমরা অন্যত্র এই পদটি সম্বন্ধে আমাদের মতামত দিয়াছি, এখানে তাহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই।[১১৪] বস্তুতঃ সতীশচন্দ্রের মতামতের বিপক্ষে কোন মন্তব্য করা মুস্কিল, কারণ রসবোধের ক্ষেত্রে মানুষ বেপরোয়া। সুতরাং সতীশ-চন্দ্র রায় মহাশয়ের মতো বৈষ্ণব সাহিত্যের 'ঘুণ' যদি ঐ মন্তব্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সাধারণ রসিক পাঠক কি করিবেন? তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। যাঁহাকে এই পদের রস মন্থন করিয়া বুঝাইতে হয়, তাঁহাকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'মেঘদূত' ব্যাখ্যার মতো বলিতে ইচ্ছা করে, "দূর মূর্খ! তোর বৈষ্ণবপদাবলী বুঝিয়া কাজ নাই!" সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা-মৈথিল সাহিত্যে ইহার অনুরূপ দ্বিতীয় কোন পদ রচিত হয় নাই।[১১৫] বিশ্বের প্রেমভক্তিগীতিকার ইতিহাসেও ইহা একটি অচপল দীপশিখার মতো বিরাজ করিবে। অথচ ইহাকে সতীশচন্দ্র রায় উৎকৃষ্ট পদ বলিতে চাহেন নাই। তাই মনে হইতেছে, রসের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের অভিমত সভয়ে ত্যাগ করাই শ্রেয়। যাহা হউক সতীশচন্দ্রের মতে এই পদের প্রথম পংক্তিতে ব্যক্ত অনুরাগের তিলে তিলে নূতন হইবার ইঙ্গিতটি রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীল-

---

১১২ 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে অনুরাগ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:

সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্যতে॥

যে 'রাগ' নব নব রূপ ধারণ করিয়া সর্বদা অনুভূত প্রিয়জনকেও নব নব রূপে আস্বাদিত করায় তাহাকেই অনুরাগ বলে।

১১৩ পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ. ২৮

১১৪ লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'র ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, (পৃ. ৪৩১, পাদটীকা) দ্রষ্টব্য।

১১৫ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী'র ৫৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মণি'র ছায়াতলে বসিয়া রচিত। এবং "পরবর্তী কলিগুলিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ও রসশাস্ত্রের মত উপস্থাপিত হওয়ায় পদটি যে অনেক পূর্ববর্তী মৈথিল কবি বিদ্যাপতির রচনা নহে—কিন্তু শ্রীরূপ ও শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয়দিগের পরবর্তী কোন বঙ্গীয় কবির রচনা, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না।"[১১৬] অবশ্য সতীশচন্দ্রের এই মন্তব্যের মতো আমরা এতটা নিঃসন্দেহ নহি। কারণ রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' ধৃত "অনুরাগ" এবং এই পদে উল্লিখিত "অনুরাগের" মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। অনুরাগ অনুরক্তি প্রভৃতি শব্দ প্রেমপ্রীতি ও ঈশ্বরভক্তি অর্থে অনেক পূর্ব হইতেই ভারতীয় সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। শাণ্ডিল্যের 'ভক্তিসূত্র' ও নারদীয় 'ভক্তিসূত্রে' এই শব্দের প্রয়োগ সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সুতরাং বিদ্যাপতি বা রূপগোস্বামী—কেহই কোন নূতন মনগড়া শব্দ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে নূতন অর্থব্যঞ্জনা আরোপ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ ইহার পরবর্তী পংক্তিগুলিতে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে (সতীশ-চন্দ্রের মন্তব্য), তাহাও কোন গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি নহে। সতীশচন্দ্র 'পদকল্প-তরু'র ১ম খণ্ডে গোবিন্দদাসের ২৩৪ সংখ্যক পদ ('আধেক আধ আধদিঠি অঞ্চলে') ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই পদটিকে উহার সমধর্মী পদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সমধর্মিতা সতীশচন্দ্রের কল্পনাসৃষ্ট,—যথার্থ নহে। তিনি গোবিন্দদাসের উক্ত পদের শেষ কয় ছত্রের[১১৭] সঙ্গে এই পদের 'জনম অবধি হাম ওরূপ নেহারলুঁ নয়ন না তিরপিত ভেল' এই ছত্রের যে সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট যুক্তিসঙ্গত মনে হইতেছে না। সামান্য ভারসহ লূতাতন্তুর উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই পদটিকে কবিবল্লভ বলিয়া কোন এক অজ্ঞাত পরিচয় কবির রচনা বলিয়াছেন। যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে, উহা কবিবল্লভেরই রচনা, বিদ্যাপতির রচনা নহে, তাহা হইলে 'পদকল্পতরু'তে কবিবল্লভের আর কোন পদ স্থান পাইল না কেন ? অনেক

---

১১৬ পদকল্পতরু, ৫ম. পৃ. ২৯

১১৭ প্রেমবতি প্রেম- লাগি জিউ তেজত
চপল জীবনে মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে
রসবতিরস মরিযাদ॥

তৃতীয় শ্রেণীর কবির একাধিক পদ বৈষ্ণবদাস তাঁহার সঙ্কলনে স্থান দিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ একজন কবির দ্বিতীয় কোন পদ 'পদকল্পতরু'তে ঠাঁই পাইল না, ইহাও অল্প বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। অন্য কোন পদসঙ্কলনেও কবিবল্লভের কোন পদ সংগৃহীত হয় নাই।[১১৮] সুতরাং এই পদটি কবিবল্লভ নামক উত্তর-চৈতন্য যুগের কোন কবির রচনা হইতে পারে না, উত্তর-চৈতন্য যুগে ঐ নামে কোন পদকার ছিলেন কি না সন্দেহের বিষয়। শ্রীখণ্ডসম্প্রদায়-ভুক্ত কবিবল্লভ নামক এক কবি 'রসকদম্ব' শীর্ষক বৈষ্ণব রসতত্ত্ব সম্পর্কিত যে পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন, তিনিই নাকি ইহার রচয়িতা।[১১৯] তবে এরূপ অনুমানও অনুমান মাত্র। 'রসকদম্ব' একজন বিচক্ষণ কবির রচনা, কিন্তু আলোচ্য পদের বিস্ময়কর লিপিকৌশল, ব্যঞ্জনার গভীরতা ও রসের সূক্ষ্মতার অনুমাত্রও 'রসকদম্বে' খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং আমরা কবিবল্লভ নামক কোন পদকারের (যিনি উক্ত পদের রচয়িতা বলিয়া কোন কোন সমালোচকের দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছেন) পরিচয় সম্বন্ধে তথ্যের অভাব কল্পনার দ্বারা পুরাইয়া লইতে অক্ষম।

বৈষ্ণবসাহিত্যে বল্লভদাস, বিদ্যাবল্লভ, বল্লভ—প্রভৃতি আরও কয়েকজন পদকারের পদ পদসঙ্কলনে স্থান পাইয়াছে। তিনচারিজন বল্লভদাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ কেহ দৃঢ়নিশ্চয়।[১২০] বল্লভ, শ্রীবল্লভ, বল্লভচৌধুরী, শ্রীবল্লভ ঠাকুর, শ্রীবল্লভ মজুমদার ইত্যাদি ভণিতায় কয়েকটি বাংলা ও ব্রজবুলির পদ পাওয়া গিয়াছে। এগুলি এক, না একাধিক কবির রচনা, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। উপরন্তু 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র সঙ্কলক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, যিনি বল্লভ ভণিতায় পদ লিখিতেন, তিনিও বল্লভ ভণিতা ব্যবহার করিয়া গোলমাল আরও পাকাইয়া তুলিয়াছেন। পার্মার্থি বল্লভদাস ভণিতায় 'পদকল্পতরু'র ৯৭ সংখ্যক পদটি ('সুন্দরি তুহুঁ বড়ি হৃদয়-পাষাণ') যে-বল্লভের হউক, উহা যে বেশ কবিত্বময় তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

---

১১৮ Dr. S. K. Sen—HBBL, p. 163

১১৯ "We know of one Kavi-Vallabha, the author of the *Rasakadamba*, who was a very good poet......In all probability this Kavi-Vallabha was the author of the poem in question." HBBL, p. 164

১২০ Ibid, p. 159

'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'তে কিশোরী রাধার রূপ বর্ণনা বিষয়ক সুবিখ্যাত পদটি ('ক্ষণে ক্ষণে নয়নকোণ অনুসরই। ক্ষণে ক্ষণে বসনধূলি তনু ভরই') বিদ্যাবল্লভ ভণিতায় গৃহীত হইয়াছে। আবার এই পদটি ঈষৎ পরিবর্তনসহ 'পদকল্পতরু'তে বিদ্যাপতির ভণিতায় স্থান পাইয়াছে। সুতরাং কোন একটি পদে কোন নূতন কবির ভণিতা দেখিলেই তাহাকে প্রকৃত নূতন কোন কবির রচনা বলিয়া সব সময়ে গ্রহণ করা যায় না। বৈষ্ণব পদসঙ্কলনগুলিতে ভণিতাগুলি যে সর্বদা বিশুদ্ধ তাহাও বলা যুক্তিযুক্ত নহে। সুতরাং একটি মাত্র পদের সংশয়জনক ভণিতার দ্বারা একজন পৃথক কবির অস্তিত্ব প্রমাণ করা দুরূহ।

২. গোপালদাস॥ গোপালদাস বা রামগোপালদাস 'রাধাকৃষ্ণ-রসকল্পবল্লী' (সংক্ষেপে 'রসকল্পবল্লী') নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া নিজেকে বৈষ্ণবপদকর্তা নামে পরিচায়িত করিয়াছেন। ১৫৯৫ শকে বা ১৬৭৩ খ্রীঃ অব্দে কবি রসতত্ত্ববিষয়ক এই পুঁথিতে অন্যান্য কবির সঙ্গে নিজেরও কয়েকটি বাংলা ও ব্রজবুলির পদ উল্লেখ করিয়াছেন। রামগোপাল শ্রীখণ্ডের বৈদ্য-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। রঘুনন্দনের শিষ্য রতিপতি ঠাকুর কবির গুরু। কবির পুত্র পীতাম্বরদাস 'রসমঞ্জরী' শীর্ষক যে বৈষ্ণবতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, তাহাতেও তিনি পিতার পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, 'রসকল্পবল্লী'তে রামগোপালদাসের ভণিতায় যে ছয়টি ব্রজবুলির পদ আছে তন্মধ্যে দুইটি গোপালদাসের ভণিতায় 'পদকল্পতরু'তে[১২১] (১০৫২ ও ১০৭৬) গৃহীত

১২১ (১) কালিয় দমন জগতে তুয়া ঘোষই
সহচরি শুনইতে কানে।
(২) মধু পদ দংশল মদনভুজঙ্গ।
গরলহি ডুবল অবশ ভেল অঙ্গ॥

এই দুইটি পদ 'পদকল্পতরু'তে গোবিন্দদাসের ভণিতায় আছে। প্রথম পদটি 'পদামৃত সমুদ্রে', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৩৪ সংখ্যক পুঁথি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪৪১ ও ২৪৫৭ সংখ্যক পুঁথিতেও গোবিন্দদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় পদটিও 'পদামৃত সমুদ্রে' এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইখানি পুঁথিতে (২৯৮৮, ২৫৮৮) গোবিন্দদাসের ভণিতায় উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এই পদ দুটিতে 'রসকল্পবল্লী'তে গোপালদাসের ভণিতা থাকিলেও তাহা গ্রাহ্য নহে।

হইয়াছে। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত 'ভাল হইল আরে বন্ধু আইলা সকালে' এবং 'সই জানি কুদিন সুদিন ভেল' পদ দুইটিও কবির পুত্র পীতাম্বর দাস 'রসমঞ্জরী'তে পিতার রচনা বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার কারণ কি? পিতা-পুত্র শ্রীখণ্ডের বৈদ্যসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তাঁহারা গোবিন্দদাস ও চণ্ডীদাসের পদ আত্মসাৎ করিবেন, ইহাও মানিয়া লইতে সঙ্কোচ বোধ হয়। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহা বিচার করিতে গিয়া ফাঁপরে পড়িয়াছেন। সহজ বুদ্ধিতে ইহাকে লিপিচৌর্য (plagiarism) বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। দীনেশচন্দ্র সেন তো ইহাকে চৌর্যাপরাধই বলিয়াছেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংশয় প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছেন, "কাহার পদ কাহার নামে চলিয়া গিয়াছে? গোপালদাস চণ্ডীদাসের পদের কিছু অদলবদল করিয়াছেন, না গোপালদাসের পদ কেহ জুড়িয়া তাড়িয়া চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়া দিয়াছেন? এবিষয়ে কোনরূপ মন্তব্য দেওয়া বড় শক্ত।"[১২২] কিন্তু সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া বলা যাইতে পারে, পদগুলি যখন সর্বত্র গোবিন্দদাস এবং চণ্ডীদাসের ভণিতায় মিলিতেছে, তখন গোপালদাস উহার রচয়িতা নহেন—ইহা একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্ত। 'রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী' ও 'রসমঞ্জরী'তে ঐ পদগুলি গোপালদাসের ভণিতায় কি করিয়া উদ্ধৃত হইল সে প্রশ্ন বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর। সে যাহা হউক 'পদকল্পতরু'তে গোপালদাসের ভণিতায় যে পদগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাদের কাব্যসৌন্দর্য এমন কিছু অভূতপূর্ব নহে।

৩. **ঘনশ্যামদাস**॥ গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র, দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যামদাস সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ব্রজবুলির প্রতিভাবান পদকর্তা বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি পিতামহের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই পদরচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা দিব্যসিংহও দুই চারিটি পদ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি তেমন উল্লেখ-

---

১২২ 'বীরভূমি বিবরণ' (৩য়) দ্রষ্টব্য। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় তাঁহার সঙ্কলিত 'বৈষ্ণব পদাবলী'তে উনিশটি পদ গোপালদাসের ভণিতায় উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে 'থির বিজুরী বরণ গৌরী পেখলুঁ ঘাটের কূলে' (পৃ. ৭৭২) এবং 'চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে পুলক যৌবন ভার' (পৃ. ৭৭৬) পদ দুইটি সর্বত্র চণ্ডীদাসের ভণিতায় উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া গোপালদাস পদদ্বয়ের রচনাকার নহেন তাহা একরূপ প্রমাণিত সত্য।

যোগ্য নহে। এই দিক দিয়া ঘনশ্যামদাস পিতামহের নিকট হইতে প্রতিভার উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। 'পদকল্পতরু'তে ঘনশ্যাম ভণিতায় ৪২টি পদ আছে, তন্মধ্যে কিছু বাংলা পদ ছাড়িয়া দিলে অধিকাংশই ব্রজবুলিতে রচিত। 'পদকল্পতরু' ছাড়াও 'পদরত্নাকর', 'পদরসসার' প্রভৃতি সঙ্কলনে আরও ১৮টি ব্রজবুলির পদ তাঁহার রচনা বলিয়া মনে হয়। তিনি 'গোবিন্দরতি-মঞ্জরী' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখনও ইহা মুদ্রিত হয় নাই।

ঘনশ্যামদাসের পদ লইয়াও কিছু কিছু গোলমাল হইয়াছে। কারণ 'ভক্তিরত্নাকরে'র নরহরি চক্রবর্তী ঘনশ্যামদাস ভণিতায় অনেক পদ লিখিয়াছিলেন, আবার নরহরি নামও কোন কোন ভণিতায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার পদের সঙ্গে চৈতন্য-সমসাময়িক শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশসম্ভূত নরহরি সরকার ঠাকুরের পদেরও কিছু কিছু মিশ্রণ ঘটিয়াছে। গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যামদাসের বাংলা পদের সঙ্গে ঘনশ্যাম ভণিতাধারী নরহরি সরকার ঠাকুরের সরল বাংলা পদগুলির মিশ্রণ ঘটিয়া যাওয়া কিছু অসম্ভব নহে। কারণ উভয় কবির বাংলা পদই সুমধুর ও প্রাঞ্জল। কিন্তু ঘনশ্যামদাসের ব্রজবুলিগুলিতেও এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে, তাহাকে 'ভক্তিরত্নাকরে'র নরহরি চক্রবর্তীর রচনা বলিয়া ভুল করিবার সম্ভাবনা অল্প। পদঝঙ্কার, শব্দ কৌশল, ছন্দের কারুকর্ম প্রভৃতি আলঙ্কারিক বৈদগ্ধ্যে পৌত্র পিতামহকে সার্থকভাবে অনুকরণ করিয়াছিলেন। ব্রজবুলিতে পদ রচনায় তাঁহার কৃতিত্ব গোবিন্দদাস, রায়শেখর, জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রভৃতি মহাজনদের সমপর্যায়ের না হইলেও তাঁহার কয়েকটি পদে কবিত্বশক্তির স্বচ্ছন্দ প্রকাশ লক্ষ্য করা যাইবে।

ঘোর তিমির অতি ঘন কাজর জিতি
নিসই বিপিনে একান্ত।
পিককুল বোলে সমাধি সমাপই
চমকই নেহারই পন্থ॥
মানিনি, ইথে কিয়ে নাহি অবধান।
নিমিখে বিমুখে যছু জীবন সংশয়
কি ফল তা সঞে মান॥

কিংবা

ডাকে ডাহুকি ঝনকে ঝনকল
ঝিঁ ঝিঁ ঝলকত ঝাঁঝিয়া।
ডিণ্ডিমারিত মণ্ডূকীরব
মোর নটত সাজিয়া॥
রে ঘন ঘনগহ গহন দুরগহ
গগনে ঘন ঘন গর্জিয়া।
আওয়ে রতিপতি মত্ত গজবর
বিরহিণীগণ তর্জিয়া॥

এই প্রকার পদে কবি পিতামহ গোবিন্দদাসের অনুকরণের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন এবং আংশিকভাবে সিদ্ধকামও হইয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত পদকর্তাদের মধ্যে তাঁহার স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গোবিন্দদাসাদি প্রধান কবির সঙ্গে তাঁহার পদের প্রধান পার্থক্য, তিনি অনুকরণের বাঁধা পথ ছাড়িয়া চিত্ত-অন্তঃপুরে প্রবেশের তেমন চেষ্টা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়সে বৈষ্ণবপদাবলীর অনুকরণে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনা করিয়াছিলেন। ভানুসিংহের পদাবলী ও বৈষ্ণবপদাবলীতে যে পার্থক্য, গোবিন্দদাসের পদের সঙ্গে ঘনশ্যামদাসের পদের সেই পার্থক্য।

৪. চম্পতি॥ 'পদকল্পতরু'তে চম্পতি ও চম্পতিরায় ভণিতায় ২টি পদ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু একটি পদে (পদসংখ্যা—৩৬৮—'শুন শুন মাধব') বিদ্যাপতি ও কবিচম্পতি—দুইজনের একত্র ভণিতা আছে—'বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভাণ'। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত চম্পতি ভণিতার কয়েকটি পদকে বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ নাকি মিথিলায় বিদ্যাপতির ভণিতার সঙ্গে চম্পতি ভণিতাও পাইয়াছিলেন।[১২৩] কিন্তু 'পদামৃতসমুদ্রে'র সঙ্কলক রাধামোহন ঠাকুর চম্পতি ভণিতা বিচার প্রসঙ্গে কবিকে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের একজন

১২৩ "বিদ্যাপতি কবিচম্পতি—বিদ্যাপতি সুকবি চম্পই, এরূপ মিথিলায় পাওয়া গিয়াছে" (নগেন্দ্রনাথের বিদ্যাপতির পদাবলীর ভূমিকা)। তাই সঙ্কলক চম্পতি ভণিতাযুক্ত অধিকাংশ পদকে বিদ্যাপতির বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কোন মৈথিল বা নেপালী পুঁথিতেই চম্পতি ভণিতাযুক্ত কোন পদ পাওয়া যায় নাই।

কর্মচারী বলিয়াছেন।[১২৪] কিন্তু চম্পতি খুব সম্ভব বাঙালী কবি। কারণ এই ভণিতায় কয়েকটি প্রশংসনীয় বাংলা পদ পাওয়া গিয়াছে। চম্পতি বাঙালী হউন, আর উৎকলবাসী হউন, তিনি যে বিদ্যাপতি নহেন,[১২৫] তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বরং মনে হয়, কবির প্রকৃত নাম চম্পতি, বিদ্যাপতি তাঁহার উপাধি। চম্পতি সম্বন্ধে আর কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া না গেলেও এইটুকু অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন এবং কয়েকটি মাঝারি ধরনের ব্রজবুলির পদ লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দু' একটি মন্দ নহে। যথা—

পালঙ্কে শয়ন ঘুমে অচেতন
দীঘল বহয়ে শ্বাস।
দীপ করে লই লুবধ মাধব
আওল হামারি পাশ॥
সখি হে, কানু সে ঐছন ঢীট।
হরষপরশে অধিক লালসে
বিসম তাকর দীঠ।

নিদ্রাতুর রাধার বাস্তববর্ণনা এবং দীপহস্তে কৃষ্ণের রাধার পর্যঙ্কের পাশে অবস্থান বেশ নাটকীয় হইয়াছে। সতীশচন্দ্র চম্পতির কবিত্বের উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, "...শ্রীমহাপ্রভুর ভক্ত পরবর্তী বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের মধ্যে

১২৪ "শ্রীগৌরচন্দ্রভক্তঃ শ্রীপ্রতাপরুদ্রমহারাজস্য মহাপাত্রশ্চম্পতিরায় নামা মহাভাগবত আসীৎ। স এব গীতকর্তা।" ('পদামৃত সমুদ্রে' রাধামোহনকৃত টীকা)

১২৫ ইনি বিদ্যাপতি না হইবার আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ, কবি বহু স্থলে সখীভাবে রাধাকৃষ্ণের সেবার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু প্রাক্‌চৈতন্যযুগের কবি বিদ্যাপতি সখীসাধনার বিষয়ে কিছু জানিতেন না, তাঁহার কোন পদেও সখী-সাধনার কোন উল্লেখ নাই। ইতিপূর্বে আমরা কবিরঞ্জন প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি, হরেকৃষ্ণ বাবুর মতে শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি বা ছোট বিদ্যাপতি নামে পরিচিত ছিলেন। বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত বাংলাপদগুলি ইঁহার রচিত। কিন্তু সতীশচন্দ্র অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই চম্পতিরায়-ই বোধহয় বিদ্যাপতির ভণিতা লইয়া বাংলা পদ রচনা করিয়াছিলেন। 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মনে করিয়াছিলেন, "গীতকর্তার প্রকৃত নাম রায় চম্পতি; তাঁহার উপাধি ছিল 'সুকবি বিদ্যাপতি।'" এই প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র বলিয়াছেন, "বৈষ্ণব সমাজের কিংবদন্তী প্রকৃত হইলে, 'বিদ্যাপতি' ভণিতার অনেক সন্দিগ্ধ বাংলা ও ব্রজবুলির পদ যে চম্পতি রচিত, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে।" (পদকল্প—৫ম, ১১৪ পৃ.)

চম্পতিরায়ের স্থান খুব উচ্চে নির্দেশ করিতে হইবে।"[১২৬] কিন্তু ঘনশ্যামদাস, নরহরি চক্রবর্তী প্রভৃতি পদকর্তাদের তুলনায় চম্পতিরায় পৃথক কোন গৌরব দাবি করিতে পারেন না।

৫. **জগদানন্দ** ॥ 'পদকল্পতরু'তে জগৎ ও জগদানন্দের ভণিতায় সাতটি পদ সঙ্কলিত হইয়াছে. সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী'তেও এই কবির আরও কয়েকটি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। কালিদাস নাথ জগদানন্দের অনেকগুলি পদ সংগ্রহ করিয়া বহু পূর্বে প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় 'বীরভূমি বিবরণে' এই কবি সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। সেই তথ্য হইতে জানা যাইবে যে, জগদানন্দ প্রসিদ্ধ চৈতন্যভক্ত বৈদ্য মুকুন্দের বংশে জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নিত্যানন্দ। জগদানন্দের পিতা শ্রীখণ্ড ত্যাগ করিয়া আগরডিহি দক্ষিণখণ্ডে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু জগদানন্দ ভ্রাতাদের সঙ্গে বাস করেন বীরভূমের অন্তর্গত দুবরাজপুর থানার অধীন জোফলাই গ্রামে।

জগদানন্দের আবির্ভাবকালের সন-তারিখ লইয়া বিশেষজ্ঞ মহলে কিঞ্চিৎ মতবৈষম্য সৃষ্টি হইয়াছে। ডঃ সুকুমার সেন সন-তারিখের গোলমাল মিটাইতে গিয়া দুইজন জগদানন্দের পরিকল্পনা করিয়াছেন। পূর্বেই কালিদাস নাথ দুইজন জগদানন্দের কথা বলিয়াছিলেন।[১২৭] কারণ তিনি সন্ধান করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, জগদানন্দের বংশধরদের মতে কবি জগদানন্দ ১৭০৪ শকে অর্থাৎ ১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দে, ১৮০ বৎসর পূর্বে লীলা সংবরণ করেন। কিন্তু জগদানন্দের একটি পদ ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগের এক পদসঙ্কলনে পাওয়া যাইতেছে। তাই ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ও অনুমান করিয়াছেন, জগদানন্দ নামে দুই জন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, একজন সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন, আর একজন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লোকান্তরিত হন। বৈষ্ণব সমাজে জগদানন্দ নামে একাধিক ব্যক্তি ছিলেন। রাধামোহন ঠাকুরের পিতার নামও জগদানন্দ ঠাকুর। 'কর্ণা-

১২৬ পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ. ১১৪

১২৭ কালিদাস নাথ সম্পাদিত শ্রীজগদানন্দ পদাবলী, পৃ. ৬৪ (পাদটীকা)

নন্দে'র লেখক যদুনন্দন দাস বলিয়াছিলেন যে, জগদানন্দ ঠাকুর গতি-গোবিন্দের সেবক ছিলেন। বৈষ্ণবপদাবলীতে জগদানন্দ নামে আরও কবির সংখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। জগদানন্দের ভণিতায় সহজ বাংলা পদ, ব্রজবুলির পদ এবং শব্দচাতুরীপূর্ণ বাললোভন ক্রীড়াকৌতুকযুক্ত পদগুলি—একই কবির রচনা বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু কোন্ শ্রেণীর পদ, কোন্ জগদানন্দের, তাহা নির্ণয় করিবার মতো কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই।

চৈতন্যবিষয়ক তাঁহার কয়েকটি পদ বেশ আন্তরিকতাপূর্ণ হইয়াছে। মায়ের কোলে থাকিয়া শিশু গৌরাঙ্গ চাঁদ ধরিবার জন্য বায়না লইয়াছেন, কিছুতেই তাঁহাকে শান্ত করা যাইতেছে না। দুরন্ত শিশু কখনও কাঁদিতেছে, মাথার চুল টানিতেছে, হার ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে—শেষ পর্যন্ত শিশুগৌরাঙ্গ মায়ের কাঁধ কামড়াইয়া দিলেন, শচীমাতা উহু উহু করিয়া উঠিলেন। পদকর্তা যেন শিশুগৌরাঙ্গের সম্মুখে একখানি আরশি আনিয়া দিলেন। দর্পণে চন্দ্রোপম নিজ মুখ দেখিয়া দুরন্ত শিশু শান্ত হইল :

হঠ করি জননী অংসে করু দংশন
উহু উহু রবে না রোপই কান।
জগত সমুখে করি দরপণ অরপণ
মুখ দরশাই করল সমাধান ॥

যদিও ভক্তকবি রামপ্রসাদের অনুরূপ একটি পদে ('গিরিবর, আর পারি না হে প্রবোধ দিতে উমারে') ইহা অপেক্ষা অধিকতর শিল্পসমুৎকর্ষ ফুটিয়াছে, তবু এই পদটির বাস্তব বর্ণনা বিশেষ প্রশংসনীয়। সরলভাষায় সাঙ্গরূপক অলঙ্কারে রচিত এই পদটিও বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে :

সজনি গো, কেন গেলাম যমুনার জলে।
নন্দের দুলাল চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে ॥
দিয়ে হাস্য সুধাচার অঙ্গছটা আঠা তার
আঁখিপাখি তাহাতে পড়িল।
মনমৃগী সেই কালে পড়িল রূপের জালে
শূন্য দেহ পিঞ্জরে রহিল ॥

কিন্তু সরল পদের জন্যই তাঁহার খ্যাতি নহে। চটুল অনুপ্রাস, কানমুগ্ধকর

ঝঙ্কার ও চিত্তাকর্ষী বাগ্‌বৈদগ্ধ্য সৃষ্টি করিয়া তিনি একশ্রেণীর পাঠকের নিকট বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন। যথা—

মঞ্জু বিকচ কুসুমপুঞ্জ মধুপ শবদ গঞ্জিগুঞ্জ
কুঞ্জরগতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল কুলনারী।
ঘনগঞ্জন চিকুরপুঞ্জ মালতী ফুলমালে রঞ্জ
অঞ্জনযুত কঞ্জ নয়ন খঞ্জন গতিহারী॥

কিংবা

কংস কুঞ্জর কেশরী কর্‌ৗ
কুম্ভ করজে বিদার।
করঙ্কর ভুজ কোরে কুলবতী
করব কেলি বিহার॥
কেলি-কলহক কহব কাহিনী
কুলজ কামিনী কন্ত।
কি রস কুবুধিনী কুরূপ কুবুজিনী
কোরে কহরি একান্ত॥

এসমস্ত রচনাকৌশল চিত্তাকর্ষী বটে, কিন্তু গোবিন্দদাসের অনুকরণ করিতে গিয়া জগদানন্দ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছেন তাহা রসিক পাঠক মাত্রই স্বীকার করিবেন। শব্দালঙ্কারের এইরূপ কর্ণবিদারী টঙ্কারে কর্ণসম্বল পাঠক প্রচুর আমোদ ও কৌতুক পাইতে পারেন, কিন্তু এই ধরনের শব্দের নেশা ছুটিলেই পাঠক ইহার শূন্যগর্ভ শব্দকৈতব ধরিয়া ফেলিবেন।

জগদানন্দ আর একপ্রকার বিচিত্র পদ লিখিয়াছিলেন যাহা 'চিত্রকবিতা' নামে পরিচিত। ইহাতে কবি গাণিতিক রীতিতে শব্দ সাজাইয়া নিজ মনোমত বাক্য বাহির করিয়া লইয়াছেন—অনেকটা cross-word puzzle-এর মতো। এই জাতীয় পদে লম্বালম্বি পড়িয়া গেলে একরূপ অর্থ হয়, এবং আড়ের দিকে প্রতিশব্দের আদ্যক্ষর ধরিলে ইহার আকার ও অর্থ সম্পূর্ণ পাল্টাইয়া যায়। এইরূপ শিশুসুলভ শব্দক্রীড়ায় কবির শব্দচাতুরী প্রমাণিত হইয়াছে—কবিপ্রতিভার ইহাতে কোন লাভ হয় নাই। প্রাচীন সমালোচকগণ (কালিদাস নাথ, জগদ্বন্ধু ভদ্র ইত্যাদি) জগদানন্দের কাব্য-প্রতিভার অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন।[১২৮] কিন্তু শব্দ লইয়া গেণ্ডুয়া খেলার

১২৮ জগদানন্দের পদাবলীর প্রথম সংগ্রাহক কালিদাস নাথ এই কবি সম্বন্ধে স্তুতিবাদ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "কি কবিত্ব, কি ছন্দোলালিত্য, কি রচনাচাতুর্য, কি শব্দবিন্যাস, কি

অভিনয় ভিন্ন কবি এই ধরনের পদে কোনও প্রকার প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাঁহার সহজ ভাষায় রচিত পদগুলি বরং কিছু প্রশংসার যোগ্য।

শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যস্থানীয় কয়েকজন কবি সপ্তদশ শতাব্দীতে পদরচনায় প্রায় গতানুগতিক পথ ধরিয়াই চলিয়াছিলেন। প্রসাদদাস, রাধাবল্লভদাস, শ্যামদাস, গোকুলানন্দ প্রভৃতি পদকর্তাগণ কিছু কিছু মধ্যম শ্রেণীর পদ লিখিয়াছিলেন। এই যুগে বৈষ্ণবপদের বন্যা নামিয়াছিল, অধিকাংশ বৈষ্ণবভক্তই পদ লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—বিশেষতঃ শ্রীনিবাসের শিষ্য-প্রশিষ্য সম্প্রদায়। শ্যামানন্দের এক শিষ্য রসিকদাস (রসিকানন্দ) যেমন শ্যামানন্দের জীবনী রচনা করিয়াছিলেন, তেমনি কিছু কিছু বাংলা পদও লিখিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা অচ্যুতানন্দ ধনী ভূস্বামী ছিলেন, তাঁহার উপাধি ছিল রাজা। পুত্র রসিকানন্দ শ্যামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং গুরুকে উড়িষ্যা ও দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে বিশেষ সাহায্য করেন। ইঁহারও কয়েকটি পদ বৈষ্ণবসঙ্কলনে গৃহীত হইয়াছে।

'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র সঙ্কলক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী হরিবল্লভ ভণিতায় সংস্কৃত, বাংলা ও ব্রজবুলিতে পদ লিখিয়াছিলেন। বল্লভ ভণিতায়ও তাঁহার কিছু কিছু পদ অন্যান্য পদসঙ্কলনে গৃহীত হইয়াছে। বিশ্বনাথের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি যতটা, কবিত্বের খ্যাতি ততটা নহে। সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা ও মৌলিক গ্রন্থ লিখিয়া তিনি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করিলেও বৈষ্ণবপদে খুব যে একটা কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা মনে হয় না।

মনোহর দাস ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদ 'পদকল্পতরু'তে গৃহীত হইয়াছে, পরবর্তী কালের কোন কোন পদসঙ্কলনেও ইঁহার দুই একটি পদ পাওয়া যায়।

চিত্র, বোধহয় ঠাকুর জগদানন্দ সকল বিষয়েই তাঁহার পূর্বতন ও পরবর্তী কবিকুলের বন্দনীয় ও অগ্রগণ্য। যে কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া ও যে রসে ডুবিয়া মানুষ কিয়ৎকালের জন্য শোকতাপ ভুলিয়া যায়, জগদানন্দের কবিতা সেই শ্রেণীর।" সমালোচকের ইত্যাকার স্তুতিবাদে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি যে হতভম্ব হইয়া পড়ে, তাহাতে সংশয় নাই। ভক্তির পাথায় আবেগ ভর করিলে তাহাকে সহজে যুক্তির মাটিতে টানিয়া নামানো যায় না।

বৈষ্ণব সাহিত্য-সমাজে তিন জন মনোহরদাস ছিলেন। একজন নিত্যানন্দানুচর মনোহর—'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' ইঁহার উল্লেখ আছে। আর একজন মনোহরদাস আউলিয়া—ইনি জাহ্নবীদেবীর শিষ্য এবং চৈতন্যদাস নামে পরিচিত ছিলেন। আর একজন মনোহরদাস, যিনি অধিকতর পরিচিত, তিনি 'অনুরাগবল্লী' নামক একখানি পুস্তিকায় বৈষ্ণবসমাজ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়াছেন। এই মনোহর শ্রীনিবাস-সম্প্রদায়ের শিষ্য-স্থানীয় ছিলেন। খুব সম্ভব বৈষ্ণব পদগুলি এই তৃতীয় মনোহরদাসের রচনা। শেষজীবনে কবি বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। ব্রজবুলিতে রচিত তাঁহার দু'একটি পদ মন্দ নহে। নিম্নলিখিত পদটির ধ্বনিঝঙ্কার প্রশংসার যোগ্য :

বরিখে রিমিঝিমি সঘনে যামিনি
দামিনী ঝটকাই রে।
রাগে অভিসরি সঙ্গে সহচরি
চলল সুন্দরী রাই রে॥
চলিতে অহিকুল চরণে বেড়ল
অঙ্কি পিছলিত পন্থ রে।
গিরত শত বেরি উঠিয়া ধাওত
ভেটিতে গোকুলচন্দ্র রে॥

রাধার এই বর্ষাভিসার শ্রেষ্ঠ পদকারদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রসঙ্গে দেখা গেল, আকাশের অগণিত তারার মতো এই শতাব্দীতে অসংখ্য বৈষ্ণব পদকর্তার আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু "একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি ন চ তারাগণৈরপি"—বৈষ্ণব-আকাশে তখন চন্দ্র অস্ত গিয়াছে—গোবিন্দদাস কবিরাজ সেই চন্দ্রাংশুবর্ষী উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই তিনি তিরোহিত হন। তাহার পর যাঁহারা বৈষ্ণবপদসাহিত্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই ব্রজবুলির পদে গোবিন্দদাসের অনুকরণ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কিছু কিছু কৃতিত্বও দেখাইয়াছিলেন, কেহ-বা ব্যর্থ অনুকরণে প্রতিভা নষ্ট করিয়াছেন। সে যাহা হউক, সপ্তদশ শতাব্দীর পদসাহিত্য যে গোবিন্দদাসের প্রতিভার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

৩

বৈ ষ্ণ ব জী ব নী ও ই তি হা স - কা ব্য

পূর্ববর্ণিত পদাবলী শাখার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, অসংখ্য পদকার ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া বৈষ্ণব পদরচনায় বিশেষভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঠিক তেমনি দুই একখানি মহান্ত-জীবনীকাব্য, কিছু কিছু বৈষ্ণব-সমাজ-ইতিহাস-সংক্রান্ত পুঁথিপত্র, সংস্কৃতে রচিত বৈষ্ণব নিবন্ধ ও কাব্যনাট্যাদির ভাবানুবাদের অনুশীলন ও প্রচার সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙলাদেশে বিশেষতঃ বৈষ্ণবসমাজ-সম্প্রদায়ে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। কাব্যাংশ বা সাহিত্যিক কারুকর্ম বিচারে ইহাদের অধিকাংশই বিস্মৃতি নামক কীটের ভোজ্যে পরিণত হইবার যোগ্য। কিন্তু ইহাতে তৎকালীন বাঙলাদেশের বৈষ্ণবসমাজ, ধর্ম ও জনচিত্ত সম্পর্কে কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য এমনভাবে অনুস্যূত হইয়া আছে যে, এই দিক দিয়া এই সমস্ত পুঁথিপত্রের কিঞ্চিৎ মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। নিজ নিজ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে বৈষ্ণবগণ অতিশয় সচেতন ছিলেন বলিয়া এই পুঁথিগুলির কিয়দংশ ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

এই যুগে এবং ঈষৎ পূর্ববর্তী যুগ হইতে চৈতন্যজীবনীকাব্যের আদর্শে বৈষ্ণব আদর্শ ও মহান্তদের জীবন সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য রচনার সূচনা হইয়াছিল, যাহাতে ধর্মসম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় অদ্বৈতপ্রভু, নরোত্তম-শ্রীনিবাস-শ্যামানন্দ প্রভৃতি আচার্যদের জীবন কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব সমাজ, সম্প্রদায় এবং বাঙলাদেশের লোকজীবন সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য স্থান পাইয়াছে। নিম্নে এইরূপ কয়েকখানি জীবনীকাব্য ও সমাজগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

অদ্বৈত ও সীতাদেবীর জীবনীকাব্য ॥

চৈতন্যদেবের সর্বজ্যেষ্ঠ ভক্ত অদ্বৈত আচার্য (মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসরের অগ্রবর্তী) বৈষ্ণবসমাজে কিরূপ মান্য ছিলেন তাহা চৈতন্যজীবনকাব্য হইতেই জানা যায়। বৈষ্ণব মতে তাঁহার হুঙ্কার-

আহ্বানেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যাবতার রূপে গৌড়ভূমিতে আবির্ভূত হন। চৈতন্যভক্তিবাদ ও তত্ত্বকথা তাঁহার সাহায্য ও উপদেশ ব্যতীত প্রথম দিকে জনসমাজে এত দ্রুত প্রচারলাভ করিতে পারিত কি না সন্দেহ। অদ্বৈতের পূর্ব নিবাস শ্রীহট্টের লাউড়ে। তাঁহার পিতা বিখ্যাত পণ্ডিত কুবের আচার্য, মাতার নাম লাভা দেবী। কুবের আচার্য সস্ত্রীক শ্রীহট্ট ছাড়িয়া বাঙলাদেশে শান্তিপুরে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে তাঁহার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে।[১] জন্মের পর পুত্রের নাম রাখা হইল কমলাক্ষ। বারো বৎসর বয়সে কমলাক্ষ শান্তিপুরে গিয়া ষড়দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্র পাঠ করেন। এখানেই তিনি স্থায়িভাবে রহিয়া যান, তাঁহার মাতাপিতাও পরে লাউড় ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে পুত্রের নিকট বাস করিয়াছিলেন। তরুণ বয়সে কমলাক্ষ দ্বিজবর বেদান্তবাগীশের নিকট চতুর্বেদ পাঠ সমাপ্ত করেন। শিষ্যের পাণ্ডিত্য দেখিয়া গুরু কমলাক্ষকে 'বেদপঞ্চানন' উপাধি দিয়াছিলেন। অতঃপর পিতার মৃত্যুর পর কমলাক্ষ গয়াধামে পিণ্ড দিতে গিয়া বৈরাগীর বেশে প্রায় সমগ্র ভারতের তীর্থগুলি পরিক্রমণ করেন। পথে তাঁহার সঙ্গে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্ত মাধবেন্দ্র পুরীর সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার নিকট কমলাক্ষ প্রথম জানিতে পারিলেন যে, শান্তিপুরের অদূরে নবদ্বীপধামে গৌরাঙ্গ প্রভুর আবির্ভাব হইবে। পথিভ্রমণ কালে তাঁহার সঙ্গে নাকি কবি বিদ্যাপতিরও সাক্ষাৎ হইয়াছিল ('অদ্বৈতপ্রকাশ')। পরে তিনি শান্তিপুরে ফিরিয়া মাধবেন্দ্রের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। নিরাকারবাদী ও ব্রহ্মজ্ঞানী শ্যামদাস নামক এক বিখ্যাত পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাভূত করিলে কমলাক্ষের খ্যাতি আরও বাড়িয়া গেল। সকলে জানিল যে, কমলাক্ষ সাধারণ পণ্ডিত নহেন, যিনি নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্ব খণ্ডন করিয়া সাকার বিগ্রহবাদ স্থাপন করেন

---

১ অদ্বৈতের ভক্ত লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস রচিত 'বাল্যলীলা সূত্রে' (সংস্কৃত) অদ্বৈতের জন্মের সন তারিখ আছে:

শাকে রস প্রাণগুণেন্দুমানে শ্রীলাউড়ে পুণ্যতমেঽথ মাঘে।
শ্রীসপ্তমী পুণ্যতিথৌ সিতেঽভূদদ্বৈতচন্দ্রঃ কৃপয়া বিরাসীৎ॥

রস-৬, প্রাণ-৫, গুণ-৩, ইন্দু-১, অর্থাৎ ১৩৫৬ শকে (১৪৩৪ খ্রীঃ অঃ) লাউড়ে অদ্বৈতের জন্ম হয়।

তাঁহার প্রাধান্য কে অস্বীকার করিবে? তিনি হরি ও হরের অভিন্ন সত্তা ছিলেন, তাই লোকে তাঁহাকে অদ্বৈত আচার্য উপাধি দিল।[২]

যথাকালে অদ্বৈতাচার্য নৃসিংহ ভাদুড়ীর দুই কন্যা সীতা ও শ্রীকে বিবাহ করেন। সীতার গর্ভে অদ্বৈতের অচ্যুতানন্দ, বলরাম, গোপাল, জগদীশ ও স্বরূপ—এই পাঁচ পুত্র এবং শ্রীর গর্ভে কৃষ্ণ মিশ্রের জন্ম হয়।[৩] ইঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অচ্যুতানন্দই বৈষ্ণব সমাজে সমধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। অতঃপর অদ্বৈত নবদ্বীপে টোল স্থাপনা করিয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। পরে বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়া তিনি নবীন যুবক গৌরাঙ্গদেবের সংস্পর্শে আসেন। গৌরাঙ্গ সান্নিধ্যে আসিয়া তিনি কিপ্রকারে মহাভক্ত হইলেন এবং চৈতন্যতত্ত্বাদর্শ প্রচার করিলেন, তাহার কাহিনী চৈতন্যজীবনীকাব্যসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য চৈতন্যজীবনীকাব্যে অদ্বৈতের আনুপূর্বিক জীবনী বর্ণিত হয় নাই, চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁহার জীবনের যতটুকু সম্পর্ক শুধু সেইটুকুই ঐ সমস্ত কাব্যে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু অদ্বৈতের জীবনীকাব্যগুলিতে আচার্যের কৈশোর-যৌবন-পরিব্রাজক-জীবন-বিবাহ-সংসারযাত্রা প্রভৃতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে আবার তৎকালীন সমাজের নানা কথাও স্থান পাইয়াছে বলিয়া এই জীবনীকাব্যগুলির সামাজিক ও ঐতিহাসিক মর্যাদা স্বীকার করিতে হইবে।

এ পর্যন্ত চারিখানি অদ্বৈত-জীবনীকাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—(১) লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের সংস্কৃতে রচিত 'বাল্যলীলাসূত্র', (২) ঈশান-

---

২ সাক্ষাৎ হরিহর এই কমলাক্ষাচার্য।
তেঞি ইঁহার শ্রীঅদ্বৈত নাম হৈল ধার্য॥ (অদ্বৈতপ্রকাশ)

কিন্তু হরিদাসের 'অদ্বৈতমঙ্গলে' এই নাম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

কৃষ্ণসনে অদ্বিতীয় অদ্বৈত প্রকটিলা।
ভক্তিশাস্ত্রে প্রকটিলা অদ্বৈতাচার্য হৈলা॥

এইরূপ ছোটখাট তথ্যপার্থক্য অদ্বৈতের জীবনীকাব্যগুলিতে পাওয়া যাইবে। যেমন—ঈশাননাগরের 'অদ্বৈতমঙ্গলে' অদ্বৈতের পূর্বনাম কমলাক্ষ, কিন্তু হরিচরণের 'অদ্বৈতমঙ্গলে'র মতে—কমলাকান্ত।

৩ 'অদ্বৈতপ্রকাশে'র মতে অদ্বৈতের পুত্রদের নাম—অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণদাস, গোপালদাস—তিন পুত্রই সীতাদেবীর গর্ভজাত। শ্রীর একটি সন্তান হইয়াছিল বটে, কিন্তু জন্মের অল্প দিনের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়।

নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ', (৩) হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল', (৪) নরহরি-দাসের 'অদ্বৈতবিলাস'।

শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড়ের ভূস্বামী দিব্যসিংহ সংসার ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈতপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় কৃষ্ণদাস—তিনি 'লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস' নামে পরে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নামে আট সর্গে বিভক্ত 'বাল্যলীলাসূত্র' পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে।[৪] ইহাতে সংস্কৃত ভাষায় অদ্বৈতের প্রথম জীবনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় ইহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান।[৫] কারণ মুদ্রিত পুস্তকে গ্রন্থ রচনার কাল হিসাবে ১৪০৯ শকাব্দ (১৪৮৭ খ্রীঃ অঃ উল্লিখিত হইয়াছে) অর্থাৎ চৈতন্যজন্মের বৎসর দুয়েকের মধ্যে ইহা রচিত হইয়াছিল। অথচ গ্রন্থের প্রথমেই গৌরগোপালের বন্দনা রহিয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত পুঁথিপত্রের রচনাকালজ্ঞাপক সনতারিখে যে অনেক কারচুপি আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

অদ্বৈত আচার্যের এক শিষ্য শ্যামদাস আচার্য 'অদ্বৈতমঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন।[৬] কিন্তু কাব্যটি পাওয়া যায় নাই। এইটি বাদ দিলে ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ', হরিচরণদাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল' ও নরহরিদাসের 'অদ্বৈতবিলাসে' অদ্বৈতের জীবনকথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কাব্যগুলির প্রামাণিকতা, বিশেষতঃ রচনার প্রাচীনত্ব বিশেষ সন্দেহজনক। ঈশাননাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশে' আছে যে, চৈতন্য-নিত্যানন্দের আবির্ভাবের

---

৪ শ্রীহট্টের অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি কর্তৃক সম্পাদিত (১৩২২)।

৫ ডঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ২৭৪। ঈশাননাগর 'অদ্বৈতপ্রকাশে' এই সংস্কৃত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন :

ভক্তিবলে হৈলা তিঁহো প্রভুর কৃপাপাত্র।
সংস্কৃতে রচিলা প্রভুর বাল্যলীলাসূত্র ॥ (অদ্বৈতপ্রকাশ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

৬ ঈশাননাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশে' (৬ষ্ঠ অধ্যায়) আছে যে, শ্যামদাস নামক এক ব্রহ্মবাদী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত অদ্বৈতের সঙ্গে তর্কে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অদ্বৈত তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করেন এবং ভাগবত পাঠের নির্দেশ দেন। অতঃপর অদ্বৈতের নির্দেশে শ্যামদাস ভাগবতাচার্য নামে পরিচিত হন। খুব সম্ভব ইনিই 'অদ্বৈতমঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন।

পূর্বেই অদ্বৈত নাকি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ নাম ধরিয়া উচ্চারণ করিয়া বিহ্বল হইতেন :

কহিতেই হৈলা প্রভু প্রেমেতে বিহ্বল।
কহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ বোল॥ (অদ্বৈতপ্রকাশ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

সুতরাং মুদ্রিত গ্রন্থগুলিতে যে প্রচুর হস্তক্ষেপ হইয়াছে তাহা মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

ঈশাননাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ অদ্বৈত-জীবনীকাব্যের মধ্যে সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছে—বিশেষতঃ ছাপাখানার যুগে। যদিও ১৩০৩-৪ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল' ও লোকনাথদাসের 'সীতাচরিত্র' (অদ্বৈতগৃহিণী) সম্বন্ধে প্রামাণিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তবু ঈশানের কাব্য সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়[৭] বলিয়া অদ্বৈতের জীবনীকাব্য হিসাবে ইহা অধিকতর প্রচার লাভ করিয়াছে। শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সাহিত্যরসিক অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি সর্বপ্রথম ঈশাননাগরের পুঁথি আবিষ্কার করেন, এবং সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় (১৩০৩) তিনিই কবির প্রথম পরিচয় দেন। অল্প কিছুকাল পরেই ইহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পুঁথিতে কালজ্ঞাপক যে শ্লোক ছিল তাহা হইতে ১৪৯০ শক (১৫৬৮ খ্রীঃ অঃ) পাওয়া যাইতেছে। মুদ্রিত পুঁথিটি ১৭০৩ শকে (১৮৮১ খ্রীঃ অঃ) অনুলিখিত হইয়াছিল। যদিও কাব্যটি প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু অচ্যুতচরণের আবিষ্কারের পূর্বে বড় কেহ ইহার সন্ধান জানিতেন না। ঢাকা জেলার অধিবাসী শ্রীনাথ গোস্বামী নামক এক বৈষ্ণবভক্ত শ্রীহট্টের লাউড় হইতে সর্বপ্রথম এই পুঁথিটি সংগ্রহ করেন, অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় তাঁহার নিকট হইতে পুঁথিখানি লইয়া সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ইহার পরিচয় দেন এবং "পুঁথিখানি সংশোধনপূর্বক"[৮] অমৃতবাজার পত্রিকায় আশ্বিন হইতে প্রকাশ করেন। এই 'সংশোধনে'র কথায় মনে হইতেছে, তত্ত্বনিধি মহাশয় কাব্যটির নানাস্থলেই হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কাব্যের ভাষাতেও আধুনিক কালের ছাপ অতি স্পষ্ট, বর্ণনার ক্রমের মধ্যে

---

৭ ১৮৯৭ সালে অমৃতবাজার পত্রিকার অফিস হইতে অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির সম্পাদনায় প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৩৩ সনে সতীশচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

৮ সতীশচন্দ্র মিত্রের সংস্করণের ভূমিকা (পৃ. ৶০) দ্রষ্টব্য।

নানা বৈষম্য ও দোষত্রুটি দেখা যায়। সুতরাং এই মুদ্রিত গ্রন্থ ও ইহাতে প্রকাশিত তথ্যগুলি কি পরিমাণে গ্রহণযোগ্য তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ তত্ত্বনিধি মহাশয় মাত্র একখানি পরবর্তী কালের পুঁথি অবলম্বন করিয়া এই কাব্য আলোচনা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদক সতীশচন্দ্র মিত্রও আর দ্বিতীয় কোন পুঁথির সাহায্য পান নাই বলিয়া (তিনি প্রথম পুঁথিখানিরও কোন সন্ধান পান নাই) এই কাব্যের প্রামাণিকতা নির্বিচারে মানিয়া লওয়া যায় না।

কবি ঈশাননাগর কাব্যসমাপ্তিতে নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। ঈশানের নিবাস অদ্বৈতেরই পিতৃভূমিতে—শ্রীহট্টের লাউড় পরগণার নবগ্রামে। ইঁহার পিতার নাম পদ্মনাভ চক্রবর্তী, মাতার নাম পদ্মমণি দেবী। শৈশবে ঈশানের পিতৃবিয়োগ হইলে তাঁহার দুঃখিনী মাতা পুত্রকে লইয়া দীর্ঘপথ পর্যটন করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবী মাতাপুত্রকে সাদরে স্থান দান করেন। অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুত ও ঈশান প্রায় সমবয়সী। মাতাপুত্র অদ্বৈতের দ্বারাই বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। যাহা হউক, ঈশান বাল্যকাল হইতে অদ্বৈতের আশ্রয়ে ছিলেন, সুতরাং আচার্যের মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধেই অবহিত ছিলেন। তাঁহার কাব্যে অদ্বৈতের জীবনকথা, বিশেষতঃ শান্তিপুরে আসিবার পরবর্তী ঘটনা যথাযথ ভাবেই বিবৃত হইবার সম্ভাবনা। কবি লাউড়ে বসিয়া 'চৌদ্দশত নবতি শকাব্দে' (১৫৬৮ খ্রীঃ অঃ) এই কাব্য সমাপ্ত করেন, মুদ্রিত গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে আত্মবিবরণ প্রসঙ্গে কবি শকাব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। এই তারিখে কাহারও কারচুপি না থাকিলে ইহাকে অতিশয় প্রাচীন, এমন কি প্রাচীনতম বাংলা জীবনীকাব্যও বলা যাইতে পারে। চৈতন্যভাগবত (বৃন্দাবনদাস) ও চৈতন্যচরিতামৃত (কৃষ্ণদাস কবিরাজ) ইহার পরে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু 'অদ্বৈতপ্রকাশে'র রচনাকাল সম্বন্ধে আমরা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছি। কারণ ইহার তারিখ যত প্রাচীন, ভাষা তত প্রাচীন নহে। যদিও দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদক সতীশচন্দ্র মিত্র ইহাতে 'বুলি' (ভ্রমি), 'নিছিয়া' 'যৈছে' 'মোহর' (আমার), 'বাট' প্রভৃতি পুরাতন শব্দের উল্লেখ পাইয়াছেন, তবু ইহার ভাষাভঙ্গিমা প্রাচীন নহে, অত্যন্ত অর্বাচীন বলিয়া মনে হয়। যেমন:

তুমি জগতের মূল কেবা তব মাতা।
স্বয়ং মহাবিষ্ণু তুঁহু জগতের পিতা।
কোটি কোটি তীর্থ আছে তব রাঙ্গা পায়।
তুয়া পদামৃতপানে জীব মোক্ষ পায়॥

কিংবা,

শ্রীধাম বৃন্দাবনে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
বরলীলা কৈলা করি গোপ অভিমান॥
একদিন গোষ্ঠলীলায় শ্রীনন্দনন্দন।
গোপাল উচ্ছিষ্ট ফল করিলা ভোজন॥

এই ভাষা দুই এক শতাব্দীর পূর্ববর্তী কি না সন্দেহ হয়। হয়তো কেহ বলিবেন, পুঁথির প্রথম সম্পাদক ভাষার কোন কোন স্থলে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাই ভাষায় এইরূপ আধুনিকতা দেখা যাইতেছে। কিন্তু আমরা পুরা কাব্যখানার ভাষা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি—ভাষায় সর্বত্র এইরূপ আধুনিক বর্ণনারীতি অনুসৃত হইয়াছে। দুই একটি পুরাতন শব্দ থাকিলেও গোটা কাব্যের বর্ণনা ও ভাষা আদৌ পুরাতন যুগের নহে। এই জন্য যদি কোন সন্দেহপরায়ণ পাঠক কাব্যটির প্রামাণিকতা ও বিশুদ্ধি সম্পর্কে সন্দিহান হন, তাহা হইলে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। সে যাহা হউক, ইহাতে অদ্বৈতের জীবনকাহিনী ও তৎকালীন সমাজের নানা কথা বেশ প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যটি মোট ২২টি অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে অদ্বৈতের পূর্বনিবাস শ্রীহট্টের লাউড় পরগণার অন্তর্গত নবগ্রাম, তাঁহার বাল্যজীবনী, শান্তিপুরে বিদ্যালাভার্থে আগমন, চারিবেদে পাণ্ডিত্য অর্জন, মাতাপিতার স্বর্গারোহণ, অদ্বৈতের পিতৃপিণ্ডদান উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমা, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের পরাজয় ও অদ্বৈতের শিষ্যত্ব গ্রহণ, লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের সংসার ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈতের শিষ্যরূপে অবস্থান, হরিদাসের সঙ্গে অদ্বৈতের সম্প্রীতি, সীতা ও শ্রী—দুই ভগিনীকে বিবাহ, নবদ্বীপে টোল স্থাপন প্রভৃতি কাহিনী সংক্ষেপে পরিচ্ছন্নভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহার পর গৌরাঙ্গের জন্ম, বিদ্যালাভ হইতে আরম্ভ করিয়া নীলাচলে গমন পর্যন্ত কাহিনী, যাহার সঙ্গে অদ্বৈতের কিছু কিছু সম্পর্ক ছিল, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। কবি প্রসঙ্গক্রমে হরিদাস, শ্রীরূপগোস্বামী, নিত্যানন্দের বিবাহ, শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বিষয়ে

সামান্ত তথ্য দিয়াছেন। কাজেই ইহা শুধু অদ্বৈত ও তাঁহার পুত্র-কলত্রের কাহিনী নহে, ইহাতে তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজেরও অনেক কথা আছে। মুসলমানগণ হিন্দুর মন্দির আক্রমণ করিয়া বিগ্রহ অপবিত্র করিতে চেষ্টা করিত,[১] বিগ্রহরূপী মদনমোহন ম্লেচ্ছভয়ে ফুলের মধ্যে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন—এইরূপ বর্ণনাও আছে :

দুষ্ট যবনেরা পাঞা ঠাকুরের তত্ত্ব।
ভাবে ঠাকুর ভাঙ্গি হিন্দুর নাশিমু মহত্ব॥
যুক্তি করি ম্লেচ্ছগণ হইয়া একত্র।
অদ্বৈত বটেতে আইলা লঞা অস্ত্রশস্ত্র॥
মদনমোহন দুষ্ট ম্লেচ্ছভয় পাঞা।
পুষ্পতলে লুকাইলা গোপাল হইয়া॥

কোন কোন স্থলে আধুনিক কালের রাজা রামমোহন প্রতিপাদ্য একেশ্বর ব্রহ্মতত্ত্বের অনুরূপ উক্তিও দুর্লভ নহে :

প্রভু কহে পরং ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান।
তিহোঁ মোর সাধ্যবস্তু নহে কেহ আন॥
নানামতে যেই যায় তার বিড়ম্বনা।
বিজ্ঞ জনে এক ইষ্ট করয়ে ভাবনা॥
... ...
যৈছে বৃক্ষমূলে জল করিলে সেবন।
শাখা পল্লবাস্তে হয় তৃপ্তির সাধন॥

---

১ বৈষ্ণবদের উপর মুসলমানদের অত্যাচারের বর্ণনা :

একদিন হরিদাস কহে প্রভু স্থানে।
নিত্য ধর্ম নষ্ট করে দুষ্ট ম্লেচ্ছগণে॥
দেবতা প্রতিমা ভাজি করে খণ্ড খণ্ড।
দেবপূজার দ্রব্য সব করে লণ্ড ভণ্ড॥
শ্রীমদ্ভাগবত আদি ধর্মশাস্ত্রগণে।
বল করি পোড়াইয়া ফেলায় আগুনে॥
ব্রাহ্মণের শঙ্খঘণ্টা কাড়ি লঞা যায়।
অঙ্গের তিলকমুদ্রা বলে চাটি খায়॥
শ্রীতুলসী বৃক্ষে মুতে কুকুরের সনে।
দেবগৃহে মল ত্যাগ করে দুষ্ট জনে॥
পূজায় বসিলে দেয় কুলকুচা জল।
সাধুরে তাড়না করে বলিয়া পাগল॥ (অদ্বৈতপ্রকাশ)

তৈছে সব দেবদেবীর মূল নারায়ণে।
পুজিলে সকল পুজা হয় সমাধানে॥

সে যুগে কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহের বর বিবাহে এক কন্যা পাইত, আর এক কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ লাভ করিত, 'অদ্বৈতপ্রকাশে' নিত্যানন্দের বিবাহের বর্ণনায় সেইরূপ ইঙ্গিত আছে :

সূর্যদাস নিত্যানন্দে ঘরে লঞা গেলা।
লক্ষণে প্রভুরে চিনি প্রেমাবিষ্টা হৈলা॥
মহাভাগ্য মানি তিহুঁ নিত্যানন্দচান্দে।
সমারোহে কন্যা দান কৈলা মহানন্দে॥
বসুধা দেবীকে প্রভু বিবাহ করিলা।
যৌতুক ছলে জাহ্নবারে আত্মসাৎ কৈলা॥

এইরূপ দুই চারিটি কৌতূহলজনক সংবাদ ইহাতে আছে ; সুতরাং চৈতন্যানুচর, অদ্বৈতগোষ্ঠী ও তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজ সম্বন্ধে ইহাতে যে সমস্ত তথ্য আছে, ইতিহাসের দিক দিয়া তাহার মূল্য অল্প নহে।

হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল' অদ্বৈতপ্রকাশের মতো সুপরিচিত না হইলেও ইহাতেও অদ্বৈত জীবন বিষয়ে কিছু কিছু নূতন তথ্য আছে। অবশ্য অদ্বৈতপ্রকাশ ও 'অদ্বৈতমঙ্গলে'র মধ্যে কাহার তথ্য কতটা বিশ্বাসযোগ্য তাহাও চিন্তার বিষয়। হরিচরণদাস অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুতানন্দের শিষ্য। তিনি সীতাদেবী ও অচ্যুতানন্দের নিকট অদ্বৈতাচার্যের শান্তিপুরধামের জীবনকাহিনী শুনিয়াছিলেন, কিন্তু অদ্বৈতপ্রভুর বাল্যলীলা সংক্রান্ত কাহিনী তিনি সংগ্রহ করেন অদ্বৈতের সম্পর্কে মাতুল বিজয়পুরীর নিকট। বিজয়পুরী মাধবেন্দ্র পুরীর সতীর্থ ছিলেন।

এই কাব্যে কবিকর্ণপূরের চৈতন্যলীলা সংক্রান্ত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের উল্লেখ আছে বলিয়া[১০] কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহা 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে'র পরে রচিত হইয়াছিল।[১১] 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' ১৪৯০ শকে (১৫৬৮ খ্রীঃ অঃ) রচিত হয়। সুতরাং হরিচরণদাসের অদ্বৈতমঙ্গলের রচনাকাল ইহার পরে হওয়াই সম্ভব। তেইশ অধ্যায়ে বিভক্ত এই কাব্যে কাহিনীর দিক দিয়া মোট

---

১০ চৈতন্যলীলা বর্ণিলা কবি কর্ণপুর।
তাহাতে জানিলা সবে রসের প্রচুর॥

১১ ব. সা. প. প, ১৩০৩

পাঁচটি উপবিভাগ আছে :—(১) অদ্বৈতের জন্ম ও বাল্যলীলা, (২) পৌগণ্ড-লীলা ও শান্তিপুরে আগমন, (৩) কৈশোরলীলায় তীর্থপর্যটন, বৃন্দাবন গমন, ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যা, দিগ্বিজয়ী পরাজয়, 'অদ্বৈত' নাম লাভ, (৪) যৌবনে শান্তিপুরে বাস, (৫) প্রবীণ বয়সে বিবাহ, নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎলাভ, পুত্রাদির জন্ম। গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায়ে তেইশ অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনার সংক্ষিপ্ত সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। লেখকের মতের সঙ্গে ঈশাননাগরের তথ্যাদির স্থানে স্থানে পার্থক্য আছে তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। ইঁহার বর্ণনা অনুসারে, অদ্বৈতের দুই স্ত্রী থাকিলেও জ্যেষ্ঠা সীতাদেবী বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ শ্রদ্ধাসম্মানের পাত্রী ছিলেন। হরিচরণের ঘটনাকাহিনীর বাহ্যিক বর্ণনা মোটামুটিভাবে ঈশাননাগরের অনুরূপ, দু-এক স্থলে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। ঈশাননাগর দেখাইয়াছেন, সীতাদেবী ও শ্রী—দুই ভগিনীকে অদ্বৈত বিবাহ করেন। কিন্তু হরিচরণ দাস বলিয়াছেন, অদ্বৈত সীতাদেবীকে বিবাহ করিলেও শ্রীকে বোধ হয় যৌতুকে পাইয়াছিলেন :

তাহার কনিষ্ঠ শ্রীঠাকুরাণী।
পিতা আনিয়া প্রভুকে দিলা আপনি॥

ইহা কি নিত্যানন্দের জাহ্নবাদেবী বিবাহের অনুরূপ ব্যাপার? এই কাব্যে সীতাদেবীর বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। অচ্যুতের উল্লেখও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সীতাদেবী স্বামীর নিকট দীক্ষা লইয়াছেন, ইহাও এ কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। ভাষা অতিশয় নীরস ও বৈশিষ্ট্যবর্জিত—ইহাতে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাষা প্রভাব অতি প্রকট। ছন্দে অলঙ্কারে কবি কোনরূপ নৈপুণ্য প্রকাশের চেষ্টা করেন নাই। সহজ বিবৃতিধর্মী বর্ণনা হিসাবে নবদ্বীপের বাস্তবচিত্র মন্দ নহে :

জম্বুদ্বীপ মধ্যে হয় নবদ্বীপ গ্রাম।
শ্রীবৃন্দাবন প্রায় গুণবন্ত ধাম।
তথা যমুনাবেষ্টিত অর্ধচন্দ্র।
তথা রহে গঙ্গা যে সেহি প্রায় ছন্দ॥
গঙ্গা যমুনা দোঁহে আছে এক ঠাই।
কভু এক হইয়া রহে কভু যায় তথাই॥
বড় বড় ব্রাহ্মণ দেশে দেশে আসি।
নবদ্বীপে বাস করে হৈয়া তপস্বী॥

মহাদেব ক্ষেত্রপাল লিঙ্গরূপে রহে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সবে পূজে তাহে॥

হরিদাসের 'অদ্বৈতবিলাস' নামে একখানি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এই ধরনের অকিঞ্চিৎকর রচনা সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ নাই।

অদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবী বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ মান্যা ছিলেন। অবশ্য তিনি জাহ্নবাদেবীর মতো সম্প্রদায়ের নেত্রীত্ব না করিলেও তাঁহারও অনেক শিষ্য ছিল; শান্তিপুর সম্প্রদায়, অচ্যুতানন্দের শিষ্য ও শাখাভুক্ত সকলেই তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিত। তাঁহারও দুইখানি জীবনীকাব্য পাওয়া গিয়াছে—লোকনাথদাসের 'সীতা চরিত্র' এবং বিষ্ণুদাস আচার্যের 'সীতাগুণ-কদম্ব'। লোকনাথের 'সীতা চরিত্র' আকারে অতি ক্ষুদ্র, দশ (মতান্তরে ত্রয়োদশ) অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। এই কাব্যে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখ আছে, সুতরাং ইহা বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থদ্বয়ের পরবর্তী কালের রচনা তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে সীতাদেবীর অলৌকিক জীবনকথার সঙ্গে তাঁহার পুত্রগণের বর্ণনা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়েরও উল্লেখ আছে—বিশেষতঃ গৌরাঙ্গের জন্ম হইতে সন্ন্যাস, নীলাচলে গমন এবং অন্তর্ধান পর্যন্ত কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। সীতাদেবীর দুই শিষ্যের বিচিত্র বর্ণনা ইহাতে কিঞ্চিৎ অদ্ভুতরস সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার দুইজন শিষ্য স্ত্রীবেশে স্ত্রীভাব ধারণ করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র কাব্যের ভাষা বেশ সরস, বর্ণনাও পরিচ্ছন্ন। চৈতন্যদেবের তিরোধানে অদ্বৈত ও সীতাদেবীর বিলাপ উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত হইতেছে:

হরি হরি কি হৈল মরমের কাজ।
ছাড়ি মহীমণ্ডল গৌরাঙ্গ যে কোথা গেল
আচার্যের মাথে পৈল বাজ॥
নীলাচলে ছিল গৌর ভরসা আছিল মোর
অনায়াসে হৈত দরশন।
কি বুঝিয়া কি না কৈনু কেনে পত্র পাঠাইনু
যৈছে কৃষ্ণ গেলা বৃন্দাবন॥
মনে ছিল বড় সাধ ধরি প্রভুর শ্রীপাদ
নীলাচলে ছাড়িব জীবন।
ইহাতে বিপাক হৈল আগে লীলা সম্বরিল
এই সব বিধির ঘটন॥

বিষ্ণুদাসের 'সীতাগুণকদম্ব' আর একখানি ক্ষুদ্র জীবনীকাব্য—এটি নাকি ১৪৪৩ শকাব্দে (১৫২১-২২ খ্রীঃ) রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ভাষাদৃষ্টে তাহা মনে হয় না। বিষ্ণুদাস নিজে সীতাদেবীর শিষ্য ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পরিবেশিত তথ্যে খানিকটা বিশ্বাসযোগ্য উপাদান থাকাই সম্ভব। তিনি একদা বৈষ্ণবসমাজে, বিশেষতঃ শান্তিপুর সমাজে যে কিরূপ মান্যা ছিলেন, তাহা এই দুইটি জীবনীকাব্য হইতেই বুঝা যাইবে।

বৈষ্ণবসমাজবিষয়ক নিবন্ধ ॥

এই অধ্যায়ের ভূমিকাংশে আমরা দেখিয়াছি যে, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে নানা দল-উপদলের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কয়েকজন আচার্য নেতা হইয়া সমাজকে পরিচালনা করিতেছিলেন, তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্য ও শাখাভুক্ত বৈষ্ণব জনসাধারণের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে এই সমাজকে সংহত করিবার জন্য বৈষ্ণব স্মৃতিনিবন্ধ, সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা, আচার্য ও গোষ্ঠীর বিবরণ প্রভৃতি জ্ঞাতব্য তথ্যের দিক হইতে মূল্যবান কয়েকখানি ইতিহাসগ্রন্থ এই যুগের বিশেষ সংযোজনা। যদিও এগুলির বিশেষ কোন কাব্যগুণ নাই, ইহারা নিতান্তই তথ্যসর্বস্ব ঘটনাবিবৃতিমাত্র, তবু সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায় ও সমাজের অনেক উপাদান এই সমস্ত সমাজ-ইতিহাস সংক্রান্ত কাব্যে নিহিত আছে। নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস', যদুনন্দনদাসের 'কর্ণানন্দ', মনোহর-দাসের 'অনুরাগবল্লী', গোপীজনবল্লভদাসের 'রসিকমঙ্গল' এবং বিভিন্ন লেখকের 'শাখা নির্ণয়'—এই ধরনের কয়েকখানি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে।

নিত্যানন্দদাসের প্রেমবিলাস ॥ শ্রীখণ্ড গ্রামে বৈদ্যবংশে নিত্যানন্দ দাসের জন্ম হয়। তাঁহার আসল নাম বলরামদাস। তাঁহার দীক্ষাগুরু জাহ্নবা-দেবী শিষ্যের নাম পাল্টাইয়া নূতন নামকরণ করেন নিত্যানন্দদাস। নিত্যা-নন্দের পুত্র বীরচন্দ্র তাঁহার শিক্ষাগুরু।[১২] কবি বাল্যকালে মাতাপিতা হারাইয়া

---

১২ "নিত্যানন্দপত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবী ইঁহার দীক্ষাগুরু। নিত্যানন্দতনয় বীরভদ্র শিক্ষাগুরু।" (প্রেমবিলাসের দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন)

জাহ্নবাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করেন; তাঁহার সান্নিধ্যেই কবির জীবন অতিবাহিত হয়। বস্তুতঃ তিনি ছায়ার মতো গোস্বামিনীকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। তদানীন্তন গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ, দল-উপদল, বৈষ্ণব মোহান্ত, বাঙলার বাহিরের বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। কারণ জাহ্নবাদেবীর সঙ্গে তিনিও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তাঁহার 'প্রেমবিলাসে'র ২০শ বিলাসের শেষে কবি সংক্ষেপে নিজের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়াছেন—তাহা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যায়। একনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের মতো তিনি বস্তুগত কাহিনী ও ঘটনার দিকে গুরুত্ব দিয়াছেন, কিন্তু নিজেকে সর্বদা নেপথ্যে রাখিয়াছেন। সেইজন্য ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় প্রেমবিলাসকে "বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ"[১৩] বলিয়াছেন।

নিত্যানন্দদাস সর্বপ্রথম বোধ হয় নিজ শিক্ষাগুরু বীরচন্দ্রের চরিত্র অবলম্বনে কোন জীবনীকাব্য লিখিয়া থাকিবেন। কারণ প্রেমবিলাসের দুই স্থলে তিনি সেরূপ ইঙ্গিত দিয়াছেন। যথা:

এই সব প্রসঙ্গ আমি অতি বিস্তারিয়া।
বীরচন্দ্র চরিতে রাখিল লিখিয়া॥
বীরচন্দ্র চরিতে অতি বিস্তারিয়া॥
বিবাহ বর্ণিল আমি আনন্দিত হঞা॥ (প্রেমবিলাস, ২৪শ বিলাস)

এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, কবি 'প্রেমবিলাসে'র পূর্বে বীরচন্দ্রচরিত রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, 'প্রেমবিলাসে'র ২০শ বিলাসের পর অন্যান্য চারটি বিলাস (অধ্যায়) অতি সন্দেহজনক। কারণ প্রাচীন পুঁথিতে ২০শ বিলাস পর্যন্তই আছে। সুতরাং ২৪শ বিলাসে উল্লিখিত এই বীরচন্দ্রচরিতের অস্তিত্ব বিশেষ সন্দেহজনক। কিন্তু আমরা ১৯শ বিলাসেও কবি রচিত বীরচন্দ্রচরিতের উল্লেখ পাইতেছি।

ইথে সূত্রমাত্র আমি বর্ণন করিল।
বীরচন্দ্রচরিতে তাহা বিস্তারি লিখিল॥
শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুর বৈরাগ্যের রীতি।
প্রভুর চরিতে আমি লিখিলাম কতি॥

এই প্রমাণের বলে স্বীকার করিতে হইবে যে, নিত্যানন্দদাস বীরচন্দ্রের

১৩ ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (১ম সং)

চরিত অবলম্বনেও কোন কাব্য লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, বা সেই মর্মে অন্য কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। সুতরাং কাব্যটি রচিত হইলেও প্রচারিত হইয়াছিল কিনা জানা যাইতেছে না, এবং প্রচারিত না হইবারই বা কি কারণ থাকিতে পারে তাহাও রহস্যময়। বীরচন্দ্রের অদ্ভুত চরিত্রই কি তাহার কারণ? যাহা হউক (নিত্যানন্দদাসের 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থটি বৈষ্ণব সমাজের প্রথম ইতিহাস হিসাবে অতিশয় মূল্যবান, এবং মধ্যযুগীয় বাঙলার সামাজিক দর্পণ হিসাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা ঐতিহাসিক মাত্রই স্বীকার করিবেন।)

এই কাব্যের যে সমস্ত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধ্যায়বিভাগগুলিতে সংখ্যাসমতা নাই। কোনটিতে ১৪শ-১৫শ, কোনটিতে ২০শ, কোনটিতে বা ২৪শ বিলাস (অধ্যায়) পাওয়া যাইতেছে। তবে অধিকাংশ পুঁথিতেই ২০শ বিলাস পর্যন্ত আছে। মনে হয় কবি ২০শ বিলাস পর্যন্তই লিখিয়াছিলেন, কারণ এই বিলাসের শেষে কবি আত্মপরিচয় দিয়াছেন।[১৪] কাব্য শেষ না হইলে কবি আত্মপরিচয় দিবেন কেন? শেষ চারি অধ্যায়ে (২১শ-২৪শ বিলাস) বীরভদ্রের কাহিনী আছে বলিয়া মনে হয়, ইহা পরবর্তী কালে সংযোজিত হইয়াছিল। কবি স্বয়ং বা অন্য কোন বীরচন্দ্রভক্ত জুড়িয়া দিয়া থাকিবেন। ইহাতে তথ্যঘটিত কিছু কিছু গরমিল থাকিলেও সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবসমাজের ইতিহাস হিসাবে ইহার বিশেষ মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। এখন দেখা যাক, কবি বৈষ্ণবসমাজের ইতিহাস বর্ণনায় কোন্ রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

---

১৪ বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত ও হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা হইতে রামদেব মিশ্র কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রেমবিলাসে'র দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে "প্রেমবিলাস যে বিংশ বিলাসেই পরিপূর্ণ, তাহাও গ্রন্থকর্তা নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন; সুতরাং তদ্বিষয়ে ইতস্ততঃ করা নিষ্প্রয়োজন।...যাহাতে ২৪ বিলাস আছে, তাহার সমস্ত কথাই ২০ বিলাসের মধ্যে নিবিষ্ট। বোধ হয় ২০ বিলাসকেই কোন কোন স্থানে অংশ (ভাগ) কল্পনা করিয়া ২৪ চব্বিশ করা হইয়াছে।" প্রেমবিলাসের বিভিন্ন পুঁথির মধ্যেও যে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে উল্লেখ করিয়া প্রকাশক রামদেব মিশ্র বলিয়াছেন, "যে গ্রন্থ যত প্রাচীন হয়, তাহার দশা তভই বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। বিভিন্ন দেশের রামায়ণ, মহাভারত ও অভিজ্ঞান শকুন্তল দেখিলেই ইহা বেশ বুঝা যায়, প্রেমবিলাসও সেইরূপ নানা স্থানে নানা লোকের হাতে নকল হইয়া কত রকম গোলযোগ হইয়াছে তাহা বলাও দুষ্কর।

(এই কাব্যে প্রধানতঃ শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ এবং গৌণতঃ জাহ্নবা-দেবী ও বীরচন্দ্রের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম তিনজনের কাহিনীই ইহার প্রধান অবলম্বন। এই কাহিনীতে কবি যথাসম্ভব বাস্তব-জীবনীর উপাদান এবং ঐতিহাসিক তথ্য ব্যবহার করিয়াছেন, কিছু-বা লোকমুখে শুনিয়া থাকিবেন। বস্তুতঃ 'ভক্তিরত্নাকর'কে ছাড়িয়া দিলে 'প্রেমবিলাসে'র সমতুল্য গুরুত্বপূর্ণ সমাজ-ইতিহাস-কাব্য মধ্যযুগে কদাচিৎ রচিত হইয়াছে। তিন আচার্যের জীবনী ও অলৌকিক কাহিনী ইহার মূল প্রেরণা হইলেও কবি বৈষ্ণবসমাজসংক্রান্ত নানা তথ্য ও ঘটনা ইহাতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনজন আচার্যের জীবনী লৌকিক হইয়াও ক্ষণে ক্ষণে অলৌকিক মহিমা লাভ করিয়াছে, কাজেই নিত্যানন্দদাস এই কাব্য রচনায় সব সময় লৌকিক-অলৌকিকের ভেদ না মানিলেও মোটামুটি তাঁহার অবলম্বন—আচার্যত্রয়ের ভক্তিরসময় ও অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনাপূর্ণ বাস্তব জীবন, যেখানে তাঁহারা বাস্তব পটভূমিকায় আবির্ভূত হইয়া অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করিয়াছেন।) শ্রীনিবাস আচার্যের জন্মের মধ্যে অলৌকিক মহিমা থাকিলেও তিনি যেভাবে ধর্মপ্রচার করিয়াছেন, দস্যু হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণসমাজ, দরিদ্র হইতে ভূস্বামী সম্প্রদায়—সকলকে প্রেমধর্মের ছায়াতলে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, বৈষ্ণব সমাজসঙ্ঘ পুনর্গঠনে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন, প্রয়োজনস্থলে কিছু কিছু রাজসিক আচারও গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহাকে একজন অতিশয় প্রখর বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন কর্মঠ সঙ্ঘনেতা বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ বীরহাম্বীর কর্তৃক গ্রন্থ লুণ্ঠন এবং পরিশেষে সপরিবারে আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণের ঘটনায় শ্রীনিবাসের অধ্যবসায়, মনীষা ও তৎপরতা প্রমাণিত হইয়াছে।

(নিত্যানন্দদাস নরোত্তমের নিত্যশুদ্ধ সাত্ত্বিক চরিত্র এবং শ্যামানন্দের নিষ্কলুষ ও প্রেমভক্তিনত আদর্শ জীবনকথাকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে কবির তথ্যপ্রিয়তা ও বাস্তবানুরক্তি বিশেষ প্রশংসনীয়। কথা-প্রসঙ্গে 'প্রেমবিলাসে' তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম—ভূস্বামী সম্প্রদায়ের শ্রীনিবাসের শিষ্যত্বে গ্রহণ, কায়স্থ নরোত্তম কর্তৃক ব্রাহ্মণদের দীক্ষা দান ও তাঁহাদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ, শ্যামানন্দের উৎকলে চৈতন্যধর্ম প্রচার, পশ্চিমবঙ্গের বনবিষ্ণুপুর ও উত্তর-বঙ্গের খেতুরীতে বৈষ্ণব

কেন্দ্রের বিকাশ। দ্বিতীয়—বৃন্দাবন হইতে প্রেরিত গ্রন্থ লুণ্ঠনের কাহিনী। তৃতীয়—খেতুরীর মহোৎসব বর্ণনা, চতুর্থ—জাহ্নবাদেবীর বৈষ্ণব সমাজের নেত্রীত্ব, বৃন্দাবনে গিয়া গোস্বামীদের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভক্তি লাভ। এই ঘটনাগুলি বৈষ্ণব-সমাজের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, বিশেষতঃ খেতুরীর মহোৎসব সমগ্র বৈষ্ণবধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যের দিকনির্দেশক ঘটনা। কবি সংক্ষেপে অথচ যথেষ্ট তথ্যাদি দিয়া এই উৎসবের বর্ণনা করিয়াছেন।) অবশ্য গ্রন্থ লুণ্ঠনের ব্যাপারে হয়তো একটু-আধটু তথ্যব্যতিক্রম হইয়াছে। গ্রন্থাপহরণের সংবাদে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শোকে রাধাকুণ্ডে দেহ ত্যাগের কাহিনী[১৫] হয়তো জনশ্রুতি মাত্র—এবং কবি সেই জনশ্রুতিকে অমান্য করিতে পারেন নাই।[১৬] হিন্দু সমাজ সম্পর্কে আরও দু-একটি সংবাদ উল্লেখযোগ্য। সে যুগেও রাঢ়ী ও বারেন্দ্রশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ চলিত, কবি তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। রাঢ়ীশ্রেণীভুক্ত নিত্যানন্দের কন্যা গঙ্গাদেবীর সঙ্গে বারেন্দ্রশ্রেণীর মাধবাচার্যের বিবাহের উল্লেখ করিয়া নিত্যানন্দদাস বলিতেছেন :

রাঢ়ীতে বারেন্দ্রে বিয়ে না ভাবিহ আন।
রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে হয় একের সন্তান॥
রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিয়ে হৈয়াছে অনেক।
দেশভেদে নামভেদ এই পরতেক॥

সে যুগের পক্ষে এই সংবাদ এবং এই বিষয়ে কবির উদার অভিমত বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। এই বিবাহের ব্যাপারে জাহ্নবাদেবীই অধিকতর উদ্যোগী ও

---

১৫ জরাকালে কবিরাজ না পারে চলিতে।
অন্তর্ধান কৈল সেই দুঃখের সহিতে॥
কুণ্ডতীরে বসি সদা করে অনুতাপ।
উছলি পড়িল গোসাঞি দিয়া এক ঝাঁপ॥
... ...
যেই গণে স্থিতি তাহা করিতে ভাবন।
মুদিত নয়নে প্রাণ কৈল নিষ্ক্রামণ॥

১৬ আরও একটি সংবাদ, কবির মতে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতের পূর্বে নাম ছিল 'চৈতন্য মঙ্গল', কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামীরা ইহার নাম রাখেন 'চৈতন্যভাগবত' :

চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনে মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল॥

আগ্রহী হইয়াছিলেন। বারেন্দ্র শ্রেণীর মাধবাচার্য ছিলেন নিত্যানন্দের পরম ভক্ত। জাহ্নবাদেবীর নির্দেশেই তিনি নিত্যানন্দের কন্যাকে বিবাহ করেন। তখন সমাজে রাঢ়ী-বারেন্দ্রের বিবাহ যে বেশ চলিত, তাহার প্রমাণ, "রাঢ়ী-বারেন্দ্রে বিয়ে হইয়াছে অনেক"।

এই গ্রন্থে বর্ণিত আরও দু একটি ব্যাপার কৌতূহলজনক। বৈষ্ণব-সমাজের আচার-আচরণের প্রতি অবৈষ্ণব হিন্দুসমাজ মাঝে মাঝে প্রতিকূল হইত বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে আচার্যদের অলোকসামান্য জীবনাদর্শের সংস্পর্শে আসিয়া শাক্ত হিন্দুরাও বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন, মুসলমান দস্যুরা ভক্ত বৈষ্ণব হইলেন, বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণও কায়স্থ নরোত্তমের চরণরেণু শিরে ধারণ করিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। বড় বড় ভূস্বামীরাও বৈষ্ণবমত গ্রহণ করাতে সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব আদর্শ গোটা বাঙলাদেশকেই যেন গ্রাস করিয়া ফেলিল, বাঙলার প্রান্তীয় অঞ্চলেও অতি দ্রুতিগতিতে এই প্রভাব ছড়াইতে লাগিল। কিন্তু নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবসমাজ হইতে জাতিপাঁতির ভেদ ঘুচিয়াছিল কিনা সন্দেহ। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ তখনও বৈষ্ণব সমাজে চলে নাই, চলিলে নিত্যানন্দদাস গঙ্গাদেবীর বিবাহ প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করিতেন।

শাক্ত-বৈষ্ণবদের ঘোর দ্বন্দ্বের নানা কাহিনী 'প্রেমবিলাসে' মাঝে মাঝে দেখা যায়। কিন্তু শাক্ত চণ্ডীদেবী সব সময়ে কৃষ্ণের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া চলিয়াছেন, মূঢ় শাক্তভক্তকে বৈষ্ণব হইবার জন্য স্বপ্নে প্রত্যাদেশ দিয়া নিজ ভক্তের উপর স্বত্বস্বামিত্ব ছাড়িয়া দিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীর পক্ষে ইহা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার বটে। দেখা যাইতেছে, শেষ পর্যন্ত শাক্ত সমাজে বৈষ্ণব প্রভাব ক্রমেই দৃঢ়মূল হইতেছিল। তবে তখনও সমাজ ও গণমানসে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব পুরামাত্রায় ছিল। যদিও কায়স্থ নরোত্তমের বহু ব্রাহ্মণ মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন, তবু ব্রাহ্মণের একগাছি যজ্ঞসূত্রের প্রতি অব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সমাজের যে কিঞ্চিৎ লোভ ছিল না এমন কথা বলিতে পারি না। তাহা না হইলে খেতুরী সম্মেলনে নরোত্তমকে ব্রাহ্মণ প্রমাণ করিবার জন্য বীরচন্দ্র এত চেষ্টা করিবেন কেন?[১৭]

১৭ পূর্বে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায় সম্পর্কিত প্রথম গ্রন্থ এবং অনেকটা তথ্যনিষ্ঠ বলিয়া ইতিহাসের দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। অবশ্য (ইহা পয়ারে লিখিত হইলেও কবির ভাষা অত্যন্ত নীরস ও গদ্যাত্মক—বিষয়বস্তুর জন্য সেরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। সে যুগে সাহিত্যকর্মে গদ্য ব্যবহৃত হইত না বলিয়াই কবি পয়ারে ইতিহাস লিখিয়াছেন।) অবশ্য তাঁহার কোনও প্রকার পল্লবিত কবিত্বশক্তিও ছিল না, থাকিলে গ্রন্থের কোথাও না কোথাও তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও তথ্যবহুল চিন্তামূলক গদ্যাত্মক গ্রন্থ; কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর মননশীল প্রতিভার সঙ্গে কবিপ্রতিভা মিলিত হইয়াছিল বলিয়াই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শুধু শুষ্ক দার্শনিক আলোচনায় পর্যবসিত হয় নাই, ইহার কাব্যগুণও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। দুঃখের বিষয় নিত্যানন্দদাস সেরূপ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, তাই তাঁহার 'প্রেমবিলাসে' অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য থাকিলেও, প্রায় কোথাও কাব্যের বাষ্পবিন্দু জমিতে পারে নাই।

যদুনন্দনের কর্ণানন্দ ॥ ইহার পরে 'কর্ণানন্দে'র উল্লেখ করা প্রয়োজন। বৈদ্যবংশোদ্ভূত যদুনন্দন দাস এই পুস্তিকার রচনাকার। সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা ও অনুবাদক যদুনন্দন দাস বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। বৈষ্ণব সাহিত্যে একাধিক যদুনন্দন থাকিলেও যিনি প্রসিদ্ধতর এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিই বোধ হয় কিছু কিছু পদ লিখিয়া এবং অন্যবিধ সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থে (কর্ণানন্দ, রাধাকৃষ্ণ-লীলারসকদম্ব, গোবিন্দলীলামৃত) কবি যৎসামান্য আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কাটোয়ার উত্তরাংশে মালিহাটী গ্রামে বৈদ্যবংশে তাঁহার জন্ম হয়।[১৮] তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য এবং শ্রীনিবাসের পৌত্র সুবলচন্দ্র ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন—'কর্ণানন্দে'র বহুস্থলে তিনি হেমলতা ঠাকুরাণীর বিশেষ

---

১৮ দীন যদুনন্দন বৈদ্য দাস নাম।
মালিহাটি গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার ॥ (প্রেমবিলাস—২য় নির্যাস)

জয়গান করিয়াছেন।[১৯] 'কর্ণানন্দ' রচনা করিয়া তিনি হেমলতাকেই শুনাইয়াছিলেন, এবং হেমলতাই কাব্যের নাম দিয়াছিলেন 'কর্ণানন্দ'। ষষ্ঠ নির্যাসে কবি ঐতিহাসিকের মতোই পরিচয় দিয়াছেন :

বুঁধুই পাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে।
সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে॥
পঞ্চদশ শত আর বৎসর ঊনত্রিশে।
বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে॥
... ...
গ্রন্থ শুনি ঠাকুরানীর মনের আনন্দ।
শ্রীমুখে রাখিলা নাম কর্ণানন্দ॥

কবি বুধুইপাড়ায় হেমলতা ঠাকুরাণীর নিকট বাস করিতেন। ১৫২৯ শকের (১৬০৭ খ্রীঃ অঃ) বৈশাখমাসে তিনি 'কর্ণানন্দ' সমাপ্ত করেন। বৈষ্ণব সমাজ, কুল, সম্প্রদায় ও শাখাপ্রশাখার ইতিবৃত্ত প্রভৃতি তথ্য তিনি হেমলতার নিকট সংগ্রহ করেন।[২০] কোথাও সন্দেহ হইলে ঈশ্বরী

---

১৯ কবি এই গ্রন্থে হেমলতাকে 'মদীশ্বরী' বলিয়াছেন, এবং প্রত্যেক নির্যাসের শেষে এইভাবে ভণিতা দিয়াছেন :

শ্রীআচার্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥
সেই দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস॥

'কর্ণানন্দে'র সম্পাদক ও প্রকাশক রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সুবলচন্দ্র ঠাকুরকেও কবির গুরু (ঐ সংস্করণের ভূমিকা, পৃ. ৶০) বলিয়াছেন। ইহা বোধ হয় ঠিক নহে। কারণ 'কর্ণানন্দের' প্রায় প্রত্যেক স্থলেই কবি হেমলতার জয়গান করিয়াছেন, তাঁহার পদবন্দনা করিয়াছেন, গ্রন্থ লিখিয়া তাঁহাকেই প্রথমে শুনাইয়াছেন, তাঁহার নির্দেশেই কাব্যের নামকরণ করিয়াছেন। সুতরাং যদুনন্দন হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য ছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে। তবে বোধ হয় তিনি হেমলতার ভ্রাতুষ্পুত্র সুবলচন্দ্রকেও বিশেষ ভক্তি করিতেন। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁহার শিষ্য ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। হেমলতার আজ্ঞাতেই তিনি 'কর্ণানন্দ' লিখিয়াছিলেন। তাই তিনি এই কাব্যের ষষ্ঠ নির্যাসে স্পষ্টই বলিয়াছেন :

শ্রীমতীর আজ্ঞা মুই লইয়া মস্তকে।
পরমানন্দে কর্ণানন্দ লিখিল পুস্তকে॥

২০ শ্রীমতীর মুখে আমি যেকথা শুনিল।
শুনিয়া আমার চিত্ত প্রসন্ন হৈল॥

ঠাকুরাণীর নিকট তিনি সংশয় নিরসন করিয়া লইয়াছেন। আরও কয়েকখানি গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া মনে হয়। রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের সংক্ষিপ্ত কাব্যানুবাদ করিয়া তিনি 'রাধাকৃষ্ণ-লীলারসকদম্ব' (সংক্ষেপ 'রস-কদম্ব') রচনা করেন। ইহাতে পয়ার ছন্দে নাটকটির ঘটনা ও নাটকের গানগুলি পদের আকারে অনূদিত হইয়াছে।[২১] তাঁহার আর একখানি অনুবাদকাব্য—'কৃষ্ণকর্ণামৃত'। বিল্বমঙ্গলের নামে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' শীর্ষক সংস্কৃত ক্ষুদ্র কাব্যখানি ভক্ত সমাজে সুপরিচিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সংস্কৃতে ইহার 'সারঙ্গরঙ্গদা' নামে টীকা রচনা করিয়াছিলেন। যদুনন্দন উক্ত টীকাসহ মূল কাব্যের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয় অনুবাদ-কাব্য—'গোবিন্দলীলামৃত'। যদুনন্দন কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্ত নামীয় বিরাট কাব্যকে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

কর্ণানন্দের সাতটি নির্যাসে (অধ্যায়) শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনকথা ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও বিবরণী আছে। কথাপ্রসঙ্গে কবি বৈষ্ণবসমাজ, ধর্ম, দর্শন সম্বন্ধেও অনেক মূল্যবান তথ্য সমাবেশ করিয়াছেন। অনেক বিস্মৃতপ্রায় ঘটনাকে ইহাতে স্থান দিয়া মধ্যযুগীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের ইতিহাসঘটিত অনেক তথ্য রাখিয়া গিয়াছেন। প্রথম দুই নির্যাসে কবি শ্রীনিবাসের প্রধান শিষ্য ও অনুশিষ্য সম্প্রদায়ের সুদীর্ঘ তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়াছেন—এই দিক দিয়া কবি বোধ হয় 'শাখানির্ণয়' ধরনের পুস্তিকা রচনা করিতে চাহিয়াছেন। শ্রীনিবাস আচার্য ও হেমলতা ঠাকুরাণীর গৌরব প্রচারই কবির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; সুতরাং তৃতীয় নির্যাস হইতে তাঁহার বর্ণনার রীতি বদলাইয়া গিয়াছে। পরবর্তী নির্যাসে তিনি শুধু নামের তালিকা না দিয়া শ্রীনিবাস প্রভাবিত বৈষ্ণব সমাজ ও তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। যথা—রামচন্দ্র কবিরাজ কর্তৃক বীরহাম্বীরকে বৈষ্ণব শাস্ত্রে দীক্ষাদান (৪র্থ নির্যাস)। এই অধ্যায়ে মূলতঃ কৃষ্ণদাস

---

২১ কেহ কেহ মনে করেন, 'রসকদম্বে'র লেখক আর-একজন যদুনন্দন, তাঁহার নাম যদুনন্দন চক্রবর্তী, এবং তিনি এই যদুনন্দনের পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী'তে জগদ্বন্ধু ভদ্র সেই মত প্রথম প্রচার করেন, এবং ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ও *History of Brajabuli Literature* (p. 219;-এ তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।

কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অবলম্বনে যত্নন্দন রসতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কবিরাজের মত ও আদর্শকেই প্রামাণিক সিদ্ধান্ত বলিয়া তিনি মানিয়া লইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত চৈতন্যযুগের কয়েকটি ঘটনাও ইহার বক্তব্য বিষয়ের অন্তর্গত। ষষ্ঠ নির্যাসে গোপালভট্টের কথা এবং বৈষ্ণব সমাজের আটজন কবিরাজ ও ছয়জন চক্রবর্তীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠকের জন্য আমরা সেই বর্ণনার কিয়দংশ উল্লেখ করিতেছি। আটজন কবিরাজের তালিকায় যত্নন্দন বলিতেছেন :

কবিরাজের জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কবিরাজ।
ব্যক্ত হৈয়া আছে নিজ গুণে জগতের মাঝ॥
তাহার অনুজ শ্রীকবিরাজ গোবিন্দ।
যাহার চরিত্রে দেখ জগৎ আনন্দ॥
তবে শ্রীকর্ণপুর কবিরাজ ঠাকুর।
বর্ণিয়াছেন প্রভুর গুণ করিয়া প্রচুর॥
তবে কবি শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ ঠাকুর।
ভজন প্রবল যার চরিত্র মধুর॥
ভগবান কবিরাজ মধুর আশয়।
প্রভুপদ বিনু যিঁহো অন্য না জানয়॥
বল্লবীদাস কবিরাজ বড় শুদ্ধ চিত্ত।
প্রভু পদে সেবা বিনু নাহি অন্য কৃত্য॥
তবে শ্রীগোপীরমণ কবিরাজ ঠাকুর।
বড়ই আনন্দময় গুণের প্রচুর॥
তবে কহি কবিরাজ শ্রীগোকুলানন্দ।
নিরন্তর ভাবে যিঁহো প্রভু পদদ্বন্দ্ব॥[২২] (৬ষ্ঠ নির্যাস)

যত্নন্দন বৈষ্ণব সমাজের ছয়জন চক্রবর্তীরও তালিকা দিয়াছেন। যথা—

২২ অতঃপর কবি আরও কয়েকজন উপকবিরাজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন :— গোবিন্দদাস কবিরাজের পুত্র দিব্যসিংহ, বসুদেব কবিরাজ, বনমালী দাস, দুর্গাদাস, রূপ কবিরাজ, নিমাই কবিরাজ, শ্যামদাস কবিরাজ, নারায়ণ কবিরাজ, বল্লবী কবিরাজের দুই ভ্রাতা—রামদাস কবিরাজ ও গোপালদাস কবিরাজ। তাঁহার মতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে আটজন প্রধান এবং এগারোজন অপ্রধান—মোট উনিশ জন 'কবিরাজ' প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

(১) গোবিন্দ চক্রবর্তী, (২) শ্যামদাস চক্রবর্তী, (৩) রামচন্দ্র চক্রবর্তী [২৩] (৪) ব্যাস চক্রবর্তী, (৫) রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী, (৬) গোকুলানন্দ চক্রবর্তী।[২৪]

ইহাতে আরও কয়েকটি মূল্যবান তথ্য আছে। শ্রীনিবাস আচার্যের সমাধি ও ব্যুত্থানের বিচিত্র কাহিনী তৃতীয় নির্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। একদা শ্রীনিবাস রাধাকৃষ্ণলীলা ধ্যান করিতেছিলেন, ধ্যানে তিনি রাধাকৃষ্ণের যমুনায় জলকেলি প্রত্যক্ষ করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান রহিত, নিশ্চেষ্ট ও জড়বৎ হইয়া পড়িলেন। তিনি যেন অন্যজগতে চলিয়া গিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের 'মঞ্জরী' হইয়া ধ্যানযোগে সে অপার্থিব লীলা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। রাধা জলকেলির সময় নাসার বেসর হারাইয়া ফেলেন। শ্রীনিবাস যেন মণিমঞ্জরী হইয়া যমুনার জলে সেই বেসর খুঁজিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই পাইতেছেন না। বাহ্যচেতনা রহিত হইয়া তিনি অলৌকিক ভাবরসে নিমজ্জিত হইয়া রহিলেন। সারাদিন এইভাবে চলিয়া গেল, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল, মণিমঞ্জরীবেশী শ্রীনিবাস শ্রীরাধার বেসর খুঁজিয়া পান না, ধ্যানভঙ্গও হয় না। এইভাবে একপ্রহর রাত্রি কাটিয়া গেল। তাঁহার দুই পত্নী এই ব্যাপার দেখিয়া স্বামীর অনিষ্ট আশঙ্কায় রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা বীরহাম্বীর সংবাদ পাইয়া গুরুর এই অবস্থা দেখিতে আসিলেন, দেখিলেন—আচার্যের যেন প্রাণ নাই —"নাকেতে অঙ্গুলি ধরে করে হায় হায়।" পত্নীরাও যখন দেখিলেন, আচার্যের নাসাগ্রে তুলা রাখিলে তাহা নড়িতেছে না, তখন তাঁহারা বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন রামচন্দ্র কবিরাজ আসিয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন, কারণ তিনি গুরুর এই আধ্যাত্মিক ব্যাপারের রহস্য জানিতেন। তাঁহার চেষ্টায় শ্রীনিবাসের বাহ্যচেতনা ফিরিয়া আসিল। শ্রীনিবাসের যোগযুক্ত অধ্যাত্মচেতনার বর্ণনায় যদুনন্দন বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

যদুনন্দন যে একজন (যে কয়জনই হউক না কেন) উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন

---

২৩ শ্যামদাস চক্রবর্তী ও রামচন্দ্র চক্রবর্তী শ্রীনিবাসের শ্যালক।

২৪ ইহা ছাড়াও কবি বীর হাম্বীর, দাস চক্রবর্তী, রামজয় চক্রবর্তী, রাধাবল্লভ চক্রবর্তী, রূপঘটক চক্রবর্তী, ঠাকুর চক্রবর্তী প্রভৃতি অন্যান্য চক্রবর্তীদের উল্লেখ করিয়াছেন। 'প্রেম বিলাসে'র ১৮শ বিলাসের শেষে চক্রবর্তী ও চট্টরাজ উপাধিক বৈষ্ণব ভক্তদের তালিকা আছে। কবি সম্ভবতঃ সেই স্থান হইতেই এই তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তত্ত্বকথা ও দার্শনিক রচনায় তিনি সার্থকভাবেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। কাহিনীবর্ণনা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবিবৃতিতেও তাঁহার রচনাকৌশল বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। অনুবাদ-কাব্যেও তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য দেখা যায়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শেষে যদুনন্দনের অনুবাদ কাব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে তাঁহার সার্থক অনুবাদশক্তির কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের প্রথম অঙ্কে আছে:

নাদঃ কদম্ববিটপান্তরিতো বিসর্পন
কো নাম কর্ণপদবীম্ অবিশন্ন জানে।
হা হা কুলীন-গৃহিণী-গণ-গর্হনীয়াম্
যে নাদ্য কামপি দশাং সখি লম্ভিতাস্মি॥

যদুনন্দন এইভাবে শ্লোকটির অনুবাদ করিয়াছেন:

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিঞা পশিল মোর কানে।
অমৃত নিছিয়া পেলি সুমাধুর্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে মনে॥
সখি হে, নিশ্চয় করিয়া কহি তোহে।
হা হা কুলরমণীরা গ্রহণ করিতে যাঁরা
যাতে কোন দশা কৈল মোহে॥

এই অনুবাদ মূলানুগ হইয়াও কৃত্রিম হয় নাই, প্রায় স্বাভাবিক ও মৌলিক রচনার স্বাদ ছত্রকয়টিকে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।[২৫] কবি নানাবিষয়ে প্রশংসনীয় উৎসাহ দেখাইলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার যথাযোগ্য স্থান সম্বন্ধে অনেকেই কৃপণতা করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই যে, "Jadunandana was one of the best lyric poets in the late sixteenth century."[২৬] তাঁহার বিচিত্র বিস্ময়কর প্রতিভা সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

---

২৫ ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় এ বিষয়ে যথার্থই বলিয়াছেন, "He was no mere translator. His poems are more creations than traslations". (HBBL, p. 222)

২৬ Ibid, p. 222

মনোহরদাসের অনুরাগবল্লী ॥ এই পুস্তিকাতেও শ্রীনিবাস-নরোত্তমাদি আচার্যগণ ও তাঁহাদের শাখা-সম্প্রদায়ের কিছু কিছু তথ্য আছে যাহা বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাস হিসাবে গণ্য হইবার যোগ্য। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যানুশিষ্য মনোহরদাস ১৬১৮ শকাব্দে (১৬৯৬ খ্রীঃ অঃ)[২৭] এই কাব্য রচনা করেন। শ্রীনিবাসের এক শিষ্য রামচরণ চক্রবর্তী, তাঁহার শিষ্য রামশরণ চট্টরাজ। মনোহরদাস ইঁহারই মন্ত্রশিষ্য। শিষ্যের সাংসারিক নাম পাল্টাইয়া গুরু নূতন নামকরণ করেন—মনোহরদাস। কবির পূর্বনাম জানা যায় না। তাঁহার গুরু রামশরণ চট্টরাজ কাটোয়ার নিকট বেগুনকোলা গ্রামে বাস করিতেন। কবিও গুরুর নিকট অবস্থান করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায় বিষয়ক এই কাব্যখানি বৃন্দাবনের নিকট কোন গ্রামে সমাপ্ত হয়। কাব্যটি আকারে ক্ষুদ্র, আটটি অনতিপ্রসর মঞ্জরী বা অধ্যায়ে বিভক্ত। শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনের প্রধান ঘটনা বর্ণনাই কবির মূল উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীনিবাস কীভাবে মহাপ্রভু সন্দর্শনে যাত্রা করিলেন, পথিমধ্যে তাঁহার অন্তর্ধানের কথা শুনিলেন, বৃন্দাবনে গিয়া গোপালভট্টের কৃপাকরুণা লাভ করিলেন—তাহার বর্ণনা এবং তাহারই সঙ্গে নরোত্তম-শ্যামানন্দের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব এবং গ্রন্থসহ গৌড়ে যাত্রার কথা কবি সংক্ষেপে বলিয়াছেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় বীরহাম্বীর কর্তৃক গ্রন্থাপহরণের কোন প্রসঙ্গ ইহাতে নাই। ইহার সপ্তম ও অষ্টম মঞ্জরীতে শ্রীনিবাসের শাখাবর্ণন অর্থাৎ শিষ্যতালিকা এবং চারি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের (শ্রীসম্প্রদায়, ব্রহ্মসম্প্রদায়, রুদ্রসম্প্রদায় ও সনক সম্প্রদায়) বর্ণনা ও তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে যাহার ঐতিহাসিক তথ্য অতিশয় মূল্যবান। সংস্কৃত কবিতা রচনাতেও কবির বেশ দক্ষতা ছিল। নিজের দীক্ষাগুরু রামশরণ চট্টরাজ লীলা সংবরণ করিলে শোকসন্তপ্ত কবি দুইটি সংস্কৃত শ্লোকে যে 'শুচক' পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে কবিকে বেশ অভিজ্ঞ সংস্কৃতনবিশ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কবির বাংলা রচনা নিতান্তই বিবৃতিধর্মী, প্রায়শঃই

---

২৭ অনুরাগবল্লীর সমাপ্তিতে আছে:

বসুচন্দ্রকলাযুক্তে শাকে চৈত্র সিতেঽমলে।
বৃন্দাবনে দশম্যন্তে পূর্ণানুরাগবল্লিকা॥

অর্থাৎ ১৬১৮ শকাব্দে (১৬৯৬ খ্রীঃ অঃ) বৃন্দাবনে এই কাব্য সমাপ্ত হয়।

সাহিত্যরস বর্জিত। তথ্যের দিক দিয়াও তাঁহার কোন কোন রচনাংশ প্রামাণিক বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দর্শনে তাঁহার অভিজ্ঞতা বিশেষ প্রশংসনীয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্ষুদ্র আকারের আরও কয়েকখানি শাখানির্ণয় জাতীয় পুস্তিকা রচিত হইয়াছিল। যথা—রাজবল্লভের বংশীবিলাস, গোপীজনবল্লভ-দাসের রসিকমঙ্গল, তিলকরামদাসের অভিরামলীলামৃত, উদ্ধবদাসের ব্রজমঙ্গল প্রভৃতি। বৈষ্ণবসমাজে এগুলির বড় একটা প্রচার নাই, সাহিত্যাংশেও ইহাদের বিশেষ কোন গুণ নাই। চৈতন্যের প্রতিবেশী ও ভক্ত বংশীবদন চট্টের জীবনকথাই 'বংশীবিলাসে'র মূল বক্তব্য। রচনা করিয়াছিলেন তাঁহারই বংশধর রাজবল্লভ। তিলকরামদাসের 'অভিরামলীলামৃতে' নিত্যানন্দের প্রধান অনুচর এবং পরবর্তী কালে খড়দহগোষ্ঠীর অভিভাবক-স্থানীয় অভিরামের চরিতকথা অবলম্বনে তিলকরামদাস 'অভিরামলীলামৃত' রচনা করেন। রাঢ় অঞ্চলে নিত্যানন্দ-বীরচন্দ্র-জাহ্নবাদেবীর পরেই অভিরাম জনপ্রিয় হিসাবে গণনীয় হইবার যোগ্য। খড়দহসম্প্রদায় গঠনে তাঁহার সঙ্ঘশক্তি ও কর্মনৈপুণ্যের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। গুরু নিত্যানন্দের মতো অনুচর অভিরামও কিছুটা বেপরোয়া ধরনের ছিলেন। তাঁহার অধ্যাত্মশক্তি ও শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে অনেক গল্প চলিয়া আসিতেছে। একদা খড়দহ কেন্দ্রের প্রধান নেতৃপদ লাভ করিয়া সমস্ত রাঢ়ভূমিতে অভিরাম যে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। উদ্ধবদাস 'ব্রজমঙ্গলে' লোচনদাসের কাহিনী ও শাখাপ্রশাখার বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে লোচনদাস বা লোচনানন্দ সম্বন্ধে এমন দুই-একটি কাহিনী আছে যাহা প্রামাণিক গ্রন্থাদিতে বড় একটা দেখা যায় না।

পরিশেষে আমরা গোপীজনবল্লভদাসের 'রসিকমঙ্গল' উল্লেখ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম-সমাজ-সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনা সমাপ্ত করিব। শ্যামানন্দ উৎকলে ও মেদিনীপুর অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে চৈতন্যধর্ম প্রচারে যে কতটা সফল হইয়াছিলেন, তাহার কাহিনী প্রামাণিক বৈষ্ণব ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। ধনী জমিদার ও দুর্দান্ত মুসলমান দস্যুও তাঁহার শিষ্য হইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। শ্যামানন্দের প্রসিদ্ধ শিষ্য রাজবংশোদ্ভূত রসিকানন্দের জীবন-কথাই 'রসিকমঙ্গলে'র মূল বক্তব্য। গ্রন্থটি ১৫৮২ শকাব্দে (১৬৬০ খ্রীঃ অঃ)

সমাপ্ত হয়। গোপীজনবল্লভদাস রসিকানন্দের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। এইজন্য রসিকানন্দের জীবনী এবং দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষতঃ উড়িষ্যা ও বাঙলার সীমান্তে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের যে তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে, ইতিহাস হিসাবে তাহার মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। কবি মোটামুটি ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিয়াছেন, কবিত্বেও তিনি উচ্চ স্থান দাবি করিতে পারেন; পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তীয় অঞ্চলে চৈতন্যসম্প্রদায়ের প্রভাব আলোচনা করিতে হইলে 'রসিকমঙ্গলে'র সাহায্য লইতে হইবে।

এই সমস্ত শাখা নির্ণয় ও বৈষ্ণব মহান্ত-জীবনকথা ছাড়িয়া দিলেও বৈষ্ণব তত্ত্বনিবন্ধ বিষয়ে বাঙলাদেশে অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হইয়াছিল। তাহার অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়াছে, পুঁথির আশ্রয়ে কিছু কিছু আমাদের যুগেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অধিকাংশ স্থলে বৈষ্ণব সহজিয়ারা চৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের আদর্শের সঙ্গে নিজেদের কৃত্য ও আচার-আচরণ সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। এগুলিকে এক কথায় 'সহজিয়া কড়চা' বলে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রূপগোস্বামী, নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি বিখ্যাত আচার্যদের ভণিতার আড়ালে সহজিয়া সাধকগণ নিজেদের সম্প্রদায়গত সাধনপ্রক্রিয়ার কথা উপমারূপকের ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। রঘুনাথদাস, জীবগোস্বামী, শ্রীনিবাস আচার্য, স্বরূপ গোস্বামী, লোচনদাস, গোপালভট্ট প্রভৃতি বিখ্যাত আচার্যেরাও ইঁহাদের লেখনী-আক্রমণ হইতে রক্ষা পান নাই। এই সমস্ত সাধনভজন বিষয়ক পুস্তিকায় প্রচ্ছন্নভাবে আরোপসিদ্ধির স্থূল ব্যাপারের নির্দেশ আছে। কামকে অবলম্বন করিয়া কামাতিক্রমের নানা গুহ্যাতিগুহ্য তত্ত্বদর্শন ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই সমস্ত পুস্তিকার প্রায় অনেক স্থলে নির্জলা কামাচারের কথাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কালে এই ধরনের রাশি রাশি পুস্তিকা রচিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ণিত সাধনভজন সহজিয়া বৈষ্ণবসাধনার অঙ্গ বিশেষ। বহু স্থলে আদিরসাত্মক আচরণের স্পষ্ট নির্দেশ আছে। গূঢ় ব্যঞ্জনা সত্ত্বেও ইহার স্থূল দেহঘটিত দিকটি ঢাকা পড়ে নাই। এই সমস্ত পুস্তিকা অবলম্বনে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুঃসাহসিকতার নামান্তর মাত্র। কারণ পুস্তিকার রচনাকারগণ নির্দ্বিধায় অনৃতভাষণের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। চৈতন্য-রূপ-সনাতন নারী সাহচর্যে

রসতত্ত্ব সাধনা করিতেন এরূপ ঘৃণ্য মিথ্যা বর্ণনাও কোন কোন পুস্তিকায় আছে। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত একটি পুঁথি (১৯৫২ সং) হইতে এইরূপ একটি চমকপ্রদ বর্ণনা উদ্ধার করিয়াছেন :

শ্রীরূপ সহিত পরম পিরীত
মিরাবাঈ সাথে বলি।
লক্ষহীরা সনে গোসাঞি সনাতনে
পরম বিবিধ কেলি ॥
ভট্ট রঘুনাথ কারনার সাথ
পিরীতে পরম সেবা।
সেই পুণ্যফলে শ্রীব্রজমণ্ডলে
মদনমোহন সেবা ॥
শ্রীজীবের প্রেমখানি শ্যামলা নাপিতানী
পিরীতি তাহার পন্থ।
সুকৃত গোপত না হয় বেকত
করিল ভক্তিগ্রন্থ ॥
চিরাবাই সনে পরম গোপনে
লোকনাথ প্রেমরাশি।
দাস রঘুনাথ তিবাবাই সাথ
পিরীতে রহিল পশি ॥

এই জাতীয় সহজিয়া পুঁথিতে এই ধরনের নির্জলা মিথ্যা কথা বেমালুম চলিয়া গিয়াছে। যাঁহারা যতিশুদ্ধ জীবনযাপন করিয়া সাধারণ মানুষের দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া আছেন, সহজিয়া লেখকগণ তাঁহাদের চরিত্রে এইরূপ মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিয়া নিজেদের ঘৃণ্য পন্থা শিষ্টসমাজে শ্রদ্ধেয় করিতে চাহিয়াছিলেন। মধ্যযুগের শেষভাগে এইরূপ অসংখ্য পুঁথির জঞ্জাল জমিয়া উঠিতেছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে সারা বাঙলাদেশ ও বাঙলার প্রান্তীয় অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম, সমাজ, নীতিদর্শন ও সাহিত্য কিভাবে বিকাশ লাভ করিতেছিল, জনচিত্তে সুগভীর প্রভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিল, জাতিসম্প্রদায়ে বিভক্ত বাঙালীকে সংহত সঙ্ঘশক্তি দান করিয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা এই

যুগের সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভের চেষ্টা করিয়াছি। এই শতাব্দীতে বৈষ্ণব আচার্য ও কেন্দ্রের প্রভাবে এদেশে বৈষ্ণবধর্মের অসাধারণ জনপ্রিয়তা এবং তাহার ফলে বৈষ্ণব সাহিত্যেরও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। পদাবলী, মহান্ত-জীবনীকাব্য, সমাজ-ইতিহাসঘটিত পুস্তিকা এবং সাধনভজন সংক্রান্ত পুঁথিপত্রের সংখ্যা দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু সংখ্যাবৃদ্ধি সত্ত্বেও সমগ্র সাহিত্যের যে বিশেষ উৎকর্ষ ঘটিতেছিল তাহা মনে হয় না। সাহিত্য ও সংস্কৃতির অপকর্ষ পরবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীতে চূড়ান্ত আকার ধারণ করিল। পরবর্তী পর্বে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করিব।

অষ্টম অধ্যায়

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবি

১

ভূমিকা: বাঙলায় মুসলমান

বাঙলায় ইসলামী সংস্কৃতির আবির্ভাব ॥

বাঙলা দেশে মুসলমানের অভিযান, আগমন ও সম্প্রসারণ ইতিহাসের ঘটনা হইলেও বঙ্গসংস্কৃতি, সমাজমানস ও জীবনচেতনার সঙ্গে ইসলামী-তমদ্দুনের অন্তর্গূঢ় যোগাযোগ এবং প্রভাব-প্রতিপ্রভাবের সম্পর্ক রহিয়াছে। ইহার শিকড় বহুদূর বিস্তৃত; ইহার ইতিহাস ও বিবর্তন শুধু সুলতানী ও সুবাদারী কাহিনী এবং রাজনৈতিক জঙ্গীবাদ ও পীর-ফকির-মুর্শিদের 'কেরামতে'র মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাতার-তুরকী-খোরাসানী-আফগানী-মুঘল-পারসীক মুসলমানগণ ভারতে প্রবেশ ও আধিপত্য বিস্তারের বেশ কিছু পরে বাঙলা দেশে তাহাদের প্রাধান্য দৃঢ়মূল হইয়াছিল। এই সঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে, বাঙলায় পাঠান শাসন স্থাপনের পূর্বেই চট্টগ্রাম-আরাকানে আরব বণিকদের যাতায়াত শুরু হইয়া গিয়াছিল। বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের ফলে যখন এই বণিকগণ এই অঞ্চলে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিল, তখন স্থানীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ জনসাধারণ যে ইহাদের কিঞ্চিৎ সংস্পর্শে আসিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আধুনিক কালের মুসলমান লেখকগণ এ সম্বন্ধে যে সমস্ত আজগবী সংবাদ ছড়াইতেছেন তাহার যাথার্থ্য সাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে।

নানাপ্রকার গালগল্পে দেখা যাইতেছে, পাহাড়পুরে খলিফা হারুন-অল-রসিদের (৭৮৬-৮০৯ খ্রী: অ:) একটি স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১] সুলতান ইয়াজিদ বস্তামি (৮৭৪ খ্রী: অ:), মীর সৈয়দ সুলতান মাহ্‌মুদ মহি সওয়ার (১০৪৭ খ্রী: অ:), শাহ্ মুহম্মদ সুলতান রুমি (১০৫৩ খ্রী: অ:), বাবা আদম শহিদ (১১১৯ খ্রী: অ:) শাহ্ নিয়ামতুল্লা বাৎমিখান প্রভৃতি মুসলমান

১ Dr. Enamul Huq—*Muslim Bengali Literature* (Karachi)

ধর্মগুরুগণ চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন—এরূপ কথাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।[২] এই সমস্ত তথ্য বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক বলিয়া প্রমাণিত না হইবার পূর্বে ইহাকে পুরাপুরি সত্যের মর্যাদা দিয়া গ্রহণ করা যায় না। তথাপি ইহা অবশ্য সত্য যে, পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান শাসন আরম্ভ হইবার দুই এক শতাব্দী পূর্ব হইতেই বাঙলার পূর্বাঞ্চলে আরবদেশীয় বণিকদের দ্বারা ইসলামী ভাবধারা ও ধর্মবিশ্বাস কিঞ্চিৎ প্রচার লাভ করিয়াছিল। অবশ্য কেহ কেহ মনে করেন যে, 'সেকশুভোদয়া'য় উল্লিখিত জলালুদ্দিন তাব্রিজি লক্ষ্মণসেনের সভায় উপস্থিত হইয়া অদ্ভুত ঐশ্বরিক ক্ষমতা দেখাইয়া লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার সভাপণ্ডিত হলায়ুধমিশ্রকে তাক লাগাইয়া দিয়াছিলেন—এই বিবরণ সত্য হইতে পারে। কিন্তু উক্ত 'সেকশুভোদয়া'—যাহা হলায়ুধের নামে প্রচারিত হইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিকতা ও প্রামাণিকতা অত্যন্ত সন্দেহজনক।[৩] সে যাহা হউক বর্তমানক্ষেত্রে একথা স্বীকার করা যাইতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গে তুর্কী আক্রমণ ও প্রভাব বিস্তারের পূর্বেই আরাকান ও চট্টগ্রামে আরবী মুসলমান ভাবাদর্শ ঐ অঞ্চলে প্রচারিত হইয়াছিল। তারপর তুর্কী অভিযান ও শাসনের সময় উত্তরাপথ ও ভারতের বাহির হইতে এদেশে মুসলমান পীর-ফকির মুর্শিদ ও সূফী মালিকদের আনাগোনা বাড়িয়া যায়। শাসক সুবাদার ও ধর্মগুরু পীরদের প্রভাবে বাঙলা দেশে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি হিন্দুসমাজে অল্পস্বল্প ছড়াইতে থাকে। শাহ্ জালাল তাব্রিজি (মৃত্যু ১২২৫ খ্রীঃ অঃ), শাহ্ জালাল জুজ্বারদ্-ই-য়মনি (মৃত্যু ১৩৪৭ খ্রীঃ অঃ), গাজি মুলক ইকরাম খাঁ (১২১৫ খ্রীঃ অব্দে বাঙলায় আগমন), মকতুম শাহ্ মুহম্মদ গজনভি, শাহ সফিউদ্দিন শহিদ, বদরুদ্দিন আল্লামা (বদরশাহ্) মুবারক শাহ্ (১৬১৮-৪৯ খ্রীঃ অঃ), মকতুম শাহ্ দৌলা (১২৫০ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত জীবিত), সৈয়দ আব্বাস আলি মাক্কি (চব্বিশ পরগণার গোরাচাঁদ পীর), মৌলানা আতা (১৩০০-১৩৫০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন), প্রভৃতি মুসলমান ধর্মপ্রচারকগণ সারা বাঙলা দেশে, আসাম-চট্টগ্রাম-আরাকানে ইসলামধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।[৪] ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সূফী সম্প্রদায়ভুক্ত

২ Ibid

৩ সেকশুভোদয়ার ভূমিকা, পৃ. XXX—XXXXI (ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত)

৪ Dr. E. Huq—op. cit

ছিলেন।[৫] বীরভূমের পীর আবদুল্লা কিরমানি প্রসিদ্ধ সূফী সাধক খাজা মৈনুদ্দিন চিশ্‌তির শিষ্য ছিলেন। যাহা হউক, রাষ্ট্র ও ধর্মপ্রচারকদের যুগপৎ চেষ্টার ফলে বাঙলা দেশে প্রচুর ধর্মান্তরীকরণ হইয়াছিল। বর্ণ-হিন্দুসমাজের দ্বারা কিঞ্চিৎ নিপীড়িত নিম্নবর্ণের হিন্দু, অধঃপতিত বৌদ্ধ সমাজ এবং রাজানুগ্রহ-প্রার্থী কিছু কিছু উচ্চকুলোদ্ভব হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল—এইভাবে বাঙলা দেশে হিন্দুসমাজের অনুদারতার ফলে এদেশের একটা বড় অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। অধিকন্তু বাঙলার বাহির হইতে যে সমস্ত আরবী ও ইরানী মুসলমান এদেশে আসিয়াছিলেন. তাঁহারা তো সঙ্গে করিয়া স্ত্রীদের লইয়া আসেন নাই, এখানেই হিন্দুকন্যাকে বিবাহ-নিকাহ্‌ করিয়াছিলেন।[৬] তাহা হইলে বাঙলার মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, একদিকে পীর-ফকির ও রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় হিন্দুসমাজের কিয়দংশ যেমন মুসলমান হইয়া গিয়াছিল, তেমনি নবাগত মুসলমানগণ হিন্দু স্ত্রী গ্রহণ করিয়া, বা হারেমে তাহাদিগকে স্থান দিয়া পরবর্তী কালে বাঙলার ইসলাম ধর্মকে একটা বিচিত্র মিশ্ররূপ দিয়াছিল।

হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সম্পর্ক ॥

বাঙলার মুসলমান সমাজ বিশুদ্ধ আরবী ও ইরানী 'তমদ্দুন' ও 'শরা' পন্থা কতটা মানিয়া চলিয়াছে তাহা অবশ্য চিন্তার বিষয়। মুসলমান জনসংখ্যার অধিকাংশই ধর্মান্তরিত মুসলমান। হয় হিন্দু, আর না হয় বৌদ্ধ, হয় গৌড়ীয় বাঙালী, আর না হয় আরাকানী বৌদ্ধ মগ-চাকমা—ইহারাই বাঙলার মুসলমান সম্প্রদায়কে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া তুলিয়াছিল। তাই এদেশে 'শরা' পন্থা অপেক্ষা 'বেশরা' পন্থার আচার-আচরণ মুসলিম সমাজে অবাধে

৫ পূর্ববঙ্গে মুসলিম সমাজে সূফীগণের বিশেষ প্রভাব ছিল। ভারতীয় সূফী সম্প্রদায় ১৪টি 'খানদান' বা শাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে ৪টি খান্দান—চিশ্‌তী, সুহ্‌রওয়াদী, নক্‌শবন্দী ও ক্বাদেরী সম্প্রদায়ের অধিক প্রভাব দেখা যায়।

৬ "Most of the soldiers who entered Bengal with Bakhtiar and his generals did not bring their wives with them or were unmarried. They and other foreign Muslims married in this province and settled down for good, and in due course of time Muslims became cultural force in Bengal." (Dr. E. Huq—*Muslim Bengali Literature*)

অনুপ্রবেশ করে। যাহারা দুই এক পুরুষ পূর্বে হিন্দু বা বৌদ্ধ ছিল, তাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াই যে রাতারাতি কোরান-হাদিস পাঠ করিয়া খাঁটি মুসলমান বনিয়া গেল তাহা মনে হয় না। তাহাদের বাহিরের ধর্ম পাল্টাইলেও অন্তরে বীজাকারে হিন্দু-বৌদ্ধ ঐতিহ্যের ভগ্নাবশেষ বজায় ছিল।[৭] তাই বাঙলার মুসলমান সুলতান যেমন বাঙালী হিন্দু কবিকে কাব্য-রচনার উৎসাহ দিতেন তেমনি মুসলমান কবিকেও হিন্দুবিষয় লইয়া কাব্য রচনায় নিরুৎসাহিত করিতেন না। ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজও আচারে বিচারে, ধর্মমতে, বিশ্বাসে কিছু কিছু হিন্দুয়ানী মানিয়া চলিত—মুসলমান শ্রোতাও ভক্তিভরে রামায়ণ-মহাভারত শুনিত। সৈয়দ সুলতান নামক এক মুসলমান কবি লিখিয়াছেন যে, হিন্দুমুসলমান সকলেই কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত পড়িত :

লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি।
কবীন্দ্র ভারতকথা কহিল বিচারি॥
হিন্দু মুসলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে।
খোদার গুণের কথা কেহ না কহিল॥

আলাওল, দৌলত কাজী প্রভৃতি কবিগণ তাঁহাদের কাব্যের বহু স্থলে হিন্দু শাস্ত্রাদিতে প্রশংসনীয় অধিকারের পরিচয় দিয়াছেন। কলিকাতা নিবাসী শেখ জালাল মাহ্‌মুদ (১৮শ শতাব্দী) নিজে পড়িবার জন্য কাশীরাম দাসের মহাভারতের নকল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই পুঁথিটি এখনও ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে।[৮] জঙ্গনামা, রসুলবিজয়, রসুলনামা—এই সমস্ত ইসলামী

৭ "এই কুসংস্কার, আচার, বিচার ও রীতিনীতির মূল খুঁজিতে গেলে দেখা যাইবে—বাঙ্গালার সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানেরা ইহার অনেকগুলি হয় পৈত্রিক উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহাদের হিন্দু বা বৌদ্ধ পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন, নয় তাঁহাদের প্রতিবেশীদের নিকট হইতে ধার বা অনুকরণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্বাসমূলক সংস্কারগুলি যে পৈতৃক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কেন না জাতিগত বিশ্বাসগুলি ধর্ম পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় হইতে মুছিয়া না গিয়া fossil বা মৃত্তিকা-গর্ভস্থিত প্রস্তরীভূত প্রাচীন উদ্ভিজ্জ বা জান্তবদেহ সদৃশ প্রচ্ছন্নভাবে অন্তরের অন্তস্তলে লুক্কায়িত থাকে এবং সুযোগ পাইলে কালক্রমে আত্মপ্রকাশ করিতে কসুর করে না।" (মুন্সি আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ ও ডঃ এনামুল হক প্রণীত 'আরকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্য')

৮ ডঃ সুকুমার সেন—ইসলামি বাংলা সাহিত্য

গ্রন্থেও মুসলমান কবিগণ রামায়ণ-মহাভারতের রীতি ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করিয়াছেন, কেহ হিন্দুদের গুরুপূজার অনুকরণে পীর-মুর্শিদ পূজাও সমর্থন করিয়াছেন। কবি সেরবাজের 'মল্লিকার হাজার সওয়ালে' অতি স্পষ্টভাবে পীর-মুর্শিদের পূজা-অর্চনা-ভজনার কথা বলা হইয়াছে :

কায়াশুদ্ধ হয় জান মুর্শিদ ভজিলে।
লাঠি লৈক্ষ্যে চলে যেন আন্ধিআল সকলে॥
মুর্শিদ প্রসাদে হয় আঁখির প্রকাশ।
মিহির কিরণে যেন উজ্জ্বল আকাশ॥

('আরকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্য' হইতে উদ্ধৃত)

কবি মর্দন 'নছিরনামা'য় হিন্দুর কর্মবাদ ও পুনর্জন্মবাদকেও স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন :

দেখ দেখ জার জেই আছে কর্মভোগ।
সেই মতে কর্ম ফল ভুঞ্জে দুঃখসুখ॥ (ঐ)

সূফী মতাবলম্বী ও বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবিরা যে হিন্দুর যোগ-তন্ত্রের পারিভাষিক শব্দ এবং বৈষ্ণব সংস্কার কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করিয়াছেন তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়।

মুসলমান কবির কোন কোন কাহিনীতে আছে যে, মুসলমান নায়ক হিন্দু নায়িকাকে বিবাহ করিলেও সব সময়ে হিন্দু স্ত্রীকে 'শরা' পড়াইয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। মোহম্মদ আকবরের 'জেবলমুলুক-শামারোখে' নায়ক জেবলমুলুক হিন্দু রতিকলাকে বিবাহ করিলেও রতিকলা নামধাম ও আচারে-আচরণে হিন্দুই রহিয়া গেল। দোনা গাজী চৌধুরীর 'সয়ফুল-মুলুকে' নায়িকার বিবাহের পূর্বে স্নানের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অবিকল হিন্দুকন্যার অধিবাসের মতো।[১]

---

১ অবশ্য রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক কারণে আধুনিক যুগে অনেক মুসলমান লেখক বাঙলার সাধারণ মুসলমানের এই হিন্দু-ঘেঁষা আচার-আচরণকে কুসংস্কার বলিয়া ঘৃণা করিয়াছেন এবং ইহাদিগকে আরবী-ফার্সী কিতাবের রীতি-আদর্শের দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ উগ্র হইলে অনেক সময় যুক্তি-বুদ্ধি বিপর্যস্ত হয়—তাহার দৃষ্টান্ত ডঃ এনামুল হক সাহেবের '*Muslim Bengali Literature*-এ প্রচুর পাওয়া যাইবে। হক সাহেব মনে করেন, বাঙলার বৈষ্ণব ধর্ম সুফী মতবাদের প্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে—"The innermost core of Vaishnavism was filled with Sufistic

মুসলমান সমাজে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ ॥

বাঙলা দেশের মুসলমান সমাজে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ ঘটিত প্রচ্ছন্ন ভেদ বিভেদ আছে তাহা মুসলমান সমাজতাত্ত্বিকগণ প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ (ডঃ এনামুল হক ও মুন্সি আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ) মনে করেন যে, চট্টগ্রাম-আরাকানের মুসলমান কেন্দ্র, বাঙলা দেশে মুসলমান আধিপত্য স্থাপনের পূর্বেই প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল, এবং এই অঞ্চলের ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ আরবী বণিক ও ইরানী সাধক-পীরদের নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে মুসলমান ধর্ম ও 'তমদ্দুনে' দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।[১০] কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজ প্রধানতঃ উত্তরাপথের উর্দু-জবান-দুরস্ত পশ্চিমা মুসলমানের নিকট হইতে 'second hand' ধরনের ইসলাম ধর্ম পাইয়াছিল। সেই দিক দিয়া পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজ অধিকতর বিশুদ্ধ আদর্শ ও 'শরা' পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। অনেক পূর্ব হইতেই পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান কবিরা বাংলা সাহিত্য চর্চায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কাব্যাদিতে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন, অবশ্য ইসলামী তত্ত্বসংক্রান্ত কাব্যে তাঁহাদিগকে ইসলাম ধর্মের পারিভাষিক আরবী-ফার্সী শব্দ বাধ্য হইয়াই গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে সে কথা একবাক্যে বলা যায় না।

sentiments" আরও অদ্ভুত কথা—"Radha and Krishna, though originally Hindu, had been purified of gross elements and transformed into *Ashiq* and *Mashuq* in Vaishnava literature." (পৃ. ৫০) তাঁহার মন্তব্য কিরূপ হাস্যকর তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দিই, "An analysis of the Gaudian from of Vaishnavism proves it to be almost a Bengali version of Muslim Sufism." (পৃ. ৪৯) তাঁহার মতে সূফীদের গজলিয়ৎ (Ghazaliat) এবং বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী প্রায় একই প্রকার। সূফীদের 'মই' ও 'শর্ব' নাকি বৈষ্ণব দর্শনে 'প্রেম' ও 'প্রীতি'তে রূপান্তরিত হইয়াছে। লেখক আরও বিচিত্র সরলীকরণ করিয়াছেন। যথা—সূফীদের 'আশিক'=রাধা, মাশুক=কৃষ্ণ, হিজরন (Hizran)=বিরহ, বিসল=মিলন। সাদৃশ্যের অর্থ যে সব সময়ে প্রভাব নহে, তাহা লেখক বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন।

১০ "পূর্ববঙ্গের সাধারণ মুসলমান সমাজ ইসলামকে লাভ করিয়াছিল সোজা আরবদের নিকট হইতে। আর পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মুসলমান সমাজ ইহাকে লাভ করিয়াছিল দ্বিতীয় হাতের মধ্যস্থতায়। অর্থাৎ পাঠান, মোঘল এবং সর্বোপরি উত্তর ভারতীয় দরবেশদের হাত হইতে।" ('আরকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্য')

অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি-কেন্দ্রে পরিণত হইলে এই অঞ্চলের মুসলমান সমাজ প্রাধান্য লাভ করে, কলিকাতার বহু ছাপাখানা তাহাদের করায়ত্ত হয়। তাহারা কোন কোন দিক দিয়া পশ্চিমা মুসলমানের মুখাপেক্ষী ছিল বলিয়া পশ্চিমা মুসলমানের উর্দু ভাষা অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান-সাহিত্যে প্রচণ্ড কলরব তুলিয়াছিল। 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য' বলিয়া যে বিচিত্র ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার গৌরব বা অগৌরব সমস্তই পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানের প্রাপ্য। পূর্ববঙ্গের কবি আবদুল হাকিম তাঁহার 'নূরনামা' কাব্যে আরবী-ফার্সী-প্রেমিক বাঙালী মুসলমানকে সুকঠোর ভাষায় নিন্দা করিয়া লিখিয়াছিলেন:

> জে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবানি।
> সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি॥
> দেসি ভাসা বিদ্যা জার মনে না জুয়াএ।
> নিজ দেস তেয়াগি কেন বিদেশে না জাএ॥

পশ্চিমবঙ্গ উনবিশ শতাব্দীতে নাগরিক জীবনের কেন্দ্রে পরিণত হইলে পশ্চিমা হিন্দী-হিন্দোস্তানী-উর্দুভাষী মুসলমানের সংস্পর্শে আসার ফলে এই অঞ্চলের মুসলমান সমাজ আরবী-ফার্সী শব্দ জোর করিয়া বাংলাভাষায় ব্যবহার করিয়াছিল, মুঘলযুগের উত্তরাপথের হিন্দী-উর্দু-আরবী-ফারসী-ভাষী মুসলমানের সংস্পর্শে আসিয়া পশ্চিম বাঙলার মুসলমানও উত্তরাপথের ভাষা-সংস্কৃতিকে খাঁটি ইসলামী 'তমদ্দুন' মনে করিয়া তাহার অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাই এই অঞ্চলের মুসলমান সমাজে ও সাহিত্যে আরবী ফার্সীর একটা উৎকট আতিশয্য দেখা দেয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গে বিশেষতঃ চট্টগ্রাম-আরাকান অঞ্চলের মুসলমান কবিগণ বিনা প্রয়োজনে প্রায় কোথাও ইসলামী শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তাই তাঁহাদের রচিত অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থ (ধর্মগ্রন্থ বাদে), শুধু মুসলমান সমাজের নহে, সমগ্র বাঙালী সমাজের আদরের সামগ্রী হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের দৌলত কাজী, আলাওল, আলীরাজা এবং বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবিগণ যাহা রচনা করিয়াছিলেন তাহা বাঙালী হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই শিরোধার্য করিয়াছেন। এই দিক দিয়া পূর্ববঙ্গের বাঙালী মুসলমানের বাংলা সাহিত্য গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তথাকথিত 'ইসলামী

সাহিত্য', যাহার অনেকটা পরবর্তী কালে পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমানের সৃষ্টি, তাহা সমগ্র বাঙালীর সাহিত্য হইয়া উঠিতে পারে নাই।

বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তিনটি অঞ্চলের মুসলমান কবিসাহিত্যিকগণ বাংলা সাহিত্য রচনা ও অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গের প্রধান কর্মকেন্দ্র ও পাঠান রাজত্বের পীঠস্থান গৌড়কে কেন্দ্র করিয়া মুসলমান সুলতান ও তাঁহার সভাসদের মধ্যে যে সমস্ত গল্পকাহিনীর প্রচলন হইয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ততটা পাওয়া না গেলেও কিছু কিছু অনুমান করা যাইতে পারে। জৌনপুরের সুলতান শর্কি-বংশীয় হুসেন শাহ যখন বাঙলা দেশে পলাইয়া আসিয়া গৌড়ের সুলতানের আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন তখন তাঁহার সঙ্গে হিন্দী ভাষার বিখ্যাত কবি কুতুবনও আসিয়াছিলেন। কুতুবন ৯০৯ হিজরীতে (১৫১২ খ্রীঃ অঃ) এই গৌড়দেশে বাস করিবার সময়ে 'মৃগাবতী' নামক একখানি রোমান্টিক প্রেমের কাব্য নিজ মাতৃভাষা পূরবীয়া হিন্দীতে রচনা করিয়াছিলেন। বিযাদান্ত কাব্য 'মৃগাবতী'র পাত্র-পাত্রী হিন্দু; কিন্তু ইহাতে কোন দেবমাহাত্ম্য প্রচারিত হয় নাই। কাব্যের অন্তে রাজকুমারের মৃত্যু এবং তাঁহার দুই পত্নী রুক্মিণী ও মৃগাবতীর সহমরণের বেদনাদায়ক কাহিনী গৌড়ের মুসলমান সুলতানের দরবারে বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। কিন্তু উত্তরবঙ্গের হিন্দু কবিগণ, যাঁহারা সুলতান হুসেন শাহ ও তাঁহার পুত্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা মৃগাবতীর পার্থিব কাহিনীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট না হইয়া দেবমাহাত্ম্য বর্ণনায় অধিকতর উৎসাহিত হইয়াছিলেন। ফলে কুতুবনের 'মৃগাবতী' সমকালীন বাঙালী হিন্দু কবিকে বিশেষ প্রভাবিত করিতে পারে নাই। যাহা হউক গৌড়ের সুলতান কাব্য-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তিনি হিন্দু কবিদের উৎসাহ দিতেন এবং হিন্দু কবিরাও সুলতানের উচ্চ প্রশংসা করিয়া কাব্যে স্তুতিবাদ করিতেন—কিন্তু 'মৃগাবতী'র অনুরূপ কোন কাব্য রচনায় তাঁহাদের ইচ্ছা হয় নাই—মধ্যযুগীয় ধর্মপ্রধান হিন্দুসমাজই তাহার প্রধান কারণ।

আরাকানী মুসলমান ও বাংলা সাহিত্য ॥

চট্টগ্রাম ও আরাকান কেন্দ্র হইতে বাঙালী মুসলমান কবি-রচিত যে সমস্ত

কাহিনী-কাব্য আমাদের যুগেও আসিয়া পৌঁছাইয়াছে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার বিশেষ স্থান স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আরাকান সম্বন্ধে দুই এক কথা জানিয়া রাখা ভালো। কারণ হয়তো মনে হইতে পারে বাঙলার বাহিরে ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত আরাকানী মগমুল্লুকে বাংলা সাহিত্য কীভাবে এবং কেনই-বা অনুশীলিত হইবে? কিন্তু সেই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইয়াছিল কয়েকজন বাঙালী মুসলমান কবির আবির্ভাবের ফলে।

আরাকান-বাসীরা বহু পূর্ব হইতে তাহাদের দেশকে 'রখইঙ্গ' (*Rakhaing*) নামে অভিহিত করিত। খুব সম্ভব এই শব্দটি সংস্কৃত 'রক্ষ' শব্দের (পালিতে যক্ষ অর্থে ব্যবহৃত) অপভ্রংশ।[১১] বোধ হয় আর্যেরা দ্রাবিড়-মোঙ্গল অধ্যুষিত আরাকানকে এইরূপ অপনাম প্রদান করিয়াছিলেন। আরাকানী ভাষায় 'রখইঙ্' শব্দের অর্থ দৈত্য বা রাক্ষস—তাহার অধিবাসী, এই অর্থে আরাকানী ভাষায় 'রখইঙ্গ-তঙ্গী' (*Rakhaing taingyyi*) শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[১২]

এই অঞ্চল সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব হইতে আরবী ও বাঙালী মুসলমানদের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। আরবী মুসলমানগণ ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য চট্টগ্রামে সমবেত হইত, সেখানে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল আরাকানেও বাণিজ্য-ব্যাপার লইয়া আনাগোনা করিত। বাঙালী মুসলমান—অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের মুসলমান—আরাকানের সেনাবাহিনীতে ও অন্যান্য রাজকর্মে নিযুক্ত হইতেন। পরে হুসেনশাহী বংশ কর্তৃক আরাকান বিজিত হইলে এখানে বাঙালী মুসলমানের যাতায়াত অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরে আগন্তুক বাঙালী মুসলমানের মুখে মুখে 'রখাইঙ্গ' শব্দটি বদলাইয়া গিয়া 'রোসাঙ্গ' এইরূপ লাভ করে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে আরাকান তাই রোসাঙ্গ নামে সর্বত্র উল্লিখিত হইয়াছে। মুন্সি আবদুল করীম সাহিত্য

---

১১ কোন কোন মতে রোসাঙ্গের মূল শব্দটির উৎস আরাকানী 'ম্রোহং'—আরাকানের রাজধানী। তাহা ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনে (ম্রোহং > রোহাং > রোহাঙ্গ) রোহাঙ্গ হইয়া 'রোসাঙ্গ' হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় স > হ; কিন্তু লিখিত ভাষায় 'স' রক্ষিত হয়। সেই সাদৃশ্যে হয়তো 'রোহাং'-এর 'হ' 'স'-তে রূপান্তরিত হইবার ফলে রোহাঙ্গ হইয়াছে রোসাঙ্গ। (দ্রষ্টব্য—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'পুথি পরিচিতি', পৃ. ৩১৬)

১২ **J. R. A. S. B, 1844, vol XIII, part I. p. 24.**

বিশারদ এবং ডঃ এনামুল হক তাঁহাদের রচনায় আরাকান শব্দের পরিবর্তে (তাঁহারা 'আরকান' বলিয়াছেন, 'আরাকান' নহে) রোসাঙ্গ শব্দ বহাল রাখিয়াছেন। কিন্তু আরাকান শব্দটি অধুনা সুপ্রচলিত বলিয়া আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে রোসাঙ্গের স্থলে আরাকান শব্দ ব্যবহার করিব।

অনেক প্রাচীন মুসলমান পরিব্রাজক (সুলেমান, আবু জয়দুল হাসন, ইবনু খুর্‌দবা, আল মাসুদী, ইব্‌নু হাওকল ইত্যাদি) যে সমস্ত ভ্রমণ বৃত্তান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় অষ্টম-নবম শতাব্দীর মধ্যে আরাকান হইতে মেঘনা নদীর পূর্ব তীরবর্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগে মুসলমানের আনাগোনা শুরু হইয়া গিয়াছিল। দশম শতাব্দীর মধ্যে আরব বণিকগণ আরাকানের বৌদ্ধরাজের আশ্রয় লাভ করেন, মুসলমান জনসংখ্যাও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।[১৩] ফলে দশম শতাব্দীতেই চট্টগ্রামে একটি স্থানীয় মুসলমান রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সমস্ত উল্লেখ হইতে দেখা যাইতেছে যে, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে তুর্কী শাসন স্থাপিত হইবার তিন-চারি শত বৎসর পূর্ব হইতেই আরাকান ও চট্টগ্রামে আরবী বণিকদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়—ধর্মান্তরীকরণ ও বিবাহাদির ফলে ঐ অঞ্চলে মুসলমান জনসংখ্যাও স্বাভাবিক কারণে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাই পশ্চিমবঙ্গে ইসলামী সংস্কার দৃঢ়মূল হইবার পূর্বেই আরাকান-চট্টগ্রামে তাহার প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। যতটুকু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, আরাকানের মুসলমান সমাজ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা সাহিত্যকে নিজেদের সাহিত্য বলিয়া মনে করিতেন এবং সেই সাহিত্য রচনা ও লালনে হিন্দু কবির মতোই আত্মনিয়োগ করিতেন। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অধিক অগ্রবর্তী আরবী মুসলমানেরা আরাকানের বৌদ্ধ রাজা মেঙৎ-চৌ-মৌন, থিরী-থু-ধম্মা, নরপদিগ্যি, সন্দি থুধম্মা, থদো মিন্তার প্রভৃতি রাজাদের সভায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন; কোন কোন আরাকানরাজ আবার নিজেদের নামের সঙ্গে মুসলমানী নাম যোগ করিয়া শ্লাঘা বোধ করিতেন। তাঁহাদের রাজস্ব ও সেনাবিভাগে বহু আরবী ও ধর্মান্তরিত বাঙালী মুসলমান নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং আবাকান ও চট্টগ্রামে যে মুসলমান ঐতিহ্য সুদৃঢ় হইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে?

১৩ G. E. Harvey—*History of Burmah*, p. 137

এই কেন্দ্রের উল্লেখের কারণ, চট্টগ্রাম ও আরাকানে আরবী বণিকদের প্রাধান্য স্থাপিত হইলেও সংস্কৃতির দিক দিয়া বিচার করিলে এই অঞ্চলে ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম-নোয়াখালি অঞ্চলের বাঙালী মুসলমানেরাই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, আরাকানের রাজসভা ও সমাজে বাঙালী মুসলমানগণ অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে আরাকানে বসিয়া মুসলমান কবিগণ বাংলা কাব্য রচনা করিতে যাইবেন কেন? আরাকানের মগরাজারা বাংলা ভাষা কতটা বুঝিতেন তাহা অবশ্য সংশয়স্থল। কিন্তু তাঁহাদের উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মচারিগণ বাংলা ভাষা বুঝিতেন এবং কথা বলিতেন—বাংলাই ছিল তাঁহাদের মাতৃভাষা। তাঁহাদের মধ্যে কেহ ধর্মান্তরিত বাঙালী মুসলমান, কেহ-বা খাঁটি আরবী বংশোদ্ভূত। কিন্তু ইঁহারা আরাকানে বসিয়া আরবী ভাষার চর্চা করেন নাই, ফার্সী ভাষাও তখন আরাকানে অনুশীলিত হইত না। এই সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশেই বাঙালী মুসলমান কবিগণ বাংলা কাব্য লিখিয়াছিলেন। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় ইঁহাদের যে বিশেষ অধিকার ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। হিন্দুর যোগদর্শন, তন্ত্রমন্ত্র প্রভৃতি ব্যাপারেও এই কবিগণ অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তাই দেখা যাইতেছে, এই অঞ্চলের মুসলমান কবিদের রচিত কাব্যাদিতে ইসলামী শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত সঙ্কুচিত। একমাত্র ইসলাম ধর্ম ও আচার-সংক্রান্ত গ্রন্থ ব্যতীত অন্য বাংলা কাব্যে ইঁহারা বিশুদ্ধ সংস্কৃতগন্ধী বাক্‌রীতি ব্যবহার করিয়াছেন। 'ইসলামী বাংলা' নামক যে খিচুড়ী ভাষা অর্বাচীন কালে পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমান সমাজে প্রচলিত হইয়া পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ বাঙলার সমস্ত অঞ্চলের মুসলমান পরিবারে প্রবাহিত হইয়াছে, যাহাতে ইসলামঘেঁষা কাব্যাদি প্রচুর পরিমাণে রচিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। ইহা সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বৃত্তে ঘুরিয়া স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্যর্থ হইয়াছে। আরাকানের মুসলমান কবিরা সেইরূপ হাস্যকর এবং বিড়ম্বিত সাহিত্যচেষ্টা হইতে দূরে ছিলেন। তাঁহারা যথার্থই বাঙালী কবি, শুধু মুসলমান কবি নহেন। তাই আরাকানের মুসলমান কবিগণের অধিকাংশ কাব্য সমগ্র বাঙালী সমাজের আদরের সামগ্রী হইয়াছে, সম্প্রদায়বিশেষের কুক্ষিগত হইয়া বৃহৎ সমাজ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই।

আধুনিক যুগে ইসলামী ঐতিহ্য ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষতঃ কলিকাতা অঞ্চলে মুসলমান সমাজের আধিপত্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরে কলিকাতায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইলে শিয়ালদহ-মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট-দর্জিপাড়া অঞ্চলে ছোট ছোট ছাপাখানার মালিক পশ্চিমবঙ্গীয় (অধিকাংশই হাওড়া-হুগলী অঞ্চলের) মুসলমানগণ ইসলামী বাংলা ভাষায় ফার্সী কিস্‌সা ছাপাইয়া সুলভ মূল্যে সেগুলিকে অল্পশিক্ষিত মুসলমান সমাজে বিক্রয় আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে 'ইসলামী বাংলা' বলিয়া উর্দু-ফার্সী জবান-মিশ্রিত একপ্রকার কেতাবী ইসলামী বাংলার উদ্ভব হয়—যাহা শুধু গল্প-উপগল্প ও ইসলামী আচার-বিচার সংক্রান্ত পুস্তিকায় ব্যবহৃত হইত। এই ব্যাপার উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কলিকাতা হইতে শুরু করিয়া গোটা বাঙলা দেশেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হুগলী জেলার ভুরশুট গ্রামের মুসলমান সমাজ এই ব্যাপারে বিশেষ অগ্রণী হইয়াছিলেন।[১৪] ইঁহারা হিন্দুর ব্যবহৃত বাংলা ভাষাকে অনৈস্লামিক 'নাপাক' মনে করিতেন, তাই প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে প্রচুর আরবী-ফার্সী ও উত্তর-ভারত হইতে আগত উর্দু শব্দের আমদানী করিয়া ইঁহারা বাংলা ভাষাকে ভাঙিয়া চুরিয়া মোচড়াইয়া-তুমড়াইয়া সম্প্রদায়বিশেষের জন্য একপ্রকার খণ্ড বর্ণসঙ্কর ভাষা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইসলামী গল্পকাহিনী, জঙ্গনামা, ধর্মতত্ত্ব ও আচার-আচরণ সংক্রান্ত পুস্তক-পুস্তিকায় এই উৎকট ভাষার প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় এই ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে বিশাল হিন্দুসমাজের কোন যোগাযোগ রহিল না।[১৫] রাজনৈতিক স্বার্থের খাতিরে ভাষা-সরস্বতীকে জবাহ্ করিতে মুসলমান মৌলবীর দল ফতোয়া দিলেন।[১৬] ফলে 'এছলামি বাংলা' নামক এক অপরূপ চিজ অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মুসলমান সমাজে ধর্মীয় কারণে

১৪ ডঃ সুকুমার সেন—ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃ. ৪৪

১৫ অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও হিন্দু লেখকগণ বাংলা-গদ্যে প্রচুর ফারসী শব্দ ব্যবহার করিতেন, পূর্বতন ধারার অনুসরণে এবং আইন-আদালতের জন্য হিন্দুরা ফারসী ভাষা শিক্ষাও করিতেন। আদালত হইতে ফারসী ভাষা উঠিয়া গেলেও বাংলা গদ্যে প্রচুর ইসলামী শব্দ রহিয়া গিয়াছে।

১৬ "মোল্লা সমাজ এই ভাষার বিপক্ষে ফতোয়া দিতেন বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।"—আরকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্য, পৃ. ৯১

(যাহার প্রধান উদ্দেশ্য রাজনৈতিক স্বার্থ) গৃহীত হইল। সমাজ-নেতারা বুঝাইলেন যে, 'এছলামি বাংলা' ব্যতিরেকে খাঁটি ইসলামী তমদ্দুন মুসলমান সমাজে দৃঢ়মূল হইবে না। সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকানের মুসলমান কবিরা যে উদার পটভূমিকায় কাব্য রচনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রায় অপ্রচলিত হইয়া পড়িল এবং "পশ্চিম-বঙ্গের কোন কোন মুসলমান জননায়ক সরকারী আইন সাহায্যে বাঙালী মুসলমানের ঘাড়ে উর্দুর মামদো ভূত"[১৭] চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। সে প্রসঙ্গ বর্তমান আলোচনায় অবান্তর। কিন্তু পরবর্তী কালে মুসলমান কবি-লেখকের গ্রন্থসমূহ যে সঙ্কীর্ণখাতে সঙ্কুচিতভাবে বহিতেছিল, এবং হিন্দুসমাজের সঙ্গে এই ইসলামী সাহিত্যের বিশেষ কোনই যোগ ছিল না, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

এই ব্যাপার শ্রীহট্টেও চলিয়াছিল। অনেক পূর্ব হইতে শ্রীহট্টে উর্দুভাষী পশ্চিমা মুসলমানদেব আনাগোনা চলিত, ফলে এই অঞ্চলের মুসলমান সমাজে বাঙালী মুসলমান অপেক্ষা উর্দুভাষী মুসলমানদের অধিকতর প্রভাব স্থাপিত হয়। তাই সিলেটী মুসলমান বাংলা হরফ ও বাংলা ভাষা ত্যাগ করিয়া দেবনাগরী হরফের অনুকরণে একপ্রকার জগাখিচুড়ি ধরনের লিপি গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার নাম 'সিলেটী নাগরী'। সিলেট (শ্রীহট্ট) অঞ্চলের মুসলমানী কিতাবগুলি এই হরফে লিখিত হইত। কিছুকাল পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষতঃ কলিকাতা অঞ্চলে মুদ্রিত মুসলমানী গ্রন্থ সেমিটিক লিপির অনুকরণে দক্ষিণ হইতে বামে মুদ্রিত হইত, এখনও সে রীতি যে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহা মনে হয় না। ইদানীং মুসলিম ঐতিহ্যের ভারকেন্দ্র পূর্বপাকিস্তানে সরিয়া যাওয়ায় কলিকাতার ছাপাখানা হইতে এই সমস্ত বিচিত্র 'কেচ্ছা' বিচিত্রতর রীতিতে, কদর্য কাগজে, কদর্যতর ছাপাখানায় আর ছাপা হইতে পায় না—এই ধারাটি ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টির পর পশ্চিমবঙ্গ হইতে ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

১৭ আরকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্য

২

মু স ল মা ন ক বি প রি চ য়

(পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী)

সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের কাব্যাদি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, তাঁহারা প্রধানতঃ হিন্দু ধরনের রোমান্টিক ও অধ্যাত্ম প্রণয়-গাথা, আরবী মুসলমানদের যুদ্ধবিগ্রহ, খলিফা ও নেতাদের বীরত্বের গল্প এবং 'তোহ্‌ফা' ধরনের নীতিতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তক-পুস্তিকা প্রচুর রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে প্রথমোক্ত কাব্যগুলিরই যথার্থ যোগাযোগ। কবিগণ এই রোমান্টিক আখ্যানের মধ্যেই আত্মপ্রকাশের যথার্থ সুযোগ পাইয়াছেন। তবে তাঁহারা যখন হিন্দু পুরাণের আদর্শে ইসলাম ধর্মের নবীদের পূত জীবনকথা লিখিতেন, কারবালা প্রান্তরের মর্মন্তুদ ঘটনা বর্ণনা করিতেন, তখন তাহার মধ্যে সত্যকারের কাব্যরস শিল্প-সুষমা লাভ করিত। আরও একটি বিস্ময়কর ব্যাপার, বেশ কয়েকজন মুসলমান ভক্তকবি হিন্দু বৈষ্ণব কবিদের মতো রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক কয়েকটি চমৎকার বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়াছিলেন।

এই কবিদের মধ্যে একদল লেখক সাধারণ মুসলমানের জন্য কোরান-হাদিস-তোহ্‌ফার উপদেশ ও কৃত্যকে বাংলা পয়ার-ত্রিপদীতে অনুবাদ করিতেন —ইহার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ যোগাযোগ নাই। আরাকান চট্ট-গ্রামের কোন কোন মুসলমান কবি আবার সূফী মতাবলম্বী ছিলেন; তাঁহারা প্রণয়গাথাকে 'আশেক'-'মাশুকের' রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন, কেহ-বা যোগ-তন্ত্রকেও সূফীদর্শনে ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা পীরদিগকে 'মুর্শিদ' বা পরমার্থ-পথদ্রষ্টা এবং পীরদের শিষ্যগণকে 'মারফত' বা তত্ত্বজ্ঞানের ভাণ্ডারী বলিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। যাহা হউক ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান ও চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া যে মুসলমান কবিদের আবির্ভাব হইয়াছিল. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাদের বিশেষ স্থান রহিয়াছে। কারণ তাঁহাদের কোন কোন ইসলামী কাব্য শুধু মুসলমান সমাজের জন্য রচিত হইলেও আখ্যানকেন্দ্রিক রোমান্টিক কাব্যগুলি ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল বাঙালীর উপভোগের সামগ্রী হইতে পারিয়াছে।

নিয়ে আমরা পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি।

সপ্তদশ শতাব্দীর দৌলত কাজী আরাকান-গোষ্ঠীর সর্বজ্যেষ্ঠ কবি হইলেও কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহার পূর্বেও অনেক বাঙালী মুসলমান কবি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তান হইতে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মুসলমান কবির রচিত বলিয়া মুদ্রিত কয়েকখানি কাব্য সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। অবশ্য এগুলি সম্বন্ধে অনেক সময়ে আমরা বিশেষ কোন সংবাদ পাই না। পূর্ব-পাকিস্তানের সাময়িক পত্রাদিতে এই সম্পর্কে যে প্রবন্ধ বাহির হয় এবং ঢাকা-রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ হইতে যে দুই একখানি পুরাতন পুঁথি মুদ্রিত হয়, পুঁথির বিবরণী প্রকাশিত হয়, তাহাই আমাদের একমাত্র সম্বল।[১৮] ডঃ এনামুল হকের 'মুসলিম বাংলা সাহিত্যে' (ইহার ইংরাজী অনুবাদ *Muslim Bengali Literature* করাচী হইতে প্রকাশিত) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত 'পুথি-পরিচিতি'তে আরাকান-গোষ্ঠীর পূর্ববর্তী অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কয়েকজন বাঙালী মুসলমান কবির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাচীন মুসলিম বাংলা কাব্য ও কবিদের একমাত্র ভাণ্ডারী পরলোকগত মুন্সি আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় এ বিষয়ে অনেকদিন ধরিয়া পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চল হইতে (বিশেষতঃ চট্টগ্রাম) সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী মুসলমান কবিদের তথ্যাদি সন্ধান করিয়াছিলেন এবং শুনা যায় তিনি নাকি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর অনেক মুসলমান কবিকে

১৮ 'সতী ময়না বা লোরচন্দ্রানী'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল কিন্তু পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের প্রামাণিকতায় বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়া এবং দৌলত কাজীকেই সর্বপ্রাচীন মুসলমান কবি বলিয়া দাবি করিয়াছেন—"এ ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রথম মুসলমান কবি হিসাবে আরাকান রাজসভার কবি দৌলৎ কাজীর দাবিই যে সর্বাগ্রগণ্য ইহা মানিয়া লইতে আর কোন বাধা আছে বলিয়া মনে হয় না।" (সাহিত্য প্রকাশিকা, ১ম পৃ. ৪) অবশ্য ডঃ এনামুল হক, মুন্সি আবদুল করীম সাহেবের তথ্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পুথিপরিচিতি' সত্য হইলে শ্রীযুক্ত ঘোষালের উপর্যুক্ত মন্তব্য একদেশদর্শী বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে। ঢাকা হইতে মুসলমান কবিদের যে কাব্যবিবরণ প্রকাশ হইতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাময়িক পত্রাদিতে যে সমস্ত প্রবন্ধ মুদ্রিত হইতেছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতেও বাঙালী মুসলমান কবি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

আবিষ্কারও করিয়াছিলেন। ইহার বিবরণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'পুথি-পরিচিতি'-তে পাওয়া যাইবে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে করীম সাহেবের ভাণ্ডারজাত দুই-একখানি মুসলমানী কাব্য প্রকাশিতও হইয়াছে। ডঃ এনামুল হক সাহেব সেই সমস্ত উপাদান অবলম্বনে 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' নামক গ্রন্থে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বাঙালী মুসলমান কবিদের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাই মুসলমান কবি সম্পর্কে একমাত্র তথ্য। রাজনৈতিক কারণে পূর্ব-পাকিস্তানের সেই সমস্ত পুঁথি, যাহার অধিকাংশই করীম সাহেবের সংগ্রহে ছিল, পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষে আর তাহার দর্শন লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এখানে পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর মুসলমান কবি সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইতেছে, তাহার বস্তুগত যাথার্থ্য ও তদ্বিষয়ক দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের বিশেষ কোন বক্তব্য নাই। যাহা হউক, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মুসলমান কবি বলিয়া প্রচারিত কয়েকজন কবি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

পরলোকগত মুন্সি আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩), ডঃ এনামুল হক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেষ্টায় পূর্ব-পাকিস্তানে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মুসলমান কবিদের যে পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে, নানা কারণে আমাদের তাহা চাক্ষুষ করিবার উপায় নাই বলিয়া তাঁহাদের সংগৃহীত তথ্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। ডঃ এনামুল হক সাহেব খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিন জন মুসলমান কবির অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন।[১৯] ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় মনে করেন যে, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে জৌনপুরের সুলতান হুসেন শাহ শর্কী যখন পরাভূত হইয়া বাঙলায় হুসেন শাহের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে কুতুবন নামক এক বিখ্যাত হিন্দী কবি তাঁহার অনুচর হিসাবে গৌড়ে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। ইনি পূর্বী হিন্দী ভাষায় হিন্দু রোমান্টিক আখ্যান অবলম্বনে 'মৃগাবতী' শীর্ষক বিষাদান্ত কাহিনীকাব্য রচনা করেন। ইনি আবার বিখ্যাত সূফী সাধক শেখ বুরহান চিশ্‌তীর শিষ্য ছিলেন। সুতরাং তাঁহার আখ্যানকাব্যের অন্তরালে সূফীসাধনার সঙ্কেত থাকাই স্বাভাবিক। কাব্যটি গৌড়ে রচিত হইয়াছিল। ইঁহার পূর্বে বাঙলা দেশে আর কোন মুসলমান কবি এই

১৯. ডঃ এনামুল হক—মুসলিম বাঙলা সাহিত্য

ধরনের কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত 'পুথি পরিচিতি'[২০] হইতে মনে হইতেছে ষোড়শ শতকের পূর্বেও বাঙালী মুসলমান কবিরা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

পূর্বপাকিস্তানের গবেষক ও ঐতিহাসিকগণ পঞ্চদশ শতাব্দীতেও বাঙালী মুসলমান কবিদের কাব্যের সন্ধান পাইয়াছেন—ইহা সত্য হইলে বিস্ময়কর বটে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙলার হিন্দু কবিরাও প্রচুর পরিমাণে সাহিত্য রচনায় ততটা অগ্রসর হন নাই। সে ক্ষেত্রে বাঙলার ধর্মান্তরিত মুসলমান কবিদের একাধিক কাব্য আবিষ্কৃত হইলে বিস্মিত হইবার কারণ আছে। আরও বিস্মিত হইবার কারণ, পূর্বে বঙ্গীয় সরকারের উদ্যোগে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব প্রভৃতি পণ্ডিত-গবেষকের নেতৃত্বে বাঙলার পল্লীঅঞ্চল হইতে যখন বহু প্রাচীন কবির অসংখ্য পুঁথিপত্র আবিষ্কৃত হইতেছিল, তাহার মধ্যে দুই-একজন মুসলমান কবির কাব্যও ছিল। কিন্তু তখন সম্প্রতি-প্রচারিত এই মুসলমান কবিদের পুঁথি-পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই কেন? আবদুল করীম সাহেবও তখন চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা-নোয়াখালি হইতে পুঁথি সংগ্রহ করিতেছিলেন। তিনিই বা পঞ্চদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের বাংলা কাব্য প্রচার করিলেন না কেন? রাজনৈতিক কারণে একদেশ দুই হইয়া যাইবার পরেই বা দলে দলে প্রাচীন মুসলমান কবির আবির্ভাব হইতেছে কেন, তাহাও জিজ্ঞাস্য। যাহা হউক পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ (ডঃ শহীদুল্লাহ, ডঃ এনামুল হক, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই) পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত অন্ততঃ তিন-জন প্রধান মুসলমান কবি ও তাঁহাদের কাব্য সম্বন্ধে নানা তথ্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই তিন জন কবির নাম: শাহ্ মুহম্মদ সগির, জৈনুদ্দিন, মোজাম্মিল।[২১] এখানে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

চট্টগ্রামের অধিবাসী বলিয়া অনুমিত শাহ্ মহম্মদ সগির সুলতান

---

২০ আহমদ শরীফ সম্পাদিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগ প্রকাশিত 'পুথি-পরিচিতি' (১৯৫৮) শীর্ষক পুথির তালিকা বিবরণীতে আবদুল করীম সাহেব প্রদত্ত পুঁথি সমূহের বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। পুঁথির সংখ্যা সাড়ে পাঁচ শতেরও বেশী।

২১ 'পুথি-পরিচিতি'তে ইহাকে ১৬শ শতাব্দীর কবি বলা হইয়াছে।

গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের (১৩৮৯-১৪০৯) সমসাময়িক এবং সম্ভবতঃ উক্ত সুলতানের কর্মচারী ছিলেন। কারণ কবি তাঁহার রোমান্টিক কাব্য 'য়ুসুফ-জুলেখা'র প্রথমেই আজমশাহের যেভাবে স্তুতিবাদ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে উক্ত সুলতানের রাজকর্মচারী বলিয়াই মনে হয়। অনুমান হয়, কবি কোন পীরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ধর্মীয় মনোভাবের দৃষ্টিকোণ হইতে কবি কোরানে বর্ণিত 'য়ুসুফ-জুলেখা'র সুপরিচিত প্রণয়াখ্যান বিবৃত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে সূফী মতাবলম্বী বলিয়া মনে হয়। ফার্সী ভাষায় ফের্দৌসী পূর্বে এই কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন—বাইবেলেও এ আখ্যান আছে। জামি নামক আর এক ফার্সী কবি এই আখ্যান রচনা করিয়াছিলেন। বাঙালী মুসলমান কবি মুহম্মদ সগির জামিরও কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী।[২২] আখ্যানটির জড় বাইবেল ও কোরানে থাকিলেও আমাদের কবি ইহাতে বাঙালী হিন্দুসমাজের ছবিই আঁকিয়াছেন। য়ুসুফের কনিষ্ঠ ভাই ইবন্-ইয়ামিন মধুপুরের রাজকন্যা বিধুপ্রভাকে বিবাহ করেন—এই বর্ণনাতে বুঝা যাইতেছে, ধর্মান্তরিত বাঙালী মুসলমান কবি পূর্বতন হিন্দু সংস্কার ভুলিতে পারেন নাই। তা' নহিলে তিনি কোরান ও ফের্দৌসীর বর্ণনা সত্ত্বেও হিন্দুনাম গ্রহণ করিবেন কেন? যাহা হউক, যখন হিন্দু কবিরাও দেবদেবী ভিন্ন লৌকিক কাহিনী গ্রহণ করিতে সাহসী হইতেন না, তখন এই মুসলমান কবি পার্থিব কাহিনী লইয়া যে রোমান্টিক আখ্যানকাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। বলিতে কি ইহাই মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রথম পার্থিব প্রেমের কাব্য। অবশ্য কোরান-বাইবেলে বর্ণিত য়ুসুফের কাহিনীতে ধর্মভাবের প্রাধান্য আছে। কিন্তু মহম্মদ সগির ধর্মভাব অপেক্ষা গল্পরসের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়াছিলেন।

কবি জৈনুদ্দিন 'রসুল বিজয়' শীর্ষক যে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার পুঁথিটি খণ্ডিত এবং ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ। কবি গৌড়ের সুলতান য়ুসুফ শাহের সভাকবি ছিলেন; য়ুসুফ শাহ্ ১৪৭৪-১৪৮১ খ্রীঃ অব্দে গৌড়ের মসনদে

---

২২ অধ্যাপক আহ্‌মদ শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা একাডেমি হইতে বাহরাম খানের 'লায়লী-মজনু' শীর্ষক যে আখ্যানকাব্য সম্পাদনা করিয়াছেন, তাহার ভূমিকায় (পৃ. ৩৩) মুহম্মদ সগির রচিত 'য়ুসুফ-জুলেখা' সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "সাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ-জোলেখাই (১৩৮৯-১৫১০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচিত) আমাদের প্রাচীনতম কাব্য।"

আসীন ছিলেন। সুতরাং 'রসুলবিজয়' পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত বলিয়া অনুমিত হইতেছে। তিনি য়ুসুফ শাহের প্রশংসা করিতে গিয়া তাঁহাকে দানে হরিশ্চন্দ্র, গৌরবে ইন্দ্র, ধর্মে কল্পতরু, জ্ঞানে শুক্র এবং ধ্যানে মহেশের সমকক্ষ বলিয়াছেন। য়ুসুফ শাহের সময় ধরিয়া জৈনুদ্দিনের আবির্ভাবকাল ও কাব্যরচনার কাল মোটামুটি নির্দিষ্ট হইতে পারে। তিনি শুধু একস্থলে 'শ্রীযুত যুসুফ শাহ' উল্লেখ করিলেও কাব্য মধ্যে সর্বত্র 'খান' বলিয়াছেন, 'যুসুফ খান' কোথাও বলেন নাই। এই জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে গৌড়ের সুলতান যুসুফ খানের সমসাময়িক না বলিয়া পরবর্তী কালের কবি বলিতে চাহেন। কিন্তু কবি এই 'খান'কে যেভাবে 'যুসুফ খান' বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে ডঃ এনামুল হক গৌড়ের সুলতান বলিয়াই অনুমান করিয়াছেন।[২৩]

'রসুলবিজয়' কাহিনী কোন প্রাচীন ফার্সী কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু কাব্য রচনার রীতিটি বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ধারা অনুসরণ করিয়াছে। জৈনুদ্দিনের 'রসুলবিজয়ে' হজরত মহম্মদের বিজয়কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। জয়কুমের অমুসলমান রাজা বহরামের রাজ্য আক্রমণ করিয়া মহম্মদ তাঁহাকে পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আদেশ দিলেন। কিন্তু বহরাম তাহাতে কর্ণপাত না করিলে হজরত মহম্মদ তাঁহার ধর্মযুদ্ধের সেনা-বাহিনী লইয়া বহরামের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বিপর্যস্ত করিয়া তোলেন। কিন্তু এই স্থানে পুঁথিটি খণ্ডিত হইয়াছে। এ কাহিনীটি কিন্তু কবিকল্পিত, ফার্সী কাব্যকাহিনীর সঙ্গে ইহার কাহিনীগত বিশেষ যোগাযোগ নাই। তবে ইহাতেও বাঙালী মনোভাব ও অনুরূপ তথ্য আবিষ্কার করা দুরূহ নহে। দুঃখের বিষয় কবির সম্পূর্ণ কাব্য পাওয়া যায় নাই, পাওয়া গেলে তাঁহার কবিত্ব বিচারের সুবিধা হইত।

পঞ্চদশ শতাব্দীর সর্বশেষ মুসলমান কবির নাম মোজাম্মেল। ইনি সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। এ পর্যন্ত তাঁহার নামে তিনখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে—(১) নীতিশাস্ত্র, (২) সয়ৎনামা, (৩) খঞ্জন-চরিত্র। তন্মধ্যে 'খঞ্জনচরিত্রে'র মাত্র কয়েকখানি পৃষ্ঠা মিলিয়াছে। অবশ্য

২৩ Dr. Enamul Huq—*Muslim Bengali Literature* p. 56
পুঁথি পরিচিতি, পৃ. ৪৬৮—৪৬৯

এই কবিকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত বলিয়া গ্রহণ করিতে কিঞ্চিৎ দ্বিধা হয়। কারণ 'নীতিশাস্ত্র' ও 'সয়ৎনামা'র পুষ্পিকায় কাব্যরচনার যে সন-তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী নহে, ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দ পাওয়া যায়। ইহার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ডঃ হক কোন বিশ্বাসযোগ্য কারণ দেখাইতে পারেন নাই। কাব্যটি কেন প্রাচীন, সে সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, ইহার ভাষা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর হইতে পারে না, তাহা অপেক্ষা অনেক পুরাতন। তিনি আর একটি প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। মোজাম্মিল বদর পীরের শিষ্য ছিলেন। বদর পীর ১৪৪০ খ্রীঃ অব্দে বিহারে দেহরক্ষা করেন। সুতরাং মোজাম্মিল এই সময়ের কবি হইবেন বলিয়া হক সাহেব অনুমান করেন। কবি 'সয়ৎনামা' শীর্ষক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক যে পুস্তিকা রচনা করেন, তাহাতে আরবী শাস্ত্রের দোহাই থাকিলেও বাঙালী মনোভাবই বেশী। 'নীতিশাস্ত্র' ও 'খঞ্জনচরিত্র' অনেকটা জ্যোতিষশাস্ত্রের মতো বার-তিথি নক্ষত্র, শুভাশুভ ফল ইত্যাদি ধরনের নানা তথ্যে পূর্ণ।

এই তিন জন কবির যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, ইঁহারা যদি সত্যই পঞ্চদশ শতাব্দীতে কাব্যরচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ধর্মান্তরিত বাঙালী মুসলমান যে সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে কাব্যরচনার সূচনা করিয়াছিলেন, হিন্দু কবিদের পথ ত্যাগ করিয়া একটা নূতন পথের সন্ধান দিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু স্বাভাবিক কারণে হিন্দুসমাজে এই পুঁথিখানির প্রচার ছিল না, ফলে বৃহত্তর হিন্দুসমাজ এই সমস্ত ইসলামী পুঁথিপত্রের কোন সন্ধান রাখিত না।

ষোড়শ শতাব্দীতেও বেশ কয়েকজন বাঙালী মুসলমান কবি চট্টগ্রাম অঞ্চলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—ডঃ এনামুল হক এবং মুন্সি আবদুল করীম সাহেবের কাছে ইঁহাদের পাণ্ডুলিপির কিছু কিছু এখনও আছে।[২৪] রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতেও এই ধরনের ইসলামী বাংলা কাব্যের পুঁথি আছে।[২৫]

২৪ করীম সাহেব সংগৃহীত সমস্ত পুঁথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হইয়াছে।

২৫ ইহার তালিকা 'পুথি-পরিচিতি'তে পাওয়া যাইবে। ইহাতে এই শতাব্দীতে আবির্ভূত পনের জন মুসলমান কবির কাব্যের উল্লেখ আছে। যথা—আফজল আলী, চাঁদকাজী, দোনাগাজী, দৌলত উজীর বাহরাম, মুহম্মদ কবীর, মোজাম্মিল, শেখ কবীর, শেখ ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ সুলতান, মুহম্মদ আকিল, সা বিরিদ খান, মর্তুজা, হাজি মুহম্মদ, নেয়াজ ও শেখ পরাণ।

এখানে ষোড়শ শতাব্দীর কয়েকজন মুসলমান কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

ষোড়শ শতাব্দীর চাঁদ কাজী, শেখ কবীর, আফজল আলী প্রভৃতি কবিগণ কিছু কিছু বৈষ্ণবপদ ও গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনা করিয়াছিলেন—এ সংবাদও বিস্ময়কর। কারণ চৈতন্যদেবের তিরোধানের অল্প পরেই এই মুসলমান কবিগণ বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়াছিলেন—ইহা সাধারণ ব্যাপার নহে। ইঁহাদের মধ্যে আফজল আলী (গৌড়ের সুলতান ফিরুজশাহের সময়ে ১৫৩২-৩৩ খ্রীঃ অব্দে বর্তমান ছিলেন) 'নসিয়ৎনামা' শীর্ষক ইসলাম ধর্মতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্রবিষয়ক একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কোরান ও হাদিসের তত্ত্বকথাই কবির প্রধান অবলম্বন ছিল।

ইতিপূর্বে বিদ্যাসুন্দর প্রসঙ্গে আমরা সাবিরিদ খাঁয়ের কথা সংক্ষেপে বলিয়াছি। সম্প্রতি তাঁহার নামে 'রসুলবিজয়' এবং 'হানিফা কয়রাপরী' শীর্ষক কাব্য পাওয়া গিয়াছে। ইনিও চট্টগ্রামের কবি। 'রসুলবিজয়ে'র মাত্র বারোখানি পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এ কাব্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। 'হানিফা-কয়রাপরী' অনেকটা 'রসুলবিজয়' ধরনের কাব্য। হানিফা অনেক অমুসলমান রাজ্য জয় করিয়া সাহিরাম নামক এক অমুসলমান রাজার সঙ্গে যুদ্ধে আহত হন। তখন সাহিরামের কন্যা কয়রাপরী তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহাকে অচৈতন্য অবস্থায় লুকাইয়া রাখে। এই কাহিনীর পরিণাম জানা যায় না। কারণ মধ্যপথেই পুঁথিটি খণ্ডিত হইয়াছে। চট্টগ্রামের মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে এই কাহিনীতে বর্ণিত নানা-স্থানের অস্তিত্ব এখনও আছে। বোধ হয় স্থানীয় কোন উপকথার পট-ভূমিকায় কয়রাপরীর গল্প পরিকল্পিত হইয়াছে।

দোনাগাজীর 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল' শীর্ষক মুসলমানী রোমান্টিক কাহিনীটির একখানি পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কবি সম্ভবতঃ ত্রিপুরার অধিবাসী ছিলেন। ফার্সী কিস্‌সা অবলম্বনে রচিত এই আখ্যানের অনুরূপ আর একটি আখ্যান সপ্তদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ আলাওল রচনা করিয়াছিলেন। ডঃ হকের মতে আলাওলের কাব্য ফার্সী কাব্যের প্রায় অনুবাদের মতো, কিন্তু দোনাগাজীর কাব্যটি স্বাধীন রচনা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

হক সাহেবের মতে কবি ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।[২৬] কিন্তু 'আরকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্যে' কবিকে আরও পরে আবির্ভূত বলা হইয়াছে।[২৭] ইহাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু ডঃ হক দোনাগাজীর ভাষার প্রাচীনতা ধরিয়া কবিকে যে ষোড়শ শতাব্দীতে স্থাপন করিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না।[২৮]

'গোরক্ষবিজয়ে'র প্রসিদ্ধ কবি শেখ ফয়জুল্লার নামে আরও চারিখানি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—গাজীবিজয়, সত্যপীর, জয়নালের চৌতিশা ও রাগনামা। ডঃ হক মনে করেন যে উক্ত সত্যপীরের পুঁথি ১৪৬৭-৯৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৪৫-৭৫ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। কারণ উহাতে কাল-জ্ঞাপক এই পয়ারটি পাওয়া গিয়াছে :

মুনি রস বেদ শশী শকে কহি সন।
শেখ ফয়জুল্লা ভাবে ভাবি দেখ মন॥

ফয়জুল্লার 'গাজীবিজয়ে'র কোন পুঁথি এখনও চাক্ষুস করা সম্ভব হয় নাই। তবে মনে হয়, ইহাতে প্রসিদ্ধ পীর ইসমাইল গাজীর কীর্তিকাহিনী বর্ণিত হইয়াছিল। ইসমাইল গাজী সুলতান বরবাক শাহের (১৪৫৯-৭৫) সমসাময়িক ছিলেন। সুতরাং ফয়জুল্লা নিশ্চয়ই এই সনের পরে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার 'জয়নালের চৌতিশা'য় মঙ্গলকাব্যের চৌতিশার আদর্শে হাসান-হুসেনের মৃত্যুর পর মাতা জয়নালের বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে। 'রাগনামা'য় রাগরাগিণী ও তালের বর্ণনা আছে। শেখ ফয়জুল্লা সঙ্গীতশাস্ত্রেও বেশ অভিজ্ঞ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ষোড়শ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মুসলমান কবি দৌলত উজীর বহরম খান 'লায়লী-মজনু' শীর্ষক বিখ্যাত বেদনামধুর আরবী গল্প লিখিয়া একদা মুসলমান সমাজে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন।[২৯] বহরমের পূর্বপুরুষ চট্টগ্রাম-বিজয়ী হামিদ খান হুসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

২৬ Dr. Enamul Huq—*Muslim Bengali Literature*, p. 70

২৭ 'পুথি-পরিচিতি'তেও কবিকে ১৮শ শতাব্দীতে আবির্ভূত বলা হইয়াছে।

২৮ *Muslim Bengali Literature* p. 70—71

২৯ ১৯৫৭ সালে অধ্যাপক আহমদ শরীফের সম্পাদনায় ঢাকা বাংলা একাডেমি হইতে এই কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক উহার ভূমিকায় অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

তাঁহারই বংশে কবি বহরমের জন্ম হয় (১৬শ শতাব্দী)। তাঁহার পিতা মোবারক খান চট্টগ্রামের স্বাধীন রাজা নেজাম শাহ্ শূর প্রদত্ত 'দৌলত উজীর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কবিও পরে সেই উপাধির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। আবদুল করীম সাহেব, ডঃ এনামুল হক এবং অধ্যাপক আহমদ শরীফ মনে করেন যে, এই কাব্য ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। হোসেন শাহের আমলে ও পরবর্তী কালেও চট্টগ্রামের নাম ছিল ফতেয়াবাদ। কবি এই কাব্যে আত্মকথা বর্ণনা-প্রসঙ্গে চট্টগ্রামকে ফতেয়াবাদই বলিয়াছেন। পরে ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দে শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম জয় করিয়া ইহার নূতন নামকরণ করেন ইসলামাবাদ। সুতরাং কাব্যে যেহেতু ফতেয়াবাদ নাম রহিয়াছে (এবং ইসলামাবাদ নাই), সেই-হেতু ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কাব্য বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু প্রাপ্ত পুঁথিতে ঔরংজেবের একটি প্রশস্তি আছে। তাহা হইতে কবিকে সপ্তদশ শতাব্দীতেই স্থাপন করিতে হয়। অবশ্য কাব্য-সম্পাদক অধ্যাপক শরীফ নানা যুক্তির বলে পুঁথিতে সন্নিবিষ্ট ঔরংজেবের প্রশস্তিকে পরবর্তী কালের লিপিকর বা গায়েনদের প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[৩০] সে যাহা হউক, কাব্যটি ষোড়শ শতাব্দীর রচনা হইলে প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই।

ফার্সী কবি জামীর কাব্যে লায়লা-মজনুর কাহিনী আছে। পাত্র-পাত্রী আরবে উদ্ভূত হইয়াছিল বলা হইলেও কাহিনীটির জড় রহিয়াছে সূফী মতাবলম্বী ইরানী মুসলমান সমাজে। প্রাচীন মরমী সূফীগণ মানবীয় প্রেমের আধারে অধ্যাত্মরস পরিবেশন করিতেন। লায়লা-মজনু, শিরি-ফরহাদ ও য়ুসুফ-জুলেখার রোমান্টিক ও বিষাদান্ত প্রেমের কাহিনীর উদ্ভাবন করিয়াছিলেন ইরানী সূফীসম্প্রদায়। সূফী সাহিত্যে লায়লা-মজনুর প্রেম, উন্মাদনা ও ব্যর্থতাকে ঈশ্বর ও ভক্তের আকূতির রূপক হিসাবেই গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু বাঙালী মুসলমান কবি বক্ষ্যমাণ 'লায়লী-মজনু' কাব্যে অধ্যাত্ম প্রেম অপেক্ষা মানবীয় প্রেমের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন। সেই দিক দিয়া বহরমের বিশেষ কৃতিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। পরবর্তী কালে, এমন কি আধুনিক যুগেও লায়লী ও মজনুর ব্যর্থ প্রণয় অবলম্বনে অনেক হিন্দু লেখক নানা নাটক-কাব্যকাহিনী রচনা করিয়াছেন।

---

৩০ ঐ, পৃ. ১৭—১৮

কবি বহরম এই কাব্যে সহজ আখ্যানকাব্যের ধারা অনুসরণ করিয়াছেন। মজনুর স্নিগ্ধ অপার্থিব সৌন্দর্য এবং লায়লীর নিষ্কাম প্রেমের উন্মত্ততা বর্ণনায় কবি যথাসাধ্য কৃতিত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যাহাকে মুন্সিয়ানা ও পরিপক্ক কবিত্ব বলে, কবি অতি অল্প স্থলেই সেরূপ কাব্যগুণের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। সে যাহা হউক, কবি সূফী মতানুযায়ী অধ্যাত্ম প্রেমের পথে না গিয়া মানবীয় প্রেমরসের বর্ণনায় কিঞ্চিৎ সফল হইয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য প্রাপ্ত পুঁথির ভাষা এত মার্জিত ও আধুনিক ধরনের যে, তাঁহাকে ষোড়শ শতাব্দীর ব্যক্তি বলিতে বিশেষ সন্দেহ হয়।

বদনকমল হাস কিবা ইন্দুপরকাশ
চকোর-ভ্রমরে হৈল দ্বন্দ্ব।
ভুরুযুগ অভিরাজ সীমা হৈল দুই মাঝ
অর্ধেক কমল অর্ধচন্দ্র॥

এ ভাষার পরিচ্ছন্নতাই ইহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সংশয়কে দৃঢ়তর করিয়াছে। সে যাহা হউক বহরম সংস্কৃত ভাষাও জানিতেন—ভাষার বাঁধুনী তাহা প্রমাণ করিতেছে। মুসলমানী কিস্সা অবলম্বন করিলেও কাহিনী গ্রন্থনে তিনি ইসলামী বৈশিষ্ট্যের প্রতি কোন গুরুত্ব দেন নাই—মোটের উপর এই কাহিনীকাব্য বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

স্বর্গতঃ আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ এবং ডঃ এনামুল হক—দুই জনেই মুহম্মদ কবীর নামক এক মুসলমান কবি রচিত 'মধুমালতী' শীর্ষক এক হিন্দু আখ্যানকাব্যের পুঁথি দেখিয়াছিলেন বলিয়া জানাইয়াছেন। ডঃ হক ১১০১ মঘী সনে (১৭৩৯ খ্রীঃ অঃ) অনুলিখিত এইরূপ একখানি পুঁথির সন্ধান পাইয়াছিলেন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থানার অন্তর্গত জরোয়াগঞ্জ গ্রামে। পুঁথিখানি তিনি দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, শুধু পুষ্পিকায় উদ্ধৃত সনতারিখজ্ঞাপক পয়ারটি টুকিয়া লইয়াছিলেন। তাহা হইতে মনে হয় ৯৯৭ হিজিরায় বা ১৫৮৮ খ্রীঃ অব্দে এই কাব্য সমাপ্ত হয়, তাহার পাঁচ বৎসর পূর্বে কাব্যটি আরম্ভ হইয়াছিল। পরে আব্দুল করীম সাহেব এই কাব্যের আর একখানি পুঁথির সন্ধান পান বটে, কিন্তু অর্থাভাবে সেখানিও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তিনিও পুঁথির পুষ্পিকাটুকুই লিখিয়া লইয়াছিলেন। এই পুষ্পিকায় উল্লিখিত সনতারিখজ্ঞাপক পয়ারটি

এতই বিশৃঙ্খল যে, ইহা হইতে অভ্রান্তরূপে রচনাকালের সন্ধান পাওয়া যায় না। ডঃ হক এই দুরূহ পয়ারটির একটু অদল-বদল করিয়া ৮৯০ হিজরা বা ১৪৮৫ খ্রীঃ অঃ পাইয়াছেন। অর্থাৎ ডঃ হকের মতে পুঁথিটিই নকল করা হইয়াছিল ১৪৮৫ খ্রীঃ অব্দে। তাহা হইলে কবি তো আরও পূর্ববর্তী হইবেন। যাহা হউক এসব বিষয়ে চূড়ান্ত কোন মতামত দেওয়া যায় না। প্রথমতঃ এই সমস্ত পুঁথি আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই, ডঃ হক ও করীম সাহেব ব্যতীত অন্য বড় কেহ ইহার কোন সন্ধান জানেন না। সুতরাং ডঃ হকের রচনাকাল বিষয়ক মন্তব্য নিঃসংশয়ে মানিয়া লওয়া যায় না। ১৪৮৫ খ্রীঃ অব্দে অনুলিখিত পুরাতন পুঁথির অস্তিত্বে স্বতঃই সন্দেহ জাগে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কবির আবির্ভাব হইলে বরং পুঁথির প্রামাণিকতা কিছুটা স্বীকার করা যাইতে পারে। অবশ্য ডঃ হকের মতে কবির ভাষা বিপ্রদাস ও বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল অপেক্ষাও নাকি পুরাতন। তিনি ভাষার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া যে সমস্ত দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা ভাষাতত্ত্বের বিচারে খুব পুরাতন মনে হয় না। কুমারক, নৃপতিক (৬ষ্ঠীর 'ক' বিভক্তি), জানসি (তুমি জান), কেরুয়াল, নৌলী (নহুলী) যৌবনী, বঙ্ক (বক্র) ইত্যাদি প্রয়োগকে তিনি অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু এই ধরনের শব্দ প্রয়োগ পরবর্তী যুগেও দুর্লভ নহে। তাঁহার মন্তব্য—"The language of Vipradas and Vijay Gupta is comparatively much modern."[৩১]—খুব যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

এই কাব্য ফার্সী কিংবা হিন্দী আখ্যায়িকার অনুবাদ কিনা তাহা লইয়াও সন্দেহ জাগিয়াছে। কবি একস্থলে বলিয়াছেন, তিনি পুরাতন ফার্সী গল্প হইতে বাংলা ছন্দে এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। আবার অন্য একস্থলে বলিতেছেন, হিন্দীকাব্য অবলম্বনে এই কাব্য রচিত হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা একটু দুরূহ। গল্পের পরিবেশ অনেকটা 'গুলে-বকাওলি' ধরনের হইলেও মূলতঃ ইহা হিন্দু আখ্যান। ইহাতে রাজা সূর্যভান ও রানী কমলার একমাত্র পুত্র মনোহর এবং রাজা বিক্রম অভিরাম ও রানী রূপসমঞ্জরীর কন্যা মধুমালতীর প্রেম বর্ণিত হইয়াছে। ইহার রচনাভঙ্গিমা স্বচ্ছ, অবশ্য গল্পটির আখ্যান এমন কিছু অভূতপূর্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ নহে।

---

৩১ *Muslim Bengali Literature* (Dr. Huq)

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া প্রচারিত উল্লিখিত কাব্যগুলি যথার্থই এত পুরাতন কিনা নিশ্চয় করিয়া বলা হয় না। যাহা হউক, ইসলামী কিস্‌সার হিন্দুরূপ, রোমান্টিক প্রেমের আখ্যান, ইসলামী পুরাণ ইতিহাসের গল্প—এই সমস্ত বিষয় অবলম্বনে যে পুঁথিপত্র রচিত হইয়াছিল, একদা পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে তাহার কিছু কিছু প্রভাব ছিল। এই কবিদের সকলেই ধর্মান্তরিত মুসলমান, কয়েক পুরুষ আগেও তাঁহারা হিন্দু ছিলেন। তাই তাঁহাদের কাব্যকাহিনীতে হিন্দুপরিবেশ, নামধাম প্রভৃতি অনেকটা বজায় আছে। এগুলির প্রাচীনতা প্রমাণিত হইলে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মানব জীবনের কাব্যরচনার সমস্ত গৌরব এই মুসলমান কবিদের প্রাপ্য।

৫

স প্ত দ শ শ তা ব্দী র
মু স ল মা ন ক বি

বাঙলায় মুসলমান কবিদের যথার্থ ঐশ্বর্যের যুগ সপ্তদশ শতাব্দী। আরাকান ও চট্টগ্রামের মুসলমান শাসক ও অভিজাত সমাজের সান্নিধ্যে যে সমস্ত মুসলমান কবির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের অলঙ্কারস্বরূপ দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল শুধু মুসলমান সমাজে নহে, সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ গৌরবজনক স্থান অধিকার করিয়া আছেন। কিন্তু তাঁহাদের সমকালে আরও কয়েকজন শক্তিশালী মুসলমান কবির পরিচয় ও কাব্যাদি বিষয়ক নানা তথ্য সম্প্রতি পূর্বপাকিস্তানের গবেষকবৃন্দ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে সৈয়দ সুলতান, শেখ পরাণ, হাজি মুহম্মদ, নসরুল্লা খাঁ, মুহম্মদ খাঁ প্রভৃতি কবি এবং শাহ্ আকবর নসির মামুদ, কবীর, সালবেগ প্রভৃতি মুসলমান বৈষ্ণব কবির পদসমূহ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য অধিকাংশ মুসলমান কবি এমন সমস্ত ইসলামী বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, যাহার সঙ্গে মধ্যযুগের বৃহত্তর হিন্দুসমাজের বড় একটা যোগাযোগ ছিল না। তাই হিন্দুগণ এই সমস্ত পুঁথি সংগ্রহ

করিয়া রাখে নাই, হিন্দুসমাজের কেহ ইহার নামধামও জানিত না। তাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যখন দীনেশচন্দ্র ও নগেন্দ্রনাথ বসুর প্রবর্তনায় বাংলা পুঁথি সংগ্রহ করিবার ধুম পড়িয়া গেল, বঙ্গীয় সরকার পুঁথি সংগ্রহের জন্য মোটা টাকা বরাদ্দ করিলেন, তখনও এই সমস্ত মুসলমান কবিদের কাব্যকবিতার অতি অল্পই লোকলোচনের গোচরে আসিয়াছিল। সম্প্রতি পূর্ব-পাকিস্তানে এই সমস্ত কবি ও কাব্য লইয়া যে গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, ইঁহাদের প্রায় সকলেই চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা-আরাকানের বাসিন্দা। এই কাব্যের পুঁথিগুলি মুন্সি আবদুল করীম সাহিত্য-বিশারদ আবিষ্কৃত এবং তাঁহারই হেফাজতে এতদিন রক্ষিত ছিল। মাঝে মাঝে করীম সাহেব এই কবিদের বিষয়ে সাময়িক পত্রে দুই একটি প্রবন্ধ লিখিয়া অনুসন্ধিৎসু গবেষকেব কৌতূহল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার লোকান্তরের পরে তাঁহার সংগৃহীত ও তালিকাবদ্ধ প্রায় ছয়শত মুসলমান কবির পুঁথি উপস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে।

কয়েকজন অপ্রধান কবি ॥

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এবং পরে কয়েকখানি কাব্য লিখিয়া সৈয়দ সুলতান কবি বলিয়া মুসলমান সমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার নামে আটখানি পুঁথি ও দুইখানি গানের সংগ্রহ পাওয়া গিয়াছে। নবিবংশ, শব-ই-মেরাজ, রসুলবিজয়, ওফত-এ-রসুল, জয়কুম রাজার লড়াই, ইবলিসনামা, জ্ঞানচৌতিশা, জ্ঞানপ্রদীপ এবং কিছু দেহতত্ত্ব বিষয়ক মারফতী গান উল্লেখযোগ্য। ইঁহার অধিকাংশ কাব্যই ইসলাম ধর্মের পুরাণ-ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্ব অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। নবিবংশে কবি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, নরসিংহ, বামন, রাম, কৃষ্ণ, আদম, শিব, নূ, ইব্রাহিম, মুসা, ইসা প্রভৃতি দেবতা ও অবতারের কথা বলিয়াছেন। মহম্মদের জীবনকাহিনী ও ঘটনা লইয়া রচিত হয় শব-ই-মেরাজ, রসুলবিজয় এবং ওফত-ই-রসুল (অর্থাৎ রসুলের তিরোধান)। এগুলি মুসলমান সমাজে একদা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। কবি মাঝে মাঝে হিন্দুধর্মের কথাও বলিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্বধর্মীরা বোধ হয় তাঁহাকে একটু অপ্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তাই তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, মুসলমান

কবিকে হিন্দুভাবাপন্ন দেখিয়া তাঁহার নিন্দা করিয়া থাকেন ('শব-ই-মেরাজ')। এই দিক দিয়া কবির ধর্মমতের উদারতা অতি প্রশংসনীয়।

হাজি মহম্মদ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে জীবিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইনি 'নূরজামাল' এবং ইসলাম ধর্মবিষয়ক আরও কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন যাহার সহিত বাংলা সাহিত্যের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। নসরুল্লা খাঁ জঙ্গনামা, মুসার সওয়াল, শরিয়ৎনামা এবং হিদায়েত-উল-ইসলাম শীর্ষক চারিখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবি গৌড় এবং আরাকানে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, জঙ্গনামা এবং শরিয়ৎনামাতে কবি নিজের জীবনকথাও কিছু কিছু বিবৃত করিয়াছেন। অনুমান হয়, কবি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার কাব্যাদি শুধু মুসলমান সমাজের জন্য রচিত হইয়াছিল, সেইজন্য হিন্দুসমাজে ও সাহিত্যে এই সমস্ত কবি সম্পূর্ণ অপরিচিত।

সপ্তদশ শতাব্দীর আর একজন শক্তিশালী কবি মুহম্মদ খানের (১৫৮০—১৬৫০) কিঞ্চিৎ উল্লেখ প্রয়োজন। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তিনি মুসলমান সমাজ ও ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে এবং রূপক ধরনের কাব্য রচনা করিয়া নিজ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এই কবি চট্টগ্রামের শাসক রাস্তিখানের বংশধর ছিলেন, উক্ত অঞ্চলের হাটহাজারী থানার অন্তর্গত গোবরা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। শুনা যায়, এখানে নাকি আলাওলেরও জন্ম হয়। মুহম্মদ খানের কয়েকখানি কাব্যে রচনাকাল প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া কবির সনতারিখ নির্ধারণ অপেক্ষাকৃত সহজ। তাঁহার নামে এ পর্যন্ত সাতখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে—(১) সত্য-কলি বিবাদ সংবাদ, (২) হানিফার লড়াই, (৩) আশবনামা ('মুক্তাল হোসেনে'র অংশ বিশেষ), (৪) মুক্তাল হোসেন, (৫) কিসমৎনামা, (৬) দজ্জলনামা, (৭) কাশিমের লড়াই ('মুক্তাল হোসেনে'র অংশবিশেষ)।

মুহম্মদখানের প্রথম কাব্য হিসাবে 'সত্য-কলি-বিবাদ সংবাদ' বাংলা সাহিত্যের প্রথম রূপককাব্য হিসাবে উল্লেখযোগ্য। পাঁচটি অধ্যায়ে সমাপ্ত এই রূপককাব্যে সত্যের সঙ্গে কলির বিবাদ এবং পরিশেষে কলির পরাজয় ও সত্যের জয়লাভ বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে কলির সঙ্গে দুঃশীলা এবং সত্যের সঙ্গে সত্যবতীর প্রেমের কাহিনীও বর্ণিত হইয়াছে। নারদের কৌশলে

সত্য ও কলির মধ্যে বিবাদ ঘনাইল, শান্তির দূত মিত্রকণ্ঠও দুইজনের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন করিতে পারিল না, যুদ্ধে চাতুরীর দ্বারা প্রথম দিকে পাপ-কলি জয়লাভ করিল, এবং সত্য মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে সত্যবতী এই সংবাদ পাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সুবুদ্ধি আসিয়া ধন্বন্তরিকে আহ্বান করিলেন, ধন্বন্তরি মূর্ছিত সত্যকে জ্ঞানবটিকা খাওয়াইয়া আরোগ্য করিয়া তুলিলেন। অতঃপর সত্যের সঙ্গে যুদ্ধে পাপ-কলি পরাভূত ও মূর্ছিত হইয়া পড়িল। যাহা হউক, এই যুদ্ধ শেষ হইলেও সত্য-কলির বিবাদ সত্য হইতে ত্রেতাযুগ পর্যন্ত চলিতে লাগিল। অবশেষে কলি সত্যের কাছে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া পলাইয়া গেল। এই আখ্যানটিতে সত্যপথযাত্রী মানুষের সঙ্গে কলিযুগের পাপের সংঘর্ষ এবং পরিশেষে সত্যের জয়লাভ সরলভাষায় রূপকচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। ১৬৩৫ খ্রীঃ অব্দে কাব্যখানি রচিত হয়। উত্তরাপথের সূফী সাধকগণ এই ধরনের কিছু কিছু তত্ত্বাশ্রয়ী ও রূপকথাধর্মী গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম ও আরাকানের মুসলমান কবিগণ এই আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন—যেমন কবি আলাওল।

চট্টগ্রামে হানিফা ও কয়রাপরী সংক্রান্ত যে সমস্ত গালগল্প মুসলমান সমাজে প্রচলিত আছে, ইতিপূর্বে যাহা অবলম্বনে সাবিরিদ খান একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন, মুহম্মদ খানও সেই একই বিষয় লইয়া 'হানিফার লড়াই' রচনা করেন। তাঁহার 'মুক্তাল হোসেন' একদা মুসলমান সমাজে খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। ইহাতে কারবালা প্রান্তরের শোচনীয় ঘটনা দক্ষতার সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে: গ্রন্থটির অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্য বর্তমান কালে ইহার একাধিক মুদ্রণ হইয়াছে। চট্টগ্রামের শিক্ষিত মুসলমান সমাজে এইকাব্য এখনও পঠিত হয়।

এবার আমরা আরও দুই-একজন মুসলমান কবির পরিচয় লইব, যাঁহারা শুধু সম্প্রদায় বিশেষের জন্য কাব্য রচনা করেন নাই, সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে যাঁহাদের স্থান অবিসংবাদিতভাবে নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরা আরাকানের কবি দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওলের কথা সবিস্তারে আলোচনা করিব।

দৌলত কাজী ॥

এই অধ্যায়ের সূচনাংশে আমরা দেখিয়াছি যে, সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই চট্টগ্রাম ও আরাকানের বৌদ্ধ রাজসভায় মুসলমান প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এখানে যে সমস্ত মুসলমান কর্মচারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই ছিলেন ধর্মান্তরিত বাঙালী মুসলমান। ইসলামী সংস্কৃতির দিক হইতে তাঁহারা যেমন ঘনিষ্ঠভাবে আরবী বণিকদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহারা যে দুই-এক পুরুষ পূর্বে হিন্দু ছিলেন, সেকথাও তাঁহাদের অবচেতন সত্তায় জাগরূক ছিল। বিদ্যোৎসাহী এই কর্মচারিগণ আরাকানের বর্মী বৌদ্ধ রাজবংশকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিলেন এবং বাঙালী মুসলমান কবিদের কাব্য রচনায় বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন। এই উৎসাহ-প্রবুদ্ধ কবিগণ, কেহ বিশুদ্ধ ইসলামী ইতিহাস-পুরাণের ঘটনা অবলম্বন করিয়া, কেহ সূফী-যোগদর্শন বিষয়ক রূপককাব্য লিখিয়া, কেহ-বা হিন্দুসমাজের রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়া একদা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। নানা কারণে চট্টগ্রাম ও আরাকান কবিদের কাব্যগুলি, উল্লেখযোগ্য কাব্যগুণ সত্ত্বেও, ভৌগোলিক সীমা ছাড়াইয়া মধ্যযুগে সমগ্র বাঙলাদেশে প্রচার লাভ করিতে পারে নাই—এখনও এই সমস্ত কাব্যের অতি অল্পই মুদ্রিত হইয়াছে। পুঁথিগুলি মুসলমান সমাজে যত্নপূর্বক রক্ষিতও হয় নাই। যাহা হউক, এখানে সপ্তদশ শতাব্দীর দুইজন শ্রেষ্ঠ ও প্রতিভাবান কবির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে—একজন দৌলত কাজী, অপরজন আলাওল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত আরাকানের দৌলত কাজী 'লোরচন্দ্রানী' বা 'সতী ময়না' শীর্ষক রোমান্টিক আখ্যানকাব্য রচনা করিয়া যে প্রশংসনীয় কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিভাবান কবি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য অনেকগুলি কাব্যের স্রষ্টা আলাওল মুসলমান সমাজে বিশেষ পরিচিত হইলেও নিছক কবিত্ব বিচারে দৌলত কাজী অধিকতর প্রশংসনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে দৌলতকাজীর জন্ম হয়। অল্প বয়সেই তিনি নানা বিদ্যা অর্জন করেন। স্বগ্রামে তরুণবয়স্ক

কবির ততটা সমাদর না হওয়ায় কবি আরাকানের বৌদ্ধ রাজা থিরি-থু-ধম্মার (শ্রীসুধর্মা) রাজসভায় আসিয়া আরাকানের সমর-সচিব আশরফ খানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরাকানের সঙ্গে পূর্ব-বাঙলার বেশ একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। বাঙলার পাঠান সুলতানের সাহায্যেই আরাকানরাজ নর-মেইখলা (১৪০৪-১৪৩৪) দীর্ঘকাল পরে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন; তাহার পর হইতে আরাকান রাজসভায় বাঙালী মুসলমান রাজকর্মচারী, সেনাপতি, মন্ত্রী, সূফী সাধক-কবিদের আনাগোনা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আরাকানরাজের অনেক বিচক্ষণ মুসলমান কর্মচারী বিশেষরূপে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহারা বাঙালী মুসলমান কবিকে আশ্রয় ও উৎসাহ দান করিতেন। এমনি এক বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি আশরফ খান, যিনি থিরি-থু-ধম্মার সেনাপতি ছিলেন,[৩২] তিনি তরুণ কবি দৌলত কাজীকে আশ্রয় দিয়াছিলেন।

কবি দৌলতকাজী আরাকানের রাজধানী রোসাঙ্গ এবং রাজা থিরি-থু-ধম্মা সম্বন্ধে অনেক তথ্য দিলেও নিজের পরিচয় সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলেন নাই। সোলতানপুরে তাঁহার বাস্তুভিটার চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু তাঁহার বংশধারার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।[৩৩] কবি কোন সম্ভ্রান্ত কাজীবংশে জন্ম গ্রহণ করেন, খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বোধ হয় তাঁহার জন্ম হয়। রোসাঙ্গে থিরি-থু-ধম্মার শাসনকালে (১৬২১-১৬৩৮) তিনি উক্ত কাব্য রচনা করেন, কিন্তু কাব্যটি অসমাপ্ত রাখিয়া অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে পরলোক যাত্রা করেন—ইহার অধিক তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না।[৩৪] তাঁহার 'লোরচন্দ্রানী' বা 'সতীময়না'র এক-তৃতীয়াংশ অসমাপ্ত রাখিয়া কবি মরদেহ ত্যাগ করেন। বাকি অংশ সম্পূর্ণ করেন তাঁহার পরবর্তী কবি সৈয়দ আলাওল। আরাকানরাজ সান্দ থু-ধম্মার (চন্দ্র সুধর্মা, ১৬৫২-১৬৮৪) প্রধানমন্ত্রী সুলেমানের নির্দেশে আলাওল 'লোরচন্দ্রানী'র অবশিষ্টাংশ সমাপ্ত

৩২ G. E. Harvey—*History of Burma*

৩৩ 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র ১৩৩৫ সনের মাঘ সংখ্যায় কবির জীবনকথা সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন তথ্য আছে।

৩৪ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে এ বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছিল। (দ্রষ্টব্য—আরকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্য)

করেন ১০৭০ হিজরা অর্থাৎ ১৬৫৯ খ্রীঃ অব্দে—দৌলত কাজীর মৃত্যুর প্রায় তিরিশ বৎসর পরে।

একদা আরকানরাজ থিরি-থু-ধম্মা বিপিনবিহারে গিয়াছিলেন পাত্রমিত্র সহ, সঙ্গে চলিলেন লস্কর উজীর শ্রীআশরফ খান। রাজার সভা বসিল অরণ্যে। সভায় আরবী-ফার্সী নানা কাহিনী ও তত্ত্ব-উপদেশ শোনা হইল, "গুজ্রাতী গোহারী ঠেটভাষা"তেও নানা কাহিনী চলিল। প্রধান অমাত্য আশরফ খান শেষে দৌলত কাজীকে নির্দেশ দিলেন—"শুনিতে লোরক রাজ ময়নার ভারতী"। লোরক রাজা ও সতী ময়নার কাহিনী শুনাও। জীবনে সত্যই একমাত্র অবলম্বন, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণকাহিনীতে সত্যই জয়ী হইয়াছে। লোরক রাজার পত্নী ময়না কি করিয়া সত্যপথে অবিচলিত থাকিয়া সতী হইলেন, দৌলত কাজীর নিকট আশরফ সে কাহিনী শুনিতে চাহিলেন—"কোন মতে হৈল ময়না পতিব্রতা সতী"। পরিশেষে আশরফ বলিলেন :

ঠেটা চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে।
না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে॥
দেশীভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় আনন্দে॥[৩৫]

সাধন নামক এক হিন্দী কবি ঠেট-গোহারী ভাষায় সতীময়নার কাহিনী লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙালীরা ঠেট হিন্দী বুঝিতে পারিত না। তাই আশরফ দৌলত কাজীকে দেশী অর্থাৎ বাংলা ভাষায় পাঞ্চালী ছন্দে এই কাব্য রচনার আদেশ দিলেন, যাহাতে সকলে শুনিয়া বুঝিতে পারে। তখন—

তবে কাজী দৌলত বুঝিয়া সে আরতি।
পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী॥

এখানে দেখা যাইতেছে, আরাকানের আশরফ খান এবং আরও অনেক বাঙালী মুসলমান লোরচন্দ্রানী বা সতীময়নার গল্প শুনিতে উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু মূলকাব্য ঠেট হিন্দী ভাষায় সাধন নামক এক কবি রচনা করিয়াছিলেন, যাহার অর্থ বাঙালী শ্রোতারা বুঝিত না। সেই অসুবিধা

---

৩৫ এখানে লোরচন্দ্রানী-সতীময়নার উদ্ধৃতিগুলি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত ও বিশ্বভারতী প্রকাশিত সংস্করণ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

দূর করিবার জন্য কোন এক হিন্দী গল্প বা রূপকথাকে দৌলত কাজী বাংলা পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে রচনা করেন। কিন্তু কাব্য সমাপ্ত হইবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, লোরচন্দ্রানী-সতীময়নার কাহিনী দৌলত কাজীর মৌলিক সৃষ্টি নহে, তিনি কবি সাধন রচিত কোন হিন্দী-কাব্যের অনুকরণে সতী ময়নার কাব্য লিখিয়াছিলেন।

দৌলত কাজীর কাব্যের মূল উৎস কোথায় নিহিত এবিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন এবং 'লোরচন্দ্রানী-সতীময়না'র সম্পাদক অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন, দুই-একটা তথ্যও সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের কেহই মূল উৎসের সন্ধান পান নাই।[৩৬]

ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় লোরকাহিনীর কয়েকটি অপ্রধান উৎসের উল্লেখ করিয়াছেন। চতুর্দশ শতাব্দীর জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের 'বর্ণনরত্নাকরে' "লোরিক নাচ"-এর উল্লেখ আছে। ইহাতে মনে হয়, চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই হিন্দী-ভাষায় লোরকাহিনী সম্বলিত নৃত্যগীত বিহারে প্রচলিত ছিল। গ্রীয়ার্সন সাহেব শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় দক্ষিণ-বিহারের গোয়ালাদের (আহীর) সমাজে প্রচলিত লোরিক মল্লের গান সংগ্রহ করেন। এই গল্প-আখ্যানের সঙ্গে দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রানী'র মোটামুটি ঐক্য আছে। বিহারী গল্পে লোরিক মল্লকে গৌড়বাসী বলা হইয়াছে। লাহোর মিউজিয়মে 'লোরচন্দ্রানী'র কাহিনী-বিষয়ক যে চিত্রগুলি আছে, তাহা লোরচন্দ্রানীর কাহিনীকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।[৩৭] অবশ্য দৌলত কাজী সাধন নামক এক হিন্দী কবির উল্লেখ করিয়াছেন, যাঁহার আখ্যান অবলম্বনে তিনি বাংলা কাব্য রচনা করেন। এই বিষয়ে ইতিপূর্বে বিশ্বাসযোগ্য বিশেষ কোন উৎস বা উপাদান খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

মুন্সী আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "খেট

---

৩৬ এই বিষয়ে তাঁহাদের মতামতের জন্য ডঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম—অপরার্ধ) ও 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য' এবং অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত 'সতীময়না-লোরচন্দ্রানী'র ভূমিকা (বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'সাহিত্য প্রকাশিকা'-১ম খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

৩৭ সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত—মোগল চিত্রের আমদানী। (প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩২১)

(ঠেট?) ও গোহারী কোন্ দেশের ভাষা?[৩৮] এই গোহারী ভাষা নিবদ্ধ 'লোরচন্দ্রানী' উপাখ্যান কোথায় গেল, অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় এখন আর কোন ফল হইবে না।"[৩৯] কিন্তু ইদানীং এ বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, যাহা হইতে দৌলত কাজীর অবলম্বিত উৎস খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সম্প্রতি আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের "হিন্দী তথা ভাষা-বিজ্ঞান বিদ্যাপীঠ" কেন্দ্র হইতে ডঃ বিশ্বনাথ প্রসাদ ও ডঃ মাতাপ্রসাদ গুপ্তের সম্পাদনায় 'চন্দায়ন' শীর্ষক একটি লোকগাথাকাব্য ও লোকগীতিসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে সম্পাদকদ্বয় মুল্লা দাউদ রচিত 'চন্দায়ন' নামক একখানি প্রাচীন হিন্দীকাব্য ও শ্লোকসংগ্রহ সম্পাদনা করিতে গিয়া লোর কাহিনী সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান ও অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন।[৪০] পুরাতন হিন্দী ভাষায় রচিত 'চন্দায়ন' কাব্যের রচনাকার মুল্লা দাউদের উল্লেখ ঐতিহাসিক বদাউনের গ্রন্থে আছে। ইহাই হিন্দী সাহিত্যের প্রেমাশ্রিত প্রথম সূফী কাব্য। বাঙলায় প্রবাস জীবন যাপনকালে কুতুবন 'মৃগাবতী' শীর্ষক রোমান্টিক আখ্যানকাব্য লিখিয়াছিলেন পূরবীয়া হিন্দী-ভাষায়। তাহারও ১৩০ বৎসর পূর্বে চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দে মুল্লা দাউদ হিন্দী ভাষায় নূর ও চন্দার প্রেমকাহিনী বর্ণনা করেন। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা 'চন্দাবত' বা 'চন্দাবন' নামে উল্লিখিত হইয়াছে।[৪১] সম্প্রতি এই কাব্যটির ফার্সী হরফে লেখা পুঁথি দুটি-একটি প্রাচীন রেখাচিত্রসহ পাটনা কলেজের অধ্যাপক সৈয়দ হসন অস্করী সাহেবের গ্রন্থাগার হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। পরে 'চন্দায়ন' সম্পাদক ডঃ বিশ্বনাথ প্রসাদ ও ডঃ মাতাপ্রসাদ গুপ্ত এই বিষয়ের আরও কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন।

---

৩৮ ডঃ সুকুমার সেন এই ভাষাকে হিন্দী বা ভোজপুরী ভাষা বলিয়াছেন। (বা. সা. ইতি. ১ম—অপরার্ধ)

৩৯ আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ—দৌলত কাজী ও লোরচন্দ্রানী (সাহিত্য, ১১শ সংখ্যা, ১৩০৮)

৪০ দ্রষ্টব্য—আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ও ডঃ বিশ্বনাথপ্রসাদ সম্পাদিত হিন্দী লোক-কাব্য—'চন্দায়ন'।

৪১ ডঃ রামকুমার বর্মার 'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাসে' এই কাব্য 'চন্দাবন' বা 'চন্দাবত' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার মতে ইহা ১৩৭৫ বিক্রমাব্দে রচিত হইয়াছিল। অবশ্য তিনি ঐই কাব্যের কোন পুঁথির সন্ধান পান নাই। (উক্ত গ্রন্থের, ৩য় সংস্করণের ৩০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

মুল্লা দাউদ এই কাব্যকে কখনও 'চন্দায়ন', কখনও-বা 'নুরক চন্দা' বলিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন পুঁথিতে ইহা 'লোর' বা 'লোরক' নামেও অভিহিত হইয়াছে। এই কাব্যের ফার্সী অনুবাদও হইয়াছিল। উক্ত সম্পাদকদ্বয়ের মতে প্রাচীন অবধী ভাষায় (মতান্তরে হিন্দী) এই 'চন্দায়ন' কাব্য মুল্লা দাউদ ১৩৭৬ খ্রীঃ অব্দের দিকে রচনা করেন। ইহাই লোর কাহিনী সংক্রান্ত প্রাচীনতম কাব্য। অবশ্য নানা লোকগাথায় ও লোকমুখে ইহা পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। ছত্তীসগঢ়ী অঞ্চলে নানা উপকথায় এই কাহিনীর প্রায় সবটাই পাওয়া যায়—নামধামে যৎসামান্য পার্থক্য থাকিলেও মৌলিক পার্থক্য নাই বলিলেই চলে।[৪২] হায়দ্রাবাদে সালরজঙ্গ মিউজিয়মে দক্ষিণী ভাষায় রচিত 'মৈনা সতবন্তী' শীর্ষক একখানি পুঁথি আছে। ইহাতে গোয়ালাবংশের লোরক রাজা ও তাঁহার মৈনা নাম্নী পত্নী এবং চন্দ্রানী নাম্নী উপপত্নীর উল্লেখ আছে। সে কাহিনীও মুল্লা দাউদের আখ্যানের অনুরূপ। মির্জাপুরে প্রচলিত গল্পে চন্দ্রানীর চরিত্র নাই, তাহাতে মঞ্জরী লোরের রাণী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। লোর-চন্দ্রানী-মৈনা-মঞ্জরী সংক্রান্ত নানা গল্পকাহিনী ও উপকথা উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের লোক-জীবনে ও লোকসাহিত্যে এখনও ছড়াইয়া আছে।[৪৩] যাহা হউক নিম্নে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোর কাহিনীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা যাইতেছে।

মুল্লা দাউদের 'চন্দায়ন' শীর্ষক হিন্দী কাব্যের কাহিনী :—রাজা সহদেব কন্যা চন্বা বা চন্দার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিলে কন্যা মনোমত পাত্র লোরিকের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায় এবং

---

৪২ V. Elwin—*Folk Songs of Chhattisgarhi* (Oxford University Press)

৪৩ 'চন্দায়ন' সম্পাদক ডঃ বিশ্বনাথ প্রসাদ উক্ত কাব্যের ভূমিকায় বলিয়াছেন, "বিহার কে উত্তরী ভাগোঁসে লেকর সুদূর দক্ষিণকে হৈদরাবাদ তক ইস কথা কা বিস্তার পায় জাতা হৈ। উত্তরমেঁ গয়া, সারন, রামনগব, শাহাবাদ, মির্জাপুর, ছত্তীশগঢ় কা জিলা রায়পুর ঔর বুন্দেলখণ্ড, রাজস্থান আদিমেঁ সর্বত্র কিসী ন লিখী রূপমেঁ ইসকা প্রচার পায় জাতা হৈ। বংগাল ঔর ছত্তীশগঢ়কে কথারূপ কী ভী চর্চা উপর কী জা চুকী হৈ। ইতনে বিস্তৃত ভূখণ্ড মেঁ ব্যাপ্ত দুসরী কোই, লোকগাথা নহীঁ পাই জাতী।" কিন্তু গোরক্ষনাথ-সংক্রান্ত লোককথা, গাথা ও লোকনাট্যের আকারে বহু পূর্ব হইতেই সারা ভারতে প্রচার লাভ করিয়াছে—কেবল লোরকথারই সেইরূপ গৌরব প্রাপ্য নহে।

পথিমধ্যে এক চামারের কবলে পড়ে। এই বাঁঠোবার (বামন) অত্যাচারে গউরা রাজ্যের জনসাধারণ অত্যন্ত ক্লিষ্ট অবস্থায় কালযাপন করিতেছিল। তাই তাহার প্রতিবিধানের জন্য চনবা মহাবীর লোরিকের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। পথে ঐ বাঁঠোবার সঙ্গে লোরিকের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই অবকাশে চনবা পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিয়া লোরিকের সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যাকুল হইল এবং নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পুনরায় পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া গেল।

প্রাপ্ত হিন্দী লোকগাথায় লোরিকের মৈনা নাম্নী কোন পত্নীর উল্লেখ নাই, কিন্তু পুঁথির কাব্যে সর্বত্র মৈনা চরিত্রের বর্ণনা রহিয়াছে। অন্য এক হিন্দী কাব্যের কাহিনীতে আছে, মৈনা লোরিকের বিবাহিত পত্নী। কালক্রমে লোরের প্রেম চন্দার প্রতি ধাবিত হয়, তাহাকে লইয়া লোরিক বিদেশে চলিয়া যায়। এদিকে সুন্দরী মৈনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সাতন নগরের রাজকুমার তাহাকে হস্তগত করিবার জন্য এক কুটনী নিযুক্ত করে। কুটনী মৈনাকে অনেক প্রলোভন দেখাইল, কিন্তু মৈনা তাহার কথায় কান না দিয়া নিজ সতীধর্মে অবিচল রহিল। এই কাহিনী লইয়া সাধন নামক এক হিন্দী কবি "মৈনা কো সত্" নামক একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন। ইহাতে মৈনা এই বলিয়া বিলাপ করিতেছে যে, স্বামী লোরিক তাহাকে ত্যাগ করিয়া মহরের কন্যা চাঁদাকে লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।[৪৪]

ছত্তীশগঢ়ী উপকথায় কাহিনীটি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে:—বীর বামনের স্ত্রীর নাম চন্দৈনী। স্বামী তাহার প্রতি উদাসীন ছিল বলিয়া ভাইকে দেখিবার ছলছুতা করিয়া চন্দৈনী পিত্রালয়ে পলাইয়া আসিতেছিল। পথে বঁঠোবা নামে এক চামার তাহার পিছু লইলে চন্দৈনীকে অনেক বিপদে পড়িতে হইল। পরে সে মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিলে বঁঠোবা চামার তাহার সন্ধানে সেখানেও হাজির হইল। তখন চন্দৈনীর মা বীরপুরুষ লোরকে আহ্বান করিলেন এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য। লোর

৪৪ পণ্ডিত উদয়শঙ্কর শাস্ত্রীর সম্পাদনায় আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক. মু. হিন্দী তথা ভাষা বিজ্ঞানপীঠ' হইতে "মৈনা সতবন্তী" নামে সাধন কবির পুরাতন হিন্দী কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। মিয়া সাধনের সমগ্র গ্রন্থাবলী সম্প্রতি অগরচন্দ্র সম্পাদনা করিয়াছেন—উহা প্রকাশিতও হইয়াছে।

তাঁহার স্ত্রী মংঝরিয়াকে (মঞ্জরী) সঙ্গে লইয়া চামারের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিল—চামার তাহার কাছে হারিয়া গেল। যাহা হউক এই প্রসঙ্গে চন্দৈনীর সঙ্গে লোরকের দেখা সাক্ষাৎ হইবার ফলে উভয়ের মধ্যে প্রেম সঞ্চারিত হয়। তখন লোরক প্রতি রাত্রিতে দড়ির মই বাহিয়া চন্দৈনীর শয়নকক্ষে যাতায়াত আরম্ভ করিল, একদিন সকলের অলক্ষ্যে দুই জনে পলায়ন করিল। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া বীর বামন তাহাদিগকে ধরিবার জন্য পিছু পিছু ধাওয়া করিল। তখন লোরক-চন্দৈনী স্থানীয় রাজাদের কাছে আশ্রয় লইল। এদিকে লোরকের সঙ্গে চন্দৈনীকে দেখিয়া মঞ্জরী খুব ক্রুদ্ধ হইল—দুই সতীনে দারুণ কোন্দল বাধিয়া গেল। মঞ্জরী স্বামীর নিকট নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল—ইহার পরে ছত্তীসগঢ়ী উপকথার বাকি অংশ আর পাওয়া যায় না।[৪৫]

হায়দ্রাবাদ সালারজঙ্গ মিউজিয়মে রক্ষিত দক্ষিণী ভাষায় লিখিত পুঁথিটির কাহিনীও কতকটা এইরূপ। পুঁথির নাম 'মৈনা সত্‌বন্তী'। এক গোয়ালার লোরক নামে এক পুত্র ছিল। ঐ দেশের রাজার মৈনা নাম্নী একটি সুন্দরী কন্যা ছিল। দুই জনের বিবাহের পর সুখে দিন কাটিতেছিল। কালক্রমে লোরক দরিদ্র হইয়া পড়িল। জীবিকা নির্বাহের জন্য তাহাকে বাধ্য হইয়া পশু চরাইতে হইল। পশু চারণের অবকাশে সে চন্দা নাম্নী এক যুবতীকে দেখিয়া মুগ্ধ হয়, চন্দাও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাহারা দুই জনে পলাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত করিল এবং একদিন তাহারা পলাইয়াও গেল। এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া সতী মৈনা বিলাপ করিতে লাগিল। তখন এক দুষ্ট ব্যক্তি তাহাকে ভুলাইতে গিয়া ব্যর্থ হইল—মৈনার সতীত্ব এমনই অবিচল।[৪৬]

মির্জাপুরের লোকগাথায়ও এ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে চন্দৈনীর উল্লেখ নাই, মঞ্জরী লোরকের স্ত্রী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। লোর যুদ্ধ করিয়া এবং বীরত্ব দেখাইয়া মঞ্জরীকে লাভ করে।

দক্ষিণবিহারে গোয়ালাসমাজে লোরক মল্লের যে গল্প-কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা গ্রীয়ার্সন সাহেব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহাও কতকটা

৪৫ V Elwin—op cit.

৪৬ পূর্বোল্লিখিত 'চন্দায়ন' কাব্যের প্রস্তাবনা দ্রষ্টব্য।

এইরূপ :—গৌড়ের[৪৭] রাজা মাহারার কন্যার নাম চানায়ন। প্রথমে তাহার বিবাহ হয় সেওধারীর সঙ্গে। দেবী দুর্গার শাপে এই বিবাহ সুখের হয় নাই। তখন চানায়ন গৌড়বাসী প্রসিদ্ধ বীর লোরিকমল্লের সঙ্গে পলায়ন করে। চানায়নকে সঙ্গে লইয়া লোরিক নানা রাজ্য জয় করিল এবং অধিকৃত রাজ্যে বাস করিতে লাগিল। পরে দেবী দুর্গার নির্দেশ অমান্য করিয়া তিরহুত জয় করিতে গিয়া সে বিপদে পড়িল—অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচিয়া গেল। তাহার প্রথমা স্ত্রীর নাম মাজর (মঞ্জরী)। মাজর পূর্বজন্মে ছিল স্বর্গের পরী। মর্ত্যজীবনে সে লোরিকের পত্নী হইয়াছিল। সে-ই মৃতসঞ্জীবনী জল ছিটাইয়া লোরিককে বাঁচাইয়া তুলিল। তারপর লোরিক ও তাহার দুই স্ত্রী সুখে ঘরকরনা করিতে লাগিল।

দৌলত কাজী হিন্দী ঠেট ও গোহারী (গাঁওয়ারী) ভাষায় অর্থাৎ প্রাচীন হিন্দীতে রচিত লোরক-মৈনা-চন্দায়নী সংক্রান্ত কোন কাব্য-কাহিনী অবলম্বনেই তাঁহার লোরচন্দ্রানী বা সতী ময়নার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। হয়তো মিয়া সাধনের 'মৈনা সতবন্তী' বা মুল্লা দাউদ রচিত 'চন্দায়ন' শীর্ষক হিন্দী কাব্যের দ্বারাও প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন। সে যুগে উত্তর ভারতে এবং পূর্ব ভারতে হিন্দীভাষী অঞ্চলে লোরিকমল্ল ও তাহার দুই স্ত্রী মৈনা (মঞ্জরী) ও চন্দায়নের অনেক গল্পকাহিনী প্রচলিত ছিল। কবি দৌলত কাজী সেই সমস্ত পুঁথিসাহিত্য ও লোকগাথার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পৃষ্টপোষক আশরফ খান এই গল্পের একজন রসিক বোদ্ধা ছিলেন। তিনিই কবিকে হিন্দী চৌপাই ভাঙিয়া বাংলা পাঁচালীতে এই কাব্য রচনার নির্দেশ দেন।

দৌলতের কাব্যের আখ্যানভাগ হিন্দী কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া হয়তো এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ মৌলিকতা দাবি করিতে পারেন না, কিন্তু প্রচলিত লোককাহিনীকে যে তিনি একটি রমণীয় রূপকথাধর্মী রোমান্টিক আখ্যায়িকায় পরিণত করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ : গোহারি দেশের রাজা মোহরার সুন্দরী কন্যা চন্দ্রানীর সঙ্গে এক বামনের বিবাহ হয়—এ বিবাহ সুখের হয়

---

৪৭ দৌলত কাজী এই রাজ্যের নাম দিয়াছেন গোহারি। তাঁহার মতে, ইহা পশ্চিমের কোন রাজ্য—"পশ্চিমেত এক রাজ্য আছয় গোহারি।"

নাই। কারণ বামন ছিল নপুংসক। অতঃপর রাজা লোরকের (লোর) সঙ্গে সাক্ষাতের পর চন্দ্রানী ও লোর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। লোরের ময়নামতী নাম্নী আর এক স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু লোর সেই স্ত্রীকে ছাড়িয়া চন্দ্রানীকে লইয়া পলায়ন করিলেন। পথে নপুংসক বামন তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিলে লোর তাহাকে বধ করেন এবং রাজা মোহরার অনুরোধে গোহারি রাজ্যের রাজা হইয়া বসেন। এইরূপে কিছু কাল যায়, কালক্রমে তিনি প্রথমা পত্নী সতী সাধ্বী ময়নাকে ভুলিয়া গেলেন। ময়না এদিকে পতিবিরহে দুঃখে কষ্টে কাল কাটাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ছাতন নামক এক লম্পট রাজকুমার ময়নাকে হস্তগত করিবার জন্য রত্তনা নাম্নী এক কুটনীকে কুপ্রস্তাব দিয়া ময়নার নিকট পাঠাইয়া দিল। রত্তনা তাঁহাকে নানা প্রলোভনের দ্বারা ছাতনের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য বহুবিধ চেষ্টা করিল, কিন্তু প্রতিবারই সতী ময়না তাহার প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং বলিলেন :

মরে ইহলোকে না মিলে লোরকে
পরলোকে হইব সঙ্গী।

রত্তনা বারো মাসের যৌবনসুখের বর্ণনা (বারমাস্যা) দিয়া আষাঢ় হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী বৎসরের জ্যৈষ্ঠ মাসের বর্ণনা আরম্ভ করিতেই কাব্য খণ্ডিত হইয়াছে। কবি কাব্য অসমাপ্ত রাখিয়া পরলোক গমন করেন। অনেক পরে আরাকানের আর এক প্রসিদ্ধ কবি সৈয়দ আলাওল শেষাংশ সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি ১৬২২ হইতে ১৬৩৫ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রানী'র অনেকটা রচিত হয়, তারপর তিনি তিরোহিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর থিরি-থু-ধম্মার পরে আরাকানে আরও তিনজন রাজার (মিন্‌সানি, নরপতিগ্যি, থদো মিন্তা) রাজ্যকাল শেষ হইলে রাজা সান্দ-থু-ধম্মার (চন্দ্র সুধর্মা, ১৬৫২-৮৪) প্রধান মন্ত্রী সোলেমানের আদেশে সৈয়দ আলাওল 'লোরচন্দ্রানী'র অসমাপ্ত অংশ সমাপ্ত করেন। কাব্যটি সম্পূর্ণ করিয়া কবি আলাওল প্রহেলিকাপূর্ণ পয়ারে সমাপ্তিকাল নির্দেশ করিয়াছেন :

(১) মুসলমানী শকসংখ্যা শুন দিয়া মন।
অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্ধিমন্ত জন॥
সিন্ধু শূন্য রাখিয়া আপনি দুই দিগে।
সুত কলানিধিরে রাখিবা বাম ভাগে॥

(২) মগদের সনের শুনহ বিবরণ।
যুগে শূন্য মধ্যে যুগ বামে মৃগাঙ্কন॥

প্রথম শ্লোক হইতে ১০৭০ হিজরা অর্থাৎ ১৬৫৯ খ্রীঃ অব্দ এবং দ্বিতীয় শ্লোক হইতে ১০২০ মঘী সন অর্থাৎ ১৬৫৯ খ্রীঃ অব্দই পাওয়া যাইতেছে। দৌলত কাজীর মৃত্যুর প্রায় তিরিশ বৎসর পরে আলাওল 'সতী ময়না' সম্পূর্ণ করেন। এই সময়ে তিনি 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল' ও 'সপ্ত (হপ্ত) পয়কর' কাব্য লইয়াও ব্যস্ত ছিলেন। এই ব্যস্ততার মধ্যেই আলাওল দৌলতের অসমাপ্ত কাব্য 'সতী ময়না'য় হস্তক্ষেপ করেন। সেইজন্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ব্যস্ততার জন্যই "সতী ময়নায় উৎকর্ষের অভাব লক্ষিত হয়।"[৪৮]

দৌলত কাজী যেখানে কাব্যটি অসমাপ্ত অবস্থায় রাখিয়া লোকান্তরিত হন, তার পরে আলাওল এই ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন :—কুটনী রত্নার ঘৃণ্য প্রস্তাব আর সহ্য করিতে না পারিয়া ময়না তাহাকে মারিয়া ধরিয়া মুখে চূণকালি লাগাইয়া দূর করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি কি করিয়া বিরহব্যথা প্রকাশ করিবেন? তখন তাঁহার এক সখী তাঁহার দুঃখ দূর করিবার জন্য একটি দীর্ঘ উপকথার অবতারণা করিল। এই সুদীর্ঘ রূপকথায় সুখদুঃখের সঙ্গে মানবভাগ্যের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কথা বিবৃত হইয়াছে। এ গল্প যত দীর্ঘ, ততই নীরস। মূলকাহিনীর সঙ্গে এই উপকাহিনীর বিশেষ কোন যোগাযোগ নাই। এই অপ্রাসঙ্গিক গল্পটি অবতারণা করিয়া আলাওল কাব্যের কলেবর বাড়াইয়াছেন, কিন্তু মূলকাব্য ইহার দ্বারা কিছুমাত্র লাভবান হয় নাই। ধর্মবতী নগরীর রাজা উপেন্দ্রদেব কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া নিজ গর্ভবতী স্ত্রী রতনকলিকাকে ভেলায় চড়াইয়া জলে ভাসাইয়া দেন। রতনকলিকা অতি দুঃস্থ অবস্থায় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর আশ্রয়ে থাকিয়া একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। তাহার নাম আনন্দ। আনন্দ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অনেক দুঃসাধ্য কর্ম সম্পাদন করিয়া এবং বহু আপদবিপদ

৪৮ অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত—সতী ময়না ও লোরচন্দ্রানী, ভূমিকা, পৃ. ১১

অতিক্রম করিয়া শেষ পর্যন্ত পিতার সহিত মিলিত হইল, রাণীও বহুকাল পরে স্বামিসাহচর্য লাভ করিলেন। ইহাই এই উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। এই গল্পটি বিবৃত করিয়া সখী বলিল যে, ভাগ্য ছাড়া পথ নাই। সুতরাং ময়নাকে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতেই হইবে। এই গল্প শুনিয়া ময়না কোনও প্রকারে ধৈর্য ধরিয়া রহিলেন।

এদিকে লোর ও চন্দ্রানীর একটি পুত্র হইল, তাহার নাম প্রচণ্ড-তপন। এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল। সতী ময়না আর ধৈর্য রাখিতে না পারিয়া এক ব্রাহ্মণকে লোরের নিকট দূত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ সঙ্গে একটি সারিকা পক্ষী লইলেন। তিনি লোরের রাজসভায় উপস্থিত হইলে এই শিক্ষিত সারিকা রাজাকে ময়নার বিরহ কথা শুনাইল। এতদিন পরে লোরের সতী ময়নার কথা মনে পড়িল, তিনি পুত্রের হস্তে রাজ্যভার দিয়া সত্বর চন্দ্রানীসহ সতী ময়নার নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন। সতী ময়নার দুঃখের দিন ফুরাইল, বহু দুঃখের পর তিনি স্বামী সন্দর্শন লাভ করিলেন। অতঃপর দুই সতীনে মহানন্দে স্বামী সেবা করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। পরিশেষে কাল পূর্ণ হইলে পরিণত বয়সে রাজা লোর দেহত্যাগ করিলেন, তাঁহার দুই রাণী ময়না ও চন্দ্রানী সহমরণে গেলেন, বিষাদের মধ্যে কাব্য শেষ হইল। কাব্য সমাপ্ত করিবার পূর্বে আলাওল দৌলত কাজীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলিয়াছেন :

শ্রীযুক্ত দৌলত কাজী মহা গুণবন্ত।
তানে আন্তে করিয়া রচিল আদি অন্ত॥
তান সম আমার না হয় পদগাঁথা।
গুণিগণ বিচারিয়া কহ সত্য কথা॥

গুণিগণ যদি বিচারিয়া সত্য কথা কহেন, তবে তাঁহারা বলিতে বাধ্য হইবেন,—"তান_সম সৈয়দের (আলাওল) না হয় পদগাঁথা।" বাস্তবিক দৌলত কাজী প্রতিভাবিচারে আলাওল অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ—দৌলতের কাব্যে আলাওল-সংযোজিত শেষাংশ পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। কাহিনীগ্রন্থনে অপ্রাসঙ্গিকতার অবতারণা করিয়া এবং রচনাশৈথিল্যের পরিচয় দিয়া আলাওল পূর্ববর্তী কবির সুস্থ স্বাভাবিক রচনাদর্শ পুরাপুরি বজায় রাখিতে পারেন নাই। দৌলত কাজী যেখানে সহজ সরস রচনারীতি

অনুসরণ করিয়াছেন, সেখানে আলাওল কৃত্রিম কাব্যকলার ঐশ্বর্যে স্বাভাবিকতা ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন।

[দৌলতের কাব্যকাহিনী মৌলিক না হইলেও তিনি যে কাহিনী-বিন্যাসে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আলাওলের মতো বিখ্যাত কবিও অসম্পূর্ণ কাব্যকে সম্পূর্ণ করিতে গিয়া শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই—অপ্রাসঙ্গিকতার দহে ডুবিয়াছেন। সেই দিক দিয়া দৌলত কাজী বিচক্ষণতার অজস্র নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। কাহিনীটির উৎস উত্তর-ভারতীয় লোকচিত্ত: সুতরাং ইহাতে রূপকথার প্রভাব কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে। দৌলত কাজী রূপকথাকে পরিণত মনের পাঠোপযোগী রোমান্টিক কাহিনীতে পরিণত করিয়াছেন, আলাওল কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারেন নাই।]

কাহিনীটির আরও দুই-একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে। প্রথমতঃ সঠিকভাবে বলিতে গেলে দৌলত কাজীই মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্ত্য-জীবনরসের কবি। অবশ্য ডঃ এনামুল হক, মুন্সি আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এ্যাকাডেমির উদ্যোগে দৌলত কাজীরও পূর্ববর্তী মুসলমান কবিদের তথাকথিত 'সেকুলার' কাব্যের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।[৪৯] ইতিপূর্বে কিছু সন্দেহের অবকাশ রাখিয়া আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। যাহা হউক উৎকৃষ্ট কবিত্বশক্তি ও বিচক্ষণতা বিচার করিলে দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রানী'কে মধ্যযুগের একখানি মূল্যবান মর্ত্য-জীবনের অসাম্প্রদায়িক কাব্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ দৌলত কাজী মুসলমান হইলেও হিন্দুর কাহিনীকে ঠিক হিন্দু কবির মতোই বর্ণনা করিয়াছেন। হিন্দুর সামাজিক আচারব্যবহার, জীবন, আদর্শ ও শাস্ত্রসংহিতালব্ধ নানা তথ্য অবলম্বনে তিনি যেভাবে কাব্যের রূপ দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে হিন্দু কবি বলিয়া মনে হইতেছে। অবশ্য পূর্বে তাঁহাদের বংশ হিন্দুই ছিল। তবু চিত্রকল্প, উপমা, উদাহরণ প্রভৃতিতে কবি সর্বত্র হিন্দু মনোভাব রক্ষা করিয়াছেন—ইহা অল্প বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। প্রারম্ভে বন্দনা অংশ ও 'মুহম্মদের সিফত' এই দুইটি অনুচ্ছেদ ব্যতীত আর

৪৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ প্রকাশিত 'পুথি-পরিচিতি' দ্রষ্টব্য।

কোথাও প্রত্যক্ষভাবে মুসলমান সমাজ বা ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত কোন প্রসঙ্গ নাই। 'দ্বারিকাতে শোভে যেন গোবিন্দ সমাজ', 'প্রত্যক্ষ শঙ্কর সম সেবে নিজ পতি', 'নামে চিরজীবী হৈল জানকী শ্রীরাম', 'লোরক রাজন রূপে নারায়ণ প্রাণসম নিজ নারী', 'সাক্ষাতে অম্বিকা যেন অনুভব করে,' 'প্রেম-ভাবে গৌরীঅঙ্গ প্রত্যক্ষ শঙ্কর', 'যেন রাধার কোলে কানাই', 'যৌবন কালেতে হরি বিদেশে গেলেন ছাড়ি,' 'রাধাসহ নিকুঞ্জে খেলয়ে বনমালী'[৫০] প্রভৃতি অজস্র উক্তিতে কবি হিন্দু-ঐতিহ্য অনুসরণে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। অথচ কবি ধর্মমতের দিক দিয়া সূফী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক আশরফ খানও চিস্তিয়া খান্দান মতের ("হানাফী মোঝাব ধরে চিস্তি খানদান") অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দুই-একটি উল্লেখ ব্যতীত মূল কাহিনীতে কবির ব্যক্তিগত ধর্মমতের কোন প্রসঙ্গ নাই। বরং হিন্দু যোগ-সাধনার প্রতি তাঁহার বেশ আকর্ষণ ছিল। যেমন এই বর্ণনা :

জ্ঞান সমুদ্রেতে ডুবি মনচিত্ত
বিম্ব মত কায়া ভাসে।
নাহি মিলে স্থল হইয়া চঞ্চল
মন বান্ধি সেই আশে॥
নয়ন মুদিয়া পাতাল ভেদিয়া
দৃষ্টি চন্দ্র মূলে করে।
স্থলে ডিম্ব রাখি জলে কূর্ম থাকি
কূর্মে ডিম্বে দৃষ্টি ধরে॥
মারি মায়াজাল জগৎ জঞ্জাল
দশ দিশ করে দূর।

৫০ আরও কিছু দৃষ্টান্ত :—

(১) জটাধারী ব্যাঘ্রচর্ম বিভূতিভূষণ।
কণ্ঠে রুদ্রমালা মূর্তি যেন ত্রিনয়ন॥
(২) তোমার কারণে লোর ধরে পীতাম্বর।
গৌরী প্রেমভাবে যেন উন্মত্ত শঙ্কর॥
(৩) জীবনে কি ফল যদি কলঙ্ক রহিল।
কলঙ্কের ভয়ে সীতা পাতালে নামিল॥

শুধু হিন্দু পুরাণের সুষ্ঠু ব্যবহার নহে, কবি এই সমস্ত পংক্তিতে যে বিস্ময়কর রচনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

লক্ষ্য অস্তস্পট লখিব দেখ তট
নির্মল চিত্তের মুকুর।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, এই রোমান্টিক কাব্যের আদ্যন্ত মর্ত্যের জীবনরসে পূর্ণ। কবি একস্থলে মৃত্তিকা, আর এক স্থলে মাটির মানুষের জয়ধ্বনি দিয়াছেন। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নর সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন :

নিরঞ্জন-সৃষ্টি নর অমূল্য রতন।
ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহার সমান॥
নর বিনে চিন নাহি কিতাব কোরান।
নর সে পরম দেব তন্ত্র-মন্ত্র-জ্ঞান॥
নর সে পরম দেব নর সে ঈশ্বর।
নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিঙ্কর॥

এই নরতত্ত্ব সহজিয়া সাধনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অবশ্য এই নরবাদ সূফী-দর্শনের অন্তর্ভুক্ত, কবি সূফী মতাবলম্বীও ছিলেন। কবি আর এক স্থলে মাটির বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন :

সিদ্ধিপদ পুণ্যপদ পৃথিবীতে সব।
মৃত্তিকা সে রাজধানী সকল সম্ভব॥
মাটি হন্তে রত্নমণি রূপের প্রতিমা।
সৃজিয়া প্রকাশে বিধি আপন মহিমা॥
পরম হংসের খোলা মাটির পাঞ্জর।
মাটি-ভঙ্গে হংসরাজ গতি শূন্যান্তর॥
মাটি হন্তে ভেদ পায় শূন্য চলাচল।
ছোট বড় রঙ্গ যত মাটিতে সকল॥
নানা রঙ্গে কেলিকলা উপজে বিলাস।
মৃত্তিকার ভোগ পুজি মৃত্তিকা গরাস॥

অবশ্য এই মৃত্তিকাস্তুতি আধুনিক কোন মানবতাবাদী জীবনরস হইতে উত্থিত হয় নাই, সূফী ও মরমী সাধনাই ইহার প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য। মৃত্তিকারূপী জীবদেহ অবসানে আত্মার মুক্তি লাভ ("মাটি-ভঙ্গে হংসরাজ গতি শূন্যান্তর") —ইহাই ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে। অনেকটা বাইবেলের "For dust thou art and unto dust shalt thou return"—এই উক্তির মতো। অবশ্য তাহার তাৎপর্য সম্পূর্ণ অন্যরূপ।

'সতীময়না'র যে অংশটুকু দৌলত কাজী রচনা করিয়াছিলেন এবং

অবশিষ্ট যেটুকু আলাওল সম্পূর্ণ করেন—দুই অংশকে একসঙ্গে বিচার করিলে কাহিনীটি তিনটি উপবিভাগে বিন্যস্ত হইতে পারে। প্রথমাংশে লোর ও ময়নার দাম্পত্যজীবনের বর্ণনা এবং লোর-চন্দ্রানীর কাহিনী; দ্বিতীয়াংশে স্বামীবিরহে সতীময়নার বিলাপ এবং ছাতনের প্রলোভন উপেক্ষা—এই পর্যন্ত দৌলত কাজী রচনা করিয়া দেহরক্ষা করেন। কাব্যের তৃতীয়াংশের সবটাই এবং দ্বিতীয়াংশের খানিকটা আলাওলের রচনা। কাব্য সমাপ্তিতে আলাওল লোর-ময়না-চন্দ্রানীর মিলন এবং পরিশেষে লোরের দেহত্যাগের পর দুই রাণীর সহমরণ বর্ণনা করিয়াছেন। দৌলত জীবিত থাকিলে বিষাদে কাব্য সমাপ্ত করিতেন কিনা সন্দেহ হয়: কারণ তিনি প্রথম খণ্ডের শেষে বলিয়াছেন:

চন্দ্রানীর দেশে যদি গেলা লোরপতি।
কোন কর্ম্ম করিলা এথাতে ময়নাধতী॥
ময়নাসতী রাজ্যে লোরেন্দ্র আইল পুনি।
তবে কোন উপাএ করিলেক চন্দ্ররাণী॥
কোন মতে এ তিন মিলিবে তার সঙ্গ।
কোন মতে ময়না সঙ্গে ছাতনা প্রসঙ্গ॥

এখানে 'কোন মতে এ তিন মিলিবে তার সঙ্গ'—এই পংক্তিতে মনে হইতেছে কবি বোধ হয় মিলনেই কাব্য সমাপ্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু লায়লা-মজনুর বিষাদান্ত পরিণতির আংশিক অনুসরণে কবি আলাওল নায়ক ও নায়িকাদের দেহত্যাগেই কাব্য সমাপ্ত করিয়াছেন।

এই কাব্যের কাহিনী রূপকথা ধরনের এবং রোমান্সধর্মী; শুধু কাহিনীর জন্য দৌলত খুব কিছু প্রশংসা দাবি করিতে পারেন না। কিন্তু চরিত্র তিনটিই বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃত উপকথা ও ফার্সী কিস্‌সার সঙ্গে উত্তর-ভারতীয় লোরকথার গালগল্প মিশ্রিত হইবার ফলে কাহিনী যে-আকার লাভ করিয়াছে তাহার শিল্পগত মূল্য যেরূপ হউক না কেন, চরিত্র তিনটির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বেশ উজ্জ্বল বর্ণেই চিত্রিত হইয়াছে। সতীময়নার অচপল সতীত্ব এবং চন্দ্রানীর যৌবনোচ্ছল নায়িকামূর্তি বিশেষ প্রশংসা দাবি করিতে পারে। ময়নার চরিত্রে কবি যেন সর্বংসহ নারীমূর্তির প্রতীক অঙ্কন করিতে চাহিয়াছেন। অপরদিকে আদিরসাত্মক চাপল্যের দ্বারা বিদ্যাসুন্দর ধরনের আদর্শে ও বিদ্যার ছায়ায় চন্দ্রানীর চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তাই

আদর্শ নারী সতীময়না 'টাইপ' চরিত্রে পর্যবসিত হইয়াছে, আর চন্দ্রানীর উচ্ছল নায়িকামূর্তি জীবনচাঞ্চল্যে অধিকতর চিত্তাকর্ষী হইয়াছে। কবি লোরের চরিত্রাঙ্কনেও আদর্শ পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা বাস্তবধর্মী নায়ক চরিত্রের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন। কাব্যটির প্রায় অর্ধাংশ কবি রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি যদি ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কবি-প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইত। তবে তাঁহার রচিত যেটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে দৌলত কাজীকে বাঙলার মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি বলা যাইতে পারে। চরিত্র-চিত্রণে তিনি যেমন লোর-ময়না-চন্দ্রানীর চরিত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি কুট্টিনী, ছাতন ও নপুংসক বামনের চরিত্রাঙ্কনেও অবহেলা দেখান নাই। অবশ্য কাব্যের যে অংশ আলাওল সম্পূর্ণ করেন তাহা সব দিক দিয়া দৌলত অপেক্ষা নিকৃষ্ট।[৫১]

রচনারীতি বিচার করিলে কবির বাণী-ভঙ্গিমায় ক্লাসিক ও রোমান্টিক রীতির পরিমিত সংমিশ্রণ দেখিয়া বিস্ময় জাগে। এরূপ পরিচ্ছন্ন পয়ার-ত্রিপদী আলাওলও অনেক সময় লিখিতে পারেন নাই।) এক যোগীর বর্ণনায় কবি বলিতেছেন :

জটাধারী ব্যাঘ্র-চর্ম্ম বিভূতিভূষণ।
কণ্ঠে রুদ্রমালা মূর্ত্তি যেন ত্রিনয়ন॥
জ্বলন্ত প্রদীপ দীপ্তি দিব্য কলেবর।
যোগানলে দহিছে সকল অভ্যন্তর।

বামন ও লোরের যুদ্ধ বর্ণনা :

লোর যত বাণ এড়ে   কাটএ বামন শূরে
অস্ত্রে অস্ত্রে বরিষেন্ত শর।
দোঁহ শিক্ষাবন্ত শূর   বাণে ছাইল বনতরু
দিবসে না দেখে দিবাকর॥
যত দেব ঋষিগণ   কৌতুকে দেখন্ত রণ
কারো নহে জয়-পরাজয়।

৫১ "স্বীকার করি কবি আলাওল দৌলত কাজী হইতে পাণ্ডিত্যে অনেক গুণ শ্রেষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু রচনার লালিত্যে, ভাবার মাধুর্যে এবং অল্প কথায় বা একটি ক্ষুদ্র উপমায়, অধিক ভাব প্রকাশের ক্ষমতায়, হতভাগ্য কবি দৌলত কাজী আলাওল হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ।" ('আরকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্য')

তেজোময় তীক্ষ্ণ বাণে বামন লোরকে হানে
মর্ম্ম ভেদি প্রবেশে হৃদয় ॥

এই বর্ণনা পরবর্তী কালের কবি কাশীরাম দাসের যুদ্ধবর্ণনা অপেক্ষা কোন দিক দিয়াই নিকৃষ্ট নহে, বরং রচনাভঙ্গীর মধ্যে যে পরিমাণ-সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়, তাহার জন্য কবি অধিক প্রশংসা দাবি করিতে পারেন।

দৌলত কাজী যে মূলতঃ কবি ছিলেন, তাহা তাঁহার রচনারীতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে। এ বিষয়ে তিনি আলাওলকে বহু দূরে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। 'গীতগোবিন্দে'র আদর্শে বাংলা ও সংস্কৃত মিশাইয়া পদ রচনা করিয়া তিনি যে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা প্রশংসার বিষয়; এই ধরনের রচনা বারবার বৈষ্ণব মহাজনদের স্মরণ করাইয়া দেয়। 'গীত-গোবিন্দে'র "রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্"-এর অনুসরণে দৌলত লিখিয়াছিলেন:

ভাদ্রমাসে চন্দ্রমুখী সুচরিতা একাকিনী
বসতি তিমির অতি ঘোরং।
অধরে মধুরৌ তাম্বুল বিনা ধূসরৌ
নিচল চকোরআঁখি ঝোরং ॥
রানী লো ময়নাবতী, তেজ নিজ মান পরিখেদং।
দুরন্ত বিরহানল দহতি তন অন্তর
তথাপি না চেতন ময়নাচেতং ॥
বকফুল মঞ্জরী কির্মিতি অতিসীদতি
মলিন অঞ্জন মুখ-ভেশং।
বিষাদিত বিলপসি সকল দিন যামিনী
অবিরত বিকল বিশেষং ॥

ছন্দ প্রকরণেও তিনি জয়দেবের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। যথা:

নবচূত অঙ্কুর কিশলয় মঞ্জুল
রঞ্জিত তরুলতা পুঞ্জে।
কোকিল কাকলী কলকল কূজিত
লুলিত ললিত নিকুঞ্জে ॥
কেতকী চম্পক কদম্ব কুরুবক
বকুল মুকুলকুল রঙ্গে।
হেরইতে মধুর মধুপানে মধুকর
মানিনী মান বিভঙ্গে ॥

ব্রজবুলিতে রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর দ্বারাও তিনি আকৃষ্ট হইয়া এই কাব্যে কয়েকটি উৎকৃষ্ট ব্রজবুলির পদ লিখিয়াছেন। তাহাতে সংস্কৃত শব্দের সংমিশ্রণ ঘটাতে ধ্বনিঝঙ্কার বৃদ্ধি পাইয়াছে। যথা :

মোহর সুনায়ক গুণের পালক
মধুর মুরতি মুখভেশং।
সো মধু তেজিয়ে করাওসি বিষ পান
ভালো ধাই কহ উপদেশং॥
তুই বড় পাপিনা পাপ শুনাওসি
ধরম করাওসি বামং।
পাতকী ঘাতকী ঠাই কি মোক চিন্তসি
জাতিকুল কুরু নির্ণামং॥

দৌলত কাজী সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গেও বিশেষ পরিচিত ছিলেন, রচনার মধ্যে সেইরূপ সূক্তি-প্রৌঢ়োক্তির অনেক প্রভাব দেখা যায়। কালিদাসের 'তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্' (রঘু) এবং দৌলতের 'পিপীলিকা যেন সিন্ধুতরঙ্গ অন্তরে' প্রায় একই প্রকার। কালিদাসের 'তুলরাশাবিবাগ্নিঃ' (শকুন্তল) এবং দৌলতের 'তুলারাশি দহে যেন প্রচণ্ড হুতাশ', কালিদাসের 'উপারূঢ় সামগ্রামিব চন্দ্রমাঃ' (রঘু) এবং দৌলতের 'ষোলকলা পূর্ণ যেন চন্দ্রমা সমান' প্রভৃতি পংক্তির সাদৃশ্য চমৎকার ফুটিয়াছে।[৫২] কবি যে গভীর মনোযোগসহ কালিদাস পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার কোন কোন উক্তি ভারতচন্দ্রের মতো গাঢ় ও গভীর অর্থবহ। যথা :

(১) যুবক পুরুষজাতি নিঠুর দুরন্ত।
এক পুষ্পে নহে জান মধুকর শান্ত॥
(২) স্বামী বিনে বিষম যে কামের কামিনী।
চন্দ্রের বিচ্ছেদে যেন তাপিত রোহিণী॥
(৩) মন বিনা তনু যেন মৃত্তিকাপিঞ্জর।
(৪) যাহার নাহিক লজ্জা কি ফল গঞ্জনা।
তস্করেতে ধর্মকথা, বেশ্যাকে ভর্ৎসনা॥
(৫) চিন্তিয়া যে করে কাজ সভাতে না পায় লাজ
পাছে নহে কলঙ্ক যন্ত্রণা।

---

৫২ বিস্তারিত আলোচনার জন্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত ও বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী'র ভূমিকা (পৃ. ২৫—২৬) দ্রষ্টব্য।

(৬) দারুণ পৃথিবী এই ব্যবস্থা তাহার।
এক যায় আন আইসে, কেহ নাহি কার ॥
(৭) কাণ্ডারী বিহীন নৌকা স্রোতে ভঙ্গ হয়।
পুরুষ বিহনে নারী জীবন সংশয় ॥

এই উদ্ধৃতিগুলিতে কবির জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য 'এপিগ্রামের' সার্থক দৃষ্টান্ত হিসাবে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

দৌলত কাজী বাঙলা দেশে স্বল্পপরিচিত, তাঁহার কাব্যের প্রামাণিক সংস্করণ মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে।[৫৩] এতদিন এই কবি অর্ধশিক্ষিত মুসলমান প্রকাশকের বিবর্ণ পুস্তিকায় প্রায় অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন।[৫৪] সম্প্রতি এই কাব্য সুসম্পাদিত হওয়ার ফলে সাহিত্যরসিক পাঠক দৌলত কাজীর কবিপ্রতিভার যথার্থ পরিচয় পাইবেন।

সৈয়দ আলাওল ॥

মধ্যযুগের সর্বাধিক প্রচারিত মুসলমান কবি সৈয়দ আলাওল পৃষ্ঠপোষকরূপে আরাকানের রাজপুরুষগণের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রতিভায় দৌলত কাজী অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও বাংলা সাহিত্যে তিনি অধিকতর খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কবি অনেকগুলি ইসলামী গ্রন্থ বাংলা কাব্যে রূপান্তরিত করিয়া এবং একখানি হিন্দী রূপক কাব্যের অনুবাদ করিয়া মধ্যযুগের আরাকান-চট্টগ্রামের মুসলমান সমাজে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনকথাও কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নহে।

আলাওলের প্রায় গ্রন্থেই তাঁহার জীবনকাহিনীর দুইচারিটি ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু 'সেকেন্দারনামা'য় তিনি ঈষৎ বিস্তারিত আকারে নিজের বিড়ম্বিত জীবনকথা বর্ণনা করিয়াছেন। ফতেহাবাদের অন্তর্গত জালালপুরের শাসনকর্তার নাম মজলিস কুতুব। কবির পিতা এই কুতুবের অন্যতম অমাত্য ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে ফতেহাবাদ পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত, কারণ কবির বর্ণনায় দেখা যাইতেছে, ইহার নিকটে গঙ্গা প্রবাহিত। ডঃ এনামূলহক ও আবদুল করীম সাহেবের মতে, আলাওল

৫৩ সাহিত্য প্রকাশিকা, ১ম, বিশ্বভারতী (ইহাতে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত 'লোরচন্দ্রানী' মুদ্রিত হইয়াছে।)

৫৪ হামিদী প্রেস প্রকাশিত 'সতীময়না'।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত জোবরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেই গ্রামে নাকি এখনও কবির বংশধরদের অস্তিত্ব আছে, আলাওলের পাকা কবরও আছে।[৫৫] কিন্তু ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেব অনেক সন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, ফতেহাবাদ মধ্যযুগে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটা পরগণা ছিল। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলেও ফতেহাবাদের উল্লেখ আছে। ফতেহাবাদের অন্তর্গত জালালপুর গ্রামেই কবির বাসস্থান। 'বাহ্‌রিস্তান-ই-গয়বী'-তে ফতেহাবাদ ও জালালপুরের উল্লেখ আছে। ডঃ শহীদুল্লাহের অনুমান, এই গ্রাম এখন পদ্মাগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে। কবি বোধ হয় পরে চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে বাস করেন, এবং সেখানেই তাঁহার জীবনাবসান হয়।

'বাহ্‌রিস্তানে' ফতেহাবাদের শাসনকর্তা মজলিস কুতুবের নাম আছে। কবির পিতা ইঁহার অমাত্য ছিলেন। ফতেহাবাদের মজলিস কুতুবকে বাঙলার সুবাদার ইসলাম খাঁ পরাভূত করেন। 'বাহ্‌রিস্তানে'র উল্লেখ সত্য হইলে কুতুবের রাজ্য ফরিদপুরে ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কবি আত্ম-পরিচয় সূচক পংক্তিগুলিতে বলিয়াছেন, ফতেহাবাদ গৌড়ে অবস্থিত এবং ঐ রাজ্যের মধ্য দিয়া গঙ্গা বহিয়া গিয়াছে। যথা :

(১) মুল্লুক ফতেয়াবাদ গৌরতে প্রধান।
তথাতে জালালপুর অতি পুণ্য স্থান॥
('পদ্মাবতী', হবিবী প্রেসে মুদ্রিত, পৃ. ১৪)

(২) গৌড় মধ্যে প্রধান ফতেয়াবাদ ভূম।
বৈসে সাধু সৎলোক হর্ষ মনোরম॥
অনেক দানেশমন্দ খলিফা সুজন।
বহুত আলিম গুরু আছে সেই স্থান॥
হিন্দুকুলে মহাসভ্য আছে ভট্টাচার।
ভাগীরথী গঙ্গাধারা বহে মধ্যে রাজ্য॥
রাজ্যেশ্বর মজলিস কুতুব মহাশয়।
আমি ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্যতনয়॥
(পদ্মাবতী, ডঃ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত, ঢাকা, ভূমিকা, পৃ. ১৲)

এখানে স্পষ্টই ফতেহাবাদকে গৌড়ের মধ্যে অবস্থিত বলা হইয়াছে, যাহার মধ্য দিয়া ভাগীরথী বহিয়া যাইত। সুতরাং ফতেহাবাদকে ফরিদপুর বা

৫৫ পাকিস্তানের আধুনিক গবেষকেরা করীম সাহেব কথিত এই তথ্য স্বীকার করেন না।

চট্টগ্রামে লইয়া যাওয়া তর্কসাপেক্ষ।[৫৬] ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের হিসাব অনুসারে কবির জন্ম হয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং মৃত্যু হয় বৃদ্ধ বয়সে ১৬৭৩ খ্রীঃ অব্দে।[৫৭] 'সেকেন্দারনামা' ও 'সয়ফুলমুলুক' অনুসারে দেখা যাইতেছে, একদা কবি ও কবির পিতা জলপথে নৌকাযোগে যাইতেছিলেন। এমন সময় "দুষ্ট হারমদ সঙ্গে হই গেল দেখা" ('সেকেন্দারনামা')। হারমাদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধে কবির পিতা প্রাণ দিয়া শহীদ হইলেন, কিন্তু কবি প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন এবং বহু কষ্টে কোনও প্রকারে রোসঙ্গে (আরাকানে) উপনীত হইয়া মগরাজার সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহী সৈনিক ('রাজ-আসোয়ার') হইয়া প্রবেশ করিলেন। অন্য কোন উচ্চতর পদ না মিলিবার কারণ, "না পাইল সৎপদ আছে অঙ্গলেস"। এই অঙ্গলেস খুব সম্ভব পর্তুগীজ জলদস্যু সেবাস্টিও গন্‌জালেস টিবো (Sebastio Gonsalves Tibau)। ভাগ্যান্বেষী গন্‌জালেস ১৬১০ খ্রীঃ অব্দে সন্দ্বীপ অধিকার করেন এবং পরে আরাকানরাজের নৌসেনাপতি হন। ১৬১০ খ্রীঃ অব্দের দিকে যখন পিতৃহীন আলাওল আরাকানে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন গন্-

৫৬ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত 'পদ্মাবতী', ভূমিকা, পৃ. ১৲।

৫৭ সম্প্রতি সৈয়দ মুর্তাজা আলী (বাংলা এ্যাকাডেমি পত্রিকা, ৫ম, ৩য় সং, ১৩৬৮) 'আলাওলের তোহ্‌ফা' প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, মুঘল আমলে ফরিদপুর জেলা, বরিশালের উত্তর অংশ ও ঢাকা জেলার দক্ষিণ অংশ লইয়া ফতেহাবাদ সরকার গঠিত হইয়াছিল। তাঁহার মতে চট্টগ্রামের জোব্‌রা গ্রাম কবির বাসস্থান হইতে পারে না—আধুনিক কালেই এইরূপ কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে। সেই গ্রামে আলাওলের মসজিদ বলিয়া পরিচিত মসজিদের শিলালিপিতে কোথাও আলাওলের নাম নাই। উপরন্তু আলাওলের ভাষায় চট্টগ্রামী উপভাষার প্রভাব নাই। এই জন্য মুর্তাজা আলী সাহেব চট্টগ্রাম বাতিল করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যদি ভাষার কথাই ধরা হয়, তাহা হইলে আলাওলের ভাষায় ফরিদপুর অঞ্চলেরও তো কোন চিহ্ন নাই। বরং তাঁহার কাব্যে পশ্চিমবঙ্গের ভাষারীতি অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু 'বাহ্‌রিস্তানে'র বর্ণনায় মজলিস কুতুবের সঙ্গে ইসলাম খাঁরের যুদ্ধের কথা আছে। গৌড়, ফরিদপুর ও চট্টগ্রাম—তিন স্থান হইতেই কবিকে দাবি করা হইয়াছে। এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। 'বাহ্‌রিস্তানে'র কথা সত্য হইলে ফতেহাবাদকে ফরিদপুরের অন্তর্গত বলিতে হইবে। কিন্তু গৌড় ও গঙ্গার সম্বন্ধে কি বলা যাইবে? মনে হয়, কবি ফতেহাবাদের কাল্পনিক গৌরব প্রচারের জন্য গঙ্গার উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, উপস্থিত ক্ষেত্রে ফতেহাবাদকে ফরিদপুর জেলায় অবস্থিত ছিল (এখন পদ্মাগর্ভে বিলুপ্ত) বলিয়া ধরিয়া লওয়া গেল।

জালেস[৫৮] আরাকান রাজসভায় আসর জমাইয়া অবস্থান করিতেছিলেন।[৫৯] ইঁহারই প্রতিকূলতায় কবি রাজসরকারে প্রথম দিকে কোন উচ্চপদ পান নাই। যাহা হউক অশ্বারোহী সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণ করিলেও, তিনি যে সঙ্গীতাদি নানা কলাবিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহার সংবাদ আরাকানের অভিজাত মুসলমান সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী ও বাংলা ভাষায় তাঁহার যে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, তাহা তাঁহার অনুবাদ-কাব্যগুলি হইতেই বুঝা যাইতেছে। সঙ্গীতবিদ্যায়, বিশেষতঃ ভারতীয় মার্গসঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল. 'পদ্মাবতী' কাব্যে তিনি 'সঙ্গীত-দামোদরের'ও উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া আরাকানের উচ্চবংশজাত মুসলমানগণ তাঁহাকে 'তালিব আলিম' বলিয়া বিশেষ মান্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার গুণের কথা প্রচারিত হইল। আরাকানের শাসনকর্তাদের নির্দেশে তিনি আরবী, ফার্সী ও হিন্দী কাব্যের অনুবাদ করিয়া সর্বত্র বিশেষ খ্যাতি লাভ করিলেন। আরাকানের তিনজন প্রধান কর্মচারীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া তিনি মুসলমান সমাজে খুব মান্য হইয়াছিলেন। আরাকানের প্রধানমন্ত্রী মাগনঠাকুর, দৌলত উজীর বা অর্থমন্ত্রী সুলেমান এবং মগরাজের বন্ধু ও শ্রীহট্টের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সৈয়দ-মুসা—এই তিনজন প্রধানে কবিকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং কাব্যরচনার উৎসাহ দিতেন। সুলেমানের নির্দেশে কবি দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য 'লোর-চন্দ্রানী' সম্পূর্ণ করেন আনুমানিক ১৬৫৮ খ্রীঃ অব্দে। মাগনঠাকুরের[৬০] অনুরোধে তিনি 'পদ্মাবতী' ও 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল' রচনা করেন। কিন্তু 'সয়ফুলমুলুক' সমাপ্ত হইবার পূর্বেই মাগনঠাকুরের মৃত্যু হয়। মাগনের মৃত্যুর পর আলাওল আরাকানের প্রধানমন্ত্রী সুলেমানের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহারই নির্দেশে কবি দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য সম্পূর্ণ করেন এবং 'তোহ্‌ফার'ও অনেকাংশ রচনা করিয়া ফেলেন। সেনাপতি

---

৫৮ অবশ্য কেহ কেহ গন্‌জালেসের এই বৃত্তান্ত স্বীকার করিতে চাহেন না। দ্রষ্টব্য—'পুঁথি-পরিচিতি', পৃ. ৫৮৩।

৫৯ J. J. A. Campos—*History of Portuguese.*

৬০ মাগনঠাকুর আরাকানরাজ থদো-মিন্তার কন্তার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

সৈয়দ মহম্মদের নির্দেশে তিনি 'সপ্তপয়কর' (হপ্তপয়কর) রচনা করিয়া যখন পরম গৌরবে সমাসীন, তখনই তাঁহার জীবনে দুর্ভাগ্যের মেঘ নামিয়া আসিল। এই সময়ে শাহ্ সুজা বাঙলা হইতে পলাইয়া আসিয়া আরাকান-রাজের নিকট আশ্রয় লন। কোন কারণে আরাকানরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সপরিবারে হত্যা করেন (১৬৬১ খ্রীঃ অঃ)। শাহ্সুজা সূফী-সাধনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কবি আলাওলও একই পথের পথিক ছিলেন বলিয়া শাহ্সুজার সঙ্গে তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। শাহ্সুজার বিনাশের পর কবির উপরেও রাজদণ্ড নামিয়া আসিল। সুজা-সংশ্রবের জন্য তাঁহাকে প্রায় দুইমাস কয়েদ থাকিয়া অশেষ নির্যাতন ভোগ করিতে হইল। এই প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন :

> বহুল যন্ত্রণা দুঃখ পাইলুঁ কর্কশ।
> গর্ভবাস প্রায় ছিলুঁ পঞ্চাশ দিবস॥
> আয়ু ছিল শেষ আমার রাখিল বিধাতাএ।
> সবে ভিক্ষা জীব রক্ষা ক্লেশে দিন যাএ॥

অবশ্য কবিকে বেশী দিন লাঞ্ছিত জীবন যাপন করিতে হয় নাই। আরাকানের বিচারপতি কাজী সৈয়দ মসুদ শাহার আনুকূল্যে তিনি আবার রাজসভায় স্থান পাইলেন এবং তাঁহার নির্দেশে কবি 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল' এবং আরাকান-রাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মার নির্দেশে 'সেকেন্দারনামা' অনুবাদ করিলেন। কবি পূর্বেই সূফী মতের অন্তর্ভুক্ত কাদেরী পন্থায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধবয়সেও তিনি কয়েকখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন—সেকথা তিনি অন্যান্য কাব্যে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। 'তোহ্ফা' রচনাকালে (১৬৬৩-৬৪) কবি যে বৃদ্ধ হইয়াছেন তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। 'সয়ফুলমুলুক', 'সেকেন্দারনামা' ও 'হপ্তপয়করে'ও কবি নিজেকে বৃদ্ধ বলিয়াছেন।[৬১] তাঁহার সর্বশেষ কাব্য 'সেকেন্দারনামা' ১৬৭১ খ্রীঃ অব্দের দিকে রচিত হয়—তখন তিনি সুবৃদ্ধ। মনে হয়, ইহার অল্প পরেই তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকিবে।[৬২]

---

৬১ 'সয়ফুলমুলুকে' ("বৃদ্ধকালে গ্রন্থকর্ম উচিত না হয়"), 'সেকেন্দারনামা'র ("তবে আমি নিবেদিল হইল বৃদ্ধকাল") এবং 'সপ্তপয়করে' ("যদ্যপিও জরাজীর্ণ চিন্তাকুল চিত") এইরূপ উল্লেখ আছে।

৬২ ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মতে, কবির জন্ম হয় সম্ভবতঃ ১৫৯২ খ্রীঃ অব্দে এবং মৃত্যু হয় ৮১ বৎসর বয়সে ১৬৭৩ খ্রীঃ অব্দের কাছাকাছি সময়ে।

মধ্যযুগের বিখ্যাত অনুবাদক ও কবি সৈয়দ আলাওলের[৬৩] সমস্ত কাব্যই আরবী-ফার্সী-হিন্দী কাব্যের অনুবাদ বা ভাবানুবাদ। কেবল 'লোর-চন্দ্রানী'র অবশিষ্ট অংশটুকু আলাওলের স্বাধীন রচনা। তাঁহার পূর্ববর্তী কবি দৌলত কাজীর বিশেষ কোন ব্যক্তিগত ধর্মমত 'লোরচন্দ্রানী'তে প্রাধান্য পায় নাই, কিন্তু আলাওল তাঁহার কাব্যসমূহের কোন কোন স্থলে নিজস্ব ধর্মমত ব্যক্ত করিয়াছেন। "হিন্দু কবিরা যখন লৌকিক দেবদেবীর মহিমা প্রচারে ব্যস্ত, তখন সুদূর আরাকানে বসে আলাওল নিছক মানুষের কাহিনীকাব্য রচনা করেছিলেন।"[৬৪] একথা সত্য বটে। কিন্তু কবির 'পদ্মাবতী' ও লোরচন্দ্রানী'র শেষাংশ বাদ দিলে. তাঁহার আর সমস্ত কাব্যেই ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, গল্পকাহিনী ও শাস্ত্রনির্দেশ অনুসৃত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে কেবলমাত্র লৌকিক জীবনরসের কবি বলিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইবার প্রয়োজন নাই।

এবার সংক্ষেপে আলাওলের কাব্যসমূহের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। তাঁহার ভণিতায় মোট ছয়খানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে—(১) পদ্মাবতী (আনুমানিক ১৬৪৬ খ্রীঃ অব্দে রচিত), (২) লোরচন্দ্রানীর উত্তরাংশ (১৬৫৯), (৩) সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল (১৬৫৮-৭০), (৪) সপ্ত (হপ্ত) পয়কর (১৬৬০), (৫) তোহ্‌ফা (১৬৬৩-৬৯), (৬) সেকেন্দারনামা (১৬৭২)। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন

---

৬৩ কেহ কেহ অনুমান করেন, কবির পুরা নাম সৈয়দ আলাওল হক। "আলাওলের প্রকৃত নাম বোধহয় আলাউল হক।...অধুনা আরাকানের কেহ কেহ আলাউলের বংশধর বলে দাবী করেছেন। তাঁরা কিন্তু আলাউলের সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বংশতালিকা দিতে সমর্থ হন নাই। তাঁদের মতে, আলাউল সৈয়দ বংশের ছিলেন। মধ্যযুগে সৈয়দদের বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হত। যদি আলাউল সৈয়দবংশের হতেন তবে তিনি নিশ্চয় একথা তাঁর কাব্যে উল্লেখ করতেন।"—বাঙলা একাডেমি পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৮ (সৈয়দ মুর্তাজা আলী—'আলাউলের তোহ্‌ফা')। শ্রীযুক্ত আলী মনে করেন যে, আরাকানেই কবির শেষ জীবন অতিবাহিত হয়, আরাকানে নাকি আলাওলের কবরও আছে। অবশ্য এবিষয়ে নানা মতভেদ আছে। দ্রষ্টব্য—উল্লিখিত পত্রিকা, পৃ. ১০৮—১০৯।

৬৪ বাঙলা একাডেমি পত্রিকা, ১৩৬৮, পৃ. ১১০

বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন।[৬৫] কিন্তু উল্লিখিত ছয়খানি গ্রন্থ ব্যতীত তাঁহার রচিত বলিয়া আর কোন গ্রন্থের নিশ্চিত উল্লেখ পাওয়া যায় না।

আলাওল মূলতঃ অনুবাদক। আরবী, ফার্সী ও হিন্দী গল্পকাহিনী তাঁহার প্রধান অবলম্বন। 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল' অনেকটা মৌলিক রচনা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।[৬৬] অনুবাদক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি বাংলা সাহিত্যে স্বীকৃত হইয়াছে। বলিতে কি, মধ্যযুগের কোন কবিই তাঁহার মতো অতগুলি কাব্যের অনুবাদ করেন নাই। আরও প্রশংসার বিষয়—তাঁহার অনুবাদ মোটামুটি স্বচ্ছন্দ ও কোন কোন স্থানে সাহিত্য-গুণান্বিত হইয়াছে। দুই এক স্থলে কবির মৌলিক রচনাশক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়।[৬৭]

পদ্মাবতী ॥ এই কাব্যের দ্বারাই আলাওল মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হইয়াছেন—যদিও ইহা মৌলিক কাব্য নহে, হিন্দী কাব্যের অনুবাদ। ইহাতে হিন্দু সমাজ ও জীবনের কাহিনীই অনুসৃত হইয়াছে; তাঁহার অন্য চারিখানি কাব্যের (হপ্ত-পয়কর, সয়ফুলমুলুক, তোহ্‌ফা, সেকেন্দারনামা) বিষয়বস্তু মুসলমান পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থ হইতে গৃহীত—মুসলমান সমাজের জন্যই রচিত। 'পদ্মাবতী'র কাহিনী রাজপুত ইতিহাস বা আখ্যান হইতে গৃহীত বলিয়া হিন্দু সমাজ ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে। কিন্তু উল্লিখিত চারিখানি কাব্য কেবলমাত্র মুসলমান সমাজের জন্য রচিত বলিয়া ইহাদের সঙ্গে হিন্দু সমাজের কোন যোগাযোগ ছিল না এবং সেই জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাব্যগুলি প্রায় অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে।

'পদ্মাবতী' হিন্দী অবধি ভাষার কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবত' কাব্যের অনুবাদ।[৬৮] হিন্দী সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক-মীস্টিক কাব্যকার

---

৬৫ ডঃ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত ও ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'পদ্মাবতী', ভূমিকা, পৃ. ১৵০।

৬৬ ঐ, ভূমিকা, পৃ. ৷৴০—৷৵০।

৬৭ "আলাওল প্রধানতঃ অনুবাদক সত্যই। কিন্তু তাঁহার অনুবাদ মৌলিক রচনার স্পর্ধা করিতে পারে। কোথাও অনুবাদের আড়ষ্টভাব তাঁহার রচনায় দেখা যায় না। এরূপ নিপুণ অনুবাদ কম প্রশংসার কথা নয়।" (ঐ, পৃ. ৷৴০)।

৬৮ মূল হিন্দী কাব্যের নাম পদুমাবতী, পদ্মাবৎ বা পদমাবৎ।

মালিক মুহম্মদ জায়সী মধ্যযুগীয় সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের এক অসাধারণ প্রতিভাবান কবি বলিয়া শ্রদ্ধার্হ আসন লাভ করিয়াছেন। বাঙালী কবি আলাওল তাঁহার কাব্য অবলম্বনে পাকা অনুবাদকের রীতি অনুসরণ করিয়া পরিচ্ছন্ন পশ্চিমবঙ্গীয় সাধু ভাষার পয়ারত্রিপদী ছন্দে 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে কাহিনীর মূল লেখক সম্বন্ধে দুই-একটি কথার অবতারণা করা যাইতেছে।

মালিক মুহম্মদ অযোধ্যার অন্তর্গত রায় বেরেলীর জায়স নামে এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, সেই গ্রামের নামানুসারে তিনি মালিক মুহম্মদ জায়সী নামে পরিচিত হন। কবি বোধ হয় বিকলাঙ্গ ছিলেন, কারণ তাঁহার কাব্যের এক স্থলে কবি নিজের বিকলাঙ্গের ইঙ্গিত দিয়াছেন।[৬৯] কবির জন্মসন ৯০০ হিজরা অর্থাৎ ১৪৯৪ খ্রীঃ অঃ। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। 'পদুমাবত' ছাড়াও তাঁহার নামে 'আখিরী কলাম' এবং 'অখরাবট' শীর্ষক আরও দুইখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে। কবি ধর্মমতে সূফী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার গুরুর নাম শেখ মুহিউদ্দিন। কবির 'পদুমাবত' শের শাহের রাজত্বকালে[৭০] ৯৪৭ হিজরাতে (১৫৪০ খ্রীঃ অঃ) লিখিত হয়। লোকশ্রুতি মতে তিনি নাকি দেড়শত বৎসর জীবিত ছিলেন। ১০৪৯ হিজরা অর্থাৎ ১৬৩৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

---

৬৯ মুহম্মদ বাইঁ দিসি তজা, এক শ্রবণ এক আঁখি।
জব তেঁ দাহিন হোই মিলা, বোল পপীহা পাঁখি॥

(মুহম্মদ বাম দিকে এক কান, এক চোখ ছাড়িয়াছে। যখন সে দক্ষিণ দিকে পঁহুছিল, তখন তাহার বুলি পাপিয়া পাখীর ন্যায় হইল।—ডঃ শহীদুল্লাহের অনুবাদ)

৭০ 'পদুমাবতে'র এক স্থানে আছে:

সের সাহি দেহলী সুলতানু।
চারিউ খণ্ড তপা জস ভানু॥
ওহী ছাজ ছাত ঔ পাটা।
সব রাজৈ ধরা ললাটা॥

(দিল্লীশ্বর শের শাহ সূর্যের ন্যায় প্রতাপে চারিদিক তাপিত করিতেছেন। রাজছত্র ও পাট তাঁহারই শোভা পায়। সমস্ত রাজারা তাঁহার কাছে আভূমি নত ললাট।—প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৯, ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগোর অনুবাদ ('পদ্মাবত কাব্য এবং পদ্মিনীর অনৈতিহাসিকতা')

'পদ্মাবতে'র বর্ণনীয় বিষয়—চিতোরের রাণা রত্নসেনের সঙ্গে দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিনের যুদ্ধ, রত্নসেনের মৃত্যু এবং চিতোরগড় আলাউদ্দিনের অধিকারে আসিবার পূর্বেই সতীধর্ম দূষিত হইবার আশঙ্কায় রত্নসেনের দুই পত্নী নাগমতী ও পদ্মাবতী বা পদ্মিনীর অগ্নিশিখায় আত্মনাশ, পরিশেষে আলাউদ্দিনের শূন্যপুরী অধিকার। এই কাহিনী টডসাহেবের 'রাজস্থানে' সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য টড-প্রদত্ত কাহিনীর সঙ্গে জায়সীর কাহিনীর অনেক পার্থক্য আছে। আলাউদ্দিন-পদ্মিনীঘটিত কাহিনীর কতটুকু ঐতিহাসিক, কতটুকু জায়সীর কল্পনাপ্রসূত এবং কতটা টড সাহেবের স্বকপোলকল্পিত তাহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে। আসলে জায়সী সূফী ধর্মমতের পটভূমিকায় রূপককাব্য হিসাবেই 'পদ্মাবত' রচনা করেন। ইতিহাসের সঙ্গে এই কাব্যে-বর্ণিত কাহিনীর বিশেষ যোগ না থাকারই সম্ভাবনা।

রাজপুতানার চারণ কবিদের ডিংগলী ভাষায় রচিত কাল্পনিক গান ও গালগল্প হইতে টড এই কাহিনী সংগ্রহ করেন। তিনিও ঐতিহাসিক তথ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন নাই। উপরন্তু রাজপুত বীরত্বের প্রতি তিনি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, বহু স্থলে মুসলমান সুলতান আমীর-ওমরাহদিগকে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন।[৭১] যাহা হউক এ বিষয়ে সত্য ইতিহাস উদ্ধার করা একপ্রকার দুঃসাধ্য। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা এ বিষয়ে বহু অনুসন্ধান করিয়া হিন্দী ভাষায় "রাজপুতানা কা ইতিহাস" নামক যে বৃহৎ প্রামাণিক ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নানা তথ্য-নজির তুলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, ছয়মাস অবরোধের পর আলাউদ্দিন চিতোর দুর্গ দখল করেন। চিতোরের রাণা রতনসিংহ অন্যান্য সামন্তদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলে তাঁহার রাণী পদ্মিনী সখীদের সঙ্গে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দেন। এইরূপে অল্প দিনের জন্য চিতোর দুর্গে মুসলমান অধিকার স্থাপিত হয়—আলাউদ্দিন-পদ্মিনী

৭১ "টড রাজপুতদিগের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং মুসলমানগণের প্রতি একান্ত বিদ্বিষ্ট ছিলেন। তাঁহার বৃত্তান্তে তাহার পরিচয় আছে।"—'পদ্মাবতী'র (ডঃ শহীদুল্লাহ্‌ সম্পাদিত) ভূমিকা, পৃ. ২।০

সম্পর্কে ইহার অধিক আর যে সমস্ত গল্প কাহিনী সৃষ্ট হইয়াছে তাহাকে ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া যায় না।

আলাউদ্দিনের সমসাময়িক ও পরবর্তী মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বেশ ফলাও করিয়া আলাউদ্দিন কর্তৃক চিতোর বিজয় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পদ্মিনী-সংক্রান্ত কোন কথার আভাসও দেন নাই। আলাউদ্দিনের সমসাময়িক কবি আমীর খসরু, এবং ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরৌনী এবং অল্প পরবর্তী মৌলানা উসামি চিতোর আক্রমণের যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে পদ্মিনী-সংক্রান্ত কোন ইঙ্গিত নাই। আমীর খসরু এই আক্রমণের সময় আলাউদ্দিনের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। তাঁহার রচিত 'খজাইন্নুল-ফতুহ্'-এর বৃত্তান্তে দেখা যায়, আলাউদ্দিন চিতোর জয় করার পর চিতোর-রাজ আত্মসমর্পণ করেন। আলাউদ্দিন অতঃপর পুত্র খিজির খাঁয়ের উপর চিতোর শাসনভার অর্পণ করেন এবং চিতোরের নূতন নাম দেন—খিজিরাবাদ। এই কাহিনীতে পদ্মিনী, গোরা, বাদল, রত্নসেনের কোন উল্লেখ নাই। জিয়াউদ্দিন বরৌনীর 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহী'-তে এবং মৌলানা উসামির 'ফুতুহ-স্-সলাতিনে' এই যুদ্ধের বর্ণনা থাকিলেও পদ্মিনী-সংক্রান্ত কাহিনীর আভাসমাত্র নাই। অবশ্য আলাউদ্দিন চিতোরের পদ্মিনীর প্রতি হয়তো কামকলুষিত হস্ত প্রসারণ করেন নাই। কিন্তু তিনি গুজরাটের রাজা কর্ণসেনকে পরাভূত করিয়া তাঁহার অনুপমা রাণী কমলাদেবীকে বলপূর্বক বিবাহ করেন। মুসলমান বাদশাহেরা এরূপ কর্মে বিশেষ কেরামত দেখাইতে পারিলে আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেন। তাই মনে হয় আলাউদ্দিনের পদ্মিনী লাভের ইচ্ছা-সংক্রান্ত ঘটনার পশ্চাদ্‌পটে এরূপ কোন ঐতিহাসিক কাহিনীর ইঙ্গিত থাকিলেও থাকিতে পারে।

মুসলমান আক্রমণে নারীধর্ম হারাইবার ভয়ে রাজপুত রমণীগণ যে জহর ব্রত (জতুগৃহ>জউঘর>জহর) করিয়া প্রাণ দিতেন, এরূপ অনেক বর্ণনা মুসলমান ঐতিহাসিকদের বর্ণনাতেও আছে। মুহম্মদ তুঘলক চিতোর আক্রমণ করিলে রাণী ও অন্যান্য অন্তঃপুরিকারা অগ্নিশিখায় প্রাণদান করেন—ইহা ইতিহাসে স্বীকৃত হইয়াছে। তাই মনে হয় আলাউদ্দিন-পদ্মিনী-রত্নসেনের কাহিনীর পশ্চাতে কোন ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত প্রচ্ছন্নাবস্থায় আছে। দেশে দেশে চারণ কবিগণ যৎসামান্য ইতিহাস অবলম্বনে রাজপুত-বীরত্বের

যে গল্পকাহিনী গাহিয়া বেড়াইতেন, তাঁহারাই বোধহয় এই গল্পের কাঠামো দাঁড় করাইয়াছিলেন। আর অযোধ্যার কবি মালিক মুহম্মদ জায়সী নানা-হাত-ফেরত-হইয়া-আসা গল্পকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী ও কাব্যের প্রয়োজনে বদলাইয়া 'পদুমাবত' রচনা করেন। সুতরাং জায়সীর এই কাব্যের পটভূমিকায় সব সময়ে ইতিহাসকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।[৭২] তিনি ধর্মমতে ছিলেন সূফী সাধক এবং কাব্য-বিচারে—রোমান্টিক আখ্যান লেখক, রূপক-প্রকরণ অবলম্বন করিয়াছিলেন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য। সুতরাং তাঁহার কাব্যে পুরাপুরি ইতিহাস পাওয়া যাইবে না।[৭৩]

জায়সীর আখ্যানটি সংক্ষেপে এইরূপ :—চিতোরের রাণা রাজা রত্নসেন, তাঁহার প্রথমা পত্নীর নাম নাগমতী। রাজা একটি হীরামন (তোতা) পাখীর নিকট সিংহল-রাজকন্যা পদ্মাবতীর অপার্থিব রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া যোগীর বেশে সদলবলে বহু কষ্ট সহ্য করিয়া সিংহলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পদ্মাবতী ও রত্নসেনের চারি-চক্ষুর মিলন হইলেও কিছুতেই প্রত্যক্ষ দর্শন ও মিলন হয় না দেখিয়া মহাদেবের বরে রত্নসেন গোপনে সিংহলগড়ে প্রবেশের উদ্যোগ করিলেন এবং সিংহলরাজ কর্তৃক সদলবলে ধৃত হইলেন। সিংহলরাজ গন্ধর্বসেন তাঁহাকে সঙ্গীসাথীসহ শূলে দিতে যাইতেছেন, এমন সময় দেবতাদের হস্তক্ষেপের ফলে রত্নসেনের পরিচয় পাইয়া, রত্নসেনের সঙ্গে রাজা কন্যা পদ্মাবতীর বিবাহ দিলেন। মহানন্দে রত্নসেন নবপরিণীতা পত্নীসহ শ্বশুরালয়ে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রথমাপত্নী নাগমতীর বিরহ বেদনার কথা শুনিয়া তিনি পদ্মাবতীসহ চিতোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সমুদ্রপথে নানা আপদ-বিপদ পার হইয়া রত্নসেন

---

৭২ ডঃ কানুনগো জায়সীর 'পদুমাবত'-কে ঐতিহাসিক কাব্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহার মন্তব্য—"পদ্মিনী মালিক মুহম্মদ জ্যায়সীর কল্পনাদুহিতা, সত্যকার রাণী নহেন।" (প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩৭)

৭৩ "সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত যে, পদ্মাবতী উপাখ্যান মালিক মুহম্মদ জায়সীর নানা সময়ের নানা ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক বৃত্তান্তে জোড়া দেওয়া একটি কাব্য মাত্র। তিনি ইতিহাস লিখিতে বসেন নাই। তিনি তাঁহার কাব্যে সূফীমতের ব্যাখ্যার জন্য আদিরসের আবরণে এক আধ্যাত্মিক রূপক কাব্য রচনা করিয়াছেন।" (ডঃ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত পদ্মাবতীর ভূমিকা, পৃ. ২।৶০)

পদ্মাবতীকে লইয়া চিতোরে পৌছাইলেন এবং দুই পত্নী লইয়া মহানন্দে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে রাঘবচেতন নামে এক যাদুকর ব্রাহ্মণকে রত্নসেন কোন অপরাধের জন্য শাস্তি দিলে সে দিল্লীতে সুলতান আলাউদ্দিনের কাছে উপস্থিত হইয়া রত্নসেনকে বিপদে ফেলিবার জন্য পদ্মাবতীর রূপগুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করিয়া পদ্মাবতীকে কাড়িয়া লইবেন মনে করিয়া চিতোর অবরোধ করিতে আসিলেন, কিন্তু মনের বাসনা পূরণ করিতে পারিলেন না। শেষে চতুর কৌশলে তিনি রত্নসেনকে বন্দী করিয়া দিল্লী লইয়া গিয়া অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তখন গোরা ও বাদল—দুইজন রাজভক্ত রাজপুত অসাধারণ বুদ্ধির কৌশলে দিল্লীর কয়েদখানা হইতে রত্নসেনকে গোপনে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে চিতোরে লইয়া আসিলেন। কিন্তু গোরা বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। রাজার অনুপস্থিতির অবকাশে তাঁহার এক পুরাতন শত্রু দেবপাল পদ্মাবতীকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া রাজা দেবপালকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিলেন; নিজেও আহত হইয়া পড়িলেন। নিজের মৃত্যুকাল নিকটবর্তী জানিয়া রত্নসেন বাদলের উপর চিতোর রক্ষার ভার দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। নাগমতী ও পদ্মাবতী সহমরণে গেলেন। আলাউদ্দিন পদ্মাবতীর কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিলেন না। বাদলও আলাউদ্দিনের ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দুর্গের সিংহদ্বারের নিকট নিহত হইলেন। অতঃপর আলাউদ্দিন মৃতসৈন্যের স্তূপ ও ভস্মীভূত নারীকঙ্কালে পরিকীর্ণ ধূমায়িত চিতোরগড় অধিকার করিলেন। জায়সীর কাহিনীটির সংক্ষিপ্ত সূত্র ইহাই। ইহাতে বর্ণিত সিংহল রাজকন্যা পদ্মাবতী, হীরামন পাখী, রাঘবচেতন, দেবপাল, দিল্লীর কারাকক্ষ হইতে রত্নসেনের মুক্তিলাভ প্রভৃতি চরিত্র ও কাহিনী লোকসাহিত্য ও রূপকথার আদর্শে বর্ণিত হইয়াছে।

মুহম্মদ জায়সী প্রেমের বিয়োগান্ত কাব্য রচনার অভিপ্রায়ে এই কাহিনী রচনা করেন নাই, বা মুসলমান সুলতানের পক্ষ লইয়াও এই কাব্য রচনায় অগ্রসর হন নাই। মূলতঃ তিনি সূফী প্রেমমার্গীয় অধ্যাত্মরসের কবি ছিলেন। তাই এই রোমান্টিক কাব্যে রূপকের ছলে সূফী অধ্যাত্মরসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রূপকের কথা তিনি কাব্যের আরম্ভ ভাগেই বলিয়াছেন:

তন চিতউর, মন রাজা কীন্‌হা।
হিয় সিংঘল, বুধি পদমিনি চীন্‌হা ॥
গুরু সুআ জেই পংথ দেখাবা।
বিনু গুরু জগত কো নিরগুণ পাবা ॥
নাগমতী য়হ দুনিয়া ধংধা।
বাঁচা সোই ন এহি চিত বংধা ॥
রাঘবদূত সোই শৈতানু।
মায়া আলাউদীং সুলতানু ॥
প্রেমকথা এহি ভাঁতি বিচারহু।
বুঝি লেহু জৌ বুঝৈ পারহু ॥

অনু: দেহ হইতেছে চিতোর, মন—রাজা। সিংহলকে হৃদয়রূপে চিনিয়া লও, বুদ্ধিকে জান পদ্মিনী বলিয়া। শুক পাখী হইতেছে গুরু—যিনি পথ দেখাইয়া চলেন। গুরুর উপদেশ বিনা কি নিরঞ্জনকে লাভ করিতে পারে? নাগমতী হইতেছে এ জগতের ধাঁধা; যাহার চিত্ত ইহাতে বাঁধা পড়ে না, সে-ই বাঁচিয়া যায়। রাঘবদূত হইতেছে সয়তান, আলাউদ্দিন মায়াবদ্ধ জীব। প্রেমের কথা এইরূপে বিচার কর, যে পার বুঝিয়া লও। (লেখককৃত অনুবাদ)

ফার্সী কবি জামী 'সলমান ও আবসাল' নামক যে রূপককাব্য রচনা করেন, জায়সীও সেই একই পথ ও রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং 'পদ্মাবত' একখানি আধ্যাত্মিক রূপককাব্য, সূফী ধর্মানুসারী প্রেম-কাহিনীর উপর এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কাব্য একদা ভারতে বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। রূপক-কৌশল, প্রেমের গল্প ও আধ্যাত্মিকতা—তিনের সমন্বয়ে জায়সী অসাধারণ কুশলতা অর্জন করিয়াছিলেন—জনপ্রিয়তার ইহাই প্রধান কারণ।

জায়সীর 'পদ্মাবত' রচনার (১৫৪০) প্রায় একশত বৎসর পরে আনুমানিক ১৬৪৬ খ্রীঃ অব্দে[৭৪] বাঙালী মুসলমান কবি সৈয়দ আলাওল আরাকানে বসিয়া এই কাব্যের বাংলা অনুবাদ করেন। তাঁহার জীবন-কাহিনীতে আমরা দেখিয়াছি—কবি নানা গুণে ও কলাবিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন, নানা ভাষাও জানিতেন। আরাকানে তখন মগরাজা থদো মিন্তা (১৬৪৫-৫২) রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার পূর্ব হইতেই আরাকানে

৭৪ কাহারও কাহারও মতে, ইহা ১৬৫১ খ্রীঃ অব্দে রচিত হইয়াছিল। দ্রষ্টব্য: বাংলা একাডেমি পত্রিকা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), কার্ত্তিক-পৌষ, ১৩৬৮

বাঙালী ও আরবী মুসলমান কর্মচারী ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি যাতায়াত করিতেন। আলাওল সর্বপ্রথম রাজমন্ত্রী সোলেমানের আদেশে দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য 'লোরচন্দ্রানী' সমাপ্ত করেন। রাজা থদো মিন্তার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ও কন্যা একসঙ্গে দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। মাগনঠাকুর এই কন্যার প্রধান অমাত্য ছিলেন। আলাওলকে মাগনঠাকুর অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। একদিন মাগনঠাকুর কবিকে বলিলেন যে, জায়সীর পদুমাবত কাব্য অপূর্ব হইলেও আরাকানের লোক হিন্দুস্থানী ভাষা বুঝিতে পারে না; আলাওল যদি বাংলা ছন্দে ঐ কাব্য রূপান্তরিত করিতে পারেন তাহা হইলে সকলে এই সুমধুর কাব্যের রসাস্বাদন করিতে পারিবে।[৭৫] মাগনের নির্দেশে কবি অতি সঙ্কোচের সঙ্গে ("নিজ বুদ্ধিবলে নাহি এতেক শকতি") হিন্দী চৌপাই ছন্দ ভাঙিয়া বাংলা পয়ার ত্রিপদীতে 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করিলেন।

জায়সী অধ্যাত্ম তত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্যই রত্নসেন-পদ্মাবতীর রূপক গ্রহণ করিয়াছিলেন, আলাওল তাহা করেন নাই। তাঁহার 'পদ্মাবতী' পুরাপুরি মানব-প্রেমের কাহিনী—রূপকথার সঙ্গেই ইহার মিল বেশী। অবশ্য যাঁহারা তাঁহাকে মধ্যযুগের মানবীয় প্রেমের প্রথম কবি বলিয়া প্রশংসায় তদ্‌গত হইয়াছেন,[৭৬] তাঁহাদের সে অভিমত সর্বাংশে গ্রাহ্য নহে। সূফী মতাবলম্বী আলাওল নিছক রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বন করিলেও কাব্যটির বহু স্থলে গভীর আধ্যাত্মিক কথাও বলিয়াছেন। কাব্যের প্রথমে ('আলাওলের কাব্যের বয়ান') কবি যে প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা অবিকল মর্ত্য প্রেম নহে। "প্রেমভাবে সংসার সৃজিল করতার"—ইহাতে প্রচ্ছন্নভাবে গভীর প্রেমের ইঙ্গিত রহিয়াছে। কিংবা:

---

৭৫ এই পদ্মাবতী রসে রচ রসকথা।
হিন্দুস্তানী ভাষে শেখে রচিয়াছে পোথা॥
রোসাঙ্গেতে আন লোক না বুঝে এ ভাষ।
পয়ার রচিলে পূরে সবাকার আশ॥ ('পদ্মাবতী')

৭৬ "হিন্দু কবিরা যখন লৌকিক দেবদেবীর মহিমা প্রচারে ব্যস্ত তখন সুদূর আরাকানে বসে আলাউল নিছক মানুষের কাহিনীকাব্য রচনা করেছিলেন।" (বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ১৩৬৮)। ডঃ শহীদুল্লাহ ও মনে করেন, "আলাওলে জায়সীর মতো কোন আধ্যাত্মিক রূপকের চিহ্ন নাই।" (তৎসম্পাদিত পদ্মাবতী, পৃ. ২৷৶০)

প্রেম বিনে ভাব নাহি, ভাব বিনে রস।
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হন্তে বশ॥
যার হৃদে জন্মিলেক প্রেমের অঙ্কুর।
মুক্তিপদ পাইল সে সবার ঠাকুর॥
*　　*　　*　　*
প্রেম মূল ত্রিভুবন যত চরাচর।
প্রেম তুল্য বস্তু নাই পৃথিবী ভিতর॥
প্রেমকবি আলাওল প্রভুর ভাবক।
অন্তরে অনলপূর্ণ প্রভুর আশক॥
বাঞ্ছিত পূরণ হেতু গুরু পরসন।
অন্ধ চক্ষে জ্যোতি হৈল জ্ঞানের অঞ্জন॥
কাটিল মনের ঘোর ভক্তির কৃপাণে।
রসনাতে রস হৈল প্রেমের বচনে॥
প্রেমপুথা পদ্মাবতী রচিতে আশয়।
অসাধ্য সাধন মোর গুরু কৃপাময়॥

এই প্রেমতত্ত্ব সূফী আদর্শকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। যোগদর্শনেও কবির বেশ অধিকার ছিল। তিনি অনেক স্থলে সহজ ভাষায় যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[৭৭] হিন্দুর তন্ত্রমন্ত্র ও পুরাণসাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার অতীব প্রশংসার বিষয়।

আলাওল জায়সীর কাব্য অনুবাদ করিলেও অনেক স্থলে স্বাতন্ত্র্যও অবলম্বন করিয়াছেন। কাহিনীর মধ্যেও অল্পবিস্তর পার্থক্য আছে। মূল পার্থক্য—জায়সীর কাব্য বিষাদান্ত, আলাওলের কাব্য ততটা বিষাদান্ত নহে। কারণ আলাওলের কোন কোন পুঁথিতে রত্নসেনের ষাটবৎসর রাজত্ব করার কাহিনী ও তাঁহার পুত্রকন্যাদের বিবরণ আছে।[৭৮] এতদ্ব্যতীত ছোটখাট বর্ণনায় আলাওল নিজ ইচ্ছামতো কাহিনী সাজাইয়াছেন।

৭৭ তথাত কুণ্ডলী দেবী আছে নিদ্রারত।
সর্পরূপ ধরি রহে সুষুম্নার পথ॥
অধোমুখ চন্দ্র তথা অমিয়া বরিষে।
ঊর্ধ্বমুখী হৈয়া কুণ্ডলী সব চোষে॥
দরশন নহে পুনি শক্তি আর শিব।
এই সে কারণে মজে সংসারের জীব॥

৭৮ ১১০২ বঙ্গাব্দে নকল করা 'পদ্মাবতী'র একখানি পুঁথিতে এইরূপ বিবরণ আছে দ্রষ্টব্য—ডঃ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত 'পদ্মাবতী', পৃ. ২/০

আলাওলের পদ্মাবতীর পুঁথি একাধিকবার কলিকাতার হাবিবী প্রেসে মুদ্রিত হইয়া বাঙলা দেশের মুসলমান সমাজে প্রচার লাভ করিয়াছে। কিন্তু ছাপাখানার অর্ধশিক্ষিত মালেকগণ গ্রন্থ ছাপাইবার সময় কিছুমাত্র সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই, বাজে জিনিষ ছাপাইয়া বাজারে ছাড়িয়াছেন। আমাদের নিকট হাবিবী প্রেসে মুদ্রিত 'পদ্মাবতীর' (৩য় সংস্করণ) যে কপিটি আছে, অপপাঠে তাহা প্রায় অপাঠ্য বলিলেই চলে।[৭৯] এই কাব্য চট্টগ্রাম ও পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত মুসলমান পরিবারে সাদরে গৃহীত হইলেও, ইহাতে অর্ধ-শিক্ষিত মুদ্রাকরের অনুচিত হস্তক্ষেপের ফলে এবং মূল পুঁথি কোন কোন স্থলে আরবি হরফে ও রীতিতে লিখিত হওয়ার ফলে 'পদ্মাবতী'র মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠোদ্ধার প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে। ১৩৩১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেব এজন্য দুঃখ করিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, মুন্সি আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদের নিকট 'পদ্মাবতী'র কয়েকখানি পুরাতন পুঁথি আছে, এবং সাহিত্যবিশারদ সেই পুঁথি অবলম্বনে 'পদ্মাবতী'র একখানি বিশুদ্ধ সংস্করণ সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু নানা কার্যে ব্যস্ত করীম সাহেব সময়াভাবে ঐ কার্যে ব্রতী হইতে পারেন নাই। তাই ডঃ শহীদুল্লাহ বলিয়াছিলেন, "কয়েকখানি বিশুদ্ধ পুঁথি পাইলে আমি এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি।"[৮০] কিন্তু করীম সাহেবও পুঁথি ছাপাইলেন না, শহীদুল্লাহ্ সাহেবও প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ

---

৭৯ 'পদ্মাবতী'র প্রকাশক তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বলিয়াছেন, "ঐতিহাসিক কাব্য পদ্মাবতী নবভাবে...নবসাজে প্রকাশিত হইল।" 'নবভাব' ও 'নবসাজে'র অর্থ বোধ হয় আমূল সংস্কার। পদ্মাবতীর আরবী হরফে লেখা পুঁথিকে বাংলা হরফে লিপ্যন্তরীকরণের সময় ছাপাখানার 'দেবতা'রা অত্যন্ত গণ্ডগোল করিয়া ফেলিতেন। তাই মুদ্রিত গ্রন্থে এত অপপাঠ প্রবেশ করিয়াছে। ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩৩১). দুঃখের সঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "তাঁহার পদ্মাবতী সাদরে চট্টগ্রামে আজও পঠিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার একমাত্র বাজার-সংস্করণ এত ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ যে, তাহা হইতে বহু স্থানে পুস্তকের অর্থবোধ করা যায় না।" ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগোর মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য, "আলাওলের পুঁথির মধ্যে যতগুলি পয়ারপংক্তি আছে, উহার এক পঞ্চমাংশ—ছাপার দোষেই হউক, কিংবা পাঠোদ্ধারের দোষেই হউক—অশুদ্ধ এবং অবোধ্য। কারণ হাবিবী প্রেসের কর্তৃপক্ষ কাব্যখানিকে মার্জিত করিতে গিয়া সর্বনাশ করিয়াছেন।" (সা-প-প, ১৩৫০, ১ম)

৮০ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩১

করিতে পারিলেন না। এইরূপে পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গেল। সম্প্রতি কিছুকাল পূর্বে ডঃ শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব হাবিবী প্রেসের অপপাঠপূর্ণ ছাপা গ্রন্থ অবলম্বনে ঢাকা হইতে 'পদ্মাবতী'র এক নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। (১৩৫৬ সালে প্রকাশিত)। কিন্তু তিনি যে-রীতিতে এই কাব্য সম্পাদনা করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন কাব্য মুদ্রণের আদর্শ রীতি বলিয়া কখনও গৃহীত হইতে পারে না। কোন প্রাচীন পুঁথি না পাইয়া এবং করীম সাহেবের কব্জা হইতে কোন পুঁথি বাহির করিতে না পারিয়া অবশেষে তিনি বাজারে-প্রচলিত বহু ভুলভ্রান্তিতে ভরা এবং অর্থহীন অপপাঠে-কণ্টকিত—'পদ্মাবতী'র পাঠ সংশোধন করিয়া অর্ধেকটা ('পদ্মাবতী'—১ম খণ্ড) প্রকাশ করিয়াছেন। কি রীতিতে ইহার পাঠ প্রস্তুত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে ডঃ শহীদুল্লাহ্‌ বলিতেছেন, "আমি মূল হিন্দীর সাহায্যে বাংলা বাজার সংস্করণ সংশোধিত করিয়া আমার সংস্করণের পাঠ প্রস্তুত করিয়াছি। আমার বিশ্বাস ইহা আলাওলের মূল-পাঠের যতদূর সম্ভব নিকটবর্তী।"[৮১] এরূপ বিশ্বাস তাঁহার কেন হইল বুঝা যাইতেছে না। জায়সীর পাঠ অনুসরণে বাংলা 'পদ্মাবতী'র পাঠ সংশোধনের চেষ্টা কিরূপ হাস্যকর তাহা কি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হইবে? শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব এরূপ কৃত্রিম মিশ্রপাঠ (composite text) সংবলিত 'পদ্মাবতী' সম্পাদনা না করিলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হইত? এই রীতি যে আদর্শ রীতি নহে, তাহা ডঃ শহীদুল্লাহের মতো একজন ঝুনা পণ্ডিত গবেষক জ্ঞাত নহেন, ইহা হইতেই পারে না। তাই ভূমিকায় তিনি সাফাই গাহিয়া রাখিয়াছেন, "যদি মৌলভী আবদুল করীম সাহেব প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির সাহায্যে আলাওলের পদ্মাবতীর একটি সংস্করণ প্রকাশিত করেন, তখন আমার প্রস্তুত পাঠের সহিত তাঁহার ধৃত পাঠের চমৎকার তুলনা হইতে পারিবে।" কিন্তু তুলনাটা 'চমৎকার' হইবে কেন বুঝা যাইতেছে না। করীম সাহেব যদি পুরাতন পুঁথি অবলম্বনে পদ্মাবতীর বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করেন, তবে তাহাই হইবে প্রামাণিক গ্রন্থ; তখন শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব সম্পাদিত এই অপূর্ব চিজটির আর কোন দাম থাকিবে কি? তিনি আশা করিয়াছিলেন, হয়তো আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ প্রাচীন পুঁথি (তাঁহার কাছে সংরক্ষিত) অবলম্বনে পদ্মাবতী সম্পাদনা ও প্রকাশ করিবেন। কিন্তু

৮১ ডঃ শহীদুল্লাহ্‌ সম্পাদিত পদ্মাবতী—১ম, ভূমিকা, পৃ. ২৲

তাহা সফল হয় নাই, করীম সাহেব স্বর্গলাভ করিলে (১৯৫৩ সালের ৩০-এ সেপ্টেম্বর) 'পদ্মাবতী'র বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রাপ্তির আশা দুরাশায় পর্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু করীম সাহেবের নিকট 'পদ্মাবতীর' যে পুঁথিগুলি ছিল, তাহার কি হাল হইল?

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত 'বাঙলা একাডেমি' (১৩৬৮, কার্তিক-পৌষ সংখ্যায়) পত্রিকায় সৈয়দ মুর্তাজা আলী "আলাউলের তোহ্ফা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে (পৃ. ১০৮, পাদটীকা) বলিয়াছেন যে, আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ নানা পুঁথি অবলম্বনে "এই মূল্যবান গ্রন্থের একটি বিশুদ্ধ যৌগিক পাঠ বহু পরিশ্রম করে তৈরী করেছিলেন। দুঃখের বিষয় অর্থাভাবে তিনি এই মূল্যবান গ্রন্থ মুদ্রিত করতে সমর্থ হননি।" তিনি নাকি অপরের সহানুভূতির অভাবের জন্যই ইহা মুদ্রিত করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, রাজশাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি এই কাব্য প্রকাশের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু অদ্যাপি 'পদ্মাবতী'র কোন প্রামাণিক সংস্করণ আমাদের হাতে আসে নাই।

১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা একাডেমীর উদ্যোগে অধ্যাপক আহ্মদ শরীফের সম্পাদনায় 'পুঁথি-পরিচিতি' নামক যে বিরাট পুঁথিবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, নানা কারণে তাহা উল্লেখযোগ্য। আবদুল করীম সাহেবের নিকট চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা হইতে সংগৃহীত মুসলমান কবিদের রচিত যে সমস্ত পুঁথি ছিল, তাহাই এই 'পুঁথি-পরিচিতি'-তে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'পুঁথি-পরিচিতি'র সম্পাদক আহ্মদ শরীফ সাহেব সক্ষোভে বলিয়াছেন, "দুঃখের বিষয়, হিন্দুঘরের পুঁথিগুলো সংগৃহীত হল, কিন্তু মুসলমান ঘরে কেউ উঁকি মেরেও দেখলেন না। অথচ সর্বত্রই হিন্দু-মুসলমানের একই গাঁয়ে বাস।" অবশ্য বাঙালী হিন্দুসমাজ যে মুসলমান কবির পুঁথি সম্বন্ধে ইচ্ছাপূর্বক উদাসীন ছিলেন (শরীফ সাহেবের ক্ষোভের তাহাই প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য), তাহা বোধ হয় ঠিক নহে। কারণ মুন্সি আবদুল করীম সাহেব সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণে' অনেক মুসলমান কবির পুঁথির পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। সেই প্রসঙ্গে উক্ত বিবরণের ভূমিকায় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলিয়াছিলেন, "এই বিবরণের মধ্যে আলোচনায় অনেক নূতন

কথা আছে। চট্টগ্রাম প্রদেশে মুসলমান লেখকের প্রাধান্যও আলোচনার যোগ্য। হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলনের এতটা পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যায় না।" সুতরাং হিন্দুসমাজ মুসলমান কবিদের পুঁথিকে অবজ্ঞা করে নাই। তবে হিন্দু অপেক্ষা কোন মুসলমান এই পুঁথি সংগ্রহে প্রস্তুত হইলে পুঁথি সংগ্রহ ব্যাপারটা অধিকতর সহজ হইবে, ইহাও তাঁহারা মনে করিতেন। করীম সাহেব সেই ভার গ্রহণ করিলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সেই বিবরণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। মুসলমান কবিদের পুঁথির বিবরণীর (যাহা করীম সাহেবের সম্পাদনায় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হইতেছিল) ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর সংগ্রাহক ও সম্পাদক করীম সাহেবকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন, "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ও বাঙ্গালা সাহিত্য সমাজের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমরা এই মুসলমান লেখকের অসামান্য অধ্যবসায়ের ফল প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"

তবে কথা হইতেছে এই যে, করীম সাহেব চট্টগ্রাম-নোয়াখালি-ত্রিপুরা হইতে মুসলমান কবিদের যে সমস্ত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই নিজের কাছে রাখিয়া দিয়াছিলেন। তাই এই কবিদের বঙ্গ সাহিত্যে যথার্থ অবদান সম্পর্কে ইতিপূর্বে বাঙালী সাহিত্যিকেরা বিশেষ অবহিত ছিলেন না। করীম সাহেবের কাছে 'পদ্মাবতী'র অনেক পুঁথি থাকিলেও ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবকেও তাহা দেখিতে দেন নাই। ডঃ শহীদুল্লাহ্ এই পুঁথির সাহায্য পাইলে ছাপা কেতাব অবলম্বনে 'পদ্মাবতী'র আধুনিক সংস্করণ প্রকাশ করিতেন না। যাহা হউক, দেশ বিভাগের পর করীম সাহেবের সংগ্রহের সমুদয় পুঁথি (প্রায় সাড়ে পাঁচশত) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমর্পিত হয় (১৯৪৭)। তিনি তাহার সঙ্গে পুঁথির বিবরণটিও দিয়াছিলেন। পরে তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দ্বারা 'পুথি-পরিচিতি' নামে প্রকাশিত হইয়াছে।[৮২]

যাহা হউক, করীম সাহেবের নিকট 'পদ্মাবতী'র অন্ততঃ ত্রিশখানি পুঁথি আছে জানিয়া সে যুগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁহার উপর উক্ত কাব্য

---

৮২ তাঁহার সংগ্রহে প্রায় ৩৯৩ জন মুসলমান কবির ৪৬২ প্রকার কাব্যের ৫৩৯ খানি পুঁথি ছিল—ইঁহার বিবরণ-ই 'পুথি-পরিচিতি'তে প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মধ্যযুগের মুসলমান কবির সংখ্যা—১৮২। এই বিবরণীতে দুই-একজন হিন্দু কবির পুঁথিও আছে।

সম্পাদনার ভার অর্পণ করেন। তিনি নানা পুঁথি মিলাইয়া অনেক দিনের পরিশ্রমের পর 'পদ্মাবতী'র প্রথম খণ্ডের পাঠ প্রস্তুত করেন। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে তিনি সে কাব্য মুদ্রণের জন্য সাহিত্য পরিষদে দেন নাই। তার পর দেশ ভাগ হইয়া গেল, সব কিছু বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তখন তিনি 'পদ্মাবতী'র যেটুকু পাঠ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেইটুকু প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন—সে সময় তিনি পূর্ব-পাকিস্তানেই ছিলেন। ক্রমে তাঁহার আয়ু শেষ হইয়া আসিল; তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'পদ্মাবতী' প্রকাশিত হইল না। পাকিস্তানের অনেক পদস্থ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হইয়াও তিনি কোথাও কোন সুবিধা পাইলেন না।[৮৩] "তাঁহার সম্পাদিত পদ্মাবতীর এ খণ্ড আর প্রকাশিত হইল না; অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়াই তিনি ইহ-সংসার হইতে বিদায় হইলেন।"[৮৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ করীম সাহেবের পুঁথির বিবরণী 'পুঁথি-পরিচিতি' (১৯৫৮) নামে প্রকাশ করিয়াছেন; ইহাতে দেখা যাইতেছে, করীম সাহেবের নিকট 'পদ্মাবতী'র ৩৫ খানি খণ্ডিত ও পূর্ণাঙ্গ পুঁথি ছিল।[৮৫] তন্মধ্যে তিনখানি পুঁথি আরবী অক্ষরে লিখিত। পুঁথিগুলি বিশেষ পুরাতন নহে, কোনখানিই দেড়শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। কয়েকখানি আবার আজকালকার কলের কাগজে লেখা, সবগুলিতেই হাস্যকর ভুলভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত অপদার্থ পুঁথি অবলম্বনে 'পদ্মাবতী'র বিশুদ্ধ সংস্করণ সম্পাদনা সহজ ব্যাপার নহে।

আলাওল জায়সীর কাব্যের অনুবাদ কালে প্রায়ই আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছিলেন, কোথাও-বা ঘটনা, চরিত্র ও বর্ণনার দুই এক স্থলে নিজস্ব কবিকল্পনার খেলা দেখাইয়াছেন। তিনি যে কোন কোন স্থলে স্বাধীন

---

৮৩ শুনা যাইতেছে, রাজশাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি করীম সাহেবের সম্পাদিত 'পদ্মাবতী' প্রকাশের চেষ্টা করিতেছেন। (বাঙলা একাডেমি পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৮, পৃ. ১০৮)

৮৪ 'পুথি-পরিচিতি', পৃ. ৮

৮৫ কিছুকাল পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা একাডেমি উদ্যোগে চট্টগ্রামবাসী আবদুল সাত্তার চৌধুরী 'পদ্মাবতী'র আরও দুইখানি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন। উক্ত পুঁথি দুইখানি অর্বাচীন কালের নকল, একশত বৎসরের পুরাতন। (দ্রষ্টব্য: বাঙলা একাডেমি পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৯)

রচনা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার এই উক্তি, "স্থানে স্থানে প্রকাশিয়া নিজ মন উক্তি।" মূল 'পদ্মাবত'-কে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে তিনি মৌলিকতা দেখাইতেও চেষ্টা করিয়াছেন। জায়সী মূলতঃ অধ্যাত্মরসের কবি, সূফীতত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য 'পদ্মাবতে' রূপককাব্যের ধারা অনুসরণ করিয়াছেন এবং পরিশেষে রূপক ভাঙিয়া মানবজীবনের পরিণাম[৮৬] দেখাইয়াছেন। আলাওল সূফীমার্গের কবি হইলেও নিছক ধর্মীয় রূপক হিসাবে এ কাব্য রচনা করেন নাই। বিশুদ্ধ মর্ত্যপ্রেমকে কেন্দ্র করিয়াই কবি এই আখ্যান অনুবাদে অগ্রসর হইয়াছেন। দুইচারি স্থলে তিনি মূলকে ছাড়িয়া ভিন্নপথে গিয়াছেন, কোথাও নূতন অধ্যায় যোগ করিয়াছেন, বর্ণনার ধারাও পাল্টাইয়া দিয়াছেন। জায়সী চৌপাই ও দোহা ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, আলাওল পয়ার, ত্রিপদী ও অন্যান্য ছন্দ অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, কারণ তিনি সংস্কৃতও জানিতেন। কিন্তু জায়সী কোথাও সংস্কৃত শ্লোক ব্যবহার করেন নাই। জায়সী মুসলমান হইলেও কাব্যের কোথাও নিজ সম্প্রদায়ের কোন চিহ্ন রাখিয়া যান নাই; কিন্তু আলাওল সংস্কৃত সাহিত্য, পুরাণ ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইলেও কোন কোন স্থলে

---

৮৬ পদ্মাবতীর মৃত্যু বর্ণনার পর জায়সী কাব্য সমাপ্তিতে বলিতেছেন:

কাহাঁ সুরূপ পদ্মাবতী রানী।
কছু না রহি জগ রহি কহানি॥
ধন্য সোই ইহ কীরতি জাসু।
ফুল মরে পর মরে না বাসু॥

কোথায় সেই রূপবতী রাণী পদ্মাবতী? পৃথিবী হইতে তাঁহার কাহিনী ছাড়া সব স্মৃতি মুছিয়া গিয়াছে। যাঁহারা কীর্তিমান তাঁহারাই ধন্য। ফুল শুকাইয়া যায়, কিন্তু সুবাসটুকু মরে না।

আলাওলের হাতে পড়িয়া এই গাঢ় নির্বেদপূর্ণ রচনা তরল হইয়া পড়িয়াছে:

কোথা গেল গন্ধর্ব সেন সঙ্গে মন্ত্রিগণ।
কোথা গেল রত্নসেন সঙ্গের রাজন॥
কোথা গেল চিতাওর রত্ন চিত্রসেন।
কোথা গেল পদ্মারতি ত্রিলক্ষ মহন॥
কোথা গেল হিরামনি শুক সে পণ্ডিত।
চির দিন জার কৃত্তি আছে পৃথিবিত॥

মুসলমান সমাজের কথাই বলিয়াছেন। জায়সী যেখানে পুরাণের কথা বলিয়াছেন, আলাওল সেখানে কোরান লিখিয়াছেন। আলাওল ও জায়সী—দুই জনেই সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, দুই জনেই মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বলিয়াছেন, "কিন্তু এ বিষয়ে জায়সীর উদারতা ও সংযম আমরা বাঙালী কবির পুঁথিতে কম দেখিতে পাই।"[৮৭] আলাওল কবির কাব্যের কোন কোন স্থলে 'মোশলমান' জাতির প্রতি অধিক দৃষ্টি দিয়াছেন—যাহা জায়সীতে নাই। জায়সীর 'পদুমাবতে' আছে, আলাউদ্দিনের সঙ্গে রত্নসেনের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে আলাউদ্দিনের হিন্দু সেনাপতিরা তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া হিন্দু রত্নসেনের পক্ষ লইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে আলাউদ্দিন তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। কিন্তু আলাওলের আলাউদ্দিন হিন্দু জাতিকে মুসলমানের বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে বলিয়াই সভয়ে হিন্দু সেনাপতির কথায় সম্মত হইয়াছিলেন :

মোসলমান জাতির মনেতে নাহি আশা।
কদাচিত না করিহ হিন্দুর ভরসা ॥

অবশ্য এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব আলাওলের না হইতেও পারে। আধুনিক কালের সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন মুসলমান নকল-নবীশেরাই হয়তো যুগধর্মের বশে কাব্যে হিন্দু-বিরূপতা যোগ করিয়া দিয়াছেন।

আলাওল মূলকাব্য যে ভাবে অনুসরণ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে হিন্দী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। দুই একটি ছোট খাট পার্থক্য থাকিলেও মূলকাব্যের সঙ্গে আলাওলের কাব্যের মারাত্মক রকমের ফারাক হইয়া যায় নাই।[৮৮] জায়সীর আলাউদ্দিনের দূত একজন 'তুরুক' মুসলমান, আলাওলের কাব্যে সেই দূত একজন ব্রাহ্মণ।

---

৮৭ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৫০, ১ম সংখ্যা ("কবি আলাওলকৃত 'পদ্মাবতী' পুঁথি এবং জায়সীকৃত মূল পদ্মাবতী কাব্যের তুলনামূলক সমালোচনা"—ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো)।

৮৮ অবশ্য জায়সী ও আলাওলের চিত্তপ্রবণতার মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তাহার চিহ্ন তাঁহাদের কাব্যেও আছে। একথা সত্য যে, জায়সী মূলতঃ অধ্যাত্মরসের কবি, কিন্তু "আলাওল মূলের তত্ত্বসমৃদ্ধ রূপকের ব্যঞ্জনাকে গ্রহণ করেন নি। সামাজিক নিষ্ঠা, গৃহগত সৌজন্য, স্নেহের বন্ধন এবং নরনারীর একান্ত হৃদয়গত কামনা-বাসনায় তাঁর কাব্য সমৃদ্ধ।" (বাঙলা একাডেমি পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৯)

এইরূপ পার্থক্য আরও কিছু কিছু আছে বটে, কিন্তু তাহার জন্য আলাওলের পদ্মাবতীর আকৃতি-প্রকৃতির মূল অপেক্ষা বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই।

আলাওল মূলতঃ অনুবাদক কবি। নানা ভাষায় অভিজ্ঞ ও হিন্দুর শাস্ত্রাদিতে অসাধারণ দক্ষ এই বাঙালী মুসলমান কবি 'পদুমাবতে'র অনুবাদের মতো অতি দুরূহ কর্মে হস্তক্ষেপ করিয়া কৃতিত্বেরই পরিচয় দিয়াছেন।[৮৯] সংস্কৃত ভাষা যে তাঁহার নখদর্পণে ছিল তাহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত মূল সংস্কৃত শ্লোক ও তৎকৃত অনুবাদ হইতেই বুঝা যাইবে।

সংস্কৃত—

মূর্খানাং প্রতিমা দেবঃ বিপ্রদেবো হুতাশনঃ।
যোগীনাং প্রার্থনা দেবো দেবদেবো নিরঞ্জনঃ॥

আলাওলের অনুবাদ—

মূর্খ সকলের দেব প্রতিমা যে সার।
ব্রাহ্মণ সবের দেব অগ্নি অবতার॥
যোগী সকলের দেব আপ্ত মহাজন।
সকল দেবের দেব প্রভু নিরঞ্জন॥

জায়সীর পূরবীয়া হিন্দী চৌপাই দোহার অনুবাদে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতে হইবে। যথা :

জায়সী—

ভৌঁহ ধনুষ তিন্হ নৈন অহেরী।
মারহিঁ বান সান সৌঁ ফেরী॥
অলক কপোল ডোল হাঁসি দেহীঁ।
সো'ই কটাচ্ছ মারি জিউ লেহীঁ॥
কুচ কঁচুক জানৌ জুগ সারী।
অঞ্চল দেহিঁ সুভাব হি ঢারী॥

আলাওল—

ভুরু ধনু লৈয়া ফিরে শিকারী নয়ান।
চঞ্চল চাহনি ছুটে যেন চোখা বান॥

---

৮৯ তাঁহার রচনায় প্রাকৃতপৈঙ্গল, যোগশাস্ত্র, তসৃউউক, কামশাস্ত্র, সঙ্গীতবিদ্যা, অশ্বচালন বিদ্যা প্রভৃতি নানা বিচিত্র ব্যাপারের উল্লেখ দেখা যায়। "বাস্তবিক তাঁহার সমান নানা বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত সে যুগে আর কেহই ছিলেন না।" (ডঃ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত 'পদ্মাবতী' —১ম, পৃ. ।০)

অলকের গুচ্ছ দোলে কপোল উপরি।
হাসিয়া কটাক্ষ হানে জীউ লয় হরি॥
কাঁচলি আবৃত স্তন পাশা যুগ্ম সারি।
সুন্দর অঞ্চল ঢাল মন লয় কাড়ি॥

এইরূপ বহুস্থলে আলাওল জায়সীকে যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু জায়সী যেখানে গভীর তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন, বাস্তব-জীবনরসে—মুগ্ধ আলাওল তাহা এড়াইয়া গিয়াছেন বা সংক্ষেপে সারিয়াছেন। একটা দৃষ্টান্ত—বিবাহের পর পদ্মাবতীকে লুকাইয়া রাখিয়া সখীরা রত্নসেনের সঙ্গে তামাসা করিতেছে—সেই বর্ণনায় সূফীসাধক জায়সী গভীর দার্শনিক কথা কৌশলে বিবৃত করিয়াছেন। সখীরা রত্নসেনকে জিজ্ঞাসা করিতেছে:

পুঁছহি' গুরু কহঁ, রে চেলা।
বিনু সসিয়র কস সুর একেলা॥
ধাতু কমাই সিখেসি বে যোগী।
অব কস অস নিরধাতু বিয়োগী॥
কহাঁ সো খোয় বিরোয়া টোনা।
যেহি তেঁ হোই রূপ উ সোনা॥
কইস হরতার পারহি মারা।
গন্ধক কিয়া কুবকুটা খারা॥
কহাঁ ছপায়ে হু চাঁদ হমারা।
যেহি বিনু রইনি জগত আঁধিয়ারা॥

অনুবাদ: হে শিষ্য, তোমার গুরু কোথায়? শশী বিনা সূর্য কি করিয়া একা থাকে? হে যোগি, তুমি রসায়ন বিদ্যা শিখিয়াছ, তাই নির্ধাতু হইয়া তুমি কি করিয়া আছ? তোমার সে মন্ত্রপূত গাছ কোথায়, যাহার দ্বারা তুমি রূপা এবং সোনা তৈয়ারী করিতে? কি করিয়া তুমি গরলকে পারদের দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়াছ এবং গন্ধককে বিচূর্ণিত ক্ষারে পরিণত করিয়াছ? কোথায় তুমি আমাদের চন্দ্রকে লুকাইয়া রাখিয়াছ, যাহার অভাবে জগৎ অন্ধকার হইয়াছে? (লেখককৃত অনুবাদ)

এই গূঢ় অর্থবহ শ্লোকের অনুবাদ আলাওল দুই কথায় সারিয়াছেন:

সখীগণ নৃপতিকে দেখি হেন রীত।
জিজ্ঞাসিল মৃদু বাক্যে হাসিয়া কিঞ্চিৎ॥
কহ শিষ্যবর তোর গুরু গেল কোথা।
চন্দ্র বিনে সূর একেশ্বর কেন হেথা॥

কেবা কোথা লুকাইল চন্দ্রিকা তোমার।
যেই দিনে রমণী জগৎ অন্ধকার॥

এইজন্য কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন যে, আলাওল মূল কাব্যের গূঢ় অর্থ কোন কোন ক্ষেত্রে ধরিতে পারেন নাই।[২০] কেহ-বা মনে করেন তিনি জায়সী অপেক্ষা নিম্নস্তরের সূফী সাধক ছিলেন।[২১] যাহা হউক ডঃ কালিকা-রঞ্জন কানুনগোর মতে, আলাওলের অনুবাদে মূলের অর্থগৌরব বা ধ্বনিঝঙ্কার বড় একটা রক্ষিত হয় নাই, অনুবাদটি ত্রুটিবিচ্যুতি মুক্ত নহে।[২২] অবশ্য একটু অবহিত হইয়া দেখিলে মনে হইবে, আলাওল কোন কোন ক্ষেত্রে জায়সীর রূপ ও রীতি অনুসরণ করিলেও বহু স্থলে এই বাঙালী কবি যথেচ্ছা কল্পনার রাশ ছাড়িয়া দিয়াছেন, তখন কাব্য মূলকে ছাড়িয়া নিজস্ব পথ ধরিয়াছে।[২৩] বিবাহের বর্ণনায় জায়সী উত্তর-ভারতের রীতি অনুসরণ করিয়াছেন, আলাওল বাঙলার হিন্দুসমাজের আচারপন্থা বর্ণনা করিয়াছেন। আলাওলের স্ত্রী-চরিত্রগুলিও বাঙালী বনিয়া গিয়াছে। তাই বলিয়া আলাওলের 'পদ্মাবতীকে' মৌলিক কাব্য বলিয়া অযথা প্রশংসা করিবারও প্রয়োজন নাই।[২৪]

২০ সা-প-প, ১৩৫০, ১ম সংখ্যা (ডঃ কানুনগোর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

২১ ঐ

২২ আলাওলের অনুবাদ সম্বন্ধে ডঃ কানুনগো অযথা কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন। কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকিলেও ইহা ব্যর্থ অনুবাদ—এমন কথা বলা যায় না।

২৩ জায়সী ও আলাওলের তুলনার জন্য দ্রষ্টব্য :—(১) Calcutta Review, October, 1940 ('Jaisi's *Podumavati* and its Bengali version by Alaol—A comparison'—Kalidas Mookherjee), (২) বাঙলা একাডেমি পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৯, (৩) ডঃ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত 'পদ্মাবতী'—১ম (পৃ. ২—২১০)।

২৪ পূর্ব-পাকিস্তানের কোন কোন সমালোচক মাত্রাজ্ঞান বিসর্জন দিয়া আলাওল-স্তুতিতে মাতিয়া উঠিয়াছেন। এ বিষয়ে কোন এক সমালোচক বলিয়াছেন, "আলাওল প্রয়োজনবোধে মূল কাহিনীর পরিবর্তন করেছেন, সংক্ষেপীকরণ করেছেন, সংযোজন করেছেন এবং সম্প্রসারণ করেছেন। সর্ববিধ আলোচনায় ও সিদ্ধান্তে নিশ্চিন্ত আসা যায় যে, আলাওলের পদ্মাবতী আলাওলেরই নিজস্ব সৃষ্টি—উপাদান তিনি পেয়েছেন জায়সী পদুমাবতে।" (বাঙলা একাডেমি পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৯) এই মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত নহে। 'পদ্মাবতী' আলাওলের নিজস্ব মৌলিক সৃষ্টি নহে, ইহা জায়সীর কাব্যের প্রকৃত অনুবাদ। পংক্তিতে পংক্তিতে বহু সাদৃশ্য আছে। কোন কোন স্থলে কবি কিছু মৌলিকতা দেখাইলেও এ কাব্যকে মৌলিক কাব্য বলা যায় না। কবি নিজেও সে গৌরব দাবি করেন নাই, জায়সীর প্রশংসা করিয়া তিনি পূর্বসূরীর কাব্য অনুসরণ করিয়াছেন।

'পদ্মাবতী' অনুবাদ কাব্য হইলেও কোথাও অনুবাদজনিত বড় একটা আড়ষ্টভাব দেখা যায় না—মোটামুটি কাহিনীর মধ্যে রূপকথাধর্মী সরস পরিচ্ছন্নতা বজায় আছে। ভাষা ও ছন্দ প্রশংসার যোগ্য। অবশ্য হাবিবী প্রেসে মুদ্রিত 'পদ্মাবতী'র ভাষা ধরিয়া আলাওল সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত হইবে না। কারণ এই সমস্ত অপদার্থ ছাপাখানা হইতে মুসলমানী কেতাবী ঢঙে অতি কদর্য কাগজে ছাপা ঝুড়ি ঝুড়ি ভুল শব্দে কণ্টকিত পুস্তকগুলি পূর্ববঙ্গের অর্ধশিক্ষিত মুসলমান পরিবারে প্রচার লাভ করিলেও ইহা হইতে মূল 'পদ্মাবতী'র রস উপভোগ করা প্রায় অসম্ভব। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঢাকা হইতে 'পদ্মাবতীর' (১ম খণ্ড) যে সংস্করণ সম্পাদনা করিয়াছেন তাহার composite text এত মার্জিত ও আধুনিক ভাবাপন্ন যে, ইহার ভাষা পুরাতন পুঁথির ভাষা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কারণ তিনি 'পদ্মাবতীর' কোন পুঁথি না পাইয়া হাবিবী প্রেসের অপদার্থ সংস্করণের উপরেই জায়সী অনুসরণে কলম চালাইয়াছেন, ফলে কাব্যটি সুকুমার রায়ের "আবোলতাবোলের" 'হাঁসজারু' ও 'বকচ্ছপের' আকার ধারণ করিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পুঁথি-পরিচিতি'-তে মুন্সী আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদের নিকট রক্ষিত 'পদ্মাবতীর' ৩৫ খানি পুঁথির কয়েকখানিতে সে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং ঢাকার বাঙলা একাডেমী সংগৃহীত আর দুইখানি পুঁথির প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি হইতে 'পদ্মাবতী'র পুরাতন রূপের খানিকটা বুঝা যায়। এখানে আলাওলের পুঁথি, হাবিবী প্রেসের তৃতীয় সংস্করণ এবং শহীদুল্লাহ্ সাহেব সম্পাদিত পদ্মাবতীর সর্বাধুনিক সংস্করণ হইতে তিনটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

আলাওলের পুঁথির পাঠ

সকলেরে দেন্ত নিত্য ন টুটে ভাণ্ডার।
জগ জিব পসু পক্ষি পিপিলিকা আর॥
কাকে নাহি বিস্মরণ দিআছে আহার।
সকলের উপরে তাহান দিষ্টি আছে।
কীবা শত্রু কিবা মিত্র কাকে নাহি বাছে॥

('পুঁথি-পরিচিতি', পৃ. ৩২৬, পুঁথিসংখ্যা—২৮২)

হাবিবী প্রেস প্রকাশিত 'পদ্মাবতী'র ১৩২১ সনের সংস্করণ

সকলেরে দেয় দান না টুটে ভাণ্ডার।
গুরু করি পিপীলিকা বর গুরাকার॥
কাকে নাহি বিস্মরণ দিয়াছে আহার।
সকলের উপরে তাহান দৃষ্টি আছে।
কিবা মিত্র কিবা শত্রু কাকে নাহি বাছে॥

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহের আধুনিক সংস্করণ

সেই ধনপতি সব যাহার সংসার।
সকলেরে দেয় দান না টুটে ভাণ্ডার॥
গরু করী পিপীলিকা বড় ক্ষুদ্রাকার।
কাকে নাহি বিস্মরয় দিয়াছে আহার॥
সকলের উপরে তাহার দৃষ্টি আছে।
কিবা মিত্র কিবা শত্রু কাকে নাহি বাছে॥

জায়সীর 'পদুমাবত'

ধনপতি উহই জেহি ক সংসারূ।
সবহি দেহ নিতি ঘট ন ভংডারূ॥
জাবঁত জগত হসতি অউ চাঁটা।
সব কহঁ ভুগুতি রাতি দিন বাঁটা॥
তা করি দিসিট সবহি উপরাহীঁ।
মিত্র সত্রু কোহ বিসরহ নাহীঁ॥
পংখী পতংগ না বিসরই কোঈ।
পরগট গুপুত জহাঁ লগি হোঈ॥[১৫]

অনুবাদ: তিনিই ধনপতি, বিশ্বসংসার তাঁহারই। নিত্যই তিনি সকলকে দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার ভাণ্ডারে ঘাটতি হইতেছে না। দিনরাত্রি জগতের হাতী হইতে পিপীলিকা পর্যন্ত সকলকে তিনি আহার দিতেছেন। সকলের উপরেই তাঁহার দৃষ্টি আছে। শত্রুমিত্র কাহাকেও তিনি ভুলেন না। পাখীপতঙ্গ—প্রকাশ্যেই থাকুক বা গোপনে থাকুক কাহাকেও তিনি বিস্মৃত হন না। (লেখককৃত অনুবাদ)

এই দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইতেছে, নানা পুঁথিতে এবং হাবিবী প্রেসে মুদ্রিত সংস্করণের পাঠে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। ডঃ শহীদুল্লাহ্ জায়সী অবলম্বনে মার্জিত ভাষায় নূতন করিয়া লিখিয়া 'পদ্মাবতী'র ভাষা খানিকটা ভদ্র-

১৫ জায়সীর 'পদুমাবতে'র উদ্ধৃতিগুলি গ্রীয়ার্সন ও সুধাকর দ্বিবেদী সম্পাদিত সংস্করণ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

জনোচিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু মধ্যযুগীয় কাব্য সম্পাদনে re-write করিবার রীতি আমরা সমর্থন করি না।

আলাওল যে মধ্যযুগের একজন প্রতিভাসম্পন্ন কবি ছিলেন, তাহা 'পদ্মাবতী' হইতেই বুঝা যাইতেছে। হিন্দীভাষায় লিখিত মূল কাব্যকে সপ্তদশ শতাব্দীতে নিখুঁত পয়ারত্রিপদী ছন্দে রূপান্তরিত করা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। তবে প্রসঙ্গক্রমে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, আলাওলের যে পরিমাণে বিদ্যা ছিল, সেই পরিমাণে কবিত্ব ছিল না। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থই অনুবাদমূলক, সেখানে মৌলিক সৃষ্টির কৃতিত্ব প্রকাশের অবকাশও অল্প, দৌলতকাজীর 'লোরচন্দ্রানী'র শেষাংশ সম্পূর্ণ করিবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। ইচ্ছা করিলে এই স্থানে তিনি মৌলিক কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সেরূপ প্রমাণ দিতে পারেন নাই। 'পদ্মাবতী'র কাব্যমূল্যও উৎকৃষ্ট নহে, রচনাকৃতিও দৌলত কাজীর সমকক্ষ নহে, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় কি ?

সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল॥ \ইহা আলাওলের দ্বিতীয় কাব্য মনে হইতেছে। পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুরের (আরাকানের প্রধান অমাত্য) নির্দেশে কবি 'আলফা লায়লা'য় (আরব্য-উপন্যাস) বর্ণিত কাহিনীকে বাংলা ছন্দে রূপান্তরিত করেন। ইহা বোধ হয় কবির মৌলিক রচনা. কোন আরবী-ফারসী গ্রন্থের হুবহু অনুবাদ নহে।|

এই কাব্যের প্রথমাংশ মাগনঠাকুরের নির্দেশে রচিত হয়। এই অংশে শাহ্ সুজার উল্লেখ নাই। সুজা ১৬৬০-৬১ খ্রীঃ অব্দে আরাকানে পলাইয়া আসেন। সুতরাং ইহার রচনা আরম্ভ হয় ১৬৬০ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে। ১৬৫৮ খ্রীঃ অব্দে 'সতীময়না-লোরচন্দ্রানী'র শেষাংশ তিনি সমাপ্ত করেন। মনে হয় ১৬৫৮-৬০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে 'সয়ফুলমুলুকে'র রচনা আরম্ভ হয়। ইহার এগার বৎসর পরেও তিনি জীবিত ছিলেন। সুজার সঙ্গে তাঁহার সম্প্রীতি থাকার জন্য সুজা হত্যার পর তাঁহাকে প্রায় দুই মাস কারাকক্ষে বদ্ধ থাকিয়া দারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। সে সমস্ত নিগ্রহের কাহিনী তিনি 'সয়ফুলমুলুকে' বর্ণিত আত্মপরিচয়ে বিবৃত করিয়াছেন।

.আরাকান রাজের অমাত্য সুলেমান একদা বৃহৎ ভোজের আয়োজন করেন। সেই ভোজসভায় মাগনঠাকুর, আলাওল ও তাঁহাদের গুরুপুত্র

সৈয়দ মুস্তাফাও উপস্থিত ছিলেন। খানাপিনা ও আমোদ-আহ্লাদের পর মাগনঠাকুর মুস্তাফাকে 'পুরাণপ্রসঙ্গ' অর্থাৎ ইসলামী ইতিহাস-পুরাণকথা বিবৃত করিতে অনুরোধ করিলেন। মুস্তাফা তখন সয়ফুলমুলুকের গল্পটি বলিলেন। গল্পটি মাগনঠাকুরের ভালো লাগিল। তখন তিনি আলাওলকে উক্ত গল্পটিকে বাংলা ভাষায় রচনা করিতে নির্দেশ দিলেন। কারণ—

সকলে না বুঝে এই ফারসীর ভাব।
পয়ারপ্রবন্ধে রচ এই পরস্তাব॥

আলাওল তখন পুরাতন কাহিনী অবলম্বনে স্বাধীনভাবে 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল' শীর্ষক মর্ত্যপ্রেমের রোমান্টিক কাহিনীকাব্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বেশ কিছুটা লিখিবার পর তাঁহার জীবনে বিপর্যয় নামিয়া আসিল। কবির পৃষ্ঠপোষক মাগনঠাকুর দেহ রক্ষা করিলেন, সুজা হত্যার পর বিনা দোষে কবিও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। কাব্যেরও দুই-তৃতীয়াংশ[১৬] রচিত হইয়া পড়িয়া রহিল। অতঃপর বহু দুঃখ-নির্যাতনের পর প্রায় নয়বৎসর পরে তাঁহার ভাগ্য আবার কথঞ্চিৎ সুপ্রসন্ন হইল। আরাকান-রাজের প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ মুসা কবির পৃষ্ঠপোষক হইয়া কবিকে অসমাপ্ত 'সয়ফুলমুলুক' সম্পূর্ণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন কবি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, দেহমন ভাঙিয়া পড়িয়াছে—ঈশ্বর চিন্তায় তখন তিনি আবিষ্ট। কি করিয়া তিনি প্রণয়গাথায় হস্তক্ষেপ করিবেন? সবিস্ময়ে কবি বলিলেন, "বৃদ্ধ-কালে গ্রন্থকার্য না হয় উচিত।" কিন্তু মুসা ছাড়িবার পাত্র নহেন, বহু অনুরোধ-উপরোধে তিনি কবিকে এই কাব্যের বাকি অংশ সম্পূর্ণ করিতে রাজী করাইলেন। মাগনঠাকুরের মৃত্যুর (১৬৫৯) কিছু পূর্বে এই কাব্যের রচনা আরম্ভ হয়। সমাপ্ত হয় ইহার প্রায় দশ বৎসর পরে ১৬৭০ খ্রীঃ অব্দে।

'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল' একটি রোমান্টিক প্রেমের গল্প। কোন কোন মতে ইহা আরবী ভাষায় লেখা 'আলফা লায়লা' (আরব্য-উপন্যাস) হইতে

১৬ 'পুথি-পরিচিতি'র সম্পাদকের মতানুসারে কবি এই কাব্যের অর্ধাংশ সমাপ্ত করিবার পর মাগনঠাকুরের মৃত্যু হয় (১৬৫৯)। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন, মাগনের মৃত্যুর পূর্বে কবি কাব্যটির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ রচনা করিয়াছিলেন। পুথি-পরিচিতি, পৃ. ৩৬৫ এবং ডঃ সেনের বা. সা. ইতিহাস (১ম অপরার্ধ) দ্রষ্টব্য।

গৃহীত,[৯৭] কাহারও-বা মতে ফারসী গল্পই ইহার উৎস। যাহা হউক, কবির এ কাব্য অনুবাদ-গ্রন্থ নহে, কোন আরবী-ফারসী কিস্‌সা অবলম্বনে তিনি এই মানবীয় প্রেমের গল্প কাব্যাকারে রচনা করিয়াছিলেন। নায়কের নাম সয়ফুলমুলুক। তাঁহার পিতা ছিপুয়ান ছিলেন মিশরের বাদশাহ। অমাত্য-পুত্র সৈয়দ সয়ফুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু। নায়িকার নাম বদিউজ্জমাল—বোস্তানের অন্তর্গত এক পরীরাজ্যের অপূর্ব সুন্দরী রাজকন্যা। নায়িকার একখানি চিত্র দেখিয়া নায়ক দিওয়ানা হইয়া যান। তাঁহার এইরূপ মনোবিকারের খবর একমাত্র দিল্‌-দোস্ত্‌ সৈয়দই জানিত। সৈয়দ বন্ধুর এই অবস্থা দেখিয়া বাদশাহের নিকট সমস্ত সংবাদ জানাইল। পুত্রের জন্য বাদশাহ চারিদিকে বদিউজ্জমালের সন্ধানে চর পাঠাইতে লাগিলেন—কিন্তু পরীরাজকন্যার কেহ কোন সন্ধান দিতে পারিল না। অতঃপর স্বয়ং নায়িকা স্বপ্নযোগে সয়ফুলের নিকট দেখা দিয়া নিজ পরিচয় দিল। তখন সয়ফুল বন্ধু সৈয়দকে সঙ্গে লইয়া বদিউজ্জমালের সন্ধানে বোস্তানের দিকে যাত্রা করিল। এই যাত্রাপথে অসম্ভব ও অবান্তর ঘটনার এতটা বাড়াবাড়ি হইয়াছে যে, মূল কাহিনী তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কাব্যের শেষে পরীবালা বদিউজ্জমালের সঙ্গে মিশরের রাজকুমার সয়ফুলের মিলন এবং বন্ধু সৈয়দের সঙ্গে সরন্দীপ-রাজকন্যা বদিউজ্জমালের সখী মল্লিকার বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। এই মল্লিকাপ্রসঙ্গ কবির নিজস্ব পরিকল্পনা। যাহা হউক, ইহাতে পার্থিব নর-নারীর রোমান্টিক প্রেমের কথা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। বৃদ্ধাবস্থায় কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে সরস ভাব ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। মানুষের সঙ্গে পরীরাজকন্যার প্রেম, দেহ ও দেহাতীত, মর্ত্য ও অমর্ত্যের এই ভাববন্ধনটি বেশ উল্লেখযোগ্য। কাহিনীর অনেকটা কবির নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত বলিয়া কবি ইহাতে স্বাধীনভাবে কল্পনার লীলা দেখাইতে পারিয়াছেন। এই কাব্য একদা মুসলমান সমাজে যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ—আবদুল করীম সাহেবের সংগ্রহে 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমালে'র বাইশখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। রচনারীতি ও কাহিনীগ্রন্থনপ্রণালী এমন কিছু বিস্ময়কর প্রতিভাদ্যোতক নহে।

৯৭ পুঁথি-পরিচিতি, পৃ. ৫৬৪

উপকাহিনীর অতিপ্রাধান্যের ফলে মূলকাহিনীটি বহুস্থলে বাধাগ্রস্ত হইয়াছে।[১৮]

যাহা হউক এই গল্পটির জনপ্রিয়তার জন্য এই বিষয় লইয়া আরও কয়েকজন মুসলমান কবি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দোনাগাজী, বিরাহিম (ইব্রাহিম) এবং মালেক মুহম্মদের নাম উল্লেখযোগ্য।

সপ্ত (হপ্ত) পয়কর ॥ ইরানী কবি নেজামি সমরকন্দ[১৯] ফারসী ভাষায় ১১৯৯ খ্রীঃ অব্দে অনেকটা 'আলফা-লায়লা'র ঢঙে এই কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে আরব ও আজমের অধিপতি লো'মানের পুত্র বাহ্‌রামের বিবিধ 'কেরামত' যুক্ত সাতটি গল্প বর্ণিত হইয়াছে। বাহ্‌রাম 'এমন' দেশে রাজত্ব করিতেন। ছমনা নামক এক স্থপতি রাজার আদেশে রাজপুত্রের জন্য সপ্ত বর্ণের সাতটি 'টঙ্গী' (উচ্চ ভবন) নির্মাণ করিল। এদিকে রাজকুমার বাহ্‌রাম মৃগয়া ও নৃত্য লইয়া এত ব্যস্ত হইয়া রহিলেন যে, রাজকার্যে অবহেলা ঘটিতে লাগিল। ফলে শত্রুরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিল, অবশ্য বাহ্‌রাম অবলীলাক্রমে শত্রুদিগকে হটাইয়া দিলেন। কিন্তু এদিকে সংবাদ আসিল যে, বাহ্‌রামের পিতার মৃত্যু হইয়াছে এবং সেই সুযোগে উজীর রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছে। তখন বাহ্‌রাম সসৈন্যে পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু উজীরকে আক্রমণ করিলেন না, বরং ঘোষণা করিলেন—দুইটি ব্যাঘ্রের মধ্যে একটি তাজ রক্ষিত হইবে। যিনি ব্যাঘ্রের কবল হইতে সেই তাজ উদ্ধার করিতে পারিবেন, তিনিই বাদশাহ হইবেন। উজীর প্রাণভয়ে ব্যাঘ্রের নিকট যাইতে পারিল না, বাহ্‌রাম নির্ভয়ে ব্যাঘ্রের নিকটে গিয়া নিরাপদে তাজ লইয়া আসিলেন। ইহাতে উজীর ভয় পাইয়া প্রভুপুত্র বাহ্‌রামের চরণস্পর্শ করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিল। অতঃপর বাহ্‌রাম পার্শ্ববর্তী সাতটি রাজ্য জয় করিয়া উক্ত রাজ্য হইতে এক-একটি রাজকন্যাকে

---

১৮ কাব্যের শেষাংশ 'পদ্মাবতী'র সমাপ্তির মতো নির্বেদ-বৈরাগ্যে পূর্ণ :

কথা গেল ছাইয়া মালিকা রূপবতি।
কথা গেল নাহাপাল প্রধান নরপতি॥
ত্রিলোক মোহনি কন্যা বদিউজ্জমাল।
সকল গ্রাসিল এক বলবন্ত কাল॥

(পুথি-পরিচিতি, পৃ. ৫৭০)

১৯ আলাওল কিন্তু 'নেজামি গঞ্জনি' বলিয়াছেন। ইহা বোধহয় 'গজনভী' হইবে ।

বিবাহ করিলেন এবং প্রত্যেককে এক-একটি 'টঙ্গী' বাসস্থানরূপে নির্দেশ করিলেন। অতঃপর তিনি পত্নীদের লইয়া আনন্দে দিনাতিপাত করিতে করিতে একদিন বলিলেন :

কহে রাজকন্যা প্রতি শুনহ গুণবতী
কহ এক প্রসঙ্গ উপাম॥
এই মতে সপ্ত রাতি সপ্ত বিজ্ঞা কলাবতী
কহিলেক সপ্ত সুপ্রসঙ্গ।
এই পুস্তকের সূত্র শুন গুণী সাধুপুত্র
রসসিন্ধু অমিয়া তরঙ্গ॥

রাণীরা বাহ্‌রামকে প্রতি রাত্রে একটি করিয়া গল্প বলিলেন। গল্পগুলি শনিবার আরম্ভ হইয়া শুক্রবারে শেষ হইয়াছে। ইহা পারস্য কবি নিজামীর উক্তনামীয় কাব্যের স্বাধীন অনুবাদ—আক্ষরিক অনুবাদ নহে। আলাওল ১৬৬৩ খ্রীঃ অব্দে সৈয়দ মুহম্মদ খানের অনুবাদে হস্তক্ষেপ করেন। কবি গ্রন্থোৎপত্তি প্রসঙ্গে পৃষ্ঠপোষক সৈয়দ মুহম্মদ খানের কথা সবিস্তারে বলিয়াছেন :

হেন মহারাজেশ্বর অখণ্ড সম্পদ।
তান মহা ছন্দমতি ছৈদ মহাম্মদ॥[১০০]
অঙ্গ দুর্ব্বাদল শ্যাম মুখ পূর্ণ সসি।...
আরবি ফারসি হিন্দুস্থানি গত।......
আমিহ সভাএ তান থাকি অবিরত।
অন্নবস্ত্র দানে আমা পোসন্ত সতত॥...
আমা প্রতি আজ্ঞা দিলা হরসিত মন।
উত্তম প্রসঙ্গ এক কহিতে এখন॥
সপ্তপয়কর কথা অতি মনুহর।
মনুগত প্রকাশিলুং তাহার গোচর॥[১]

করীম সাহেবের সংগ্রহে 'সপ্ত (হপ্ত) পয়করে'র ছয়খানি খণ্ডিত পুঁথি

---

১০০ কবি আর এক পুঁথিতে মুহম্মদের এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন :

শ্রীমন্ত মহন্ত ছৈদ মুহাম্মদ খান।
সূর্য্য অবদি সে রহিল রাখান॥
সুনিয়া সপ্তম কথা হরসিত মন।
হিন আলাওলে কহে মধুর বচন॥

১ পুথি-পরিচিতি, পৃ. ৫৫৯

পাওয়া গিয়াছে—অধিকাংশই অর্বাচীন কালের কলের কাগজে নকল। গল্প-গুলি বেশ সহজ সরসভাবে বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার কাব্যমূল্য নিতান্তই নগণ্য।

তোহ্ফা॥ ইহা মুসলমান জাতির স্মৃতিসংহিতা ধরনের সূত্রসমষ্টি। তোহ্ফা শব্দের অর্থ—উপহার। সেখ ইউসুফ দেহ্লবী (যিনি 'তোহ্ফা'তে 'গদা' নামে উল্লিখিত হইয়াছেন) ৭৭৪ হিজরা সনে (১৩৭২-৭৩ খ্রীঃ অঃ) ফারসী ভাষায় 'তুহফাতুননেসা' শীর্ষক নীতিকথা বিষয়ক একখানি কাব্য রচনা করেন। কবি ইউসুফ-গদা হাদিস ও তফ্সির ভালো করিয়া অধ্যয়ন করেন। তাঁহার গ্রন্থও কিন্তু মৌলিক রচনা নহে, কোন আরবী গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া 'তুহ্ফাতুনেসা' রচিত হয়। তোহ্ফা পঁয়তাল্লিস অধ্যায়ে বিভক্ত মুসলমান সমাজের নীতিগ্রন্থ—যাহাতে ধর্ম, আচার-বিচার, দৈনন্দিন জীবনের করণীয় ও অকরণীয় বিষয় সমূহ নির্দিষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রব্যবস্থা, ইবাদত, জাকাত, রোমা, কোরান পাঠ, শহীদ, বেহশ্ত, দোজখ ইত্যাদি ব্যাপার ইহার বর্ণিত বিষয় বলিয়া মুসলমান সমাজে কাব্যটি বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। আলাওল কারামুক্তির পরে ১৬৬৩-৬৪ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে ইউসুফ গদার 'তুহ্ফাতুন' অবলম্বনে তোহ্ফা' রচনা করেন। ইহা কেবলমাত্র মুসলমান সমাজের জন্য নির্দিষ্ট বলিয়া এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নাই। তবে আলাওল বেশ পরিচ্ছন্ন ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছেন যেমন :

দুঃখীজন দেখিয়া তুষিব যোগ্য দানে।
মুই দিমু হেন জ্ঞান না রাখিব মনে॥
মনে দুঃখ না দিও বিমুখ কটু বাকে।
ভাবিও "যে মোরে দিছে সেই দিন তাকে॥"

অধ্যাপক আহ্মদ শরীফ 'তোহ্ফা' প্রবন্ধে (সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা, শাতসংখ্যা, ১৩৬৪) এবং অধ্যাপক সৈয়দ মূর্তাজা আলি 'আলাউলের তোহ্ফা' প্রবন্ধে (বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৮) এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন, এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এ পর্যন্ত বাংলা 'তোহ্ফা'র মাত্র তিনখানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে শরিয়তের নিয়মাবলী যেমন অনুসৃত হইয়াছে, তেমনি অনেক লৌকিক সংস্কারের ছাপও আছে, যাহাতে হয়তো 'শরা' পন্থী বিশুদ্ধ

মুসলমান আপত্তি করিতে পারেন এবং সত্যই কেহ কেহ সম্প্রতি 'তোহ্‌ফা' সম্বন্ধে আপত্তির মৃদু গুঞ্জন তুলিয়াছেন। জ্যোতিষে অভিজ্ঞ আলাওল ইহাতে চাঁদ-তারার সঙ্গে মানব ভাগ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা রক্ষণশীল মুসলমান সম্প্রদায়ের মনঃপূত হয় নাই। অবশ্য এরূপ বর্ণনা ইউসুফ গদার 'তুহ্‌ফাতুনে'ই আছে, আলাওল একা অপরাধী নহেন। ইরানের (প্রাচীন আর্য) প্রভাবে আরবী মুসলমানসমাজে এরূপ তথাকথিত অনেক কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছিল। মুসলমান সমাজের কেহ কেহ এইরূপ "ইসলাম বিরোধী, ভ্রান্ত সংস্কারে বিশ্বাসীরা গৃহপ্রতিষ্ঠা, বিদেশে যাত্রা উপলক্ষে শুভ-দিনের অন্বেষণ" করিতেন বলিয়া একালের সরিয়ত-হাদিস পন্থী মুসলমানসমাজ এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকেন।[২] ইহাতে আলাওল হিন্দুদের গুরুবাদের[৩] অনুরূপ 'পীরপরস্তি' বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু "এই পীরপূজা ইসলামের মূলনীতি বিরোধী"—অনেক আধুনিক মুসলমান এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।[৪]

আলাওল এই নীতিকাব্যে দাসী-সম্ভোগের কথাও বলিয়াছেন:

আপন হরিষ যদি চাহ চিরকাল।
কিনিয়া সুন্দর দাসী গোঞাইবে ভাল॥

বিবাহে হিন্দুসমাজের স্ত্রী-আচারের মতো আলাওল নববধূ-সংক্রান্ত হিন্দু-আচার বর্ণনা করিয়াছেন:

পিতৃগৃহ হস্তে নারী গৃহেতে আনিব।
প্রথমে তাহার দুই পদ পাখালিব॥
তবে সেই রমণীর পাখালনা পানি
চারিকোণে বাসগৃহে ছিটিবেক আনি॥

"এই সকল স্ত্রী-আচার ইসলাম ধর্ম অনুমোদন" না করিলেও হিন্দুসমাজের পাশে বাস করিয়া ধর্মান্তরিত মুসলমানসমাজ একদা কিছু কিছু হিন্দুয়ানি পালন করিত—আলাওলের রচনায় তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। যাহা হউক আধুনিক কালে পূর্বপাকিস্তানী মুসলমান সমাজে নবোদ্যমে সরিয়ত-হাদিস

---

২ বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, কার্তিক পৌষ, ১৩৬৮, পৃ. ১১৪

৩ ঈশ্বর সেবার এই মূল দৃঢ়ভাব।
ভাবস্থির চাহ যদি গুরুপদ সেব॥

৪ বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৮, পৃ. ১১৫

শাসনের ব্যবস্থা যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে কেহ কেহ হয়তো আলাওলের 'তোহ্‌ফার' সব নির্দেশ মানিতে পারিবেন না। পূর্বপাকিস্তানের মুসলমান লেখক যতই বলুন না কেন—"মোটকথা ধর্মজীবন পালনের এটা (তোহ্‌ফা) একখানি মূল্যবান নির্দেশিকা—"[৫] তবু তাঁহারা আলাওলের হিন্দুঘেঁষা নির্দেশগুলি মানিতে সম্মত নহেন। সূফীসাধক আলাওল যোগ-তন্ত্র-জ্যোতিষ প্রভৃতি হিন্দুর শাস্ত্র গ্রন্থসমূহ হিন্দুর মন ও নিষ্ঠা লইয়াই অনুশীলন করিয়াছিলেন—এ সংবাদ আধুনিক বিশুদ্ধ ইসলামপন্থী মুসলমান-সমাজের পক্ষে পীড়াদায়ক সন্দেহ নাই। এখন আলাওল জীবিত থাকিলে 'বেশরা'-পন্থী বলিয়া তাঁহার জাতি যাইত।

সেকান্দারনামা॥ আলাওলের সর্বশেষ কাব্য 'সেকান্দারনামা' প্রসিদ্ধ ফারসী কবি নেজামী সমরকন্দীর 'ইস্‌কান্দারনামা' কাব্যের অনুবাদ, কোথাও কোথাও কবির নিজস্ব রচনাও আছে। আলেকজাণ্ডারের বিজয়-কাহিনী লইয়া ইরানে যে সমস্ত গালগল্প ও অতিরঞ্জিত কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা অবলম্বনে নেজামী 'ইস্‌কান্দারনামা' রচনা করেন, যাহাতে ইতিহাস, অতিরঞ্জন ও রূপকথা অবিরোধে পাশাপাশি স্থান পাইয়াছে।

সুজার হত্যার পর আলাওল কিছুকাল বিনাদোষে শাস্তি পাইয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। যাহা হউক তার পরে তিনি আরাকানরাজ-চন্দ্রসুধর্মার (১৬৫২-৮৪) আমলে তাঁহার প্রধান অমাত্য নবরাজ মজলিসের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তাঁহারই আদেশে কবি ১৬৭৩ খ্রী: অব্দে 'সিকান্দারনামা' রচনা করেন—কবি তখন সুবৃদ্ধ।

একদা নবরাজ মজলিস এক ভোজসভার আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই সভায় আলাওলও উপস্থিত ছিলেন। সকলে মজলিসের উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলিলেন, তিনি যদি মসজিদ বানাইয়া পুকুর কাটাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার নাম চিরজীবী হইবে। কিন্তু প্রাজ্ঞ মজলিস বলিলেন:

> মছজিদ পুষ্করণী নাম নিজ দেশে রহে।
> গ্রন্থকথা যথাতথা ভক্তি ভাবে কহে॥
> গ্রন্থ পড়ি সকলের দীপ্ত হয় মন।
> নাম স্মরি মহিমা করয়ে কত জন॥

৫ ঐ পত্রিকা, পৃ. ১১৫

তখন তিনি আলাওলকে এমন একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে বলিলেন যাহাতে তাঁহার নামযশ বৃদ্ধি পায়। আলাওল বলিলেন যে, নেজামীর 'ইসকান্দার-নামা' অনুবাদ করিলে ভালো হয়। নেজামীর ভাষা কিছু কর্কশ বলিয়া মুসলমানসমাজে ইহার তওটা প্রচার ছিল না। কিন্তু "ভাঙ্গিয়া কহিলে তাতে আছে বহু রস।" অবশ্য আলাওল তখন অতি বৃদ্ধ, শোকতাপ ও অর্থাভাবে বিপর্যস্ত—তাই তিনি এরূপ গ্রন্থ অনুবাদে কিছু সঙ্কুচিত হইলেন। কিন্তু নবরাজ মজলিস কবির সমস্ত ভার গ্রহণ করিলে আলাওল অনুবাদে অগ্রসর হইলেন। মূলকাব্যে বর্ণিত আলেকজাণ্ডারের অভিযান সম্পর্কিত সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত কাহিনীটি কতকটা এইরূপ :—

রোমরাজ ফয়লকুছের (ফিলিপ) আদি নিবাস ইউনান (আইয়োনিয়া অর্থাৎ গ্রীস)। তিনি ইস্‌হাক নবির (আইজক) ভ্রাতুষ্পুত্র। মখদুমিয়া (ম্যাসিডোনিয়া) দেশে তাঁহার রাজধানী। সেকান্দার এই ফয়লকুছের পালিত পুত্র। আরস্তুতালিস (এ্যারিস্টটল) সেকান্দারের গৃহশিক্ষক ছিলেন। মিশর জয় করিয়া তিনি ইস্‌কান্দারিয়া নগরী (আলেকজান্দ্রিয়া) স্থাপন করেন। পারস্যরাজ দরায়ু (ডেরিয়াস) সেকান্দারের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। সেকান্দার পারস্যে গিয়া অগ্নি-উপাসকদের বিনাশ করেন এবং দরায়ুর কন্যা রৌসনকে বিবাহ করেন। তার পর তিনি হিন্দুস্থান অভিযানে যাত্রা করেন। হিন্দুস্থানের রাজা ভয় পাইয়া নিজ কন্যার সঙ্গে সেকান্দারের বিবাহ দিয়া সন্ধি করেন। হিন্দুস্থান জয়ের পর তিনি চীন ও রুশের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দুই দেশেই জয় লাভ করেন। অতঃপর তিনি অমৃতরস বা 'আব-ই-হায়াত' আবিষ্কার করিতে গিয়া ব্যর্থ হন। যাহা হউক তিনি কিছু দিন রুমে (রোম) অবস্থান করিয়া নিজ দেশ ইউনানে যাত্রা করেন। এইখানে কাব্য শেষ হইয়াছে।

(এই কাব্যে যুদ্ধবিগ্রহের দীর্ঘ বর্ণনা আছে, অনেক রূপকথাধর্মী অনৈতিহাসিক গল্প ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। ভাষা মোটামুটি বিবৃতিমূলক হইলেও বিশেষ কোন অর্থবহ গৌরবের অধিকারী নহে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কেহ কেহ অতিবৃদ্ধ আলাওলের সর্বশেষ কাব্যখানির উচ্চপ্রশংসা

করিয়াছেন।[৬] কেহ-বা তাঁহার ভাষার মধ্যে মেঘনির্ঘোষবৎ গাম্ভীর্য আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু বৃদ্ধ কবি মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছাইয়া এই কাব্যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ভাষাপ্রবাহ অবাধিত ও স্বচ্ছ সরল—শুধু এইটুকুই অনুবাদ-কাব্যের গুণ। একটু দৃষ্টান্ত :

আসিয়া আসন পরে বসিয়া রাজন।
পন্থপরিশ্রম ক্লেশ কৈল নিবারণ॥
সপ্তখণ্ড পৃথিবীর নৃপতির আজ্ঞা ভুক্ত।
নিয়োজিল প্রতিখণ্ডে নায়েব উপযুক্ত॥
ভূপতি সঙ্গতি ছিল যত নৃপদল।
প্রতিজ্ঞায় দড় করি আছিল সকল॥
নৃপতির হস্তে পাই যোগ্য পুরস্কার।
স্বীয় স্বীয় দেশে গেল হরিষ অন্তর॥

একদা কাব্যটি যে মুসলমান সমাজে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ করীম সাহেবের পুঁথি-সংগ্রহে এই কাব্যের এগারখানি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

আলাওলের নামে নাকি আরও কাব্য প্রচলিত আছে। সর্বপ্রথম মুন্সি আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ ও ডঃ এনামুল হক এই সংবাদ দিয়াছিলেন।[৭] আলাওলের নাম জড়িত আরও দুইখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে—একখানির নাম 'রাগতালনামা'।[৮] ইহাতে আলাওল ও মহম্মদ

---

৬ 'আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্যে'র লেখকদ্বয় বলিয়াছেন, "যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনায় পূর্ণ হইলেও প্রাসঙ্গিকভাবে বহু অমূল্য উপদেশ সন্নিবিষ্ট করায় গ্রন্থখানি অত্যন্ত সুখপাঠ্য হইয়াছে। ইহার ভাষা সর্বত্র মেঘনির্ঘোষবৎ গম্ভীর।" (পৃ. ৫৮) ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া 'পুথি-পরিচিতি'র সম্পাদক বলিয়াছেন, "গ্রন্থখানি যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনায় পূর্ণ হইলেও, প্রাসঙ্গিক নানা ঘটনার সমাবেশ এবং আলাওলের নিপুণ তুলিকাস্পর্শে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও উপাদেয় হইয়াছে।" (পৃ. ৫৮২)

৭ আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য পৃ ৩১-৩২, ২২৯-৪৩

৮ আলাওলের ভণিতায় 'রত্নকলিকা' শীর্ষক একখানি প্রায় দেড়শত বৎসরের পুরাতন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। 'পুথিপরিচিতি'তে (পৃ. ৪৯২) ইহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। আলাওল দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রানী'র শেষাংশ সমাপ্ত করিতে গিয়া 'রত্নকলিকা'র যে গল্প বলিয়াছিলেন, তাহাই পৃথক আকারে প্রচলিত ছিল।

শাহ্ ফকিরের ভণিতায় রাগ ও তালযুক্ত কিছু কিছু গানও প্রচলিত আছে। 'পুঁথি পরিচিতি'তে বিবৃত তিন খানি পুঁথিতে (পুঁথি সংখ্যা—১০০ ও ৪৪৪, ৬৯৯) আলাওলের নাম পাওয়া যায়। উহাতে কবির ভণিতা এইরূপ :

হিন আলাওল কহে সুন গুণিগণ।
উভয়ের সদুত্তর সুনহ এখন ॥

'পুঁথি-পরিচিতি'র এই দেড়পংক্তির বিবরণ ভিন্ন এই সম্পর্কে আলাওল সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ নাই। প্রাপ্ত পুঁথিটি অতিশয় অর্বাচীন, আধুনিক কালের কাগজে লিখিত। সুতরাং ইহাতে প্রদত্ত আলাওলের ভণিতা আসল আলাওলের ভণিতা নহে, পরবর্তী কালের কেহ রাগতাল লিখিতে গিয়া সঙ্গীত-বিশারদ আলাওলের ভণিতা চালাইয়া দিয়াছেন।[৯] এবিষয়ে প্রামাণিক ও বিশ্বাসযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

আলাওল মধ্যযুগের যে একজন নানাবিদ্যাবিশারদ কবি ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার সমস্ত পুঁথি চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলমান সম্প্রদায়ের বাটী হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। এগুলি এতদিন আড়ালেই ছিল। পরে পুঁথিসাহিত্যে অভিজ্ঞ করীম সাহেবের চেষ্টায় আলাওল সম্বন্ধে অনেক পুঁথি ও তথ্য পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত পুঁথিগুলির দুই-একখানি আরবী হরফে লিখিত। আলাওলের 'পদ্মাবতী' বাদ দিলে তাঁহার আর সমস্ত কাব্য শুধু মুসলমান সমাজের জন্য রচিত হইয়াছিল। কোনটিতে আরবী-ফারসী কিস্সা-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, কোনটিতে ইসলাম ধর্মের নীতি-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ফলে এই পুঁথিগুলি সম্বন্ধে হিন্দুসমাজের বিশেষ কোন কৌতূহল ছিল না। যে পুঁথিতে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সার্বজনীন গল্পরস আছে, এবং যাহাতে বৈষ্ণব পদাবলীর রস ও আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে, মুসলমান কবিদের সেই সমস্ত রচনাই হিন্দুসমাজে কথঞ্চিৎ পরিচিত ছিল। বৈষ্ণব পদসঙ্কলনে দুই একজন মুসলমান পদকারের দুই-একটি পদও স্থান পাইয়াছিল।[১০] যাহা হউক আলাওল যে সপ্তদশ শতাব্দীর একজন উল্লেখযোগ্য কবি, তাহা

---

৯ ফাজিল নাসির মুহম্মদ, চম্পাগাজী, বক্সা আলী, দানিস কাজী প্রভৃতির নামে অনেক 'রাগমালা' প্রচলিত আছে। দ্রষ্টব্য। 'পুথি-পরিচিতি'।

১০ এই অধ্যায়ের শেষভাগে মুসলমান কবির বৈষ্ণব পদ প্রসঙ্গে আলাওলের নামে প্রচারিত বৈষ্ণব পদ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

তাঁহার কাব্যগুলিই প্রমাণ করিবে। তবে দৌলত কাজীর তুলনায় তাঁহার প্রতিভা যে নিকৃষ্ট তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহা অবশ্য সত্য যে "তাঁহার সমান নানা বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত সে যুগে আর কেহই ছিলেন না।"[১১] কিন্তু যাঁহারা ভক্তিবিগলিত কণ্ঠে বলিয়া থাকেন, "তাঁর পাণ্ডিত্য ও কবিত্বে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নূতন রূপ লাভ করে।...তাঁর রচনায় ছিল কবিপ্রতিভার নির্ভুল স্বাক্ষর"...[১২], তাঁহারা পাণ্ডিত্যকে কবিত্ব বলিয়া ভুল করেন, ভূয়োদর্শনকে ভাবাবেগ বলিয়া পুলকিত হন। তাঁহাদিগকে 'আরকান রাজসভার বাঙ্গালা সাহিত্যে'র গ্রন্থকারদ্বয়ের মন্তব্য স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, "আলাওলের রচিত অংশে পাণ্ডিত্য আছে, শব্দাড়ম্বর আছে, অস্বাভাবিক ও অবান্তর গল্পের সমাবেশ আছে, কিন্তু দৌলত কাজীর রচনায় যে প্রাঞ্জলতা, যে স্বাভাবিকত্ব ও ভাবপ্রকাশক অল্পভাষিতার নিদর্শন আছে, আলাওলের রচিত অংশে তাহা পাওয়া যায় না। এইরূপে বহু গ্রন্থপ্রণেতা, দীর্ঘজীবী ও পণ্ডিত আলাওল দৌলত কাজীর ন্যায় একজন খণ্ডকাব্য প্রণেতা ও স্বল্পজীবী কবির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন।" (পৃ. ২৬)

অন্যান্য কবি-পরিচয় ॥

সপ্তদশ শতাব্দীর যে দুইজন মুসলমান কবি প্রতিভার প্রসাদে সঙ্কীর্ণতর সম্প্রদায়ের বেষ্টন ভেদ করিয়া বৃহত্তর বাঙালী সমাজে শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন, সেই দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল সম্বন্ধে সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল। এই শতাব্দীতে আরাকান-চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা-নোয়াখালি অঞ্চলে আরও অনেক বাঙালী মুসলমান কবি সাহিত্যকর্মে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

সে যুগে ব্রজসুন্দর সান্যাল মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের কিছু কিছু পদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের দান সম্পর্কে পাঠকচিত্তে কৌতূহল জাগাইয়াছিলেন। মুন্সি আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ জীবনব্যাপী সাধনা করিয়া পূর্ববঙ্গের বহু অজ্ঞাতপরিচয় মুসলমান কবির পুঁথি

---

১১ ডঃ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত পদ্মাবতী ১ম, ভূমিকা, পৃ. ।৹

১২ বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৮ ('আলাওলের তোহ্ফা—সৈয়দ মুর্তাজা আলী)

আবিষ্কার করেন, তাহার কিছু কিছু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণে প্রকাশিত হইয়াছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে করীম সাহেবের সারা জীবনের সাধনফল বিরাট পুঁথিতালিকা ('পুথি-পরিচিতি') প্রকাশিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান সমাজ ও পরিবারে যে সমস্ত পুঁথিপত্রাদি এখনও রক্ষিত আছে (রক্ষিত আছে বলিয়াই আমাদের ধারণা), অদ্যাপি সে সম্বন্ধে কোন তথ্যানুসন্ধান বা আলোচনা হয় নাই। যাহা হউক ঢাকার 'পুথি-পরিচিতি'তে বিবৃত মুসলমান কবিদের তালিকায় দেখা যাইতেছে, সপ্তদশ শতাব্দীতে দৌলত কাজী ও আলাওল ছাড়াও প্রায় পঞ্চাশ জন মুসলমান কবি পূর্ববঙ্গে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে অধিকাংশ কবির বিষয়বস্তু ইসলামী ইতিহাস-সংস্কৃতি ও শাস্ত্রসংহিতা—যাহার প্রভাব বৃহত্তর বাঙালী সমাজ ও বাংলা সাহিত্যে বিশেষ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই পুঁথিগুলি এতদিন চট্টগ্রাম-আরাকান-ত্রিপুরার মুসলমান পরিবারেই রক্ষিত হইয়াছিল, পরে তাহার কিছু কিছু মুন্সি আবদুল করীম কর্তৃক সংগৃহীত হয়। এখন সেগুলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে, দুই একখানি পূর্বপাকিস্তানে প্রকাশিতও হইয়াছে। এই সমস্ত পুঁথি সম্বন্ধে পূর্বপাকিস্তানের গবেষকগণ পত্র-পত্রিকায় নানা আলোচনা করিতেছেন—আমাদের আলোচনার সেইটুকুই সম্বল। নানা কারণে এই সমস্ত পুঁথি আমাদের চাক্ষুষ করিবার উপায় নাই।

এই যুগের আরও কয়েকজন কবি রোমান্টিক আখ্যানকে মানবীয় প্রেমের আধারে পরিবেশন করিয়াছেন। মাগনঠাকুরের নামে প্রচারিত 'চন্দ্রাবতী' (১৬৫৮), আবদুল হাকিমের 'ইউসুফ-জুলেখা', 'লালমতী'-সয়ফুলমুলুক', নওয়াজিস খানের 'গুলেবকাওলী' উল্লেখযোগ্য। কেহ কেহ মুসলমান-ইতিহাস-পুরাণ-যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী লইয়াও কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। যথা—মীর মোহাম্মদ সফীর 'নূরনামা', নসরুল্লা খোন্দকারের 'জঙ্গনামা', মোহাম্মদ খানের 'মুক্তাল হোসেন' শেখ চান্দের 'রসুল বিজয়', সদ্দত উল্লার 'হাতেমতাই'—একদা পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে এ পুঁথিগুলির বেশ চাহিদা ছিল। কারণ করীম সাহেব এই সমস্ত কাব্যের একাধিক পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

পূর্ববঙ্গের কোন কোন মুসলমান কবি বৈষ্ণব ঢঙে যে সমস্ত পদ লিখিয়া-

ছিলেন, তাহারও পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। যেমন—সৈয়দ আইনুদ্দিন, গেয়াস খান, গরীব খান, ফতে খান, আফজল আলীর পদাবলী। শেখচান্দের 'হরগৌরী সংবাদ', সাদেক আলির 'রামচন্দ্রের বনবাস' এবং সেখ মোহাম্মদ হোসেনের চাণক্যশ্লোকের অনুবাদের উল্লেখ না করিলে এ তালিকা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ইহা ছাড়াও ডঃ এনামুল হক এবং আবদুল করীম সাহেব তাঁহাদের 'আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্যে' আরও কয়েকজন বিস্মৃত কবির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রথমে কোরেশী মাগনের 'চন্দ্রাবতী' সম্বন্ধে দুই-এক কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৩৩৩ সনের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় আবদুল করীম সাহেব কোরেশী মাগন ভণিতায় রচিত 'চন্দ্রাবতী' কাব্যের একখানি খণ্ডিত পুঁথির কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। পরে 'আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্যে' এই কাব্যের বিস্তারিত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। করীম সাহেবের মতে আরাকানের প্রধান অমাত্য মাগনঠাকুর আলাওলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইনি নাকি কোরেশ বংশসম্ভূত, তাই তাঁহার নাম কোরেশী মাগনঠাকুর। আলাওল 'সয়ফুলমুলুকে' সিদ্দিকী বংশজাত আর এক মাগনের উল্লেখ করিয়াছেন :

> সিদ্দাক সংশেতে জন্ম শেখজাদা জাত।
> কুলে শীলে সৎকর্ম্মে ভুবন বিখ্যাত॥

কবির পৃষ্ঠপোষক মাগনঠাকুর হিন্দু, মুসলমান, না বৌদ্ধ মগ তাহা লইয়া মতভেদ হইয়াছে। 'সয়ফুলমুলুকে'র বর্ণনানুসারে দেখা যাইতেছে, তিনি হিন্দু বা মগ—যাহাই হউন না কেন, মুসলমান ধর্মগুরু মাসুম শাহার ভক্ত-শিষ্য ছিলেন এবং মুসলমান অমাত্যদের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিতেন তাহাতে তাঁহাকে পুরাপুরি হিন্দু বলা যায় না। আমাদের অনুমান, আরাকানরাজের অমাত্য মাগনঠাকুর মগ-বংশসম্ভূত। ধর্মমতে তিনি বোধহয় সূফী মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তিনি যে কোরেশ বংশ বা সিদ্দিকী শ্রেণী-ভুক্ত ছিলেন—এনামুল হক সাহেবের এইরূপ অনুমান, অনুমান মাত্র। মাগন মুসলমান হইলে কখনও 'ঠাকুর' উপাধি ব্যবহার করিতেন না।

'চন্দ্রাবতী' আখ্যানকাব্যের কবি কোরেশী মাগন (কোরেশ বংশোৎপন্ন) এবং আলাওলের পৃষ্ঠপোষক মাগনঠাকুর যে একই ব্যক্তি তাহা প্রমাণ করা

দুরূহ। সুতরাং মাগনঠাকুরের সময় ধরিয়া ডঃ হক কোরেশী মাগনের যে সন তারিখ (১৬০০—১৬৬০) নির্ধারিত করিয়াছেন সে সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ আছে। এই কাব্য অন্য কোন মাগনের রচিত হওয়াই সম্ভব—যিনি মুসলমান কোরেশ বংশে জন্মলাভ করেন।

'চন্দ্রাবতী' রূপকথাধর্মী একটি পরিচ্ছন্ন আখ্যানকাব্য। ভদ্রাবতীর রাজা চন্দ্রসেনের পুত্র বীরভানের সঙ্গে সরন্দ্বীপের (সিংহল) রাজকন্যা চন্দ্রাবতীর প্রণয়কাহিনী ইহাতে রূপকথার ঢঙে বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া গিয়াছে, কাজেই সমাপ্তিতে কিরূপ ছিল তাহা বুঝা যাইতেছে না। তবে বীরভান-চন্দ্রাবতীর মিলনেই কাব্য সমাপ্ত হইয়াছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এই কবি যিনিই হউন, কাব্যটির ভাষা বেশ মার্জিত, কবির ছন্দ-জ্ঞানও বেশ প্রখর। ইহাতে মাঝে মাঝে দুই একটি স্থানীয় (চট্টগ্রাম) শব্দও আছে। এখানে কোরেশী মাগনের প্রশংসনীয় বর্ণনার সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

বর্ষার বর্ণনা :

বরিষার মেঘে যেন বরিষয়ে ধারা।
সঘন তিতিল নিত্য নয়নের ঝারা॥
বসিয়া চাতক বৃক্ষে বলে পিউ পিউ
বান হানে তারস্বরে দেহা প্রাণ জীউ॥

ঝড়ের বর্ণনাও প্রশংসার যোগ্য—

দৈবগতি অলক্ষিতে তুফান হইল।
লবণসমুদ্র মধ্যে তরঙ্গ উঠিল॥
একে ঘোর আর নিশি হইল তুফান।
আর সমুদ্রের জন্তু উঠে তুরমান॥

এ বর্ণনা সপ্তদশ শতাব্দীর কবির পক্ষে শ্লাঘনীয় বলিতে হইবে। কিন্তু ইনি কোন্ শতাব্দীর কবি, তাহা এনামুল হক সাহেব ও করীম সাহেবের লিখিত সাক্ষ্য ভিন্ন অন্য কোন যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আরও কয়েকজন মুসলমান কবি (সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত) কাহিনীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মরদনের (আরাকানের অধিবাসী) 'নছিরনামা'য় রূপকথার ঢঙে অদৃষ্ট লিপির অলঙ্ঘণীয়তা বর্ণিত হইয়াছে। শমসের আলীর 'রিজওয়ান শাহ' একটি বিচিত্র কাহিনীকাব্য। ইহাতে গল্পের

পটভূমিকা খোরাসান ও পারস্য হইলেও চরিত্রগুলি বাঙালী হিন্দু। যথা—হিরালাল, চিত্রপ্রভা, চন্দ্রাবতী ইত্যাদি। কবির ভাষা ও ছন্দজ্ঞান প্রশংসার যোগ্য। যথা—

দেখি মন উচাটন হইল কুমার।
বাঞ্ছা আশে সখীপাশে করিল পুছার॥
ওহে সখি কহ দেখি এই কোন জন।
চিনি কান্দে মন বান্ধে জগত মোহন॥

এই প্রসঙ্গে মোহাম্মদ খানের 'মকতুল হোসেন' উল্লেখযোগ্য। এই কাব্য এখনও চট্টগ্রামে মুসলমান সমাজে প্রচলিত আছে—এক সময়ে মহরম উৎসবে ইহা পাঠ করা হইত। ইহাতে কারবালা প্রান্তরে হজরত মহম্মদের দৌহিত্র হোসেনের নিধন কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যটি করুণরসের আকর, ইহার রচনারীতিও বেশ স্নিগ্ধ। কাব্যটির অসাম্প্রদায়িক করুণরসের আবেদন যে কোন শ্রেণীর পাঠককেই অভিভূত করিবে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের কবি আবদুল নবি ফারসী কাব্য 'দাস্তানে আমীর হামজা' অবলম্বনে ১০৯৬ হিজরা (১৬৮৪ খ্রীঃ অঃ) 'আমীর হামজা' কাব্য রচনা করেন। এই বিরাট কাব্য ৮০ পর্বে বিভক্ত। ইহাতে হজরত মহম্মদের খুল্লতাত আমীর হামজার বীরত্বের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ডঃ এনামুল হক সাহেব এই কবিকে কাশীরাম দাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিতে চাহেন। বলা বাহুল্য তাঁহার এ অভিমত যুক্তিসঙ্গত নহে।

সৈয়দ মোহাম্মদ আকবর (জন্ম -১৬১৭ খ্রীঃ অঃ) 'জেবলমুলুক-শামারোখ' শীর্ষক যে রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী রচনা করেন, তাহার একটা বৈশিষ্ট্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। তিনি হিন্দুর দেবতাকে মুসলমান পীর-নবির সঙ্গে এক করিয়া অসাম্প্রদায়িক ঔদার্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মতে ফিরিস্তা হইতেছেন নারদ। ঐরূপ আল্লাহ্—ঈশ্বর, পয়গম্বর—দেবতা, আদম—অনাদি নর, হাওয়া (Eve)—কালী, হজরত মহম্মদ—চৈতন্যদেব, খাজা খিজির—শ্রীকৃষ্ণ, আস্হাবগণ (মহম্মদের সঙ্গীসাথী)—দ্বাদশ গোপাল, আওলিয়া আম্বিয়া (মুসলমান সন্তসাধক)—মুনিঋষি। রচনার এই অংশটুকু কৌতূহলজনক বলিয়া এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইতেছে :

বিনএ করিয়া বন্দি ফিরিস্তার পদ।
তুর্কিকুলে ফিরিস্তা যে হিন্দুতে নারদ॥

ভক্ত সিংহাসনে বন্দি আল্লার দরবারে।
হিন্দুকুলে ঈশ্বর হেন জগতে প্রচারে॥
পএগম্বর সকল বন্দি করিয়া ভকতি।
হিন্দুকুলের দেবতা হেন হইল প্রকৃতি॥
আদম বন্দি জগতের বাপ।
হিন্দুকুলে অনাদি নর প্রচার প্রতাপ॥
মা হাওয়া বন্দম জগতজননী।
হিন্দুকুলে কালীনাম প্রচারে মোহিনী॥
হজরত রছুল বন্দি প্রভু নিজ সখা।
হিন্দুকুলে অবতারি চৈতন্যরূপে দেখা॥
খোআজ খিজির বন্দম জলেত বসতি।
হিন্দুকুলে বাসুদেব শূণ্যে যে প্রকৃতি॥
* * * *
আছহ্বা সকল বন্দি নবীর সভাএ।
হিন্দুকালে দোয়াদশ গোপাল খেয়াএ॥
আওলিয়া আম্বিয়া বন্দি রব্বানি কোরান।
হিন্দুকুলে মুনিভাব আছএ পুরাণ॥
পীর মুর্শিদ বন্দম ওস্তাদ চরণ।
হিন্দুকুলে গুরু যেন করএ পূজন॥

ইঁহার গল্পে আছে, শাহ্ সুলতান নামক চামরীরাজ কর্ণাটদেশের রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যা রতিকলাকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের পুত্রের নাম জেবলমুলুক। জেবলমুলুকের সহিত গন্ধর্বকুমারী শামারোখের প্রণয়-কাহিনী এই আখ্যানের মূল বক্তব্য। অবশ্য বর্ণিত প্রেমকাহিনীটি অধ্যাত্ম-মার্গে উন্নীত হইয়াছে। দু' এক স্থলের বর্ণনা বেশ কবিত্বপূর্ণ। করুণরস পরিস্ফুটনে কবির যে বিশেষ প্রবণতা ছিল তাহা নিম্নলিখিত ছত্রকয়টি হইতে বুঝা যাইবে :

কুক্ষণে জনম লৈনু কুলকলঙ্কিনী হৈনু
জগতে রহিল অপবাদ।
পাপিনী কহিবে সবে পিতৃমাথা হেট হবে
সবে কবে জন্মিল আপদ॥

অবশ্য এরূপ মসৃণ ভাষাকে সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা বলিতে কিঞ্চিৎ দ্বিধা হয়।

মোহাম্মদ রাজা, রফিদ্দিন, সেরবাজ, আবদুল আলিম, আবদুল হাকিম

—ইঁহাদের কিস্‌সা জাতীয় কাহিনীকাব্য কলিকাতার বটতলা হইতে ইসলামী রীতিতে মুদ্রিত হইয়া একদা মুসলমান সমাজে প্রসার লাভ করিয়াছিল। সেরবাজের 'মল্লিকার হাজার সওয়াল', আবদুল আলিমের 'হানিফার লড়াই' (কারবালা প্রান্তরের পরবর্তী ঘটনা), আবদুল হাকিমের 'লালমতী সয়ফুলমুলুক', 'ইউসুফ-জুলেখা' প্রভৃতি কাহিনীকাব্যের গল্পরস বেশ উপভোগ্য, ছন্দও নিন্দনীয় নহে। বিষয়বস্তু অধিকাংশ স্থলে মুসলমান সংস্কৃতি বিষয়ক হইলেও কবিগণের রচনার মধ্যে এমন একটা উদার অসাম্প্রদায়িক প্রকাশভঙ্গী ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, জাতিসম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই এই সমস্ত মুসলমান কবির রচনা হইতে মানসিক তৃপ্তি খুঁজিয়া পাইবেন। তবে বটতলা হইতে প্রকাশিত এই কাহিনীকাব্যকে সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করিবার মতো কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ডঃ হক ও করীম সাহেব যাহাই বলুন না কেন (তাঁহাদের মতে ইহার রচনাকাল—১৭শ শতাব্দী), এই কাব্যের ভাষা প্রভৃতিতে প্রাচীনত্বের বিশেষ কোন লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সৈয়দ সুলতানের 'নবিবংশ' এবং মুহম্মদ খানের 'সত্যকলি বিবাদসংবাদ' প্রভৃতি কাব্যে কিঞ্চিৎ প্রশংসনীয় কাব্যলক্ষণ আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। একাদশ সর্গে সমাপ্ত 'মক্তুল হোসেন' কাব্যও রচনারীতির দিক দিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরার কবি শেখ চাঁদের (১৫৬০-১৬২৫) 'রসুলবিজয়', 'হরগৌরী সংবাদ' (যোগদর্শনের কাব্য), সৈয়দ মুহম্মদ আকবরের 'জেবুলমুলুক-শ্যামারোখ' প্রভৃতি ঐতিহাসিক রোমান্টিক আখ্যায়িকা কাব্যগুলি হইতে অনুমিত হইতে পারে যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান সমাজে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব কীভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল। অবশ্য এই সমস্ত মুসলমান কবি প্রধানতঃ ফারসী-আরবী রোমান্টিক প্রণয়গাথা ও কারবালা প্রান্তরের শোকাবহ ঘটনা, নবীদের চরিতকথা, যুদ্ধজয়-কাহিনী, ইসলামী শাস্ত্রসংহিতার কিছু কিছু অনুবাদে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন। মধ্যযুগের হিন্দু লেখকগণ কিন্তু লৌকিক কাহিনীর প্রতি কিছুমাত্র আকৃষ্ট হন নাই, দেবদেবী ও অবতারকল্প মানুষের কাহিনী লইয়াই তাঁহাদের ষোল আনা আয়োজন। অবশ্য মুসলমান কবিগণ যে শুধু মানবীয় কাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক নহে। ইসলাম ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, নীতিতত্ত্ব,

নবীকাহিনী, জঙ্গনামা প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদের কম আকর্ষণ ছিল না, সেইরূপ কাব্যের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নহে। কিন্তু বাঙলার, বিশেষতঃ পূর্ববাঙলার ইসলামী বাংলা সাহিত্য মুসলমানসমাজ ও পাঠকশ্রেণীর বাহিরে ছড়াইয়া পড়িতে পারে নাই। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। বাঙালী মুসলমান সমাজ বাঙলার সঙ্গে নাড়ীর যোগসূত্রে মিলিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা আরবী-ফার্সী কিস্‌সাকাহিনী, ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও আচার অনুষ্ঠান এবং আরবী-ইরানী সেমীয় সংস্কৃতিকে নিজস্ব বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা যেমন পশ্চিমদিগন্তের দিকে ফিরিয়া প্রার্থনা করেন, তেমনি সংস্কৃতির দিক দিয়াও কিয়দংশে পশ্চিমী সেমীয় (Semitic) তমদ্দুনের ধারক ও বাহক। সেই জন্য তাঁহারা যখন পশ্চিম প্রান্তের ইসলামী কাহিনী ইত্যাদির অনুশীলনে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তখন তাহাকে হিন্দুপ্রতিবেশীরা ঠিক নিজেদের সামগ্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। অবশ্য উদারতর মরমী সাধনার ক্ষেত্রে (যথা যোগ, সূফী, মুর্শিদা, মারফতী, বৈষ্ণব, আউলবাউল, নাথসাহিত্য) হিন্দু-মুসলমান মিলিত হইয়াছিল, মুসলমান সাধক হিন্দুর যোগতন্ত্রের পরিভাষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, হিন্দু বাউল সূফীতত্ত্বের সঙ্গেও গভীর একাত্মতা বোধ করিতেন। কিন্তু মানবীয় গল্প-আখ্যানে—যাহার ঘটনাস্থল ভারতের বাহিরে অবস্থিত, পাত্র-পাত্রী অধিকাংশ স্থলে অভারতীয়, তাহা হিন্দু প্রতিবেশীর কাছে অপরিচিত রহিয়া গেল। মধ্যযুগের মুসলমান কবি-লেখকগণ পুঁথিপত্রে কি লিখিয়াছেন আধুনিককালের হিন্দু পণ্ডিত ও গবেষকগণ তাহার বড় একটা খোঁজ খবর রাখেন নাই, হিন্দু কবিরাও সেই ধরনের কাব্যকাহিনী লিখিতে উৎসাহিত হন নাই। পরবর্তী কালে ছাপাখানার যুগে বটতলা হইতে যখন ইসলামী রীতিতে দক্ষিণ হইতে বামে বহি ছাপা শুরু হইল, তখন এই ব্যাপারের প্রতি মুসলমান পাঠকগণ যেমন আকৃষ্ট হইলেন, হিন্দু পাঠকসম্প্রদায় সেইরূপ উদাসীন হইয়া রহিলেন। এই জন্য যে বিপুলকলেবর ইসলামী পুঁথিসাহিত্যের গবেষণা পূর্বপাকিস্তানে সবেমাত্র শুরু হইয়াছে, তাহার স্থান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বতই সঙ্কুচিত। এইজন্য আমরা শুধু কতিপয় কবি ও তাঁহাদের কাব্যের সামান্য পরিচয় দিলাম। বর্তমানে পূর্বপাকিস্তানের এই সমস্ত নূতন আবিষ্ক্রিয়া ও আলোচনা সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কোন সংবাদ পাই না, ও দেশে মুদ্রিত

গ্রন্থ সংগ্রহ করা তো রীতিমতো কসরতের ব্যাপার। তাই এই আলোচনায় অধিকাংশ স্থলে 'পুথি-পরিচিতি'র তালিকার উপরে নির্ভর করিতে হইয়াছে।

৪
মুসলমান বৈষ্ণব কবি

ইতিপূর্বে আমরা মধ্যযুগে মুসলমান কবিদের দান সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ আরবী-ফারসী গল্পকাহিনী ও ইসলামী বিষয় লইয়া যে সমস্ত কাব্যকাহিনী রচনা করিয়াছিলেন, তাহার দুইচারি খানিতে অসাম্প্রদায়িক উদারতা প্রকাশিত হইলেও এই পর্যায়ের অধিকাংশ রচনাই মুসলমান সমাজের জন্য রচিত হইয়াছিল। দুই একজন সাধক প্রকৃতির কবি যোগ-তন্ত্র ও সুফী আদর্শ মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার মরমী সাহিত্যাদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হিন্দু ঐস্লামিক কাব্যধারার সমন্বয়ের পথ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু একদল মুসলমান কবি উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব-পদাবলী রচনা করিয়া যে বিচিত্র ও বিস্ময়কর কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহার মূল্য চিরকালের জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নির্ণীত হইয়া গিয়াছে।

মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের কবিতার স্বরূপ ॥

মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে, কোন কোন স্থলে বাহ্যিক ধর্মাচরণে হিন্দু-মুসলমানের মারাত্মক বিরোধ বাধিত তাহা অস্বীকার করা যায় না বটে, কিন্তু যে ধর্ম ব্যক্তিগত সাধনসাপেক্ষ, প্রেমভক্তি যাহার পথের দিশারী, এবং যাহার মূল উদ্দেশ্য ঈশ্বর প্রেমলাভ—সেখানে হিন্দু-মুসলমান এক হইয়া গিয়াছে। মধ্যযুগে ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দুধর্ম ও সংস্কার যেমন সমাজের এক-স্তরে উপেক্ষিত হয় এবং প্রেমমার্গীয় উদার সাধনা প্রচার লাভ করে, তেমনি বিশুদ্ধ আরবী তমদ্দুনে বিশ্বাসী মুসলমান সমাজেও সূফী সাধনার রন্ধ্রপথ দিয়া 'বেশরা' পন্থী এমন সমস্ত রীতিকৃত্য ও সাধনা প্রবেশ করে, যাহাতে প্রেমমার্গ ও যোগতন্ত্রাদির ধারা এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমান সমাজে সম্প্রদায়কেন্দ্রিক

স্বাতন্ত্র্যের প্রাধান্য স্থাপনের উগ্র প্রচেষ্টার ফলে এই সমস্ত হিন্দু-মুসলিম যুক্ত সাধনাকে 'বেশরা' ও 'নাপাক' বলিয়া মৌলভি ও মুল্লাগণ ফতোয়া দিবার পর (যাহার পশ্চাতে খানিকটা রাজনৈতিক চাতুরীও ছিল) মুসলমান সমাজে আরবী-বিশুদ্ধীকরণের ধুম পড়িয়া গেল। তাহার ফলাফল আমরা এখানে আলোচনা করিব না ; কিন্তু মুসলমান কবিগণ, যাঁহারা সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ বাতায়ান ত্যাগ করিয়া হিন্দু মুসলিম যুক্তসাধনার সাগরসঙ্গমে উপনীত হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা যে সর্বজনশ্রদ্ধেয় তাহা স্বীকার করিতে হইবে। শুধু মধ্যযুগের বাঙলা দেশেই এইরূপ যুক্ত সাধনার ধারা প্রচলিত হয় নাই, সমগ্র ভারতবর্ষেই এইরূপ শুভ স্বাস্থ্যপ্রদ মানসিক আবহাওয়া হিন্দু মুসলমান মরমী সাধক ও রসিক সমাজে প্রবাহিত হইয়াছিল। ত্রিবেণীর দরাফ খাঁ গাজী সংস্কৃত ভাষায় যে গঙ্গাস্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, হিন্দুগণ এখনও তাহা ভক্তিভরে আবৃত্তি করিয়া থাকেন। কলিকাতাবাসী মুন্সি বিলায়েৎ হোসেন শাক্ত পদাবলী রচনা করিয়া এবং দেবী কালিকার ভক্ত হইয়া হিন্দু ও মুসলমান সমাজে 'কালীপ্রসন্ন' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। হিন্দী কবি রসখান গাহিয়াছেন :

মানুষ হৌঁ তৌ ৱহি রসখানি
নসৌঁ ব্রজ গোকুল গাঁয়কে গ্বায়ন।
জো পশু হৌ তৌ কহা বসু
মেরো চবৌঁ নিত নন্দকী ধেনু মঝারন॥
পাহন হৌ তৌ বহি গিরিকৌ
জো ধর্যৌ করছত্র পুরন্দর কারণ।
জো খগ হৌ তৌ বসরো করৌ
মিলি, কালিংদী-কূল কদম্বকো ডারন॥

অনু: রসখান বলিতেছেন, জন্মান্তরে যদি তুমি মানুষ হও, তাহাহইলে ব্রজগোকুলে গোপদিগের মধ্যে বাস করিও, যদি পশু হও তবে নন্দের ধেনুর সহিত নিত্য চরিয়া বেড়াইও, যদি পাষাণ হও তবে ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে গিরিগোবর্ধনকে ছত্রের ন্যায় ধারণ করিয়াছিলেন, সেই পর্বতের পাথর হইও, আর যদি পাখী হও, তবে যমুনাকূলে কদম্ববৃক্ষের ডালে বাসা বাঁধিয়া থাকিও।[১৩]

বাদশাহ আকবরের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন আবদর রহিম খানখানান "জিন

১৩ অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য কৃত অনুবাদ ('বাঙ্গালায় বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি')।

আঁখিন সোঁ হরি লখ্যো রহিমন বলি বলি জায়"[১৪] এই বলিয়া কৃষ্ণের চরণে নিজকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। হিন্দী ভাষার কবি আদিল বলিয়াছেন, "নন্দকে কিসোর চিতচোর মোর পংখ্‌বা রে, বংশীয়ারে সাঁয়রে পিয়ারে ইত আউরে"।[১৫] এক মুসলমান মহিলাকবি অতি চমৎকারভাবে বলিয়াছেন :

নন্দকে কুমার কুরবান তেরী সুরতপৈ।
হোঁ তো মুগলানী হিন্দুয়ানী হৈব রহুঁসী মৈ ॥[১৬]

কোন কোন মুসলমান কবি বাহ্যিক ধর্মীয় আচরণ ত্যাগ করিয়া প্রেমের মধ্যে সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন :

পূরব দিশা হরিকো বাসা পশ্চিম অলহ মুকামা।
দিলমেঁ খোজি দিলহিমে খোজো ইহৈ করীমা রামা ॥[১৭]

ঠিক ঐরূপ অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের বশবর্তী হইয়া অনেক বাঙালী মুসলমান কবি বৈষ্ণবভাবের পদ লিখিয়া বিচিত্র বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছেন। ইঁহারা পদকার হিসাবে এরূপ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন যে, প্রাচীন বৈষ্ণব পদসঙ্কলনেও ইঁহাদের দুই একটি পদ গৃহীত হইয়াছিল। প্রাচীন পদসংগ্রহে 'পদকল্পতরু' ও আধুনিক সংগ্রহ 'গৌরপদতরঙ্গিণী', (জগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত) 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' (সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত) রমণীমোহন মল্লিক সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' এবং ব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত চারিখণ্ডে প্রকাশিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' পুস্তিকাগুলিতে মোট ৪৩ জন মুসলমান কবির পদ প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য শ্রীহট্ট হইতে মুসলমান কবির অনেক বৈষ্ণবপদ সংগ্রহ করিয়া কিছুকাল পূর্বে 'বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি' পুস্তিকায় প্রাচীন

১৪ যেই নয়ন দেখিয়াছে শ্রীহরির রূপ, রহিম বার বার সেই নয়নের কাছে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দেয়।

১৫ হে নন্দকিশোর, চিত্তচোর, ময়ূরপাখার মুকুটধারী, আমার প্রিয় বংশীধর শ্যাম, তুমি একবার এদিকে এসো।

১৬ হে নন্দ দুলাল, তোমার অপরূপ রূপমাধুর্যের নিকট আমি আত্মবলিদান দিলাম। আমি তো মুসলমানী, তাহাতে কী? আমি হিন্দু নারী হইয়াই তোমার সেবা করিব।

১৭ পূর্ব দিকে হরির বাস, পশ্চিমে আল্লার মোকাম। হৃদয়ে খুঁজিয়া হৃদয়ের মধ্যেই খোঁজ। এইখানেই করীম ও রাম।

(অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের অনুবাদ অবলম্বনে)

ও আধুনিক মুসলমান কবিদের মধ্যে আরও ৫৯ জন কবির পদ উদ্ধার করিয়াছেন। অর্থাৎ অধ্যাপক ভট্টাচার্যের হিসাব মতে প্রাচীন ও আধুনিক বৈষ্ণব ভাবের মুসলমান কবিদের সংখ্যা অন্যূন ১০২ জন এবং তাঁহাদের পদের সংখ্যাও সাড়ে চারি শতের অধিক। পূর্বে আবদুল করীম সাহেব, রমণীমোহন মল্লিক, ব্রজসুন্দর সান্যাল এবং আধুনিক কালের অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের একটি অনালোচিত বিচিত্র দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

চৈতন্য ও চৈতন্যসম্প্রদায়ের প্রভাবে কিছু কিছু মুসলমান নিজ ধর্ম ত্যাগ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—এরূপ নানা কাহিনী বৈষ্ণব-জীবনীকাব্য ও সমাজকাহিনীতে বর্ণিত হইয়াছে। এই ঘটনাগুলির সত্যতায় সন্দেহ করিবার কারণ নাই। আধুনিক যুগে যখন মুসলমান কবির ভণিতায় রচিত এই সমস্ত বৈষ্ণবপদের প্রতি কাব্যরসিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, তখন অনেকে এই পদের অভিধা লইয়া কিঞ্চিৎ গোলে পড়িলেন। পদগুলি তো বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের রচনা, উহার রচনারীতি ও অন্তর্নিহিত ভক্তি তাহাই নির্দেশ করিতেছে। অথচ কবিগণ মুসলমান—ভণিতাই তাহার প্রমাণ। তাঁহারা রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গের জয়গান করিলেও কেহ কি আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছিলেন? যদি তাই হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা মুসলমান-নাম ভণিতায় ব্যবহার করিলেন কেন? সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, এই সমস্ত বৈষ্ণবপদকার মুসলমান কবিগণ রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্যবিষয়ক পদ লিখিলেও সামাজিক ও আনুষ্ঠানিকভাবে কেহ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেন নাই।

১২৯৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যার 'সাহিত্যে' বোধহয় সর্বপ্রথম 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি'—এই আখ্যা পাওয়া যাইতেছে।[১৮] পরে মুন্সি আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ, রমণীমোহন মল্লিক, ব্রজসুন্দর সান্যাল—সকলেই এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা বোধহয় বলিতে চাহিয়াছেন যে, এই সমস্ত কবি মুসলমান হইয়াও বৈষ্ণবভাবাপন্ন পদ রচনা করিয়াছিলেন। এক্রামুদ্দিন

---

১৮ এই সংখ্যায় ক্ষীরোদচন্দ্র রায় 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

সাহেব বলিয়াছিলেন যে, এই মুসলমান কবিগণ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন কিনা, তাহাতে সন্দেহ থাকিলেও ইঁহারা "বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা বলিয়া সাহিত্যজগতে বৈষ্ণবকবি নামে খ্যাত, সুতরাং আমরাও তাঁহাদিগকে উক্ত নামেই অভিহিত করিব।"[১৯]

আবদুল করীম সাহেব এই কবিদের ধর্মমত আলোচনা করিতে গিয়া কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছেন, "মুসলমান হইয়া আলীরাজা প্রভৃতি কবিগণ বৈষ্ণব কবিতা লিখিলেন কিরূপে বলা যায় না।"[২০] ব্রজসুন্দর সান্যাল এবিষয়ে বলিয়াছেন, "তাঁহাদের ধর্মমত কি ছিল তাহা অভ্রান্তরূপে জানিতে না পারিলেও তাঁহারা যে প্রভূতপরিমাণে বৈষ্ণবধর্মানুরাগী ছিলেন তাহাতে সংশয় করিবার কিছুমাত্র কারণ দেখা যায় না, এবং এইজন্যই আমরা তাঁহাদিগকে মুসলমান বৈষ্ণবকবি বলিয়া অভিহিত করিতে সাহসী হইলাম।"[২১] শুধু বৈষ্ণব পদ নহে, আলীরাজা শাক্তপদও লিখিয়াছিলেন।[২২] সৈয়দ মর্তুজা তো এক বিধবা ব্রাহ্মণীকে সাধন-সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিয়া তন্ত্রসাধনা করিতেন।[২৩] কাজে কাজেই মনে হয়, তাঁহারা প্রকাশ্যেই হিন্দু-ধর্মের কোন কোন শাখার প্রতি মমতা দেখাইতেন, সেইরূপ সাধনভজন করিতেন। সৈয়দ মর্তুজা যখন বলেন:

পার কর পার কর মোরে নাইয়া কানাই।
কানাই মোরে পার কর রে।

কিংবা নাসির মাহ্‌মুদের শ্রীহরির চরণ শরণ লইবার বাসনা—

নসির মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দানরি।

ইরফানের অন্তিম আকাঙ্ক্ষা—'শ্যামের চরণ যেন পাই।' লালমাহ্‌মুদের সেই বিখ্যাত উক্তি:

জন্ম নিয়া মুসলমানে বঞ্চিত হব শ্রীচরণে
আমি মনে ভাবি না একবার।
এবার লাল মামুদে হরেকৃষ্ণ নাম করেছে সার॥

---

১৯ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি, পৃ. ৮

২০ ব্রজসুন্দর সান্যালের 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' (আলীরাজা) পুস্তিকায় লিখিত করীম সাহেবের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২১ ঐ, ভূমিকা

২২ পরে উল্লিখিত হইয়াছে।

২৩ ব্রজসুন্দর সান্যাল—মুসলমান বৈষ্ণব কবি (১৩১১), ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

এই সমস্ত উদ্ধৃতি হইতে মনে হইতেছে, উল্লিখিত মুসলমান কবিদের অন্তরে বাস্তবিক কৃষ্ণভক্তির উদয় হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব কবি বা বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবি বলিতে বাধা নাই।

বাঙলার অধিকাংশ মুসলমান পূর্বে হিন্দুই ছিলেন। রাজধর্মের প্রভাব বা মোহ বা হিন্দুসমাজের সঙ্কীর্ণতা—যে কোন কারণেই হউক, কিছু সংখ্যক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও রাতারাতি হিন্দুসংস্কার ভুলিতে পারে নাই। কেহ বৈষ্ণব সাধক ও কবির আদর্শ নৈষ্ঠিকভাবে অনুসরণ করিয়া দীন-বৈষ্ণবের অনুরূপ আর্তিবশতই পদ লিখিয়াছেন, কেহ তন্ত্রযোগ অভ্যাস করিয়াছেন, কেহ-বা কালী-বিষয়ক গান লিখিয়াছেন। অর্জিত সংস্কার যত বড়ই হউক, পৈত্রিক সংস্কার সহজে বিস্মৃত হওয়া যায় না। প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্ন ভাবে তাহা ফুটিয়া ওঠে—সে কথা মুসলমান কবিদের বৈষ্ণব পদ-রচনাতেই বুঝা যাইতেছে। অবশ্য আধুনিক কালের মুসলমান লেখক ও সমালোচকগণ একথা ততটা মানিতে চাহেন না। তাঁহারা মনে করেন, মুসলমান কবিরা কবিত্বের অনুরোধে রাধাকৃষ্ণের রূপক গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সৈয়দ মর্তুজা, সালবেগ, নসির মাহ্‌মুদ প্রভৃতি পদকর্তাদের পদ সেরূপ সাক্ষ্য দেয় না। ধর্মমতে তাঁহারা যে বৈষ্ণবমতের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায় কি রূপে?[২৪]

মুসলমান কবিদের কোন কোন পদে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ এমনভাবে আছে যে, তাহাকে রূপক বলিয়া লঘু করা যায় না। কয়েকটি পদ হইতে মনে হয়, এই মুসলমান কবিরা তাঁহাদের ইসলাম ধর্মসংস্কার ছাড়িয়া হিন্দু বৈষ্ণব হইয়াই যেন রাধাকৃষ্ণের চরণে প্রণতি নিবেদন করিয়াছেন।

চাঁদ কাজী বলে বাঁশি শুনে ঝুরে মরি।
জীমু না জীমু না আমি না দেখিলে হরি॥

২৪ এক্রামুদ্দিন সাহেব 'বঙ্গ-সাহিত্যে মুসলমান কবি' (বীরভূমি—১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) প্রবন্ধে সৈয়দ মর্তুজার "পার কর পার কর মোরে নাইয়া কানাই" পদটি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ইহাতে বিশেষরূপে বৈষ্ণবমত ব্যক্ত হয় নাই—শুধু ভবপারাবার পার হইবার জন্য কবির সাধারণ আবেগই ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু এক্রামুদ্দিনের এ মন্তব্য গ্রাহ্য হইতে পারে না। মুসলমান কবিগণ এমন সমস্ত বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়াছিলেন যে, তাহাকে রূপকের আড়ালে লুকাইয়া কবির রচনা হইতে বৈষ্ণবভাবের প্রেরণা মুছিয়া ফেলিবার উপায় নাই।

ইহাতে তো প্রত্যক্ষ ভাবেই বৈষ্ণব আর্তি ধ্বনিত হইয়াছে। সৈয়দ মর্তুজার 'শ্যামবন্ধু চিতনিবারণ তুমি' পদটি যে "তাঁহার অনন্ত কৃষ্ণভক্তির পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই।"[২৫] সৈয়দ মর্তুজা যখন বলেন,

সৈয়দ মর্তুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিল তুয়া পায়ে
জীবন মরণ ভরি॥

তখন ইহাতে কি বৈষ্ণব মহাজনের প্রাণের বেদনা ফুটিয়া ওঠে না? সুতরাং কোন কোন মুসলমান কবি যে বিশুদ্ধ রূপে বৈষ্ণবমনোভাবের দ্বারা চালিত হইয়া বৈষ্ণব-পদাবলীর আদর্শে রাধাকৃষ্ণ পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের প্রায় সাড়ে চারিশত পদ হইতে ২৩-২৪টি পদ বাছিয়া লইয়া সেগুলিকে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবপদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ এই সমস্ত পদে আগাগোড়া রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে এবং কোথাও ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কোন নির্দেশ বা ইঙ্গিত নাই। কবীরের[২৬] বসন্তলীলার বর্ণনা:

বরজাকিশোরী কান্ত খেলত রঙ্গে।
চুয়াচন্দন আবীর গোলাব[২৭]
দেয়ত শ্যামের অঙ্গে॥
ফাগু হাতে করি ফিরত শ্রীহরি
ফিরি ফিরি খেলত রাই।
ঘুংঘট উঠায়ে বয়ান ছাপায়ত
বেরি বেরি যৈছে মেঘসেঁ চাঁদ লুকাই॥
ললিতা এক সখী ফাগু হাতে করি
দেয়ত কানু নয়ান।

---

২৫ সতীশচন্দ্র রায় সঙ্কলিত 'পদকল্পতরু'র ৫ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২৬ ইঁহার পরিচয় জানা যায় না। কিন্তু জগবন্ধু ভদ্র সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'গৌরপদ তরঙ্গিণী', রমণীমোহন মল্লিকের 'মুসলমান বৈষ্ণবকবি' এবং ব্রজসুন্দর সান্যালের উক্ত নামীয় পুস্তিকার ৪র্থ খণ্ডে ইঁহার পদ গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং কবিকে খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হইতেছে না।

২৭ মুসলমান কবি বৈষ্ণবসাহিত্যে ইরাণীগুল্ গোলাপের প্রবেশাধিকার দিয়াছেন, এ তথ্যটি কৌতূহলজনক।

বৃষভানু কিশোরী দুহুঁ বাহু ধরি
মারত শ্যাম বয়ান ॥

ইহা তো যে-কোন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব কবির দোললীলার সার্থক পদ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। সুতরাং মুসলমান কবিগণ যখন পদাবলীর বিভিন্ন পদ-পর্যায় ধরিয়া পদ রচনা করিয়াছেন, তখন তাহাতে হিন্দু বৈষ্ণব কবিদের অনুরূপ মনোভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মনে করেন যে, যে সমস্ত হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তাঁহারা বাহিরে স্বধর্মত্যাগ করিলেও অন্তরশায়ী হিন্দুসংস্কার পুরাপুরি ত্যাগ করিতে পারেন নাই।[২৮] "এই শ্রেণীর মুসলমানেরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীকে প্রায়শঃ স্বীকার করেন নাই। স্বীকার করিয়াছেন—প্রেমিক-প্রেমিকার মূর্ত প্রতীক রাধাকৃষ্ণকে। ইঁহারা কৃষ্ণ বলিতে গীতার কৃষ্ণকে জানেন না, জানেন রাধাবন্ধু কৃষ্ণকে।[২৯] এই রাধাকৃষ্ণ আবার অধিকাংশ মুসলমান কবিদের নিকট অপৌরুষেয়। ইঁহারা বৃষভানুনন্দিনী বা যশোদানন্দন নহেন।"[৩০] মৌলবী এক্রামুদ্দিন এবং আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ মুসলমানের বৈষ্ণবধর্মে-প্রীতি ও রাধাকৃষ্ণকে ইষ্টরূপে গ্রহণের ব্যাপারটিকে বেশ মন খুলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি পূর্বপাকিস্তানে পূর্ববঙ্গের মুসলমান কবিদের আলোচনা প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ ইসলামী তমদ্দুনে বিশ্বাসী আধুনিক মুসলমান গবেষকও এই ব্যাপারকে অনগ্রসর মুসলমান সমাজের কুসংস্কার বলিয়াই রায় দিয়াছেন।[৩১] কিন্তু এই

২৮ রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয়: "এদেশের অধিকাংশ মুসলমানই বংশগত জাতিতে হিন্দু, ধর্মগত জাতিতে মুসলমান।"—মুহম্মদ মনসুরুদ্দিনের 'হারামণি' নামক বাউল গানের সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা।

২৯ অবশ্য কৃষ্ণের এই মূর্তিই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আরাধ্য; গীতার পার্থসারথি নহেন।

৩০ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—বাঙলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি, পৃ. ২। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের এই মন্তব্য ঠিক নহে। কারণ অনেক মুসলমান বৈষ্ণব কবি বৃষভানুনন্দিনী রাধা ও গোপনন্দন কৃষ্ণের উল্লেখ করিয়াছেন।

৩১ অনেক মুসলমান লেখক মনে করেন, বাঙলার বৈষ্ণবপদাবলীর সবটাই সুফী মতের দান। ডঃ এনামুল হক *Muslim Bengali Literature*-এ এই সম্পর্কে বলিয়াছেন—"The 'Ashiq' and 'Mashuq' of the Sufis have transformed into the 'Radha' and 'Krishna' of the Vaishnavas". হুমায়ুন কবীর সাহেবও তাঁহার

সমস্ত পদে যে ভাবে বৈষ্ণবপদাবলীর স্থান ও ব্যক্তির পরিচয় (বৃন্দাবন, যমুনা, মথুরা, রাধা, কৃষ্ণ, বৃকভানু, ললিতা) আছে এবং কবিগণ যেভাবে রাধাকৃষ্ণের চরণে নিজ নিজ অন্তরের আকুতি নিবেদন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের বৈষ্ণব কবি না বলিয়া আর কোন্ নামে অভিহিত করা যাইবে?

অবশ্য এই সমস্ত মুসলমান বৈষ্ণব কবি এমন অনেক পদ লিখিয়াছিলেন যাহাতে 'রাধা-কৃষ্ণ' শব্দ রূপকার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কেহ-বা সূফী আদর্শেও রাধাকৃষ্ণ পদাবলী ব্যবহার করিয়াছেন। আবার কোন কোন পদকার রাধাকৃষ্ণকে জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপকরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। সৈয়দ শাহানূর বলিয়াছেন, আপনার তনুতেই রাধাকানু বিরাজ করিতেছেন—"তন্ রাধা মন কানু শাহানূরে বলে।" আর একস্থানে তিনি বলিতেছেন, "রাধাকানু এক ঘরে কেহ নহে ভিন।" বাসন উদাস আবার বলিয়াছেন, "আমি রাধা, আমি কানু, আমি শিবশঙ্করী।" কবি সূফী মতের আদর্শে কখনও ভগবানকে প্রিয়ারূপে দেখিয়াছেন—

হিন্দুরে বলে তোমার রাধা, আমি বলি খোদা।
রাধা বলিয়া ডাকিলে মুল্লা মুন্সিতে দেয় বাধা॥

মোল্লামুন্সিতে বাধা দেয় বলিয়া কবি তাঁহার ইষ্টদেবাকে রাধা বলিয়া ডাকিতে ভয় পান। তাই তিনি তাঁহাকে খোদা বলেন। এই স্বীকারোক্তিটুকু বিশেষ মূল্যবান, এবং এখানে কবি যে সূফীমতের দৃষ্টিকোণ হইতে রাধাকে দেখিয়াছেন, তাহাও লক্ষণীয়। কারণ সূফীমতের ঈশ্বর হইতেছেন প্রেমিকা—'আসেক', আর ভক্ত হইতেছেন প্রেমিক—'মাশুক'। এক শ্রেণীর সূফী মতাবলম্বী মুসলমান সাধক রাধাকৃষ্ণকে সূফীসাধনার রূপক হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'হকিকত সিতারা'র তত্ত্বরসিক কবি আরকুম বলেন—

তুমি আসিক, তুমি মাশুক, তুমি রাজা প্রজা।
তুমি দেবতা, তুমি ফুল, তুমি কর পূজা॥

'বাঙলার কাব্যে' প্রায় এইরূপ মতই ব্যক্ত করিয়াছেন। ডঃ হক মুসলমান বৈষ্ণব কবি সম্বন্ধে বিচিত্র মত জ্ঞাপন করিয়াছেন, "The Muslims used to study Sufi Literature, they did not become Muslim Vaishnava poets; they remained Muslim poets, only composed songs in the Vaishnava style.' (Ibid) এই সমস্ত উক্তি হইতে দেখা যাইতেছে প্রতিভাবান মুসলমান পণ্ডিতগণও সাহিত্যবিচারে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বিসর্জন দিতে পারেন নাই। বলাই বাহুল্য, এ জাতীয় মন্তব্য যুক্তিহীন ও তথ্যবিরোধী।

ইহা সূফীমতের শেষ কথা—বিশুদ্ধ ভূমানন্দময় অদ্বৈতানুভূতি, উপাস্ত-উপাসকের অভেদত্ব—ইহাকেই সূফী সাধক বলিয়াছেন 'ফনা', পরিচ্ছিন্ন আত্মার আবরণ-ভঙ্গ।

অনেক মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণের মধ্যে নিজ নিজ অধ্যাত্মপ্রেরণার উৎস আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা যদি শুধু রূপকার্থে বা লৌকিক অর্থে সূফীমত অনুশীলন করিতেন, তাহা হইলে লায়লা মজনু, শিরি-ফরহাদ প্রভৃতি ইসলামী রূপক গ্রহণ করিলেই পারিতেন। শ্রোতৃসমাজ হিন্দু বলিয়াই তাঁহারা যে রাধাকৃষ্ণের রূপক গ্রহণ করিয়াছেন তাহা যথার্থ বলিয়া মনে হয় না।[৩২] কারণ তাঁহারা নিজ নিজ অন্তরের অবাধ আবেগ ও প্রেম-ভক্তিকে যেভাবে একান্ত আত্মগতভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা যে কাহারও মুখ চাহিয়া এইরূপ পদ লিখিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। তাঁহারা সূফী মতাবলম্বী হইলেও হিন্দুর রাধাকৃষ্ণকে নিজ নিজ অধ্যাত্ম অনুভূতির রূপক হিসাবে গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, বা ইহাকে গুনাহ্ মনে করেন নাই। অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এ বিষয়ে বলিয়াছেন, "এই সকল কবিদের পক্ষে সময়ের প্রভাব অতিক্রম করা সম্ভব হয় নাই বলিয়াই ইঁহারা বৈষ্ণবভাবে খানিকটা অনুপ্রাণিত হইয়া রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় পদ রচনা করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছেন।"[৩৩] যাঁহারা সূফী মতে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁহাদের সম্পর্কে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের এই মন্তব্য প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা যে-জাতীয় বৈষ্ণবপদের উদাহরণ দিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে, মুসলমান কবিগণ যথার্থই বৈষ্ণব মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। এমন কি কেহ কেহ চৈতন্যভক্তরূপে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদও লিখিয়াছিলেন। আকবরের[৩৪]

জীউ জীউ মেরে মনচোরা গোরা।
আপহি নাচত আপন রসে ভোরা॥
* * * *

---

৩২ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—বাঙলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি, পৃ. ৩

৩৩ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের ঐ পুস্তিকা, পৃ. ৩

৩৪ কেহ কেহ এই পদকর্তাকে বাদশাহ্ আকবর বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহা সন্দেহ-জনক।

ঐছন পহুঁকে বাহু বলিহারী।
সাহ আকবর তেরে প্রেম-ভিখারী॥

অথবা লালন ফকিরের

আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা।
মুড়িয়ে মাথা গলে কাঁথা কটিতে কৌপীন ধরা।

কিংবা লাল মামুদের

সোনার মানুষ নদে এল রে।
ভক্ত সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে
ভাসিছে শ্রীবাসের ঘরে॥

হুসেনের সেই বিখ্যাত পদ

গোরাচান্দ আমার।
তোমার লাগি আমি ঘরের বার॥

এই পদগুলি হইতে কবিদিগকে বিশেষভাবে গৌরাঙ্গ-ভক্ত বলিয়াই মনে হয়। অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মুসলমান কবিদের রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কোন কোন পদকে বৈষ্ণবভাবদ্যোতক বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত না হইলেও যে সমস্ত গৌরাঙ্গবিষয়ক পদকর্তা মুসলমান, তাঁহাদিগকে অধ্যাপক ভট্টাচার্য বৈষ্ণব বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন—এ বিষয়ে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত।[৩৫] যাহা হউক এখানে মধ্যযুগীয় কয়েকজন প্রসিদ্ধ মুসলমান কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

ব্রজসুন্দর সান্যাল, রমণীমোহন মল্লিক, মুন্সি আবদুল করীম সাহিত্য-বিশারদ এবং আধুনিককালে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বহু সন্ধান করিয়া মুসলমান কবিদের যে সমস্ত বৈষ্ণব পদ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা সাড়ে চারি শতের মতো এবং মধ্যযুগের ঐরূপ কবির সংখ্যাও

৩৫ "গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রাণপুরুষ চৈতন্যদেবকে যাঁহারা বন্দনা করিয়াছেন, চৈতন্যদেবের প্রতি যাঁহারা আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবভাবাপন্ন ব্যতীত আর কি বলিব? কৃষ্ণলীলার পদসমূহকে কোন কোন স্থলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপক বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু গৌরলীলার জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপকের বিশেষ অবকাশ নাই। গৌরলীলা পদরচক মুসলমান কবিদিগকে বৈষ্ণবভাবাপন্ন না বলিবার মত কোন যুক্তিই পাইতেছি না।... এই সকল গৌরলীলা পদ আনুষ্ঠানিক কীর্তনে 'গৌরচন্দ্রিকারূপে' গীত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত এবং পদকর্তাগণ গৌরভক্ত সংজ্ঞার সম্পূর্ণ অধিকারী।"—ঐ পুস্তিকা, পৃ. ২৯

শতাধিক হইবে।[৩৬] অবশ্য এই কবিদের সকলেই মধ্যযুগের নহেন, কেহ কেহ অর্বাচীন কালেরও অন্তর্ভুক্ত হইবেন। যাহা হউক আলোচনা সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য আমরা এখানে কয়েকজন প্রধান মুসলমান বৈষ্ণব কবির উল্লেখ করিতেছি।

দৌলত কাজী ও আলাওল ॥

দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল আখ্যানকাব্য লিখিলেও রচনার ফাঁকে ফাঁকে যে-সমস্ত বৈষ্ণবপদ লিখিয়াছেন তাহা প্রশংসার যোগ্য। দৌলত কাজী তাঁহার 'লোর-চন্দ্রানী'তে ব্রজবুলিতে যে কয়টি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার রচনাভঙ্গিমা প্রশংসার যোগ্য হইলেও সেগুলিকে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবপদ বলা যায় না। নায়িকা ময়নার বারো মাসের দুঃখ বর্ণনায় কবি ইচ্ছা করিয়াই ব্রজবুলির সাহায্য লইয়াছেন, এবং সেই সমস্ত স্থলে বৈষ্ণবপদের বাহ্যিক কাঠামোটি অনুসরণ করিয়াছেন। বর্ষাবিরহ বর্ণনায় কবি যখন বলেন :

যার ঘরে কান্ত সব সোহাগিনী
পুরএ মনোরথ কাম।
দুর্লভ বরিষা তামসী রজনী
নির্জন সঙ্কেত ঠাম॥
দারুণ ডাউক দাদুরী ময়ুর
চাতক নিনাদে ঘন।
তা ধ্বনি শুনিতে শ্রবণে বিরহিনী
ছোহএ মনে মদন॥

অথবা

শুনহ উকতি করহু ভকতি
মানহ সুরতি বাই।

৩৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'পুথি-পরিচিতি'-তে মুসলমান কবিদের বৈষ্ণবপদ সম্বন্ধে দুই একখানি ব্যতীত বিশেষ কোন পুঁথির উল্লেখ নাই। সম্পাদক মুসলমান কবি-দের ইসলামসংস্কৃতিবহ পুঁথিরই বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদগুলিকে তিনি জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। কমর আলীর রাধার বারমাস্যা সংক্রান্ত পুঁথিটিকে (পুঁথি সংখ্যা—৩০১) তিনি "বড়ঋতুর পরিপ্রেক্ষিতে রাধার বিরহ সঙ্গীত তথা রাধার রূপকে জীবাত্মার বিরহসঙ্গীত" বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। (পুথি-পরিচিতি, পৃ. ৩১৩)

নাগর সুজন মিলাইয়া দেউ
রাধার কোলে কানাই॥

তখন তাহাতে রাধার-ব্যথাই ময়নার বিরহবেদনাকে আবেগব্যাকুল করিয়া তোলে। অবশ্য দৌলত কাজী বিশুদ্ধ রোমান্টিক আখ্যানকাব্য লিখিয়াছিলেন। তাঁহার দুইচারিটি পদে বৈষ্ণবপদাবলীর কবিভাষা অনুসৃত হইলেও ভাবের দিক দিয়া তিনি সে পথের পথিক ছিলেন না।

সৈয়দ আলাওল তাঁহার কাব্যের কোন কোন স্থলে বৈষ্ণবপদাবলীর অনুকরণে পদ লিখিয়াছিলেন। ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' পুস্তিকার ৩য় খণ্ডে আলাওলের পাঁচটি পদ উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার দুইটি পদ পদাবলী সাহিত্যে সুপরিচিত :

(১) ননদিনী রসবিনোদিনী তোর কুবোল সহিতাম নারি॥ ধ্রু॥
ঘরের ঘরনী জগতমোহিনী
প্রত্যুষে যমুনায় গেলি।
বেলা অবশেষে নিশি পরবেশে
কিসে বিলম্ব করিলি॥
প্রত্যুষে বিহানে কমল দেখিয়া
পুষ্প তুলিবারে গেলুং।
বেলা উদানে কমল মুদনে
ভ্রমর দংশনে মৈলুং॥

(২) আহা মোর বিদরে পরাণ।
জাগিতে স্বপন দেখি ভূমে নাহি আন॥
কি জানি লিখিছে বিধি এ পাপ করমে।
পাইয়া পরশমণি হারাইলুঁ ভ্রমে॥
সে সব মনের দুঃখ কাহাকে কহিব।
ব্যথিত বান্ধবকুল স্মরিতে মরিব॥

এই সমস্ত পদে কবির রচনাশক্তির প্রশংসা করিতে হইবে। কিন্তু বৈষ্ণবপদের অন্তর্লীন ভক্তির গভীরতা, যাহা আলীরাজা, সৈয়দ মর্তুজা প্রভৃতি ভক্তকবিদের পদে পাওয়া যায়, আলাওলের পদে সেইরূপ প্রাণের গভীর অনুভূতির অভাব আছে। কবি যেন রুচির বৈচিত্র্যের অনুরোধে বৈষ্ণব পদাবলীর ঢঙে কবিতা লিখিয়াছিলেন, আন্তরিক প্রেরণার বশে নহে।

দৌলত কাজীর পদও এই প্রকার, কিন্তু তাঁহার রচনাকৌশল আলাওল অপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্ব দাবি করিতে পারে।

সৈয়দ মর্তুজা ॥

মর্তুজার একটি পদ (পদকল্পতরু—২৯৫৭)—'শ্যামবন্ধু চিতনিবারণ তুমি' 'পদকল্পতরু'তে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রাচীন বৈষ্ণবসমাজ এই মুসলমান পদকর্তার নাম জানিতেন। আধুনিক কালে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৩৭] মর্তুজা ভণিতায় রাধাকৃষ্ণবিষয়ক মোট ২৮টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২২টি পদ ব্রজসুন্দর সান্যালের 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' (৩য় খণ্ড) পুস্তিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। 'পদকল্পতরু' ধৃত সুপরিচিত পদটি পশ্চিমবঙ্গে সংগৃহীত হয়, কিন্তু কবির আর সমস্ত পদ চট্টগ্রামের রাগ ও তাল শিখিবার পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। এইজন্য আবদুল করীম সাহেব দুইজন মর্তুজার কথা বলিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসকার নিখিল নাথ রায় সর্বপ্রথম বলেন যে, মুর্শিদাবাদে সৈয়দ মর্তুজা নামক এক উদাসীন ভক্তদরবেশ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।[৩৮] তাঁহার সংগৃহীত তথ্যানুসারে মনে হয়, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সৈয়দ মর্তুজা মুর্শিদাবাদে ভক্ত ও ফকির বলিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ বাঙালী নহেন। উত্তর প্রদেশের বেরিলী জেলায় তাঁহাদের আদিনিবাস। মর্তুজার পিতা সৈয়দ হাসেনই বোধহয় পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করেন। তিনিও পরিব্রাজক ফকির ছিলেন। মর্তুজাও ফকিরের বেশে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। জঙ্গীপুরের চড়কা নামক স্থানে তিনি রাজাক নামে এক পীরের শিষ্য হন এবং উহার নিকটবর্তী অঞ্চল ছাপাঘাটিতে

---

৩৭ পদকল্পতরু-সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় 'পদকল্পতরু'র ৫ম খণ্ডে মর্তুজা সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য সরবরাহ করিতে পারেন নাই। তিনি শুধু এইটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, "এই মুসলমান পদকর্তার কোন পরিচয়ই আজ পর্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই।...পদকর্তা নসির মামুদের ন্যায় ইনিও সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গবাসী কবি হইবেন।"

৩৮ সেই প্রবন্ধটি 'সুধা' মাসিকপত্রে (১ম বর্ষ, মাঘ সংখ্যা) প্রকাশিত হয়। ব্রজসুন্দর সান্যাল তাঁহার 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' (৩য় খণ্ড) পুস্তিকায় নিখিলনাথ পরিবেশিত তথ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

আস্তানা নির্মাণ করিয়া কিছুকাল বসবাস করেন—সেখানে এখনও তাঁহার সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। রজব মাসে আউলিয়া ও ফকিরগণ তাঁহার সমাধি পার্শ্বে সমবেত হইয়া মর্তুজার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকেন। মর্তুজা সম্বন্ধে স্থানীয় অনেক অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁহাকে সিদ্ধ সাধক বলিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা করেন। তিনি মুসলমান হইয়াও তন্ত্র ও বৈষ্ণবতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি নাকি আনন্দময়ী নাম্নী এক ব্রাহ্মণীকে ভৈরবী করিয়া তাঁহার সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনা করিতেন। আনন্দময়ী ও মর্তুজাকে জড়াইয়া সকলে 'মর্তুজানন্দ' বলিত, মুসলমানেরা বলিত 'মর্তুজাহিন্দ'। মর্তুজার সমাধি পাশেই নাকি আনন্দময়ীর সমাধি আছে। তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রীর নাম নেজাম বিবি। নিখিলনাথ রায়ের মতে 'পদকল্পতরু' ধৃত পদটি এই মর্তুজা রচিত।

করীম সাহেব আর এক মর্তুজার সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহার পদসমূহ চট্টগ্রাম হইতে পাওয়া গিয়াছে। ইনি যদি নিখিলনাথ রায় কথিত মর্তুজা হইতেন, তাহা হইলে পদকল্পতরুর পদটি চট্টগ্রামেও পাওয়া যাইত, এবং চট্টগ্রামে প্রাপ্ত পদগুলির দুই একটি হয় 'পদকল্পতরু'তে, আর না হয় মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে লোকমুখে মিলিত। কারণ চট্টগ্রামের পদগুলির মধ্যে কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ আছে, যাহা কাব্যগুণে 'পদকল্পতরু'র পদ অপেক্ষা কোন দিক দিয়াই ন্যূন নহে। তাই করীম সাহেব এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 'পদকল্পতরু'র পদটির কয়েক পংক্তি :

শ্যামবন্ধু চিতনিবারণ তুমি।
কোন শুভদিনে দেখা তোমা সনে
পাসরিতে নারি আমি॥
যখন দেখিয়ে এ চাঁদ বদনে
ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আনচান
দণ্ডে দশবার মরি।
মোরে কর দয়া দেহ পদছায়া
শুনহ পরাণকানু।
কুলশীল সব ভাসাইনু জলে
প্রাণ না রহে তোমা বিনু॥

পরিশেষে কবি বৈষ্ণবপদকর্তাদের মতো ভণিতা দিয়া বলিতেছেন :

সৈয়দ মর্তুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রৈলুঁ তুয়া পায়ে
জীবনমরণ ভরি॥

চট্টগ্রামে প্রাপ্ত পদগুলির ভাষা ও ভক্তির ঐকান্তিকতা প্রায় একই রূপ। যেমন :

(১) পার কর পার কর মোরে নাইয়া কানাই।
কানাই মোরে কর পার॥
ঘাটের ঘাটিয়াল কানাই পন্থের চৌকিদার
নয়ালি যৌবন দিমু খেয়ার পাই পার॥

(২) সুন্দরী তুমি নাগর ভুলাইতে জান।
আড় নয়ন কোণে হানিলে মদনবাণে
জীউ ধরিয়া মোরে টান॥
একে তোমার গোরা গা না সহে ফুলের ঘা
বায় হেলিছে সব অঙ্গ।
দেখিয়া তোমার মুখ অন্তরে বিদরে বুক
দানসাগরে উঠে রঙ্গ॥

* * * * *

সৈয়দ মর্তুজা বাণী শুন রাধা ঠাকুরাণী
ধনি ধনি তোমার জীবন।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর যাঁরে ভাবে নিরন্তর
সে তোমার কেবল শরণ॥

(৩) বন্ধু আমার কালিয়া সোনা।
স্বপনে পাইলাম বন্ধু করিয়া কামনা॥
স্বপনে বন্ধুর সনে দরশন ভেল।
উলটি পাষাণ দিতে বন্ধু কোন দেশে গেল॥

'পদকল্পতরু'র পদ এবং উল্লিখিত তিনটি পদ একই কবির রচনা বলিয়াই মনে হইতেছে—নূতন কোন তথ্য না পাইলে এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা করা যাইবে না। যাহা হউক মর্তুজার স্বতোৎসারিত ভাবগর্ভ কবিত্বশক্তি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। শব্দযোজনা, বাকরীতি, রূপনির্মিতি ও আবেগ—শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার প্রত্যেক বৈশিষ্ট্য তাঁহার পদে মিলিবে। বিশেষতঃ তাঁহার

সর্বসমর্পণমূলক আত্মনিবেদনটি বৈষ্ণবীয় দীনতায় অপূর্ব সাত্ত্বিক শ্রী ধারণ করিয়াছে। আবদুল করীম মর্তুজার কবিত্ব সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন—"মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে আমার মতে সৈয়দ মর্তুজাই সর্বশ্রেষ্ঠ।"[৩৯]

নসির মামুদ ॥

নসির মামুদের একটি পদ 'পদকল্পতরু'তে (পদসংখ্যা-১৩২৯) এবং আর একটি পদ রমণীমোহন মল্লিকের 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' পুস্তিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এই কবির বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, ইনি নাকি সুলতান হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ।[৪০] এ বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং তাঁহার আবির্ভাবকাল বা অন্য কোন পরিচয় সংগ্রহ করা যায় নাই। তবে অনুমান হয়, কবি সপ্তদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে বর্তমান ছিলেন, কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সঙ্কলিত 'পদকল্পতরু'তে কবির একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই উৎকৃষ্ট পদটি শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা বিষয়ক। পদটি শুনিলেই গোক্ষুর-রেণুরঞ্জিত বৃন্দাবনের গোচারণ ভূমিটি শ্যাম ও শ্যামসখাদের কলরবে যেন মুখর হইয়া ওঠে। যথা:

ধেনুসঙ্গে গোঠে রঙ্গে,
খেলত রাম সুন্দর শ্যাম,
পাঁচনি কাঁচনি বেত্র বেণু
মুরলী খুরলী গানরি।
প্রিয়দাম শ্রীদাম সুদাম মেলি
তপনতনয়া তীরে কেলি
ধবলি সাঙলি আওবি আওবি
ফুকারি চলত কানরি॥

ভণিতাটিও কবির ভক্ত মনকে প্রকাশ করিয়াছে:

আগম নিগম বেদ সার,
লীলায় করত গোঠ বিহার,
নসির মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দানরি॥

৩৯ ব্রজসুন্দর সান্যালের 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' (৩য়), ভূমিকা
৪০ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—বাঙলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি

শেষ পংক্তিতে কবির হৃদয়ধর্ম ধরা পড়িয়াছে। ভাষার দ্বারা এমন চিত্ররূপ সৃষ্টি কবিকৃতির প্রশংসনীয় স্মারক চিহ্ন। দুঃখের বিষয় এই কবি সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই, দুইটি ব্যতীত তাঁহার আর কোন পদেরও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

আলীরাজা॥

প্রসিদ্ধ দরবেশ-কবি এবং হিন্দুর যোগতন্ত্রাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ আলীরাজার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পদ সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে আবদুল করীম সাহেব কিছু কিছু তথ্যও সংগ্রহ করিয়াছেন। আলীরাজা সাধারণতঃ ওয়াহেদ কানু বা কানুফকির নামে পরিচিত। ইনি চট্টগ্রামের বাঁশখালি থানার অন্তর্গত ওশাইন গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩১১ সনের দিকে করীম সাহেব জানাইয়াছিলেন যে, আলীরাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্ফৎ মিঞা ঐ সনের চারি পাঁচ বৎসর পূর্বে প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন। সুতরাং অনুমান সর্ফৎ মিঞার জন্ম হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে। ইহা হইতে মনে হইতেছে তাঁহার পিতা আলীরাজা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার দুই স্ত্রী, তিন পুত্র। পুত্রেরাও ভক্ত ও কবি ছিলেন। আলীরাজা সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়াও নিরাসক্ত যোগীর মতো ফকিরি অবলম্বন করিয়াছিলেন। সাধনমার্গে তিনি বৈষ্ণব, তন্ত্র, যোগ ও সূফী সাধনার আশ্চর্য সমন্বয় করিয়াছিলেন। তাঁহার হিন্দু মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়েরই অনেক শিষ্য ছিল। কবির গুরুর নাম দরবেশ কেরামুদ্দিন। কবি বাহ্যতঃ দরবেশ-পন্থা অনুসরণ করিলেও অন্তরে অন্তরে ছিলেন উদারপ্রাণ ভক্ত—হিন্দু-মুসলিম সাধনার সংযুক্ত প্রতীক। তাঁহার নামে সাধনভজন সংক্রান্ত কয়েকখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে পাঁচখানির নাম উল্লেখযোগ্য—(১) জ্ঞানসাগর, (২) সিরাজকুলুপ, (৩) ধ্যানমালা, (৪) যোগকালান্দর, (৫) ষটচক্রভেদ।

'জ্ঞানসাগর'[৪১] পুস্তিকাটি ইসলামী তত্ত্বকথায় পূর্ণ হইলেও কবি যে হিন্দুর আগম-নিগম, যোগ ও তন্ত্র সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, তাহা এই পুস্তিকা হইতেই জানা যাইতেছে। করতার, নিরঞ্জন, আল্লারসুল এবং মোহম্মদ ও

৪১ মুন্সি আবদুল করীম সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত (১৩২৪)

অন্যান্য নবীদের বর্ণনা ও দার্শনিক ও তাৎপর্য, বিশ্ব ও বিশ্ববিধান ইত্যাদি নানা তত্ত্বকথা দার্শনিক ও তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টিতে কবি আলোচনা করিয়াছেন। কোথাও তিনি কোরানের বিশুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্বের পটভূমিকায় বলিয়াছেন :

এক কায়া এক ছায়া নাহিক দোসর।
এক তন এক মন আপে একেশ্বর॥
ত্রিজগত এক কায়া এক করতার।
এক প্রভু সেবে জপে সব জীবধর।
প্রভু মূল হএ বৃক্ষ ডাল মোহাম্মদ।
ফলফুল হএ নর পাত সে জগত॥

আবার কোথাও কোথাও হিন্দুর যোগদর্শনের গূঢ় কথা হিন্দুর মন লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন :

শূন্যেত পরমহংস শূন্যে ব্রহ্মজ্ঞান।
যথাতে পরম হংস তথা যোগধ্যান॥
যে জানে হংসের তত্ত্ব সেই সার যোগী।
সেই সব শুদ্ধ যোগী হএ শূন্য ভোগী॥[৪২]

অসাম্প্রদায়িক কবি আদম-হবা (ইভ্), মহাদেব-গৌরীগঙ্গা, আয়েসা-মোহম্মদ প্রভৃতিকে প্রেমরসে নিমজ্জিত করিয়াছেন। কবি 'জ্ঞানসাগরে'র বহু স্থলে সহজিয়া বৈষ্ণবধরনের প্রেমরস[৪৩] ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কোথাও-বা পরকীয়া প্রেমতত্ত্বও গ্রহণ করিয়াছেন,[৪৪] এমন কি উল্টাসাধন, চন্দ্রসাধন প্রভৃতি গুহ্যাতিগুহ্য সহজিয়া সাধন-সংক্রান্ত তত্ত্বকথাও তিনি 'জ্ঞানসাগরে'

---

৪২ কবি প্রাণায়াম তত্ত্বও জানিতেন :

মিশাই পরম হংস পবনের সনে।
পূরক রেচক সঙ্গে হৃদের কম্পনে॥
পূরক রেচক সঙ্গে রাখি মহাহংস।
এক যুগ সাধনে সে শরীর নহে ধ্বংস॥

৪৩ প্রেমানন্দ সিংহাসন প্রেমরস বৃন্দাবন
প্রেমানন্দ অমৃত লহর।
প্রেমানন্দ তরুমূল প্রেমানন্দ ফলফুল
প্রেমানন্দ রস মধুকর॥

৪৪ স্বকীয়ার সঙ্গে নহে অতি প্রেমরস।
পরকীয়া সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মানস॥

ইঙ্গিতে বলিয়াছেন।[৪৫] মাঝে মাঝে কবি আল্লারসুল, ফতিমাজননী, আছবা-গণ (হজরত মহম্মদের অনুচর) এবং অন্যান্য নবীদের কথা বলিলেও যোগ-তন্ত্র-হঠযোগ-বাউল-সহজিয়া বৈষ্ণব প্রভৃতির গুহাহিত কায়াসাধনা, প্রেম ও মুক্তি ইত্যাদি প্রসঙ্গই 'জ্ঞানসাগরে'র বারো আনা অংশ অধিকার করিয়া আছে। তিনি স্বয়ং ফকির বা দরবেশ ছিলেন, কিন্তু হিন্দুর যোগ ও তন্ত্রানুযায়ী তিনি সাধনভজন করিতেন বলিয়া মনে হয়; তা' না হইলে 'জ্ঞানসাগরে' তিনি এত ঘনঘন যোগ ও তন্ত্রের পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ করিতেন না।[৪৬] তাঁহার 'যোগ-কালান্দর,' 'সিরাজকুলুপ' ও 'ষটচক্রভেদ' (পাওয়া যায় নাই) যে যোগতন্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে বাঙলা দেশে একদল মুসলমান পরিব্রাজক উদাসীন দরবেশের বেশ গ্রহণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহাদের অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া হিন্দু মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ই তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। সূফী মতের সঙ্গে বৈষ্ণব সহজিয়া, যোগ-হঠযোগ ও তন্ত্রের সংমিশ্রণে ইঁহারা এক প্রকার কায়াকেন্দ্রিক প্রেমধর্ম অনুসরণ করিতেন, যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান—উভয় সংস্কৃতি ও ধর্মসাধনার প্রভাব ছিল। আলীরাজার উক্ত পুস্তিকাগুলি তাহার সার্থক দৃষ্টান্ত।

কবি আলীরাজার প্রধান খ্যাতি নির্ভর করিতেছে তাঁহার পদাবলীর উপর। তিনি যে একজন প্রতিভাধর পদকর্তা তাহাতে দ্বিমতের অবকাশ নাই, সঙ্গীতকলা সম্বন্ধেও তিনি বেশ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার 'ধ্যানমালা' রাগতালের গ্রন্থ। কিন্তু তাঁহার ভণিতায় যে সমস্ত বৈষ্ণব ও শাক্ত পদ পাওয়া গিয়াছে তাহার কাব্যমূল্য ও ভক্তিরস বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহার নামে অর্ধশতের অধিক বৈষ্ণব পদ পাওয়া গিয়াছে, তিনি দুই একটি শাক্ত পদও লিখিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ পদ ব্রজসুন্দর সান্যালের 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' পুস্তিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল, আবদুল করীম

---

৪৫ মুদ্রিত 'জ্ঞানসাগরের' ৯১-৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪৬ 'জ্ঞানসাগরে'র ভূমিকায় সম্পাদক করীম সাহেব "জ্ঞানসাগর প্রভৃতি হইতে তাঁহার (অর্থাৎ কবির) স্বধর্মানুরাগের" পরিচয় পাইয়াছেন। এই তত্ত্বগ্রন্থে ইসলামধর্মের প্রসঙ্গ আছে, ফকিরী আদর্শের কথাও আছে। কিন্তু কবি যোগতন্ত্রাদির কথা যতটা বলিয়াছেন, 'স্বধর্মের' কথা ততটা বলেন নাই।

সাহেবও আলীরাজার কয়েকটি পদ সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'প্রাচীন বাংলা পুঁথির বিবরণে' মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

আলীরাজার দুই-একটি বৈষ্ণবপদ যে কোন প্রথম শ্রেণীর বৈষ্ণবপদের সমকক্ষ, কোনটি-বা দুর্লভ উৎকর্ষে প্রশংসনীয়। রাধার ব্যাকুলতা কবি কত অল্প ভাষণে ফুটাইয়াছেন :

বনমালী, কি হেতু রাধারে ভাব ভিন।
তোমার প্রেমের ঘায় দগধে জীবন যায়
নিত্য রাধা মদন-অধীন॥

কবির ভণিতাও বিশেষ অর্থবহ ও উল্লেখযোগ্য :

গাহে আলীরাজা হীনে রাধাসম ত্রিভুবনে
প্রেমভক্ত নহে দেবমুনি।
জাব যত পরীনর এক নহে সমস্বর
কুলভক্ত রাধার নিছনি॥

হিন্দু বৈষ্ণব মহাজনের মতো কবি রাধাকৃষ্ণলীলার সঙ্গী হইতে চাহেন :

হীন আলীরাজা বলে হরি-রাধা পদতলে
শুন ঠাকুরাণী রাধা সার।
যে রামা হরিরে ভজে কদাচিত নাহি তেজে
হরি নিত্য বিদিতে রাধার॥

কৃষ্ণদর্শনে রাধার আক্ষেপোক্তি সুন্দর হইয়াছে :

কি খেনে আসিলাম ঘাটে
নন্দের নন্দন ভুবনমোহন
দেখিয়া মরম ফাটে॥

কবি যোগতন্ত্রসাধক ছিলেন, তাহার প্রমাণ পদেই আছে। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কোন কোন পদে যোগ ও তন্ত্রের পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা :

যখনে দেখিলুম শ্যাম কালিন্দীর কূলে।
সেই ধার রাজহংস নাচে শতদলে॥
ষটচক্রমধ্যে মোর বহে ষটু ঋত।
পঞ্চ শব্দে যন্ত্র বাজে গাহে তার গীত॥

অথবা :

রাধার মন্দির মাঝে পঞ্চ শব্দে বাস্ত বাজে
রাধা কালনিদ্রায় পীড়িত।

রাধিকার হৃদে বসি দামোদর ফুঁকে বাঁশী
প্রেমবশে গাহে যন্ত্রগীত ॥
রাধিকার কায়মনে ঠাকুরের বৃন্দাবনে
ষট শত রাগ তথা বৈসে।
ছয় চক্র জ্ঞানঘর তাতে সপ্ত সরোবর
রাজহংস শত পদ্ম ভাসে ॥

কবি যে কৃষ্ণচরণ সার করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার একটি পদ হইতে বুঝা যায় :

হীন আলীরাজা ভণে এই শ্রদ্ধা কায়মনে
ঐ রাঙা চরণে হই রেণু।

আলীরাজা কয়েকটি শাক্ত পদও লিখিয়াছিলেন। একটি পদে দানব-দলনী চণ্ডিকার বীরাঙ্গনা মূর্তি চমৎকার ফুটিয়াছে :

অষ্ট অলঙ্কার চণ্ডী করি পরিধান।
মহানন্দে নৈল গৌরী যুদ্ধের সাজন ॥
সিংহ আরোহণ কালী হস্তেত কৃপাণ।
সুরবর্ণ ত্রিনয়নী সমরে পয়ান ॥
যুদ্ধে প্রবেশিলা দেবী মন্দ মন্দ হাসি।
রক্তপানে মত্ত অসুর কাটে রাশি রাশি ॥

পদের ভণিতায় কবি নিজেকে "শিশু আলীরাজা ভণে শ্যাম-কালিকা দাস" বলিয়া শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় শাখার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। আর একটি পদে কবি হরপার্বতীর বর্ণনা করিয়াছেন এবং রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ করিয়া পদ সমাপ্ত করিয়াছেন। যথা—

তুমি নারায়ণ হরি তুমি হর ব্রহ্মগৌরী
দেবের দেবতা তুয়া মূল।
অষ্টলোকে পরিহার রাতুল চরণে যার
শরণ মাগে সব দেবকুল ॥
তুমি গুরু মাতাপিতা তিলেক পরমদাতা
তারিণী করুণাসিন্ধুময়।
জগৎ রুদ্রাণী তনু শিবলীলা রাধাকানু
সত্ত্ব রজঃ তমঃ শক্তিময় ॥
হীন আলীরাজা বলে শ্যামাকালী পদতলে
শক্তিলীলা শঙ্কর ঘরণী।

সূর অংশ হরগৌরী চন্দ্র অংশী রাধাহরি
তত্ত্বরূপী নবীন যৌবনী ॥

ব্রজসুন্দর সান্যাল আলীরাজার কবিত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "আলীরাজা কেবল প্রেমিক নহেন, তিনি ভক্তও বটেন।" এ মন্তব্য অযৌক্তিক নহে। আসল কথা, অসাম্প্রদায়িক উদারমতি আলীরাজা হিন্দুর অধ্যাত্মবাদে উত্তমরূপে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। সেই দিক দিয়া তিনি তাত্ত্বিক ও দার্শনিক। অপরদিকে তিনি আবার ভক্ত-কবি। তত্ত্ববাদ ও ভক্তিরস তাঁহার পদসাহিত্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়াইয়া গিয়াছে।

মধ্যযুগে এবং মধ্যযুগের অন্তে আরও কয়েকজন মুসলমান কবি বৈষ্ণব ভাবের গান রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ মুসলমান কবি সালবেগের (শালবেগ) নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহার তিনটি পদ 'পদকল্পতরু'তে গৃহীত হইয়াছে, সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'তেও ইঁহার আর একটা পদ উদ্ধার করিয়াছেন। উড়িষ্যায় এই মুসলমান কবি বৈষ্ণবভক্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। এক মুসলমান সেনাপতি ওড়িয়া হিন্দু বিধবাকে বলপূর্বক বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্র সালবেগ পরবর্তী জীবনে বৈষ্ণবভক্ত হইয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার শেষজীবন বোধ হয় বৃন্দাবনে অতিবাহিত হয়। ইঁহার পদে সরল সহজ ভক্তি যতটা লক্ষ্য করা যায়, কবিত্ব ততটা নহে। 'পদকল্পতরু'তে ইঁহার তিনটি পদ গৃহীত হইয়াছে, অথচ অনেক উৎকৃষ্ট মুসলমান বৈষ্ণব কবির পদ এই সঙ্কলনে স্থান পায় নাই।

ব্রজসুন্দর সান্যাল চম্পাগাজী, মুহম্মদ হাসিম, কমর আলী, আলীমিঞা, ওহাব প্রভৃতি অনেক মুসলমান বৈষ্ণব কবির পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পূর্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য 'বাঙলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' পুস্তিকায় আরও অনেক কবি ও তাঁহাদের পদের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। আলীমিঞার চণ্ডীদাসের অনুকরণে রচিত পদটি উল্লেখযোগ্য :

গাছের উপরে লতার বসতি
লতার উপরে ফুল।
ফুলের উপরে ভ্রমরা গুঞ্জরে
কানুএ মজাই জাতিকুল ॥

কবি ওহাবের এই পদটি উৎকৃষ্ট বৈষ্ণবপদাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে :

কি হৈল আমারে রে বন্ধু কি হৈল আমারে।
দিবানিশি ঝুরে পাণি না দেখিয়া তোরে॥
এই সাধ করি মনে তোর লাগ্‌ত পাই।
তোমার পদের ধূলা নয়নে লাগাই॥

শেষ পংক্তিটির ভাবভাষা চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কুঞ্জভঙ্গে রাধিকার উক্তি :

রাত্রি পোহাইয়া যায় কোকিল পঞ্চমে গায়
নিদ্রাতে পাইয়াছ বড় সুখ।
অভাগিনী বলিয়া রে নিশি গোঞাইলুম
উঠ এবে দেখি চান্দমুখ॥
আমার মাথাটি খাও উঠ এবে ঘরে যাও
কাকুতি করিয়ে বোলি তোরে।
রাত্রি প্রভ্যুষ হৈলে লোকে দেখিবে তোরে
কলঙ্কিনী করিবে আমারে॥

এই পদটির ব্যাকুল বেদনা ও চকিত আশঙ্কা রাধার চরিত্রটিকে একটি অপরূপ গীতিমাধুর্য দান করিয়াছে।

কবি গয়াজের একটি বিরহের পদ উল্লেখ করিয়া আমরা বর্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। বিরহিণী রাধার শীর্ণ মূর্তি ও মনের অভিমান বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন :

কনক অঙ্গুরি ছিল সে পুনি বলয়া ভেল
সে বলয়া হৈয়া গেল তাড়।
প্রভুরে কি দিমু গালি যদি না আইসে আজি কালি
পরাধীনী জীবন অসার॥

রাধা কৃষ্ণবিরহে ধীরে ধীরে শীর্ণ হইয়া পড়িতেছেন, যে অঙ্গুরি আঙুলে শোভা পাইত, রাধার বাহু এত শীর্ণ হইয়া গেল যে, সেই অঙ্গুরি বাহুর বলয় হইয়া পড়িল, ক্রমে রাধা আরও শীর্ণ হইয়া পড়িলেন, বাহুর বলয় আরও উপরে উঠিয়া তাড় (তাগা) হইয়া পড়িল। এই বর্ণনাটির চমৎকারিত্ব বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

আমরা মধ্যযুগীয় মুসলমান কবিদের সম্বন্ধে[৪৭] সংক্ষেপে আলোচনা

৪৭ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মুসলমান কবি সম্বন্ধে দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

করিলাম। বাঙলাদেশের মুসলমানসমাজ কীভাবে সাহিত্য, সংস্কৃতি-সাধনায় বাঙালী হিন্দুর ধারা অনুসরণ করিয়াছিলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের সমন্বয় পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস বিস্ময়কর। এই মুসলমান কবিগণ ইসলামধর্মাবলম্বী হইলেও হিন্দুর ধর্মদর্শন ও হিন্দুর দেবদেবীকে হিন্দুর মতোই শ্রদ্ধা করিয়াছেন, সাহিত্যে তাহার স্বীকৃতি রাখিয়া গিয়াছেন।

আধুনিক কালে কোন কোন মুসলমান সমালোচক এই ব্যাপারে কিছু বিস্মিত হইয়াছেন।[৪৮] কেহ-বা ইহাতে, "ধর্মসমন্বয় ও ধর্মসহিষ্ণুতার মহতী বাণী"[৪৯] উপলব্ধি করিয়া কবিগণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। কেহ-বা এই কবিদের পুরাপুরি কৃষ্ণভক্ত[৫০] বলিয়াছেন। কবিগণ সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ হওয়ার কারণ, কবিদের সম্প্রদায় ও সমাজগত ধর্মমত লইয়া অধিক বাহ্বাস্ফোট করা হইয়াছে। সমাজধর্মে তাঁহারা হয়তো বিশুদ্ধ মুসলমান ছিলেন, তাঁহাদের কেহ বৈষ্ণবধর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা লন নাই। যদি লইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা মুসলমানী নাম ত্যাগ করিয়া ভক্ত-বৈষ্ণবের দাস-উপাধিক হিন্দু নামই গ্রহণ করিতেন। কিন্তু সমাজ সম্প্রদায়-

---

৪৮ এই প্রসঙ্গে আবদুল করীম লিখিয়াছিলেন, "মুসলমান হইয়া আলীরাজা প্রভৃতি কবিগণ বৈষ্ণব কবিতা লিখিলেন কিরূপে বলা যায় না।" (ব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি'র চতুর্থভাগ দ্রষ্টব্য) তিনি আলীরাজার 'জ্ঞানসাগরে'র ভূমিকাতেও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, "তাঁহার ন্যায় একজন স্বধর্মপরায়ণ মুসলমান এরূপ করিলেন কেন তাহা ভাবিবার বিষয় বটে।" আলীরাজা সম্বন্ধে তিনি আর একস্থলে এই রূপ মন্তব্য করিয়াছেন, "একদিকে তাঁহার এই হিন্দু দেবদেবীর প্রতি ভক্তি, অন্যদিকে 'জ্ঞানসাগর' প্রভৃতি হইতে তাঁহার স্বধর্মানুরাগের পরিচয়—এই পরস্পরবিরোধী ভাব দুইটি মিলিয়া সমস্যাটিকে বড়ই জটিল করিয়া তুলিয়াছে।' সমস্যাটি কিন্তু আদৌ জটিল নহে। কবিগণ যেরূপ অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং হিন্দুধর্মকে শ্রদ্ধা করিয়াছেন, করীম সাহেবের মতো আধুনিককালের সমালোচকগণ ততদূর যাইতে প্রস্তুত নহেন বলিয়াই সমস্যাটি তাঁহাদের নিকট জটিল আকার ধারণ করিয়াছে।

৪৯ "ধর্মসমন্বয়ের ও ধর্মসহিষ্ণুতার যে মহতী বাণী এই সকল তথাকথিত অল্পশিক্ষিত ও নিরক্ষর কবিদের মধ্যে আছে, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীরই মনে শ্রদ্ধা উদ্রেক করিবে সন্দেহ নাই।' অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের উল্লিখিত পুস্তিকা।

৫০ 'পদকল্পতরু' সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মতে, "নসির মামুদের মতো কবিরা প্রকৃত পক্ষেই কৃষ্ণভক্ত ও বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন।" (পদকল্পতরু, ৫ম,)

গত ধর্ম যাহাই হউক, অন্তরের দিক দিয়া, ব্যক্তিধর্মের দিক দিয়া তাঁহাদের অনেকেই যে বৈষ্ণবভাবের বশবর্তী হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। মনে হয়, এই ধরনের অধিকাংশ কবিই আংশিকভাবে মরমী সাধক ও সূফীপন্থী 'বে-শরা' মার্গের পথিক ছিলেন। হিন্দু বৈষ্ণব কবিরা যেমন অনেক সময় শাস্ত্র-সংহিতা মানিতেন না, তেমনি ইঁহারাও গুরু-মুর্শিদের ফতোয়া না মানিয়া অন্তরের ডাকেই সাড়া দিয়াছেন। স্মার্ত-শৈব বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, শাক্ত মঙ্গলকাব্যের কোন কোন কবি বৈষ্ণবমতের প্রতি আনুকূল্য করিতেন, কালীভক্ত মুন্সি বেলায়েৎ হোসেন 'কালীপ্রসন্ন' নামে পদ লিখিতেন। আধুনিক কালে কবি কাজী নজরুল ইসলামের শাক্ত গান আবদুল করীম সাহেবের সমস্যা দূর করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। নজরুলের শ্যামাসঙ্গীতগুলি কি আন্তরিক অনুভব হইতে জন্ম লাভ করে নাই? সে যাহা হউক, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের নানা শাখায় মুসলমান কবিদের দান বিশেষভাবে স্মরণীয়, বাংলা সাহিত্যের কোন কোন বিভাগে তাঁহারা সুগভীর প্রভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

নবম অধ্যায়

প্রথম পর্বের পরিশিষ্ট

সমসাময়িক য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সাহিত্য

সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি। বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের পার্শ্বে সমকালীন প্রধান প্রধান য়ুরোপীয় সাহিত্য ও ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যকে স্থাপন করিয়া ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া যাক।

সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ঐ শতাব্দীর প্রধান প্রধান য়ুরোপীয় সাহিত্যের তুলনা চলে না, কারণ গুণগত উৎকর্ষ ও বিষয়গত বৈচিত্র্যে এই শতকের বাংলা সাহিত্য য়ুরোপীয় সাহিত্যের নিকটেও ঘেঁষিতে পারিবে না। তবে এই প্রসঙ্গে সমকালীন য়ুরোপীয় সাহিত্যের পরিচয় লইলে বাংলা সাহিত্যের দারিদ্র্য ও দুর্বলতার যথার্থ স্বরূপ বুঝা যাইবে।

সপ্তদশ শতাব্দীর
য়ু রো পী য় সা হি ত্য

সপ্তদশ শতাব্দীতে য়ুরোপীয় সাহিত্য যে কী অভূতপূর্ব ঐশ্বর্য সৃষ্টি করিয়াছে, একটা মহাদেশের ক্রমব্যাপ্তিশীল জীবনধারাকে অধিকতর বেগবান করিয়াছে তাহা সমকালীন ইংরাজী, ফরাসী ও জার্মান সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইলেই বুঝা যাইবে।

ইংরাজী সাহিত্য ॥

ইংরাজী সাহিত্যে সপ্তদশ শতাব্দী অবশ্য খুব একটা বিরাট ঐতিহ্য বহন করিয়া আবির্ভূত হয় নাই। নানাবিধ রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলনই তাহার কারণ বলিয়া বোধ হয়। ষোড়শ শতাব্দীর এলিজাবেথায় যুগ, যাহা যথার্থই ইংরাজী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ, তাহার অন্তিমপর্বে

শেক্‌সপীয়রের আবির্ভাব এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি সমূহ রচনার পর তাঁহার জীবনাবসান। ১৬০৩ খ্রী: অব্দে রাণী এলিজাবেথ দেহত্যাগ করেন। ইঁহার পর স্কটল্যাণ্ডের ষষ্ঠ জেম্‌স্ ইংলণ্ডের প্রথম জেম্‌স্-রূপে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন—তাঁহার রাজত্বকালে পিউরিটান ও এ্যাংলিকান দলের মতান্তর বৃদ্ধির ফলে চারিদিকে অশান্তি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। অতঃপর প্রথম চার্লস্ (১৬২৫) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া বিশৃঙ্খলার মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিলেন, পার্লামেণ্টকে তুচ্ছ করিয়া নিজে যথেচ্ছাচার চালাইতে লাগিলেন। ফলে ১৬৪৯ খ্রী: অব্দে তিনি পার্লামেণ্টের দ্বারা প্রাণ-দণ্ডাদেশ লাভ করিলেন। তাহার পর বেশ কিছুদিন ধরিয়া চলিল শাসন-সংক্রান্ত অরাজকতা। ১৬৫৯ খ্রী: অব্দে অলিভার ক্রমওয়েল নূতনভাবে ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। ক্রমে শাসনব্যবস্থায় পিউরিটান নীতিবাদ প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল। ১৬৫৮ খ্রী: অব্দে ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর নিহত প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লস্ ইংলণ্ডের সিংহাসনে স্থাপিত হইলে ইংলণ্ডে পুনরায় রাজতন্ত্র ফিরিয়া আসিল। পিউরিটানদের শুষ্ক নীতিবাদের স্থলে আমোদ-প্রমোদের তরঙ্গ প্রবাহিত হইল। অতঃপর ১৬৬৫ খ্রী: অব্দে দারুণ মড়ক এবং পর বৎসর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে লণ্ডন শহর প্রায় বিধ্বস্ত হইয়া গেল। যাহা হউক শতাব্দীর শেষ দিকে দ্বিতীয় চার্লস্ খানিকটা শান্তি ফিরাইয়া আনিলেন। ১৬৮৫ খ্রী: অব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় জেম্‌স্ রাজা হইয়া ক্যাথলিকদের পক্ষ লইবার ফলে তাঁহার চারিদিকে প্রতিকূলতা ঘনাইয়া আসিল। প্রোটেস্টাণ্টদের প্রবল বিরোধিতার ফলে দ্বিতীয় জেমস্ পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার কন্যা ম্যারী (প্রটেস্টাণ্ট ধর্মাবলম্বী) এবং তাঁহার স্বামী অরেঞ্জের উইলিয়ম—দুইজনে ইংলণ্ডের যুগ্ম শাসনকর্তা হইলেন। ফলে রোমান-ক্যাথলিকদের ক্ষমতা খর্ব হইল এবং প্রোটেস্টাণ্টগণ প্রাধান্য পাইল—ইহাই রক্তপাতহীন গৌরবময় সমাজবিপ্লব ('Glorious Revolution')।

উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাসূত্র হইতে দেখা যাইতেছে, রাণী এলিজা-বেথের মৃত্যুর পর শিল্প ও সাহিত্যে আরও কিছুকাল এলিজাবেথীয় যুগের ঐশ্বর্য বজায় থাকিলেও পরবর্তী অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া ইংলণ্ডের উপর দিয়া

রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিপ্লব ও পরিবর্তনের বিরাট ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছিল। এইরূপ রাষ্ট্রিক অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলার ফলেই বোধ হয় সারস্বত প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। অবশ্য শেক্‌স্‌পীয়রের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিগুলি এলিজাবেথের মৃত্যুর পরেই সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকেই রচিত হয়, এলিজাবেথীয় যুগের অনেক কবি-সাহিত্যিক তারপরেও জীবিত ছিলেন এবং তখনও তাঁহাদের লেখনী বিরাম লাভ করেন নাই। কিন্তু এলিজাবেথের মৃত্যুর পর তাঁহারা সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক পর্যন্ত জীবিত থাকিয়া কাব্য নাটকাদি রচনা করিলেও তাঁহাদিগকে এলিজাবেথীয় যুগের ফসল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজী কাব্যসাহিত্যে দুইজন কবির বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়—মিল্টন ও ড্রাইডেন। মিল্টন ক্রমওয়েলীয় যুগের (খ্রীঃ অঃ ১৬৪৯-৬০) কাব্যনেতারূপে অভিহিত হন, যদিও তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'প্যারাডাইস লস্ট্' ক্রমওয়েলীয় যুগের কিছু পরে রচিত হইয়াছিল। তাঁহার পরে কাব্যশাখার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন ড্রাইডেন।

মিল্টনের ঈষৎ পূর্বে সপ্তদশ শতাব্দীর কাব্যধারায় দুইটি শাখা লক্ষ্য করা যাইবে। একটি—এলিজাবেথীয় যুগের অবশেষ, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতায় সুন্দর স্নিগ্ধরস সৃষ্টি, এবং অপরটি—তত্ত্ববাদী কবিতা, যাহা মেটাফিজিকাল কবিতা নামে পরিচিত—এই শাখার নেতা জন ডন (১৫৭৩-১৬৩১)। এলিজাবেথীয় যুগের স্নিগ্ধ প্রসন্ন প্রেমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়া রবার্ট হেরিক, টমাস ক্যারিউ, জন সাকলিং, রিচার্ড লাভলেস পূর্বতন ধারা কথঞ্চিৎ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অপরদিকে জন ডনের তত্ত্ববাদী মননশীল ও ব্যঙ্গপ্রবণ কবিতার আদর্শে জর্জ হার্বার্ট, হেনরি ভঘান, রিচার্ড ক্র্যাশ' দার্শনিকতা, নীতি ও ধর্মীয় তত্ত্বকথা সংবলিত কবিতা রচনা করিয়া তদানীন্তন ইংলণ্ডের ধর্মান্দোলনের প্রভাব স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু জন মিল্টনই (১৬০৮-৭৪) সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজী কাব্যসাহিত্যকে বিরাট ক্লাসিক ঐতিহ্যের তোরণদুয়ারে স্থাপন করিলেন। শেকসপীয়রের সঙ্গে যদি আর কোন ইংরাজ কবির নামোচ্চারণ করিতে হয়, তবে তিনি জন মিলটন। প্রথম দিকে তিনি ক্রমওয়েলীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকিলেও পরবর্তীকালে দ্বিতীয় চার্লস্ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর

তিনি রাজনৈতিক আবহাওয়া হইতে বাহির হইয়া স্বাধীনভাবে ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'প্যারাডাইস লস্ট' রচনা করিয়া পরবর্তী যুগে অমরত্ব লাভ করেন। ক্লাসিকতার সঙ্গে আস্তিক্যবাদী ধর্মীয় চেতনার নিবিড় যোগস্থাপন তাঁহার প্রতিভার একটা বড় লক্ষণ—বস্তুতঃ সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা মিল্টনকে ঘেরিয়া আবর্তিত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার পরে জন ড্রাইডেন (১৬৩১-১৭০০) পরিমিত বাগধারা ও ছন্দপ্রকরণ অনুসরণ করিয়া বুদ্ধিমার্গীয় কাব্যরীতির যে পরিকল্পনা করেন, তাহার আদর্শ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বজায় ছিল। তিনি একাধারে ব্যঙ্গরচনাকার, নাট্যকার, 'ওড'-কবি, সমালোচক—বিচিত্র প্রতিভার সমন্বয়-স্থল। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সারস্বত সমাজে তিনিই নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক এ্যাব্রাহাম কাউলে, স্যামুয়েল বাটলার—ইঁহারা পিউরিটারের নীতিবাগীশতার বাড়াবাড়িকে কিছু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। বাটলারের 'হুডিব্রাস' ব্যঙ্গকাব্যে পিউরিটানদের প্রতি ব্যঙ্গ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। যাহা হউক এলিজাবেথীয় যুগের পরবর্তী 'রেসটোরেশন' যুগের ইংরাজী কাব্যসাহিত্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, জন মিল্টনই একমাত্র বিশ্বপ্রতিভাধর বিরাট কবিব্যক্তিত্ব লইয়া ইংরাজী কাব্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—ড্রাইডেন ও তৎসমসাময়িক কবিবৃন্দ পরিমিত স্থান-কালে কিছু প্রভাব বিস্তার করিলেও মিল্টনের পার্শ্বে তাঁহাদিগকে ছায়ামূর্তি বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ মিল্টনের আবির্ভাব না হইলে শেক্‌স্‌পীয়রের পরবর্তী যুগের দীনতা-শূন্যতা কিছুতেই ঢাকা পড়িত না।

নাটকের দিকে বিচার করিলে শেক্‌স্‌পীয়রীয় পরিমণ্ডলের বাহিরে রচিত সপ্তদশ শতাব্দীর নাটক ও নাট্যকার কোন দিক দিয়াই বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহেন। শেক্‌স্‌পীয়রের সমসাময়িক নাট্যকার জন লাইলি, জর্জ পীল, রবার্ট গ্রান—ইঁহারা সকলেই শেক্‌স্‌পীয়রের প্রভাবে ম্লান হইয়া গিয়াছেন, কেবল মার্লো (১৫৬৪-৯৩) কিছু জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন। শেক্‌স্‌পীয়রের বন্ধু বেন জনসন (১৫৭২-১৬৩৭) এই গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাধিক প্রতিভাবান নাট্যকার ছিলেন। পরিমিত ক্ষেত্রে বো মন্ট ও ফ্লেচার নাট্যকার হিসাবে শেক্‌স্‌পীয়রের অব্যবহিত পর কিছু জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন। অবশ্য যাঁহাদের কথা উল্লেখ করা হইল, তাঁহারা এলিজাবেথায় যুগের ও শেক্‌স্-

পীয়রীয় পরিমণ্ডলেরই অন্তর্ভুক্ত, সেইজন্য সপ্তদশ শতাব্দীর পরবর্তী নাট্য-সাহিত্যের সঙ্গে ইঁহাদের সংযোগ অল্প। ক্রম্ওয়েলীয় পিউরিটান যুগে নাট্যাভিনয় ও নাট্যশালা আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় (১৬৪২, ২রা সেপ্টেম্বরের অর্ডিনান্স)। ফলে নাটক রচনাও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রেস্টোরেশনের পর দেশে আমোদ প্রমোদ ও নাটকাভিনয় পুরা দমে শুরু হইলেও সপ্তদশ শতাব্দী কোন বিশেষ নাট্যকারকে লইয়া গর্ব করিতে পারে না। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হালকা রঙ্গব্যঙ্গ-সম্বলিত কতকগুলি সামাজিক ধরনের নাটক দর্শকমহলে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। উইলিয়ম উইচারলি, উইলিয়ম কনগ্রীভ, সার জন ভ্যান ব্রাঘ, জর্জ ফার্কুহার—ইঁহারা রঙ্গরসের প্রহসন রচনা করিতে গিয়া মাঝে মাঝে রুচির শালীনতা বিসর্জন দিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। কোন কোন সমালোচক এই ধরনের চটুল সামাজিক নাটকে (Comedy of Manners) এতটা হালকা সুর ও স্থূল রঙ্গরসের বাড়াবাড়ি পছন্দ করিতেন না। যাহা হউক এই শ্রেণীর নাটকীয় ঐতিহ্য দীর্ঘকাল প্রভাব বজায় রাখিতে পারিয়াছিল। যেমন প্রথম বেগ নিঃশেষ হইয়া গেলে শ্রান্ত মন্থরতা শুরু হয়, তেমনি গৌরবময় এলিজাবেথীয় যুগ ও ঐশ্বর্যবান শেক্স্পীয়রীয় পরিমণ্ডলের অবসানের পর সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত নাটকে প্রতিভা অপেক্ষা কৌশল, আবেগ অপেক্ষা চটুল বুদ্ধি এবং স্বতঃস্ফূর্তির স্থলে চেষ্টাকৃত কৃত্রিম মার্জিতভাব প্রাধান্য পাইতে থাকে। এই দিক দিয়া পূর্বতন এলিজাবেথীয় যুগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী যে অতিশয় নিষ্প্রভ তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে কিছু কিছু উপন্যাস জাতীয় গদ্য রচনাও প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পূর্বে এলিজাবেথায় যুগে রোমান্সধর্মী গদ্যসাহিত্য রচনাগত উৎকর্ষ ও জনপ্রিয়তায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। সার ফিলিপ সিড্নের 'আর্কাডিয়া' শীর্ষক গদ্যকাহিনী এই যুগের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা—রচনাটি প্রায় আধুনিক উপন্যাসের ধার ঘেঁসিয়া গিয়াছে। এই যুগেই জন লাইলির 'ইউফিউয়াস', গ্রীনের 'প্যাণ্ডোস্টো', লজের 'রোজালিন্ড্', ন্যাশের 'আনফরচুনেট ট্রাভেলর'—এ সমস্তই উপন্যাসধর্মী রোমান্টিক গদ্য কাহিনী—সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। যদিও ইহাতে কল্পনার আতিশয্য ও স্বপ্নিল সৌন্দর্যবিলাস অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে, তবুও

উপন্যাসের প্রথম সূচনা হিসাবে ইহাদের বিশেষ মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে পৌঁছাইয়া উপন্যাসের এই বিকাশ অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া যায়। অবশ্য ইহার কারণ দুর্জ্ঞেয় নহে। ধর্মনৈতিক কলহদ্বন্দ্ব, সামাজিক বিতর্ক এবং গৃহযুদ্ধের ফলে অসংখ্য প্রচারপুস্তিকা সমগ্র দেশটাকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছিল—সেই বিতর্ক, দ্বন্দ্ব, মতপ্রকাশ ও মতপ্রচারের প্রচণ্ড কোলাহলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া গদ্য আখ্যানের প্রতি লেখক-পাঠক—কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। এই যুগে দুই-একখানি ফরাসী গদ্য-রোমান্স ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া অভিজাত মহলে কিছু প্রচার লাভ করিয়াছিল। কেহ কেহ (স্যামুয়েল পেপিস, জন ইভিলিন) ভ্রমণ কাহিনীতে কল্পনার রঙ মিশাইয়া উপন্যাসের অভাব মোচনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তবে এই শতাব্দীতে একজন মাত্র ইংরাজ গদ্য লেখক—জন বেনিয়ান (১৬২৮-৮৮) আখ্যান-সাহিত্যে অমর হইয়া আছেন। বেনিয়ানের 'পিলগ্রিম্‌স্ প্রগ্রেস' (১ম খণ্ড—১৬৭৮, ২য় খণ্ড—১৬৮৪) বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও আরও অনেকগুলি রূপককাহিনী ও গদ্য রচনা ('গ্রেস এ্যাবাউণ্ডিং', 'হোলি ওআর', 'লাইফ এ্যাণ্ড ডেথ অব মিস্টার ব্যাডম্যান' ইত্যাদি) একদা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। 'পিলগ্রিম্‌স্ প্রগ্রেসে' রূপকের আবরণে মূলতঃ খ্রীস্টানী আদর্শে মানুষের ঊর্ধ্বতর অভিযানের কথা বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক উপন্যাসের যথার্থ স্বর্ণযুগ শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে গদ্য নিবন্ধের কথাও আলোচনা করা যাইতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দী নানাবিধ আন্দোলনে উচ্চকিত হইয়াছিল। সেই সমস্ত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলন যে কী পরিমাণে জনচিত্ত আলোড়িত করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ অসংখ্য প্রচার-পুস্তিকা। বিশেষতঃ রোমান-ক্যাথলিক, প্রটেস্টান্ট, পিউরিটান, এ্যাংলিকান—বিভিন্ন খ্রীস্টীয় সঙ্ঘের পারস্পরিক বিরোধের ফলে ক্ষুদ্র বৃহৎ পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছে। স্বয়ং মিল্টন খ্রীস্টানধর্মের নানা বিষয় লইয়া ল্যাটিন ও ইংরাজীতে অনেকগুলি প্রচারপুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বেকন ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম শিল্পরসসমৃদ্ধ গদ্য নিবন্ধসাহিত্যের জন্ম দান করিয়াছিলেন—ফরাসী বিদগ্ধ পণ্ডিত মঁতেইয়ের প্রভাবে। সপ্তদশ শতাব্দীর খ্যাতিমান গদ্যশিল্পী হিসাবে টমাস ব্রাউন (১৬০৫-৮২), মিল্টন, জেরিমি টেলর, জন লক (১৬৩২-

১৭০৪) ধর্ম, দর্শন ও সমাজসংক্রান্ত যে সমস্ত গদ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ইংরাজী সাহিত্যে মননশীল যুক্তিমার্গের দিগ্‌দর্শনরূপে অদ্যাপি গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু এই জ্ঞানগর্ভ চিন্তাশীল প্রবন্ধসাহিত্যের পার্শ্বেই আর একপ্রকার গদ্য নিবন্ধসাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহাতে শুধু ইংরাজ জাতির মননশীলতা নহে, ফরাসী বাগ্‌বৈদগ্ধ ও মার্জিত রচনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রহিয়াছে। রিচার্ড স্টীল (১৬৭২-১৭২৯), জোসেফ এ্যাডিসন (১৬৭২-১৭১৯) এবং জোনাথান সুইফ্‌ট্ (১৬৬৭-১৭৪৫) ইংরাজী প্রবন্ধসাহিত্যে যে নূতন প্রাণরস, কল্পনাকুশলতা ও প্রসন্নতা সঞ্চার করেন, তাহার সুদূরপ্রসারী প্রভাব স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য সুইফ্‌টের গদ্যনিবন্ধ অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত হইলেও সপ্তদশ শতাব্দীতেই তাঁহার মনঃপ্রকৃতি পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। স্টীল ও এ্যাডিসন ইংরাজী প্রবন্ধসাহিত্যের জ্ঞানগম্ভীর গুরুভারের স্থলে ব্যক্তিচেতনার যে প্রসন্ন রস পাঠকচিত্তে সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন, পরবর্তী শতাব্দীতে তাহা আরও প্রসার লাভ করিল, দ্বৈপায়ন ইংলণ্ডের অপ্রসন্ন মনোভাবে বিশুদ্ধ আনন্দ ও আবেগ এমনভাবে মিশিয়া গেল যে, গদ্যরচনাও কবিতা ও কথারসের মতো হৃদ্য হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ রেস্টোরেশনের পর ইংলণ্ডের সমগ্র জাতি-জীবনের পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে এই যুগের গদ্যনিবন্ধে ও সরস রচনাসাহিত্যে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। নাটকের দিকে সপ্তদশ শতাব্দীর খ্যাতি এমন কিছু গগনচুম্বী নয়, কাব্যশাখায় মিল্টনকে বাদ দিলে এই যুগে আর কেই-বা আছেন যাঁহাকে মহাকালের দরবারে বিনা দ্বিধায় স্থাপন করা যায়? উপন্যাসও এই যুগে অদ্ভুত রোমান্টিক আখ্যানের মধ্যে স্বপ্নজীবন যাপন করিতেছিল। কেবল গদ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধেই সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের সমগ্র রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ফরাসী সাহিত্য ॥

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী সাহিত্য যে একটি সুচিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছিল, তাহা এই যুগের নাটক ও গদ্যসাহিত্য হইতেই বোধগম্য হইবে। ইহাকেই ফরাসী ভাষায় ***grand siecle*** বা বিরাট যুগ বলা হয়। ইতিহাস বিচার করিলেও দেখা যাইবে সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক ও সামরিক

শক্তিতে ফরাসী দেশ সারা য়ুরোপে যেমন প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল, তেমনি সাহিত্যেও এই জাতির স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। চতুর্থ হেনরীর (শাসনকাল ১৫৮৯-১৬১৩) প্রায় কুড়িবৎসর ব্যাপী শাসনের ফলে ফ্রান্সে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিয়াছিল। তাঁহার অনুজ্ঞার ফলেই ফরাসী দেশের ধর্মনৈতিক দ্বন্দ্ব দীর্ঘকালের জন্য অন্তর্হিত হইল। তাঁহার পরে ত্রয়োদশ লুইয়ের (শাসনকাল—১৬১০-৪৩) শাসনকালে প্রটেস্টান্টদের প্রাধান্য খর্ব হইল। য়ুরোপে 'ত্রিংশবর্ষ যুদ্ধের' (১৬১৮-৪৮) ইতিহাসে ফরাসী জাতির সম্মান ও প্রাধান্য রীতিমতো বৃদ্ধি পাইল। চতুর্দশ লুইয়ের (শাসনকাল—১৬৪৩-১৭১৫) সময় সেই গৌরব চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছাইল। অবশ্য তাঁহার শাসনের শেষের দিকে ধীরে ধীরে ফরাসী গৌরব হ্রাস পাইতে লাগিল, প্রটেস্টান্টদের উপর দারুণ অত্যাচারের ফলে তাহারা নানা দেশে পলাইতে আরম্ভ করিল—দেশের ঐশ্বর্য বিদ্যাবুদ্ধিও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। উদ্ধত লুই বলিতেন, "L' etat c'est moi"—আমিই রাষ্ট্র। তাঁহার অদূরদর্শিতা, ব্যয়শৌণ্ডিকতা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরাভবের ফলে ফরাসী জাতির মনে শান্তি ছিল না। যাহা হউক তাঁহার শাসনকাল শেষ হইলে সকলে স্বস্তি লাভ করিল।

চতুর্থ হেনরীর সময় রাজসভাতে বিদগ্ধ সাহিত্য-শিল্পের বিশেষ স্থান ছিল না বলিয়া নগরীর অভিজাত ও রুচিশীলা বিদুষী মহিলারা তাঁহাদের 'সাঁলো'তে (বৈঠকখানা) প্রসিদ্ধ শিল্পী-সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হইতে লাগিলেন। ফলে ফরাসী সাহিত্যে এক প্রকার মার্জিত রচনাসৌকুমার্য, যাহা কিয়ৎ পরিমাণে কৃত্রিম, —বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করিল। অবশ্য ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ লুই সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। ১৬৩৫ খ্রীঃ অব্দে ত্রয়োদশ লুইয়ের পৃষ্ঠ-পোষকতায় রয়াল এ্যাকাডেমি সাহিত্য ও শিল্পের নিয়ামক সংস্থায় পরিণত হইল। এই সময় দার্শনিক রেনি দেকার্তে (১৫৯৬-১৬৫০) ফরাসী চিন্তার জগতে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। নিজ অভিজ্ঞতা লব্ধ প্রত্যয়কেই ব্যক্তি ও বস্তুসত্তার একমাত্র নিয়ামক শক্তি বলিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন। তাঁহার সেই প্রসিদ্ধ উক্তি "Je pense; donc Je suis" (আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি) বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছে। তাঁহার

যুক্তিমার্গীয়, বুদ্ধিকেন্দ্রিক ও অভিজ্ঞতালব্ধ চৈতন্যধারা ফরাসী চিন্তাশীলতাকে বিশেষভাবে আচ্ছন্ন করিল। ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যে লীরিক ও রোমান্টিক আবেগ-অতিরেকের স্থলে ক্লাসিক সংযম ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবাদ প্রাধান্য অর্জন করিল। তাই সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ফরাসী সাহিত্যে দেখা যাইতেছে যে, ঈষৎ বিশৃঙ্খল আবেগতরল সাহিত্যের স্থলে ক্লাসিক রীতির সংযত শিল্প ও সাহিত্য বিদগ্ধমহলে জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছে। এই যুগের প্রসিদ্ধ সমালোচক Francois De Malharbe (১৫৫৬-১৬২৮) এই ধরনের শিথিলগঠন আবেগতরল সাহিত্যের স্থলে সংযত, বস্তুপ্রধান, পরিচ্ছন্ন ও বুদ্ধিদীপ্ত রচনার স্বপক্ষে এমন সমস্ত উক্তি করিতে লাগিলেন, যাহার ফলে আবেগপ্রধান গীতিকবিতার যথার্থই মৃত্যু হইল। যাহা হউক মালহার্বের আলোচনা, দেকার্তের যুক্তিবাদ, রাজ-সভার ফতোয়া, সালেঁার বৈদগ্ধ্য এবং রয়াল এ্যাকাডেমির নির্দেশের ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যে যে পরিমিত বাগবন্ধনের শিল্পরূপ ফুটিয়া উঠিল তাহাই ক্লাসিক বা নব্যক্লাসিক যুগকে ত্বরান্বিত করিল। সমালোচক Boileau তাঁহার *Art Poetique*-এ ঘোষণা করিলেন যে, ইন্দ্রিয়ময় বস্তু-চেতনাকে পরিমিতগঠন ক্লাসিক শিল্পের রূপ দেওয়াই সাহিত্যের কাজ। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে রোমান-গ্রীক ক্লাসিকতার মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দিল। ইহাই 'নবীন-প্রাচীনের সংঘর্ষ' (১৬৮৭-১৭১৫)—যাহার ফলে ক্লাসিকতার অন্ধ অনুকরণের স্থলে স্বাধীন ও স্বাভাবিক প্রগতির দিকে ফরাসী সাহিত্যিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সপ্তদশ শতাব্দীতে বিশুদ্ধ লীরিকের স্থলে ক্লাসিক অনুকরণে লেখা নাটক ব্যঙ্গরচনা ও গল্পকথা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

নাটকের মধ্যে Pierre Corneille (১৬০৬-১৬৮৪), জঁা রেসিন ও মলিয়রের নাম (ইঁহার প্রকৃতনাম Jean Baptist Pocuelin) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের ঈষৎ পূর্বে Alexander Hardy (১৫৬৯-১৬৩০) ও Jean de Mairet (১৬০৪-১৬৮৬) কয়েকখানি নাটক রচনা করিয়া ইঁহাদের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কর্ণেইল গ্রীক-রোমান আদর্শে বুদ্ধিকেন্দ্রিক কয়েকখানি ট্রাজেডি (*The Cid, The Liar, Horace, Cinna*) রচনা করিয়া ফরাসী ক্লাসিক ট্রাজেডির একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম

ছকিয়া দেন। অবশ্য তাঁহার এই সমস্ত নাটকের সাহিত্যমূল্য ততটা উৎকৃষ্ট না হইলেও তিনিই যে ফরাসী ক্লাসিক ট্রাজেডির যথার্থ স্রষ্টা তাহা অস্বীকার করা যায় না। নাট্যকার রেসিন গোড়ার দিকে কিছুকাল কার্নেইলের অনুসরণ করিলেও তাঁহার 'এ্যাণ্ড্রোম্যাকি', 'বেরেনিস', 'ফিড্রা' প্রভৃতি ট্রাজিডিতে নিজস্ব ধরনের ক্লাসিক আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার পরিকল্পনা, চরিত্র, ভাষা-ভঙ্গিমার সংযম ও তীক্ষ্ণতা দীর্ঘদিন ফরাসী নাটকের আদর্শ হইয়া ছিল। কমেডিকারের মধ্যে মলিয়রের নাম সর্বোচ্চে বিরাজ করিতেছে। এই সমস্ত হাস্যরঙ্গমুখর কমেডি রচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন —মানুষের, বিশেষতঃ তাঁহার যুগের মানুষের ত্রুটিবিচ্যুতি ফুটাইয়া তোলাই তাঁহার একমাত্র বাসনা। তাঁহার দু এক নাটকে কিঞ্চিৎ বিষণ্ণতা ও বেদনার স্পর্শ থাকিলেও অধিকাংশ নাটকেই (*Les Precieuses ridicules, Le Medecin mglre lui, Tertafle, Ou l'imposteur* ইত্যাদি) সমসাময়িক অভিজাত ও ধর্মযাজক সমাজের কৃত্রিমতা ও ভণ্ডামি ফাঁস হইয়া গিয়াছে। তাঁহার রঙ্গনাট্য কোন কোন স্থলে কৃত্রিম মনে হইলেও কেহ কেহ মনে করেন, এই বিভাগে তিনি শেক্‌স্‌পীয়রকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

এই যুগে কিছু কিছু নীতিগল্প রচিত হইয়াছিল, যাহার পাত্রপাত্রী অনেক সময়েই মানুষ নহে, মানবেতর প্রাণী। Jean De La Fontaine দ্বাদশ খণ্ডে (১৬৬৮-৯৪ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচিত) যে গল্পকথা রচনা করেন, তাহা ছন্দে রচিত, গল্পগুলির অধিকাংশই অন্য স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। তিনি আখ্যানে নীতি-উপদেশের প্রাধান্য না দিয়া গল্পরসকেই অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিলেন—যদিও ইহাতে সাংসারিক অভিজ্ঞতা ও বাস্তবজীবনের নানা সমস্যা উল্লিখিত হইয়াছে।

এই শতাব্দীতে কয়েকখানি কৃত্রিম বীরত্বপূর্ণ ঘটনাসংবলিত উপন্যাস রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে Honoré d' Urfe ও Mlle de Scudery-র দুইখানি রোমান্টিক গদ্যকাহিনী উল্লেখযোগ্য—যদিও তাহার গুণগত উৎকর্ষ এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নহে। অবশ্য মঁতেইয়ের আদর্শে রচিত কয়েকজন লেখকের গদ্যনিবন্ধ ও পত্রসাহিত্য এই যুগের ফরাসী সাহিত্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। Nicolas Boileau-এর (১৬৩৬-১৭১১) সমালোচনা গ্রন্থ (*L' Art Poetique*), Francois Fenelon-এর দুই একখানি প্রবন্ধ পুস্তক,

প্রসিদ্ধ নীতিবাগীশ দার্শনিক Francois de la Rochefoucauld দুইখানি প্রবন্ধ পুস্তকে এবং Blaise Pascal-এর রচনায় গদ্যশিল্পের নানা বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ পাসকালের গদ্যরীতি আদর্শ ফরাসী রীতি বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কয়েকজন অভিজাত মহিলা (Mme de Se´vigne, Mme de Maintenon প্রভৃতি) চমৎকার কয়েকখানি পত্র-সাহিত্যের গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ফরাসী গদ্যে যে বৈদগ্ধ্য সঞ্চার করেন, তাহা ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। যাহা হউক সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যে ক্লাসিকতা ও কৃত্রিম নাগরিকতার প্রভাব প্রধান হইয়া ফরাসী সাহিত্যের আবেগধর্মকে কোণঠাসা করিয়াছিল, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ ক্লাসিক আদর্শ ব্যাপকতর জীবনের সংস্পর্শে বিশালতা লাভ করিল।

জার্মান সাহিত্য ॥

সপ্তদশ শতাব্দীর জার্মান সাহিত্যকে এক কথায় বন্ধ্যাযুগের সাহিত্য বলা চলিতে পারে। কারণ এই যুগে যেমন জার্মান জাতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন গৌরবলাভ করিতে পারে নাই, তেমনি সাহিত্যেও তাহারা বিশেষ কোন প্রাধান্য অর্জন মৌলিক সৃষ্টি লক্ষ্য করা যায় না। 'ত্রিংশবর্ষব্যাপী যুদ্ধে'র ফলে (১৬১৮–৪৮) এবং জার্মানীতে প্রটেস্টান্ট দলনের প্রতিক্রিয়ায় প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া সমগ্র জার্মান জাতি অসাড় অবস্থায় ছিল। সংশয়, সন্দেহ, চরিত্রভ্রষ্টতা—নানা অধঃপতন, যাহা যুদ্ধেরই একটা হানিকর প্রতিক্রিয়া, তাহারই প্রভাবে সপ্তদশ শতাব্দীতে জার্মান সাহিত্য অনুকরণমূলক সাহিত্য ভিন্ন অন্য কোন মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির গৌরব দাবি করিতে পারে না। তাই জার্মান সাহিত্যের ইতিহাসে ১৬২৪ হইতে ১৭৪৮ খ্রীঃ অঃ—এই শতাধিক বর্ষকে অনুকরণ-সাহিত্যের যুগ বলা হয়। ফরাসী ক্লাসিক লেখক রেসিন, কর্নেইল, মলিয়রের নাটকাবলীর অনুবাদ ও অনুকরণ হইল এই যুগের জার্মান সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন। শুধু সাহিত্য নহে, জার্মান ভাষাতেও বিদেশী শব্দ প্রচুর পরিমাণে অনুপ্রবেশ করিয়া মূল জার্মান ভাষার বিশুদ্ধি ক্ষুণ্ণ করিল। এই ব্যাপারে বাধা দিবার জন্য অবশ্য কয়েকটি জার্মান প্রতিষ্ঠান

বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিল। সাহিত্যিকদের মধ্যেও কেহ ইহার বিপক্ষে, কেহ-বা পক্ষে গিয়া আন্দোলন করিয়াছিলেন।

কবি Martin Optiz (১৫৯৭—১৬৩৯) এই বিশুদ্ধ ভাষাপন্থী দলের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তিনি ভাষার বিশৃঙ্খলা ত্যাগ করিয়া ইটালি ও ফরাসী ক্লাসিকের আদর্শে জার্মান কাব্যসাহিত্যে পরিমিত বাগবন্ধন ও সংযমের কথা প্রচার করেন। তাঁহার এই নীতিনিয়মবদ্ধ বিশুদ্ধ ভাষারীতিকে কেহ কেহ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অবশ্য বাঁধাবাঁধি নিয়মে সাহিত্য রচিত হইলে তাহা কৃত্রিম হইতে বাধ্য—তাই এই যুগের জার্মান কাব্যকবিতা অনেকটা কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক কবি এই ধরনের অনর্থক বাগ্‌-বিস্তার ও কৃত্রিম ক্লাসিক আদর্শ অনুসরণ করিয়া জার্মান কাব্যের স্বাভাবিক বিকাশ প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলেন। অবশ্য ইহার বিরুদ্ধে কয়েকজন কবিপ্রাণ ব্যক্তি আন্দোলন করিয়াছিলেন। Christian Weise (১৬৪২—১৭০৮) এবং আরও কয়েকজন কবি এই ধরনের কৃত্রিম ক্লাসিক কাব্যকলার বিরোধিতা করিয়া সহজ সরলভাষায় কাব্যরচনার কথা ঘোষণা করেন। Paul Gerhardt (১৬০৭—৭৬) অতি সুমধুর ভাষায় এমন সমস্ত স্তব-স্তোত্র রচনা করেন, যাহার আন্তরিকতা ও ধর্মীয় নিষ্ঠা তথাকথিত কৃত্রিম ক্লাসিকতাকে একেবারে ম্লান করিয়া দিয়াছিল।

এই যুগে দুই-একজন নাট্যকার আবির্ভূত হইয়া পরিমিত ক্ষেত্রে আসর জমাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই নাটকসমূহ বিশেষ শিল্পসৃষ্টি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। Audreas Gryphius (১৬১৬—১৬৬৪) কয়েকখানি ট্রাজেডি ও কমেডি লিখিয়া সপ্তদশ শতাব্দীতে কিঞ্চিৎ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। অবশ্য এই যুগে যে যৎসামান্য সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে—কবিতা, ধর্মীয় কবিতা, নাটক—প্রত্যেক শাখাতেই হতাশা, বেদনা ও মৃত্যু ছায়া ফেলিয়াছে—তাহার কারণ, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি-স্বস্তির অভাব; সাহিত্যেও তাহার ছায়া পড়িয়াছে। Gryphius-এর কয়েকখানি ট্রাজেডিতে মৃত্যু ও হত্যার এত বাড়াবাড়ি যে, প্রায় কোথাও ট্র্যাজিক্ রস জমিতে পারে নাই। অবশ্য তাঁহার কবিতাগুলি সাধারণ মানুষের কথা লইয়া রচিত বলিয়া মোটামুটিভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।

Grimmeleshausen (১৬২৫—৭৬) একখানি সুদীর্ঘ গদ্যকাহিনী লিখিয়া

কৃত্রিম কাব্যকলার যুগে স্বাভাবিক রচনাশক্তির পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন। *Simplicissimus* শীর্ষক উপন্যাসধর্মী বিরাট কাহিনীতে সমসাময়িক জার্মান সমাজ, যুদ্ধবিগ্রহ, সাধারণ মানুষের চরিত্র, রঙ্গব্যঙ্গ—সমস্তই নিপুণ বাস্তবতার সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক সপ্তদশ শতাব্দীর জার্মান সাহিত্য গুণগত ও সংখ্যাগত উৎকর্ষে যে উল্লেখযোগ্য নহে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই জার্মান সাহিত্যে যথার্থ নবযুগের সূত্রপাত হয়।

২

সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্য

অতঃপর বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর কয়েকটি প্রধান প্রধান ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্যের রেখাচিত্র আলোচনা করিব।

হিন্দী সাহিত্য ॥

প্রথমে হিন্দী সাহিত্যের কথা ধরা যাক। ষোড়শ শতাব্দীর হিন্দী সাহিত্যে ভক্তিবাদ যে কিরূপ বিপুল ঐশ্বর্য সৃষ্টি করিয়াছিল, মীরাবাঈ, তুলসীদাস, সুরদাস, নাভাদাস, কবীর এবং মুসলমান সূফী সাধকগণের প্রেম-ভক্তিপূর্ণ পদ, কাব্য ও কাহিনী তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তির স্থলে কৃত্রিম কাব্যকলা, অলঙ্কারতত্ত্ব—এই সমস্তই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করে। এই যুগকে হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে 'রীতিযুগ' বা 'শৃঙ্গার যুগ' বলা হয়—এই যুগাদর্শ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। রীতিযুগের অধিকাংশ কবিই কোন-না-কোন হিন্দু রাজসভায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, নাগরিক ও সভাসাহিত্যের সঙ্গে জড়িত হইয়া একপ্রকার কৃত্রিম কাব্যকলার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কেহ-বা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুসরণে রস, অলঙ্কার, ছন্দ, নায়ক-নায়িকা বিচার প্রভৃতি কাব্য-উপাদান লইয়াও কবিতায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছিলেন। সংজ্ঞা-সূত্র ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাহায্যে এই সমস্ত কবি-পণ্ডিত সংস্কৃতানুসারী অলঙ্কারতত্ত্ব হিন্দী সাহিত্যে আমদানি করিয়াছিলেন।

রীতিবাদী লেখকদের মধ্যে সর্বাগ্রে কেশবদাসের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি বুন্দেলখণ্ডের ওর্ছা রাজের সভায় বাস করিতেন। ১৬০১ খ্রীঃ অব্দে কেশবদাসের 'কবিপ্রিয়া' নামক অলঙ্কার-শাস্ত্রের উপর একখানি কাব্য রচিত হয়। কবি বিহারী সাতশত শ্লোকে শৃঙ্গাররসের যে পদ লিখিয়াছিলেন, তাহা 'সাতসই' নামে পরিচিত। ইনি জয়পুরে রাজসভার কবিপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সেনাপতি, মতিরাম, ঘনানন্দ, ভিখারীদাস প্রভৃতি কবিগণ এইযুগে কাব্যকলা, অলঙ্কারতত্ত্বে কিছু কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু কেশবদাস ও বিহারীই অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন।

এই যুগে যেমন আদিরসাত্মক ছোট ছোট পদ রচিত হইয়াছে, অলঙ্কার তত্ত্ব হিন্দী কবিতায় আলোচনা হইয়াছে, তেমনি আবার রাজা-মহারাজা ও বীরপুরুষদের চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া ঐতিহাসিক ও বীররসাত্মক আখ্যানকাব্যও রচিত হইয়াছে। এই সমস্ত কবি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন-না-কোন রাজা-ভূস্বামী-সামন্তের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতেন বলিয়া পৃষ্ঠপোষকদের গুণকীর্তন করিয়া আখ্যানকাব্য লিখিতেন। গোরলালের 'ছত্রপ্রকাশ', সুদনের 'সুজনচরিত' এবং মানের 'রাজবিলাস' এই ধরনের কাব্য। এই যুগে বিরাট প্রতিভাধারী কোন হিন্দী কবির আবির্ভাব হয় নাই তাহা স্বীকার করিতে হইবে। আকবরের সভাকবি আবদার রহিম খানখানা রাজনীতি, এবং বাস্তবজীবনকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত তীক্ষ্ণ-তির্যক শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। ষোড়শ শতাব্দীর ভক্তিযুগের পর সপ্তদশ শতাব্দীর রীতি-শৃঙ্গার যুগে কৃত্রিম কাব্য কলার অনুশীলন হিন্দী সাহিত্যে একপ্রকার বিচিত্র নাগরিকতার বৈদগ্ধ্য সৃষ্টি করিয়াছে। গুণগত গভীরতায় তাহা বিস্ময়কর না হইলেও রুচির স্বাদ পালটাইতে তাহা কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছে। এই শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য আরও বিশাল এবং বিষয়বৈচিত্র্য আরও বিস্ময়কর হইলেও ঠিক এই ধরনের তীক্ষ্ণ-তির্যক রচনা এবং ঐতিহাসিক আখ্যানকাব্য মধ্যযুগে ভারতচন্দ্রের পূর্বে রচিত হয় নাই।

মারাঠী সাহিত্য ॥

সপ্তদশ শতাব্দীর মারাঠী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য ভারতের যে-

কোন প্রাদেশিক সাহিত্য অপেক্ষা অধিকতর উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ শতাব্দী হইতে ধর্মসাধনাকে কেন্দ্র করিয়া মারাঠী সন্তসম্প্রদায় জনসাধারণের ভাষায় নূতন ভক্তিসাহিত্য রচনা করেন। গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থকে সরল মারাঠী ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া কবি ও ভক্তগণ মহারাষ্ট্রে দেশভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ উৎকর্ষ সৃষ্টি করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যনায়ক তুকারাম মারাঠী সাহিত্যে যে গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়াছেন তাহা প্রায় অতুলনীয় বলিলেই চলে। শূদ্রবংশে জাত তুকারাম শুধু ভক্তি ও নিষ্ঠার জন্যই সর্বত্র পূজনীয় হইয়াছেন। তাঁহার ভক্তিরসার্দ্র পদাবলী মারাঠী ভাষায় 'অভঙ্গ' নামে পরিচিত। এই অভঙ্গ-গুলির উদার অসাম্প্রদায়িক ভক্তির আহ্বান অন্য ধর্মাবলম্বীরাও এড়াইতে পারেন নাই। শুনা যায়, খ্রীস্টান সম্প্রদায়ও এই অভঙ্গের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। পূর্বে মহারাষ্ট্রে জ্ঞানেশ্বর ভাগবতধর্ম প্রচার করেন, নামদেব ইহাকে ঐশ্বর্য দান করেন এবং একনাথ ও তুকারামে মিলিয়া ভক্তিবাদী ভাগবতধর্মকে অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে লইয়া যান। এই প্রসঙ্গে তুকারামের সমসাময়িক ও শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইনিও ভক্তিরসের যাত্রী ও ভক্তিরসের কবি। অবশ্য তাঁহার পদ ও গানে যতটা ভাবের গভীরতা আছে, ততটা কাব্যোৎকর্ষ নাই। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া মহারাষ্ট্রে রামদাসী সম্প্রদায় ('রামদাসী পন্থ') গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহারই চেষ্টায় সমগ্র মহারাষ্ট্রে তাঁহার মতাবলম্বী অনেক মঠ স্থাপিত হইয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর মারাঠী সাহিত্যের বিচিত্র ব্যাপার হইতেছে কাব্যক্ষেত্রে খ্রীস্টান মিশনারী ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রভাব। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতেই পর্তুগীজ মিশনারীগণ মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়া হিন্দুদের খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু হিন্দুগণ খ্রীস্টান হইয়াও হিন্দুর আচারবিচার ছাড়িতে পারিল না। তখন পর্তুগীজ পাদ্রী সম্প্রদায় ভাবিলেন যে, হিন্দুর পুরাণ, কাব্য ও ধর্মগ্রন্থের ছাঁচে যদি খ্রীস্টানতত্ত্ব, ধর্ম ও খ্রীস্টের জীবনী, সন্তদের অলৌকিক কাহিনী চালান যায়, তাহা হইলে হয়তো ধর্মান্তরিত খ্রীস্টানগণ হিন্দুধর্ম-সংক্রান্ত কাব্যকাহিনী ও আচারবিচারের প্রতি আকৃষ্ট হইবে না। এই সিদ্ধান্তকে কার্যে রূপায়িত করিবার জন্য

ফাদার টমাস স্টিফেন্‌স্ ১৬১৪ খ্রীঃ অব্দে মারাঠী ভাষায় 'ক্রিশ্চিয়ান পুরাণ' রচনা করিয়া মারাঠী সাহিত্যের এক অভিনব শাখা খুলিয়া দেন। দেশীয় খ্রীস্টান সমাজে এই 'ক্রিশ্চিয়ান পুরাণে'র খুব জনপ্রিয়তা দেখা গিয়াছিল। জনপ্রিয়তার দাবি মিটাইতে গিয়া টমাস স্টিফেন্‌স্ ১৬১৬ খ্রীঃ অব্দে এই কাব্যকে রোমান হরফে ছাপাইয়া প্রচার করেন। কাব্যটি খ্রীস্টানসমাজে এতদূর জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, এই শতাব্দীতে ইহার কয়েকটি সংস্করণ মুদ্রণের প্রয়োজন হইয়াছিল। ফাদার স্টিফেন্‌স্ কিন্তু খাঁটি ইংরাজ মিশনারী ছিলেন, পর্তুগীজ নহেন। তাঁহার 'ক্রিশ্চিয়ান পুরাণে' মারাঠী ছন্দে ওল্ড্ টেস্টামেণ্ট' ও 'নিউ টেস্টামেণ্ট'—উভয় কাহিনীই সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। আর একজন ফরাসী জেসুইট পাদ্রী Father Etienne de La Croix সেণ্ট পিটারের জীবনী অবলম্বনে মারাঠী ভাষায় আর একখানি পুরাণধর্মী কাব্য রচনা করেন। ইহাও রোমান হরফে ১৬২৯ খ্রীঃ অব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি হিন্দুধর্মকে নিন্দা করিয়াছিলেন, হিন্দুর দেবদেবীরাও তাঁহার নিন্দা-বিদ্রূপ হইতে রক্ষা পান নাই। বাঙলা দেশে এই সময়ে এরূপ ব্যাপকভাবে কোনদিন কোন ফাদার এই জাতীয় পুঁথিপত্র রচনা করেন নাই—যদিও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মিশনারীগণ বাংলায় অসংখ্য প্রচারপুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন।[১] ফাদার এণ্টোনিও দে সালদান্‌হা নামক এক পর্তুগীজ পাদ্রী উত্তমরূপে মারাঠী ভাষা শিখিয়া মারাঠী খ্রীস্টানদের জন্য সেণ্ট এ্যাণ্টনির জীবনীবিষয়ক একখানি কাব্য রচনা করেন—ইহারও আদর্শ হিন্দুর পুরাণ ও সন্তসাধকদের জীবনী। ক্রুশবিদ্ধ খ্রীস্ট সম্পর্কেও খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারকগণ কিছু কিছু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

খ্রীস্টান প্রচারকগণ যেমন খ্রীস্টধর্ম প্রচারের জন্য হিন্দুর কাব্যকাহিনী ও ধর্মশাস্ত্রের অনুকরণে খ্রীস্টকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ কয়েকজন মুসলমান কবিও এই শতাব্দীতে মারাঠী সাহিত্যে অবতীর্ণ হইয়া-

---

১ বাঙলাদেশেও মিশনারীগণ পাঁচালীর ধরনের কয়েকখানি খ্রীস্টকাব্য লিখিয়াছিলেন—'খ্রীস্টবিবরণামৃতং', 'নিস্তাররত্নাকর' প্রভৃতি পুস্তিকায় খ্রীস্টের কাহিনী ও খ্রীস্টানধর্ম বর্ণিত হইয়াছে। তবে এই ধরনের পুঁথি অষ্টাদশ শতকের শেষে—অধিকাংশই উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শ্রীরামপুর মিশনারীদের উদ্যোগে রচিত হইয়াছিল। দ্রষ্টব্য: সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ২-১

ছিলেন। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই মুসলমান কবিগণ সকলেই হিন্দুর ধর্ম, পুরাণ, শাস্ত্র-সংহিতায় সু-অভিজ্ঞ ছিলেন, এবং হিন্দুর মতো শ্রদ্ধাভক্তি লইয়াই হিন্দু বিষয়ক কাব্যাদি রচনা করিয়াছিলেন—কেহই স্বধর্ম বিষয়ক কোন ইসলামী কাহিনীতে বা তত্ত্বে হস্তক্ষেপ করেন নাই। শেখ মহম্মদ যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে 'যোগসংগ্রাম', 'পবনবিজয়', 'নিষ্কলঙ্কবোধ' এবং 'জ্ঞানসাগর' শীর্ষক ধর্ম ও সাধনা বিষয়ক কাব্যগুলি উল্লেখযোগ্য। এই কবি হিন্দুসমাজেও অতিশয় শ্রদ্ধেয় হইয়াছিলেন। অম্বর হুসেন খাঁ নামক আর একজন মুসলমান কবি কবিতায় গীতার ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রে অদ্যাপি ইহা 'অম্বর-হুসেনী' নামে পরিচিত। শাহ্‌মুনি, আলম খাঁ, শেখ সুলতান, জামাল শাহ্‌ প্রভৃতি কবিগণ গভীর তত্ত্বদর্শনের কাব্য লিখিয়া হিন্দুসমাজেও সন্ত সাধকের সম্মান পাইয়াছেন।

লিঙ্গায়েত ধর্মসম্প্রদায়ও মারাঠী ভাষায় নিজ নিজ সম্প্রদায়গত ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া কিছু কিছু কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবি সন্ত লিঙ্গপ্‌পা 'কর্ণ হস্তকি' শীর্ষক কাব্যে এই সম্প্রদায়ের নীতি ও তত্ত্বকথা কাব্যাকারে গ্রথিত করিয়াছিলেন। শুনা যায়, জৈনগণও সপ্তদশ শতাব্দীতে মারাঠী ভাষায় জৈন ধর্ম সম্পর্কে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা গেল, ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রে ভক্তিধর্মকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত মহাপুরুষ ও সন্তসম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছিলেন, সপ্তদশ শতাব্দীতেও তাহার জের চলিয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টান কবিসম্প্রদায় মারাঠী কাব্যে নিজ নিজ ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—সংবাদ হিসাবে ইহা মূল্যবান।

অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে শুধু ধর্মসাহিত্যই রচিত হয় নাই, কোন কোন সংস্কৃতজ্ঞ বিদগ্ধ পণ্ডিত সংস্কৃত মহাকাব্যের আদর্শে মারাঠী মহাকাব্যেরও সূচনা করিয়াছিলেন। রঘুনাথ পণ্ডিতের 'দময়ন্তী স্বয়ম্বর' সংস্কৃত 'নৈষধ-চরিত' (শ্রীহর্ষরচিত) অবলম্বনে সংক্ষেপে রচিত হইয়াছিল। কবি সমরাজ সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম অনুসরণ করিয়া 'রুক্মিণীহরণ' রচনা করেন। তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া আরও অনেকে স্বয়ম্বর ধরনের কাব্যকাহিনীতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই শ্রেণীর কাব্য কিছু কৃত্রিম, কিছু-বা মুষ্টিমেয় পণ্ডিত সমাজের জন্য রচিত—ইহার প্রভাব ছিল সীমাবদ্ধ। তাই ধর্মকেন্দ্রিক ভক্তিসাহিত্যই জনসাধারণের মন জয় করিয়া লইয়াছিল।

গুজরাটী সাহিত্য ॥

ষোড়শ শতাব্দীতে মীরাবাঈ, সুরদাস এবং তুলসীদাস গুজরাটী সাহিত্যেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ভক্তি-ধারার সঙ্গে আরও দুই-একটি বিচিত্র কাব্যশাখা ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল, তন্মধ্যে আখ্যানকাব্যশাখা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন কাল হইতে গুজরাটে যেমন পুরাণের গল্পকাহিনী লোকমুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তেমনি রোমান্টিক প্রেম ও দুঃসাহসিকতার বাস্তব গল্প-আখ্যানকে কেন্দ্র করিয়াও অনেকগুলি কাব্য রচিত হইয়াছিল। এই ধরনের গল্পকথা হইতে ধর্মীয় ভক্তিভাব একটু একটু করিয়া অপসৃত হইল, তাহার স্থানে জুড়িয়া বসিল বাস্তব মানুষের গল্প। সামলভট্ট সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে এইরূপ কিছু কিছু আখ্যানকাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

কবি প্রেমানন্দ সপ্তদশ শতাব্দীতে বহু কাব্য লিখিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার সমস্ত কাব্যকাহিনী রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর সাধক নরসি মেহ্টার পূত জীবনকথা অবলম্বনে তিনি একখানি কাব্য রচনা করেন। প্রেমানন্দ রামায়ণ মহাভারত হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিয়া এমন একটা সরল রূপ দিয়াছিলেন যে, জনসাধারণ তাঁহার রচনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছিল। তিনি কাহিনীগ্রন্থনে পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে গুজরাটের লোকজীবনকেও মিলাইয়া দিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার এই সমস্ত কাব্য একটা স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করিয়াছে। বস্তুতঃ প্রেমানন্দই সপ্তদশ শতাব্দীর গুজরাটী সাহিত্যকে গৌরবভূষিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে না পাইলে এই শতাব্দীর গুজরাটী সাহিত্য দীনদুর্বল হইয়াই থাকিত।

ওড়িয়া সাহিত্য ॥

ওড়িয়া সাহিত্যের মধ্যযুগে, বিশেষতঃ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে জয়দেবকে কেন্দ্র করিয়া ভক্তিকাব্যের বান ডাকিয়াছিল। বাঙলার চৈতন্যদেব ভক্তগণ সহ শেষজীবন পুরীধামে অতিবাহিত করেন। তাঁহার প্রভাবে জয়দেবের 'গীতাগোবিন্দে'র প্রতি ওড়িয়া কবিগণ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ক্রমে জনসাধারণের মধ্যেও 'গীতগোবিন্দের' শ্লোকগীতি

ছড়াইয়া পড়িল, পুরী মন্দিরে এই কাব্য গীত হইতে লাগিল। বাঙলা দেশ বাদ দিলে 'গীতগোবিন্দের' এত গভীর ও ব্যাপক প্রভাব অন্য কোন প্রাদেশিক সাহিত্যে দেখা যায় না। ইতিপূর্বে সারল দাস, বলরামদাস এবং জগন্নাথ দাস সরল ওড়িয়া ভাষায় জনসাধারণের প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে 'গীতগোবিন্দের' মঞ্জু শ্লোকাবলীর প্রভাবে সরল ওড়িয়া ভাষায় কৃত্রিম কাব্যকলার জটিলতা প্রবেশ করিল। তাহার সঙ্গে আবার সংস্কৃত কাব্যকলার অলঙ্কার কৌশলও বিশেষভাবে গৃহীত হইল। এই যুগের কবিগণ সরল সুবোধ্য ওড়িয়া ভাষা ছাড়িয়া এমন সমস্ত গুরুভার অভিধানিক শব্দ ও অলঙ্কার ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, তাহার সহিত জনচিত্তের বিশেষ যোগ রহিল না। এই সময়ে উড়িষ্যা মুসলমানের দ্বারা বিজিত হইলে সাহিত্যের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িল। সমগ্র দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারে খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল। কবিগণ তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া পৃষ্ঠপোষক জমিদারদের মনস্তুষ্টির জন্য আদিরসের কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। বলাই বাহুল্য যে, এই জাতীয় কৃত্রিম ও আলঙ্কারিক আদিরসের সাহিত্য জনসাধারণ হইতে দূরে নির্বাসিত হইয়া জমিদারদের সভাতলে কোনও প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। পরবর্তী শতকের গোড়ার দিকে উপেন্দ্র ভঞ্জ অসংখ্য কাব্য রচনা করিয়া এই কৃত্রিম ও বুদ্ধিকেন্দ্রিক ক্লাসিক কাব্যকলার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

মধ্যযুগে যেমন মর্ত্য জীবনকে কেন্দ্র করিয়া রোমান্টিক প্রেমের কাব্য-কাহিনী রচিত হইয়াছিল তেমনি আবার কয়েকজন ভক্ত-কবি আসিয়া কৃত্রিমতার স্থলে অনাবৃত হৃদয়ের স্নিগ্ধ ভক্তিবেদনার স্পর্শ দিয়া রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক চমৎকার পদ রচনা করিয়াছিলেন। দীন কৃষ্ণদাস, অভিমন্যু সামন্ত, বলদেব রথ, গোপাল কৃষ্ণ যে সমস্ত পদ রচনা করেন, তাহা উড়িষ্যায় গ্রাম জনপদ ও নাগরিক জীবনে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে পার্লাকিমেদী-বাসী গোপালকৃষ্ণের পদাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ভক্তকবি বিশুদ্ধ বৈষ্ণবীয় ভক্তির উচ্চলোকে পদাবলী সাহিত্যকে স্থাপিত করিয়া মধ্যযুগীয় ওড়িয়া গীতিশাখার গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন। তাই কেহ কেহ তাঁহাকে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন। যাহা

হউক সপ্তদশ শতাব্দীর ওড়িয়া সাহিত্যে যে নূতনত্বের স্পর্শ লাগিয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

আসামী সাহিত্য ॥

সপ্তদশ শতাব্দীর আসামী সাহিত্যের বিরাট কোন ঐতিহ্য দেখা না গেলেও আসাম ও কুচবিহারের রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত—প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া নানা কবি পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্যাদি অবলম্বনে অনেকগুলি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে শঙ্করদেবের আবির্ভাবের ফলে আসামে যে ভক্তির ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়, সপ্তদশ শতাব্দীতেও তাহার জের চলিয়াছিল। সংস্কৃত পুরাণ, মহাকাব্য ইত্যাদি আসামী ভাষায় রূপান্তরিত করিবার বিশেষ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কবিরা দেখিলেন যে, ভক্তিরস ও কাব্যকাহিনী দেবভাষার মধ্যে বন্দী হইয়া থাকিবার জন্য অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত জনসাধারণ তাহা হইতে কোন রস পায় না। তখন কুচবিহাররাজ নরনারায়ণ অনেক কবি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারা সরল ভাষায় নানা পুরাণ-উপপুরাণের অনুবাদ করাইতে লাগিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে এই ব্যাপার আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত অনুবাদ গ্রন্থ আসাম প্রদেশে বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।

এই সময়ে অহোমরাজগণ (পূর্ব-আসাম) হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া কবি-পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা অনেকে কবিকে পুরস্কৃতও করিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই অহোমরাজের উৎসাহে আসামী ভাষায় সংস্কৃত কাব্যপুরাণাদি অবলম্বনে অনেক গ্রন্থ রচিত হইতে লাগিল। অহোমরাজ রুদ্রসিংহ ও তাঁহার তিনপুত্র এই বিষয়ে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। এইযুগের প্রসিদ্ধ কবি কবিরাজ চক্রবর্তী ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও কালিদাসের শকুন্তলার কাব্যানুবাদ করেন। অহোম রাজাদের অনেকে কাব্য রচনা করিতে পারিতেন। রাজকুমার রাজেশ্বর সিংহ 'কীচকবধ' শীর্ষক কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এইযুগে তালপাতার চিত্রবিচিত্র পুঁথিতে অনেক কাব্য পাওয়া গিয়াছে, যাহার অধিকাংশই সংস্কৃতের অনুকরণে রচিত হইয়াছিল। যাহা হউক সপ্তদশ

শতাব্দীতে আসামী সাহিত্যে সংস্কৃত পুরাণ ও কাব্যাদির অনুকরণ ভিন্ন মৌলিক কোন বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য কাব্য রচিত হয় নাই।

সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ও পরিণতির পাশে আমরা সমকালীন প্রধান প্রধান য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্যই বা কোথায়, দীনতাই বা কোথায়। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজী, ফরাসী ও জার্মান সাহিত্যের সঙ্গে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের কোন দিক দিয়াই তুলনা চলিতে পারে না। কারণ এই শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে একতারা যন্ত্রের মতো শুধু ধর্মসঙ্গীত ও ধর্মকাহিনী একটানা একঘেয়ে সুরে বাজিতেছিল। এই শতাব্দীর পাশ্চাত্য সাহিত্যেও ধর্মীয় সুর প্রবলভাবে অনুরণিত হইতেছিল, সমগ্র ষোড়শ শতাব্দী ধরিয়া সারা য়ুরোপেই ধর্মীয় তত্ত্ব, আচার-আচরণ ও আদর্শের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সাহিত্যের একটা বড় অংশ ধর্মনৈতিক কলহকে কেন্দ্র করিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও বিদেশী সাহিত্যে যে জাগ্রত জীবনপিপাসা উপলব্ধি করা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীর দেবকৃপানির্ভর বাংলা সাহিত্যে তাহার স্বাদ-গন্ধ খুঁজিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। উপরন্তু তখনও গদ্য রচনা বাংলা সাহিত্যে আরম্ভ হয় নাই. যাত্রা পাঁচালী—ঝুমুর গান প্রচলিত থাকিলেও তখনও পুরামাত্রায় কোন নাটক রচিত হয় নাই, নাটমঞ্চও ছিল না। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তৎকালীন পাশ্চাত্য সাহিত্যের কোনও প্রকার তুলনা চলিতে পারে না।

কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের তুলনা করিয়া বাঙালী সাহিত্যিকসমাজ গৌরব বোধ করিতে পারে। বিষয়-বৈচিত্র্যে ততটা না হইলেও রচনার সৌকুমার্য ও কবিপ্রাণের গভীর অনুভূতিতে বাংলা সাহিত্যের আপেক্ষিক উৎকর্ষ সহজেই বুঝা যাইবে। অবশ্য হিন্দী-মারাঠী-গুজরাটী সাহিত্যে ধর্মবিরহিত যে সমস্ত আখ্যানকাব্য,রোমান্টিক গল্প ও ঐতিহাসিক কাহিনী রচিত হইয়াছিল, বাংলা সাহিত্যে তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্তের একান্ত অভাব এই সাহিত্যের একদিকের শূন্যতাকেই প্রকটিত করিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশের উপর দিয়া নানা

ঐতিহাসিক ঝড়ঝঞ্ঝা বহিয়া গেলেও সাহিত্যে তাহার স্পর্শ লাগে নাই, তাহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের চক্রাবর্তন পূর্ণ হইল। ইহার পর অর্ধ শতাব্দী (অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ) ধরিয়া শুধু পুরাতন কাব্যধারার অক্ষম পুনরাবৃত্তি চলিয়াছে, জীবনপাত্রে তখন শুধু অবশেষটুকু পড়িয়া ছিল—এই অর্ধশতাব্দীর সাহিত্য-প্রচেষ্টায় সেই অক্ষমতা ও পর্যুসিত জীবনের ক্লান্ত রোমন্থন উৎকট আকারে ধরা পড়িয়াছে। পরবর্তী পর্বে আমরা সংক্ষেপ তাহার কথাই আলোচনা করিব।

———

দ্বি তী য় প র্ব

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ

দশম অধ্যায়

পটভূমিকা

সূচনা ॥

ইতিপূর্বে প্রথম পর্বের অন্তর্ভুক্ত সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা উক্ত শতাব্দীর সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাসের বিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছি। সেই বিবর্তনে একটা কথা বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের শাখাপ্রশাখা বৃদ্ধি পাইয়াছে, প্রচুর পুঁথিপত্র রচিত হইয়াছে, পুরাতন কাব্যের অসংখ্য নকল হইয়াছে ; কিন্তু গুণগত উৎকর্ষ ক্রমেই ম্লান হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙালীর সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সাধনার চূড়ান্ত বিকাশ হইয়াছিল, সপ্তদশ শতাব্দীর কিছুকাল ধরিয়া তাহার জের চলিলেও একথা বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, বাঙালীর সাহিত্য ও সাধনার পূর্ণচন্দ্রে গ্রহণ লাগিয়াছে। রাষ্ট্রে লোভী ও অত্যাচারী মুঘল সুবাদারের হস্তক্ষেপ, দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণের চূড়ান্ত প্রকাশ, জমিদারী ব্যবস্থার আংশিক বিনাশ, বিদেশী বণিকের শনৈঃ শনৈঃ ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিপত্তি লাভ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনায় বাঙালী-জীবন যে কিরূপ দুর্যোগের মধ্যে নামিয়া আসিল তাহা বুঝা গেল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, আলমগীর বাদশাহ ঔরংজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) পর। তখন দিল্লীর সিংহাসন লইয়া ঔরংজেবের বংশধরদের শবমাংসভুক শ্বাপদের মতো কাড়াকাড়ি, আহ্‌মদশাহ্‌ আবদালির ভারত আক্রমণ, মারাঠা শিখ শক্তির নবোদ্যমে উত্থান, দিল্লীর সভাতলে ও পণ্যবিপণিতে বিদেশী বণিকের সতর্ক পদসঞ্চার—এই ভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই আসন্ন রাত্রির দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিল।

বাঙলা দেশের রাষ্ট্র ও সমাজেও সর্বনাশা বিনাশের মারীবীজ চতুর্দিকে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে যেমন সমগ্র উত্তরাপথে মনুষ্যত্বহীন অবক্ষয়ী সমাজ-আদর্শ মুসলমান শক্তিকে কোনও বাধা দিতে

পারে নাই, ঠিক সেইরূপ রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও ঐতিহ্যগত অধঃপতন অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সমগ্র ভারতবর্ষেই দ্রুততর হইল—আর সেই অধঃপতিত জাতির জীবনসন্ধ্যায় দূর দিগন্ত হইতে নূতন ইশারা ভাসিয়া আসিল। পশ্চিম সমুদ্র-তীরবাসী শ্বেতবণিক এই অরাজকতা, সামাজিক অবক্ষয় ও নৈতিক হতাশার চূড়ান্ত সুযোগ গ্রহণ করিল—নূতন যুগের আনা-গোনা শুরু হইয়া গেল। তবে রাত্রি প্রভাতের পূর্বে গাঢ় অন্ধকারের যবনিকা যেন কিছুতেই অপসারিত হইতে চাহে না। ঔরংজেবের মৃত্যু (১৭০৭) হইতে পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) কাল—এই অর্ধশতাব্দীই জাতীয় জীবনের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের কাল। মুঘল মহিমা অনেক পূর্বেই সমাধিস্থ হইয়াছে, শাসনব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। দুই একজন সুবাদার বাঙলাকে শোষণ করিয়া, ঐশ্বর্য-বিলাসে ঘৃণ্য জীবন যাপন করিয়া বাঙলার রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে অনেক পূর্বেই অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সমাজেও তখন ঘুণ ধরিয়াছিল, পুরাতন ভূস্বামিসম্প্রদায় ক্ষমতাচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল, শিক্ষাদীক্ষাও প্রায় সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইতে বসিয়াছিল,—এই অর্ধ শতাব্দী বাঙলা দেশের পক্ষে চূড়ান্ত হতাশার কাল; চারিত্র, মনুষ্যত্ব, সুস্থ জীবন—সব দিক দিয়াই বাঙালী-জীবনে ক্ষয়ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সাহিত্যের দিক দিয়াও এরূপ বন্ধ্যাযুগ কদাচিৎ দেখা দিয়াছে। অবশ্য রাশি রাশি পুঁথি নকল করা হইয়াছে, পুরাতন ধারার উচ্ছিষ্টাবশেষ অবলম্বনে চর্বিত চর্বণের চেষ্টাও হইয়াছে অজস্র। কিন্তু সেই স্তূপাকার পুঁথি হইতে সাহিত্য ও জীবনের কোন আশাপ্রদ বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পুরাতনের নকল, নকলের নকল—এই ভাবেই সাহিত্য চলিয়াছিল ক্লান্ত মন্থর পদচারণায়। অপরদিকে রাষ্ট্র ভাঙিল, সমাজ ভাঙিল, জীবনের সুস্থ আদর্শ ভাঙিল, এবং জীবন হইতে যে সাহিত্যের জন্ম হয়—তাহাও ভাঙিয়া পড়িল। তাই বাঙলা দেশের অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে ভাঙিয়া পড়ার ইতিহাস বলা যাইতে পারে। সে কথা স্পষ্ট হইবে এই যুগের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে। সর্বপ্রথমে এই যুগের রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় লওয়া যাক।

১

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের

ই তি হা স বি ব র্ত ন

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইতিহাস বাঙলা দেশে যে পরিবর্তন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহার উত্তাপ বাঙালী জনসাধারণকেও স্পর্শ করিয়াছিল, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলেও পরোক্ষ যোগাযোগ অস্বীকার করা যায় না। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর তাঁহার সন্তানসন্ততিদের মধ্যে দ্বন্দ্বকলহের ফলে রাজনৈতিক ইতিহাসে ঘন ঘন পালা বদল চলিতেছিল, ফলে শাসনগত শিথিলতা সৃষ্টি হইয়াছিল। বিদেশী বণিক-দের অসাধুতার ফলে দেশের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কাঠামোও বিপর্যস্ত হইয়াছিল। সর্বোপরি বর্গীর হাঙ্গামার ফলে পশ্চিমবঙ্গের ধনপ্রাণ, মান-ইজ্জত এমনভাবে লুণ্ঠিত হইয়াছিল যে, বাঙালী সে দুঃস্বপ্নের কথা বহুদিন ভুলিতে পারে নাই। এরূপ অব্যবস্থার যুগে মৌলিক সৃষ্টিক্ষম প্রতিভা আত্মপ্রকাশের পথ পায় না; তখন শুধু পুরাতনের রোমন্থন চলিতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্যেও সেই অবক্ষয়ী জীবন এবং সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার গভীর ছায়াপাত হইয়াছে। যাহা হউক এই অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে চারি জন সুবাদার বাঙলার ইতিহাসে বিচরণ করিয়াছিলেন—মুর্শিদকুলি খাঁ, সুজা উদ্দিন, আলীবর্দি খাঁ, ও সিরাজদ্দৌলা। মুর্শিদ ও আলীবর্দি বাঙলার মসনদকে নানা দিক দিয়া নিরাপদ করিয়া উত্তরাধি-কারীদের হস্তে তুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, আংশিক সফলও হইয়াছিলেন। কিন্তু নানা ঐতিহাসিক কারণে সেই মসনদ ভাঙিয়া পড়িল, অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই ইংরাজ বণিক মুঘল রাজশক্তিকে হঠাইয়া দিয়া ছলে-বলে-কৌশলে সেই মসনদ অধিকার করিল।

মুর্শিদকুলি খাঁ॥

মুঘল সুবাদারদের মধ্যে মুর্শিদকুলি খাঁ যে একজন অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শাসন ও রাজস্ব বিষয়ে তাঁহার সূক্ষ্ম জ্ঞান এখনও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করিয়া থাকে। ঔরংজেবের জীবিতকালে

১৭০০ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে মুর্শিদ বাঙলার দেওয়ান হইয়া আসেন এবং ১৭২৭ খ্রীঃ অব্দে সুবাদার ও দেওয়ানের উভয় কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়া বাঙলায় মাটি গ্রহণ করেন। তিনিই বাঙলা দেশে স্বাধীন শাসক বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ মুর্শিদকুলি ও আলীবর্দির সুবাদারী কালে বাঙলা দেশের কোন কোন ক্ষেত্রে যে কিছু উন্নতি হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। আলীবর্দির সময় বর্গীর হাঙ্গামার ফলে সেই শান্তি, শৃঙ্খলা ও সচ্ছলতা নষ্ট হইয়াছিল। সে যাহা হউক, ঔরংজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন লইয়া ঘন ঘন পরিবর্তন এবং তাহার ফলে নানা স্থানে অব্যবস্থার সৃষ্টি হইলেও মুর্শিদকুলি খাঁ ও আলীবর্দি খাঁয়ের শাসনে বাঙলায় তাহার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নাই।

১৭০০ খ্রীঃ অব্দে হায়দ্রাবাদের দেওয়ান কারতালব খাঁ ঔরংজেব কর্তৃক বাঙলার দেওয়ান ও মুখসুদাবাদের ফৌজদার নিযুক্ত হন। তাঁহার কর্মদক্ষতায় খুশি হইয়া ১৭০২ খ্রীঃ অব্দে ঔরংজেব তাঁহাকে 'মুর্শিদকুলি খাঁ' উপাধি দান করেন। পরে তিনি এই নামেই প্রসিদ্ধ হন। শুনা যায় তিনি হিন্দু-সন্তান ছিলেন।[১] অবশ্য পরবর্তী কালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া তিনি হিন্দুসমাজের উপর উৎপীড়ন করিতে কসুর করেন নাই। ১৭০৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি বাঙলার সহকারী সুবাদার হইলেন, দেওয়ানী পদও রহিল। কিন্তু ঔরংজেবের মৃত্যুর পর তাঁহাকে কিছুটা পদাবনতির অগৌরব সহ্য করিতে হইয়াছিল। ১৭০৮-৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি বাঙলা হইতে দূরে দাক্ষিণাত্যে দেওয়ানের পদে যোগদানের জন্য প্রেরিত হন। যাহা হউক, নানা ভাগ্য-বিপর্যয়ের পর তিনি পুনরায় পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ১৭১৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি দিল্লীর বাদশাহ কর্তৃক "মুতামন-উল-মুলক আলাউদ-দৌলা জাফর খাঁ বাহাদুর, নাসিরি, নাসিরি জঙ্গ" এই গালভরা উপাধিতে ভূষিত হইয়া বাঙলার পুরাপুরি সুবাদারী লাভ করিলেন। যখন ঔরংজেবের পৌত্র

১ মুর্শিদকুলি খাঁ দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। বাল্যকালে হাজি সফি ইসফাহানী নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে ক্রয় করিয়া মুসলমান করেন। তখন তাঁহার নামকরণ হয় মুহম্মদ হাজি। হিন্দু থাকাকালীন তাঁহার নাম বা অন্যান্য পরিচয় জানা যায় না। ইহার পর তিনি পারস্যে নীত হন এবং সেখানে ইসলামী শিক্ষাদীক্ষায় অভিজ্ঞ হইয়া ওঠেন। দ্রষ্টব্য : HOB—II, pp. 399-400

আজিম-উশ-সান (প্রথম বাহাদুর শাহের পুত্র) বাঙলার সুবাদার ছিলেন (১৬৯৭-১৭১২), তখন মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙলার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত ছিলেন। সুবাদার ও দেওয়ানে নিত্য মতান্তর হইত বলিয়া নিজ নিরাপত্তার জন্য মুর্শিদ রাজধানী ঢাকা নগরী ত্যাগ করিয়া মুখসুদাবাদে দেওয়ানী উঠাইয়া লইয়া আসেন। তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম হয় মুর্শিদাবাদ। প্রথম বাহাদুরশাহের মৃত্যুর পর (১৭১২) তাঁহার পৌত্র ফারুক সায়ার (আজিম উশ্-সানের পুত্র) দিল্লীর সিংহাসন দাবি করিয়া বসিলেন। ছোট খাট যুদ্ধবিগ্রহের পর ফারুক সায়ারই শেষ পর্যন্ত সিংহাসন অধিকার করিলেন (১৭১৩)। মুর্শিদ প্রথমে তাঁহাকে বাধা দিলেও যখন সম্রাট-পৌত্র সত্যই বাদশাহ বনিয়া গেলেন, তখন মুর্শিদ আর তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন না, তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া কুর্নিশ জানাইলেন এবং বাঙলা হইতে প্রচুর রৌপ্যমুদ্রা উপঢৌকন স্বরূপ নূতন বাদশাহকে প্রেরণ করিলেন।

১৭১৭ খ্রীঃ অব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ বাদশাহ্ কর্তৃক বাঙলার সুবাদার নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর তিনিই বাঙলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইলেন। দিল্লীর সম্রাট তখন অন্তর্ঘাতী বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রে এমন জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন যে-সুবার প্রতি মনোযোগ দিবার সময় পান নাই। বার্ষিক রাজস্ব হাতে পাইলেই তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন। এই সুযোগে মুর্শিদ বাঙলার রাজস্ব-ব্যবস্থার পাকাপাকি সুবন্দোবস্ত করিলেন, ফলে ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মচারীদের অত্যাচারও অনেকটা হ্রাস পাইল। কারণ সুবাদার ও দেওয়ান তখন একই ব্যক্তি। অবশ্য মুর্শিদকুলি খাঁ প্রাপ্য রাজস্বের এক কপর্দকও ছাড়িতেন না, এবং তাহা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া না পাইলে আদায়ের জন্য যে-কোন ঘৃণ্য ও নির্মম পন্থা অবলম্বনে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু প্রাপ্যের অতিরিক্ত আদায়ের প্রতি তাঁহার কোন লালসা ছিল না। রাজস্ব ব্যবস্থার সুবন্দোবস্তের ফলে তাঁহার সুবাদারী কালে কিছুদিন বাঙলার ভাগ্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া আসিয়াছিল।

অন্যান্য সুবাদারদের তুলনায় (শায়েস্তা খাঁ, খান জাহান, আজিম উশ্শান প্রভৃতি) মুর্শিদকুলি লোভী ছিলেন না। তাঁহার সময়ে বাড়তি 'আবওয়াব' ধরা বন্ধ হইয়া যায়—তিনি নিজেও খুব সংযত জীবন যাপন করিতেন। অবশ্য কোন কোন বিষয়ে সুবাদার সাহেব অত্যন্ত নির্মম

ছিলেন। হিন্দু জমিদারগণ রাজস্ব দিতে অপারগ হইলে বা বিলম্ব করিলে তিনি তাহাদিগকে অমানুষিক শাস্তি দিতেন, অনেককেই বলপূর্বক মুসলমান করিতেন। কিন্তু চরিত্রদুষ্টি ও অন্যান্য ঘৃণ্য আচরণ হইতে তিনি দূরে থাকিতেন। যাহা হউক তাঁহার সুবাদারী কালে বাঙলার শাসন ও অর্থনৈতিক অবস্থার যে একটু উন্নতি হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। সমসাময়িক ঐতিহাসিক সলিমুল্লা তাঁহার 'তারিখ-ই-বঙ্গালা'তে বলিয়াছেন যে, মুর্শিদাবাদের কোষাগারে প্রতিবৎসর বাড়তি টাকা রাখিবার জন্য মুর্শিদকুলি নূতন নূতন লোহার সিন্দুক নির্মাণ করাইলেও অসহায় বুভুক্ষু জনসাধারণ গোমহিষাদির মতো মারা পড়িত।[২] অথচ মুর্শিদাবাদের কোষাগারে সোনারূপা হীরা জহরতে ধূলা জমিত![৩] তখন ঐশ্বর্য বলিতে রাজ-কোষাগারে সঞ্চিত স্তূপীকৃত টাকাকড়ি সোনা-রূপাকেই বুঝাইত। জনসাধারণের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। যাহা হউক মুর্শিদকুলি রাজস্ব ও শাসনের সুবন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ানী বিভাগে বিশ্বাস-ভাজন পদস্থ হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করিয়া, ইংরাজ ও অন্যান্য বণিকদের ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিয়া খানিকটা যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সলিমুল্লা ('তারিখ-ই-বঙ্গালা') ও গোলাম হুসেন ('রিয়াজ-উস-সালাতিন') মুর্শিদকুলি খাঁর চরিত্রের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ইসলামী আদর্শ ও আচার নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিতেন, স্বহস্তে কোরান নকল করিতেন, দুই হাজার কোরানপাঠককে ভরণপোষণ দিতেন। অশনেবসনে তিনি প্রায় ঔরংজেবের মতো মিতব্যয়ী ও সদাচারী ছিলেন। দেশে দুর্ভিক্ষ মড়ক লাগিলে তিনি যথাসাধ্য দান-খয়রাত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। নিজে ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন,

---

২ Salimullah—*Tārikh-i-Bangala* (Tr. by Gladwin)

৩ পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে গিয়া কোষাগারের দ্বার খুলিয়া তাজ্জব বনিয়া গিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে পার্লামেণ্টে সিলেক্ট কমিটীর কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "I walked through vaults which were thrown open to me alone, piled on either hand with gold and jewels!"

দরবারে অনেক জ্ঞানীগুণী উলেমাকে স্থান দিয়াছিলেন। শাসন ও বিচার বিভাগে তাঁহার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে মোল্লা বা কাজীর বিচারের মতো অবিচার ঘটিত না। স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে তিনি বিশুদ্ধ জীবন যাপন করিতেই অভ্যস্ত ছিলেন, একস্ত্রী লইয়া সুখে বাস করিয়া গিয়াছেন। হারেমে খোজা প্রহরী ও আওরত সম্বন্ধে তিনি সর্বদা সতর্ক হইয়া থাকিতেন, যাহাতে শুদ্ধান্তঃপুরে অনাচার প্রবেশ করিতে না পারে। তাঁহার চরিত্রে এই রূপ নানা সদ্‌গুণ ছিল। ব্রাহ্মণ-সন্তান মুর্শিদকুলি খাঁ মুসলমান হইয়াও ব্রাহ্মণের মতো ভোগবিলাসহীন সরল জীবন যাপন করিয়া সে যুগের মুসলমান ঐতিহাসিকের প্রশংসা ভাজন হইয়াছিলেন। অবশ্য ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ এরূপ মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করেন নাই। স্টুয়ার্ট সাহেব তাঁহার গ্রন্থে[৪] বলিয়াছেন যে, মুর্শিদের চরিত্রে কিছু কিছু সদ্‌গুণ থাকিলেও তিনি নির্মম ও প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন। উপরন্তু তাঁহার ধর্মমতের উগ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা তাঁহাকে উদারমতি শাসকে পরিণত হইতে দেয় নাই। গোলাম হুসেন, সলিমুল্লা ও স্টুয়ার্ট—তিনজনের মন্তব্যের কিছু কিছু গ্রহণ-বর্জন করিয়া লইলে দোষে-গুণে মুর্শিদকুলি খাঁকে সেকালের পক্ষে একজন বিচক্ষণ শাসক বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। হিন্দু জমিদার, ভূস্বামী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার উৎপীড়নের অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা ঠিক বটে। কিন্তু সেই দুষ্কৃতি হইতে কোন্ মুসলমান শাসকই-বা সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন?

১৭২৭ খ্রীঃ অব্দে মুর্শিদকুলি খাঁয়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার জামাতা সুজা উদ্দিন মুহম্মদ খাঁ বাঙলা ও উড়িষ্যার সুবাদার হইলেন। কারণ মুর্শিদকুলির কোন পুত্রসন্তান ছিল না। অবশ্য জামাতার সঙ্গে শ্বশুরের সম্পর্ক বেশ মধুর ছিল না, যদিও মুর্শিদকুলির চেষ্টাতেই সুজা উদ্দিন উড়িষ্যার সহকারী সুবাদার হইয়াছিলেন। সুজা উদ্দিনের পুত্র সরফরাজ খাঁ—তিনি আলীবর্দির দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন।

সুজা উদ্দিন ॥

জীবিতকালেই মুর্শিদকুলি দৌহিত্র সরফরাজকে নিজের গদিতে বসাইতে

৪ *History of Bengal* (1810), Chap. VII

চেষ্টা করিয়াছিলেন, কারণ তিনি তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং জামাতাকে বড় একটা পছন্দ করিতেন না। অকস্মাৎ মৃত্যু আসিয়া তাঁহার এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে দিল না। সুজা উদ্দিন দিল্লীর দরবারে প্রভাব বিস্তার করিয়া বাঙলা ও উড়িষ্যার সুবাদার হইলেন এবং সুবাদারী লাভ করিয়াই প্রিয়পাত্র ও বন্ধুবান্ধবদিগকে বড় বড় পদে নিযুক্ত করিলেন। পুত্র সরফরাজকে নামেমাত্র দেওয়ানী পদ দেওয়া হইল। আলীবর্দি, আলমচাঁদ প্রভৃতি উপদেষ্টা ও শুভানুধ্যায়ীদের তিনি রাতারাতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রধান কর্মচারী আলীবর্দি খাঁ ও আলীবর্দির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহ্‌মদ সুজা উদ্দিনের উপর গুরুতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সুজার সময়েই মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ বংশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সুবাদার ইঁহাদের উপদেশেই শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন।

সুজা উদ্দিন সুবাদার হইয়া মোটামুটি বুদ্ধি বিবেচনা ও কর্মশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজস্ব না দিতে পারায় যে সমস্ত জমিদার মুর্শিদকুলির দ্বারা কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, সুজা তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া সদ্‌বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলির সময়ে যে সমস্ত জমিদার গোপনে গোপনে তাহার বিরুদ্ধতা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সুজা উদ্দিনের সদয় ব্যবহারের ফলে তাঁহারা কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। তাঁহার নির্দেশে মুর্শিদাবাদ শহরে অনেক ভালো ভালো বাগ-বাগিচা কোঠা-বালাখানা নির্মিত হইল, শহরের শ্রী ফিরিয়া গেল। সামরিক বিভাগে প্রায় আড়াই লক্ষ্য সৈন্য নিযুক্ত করিয়া তিনি নিজ নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন। উপরন্তু বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যা—তিনটি প্রদেশের সহকারী সুবাদার নিযুক্ত হইলে তাঁহার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইল।

তিন সুবার বিরাট অংশকে কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করিয়া সুজা উদ্দিন উহার কিয়দংশ নিজ প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে রাখিলেন এবং বাকি অংশগুলির শাসনভার নবাব নাজিমদের (সহকারী সুবাদার) হস্তে অর্পণ করিলেন। পুত্র সরফরাজ খাঁয়ের উপর ঢাকা বিভাগের শাসন অর্পিত হইল। সুজা উদ্দিন পদস্থ হিন্দুকর্মচারীগিকে বিশেষ সম্মান করিতেন। যশোবন্ত রায় নামক এক হিন্দু কর্মচারী ঢাকার দেওয়ান হইয়া সরকারী কর্মে খুব বিচক্ষণ-তার পরিচয় দিয়াছিলেন। অবশ্য সুজার শাসনকালের শেষের দিকে তাঁহার

পরিবারে ও শাসনবিভাগে নানা বিশৃঙ্খলা ঘনাইয়া আসিল, অনেক জমিদার বিদ্রোহী হইল। তিনি নিজের চরিত্রটিও বিশেষ শুদ্ধ রাখিতে পারেন নাই। হারেমের হুরীপরী লইয়া তিনি বৃদ্ধবয়সে মাতিয়া উঠিলেন এবং শাসনকার্যে উদাসীন হইয়া রহিলেন। ফলে শাসনবিভাগে নানা বিশৃঙ্খলা প্রবেশ করিল। ১৭৩৯ খ্রীঃ অব্দে বৃদ্ধ সুজা উদ্দিন জমিনের মায়া কাটাইয়া জমি লইলেন, মৃতদেহ মুর্শিদাবাদের অদূরে তাঁহার অতি প্রিয় স্থান ডাহাপাড়া গ্রামে সমাহিত হইল। পুত্র সরফরাজ 'আলা-উদ্দৌলা হায়দার জং' এই উপাধি লইয়া মসনদে বসিয়া তিন সুবার মালিক হইলেন—নিরাপদেই ইহা সমাধা হইয়া গেল।

সরফরাজ মসনদে অধিষ্ঠিত হইয়া কিছুকাল নিরুপদ্রবে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। মুমূর্ষু পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সরফরাজ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, পিতার পুরাতন কর্মচারীদিগকে তিনি তাঁহাদের নিজ নিজ পদে বহাল রাখিবেন। সুবাদার হইয়া তিনি সেই প্রতিজ্ঞানুসারে কাজ চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু দেশ শাসন করিবার মতো কোনরূপ বুদ্ধি, চরিত্র ও শক্তিসামর্থ্য তাঁহার ছিল না। তিনি অচিরে মুসলমান ওমরাহদের মতো কুৎসিত আমোদপ্রমোদে আসক্ত হইয়া পড়িলেন, এবং শাসনকার্য হইতেও হাত গুটাইয়া লইলেন। পিতার সদগুণের কোনটিই তিনি পান নাই, কিন্তু দোষগুলি পাইয়াছিলেন পুরামাত্রায়। দেড় হাজার আওরত লইয়া মুর্শিদাবাদের 'চিহিল সাতুনে' (চল্লিশ থামের প্রাসাদ) তিনি দিব্য আরামে দিন কাটাইতে লাগিলেন। সুযোগ বুঝিয়া ধূর্ত উলেমা-মোল্লার দল তাঁহাকে মিষ্ট কথায় বশ করিয়া বেশ কিছু গুছাইয়া লইল। বুদ্ধিভ্রষ্ট কামুক সরফরাজ ক্রমেই আসমান-জমিনের ফারাক ভুলিয়া মাটিতেই বেহেস্ত রচনার দিবাস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। ফলে দেশের শাসন ও শৃঙ্খলা প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল; আমীর-ওমরাহ, জমিদার, বণিক ও কর্মচারীরা নবাবের উপর নবাবী করিতে লাগিল। অবশ্য সরফরাজের খোয়াব দেখিবার দিন ক্রমেই হ্রস্ব হইয়া আসিতে লাগিল। অন্যতম প্রধান ব্যক্তি আলীবর্দি খাঁয়ের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে যুদ্ধে সরফরাজ নিহত হইলে (১৭৪০) বাঙলার মসনদ বিশ্বাসঘাতক কিন্তু বিচক্ষণ প্রবীণ আলীবর্দির দ্বারা অধিকৃত হইল।

আলীবর্দি খাঁ। ॥

আরব-তুর্কী বংশোদ্ভূত মির্জা মহম্মদ আলী এবং তাঁহার অগ্রজ মির্জা আহম্মদ—দুই ভাই ভাগ্যান্বেষীরূপে আবির্ভূত হইলেও শুধু বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার দ্বারাই কনিষ্ঠ মির্জা মহম্মদ আলী বাঙলার মসনদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনিই বাঙলার নবাব আলীবর্দি খাঁ। প্রথমে তাঁহাদের পিতা আজমশাহের (ঔরংজেবের পৌত্র) সামান্য কর্মচারী ছিলেন। ইহার পর নানা দুঃখকষ্টে দুই ভাই সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেন। কিন্তু তাঁহারা সুজা উদ্দিনের কর্মে যোগ দিয়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার গুণে অল্পদিনের মধ্যেই সুবাদারের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হন এবং ক্রমে ক্রমে উচ্চ পদ লাভ করেন। সুজা উদ্দিনই কনিষ্ঠ ভাই মির্জা মহম্মদকে 'আলীবর্দি খাঁ' উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি এই নামেই পরিচিত হন। তাঁহার উপদেশেই সুজা উদ্দিনের শাসনকার্য এত শৃঙ্খলার সঙ্গে চলিত।[৫] সুজা উদ্দিন আলীবর্দির উপর এত সন্তুষ্ট ছিলেন যে, তাঁহাকে ১৭৩৩ খ্রীঃ অব্দে বিহারের সহকারী সুবাদারের পদ দিয়াছিলেন। আলীবর্দিও অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে এই কর্মভার পরিচালনা করিয়া নিজ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

সুজা উদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার অপদার্থ পুত্র সরফরাজ খাঁ বাঙলার সুবাদার হইলে তাঁহার অপদার্থতার সুযোগ লইবার অভিপ্রায়ে আলীবর্দি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তলে তলে ষড়যন্ত্রের জাল পাতিলেন। তখন দিল্লীর মুঘল বাদশাহও হতবল হইয়া পড়িয়াছেন। কারণ তৎপূর্বেই নাদির শাহের আক্রমণে তিনি এতটা ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন যে, কোন সুবায় কোনরূপ অন্যায় অনুষ্ঠিত হইলে তাহার প্রতিবিধান করিবারও তাঁহার কোন সামর্থ্য ছিল না। দিল্লীর দুর্বলতা ও সরফরাজের অপদার্থতায় উল্লসিত আলীবর্দি সরফরাজের সভাসদদের মধ্যে কয়েকজনকে হাত করিয়া তাহাদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ষড়যন্ত্রের মূল লক্ষ্য—মসনদ হইতে প্রভুপুত্রের বিতাড়ন।

---

৫ কেহ কেহ মনে করেন যে, এই দুই ভাই নিজ ইষ্ট সাধনের জন্য যে কোন পন্থা গ্রহণ করিতেন। সলিমুল্লা, হলওয়েল প্রভৃতির মতে আলীবর্দি ও তাঁহার অগ্রজ—কামুক সুজাউদ্দিনের হারেমে নিজেদের অন্তঃপুরিকাদের পাঠাইয়া সুবাদারের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কেহ কেহ আবার এই বৃত্তান্তকে অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করেন। দ্রষ্টব্য—HOB—II, p, 437–438

এদিকে সরফরাজও এই ব্যাপারের আভাস পাইয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মসনদ লইয়া রাজসভার ষড়যন্ত্র প্রথম শুরু হয় এই সময় হইতে। ১৭৩৯-৪০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্র শক্তি অর্জন করিল এবং বিহারের সহকারী সুবাদার আলীবর্দি খাঁ সরফরাজকে আক্রমণ করিবার জন্য লোক-লস্কর সেনা-বাহিনী লইয়া ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দের মার্চ মাসে আজিমাবাদ (পাটনা) ত্যাগ করিয়া রাজমহলে উপস্থিত হইলেন। এখানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহম্মদও সরফরাজের চোখে ধূলা দিয়া কনিষ্ঠের সঙ্গে মিলিত হইলেন। যাহা হউক গিরিয়ার প্রান্তরে যুদ্ধার্থী দুই দল হাজির হইল। একদিকে বিহারের সহকারী সুবাদার আলীবর্দি খাঁ, আর একদিকে সুবে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সরফরাজ খাঁ। আলীবর্দির কূট বুদ্ধির ফলে সরফ-রাজ গভীর রাত্রিতে অতর্কিতে আক্রান্ত হইলেন এবং গুলিবিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। আলীবর্দি বিজয়গর্বে সসৈন্যে আত্মীয়স্বজনসহ মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়া 'চিহিল সাতুনে' সাড়ম্বরে সুবাদার হইয়া বসিলেন।

অতি ধূর্ত আলীবর্দি সরফরাজের পরিবারবর্গের সহিত সদয় ব্যবহার করিয়া এবং যথাযোগ্য জনে প্রচুর অর্থ উপঢৌকন দিয়া মুর্শিদাবাদের প্রতিকূল শক্তিকে নিজ করায়ত্ত করিলেন। ইতিমধ্যে এই নূতন সুবাদার দিল্লীর অপদার্থ বাদশাহ মহম্মদ শাহ্‌কে ঘুষ দিয়া নিজ নামে সুবাদারের ফারমান আনাইলেন। যাহা হউক তাঁহার বিচক্ষণ শাসন ও সদয় ব্যবহারে দেশ-বাসী তাঁহার কৃতঘ্ন চরিত্রের কথা ভুলিয়া গেল।

এই সমস্ত ঘটনায় দেখা যাইতেছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে মুঘল সাম্রাজ্য ও বাঙলা দেশের কিরূপ শোচনীয় নৈতিক অধঃপতন হইয়াছিল। আলীবর্দি নিজ প্রভু ও পৃষ্ঠপোষক সুবাদার সুজাউদ্দিনের পুত্র সরফরাজ খাঁকে ঘৃণ্যপন্থা অবলম্বন করিয়া বিনাশ করিলেন এবং দিল্লীর বাদশাহের প্রসারিত করকমলে কিছু স্বর্ণরৌপ্য বৃষ্টি করিয়া নির্বিবাদে বাঙলার তখ্‌তে চড়িয়া বসিলেন। প্রথম দিকে সরফরাজের পরিবারবর্গ ও প্রভুভক্ত কর্মচারিগণ বোধ হয় আলীবর্দির কর্তৃত্ব মানিতে চাহেন নাই। বুদ্ধিমান আলীবর্দি মিঠাবুলির সঙ্গে সোনা-রূপার ঝঙ্কার মিশাইয়া তাঁহাদেরও জয় করিয়া লইলেন। অবশ্য তিনি যে ষড়যন্ত্রের সাহায্যে প্রভুপুত্রকে বিনাশ

করিয়াছিলেন, ভাগ্যের পরিহাসে ঠিক তাহার সতের বৎসর পরে তাঁহার নয়নের মণি দৌহিত্র সিরাজ-উদ্দৌলাও অনুরূপ ষড়যন্ত্রের দ্বারাই পরাভূত ও নিহত হন। আলমচাঁদ, জগৎশেঠ—সরফরাজের যে সমস্ত কর্মচারী ও উপদেষ্টারা আলীবর্দির সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র করিয়া সরফরাজের বিনাশ ত্বরান্বিত করেন, ভাগ্যের পরিহাসে তাঁহারাই আবার সিরাজ-বিনাশের কর্ণধার হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, আলীবর্দি বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার (নবাব) হইয়া নিজের নিকট-আত্মীয় ও বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীদিগকে গুরুত্বপূর্ণপদে নিয়োগ করিয়া বাঙলার শাসনে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিলেন এবং মুর্শিদকুলী খাঁয়ের মতো পারদর্শিতা দেখাইয়া সরফরাজের বিশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থাকে পুনরায় নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে আনিলেন—অনেক হিন্দুকেও তিনি উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করিয়া অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন।

বাঙলার নবাব হইয়া প্রবীণ আলীবর্দি বেশী দিন সুখশান্তি ভোগ করিতে পারিলেন না, বা বাঙলার রাজস্বব্যবস্থা ও শাসনসংক্রান্ত সুপরিকল্পনাগুলিরও রূপ দিবার সুযোগ পাইলেন না। নবাব হইয়াই তাঁহাকে উড়িষ্যার বিদ্রোহী সহকারী সুবাদারকে দমন করিতে বহু পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতে হইল। ১৭৪২ খ্রীঃ অব্দে যখন তিনি উড়িষ্যাকে বশীভূত করিয়া বিদ্রোহী সহকারী সুবাদারকে খেদাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মুর্শিদাবাদের অভিমুখে আসিতেছিলেন, তখন বালেশ্বরের নিকটে পৌঁছাইয়া সংবাদ পাইলেন যে, মারাঠা বর্গীরা দেশ লুঠিতে বাঙলার দিকে চলিয়াছে। বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও কৃতঘ্নতার দ্বারা তিনি যে বাঙলার মসনদ অধিকার করিয়াছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে যাহার নিরাপত্তার জন্য দিবারাত্র ছুটাছুটি করিতেন, সেই রাজ্য নিরুদ্বেগে ভোগ করিবার অবকাশ পাইলেন না। বর্গীর হাঙ্গামায় বাঙলা দেশ শ্মশান হইয়া গেল—আলীবর্দির চোখের সামনেই তাঁহার সাধের সুবা লুণ্ঠিত হইল—অল্পদিনের মধ্যেই তিনি হৃতগৌরব, হতাশ ও অর্থশূন্য হইয়া পড়িলেন। ইহার উপর আবার তাঁহার আফগান সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ[৬] তাঁহাকে আরও চিন্তিত করিয়া তুলিল। কিন্তু বর্গীর লুঠতরাজের ফলেই তাঁহার বিচক্ষণ শাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে, পশ্চিমবঙ্গের অনেকটাই এই মারাঠী

৬ ১৭৪৫ ও ১৭৪৮ খ্রীঃ অব্দে দুইবার বিদ্রোহ হয়।

পঙ্গপালের অত্যাচারে শ্মশান হইয়া যায়। ১৭৪২ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৭৫১ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ মারাঠা বর্গীর আক্রমণে আলীবর্দিকে এত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল যে পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধ আর আঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না। রোগজীর্ণ আলীবর্দি খাঁয়ের আয়ু ধীরে ধীরে পশ্চিম দিগন্তে ঢলিয়া পড়িল।

১৭৪২ খ্রীঃ অব্দে সর্বপ্রথম পশ্চিম বাঙলায় লুঠেরা বর্গীরা আক্রমণ ও লুঠতরাজ শুরু করে। আলীবর্দি তাহাদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলে ১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে তাহারা নাগপুরে রঘুজী ভোঁশলের অধীনে মিলিত হইয়া পুনরায় লুণ্ঠন শুরু করে। কিন্তু রঘুজী ও পেশোয়া বালাজী রাওয়ের বিরোধের ফলে রঘুজী বর্গী সৈন্যদিগকে লইয়া মানভূমের দিকে পলাইয়া গেলেন; তখন পেশোয়ার সঙ্গে আলীবর্দি এই মর্মে সন্ধি করিলেন যে, নবাব মারাঠী রাজা সাহুরাজাকে বাঙলার রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ (চৌথ) দিবেন, বালাজীকে বাইশ লক্ষ টাকা দিবারও সর্ত স্বীকৃত হইল। তাহার প্রতিদান স্বরূপ বালাজী কথা দিলেন যে, রঘুজী প্রভৃতি বর্গী নেতারা আর কোন দিন বাঙলায় উৎপাত করিবেন না। ১৭৪৩-৪৪ খ্রীঃ অব্দ ধরিয়া প্রায় পুরা এক বৎসর বাঙলায় শান্তি বিরাজ করিয়াছিল। কিন্তু সমস্ত সর্ত লঙ্ঘন করিয়া রঘুজীর সেনানায়ক ভাস্কর পণ্ডিত ১৭৪৪ খ্রীঃ অব্দে আবার দলবল লইয়া বাঙলায় নির্মম অত্যাচার শুরু করিলেন। বাধ্য হইয়াই আলীবর্দি তাঁহার হিন্দু-মুসলমান প্রধান কর্মচারীদের সহিত পরামর্শ করিয়া গোপন ফাঁদ পাতিলেন। সন্ধিসর্তের লোভ দেখাইয়া ভাস্কর পণ্ডিত ও তাঁহার অনুচরদিগকে আলীবর্দির শিবিরে আনা হইল—এবং চকিতের মধ্যে তাঁহাদিগকে হত্যা করা হইল। এই প্রয়োজনীয় বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আলীবর্দি বৎসর খানেক শান্তি পাইলেন। এদিকে পুনঃ পুনঃ মারাঠার আক্রমণে রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, সিপাহীরা বেতন পায় না। অর্থের জন্য আলীবর্দি জমিদার ও ইংরাজ-ফরাসী বণিকদের উপর জোর-জুলুম চালাইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার আফগান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ বিদ্রোহী হইয়া মারাঠা বর্গীদের পক্ষে যোগ দেওয়ার ফলে আলীবর্দির অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িল। এই সুযোগে ১৭৪৬ খ্রীঃ অব্দে বর্গীরা পুনরায় বাঙলায় আসিয়া লুঠিতে লুঠিতে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়াছিল। অবশ্য বৃদ্ধ আলীবর্দি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কর্মচারীরা তাঁহার এই

বিপদের দিনে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয় মীর জাফর ও রাজমহলের ফৌজদার আতাউল্লা তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া আলীবর্দি তাঁহাদিগকে বরখাস্ত করিলেন। এদিকে ১৭৪৭ খ্রীঃ অব্দে বর্গীরা মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা অধিকার করিয়া ফেলিল। বিপদের উপর বিপদ—নাদির শাহের উত্তরাধিকারী আহমদশাহ্ দুরাণী পাঞ্জাব আক্রমণ করিলে দিল্লীর 'শাহান্-শাহ' টলটলায়মান হইলেন, এবং এই সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলার সুযোগে দ্বার-ভাঙ্গার আফগান সেনারা পাটনা আক্রমণ করিয়া আলীবর্দির জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজি আহমদ ও জামাতা জৈনুদ্দিনকে হত্যা করিল। শোকে অভিভূত বৃদ্ধ আলীবর্দি তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া তাড়াইয়া দিলেও উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ মারাঠাদের অধিকারে রহিল। ১৭৫০ খ্রীঃ অব্দের দিকে আবার তাহারা মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত উপস্থিত হইয়া লুঠপাঠ আরম্ভ করিল। তখন আলীবর্দির জীবনীশক্তি নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। যাহা হউক ১৭৫১ সালে পঁচাত্তর বৎসর বয়সের বৃদ্ধ নবাব মারাঠা লুঠেরাদের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ দিয়া এবং উড়িষ্যা হারাইয়া আলীবর্দি রোগজীর্ণ শরীরে কোনও প্রকারে শান্তি স্থাপন করিলেন। অপরিণামদর্শী তরুণ দৌহিত্র সিরাজ-উদ্দৌলার হস্তে সুবে বাঙলা-বিহারের গুরুভার অর্পণ করিয়া ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে ১০ই এপ্রিল অতি প্রত্যূষে আলীবর্দি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

আলীবর্দি খাঁ নিজ স্বার্থসাধনের জন্য নীতিবিরোধী কৃতঘ্নতার আশ্রয় লইয়া বাঙলার মসনদ অধিকার করিয়াছিলেন, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সানুচর ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করাইয়াছিলেন—তাহা ঠিক বটে। কিন্তু সুবায় সুশাসন স্থাপনের জন্য তিনি যেরূপ বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে মুর্শিদকুলি খাঁ অপেক্ষাও প্রশংসা করিতে হইবে। অতিশয় স্নেহপ্রবণ ও বিশুদ্ধ পারিবারিক জীবনে একনিষ্ঠ এই সুবাদার কখনও কুৎসিত আমোদপ্রমোদে লিপ্ত হন নাই, সর্বদা সজ্জীবন যাপন করিয়াছেন। উপরন্তু তিনি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন ভেদ করেন নাই। অবশ্য বিদেশী বণিক ও জমিদারদের উপর মাঝে মাঝে উৎপীড়ন করিতেন বটে, কিন্তু তাহা নিজের জন্য নহে—বর্গীর আক্রমণ বাধা দিবার জন্যই তিনি

কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থের জন্য পীড়ন করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার একটি ত্রুটি মারাত্মক হইয়া বাঙলার সর্বনাশ করিয়াছিল। অন্ধ স্নেহবাৎসল্যের জন্য তিনি নয়নের মণিস্বরূপ দৌহিত্র সিরাজকে যথোচিত 'মানুষ' করিতে পারেন নাই, রাজোচিত কোন শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেন নাই—অত্যধিক আদরে এই কিশোরের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সিরাজের জন্মের পর আলীবর্দির অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। এই জন্যই তিনি অত্যধিক আদরে সিরাজকে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী করিয়া গড়িতে পারেন নাই। ফলে তরুণ সিরাজ নির্বুদ্ধিতার জন্য শোচনীয়ভাবে নিহত হইয়াছিলেন এবং বাঙলার শাসনভার বিদেশী বণিকের হাতে চলিয়া গিয়াছিল। অবশ্য তখন সারা-ভারতের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সিরাজ বুদ্ধিমান হইলেও বাঙলাকে অধিকারে রাখিতে পারিতেন না। তখন চারিদিকে শাঠ্য-ষড়যন্ত্র লোভ-ক্ষোভের অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। ভবিতব্যের গতিকে, সিরাজ কেন—কেহই বাধা দিতে পারিত না।

সিরাজউদ্দৌলা ॥

১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে আলীবর্দি খাঁয়ের উত্তরাধিকারী দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা প্রায় ২৩ বৎসর বয়সে সুবে বাঙলা বিহারের নবাব হইলেন। বৎসর খানেক গত হইতে না হইতেই ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ২৩-এ জুন তিনি পরাভূত হইয়া মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়া পলায়ন করেন এবং পথিমধ্যে ধৃত হইয়া ২রা জুলাই রাত্রিতে মুর্শিদাবাদে নীত ও নিহত হন। বাঙলায় মুসলমান শাসন ফুরাইল, বাঙলার স্বাধীনতা জবাহ্ হইল, বিদেশী বণিক তুলাদণ্ডকেই যাদুদণ্ডরূপে ব্যবহার করিয়া প্রাচ্য বিশ্বে নূতন ইতিহাসের পথ খুলিয়া দিল।

শেষ জীবনে বৃদ্ধ আলীবর্দি বড় হতাশার মধ্যে দিন কাটাইতেছিলেন। বর্গীর হাঙ্গামা দমন করিতে গিয়া তাঁহার রোগজীর্ণ দেহ ভাঙিয়া পড়িয়াছে, সেনাবাহিনীর একটা বড় অংশ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে চরম বিপদে ফেলিয়াছে, একবৎসরের মধ্যে তাঁহার দুই জামাতা ও একটি দৌহিত্র মারা গিয়াছে, তাঁহার জীবিতকালেই তাঁহার তিনকন্যা বিধবা হইয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসেটি বেগম (মিহিরউন্নিসা) অপুত্রক ছিলেন। দ্বিতীয় কন্যা পূর্ণিয়ার সুবাদারের বেগম ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—সৌকৎজঙ্গ ও মির্জা

রমজানি। কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমের দুই পুত্র, সিরাজউদ্দৌলা ও মির্জা মেহ্‌দি।

সিরাজের জন্মের (১৭৩৩) পর আলীবর্দি অতি দ্রুত সৌভাগ্যের শিখরে আরোহণ করেন, সামান্য অবস্থা (মাত্র ১০০৲ টাকা বেতনের কর্মচারী) হইতে তিনি তিন প্রদেশের সর্বময় কর্তা হইয়াছিলেন। তিনি আবার কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্নও ছিলেন, জ্যোতিষ করকোষ্ঠীতে তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল। এই সৌভাগ্যের জন্য নবজাত দৌহিত্র সিরাজকে তিনি এত স্নেহ করিতেন যে, মুহূর্তের জন্যও তাহাকে চোখের আড়াল করিতে দিতেন না। পরে বালকের বয়স বাড়িতে থাকিলেও স্নেহান্ধ আলীবর্দি তাহার সাধারণ শিক্ষা ও অস্ত্র-শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করিলেন না—পাছে তাহার কোন ক্ষতি হয়। ফলে যে তাঁহার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হইবে, সে তাঁহারই বুদ্ধিভ্রষ্টতার জন্য অশিক্ষিত, দুর্বিনীত, বর্বর যুবকে পরিণত হইল। আলীবর্দির মৃত্যুর পর তেইশ বৎসরের যুবক সিরাজের হাতে বিপুল শক্তি ও কুবেরের ঐশ্বর্য সমর্পিত হইল। আলীবর্দির জীবিতকালেই সিরাজ যেরূপ উদ্ধত জঘন্য চরিত্রের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বিচক্ষণ আলীবর্দি কেন যে অন্য ব্যবস্থা করেন নাই, তাহা এক চিন্তার বিষয়। মাত্রাতিরিক্ত স্নেহ যে বিচক্ষণ ব্যক্তির বুদ্ধিবিবেচনাকে কতদূর গ্রাস করিতে পারে আলীবর্দিই তাহার সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত।

আলীবর্দি মৃত্যুশয্যা লইলে বাঙলা-বিহারের মসনদলাভের জন্য দুই অপরিণামদর্শী মূঢ় যুবক প্রস্তুত হইতেছিলেন। একজন স্বয়ং সিরাজ, আর একজন তাঁহার মাসতুতো ভাই পূর্ণিয়ার সৌকৎজঙ্গ। আলীবর্দির মৃত্যুর পর সিরাজ দুইজন প্রত্যক্ষ শত্রুর প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইলেন। একজন তাঁহার মাসী ঘসেটি বেগম, আর একজন সেনাবিভাগের সর্বাধ্যক্ষ এবং তাঁহার আত্মীয়[৭] মীরজাফর আলী খাঁ। নিঃসন্তানা, বিধবা, লোভী ও চরিত্রহীনা ঘসেটিবেগম সৌকৎজঙ্গকে পূর্ণিয়া হইতে গোপনে ডাকিয়া পাঠাইলেন, সিংহাসন লাভে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। অপর দিকে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর এই সুযোগে কাজ গুছাইয়া

৭ মীরজাফরের সঙ্গে আলীবর্দি নিজ সম্পর্কের ভগিনীর (শাহ্‌খানুম) বিবাহ দিয়া তাঁহাকে সর্বোচ্চ পদে নিয়োগ করেন। সেদিক দিয়া সিরাজ মীরজাফরের নাতিস্থানীয়।

লইবার ব্যবস্থা করিলেন। যাহা হউক সিরাজ মাসীমাতাকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার ধনভাণ্ডার হস্তগত করিলেন—এইরূপে একটি বড় শক্তিকে হতবল করিয়া ফেলিলেন। সেই সঙ্গেই মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া তিনি মীরমদনকে সেই পদ দান করিলেন; মোহনলাল কাশ্মীরীও প্রায় প্রধান উজীরের মর্যাদা লাভ করিলেন। সমস্ত বিভাগে নিজ মনোমত ব্যক্তিদের নিযুক্ত করিয়া সিরাজ সৌকৎজঙ্গকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু পথিমধ্যে সব মিটমাট হইয়া গেলেও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। কারণ তাঁহার প্রধান শত্রু ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে তাঁহার মনান্তর প্রবলাকার ধারণ করিল। কলিকাতার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের উপর সিরাজের ক্রুদ্ধ হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। ইংরাজ বণিক য়ুরোপে ফরাসীদের সঙ্গে ইংরাজ জাতির যুদ্ধের অছিলায় কলিকাতায় নিজেদের কেল্লা সুদৃঢ় করিয়া এবং মারাঠা খাল আরও চওড়া করিয়া কাটাইয়া ফার্মানের সর্ত লঙ্ঘন করিয়াছিল। ব্যবসা বাণিজ্যেও তাহারা দস্তকের অপব্যবহার করিয়া সরকারী রাজস্বের প্রচুর ঘাটতি করিত, এইরূপে নবাবের সঙ্গে সম্পাদিত সর্তচুক্তি তাহারাই সর্বাগ্রে লঙ্ঘন করিল।

আরও একটা কারণে সিরাজ ইংরাজ বণিকের উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে ইংরাজগণ আশ্রয় দিয়া দেশের রাজশক্তিকে তুচ্ছ করিয়াছিল। সুতরাং ন্যায্য কারণেই সিরাজ ইংরাজদের উপর রুষ্ট হইলেন। পূর্ব হইতেই ইহাদের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ সঞ্চারিত হইয়াছিল; এই সমস্ত কারণে তাহা প্রকাশ্য ক্রোধের আকারে ফাটিয়া পড়িল।

১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই জুন সিরাজ সসৈন্যে কলিকাতা আক্রমণ করিলেন। ১৮ই জুনের মধ্যে স্থানীয় ইংরাজের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। ১৯এ জুন গভীর রাত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বীর ব্রিটনগণ জরুজহরতসহ পলাইবার ব্যবস্থা করিল। গভর্ণর ড্রেক সকলের আগে চুপিসাড়ে নৌকায় উঠিয়া 'যঃ পলায়তি স জীবতি' এই মহাবাক্য অনুসরণ করিলেন। কলিকাতা হইতে গভর্নর এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ পলাইয়া গেলে হলওয়েল অবশিষ্ট ভীত সৈন্যদিগকে কোনও প্রকারে জুটাইয়া নবাবের আক্রমণ বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সিরাজের অগ্নিবর্ষণের

সম্মুখে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কেল্লার মধ্যে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, কেল্লার প্রাচীরের পাশ হইতে চিৎপুর পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল নবাবের গোলাবর্ষণে জ্বলিতে লাগিল। সিরাজের বাহিনী অতঃপর কেল্লার প্রাচীর টপকাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সন্ধ্যার দিকে কে-একজন কেল্লার ফটক খুলিয়া দিলে নবাবের বাহিনী বিজয়গর্বে কেল্লার মধ্যে বিনা বাধায় প্রবেশ করিল, যুদ্ধ বন্ধ হইল। কিন্তু সিরাজ ইংরাজপক্ষীয় কাহাকেও বন্দী করিলেন না। সিরাজের সৈন্যেরা লুঠতরাজ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহারাও ইংরাজদের প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহার করে নাই। ইতিমধ্যে রাত্রির দিকে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। সিরাজ পরাভূত ইংরাজদের প্রতি বিজয়ীসুলভ কোন উদ্ধত ব্যবহার করেন নাই, তাহাদের প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। হলওয়েলসহ ইংরাজপক্ষীয়দিগকে কামানের মুখে উড়াইয়া দিলে ভারতের ইতিহাস হয়তো অন্যরূপ হইত এবং তাহাই যুদ্ধের সাধারণ রীতি। সিরাজ আত্মপ্রসাদের বশে বোধ হয় রণক্লান্ত হৃতসর্বস্ব ইংরাজ সৈন্যদিগকে কৃপার চোখেই দেখিয়াছিলেন। ফলে অর্ধবর্বর টমিরা মহানন্দে মদ গিলিয়া সেই রাত্রেই দেশীয় লোকের প্রতি অত্যাচার শুরু করিল। রাত্রে যাহাতে দুর্দান্ত ইংরাজ সিপাহীরা বেশী গোলমাল সৃষ্টি করিতে না পারে, এ অভিপ্রায়ে সিরাজ মাতাল গোরা সৈন্য ও তাহাদের চেলাচামুণ্ডাদের কোন ঘরে আটকাইয়া রাখিবার আদেশ দিয়া ঘুমাইতে গেলেন। সেদিন ১৭৫৬ সাল, ২০এ জুন, রবিবার। কেল্লার ইংরাজ কর্তৃপক্ষ দুর্বিনীত টমিদের শাস্তি দিবার জন্য কেল্লার মধ্যেই একটি ক্ষুদ্র কয়েদখানা নির্মাণ করাইয়াছিলেন—ইহাই কুখ্যাত Black Hole বা 'অন্ধকূপ'। সিরাজের কর্মচারীরা সেই অপরিসর প্রকোষ্ঠে (১৮ ফুট × ১৪ ফুট-১০ ইঞ্চি) ১৪৬ জন সৈন্যকে (হলওয়েল সহ) নিক্ষেপ করিয়া তালা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পরের ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী হলওয়েলের বিবরণ ভিন্ন আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না। পরদিন সকালে দরজা খুলিয়া দেখা গেল, জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মে জানালাহীন রুদ্ধপ্রকোষ্ঠে বন্দী ১৪৬ জন শ্বেতাঙ্গের মধ্যে ১২৩ জনই মরিয়া গিয়াছে।

এই ব্যাপারের যাথার্থ্য লইয়া এদেশে ও বিদেশে বহু বাদানুবাদ হইয়াছে। প্রাচ্য দেশের লোকের ঘৃণ্য চরিত্র ঘৃণ্যতম করিবার জন্য পাশ্চাত্যের

ঐতিহাসিকগণ এখনও এই উপকথা বাইবেলের মতো বিশ্বাস করেন এবং মিথ্যাবাদী হলওয়েলের নির্জলা মিথ্যা কথাকে মেসায়ার বাণী বলিয়া ভক্তি-ভরে হজম করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক ভারতীয় ও কিছু কিছু পাশ্চাত্য পণ্ডিত এ বিষয়ে গবেষণা করিয়া হলওয়েলের মিথ্যা কথার গলা টিপিয়া ধরিয়াছেন। প্রথমতঃ, এই ব্যাপারে সিরাজের কোন অপরাধ ছিল না। মাতাল ও দুর্বিনীত টমিদিগকে সিরাজ গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবার আদেশ না দিয়া কোন কক্ষে আটক করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন—ইহাই তাঁহার একমাত্র অপরাধ। ১৪৬ জন শ্বেতাঙ্গের সংখ্যাও মিথ্যাবাদী হলওয়েলের মস্তিষ্কপ্রসূত। কারণ উক্ত মাপের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে কোনও প্রকার গণিত-জ্যামিতি-পরিমিতির হিসাবেই ১৪৬ জন ব্যক্তির দাঁড়াইবার স্থান হইতে পারে না। সুতরাং এ সংখ্যা সর্বৈব মিথ্যা। মনে হয় এই সংখ্যা বড় জোর ৬০ জন হইতে পারে।[৮] যাহা হউক পরদিন সিরাজ বিজয়গৌরবে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। যে সমস্ত শ্বেতাঙ্গ ধৃত হইয়াছিল তাহারা মুক্তি পাইয়া ফলতায় অপেক্ষমান ইংরাজের জাহাজে আশ্রয় পাইল।

এদিকে সিরাজ সংবাদ পাইলেন যে, সৌকৎজঙ্গ মীরজাফরের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া দিল্লীতে ঘুষ দিয়া নিজ নামে সুবাদারের ফারমান আদায়ের চেষ্টা করিতেছেন। সিরাজ সসৈন্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিলেন, পূর্ণিয়া তাঁহার অধিকারে আসিল (১৭৫৬, অক্টোবর)। এই সময়ে কয়েকমাস তিনি বেশ নিশ্চিন্ত গৌরবে আসীন ছিলেন। প্রথমতঃ, তিনি কলিকাতার ইংরাজদের বহু ক্ষতি করিয়া তাহাদিগকে কলিকাতার বাহিরে খেদাইয়া দিয়াছিলেন, দ্বিতীয়তঃ সওকত জঙ্গের বিনাশে আর কেহ তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না, তৃতীয়তঃ তিনি দিল্লী হইতে নিজ নামে ফারমান লাভ করিলেন। সিরাজ মনে করিয়াছিলেন, পরাভূত ইংরাজ বণিক দন্তে তৃণ লইয়া তাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা করিবে। কিন্তু হঠাৎ সংবাদ পাইলেন যে, পলাতক ইংরাজগণ আবার কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছে এবং নবাবের প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতেছে।

১৭৫৭ সালের ২রা জানুয়ারী ক্লাইভ স্থলপথে এবং ওয়াটসন জলপথে

---

৮ হিল সাহেবের *Bengal in 1756-57*-এ হলওয়েল প্রদত্ত তথ্যের কঠোর সমালোচনা করা হইয়াছে।

ফলতা হইতে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন এবং কলিকাতা অক্লেশে পুনরধিকার করিয়া সেই দিনই সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইহার ঠিক একমাস পরে ৩রা ফেব্রুয়ারী সিরাজ সসৈন্যে কলিকাতার উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। ৫ই ফেব্রুয়ারী গভীর রাত্রে চতুর ক্লাইভ কিছু সৈন্য লইয়া অতর্কিতে নবাবের শিবির আক্রমণ করিলেন, কিন্তু বিশেষ ক্ষতি করিতে না পারিয়া তিনি আবার কেল্লায় ফিরিয়া আসিলেন। অবশ্য এই নৈশ আক্রমণে নবাবের পক্ষে প্রচুর লোক মারা পড়িল। এই ব্যাপারে নবাব সিরাজউদ্দৌলা সহসা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন এবং ইংরাজের সংস্পর্শ হইতে দূরে ঢাকুরিয়া অঞ্চলে সরিয়া গিয়া সন্ধির কথাবার্তা চালাইতে লাগিলেন। এই সন্ধির সর্তানুসারে ইংরাজ বণিক পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইল, নবাব তাহাদের যাবতীয় ক্ষতি পূরণ করিলেন, তাহারা কেল্লা মেরামত ও মজবুত করিবার অনুমতি আদায় করিয়া লইল। শুধু ইহাই নহে, তাহারা কলিকাতায় নিজেদের টাকশাল স্থাপন করিয়া সেখান হইতে টাকা মুদ্রণের অনুমতিও পাইল। বস্তুতঃ এই সন্ধিই সিরাজের অধঃপতনের প্রথম সোপান বলিয়া গৃহীত হইতে পারে—পলাশীর যুদ্ধ তাহার চূড়ান্ত পরিণাম। এই সময় জয়োদ্ধত ইংরাজ ফরাসী-চন্দননগর আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিলেও সিরাজ মূঢ়ের মতো হাত গুটাইয়া রহিলেন। চন্দননগরের পতনের ঠিক তিনমাস পরে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ পরাভূত হইলেন। কলিকাতার সন্ধি হইতে সেই পরাজয় শুরু হইয়াছিল, ব্রিটিশের দ্বারা চন্দননগর ধ্বংসের ফলে সিরাজ শুভানুধ্যায়ী ফরাসীদের সহায়তা হারাইলেন, পলাশীর প্রান্তরে সমস্ত ঘটনার উপসংহার হইল।

ইতিমধ্যে দিল্লী হইতে আবার এক দুঃসংবাদ আসিল—আহমদশাহ্ আবদালী দিল্লী-আগ্রা-মথুরা লুঠিতে লুঠিতে আসিতেছে, হয়তো সেই লুঠেরা অযোধ্যা হইয়া বাঙলা মুলুকেও আসিতে পারে। ভীত সিরাজ তখন পূর্বের বিরোধ মুলতুবি রাখিয়া ইংরাজদের পরামর্শ চাহিলেন। কিন্তু যেই আবদালী দিল্লী হইতে প্রস্থান করিল (১৭৫৭, এপ্রিল), অমনি সিরাজ ইংরাজদের ত্যাগ করিয়া চন্দননগর ও কাশিম বাজারের আশ্রয়প্রার্থী ফরাসীদিগকে সানন্দে আশ্রয় দিলেন। এই ব্যাপারে ইংরাজ বণিক প্রমাদ গণিল। তাহারা দেখিল, নবাব যদি ফরাসী সৈন্যের সাহায্য পান তাহা হইলে

বাঙলা হইতে ইংরাজদের পাততাড়ি গুটাইতে হইবে, ব্যবসাবাণিজ্য দরিয়ায় ভাসাইয়া দিয়া নূতন কোন বন্দরের সন্ধানে যাত্রা করিতে হইবে। সুতরাং ইংরাজ সব দুশ্চিন্তার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য সিরাজকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া তাহাদের প্রতি অনুকূল কোন ব্যক্তিকে বাঙলার মসনদে বসাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। অনুকূল বায়ু প্রবাহে তাহারা বেশ ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া ষড়যন্ত্রের তরণীতে পাল তুলিয়া দিল।

বৎসর খানেক রাজত্ব করিয়া উদ্ধত সিরাজ রাজসভার প্রধান পুরাতন কর্মচারীদের শত্রু করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিশেষতঃ পুরাতন কর্মচারীদের বরখাস্ত করিয়া তিনি নিজ আস্থাভাজন তরুণদের সেই সমস্ত পদে নিয়োগ করিয়া নিজের পতনকেই ত্বরান্বিত করিয়া আনিলেন। দরবার, মসনদ ও অন্তঃপুরকে ঘেরিয়া পুরাতন অসন্তুষ্ট কর্মচারীরা গোপনে ষড়যন্ত্রের জাল পাতিলেন। উদ্ধত সিরাজ অনেক সময় মানীর মান রক্ষা করিয়া চলিতেন না। প্রবীণ জগৎশেঠকে প্রায়ই শাসাইতেন, সুন্নত দিয়া তাঁহাকে মুসলমান করিবেন। পূর্বতন দেওয়ান রায়দুর্লভ এবং বখশী মীরজাফরের তো পূর্বেই চাকরী গিয়াছিল। সুতরাং হিন্দু-মুসলমান অভিজাতশ্রেণী—সকলে মিলিয়া গোপনে মিলিত হইয়া এই উদ্ধত মূর্খ যুবকের হাত হইতে বাঙলার মসনদ কি করিয়া রক্ষা করা যায় তাহারই সলাহ্-পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ধনকুবের জগৎশেঠ এই ষড়যন্ত্রের প্রধান পাণ্ডা হইলেন; ইঁহারা গোপনে কলিকাতার ইংরাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। যোগাযোগের প্রধান সেতু হইলেন মীরজাফর। ইংরাজ বণিক ইহারই অপেক্ষায় শ্বাদন্ত শানাইয়া বসিয়াছিল। সুযোগ আসিল অপ্রত্যাশিতভাবে।

ইংরাজদের কলিকাতার কাউন্সিল ১লা মে তারিখে এই সর্তে মীরজাফরের সঙ্গে সন্ধিষড়যন্ত্রে সম্মত হইল: উভয়ের মধ্যে সহযোগিতামূলক সন্ধি স্থাপিত হইবে, ফরাসী চন্দননগরের সমস্ত ফরাসী আশ্রয়প্রার্থীদের ইংরাজদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে, কলিকাতা আক্রমণে ইংরাজদের যত ক্ষতি হইয়াছিল সমস্ত পূরণ করিতে হইবে, ফারমানে উল্লিখিত ইংরাজদের প্রতি প্রদত্ত সমস্ত ধারা-উপধারা স্বীকার করিতে হইবে, কাশিমবাজার ও ঢাকায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিবার অধিকার দিতে হইবে, হুগলীর পরে নবাব আর কোন কেল্লা নির্মাণ বা সৈন্ত রাখিতে

পারিবেন না, ইংরাজ সেনাবাহিনীর জন্য নবাবকে উপযুক্ত জমিজমা দিতে হইবে, নবাবের জন্য ইংরাজ সৈন্য সংরক্ষণের যাবতীয় ব্যয়ভার নবাবকেই বহন করিতে হইবে, কলিকাতার সীমার মধ্যে ইংরাজের একচ্ছত্র অধিকার মানিতে হইবে,—সর্বোপরি নবাবের দরবারে কোম্পানীর এক শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী অবস্থান করিয়া সব কিছু লক্ষ্য করিবেন। কাশিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ উইলিয়াম ওয়াট্‌স্‌ অদ্ভুত নিপুণতা সহ গোপনে ষড়যন্ত্র চালাইতে লাগিলেন। পূর্ব পরামর্শ মতো ১২ই জুন ওয়াট্‌স্‌ তাঁহার দলবল সহ মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন এবং ঐ তারিখেই ক্লাইভ আট শত শ্বেতাঙ্গ ও বাইশ শত কালা সিপাহি সহ মুর্শিদাবাদের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ১৯এ জুন ইংরাজ কাটোয়ায় উপস্থিত হইল। কিন্তু তখনও ক্লাইভ মীরজাফরের নিকট হইতে ফাঁকা আশ্বাস ছাড়া নির্ভরযোগ্য কোন ইঙ্গিত পান নাই। তিনি কাটোয়ায় গঙ্গার ধারে পৌঁছাইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন—গঙ্গা পার হওয়া উচিত কিনা। সঙ্গী-সাথীরাও ইহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু ২২শে জুন প্রভাতে ক্লাইভ সমস্ত সংশয় ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া সেনাবাহিনী সহ গঙ্গা পার হইয়া নবোদ্যমে অগ্রসর হইলেন এবং প্রচণ্ড বারিবর্ষণ ও প্রখর রৌদ্র মাথায় লইয়া শ্রান্তক্লান্ত শরীরে গভীর রাত্রে পলাশীর লক্ষবাগ আমবাগানে উপস্থিত হইলেন।

২৩এ জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দ। পলাশীর প্রান্তরে সকাল আটটার সময়ে সিরাজ ও ক্লাইভের বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। সিরাজের পক্ষে ছিলেন ফরাসী সেনানায়ক মঁসিয়ে দে সিন্‌ফ্রে, মীরমদন (গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক), মোহনলাল কাশ্মীরী, ইয়ার লতিফ খাঁ, রায় দুর্লভ ও মীরজাফর। প্রায় ৫০,০০০ সৈন্যসহ সিরাজ রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। ক্লাইভের অধীনে ছিল ৯৫০ জন শ্বেতাঙ্গ সৈন্য, ১৫০ জন গোলন্দাজ, ২,১০০ দেশী সিপাহি (বাঙালী মুসলমানের দ্বারা গঠিত 'লাল পল্টন' এবং মাদ্রাজী তেলেঙ্গা সৈন্য)। বেলা এগারটা পর্যন্ত যুদ্ধ চলিল, দুই পক্ষেরই ক্ষতি হইতে লাগিল। তাহার পরই শুরু হইল দারুণ ঝড়-বৃষ্টি। জলে কাদায় পলাশীর প্রান্তর নরককুণ্ড হইয়া উঠিল। নবাবের বিস্ফোরক বারুদ অনাবৃত অবস্থায় ছিল বলিয়া জলে ভিজিয়া সব নিষ্ক্রিয় হইয়া গেল। কিন্তু বুদ্ধিমান ইংরাজ

পূর্বেই ঝড় বৃষ্টি অনুমান করিয়া গোলাবারুদ ঢাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। ফলে ইংরাজ পক্ষ হইতে অবিরাম প্রবল গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল। মীরমদন ও অন্যান্য সৈন্যাধ্যক্ষ নিহত হইলেন। এই ব্যাপারে ভীত হইয়া সিরাজ-পক্ষীয় সৈন্যেরা শিবিরে পলাইবার উদ্যোগ করিল। এইবার বিশ্বাসঘাতকতার খেলা শুরু হইল, শিবিরে বসিয়া সিরাজও তাহা বুঝিতে পারিলেন। বিপদে পড়িয়া তিনি দম্ভ হঠকারিতা বিসর্জন দিয়া মীরজাফরের কাছে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার পায়ের কাছে পাগড়ি খুলিয়া রাখিয়া সকাতরে সাহায্যের অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মীরজাফর বুঝিলেন, এইবার ষড়যন্ত্র সফল হইবার মুহূর্ত আসিয়াছে। মূঢ়, বিপন্ন, বুদ্ধিভ্রষ্ট তরুণ নবাবকে তিনি মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়া সেদিনকার মতো সৈন্য সরাইয়া লইতে বলিলেন। পরদিন নবোদ্যমে যুদ্ধ করা যাইবে—সিরাজকে তিনি এই আশ্বাস দিলেন। এইরূপ নির্দেশ দিয়াই তিনি দ্রুতবেগে নিজের শিবিরে ফিরিয়া ক্লাইভের কাছে গোপনে এক পত্রবাহকের মারফতে সংবাদ পাঠাইলেন, নবাব ভীত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়—নবাব-বাহিনীও পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে—এই সময়ে নবাবকে আক্রমণ করিলেই ক্লাইভ জয়ী হইবেন। এদিকে মীরজাফরের কারসাজিতে নবাবপক্ষীয় অবশিষ্ট সেনাবাহিনী রণে-ভঙ্গ দিয়া শিবিরে চলিয়া যাইতে লাগিল। অবশ্য সিরাজের প্রভুভক্ত রাজপুত সৈন্য ফিরিল না, খাড়া দাঁড়াইয়া লড়াই করিতে লাগিল এবং ক্লাইভের গুলিবর্ষণে একে একে নিহত হইল। কিন্তু মীরজাফর, দুর্লভরাম ও ইয়ার লতিফের সেনাবাহিনী নীরবে দূরে দাঁড়াইয়া ঢেউ গণিতে লাগিল, কেহ একটাও গুলি ছুড়িল না।

বেলা চারিটা বাজিয়া গেল। সিরাজের বাহিনী পলাইতেছে, চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। ক্লাইভের বাহিনীকে বিজয়গর্বে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বেলা অপরাহ্নের দিকে নবাব যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদের অভিমুখে পলাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল, রক্তাক্ত পলাশী প্রান্তরের অদূরে ভাগীরথী নীরে মুসলমান ভাগ্যরবি চির অস্তাচলে ডুবিয়া গেল।

পরাভূত নবাব সিরাজউদ্দৌলা অবশিষ্ট সৈন্য-সেনাপতিদের রণক্ষেত্রে ফেলিয়াই দ্রুতগামী উটের পিঠে চড়িয়া প্রাণভয়ে রাজধানীর অভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন, এবং প্রায় মধ্যরাত্রিতে গভীর অন্ধকারে মুর্শিদাবাদে

পৌঁছাইলেন। চারিদিকে তখন বিশ্বাসঘাতকতা ও বিশৃঙ্খলা শুরু হইয়াছে—হাওয়ার আগে যেন পলাশীর বার্তা রাজধানীতে পৌঁছাইল। ২৪শে জুন গভীর রাত্রে সিরাজ একটি খোজা ও পত্নী লুৎফ-উন্নেসাকে সঙ্গে লইয়া ছদ্মবেশে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিলেন। ২৯শে জুন ক্লাইভ সদলবলে বিজয়গর্বে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিলেন এবং অপরাহ্নের দিকে সমবেত গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সভাসদদের সম্মুখে বৃদ্ধ মীরজাফরকে বাঙলার মসনদে বসাইয়া তাঁহাকে নবাব বলিয়া কুর্নিশ করিলেন। বাঙলার স্বাধীন নবাবের দিন ফুরাইল, বিদেশী বণিকের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে চালিত পুতুল-নবাবের নবাবী লীলা শুরু হইল।

পরবর্তী কাহিনী খুবই সংক্ষিপ্ত। ৩০ এ জুন ছদ্মবেশী সিরাজ রাজমহলের কাছে নৌকা হইতে নামিয়া আহারাদির আয়োজন করিলে দানসা ফকির নামে এক ভিক্ষোপজীবী তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিল এবং ধরাইয়া দিল। তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া খুব গোপনে ২রা জুলাই মুর্শিদাবাদে আনা হইল। সেই রাত্রি তাঁহাকে লইয়া কি করা যাইবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া মীরজাফর সিরাজকে পুত্র মীরনের হাতে দিয়া সেই রাত্রির মতো বিশ্রাম করিতে গেলেন। মীরন কাহারও অনুমতি উপদেশের অপেক্ষা না করিয়া সেই রাত্রেই বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাবকে ঘাতকের দ্বারা হত্যা করাইলেন।[১] পরদিন প্রভাতে সিরাজের রক্তাক্ত মৃতদেহ হাতীর পিঠে চড়াইয়া সমস্ত মুর্শিদাবাদ শহর ঘুরাইয়া আনা হইল। বৃদ্ধা মাতা আমিনা বেগম হারেমের বাধানিষেধ তুচ্ছ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পথে আছড়াইয়া পড়িলেন। লোকে এই দৃশ্যে শিহরিয়া উঠিল। অবশ্য সিরাজ হত্যার পিছনে ক্লাইভের কোন সম্মতি ছিল না, তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানিতেন না।

সিরাজচরিত্রে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ স্বাভাবিক কারণেই কালি লেপিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষপাতদুষ্ট অতিরঞ্জন নিন্দার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। সিরাজ মাত্র বৎসরখানেক মসনদে বসিয়াছিলেন, তাও আবার অনেকটা সময়ই যুদ্ধবিগ্রহে কাটিয়াছে। সুতরাং ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ প্রাচ্য রাজার ঘৃণ্য চরিত্রের উদাহরণ হিসাবে যে সিরাজের চরিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন,

---

১ মীরন সিরাজের একমাত্র জীবিত ভ্রাতা মির্জা মেহ্‌দি এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মুরাদ-উদ্দৌলাকেও নির্মমভাবে হত্যা করিয়া আলীবর্দির বংশধারাকে নিশ্চিহ্ন করেন।

তাহা অন্যায়, অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক। ঐ সময়ে, তাহার পূর্বে বা পরে সুসভ্য য়ুরোপে বহু দাম্ভিক রাজা সিরাজ অপেক্ষাও কুৎসিত জীবন যাপন করিয়াছেন, তাঁহার অপেক্ষাও নিবুর্দ্ধিতা ও নির্মমতা দেখাইয়াছেন। তাই চারিত্রিক কদাচারের জন্য সিরাজকে বাছিয়া লইয়া গালিগালাজের গোলাবারুদ অনর্থক অপব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই। আলীবর্দির সর্বনাশা আদরে সিরাজ কৈশোরেই বিগড়াইয়া গিয়াছিলেন ; যৌবনে মসনদে বসিয়া এবং বিপুল ঐশ্বর্য হাতে পাইয়া এই অপরিণামদশা তরুণের মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছিল। তবে তদানীন্তন সমাজ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিচার করিলে সিরাজকে পৃথক করিয়া নিন্দা করিবার প্রয়োজন হইবে না। অবশ্য তিনি যে উদ্ধত, নির্মম, বুদ্ধিহীন ও কামুক প্রকৃতির ছিলেন, তাহা তাঁহার শুভানুধ্যায়ীরাও স্বীকার করিয়াছেন। কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠিয়াল মঁসিয়ে জঁ। ল' সিরাজের বন্ধু ছিলেন, বিপদের দিনে তিনি সিরাজকে সাহায্যও করিয়াছিলেন। তিনিও সিরাজ সম্বন্ধে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, "The character of Siraj-ud-daulah was reputed to be one of the worst ever known. In fact he had distinguished himself not only by all sorts of debaucheries, but by a revolting cruelty....Everyone trembled at the name of Siraj-ud-daulah"[১০] সম্ভবতঃ আলীবর্দির অত্যধিক আদরে কাঁচা বয়সে সিরাজ এতটা বখিয়া গিয়াছিলেন যে, লোকে তাঁহার নামে ভয় পাইত। তাঁহাকে যথারীতি বিদ্যাশিক্ষা বা অস্ত্রশিক্ষা কোনটাই দেওয়া হয় নাই, মাতামহের আদরে তিনি নবাব হইবার পূর্বেই দুর্দান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সময় সময় বৃদ্ধ আলীবর্দিও এই উদ্ধত বলীবর্দকে সামলাইতে পারিতেন না। যাহা হউক, যে অপরাধে অন্যান্য বাদশাহ-সুবাদারগণ শিরে তাজ ধারণ করিতেন, সেই অপরাধে নিতান্ত তরুণ বয়সে সিরাজকে শির দিতে হইল।

অতঃপর যুবক ক্লাইভের (১৭২৫-৭৪) কনিষ্ঠ অঙ্গুলি ধরিয়া বৃদ্ধ মীরজাফর বাঙলার মসনদে আরোহণ করিলেন। নেশাখোর ঘৃণ্য জীব মীরজাফরকে তাঁহার জীবিতকালেই লোকে 'ক্লাইভের বুড়া গাধা' (Jack ass of Clive)

---

১০ Jean Law—*Memoire sur l' Empire Mogul* (হিল সাহেবের *Bengal in 1756-57*, Vol, III-তে ফরাসী হইতে অনূদিত)

বলিত। এই ঘৃণ্য ব্যক্তির মৃত্যুও হইয়াছিল ঘৃণ্য কুষ্ঠ ব্যাধিতে, গলিত কুষ্ঠে আক্রান্ত হইয়া বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর পশুর মতোই মারা পড়িয়াছিলেন।

১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ২৩শে জুন অপরাহ্ণে বাঙলার স্বাধীন নবাববংশের পরাজয় হইল, ২রা জুলাই রাত্রে সিরাজ নিহত হইলেন। তারপর ইংরাজ যথার্থ ভক্ষক হইয়া বসিবার পূর্বে অঙ্গুলিসঙ্কেতে নবাব নির্বাচন করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া সিংহাসনে বসাইয়াছে, আবার প্রয়োজন ফুরাইলে তাঁহার কান ধরিয়া নামাইয়াও দিয়াছে।

বাঙলায় মধ্যযুগের অবসান হইল, মুসলমান শাসন শেষ হইল, স্বাধীন রাজবংশের বিনাশ হইল। আরম্ভ হইল নূতন ইতিহাস, নূতন জীবন, নূতন ঐতিহ্য। ক্লাইভের আক্রমণের পূর্ব হইতেই বাঙলার মুসলমান শাসন ভাঙিয়া পড়িয়াছিল—চরিত্র, নীতি, মনুষ্যত্ব সবই ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছিল। তারপর বিদেশী সংস্কৃতির রূঢ় আঘাতে বাঙালীর, গোটা ভারতবর্ষেরই নির্মম জাগরণ হইল—পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও নীতি-আদর্শ মধ্যযুগীয় ক্ষয়িষ্ণু জাতিকে আধুনিক জীবন-সমুদ্রের উপকূলে নিক্ষেপ করিল। সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, ঐতিহ্য—প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নবজীবন-জিজ্ঞাসা শুরু হইল। ঐতিহাসিকের এ মন্তব্য অতিশয় যুক্তিসঙ্গত—"In June, 1757, we crossed the frontier and entered into a great new world to which a strange destiny had led Bengal."[১১]

২

স মা জ ও সং স্কৃ তি

অর্থনৈতিক অবস্থা ॥

প্রথম উপচ্ছেদে আমরা রাজনৈতিক কাহিনীর বৃত্তবিবর্তন সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু উহা তো শাসক বংশের জয়পরাজয়ের কাহিনী মাত্র। উহার সঙ্গে জনজীবনের—জনসাধারণের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের কোন যোগাযোগ ছিল কিনা আলোচনা করিয়া দেখা যাক। অষ্টাদশ

১১ HOB, Vol. II, p. 499

শতাব্দীর প্রথমার্ধের রাজনৈতিক ইতিহাস শাঠ্য-ষড়যন্ত্র ও নীচতায় পূর্ণ। জীবন ও সাহিত্যেও সেই উত্তাপ কখনও কখনও সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই অর্ধশতাব্দীতে বাঙালীর অর্থনৈতিক জীবন শোষণের ফলে বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, বিদেশী বণিক ও মুসলমান সুবাদার, দেওয়ান ও তাহাদের প্রসাদলোভী পরগাছার দল বাঙলাকে নিঃসার করিয়া ফেলিয়াছে। আলীবর্দির আমল হইতে দেশের উপরে যুদ্ধবিগ্রহের অজস্র বন্যা বহিয়া গিয়াছে, বর্গীরা দেশ লুঠিয়া শ্মশান করিয়া দিয়াছে, বাঙলা হইতে বহু ধনরত্ন স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রা দিল্লীতে রাজস্ব, নজরানা, আবওয়াব প্রভৃতি নানা খাতে প্রেরিত হইয়াছে। বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল, দুর্নীতিপরায়ণ অভিজাত মুসলমান সমাজের হানিকর ঘৃণ্য আদর্শ জনসাধারণের চরিত্রবল হরণ করিয়াছে—সাহিত্যেও শুধু পুরাতনের বিশীর্ণ অনুকরণ চলিয়াছে। এই অর্ধ শতাব্দীতে যেন মৃত্যুর অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া ঘেরিয়া ধরিয়াছে, আর সেই অন্ধকারে নির্নিমেষ সর্পচক্ষুর মতো ভারতচন্দ্রের আদিরসের ফেনতরঙ্গ জ্বলিতেছে। বিলাসিতা ও বিভ্রান্তি, উজ্জ্বলতা ও বিবর্ণতা, ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য, বিদগ্ধ নাগরিকতা ও স্থূল ইতরতা—সমস্ত পরস্পরবিরোধী ব্যাপার আলো-অন্ধকারের মতো এই অর্ধশতাব্দীতে বাঙালীর মনে শঙ্কাসংশয়কেই ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছিল।

মুর্শিদকুলি খাঁ হইতে আলীবর্দির শাসনকাল পর্যন্ত—শাসন ও রাজস্ব-বিভাগে মোটামুটি নিয়মানুগত্য ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। সেনাবাহিনীর সংখ্যা বাড়িয়াছিল, সেনাবিভাগ সুগঠিত হইয়াছিল। ভারতের নানা স্থান হইতে বলিষ্ঠ ব্যক্তিরা বাঙলার নবাবের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হইত, ফরাসী সৈন্যেরাও তন্‌খার বিনিময়ে নবাবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া লড়াই করিত। রাজস্ব ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে মুর্শিদকুলি খাঁ খুব বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে কর্নওয়ালিশ যে চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথা কায়েম করেন, তাহার গঠনরীতি ও আদর্শও তিনি মুর্শিদের রাজস্ব ব্যবস্থা ও শাসনসংস্কার হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন—যদিও মুর্শিদকুলির বিচক্ষণতার তুলনায় কর্নওয়ালিশের ব্যবস্থা নানা ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত হইয়াছে।

মুর্শিদকুলি খাঁর পূর্বে সুবাদার মীরজুমলা বাঙলার রাজস্ব সংগ্রহের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিছুকাল সে ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই চলিয়াছিল।

তারপর তাহাতে নানা গলদ প্রবেশ করিল। বিশেষতঃ জায়গীর প্রথার ফলে জায়গীরদার ও জমিদারেরা নবাব সরকারে কোন রাজস্ব দিত না, নিয়মিত সৈন্য-সাহায্যও করিত না। মুর্শিদকুলি দেওয়ানী লাভের পর রাজস্বের বিলিব্যবস্থা করিতে গিয়া জায়গীরদারী প্রথার কুফল প্রত্যক্ষ করেন। তখন তিনি জমিদারদের যাবতীয় জমি 'খাল্‌সা' জমি অর্থাৎ রাষ্ট্রের জমি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তৎপরিবর্তে জমিদারদের উড়িষ্যার অনুর্বর অঞ্চল দেওয়া হইল। ফলে জমির বড় অংশের রাজস্ব রাজকোষে জমা পড়িতে লাগিল, মাঝখান হইতে কোন জমিদার তাহার উপর ভাগ বসাইতে পারিলেন না। উপরন্তু মুর্শিদ সুষ্ঠুভাবে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ইজারাদার নিয়োগ করিলেন। তাহারা মোটা টাকা জমা রাখিয়া রাজস্ব সংগ্রহ করিত —এবং ইহার জন্য নিয়মিত বেতন পাইত। ইহারা আবার কৃষকদের অগ্রিম দাদন ('তাকাভি') ঋণস্বরূপ দিয়া জমিদারদের কৃষকের উপর প্রভাব আরও কমাইয়া দিল। মুর্শিদকুলি এবং তাঁহার জামাতা জমিদারদের নিকট প্রাপ্য রাজস্ব আদায়ের জন্য কোন কোন সময় নির্মম অত্যাচার করিতেন। জমিদার হিন্দু হইলে তাঁহাকে সপরিবারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করাও হইত। তাঁহার জামাতা সৈয়দ রাজি খাঁ একটা গর্ত খুঁড়িয়া তাহা মলমূত্রে পূর্ণ করিয়া রাখিতেন—হিন্দুর মনে আঘাত দিবার জন্য রঙ্গ করিয়া তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'বৈকুণ্ঠ'। যে হিন্দু জমিদার যথাসময়ে রাজস্ব দিতে পারিতেন না তাঁহাকে ঐ 'বৈকুণ্ঠে' ডুবাইয়া রাখা হইত।

রাজস্ব সংগ্রহ ও বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে মুর্শিদকুলি মুসলমান কর্মচারীদের বিশ্বাস করিতেন না, ইজারাদারদের পদে এবং দেওয়ানী বিভাগে তিনি বাছিয়া বাছিয়া হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করিতেন। পরবর্তী কালে আলীবর্দিও এই নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। কারণ মুসলমান কর্মচারীরা অনেক সময় আদায়ী রাজস্বের হিসাব দিতে পারিত না, কেহ-বা ইহার অনেকটা লোভে পড়িয়া হজম করিয়া ফেলিত। যাহা হউক জমিদার বংশের উপর ইজারাদারদের জোরজুলুমের ফলে অনেক পুরাতন সম্ভ্রান্ত সামন্তবংশ লুপ্ত হইয়া গেল, এবং ইজারাদারগণ বিত্ত সঞ্চয় করিয়া সেই সমস্ত জমিদারী কিনিয়া রাতারাতি 'হঠাৎ নবাব' হইয়া বসিল। মুর্শিদকুলি খাঁয়ের সময় হইতেই অভিজাত ভূস্বামীদের দ্রুত অপসরণ এবং তাঁহাদের শূন্য স্থানে বিত্তবান অথচ

শিক্ষাদীক্ষাহীন ইজারাদারেরা জমিদার হইয়া বসিল। পরবর্তী কালে জমিদার নামক যে সমস্ত রক্তশোষকের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই এই ইজারাদারদের বংশধর। নাটোর, দিঘাপতিয়া, নড়াইল, তাহিরপুর, পুঁটিয়া, ঘোড়াঘাট, মুক্তগাছা প্রভৃতির জমিদারগণ মূলতঃ ইজারাদার বা অন্য বিভাগের রাজকর্মচারী ছিলেন। প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করিয়া এবং মুর্শিদকুলি খাঁয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ইঁহারা জমিদার হইয়া বসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ—এমন কি, মোদক সম্প্রদায়েরও কেহ কেহ জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। ইঁহারা সগর্বে 'রাজা' উপাধি ধারণ করিতেন, সুবাদারের নিকট হইতেও 'রায়-ই-রায়ান' (মুসলমানী 'খান-ই-খানান-'এর অনুকরণে) উপাধি লাভ করিতেন। উচ্চ বংশের যে সমস্ত হিন্দু কর্মচারী রাজস্ব বা সেনা বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা পদ বা বৃত্তি হিসাবে সুবাদারের নিকট বখশি, সরকার, কানুনগো, শাহানা (সানা), চাকলাদার, তরফদার, মুন্সি, লস্কর, প্রভৃতি উপাধি লাভ করিতেন এবং কৌলিক উপাধি ত্যাগ করিয়া নবাব-সুবাদার প্রদত্ত এই সমস্ত মুসলমানী উপাধি ব্যবহার করিতেন। এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ এই উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙলাকে তেরটি প্রধান বিভাগে (চাকলা) এবং তেরটি উপবিভাগে বিভক্ত করিয়া জমিদারদের উপর প্রত্যেক উপবিভাগের রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়াছিলেন। ধূর্ত দেওয়ান-সুবাদার কোন কোন ক্ষেত্রে অনাবাদী জমিকে আবাদী বলিয়া ধরিয়া উচ্চ হারে রাজস্ব ধরিতেন। মুর্শিদের পূর্বে বাঙলার আদায়ী রাজস্বের মোট পরিমাণ ছিল এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা। সুবাদার নানাভাবে রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার ফলে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইল প্রায় দেড় কোটি টাকা—ইহাই 'জমা কামিল' বা মোট নির্ধারিত রাজস্ব। এই 'জমা কামিল' আদায়ের জন্য তিনি যে-কোন পন্থা গ্রহণে ইতস্তত: করিতেন না, কিন্তু প্রাপ্যের অতিরিক্ত দাবি করাও তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। ফলে মুর্শিদকুলি খাঁ ও আলীবর্দির সময়ে নির্ধারিত রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে প্রজাদের উপর ততটা উৎপীড়ন হইত না। কিন্তু মুর্শিদ-কুলির জামাতা সুজা উদ্দিন সুবাদার হইয়া এই নিয়ম ততটা মানিয়া চলিতেন না। তিনি প্রতি বৎসর দিল্লীতে রাজস্ব বাবদ এককোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা

পাঠাইতেন।[১২] কিন্তু তাঁহার সময়ে 'জমা কামিলে'র মোট পরিমাণ ছিল ১,৪২,৪৫,৫৬১ টাকা। ইহা হইতে এককোটি পঁচিশ লাখ দিল্লী চলিয়া গেলে তাঁহার সংসারযাত্রা ও নবাবীলীলা চলে কি করিয়া? তাই তিনি জমিদারের উপর নানা বাবদে অতিরিক্ত কর ('আবওয়াব') ধরিতেন। নজরানা, মোকররি, জর মাথুট, মাথুট পিলখানা, ফৌজদারি আবওয়াব প্রভৃতি বিভিন্ন খাতে ১৯,১৪,০৯৫ টাকা অতিরিক্ত রাজস্বরূপে সংগৃহীত হইত—ইহার সবটাই সুবাদার হজম করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু সমস্ত চাপ পড়িত প্রজাদের উপর—জমিদারেরা প্রজাদের উপর দিয়া অতিরিক্ত 'আবওয়াবের' রথ চালাইয়া দিতেন—সুতরাং প্রজাদের অবস্থা সহজেই কল্পনা করিতে পারা যায়।

আলীবর্দি বর্গীর হাঙ্গামার সময় যুদ্ধব্যয় নির্বাহের জন্য জমিদারদের উপর ২২,২৫,৫৫৪ টাকা 'আবওয়াব' ধরিয়াছিলেন। ইংরাজ বণিকদেরও ভয় দেখাইয়া তিনি যুদ্ধ ব্যয় বাবদ সাড়ে তিনলাখ টাকা আদায় করেন। অন্যান্য বিদেশী বণিকদেরও তিনি রেহাই দেন নাই, তাহাদের নিকট হইতেও তিনি প্রায় পৌনে এক লাখ টাকা আদায় করিয়াছিলেন। অবশ্য এইজন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ দেশের সাধারণ শত্রু বর্গী বিতাড়নের জন্য সকলেরই নবাবকে সাহায্য দান করা প্রয়োজন হইয়াছিল। অবশ্য তিনি জমিদারদের উপর উচ্চ হারে আবওয়াব ধরিলে হিন্দু জমিদারেরা নাকি তলে তলে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করিয়াছিলেন।[১৩]

---

১২ বারো বৎসর সুজাউদ্দিন বাঙলার সুবাদারী করিয়াছিলেন। তাহা হইলে তাঁহার শাসনকালে বাঙলা হইতে মোট ১৪,৬২,৭৮,৫৩৮ টাকা দিল্লীর তোশাখানায় প্রেরিত হইয়াছিল—দেশ কীভাবে নিঃস্ব হইতে বসিয়াছিল, ইহাই তাহার একটা স্থূল হিসাব।

১৩ ১৭৫৪ খ্রীঃ অব্দে কর্নেল স্কট তাঁহার এক বন্ধুকে লেখেন, "Jentue (i. e. Hindoos) Rajahas and inhabitants were much disaffected to the Moor (i. e. Muhammadan) Government and secreatly wished for a change and oppertunity of throwing off their tyrannical yoke." (*Hill's Bengal in 1556-57*, Vol. III. p. 328) সুতরাং হিন্দু রাজ-কর্মচারী ও ভূস্বামীরা মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে বোধ হয় গোপনে গোপনে একটু-আধটু ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা যে এই সময় সম্পন্ন হিন্দুর নিকট গোপনে নানা সাহায্য লাভ করিত তাহার প্রমাণ আছে। সিরাজ-বিতাড়িত ইংরাজ দুঃস্থ অবস্থায় ফলতার নঙর ফেলিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তখন কলিকাতার রাজ

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে বাঙলা দেশের অভ্যন্তরে ও উপকূলে বিদেশী বণিকদের বাণিজ্যাদি পুরাদমেই চলিতেছিল। প্রথম দিকে দিনেমার কোম্পানী চুঁচুড়া, কাশিমবাজার ও পাটনায় কুঠি স্থাপন করিয়া বেশ ফলাও কারবার ফাঁদিয়াছিল। ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নানা বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়িয়াছিল, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই দিল্লীর বাদশাহকে ৪০, ০০০ টাকা এবং বাঙলার সুবাদারকে ১০, ০০০ টাকা দিয়া মাত্র ২২/২% শুল্কের বিনিময়ে চুটাইয়া বাণিজ্য করিতে লাগিল। অস্ট্রিয়ান অসটেণ্ড কোম্পানীও এই শতাব্দীর প্রথমভাগে দুই একস্থলে অস্ট্রিয়ান পতাকা তুলিয়া বেশ বাণিজ্য চালাইতেছিল। ঈর্ষাতুর ইংরাজ ও দিনেমার বণিকগণ হুগলীর ফৌজদারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া বেশ কিছু রৌপ্যচক্রের বিনিময়ে অসটেণ্ড কোম্পানীকে বাঙলা হইতে বিতাড়িত করিয়া (১৭৩৩) নিজেরা মহানন্দে কারবার চালাইতে লাগিল। সুজা উদ্দিনের সময়ে ইংরাজ, ফরাসী, দিনেমার, জার্মান—এমন কি পোল্যাণ্ড ও সুইডেনের ব্যবসায়ীরাও বাঙলা দেশে বাণিজ্য চালাইত। তবে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাড়বাড়ন্ত একটু বেশীই হইয়াছিল। সুজা উদ্দিন সমস্ত বিদেশী বণিককেই নিজ কব্জার মধ্যে রাখিয়াছিলেন—যদিও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা গোপনে গোপনে নিজেদের নৌকায় কোম্পানীর নিশান তুলিয়া কোম্পানীর বকলমে নিজেরা বাণিজ্য চালাইত এবং নবাব সরকারের শুল্ক ফাঁকি

নবকৃষ্ণ বাহাদুর গোপনে তাঁহাদিগকে খাদ্যসামগ্রী যোগাইয়াছিলেন। সিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করিলে নবাব-চক্ষুর অন্তরালে বিপন্ন ইংরাজদের অর্থ ও খাদ্যাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন কলিকাতার ধনকুবের গঙ্গারাম ঠাকুর ও নকুড়চন্দ্র সরকার। সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা যে সমস্ত হিন্দুর সঙ্গে গোপনে গোপনে সলাপরামর্শ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে গোবিন্দরাম, রঘুমিত্র, শোভারাম বসাক, শুকদেব মল্লিক. দয়ারাম বসু, হরিকৃষ্ণ ঠাকুর, দুর্গারাম দত্ত, চৈতন্য দাস, দুর্লভ চরণ বসাক, চূড়ামণি বিশ্বাস, রাজারাম পালিত, নীলমণি চৌধুরী প্রভৃতি ভূস্বামী ও বণিকের নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী যুগেও দেখা যায়, সিতাব রায়, কল্যাণ সিং, মহারাজ বেণীবাহাদুর, রায় সাধুরাম—প্রভৃতি ধনী-ভূস্বামীরা মীরকাশিমের বিরুদ্ধে গোপনে গোপনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সাহায্য করিয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য: ডঃ কালীকিঙ্কর দত্ত প্রণীত ***Studies in the History of Bengal Subah*, Vol. I,**

দিত।[১৪] এই ব্যাপার লইয়া প্রত্যেক সুবাদার-দেওয়ান-ফৌজদারের সঙ্গেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরোধ বাধিত।

এই সময়ে সাধারণ লোকের অবস্থা কেমন ছিল তাহা দেখা যাক। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বেই দেশীয় ব্যক্তিদের বাণিজ্যকেন্দ্রে ইংরাজ বণিকের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙলার যাবতীয় তন্তুজ দ্রব্য বাঙালী বণিকের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া নিজেরাই অন্যান্য প্রদেশে ও ভারতের বাহিরে রপ্তানি করিতে আরম্ভ করিল এবং কোম্পানী ধনস্ফীত হইতে লাগিল। সেই সময়ে দিল্লীর মুঘল বাদশাহ্ হৃতগৌরব হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার ফলে প্রদেশে প্রদেশে শুল্কের হারের অনেক তারতম্য হইত—তখন অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলাকে নিয়মানুগ করিবার মতো দেশে কোন শক্তিও ছিল না। কাজেই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালী বণিকের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। তখন সাধারণ লোকে টাকায় দশ-বারো সেরের অধিক চাউল সংগ্রহ করিতে পারিত না।[১৫]

১৭৫১ খ্রীঃ অব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতায় জিনিসপত্রের একটা নির্দিষ্ট দাম বাঁধিয়া দিয়াছিল, যাহার ফলে সে সময়ে এই অঞ্চলে টাকায় ১মণ ৩২ সের মোটা চাউল মিলিত। কিন্তু বর্গীর হাঙ্গামার প্রতিক্রিয়ার ফলে এই নিয়ম ভাঙিয়া পড়িল। ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দে অতিবৃষ্টির ফলে বহু ধান চাউল হাজিয়া গেল, ফলে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল—তাহার সঙ্গে আবার যোগ দিল বর্গীর উৎপাত। ফলে বাঙলার অর্থনৈতিক কাঠামো সেই যে ভাঙিয়া পড়িল, পরবর্তী তিনশত বৎসরের মধ্যেও সে ভাঙা আর্থিক অবস্থা আর জোড়া লাগিল না। ১৭৫১ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় একজন কুলি সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া মাত্র দশ পয়সা উপার্জন

---

১৪ Verelest তাঁহার *View of Bengal*-এ এবিষয়ে স্পষ্টই বলিয়াছেন, "A trade was carried on without payment of duties, in the proseution of which infinite oppresions were committed. English agents and gomostahs, not contented with injuring the people, trampled on the authority of Government, binding and punishing the Nabob's officers wherever they presumed to interfare." (ডঃ কালীকিঙ্কর দত্তের *Alivardi and His Times* হইতে উদ্ধৃত।)

১৫ ঐ

করিত। তখন কলিকাতায় এক মণ মোট চাউলের দাম ছিল দেড় টাকা। অবশ্য যে সমস্ত দেশের লোক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর বাড়ীতে চাকুরী করিত তাহাদের মাসিক বেতন একটু বেশী ছিল। সাহেবের খানসামারা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাসে পাঁচটাকা মাহিনা পাইত। নাপিতে দাড়ি কামাইবার পারিশ্রমিক পাইত এক পয়সা। কলিকাতা শহরে বহু দিন কড়িতে লেনদেন চলিয়াছিল। কড়ির হিসাবে অনেক সময় গোলমাল হইত, গরীব মানুষেই তাহাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইত। অথচ সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙলার উৎপন্ন তন্তুজাত দ্রব্য, লোহা ঢালাই, কামান বন্দুকের কারখানা (বীরভূমে লোহা ঢালাইয়ের কারখানা ছিল) প্রভৃতি ছিল। শুনা যায়, তখন দেশে কৃত্রিম বরফও তৈয়ারি হইত। কিন্তু বর্গীর হাঙ্গামা ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থপর নীতির ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর শিল্পবাণিজ্য, কল কারখানা সব লোপ পাইয়া গিয়াছিল।[১৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আর্থিক দুর্গতির চিত্র সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য অল্পস্বল্প মিলিতেছে। রামেশ্বরের 'শিবায়নে' জামাইয়ের সঙ্গে সদ্য-বিবাহিতা কন্যাকে বিদায় দিবার সময় শাশুড়ী জামাতাকে অনুরোধ করিয়াছেন —"আঁঠু ঢাকি বস্ত্র দিহ পেট ভরি ভাত"। গ্রাসাচ্ছাদনের নিম্নতম অধিকারও মধ্যবিত্ত সমাজে ক্রমে ক্রমে হারাইয়া যাইতেছিল। ভারতচন্দ্রের হরিহোড়ের দারিদ্র্যের বর্ণনা কথার কথা নহে, বা প্রথাপালনের গতানুগতিকতাও নহে। রায়গুণাকরের ঈশ্বরী পাটুনী অন্নদার কাছে শুধু পুত্রদের জন্য দুধভাত প্রার্থনা করিয়াছিল, সোনাদানা রাজৈশ্বর্য নহে—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে"। রামানন্দ ঘোষ নিজের ব্যর্থ জীবনের নিদারুণ দারিদ্র্যের কথাও সক্ষোভে বর্ণনা করিয়াছেন :

> ধনীতে বান্ধয়ে ধন জলে বান্ধে জল।
> নাহি মিলে কাঙ্গালের কড়ার সম্বল॥
> ... ...
> ক্ষুধায় না মিলে অন্ন পিয়াসে না পানী।
> মিথ্যা ধন্দে গেল মোর দিবস-রজনী॥

এ সমস্ত উক্তি একযুগের নিঃসার অর্থনৈতিক অবস্থার কথাই স্মরণ করাইয়া

১৬ Dr. K. K. Datta—*Studies in the History of Bengal Subah*, vol. I

দিতেছে। এই যুগে প্রাপ্ত চিঠি পত্রাদিতেও[১৭] জনসাধারণের নিদারুণ দারিদ্র্যের মসীলাঞ্ছিত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। শুধু প্রাণধারণের জন্য কেহ কেহ ধনীর নিকট সপরিবারে আত্মবিক্রয় করিতেছে, দুই-চারি টাকার বিনিময়ে স্ত্রীপুত্র বেচিয়া দিতেছে—এসমস্ত ঘটনা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই শুরু হইয়া গিয়াছিল।

সমাজ ও সংস্কৃতি ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজের মধ্যে বিশেষ কোন নূতনত্ব বা বৈচিত্র্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। ইতিপূর্বে অর্থনৈতিক তথ্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, মুঘলশাসনের শেষভাগে বাঙলার স্বাধীন নবাবী আমলে অর্থনৈতিক শোষণের ফলে বাঙলার সাধারণ সমাজ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই ব্যাপার দেখা দিল। মুর্শিদকুলি খাঁয়ের সময় হইতেই বাঙলার পুরাতন জমিদার বংশ ও সামন্তশ্রেণীর বিলোপ হইতে লাগিল, এবং ইজারাদার ও আমিনগণ জমিদার হইয়া বসিল। প্রাচীন ভূস্বামী বংশ একদা সমাজের কেন্দ্র স্থলে বিরাজ করিত। ইঁহারা গোব্রাহ্মণের সেবা করিয়া এবং মোটামুটি বর্ণাশ্রম সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের সংরক্ষক হইয়া শিক্ষা সংস্কৃতিরও কর্ণধার হইয়াছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁহারা অকস্মাৎ গৌরবচ্যুত হইলে দেশের সামাজিক ভারকেন্দ্রও ভাঙিয়া পড়িল। অবশ্য তখনও বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, কুচবিহার, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলের সামন্তগণ নিজ নিজ আঞ্চলিক প্রাধান্য অনেকটা বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি পোষণে যথাসম্ভব সাহায্য করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর ও কুচবিহাররাজ এ বিষয়ে বিশেষ গৌরব দাবি করিতে পারেন। কারণ তাঁহাদের সভায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও কবি-সাহিত্যিকের বিশেষ গৌরব ছিল।[১৭ক] সংস্কৃত

---

১৭ বাংলা পত্রসঙ্কলন—ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত

১৭ক দ্বিজ ভবানী রামায়ণ অনুবাদের জন্য নোয়াখালির জমিদারের নিকট দৈনিক দশ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক পাইতেন ('দিনে দিনে দশমুদ্রা দান')। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও নদীয়ার স্মার্তপণ্ডিত নৈয়ায়িক ও জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতদের খুব সম্মান করিতেন। টোল-চতুষ্পাঠীর ব্যয় নির্বাহের জন্যও তিনি বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। (*Calcutta Review*, 1872)

ও বাংলা গ্রন্থ রচনার সঙ্গে তাঁহাদের নামও ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প প্রতিপত্তিশালী জমিদারগণ (যাঁহারা পূর্বে নবাব সরকারে কর্ম করিতেন) এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন ছিলেন। ফলে সামাজিক বন্ধন ও সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিকাশ যে বিশেষ ভাবে খর্ব হইয়া পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দু সমাজে একটা নূতন পরিবর্তন এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মুর্শিদ-কুলি খাঁয়ের সময় হইতে রাজসরকারে, বিশেষতঃ রাজস্ববিভাগে হিন্দুকর্ম-চারীর সংখ্যা বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। আলীবর্দিও শাসনব্যাপারে কোনও প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতেন না—যদিও তাঁহারা নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ হিন্দুর উৎসবেও যোগ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, বিশেষতঃ দোললীলার সময় মুসলমান নবাব ও ওমরাহের দল হারেমে আবীর-গুলাল লইয়া এবং পিচকারিতে রঙিন গুলাবজল ভরিয়া আওরত-বাহিনীর সঙ্গে রঙ ও রসের যুদ্ধে মাতিয়া উঠিতেন। শুনা যায় সাহামৎ জঙ্গ ও সৌলৎ জঙ্গ মুর্শিদাবাদের মতিঝিলের বাগানে সাতদিন ধরিয়া হোলি খেলিতেন। সিরাজও আলিনগরের (কলিকাতা) সন্ধির পর মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া হোলি উৎসবে সানন্দে যোগ দিয়াছিলেন। মীরজাফরও পাটনায় থাকার সময় হোলিতে যোগ দিতেন। কুষ্ঠব্যাধির আক্রমণে মীরজাফর যখন মৃত্যুর পথে চলিয়াছিলেন তখন মহারাজ নন্দকুমার কিরীটেশ্বরীদেবীর (বরনগর) চরণামৃত পান করাইয়া রোগীকে চাঙ্গা করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন—তবে এ মুষ্টিযোগ বিশেষ কাজ দেয় নাই।

হিন্দুরাও মুসলমান পীর-ফকিরকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত, সত্যপীরকে সত্য-নারায়ণ বলিয়া শীর্নি দিত। কোরানকেও হিন্দুরা নিজেদের ধর্মগ্রন্থের মতো শ্রদ্ধা করিত। ক্ষমানন্দের মনসামঙ্গলের কোন কোন পুঁথিতে আছে যে, লোহার বাসরঘরে লখিন্দরকে সর্পাঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দুর ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে একখানি কোরানও রক্ষিত হইয়াছিল। সমসের গাজীর পুঁথিতে আছে, হিন্দুর দেবী তাঁহাকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ দিয়াছিলেন। গাজীও দেবীকে ব্রাহ্মণের দ্বারা হিন্দুর রীতি অনুসারে ভক্তিভরে পূজা করিয়াছিলেন।

সে যুগের মুসলমান অভিজাত সমাজে হিন্দুর জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিশেষ

প্রভাব ছিল। সরফরাজ ও আলীবর্দি যুদ্ধযাত্রা বা কোন শুভকার্যের পূর্বে হিন্দু জ্যোতিষীকে আনাইয়া ভবিষ্যৎ গণাইয়া লইতেন, মীরকাসিম নিজেও হিন্দু পণ্ডিত রাখিয়া জ্যোতিষবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক মুসলমান কবি ইসলামী কাব্য রচনার প্রারম্ভে হিন্দুর দেবদেবীরও বন্দনা গাহিয়াছেন। তেমনি আবার মহরম উৎসবে হিন্দুরাও যোগ দিত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক ও ধর্মীয় উদারতা লক্ষ্য করা যায়। দৌলত রাও সিন্ধিয়া মহরম উৎসবে মুসলমান প্রজাদের মতো সবুজ পোষাক পরিধান করিয়া ঐ উৎসবে নিষ্ঠা সহকারে যোগ দিতেন।[১৮] দিল্লী দরবারের আনুকূল্যে দুর্গোৎসব হইত—এরূপ জনশ্রুতিও প্রচলিত আছে।[১৯] হ্যামিল্টন বুকানন ঊনবিংশ শতাব্দীতেও দেখিয়াছিলেন যে, ভাগলপুর অঞ্চলে হিন্দুমুসলমানে মিলিয়া মহরম উৎসব করিত।[২০]

এই সময়ে ধীরে ধীরে কলিকাতা জাঁকিয়া উঠিতেছিল। ঢাকা হইতে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হইলে শাসনকেন্দ্র, সভাজীবী নাগরিকতা ও ব্যবসাবাণিজ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই অঞ্চলেই প্রাধান্য লাভ করিতেছিল। ক্রমে হুগলী-চুঁচুড়া-শ্রীরামপুর হইতে ভাগীরথীর দুইতীর ধরিয়া সুতানুটী-কলিকাতা-গোবিন্দপুর পর্যন্ত অঞ্চল ধীরে ধীরে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হইল, সভ্যতা সংস্কৃতিও এইদিকে সরিয়া আসিতে লাগিল। মুসলমান আমীর-ওমরাহ, পদস্থ হিন্দু রাজকর্মচারী ও বণিক —সকলেরই দৃষ্টি গাঙ্গেয় ভূমিখণ্ডের দিকে আকৃষ্ট হইল—উপরন্তু পুরাতন জমিদার বংশ অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে নিষ্কর জমিদান করিয়া বাঙালী হিন্দু সংস্কৃতিকেও এই অঞ্চলে সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে পশ্চিমবঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া হইতেই ব্যবসাবাণিজ্য ও শিক্ষা-দীক্ষা সাহিত্যের প্রাধান্য স্থাপিত হইল। সেই প্রাধান্যের মধ্যমণি হইল জলজঙ্গল পরিবেষ্টিত সুতানুটী-গোবিন্দপুর-কলিকাতা নামক তিন খানি তুচ্ছ গ্রাম।

সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই কলিকাতা নগরী অতি দ্রুতবেগে

---

১৮ Dr. S. N. Sen—*Administrative System of the Marathas*, p. 401

১৯ *Bengal Past and Present*, 1932 (আবদুল আলীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

২০ K. K. Datta—*Alivardi and His Times*, p. 259, 260

নাগরিক জীবনকে গ্রহণ করিয়া ক্রমেই প্রাধান্য লাভ করিতেছিল। মুর্শিদাবাদ হুগলী প্রভৃতি অঞ্চল শাসনকেন্দ্র ও বাণিজ্যকেন্দ্র হইলেও মুসলমান সুবাদার-ফৌজদার-দেওয়ানের খামখেয়াল ও লোভ-লালসা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য হিন্দু-মুসলমান-আরমানী বণিকের দল স্ত্রী-পুত্রাদি সহ ইংরাজের নিরাপদ আশ্রয়ে আসিয়া বিষয়কর্মে প্রবৃত্ত হইল। ১৭১৭ খ্রী: অব্দে বাদশাহ ফারুকশায়ার ইংরাজ বণিককে সামান্য শুল্কের বিনিময়ে এদেশে নির্ভয়ে বাণিজ্য করিবার অধিকার দিলে ইংরাজের ব্যবসাবাণিজ্য দ্রুতবেগে বাড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে ইংরাজ বণিক কলিকাতার দক্ষিণে ৩৮টা গ্রাম ইজারা লইতে চাহিলে বাঙলার নবাবের বাধাদানের ফলে তাহা আর সম্ভব হইল না। ১৭০০ খ্রী: অব্দে কলিকাতা মাদ্রাজের আওতা হইতে মুক্তি পাইয়া স্বাধীন ভাবে বিকাশের সুযোগ পাইল, ক্রমে ক্রমে কলিকাতার লোকসংখ্যাও বাড়িতে লাগিল। ১৭০৪ খ্রী: অব্দে কলিকাতার লোকসংখ্যা ছিল ১৫,০০০ ; কিন্তু অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে (১৭৫০) ইহা এক লক্ষে পরিণত হইল।

বহুজনের যাতায়াতের ফলে হুগলী যেমন বন্দর হিসাবে ব্যবসার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, তেমনি ইহা সিয়া সম্প্রদায়ের কেন্দ্ররূপেও পরিচিত হইয়াছিল। ইরান হইতে সিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান বণিক, শিল্পী, হেকিম এবং শিল্পী-সাহিত্যিকেরা বাঙলা দেশকে আশ্রয়স্থল মনে করিয়া দলে দলে এখানে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতেই বাঙলায় ইরানী সিয়া মুসলমানের যাতায়াত বাড়িয়া গিয়াছিল। কারণ ইরানে আফগান আধিপত্যের ফলে সিয়াগণ বাধ্য হইয়াই নিরাপদ বাসস্থানের আশায় মুর্শিদাবাদ ও হুগলী অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। কারণ তখন বাঙলার মসনদে সিয়াবংশই আসীন। সিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত প্রসিদ্ধ ফারসী ঐতিহাসিক আবুল হাসান গুলিস্তানি ১৭৫৬ খ্রী: অব্দের দিকে আশ্রয়প্রার্থীরূপে বাঙলায় আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। এইরূপে পশ্চিমবঙ্গে সিয়া আভিজাত্য বেশ দৃঢ়মূল হইয়াছিল।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে শিক্ষাদীক্ষা কি অবস্থায় ছিল তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাচীন জমিদার বংশের স্থলে ইজারাদারগণ জমিদার বনিয়া গেলেও তখন

দেশের মধ্যে প্রাচীন ঐতিহ্যবিশিষ্ট কিছু কিছু সামন্তশ্রেণীর ভূস্বামিসম্প্রদায় ছিল। কৃষ্ণনগর, কুচবিহার, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলের সামন্ত ও জমিদারগণ টোলচতুষ্পাঠীর ব্যয়ভার বহন করিতেন, ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে বৃত্তি ও নিষ্কর জমি দিয়া মোটামুটি প্রাথমিক ও উচ্চ সংস্কৃত শিক্ষার ধারা বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষতঃ কৃষ্ণনগরাধিপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় বহু পণ্ডিত ও কবি শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিলেন। নৈয়ায়িক ও অন্যান্য শাস্ত্রাধিকারীরা মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতেন। ফলে কৃষ্ণনগরের চারিপাশে সংস্কৃত স্মৃতি-মীমাংসা-ন্যায়শাস্ত্র চর্চার নানা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর হইতে মনে হয়, পণ্ডিত ও শিক্ষিত সমাজে ব্যাকরণ, ভট্টিকাব্য, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, অলঙ্কার শাস্ত্র এবং ষড়দর্শনের কোন কোন শাখার (বিশেষতঃ বেদান্ত) বেশ চর্চা ছিল। শুনা যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আশীজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে প্রতিপালন করিতেন, তিনি নিজেও ন্যায়শাস্ত্রে বেশ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার সভাপণ্ডিত প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, রামানন্দ বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, বীরেশ্বর ন্যায় পঞ্চানন প্রভৃতি পণ্ডিতদের সঙ্গে তিনি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতেন। বিখ্যাত জ্যোতিষবিশারদ রামরুদ্র বিদ্যানিধি তাঁহার রাজসভায় অবস্থান করিয়া 'সারসংগ্রহ' রচনা করেন।[২১]

মুঘলযুগে রাজকার্যাদি সমস্তই ফারসী ভাষায় চলিত বলিয়া হিন্দু রাজকর্মচারী ও কর্মপ্রার্থীরা বেশ মনোযোগ দিয়া ফারসী ভাষা শিখিতেন—বিশেষতঃ কায়স্থ সম্প্রদায়। ভারতচন্দ্র রামচন্দ্র মুন্সীর নিকট ফারসী ভাষা শিখিয়াছিলেন ভবিষ্যতে রাজকর্মচারী হইবার জন্য। তিনি হিন্দীভাষাও ভালো জানিতেন। নরসিংহ বসু নামক অষ্টাদশ শতাব্দীর এক কবি উত্তমরূপে ফারসীভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেববাহাদুর প্রথম জীবনে হেস্টিংসকে ফারসী শিখাইতেন; আলীবর্দির আমলে তাঁহার অনেক হিন্দু কর্মচারী ফারসীনবিশ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার এক কর্মচারী কিরীটচাঁদ ফারসী ব্যাকরণে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন—রাজা রামনারায়ণ ফারসীতে কবিতা রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

আলীবর্দির সময়ে সরকারীভাবে মুসলমান সমাজের জন্য প্রাথমিক ও

২১ ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত, পৃ. ৪১

উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আজিমাবাদ (পাটনা) কিছু পূর্ব হইতেই ফারসী শিক্ষা ও ইসলামী তমদ্দুনের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। বাঙলা দেশেও শিক্ষিত ও অভিজাত মুসলমান সমাজে ফারসী কিস্‌সা-সাহিত্য, হেকিমী ও জ্যোতির্বিদ্যার বেশ চলন ছিল। মসজিদ বা ইমামবাড়ায় সরকারী ব্যয়ে ইসলামী শাস্ত্রজ্ঞ মুসলমান উলেমাগণ প্রতিপালিত হইতেন, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মক্তবও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সুশাসক আলীবর্দির সময়েও বিশাল হিন্দুসমাজের শিক্ষার জন্য রাজকোষ হইতে এক কপর্দকও ব্যয় করা হয় নাই। হিন্দু জমিদারগণ হিন্দুসমাজের শিক্ষার জন্য টোলচতুষ্পাঠীতে যে সাহায্য করিতেন তাহাই ছিল হিন্দুসমাজের শিক্ষার একমাত্র উপায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কলিকাতা অঞ্চলে ইংরাজ বণিকদের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালীরা, বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দুরা কাজকর্ম চালাইবার জন্য অল্পস্বল্প ইংরাজী শিখিবার চেষ্টা করিতেছিল। ১৭৫৪ খ্রীঃ অব্দে মেপল্‌-লফ্‌ট্ (Maple Loft) নামক এক মিসনারী সাহেবের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে লিখিত এক আবেদনপত্র হইতে দেখা যাইতেছে, এই সময়ে কলিকাতার স্থানীয় দেশীয় ব্যক্তিদের কেহ কেহ ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম ১৭৬৬ খ্রীঃ অব্দে ইৎসামুদ্দিন নামক নিজ পক্ষীয় এক উকিলকে পার্লামেণ্টে তাঁহার হইয়া ওকালতি করিবার জন্য বিলাত পাঠাইয়াছিলেন। ইৎসামুদ্দিন নিশ্চয়ই বেশ ভালো করিয়া ইংরাজী ভাষা শিখিয়াছিলেন। তাহা না হইলে শাহ্‌আলম তাঁহাকে বিলাত পাঠাইবেন কেন?

তখন বাঙলা দেশে কোন কোন ক্ষেত্রে দাসব্যবসায়ের প্রচলন ছিল। ১৭২৯-৩০ খ্রীঃ অব্দের দিকে হাটেবাজারে দশ-এগারো বৎসরের বালিকা রীতিমতো ক্রয়বিক্রয় হইত। দারুণ দারিদ্র্যের জন্য অনেকে শুধু খোর-পোষের বিনিময়ে সপরিবারে আত্মবিক্রয় করিত, তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। এইরূপ ক্রয়বিক্রয় হিন্দুসমাজেও প্রচলিত ছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও এরূপ অনেক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। পূর্ববঙ্গে আবার তৈজসপত্রাদির মতো দাসদাসীও হস্তান্তরিত হইত। কলিকাতায় ৫০০৲ টাকায় কাফ্রী দাস কিনিতে পাওয়া যাইত। এইরূপ

ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারে বিদেশী বণিকেরাই বেশী তৎপর ছিল। তাহারা দাসদাসীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিত। ফলে অনেক ক্রীতদাস নির্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইয়া যাইত। শ্বেতাঙ্গ প্রভু পলাতক ক্রীতদাসকে ধরিতে পারিলে যে কিরূপ নিগ্রহ করিত তাহা সহজেই অনুমেয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর এই পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যের কিরূপ বিকাশ হইয়াছিল তাহা পরবর্তী অধ্যায় আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

একাদশ অধ্যায়

পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি

মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরিয়া বাঙলাদেশের নগর-জনপদের উপর দিয়া কিরূপ অরাজকতা ও কুশাসনের ঘূর্ণিবায়ু বহিয়া গিয়াছিল তাহা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান রাজশক্তির অবসান হইবার পর পাশ্চাত্য শাসন এদেশে বদ্ধমূল হইবার পূর্ব পর্যন্ত জাতীয় জীবনে বিশেষ কোনরূপ পরিবর্তন দেখা যায় নাই। পর্যুসিত জীবনের ক্লিন্ন তণ্ডুলকণা খুঁটিয়া লইবার জন্য যেন ভিখারীসঙ্ঘের কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। অর্থনৈতিক রক্তহীনতা, শাঠ্য-ষড়যন্ত্রের পূতিগন্ধ এবং চারিত্রভ্রষ্টতার ধূমাঙ্কিত কালিমা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালী জীবন ও সমাজকে মসীলাঞ্ছিত বিবর্ণতায় দুর্নিরীক্ষ্য করিয়া তুলিয়াছিল। সেই হীনতার পঙ্কগ্লানি এই অর্ধশতাব্দীর সাহিত্যেও সঞ্চারিত হইয়াছিল—তাহা এই যুগের ভূরি-পরিমাণ পুঁথিপত্রের সন্ধান লইলেই দেখা যাইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত পুঁথিসমূহের মধ্যে অনেকগুলিই অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত, কোন কোনখানি আবার প্রাচীন পুঁথির অর্বাচীন নকল। প্রায় সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী ধরিয়াই পুঁথির প্রতাপ প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু শতাব্দী শেষে প্রত্যূষ দিগন্তে আলোক-রেখার মতো কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাব হইল, হরিদ্রাভ তুলোট কাগজ আর তালপত্রে সেহাই কালির ভ্রমরকৃষ্ণ অক্ষরপংক্তির আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া আসিল, ছাপাখানা হইতে কালিঝুলি মাখিয়া ইস্তাহার, বিজ্ঞাপন, আইনের তর্জমা, ইংরেজী ব্যাকরণ-অভিধান-শব্দকোষ প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যাপার রাশি রাশি প্রকাশিত হইতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীতেও হাতেলেখা পুঁথির রেওয়াজ লোপ পায় নাই—পুরাতন সাহিত্য-ধারা তখনও গ্রামে গ্রামান্তরে, চণ্ডীমণ্ডপে, দেবমন্দিরে, গোশালায় মুখ

লুকাইয়া কিছুদিন আত্মরক্ষায় করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়ের পুঁথি-সংক্রান্ত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে, "দেশের লোকে দেশের সাহিত্য, হাতেলেখা পুঁথিপত্রাদির কথা ভুলিতে লাগিল। ভুলিতে লাগিল বিশেষ করিয়া দেশের আলোকপ্রাপ্ত উচ্চতর সম্প্রদায়ের সকলে। পুঁথি খুলিতে লাগিল মাত্র বাড়ির ইংরেজি-না-জানা মেয়েরা আর নিম্নবর্ণের লোকেরা। পাঁচালীর বদনামে দেশের কাব্য, সঙ্গীত, চিকিৎসা, জ্যোতিষ গ্রন্থরাজি একেবারে উপেক্ষিত হইয়া পড়িল পাশ্চাত্য-সংস্কৃতিমুগ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট।"[১]

ডঃ মণ্ডলের এই মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত বটে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, পুঁথিসাহিত্য আধুনিক শিক্ষিতমহলে অপ্রচলিত হইবার কারণ, উনবিংশ শতাব্দী হইতে বাঙলাদেশে, বিশেষতঃ শহরে নগরে যে-ধরনের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য প্রাধান্য পাইতেছিল, তাহাতে পুরাতন ধরনের পুঁথি-আশ্রয়ী কাব্যাদি পাঠক সমাজে আদরণীয় হওয়া সম্ভব ছিল না। মধ্যযুগের বিপুল-কলেবর পুঁথিসাহিত্য যদি উনবিংশ শতাব্দীতেও বাঙালীর কাব্যপ্রচেষ্টার দিক নির্ণয় করিত, তাহা হইলে, যে বাংলা সাহিত্য লইয়া আমরা বিশ্বসভায় গৌরব করি, তাহার আবির্ভাবে বহু বিলম্ব হইয়া যাইত। ঐতিহাসিক কারণেই মধ্যযুগের সমাপ্তি হইয়াছে, তাহার সঙ্গে ঐ যুগের সংস্কারও বিলুপ্ত বা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। এখনও যে মনসা-চণ্ডী, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত সত্যপীর-কালুরায়-দক্ষিণরায়ের পাঁচালী নূতন করিয়া রচিত হয় না, তাহার কারণ আধুনিকতার ভাবপ্রবাহে মধ্যযুগীয় সংস্কার ভাসিয়া গিয়াছে—তাহাতে কিছু কিছু ক্ষতিও হইয়াছে। জাতির মধ্যযুগীয় জীবন ও মানস নির্ণয়ের অনেক উপাদানের বিনাশ দেশের ইতিহাসকে খণ্ডিত করিয়াছে। অবশ্য এখনও গ্রামাঞ্চলে প্রাচীনপন্থী সমাজে পুরাতন কাব্যধারা যৎকিঞ্চিৎ অনুশীলিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' সঙ্কলক পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ১৩০৩ সালে পুরাতন পুঁথির আদর্শে 'সত্যনারায়ণ লীলা' রচনা করিয়াছিলেন।[২]

---

১ বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'পুঁথি পরিচয়', ১ম খণ্ড, পৃ. ১০

২ দ্রষ্টব্য: পুঁথি পরিচয়, ১ম, পরিশিষ্ট, পৃ. ২০৯। এই কাব্যে হরিচরণ পুরাতন ধরনের ভণিতাও দিয়াছিলেন। যথা— শ্রীহরির পাদপদ্ম হৃৎপদ্মে ধরি।
সত্যনারায়ণ লীলা রচে দ্বিজ হরি॥

যাহা হউক এদেশে ইংরাজী শাসন, শিক্ষা, বিচারকার্য দৃঢ়মূল হইল, কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া আধুনিক নাগরিক সভ্যতার পত্তন হইল, জলা-বুজাইয়া, ঝোপজঙ্গল সাফ করিয়া ইংরাজ নির্মাণ করিল নবসভ্যতার পাদপীঠ কলিকাতা নগরী। প্রাসাদশীর্ষে বৈশ্যসভ্যতার মাণিক ধারণ করিয়া এই কলিতীর্থ নব অভিনয়ের জন্য রঙ্গসজ্জা প্রস্তুত করিতে লাগিল। অন্ধকার মুখ লুকাইল, বাতি জ্বলিয়া নৈশ কলিকাতার পথঘাট নিষ্প্রভ আলোকে ভরিয়া দিল—মুদ্রণের যুগ আরম্ভ হইল, সাধারণ মানুষের জ্ঞানান্ধকার ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ বাঙলাদেশে মুদ্রাযন্ত্রই নব-সংস্কৃতির দ্বার মোচন করিয়া দিল। ইংরাজ আগমনের ফলে মধ্যযুগীয় জীবন ও আদর্শ ভাঙিয়াছে বটে, তেমনি আবার অপর দিকে বৃহৎ জীবনের ঐশ্বর্যও নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া সমগ্র জাতিকেও লাভবান করিয়াছে। অবশ্য মুদ্রণযুগেও যে প্রচুর পুঁথি নকল হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তাহার কিছু পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাচীন পুঁথির অসংখ্য নকলের সঙ্গে কিছু কিছু মৌলিক কাব্যও রচিত হইয়াছিল। অবশ্য রামেশ্বর, ঘনরাম ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, কয়েকজন শাক্ত পদকার, বাউলকবি এবং পূর্ববঙ্গীয় পালা গায়কদের কিছু কিছু রচনা বাদ দিলে এই যুগে মৌলিকতা ও সাহিত্য-গুণান্বিত রচনা অতি অল্পই পাওয়া যায়। তবু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দুই চারিজন কবি পরিমিত ক্ষেত্রে যৎকিঞ্চিৎ প্রতিভাচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে সেরূপ কোন দৃষ্টান্ত পাঠক সমাজে উপস্থাপিত করা যায় না। রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই অন্ধকার গাঢ়তম; উনবিংশ শতাব্দীর অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্ধশতাব্দীই বন্ধ্যাতম। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সাহিত্য বিশেষভাবে এবং দ্বিতীয়ার্ধ সম্বন্ধে সাধারণভাবে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

১

ম ঙ্গ ল কা ব্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মঙ্গলকাব্যের গুণগত উৎকর্ষ যেরূপই হউক না কেন, সংখ্যার দিক দিয়াই এই শাখাটি যে নিতান্ত ক্ষীণকায় ছিল তাহা

মনে হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চণ্ডী, মনসা, ধর্ম, কালিকা, বাশুলী, শিব প্রভৃতি লৌকিক অর্ধপৌরাণিক ও পৌরাণিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন উপধর্ম সম্প্রদায় নিজ নিজ শ্রেণী ও কুলধর্ম রক্ষার্থ পূর্ববর্তী ধারাকেই অনুসরণ করিয়া বিলীয়মান মধ্যযুগের সংস্কার কথঞ্চিৎ রক্ষা করিয়াছিল, কেহ কেহ সমাজে প্রাধান্যও বজায় রাখিয়াছিলেন। অবশ্য তখন

জীবনের স্রোত জাহ্নবী সম
বহু দূরে গেছে সরিয়া;
এ শুধু উষর মরুভূধূসর
মরুরূপে আছে পড়িয়া।

তাই দুই একজন কবির কিঞ্চিৎ প্রতিভা ও কৃতিত্ব বাদ দিলে এই সমস্ত মঙ্গলকাব্য অনাবশ্যক ভার বৃদ্ধি করিয়াছে, ইহাতে পুঁথির তালিকা-লেখকের শ্রমবৃদ্ধি ব্যতীত আর কোন লাভ হয় নাই। এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গল-কাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে প্রয়োজন ও গুরুত্ব বিবেচনায় ঘনরাম ও ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

মনসামঙ্গল কাব্য ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতে, এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীতেও মনসামঙ্গলের একাধিক নূতন কাব্য পাওয়া গিয়াছে, যাহার কাব্যমূল্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু ইতিহাসের ক্রমরক্ষার জন্য এখানে তাহার উল্লেখ প্রয়োজন। জীবনকৃষ্ণ মৈত্র, রসিক মিত্র (দ্বিজ রসিক), রামজীবন বিদ্যা-ভূষণ, বাণেশ্বর রায়, দ্বিজ কালীপ্রসন্ন, দ্বিজ কবিচন্দ্র, রাধানাথ প্রভৃতি কয়েকজন কবি অষ্টাদশ শতাব্দীতে (রাধানাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি) মনসামঙ্গলের বহুপরিচিত পথে যাত্রা করিয়া বিগত শতাব্দীর জের টানিয়া চলিয়াছিলেন। চরিত্র, কাহিনী ও রচনারীতিতে ইঁহাদের মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্য কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্র ও সমাজজীবন যে ক্রমেই ভাঙনের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা এই দীনমূর্তি মনসামঙ্গল কাব্যগুলি হইতেই বুঝা যাইবে। মনে হইতেছে, দেবী মনসার অনুচরগুলি নির্বিষ ডুণ্ডুভে পরিণত হইয়াছে। এই কবিদের মধ্যে জীবনকৃষ্ণ মৈত্রের কাব্য কথঞ্চিৎ উল্লেখযোগ্য।

জীবনকৃষ্ণ মৈত্র ॥ কবি জীবন মৈত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে একখানি সুদীর্ঘ মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাব্য রচনা করিয়া এই ধারাটিকে উত্তরবঙ্গের জনসমাজে আধুনিক যুগের অব্যবহিত পূর্বে কিঞ্চিৎ জনপ্রিয় করিয়াছিলেন। অবশ্য এ বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব বহুস্থলে তাঁহার পূর্বসূরী জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

জীবনকৃষ্ণের পুরাকাব্যের দুই একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে তিনি তাঁহার কুলপরিচয় ও ব্যক্তিগত কথা, স্থানীয় জমিদারের নাম এবং প্রহেলিকার ভাষায় সন-তারিখের উল্লেখ করিয়াছেন—যাহা হইতে তাঁহার সময় এবং কাব্য-রচনার কাল নির্ণয়ে বিশেষ অসুবিধা হয় না। রংপুর সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত জীবন মৈত্রের একখানি পুরা পুঁথিতে[৩] তিনি এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন :

(১) মহারাজা রামকান্ত ভুবনে বিক্ষাত।
তাঁহার জামাতা বটে রাজা রঘুনাথ ॥
তাঁহার রাজ্যেতে থাকি ভিক্ষা করি খাই।
ভিক্ষুকের কর্ম্মদোষ নিন্দয় গোসাঞি ॥
শ্রীসংসিবদন মৈত্র জান মহাশয়।
চৌধুরী অনন্তরাম তাহার তনয় ॥
অনন্তনন্দন কবি শ্রীমৈত্রজীবন।
লাড়ি পাড়ায় বাস বারিন্দ্র ব্রাহ্মণ ॥

(২) সর্বাগ্রজ দুর্গারাম তস্যানুজ আত্মারাম
সর্ব্বেশ্বর প্রাণকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ।
শ্রীকবিভূষণ নাম বাস লাহিড়িপাড়া গ্রাম
জীবনমৈত্র চতুর্থের কনিষ্ঠ ॥[৪]

(৩) মহারাজ রামকান্ত ভুবন বিখ্যাত।
তাঁহার জামাতা বটে রাজা রঘুনাথ ॥
তাঁহার দম্পতী বটে তারা ঠাকুরাণী।
আপনি পৃথিবীশ্বর তাহার জননী ॥
সতী অতি পুণ্যবতী শ্রীরাণী ভবানী।
মহারাণীর নিজার্থে ভুবনে বাখানি ॥

---

৩ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৫, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৬৬

৪ সারদানাথ খাঁ সম্পাদিত জীবন মৈত্রের 'বিষহরী পদ্মাপুরাণ' হইতে উদ্ধৃত।

তাঁহার রাজ্যেতে বাস চাকলা ভাতুরিয়া।
পরগণে প্রতাপবাজু তরফ সাত সিমানিয়া॥

এই সমস্ত উদ্ধৃতি হইতে কবির ব্যক্তিগত জীবন ও কাল সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে অসুবিধা হয় না। বগুড়া জেলার অন্তর্গত করতোয়া নদীতীরে ভাতুরিয়া চাকলা, প্রতাপবাজু পরগণা এবং সাত সিমানিয়া তরফের অন্তর্ভুক্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-প্রধান লাহিড়ীপাড়া গ্রামে কবি জীবন মৈত্রের জন্ম হয়। নাটোরের রাণী ভবানীর পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের জমিদারিতে কায়ক্লেশে কবির জীবিকা নির্বাহ হইত। অথচ একদা তাঁহার পূর্বপুরুষগণ অভিজাত-বংশের সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পিতামহ দ্বিজবংশীবদনও সত্য-নারায়ণের পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। কবির পিতার নাম চৌধুরী অনন্তরাম—'চৌধুরী' বোধহয় নবাবদত্ত খেতাব। ইহাতেই প্রমাণ হয়, তাঁহাদের বংশ সম্পন্ন গৃহস্থরূপেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু পরে জীবন মৈত্রের সময়ে বোধহয় এই বংশের গৌরব তিরোহিত হয়, আর্থিক অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়ে। তাই তিনি কাব্যের প্রারম্ভে আত্মকথায় বলিয়াছেন, "ভিক্ষা করি খাই"। কবি নিজেও জীবিকার্জনে কিছু উদাসীন ছিলেন। এই জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে "পাগলা জীবন" বলিত।[৫] মাঝে মাঝে তিনি বোধ হয় সহধর্মিণীর দ্বারা তর্জিত হইতেন। কারণ আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন :

তত্ত্ব দিল পুরদারা সকল বুদ্ধি হৈল হারা
পুঁথি বান্ধি হাটে চলি যাই।

কবিকে লইয়া তাঁহারা পাঁচ ভাই—দুর্গারাম, আত্মারাম, সর্বেশ্বর প্রাণকৃষ্ণ এবং কবি জীবনকৃষ্ণ। কবি বোধহয় 'কবিভূষণ' উপাধিও পাইয়াছিলেন।

আত্মপরিচয়ে রাণী ভবানীর উল্লেখ হইতে মনে হয় কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জন্মগ্রহণ করেন। রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার লেখক[৬] অনুমান করিয়াছিলেন—এই কাব্য পলাশীর যুদ্ধের নয়-দশ বৎসর পূর্বে রচিত হয় (১৭৪৭-৪৮)। কাব্যের মধ্যে একাধিক স্থলে কবি প্রহেলিকার ভাষায় কাব্যরচনাকাল উল্লেখ করিয়াছেন :

---

৫ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৩০৬

৬ র-সা-প-প, ১৩১৫, ২য়

(১) মহীপৃষ্ঠে শশী দিয়া বাণবিন্দু সমর্পিয়া
বুঝহ সনের পরিমাণ।
(২) অম্বুজের পৃষ্ঠে রস ঋতু রিপু দান।
এই শকে শ্রীজীবন মৈত্র কবি গান॥
(৩) নিরনিধি সুতপৃষ্ঠে মহি আরোপিয়া।
বিরোচত সুতের সুত তাহাতে স্থান পায়া।
কোকনদ বন্ধুভার পৃষ্ঠে অধিষ্ঠান।
এই সনে শ্রীমৈত্র জীবন বচে গান॥

দ্বিতীয়-তৃতীয় উদ্ধৃতির অর্থ উদ্ধার দুরূহ হইলেও প্রথম উদ্ধৃতি হইতে ১১৫১ বাংলা সন বা ১৭৪৪ খ্রীঃ অঃ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আবির্ভূত কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

আকারে-প্রকারে মৈত্রের কাব্য বেশ স্থূলায়তন—যথারীতি স্বর্গ ও মর্ত্যের কাহিনী ইহাতে অনুসৃত হইয়াছে। কাহিনী গতানুগতিক হইলেও কোন কোন স্থলে ঈষৎ নূতনত্ব আছে। যেমন কবির কাব্যে বেহুলার পিতার নাম বাহো সদাগর, মাতা—মেনকা, ভ্রাতা—শঙ্খধর। কোন কোন স্থলে বেহুলাকে বেললি বলা হইয়াছে। তবে ইহা লিপিকার প্রমাদও হইতে পারে। কাহিনীটি সংস্কৃতপ্রধান ভাষায় স্বচ্ছন্দগতিতে রচিত হইয়াছে, ভাষার তৎসমপ্রধান ভঙ্গিমা বিশেষ উৎকট হয় নাই। চরিত্র নির্মাণে কবি এমন কোন বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। অবশ্য করুণরসের বর্ণনায় কবির রচনাশক্তি প্রশংসার যোগ্য। লখিন্দরের মৃত্যুতে মাতার বিলাপ স্বাভাবিক ও হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে:

হাথের প্রহারে শোনা কপাট ঘুচাএ।
বেকুল হইআ শোনা মেড় মর্দ্ধে জাএ॥
দুই হস্ত ধরিয়া পুত্রের লইআ কোলে।
বশন তিতিলো মাএর নঞানের জলে॥
পুত্রো মুখে মুখ থুইয়া কান্দে অভাগিনি।
হেলাএ হারাইলাম বাছা কথাত অভাগিনি॥
মরণ শময় বাছা না দেখিলাম তোমা।
কাহাকো দেখিআ রামি চিত্তে দিবো খেমা॥

ওটো বাছা লখিন্দর চৈতর্ণ করো গাও।
চান্দমুখ চাইআ কান্দে তোমার অভাগিনি মাও॥
না জানিঞা বিবা দিলাম তোমা বধিবারে।
এতো দিনে রভাগিনি জায় গঙ্গাতিরে॥
লোহার শরির রামার বজ্রের সমান।
তে কারণে ফাটিয়া না হইলো খান ২॥
বুকেত পাথর দিআ থাকিব কিবা নিআ।
রাত্রি দিনে ঝুরিবে মোর রভাগিনির হিআ॥
না রহিব ঘরে আমি চাপাবতি পুরি।
যুখে রার্জ্য করুক যখন চান্দো অধিকারি॥

(কলি. বিশ্ব. পুঁথি—৬১১১)

কবির রচনাভঙ্গীতে ঈষৎ সংস্কৃতপ্রাধান্য থাকিলেও ইহাকে বিশেষ কৃত্রিম বলিয়া মনে হয় না। ব্রাহ্মণকবি মাঝে মাঝে অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা করিলেও তাহা লালা জয়নারায়ণের 'হরিলীলা'র মতো উৎকট আকার ধারণ করে নাই।[৭] আরও দুই-এক স্থলে জীবন মৈত্র আন্তরিক রচনাভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন—যেমন স্বামী হারাইয়া বেহুলার বিলাপ। কেহ কেহ বলেন যে, কবির কাব্যের কোন কোন স্থলে আদিরসের উগ্রতা পরিলক্ষিত হয়, রুচিবিকারও সমর্থনযোগ্য নহে।[৮] কারণস্বরূপ আলোচকগণ মনে করেন, জীবন মৈত্র সংস্কৃত পুরাণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন বলিয়া নির্জলা কামচর্চায় আমোদ বোধ করিয়াছেন। এ অভিযোগ কিন্তু যুক্তিযুক্ত নহে। তাঁহার কাব্যে কিছু কিছু আদিরসের আপত্তিকর বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহার জন্য সংস্কৃত পুরাণ দায়ী নহে। জীবনকৃষ্ণ অনেক স্থলে উত্তরবঙ্গের আর এক মনসামঙ্গল-কবি জগজ্জীবন ঘোষালের রচনা বেমালুম আত্মসাৎ করিয়াছেন।[৯] জগজ্জীবন যেমন তন্ত্রবিভূতির কিছু কিছু অংশ পরিপাক করিয়াছিলেন, তেমনি পরবর্তী কবি জীবনকৃষ্ণও জগজ্জীবনের কাব্যের কিছু কিছু অংশ নিজ রচনায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার তথাকথিত অশ্লীলতা জগজ্জীবনের প্রভাব-প্রসূত। এ বিষয়ে জগজ্জীবন কোনও প্রকার সঙ্কোচ বোধ

---

৭ পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৮ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৩০৭

৯ ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল, পৃ. ১/০

করেন নাই, শ্লীলতা-অশ্লীলতাবোধ ত্যাগ করিয়া অশুচিবর্ণনায় মত্ত হইয়াছেন।[১০] জীবনকৃষ্ণের আদিরসের প্রতি অধিকতর আকর্ষণের একটা কারণ—জগজ্জীবনের প্রভাব। তিনি যে কী পরিমাণে জগজ্জীবনের রচনা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, নিম্নে উভয় কবির রচনাংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে :

জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল

(১) বালা বে'লে প্রাণপ্রিয়া   কোলে আসি বৈস সিয়া
ছাড় পাশা কিসের ধামালী।
দেখিঞা তুমার ঠান   মদনে হানিল বাণ
প্রাণ রাখ বানিয়ার বালী॥
কুন বিধি বিচক্ষণ   একান্ত করিঞা মন
তোর রূপ নিরমিল বসি।
আমি কত জন্ম ভরি   কঠোর তপস্যা করি
তোমা হেন পাইমু রূপসী॥
(২) ভাসাইঞা পুত্রখানি   অসার সংসার গুণি
শোকে সাধু কান্দে উচ্চ স্বরে।
বঞ্চিল দারুণ বিধি   সাগরে ভাসাল নিধি
কেমতে থাকিব একেশ্বরে॥
ধিক মোর ধনজন   প্রাণ ধরি অকারণ
অকারণ গৃহতে বসতি।
একে একে সাত জন   মৈল মোর পুত্রগণ
অন্তকালে আমার কি গতি॥[১১]

জীবনকৃষ্ণ মৈত্রের পদ্মাপুরাণ

(১) বালা বোলে প্রাণপ্রিয়া   কোলে রাসি বোশাসিআ
তেজো পাশা কিসের ধামালি।
দেখিয়া তোমার ঠাম   মদনে হানিল বাণ
প্রাণ রাখো শাহের ঝিআরি॥

১০ পূর্বে জগজ্জীবন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে।

১১ ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদিত—জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল

কৈল বিধি বিচক্ষণ একত্র করিয়া মোন
তোর রূপ নিরমাইল বিধি।
আমি কত জন্মো ধরি কঠুর তবিস্তা করি
তোমা পাইলাম রূপষতি॥
(২) ভাসে পুত্রবধুখানি রণার শংশার গুনি
শোকে সাধু কান্দে উচ্য স্বরে।
আমার বঞ্চিত বিধি সাগরে ভাসাইলাম নিধি
কি লইয়া বঞ্চিব নিজ ঘরে॥
ত্রেথা মোর ধনজন প্রাণ মোর রকরণ
রকারণ মোর গৃহেতে বসতি।
শপ্ত পুত্র কার মরে কার প্রাণে কতো ধরে
অন্তিমকালে মোর কার হএ গতি॥[১২]

এইরূপ আরও অনেক স্থলে বারেন্দ্র জীবন মৈত্র রাঢ়ী জগজ্জীবন ঘোষালের হস্তে নির্দ্বিধায় তাম্রকূট সেবন করিয়াছেন। এরূপ ব্যাপারে জগজ্জীবনও লিপ্ত ছিলেন—তন্ত্রবিভূতি তাঁহার উত্তমর্ণ। আবার তিনি জীবন মৈত্রকে অধমর্ণত্বের পাশে বন্ধন করিয়াছেন। সে যাহা হউক, অষ্টাদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গলের কয়েকজন কবির মধ্যে একমাত্র জীবন মৈত্র মুদ্রণসৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন—কাব্যটিও তুচ্ছ করিবার মতো নহে।

মনসামঙ্গলের কয়েকজন অপ্রধান কবি॥ অষ্টাদশ শতাব্দীতে একমাত্র জীবন মৈত্র ভিন্ন অন্য কোন মনসামঙ্গলের কবি কাব্য রচনায় বিশেষ কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাই এখানে শুধু তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়াই এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করা যাইতেছে!

বর্ধমান জেলার দ্বিজরসিক বা রসিক মিশ্রের মনসামঙ্গলের খানকয়েক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে তিনখানি পুঁথি (পুঁথি. সংখ্যা—১৯৭০, ২০৭১, ২৫১০) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় আছে। কবি কাব্যের প্রারম্ভে নিজ বংশপরিচয় দিয়াছেন, পিতা (প্রসাদ), পিতামহ (মহেশ), প্রপিতামহ (কালিদাস) প্রভৃতি পূর্বপুরুষদের নাম উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। কবি বোধ হয় 'শ্রীকবিবল্লভ' নামেও পরিচিত ছিলেন। কারণ ভণিতায় তিনি এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন :

১২ কলি. বিশ্ব. পুঁথি—৬১১৩

আখড়া শালেতে থানা।
শ্রীকবিবল্লভ বাণ্য॥

কবি দুই এক স্থলে নিজের কাব্যকে 'জগতীমঙ্গল'ও বলিয়াছেন। আরও দুই একজন কবি (যেমন দ্বিজ কবিচন্দ্র) এই শব্দটি মনসামঙ্গল বুঝাইতে ব্যবহার করিয়াছেন। দ্বিজ রসিকের এই কাব্য বিশেষ কোন কাব্যগুণযুক্ত নহে, কেবল বিষ-ঝাড়ানোর মন্ত্রটি মোটামুটি বৈচিত্র্যপূর্ণ।

চট্টগ্রামের রামজীবন বিদ্যাভূষণ অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একখানি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন।[১৩] কবি পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইলেও কবিত্বের অধিকারী ছিলেন না। তাঁহার ভণিতায় সূর্যমঙ্গল নামে আর একখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে। সীমাবদ্ধ অঞ্চলে তাঁহার মনসামঙ্গল 'বিদ্যাভূষণী' মনসামঙ্গল নামে পরিচিত হইলেও চট্টগ্রামের বাঁশখালি গ্রামের (কবির জন্মভূমি) বাহিরে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কেহ কেহ এই কাব্যের রচনারীতির প্রশংসা করিয়া থাকেন। তবে কাব্য হিসাবে ইহার এমন কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাণেশ্বর নামক এক কবি আর একখানি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহার মাত্র একখানি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কবি কাব্য রচনার কাল এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন:

মনসামঙ্গল ভাষে প্রথম বৈশাখ মাসে
শকাব্দ ষোল শ একচল্লিশে।
ভাবিয়া ভবানীহর ভণে দ্বিজ বাণেশ্বর
মনসার মঙ্গল প্রকাশে॥

অর্থাৎ ১৬৪১ শকাব্দে (১৭১৯ খ্রীঃ অঃ) এই কাব্য রচিত হয়। কবি

১৩ মনসামঙ্গলের রচনার নির্দেশ:

শর কর ঋতু বিধু শক নিয়োজিত।
মনসামঙ্গল রামজীবন রচিত॥

অর্থাৎ ১৬২৫ শকাব্দ বা ১৭০৩-৪ খ্রীঃ অব্দে এই কাব্য রচিত হয়। তাঁহার সূর্যমঙ্গলে এইভাবে রচনাকাল উল্লিখিত হইয়াছে:

ইন্দু রাম ধাতু বিধু শক নিয়োজিত।
শ্রীরামজিবণ ভণে আদিত্ত চরিৎ॥ (সা. প. প. ১৩১৩।১)

অর্থাৎ ১৬৩১ শকাব্দ বা ১৭০৯-১০ খ্রীঃ অব্দে 'আদিত্য চরিত' বা সূর্যমঙ্গল কাব্য রচিত হয়। সুতরাং কবিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্থাপন করা যায়।

সবিস্তারে নিজ বংশতালিকা দিয়াছেন বটে, কিন্তু ঠিক কোন্ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ নাই। তাঁহার নিবাস ছিল চম্পকপুরীতে, জন্ম হইয়াছিল রাইপুরে। এই দুই গ্রাম কোন্ অঞ্চলে অবস্থিত তাহা বুঝা যাইতেছে না। কবির ভাষা কলিকাতার নাগরিক ভাষার মতো বেশ মার্জিত—কাব্য হইতে শুধু এইটুকু সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে বেহুলার চরিত্র অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই উপস্থাপিত হইয়াছে। উচ্চ আদর্শবাদ অপেক্ষা মর্ত্যজীবনের স্পর্শ অধিকতর লক্ষণীয় বলিয়া এই কাব্যের কিঞ্চিৎ মূল্য আছে।[১৪]

সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং জগমোহন মিত্র ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। আধুনিক কালে ইংরাজী শিক্ষা সভ্যতা নাগরিক জীবনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিলেও গ্রামে গ্রামান্তরে সে তরঙ্গাভিঘাত পৌঁছাইতে বিলম্ব হইয়াছিল। তাই দেখা যাইতেছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে, এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীতেও কেহ কেহ পুরাতন যুগের রীতি অনুসরণ করিয়া মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু নূতন আদর্শ-ঐতিহ্যের বন্যাধারায় এই সমস্ত বিগত-গৌরব মঙ্গলকাব্য দিগন্তে ভাসিয়া গিয়াছে। ইহাদের প্রতি এখন আমাদের শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতূহল ভিন্ন আর কোন আকর্ষণ নাই।

চণ্ডী-দুর্গা-ভবানীমঙ্গল ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুরাতন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার অন্তর্গত কালকেতু ও ধনপতির উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্রকায় মধ্যমশ্রেণীর চণ্ডীমঙ্গল বা অভয়ামঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল। দুই একজন আবার মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে চণ্ডী ও অসুরবিজয় কাহিনীকে সংক্ষেপে রচনা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত রচনার কাব্যগৌরব নিতান্তই তুচ্ছ। সাহিত্যের ইতিহাস বিবর্তনে এগুলি শুধু পাদটীকা হিসাবে গণ্য হইবার যোগ্য। এইজন্য এখানে ইহাদের সামান্য পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

যে সমস্ত কবি পুরাতন চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু-ধনপতির উপাখ্যান অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মুক্তারাম সেন, কৃষ্ণজীবন, লালা

১৪ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৩১১—১২

জয়নারায়ণ, হরিশ্চন্দ্র বসু, মুকুন্দ মিশ্র, ভবানীশঙ্কর দাস, হরিরাম প্রভৃতি কয়েকজন কবির নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইঁহারা প্রায় সকলেই কবিকঙ্কণের রচনায় হাত পাকাইয়াছেন। কেহ কেহ নামধামে ঈষৎ নূতনত্ব অবলম্বন করিলেও কাহিনীগ্রন্থনে কবিকঙ্কণের পথ ছাড়িয়া ভিন্ন পথে যাইতে সাহস করেন নাই। মনসামঙ্গলের কবিরা বাঁধা ছকের অনুসরণ করিলেও কোন একজন কবির কাব্য অন্য কবিদের এতটা প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করে নাই। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাধর মুকুন্দরাম প্রতিভা ও কাব্যকলার গুণে সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর চণ্ডীমঙ্গলের যাবতীয় কবির উপর অখণ্ড প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এখানে এইরূপ কয়েকজন কবির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

মুক্তারাম সেন ॥ মুন্সী আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ ১৩২৪ সনে চট্টগ্রামের কবি মুক্তারাম সেনের 'সারদামঙ্গল' বা 'অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঁচালী' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশ করেন। পুঁথিটি বিশেষ প্রাচীন নহে, ১১৭৪ মঘী সন অর্থাৎ বাংলা ১২৭৮ সনের (১৮৭২ খ্রীঃ অঃ) অনুলিখন। মুক্তারাম গ্রন্থ মধ্যে বিস্তারিতভাবে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যাইতেছে, তিনি চট্টগ্রামের আনোয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার পূর্বপুরুষের আদি নিবাস যশোহরের কালিয়া গ্রাম। তাঁহার পূর্বজ কেহ চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শন করিতে আসিয়া এখানেই বসবাস করিয়াছিলেন। কুলধর্ম মতে তাঁহারা তান্ত্রিক বংশের সন্তান। তিনি নিজেও তান্ত্রিক সাধনাদি করিতেন। কবি তাঁহার পূর্বপুরুষ যাদব রায় হইতে অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। যাদব রায় ১৬১৮ খ্রীঃ অব্দে বর্তমান ছিলেন। প্রতি তিন পুরুষে এক শত বৎসরের হিসাব মতে কবি মুক্তরামকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাওয়া যাইতে পারে।[১৫] কবি এইভাবে 'সারদামঙ্গলে'র রচনাকাল নির্দেশ করিয়াছেন :

> গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি।
> মুক্তারাম সেনে ভণে ভাবিয়া ভবানী ॥

অর্থাৎ ১৬১৯ শক বা ১৭৪৭ খ্রীঃ অব্দে এই কাব্য রচিত হয়। এই কাব্যে মাঝে মাঝে হরিলাল নামক আরও একটি ভণিতা পাওয়া যায়। যেমন :

---

১৫ আবদুল করীম সাহেব অনুমান করিয়াছেন, ১৭০৮ খ্রীঃ অব্দে কবির জন্ম হয়। ইহা তাঁহার অনুমান মাত্র।

শ্যামা অঙ্গে শোভে কাণ্ড রকত মিশালে।
তছু পদধূলি মাগে যেন হরিলালে॥

মনে হয় এই হরিলাল কোন গায়েন বা লিপিকার হইবেন। সুকৌশলে ইনি মুক্তারামের কাব্যে নিজ নাম অনুপ্রবিষ্ট করাইয়াছেন।

'সারদামঙ্গলে'র কাহিনী মুকুন্দরামের অনুরূপ দুই খণ্ডে বিভক্ত হইলেও আকারে প্রকারে ব্রতকথার মতো অতি সংক্ষিপ্ত। কবির কাব্যে এমন কোন কাব্যবৈশিষ্ট্য নাই যাহার জন্য তিনি প্রশংসা দাবি করিতে পারেন। মুকুন্দরামের কাহিনীর দ্বারা তিনি প্রভাবিত হইলেও কবিত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।[১৬] কবি কাব্যের প্রারম্ভেই পরিচ্ছন্ন ভাষায় আদ্যাশক্তির বন্দনা করিয়াছেন:

তুমি আদ্যা নারায়ণী নারায়ণ পরায়ণী
তুয়া অংশে পঞ্চ অবতীর্ণ।
গৌরী জহ্নুসুতা সতী রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী
সৃষ্টি কর্ম্ম দেখিমাত্র ভিন্ন॥

কবি প্রথমে দেবীকর্তৃক মঙ্গলাসুর বধের বর্ণনা দিয়াছেন, তারপর কালকেতু ও ধনপতি সদাগরের আখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন। ঘটনা সন্নিবেশ অনেকটা দ্বিজমাধব (মাধব আচার্য) মঙ্গলচণ্ডীর অনুরূপ।[১৭] এমন কি কবি মাধবের আদর্শে অনেক বিষ্ণুপদ রচনা করিয়া কাব্যমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ধনপতির বাণিজ্যযাত্রার সময়ে মথুরায় কৃষ্ণযাত্রার অনুরূপ পদ ব্যবহার করিয়া কবি রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন:

মধুপুরী জাএ রাধার বন্ধু হে।
না জানি কপালে কিবা আছে॥
পাইয়া যুবতী নব মধু হে।
অলি হইয়া রহে কালা কাছে॥

শাক্তকাব্য লিখিলেও কবি অনেক স্থলে বৈষ্ণব ভক্তের আবেগ ব্যক্ত করিয়াছেন।

---

১৬ এ বিষয়ে সম্পাদক করীম সাহেবের মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত, "সারদামঙ্গল মাধবাচার্য ও কবিকঙ্কণের গ্রন্থের পরবর্তী কালের রচনা। উক্ত কবিদ্বয়ের গ্রন্থগুলি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের চক্ষে ইহার সৌন্দর্য প্রতিভাত হইবে কিনা সন্দেহ।"

১৭ লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'র ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

ভবানীশঙ্কর দাসের মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালিকা ॥ চট্টগ্রামের অধিবাসী রামচন্দ্র দত্ত এই কাব্যের পুঁথি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করিয়াছিলেন, ১৩২৩ সনে তাহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাও চণ্ডীমঙ্গলের অনুরূপ কালকেতু ও ধনপতি সদাগরের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কাব্যের প্রারম্ভে কবি ঈষৎ বিস্তারিত আকারেই আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কবির পূর্বপুরুষ বোধহয় পূর্বে রাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন ("মোর আদিপুরুষ জন্মিল রাঢ়া গ্রাম")। আত্রেয় গোত্রীয় নরদাসের কুলীন কায়স্থ বংশে কবির জন্ম হয়। যদুনন্দন কৃত কুলজী গ্রন্থে ('ঢাকুর') এই কুলীন বংশের বিস্তারিত পরিচয় আছে। কিন্তু তাঁহার পূর্বপুরুষগণ রাঢ়ী কৌলীন্য ত্যাগ করিয়া বারেন্দ্র সমাজভুক্ত হইয়াছিলেন। কেহ-বা 'বঙ্গে' অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে গিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতে থাকেন।[১৮] 'ঢাকুর' কুলজী গ্রন্থ হইতে কবিকে বারেন্দ্রসমাজের কুলীন নরদাসের বংশধর বলিয়া মনে হইতেছে। এই নরদাসের বংশধর কৃষ্ণ হৃদানন্দ চট্টগ্রামের দেবগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ইঁহার বংশধর মধুসূদন সেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া চক্রশালা গ্রামে (আধুনিক পটিয়াবাজারের অন্তর্গত) বসবাস করেন। ইঁহার পুত্র শ্রীমন্ত, শ্রীমন্তের পুত্র নয়ন রায়। কবি ভবানীশঙ্কর এই নয়ন রায়ের পুত্র। তিনি কোথাও 'শঙ্কর' ("শঙ্কর আহ্মার নাম তাহান নন্দন", "ভণে দাস শ্রীশঙ্কর"), কোথাও ভবানীশঙ্কর ("দীনহীন ভবানী শঙ্কর দাসে ভণে") ভণিতা দিয়াছেন তবে শেষোক্ত ভণিতাই অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। কবির বংশধারা এখনও বর্তমান আছে।

শুনা যায় "কবি নিজ বাটীর সম্মুখবর্তী দীঘির জলের উপর টঙ্গী প্রস্তুত করতঃ শুচি ও সংযতভাবে তাহাতে বসিয়া এই 'জাগরণ' রচনা করিয়াছিলেন।"[১৯] সম্পাদক রাজচন্দ্র দত্ত প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী নামক এক অশীতিপর বৃদ্ধের নিকট এই পুঁথি সংগ্রহ করেন। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর মতে পুঁথিখানি নাকি কবির স্বহস্তলিখিত। এই কাব্যের আর দ্বিতীয় কোন

---

১৮ 'ঢাকুর' গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে—

কেহবা বঙ্গেতে গেলা কেহবা বারেন্দ্রে রৈলা
তার কার্য নহিল প্রধান ॥

১৯ ঐ, ভূমিকা, পৃ. ২

নকল পাওয়া যায় নাই। স্থানীয় সমাজে এই কাব্য 'জাগরণ' বা 'শঙ্কর বিশ্বাসের জাগরণ' নামেই অধিক পরিচিত।[২০] কিন্তু কবি কাব্যের কোথাও এই শব্দ ব্যবহার করেন নাই, বরং সর্বত্র "ভবানীশঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে"—এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। এইজন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে যখন এই কাব্য প্রকাশিত হয় তখন পরিষৎ সম্পাদক ইহাকে 'জাগরণ' নামে অভিহিত না করিয়া 'মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা' নামে প্রকাশ করেন।[২১] পুঁথির শেষে কালজ্ঞাপক এইরূপ উল্লেখ আছে :

ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু শকাদিত্য সনে।
ভবানীশঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে॥

ইহা হইতে ১৭০১ শকাব্দ (১৭৭৯-৮০ খ্রীঃ অঃ) নির্ধারিত হইয়াছে (ধাতা অর্থাৎ বিধাতা = ১, বিন্দু = ০, সাগর = ৭, ইন্দু = ১)। কিন্তু বিধাতা যদি চতুর্মুখ ব্রহ্মার নির্দেশক হয়, তাহা হইলে ইহা হইবে ১৭০৪ শকাব্দ (১৭৮২ খ্রীঃ অঃ)। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ইংরাজ আমলেই এই কাব্য রচিত হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাব্যের পরিচ্ছন্ন তৎসম শব্দবহুল বাগ্‌-বিন্যাসও সেই কথা প্রমাণ করিতেছে।

পূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে, ভবানীশঙ্কর ইহাতে কালকেতু ও ধনপতি সদাগরের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম দিকে কবি সামান্য কথায় দেবী ভাগবতের কাহিনী বলিয়া লইয়াছেন। তার পর দক্ষের গৃহে সতীরূপে আদ্যাশক্তির জন্ম, সতীর দেহত্যাগ, পার্বতীরূপে হিমালয় গৃহে পুনর্জন্ম, হরপার্বতীর বিবাহ, গণেশ-কার্তিকের জন্ম, অসুরযুদ্ধে দিগ্‌বসনা কালিকার আবির্ভাব—পরে মর্ত্যে কলিঙ্গনগরে পূজা লইতে দেবীর আবির্ভাব এবং যথারীতি কালকেতু-ধনপতির আখ্যানের পর পালা শেষ হইয়াছে। যদিও

---

২০ ঐ, ভূমিকা, পৃ. ৩

২১ পরিষৎ সম্পাদক এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন, "পুঁথির মধ্যে কিন্তু ইহার নাম 'জাগরণ' বলিয়া কোন স্থলেই উল্লিখিত হয় নাই, পুঁথির শেষে এই গ্রন্থের নাম 'মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা' লেখা আছে। গ্রন্থমধ্যে যে সকল ভণিতা আছে, তাহাতেও ইহার যে পাঞ্চালিকা নাম ছিল তাহা বুঝা যায়; যথা—"ভবানীশঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে"। সুতরাং এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া গ্রন্থের নাম 'জাগরণ' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও ইহা যে গ্রন্থের কবি-প্রদত্ত নাম নহে, এই ধারণাই আমাদের বদ্ধমূল হওয়ায় ইহার নাম মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।" সম্পাদকের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

কবি আখ্যানকাব্য লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার রচনাভঙ্গিমা ও মনোভাব ভক্ত গীতিকবির অনুরূপ—বিশেষতঃ তাঁহার শাক্ত ভক্তের মনটি উক্ত কাব্যের কতিপয় 'ঘোষা', 'মালসী', ও লাচাড়ী ছন্দে চমৎকার ফুটিয়াছে। বলিতে কি প্রত্যেক বর্ণনার প্রারম্ভে কবি দীর্ঘ ছন্দে দেবী বন্দনা করিয়াছেন, কোথাও গান সংযোজনা করিয়াছেন, যাহার ফলে মূল কাহিনী কিঞ্চিৎ মন্থর হইয়া গিয়াছে। কখনও তিনি চণ্ডিকার কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন :

তারিণি ত্রাণ কর।
সংসারেতে আহ্মি বড় পাপী নর॥

কখনও মহাদেবের নিকট মিনতি জানাইয়াছেন ; "মোরে কৃপা কর শম্ভুনাথ", কখনও-বা 'দেহি এই বর, মৃত্যু হোক মোর কালী জপিয়া বদনে"—এইরূপ আবেদন জানাইয়াছেন। কোথাও কোথাও উদারমতি কবি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদও রচনা করিয়াছেন। কৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়া রাধার ব্যাকুলতা :

দূতী কি হবে উপাএ।
বাঁশী রবে রাধা বলি ডাকে শ্যামরাএ॥

কিংবা রাধার অভিমানোক্তি :

প্রাণনাথ আহ্মি জানি তব সর্ব্ব মর্ম্ম।
কেন তোরে বোলি হরি জগৎ-ঈশ্বর করি
কিছু নাহি বুঝ ধর্ম্মাধর্ম্ম॥

*   *   *   *

মোহন বাঁশীর স্বরে আর না ডাকিহ মোরে
আর না আসিহ মোর ঘরে।
আপনে বঞ্চহ যথা আহ্মিহ না জাবো তথা
ভণে দাস ভবানীশঙ্করে॥

কবি কোন কোন স্থলে সীতারামের উল্লেখ করিয়াছেন :

রাম নাম জপ একবার।
ভাবি দেখিলাম শাস্তে বর্ত্তমান বা কালান্তে
দুষ্কৃতির বন্ধু নাই আর॥

একস্থলে গৌরাঙ্গবন্দনায় কবি বলিয়াছেন :

দেখ রে গৌরাঙ্গ নাচে করে করতালি দিয়া।
খেনে খেনে ঢলি পড়ে রাম নাম বলিয়া॥

তবে "দুর্গানামাক্ষরদ্বয় বদ নিরবধি"—এই উক্তিই প্রতি পদে ও পয়ার-লাচাড়ীতে পাওয়া যায়। কবির দুই একস্থলের বর্ণনা বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে। বালক শ্রীমন্ত সমবয়সীদের মারিয়া ধরিয়া খেদাইয়া দিলে তাহারা খুল্লনার কাছে গিয়া অভিযোগ করিতেছে:

কান্দে শিশু মাএর গোচরে।
মহাদুষ্ট শ্রীয়মন্ত হঞা বড় বলবন্ত
প্রহারিছে আহ্মারা সভারে॥
বিস্তর কাকুতি করি আহ্মারা সভারা ধরি
প্রিয় বাক্যে লৈয়া যায় দূরে।
বসিএ একত্র হৈয়া নানা খেলা খেলাইয়া
শেষে প্রহার করে কলেবরে॥
ধাই যদি জাই ডরে দ্রুত গিয়া করে ধরে
বাটে পতন কবে আছাড়িয়া।
নাহি পারি তার সঙ্গে বেদনা পাইয়া অঙ্গে
গৃহে আসি কান্দিয়া কান্দিয়া॥

কবির রচনাভঙ্গিমা অষ্টাদশ শতকের শেষভাগের মতো একটু গুরুগম্ভীর, কিছু কৃত্রিম এবং সমাস সন্ধির ভারে পীড়িত। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার রচনাকে 'বিকট' বলিবার পক্ষেও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।[২২] রচনার কোন কোন স্থান বেশ প্রসাদগুণ বিশিষ্ট বলিয়াই বোধ হয়। 'ঘোষা'র অন্তর্ভুক্ত রাধার রূপ বর্ণনাবিষয়ক এই ছত্রগুলি নিতান্ত মন্দ নহে:

বোল হে বড়াই কে চলিছে যমুনাকূলে।
কাহার সুন্দরী নারী গোপীগণ সঙ্গে করি
চলিয়াছে মনকুতূহলে॥
বক্তে নিন্দিয়াছে ইন্দু কপালে সিন্দুরবিন্দু
কটি মাঝে পূর্ণ কুম্ভ সাজে।

---

২২ ডঃ সুকুমার সেন এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন, "বিষম সংস্কৃত পদের ব্যবহার এবং তদ্ভব পদের সঙ্গে তৎসম শব্দের সন্ধি ভবানীশঙ্করের রচনাকে বিকট করিয়াছে" (বা. সা. ইতি. ১ম, অপরার্ধ, পৃ, ৪২৬)। 'শুণ্ধবং মাধব সব কর অবধান', 'বন্দনাম্বিকারাজ্বি এতে লোটাই বিশেষ' প্রভৃতি ছত্রগুলি কিছু উৎকট হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ কিছু কিছু আতিশয্য বাদ দিলে ভবানীশঙ্করের রচনা বেশ মার্জিত বলিয়াই বোধ হইবে।

হেরিতে ওরূপ খানি হরি নিল মোর প্রাণী
জিজ্ঞাসা না কৈলুম মুই লাজে ॥

কালিকার রণবেশ বর্ণনাও বীররসের অনুকূল হইয়াছে :

চতুর্ভুজ ত্রিনয়নী করাল বদনখানি
প্রকাশিত দন্ত কৈলা রসনা বিস্তারিয়া।
বস্ত্রে হৈলা বিবর্জিত বেশ কৈলেন বিপরীত
চতুর্ভিতে নাবী সৈন্য মিলিল আসিয়া ॥

অবশ্য ভবানীশঙ্করের পূর্বেই ভারতচন্দ্র আসিয়া মার্জিত বাগবিন্যাসের যে রীতি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন তাহার প্রভাব যে সুদূর চট্টগ্রামে পৌঁছায় নাই তাহা বলা যায় না। তবে শব্দকুশলী ভারতচন্দ্র যেমন তৎসম ও তদ্ভব শব্দকে শিল্পকৌশলের দ্বারা মিলাইয়া দিয়া চমৎকার ধ্বনিঝঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, নিকৃষ্ট প্রতিভার কবি ভবানীশঙ্কর তাহাতে ততটা কৃতকার্য হন নাই।

কবি মুকুন্দের (দ্বিজ মুকুন্দ) বাসুলীমঙ্গল ॥ কিছুকাল পূর্বে 'বাসুলীমঙ্গল' শীর্ষক চণ্ডীমঙ্গল ধরনের একখানি নূতন কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে—রচয়িতার নাম মুকুন্দ বা দ্বিজ মুকুন্দ, কোথাও কোথাও 'কবিচন্দ্র মুকুন্দ' এইরূপ ভণিতাও পাওয়া যায়। চকদীঘির অধিবাসী অদ্বৈতনাথ সিংহ বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম হইতে 'বাসুলীমঙ্গলের' একখানি পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ করেন। এই কাব্যে কোথাও কোথাও দেবী বাসুলী বিশালাক্ষী ও বিশাল লোচনী নামেও অভিহিত হইয়াছেন।[২৩] কবিও এই কাব্যকে 'বিশাললোচনীর গীত' আখ্যা দিয়াছেন। কিছুকাল পূর্বে কাব্যটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শুভেন্দুসুন্দর সিংহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

২৩ রামেশ্বরও শিবায়নে পার্বতীকে বিশাললোচনী বলিয়াছেন :

বালকে বারণ করে বিশাললোচনী।
কৈর নাই কোন্দল কোপিবে শূলপাণি ॥

(যোগিলাল হালদার সম্পাদিত রামেশ্বর প্রণীত 'শিব সঙ্কীর্তন পালা', পৃ. ১০০)

একস্থানে কবি দেবীকে বাসুলীও বলিয়াছেন :

বসাইল বৃষধ্বজে বিচিত্র আসনে।
বাসুলি বাতাস করে বিচিত্র ব্যজনে ॥ (ঐ, পৃ. ১০২)

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে 'মুকুন্দ'-নামাশ্রিত অনেকগুলি কবির নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে স্বনামধন্য কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী সর্বজন-পরিচিত। দ্বিজ মুকুন্দ নামক আর এক কবি 'জগন্নাথ বিজয়' শীর্ষক এক কাব্যে (সাহিত্য পরিষদ পুঁথি—২৮৩) জগন্নাথ মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি দ্বিজ মুকুন্দ ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু 'বাসুলীমঙ্গলে'র কবিচন্দ্র উপাধিক দ্বিজ মুকুন্দ স্বতন্ত্র কবি। কাব্যমধ্যে কবি সংক্ষেপে নিজ পরিচয় দিয়াছেন :

বিপ্রকুলে জন্ম পিতামহ দেবরাজ।
পিতা বিকর্তন মিশ্র বিদিত সমাজ॥
শ্রীযুক্ত মুকুন্দ হীরাবতীর নন্দন।
পাঁচালী প্রবন্ধ করে ত্রিপুরাস্মরণ॥

অন্য বর্ণনা হইতেও বুঝা যায় যে, কবিচন্দ্র উপাধিক মুকুন্দমিশ্রের পিতামহের নাম দেবরাজ, পিতা ও মাতা যথাক্রমে বিকর্তন ও হীরাবতী, খুল্লতাতের নাম গদাধর। কবির তিনপুত্র—রমানাথ, চন্দ্রশেখর ও সনাতন।

প্রাপ্ত মাত্র একখানি পুঁথিতে নকলের তারিখ হইতেছে শকাব্দ ১৬৫৭ কার্তিক—"স্বাক্ষর মিদং শ্রীকিশোরদাস মিশ্রস্য মোকাম সাং আখড়িয়া পরগণে মঙ্গলঘাট আমল শ্রীযুক্ত মহারাজা কীর্তিচন্দ্র রায় মহাশয় সন ১১৪২ সাল তারিখ ৩০ কার্তিক।" কীর্তিচন্দ্রের রাজত্বকাল ১৭০২-১৭৪০ খ্রীঃ অ। সুতরাং পুঁথিটি দুইশত বৎসরের প্রাচীন। পুঁথিতে রচনাকালজ্ঞাপক একটি পয়ারও আছে :

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতে।
বাসুলী মঙ্গল গীত হইল সেই হইতে॥

ইহা হইতে ১৪২৯ শক বা ১৫০৭ খ্রীঃ অঃ পাওয়া যায়।[২৪] কবি কঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের মুদ্রিত সংস্করণে কাব্যরচনাকাল হিসাবে এইরূপ উল্লেখ আছে :

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বণিতা॥

---

২৪ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩৬০, ২য়) শ্রীত্রিদিবনাথ রায় 'বাসুলী মঙ্গল' প্রবন্ধে 'রথ' কে 'চরণ' ধরিয়া ২ স্থির করিয়াছেন। কিন্তু 'রথ' বোধহয় 'রস' হইবে। লিপিকার প্রমাদে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। তাহা হইলে এই তারিখ হইবে—'শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতে'—১৪৯৯ শক বা ১৫৭৭ খ্রীঃ অঃ। কিন্তু এই তারিখও গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ কবি এত প্রাচীন হইতে পারেন না।

মনে হয় দ্বিজমুকুন্দ এই শ্লোকের প্রভাবে নিজ কাব্যের রচনাকাল নির্দেশ করিয়াছিলেন। সম্পাদক সুবলচন্দ্র মনে করেন যে, বাসুলীমঙ্গল চণ্ডীমঙ্গলের পূর্ববর্তী রচনা। কিন্তু ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সেরূপ অনুমানের পক্ষপাতী নহেন। কারণ দ্বিজমুকুন্দ কবিকঙ্কণের পূর্ববর্তী হইলে চণ্ডীমঙ্গলের কবি নিশ্চয় নিজ কাব্যে পূর্বসূরীর উল্লেখ করিতেন। কারণ কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি মাণিকদত্তকে অভিবাদন করিয়া কাব্যরচনায় অগ্রসর হইয়াছেন, দ্বিজমুকুন্দ তাঁহার পূর্ববর্তী হইলে কবিকঙ্কণ তাঁহার নামও উল্লেখ করিতেন। উপরন্তু প্রাপ্ত কাব্যের ভাষা বড় জোর দুইশত বৎসরের পুরাতন হইতে পারে। পুঁথিটির নকলের তারিখ হইতে ১৭৩৫ খ্রীঃ অঃ পাওয়া যাইতেছে— কবিও বোধহয় এই সময়ের অধিক পূর্ববর্তী হইবেন না।

কাব্যের প্রথমে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তারপর বণিক ধূসদত্তের কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু কালকেতুর কাহিনী কবি বর্ণনা করেন নাই। আমাদের অনুমান, অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের এই কবি মুকুন্দরামের আদর্শে ধনপতির কাহিনীর অনুকরণে ধূসদত্তের কাহিনী ফাঁদিয়াছেন। ধূসদত্ত নামটিও কবিকঙ্কণের কাব্যে আছে। কবি কিছু নূতনত্বের আশায় মুকুন্দরাম প্রদত্ত নামগুলি শুধু বদলাইয়া লইয়াছেন। বণিক ধূসদত্তের দ্বিতীয়া স্ত্রী রুক্মিণী, প্রথমা স্ত্রী সত্যবতী। স্বামী বাণিজ্যে গেলে সত্যবতী সতীন রুক্মিণীর প্রতি নির্যাতন আরম্ভ করে। ধূসদত্তের 'মায়াদহের পুলিনে' দেবী দর্শন, বর্ধমানের অধীশ্বর সুরথের নিকট তাহার গল্প, রাজাকে সেই দৃশ্য দেখাইতে না পারায় কারাবাস ইত্যাদি ঘটনা অবিকল মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতির কাহিনীর অনুরূপ। শুধু ধনপতির স্থলে ধূসদত্ত, লহনার স্থলে সত্যবতী, খুল্লনার স্থলে রুক্মিণী, শ্রীমন্তের স্থলে গুণদত্ত এবং সিংহলের স্থলে বর্ধমান ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সামান্য নামধাম বাদ দিলে দ্বিজমুকুন্দ মুকুন্দরামের কাহিনীরই নকল করিয়াছেন। এমন কি বাঙাল মাঝিদের বিলাপের বর্ণনাও কবিচন্দ্র মুকুন্দ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের রচনা হইতে বেমালুম আত্মসাৎ করিয়াছেন। যথা—

কাঁদেরে বাঙ্গাল ভাই বাফই বাফই।
কুখেনে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই॥

* * * *

আর বাঙ্গাল বলে মুঞি হইনু অনাথ।
সর্ব্বধন গেল মোর হকুতার পাত ॥
হলদি হকুতা পাতা হিন্দল হিকই।
মজিল সকল মন কেমতে কুলাই ॥

এ বর্ণনা পুরাপুরি কবিকঙ্কণের নকল। কবি কৌশলী 'কুশীলক'; তাই পাত্র-পাত্রীর নামধাম বদলাইয়া পাঠকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই কাব্যের ভাষা আধুনিক ধরনের হইলেও কাব্যগুণ-বর্জিত। কাব্যটি জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই, জনপ্রিয় হইলে ইহার দ্বিতীয় পুঁথি মিলিত।

কয়েকজন অপ্রধান কবি ॥ অষ্টাদশ শতাব্দীর আরও কয়েকজন স্বল্প-প্রতিভাধর কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ও পৌরাণিক চণ্ডিকার কাহিনী অবলম্বনে দুই একখানি অকিঞ্চিৎকর চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। এখানে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। কৃষ্ণজীবন, লালা জয়নারায়ণ সেন, হরিরাম, অকিঞ্চন চক্রবর্তী প্রভৃতি কবিদের বিশেষ কোন প্রতিভা না থাকিলেও ইতিহাসের ক্রম রক্ষার জন্য এখানে শুধু তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে।

কবি কৃষ্ণজীবনের 'অভয়ামঙ্গল' অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া মনে হয়।[২৫] কোন কোন স্থলে কবি এই কাব্যকে 'অম্বিকামঙ্গলও' বলিয়াছেন। নাটোরের ভূস্বামী প্রসিদ্ধ কালীভক্ত রাজা রামকৃষ্ণের সভায় অবস্থান করিয়া কবি কালকেতু ও ধনপতির কাহিনী রচনা করেন। বিষয়বস্তু মুকুন্দরামের অনুরূপ—কিন্তু ভাষা বা অন্যান্য ব্যাপারে মুকুন্দরামের বিশেষ কোন প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয় না। আধুনিক কালের কবি বলিয়া তাঁহার ভাষা মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন। তাঁহার অর্ধনারীশ্বরের বর্ণনাটি প্রশংসার যোগ্য:

অর্দ্ধেক বাহন সিংহ অর্দ্ধেক বৃষভ।
দক্ষিণ করেতে সিঙ্গা সঙ্খ বাম করে ॥
ধুতুরা কুসুম কর্ণে কনক কুণ্ডল।
পরিধান পট্টবাস আর বাঘাম্বর ॥

---

২৫ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৪, ১ম (কালীকান্ত বিশ্বাস—প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণ)

অর্দ্ধেক বনমালা অর্দ্ধেক বিষাম্বর।
দক্ষিণ লোচনে তারা বামে ইন্দুবর॥

লালা জয়নারায়ণ সেন বিক্রমপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার অগ্রজ রামগতি ও অনুজ রাজনারায়ণও কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। জয়নারায়ণ এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন:

গৌড়রাজ্য পূর্বভাগে বিক্রমপুরেতে।
রচিলাম এই গ্রন্থ ধর্মপ্রসঙ্গেতে॥

১৬৯৪ শকে (১৭৭২ খ্রীঃ অঃ) কবির 'হরিলীলা' রচিত হয়, তাহার কিছু পরে তিনি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইহাতে তিনি মুকুন্দরামের কাহিনী অনুসরণ করিয়াছেন, কেবল মাধব ও সুলোচনার গল্পটি নূতন সংযোজিত।[২৬] অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর এই কাব্য রচিত হয় বলিয়া ইহার ভাষা বেশ মার্জিত ও তির্যক। যথা—মদনকর্তৃক মহাদেবকে কামশরে বিদ্ধ করিবার প্রয়াস:

একবার নাহি পারে পুনশ্চ সন্ধান করে
স্মর নিজ শরে চুম্ব দিয়া।
ছোঁয়ায়ে রতির বুকে ধনুকে পুনশ্চ তাকে
ছুড়িলেক সাবধান হৈয়া॥
নিরখে শঙ্কর পানে করিয়া অবলোকনে
দেখে যেন রজত অচল।
তেজ শত সূর্যপ্রায় শতচন্দ্র সম তায়
রত্নবেদি পরে ঝলমল॥

অবশ্য কবির চণ্ডীমঙ্গল অপেক্ষা 'হরিলীলা' অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।[২৭]

দ্বিজ গঙ্গানারায়ণের[২৮] 'ভবানীমঙ্গল' অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রচিত হইয়াছিল। পাকুড়রাজ পৃথ্বীচন্দ্র রচিত 'গৌরীমঙ্গলে' (১৮০৬-৭) এই কবির[২৯] উল্লেখ আছে।[৩০] সুতরাং কবির কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর

২৬ সা-প-প, ১৩০৭, ৩য় সংখ্যা (আনন্দনাথ রায়—কবি লালা জয়নারায়ণ)
২৭ পরে সত্যনারায়ণ সম্পর্কে কবির এই কাব্যপরিচয় দ্রষ্টব্য।
২৮ প্রবাসী, ১৩১৭, কার্তিক (শিবরতন মিত্র—গঙ্গানারায়ণের ভবানীমঙ্গল)
২৯ সা-প-প, ১৩০৩ (রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)
৩০ গঙ্গানারায়ণ রচে ভবানী মঙ্গল।
কিরীটী মঙ্গল আদি হইল সকল॥ ('গৌরী মঙ্গল')

মাঝামাঝি বা শেষভাগে রচিত হওয়াই সম্ভব। কবির পূর্বপুরুষগণের বাস ছিল বর্ধমান জেলার মোটরী গ্রামে। কবির পিতা তিতুরায় সেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয় বীরভূমের হস্তিকান্দায় বসবাস করেন। তাঁহার দুই পুত্র, গঙ্গানারায়ণ ও রামদুলাল। গঙ্গানারায়ণ ধর্মমতে শাক্ত ছিলেন। এখনও সেই গ্রামে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণা মূর্তি পূজা হয়। কবি সংস্কৃত ভাষায়ও যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাঁহা তাঁহার তৎসম শব্দবহুল প্রগাঢ় রচনা হইতে বুঝা যায়। ইহাতে শিবদুর্গার পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ভাষা অতিশয় মার্জিত, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মতো ততটা সরস নহে। যথা :

অভিলাষ করে দাস শুন মা শঙ্করী।
রচিব তোমার লীলা মনে বাঞ্ছা করি॥
পুরাণসম্মত কথা রচিব ভাষাতে।
অষ্ট দিবসের গান ছন্দ নানা মতে॥

ইহাতে চণ্ডীমঙ্গলের ধারা অনুসৃত হয় নাই, পুরাণের গল্পের সঙ্গে গৌরীর পিত্রালয়ে বাস ও পরে স্বামীসহ কৈলাসে বসবাস ইত্যাদি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কবি দুর্গামঙ্গল জাতীয় কাব্য লিখিলেও ইহাতে বহুস্থলে বৈষ্ণব মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের মতো তাঁহার ধর্মমত বেশ উদার, অবশ্য তাঁহার রচনার কোথাও আদিরসের তপ্ত স্পর্শ নাই। কিন্তু রচনার উৎকর্ষে তিনি যে উচ্চ স্থানের অধিকারী নহেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অকিঞ্চন চক্রবর্তী নামক আর এক কবি মুকুন্দরামের ধারা অনুসরণ করিয়া যে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, সম্প্রতি ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁহার পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন।[৩১] ষোল পালায় বিভক্ত এই দীর্ঘ কাব্যে যথারীতি কালকেতু ও ধনপতির কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহার উপাধি ছিল কবীন্দ্র। কারণ ভণিতার একাধিক স্থলে কবি 'কবীন্দ্র চক্রবর্তী', 'কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ'—এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। তিনি বর্ধমানের রাজা তেজশ্চন্দ্রের (১৭৭০-১৮৩২) সময়ে ঐ অঞ্চলে বাস করিতেন, কাব্যে তাহার

৩১ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৪৫৮

উল্লেখ করিয়াছেন।[৩২] ইহা হইতে মনে হয়, কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যটি পুরাপুরি কবিকঙ্কণের অনুকরণে রচিত হইয়াছে। দুই এক স্থলে কবি ঈষৎ মৌলিকতা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার গুণগত উৎকর্ষ এমন কিছু প্রশংসনীয় ব্যাপার নহে। ভাষার মধ্যে চেষ্টাকৃত অলঙ্কার প্রয়োগ কৌশল সহজেই লক্ষ্য করা যাইবে :

পুলোমজা পুরন্দরে প্রবোধিয়া দুর্গা।
অবিলম্বে জননী আইলা অপবর্গা॥
বিশ্বমাতা বীরবরে বলেন মধুর।
কান্তা সহ কালকেতু চল স্বর্গপুর॥
বিমানে বসিলা বীর বনিতা লইয়া।
যায় যমালয়ে পথে জয় জয় দিয়া॥

এখানে কৃত্রিম অনুপ্রাস মন্দ জমে নাই। কিন্তু কাব্যরসের দিক দিয়া কবি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই।

দেবীভাগবত অবলম্বনে দ্বিজ শিবচরণের 'গৌরীমঙ্গল', হরিশ্চন্দ্র বসুর 'চণ্ডীবিজয়'[৩৩], জগন্নাথের 'দুর্গাপুরাণ', পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্রের 'গৌরী-মঙ্গল' ইত্যাদি কাব্যে প্রতিভার বিশেষ কোন চিহ্ন নাই। সুতরাং এখানে পুঁথির তালিকা বাড়াইবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। অনেকগুলি ছোট ছোট পুঁথিতে ব্রতকথার ঢঙে খুল্লনা-ধনপতির কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে —যেমন দ্বিজ রঘুনাথের 'মঙ্গলচণ্ডী'র পাঁচালী', মদনদত্তের 'মঙ্গলচণ্ডীর কথা', দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্রের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'। এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর রচনা সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচনার যোগ্য নহে। এখানে শুধু ইহাদের উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

---

৩২ ভূপতি তিলকচন্দ্র বর্ধমানে যে ইন্দ্র
তেজশ্চন্দ্র তাঁহার নন্দন।
নিবাস তাঁহার দেশে চণ্ডিকামঙ্গল ভাষে
কবীন্দ্র ব্রাহ্মণে অকিঞ্চন॥

৩৩ এই কাব্য সমাপ্ত হয় "পঞ্চভূৎ রীতুচন্দ্র শকের বিশেষ"—অর্থাৎ ১৬৫৫ শক বা ১৭৩৩ খ্রীঃ অব্দে। ইহাতে দেবী ভাগবতের অতিরিক্ত অনেক বিষয় আছে। দ্রষ্টব্য—বং. সা. প. প. ১৩১৫, ২য় সংখ্যা

শিবায়ন কাব্য ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিবায়ন কাব্যের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্পতম। তন্মধ্যে রামেশ্বর চক্রবর্তীর (ভট্টাচার্য) 'শিব সঙ্কীর্তন' নানা কারণে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর রামকৃষ্ণের শিবায়ন কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট—যদিও রামেশ্বরের মতো রামকৃষ্ণ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারেন নাই। বাঙলার লোকজীবনে বৃষভধ্বজ শিবপ্রমথেশ অপেক্ষা গঞ্জিকাধুস্তুরসেবী, পরস্ত্রীলোলুপ কৃষক-শিব অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন—যাঁহাকে কেহ কেহ অস্ট্রিক-সংস্কৃতিজাত কৃষিদেবতার প্রতীক বলিয়া মনে করেন। পরে আর্য ও আর্যেতর সংস্কৃতির সমন্বয়ের সময় পৌরাণিক মহেশ্বর ও কুচনীরূপমুগ্ধ বৃদ্ধ শিব এক হইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য, পৌরাণিক ও লৌকিক, ভারতীয় ও বাঙালী শিবের সমন্বয়ী রূপের পরিচয় পাইতে হইলে বাঙলার স্বল্পসংখ্যক শিবায়ন কাব্যেই তাহার পূর্ণ চিত্র পাওয়া যাইবে। অবশ্য মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য শাখার মতো এই শাখাটি ততটা প্রাধান্য অর্জন করিতে পারে নাই। অথচ অদ্যাপি লোকজীবনে, নানা ব্রতকৃত্যে, শিবের গাজনে এই আর্যেতর শিবের বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যগুলির সঙ্গে শিবায়ন কাব্যের কতকগুলি মৌলিক প্রভেদ আছে। মঙ্গলকাব্যে দেবখণ্ড ও নরখণ্ড —দুইটি বিভাগ থাকে; কিন্তু শিবায়নে কৈলাসবাসী শিবের ঘরগৃহস্থালী বর্ণিত হইয়াছে—কোন ভক্ত কর্তৃক তাঁহার পূজা প্রচারের বিশেষ কোন কাহিনী নাই। বরং 'মৃগলুব্ধ' ধরনের ব্রতকথাজাতীয় আখ্যানে মঙ্গল-কাব্যের দেবদেবীর মতো শিবের পূজা প্রচারের কথা আছে। উপরন্তু চণ্ডী ও মনসামঙ্গলের গোড়ার দিকে দেবখণ্ডে শিবের লৌকিক কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। সেইজন্য বাঙলার শিবসাহিত্য প্রবলভাবে বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করিতে পারে নাই—ইহার সাহিত্যিক উৎকর্ষও এমন কিছু বিস্ময়কর নহে। যাহা হউক এখানে রামেশ্বর এবং আরও কয়েকজন শিবকাব্যের কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী) ॥ শিবায়ন শাখার সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য ভারতচন্দ্রের অর্ধশতাব্দী পূর্বে এবং কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের দেড়শত বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং উক্ত দুইজন

প্রথম শ্রেণীর কবির ছায়ায় পড়িয়া প্রতিভা সত্ত্বেও যথোচিত গৌরব লাভ করিতে পারেন নাই। পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, বাস্তবতা, দৈনন্দিন জীবন-চিত্রাঙ্কন, হাস্যপরিহাস, কাব্যকলার সচেতন অনুশীলন, ভূয়োদর্শন—ইত্যাদি বিষয় বিচার করিলে তাঁহাকে প্রায় মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ কবি বলিতে হইবে। অবশ্য একথা ঠিক যে, "ভবভাব্য ভদ্রকাব্য"[৩৪] প্রণেতা রামেশ্বর মুকুন্দরামের মতো প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। বিশেষতঃ সুবিস্তৃত পটভূমিকায় জীবনসৃষ্টির দুর্লভ শক্তি তাঁহার ততটা ছিল না। রচনাবৈদগ্ধ্যেও তিনি ভারতচন্দ্র অপেক্ষা নিম্নাসনের অধিকারী। তবু তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীর মূল প্রেরণা তাঁহার 'শিবসঙ্কীর্তনে' প্রকৃষ্টরূপেই পাওয়া যাইবে। দেবতাকে মানবীকরণ, ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের প্রভাবে দৈনন্দিন দুর্ভর জীবনের বাস্তব চিত্র, রঙ্গরস ও আদিরসের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁহার রচনায় বিশেষভাবে ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা কোন দিক দিয়াই মধ্যম শ্রেণী অতিক্রম করিতে পারে নাই বলিয়া তিনি মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রের ন্যায় দেশব্যাপী যশ লাভ করিতে পারেন নাই।

প্রথমে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে দুইচারি কথা আলোচনা করা যাইতেছে। এ বিষয়ে শিবসঙ্কীর্তনের সম্পাদকগণ কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, কবি নিজেও কিছু কিছু তথ্য দিয়াছেন। তিনি যে জমিদার বংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশকাহিনী ও সমসাময়িক ইতিহাস হইতেও কবি সম্বন্ধে অল্পবিস্তর তথ্য পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে (বাংলা ১২৯৩ সন) রামেশ্বরের শিবায়নের 'বঙ্গবাসী' সংস্করণের সম্পাদক ঈশানচন্দ্র বসু, আধুনিক সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগিলাল হালদার (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, শিবসঙ্কীর্তন বা শিবায়ন, ১৯৫৭) এবং ডঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্তী (সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত সংস্করণ) তাঁহাদের

---

৩৪ চন্দ্রচূড় চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর॥

কবি তাঁহার কাব্যের বহুস্থলে এইরূপ ভণিতা দিয়াছেন। রামেশ্বর বোধহয় গ্রাম্য অশ্লীল শিব কাহিনীকে মার্জিত ও পরিশুদ্ধ করিয়া ভদ্রকাব্য রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন।

সম্পাদকীয় ভূমিকায় রামেশ্বর সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য দিয়াছেন, তাহা হইতে কবিজীবনী সম্বন্ধে মোটামুটি সমস্ত কথাই জানা যায়। তন্মধ্যে ডঃ চক্রবর্তী সংগৃহীত তথ্য-উপাদানই অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

রামেশ্বর কাব্যমধ্যে নিজ গ্রামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, "সাকিম বরদাবাটী যদুপুর গ্রাম"। মেদিনীপুর জেলার ঘাঁটালের অন্তর্গত বরদা পরগণার অন্তর্ভুক্ত যদুপুর গ্রামে কবির জন্ম হয়। এই গ্রাম এখনও আছে, কবির বাস্তুভিটার আলোকচিত্রও ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তীর সম্পাদিত সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত গ্রামের অধিবাসীরা সম্প্রতি কবির স্মৃতিরক্ষাকল্পে নানা চেষ্টা করিতেছেন। ঐ গ্রামে এক বটবৃক্ষতলে প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমায় এখনও অষ্টপ্রহরব্যাপী হরিসঙ্কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। কারণ গ্রামবাসীরা মনে করেন, কবি নাকি এই তিথিতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। কবির ভিটার অদূরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শম্ভুরামের বংশধারা এখনও বর্তমান আছে। কিন্তু রামেশ্বরের কোন বংশধর নাই, সম্ভবতঃ তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। কবির পিতামহ গোবিন্দ চক্রবর্তী বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। আসলে তাঁহারা শাণ্ডিল্য গোত্রোদ্ভূত বন্দ্যোপাধ্যায়-উপাধিক ব্রাহ্মণ। কিন্তু কবির প্রপিতামহ হইতে তাঁহারা 'চক্রবর্তী' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা লক্ষ্মণ পাণ্ডিত্য ও যজন-যাজন ক্রিয়ার জন্য ভট্টাচার্য পদবী গ্রহণ করেন। কবির মাতার নাম রূপবতী। কবির দুই পত্নী—সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী। তাঁহার জীবনের প্রথম দিকের ঘটনা কবি লিপিবদ্ধ করেন নাই। কিন্তু ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তীর নিকট এই সম্পর্কে কিছু কিছু নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।[৩৫] রাধারমণবাবুর নিকট রক্ষিত একখানি পুরাতন রোজনামচা হইতে ডঃ চক্রবর্তী অনুমান করেন যে, কবি রামেশ্বর ১৬৭৭ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পরে কবি নিজ গ্রাম যদুপুর ত্যাগ করিয়া কর্ণগড়ের জমিদারদের সভায় পুরাণপাঠক রূপে বাস করিয়াছিলেন। কেন তিনি নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া কর্ণগড়ে বসবাস করেন, কবি নিজেই তাহা জানাইয়াছেন :

---

৩৫ ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত ও সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'রামেশ্বর রচনাবলী', পৃ. ৫৬

পূর্ব্বে বাস বছপুরে　　হেমৎ সিংহ ভাঙ্গে যারে
রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিয়া কৌশিকীতটে　　বসিয়া পুরাণ পাঠে
রচাইল মধুর সঙ্গীত॥

রামেশ্বর শিবায়নের নানা স্থানে রাজা রামসিংহ ও তাঁহার পুত্র যশোমন্ত সিংহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন :

রাজা রামসিংহ স্থত　　যশোমন্ত নরনাথ
তস্য পোষ্য দ্বিজ রামেশ্বর।

এই উল্লেখ হইতে মনে হয় হেমৎ সিংহ নামক কোন জমিদার বা সামন্ত কবির ঘরদুয়ার ভাঙিয়া দিলে তাঁহাকে রামসিংহ আশ্রয় দিয়াছিলেন। হেমৎ সিংহ ও রামসিংহের নাম মেদিনীপুরের ইতিহাসে নিতান্ত অপরিচিত নহে। স্থানীয় গ্রামে এই বিষয়ে নানা উপকথা প্রচলিত আছে। এখনও গ্রামবৃদ্ধগণ সেই কাহিনী আলোচনা করিয়া থাকেন। ডঃ চক্রবর্তী তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করিয়া সেই সমস্ত কিংবদন্তী সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার গল্পের অংশ বাদ দিলে মোটামুটি ঘটনাটা দাঁড়ায় এইরূপ : মুঘল আমলে বর্ধমান-মেদিনীপুর-হুগলী অঞ্চল শোভাসিংহ নামক এক দুর্দান্ত জমিদারের হস্তগত হয়। এই জমিদার বর্ধমান অধিকার করিয়া বর্ধমানের অনূঢ়া রাজ-কুমারীর উপর অনুচিত বল প্রয়োগ করিতে গিয়া নিহত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমন্ত (হেমৎ, হিম্মৎ) সিংহ ভ্রাতার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হন। ইঁহার সঙ্গে কবির কোন কারণে মনোমালিন্য হইলে উদ্ধত জমিদার কবিকে ভিটাচ্যুত করিয়া স্বগ্রাম হইতে বিতাড়িত করেন। অত্যাচারিত কবি তখন (সম্ভবতঃ ১৬৯৭-৯৮ খ্রীঃ অঃ) মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের সামন্ত রামসিংহের আশ্রয়ে গিয়া তাঁহার সভায় পুরাণপাঠকের পদ লাভ করেন। রামসিংহ কবিপ্রতিভার পুরস্কার স্বরূপ[৩৬] রামেশ্বরকে নিকটবর্তী অযোধ্যানগর গ্রামে বসতবাটী নির্মাণ

৩৬ কেহ কেহ মনে করেন রামেশ্বরের উপাধি ছিল 'কবিকেশরী' (দ্রষ্টব্য : ডঃ চক্রবর্তীর সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, পৃ. ৫ ও ৩৩০)। কবির সভাপীরের একখানি পুঁথিতে এইরূপ উক্তি আছে :

উদ্দেশে অষ্টাঙ্গে দ্বিজ করিল প্রণাম।
কহে কবিকেশরী কেশরকোণি রাম॥

অবশ্য কবি যদি 'কবিকেশরী' উপাধি লাভ করিতেন, তাহা হইলে ভারতচন্দ্রের 'রায়-গুণাকর' উপাধির মতো কাব্যের নানা স্থলে তাহা ব্যবহার করিতেন। ইহা কবির সাধারণ বিশেষণ বলিয়াই মনে হইতেছে।

করাইয়া দিয়াছিলেন। কর্ণগড়ে আশ্রয় পাইয়া কবি নিশ্চিন্ত হইয়া কাব্য-রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং অবকাশ মতো কিছু কিছু তীর্থদর্শন করেন। কবি এক সাধক ব্রাহ্মণ চন্দ্রচূড় চক্রবর্তীর নিকট তন্ত্রমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। রামসিংহের পুত্র যুবরাজ যশোমন্ত সিংহের সঙ্গে কবির আন্তরিক প্রীতি ছিল। ১৭১১-১২ খ্রীঃ অব্দে রামসিংহের মৃত্যুর পর পুত্র যশোমন্ত সিংহ জমিদারী পাইয়া সুহৃৎ-কবি রামেশ্বরকে নিজের সভাকবির পদ দিয়াছিলেন। এই জন্য কাব্যের নানা স্থলে কবি রামসিংহ ও যশোমন্ত সিংহের স্তুতিবাদ করিয়াছেন। মনে হয় কবি যশোমন্ত সিংহের সময় অর্থাৎ ১৭১১-১২ খ্রীঃ অব্দের পরে 'শিবসঙ্কীর্তন' সমাপ্ত করেন। স্থানীয় অভিজাত বংশের সঙ্গে কবির বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। কর্ণগড় রাজ্যের সেনাপতি পরমানন্দ কবির বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা দুই জনেই বোধ হয় শাক্ত সাধনার পক্ষপাতী ছিলেন। কবির গুরুবংশের যে রোজনামচা রক্ষিত হইয়াছে, তদনুসারে ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী ১৭৪৪ খ্রীঃ অব্দকেই কবির তিরোধান কাল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[৩৭] এখনও কর্ণগড়ের মন্দিরপ্রাঙ্গণে কবি-সমাধির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

কবির সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের মতো রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত কারণে কবিকে নিগ্রহভোগ করিতে হইয়াছিল, যদিও সে নিগ্রহ মুকুন্দরামের মতো কাব্যরসে পরিণত হইতে পারে নাই। বিদ্যাপতির মতো তিনি রাজবংশের আনুকূল্য লাভ করিলেও নাগরিক মনোভাব অর্জন করিতে পারেন নাই, ভারতচন্দ্রের মতো রাজসমীপে বাস করিয়াও সভাজীবী সাহিত্যের তীক্ষ্ণতা, বৈদগ্ধ্য, ও উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক, সাধারণতঃ দুইখানি কাব্যের রচনাকার হিসাবে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে—(১) শিবসঙ্কীর্তন বা শিবায়ন এবং (২) সত্যপীরের ব্রতকথা। দুইখানি কাব্যই প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী বহু সন্ধান করিয়া রামেশ্বর ভণিতাযুক্ত আরও কিছু কিছু রচনার সন্ধান পাইয়াছেন : (৩) শীতলামঙ্গল (মগপূজা পালা) এবং (৪) সত্যনারায়ণের ব্রতকথা (আখোটী পালা)। কিন্তু শিবসঙ্কীর্তন ও সত্যপীরের ব্রতকথাই অধিকতর প্রামাণিক বলিয়া আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে

৩৭ ঐ, ভূমিকা, পৃ. ৬৩

শুধু এই দুইখানি কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইব। প্রথমে সত্যপীরের ব্রত-কথার বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে। মনে হয়, স্বগ্রামে বাস করিবার সময় কবি সত্যনারায়ণের (সত্যপীর) ব্রতকথা রচনা করেন। তার পর রামসিংহ-যশোমন্তসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় শিবায়ন গান রচনা করেন।

রামেশ্বরের সত্যপীরের ব্রতকথা একদা কিছু জনপ্রিয় হইয়াছিল। কারণ বটতলা হইতে ইহার একাধিক মুদ্রণ হইয়াছিল। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে'ও ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল (১৮৭৫)। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদনায় 'সত্যপীরের কথা' (১৯২৯) প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত 'রামেশ্বর রচনা-বলী'তে উহা পুনরায় গৃহীত হইয়াছে। ডঃ চক্রবর্তী তিনখানি পুরা পুঁথি (একখানি ১২২৮, আর একখানি ১২৫৯ সালের নকল, অপর পুঁথি সনতারিখ বর্জিত) এবং একখানি খণ্ডিত পুঁথি (সনতারিখ নাই) অবলম্বনে সত্যপীর-কাহিনী সম্পাদনা করিয়াছেন। অবশ্য তিনি মুদ্রিত গ্রন্থেরও সাহায্য লইয়াছেন। তন্মধ্যে ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত ঈশানচন্দ্র বসু প্রকাশিত 'সত্যনারায়ণ ব্রতকথা'[৩৮], ১৩৩০ সালে বটতলা হইতে মাণিকচন্দ্র দে সংগৃহীত 'সত্যনারায়ণের কথা', ১৩৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সত্যপীরের কথা' এবং কাঁথি নীহার প্রেস হইতে প্রকাশিত 'রামেশ্বরের সত্যনারায়ণের পাঁচালী' ('আখোটা পালা') অবলম্বনে ডঃ চক্রবর্তী 'সত্যপীরের ব্রতকথা 'সম্পাদনা করিয়াছেন। পুঁথি এবং মুদ্রিত কাব্যের আখ্যান প্রায় একরূপ, মাঝে মাঝে ভাষাভঙ্গিমায় অল্পস্বল্প পার্থক্য আছে। কিন্তু কাঁথি নীহার প্রেস প্রকাশিত 'আখোটা পালার'

---

৩৮ ভূমিকায় সম্পাদক বলিয়াছেন, "১৭৯৭ শকে খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রকাশিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের মধ্যে ৺রামেশ্বরকৃত সত্যনারায়ণের পালা মুদ্রিত হইয়াছিল। আমি ১১৬২, ১১৮৮ ও ১২৩৯—এই তিন সালের হস্তলিখিত তিনখানি পুঁথির পাঠ বিচার করিয়া উহার পাঠ নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছিলাম এবং কঠিন অংশের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছিলাম। সেই সটীক সত্যনারায়ণ সহকৃত "প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ" পুনশ্চ প্রকাশিত হইয়াছে। এদেশে সত্যনারায়ণের পূজার সময় রামেশ্বরের রচিত সত্য-নারায়ণীর কথা পাঠ হয়। অতএব সাধারণের ইহাতে প্রয়োজন আছে। যথার্থ রামেশ্বর বিরচিত সত্যনারায়ণের গ্রন্থ অল্পমূল্যে সকলে পাইতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে মূলমাত্র এই রামেশ্বরী সত্যনারায়ণকথা প্রকাশিত হইল।"

বর্ণনা ও কাহিনী সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের—যদিও ভণিতায় এই প্রকার উল্লেখ আছে—"দ্বিজ রামেশ্বর গায় বলে কৃত্তিবাস।" অন্য স্থলেও "দ্বিজ রামেশ্বর বলে", "দ্বিজ রামেশ্বর গায়", "দ্বিজ রামেশ্বর ভাষে" প্রভৃতি ভণিতা আছে। মনে হয়—ইনি অন্য কোন অর্বাচীন কবি হইবেন, ইঁহার রচনার ধারা বৈশিষ্ট্যবর্জিত ও গতানুগতিক।

পশ্চিমবঙ্গে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মমত একত্র করিয়া যে মিশ্র দেবতার উদ্ভব হয়, তিনি সত্যপীর—হিন্দুর ঘরে ইনি অধিকাংশ স্থলে নারায়ণ বা সত্যনারায়ণ রূপে পূজিত হন। ইনি লৌকিক এবং অর্বাচীন কালের দেবতা হইলেও দুইখানি সংস্কৃত পুরাণে (স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ড এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণের উত্তরখণ্ড) এই কাহিনীর উল্লেখ আছে এবং মুসলমান পীর-প্রভাবিত সত্যনারায়ণের পূজাও ছদ্মনামে প্রচারিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য দুই-এক শতাব্দী পূর্বে এই সমস্ত অর্বাচীন কাহিনী উর্দু-ফারসী জবান ছাড়িয়া সংস্কৃত ভাষার খোলস ধারণ করিয়া হিন্দুর গৃহে স্থান পাইয়াছে।[৩৯]

রামেশ্বরের সত্যপীর কাহিনীও অর্বাচীন পুরাণের গল্পের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে।[৪০] বোধ হয় এই উপকাহিনীর জড় পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু-মুসলমান জনসমাজেই নিহিত ছিল[৪১], তাহাই অর্বাচীন কালে সংস্কৃত পুরাণে প্রক্ষিপ্ত হয়।

রামেশ্বর কাব্যের প্রথমে সর্বদেবদেবী বন্দনা ও চৈতন্যাদির স্তুতির পর[৪২] এইভাবে সত্যপীরের বন্দনা করিয়াছেন:

জয় জয় সত্যপীর সনাতন দস্তগীর
দেবদেব জগতের নাথ

৩৯ সত্যনারায়ণ সত্যপীর প্রসঙ্গে পরে আলোচিত হইয়াছে।

৪০ "রামেশ্বরের সত্যপীরের পাঁচালীকে স্কন্দপুরাণের রেবা ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণের উত্তর খণ্ডের অনুবাদ বলিলেই চলে। স্কন্দপুরাণের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এখানে ফকিররূপে চিত্রিত হইয়াছেন।" ডঃ চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, পৃ, ৩৬

৪১ ডঃ সুকুমার সেন—বাং. সা. ইতি, ১ম, অপরার্ধ, পৃ. ৪৪০

৪২ কবি বন্দনাংশে শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, বীরভদ্র, রূপসনাতন, রামানন্দ, সারেঙ্গ গোসাই (?), সার্বভৌম প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। কবি যে ব্যক্তিগত ধর্মমতে বৈষ্ণব ছিলেন, ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণ।

কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি রজঃ তুমি সত্ত্ব
তোমার চরণে প্রণিপাত ॥

তারপর কবি আখ্যান আরম্ভ করিয়াছেন। "দিল্লীর দক্ষিণ দেশ মথুরেশপুর"—সেই মথুরেশপুরে বিষ্ণুশর্মা নামে এক দরিদ্র ধর্মভীরু ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ ছিলেন কৃষ্ণের পরম ভক্ত। তাঁহার দুঃখ কষ্ট ঘুচাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ফকিরের (সত্যপীর) বেশে ব্রাহ্মণীর নিকট উপস্থিত হইয়া উর্দু-ফারসী জবানে বাতচিত করিতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মণকে সত্যপীরের পূজা ও শীর্ণি দিতে বলিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ হইয়া তিনি যবনের আচার কি করিয়া গ্রহণ করিবেন? তিনি চিন্তিত হইলে পীরবেশী কৃষ্ণ নিজ পরিচয় দিয়া বলিলেন:

বিধি মোর বড় ভাই মহেশ অনুজ।
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম ধারী চতুর্ভুজ ॥
কংস কেশী মথনে কেশব মোর নাম।
মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যার রাম ॥
* * * *
ফকির হইয়া আমি তোমার কারণ।
কলিতে সম্প্রতি আমি সত্যনারায়ণ ॥

তাঁহার নির্দেশে ব্রাহ্মণ শীর্ণি (সিন্নি) দিয়া সত্যপীরের পূজা করিলেন, মর্ত্যে পীরের পূজা প্রচার লাভ করিল, ব্রাহ্মণের দুঃখ ঘুচিল। ব্রাহ্মণ পীরপূজা-পদ্ধতি লিখিয়া দিলে লোকে তাহা নকল করিয়া বাড়ী লইয়া গেল এবং সেই নির্দেশ অনুসারে সত্যপীরের পূজা-শীর্ণি দিয়া উপাসনাস্থলে পীরমাহাত্ম্যকথা পাঠ করিতে লাগিল।[৪৩] ইহাই রামেশ্বরের সত্যপীর কাহিনীর প্রথম আখ্যান। দ্বিতীয় আখ্যানে সদানন্দ নামে এক বণিকের গল্প বর্ণিত হইয়াছে।

নিঃসন্তান বণিক সদানন্দ সত্যপীরের শীর্ণি মানিয়া চন্দ্রকলা নাম্নী এক কন্যা লাভ করিল। পরে চন্দ্রকলা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে সাধু কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতাকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণে বাণিজ্য করিতে গেল। ইতিমধ্যে সে পীরের শীর্ণি দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। এইজন্য তাহাকে জামাতাসহ

---

৪৩ পূজার পদ্ধতি ভাষা রচ্যা দিল তবে।
নকল লিখায়্যা লোক লয়্যা গেল সভে ॥
(অতঃপর রামেশ্বরের সমস্ত উদ্ধৃতি ডঃ চক্রবর্তীর সম্পাদিত গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইবে।)

রাজকারাগারে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইল। এদিকে চন্দ্রকলা বহুদিন পিতা ও স্বামীর সংবাদ না পাইয়া সত্যপীরের পূজানুষ্ঠান করিল। তখন পীর নিদ্রিত রাজাকে স্বপ্নে ভয় দেখাইলেন। ফলে বণিক ও জামাতা সসম্মানে মুক্তি পাইল, অনুতপ্ত রাজা বহু খেসারত দিলেন। মুক্তি পাইয়া জামাতা ও প্রচুর ধনরত্নসহ বণিক দেশে ফিরিল। কিন্তু এ সমস্ত যে সত্যপীরের কৃপাতেই হইয়াছে, সে কথা বণিক জানিতে পারিল না। ছদ্মবেশী পীর বণিককে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার নিকট কিছু যাচ্ঞা করিতে আসিলেন, কিন্তু ধূর্ত বণিক তাঁহাকেও বঞ্চনা করিতে চাহিল। তখন পীর বণিককে কিঞ্চিৎ শাস্তি দিয়া তাহাকে আক্কেল দিলেন, বণিক পীরের শীর্ণি মানিয়া রেহাই পাইল। এদিকে চন্দ্রকলা স্বামী ও পিতার সংবাদ পাইয়া অতি ব্যস্ততার জন্য পীরের শীর্ণির অবমাননা করিয়া অতি দ্রুত ঘাটে আসিয়া পৌঁছাইল। কন্যার অপরাধে সাধুর নৌকা ঘাটে ভিড়িয়াও ডুবিয়া গেল। তখন চন্দ্রকলা নিজ অপরাধ বুঝিতে পারিল, পীরের শীর্ণি ভক্তিভরে আহার করিলে নিমজ্জিত তরী ধনরত্নসহ আবার ভাসিয়া উঠিল, সুখে ঐশ্বর্যে বণিক সদানন্দের সংসার ভরিয়া উঠিল।

এই অকিঞ্চিৎকর কাহিনীটি সাহিত্যাংশে কোনও দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে, অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণের হুবহু অনুকরণমাত্র। আধা-মঙ্গলকাব্য, আধা-পাঁচালী ধরনের বিশেষত্ববর্জিত এই কাহিনীর জন্য রামেশ্বরকে 'ধন্য ধন্য' করিবার প্রয়োজন নাই। ইহার কাহিনী চরিত্র কিছুই মনের মধ্যে রেখাপাত করে না। পূজা ও শীর্ণি লাভের জন্য সত্যপীরের অশোভন ব্যগ্রতা ভদ্রেতর ও স্ত্রীসমাজেই আসর জমাইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান ধর্মমতের সমন্বয়ের গৌরব কেহ কেহ রামেশ্বরের উপর আরোপ করিয়া বলিয়াছেন, "ধর্ম এক, সম্প্রদায় বিস্তর,—ঈশ্বর এক, তাঁহার নাম নানা। রাম ও রহিম এক, রামেশ্বর এই কথা কয়েকবার মধুরভাবে লিখিয়াছেন।"[88] কেহ-বা বলেন যে, কবি ব্যক্তিগত ধর্মমতে কালীমন্ত্রের উপাসক হইলেও, "তিনি ধর্মের সমন্বয়বাদিরূপে অনায়াস উদারতায় মুসলমানদের দেবতাকেও হিন্দুর দেবতার সঙ্গে এক করিয়াছেন। কারণ তাঁহার মধ্যে ধর্মান্ধতাবশতঃ ভেদবুদ্ধি ছিল

৮৮ সত্যপীরকথা—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত, ভূমিকা, পৃ ॥৶০

না।"[৪৫] কিন্তু ধর্মীয় ঔদার্য অপেক্ষা বরং এইরূপ সিদ্ধান্ত করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত যে, মুসলমান শাসনের চণ্ডনীতি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য হিন্দুরা এইরূপ একটি মিশ্র দেবতার উদ্ভাবন করিয়া প্রবল মুসলমানের হস্তক্ষেপ হইতে কোনও প্রকারে নিজ নিজ ধর্ম বাঁচাইতে চাহিয়াছিলেন। আর তাহা ছাড়া সত্যপীরের উদ্ভাবয়িতা রামেশ্বর নহেন, সুতরাং তাঁহাকে এই কাব্যের জন্য উচ্চ প্রশংসা করা যায় না। তাঁহার সমকালে এবং পরেও বহু ব্যক্তি সত্যপীর-সত্যনারায়ণের পাঁচালী লিখিয়াছিলেন, বটতলা হইতে বর্তমান শতাব্দীতেও এইরূপ অসংখ্য পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, এখনও হইতেছে।[৪৬] রামেশ্বর পীরমাহাত্ম্য-কাব্য ও শিবসঙ্কীর্তন রচনা করিলেও কৌলিক ধর্মমতে শাক্তই ছিলেন—কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি তাঁহার অধিক আনুগত্য দেখা যায়। শিবসঙ্কীর্তন ও সত্যপীরের ব্রতকথায় কবির বৈষ্ণবধর্মানুকূল অজস্র পংক্তি পাওয়া যায়।

রামেশ্বরের শিবায়নে যে আলঙ্কারিক মণ্ডনকলা লক্ষ্য করা যায় সত্যপীর ব্রতকথায় কিন্তু তাহার বিশেষ চিহ্ন নাই। ইহা প্রথম রচনা বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার রচনাভঙ্গিমা সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। মাঝে মাঝে সত্যপীরের উর্দু-ফারসী-হিন্দী মিশ্রিত জবান কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে বটে, কিন্তু এ বৈশিষ্ট্যও তাঁহার এক শতাব্দী পূর্ববর্তী কবি কৃষ্ণরাম দাসের মঙ্গলকাব্যে দেখা গিয়াছিল। অনেক সময় ওজঃ ও বীররস সঞ্চারের জন্য কৃষ্ণরাম গ্রাম্য শব্দের সঙ্গে উর্দু-ফারসী শব্দের মিশ্রণ করিয়াছিলেন, কখনও কখনও নিতান্ত অশ্লীল বদ জোবানও ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু রামেশ্বরের সত্যপীর মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিলেও কুরুচিপূর্ণ ভাষার ধার দিয়াও যান নাই। কোন এক সমালোচক কবির সত্যপীর কাহিনীর বিশেষ প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন, "এই কবি অসামান্য ভাষা ও শব্দকুশলী। সংস্কৃত জানিতেন, তাহার উপর ফারসী ও উর্দু ভাষায় অসীম ক্ষমতা।...আগাগোড়া ভাষা চোস্ত, জমাট, ধারালো, ফেনাইবার ফাঁপাইবার চেষ্টা কোথাও নাই।"[৪৭] একথা অবশ্য ঠিক যে, এই পণ্ডিত-কবি সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ

৪৫ ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তীর গ্রন্থ, পৃ. ৬৪

৪৬ অষ্টাদশ হইতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যে অন্ততঃ পঞ্চাশ জন কবি সত্যনারায়ণের পাঁচালী লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্রের কাব্য খোপে টিকিয়া গিয়াছে।

৪৭ সত্যপীরকথা—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত, (ক. বি.) পৃ. ।৵৹

ছিলেন, উত্তর ভারতীয় আদর্শের প্রভাবে হিন্দী-উর্দু-ফারসী ভাষাতেও কিছু রপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাষাভঙ্গিমায় 'চোস্ত, জমাট, ধারালো' প্রভৃতি যে সমস্ত বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা ভারতচন্দ্রেই অধিকতব যুক্তিসঙ্গত হইত। যাহা হউক বিশেষত্বহীন সত্যপীর কাহিনীতে কবির পূর্ণ-প্রতিভার যে কোনরূপ ছায়া পড়ে নাই তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ভণিতায় রামেশ্বরের নাম না থাকিলে আমবা ইহা যে-কোন তৃতীয় শ্রেণীব কবির রচনা বলিয়া ধরিয়া লইতাম।

রামেশ্বরের শ্রেষ্ঠকাব্য শিবসঙ্কীর্তন বা শিবায়ন। এই কাব্যের কয়েকখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, ছাপাব যুগে ইহাব একাধিক সংস্করণ হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ পুরাতন ছাপা গ্রন্থে পুঁথিব বিশুদ্ধি রক্ষিত হয় নাই।[৪৮] অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ঈশানচন্দ্র বসু, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং আধুনিক কালে ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী অনেকটা সতর্ক হইয়া পুঁথি সম্পাদনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে ডঃ চক্রবর্তীর সংস্করণ অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্তন সাত পালা ও জাগরণ-আরম্ভ পালায় সমাপ্ত— প্রত্যেক দিন ও রাত্রিতে এক পালা গীত হওয়াই রীতি। তন্মধ্যে প্রথম হইতে তৃতীয় পালার কিয়দংশে পুরাণাশ্রিত কাহিনী অনুসৃত হইয়াছে। প্রথম পালায় পুরাণানুসারী সৃষ্টি, দেবতাদির উৎপত্তি কথন, দ্বিতীয় পালায় দক্ষযজ্ঞ নাশ ও সতীর দেহত্যাগ, দক্ষের ছাগমুণ্ডের কাহিনী, তৃতীয় পালায় হিমালয় গৃহে গৌরীর জন্ম, হিমালয় গৃহে শিবেব আগমন, মহাদেবের ধ্যানভঙ্গেব অপরাধে মদনভস্ম ও রতিবিলাপ, গৌরীব তপস্যা, গৌরী ও ছদ্মবেশী শিবেব বাক্যপ্রবন্ধ, শিবের বিবাহ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্যন্ত পৌরাণিক কাহিনীর ধারা ঘনিষ্ঠভাবে অনুসৃত হইয়াছে। পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, নন্দিকেশ্বর পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, কালিদাসের কুমারসম্ভব প্রভৃতি পৌরাণিক ও ক্ল্যাসিক সাহিত্য হইতে কবি পৌরাণিক কাহিনীর উপাদান সংগ্রহ

৪৮ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগিলাল হালদার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্তন বা শিবায়ন সম্পাদনা করিয়াছেন। তিনি কুচবিহার রাজ-লাইব্রেরীতে রক্ষিত একখানি পুঁথির আধুনিক নকলের উপর অধিক নির্ভর করিয়াছেন, মূলপুঁথি চাক্ষুষ করেন নাই। এইরূপ পরোক্ষ রীতি প্রাচীন কাব্যসম্পাদনের আদর্শ রীতি নহে। তিনি তৎপর হইয়া মূল পুঁথি ও তাহার নকলের পাঠ তুলনা করিলে সম্পাদনার কার্য আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারিতেন।

করিয়াছেন। হরপার্বতীর বিবাহের পর হইতে পৌরাণিক কাহিনী অল্পে অল্পে অপসৃত হইয়াছে এবং কৃষিপ্রধান জীবন হইতে উত্থিত লৌকিক শিবের কাহিনী জাঁকাইয়া বসিয়াছে। কবি পৌরাণিক অংশে গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন—চতুষ্পাঠীতে পড়িয়া তিনি সংস্কৃত ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন, শিবসঙ্কীর্তনের পৌরাণিক অংশে তাহার পরিচয় রহিয়াছে। কিন্তু পুরাণের ঘনিষ্ঠ অনুকরণের জন্য কবি এই অংশে বিশেষ কোন মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই।[৪৯] বরং পরবর্তী কবি ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গলে'র পৌরাণিক অংশে ঘটনাসন্নিবেশে পৌরাণিক কাহিনী অনুসরণ করিলেও কবিত্ব ও মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়া নিজ প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণ করিয়াছেন। হইতে পারে রায়গুণাকর মুকুন্দরাম ও রামেশ্বরের নিকট কোন কোন দিক দিয়া ঋণী, কিন্তু কবিত্ববিচারে অধমর্ণ যে উত্তমর্ণ-দিগকে বহু দূরে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

তৃতীয় পালার মাঝামাঝি হইতে রামেশ্বর লৌকিক কাহিনী অনুসরণ করিয়াছেন। বরবেশী শিবকে দেখিয়া মেনকার বিলাপ, শিবের মোহনমূর্তি ধারণ, হরগৌরীর বিবাহ—এই স্থানে তৃতীয় পালা সমাপ্ত হইয়াছে। চতুর্থ পালায় শিবের গার্হস্থ্য জীবনের লৌকিক কাহিনীর চিত্র বর্ণিত হইয়াছে। মহাদেবের ভিক্ষা-উপজীবিকা, হরগৌরীর কলহ, ঝুলি হইতে শিবের ধনরত্ন বাহির করা, হরগৌরীর নানা তত্ত্বকথা আলোচনা, রামনাম মাহাত্ম্য ও হরিনাম মাহাত্ম্য ঘোষণা—এই স্থলে চতুর্থ পালা পরিসমাপ্ত হইয়াছে। চতুর্থ পালায় মূলঘটনাবহির্ভূত ভক্তি ও তত্ত্বকথা অধিক স্থান অধিকার করিয়াছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পালায় যথাক্রমে কৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ ও বিবাহ এবং বাণরাজার কন্যা উষার সঙ্গে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের গোপন মিলন এবং সেই প্রসঙ্গে হরিহরের যুদ্ধ, এবং সপ্তম পালায় শিবরাত্রির আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যথার্থ লৌকিক কাহিনী ষষ্ঠ, সপ্তম ও জাগরণ পালায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ পালায় মহাদেবের কৈলাস ত্যাগ ও কৃষি-কার্য গ্রহণ এবং সপ্তম পালায় বাগদিনীবেশিনী মহামায়ার সঙ্গে শিবের মৎস্য ধরা, শিবকে ছলনা করিয়া দেবীর কৈলাসে প্রস্থান এবং শিবেরও কৈলাস

৪৯ "পুরাণখণ্ডে তাঁহার কাব্যের বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই, কেবল পুরাতনের পুনরাবৃত্তি।"—ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, পৃ. ১১২

যাত্রা—এই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। জাগরণ পালায় নারদের প্ররোচনায় পার্বতীর স্বামীর নিকট শাঁখা পরিবার বাসনা, শিবের অসামর্থ্য জানিয়া দেবীর সাভিমানে পিত্রালয়ে গমন, শিবেরও কৈলাস যাত্রা। জাগরণ পালায় গৌরীকে শাঁখা পরাইয়া বৃদ্ধ মহাদেবের পত্নীর মানভঞ্জনের চেষ্টা, অতঃপর হরপার্বতীর পুনর্মিলনে কাহিনী সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাই লৌকিক কাহিনীর ধারা। পৌরাণিক অংশে কবি যে পুরাণকথার নকল করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। রামেশ্বরের এই কাব্যে যদি কোন কৃতিত্ব থাকে, তবে তাহা মহাদেবের গার্হস্থ্যজীবন বর্ণনায়। মহাদেবের কৃষিকার্য, বাগদিনীবেশিনী দেবী কর্তৃক মহাদেবের ছলনা এবং গৌরীর শঙ্খপরিধান—এই অংশেই কবির মৌলিকতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। এই লৌকিক কাহিনীগুলি কোন প্রামাণিক পুরাণে পাওয়া যায় নাই। কেবল নন্দিকেশ্বরপুরাণে (অর্বাচীন পুরাণ) কিঞ্চিৎ পরিমাণে শিবের কৃষিকার্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে কিছু কিছু সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকও দুষ্প্রাপ্য নহে। এখানে এইরূপ একটি শ্লোকের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :—

> রামাদ্ যাচয় মেদিনীং ধনপতেঃ বীজং বলাল্লাঙ্গলং
> প্রেতেশান্মহিষং তবাস্তি বৃষভঃ ফালং ত্রিশূলং এব।
> শক্তাহং তব চান্নদানকরণে স্কন্দোঽস্তি গোরক্ষণে
> খিন্নাহং হর ভিক্ষয়া কুরু কৃষিং গৌরীবচঃ পাতু বঃ॥

অনু: গৌরী শিবকে বলিতেছেন, "রামের নিকট হইতে তুমি কিছু ভূমি মাগিয়া লও, ধনপতি কুবেরের নিকট হইতে বীজ আর বলরামের নিকট হইতে লাঙ্গল, প্রেতরাজ যমের নিকট হইতে চাহিয়া লও মহিষ, তোমার নিজেরই তো বৃষ রহিয়াছে—আর তোমার ত্রিশূল তো ফাল, আমি নিজে তোমাকে (মাঠে) অন্ন দিয়া আসিতে পারিব। স্কন্দ গোরক্ষণে শক্ত; হে হর, ভিক্ষায় আমি খিন্ন, তুমি এইবার কৃষি কর।"[৫০]

প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদিতেও কৃষক শিবের উল্লেখ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে। বৈদিকযুগ মূলতঃ কৃষিযুগ বলিয়া অনেক বৈদিক দেবদেবীই কৃষিদেবতার প্রতীক, কিন্তু প্রাচীন ভারতে রজতগিরিনিভ শিবকে ক্ষেত্রপালরূপে চিত্রিত

৫০ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত—প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে হরগৌরীর প্রেম (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)

করা হয় নাই। পরবর্তী কালের অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ভোলামহেশ্বরকে গার্হস্থ্য সমস্যায় বিব্রত দরিদ্র ব্রাহ্মণরূপেই চিত্রিত করা হইয়াছে—এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য হরগৌরী কৃষিকার্য অবলম্বনের কথা চিন্তা করিতেছেন—এইরূপ বর্ণনা প্রাদেশিক সাহিত্যেও প্রচুর পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি শিবগীতিকায় বাঙলা দেশের শিবায়নে বর্ণিত কৃষক শিবের অনুরূপ শিবচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সেখানেও দরিদ্র শিবকে 'কিরিষ' অর্থাৎ কৃষিকার্যে মন দিতে বলা হইয়াছে। খট্বাঙ্গ কাটিয়া লাঙ্গল, শূল ভাঙিয়া ফাল নির্মাণ করিয়া তাহাতে বৃষকে জুড়িয়া দিতে ভক্ত শিবকে অনুরোধ করিতেছেন।[৫১] আসামী ওড়িয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাতেও কৃষক শিবের বর্ণনা লোকসাহিত্যের অঙ্গস্বরূপ এখনও বাঁচিয়া আছে।[৫২] ধর্মমঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত শূন্যপুরাণে শিবের চাষবাসের যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহার উৎসও একই প্রকার। যাহা হউক আমাদের অনুমান, কৃষিপ্রধান—বিশেষতঃ ধান্য-প্রধান পূর্ব-ভারতে নিষাদযুগ হইতে (অস্ট্রিক) ধান্যক্ষেত্রের দেবতারূপে ক্ষেত্রপাল ধরনের কোন কৃষিদেবতার পূজা তদানীন্তন আর্যেতর কৃষকসমাজে প্রচলিত ছিল। এইজন্য মধ্যযুগীয় লৌকিক বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অংশে ধান্যের এত বিচিত্র বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।[৫৩]

---

৫১ বেরি বেরি অরে সিব মো তোয় বোলো
কিরিষ করিঅ মন লাই।
* * * *
খটগ কাটি হরে হর জে বঁধাওল
তিসূল তোড়িঅ করু ফারে।
বসহা ধুরন্ধর হর লএ জোতিঅ
পাটএ সুরসরি ধারে॥

(হে শিব, আমি তোমাকে বার বার বলি, মন দিয়া কৃষিকার্য কর।…হে হর, খট্বাঙ্গ কাটিয়া হল বাঁধাও, ত্রিশূল ভাঙিয়া তাহার ফাল তৈয়ার কর। হে হর, তোমার ধুরন্ধর বৃষকে লইয়া জুড়িয়া দাও। গঙ্গার ধারায় ক্ষেতের পাট কর।)

৫২ ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, পৃ ১৭৭-৭৮

৫৩ মধ্যযুগীয় কোন কোন বাংলা কাব্যে সবিস্তারে বিভিন্ন প্রকার ধান্যের তালিকা ও গুণবর্ণনা পাওয়া যায়। ধর্মপূজাবিধান, শূন্যপুরাণ, কৃষ্ণরাম দাসের কমলামঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, দয়ারাম দাসের বিনন্দ রাখালের পালা, কিঙ্করের লক্ষ্মীসরস্বতীর ঝগড়া পালা প্রভৃতিতে নানাপ্রকার ধান্যের নাম আছে। রামেশ্বরের শিবায়নে উল্লিখিত বহুপ্রকার ধান্যের

পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্র বিন্যাসে কবিপ্রতিভার যে বিশেষ কোন কৃতিত্বের পরিচয় ফুটে নাই তাহা পাঠকেরা স্বীকার করিবেন। এখানে কবি ভয়ে ভয়ে পূর্বতন আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন—স্বাধীনভাবে যথেচ্ছা বিচরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু হরপার্বতীর ঘর-গৃহস্থালী, দারিদ্র্য, কলহ, শিবের কৃষিকর্ম, মৎস্যধরা এবং শিব কর্তৃক পার্বতীকে শঙ্খ পরানোর বৃত্তান্তে তাঁহার গ্রন্থনৈপুণ্য ও চরিত্রবিন্যাস অধিকতর সহজ ও সরস হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার অনেক পূর্ব হইতেই হরপার্বতী সংক্রান্ত এই প্রকার লোককান্ত গালগল্প সমগ্র পূর্বভারতের কৃষক ও সাধারণ সমাজে প্রচলিত ছিল—যাহার জড় অতি প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক অস্ট্রিক কৌমযুগে নিহিত ছিল বলিয়া মনে হয়। অস্ট্রিকজাতি অর্থাৎ নিষাদজাতি খুব সম্ভব কৃষি ও মৎস্যজীবী জীবনের আদিম স্তরে বাস করিত, সেই দূরপ্রস্থিত জীবন-ধারার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি পূর্বভারতের লৌকিক শিবকাহিনীর মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। বাঙলাদেশে শিবের কৃষিকার্য, বাগদিনীবেশিনী দুর্গার সঙ্গে কাদাজলে নামিয়া মৎস্য ধরার বৃত্তান্ত এবং দুর্গার শঙ্খ পরিধানের তিনটি গল্প পৃথক পুঁথির আকারেও জনপ্রিয় হইয়াছিল; শুধু রামেশ্বর ভণিতায় তিন পালার বহু পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। মনে হয়, কবি পৌরাণিক কাহিনীর দ্বারা গ্রন্থের কলেবর পূর্ণ করিলেও লোকসমাজে উপরোক্ত লৌকিক কাহিনীর অধিকতর জনপ্রিয়তা ছিল।

কাব্যের লৌকিক অংশ হরপার্বতীর দারিদ্র্যের বাস্তব চিত্রসহ আরম্ভ হইয়াছে। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য পার্বতীর স-ঝঙ্কার উপদেশে শিবকর্তৃক

মধ্যে এখানে কয়েকটির নাম প্রদত্ত হইতেছে :—কাল্যাকান্থ, কাল্যাজিরা, কার্ণিফুল, কর্ণিকা, কালিন্দী, কটকী, কুসুমশালী, কনকচুর, দুধরাজ, দুর্গাভোগ, কৃষ্ণশালী, কুঙরভোগ, কলমীলতা, কনকলতা, খেজুরথুপী, খয়েরশালী, গঙ্গাজল, গয়াবালি, গোপালভোগ, গৌরীকাজল, গন্ধমালতী, গুয়াথুপী, গুলাপকর, চামরশালী, চন্দনশালী, ছত্রশালী, জলাশালী, জগন্নাথভোগ, জামাক্রিলাড়ু, জলারাঙ্গী, ঝিঙ্গাশালী, বলাইভোগ নন্দনশালী, পাতসাভোগ, পায়রারস, তিলসাগরী, বাঁকশালী, বাঁকচুর, ইত্যাদি। ভারতচন্দ্রও আশু, বোরো, আমন তিন প্রধান শ্রেণীর ধান্যবর্ণনার পর মেঘভাসা, কালাসনা, কালিন্দী, ছায়াচুর, গুয়াশালী, হরিলেবু, গুয়াখুবী, বাঁশফুল, কাঁটারাঙ্গি, কপিলভোগ, শিবজটা, গঙ্গাজল, প্রভৃতি ধান্যের বিস্তৃত তালিকা দিয়াছেন। কবি এই বর্ণনায় শুধু "রাঢ়ের সরু চালুর" উল্লেখ করিয়াছেন। বরেন্দ্র অঞ্চলের ধান্যের তালিকা ধরিলে এই বর্ণনা কত দীর্ঘ হইত তাহা সহজেই অনুমেয়।

ইন্দ্রের নিকট চাষবাসের উপযুক্ত জমির পাট্টা গ্রহণ, কুবেরের নিকট বীজ ধান কর্জ, তারপর ভৃত্য ভীমসহ শিবের ধান্য রোপণ—এই সমস্ত বর্ণনায় কবি যে বাস্তবজ্ঞান ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহার নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি বিশেষভাবে প্রশংসা করিতে হইবে। পরে কোন্দল-বিশারদ নারদ ঋষির মিথ্যা প্রজল্পে পার্বতী কর্তৃক মহাদেবকে কৃষিক্ষেত্র হইতে কৈলাসে ফিরাইয়া আনার জন্য সম্ভব অসম্ভব চেষ্টাও খুব কৌতুকজনক হইয়াছে। পার্বতী কৃষিকার্যে নিরত মহাদেবকে উত্যক্ত করিয়া কৈলাসে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ডাঁশ মশা প্রেরণ করিলেন। এই মশা—

সূক্ষ্ম বটে শরীর সামর্থ্যে নহে ত্রুটি।
হাতী পারা জন্তুকে হারাতে পারে দুটি॥

কৃষিক্ষেত্রে চন্দ্রচূড় এক হাঁটু কাদার মধ্যে দাঁড়াইয়া চাষের তদারক করিতেছেন, এমন সময় মশার দল তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল। তখন "চমকিয়া চন্দ্রচূড় চালাইলা চড়"। তাহার পরের বর্ণনা বাস্তবতা ও কৌতুকরসের দিক হইতে চমৎকার হইয়াছে।

ঠুস ঠাস ঠুই ঠাই ঠাকুরের করে।
দশ পাঁচ উড়্যা যায় দুই চারি মরে॥

কবি হালকা চালে 'মশার কীর্তনে'ও বেশ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন:

চাপড়ের চটচাট হাল্যার হুটপাট
সট সট নাড়িছে পুচ্ছ।
এই রূপ মর্দন মশার কর্দম
একহাত হৈল উচ্চ॥

মহাদেবকে ফিরাইয়া আনিবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইলে পার্বতী বাগদিনী বেশ ধরিয়া মহাদেবের ধানক্ষেতে উপস্থিত হইলেন। ডাঁশ, মশা, মাছি, জোঁক পাঠাইয়া মহামায়া যাহা করিতে পারেন নাই, শুধু বাগদিনী বেশ ধরিয়া—

কামিনী কটাক্ষ শরে
অস্থির করিলা ভূতনাথে।

প্রথম প্রথম শিবের সন্দেহ হইল, তিনি ভৃত্য ভীমকে একবার বলিলেন, আমার কেমন সন্দেহ হইতেছে—"মোর মনে হেন লয় কদাচিত হবে তোর মামী।" ভৃত্য ভাগিনা প্রতিবাদ করিয়া বলিল, তা' কি করিয়া হইবে? তাহার মামী তো গৌরাঙ্গী, আর এ যে কালো বাগদিনী! আরও পার্থক্য আছে,

"মামীর বয়েস বাড়া, মামী চেঙ্গা এ যে গেঁড়া"। বাক্যচ্ছলে মহামায়া নিজ পরিচয় দিলেও শিব বাগদিনীকে 'সাঁগা' করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন, এমন কি খোদ মহামায়াকেও ছাড়িয়া দিবেন কবুল করিলেন। শেষে বাগদিনী-মোহে মহেশ্বর হাঁটুজলে নামিয়া জল সেঁচিয়া মাছ ধরিতে লাগিলেন :

ধরেন পাবদা-পুঁঠি পাঙ্গাস পাঠীন।
চিতল চিঙ্গড়ী চেলা চাঁদকুড়্যা মীন ॥
খানছুলি ধবাচি ধরিল ডানিকোনা।
মৌরলা টেঙ্গরা ভোলা খলিস নয়না ॥
তেটেঙ্গরাকে ধরিল তেচক্ষ্যা দিল ছেড়্যা।
সোলশাল রোহিত মৃগাল ধরে তাড়্যা ॥

অতঃপর রোহিত, কাম্বাস, কাতলা, কমঠ, ভেটকী, ইলিস, মাগুর, ফলই, গড়ই, কই, পাঁকাল, চেঙ—এমন কি কাঁকড়া-শামুক-গুগলিতেও মহামায়া হাঁড়ি ভরিয়া ফেলিলেন। শিব বাগদিনীর নির্দেশ মতো কাদাজল ঘাঁটিয়া মাছ ধরিলেন এবং মনোমত অভিলাষ জানাইলেন—"অতঃপর আলিঙ্গনে অনুকূলা হও"। ইতিপূর্বে দেবী সুকৌশলে "শিবের মাণিক্য অঙ্গুরী লক্ষ নৃপতির ধন" হস্তগত করিয়াছিলেন। তখন শিবকে বাসর নির্মাণ করিতে বলিয়া ছদ্মবেশিনী দেবী কৈলাসে ফিরিয়া গিয়া নিজ মূর্তি ধরিলেন। এদিকে বাসর সাজাইয়া শিব অপেক্ষা করিতে করিতে হতাশ হইয়া পড়িলেন, তারপর ভয়ে ভয়ে বুড়া বৃষে চড়িয়া কৈলাসধামে পৌঁছাইলেন। গৌরী সক্রোধে ছেলেদের হুকুম দিলেন :

তোর বাপ বাগদি হয়্যাছে ছাড়্যা মোকে।
তার ঠাঞি যাস নাঞি ছুঁস নাই তাকে ॥

প্রচণ্ড দাবড়ি দিয়া দুর্গা মহেশ্বরকে ঘরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন :

বাগতির লাজ নাঞি ঘরে ঢুকে মোর।
ছেলাপুল্যা ছুঁইলে ছুতুক হবে ঘোর ॥
ভালো যদি চাও তো এখান হৈত্যে যাকু।
যেখানে রাখিয়া আল্য বাগদিনী মাগু ॥[৫৪]

---

৫৪ মহাদেব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে পার্বতীর গাত্র স্পর্শ করিয়া মান ভাঙাইতে আসিলে দেবীর নিকট বেশ ভালো রকমের 'অর্ধচন্দ্র' লাভ করিয়াছিলেন :

বাগদিনী-প্রেমমুগ্ধ মহাদেব যখন দেখিলেন, তাঁহার প্রদত্ত অঙ্গুরীয় দেবী বাহির করিয়া দিয়া আসল কথা ফাঁস করিয়া দিয়াছেন, তখন হর মনে মনে জিভ কাটিয়া বলিলেন, "কেন আইলাম হেথা!" হরপার্বতীর মধ্যে তৎক্ষণাৎ একটা হুলস্থুল অনর্থ বাধিয়া যাইত, কিন্তু নারদের মধ্যস্থতায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তখনকার মতো সন্ধি স্থাপিত হইল।

ইহার পর শঙ্খ পরিধান পালা আরম্ভ। নারদের প্ররোচনায় দেবী মহাদেবের কাছে শঙ্খ পরিতে চাহিলেন। ইতিপূর্বে দেবী নারদের সামনে মহাদেবকে বাগদিনী প্রসঙ্গে যথেষ্ট 'হেনস্থা' করিয়াছিলেন, মহাদেবও তাহার জন্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। দেবীর শাঁখা পরিবার বাসনায় মনে মনে জলিয়া উঠিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন,

ভিখারীর ভার্যা হৈয়া ভূষণের সাধ।
কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ॥
বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাহ জনকের ঘরে॥

এইরূপ কথার খোঁটা কোন্ স্ত্রীই-বা সহ্য করিতে পারে? সক্ষোভে পার্বতী সন্তানাদিসহ পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন। ব্যাপার এত দূর গড়াইবে তাহা পশুপতি বুঝিতে পারেন নাই। নানা অনুরোধ-উপরোধ করিয়াও তিনি ক্ষুব্ধ দেবীকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তখন "আড় হয়্যা পশুপতি পড়িলেন পথে।" কিন্তু মহাদেবকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ক্রুদ্ধা চণ্ডিকা হিমালয় ভবনে যাত্রা করিলেন, "পাথারে ফেলিয়া গেল পর্বতের ঝি।" মহাদেব নানা বাধা সৃষ্টি করিয়া দেবীকে পিত্রালয়ে যাইতে নিবৃত্ত করিতে চাহিলেন, কিন্তু দেবী ইন্দ্রের রথ আনাইয়া তাহাতে চড়িয়া বাপের বাড়ী পৌঁছাইলেন, হিমগৃহে আনন্দের শারদোৎসব শুরু হইল। এদিকে "শক্তিহীন শিব যেন জীবহীন দেহ।" তিনি যোগবলে একজোড়া বাইশঙ্খ সৃষ্টি করিয়া শাঁখারীর ছদ্মবেশে হিমালয়ে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন, তারপর নানা ছলাকলা কলকৌশলে শাঁখারী শিব পার্বতীর হাতে শাঁখা পরাইলেন, অতঃপর হর

গোসা ছিল গৌরীর গুমান গেল ভর‍্যা।
ঘর হৈতে ঘুচাইল ঘাড় ধাক্কা মার‍্যা॥
পূর্ব দুঃখে পার্বতী পেলিল পূর্ণ কাম।
উচ্চ পিড়া হৈতে পড়্যা বুড়া বলে রাম॥

ছদ্মবেশ ত্যাগ করিলেন, দেবদম্পতীর পুনর্মিলন হইল, হিমাচলে আনন্দের স্রোত বহিল। অবশ্য বাসরে পুনর্মিলনের সময় পার্বতী বাগদিনী বেশ ধরিয়াই মহাদেবের তৃপ্তি সাধন করিলেন। অতঃপর হরপার্বতী ও সন্তানেরা বিজয়া দশমীর পর কৈলাসে ফিরিয়া গেলেন। শস্য পাকিলে ভৃত্য ভীম "হু মণে দা লইয়া হাথে" ধান কাটিতে লাগিল। সর্বশেষে কবি বিবিধ ধান্যের তালিকা দিয়া গীত সমাপ্ত করিয়াছেন।

এই লৌকিক কাহিনীতে দরিদ্র শিবের গার্হস্থ্য জীবন, দাম্পত্য কলহ, চাষবাস, মাছধরা প্রভৃতি বর্ণনায় পুবাপুবি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষিত হইয়াছে। বিশেষতঃ শিবের কৃষিকার্য ও ধান্যরোপণের কাহিনীতে ব্রাহ্মণকবির কৃষিকর্ম বিষয়ে নিপুণ অভিজ্ঞতা ও আন্তরিক আকর্ষণ সূচিত হইয়াছে। শিব কর্তৃক ইন্দ্রের নিকট জমির পাট্টা গ্রহণ এবং কুবেরেব নিকট বীজধান কর্জ করার বৃত্তান্তে একযুগের সাধাবণ বাঙালী কৃষাণের জীবনচিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। কোন এক লেখক বলিয়াছেন, "এ দেবাদিদেব মহেশ্বব এবং জগন্মাতা পার্বতীর কৈলাসজীবন নয়, এ অতীত বাংলার কোন শিবদাস ভট্টাচার্য এবং তস্য ভার্যা পার্বতী ঠাকুবাণীব জীবন কাহিনী।"[৫৫] শিবের ঘবগৃহস্থালীব বর্ণনা কতকটা সেইরূপই বটে। কবি যে শিবকে কৃষক-শিবে পবিণত কবিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কৃষি সম্বন্ধে কবির যাবতীয় অভিজ্ঞতা শিবের ধান্য রোপণের কাহিনীতে নিঃশেষিত হইয়াছে। যাহা হউক হর-পার্বতীর চরিত্র যে লৌকিকতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই তাহা স্বীকার করিতে হইবে। দেবী যে ভাষায় মহাদেবেব সঙ্গে কলহ করিয়াছেন, বাগদিনী-বেশ ধারণ করিয়া অনুচিত ছলনায় মাতিয়াছেন, ভীমেব প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ঈশ্বরী-মহিমা আদৌ রক্ষিত হয় নাই। তাঁহার মান-অভিমান, দারিদ্র্যের সংসার, পুত্রকন্যাদের জন্য চিন্তা, নিষ্কর্মা স্বামীর ভিক্ষুক বৃত্তি ও চারিত্রদুষ্টি তাঁহাকে চিন্তাভারপীড়িত সাধারণ গৃহিণীতে পরিণত করিয়াছে। মহাদেবের লাম্পট্য দোষ[৫৬] গণমানসেরই

৫৫ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—বাংলা সাহিত্যেব ভূমিকা, পৃ. ২৬

৫৬ কুচনীপাড়ায় গিয়া শিবের কুচনী যুবতীদের লইয়া মত্ত হইবার বর্ণনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'শিব সঙ্কীর্তন' বা শিবায়নের সম্পাদক অধ্যাপক যোগিলাল হালদার অশ্লীলতা দেখিতে পান নাই, "শিবের হরিগুণগানে কোঁচিনীদের যোগদানে অশ্লীলতার গন্ধ কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না।" শ্রীযুক্ত হালদারের এই মন্তব্য বিশেষ যুক্তিযুক্ত বলিয়া

উপযুক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণের গোপীলীলার ছায়াতলে মহাদেবের কুচনীবিলাস পরিকল্পিত হইয়াছে।[৫৭] কিন্তু ইহা হইতে গ্রাম্য মনের অভব্যতা দূর হইতে পারে নাই—যদিও কবি 'ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর' বলিয়া অনুপ্রাসের রঙ্গে মাতিয়াছেন। রামকৃষ্ণ ও ভারতচন্দ্র শিবচরিত্র লইয়া যথাক্রমে 'শিবায়ন' ও 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ লৌকিক কাহিনীকে সঙ্কুচিত করিয়া পুরাণসাহিত্য অবলম্বনে শিবচরিত্রের সংযম রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র কোচনীপ্রসঙ্গ ও বাগদিনী লীলা এড়াইয়া গিয়াছেন। তিনিও অবশ্য শিবচরিত্রের মহিমা রক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই, কিন্তু রচনার উৎকর্ষে তিনি রামেশ্বরকে বহু দূরে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ শিবায়ন সাহিত্যকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন, "বাংলা দেশের গ্রাম্য কুটীরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত। তাহাতে কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই" ('লোকসাহিত্য')। বাস্তবিক রামেশ্বরের শিবায়ন পণ্ডিত ব্যক্তির রচনা হইলেও হরপার্বতীর লৌকিক লীলায় গ্রাম্য ধূলোট উৎসব ও গম্ভীরা গাজনের রঙ্গরস উতরোল হইয়া উঠিয়াছে। অষ্টাদশ

মনে হইতেছে না। শিবায়নে কোচপল্লীতে গিয়া শিবের অনুচিত রঙ্গরসের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে উন্নতযৌবনা কোচরমণীদের লইয়া শিবের বিহারকে কবি স্বয়ং বলিয়াছেন :

কোঁচিনী সকল হৈল কুসুম-উদ্যান।
শঙ্কর ভ্রমর তায় মধু করে পান॥

এ বর্ণনায় স্পষ্টই আদিরসের ইঙ্গিত রহিয়াছে। তাহা ছাড়া গ্রন্থের মধ্যে অনেক স্থলে অনাবৃতভাবে কোচনী প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণেও এই অমার্জিত কাহিনী প্রবেশ করিয়াছে। বাগদিনীবেশী দেবীকে দেখিয়া হরের কামোন্মত্ততা গ্রাম্য মনেরই উপযুক্ত হইয়াছে। শঙ্খপরা উপাখ্যানের অন্তে হর-পার্বতীর বাসর বর্ণনায় কবি আদিরসকে অনেকটা সংযত করিয়াছেন বটে, কিন্তু বৃদ্ধ হর এবং প্রায়-প্রৌঢ়া দুর্গার বাসর বর্ণনা কবি নেপথ্যে সারিলেই সুরুচি ও সঙ্গতিবোধের পরিচয় দিতেন।

৫৭ কৃষিকার্যে ব্যস্ত মহাদেব দেবীকে ভুলিয়া থাকিলে দেবী দুঃখ করিয়া জয়াকে বলিয়াছেন :

শঙ্কর মাধব হল্য মহী মধুপুরী।
কৈলাস হৈল ব্রজ আমি রাধা বুরি॥

শতাব্দীর পঞ্চশেষ জীবন-প্রবাহের ধূসর মন্থরতা দেবদম্পতীকে এমনভাবে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে যে, কবির বাস্তব জ্ঞান ও সাংসারিক অভিজ্ঞতার মুন্সিয়ানা প্রশংসিত হইলেও তাঁহার চরিত্রপরিকল্পনা যে নিতান্তই সামান্য ব্যাপার তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। কেহ কেহ এই কাব্যকে "a national poem of the medieval Bengal"[৫৮] বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কেহ-বা রামেশ্বরকে 'কৃষকের কবি'[৫৯] বলিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর আর কোন বাঙালী কবি এতটা 'fellow-feeling' এবং 'humanism' দেখাইতে পারেন নাই।[৬০] কোন সমালোচক এই কাব্যে চমৎকার কৌতুকরসের পরিচয় পাইয়াছেন।[৬১] আবার কেহ-বা অন্য দৃষ্টিকোণ-হইতে বিচার করিয়া বলিয়াছেন, "রামেশ্বর কোন গভীর ভাব উদ্রেক করিতে চেষ্টা করেন নাই।"[৬২] এই সমস্ত মন্তব্যের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, এই কবিকে অবহেলায় ফেলিয়া রাখিবার উপায় নাই। তাঁহার প্রভাব যে নানা মনে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা এই সমস্ত মন্তব্য হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। সাধারণ ধরনের গ্রামীণ মনের উপযোগী এই পাঁচালীকে জাতীয় কাব্য আখ্যা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। বোধ হয় কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত ছাড়া আর কোন কাব্যকেই মধ্যযুগের একমাত্র প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। ইহাতে কবির সহানুভূতি দরিদ্র শিবের ঘরগৃহস্থালীর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছে। তাই বলিয়া ইহাতে কোনও প্রকার মানবতাবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাও মনে হয় না। কৌতুকরস অবশ্য ইহাতে আছে। ভৃত্য ভীমের প্রতি বাগদিনীবেশী দুর্গা যেরূপ কটুকাটব্য করিয়াছেন তাহাতে কিঞ্চিৎ বীররসেরও সঞ্চার হইয়াছে। দেবী যেখানে রণরঙ্গিণী মূর্তি ধরিয়া বাগদিনী-সংস্পর্শের অপরাধে খোদ মহাদেবকে ঘর হইতে তাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন উগ্রচণ্ডা দেবীর অভিযোগবাক্যে বেশ উত্তাপ সঞ্চারিত হইয়াছিল—

---

৫৮ Dr. Asutosh Bhattacharya—Early Bengali Saiva Poetry, pp. 37

৫৯ ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, পৃ. ১৭০

৬০ Dr. Asutosh Bhattacharya—Ibid

৬১ কবিশেখর কালিদাস রায়—প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, ১ম, ২য় ভাগ

৬২ দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা সাহিত্য

কিন্তু অনেক স্থলেই ঘটনা জমাট বাঁধিতে পারে নাই, চরিত্রগুলিও যাত্রাভিনয়ের চরিত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। নারদ, ভীম প্রভৃতি চরিত্রাঙ্কনেও তিনি লোকচেতনার উর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। যে কৌতুকরস মাটির কাছাকাছি বিরাজ করে, যাহার সঙ্গে নির্ভেজাল গ্রাম্যমনের অধিকতর সম্পর্ক, কবি তাহাতে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—এইস্থলে তাঁহার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের প্রধান পার্থক্য। ভারতচন্দ্রের রঙ্গরসে মার্জিত নাগরিকতার চাকচিক্য বেশী, রামেশ্বরের হাস্যকৌতুক গ্রাম্য কৃষাণজীবনেরই সরিক। তাঁহাকে কৃষকের কবি বলা না গেলেও (কারণ সাধারণ কৃষকে তাঁহার কাব্য বুঝিবে না), এই কাব্য রচনাকালে তাঁহার মানসনয়নে যে রাঢ়ের কৃষকপল্লীর বাস্তবচিত্র ভাসিতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কয়েকস্থলে অবশ্য কবি প্রায় ভারতচন্দ্রের মতোই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সপুত্র মহাদেবের ভোজন এবং দুর্গার পরিবেশনের বর্ণনাটি চমৎকার ফুটিয়াছে :

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি॥
তিন জনে একুনে বদন হইল বার।
গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার॥
তিন জনে বার মুখে পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাঞি হাঁড়ি পানে চায়॥
*　　*　　*　　*
কার্তিক-গণেশ বলে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য ধরি খা॥

মহাদেব দুই পুত্রের সঙ্গে সলা করিয়া সব অন্ন চাঁছিয়া পুছিয়া খাইয়া গৌরীকে বেকায়দায় ফেলিতে চাহিলে দেবীর মহিমায় সকলের ক্ষুধাই শান্ত হইয়া গেল। দেবী পুনরায় অন্ন পরিবেশন করিতে আসিলে "শার্দূলঝম্পনে সভে আগুলিল পাতে"। সকলের ভোজনের শেষে দেবী অন্ন গ্রহণ করিলেন। এক যুগের সাধারণ গৃহস্থের প্রসন্ন জীবনচিত্রটি এই ভোজন বর্ণনায় চমৎকার ফুটিয়াছে। তাঁহার বর্ণনার অনেকস্থলে সাধারণ বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন বেশ সহৃদয়তার সঙ্গেই অঙ্কিত হইয়াছে। অনেকে ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটুনীর উক্তিটির ("আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে") বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু রামেশ্বরের এই ধরনের কোন কোন উক্তি ভারতচন্দ্র অপেক্ষা

ন্যূন নহে তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। বিবাহের পর কন্যা বিদায়ের প্রাক্কালে শাশুড়ী জামাতাকে বলিতেছেন :

কুলীনের পোকে আর কি বলিব আমি।
বাছার অশেষ দোষ ক্ষমা কর তুমি ॥
আঁটু ঢাক্যা বস্ত্র দিয় পেট ভরা ভাত।
প্রীত কর্য যেমন জানকী রঘুনাথ ॥

"আঁটু ঢাকা বস্ত্র' ও 'পেট ভরা ভাত' কুলীন কন্যার ইহা অপেক্ষা আর কিছুই চাহিবার ছিল না। এক যুগের সম্পন্ন গৃহস্থের চিত্রটিও এখানে দু' একটি রেখার আঁচড়ে যেভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, কোন সামাজিক ইতিহাসের দুই অধ্যায়েও তাহা ততটা সার্থক হইতে পারিত না।

এবার রামেশ্বরের রচনারীতি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা প্রয়োজন। বহুকাল পূর্বে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রামেশ্বরের রচনাবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "রামেশ্বরের কবিতা তেজস্বী জাঙ্গল লতার ন্যায়।"[৬৩] কিন্তু কবি যেরূপ তৎসম শব্দসঙ্কুল ও অনুপ্রাসকণ্টকিত গুরুভার বাক্‌রীতি ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাতে তাঁহার ভাষাকে 'জাঙ্গল লতা' বলা চলে না। অবশ্য তিনি গ্রাম্যশব্দও প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার কিছু কিছু বাক্য-বিন্যাস বিশেষ প্রশংসনীয়। যেমন—

(১) দিনে হও ব্রহ্মচারী রাত্রে গলা কাটা।
(২) হাঁড়ির মুখের মত মিলি গেল সরা।
(৩) তোমার তুলনা তুমি তুল্য নাঞি আর।
(৪) পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।
(৫) বিষয়ীর বচনে বিশ্বাস বিধি নয়।
(৬) জলহীন যেন মীন শিবহীন শিবা।
(৭) হাপুতির পুত্র যেন নির্ধনের ধন।
(৮) মরণ অধিক দুঃখ মাগোর বাখান।
(৯) পুরস্ত্রীর প্রগল্‌ভতা বিবাহেতে বাড়ে।
(১০) দারিদ্র্য দোষের পর দোষ নাই আর।
(১১) অনর্থের বীজ অর্থ মত্ততার ঘর।
(১২) নামের নিমিত্তে লোকে নানা কর্ম করে।

এই উক্তিগুলি অতিশয় মূল্যবান প্রাজ্ঞ উক্তি বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য—

৬৩ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রস্তাব

অবশ্য ভারতচন্দ্র এই জাতীয় উক্তিতে অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু রামেশ্বরের অনুপ্রাসগুলি বিশেষ উল্লেখ দাবি করিতে পারে। বাস্তবিক, "তাঁহার কাব্যে এমন অল্প পংক্তি আছে যেখানে অনুপ্রাস নাই।"[৬৪] দুই এক স্থলে অনুপ্রাস ব্যবহার বিশেষ বুদ্ধিকৌশলের পরিচায়ক। যথা—

(১) খঞ্জনগঞ্জন আঁখি অঞ্জন রঞ্জিত।
কটাক্ষে কন্দর্প কত কোটি মুরছিত॥
(২) উজ্জ্বল থাকুক চির কজ্জল সিন্দুর।
(৩) চন্দ্রচূড় চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর॥
(৪) রুক্মিণী সে রঙ্কনাথে শঙ্খ দিতে বলে।
(৫) মটরের মর্দনে নুপুর গেল উড়্যা।
(৬) কর্জ কর কাত্যায়ণী কুবেরের কাছে।

কিংবা,

শাঁখারি সুন্দর কহ শাঁখারি সুন্দর।
কি নাম তোমার কহ কোন গাঁয়ে ঘর॥

প্রভৃতি উক্তি সুখপাঠ্য হইয়াছে। কিন্তু অনুপ্রাস অম্ল-স্বাদের মতো, অতিরিক্ত অনুপ্রাস ব্যবহার কাব্যগুণবর্ধক না হইয়া ক্ষতিকারক হইয়া থাকে। রামেশ্বরের অনুপ্রাস কোন কোন স্থলে হানিকর মুদ্রাদোষে পরিণত হইয়াছে। যত্রতত্র যে কোন প্রসঙ্গে তিনি রাশি রাশি অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়া কাব্য-সৌন্দর্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। যেমন:

(১) ঠাকুরাণীর ঠেকিতে ঠাকুর ঠেক্যা হন।
(২) ভাড়া কর্যা ভড়ক করিয়া ভাল মতে।
(৩) কান্তের লাগিয়া কাঁদ্যা কাকুর্বাদ করে।
(৪) হাদাইলা দুটী ছেল্যা হারাইয়া হরে।
(৫) ঘস্যা গেলে পস্যা যাত্য ঘসিবার নয়।

এই সমস্ত প্রয়োগে কবি শুধু অনুপ্রাসের প্রতি অতি-ভক্তিবশতঃ কৃত্রিম শব্দালঙ্কার লইয়া অনাবশ্যক মাতামাতি করিয়াছেন। অনুপ্রাসের বহর আর একটু অল্প হইলে কাব্যের অলঙ্কার-সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাইত। বঙ্কিমচন্দ্র কবি ঈশ্বর গুপ্তের অনুপ্রাস প্রয়োগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "অনুপ্রাস-যমকের বাহুল্য বড় কষ্টকর। রাখিয়া ঢাকিয়া পরিমিতভাবে ব্যবহার করিতে

৬৪ ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ১১২

পারিলে বড় মিঠে, বাঙ্গালাতেও তাই।......ঈশ্বর গুপ্তের এক-একটি অনুপ্রাস বড় মিঠে......এইরূপ শব্দ ব্যবহারে তিনি অদ্বিতীয়।" রামেশ্বরের অনেক অনুপ্রাস প্রয়োগ সেরূপ নহে, বহুস্থলে তাহা কৃত্রিম শব্দবাহুল্যমাত্র। যাহা হউক, কবি এই কাব্যে প্রচুর বিদ্যাবুদ্ধি, অলঙ্কার কৌশল ও সাংসারিক অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন—অবশ্য স্থানে স্থানে গ্রাম্য অশ্লীলতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেও কবি পিছপাও হন নাই। বরবেশী শিবকে দেখিয়া শাশুড়ীগণের নিজ নিজ জামাতার নিন্দা একটু নূতন বটে, কারণ মঙ্গলকাব্যে রমণীগণের পতিনিন্দা আমাদের এক প্রকার 'গা-সওয়া' হইয়া গিয়াছিল। রামেশ্বরের বর্ণনায় শাশুড়ীগণ জামাতাদের যেভাবে নিন্দা করিয়াছেন, তাহার ভাষা ও বক্তব্যের বিষয়ে রুচির মুখ রক্ষা হয় নাই বটে, কিন্তু গতানুগতিক বর্ণনায় যে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য সঞ্চারিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরিশেষে কবির উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্মমতের উল্লেখ করিয়া রামেশ্বর-প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। পণ্ডিত ও পুরাণপাঠক রামেশ্বর হিন্দুধর্মের এক উদার অসাম্প্রদায়িক মনের অধিকারী ছিলেন। কবি শিব-শক্তির বিষয়ে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কবির অধিকতর নিষ্ঠা ছিল বৈষ্ণবধর্মের প্রতি।[৬৫] কবি কাব্যের নানা স্থানে নিজের বৈষ্ণব ধর্মানুরক্তি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করিয়াছেন। নিম্নে এইরূপ কয়েকছত্র উল্লিখিত হইতেছে :

(১) তোমার মহিমা হর মনোবাক্য অগোচর
হরিভক্তি দেও রামেশ্বরে।

(২) শুদ্ধভাবে হরিনাম সদা যেই স্মরে।
বন্দ তার পাদপদ্ম মস্তক উপরে॥
হরিনাম শৈবশাক্ত বৈষ্ণবের পর।
বিচারিয়া বলিল বৈষ্ণব রামেশ্বর॥

(৩) সর্বশাস্ত্রে সর্বকাজে কাল নিরূপণ।
বিষ্ণু নাম লৈতে সর্বকাল বিলক্ষণ॥
কোন কার্যে কোন কথা কহিবার বেলা।
বিষ্ণু নাম নিতে কেহ কর্য্য নাই হেলা॥

৬৫ ডঃ চক্রবর্তী কবির ধর্মমত সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে, কবি তন্ত্রও অনুশীলন করিয়াছিলেন।

স্বয়ং মহাদেবের মুখ দিয়াও কবি হরিনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করাইয়াছেন। কাব্যের কয়েকস্থলে কবি সপারিষদ চৈতন্যদেবেরও পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত উল্লেখ হইতে কবিকে ধর্মমতে বৈষ্ণব বলিয়াই মনে হইতেছে —যদিও পঞ্চোপাসক সাধারণ হিন্দুর মতো তিনি শৈব ও শাক্তধর্মের প্রতিও যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের ধর্মসংক্রান্ত মতবাদ কতকটা এইরূপ হইলেও যথার্থ নিষ্ঠা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা রামেশ্বরের যতটা ছিল ভারতচন্দ্রের ঠিক ততটা ছিল না। রামেশ্বর ভূস্বামী-সম্প্রদায়ের সান্নিধ্যে ছিলেন, ভারতচন্দ্রের অভিজ্ঞতাও এইরূপ। কিন্তু রায়গুণাকরের মধ্যে নাগরিক মনোবৃত্তি অধিক, রামেশ্বরের মধ্যে তাহার বিপরীত—গ্রামীণ সংস্কারই প্রধান হইয়াছে। রামেশ্বর দেবদেবীর জীবন লইয়া কিছু কিছু রঙ্গকৌতুক করিলেও তাঁহাদের প্রতি কবির বিশ্বাস শিথিল হয় নাই। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মনে দেববিশ্বাস ও নিষ্ঠার গভীরতা কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

যাহা হউক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবি রামেশ্বর কবিপ্রতিভায় নিতান্ত খর্ব ছিলেন না—তাঁহার 'শিবসঙ্কীর্তনই' তাহার প্রমাণ। পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীকে মিলাইয়া, উজ্জ্বলতম অনুপ্রাসের সঙ্গে সরল গ্রাম্য বর্ণনার খাদ মিশাইয়া গ্রামীণ জীবন ও সংস্কারের পটভূমিকায় কবি রামেশ্বর যাহা রচনা করিয়াছেন, একযুগের জীবন্ত সমাজ-চিত্র বলিয়া তাহা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করিবে।

শিবায়নের অন্যান্য কবি ॥ অষ্টাদশ শতাব্দীর শিবসঙ্কীর্তনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রামেশ্বরের সংক্ষিপ্ত কাব্যপরিচয় দেওয়া হইল। কিন্তু এই শতাব্দী এবং তাহার পরবর্তী শতাব্দীতেও শিবদুর্গা বিষয়ক কিছু কিছু পৌরাণিক ও পৌরাণিক-লৌকিক মিশ্রকাব্যকাহিনী পাওয়া গিয়াছে—সেগুলির অধিকাংশই ব্রতকথা ধরনের সংক্ষিপ্ত এবং কাব্যরস বর্জিত অক্ষম রচনা। রামেশ্বরের আদর্শে এবং ভারতচন্দ্রের ছায়াতলে বসিয়া অনেক নিকৃষ্ট প্রতিভার কবি শিবদুর্গা কাহিনী রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ কোন প্রতিভা ছিল না বলিয়া এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর রচনা কদাচিৎ পুঁথির মোড়ক ত্যাগ করিয়া ছাপার বেশ ধারণ করিতে পারিয়াছে।

দ্বিজ কালিদাস, দ্বিজ মণিরাম, দ্বিজ রামচন্দ্র, লক্ষণ, প্রাণচন্দ্র, দ্বিজ ভগীরথ, রাজা পৃথ্বীচন্দ্র, প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ আচার্য—ইঁহাদের কেহ কেহ অষ্টাদশ শতাব্দীতে, কেহ বা হাল আমলেও শিবদুর্গার কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। দ্বিজ কালিদাস 'কালিকাবিলাস' নামে যে কাব্য রচনা করেন, তাহা শিবায়ন শ্রেণীরই কাব্য—যদিও পৌরাণিক অংশ ইহার অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া আছে। কবির কাব্যে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের প্রভাব আছে দেখিয়া ইঁহাকে কেহ কেহ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কবি বলিয়া মনে করেন।[৬৬] অবশ্য ভাষা এত চাঁছাছোলা যে, কবিকে ঊনবিংশ শতাব্দীতেও স্থাপন করা যায়। দ্বিজ কালিদাস সংস্কৃত পুরাণ ও কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' ভালই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কালিকাপুরাণ ও মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনেকাংশ তিনি প্রায় ভাষান্তরের মতো গ্রহণ করিয়াছেন। শুম্ভদৈত্য নিধনের পর তিনি কালিদাসের কুমারসম্ভবের আদর্শে হরপার্বতীর কাহিনী শুরু করিয়াছেন এবং যথারীতি কুরুচিপূর্ণ কাহিনী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কবি যদিও সংস্কৃত কাব্যপুরাণে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, এবং ভাষাতেও মার্জিতভাব অনেকটা রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু শিব ও কুচনী পালায় গ্রাম্য বর্বর মনের পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছেন। এই অংশে তাহার স্থূল, অশিষ্ট ও অভব্য কল্পনা অনেকদূর গড়াইয়াছে—শিবায়নের অন্যান্য কবি এতটা আগাইতে পারেন নাই। এই অংশে দেখা যাইতেছে, কুচনী যুবতীরা শিবের সঙ্গে নির্জলা ও নির্লজ্জ কামোৎসবে মত্ত হইয়াছে। কেহ তাঁহাকে পুষ্পপল্লবে সাজাইল, কেহ তাম্বূল যোগাইল, কেহ মৌতাতের জোগাড় করিল ("গাঁজা ভাঙ্গ হরে করে সমর্পণ"), বেদবতী বলিয়া আর এক রসিকা কুচনী "বাঘাম্বর ধরে হরে ঘরে লয়ে গেল", এবং শিব—

মদনে মাতিয়া বুড়া স্মরার্ণবে ভাসে।
হেসে হেসে কেসে বসে কুচনীর পাশে॥

এখানেই কবি রাশ টানিতে পারিলেন না। ইহার ফল হইল সাংঘাতিক:

হেনমতে রঙ্গভঙ্গ হয় গোপনেতে।
অপরেতে গর্ভিণী হইল অনেকেতে॥

বেদবতীর গর্ভে শিবের যে অবৈধ সন্তানের জন্ম হইল, তাহার নাম

৬৬ ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তীর উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩১৭

পঞ্চানন্দ। ইনি এখনও রাঢ়ের কোন কোন অঞ্চলে শিব বলিয়াই পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

আর যত পুত্র হৈল কুচনী গর্ভেতে।
গঙ্গার রক্ষক হৈল সকলেতে॥

শিবের এই কুচনীবিলাস ও কুচনীনারীতে সন্তান সৃষ্টির কাহিনী রুচি, শ্লীলতা ও ঔচিত্যের দিক হইতে অতিশয় গর্হিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কবির এই ঘৃণ্য ও অশুচি মনোভাব একযুগের অবক্ষয়ী সমাজচিত্রকেই উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে।

নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর 'শিবের মৎস্য ধরার পালা' শীর্ষক আর একটি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে—বলাই বাহুল্য রামেশ্বরের প্রভাবে শিবায়নের মৎস্য-ধরা ও শঙ্খপরা পালা পৃথক ভাবেও অনেক কবি রচনা করিয়াছিলেন। কারণ গ্রাম্য কৃষকসমাজে এই দুই পালার বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল। নিত্যানন্দ চক্রবর্তী নামক রাঢ়ের এক কবি শীতলামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন; 'শিবের মৎস্যধরা পালা' তাঁহার রচিত হওয়াই সম্ভব। কবির বাসস্থান কাশীজোড়া গ্রাম রামেশ্বরের গ্রাম কর্ণগড়ের নিকটবর্তী, তাই বোধহয় তিনি রামেশ্বরের আদর্শে এই পালা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার শীতলামঙ্গলের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ, সুতরাং কবির এই কাব্যও ঐ সময়ের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। তবে তিনি শিবায়নের অন্যান্য পালা রচনা করিয়াছিলেন কিনা বুঝা যাইতেছে না। বর্ণনায় রামেশ্বরের প্রভাব প্রায় প্রতি মুহূর্তেই লক্ষ্য করা যায়—বিশেষত্ববর্জিত এই পালাগানের বিস্তারিত পরিচয় দানের প্রয়োজন নাই। 'বিশ্বকোষে' দ্বিজ ভগীরথের দুইশত বৎসর প্রাচীন কাব্যের উল্লেখ আছে। এই পুঁথি সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। কবির পুঁথি যদি অষ্টাদশ শতাব্দীর হয়, তবে তিনি হয়তো তাহার পূর্ববর্তীও হইতে পারেন। এই সম্পর্কে 'বিশ্বকোষে' বলা হইয়াছে, "গ্রন্থখানিতে তেমন কবিত্ব বা লালিত্যের পরিচয় না থাকিলেও সরল কবিতায় শিবের গুণকীর্তন করা হইয়াছে।" অনুমান ইহাও লৌকিক শিবের কাহিনী।

দ্বিজ মণিরামের 'বৈদ্যনাথ মঙ্গলে' দেওঘরের (বিহার) বৈদ্যনাথ শিবের মহিমা প্রচারিত হইয়াছে—বৈদ্যনাথ-শিবের মহিমা সাধক ও ভক্তের রোগ মুক্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছে। এই মিশ্রধরনের কাব্যে বৈদ্যনাথ-শিবসংক্রান্ত অনেকগুলি কাহিনী থাকিলেও বাঙলার লৌকিক শিবকাহিনীর সঙ্গে ইহার

বিশেষ কোন যোগাযোগ নাই। লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করিয়া এই-রূপ বহু পাঁচালীধরনের স্থানীয় কাব্যকাহিনী রচিত হইয়াছে, যাহার সঙ্গে সাহিত্যের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। তবে 'বৈদ্যনাথমঙ্গল' যে একদা কিছু জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে, কারণ এই কাব্যের একাধিক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। শ্রীহট্ট হইতে অধিকাংশ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ কবিকে শ্রীহট্টবাসী বলিতে চাহেন। তবে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তীয় অঞ্চলের দেবকাহিনী শ্রীহট্টে কি করিয়া জনপ্রিয়তা লাভ করিল তাহাও একপ্রকার বিস্ময়কর ব্যাপার। যাহা হউক কবির ভাষা দৃষ্টে মনে হয় কবি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে বর্তমান ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতেও দুই-একজন কবি (দ্বিজ রামচন্দ্র, রাজা পৃথ্বীচন্দ্র ত্রিবেদী, প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ আচার্য) শিবকাহিনী লিখিয়াছিলেন। পৃথ্বীচন্দ্র ছিলেন পাকুড়ের বিখ্যাত ভূস্বামী—ইঁহারা অবাঙালী হইলেও[৬৭] বাঙলাদেশকেই মাতৃভূমি এবং বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭২৮ শকে (১৮০৬)[৬৮] কবি শিবমহিমাবিষয়ক 'গৌরীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।[৬৯] এই বিরাট কাব্যে পৌরাণিক, কাল্পনিক, লৌকিক—নানাধরনের শিবকাহিনী সংগৃহীত ও গ্রথিত হইয়াছে। ইহাতে পাঁচটি খণ্ড থাকিলেও মোটামুটি দুইভাগই প্রাধান্য পাইয়াছে—একটিতে পৌরাণিক ও লৌকিক ধরনের শিবকাহিনী আছে, আর একটিতে হরগৌরীর পরমভক্ত রাজা জীমূতবাহন মদ্রসেন নামক এক দুরাচার রাজাকে

---

৬৭ কবিরা ছিলেন কনৌজিয়া ত্রিবেদী ব্রাহ্মণ। কবি আত্মপরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন :

গৌড় দেশ মধ্যে বাস গঙ্গার দক্ষিণে।
কান্যকুব্জ বিপ্র হই ত্রিবেদী আখ্যানে॥
পিতৃপূর্ব স্থান নদী সরযু উত্তরে।
এদেশে পৈতৃক বাস আমাড়ি নগরে॥

৬৮ কবি এই ভাবে গ্রন্থ রচনার কাল নির্দেশ করিয়াছেন :

সতেরশ আটাইশ শকে রচিলাম এ পুস্তকে
বারশত ত্রয়োদশ সন।

৬৯ ১৩০৪ সালে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর এই কবি সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছিলেন।

বিনষ্ট করিয়া পৃথিবীর ভার মোচন করেন এবং দেবীর কৃপায় সশরীরে স্বর্গযাত্রা করেন। ইহাতেও "কটিতে বসনমাত্র গাত্র নগ্নবেশ" এবং "তুঙ্গস্তনী নিতম্বিনী" কোচরমণীদের সঙ্গে শিবের বিহার বর্ণিত হইয়াছে। দু'একস্থলে রাধাকৃষ্ণ লীলা বর্ণনায় কবি বেশ সুন্দর ছন্দেরও ব্যবহার করিয়াছেন। যথা :

শুনলো শ্রীমতী কহিয়ে ভারতী
কেন কর এত মান।
ছাড়িয়া কি হরি থাকিবে পাশরি
ধরিতে নারিবে প্রাণ॥
নাগরের দোষ ক্ষমা কর রোষ
মান কর রাই দূরে।
আপন শরীরে যদি দোষ করে
ছাড়িতে কে পারে তারে॥

পৃথ্বীচন্দ্রের এই কাব্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কবি ইহাতে সংক্ষেপে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পরিচয় এবং কবিদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই তালিকায় কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম[১০] কবিচন্দ্র (গোবিন্দমঙ্গল), চৈতন্যমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল (ভারতচন্দ্র), শিবরাম গোস্বামীর ভক্তিলতা, কাশীরামদাসের অষ্টাদশ পর্বভাষা, নিত্যানন্দের মহাভারত, দ্বিজ রঘুনাথদেবের চণ্ডীমঙ্গল পাঁচালী, গঙ্গানারায়ণের ভবানীমঙ্গল প্রভৃতি কবির কাব্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অবশ্য এই তালিকা কোন দিক দিয়াই পূর্ণ নহে, তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সাধারণ সমাজে কোন্ কোন্ পুরাতন ধরনের কাব্যের প্রচার ছিল, তাহা ইহা হইতে বুঝা যাইবে।

দ্বিজ রামচন্দ্রের 'হরপার্বতীমঙ্গল' ১৮৪০ খ্রী: অব্দের কাছাকাছি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়—সুতরাং পুঁথি-সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাব্যের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু প্রণিধানযোগ্য যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের দিকে যখন কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া ছাপাখানার বান ডাকিয়াছিল, নানা সাময়িকপত্রে আধুনিকতার নানা ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিতেছিল, তখনও কেহ কেহ এইরূপ পুরাতন আদর্শকে কোনও প্রকারে

---

১০ তিনি কিন্তু মনসামঙ্গলের কোন কবির নাম করেন নাই—শুধু বলিয়াছেন, "মনসামঙ্গল ভাষা হইল প্রকাশ"।

আঁকড়াইয়া ধরিয়া নবীনের তরঙ্গাঘাত সামলাইতেছিলেন। দ্বিজ রামচন্দ্র সেই ধরনের কবি। তিনি কলিকাতার নিকটেই বাস করিতেন—আধুনিকতার জোয়ার নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—তথাপি পুরাতন আদর্শকেই কাব্য রচনায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃতের কালিদাস এবং বাংলার মুকুন্দরাম, রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্রের রত্নভাণ্ডারে হস্তপ্রসারণ করিয়া তিনিও পৌরাণিক ও লৌকিক শিবের কাহিনী সংমিশ্রিত করিয়া 'হরপার্বতী-মঙ্গল' রচনা করেন। ভাষায় তাঁহার কিঞ্চিৎ দক্ষতা ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না—ভারতচন্দ্রের অনুকরণে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। যথা :

তোমার রূপে সুধা কূপে
বন করেছে আলো।
ভস্ম মাথায় সে বুড়াটায়
সাজবে না তো ভালো॥

অথবা,

বাজিল রে রণডঙ্কা।
দগড় দগড় ডিমি বাজয়ে টিমি টিমি
ঘোর রোসণ ঝঙ্কা॥

কিংবা

ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন ভঙ্গা।
কুলু কুলু কুলু মস্তকে গঙ্গা॥
ধ্বক ধ্বক ধ্বক ললাটে বহ্নি।
শশধর ঊর্ধ্বে উদয় অহ্নি॥

এই ছন্দকৌশল ভারতচন্দ্রের অনুকরণ হইলেও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

মধ্যযুগে মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলের প্রারম্ভভাগে এবং অভ্যন্তরেও শিবায়ন কাহিনীর অনেকটা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। কবিগণ মনসা ও চণ্ডীর মাহাত্ম্য রচনা করিতে বসিলেও ভোলা-মহেশ্বরকে ভুলিতে পারেন নাই। সহদেব চক্রবর্তী ধর্মপুরাণের অনুরূপ 'অনিলপুরাণ' রচনা করিলেও গ্রামীণ শিব-কাহিনীকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়াছেন। রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণেও শিবের লৌকিক প্রসঙ্গ অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে।

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর শিবায়ন কাব্যের পরিচয় প্রসঙ্গে দেখা গেল, পৌরাণিক ও লৌকিক শিবকে কেন্দ্র করিয়া অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালে অনেকগুলি কাব্য ও ব্রত-পাঁচালী রচিত হইলেও, একমাত্র রামেশ্বরকে

ছাড়িয়া দিলে আর কাহারও মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। পৌরাণিক অংশে তাঁহাদের কৃতিত্ব নাই বলিলেই চলে; শিবপুরাণ, দেবীভাগবত, কালিদাসের কুমারসম্ভবের ঘটনাবস্তুতেই ইঁহারা দাগা বুলাইয়াছেন। কিন্তু লৌকিক অংশে, বিশেষতঃ শিবের দারিদ্র্য-বিড়ম্বিত দাম্পত্যজীবন, চাষপালা ও শঙ্খপরা পালায় কবিগণ কলকণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন এবং অনেক সময়েই শ্লীলতা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছেন—শিবকাহিনীর বর্ণিত বিষয় এবং তদানীন্তন সামাজিক আবহাওয়াই তাহার প্রধান কারণ। সংস্কৃতে রচিত শিবপুরাণগুলিতেও রুচির শুচিতা সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই। যাহা হউক দরিদ্র বাঙালীর সংসারযাত্রার জীবন্ত চিত্র শিবায়ন কাব্যগুলির পটভূমিকাস্বরূপ হইয়াছে—এইটুকুর জন্যই কাব্যগুলির কথঞ্চিৎ মূল্য।

ধর্মমঙ্গল কাব্য ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্ততঃ দশজন কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়া রাঢ়ে ধর্মপূজা প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ মাহিষ্য, কেহ বা অন্য কোন সম্প্রদায়ভুক্ত। এই শতাব্দীতে ধর্মঠাকুর আর ডোমপণ্ডিতের দেবতা নহেন, উচ্চশ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণগণও দেবতার স্বপ্নাদেশ-ক্রমে কাব্যকাহিনী লিখিয়া ধন্য হইয়াছেন। ঘনরাম চক্রবর্তী ও মাণিক গাঙ্গুলী—অষ্টাদশ শতাব্দীর এই দুইজন কবি ধর্মঠাকুরের কাহিনী ও মহিমা বর্ণনায় কথঞ্চিৎ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, জনসাধারণের মধ্যে এই কাব্যদুইটি বেশ প্রচারলাভও করিয়াছিল। ঘনরাম সর্বপ্রথম মুদ্রণসৌভাগ্য লাভ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান যুগে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন—যদিও সপ্তদশ শতাব্দীর রূপরাম তাঁহার কাব্যে অধিকতর প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ধর্মমঙ্গলের আরও কয়েকজন কবি (রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যা, নরসিংহ বসু, প্রভুরাম, হৃদয়রাম সাউ, কবিচন্দ্র নিধিরাম, রামকান্ত, সহদেব চক্রবর্তী প্রভৃতি) অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া যে কয়খানা ধর্মমঙ্গলের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, গুণগত উৎকর্ষে তাহার মান বিশেষ উচ্চ নহে। এই কাব্যে প্রচুর যুদ্ধবিগ্রহ, রোমান্স ও এ্যাডভেঞ্চার থাকিলেও প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভার অভাবে এই শাখাটি একেবারে মাটি হইয়া গিয়াছে। সকলেই

স্বপ্নাদেশের গতানুগতিক ছড়া ফাঁদিয়া কাব্য রচনায় অগ্রসর হইয়াছেন, একই রীতিতে আত্মকথা বর্ণনায় অগ্রসর হইয়াছেন, লাউসেনের গল্প বলিয়াছেন। ক্লান্তিকর গতানুগতিক বর্ণনা প্রায় সমস্ত কাব্যেই লবণহীন বিস্বাদ ব্যঞ্জন সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে নিদ্রাকর্ষক একঘেয়ে বর্ণনায় কাব্য গুরুতর কলেবর লাভ করিয়া পাঠকের শিরে গুরুভারের মতো জাঁকিয়া বসিয়াছে। যাহা হউক, এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

ঘনরাম চক্রবর্তী॥ অষ্টাদশ শতাব্দীর শক্তিশালী কবি ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিচিত। রূপরাম পূর্ব শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গলের কবিরূপে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিলেও ঘনরামই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কলিকাতার ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়া শিক্ষিত সমাজে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। আধুনিক যুগের বাঙালীসমাজ তাঁহার কাব্য হইতেই ধর্মমঙ্গলকাব্যের নূতনত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই শাখার অন্যান্য শক্তিশালী কবি অপেক্ষা ঘনরাম অধিকতর ভাগ্যবান, কারণ ধর্মমঙ্গলের কবিদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মার্জিতরুচির নাগরিক সমাজে পরিচিত হন। রামেশ্বর, ঘনরাম ও ভারতচন্দ্র—অষ্টাদশ শতাব্দীর এই তিনজন মঙ্গলকাব্যের কবি এই শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যকে তুচ্ছতার অগৌরব হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁহার ধর্মমঙ্গলে যৎসামান্য আত্মপরিচয় দিয়াছেন। যেখানে ধর্মমঙ্গলের অন্যান্য কবি আত্মজীবনী বর্ণনা প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ নীরস বর্ণনায় মত্ত হইয়াছেন, সেখানে ঘনরামের নিজের সম্পর্কে স্বল্পভাষিতা কিছু বিস্ময়কর বটে। অবশ্য তাঁহার আত্মকথা-সংবলিত একটি পুঁথি কোন এক ধর্মমঙ্গল গায়কের নিকট পাওয়া গিয়াছে। ডঃ সুকুমার সেন নাড়গাঁ নিবাসী অমূল্যচরণ পণ্ডিত নামক ধর্মমঙ্গলের এক গায়েনের নিকট "ঘনরামের আত্ম-কাহিনীর মর্মাংশ" পাইয়াছেন।[৭১] সেই 'মর্মাংশে' দেখা যাইতেছে, ঘনরাম ধর্মমঙ্গলের অন্যান্য কবিদের মতো মস্ত বড় এক আত্মকাহিনী ফাঁদিয়া-ছিলেন। এই আত্মকাহিনী হাস্যকর ও অসঙ্গতিপূর্ণ—অপ্রাসঙ্গিকতায় অর্থ-

৭১ ডঃ সুকুমার সেন, বা. সা. ইতি.—১ম (অপরার্ধ), পৃ. ১৮১

হীন। এই 'মর্মাংশ' অনুসারে, ঘনরাম এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে টোলে পড়াশুনা করিতেন। একদিন ব্রাহ্মণের জন্য পূজার ফুল তুলিতে গিয়া তাঁহার পায়ে বেগুনের কাঁটা ফুটিয়া যায়, পায়ে হাত দিয়া কাঁটা বাহির করিয়া ফেলিলে হাতে পা ঠেকিয়া যাইবে, সুতরাং কিশোর ঘনরাম কি করিয়া নিজ পা হইতে কাঁটা বাহির করিবেন? তাই পায়ে কাঁটা লইয়াই তিনি ফুল তুলিয়া আনিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণঠাকুর পূজা করিতে গিয়া দেখেন বিগ্রহের পায়ের তলাতেও সেই কাঁটা ফুটিয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের ইষ্টদেবতা পড়ুয়া ঘনরামকেই কৃপা করিয়া তাঁহার ব্যথার অংশ গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া ব্রাহ্মণঠাকুর বিগ্রহের প্রতি অভিমানে ঘর ছাড়িয়া পুরীধামে যাত্রা করিলেন। পথে গাছতলায় ঘুমাইয়া পড়িয়া তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে তাঁহাকে পুরীর পথ জিজ্ঞাসা করিতেছে—ব্রাহ্মণ নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহাদের পথ দেখাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে আর একটি ছেলে আসিয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার দাদাবৌদিদিকে সেই পথে তিনি যাইতে দেখিয়াছেন কিনা। ব্রাহ্মণ তাহার প্রশ্নের জবাব দিলেন। পরে গাছ হইতে এক হনুমান লাফাইয়া পড়িল। যখন সে জানিতে পারিল, ব্রাহ্মণও পুরীধামের যাত্রী, তখন সে ব্রাহ্মণের গালে চড় কষাইয়া দিয়া বলিল যে, আগে যে দুইজন চলিয়া গেল, তাহারা রামসীতা, আর শেষের জন লক্ষ্মণ—ব্রাহ্মণ তাঁহাদের চিনিতেই পারেন নাই। হনুমান বলিল, রাম-সীতা-লক্ষ্মণকে চিনিতে পারিলে না, তুমি আবার পুরী যাইবে? তখন লজ্জিত ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরিয়া ইষ্টদেবতার পূজায় মন দিলেন এবং ছাত্র ঘনরামকে রামায়ণ লিখিতে বলিলেন। ঘনরাম গুরুর আদেশানুসারে খানিকটা রামায়ণ লিখিয়া ফেলিলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখেন, রাম-বন্দনার স্থলে ধর্মের বন্দনা লেখা রহিয়াছে। তিনি তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পুনরায় রামবন্দনা লিখিলেন। তখন রাত্রে স্বয়ং রামচন্দ্র কবিকে স্বপ্ন দিলেন যে রামায়ণ তো অনেকেই লিখিয়াছেন, কবি যেন ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া রামভক্ত ঘনরাম ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় সংগৃহীত ঘনরামের আত্মকাহিনী বিষয়ক উল্লিখিত অংশটির যাথার্থ্য ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে।

কারণ উক্ত বিবরণীতে ভট্টাচার্যের কাহিনীর সঙ্গে ঘনরামের ব্যক্তিগত জীবনের যোগাযোগ নাই বলিলেই চলে, এই কাহিনীতে ভট্টাচার্যের আখ্যানই প্রধান। কাহিনীটির ধরনধারণ দেখিয়া মনে হইতেছে, ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের কোন এক গায়েন ধর্মমঙ্গলের অন্য কবিদের আত্মকথার অনুকরণে এই অংশ বানাইয়া লইয়াছেন ; কিন্তু কাঁচা হাতের ছাপ ঢাকিতে পারেন নাই। এই ধরনের অসঙ্গতিপূর্ণ রচনা কদাপি ঘনরামের পরিপক্ক লেখনী হইতে বাহির হইতে পারে না। আরও নানা কারণে ডঃ সেন সংগৃহীত এই আত্মকাহিনীর যাথার্থ্য বিষয়ে আমাদের সন্দেহ হইতেছে। ডঃ সেন মাত্র একজন ঘনরাম-ধর্মমঙ্গলের গায়েনের নিকট এই বর্ণনা পাইয়া-ছিলেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে সেই বর্ণনা হইতে কোন দৃষ্টান্ত-উদাহরণ উল্লেখ করেন নাই। করিলে উহা যথার্থই ঘনরামের রচনা কিনা তাহা বিচারের সুযোগ পাওয়া যাইত। এই রচনাটুকু যে গায়েন মহাশয়ের শ্রীহস্তের কার-সাজি নহে, তাহাই বা কে বলিল ? এরূপ অনৃতাচার বাংলা পুঁথিতে তো বিরল নহে। উপরন্তু ঘনরামের কোন পুঁথিতেই এইরূপ আত্মবিবরণী পাওয়া যায় না।[৭২] কিন্তু ডঃ সেন অনুমান করেন, ঘনরামের মূল পুঁথিতে নাকি এইরূপ আত্মপরিচয় ছিল। গ্রন্থ ছাপিবার সময় প্রকাশকগণ সেই অংশটুকু বাদ দিয়াছেন। কারণ "আধুনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ইংরেজী শিক্ষিতের কাছে অলৌকিক রসাশ্রিত কাহিনী উপহাসের বিষয় হইবে মনে করিয়াই"[৭৩] নাকি প্রথম প্রকাশকেরা এই অংশটুকু বাদ দিয়াছিলেন। ডঃ সেনের এরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ গোটা ধর্মমঙ্গল কাব্যই আদ্যন্ত অলৌকিক রসাশ্রিত—মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের কোন্ কাব্যই বা নহে ? সেখানে উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের অপ্রীতিকর মনে হইতে পারে অনুমান করিয়া ঘনরামের প্রকাশক বাছিয়া বাছিয়া শুধু ঘনরামের আত্মকাহিনীটুকুই বা বাদ

৭২ শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নানা পুঁথি ও ছাপা গ্রন্থ অবলম্বনে ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের যে বৃহৎ সংস্করণ সম্পাদনা করিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যাইতেছে, তিনি বাইশ-তেইশ খানি পুঁথি অবলম্বনে মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ নির্ণয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন পুঁথিতেই ঘনরামের আত্মকাহিনী পান নাই। তাঁহার মন্তব্য : "ঘনরামের কাব্যে আত্মপরিচয় পাওয়া যায় না। যে কয়টি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে সেগুলিতেও নাই, বা মুদ্রিত গ্রন্থে নাই।" (পৃ. ৷/০)

৭৩ ডঃ সেন—বা, সা, ইতি, ১ম, অপরার্ধ, পৃ. ১৮০

দিবেন কেন?[৭৪] কোন পুঁথিতে ঘনরামের আত্মকাহিনী নাই, মুদ্রিত গ্রন্থেও নাই। ডঃ সেন একজন আধুনিক গায়েনের নিকট হইতে প্রাপ্ত অলীক জল্পনাকে ঘনরামের আত্মকথার মর্যাদা দিতে চাহিয়াছেন। এইজন্য ইহাকে ঘনরামের যথার্থ আত্মকাহিনী বলিয়া গ্রহণ করা আপাতত সম্ভব নহে।

ঘনরাম কাব্যের মধ্যে নিজের সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য দিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী মোটামুটি উদ্ধার করা যায়। বর্ধমান জেলায় দামোদর নদের তীরে কইয়ড় পরগণার কুকুড়া-কৃষ্ণপুর গ্রামে কবির জন্ম হয়।[৭৫] কবি বোধহয় বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের দ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন, কারণ কবি অনেকস্থলে কীর্তিচন্দ্রের প্রশংসা করিয়াছেন। তবে তিনি কীর্তিচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে তিনি কাব্যে তাহার উল্লেখ করিতেন।[৭৬] কবির পিতার নাম গৌরীকান্ত, মাতা—সীতা,[৭৭] পিতামহের নাম ধনঞ্জয়। তাঁহার চারিপুত্রের নাম—

---

৭৪ শ্রীপীযুষকান্তি মহাপাত্র ঘনরামের কাব্যসম্পাদনা কালে ডঃ সেন সংগৃহীত তথ্যকেই বিনা প্রমাণে গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। নিঃসংশয় হইবার জন্য তাঁহার আরও প্রমাণতথ্য সংগ্রহ করা উচিত ছিল।

৭৫ "কইয়ড় পরগণা বাটী কৃষ্ণপুর গ্রাম।"

৭৬ অখিলে বিখ্যাত কীর্তি মহারাজ চক্রবর্তী
কীর্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥

৭৭ তাঁহার মাতার নাম সম্পর্কেও ডঃ সেনের মত গ্রহণযোগ্য নহে। তাঁহার মতে "ঘনরামের মাতার নাম সীতা নয়, মহাদেবী।...সীতা নাম তখন চলিত না, কেন না সীতার মতো দুঃখিনী হইবে ইহা তখন কোন মাতাপিতা ভাবিতে পারিত না" (বা. সা. ইতি. ১ম, অপরার্ধ, পাদটীকা, পৃ. ১৭৯)। ডঃ সেনের এ মন্তব্য মানিতে পারা যায় না। সে যুগে কেহ কন্যার নাম সীতা রাখিত না, ইহার সবচেয়ে প্রতিকূল দৃষ্টান্ত—অদ্বৈত গৃহিণীর নাম ছিল সীতাদেবী। আর তা' ছাড়া ঘনরাম কাব্যে মাতার নাম সীতাই বলিয়াছেন। যথা—

কৌকুসাবী অবতংসে কুশধ্বজ রাজবংশে
দ্বিজ গঙ্গাহরি পুণ্যবান।
তাঁহার দুহিতা সীতা সত্যবতী পতিব্রতা
তাঁর সুত ঘনরাম গান॥
(শ্রীমহাপাত্রের সংস্করণ, পৃ. ৫১৬)

রামরাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ, রাম[illegible]।[৭৮] বহুস্থলে ভণিতায় তিনি রামভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। যথা:

(১) আশীর্ব্বাদ কর যেন [illegible]রের মতি।
(২) ঘনরাম ভণে যার না[illegible]র।
(৩) প্রভু যার কৌশল্যান[illegible]পাবান।
(৪) দুষ্পার সংসার ঘোর [illegible] সাগর।
নিস্তার পাইবে সুখে [illegible]নর॥

গ্রন্থমধ্যেও কবি নানাস্থানে রামায়ণ-কা[illegible]নীর নানা প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন।[৭৯] অবশ্য ভাগবত হইতেও তিনি অনেক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু তরুণ বীর লাউসেনের সঙ্গে তিনি বীরকিশোর শ্রীরামচন্দ্রের অধিকতর সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছেন। যাহা হউক, তিনি যে রামভক্ত ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নানা দেবদেবীর সঙ্গে কবি চৈতন্যদেবকেও ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। গুরুর পদবন্দনা করিয়া কবি কাব্যরচনায় অগ্রসর হইয়াছেন—বোধহয় গুরুর নির্দেশেই তিনি ধর্ম-মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।[৮০]

অতঃপর ডঃ সেন বোধহয় স্বীকার করিবেন যে, ঘনরামের মাতার নাম 'সীতা'—মহাদেবী নহে। মহাদেবী, সত্যবতী, পতিব্রতা—এ সমস্ত ভক্তিমান পুত্র কর্তৃক সংযোজিত মাতার বিশেষণ। মাতার নাম মহাদেবী হইলে কবি এখানে নিশ্চয় তাহার উল্লেখ করিতেন।

৭৮ মাতা ও পিতার উল্লেখ:

মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবি কান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা॥

কবির পিতামহের উল্লেখ—

চক্রবর্তী ধনঞ্জয় তাঁহার তনয়বর
কবিবর শঙ্কর প্রধান।
তদনুজ গৌরীকান্ত কাব্যসিন্ধু শান্ত দান্ত
তত্তনুজ ঘনরাম গান॥

৭৯ শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের পৃ. ৪৶০—৪।৵০ দ্রষ্টব্য।

৮০ কবি কোথাও নিজ গুরুর নাম করেন নাই। একস্থানে কবি এইভাবে ভণিতা দিয়াছেন—"শ্রীরামদাসের দাস দ্বিজ ঘনরাম"। ইহাতে ডঃ সেন অনুমান করিয়াছেন, "ঘনরামের গুরুর নাম শ্রীরামদাস ছিল" (বা. সা. ইতি.—১ম, অপরার্ধ, পৃ. ১৮০)। কিন্তু উক্ত ভণিতা হইতে রামভক্ত ঘনরামের গুরুর নাম পাওয়া যায় না। 'শ্রীরামদাসের দাস'—ইহা ঘনরামের রামভক্তিবাচক বিশেষণ মাত্র।

কবির গুরু বোধ হয় কবিকে 'কবিরত্ন' উপাধি দিয়াছিলেন। কারণ কবি বলিয়াছেন :

নিজ গুণে করি যত্ন নাম দিলা কবিরত্ন
কৃপাময় করুণা আধান।

সন তারিখ উল্লেখ করিয়া কবি কাব্যসমাপন করিয়াছেন :

সঙ্গীত আরম্ভ কাল নাইক স্মরণ।
শুন সবে যে কালে হইল সমাপন॥
শক লিখে রামগুণ রসসুধাকর।
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর॥
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।
যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি॥

ইহা হইতে পুরাতন পঞ্জিকার হিসাব অনুসারে ১৬৩৩ শকাব্দ (১৭১১ খ্রীঃ অঃ) পাওয়া যায়। ঐ সনের ১লা অগ্রহায়ণ এই কাব্য সমাপ্ত হয়।[৮১] কিন্তু বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই কাব্য ১৭১১ খ্রীঃ অব্দের ৮ই অগ্রহায়ণ সমাপ্ত হয়।[৮২] সামান্য তারিখের গোলমাল থাকিলেও ঘনরাম যে এই কাব্য ১৭১১ খ্রীঃ অব্দের শেষে সমাপ্ত করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ঘনরাম নানা পুরাণ-উপপুরাণ ও কাব্য কাহিনী হইতে গল্প উপমা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ইহার আয়তন পরিপুষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে রাঢ়ে অন্ততঃ দুই শত বৎসর ধরিয়া একাধিক কবি ধর্মমঙ্গল আখ্যান লিখিয়াছিলেন। অনেক দিন ধরিয়া ধর্মমঙ্গলের দুইটি কাহিনী (হরিশ্চন্দ্র ও লাউসেন) জনসমাজে ও লোকসাহিত্যে পরিচিত ছিল। ঘনরাম সেই দুইটি কাহিনীকে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া পাঁচালী কাব্যকে প্রায় মহাকাব্যোচিত বিশালতা দিতে চাহিয়াছেন। চব্বিশ পালায় বিভক্ত এই বিরাট কাব্য মহাকাব্যেরই উপযুক্ত। সংক্ষেপে কাহিনীর ধারাটি এইরূপ :

(১) স্থাপনা পালা (দেবদেবী বন্দনা, অম্বুবতী অপ্সরীর তালভঙ্গ, ধর্মপূজা প্রচারে মর্ত্যধামে রঞ্জাবতীরূপে জন্ম), (২) ঢেকুর পালা (ইছাই

৮১ প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩৬

৮২ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণের ভূমিকা পৃ. ।৶৹

ঘোষের কাহিনী), (৩) কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিবাহ, (৪) হরিশ্চন্দ্র পালায় হরিশ্চন্দ্র ও লুইচন্দ্রের কাহিনী, (৫) রঞ্জাবতীর শালে ভর দিয়া ধর্মঠাকুরের নিকট পুত্রবর লাভ, (৬) লাউসেনের জন্ম, (৭) আখড়া পালায় দেবী চণ্ডিকা কর্তৃক লাউসেনকে পরীক্ষা, (৮) ফলানির্মাণ পালায় দেবী-প্রদত্ত অস্ত্রের দ্বারা ফলা নির্মাণ, (৯) গৌড়যাত্রা পালায় লাউসেন ও কর্পূরের গৌড়যাত্রা, (১০) কামদল পালায় লাউসেন কর্তৃক কামদল বাঘ বধ, (১১) জামতি পালায় অসতী নারীদের কবল হইতে লাউসেনের আত্মরক্ষা, (১২) গোলাহাট পালায় গণিকা সুরিক্ষার কবল হইতে লাউসেনের উদ্ধার, (১৩) হস্তীবধ পালায় লাউসেন কর্তৃক হস্তী বধ, (১৪) কাঙুর যাত্রা পালায় লাউসেনের কামরূপ যাত্রা, (১৫) কামরূপ যুদ্ধ পালায় লাউসেনের কামরূপ রাজার সঙ্গে যুদ্ধ এবং রাজকন্যা কলিঙ্গার সঙ্গে বিবাহ, (১৬) কানাড়া স্বয়ম্বর পালায় রাজা হরিপালের কন্যা কানাড়ার সঙ্গে লাউসেনের বিবাহ, (১৭) কানাড়া বিবাহ পালায় লাউসেন কর্তৃক লোহার গণ্ডার দ্বিখণ্ডিতকরণ, (১৮) মায়ামুণ্ড পালায় মহামদের কুটিল চক্রান্তে লাউসেন-পত্নীদিগকে বিভ্রান্ত করার কাহিনী, (১৯) ইছাই বধ পালায় লাউসেন কর্তৃক ইছাই ঘোষ নিধন, (২০) আঘোর বাদল পালায় গৌড়ে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি, (২১) পশ্চিমে উদয় পালায় লাউসেন কর্তৃক পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখাইবার আয়োজন, (২২) মহামদ কর্তৃক লাউসেনের রাজধানী আক্রমণ করিতে আসিয়া যথাযোগ্য শাস্তি পাইয়া পলায়ন (২৩) পশ্চিমে উদয় পালায় কঠোর সাধনার দ্বারা লাউসেনের অসাধ্যসাধন, (২৪) স্বর্গারোহণ পালায় লাউসেনের স্বর্গারোহণ এবং মহামদের উচিত শাস্তি লাভ —এইস্থানে কাহিনী সমাপ্ত হইয়াছে।

এই বিরাট কাব্যে (ছাপার অক্ষরে প্রায় বাইশ হাজার পংক্তি) ধর্মের সেবিকা রঞ্জাবতী (শাপভ্রষ্ট অপ্সরা অম্বুবতী), তাঁহার পুত্র ধর্মঠাকুরের অনুগৃহীত লাউসেন, লাউসেনের বীরত্বব্যঞ্জক নানা কাহিনী এবং ধর্মের কৃপায় অসাধ্য সাধন—প্রভৃতি ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে কবি রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত হইতে নানা গল্পকাহিনী পুরাণের ছাঁচেই গ্রহণ করিয়াছেন। কাহিনীটি বিশ্লেষণ করিলে মাতা ও পুত্র উভয়েরই প্রাধান্য এবং ধর্মপূজা প্রবর্তনে উভয়েরই কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যাইবে। কিন্তু ধর্মমঙ্গলের

অন্যান্য কবিদের মতো ঘনরামের কাব্যে ধর্মের পূজা প্রচার অপেক্ষা রঞ্জার কৃচ্ছ্রসাধন এবং লাউসেনের অদ্ভুত বীরত্বকাহিনী অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐতিহাসিক নামধামের সঙ্গে অল্পস্বল্প ঐক্য সাদৃশ্য রাখিয়া এবং ধর্মমঙ্গলের পুরাতন ধারার অনুসরণ করিয়া ঘনরাম এই কাব্যে সত্যই বীররসাত্মক মহাকাব্যের বিশাল সৌধ রচনার চেষ্টা করিয়াছেন। রঞ্জার বাৎসল্য-ব্যাকুলতা, লাউসেনের অদ্ভুত বাহুবল, মহামদের প্রচণ্ড বৈরিতা, গৌড়েশ্বরের দোলাচল মনোবৃত্তি, ধর্মের কৃপায় লাউসেনের অলৌকিক অনৈসর্গিক কৃতিত্ব প্রদর্শন—এ সমস্ত কাহিনীই কবি বেশ দীর্ঘ আকারেই বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে দুই-তিনটি বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে একটু অদ্ভুত বটে। তন্মধ্যে নারীর বীরত্ব বর্ণনায় কবি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—অথচ প্রচণ্ড বীরত্ব নারীদের কোমলতা, লাবণ্য ও প্রেমানুরাগ আচ্ছন্ন করে নাই। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের বীরাঙ্গনা চরিত্র সৃষ্টি ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিরই একটা বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। ঘনরাম ইহাতে অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আর একটি বর্ণনায় কবি লাউসেনের বীর্যের সঙ্গে চরিত্র সংযম ও উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। আখড়া ঘরে দেবী যে-ভাবে নব-কিশোর লাউসেনকে ছলিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে মুনিঋষির ও পদস্খলন হইতে পারিত; লাউসেন সে পরীক্ষায় অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইয়াছে। রঙ্গিণী নটীরা রূপের ফাঁদ পাতিয়া তাহাকে ধরিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। অবশ্য চারিত্রিক বিশুদ্ধি বজায় রাখিতে গিয়া নায়ককে বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, কিন্তু তবু তিনি চরিত্রকে কোথাও অবনমিত হইতে দেন নাই। লাউসেনের বাহুবল অপেক্ষা তাঁহার চারিত্রবল ও নৈতিক শুদ্ধাচার অধিকতর প্রশংসা দাবি করিতে পারে। রমণীর মাতৃত্ব, স্ত্রীর পাতিব্রত্য, বীরাঙ্গনার বীরমূর্তি, দেবতার প্রতি ভক্তের একান্ত আত্মসমর্পণ, ক্রুর খলের নষ্টামি,—এ সমস্ত বর্ণনাও কবির রচনাশক্তিকে সুপ্রমাণিত করিয়াছে। ইহার ঘটনাবস্তু, চরিত্রবিন্যাস, মহদাদর্শ, সমুন্নতি, অদ্ভুত অনৈসর্গিকের সঙ্গে বাস্তবের সন্ধি প্রভৃতি বর্ণনায় কবি যেরূপ বিস্তৃত পট ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার রচনাশক্তির বিশেষ প্রশংসা করিতে হইবে—রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্র উভয়ের তুলনায় ঘনরাম কাহিনীর বিশালতা ও চরিত্রবৈচিত্র্যে অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এইজন্য পাঁচালী ঢঙে রচিত

বিরাট কাব্যকে কেহ কেহ মহাকাব্য আখ্যা দিতে চাহেন।[৮৩] ধর্মমঙ্গল, আর পাঁচটা মঙ্গলকাব্যের মতোই অদ্ভুত উদ্ভট বীররসাত্মক কাহিনীপূর্ণ বটে, কিন্তু তাহা কোন দিক দিয়াই মহাকাব্যের সমুন্নতি লাভ করে নাই। ঘনরাম এই বিশাল কাহিনীতে সম্ভব-অসম্ভব—কোন কিছুরই সীমা রক্ষা করেন নাই। তিনি যুদ্ধবিগ্রহের কত অদ্ভুত বর্ণনা দিয়াছেন, দেবতা-মানবের নানা বিস্ময়কর কাহিনী ফাঁদিয়াছেন, কিন্তু মহাকাব্য বচনার মতো প্রতিভা, মানসিক অবস্থা ও সামাজিক পটভূমিকাব অভাব ছিল বলিয়া ঘনরামের এই কাব্য বৃহদায়তন পাঁচালী হইয়াছে, ঘনপিনদ্ধ মহাকাব্য হইতে পাবে নাই। বরং রামায়ণ-মহাভারত পাঁচালী জাতীয় বচনা হইলেও তাহা বাঙালীব চিত্তকে বিশালতাব দিগন্তে লইয়া গিয়াছে—ঘনবামেব ধর্মমঙ্গল কোন দিক দিয়াই সমগ্র বাঙালীর কাব্য হয় নাই। অবশ্য তাঁহাব কাব্যে আদিম মহাকাব্যেব (Primitive epic) বীজ নিহিত থাকিলেও তাহা মহাকাব্যেব মহীরুহে পরিণত হয় নাই। ঘনবাম বাহ্যিক বিস্তাবেব দিকে যতটা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, আভ্যন্তবীণ কল্পনা-সমুন্নতিব প্রতি ততটা গুরুত্ব দিতে পাবেন নাই। Heroic-tales-এর অনুরূপ ইহাতে অনেক খণ্ড খণ্ড কাহিনী থাকিলেও কবি-

৮৩ ডঃ সুকুমাব সেন ধর্মমঙ্গল কাব্য সম্পর্কে বলিয়াছেন, "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মহাকাব্য (Epic) বলিবা যদি কিছু থাকে তবে তাহা ধর্মমঙ্গল" (রূপবামেব ধর্মমঙ্গল, ১ম সংস্কবণ, ভূমিকা, পৃ. ১/০)। এই মন্তব্যেব প্রতিধ্বনি কবিয়া শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্র ঘনরামের ধর্মমঙ্গলকে মহাকাব্য বলিতে চাহেন। তাঁহাব মতে, "সর্বযুগেব, সর্বকালেব, সকল শ্রেণীব মানুষেব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শেব কাহিনী মহাকাব্যে রূপায়িত হয়।... ঘনবামেব ধর্মমঙ্গলে এই লক্ষণগুলি দেখিতে পাওযা যায়। অবশ্য সমগ্রভাবে ধর্মমঙ্গল কাহিনীতেই মহাকাব্যের কাঠামো আছে। ঘনবাম সেই প্রচলিত কাহিনীকে অবলম্বন কবিযাছেন, কিন্তু পৌরাণিক কাঠামোব মধ্যে কাহিনীকে অগ্রসর কবিযা বিশিষ্ট শিল্পরীতিব মাধ্যমে কাহিনীকে তিনি মহাকাব্যের পর্যাযে আনিতে চেষ্টা করিযাছেন।" (পীযূষকান্তি সম্পাদিত ঘনরামেব ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৩৸০—৩৸/০) ইতিপূর্বে এই গ্রন্থেব প্রথম পর্বে ধর্মমঙ্গল অধ্যাযে ধর্মমঙ্গল কাব্যকে কেন মহাকাব্য বলা যায না, সে সম্বন্ধে আমবা আলোচনা করিযাছি, এখানে তাহাব পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্র মহাকাব্যেব লক্ষণ হিসাবে যাহা নির্দেশ করিয়াছেন, ("সর্বযুগের, সর্বকালের, সকল শ্রেণীব মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের কাহিনী") তাহাব কোনটাই ধর্মমঙ্গলে পাওযা যায না। ধর্মমঙ্গলের মধ্যযুগীয গালগল্প সর্বকালের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাব কাহিনী—এইরূপ গৌরবে ধর্মমঙ্গলকে বিভূষিত করা অতি-উচ্ছ্বাসের লক্ষণ।

দৃষ্টির সেই সমগ্র বোধ ছিল না, যাহার দ্বারা সামান্য ব্যাপারও অসামান্য হইয়া উঠিতে পারে। এইজন্য মধ্যযুগীয় এই পাঁচালীকারকে মহাকবির আসনে বসাইয়া গৌরবের ফুলচন্দন দিবার প্রয়োজন নাই। তাই বলিয়া ঘনরামের প্রতিভাকে তুচ্ছ করাও যুক্তিসঙ্গত নহে। ঘটনাবিন্যাসে তাঁহার কৃতিত্ব অল্প নহে। বাস্তব অভিজ্ঞতা, সাংসারিক জ্ঞান, মানব চরিত্র প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ কৌতূহল ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। দুই এক স্থলে আদিরস লইয়া তিনি অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা বাদ দিলে তাঁহার "রচনার বিশেষ গুণ প্রসন্নতা ও ভদ্ররুচি"[৮৪] সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের মতো অনুপ্রাসে তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল, কিন্তু রামেশ্বরের মতো তিনি অনুপ্রাসের ভোজবাজিতে মত্ত হন নাই। মৃদু হাস্যকৌতুক, করুণরস ও বীররসের বর্ণনায় তিনি যে সমসাময়িক অনেক কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সহজ, সরল, অবারিত-গতি অজস্র পয়ার ত্রিপদীতে তিনি যেভাবে কাহিনীটিকে অগ্রবর্তী করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে প্রশংসাই করিতে হইবে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের লিপিকুশলতা তাঁহার ছিল না, মুকুন্দরামের মতো প্রসন্ন জীবন-চিত্র তিনি ততটা ফুটাইতে পারেন নাই, রামেশ্বরের মতো প্রতিদিনের বাস্তব জীবনকেও তিনি কাব্যে জীবন্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার সুদীর্ঘ বর্ণনা বহু স্থলেই ক্লান্তিকর, প্রাণহীন মনে হয়। তাঁহার কাব্যের পরিধি আর একটু সঙ্কুচিত হইলে হয়তো ইহা পরীক্ষার্থীর পাস-বৈতরণীর খেয়া-নৌকা না হইয়া আধুনিক পাঠকেরও রসের ভোজে আহূত হইতে পারিত।

ঘনরাম 'সত্যনারায়ণ সিন্ধু' নামে সত্যনারায়ণের একখানি ক্ষুদ্র পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন।[৮৫] কিন্তু কোন দিক দিয়াই ইহা উল্লেখযোগ্য নহে।

মাণিকরাম গাঙ্গুলি ॥ মাণিকরাম গাঙ্গুলি ধর্মমঙ্গলের আর একজন সুপরিচিত কবি—যদিও তাঁহার আবির্ভাবকাল ও গ্রন্থ রচনার সন-তারিখ লইয়া রীতিমতো বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছে। তাঁহার কাব্যে গ্রন্থ রচনার সন-

---

৮৪ বা. সা. ইতি—১ম (অপরার্ধ), পৃ. ১৮২

৮৫ প্রফুল্লচন্দ্র ভট্টাচার্য ও কালীপদ সিংহ সম্পাদিত, বর্ধমান সাহিত্য সভা প্রকাশিত।

তারিখ নির্দেশক কয়েক ছত্র থাকিলেও লিপিকার প্রমাদে তাহা এমন 'হযবরল' রূপ ধারণ করিয়াছে যে, তাহা হইতে নিশ্চিতরূপে কোন সন তারিখের হদিশ পাওয়া যায় না। বাংলা ১৩১২ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় সাহিত্য পরিষদ হইতে মাণিক গাঙ্গুলির 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' সর্বপ্রথম মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। উহাতে কোন সম্পাদকীয় ভূমিকা ছিল না, গ্রন্থকার ও গ্রন্থরচনাকাল সম্বন্ধেও কোন আলোচনা ছিল না। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'র ভূমিকায় মাণিক গাঙ্গুলির কাব্যের পুঁথি সম্বন্ধে কিছু তথ্য দিয়াছিলেন। সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে' কাব্য রচনাকাল-জ্ঞাপক যে সন-তারিখ ছিল, তাহা লইয়া আধুনিক যুগে নানা বাদানুবাদ সৃষ্টি হইয়াছে। পরে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এই বিষয়ে কিছু কিছু নির্ভরযোগ্য আলোচনা করিয়াছিলেন।

সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত কাব্যটি মাত্র একখানি পুঁথি অবলম্বনে মুদ্রিত হইয়াছিল, এখন আবার সে পুঁথিখানিরও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।[৮৬] ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল বর্ধমান সাহিত্যসভার জন্য যে পুঁথি সংগ্রহ করেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল সেই পুঁথির অবিকল মুদ্রণ। সাহিত্য পরিষদ সংস্করণে স্বর্গারোহণ পালায় কাব্য রচনার সঙ্কেতস্বরূপ এই কয় ছত্র পাওয়া যায়:

সাকেরি ও সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধ সহ যুগ দক্ষে যোগাতার সনে॥
বারে হল নন্দীপুত্র তিথি অন্যাক্তিত।
সর্ব্বারি সরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল গীত॥

বলা বাহুল্য এই কয় ছত্র হইতে সন-তারিখ সম্বন্ধে কোন হদিশ পাওয়া যায় না। লিপিকার নকল করিবার সময় গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া ইহার 'মাথামুণ্ডু' বুঝা যায় না। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কবির বর্তমান বংশধরের নিকট কাব্যের যে নকল পাইয়াছিলেন, তাহাতে কাল-নির্দেশক এই কয় ছত্র আছে:

শাকে রীত্তু (তু) সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সির্ধ সহ জোগ দক্ষে যোগ তার সনে॥

---

৮৬ ব. সা. প. প. ১৩১৩

বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত।
সর্ব্বরি সরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল্য গীত ॥

ইহা হইতে কিয়ৎপরিমাণে রচনাকাল নির্ধারণ করা যায়। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সংগৃহীত সাহিত্যসভার পুঁথিতে শ্লোকটি এইভাবে পাওয়া যাইতেছে ঃ

শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধ স [হ যুগ প] ক্ষে যোগ তার সনে ॥
বারে হল মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত।
শর্ব্বরী সরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল গীত ॥

এই সঙ্কেতের সরলার্থ নির্ধারণ করা কিঞ্চিৎ দুরূহ। দীনেশচন্দ্র ইহা হইতে এইভাবে সন-তারিখ বাহির করিয়াছেন—

ঋতু—৬, বেদ—৪, সমুদ্র—৭ = ৬৪৭
সিদ্ধি—৮, যুগ—২, পক্ষ—২ = ৮২২
১৪৬৯ শকাব্দ[৮৭]

অর্থাৎ ১৪৬৯ শকাব্দে (১৫৪৭ খ্রীঃ অঃ) এই কাব্য রচিত হয়। কিন্তু কাব্যের ভাষা এত আধুনিক ও অর্বাচীনত্বের লক্ষণযুক্ত যে, মাণিকরামকে ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত বলিয়া মনে হয় না। তাই যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ গণনার দ্বারা উক্ত চারি ছত্র হইতে ১৭০৩ শক বা ১৭৮১ খ্রীঃ অব্দ পাইয়াছেন। তিনি কবির বংশধরদের নিকট কবির বংশপরিচয় সংগ্রহ করিয়া দেখিলেন যে, গদাধর গাঙ্গুলির পুত্র মাণিকরাম—তাঁহার চারি পুত্র। গদাধর গাঙ্গুলির আর এক ভ্রাতার পুত্র গঙ্গাধর। তাঁহার পুত্র অক্ষয়, তাঁহার পুত্র শ্রীরামপদ। ১৩১৫ সালেও শ্রীরামপদ জীবিত ছিলেন।[৮৮] তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় পঞ্চাশ। শ্রীরামপদ গদাধর গাঙ্গুলি হইতে অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। সাধারণতঃ প্রতি তিনপুরুষে একশত বৎসর ধরা হইয়া থাকে। তাহা হইলে এই হিসাবমতে মাণিকরামকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাওয়া যাইবে। যোগেশচন্দ্রের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ বিভূতিভূষণ দত্ত।[৮৯] তিনি উক্ত চারি ছত্র হইতে

৮৭ কিন্তু 'যুগ' বলিতে দীনেশচন্দ্র '২' ধরিলেন কেন? যুগকে '৪' ধরিলে ইহা হইতে ১৪৮৯ শক (১৫৬৭ খ্রীঃ অঃ) পাওয়া যাইবে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ও (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৬১৩) এইভাবে সন নির্দেশ করিয়াছেন।

৮৮ ব. সা. প. প. ১৩১৫

৮৯ ব. সা. প. প. ১৩৩৫

১৪৮৯ শক (১৫৬৭ খ্রীঃ অঃ) অথবা ১৫২৯ শক (১৬০৭ খ্রীঃ অঃ) পাইয়াছিলেন। তখন যোগেশচন্দ্র পুনরায় সতর্কতার সহিত গণনা করিয়া উহা হইতে ১৭০৩ শকাব্দ পাইলেন।[৯০] তাঁহার মতে ১৭০৩ শকে (১৭৮১ খ্রীঃ অঃ) ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার মাণিকরাম গ্রন্থ শেষ করেন।[৯১] বিদ্যানিধি মহাশয় সিদ্ধকে ২৪ ধরিয়াছেন, কিন্তু মধ্যযুগে চৌরাশি সিদ্ধার কথা সুবিদিত ছিল। সুতরাং ২৪-এর স্থলে ৮৪ ধরাই যুক্তিসঙ্গত। তাহা হইলে এই সন হইবে ১৭০৯ শক বা ১৭৮৭ খ্রীঃ অব্দ। কবি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন, তাহার আর একটি প্রমাণ—কাব্যে বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের উল্লেখ :

বিষ্ণুপুরের বন্দিব শ্রীমদনমোহনে।
পূর্ব্বেতে আছিলা প্রভু বিপ্রের সদনে ॥

১৬৯৪ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে বিষ্ণুপুরে মদনমোহনের বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং কবির কাব্য নিশ্চয়ই সপ্তদশ শতাব্দীর পরবর্তী রচনা। কবি আর একস্থলে ময়ূরভট্ট ও রূপরামের বন্দনা করিয়াছেন :

বন্দিয়া ময়ূরভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্ম্ম গুণগান ॥

রূপরামের ধর্মমঙ্গল ১৬৪৯-৫০ খ্রীঃ অব্দে সমাপ্ত হয়। সুতরাং মাণিক গাঙ্গুলি সপ্তদশ শতাব্দীর পরবর্তী হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উপরন্তু তাঁহার ভাষা ও ছন্দ যেরূপ চাঁছাছোলা, তাহাতে তাঁহার কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের রচনা বলিয়া মনে হয়।[৯২] তখন পুরাতন বাংলা সাহিত্যে ভাঁটার টান শুরু হইয়া গিয়াছে। অবশ্য সেই যুগে, এমন কি পরবর্তী শতাব্দীতেও মাণিকরামের মতো কোন কোন কবি পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিয়াছিলেন।

---

৯০ ঋতু—৬, বেদ—৪, সমুদ্র—৭ = ৬৪৭
সিদ্ধ—২৪, যুগ—৪, পক্ষ—২ = ২৪২৪
৩০৭১

অর্থাৎ ১৭০৩ শক বা ১৭৮১ খ্রীঃ অব্দ।

৯১ প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৬

৯২ কবি ইংরেজী stable-এর সঙ্কুচিত রূপ 'তবল' শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য ডঃ বিজিত ও ডঃ সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল, পৃ. ১৶০

মাণিক গাঙ্গুলি খুব ফলাও করিয়া নিজের কথা বর্ণনা করিয়াছেন— ধর্মমঙ্গলের অন্যান্য কবির মতো অর্বাচীন কালের এই কবিও অদ্ভুত ও অনৈসর্গিক কল্পনার আশ্রয় লইয়াছিলেন। "মাণিকরামের আত্মকাহিনী বৈচিত্র্যহীন নয়" বটে[১৩] কিন্তু একই প্রকার *motif* আমদানির ফলে সেই বৈচিত্র্য প্রায়ই পর্যুসিত হইয়া পড়িয়াছে। সালঙ্কারে নিজের কথা ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া তোলা ধর্মমঙ্গলের কবিদের ফ্যাসান হইয়া গিয়াছিল। ফলে তাহা হইতে কবিজীবনের বস্তুগত যাথার্থ্য অপেক্ষা বানানো আজগবি কথা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। যাহা হউক তাঁহার আত্মকথা এবং গ্রন্থের অন্যান্য উল্লেখ হইতে দেখা যাইতেছে, মাণিকরামের পিতামহের নাম অনন্তরাম, পিতা গদাধর, মাতার নাম কাত্যায়নী, পত্নী শৈব্যা। কবি সর্বজ্যেষ্ঠ, তাঁহার পাঁচটি ছোট ভাই ছিল। তাহার চতুর্থ ভাই ধর্মঠাকুরের নির্দেশে জ্যেষ্ঠের কাব্যের গায়েন হইয়াছিলেন। স্বপ্নে যখন ব্রাহ্মণ কবি শুনিলেন যে, তাঁহাকে নীচ জাতির দেবতা ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্য লিখিতে হইবে, এবং তাঁহার অনুজকে সেই কাব্যের গায়েন হইতে হইবে, তখন তিনি একটু ভীত ও সঙ্কুচিত হইলেন :

এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পরাণ।
জাতি যায় তবে প্রভু যদি করে গান॥
অচিরাৎ অখ্যাতি হবেক দেশে দেশে।
স্বপক্ষের সন্তোষে বিপক্ষ পাছে হাসে॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও ব্রাহ্মণে ধর্মমঙ্গল রচনা করিলে বা গান করিলে তাঁহার জাতি যাইবার সম্ভাবনা ছিল। অবশ্য—

জগৎ ঈশ্বর কন আমি তোর জাতি।
তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি॥

কবি তখন নিশ্চিন্ত মনে ধর্মমঙ্গল রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কবির কাব্য ঘনরাম অপেক্ষা কিছু হ্রস্ব হইলেও আকারে-আয়তনে নিতান্ত ক্ষীণকায় নহে —ছাপার অক্ষরে ডিমাই সাইজে প্রায় ছয় শত পৃষ্ঠা। ইহাতে কবি সর্বপ্রথমে দিগ্‌বন্দনা অংশে বিভিন্ন গ্রামের নানা নামের লৌকিক দেবদেবীর বন্দনার পর ধর্মমাহাত্ম্য বর্ণনায় অগ্রসর হইয়াছেন। দ্বাদশ দিন ধরিয়া দিবা ও রাত্রিতে এই কাব্য পড়া হইত বলিয়া ইহা বারোমতি বা 'বার্মাতি'

১৩ ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ইতি. (১ম—অপবার্ধ,) পৃ. ১৯৪

নামেও পরিচিত।[২৪] কবি শ্রীধর্মমঙ্গল ও বার্মাতি—দুইটি শব্দই কাব্যের নাম হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। বারোটি পালায় কাহিনীর আরম্ভ হইতে পশ্চিমে সূর্যোদয় ও লাউসেনের স্বর্গারোহণ পালা বিভক্ত হইয়াছে। বর্ণনার ধারা গতানুগতিক—ঘনরামের পর তাঁহার এ কাব্য না লিখিলেও চলিত। চরিত্রগুলিও বিশেষ কোন নূতন বৈচিত্র্য দেখাইতে পারে নাই। অবশ্য কবি পুরাণ হইতে বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, কথায় কথায় রামায়ণ-মহাভারত হইতে দৃষ্টান্ত দিয়া ধর্মঠাকুরের অপৌরাণিক সংস্কার সম্পূর্ণ-রূপে মুছিয়া ফেলিতে চাহিয়াছেন। আর একটা বৈশিষ্ট্য, কবি ইহাতে রাঢ়ের ধর্মোৎসব ও ধর্মপূজা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্য সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য কবি হুবহু অনুকরণ করিয়াছেন। আদিরসের কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি আছে : রঞ্জাবতীর মাতৃহৃদয়ের ব্যথাবেদনা বেশ সহৃদয়তার সঙ্গেই অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু কবি সর্বাপেক্ষা অধিক সহৃদয়তা বোধ করিয়াছেন কালু ডোমের দারিদ্র্যপীড়িত জীবন বর্ণনায়। দরিদ্র কালু—

স্নান মুখ সদাই শূকর সঙ্গে ফিরা।।
কটিতে কৌপীন তার গণ্ডা দশ গিরা॥
তৈল বিনা তাম্র কেশ তনু যেন খড়ি।
কেবল সঙ্কট কষ্ট কপালের দেড়ি॥

যখন সে বলে : "শাক লাউ সিদ্ধ করে সেও অলবণ"—তখন দারিদ্র্যের এই বর্ণনা পোষাকী অলঙ্কার ছাড়িয়া নিরাভরণ বেশে আসিয়া পাঠকের অন্তর আকর্ষণ করে। চরিত্র হিসাবে কর্পূর চরিত্রটি ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। বিপদের সময়ে সর্বদা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজিয়া, দাদাকে বিপদের মুখে আগাইয়া দিয়া, বিপদ কাটিয়া গেলে সগর্বে বাহিরে আসিয়া সে যেরূপ শূন্যগর্ভ বীরত্বের আস্ফালন করিয়াছে, তাহাতে তাহার 'বীরপণায়' বেশ কৌতুক সৃষ্টি হইয়াছে। ঘনরাম অধিকতর প্রতিভাবান কবি হইলেও মাণিকরামের সাধারণ পাঁচাপাঁচি চরিত্র অধিকতর বাস্তবানুগামী হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য ভাষা-ভঙ্গিমায় তিনি রামেশ্বর, ঘনরাম বা ভারতচন্দ্রের মতো চমকপ্রদ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই—যদিও

২৪ ইতিপূর্বে সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল কাব্য প্রসঙ্গে 'বার্মাতি' শব্দ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

তিনি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর অন্ততঃ দুই দশক পরে ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। মাণিকরাম ছোট ছোট জীবনচিত্র নিপুণতার সঙ্গে ফুটাইয়াছেন বটে, কিন্তু কোন বড় ব্যাপক ব্যাপার ততটা কৃতিত্বের সঙ্গে অঙ্কন করিতে পারেন নাই। তিনি 'শীতলামঙ্গল' শীর্ষক একখানি ক্ষুদ্র কাব্য লিখিয়াছিলেন যাহা কোনক্রমেই উল্লেখযোগ্য নহে।

ধর্মমঙ্গলের কয়েকজন অপ্রধান কবি ॥ অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরও আট-নয় জন কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সাহিত্যের দিক দিয়া তাঁহাদের কাব্য-কাহিনীর বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই। তাঁহারা পূর্বসূরীদের খনিত পথেই যাত্রা করিয়াছিলেন, নূতন কোন বৈশিষ্ট্য সংযোজনার চেষ্টা করেন নাই, সেরূপ সাধ্যও ছিল না। সাহিত্যের ইতিহাস এই সমস্ত অনাবশ্যক তথ্যের দ্বারা ভারী করিবার প্রয়োজন নাই। শুধু মঙ্গলকাব্যের ধারা রক্ষা করিবার জন্য এখানে এই সমস্ত স্বল্প প্রতিভাধর কবিদের সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাইতেছে।

দ্বিজ রামচন্দ্র বা রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জ্যার ধর্মমঙ্গল ১০৩৮ মল্লাব্দ বা ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। কবি অতি স্পষ্টভাবে সন-তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন :

মল্লভূমে নিবসি মল্লের লিখি শক।
হাজার আটত্রিশ সালে হইল পুস্তক ॥[৯৫]

কবি মল্লভূমের রাজা গোপাল সিংহের সময়ে এই কাব্য রচনা করেন। 'সাহিত্যসংহিতা'র ৭ম-৮ম খণ্ডের (১৩১৩-১৪ সাল) পরিশিষ্টে ইহার কিয়দংশ মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার কয়েকটি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তাই মনে হয় স্থানীয় সমাজে এই কাব্যের কিঞ্চিৎ প্রভাব ছিল।[৯৬]

৯৫ ব. সা. প. প, ১৩০১

৯৬ সাহিত্য পরিষদ হইতে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ময়ূরভট্ট প্রণীত বলিয়া প্রচারিত যে ধর্মপুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যে ময়ূরভট্ট নামক কোন কবির লেখা নহে, তাহা আমরা প্রথম পর্বে প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছি। সম্প্রতি ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল বিশ্বভারতী পুঁথিশালায় রক্ষিত একখানি পুঁথি হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইহা প্রকৃত পক্ষে দ্বিজ রামচন্দ্রের রচনা—ময়ূরভট্ট নামক কোন প্রাচীন কবির নহে। ডঃ মণ্ডলের মতে রামচন্দ্র দুইখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন—(১) শ্রীধর্মপুরাণ, (২) ধর্মমঙ্গল। প্রথম খানিতে ধর্মাই পণ্ডিতের দ্বারা ধর্মপূজা প্রচারের কাহিনী এবং দ্বিতীয় খানিতে লাউসেনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম খানিই ময়ূরভট্টের নামে মুদ্রিত হইয়াছে। (এই গ্রন্থের ময়ূরভট্ট প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। পৃ. ৩১৪—৩১৮)

'সাহিত্য-সংহিতা'য় যেটুকু প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে কবির বর্ণনাভঙ্গি বেশ পরিচ্ছন্ন মনে হইতেছে—ভাষাও তীক্ষ্ণ ও আধুনিক। নানা-প্রকার ছন্দেও কবির বেশ দক্ষতা ছিল। নিম্নে কবির ব্যবহৃত একাবলী ছন্দের একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

ধর্মের সেবক আখড়া মালে।
মাল কোথা গেল ডাকিয়া বলে॥
বিপরীত পাণি সারেঙ্গ ধল।
সাজন করিছে যেমন কাল॥
বীরধড়া পড়ে আপন বেশে।
মাথা চৌতলা পটুকা কসে॥
রাঙ্গা ধুলা সবে মাখিয়া অঙ্গে।
সাত মাল সাজে সমরে রঙ্গে॥

সহদেব চক্রবর্তী ধর্মঠাকুরের স্বপ্নাদেশের ফলে ১১৪১ সালে (১৭৩৫ খ্রীঃ অঃ) ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।[৯৭] কবি কিন্তু এই কাব্যকে 'অনিল পুরাণ' বলিয়াছেন :

উলটিয়া আত্মারে কহেন ভগবান।
অনিলপুরাণ দ্বিজ সহদেব গান॥

সহদেব কালুরায় বা কালাচাঁদ নামক কোন স্থানীয় ধর্মঠাকুরের সেবক ছিলেন, গ্রন্থের মধ্যে একাধিক স্থলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। হুগলী জেলার বালিগড় পরগণার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ-বংশে কবির জন্ম হয়। কবি একস্থলে হেঁয়ালির ভাষায় নিজ কাব্যের রচনা সন নির্দেশ করিয়াছেন :

দ্বিজ সহদেব গান পূর্ব তপ ফলে।
যাহারে করিলে দয়া একচল্লিশ সালে॥
*　　*　　*　　*
চৈত্রের চতুর্থ দিনে পূর্ণিমার তিথি।
হেন দিনে যারে দয়া কৈলা যুগপতি॥

একচল্লিশ সালের ৪ঠা চৈত্র কবি দেবতার কৃপা লাভ করিয়া কাব্য রচনায় অগ্রসর হন। এখন দেখা যাক, এই একচল্লিশ সাল যথার্থ কত সন-শতাব্দী হইতে পারে। অম্বিকাচরণ গুপ্ত সহদেবের যে পুঁথি অবলম্বনে ১৩০৪ সালের

৯৭ ব. সা. প. প. ১৩০৪

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় 'সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ১১৯৩ (১৭৮৭) সন উল্লিখিত ছিল। গুপ্ত মহাশয়ের মতে একচল্লিশ সালের অর্থ—১১৪১ বঙ্গাব্দ, ১৭৩৫ খ্রীঃ অঃ। অর্থাৎ ১৭৩৫ খ্রীঃ অব্দের দিকে কবি কাব্য রচনায় প্রস্তুত হন। এই সিদ্ধান্ত সত্য হইতে বাধা নাই। এই কাব্যে রঞ্জাবতী-লাউসেনের কোন কাহিনী নাই। মূল কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ : নিরঞ্জনের নিশ্বাসে উলূকের সৃষ্টি, আদ্যার জন্ম, তাঁহার গর্ভে নিরঞ্জনের ঔরসে ব্রহ্মাদির জন্ম, আদ্যার শতবার দেহান্তর গ্রহণ, পরিশেষে মহাদেবের পত্নী হইতে অঙ্গীকার, শিবের দারিদ্র্যের কাহিনী, বাগদিনী পালার পুনরাবৃত্তি, হরপার্বতীর বল্লুকাতীরে গিয়া তত্ত্বকথা আলোচনা—সেখান হইতে নাথসাহিত্যের দিকে কাহিনী চলিয়া পড়িয়াছে। ইহার পর গঙ্গার উপাখ্যান, শিবকর্তৃক গঙ্গাপূজা, এক রাজার ধর্মঠাকুরের নিন্দা, জাজপুর নিবাসী ধর্মঠাকুর-বিরোধী ব্রাহ্মণদের প্রতি যথোচিত শাস্তি-বিধান, হরিশ্চন্দ্র রাজার ধর্মপূজা এবং লুইচন্দ্র প্রসঙ্গের পর কাহিনী সমাপ্ত হইয়াছে। ইহা ধর্মমঙ্গল নহে—ধর্মপুরাণ। তাই ইহাতে ধর্মমঙ্গল কাব্যের সুপরিচিত লাউসেন কাহিনী উল্লিখিত হয় নাই। অবশ্য ইহাকে বিশুদ্ধ ধর্মপুরাণ বলা যায় না—কারণ ইহাতে শিবায়ন ও নাথসাহিত্যের ধারাও অল্পাধিক অনুসৃত হইয়াছে। কবির বর্ণনাভঙ্গিমা পরিচ্ছন্ন, ভাষা মার্জিত, রীতিপদ্ধতি আধুনিক ধরনের—ভাষায় তৎসম শব্দের পরিমিত প্রয়োগ রচনার কোন কোন অংশকে গাম্ভীর্য দান করিয়াছে। যথা :

অতি অনুপম শোভা শোভিত কৈলাস।
ষড় ঋতু বসন্ত সমীর বারো মাস॥
কুসুম দিগন্ত গন্ধ সদা বিকশিত।
অলিগণ গায় শিবদুর্গার চরিত॥

কোন কোন স্থলে তাঁহার শাক্ত মনোভাবও বিশেষ প্রশংসনীয় :

শরণ লইনু জগৎ জননী
ও রাঙ্গা চরণে তোর।
ভবজলধিতে অনুকূল হৈতে
কে আর আছয়ে মোর॥
দুগ্ধকণ্ঠ শিশু যদি দোষ করে
রোষ না করয়ে মায়।

যদি না রুষিবে পড়িয়া কান্দিব
ধরিয়া ও রাঙ্গা পায়॥

দুই-একটি প্রহেলিকা-পদেও কবি বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন :

শিল নোড়াতে কোন্দল বাধিল
সরিষা ধরাধরি করে।
চালের কুমড়া গড়ায়ে পড়িল
পুঁইশাক হাসিয়া মরে॥
এ বড় বচন অদ্ভুত।
আকাট বাঁঝিয়া প্রসব হৈল
ছেলে চায় পায়রার দুধ॥
অনেক যতনে নোকা বাঁধিনু
কাঁকড়া ধরিল কাছি।
মশার লাথিতে পর্বত ভাঙ্গিল
ক্ষুদ্র পিপীলিকার হাসি॥

প্রসিদ্ধ 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'[৯৮] কবির অনিলপুরাণেই স্থান পাইয়াছে। এই কাব্য কাব্যহিসাবে অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু ধর্মমঙ্গলের দেবতত্ত্ব ও তাহার সঙ্গে এক যুগের সমাজ-জীবনের সম্পর্কের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হইবে।

কবি হৃদয়রাম সাউ ১১৫৬ বঙ্গাব্দে (১৭৪৯ খ্রীঃ অঃ) ধর্মমঙ্গল কাব্য সমাপ্ত করেন। পূর্বনিবাস বর্ধমানের খুরুল গ্রাম। মাতুলদের সঙ্গে পারিবারিক কলহের ফলে তিনি সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া এক পুকুরে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতে যান, তখন ধর্মঠাকুর স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া কবিকে নিরস্ত করেন এবং আদেশ দেন—কবি যেন নিদিয়াদহ বিল হইতে ঠাকুরের শিলা-মূর্তি উদ্ধার করিয়া পূজার ব্যবস্থা করেন। কবি সেই মূর্তি উদ্ধার করিয়া বীরভূমের উচকরণ গ্রামে গিয়া বসতি স্থাপন করেন। সেই গ্রামে এখনও হৃদয়রামের বংশধরদের বসবাস আছে। এই গ্রামে কবি উক্ত ধর্মঠাকুরের শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠার পরে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। কবির পিতার নাম গোবিন্দ—তাঁহারা শুঁড়ি সম্প্রদায়ভুক্ত। এখনও অনেক শুঁড়িবাড়ীতে ধর্মের পূজা হইয়া থাকে—ইনি চাঁদরায় নামে পরিচিত।[৯৯] কবির রচনা

৯৮ লেখকের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৯৯ মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত 'বীরভূম বিবরণ', ৩য়, পৃ. ১৯১—৯৩

বেশ পরিচ্ছন্ন; তৎসম শব্দযুক্ত বাক্যবিন্যাস প্রশংসার যোগ্য। যথা—রঞ্জাবতীর রূপ বর্ণনা:

নাক মুখ চক্ষু কান কুন্দে যেন নির্ম্মাণ
কামান জিনিয়া ভুরুখানি।
মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম যেন মুকুতার দাম
অঙ্ক পসি যেন পদ্মমণি॥
পদ আদ গজ হস্তী পথে চলে সেই রীতি
তাথে অধিক চলন মাধুরী।
দুই চক্ষু গগনের তারা কেশ চামরের ঝারা
মাঝাখানি জিনিআ কেশরী॥

আরও কয়েকজন ধর্মমঙ্গলের কবির পুরা অথবা খণ্ডিত কাব্য পাওয়া গিয়াছে। গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায় (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ), নরসিংহ বসু (১৭৩৭ খ্রীঃ অব্দে কাব্য রচনা করেন), রামনারায়ণ (শুধু ইছাইবধের পুঁথি), রামকান্ত (১৭৫০ খ্রীঃ অঃ), দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ, নিধিরাম গাঙ্গুলি, শঙ্কর চক্রবর্তী প্রভৃতি কবিদের নামেও ধর্মমঙ্গলের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। অনেক সময় ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ক্লান্তিকর একঘেয়েমিতে বিস্বাদ হইয়া পড়িয়াছে। পরবর্তী কালের স্বল্প প্রতিভাধর কবিদের কাহিনী পূর্বের অপেক্ষাও বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে। রাঢ় এবং উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে একদা ধর্মঠাকুরের অতিশয় প্রভাব ছিল, এখনও সে প্রভাব হ্রাস পায় নাই—অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু গ্রাম্য কবি ধর্মের অনেক পাঁচালী লিখিয়াছিলেন—যাহার বিশেষ কোন সাহিত্য-গৌরব নাই। এই সমস্ত অপদার্থ রচনার বিস্তারিত পরিচয় নিষ্প্রয়োজন বলিয়া আমরা শুধু এখানে কবিদের নাম উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

সত্যনারায়ণ কথা॥

ইতিপূর্বে রামেশ্বরের সত্যপীর পাঁচালী প্রসঙ্গে আমরা সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি। খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে হিন্দু-মুসলমানের মিশ্র দেবতা সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের উপাসনা বা শীর্ণি বণ্টন প্রচলিত হয়, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচনার ধুম পড়িয়া যায়। এই মিশ্রদেবতা পরিকল্পনায় হিন্দু-মুসলমান

উভয়েরই ধর্মবিশ্বাস একসূত্রে মিলিত হইয়াছে। মুসলমান শাসনের চণ্ডযুগে হিন্দুগণ ভয়ে ভক্তিতে মুসলমান পীর-ফকির-মুর্শিদের দরগায় যাতায়াত করিত। উপরন্তু সূফী মতবাদ বাঙালী হিন্দুর কাছে নিতান্ত বিধর্ম বলিয়া মনে হয় নাই। পীর-ফকিরের 'কেরামতে'র প্রতি অশিক্ষিত হিন্দু জনসাধারণের বিস্ময়মুগ্ধ আকর্ষণ ছিল। ফলে ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ নামে এক মিশ্রদেবতার পরিকল্পনা রাঢ়ভূমিতে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। সাধারণতঃ হিন্দুর বাড়ীতে ইনি সত্যনারায়ণ নামেই পূজা পাইয়া থাকেন—কোথাও বা ইঁহার নাম সত্যপীর। রামেশ্বরের কাব্যের নাম সত্যপীরের পাঁচালী। মুসলমানের গৃহে ইনি সত্যপীর নামেই গৃহীত হইয়াছেন। হিন্দুরা সত্যনারায়ণ বলিয়া ইঁহার পূজার্চনা করিলেও শীর্ণি-বণ্টনে পুরাপুরি মুসলমানী রীতি বজায় রাখিয়াছেন। অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণেও সত্যপীরের কাহিনী অনুপ্রবেশ করিয়াছে।[১০০] তবে সেখানে সত্যনারায়ণ নাম গৃহীত হইয়াছে—এবং সত্যপীরের কাহিনীর ফকিরকে হিন্দুপুরাণে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ করা হইয়াছে। সমগ্র অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া অসংখ্য সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মোটামুটি দুইটি কাহিনী অনুসৃত হইয়াছে। ফকিরবেশী সত্যপীর কর্তৃক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপাবর্ষণ ইহার প্রথম কাহিনী। দ্বিতীয় কাহিনীতে চণ্ডীমঙ্গলের অনুকরণে ধনপতির আখ্যানের আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে।[১] যাঁহারা এই কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু, দুইচারিজন মুসলমানও[২] সত্যপীরের পাঁচালী রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। পূর্বে রামেশ্বরের কথা বলা হইয়াছে। ভারতচন্দ্রও কৈশোরে সত্যনারায়ণের দুইখানি অতি ক্ষুদ্র পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন।[৩] ভৈরবচন্দ্র ঘটক, ঘনরাম চক্রবর্তী, ফকিররাম দাস এবং আরও অন্ততঃ চল্লিশজন কবির সত্যনারায়ণের পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের

---

১০০ পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

১ রামেশ্বরের সত্যপীরের পাঁচালী প্রসঙ্গে ইহা আলোচিত হইয়াছে।

২ দক্ষিণ রাঢ়ের আরিফ ও ফয়জুল্লার ভণিতায় সত্যপীরের কাহিনী পাওয়া গিয়াছে। দ্রষ্টব্য: ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ই.—১ম (অপরার্ধ)

৩ ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে।

অধিকাংশ কবিই উনবিংশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর অপদার্থ রচনার বিস্তারিত বিবরণ বর্তমান ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। কোন কোন সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে বিশুদ্ধ রূপকথা ধরনের গল্পও পাওয়া যায়। ইহাতে ব্রতকথার অংশ অল্প, আরব্যরজনীর গল্পের অনুরূপ বৈশিষ্ট্যই অধিক। ইহাতে বাদশাহ্ হোসেন এবং উজীর সৈয়দ জামালের কন্যা লালমোনের প্রেমের গল্প, সত্যপীরের কৃপায় নায়ক-নায়িকার নানা বিপদ হইতে উদ্ধার প্রভৃতি অদ্ভুত অলৌকিক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। দুই-একজন মুসলমান কবি সত্যপীরের কাহিনী বলিতে বসিয়া ধর্মসম্প্রদায়গত মানসিক ঔদার্যের পরিচয় দিয়াছেন। সেখ ফয়জুল্লা সত্যপীরের বন্দনায় হিন্দুর দেবদেবী এবং চৈতন্যদেবের বন্দনা করিয়াছেন, কোথাও বা তিনি আল্লাহ্ ও ব্রহ্মাবিষ্ণুকে এক করিয়া বলিয়াছেন, "তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি নারায়ণ।" কোন কোন হিন্দু কবি সত্যপীরের কাহিনী লিখিতে বসিয়া মুসলমানী কাহিনী মুসলমানী ঢঙেই লিখিতেন। সত্যপীর কাহিনীর অন্যতম কবি কৃষ্ণহরিদাস লিখিয়াছেন :

সত্যপীর বলে হাদি তুমি মোর মুরশিদ।
আমাকে বাতাও তুমি করিয়া মুরিদ॥

আর একস্থানে তিনি বলিতেছেন :

সেই নিরঞ্জনের নাম বিছমিল্লা কয়।
বিষ্ণু আর বিছমিল্লা কিছু ভিন্ন নয়॥

মুসলমান সমাজের কেহ কেহ শুধু মুসলমান সমাজের জন্যই মানিকপীরের গান[৪] লিখিয়াছিলেন। এই রচনাগুলির কাব্যগত কিছুমাত্র মূল্য নাই,

---

৪ আরও দুই-একজন কবি (যেমন হৃদয়রাম, শঙ্কর) এইরূপ ইসলামী 'পীর' কাব্য ও গান লিখিয়াছিলেন। যেমন কবি শঙ্করের :

একদিন রাসমানে বসিয়া খোদায়।
দুনিয়ার তামাসা দেখিতে পির জায়॥
রাজা দুর্ব্বাশন আছে দুনিয়া ভিতরে।
ভিক্ষার খাতিরে জান রাজার দুয়ারে॥
জবরিল আসি বলে শুন দেয়ান জি।
কৃষ্ণ পরায়ণ রাজা সেথা যাবে কি॥

(ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'পুঁথি-পরিচয়', ২য়)

অক্ষম লেখকের দুর্বলতম রচনা কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে। কিন্তু সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর সত্যপীর-সত্যনারায়ণ পরিকল্পনার মধ্য দিয়া হিন্দু-মুসলমান যে একে অপরের নিকটবর্তী হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

অন্নদামঙ্গল-কালিকামঙ্গল ও ভারতচন্দ্র বৃত্ত

ইতিপূর্বে সপ্তদশ শতাব্দী প্রসঙ্গে আমরা সবিস্তারে বিদ্যাসুন্দর-কালিকা-মঙ্গলের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করিয়াছি। উপস্থিত প্রসঙ্গে শুধু উক্ত পর্যায়ের কয়েকজন কবির কাব্যপরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্নদামঙ্গল-কালিকামঙ্গল গোত্রের ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর শুধু অষ্টাদশ শতাব্দীর নহে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের একজন প্রথম শ্রেণীর কবি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মরুধূসর বাংলা কাব্যে যিনি উচ্ছল জীবন-রসের পরিচ্ছন্নতা এবং কৌতুকরসের অনাবিল প্রসন্নতার সাহায্যে শাণিত বুদ্ধির চমক সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন—সেই রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করিয়া এই পর্বের অন্তিম সূচনা করেন। আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কয়েকজন কবির অন্নদামঙ্গল-কালিকামঙ্গল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ॥

(১) **বাঙালী ও ভারতচন্দ্র**—মধ্যযুগের অন্তিমপর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রকে লইয়া বহু দিন ধরিয়া যথেষ্ট আলোচনা-সমালোচনা ও বিচার-বিতর্ক চলিয়াছে। সেই আলোচনায় সাহিত্য-সমালোচকগণ প্রধান অংশ গ্রহণ করিলেও সমাজ ও নীতির দিক হইতেও ভারতচন্দ্রকে লইয়া প্রখর আলোচনা হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত—সকলেই কবির কাব্য, রচনারীতি প্রভৃতি লইয়া যেরূপ তীক্ষ্ণ আলোচনা করিয়াছেন, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের কোন কবিকে সেরূপ পরস্পর-বিরোধী বিশেষণের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রামাণিকতা ও রসরুচি লইয়া একদা বিশেষজ্ঞ মহলে প্রচুর কলরব উত্থিত হইলেও প্রাচীন সাহিত্যানুরাগী ব্যতীত সাধারণ পাঠকসমাজে সে

কল্লোল পৌঁছায় নাই। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যের রুচি, রীতি প্রভৃতি লইয়া যে মতামতের ঝড় উঠিয়াছে, তাহাতে অবিশেষজ্ঞ সাধারণ পাঠকও একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন ; পণ্ডিত, রসিক ও ঐতিহ্যবান ব্যক্তিরাও ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গের মধ্যে অবতরণ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের কাব্য কাহারও কাছে স্বাদু রমণীয় মনে হইয়াছে, কেহ-বা ইহাকে 'অশুভ ফুল' ('fleur de mal')[৫] বলিলেও কবির রচনাচাতুর্যে মুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতেই ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে নানা ধরনের মতামত প্রচলিত ছিল। ক্রমে ক্রমে সেই মতামতের তীব্রতা বাড়িয়াছে,—যুগধর্ম অনুসারে কেহ কবিকে গালি পাড়িয়াছেন, কেহ-বা তাঁহাকে শিরোধার্য করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজ লেখকগণ, যাঁহারা বাংলা ব্যাকরণ অভিধান সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বহু স্থলে ভারতচন্দ্র হইতেই দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন।[৬] উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আধুনিক ইংরাজী শিক্ষার মারফতে খ্রীস্টানী নীতি-আদর্শ শিক্ষিত মহলে প্রবেশ করিবার ফলে অনেকেই ভারতচন্দ্রের প্রতি প্রতিকূলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ধারার কবিদের মধ্যে পাকুড়রাজ পৃথ্বীচন্দ্রের 'গৌরীমঙ্গলে' (১৮০৬-৭)[৭] এবং দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী'তে (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে রচিত) ভারতচন্দ্রের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। আধুনিক ধারায় শিক্ষিত, কিন্তু প্রাচীন কাব্যরসে লালিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারও ভারতচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণে 'বাসবদত্তা' (১৮৩৬-৩৭) রচনা করেন। গোপাল উড়ের (১৮১৯-৫৯) বিদ্যাসুন্দর যাত্রা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং শিক্ষিত সমাজের নাসিকা কুঞ্চন সত্ত্বেও গোপালের নামে

---

৫ "I have no hesitation in admitting that Bharatchandra's masterpiece is a 'fleur de mal' but it is a flower all the same, many petalled and of perfect form."—*The Story of Bengali Literature* (Pramatha Chaudhury)

৬ হলহেডের *A Grammar of the Bengal Language (1778)*, ফরস্টারের *A Vocabulary in two parts, English and Bengali and Vice-Versa (1799-1802)*, লেবেডেফের *The Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects (1801)* প্রভৃতি কোষগ্রন্থ ও ব্যাকরণে ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইয়াছিল।

৭ ইতিপূর্বে আলোচিত।

প্রচারিত[৮] লঘু ছন্দের গান বাঙলার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। সুলভ ছাপাখানার যুগে ১৮১৬ সাল হইতে অন্নদামঙ্গল এবং ১৮১৭-১৮ সাল হইতে বিদ্যাসুন্দর মুদ্রিত হইতে থাকে। অবশ্য আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতের দল ভারতচন্দ্রের কাব্যে (বিশেষতঃ 'বিদ্যাসুন্দরে') অশ্লীলতার গন্ধ পাইয়া পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষভাবে কবিকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ১৮৩৩ সালে রাধামোহন সেন ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের ভ্রম সংশোধন করিয়া, কোথাও কবির রচনা সম্বন্ধে তির্যক মন্তব্য করিয়া 'অন্নপূর্ণামঙ্গল' প্রকাশ করেন।[৯] অবশ্য তিনি ভারতচন্দ্রের রচনারীতি সমালোচনা করিলেও শ্লীল-অশ্লীলতা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন নাই। কিন্তু ইহার কিছু পরে একদল যেমন ভারতচন্দ্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তেমনি কেহ কেহ তাঁহাকে নীতি-দুর্নীতি, শ্লীল-অশ্লীল ঘটিত প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বিচারও শুরু করিয়া দিলেন। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে মহেন্দ্রনাথ রায় 'কুসুমাবলি' শীর্ষক একটি কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশ করেন, স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জন্যই ইহা সঙ্কলিত হয়।[১০]

---

৮ গোপাল উড়ের নামে প্রচারিত গানগুলি খুব সম্ভব গোপালের রচিত নহে। তাঁহার সেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি ছিল না। তিনি ভিন্ প্রদেশ হইতে (উড়িষ্যার জাজপুর গ্রাম) ১৮৪৪ সালে কলিকাতায় আসিয়া ফল বিক্রয় করিতেন। তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন বলিয়া যাত্রার দলে স্থান লাভ করেন, পরে নিজেই দল তৈয়ারি করেন। ভৈরব হালদার নামক কোন এক গীতিকারের দ্বারা তিনি গান লেখাইয়া লইতেন বলিয়া শুনা যায়। প্রায় দশ বছর ধরিয়া গোপাল নিজের দল চালাইয়াছিলেন। দুই চারিটি গান তাঁহার নিজের হইলেও হইতে পারে।

৯ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের দ্বারা ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়। ইহাতে কিছু কিছু কাঠখোদাই চিত্রও মুদ্রিত হইয়াছিল। বিদ্যাসুন্দর পৃথকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয় বাংলা ১২২৪ সালে (১৮১৭-১৮)। ইহার পর সস্তা ছাপাখানা হইতে, কদর্য কাগজে স্বল্প মূল্যে পুরা অন্নদামঙ্গল এবং আলাদা করিয়া বিদ্যাসুন্দর বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় অন্নদামঙ্গল (দুইখণ্ড) কৃষ্ণনগর রাজবাটীর পুঁথি অবলম্বনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্যবহারের জন্য মুদ্রিত হয় (১৮৪৭)। ইহাই ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর প্রথম প্রামাণিক সংস্করণ।

১০ "অন্নপূর্ণামঙ্গল গৌড়ীয় ভাষা ভাবিত পুস্তক মহাকবি শ্রীল শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর কর্তৃক রচিত অনুলিপি হেতুক বহুবিধ অশুদ্ধ সম্প্রতি সংশোধিত হইয়া কলিকাতা নগরে বঙ্গদূত যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল—শকাব্দাঃ ১৭৫৫ ; সম্বত ১৮৯০ ; বাং ১২৪০, ইং ১৮৩৩'—উক্ত কাব্যের আখ্যা পত্র। ইহাতে কবি পদ্যেই মন্তব্য করিয়াছেন—গদ্যে নহে। সে যুগের ইংরাজী সাহিত্য-রসিক কাশীপ্রসাদ ঘোষ রাধামোহন সেনের কবিত্বশক্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৮৩০ সালের জানুয়ারী মাসের '*Literary Gazette*'-এ তিনি 'On Bengali Works and Writers' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন।

সঙ্কলক ছাত্রোপযোগী করিতে গিয়া ভারতচন্দ্রের সঙ্কলিত অংশ সমূহের আদিরসাত্মক ছত্রগুলি বাতিল করিয়া মন্তব্য করেন যে, এই কবির অশ্লীল রচনা ছাত্রদের উপযোগী নহে, এমন কি "ভদ্রসমীপে উচ্চার্য্য নহে।"[১১]

ইংরেজীশিক্ষিত মহল ভারতচন্দ্রের উপর কতটা খড়্‌গহস্ত হইয়াছিলেন তাহা একটি ঘটনা হইতেই বুঝা যাইবে। ১৮৫২ সালের ৮ই এপ্রিল রাম-বাগানের দত্তবংশীয় ইংরাজীনবিশ হরচন্দ্র দত্ত বীঠন সোসাইটিতে ইংরাজী ভাষায় *Bengali Poetry* শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি ইংরাজী কাব্যসাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্যের অপকৃষ্টতা প্রমাণ করেন এবং ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার অতিশয় নিন্দা করেন। সভায় অন্যতম আলোচক কৈলাসচন্দ্র বসুও বক্তার বক্তৃতা অনুসরণ করিয়া ভারতচন্দ্রের নিন্দার পর্দা চড়াইয়া দেন।[১২] ইহাতে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুব্ধ হন এবং বীঠন সোসাইটীর আর এক অধিবেশনে (১৮৫২ সালের ১৩ই মে) 'বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ' শীর্ষক দীর্ঘ আলোচনায় বাংলা কাব্যের গুণ বর্ণনা করেন এবং ভারতচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করেন। ইংরাজী কাব্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং বাংলা সাহিত্যের রসগ্রাহী রঙ্গলাল ভারতচন্দ্রের প্রশংসা করিলেও[১৩] কবির কাব্যে যে "নির্লজ্জতা প্রতিপাদক আদিরস বর্ণনার আধিক্য দৃষ্ট হয়—"তাহা তিনিও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইংরাজী কাব্যে ভারতচন্দ্রের অপেক্ষাও উৎকট কামচিত্র আছে—সুতরাং যে অপরাধে ইংরাজ কবিদিগকে রেহাই দেওয়া হইতেছে, সেই অপরাধে

১১ সঙ্কলক ভূমিকায় বলিয়াছেন, "যদিচ ভারত প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের প্রবন্ধ রচনা বিশেষ মাধুর্য বিশিষ্ট হইয়া অতিমাত্রায় জনকমনীয় হইয়াছে, তথাপি উক্ত পুস্তক কোনরূপেই ছাত্রপুঞ্জের পাঠোপযোগী নহে। যেহেতু স্থানে স্থানে বিবিধ অশ্লীলবাক্য ও কদর্য ভাষা ব্যবহার হওয়াতে তাহা ভদ্রসমীপে উচ্চার্য নহে।"

১২ কৈলাসচন্দ্র বসু এই প্রসঙ্গে তীব্র ভাষায় বলেন, "ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এমত জঘন্য এবং নির্লজ্জ যে তাহার সহিত ইংরাজদিগের ফেণী হিল নামক অপকৃষ্ট গ্রন্থে (যাহার নামোল্লেখ করিলে ব্রীড়ানম্র মুখ হওয়া যায়) সেই গ্রন্থের তুলনা হইতে পারে।" (রঙ্গলালের 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' হইতে উদ্ধৃত।)

১৩ রঙ্গলালের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : "ভারতের শব্দ সৌন্দর্য ভাবের মাধুর্য এবং রসের প্রাচুর্য ও প্রাখর্যের কথা অধিক কি বর্ণনা করিব, বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ সুমিষ্ট রচনা অদ্যাবধি আর দ্বিতীয় হয় নাই, ভারতের পদ্যপংক্তি পাঠকালীন বোধ হয় যেন মধুকরনিকরের ঝঙ্কার হইতেছে।......"

ভারতচন্দ্রের নিন্দা করা উচিত নহে। রঙ্গলালের এই মন্তব্য হইতে দেখা যাইতেছে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুলভ ছাপাখানার দৌলতে ভারত-চন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, বিশেষতঃ বিদ্যাসুন্দরকাব্য সর্বত্র প্রচার লাভ করিলে ইংরাজী সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সদ্য-দীক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালী পাঠক এই জাতীয় কাম-সাহিত্যের প্রতি বিশেষ বিরক্তি বোধ করিয়াছিলেন। অবশ্য রঙ্গলালের মতো কৃতবিদ্য কাব্যরসিক শুধু কবিত্বের দিক দিয়া ভারতচন্দ্রের গুণগান করিলেও অশ্লীলতার অপরাধ হইতে ভারতচন্দ্রকে পুরাপুরি মুক্তি দিতে পারেন নাই। পুরাতন ধারার শেষ প্রতিভূ ঈশ্বর গুপ্ত কোন কোন দিক দিয়া ভারতচন্দ্রের শিষ্যত্ব করিয়াছেন। তাই তিনি বহু পরিশ্রম করিয়া ভারত-চন্দ্রের জীবনকাহিনী ও কাব্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন।[১৪] গুপ্ত কবি যে ভারতচন্দ্রকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিবেন তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে?[১৫] যিনি ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের আবহাওয়া হইতে বাংলা কাব্যকে উদ্ধার করিয়া বৃহত্তর পরিবেশে স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই মাইকেল মধুসূদন কোন কোন স্থলে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বক্রমন্তব্য করিলেও 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে ভারতচন্দ্রকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করিয়াছেন। আদিরসের জন্য রায়-গুণাকরের প্রতি মধুসূদনের মন বিষাইয়া যায় নাই।

বিদ্যাসাগর নিজে উদ্যোগী হইয়া কৃষ্ণনগর রাজবাটীর মূল পুঁথি অবলম্বনে 'অন্নদামঙ্গলে'র প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করেন (১৮৪৭)। তিনি নিজেও ভারতচন্দ্রের চাঁচা-ছোলা রচনারীতির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, প্রায়ই অন্নদামঙ্গলের 'শিবের ভিক্ষা যাত্রা' অংশটি আবৃত্তি করিতেন।[১৬] বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজনারায়ণ—প্রগতিশীল হিন্দুসমাজের দুইজন দিকপাল দুই দিক হইতে ভারতচন্দ্রকে গ্রহণ করিয়াছেন। 'মধ্য-ভিক্টোরীয়' রুচির ছায়াতলে বর্ধিত বঙ্কিমচন্দ্র স্থূল দেহঘটিত বর্ণনাকে ঘৃণা করিতেন।

---

১৪ ১২৬২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ 'সংবাদপ্রভাকরে' ভারতচন্দ্রের জীবনীঘটিত তথ্য প্রকাশিত হয়, পরে ঐ ১২৬২ সালেরই ১লা আষাঢ় ইহা 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত' নামে প্রকাশিত হয়।

১৫ ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে গুপ্তকবির মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "ঐ অন্নদামঙ্গল এবং বিদ্যাসুন্দরের গুণের ব্যাখ্যা আমি কি করিব? তাহার উপমার স্থল নাই বলিলেই হয়, এই ভারতে ভারতের ভারতীর ন্যায় ভারতের ভারতী সমাদৃত ও প্রচলিত হইয়াছে।" ('কবিবর ভারত-চন্দ্র রায়গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত')

১৬ পুরাতন প্রসঙ্গ—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য

কাজেই তিনি দুই এক স্থলে ভারতচন্দ্র সম্পর্কে প্রতিকূল মন্তব্য করিয়াছিলেন। ১৮৭১ সালে *The Calcutta Review* পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র 'Bengali Literature' শীর্ষক প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের রচনাশক্তি ও হীরা-মালিনীর চরিত্রের প্রশংসা করিলেও অশ্লীলতার জন্য কবিকে নিন্দাও করিয়াছিলেন।[১৭] 'কমলাকান্তের দপ্তরে' তিনি বলিয়াছেন, "ভারতচন্দ্র আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন—কবিকঙ্কণের ঋষভ স্বর কে শুনে?" কিন্তু তিনিই আবার ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'কে উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম)। রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হইয়াও ভারতচন্দ্রের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য ('বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা') মূল্যবান, "রায়-গুণাকর যে বঙ্গদেশের একজন অতি শ্রেষ্ঠ কবি, তাহাতে সন্দেহ নাই।" প্রাচীন রুচি ও রীতির পক্ষপাতী পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন, "ফলতঃ রায়গুণাকরের রচনার এমনই মোহিনী শক্তি যে, উহার কোন অংশের কোন দোষ নেত্রগোচর হয় না। যে অংশ পাঠ করিবে, সেই অংশেই যেন মধুবৃষ্টি হইবে। পংক্তিগুলি যেন সমস্থূল মুক্তামালা" ('বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব')। রমেশচন্দ্র দত্ত চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়া মুকুন্দরামের অধিকতর প্রশংসা করিলেও ভারতচন্দ্রের রচনারীতির মুক্তকণ্ঠে জয়গান গাহিয়াছেন, "Bharatchandra is a complete master of the art of versification and his appropriate phrases and rich descriptions passed into bye words." (*Literature of Bengal*) কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্ম শুচিতার প্রভাব এবং নীতিবাদী ইংরাজী সাহিত্য ও সমালোচনার আদর্শে শিক্ষিত সমাজের অনেকেই ভারতচন্দ্রের গুণপণা স্বীকার করিতে চাহেন নাই। রবীন্দ্রনাথ ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষতঃ কোন প্রতিকূল মন্তব্য করেন নাই, বরং গুণাকরের রচনারীতির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। কাব্যরসিকসমাজের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচনা

১৭ "His works are disfigured, too, by a disgusting obscenity which unfits them for republication at a time when Bengali readers are not all the rougher sex.'

—"রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য।" কিন্তু শিক্ষিত সমাজের কোন কোন অঞ্চলে ভারতচন্দ্রের রুচি ও মনোভঙ্গী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি লাভ করে নাই। দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' ভারতচন্দ্রের বিকৃত-রুচি ও চরিত্রসৃষ্টির অক্ষমতার নিন্দা করিয়াছেন, যদিও রায়গুণাকরের রচনা-শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরীই সর্বপ্রথম রসজ্ঞ সমালোচকের দৃষ্টি অনুসারে ভারতচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী প্রমাণের চেষ্টা করেন। তাঁহার *The Story of Bengali Literature* শীর্ষক পুস্তিকায় এবং ১৩৩৫ সনে শান্তিপুর সাহিত্য সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণে বিশেষ সূক্ষ্ম-দৃষ্টিসহ ভারতচন্দ্রের রচনারীতি, সরসতা, তীক্ষ্ণতা ও নাগরিক মনোভাবের উচ্চ প্রশংসা করা হয়। সে যাহা হউক, গত এক শতাব্দী ধরিয়া ভারতচন্দ্রের রচনারীতি, রুচি, ধর্মীয় আদর্শ সম্বন্ধে যেরূপ নানাপ্রকার পরস্পরবিরোধী মত ও মন্তব্য জমা হইয়াছে, তাহাতে কবিকে অবহেলা ভরে দূরে সরাইয়া রাখা যায় না। তাঁহার আদিরসঘটিত অনাবৃত বর্ণনা আধুনিক রুচিকে পীড়িত করিলেও কৃষ্ণনাগরিক ভারতচন্দ্রের বাণীপদ্ধতির মধ্যে যে সূক্ষ্মতা, বাগবৈদগ্ধ্য ও সরস কৌতুক আছে তাহা রুচিবান পাঠকেরও পরম আদরের সামগ্রী। এবার সংক্ষেপে তাঁহার জীবনকথার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

(২) ভারতচন্দ্রের জীবনকাহিনী॥ ভারতচন্দ্রের জীবনকাহিনী অতি বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষী—আধুনিক কালের গল্প-উপন্যাসেও তাহা স্বচ্ছন্দে স্থান পাইতে পারে।[১৮] কবি নিজে কাব্যমধ্যে আপনার সম্বন্ধে দুই-চারিটি তথ্য দিয়াছেন, যাহা হইতে তাঁহার জীবনের যৎসামান্য ঘটনা জানা যায়। কিন্তু কবি ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসর পরে বহু পরিশ্রম করিয়া কবি সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেন তাহার জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। গুপ্তকবির পূর্বে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে রক্ষিত ভারতচন্দ্রের পুঁথি অবলম্বনে দুইখণ্ডে অন্নদামঙ্গল প্রকাশ করেন (১৮৪৭)। কিন্তু তিনিও ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনসম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য দিতে

১৮ বাঙলা দেশের দুইজন খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক ভারতচন্দ্রের জীবনকথাকে উপন্যাসে গ্রহণ করিয়া এই মন্তব্যের যাথার্থ্যই প্রমাণ করিয়াছেন।

পারেন নাই। ঈশ্বর গুপ্ত প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া (১৮৪৬-৫৫) দেবানন্দপুর, মূলাজোড়, কৃষ্ণনগর, এবং গুস্তে গ্রামে বহু অনুসন্ধান করিয়া ভারতচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। গুপ্ত কবি ভারতচন্দ্রের পৌত্র মূলাজোড় নিবাসী অতিবৃদ্ধ তারকনাথ রায়ের নিকট ভারতচন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য ও অনেক অপ্রকাশিত কবিতা সংগ্রহ করিয়া ১৮৫৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ করেন। তাহার একমাস পরেই ঐ সমস্ত তথ্য 'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত' নামে প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ বাঙালীর রচিত ইহাই প্রথম কবিজীবনী। পরে যাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বর গুপ্তের সংগ্রহের উপর পুরা নির্ভর করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ ভুরস্থটের রাজবংশ ও কুলজী গ্রন্থাদি হইতে ভারতচন্দ্র সম্পর্কে দুই একটি নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের তথ্যগুলিই কবির ব্যক্তিগত জীবনী ও কাব্যের পটভূমিকা স্বরূপ অধিকতর মূল্যবান। এখানে স্বল্প পরিসরের জন্য আমরা ঈশ্বর গুপ্তের সংগৃহীত তথ্য হইতে কবিজীবনীর রূপরেখা আলোচনা করিতেছি।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের দুই এক স্থলে যৎসামান্য ব্যক্তিগত পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি সবিস্তারে পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্রের কুলজী ঘাঁটিয়াছেন, মহারাজের সভা ও সভাসদদের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়াছেন, তিনি নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই ইহা বিস্ময়ের কথা বটে। গ্রন্থমধ্যে তাঁহার এইটুকু পরিচয় পাওয়া যায় :

(১) ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ
সদাভাবে হতকংস ভুরস্থটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত ভারত ভারতীযুত
ফুলের মুখটি খ্যাত দ্বিজপদে সুমতি॥
দেবের আনন্দধাম দেবানন্দপুর গ্রাম
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুনসী।
ভারতে নরেন্দ্ররায় দেশে যার যশ গায়
হয়ে মোরে কৃপা দায় পড়াইলা পারসী॥

(২) সভাসদ তাহার ভারতচন্দ্র রায়।
ফুলের মুখটী নৃসিংহের অংশ তায়॥

ভুরিশিটে ভূপতি নরেন্দ্ররায় সুত।
কৃষ্ণচন্দ্র পাশে রবে হয়ে রাজ্যচ্যুত॥
* * *
কৃষ্ণচন্দ্র আমার আজ্ঞার অনুসারে
রায় গুণাকর নাম দিবেক তাহারে॥

(৩) কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ সুরেন্দ্র ধরণী মাঝ
কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।
সিন্ধু অগ্নি রাহুমুখে শশী ঝাঁপ দেয় দুখে
যার যশে হয়ে অভিমানী॥
তাঁর পরিজন নিজ ফুলের মুখটি দ্বিজ
ভরদ্বাজ ভারত ব্রাহ্মণ।
ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজধানী নানা কাব্যে অভিলাষী
যে বংশে প্রতাপনারায়ণ॥

এই সমস্ত তথ্য এবং ঈশ্বরগুপ্ত সংগৃহীত উপাদান হইতে ভারতচন্দ্রের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া যাইতে পারে। ধনী ভূস্বামী বংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। হাওড়া ও হুগলী জেলার অন্তর্গত ভুরসুট পরগণার অন্তর্ভুক্ত (প্রাচীন বাঙলার সারস্বত তীর্থ ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রাম) পেঁড়ো (পাণ্ডুয়া) গ্রামই তাঁহার জন্মভূমি ও শৈশবের লীলানিকেতন। চতুরানন নামে এক ব্রাহ্মণ খ্রীঃ চতুর্দশ শতাব্দীর দিকে ভুরসুট পরগণায় রাজা প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজ বংশকে রাজবংশ রূপে পরিচায়িত করেন। তাঁহার পুত্র ছিল না, একটি মাত্র কন্যা ছিল। সুতরাং মুখোপাধ্যায়-উপাধিক তাঁহার জামাতার শাখাই ভুরসুটে প্রাধান্য লাভ করে। এই বংশের রাজা প্রতাপনারায়ণ খুব বিখ্যাত হইয়াছিলেন। উক্ত রাজবংশের দ্বিতীয় শাখা পেঁড়োনিবাসী রাজা কৃষ্ণরায়ের বংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ রায়।[১৯] ভারতচন্দ্র

---

১৯ কিছুকাল পূর্বে কোন এক উপন্যাসিক লিখিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রের পিতার নাম রাজেন্দ্র রায়। ইহা লইয়া কোন একটি সাপ্তাহিকে কিছু বাদানুবাদ সৃষ্টি হইয়াছিল। কুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত 'নদীয়া কাহিনী'তে (২য় সংস্করণ, পৃ. ২৯৭) ভ্রমক্রমে ভারতচন্দ্রের পিতার নাম রাজেন্দ্রনারায়ণ লিখিত হইয়াছে। উক্ত উপন্যাসিক এই গ্রন্থ হইতে ভারতচন্দ্রের পিতার নাম সংক্রান্ত ভুল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। 'রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়' বোধহয় কুমুদনাথ মল্লিকের অনবধানতা বশতঃ ছাপা হইয়াছিল। নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ই তাঁহার প্রকৃত নাম—তাঁহার অন্য কোন নাম জানা যায় না। অন্নদামঙ্গলের যাবতীয় পুঁথিতে 'নৃপতি নরেন্দ্ররায়' বা 'ভূপতি নরেন্দ্ররায়'—এইরূপ উল্লেখ আছে।

সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। কবির সহধর্মিণীর নাম বোধ হয় রাধা,[২০] কারণ অনেক স্থলে তিনি ভণিতায় নিজের নামের স্থলে 'রাধানাথ' ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। যথা :

রাধানাথ তব দাস পুরাও মনের আশ
তবে ফণিচক্র ফণে তর গো ॥

রায়গুণাকর খুব সম্ভব একপত্নীক ছিলেন। কারণ অন্নদামঙ্গলের তৃতীয় খণ্ডে ('মানসিংহ') ভবানন্দের দুই স্ত্রীসম্ভাষণ প্রসঙ্গে কবি নিজের একস্ত্রী বিষয়ে সরস পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন :

এ সুখে বঞ্চিত কবি রায় গুণাকর।
দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর ॥

তাঁহার তিনপুত্র—পরীক্ষিত, রামতনু এবং ভগবান। মধ্যম পুত্র রামতনুর বংশধারা এখনও বর্তমান আছে।[২১]

কবির পিতা পেঁড়োগ্রামে আভিজাত্যসহ বাস করিতেন। কোন কারণে বর্ধমানরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া (ঈশ্বর গুপ্তের মতে বর্ধমানের রাজমাতা বিষ্ণুকুমারী) নরেন্দ্রনারায়ণের রাজ্য ভুরসুট আক্রমণ করিয়া গ্রাস করেন। অনুমান ১৭২০ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। ঈশ্বর গুপ্তের মতে ১৬৩৪ শকে (১৭১২ খ্রীঃ অঃ) তাঁহার জন্ম এবং ১৬৮২ শকে (১৭৬০ খ্রীঃ অঃ) তাঁহার তিরোধান হয়। এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ কবি কাব্যাদির রচনাকাল নির্দেশ করিলেও নিজের জন্মাব্দ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত দেন নাই। তবে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ হইতে তাঁহার জন্মকাল সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তাঁহার দ্বিতীয় কাব্য সত্যপীরের পাঁচালীর রচনাকাল—"সনে রুদ্র চৌগুণা"—অর্থাৎ ১১৪৪ বঙ্গাব্দ (১৭৩৭-৩৮)। ঈশ্বর গুপ্ত ভুল করিয়া ইহাকে ১১৩৪ বঙ্গাব্দ ধরিয়াছিলেন। তিনি লোকমুখে শুনিয়াছিলেন যে, এই কাব্য রচনার সময় কবির বয়স ছিল

২০ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ প্রকাশিত এবং সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী'তে (পৃ. ২২) রাধানাথ বলিতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু ডঃ মদনমোহন গোস্বামী ('রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র', পৃ. ২১) নানা তথ্য হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাধা ভারতচন্দ্রের পত্নীর নাম। ডঃ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমরা তাঁহার মত গ্রহণ করিলাম।

২১ ডঃ মদনমোহন গোস্বামী—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, পৃ. ১৬

মাত্র পনের বৎসর। কিন্তু এই সময় কবির বয়স পনের হইলে মৃত্যুকালে (১৭৬০) তাঁহার বয়স হইবে উনচল্লিশ বৎসর। সংস্কৃতে রচিত 'নাগাষ্টকে' কবি নিজের বয়স বলিয়াছেন চল্লিশ বৎসর—"বয়শ্চত্বারিংশত্তব সদসি নীতং নৃপ ময়া"। 'নাগাষ্টক'ই তাঁহার শেষ রচনা নহে, ইহার পরেও তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। তাঁহার চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় বর্ধমান রাজ কীর্তিচন্দ্রের দ্বারা তাঁহার পিতৃরাজ্য নষ্ট হয়, তিনি অল্পবয়সেই মাতুলালয়ে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। কীর্তিচন্দ্রের রাজত্বকাল ১৭০২-৪০ খ্রীঃ অব্দ। সুতরাং কবির জন্ম এই কয় বৎসরের মধ্যেই হইয়াছিল বলিয়া বোধহয়। ১৭৩৭-৩৮ খ্রীঃ অব্দে সত্যনারায়ণের দ্বিতীয় পাঁচালী রচনার সময় কবির বয়স অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর হইয়াছিল। কারণ সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় তখন তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই অনেকে অনুমান করেন, ১৭০৫-১০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে তাঁহার জন্ম হয়।[২২] আর একটা দিক হইতেও প্রায় এই একই সময় পাওয়া যায়। বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্র (১৭৪৪-৭০) বর্গীর আক্রমণে ভীত হইয়া মূলাজোড়ের নিকটবর্তী কাউগাছি গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার পত্তনিদার রামচন্দ্র নাগ কবির উপর কিছু অত্যাচার করিয়াছিলেন। কবি নাগের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া সংস্কৃতে 'নাগাষ্টক' শীর্ষক একটি অনতিদীর্ঘ কবিতা লিখিয়া রাজসমীপে প্রেরণ করেন তাই মনে হয়, এই নাগাষ্টক ১৭৪৫-৫০ সালের মধ্যে রচিত হইয়াছিল উহার একস্থলে কবি বলিয়াছেন, তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ। এই সমস্ত তথ্য ও অনুমান মিলাইয়া মনে হয়, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে (১৭০৫-১০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে) জন্মগ্রহণ করেন।

ধনীর দুলাল ভারতচন্দ্রকে বাল্য বয়স হইতেই নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল। আমৃত্যু সেই দুর্ভাগ্য মাঝে মাঝে তাঁহার জীবনে ধূমকেতুর মতো উদিত হইত। ভূস্বামী পিতা নিঃস্ব হইয়া পড়িলে বাল্যবয়সে কবি মাতুলালয় মণ্ডলঘাট পরগণার অধীনে নওয়াপাড়া গ্রামে গিয়া ব্যাকরণ অভিধান পাঠ করিয়া চৌদ্দ পনের বৎসর বয়সেই সংস্কৃত ভাষায় কৃতিত্ব অর্জন

২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৮, ৪র্থ সংখ্যা, ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ভারতচন্দ্র ও ভুরসুট রাজবংশ' দ্রষ্টব্য।

করেন। এই অপরিণত বয়সেই কবি গুরুজনের সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া মাতুলালয়ের পার্শ্ববর্তী গ্রামে বিবাহ করিয়া বসিলেন। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তাঁহার অগ্রজেরা তাঁহার উপর কিছু বিরূপ হইয়াছিলেন, কারণ তখন অর্থকরী ফারসী শিক্ষাই জীবিকার অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছিল—সংস্কৃত শিক্ষা উচ্চ সমাজ হইতে ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছিল। সংস্কৃতশিক্ষা, স্বেচ্ছানুরূপ বিবাহ প্রভৃতি কারণে তাঁহার পিতাও তাঁহার উপর কিছু বিরক্ত হইয়া থাকিবেন। ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া কবি বাঁশবেড়িয়ার নিকটবর্তী দেবানন্দপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ ধনী রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে গিয়া মনোযোগপূর্বক ফারসী শিক্ষা করিলেন। কিশোর কবিকে যে কিরূপ কৃচ্ছ্রতার মধ্যে বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত, ঈশ্বর গুপ্ত সে সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "দিবসে একবার মাত্র রন্ধন করিয়া সেই অন্ন দুইবেলা আহার করেন, প্রায় কোন দিবস ব্যঞ্জন পাক করেন নাই। একটা বেগুনপোড়ার অর্ধভাগ এবেলা এবং অর্ধভাগ ওবেলা আহার করিয়া তাহাতেই তৃপ্ত হইয়াছেন।"[২৩] এইখানেই তিনি মুন্সীর বাটীতে সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষে সত্যনারায়ণের (সত্যপীর) ব্রতকথা রচনা করেন। কবি ফারসী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করিয়া বাড়ী ফিরিলে অগ্রজদের অনুরোধে বিষয়কর্ম তত্ত্বাবধানে বর্ধমানরাজসভায় প্রেরিত হন। অতঃপর তাঁহার পিতা খাজনা দিতে অপারগ হইলে সেই অপরাধে কবি বর্ধমান রাজের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। সেখানে কিছুদিন কয়েদ থাকিয়া কবি কারাধ্যক্ষের আনুকূল্যে গোপনে পলায়ন করেন এবং বহুকষ্টে মারাঠা-অধিকৃত কটকে গিয়া ঐ অঞ্চলের মারাঠা সুবাদার শিবভট্টের সাহায্যে এক ভৃত্য সহ কিছুদিন নিশ্চিন্ত মনে পুরীধামের শঙ্করাচার্য মঠে অবস্থান করেন। এই স্থানে বৈষ্ণব সাহচর্যে এবং বৈষ্ণব গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া কবি বৈষ্ণব বেশবাস ধারণ করেন এবং সকলের নিকট 'মুনি গোঁসাই' (নারদ) নামে পরিচিত হন। পরে কবি একদল বৈষ্ণবের সঙ্গে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়া হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হন এবং কীর্তনের আসরে বসিয়া মনোহরশাহী কীর্তন শুনিতে থাকেন। সেই গ্রামে তাঁহার শ্যালীপতি বাস করিতেন। তিনি সংবাদ পাইয়া কবিকে পাকড়াও করিয়া লইয়া গেলেন এবং বৈষ্ণব বৈরাগীকে পুনরায় গার্হস্থ্য ধর্মে ফিরাইয়া

২৩ 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত'।

আনিলেন। কিন্তু কবি পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না, বধূকেও পিতার নিকট পাঠাইলেন না। অতঃপর ভারতচন্দ্র চন্দননগরের ফরাসী গভর্ণমেন্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন; চৌধুরী মহাশয় কবির বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া আশ্রয় দিলেন। যাহা হউক ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কবির গ্রাসাচ্ছাদনের নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। ভারতচন্দ্রের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে সভায় স্থান দিলেন। ইতিপূর্বে তিনি কিছু কিছু কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে মুকুন্দরামের আদর্শে চণ্ডীমঙ্গলের ধারা অনুসরণ করিয়া 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনার জন্য অনুরোধ করেন।[২৪] এই কাব্যের জন্য তিনি কবিকে 'রায়গুণাকর' উপাধি দিয়াছিলেন।[২৫] বিদ্যাসুন্দর ও ভবানন্দ মজুমদারের প্রসঙ্গ বোধ হয় কবি রাজাদেশেই অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন।[২৬] পরে কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে মূলাজোড় গ্রাম ছয়শত টাকা রাজস্বের বিনিময়ে ইজারা দিলেন এবং বাটী নির্মাণের জন্য কবিকে একশত টাকা দান করিলেন। অতঃপর কবি মূলাজোড়েই স্থায়িভাবে বসবাস করেন এবং মাঝে মাঝে কৃষ্ণনগর ও ফরাসডাঙায় যাতায়াত করিতে থাকেন। এই সময় বর্গীর

---

২৪ এই প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্ত বলেন, "ভারত বলিলেন, মহারাজ, কিরূপ রচনা করিতে অনুমতি করেন।" রাজা কহিলেন, "মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (যিনি কবিকঙ্কণ নামে বিখ্যাত ছিলেন) তিনি যে প্রণালীক্রমে ভাষা কবিতায় চণ্ডী রচিয়াছিলেন, তুমি সেই পদ্ধতিক্রমে অন্নদামঙ্গল পুস্তক প্রস্তুত কর।" (ঈশ্বর গুপ্তের পুস্তিকা)

২৫ দেবী অন্নপূর্ণা কৃষ্ণচন্দ্রকে স্বপ্নে আদেশ দেন যে, তিনি যেন ভারতচন্দ্রকে রায় গুণাকর উপাধি দেন—অন্নদামঙ্গলের 'গ্রন্থ সূচনা'য় কবি সেইরূপ ইঙ্গিত দিয়াছেন। দেবী কৃষ্ণচন্দ্রকে বলিলেন,

সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়॥
তুমি তারে রায়গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও॥

২৬ গুপ্তকবির মতে "কৃষ্ণচন্দ্র অন্নদামঙ্গলের রচনা দেখিয়া অনির্বচনীয় সন্তোষ পরবশ হইয়া কহিলেন, "বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণনা করতঃ ইহার সহিত সংযোগ করিতে হইবে।"—ঐ পুস্তিকা

উৎপাতে ভীত হইয়া বর্ধমান রাজ তিলকচন্দ্র ও তাঁহার মাতা মূলাজোড়ের নিকটবর্তী কাউগাছি গ্রামে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। রাজমাতা কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়া উক্ত গ্রাম নিজ নামে পত্তনি লইলেন এবং কর্মচারী রামদেব নাগকে পত্তনিদার নিযুক্ত করিলেন। পত্তনিদারের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হইয়া ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট সংস্কৃতে একটি কবিতা ('নাগাষ্টক') লিখিয়া পাঠাইয়া দেন এবং প্রতিকার প্রার্থনা করেন, প্রত্যেক শ্লোকের শেষে লিখিয়া দেন—"সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি।" রাজা কবিকে আর একটি গ্রামে (গুস্তে গ্রাম) বাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন, কবিও যাইতে প্রস্তুত হন, কিন্তু গ্রামবাসীদের অনুরোধে কবি শেষপর্যন্ত মূলাজোড়েই থাকিয়া যান। এই গ্রামে এখনও ভারতচন্দ্রের বংশধারা বর্তমান। ঈশ্বর গুপ্তের মতে ১৬৮২ শকে (১৭৬০ খ্রীঃ অঃ) আট-চল্লিশ বৎসর বয়সে বহুমূত্ররোগে কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর লোকান্তরিত হন। কবি দীর্ঘজীবী হইলে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্ত্যপর্ব অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হইত।

কবিজীবনীর এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে দেখা যাইতেছে, ভারতচন্দ্র বাল্য হইতে পরিণত বয়স পর্যন্ত নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। ভূস্বামীর সন্তান প্রথমজীবনেই নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু অল্প বয়স হইতেই প্রখর বুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাস তাঁহাকে দুঃখ-নৈরাশ্যের মধ্যেও সান্ত্বনা দিয়াছে, বিপদ অতিক্রমে সাহায্য করিয়াছে। আদিকবি ক্রৌঞ্চবধকারী নিষাদকে অভিশাপ দিয়াছিলেন—তুই কখনও শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবি না। কবি ভারতচন্দ্র যেন কাহার অভিশাপে কোথাও স্থায়ী হইতে পারেন নাই, দীর্ঘদিন যাযাবরের বেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। তবে অতিশয় প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিলেন বলিয়া তিনি কিছুই গ্রাহ্য করেন নাই। পিতা ও অগ্রজ ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁহার সদ্ভাব না থাকিবার কারণ—তাঁহার এই স্বাতন্ত্র্যবোধ। এই স্বাতন্ত্র্য-বোধের বড় প্রমাণ—কাহারও মতামতের অপেক্ষা না করিয়া তিনি অপেক্ষা-কৃত অপরিণত বয়সেই বিবাহ করিয়া বসিলেন। অবশ্য পিতা ও জ্যেষ্ঠদের সঙ্গে সদ্ভাব না থাকিলেও তাঁহাদের জন্যই তিনি বর্ধমানরাজের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। সেখান হইতে পলাইয়া নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের পর

কবি শ্রীক্ষেত্রে গিয়া মন না রাঙাইয়াও বসন রাঙাইয়া বৈষ্ণব সাজিয়া বসিলেন। ইহার পর শুধু নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের জন্য তাঁহাকে ধনীর দুয়ারে ধর্ণা দিতে হইয়াছে। মাঝে মাঝে ভিটাটুকুও হারাইবার ভয়ে তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। চল্লিশ টাকার মাসমাহিনার কবিকে রাজা-রাজড়ার মনোরঞ্জন করিতে হইয়াছে—তিনি নিজের জীবনেই বুঝিয়াছেন, "বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।" এই বালির বাঁধ তাঁহার জীবনে একাধিকবার ভাঙিয়াছে। বস্তুতঃ ঈশ্বর গুপ্ত সংগৃহীত ভারতচন্দ্রের জীবনকাহিনী অমূলক না হইলে (অমূলক নহে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস) রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রকে অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। জীবনের যে-কোন অবস্থাতেই তিনি বুদ্ধিবিচক্ষণতার সঙ্গে অগ্রসর হইয়া দুর্ভাগ্যকে পরাভূত করিবার চেষ্টা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দরবারী আদর্শে তিনি বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐশ্বর্য পান নাই, জমিদার-পুত্র হইয়াও জমিদারের উমেদারী এবং গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দাসত্ব করিয়াছেন; সরস্বতীর বরপুত্র হইয়াও তাঁহাকে লক্ষ্মীমন্তদের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে। কিন্তু এই দুর্বিপাকের মধ্যে পড়িয়াও তাঁহার মুখের হাসি ও চোখের কটাক্ষ নিভিয়া যায় নাই, রঙ্গের উতরোল উল্লাস ও ব্যঙ্গের তির্যকতা তাঁহার সদা-প্রসন্ন মনটিকেই উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে—রচনার মধ্য দিয়া তাঁহার কৌতুকপ্রবণ চাপা হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে—এমন কি কণ্ঠস্বরের ওঠা নামা পর্যন্ত যেন কর্ণগোচর হইতেছে। কবিপ্রিয়ার জবানীতে কবি সকৌতুকে নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥

ভাগ্যবঞ্চিত কবি কবিপ্রিয়াব স-ঝঙ্কার বাক্যধারা সহাস্যে গ্রহণ করিতেন বলিয়াই মনে হয়—শুধু তাই নয়, নিজ জীবনের বিরস আবহাওয়াকেও ভারতচন্দ্র সরস করিয়া লইয়া কাব্যে সেই সরসতা সঞ্চার করিয়াছেন।

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীতশাস্ত্রের অধ্যাপক॥
পুরাণ-আগমবেত্তা নাগরী পারসী।

ইহাই ছিল তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিধি। ইচ্ছা করিলে তিনি একজন ভট্টাচার্য

হইয়া টোল খুলিয়া বসিতে পারিতেন, অথবা মুর্শিদাবাদে নবাবসরকারে গিয়া কানে কলম গুঁজিয়া হিসাব-নিকাশ লইয়া ব্যস্ত হইতেও পারিতেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য যে, তিনি সরস্বতীর সাধনার পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামও ভারতচন্দ্রের প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে নানারূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া সাত-পুরুষের বাস্তুভিটা দামিন্যা ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কবিকঙ্কণ যদি শুধু দামিন্যায় বসিয়া 'চাষ চষিতেন' তাহা হইলে গ্রামের মাটি সরস হইলেও কবির মনের মাটি বিরস হইয়াই থাকিত। ভারতচন্দ্র ধনীর সেবা করিয়াও ব্যবহারিক জীবনে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, তাহা ঠিক বটে, কিন্তু তাঁহার মনে ব্যক্তিগত জীবনের বিষণ্ণতা ছায়া ফেলিতে পারে নাই, শিল্পীসুলভ নিরাসক্তি তাঁহার কাব্যে রৌদ্রকরোজ্জ্বল হাসি ছড়াইয়াছে।[২৭] এবার সংক্ষেপে তাঁহার রচনাবলীর পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

(৩) ভারতচন্দ্রের কাব্যপরিচয়॥ প্রত্যূষ-সূর্য দেখিয়া মাধ্যন্দিন সূর্যের প্রখরতা বুঝা যায় না, নবকিশোর ভারতচন্দ্রের প্রথম রচনা হইতে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের ভাবী স্বরূপও কল্পনা করা যায় না। কবি অতি তরুণ বয়সে পীরমাহাত্ম্যবিষয়ক গতানুগতিক কাহিনী বর্ণনা করিয়া কয়েক পৃষ্ঠায় সমাপ্ত যে দুইখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন, তাহার না আছে কাব্য-সৌন্দর্য, আর না আছে কোন গভীর তত্ত্বকথার ইঙ্গিত। তাঁহার নামে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পাঁচালী ধরনের দুইখানি অতিক্ষুদ্র পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। প্রথম পুস্তিকাখানির (কবি ইহাকে 'ব্রতকথা' বলিয়াছেন)[২৮] কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই, ঈশ্বর গুপ্ত ইহা সংগ্রহ করিয়া

---

২৭ এ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ হয়েও তাঁর দারিদ্র্য ঘোচেনি, এবং দারিদ্র্য তাঁকে নিরানন্দ করিতে পারেনি, করেছিল শুধু 'প্রমোদের প্রভু'। এ প্রভুত্ব হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের উপর আত্মার প্রভুত্ব। যথার্থ আর্টিস্টের মন সকল দেশেই সংসারনির্লিপ্ত, কস্মিনকালে বিষয়-বাসনায় আবদ্ধ নয়।" (প্রমথ চৌধুরী, প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ম, 'ভারতচন্দ্র")

২৮ ব্রতকথা সাঙ্গ হলো সবে হরি হরি বলো
দোষ ক্ষম যতেক পণ্ডিত।

কবি ঈশ্বরগুপ্ত বলিয়াছেন—'সত্যপীরের ব্রতকথা'।

'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্তে' প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় পালাটির একখানি পুঁথি (১৮২৯ খ্রীঃ অব্দের নকল) বর্ধমান সাহিত্যসভায় (পুঁ—৫৮৬) আছে। এই জন্য মনে হয় এই ক্ষুদ্র পাঁচালী দুইখানি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই, করিলে একাধিক পুঁথি মিলিত।

দুইটি পুঁথির মধ্যে একখানি ত্রিপদী আর একখানি চৌপদী ছন্দে রচিত সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের পাঁচালী। প্রথম পুঁথিটি দেবানন্দপুরনিবাসী হীরারাম রায়ের নির্দেশে এবং দ্বিতীয়খানি কবির পৃষ্ঠপোষক ঐ দেবানন্দ-পুরেরই ভূস্বামী রামচন্দ্র মুন্সীর ইচ্ছাক্রমে রচিত হয়। পুঁথি দুইখানিতে এমন কোন কবিত্ব বা রচনাবৈচিত্র্য নাই যাহার জন্য তরুণ কবিকে শিরোপা দিতে হইবে। এখন দেখা যাক, কোন্ পুঁথিটি আগে রচিত হইয়াছিল। চৌপদী ছন্দে রচিত পুঁথিটির শেষে কবি এইভাবে সনতারিখের নির্দেশ দিয়াছেন, "ব্রতকথা সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা"। একাদশ রুদ্র (১১) এবং ইহার চৌগুণ (৪৪) অর্থাৎ ১১৪৪ বঙ্গাব্দে কবি ইহা রচনা করেন। অন্যদিকে চৌগুণ (চতুর্গুণ) ৪৩ (চৌ=৪, গুণ=সত্ত্ব, রজঃ তমঃ অর্থাৎ—৩) ধরিলে ইহা ১১৪৩ হইতে পারে। অর্থাৎ কবির নিতান্ত তরুণ বয়সে (১৭৩৭-৩৮ খ্রীঃ অঃ) ইহা রচিত হয়।[২৯] কিন্তু ত্রিপদী ছন্দে রচিত পুঁথিটিতে শুধু হীরারাম রায়ের নাম ছাড়া অন্য কোন নির্দেশ নাই—যাহার দ্বারা রচনা-কাল, বা কোন্ পুঁথিটি আগে, কোন্‌টি পরে রচিত, তাহা নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায়। ঈশ্বর গুপ্তের বিবরণে দেখা যাইতেছে, কবি যখন রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন তখন আশ্রয়দাতার অনুরোধে তিনি "বাসায় গিয়া তদ্দণ্ডেই অতি সরল সাধুভাষায় উৎকৃষ্ট কবিতার পুঁতি রচিয়া শীঘ্রই সভাস্থ হইয়া সকলের নিকট তাহা পাঠ করেন" (ঈশ্বর গুপ্ত)। পাঁচালী শুনিয়া সভার সকলে এবং রামচন্দ্র মুন্সী তাঁহাকে যেভাবে প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তাহাতে মনে হইতেছে চৌপদী ছন্দে রচিত পাঁচালীটি কবির প্রথম রচনা। দুইখানি পুঁথির মধ্যে কোন্‌খানি প্রথম রচিত হয়, তাহা

২৯ ঈশ্বর গুপ্তের মতে "এই কবিতা যৎকালে রচনা করেন, তৎকালে ভারতের বয়স পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হয় নাই।" আবার আর এক স্থলে বলিয়াছেন, "যদি বাঙ্গলা সন ধরিয়া ১১৪৪ নির্ণয় করা যায় তাহা হইলে তৎকালে গ্রন্থকর্তার বয়স ১৫ বৎসরের পরিবর্তে ২৫ বৎসর নির্দেশ করিতে হইবে।" (গুপ্তকবি রচিত ভারতচন্দ্রের জীবনী সংক্রান্ত পুস্তিকা)

লইয়া ঈশ্বর গুপ্ত কিছু গোলে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার অনুমান হীরারাম রায়ের নির্দেশে ত্রিপদী ছন্দে রচিত পুঁথিটি প্রথমে এবং রামচন্দ্র মুন্সীর নির্দেশে চৌপদী ছন্দে রচিত পুঁথিটি পরে রচিত হয়। হীরারাম রায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইনি ভুরসুট রাজবংশের আর এক শাখার নায়ক—বর্ধমানরাজের অত্যাচারে স্বাধিকার ভ্রষ্ট হইয়া দেবানন্দপুরেই বাস করিতেছিলেন।[৩০] কিশোর ভারতচন্দ্র পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া দেবানন্দপুরে আসিয়া সর্বপ্রথম ইঁহার আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন। ইঁহারই নির্দেশে কবি ত্রিপদী ছন্দে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা রচনা করেন। এই সময়ে, মনে হয়, ভারতচন্দ্রের বয়স কৈশোর অতিক্রম করে নাই। ঈশ্বর গুপ্ত মনে করিয়াছিলেন, রামচন্দ্র মুন্সীর নির্দেশেই কবি সর্বপ্রথম সত্যনারায়ণের ব্রতকথা রচনা করেন। আমাদের ধারণা, ইহা ঠিক নহে। হীরারাম রায়ের নির্দেশেই তিনি প্রথমে ত্রিপদী ছন্দে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা রচনা করেন। বোধহয় হীরারাম রায়ের মৃত্যুর পর কবি রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুঁথিটি তাঁহারই নির্দেশে কবি চৌপদী ছন্দে রচনা করেন।

দুইটি পালার মধ্যে ত্রিপদীতে রচিত প্রথমটিতে কিঞ্চিৎ কবিত্বের পরিচয় আছে, কিন্তু চৌপদী ছন্দে রচিত দ্বিতীয় পালাটিতে স্বতঃস্ফূর্তির বিশেষ কোন পরিচয় নাই। ইহার ভাষাবিন্যাস ও ছন্দ অত্যন্ত কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ মনে করেন, "দুইটি কাব্যের রচনাকালের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান নাই। কারণ দুইটির বিষয়বস্তু বর্ণনা প্রায় একই ধরণের।"[৩১] কিন্তু পালা দুইটির বিষয়বস্তু এক প্রকার হইলেও বর্ণনারীতির মধ্যে পার্থক্য আছে। ত্রিপদীছন্দে রচিত পুঁথির ভাষা ও রচনারীতিতে অধিকতর পরিপক্বতা লক্ষ্য করা যায়—দ্বিতীয় পালায় সেরূপ কোন কৃতিত্ব দেখা যায় না। তবে দ্বিতীয় পালায় কবি নিজের সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য দিয়াছেন বলিয়া সেই দিক দিয়া ইহা মূল্যবান, উপরন্তু ইহাতে রচনাকালও উল্লিখিত হইয়াছে।

অর্বাচীন পুরাণে যে সত্যনারায়ণের গল্প (পুরাণে তাহার নাম সত্যদেব) বর্ণিত হইয়াছে,[৩২] ভারতচন্দ্রের পূর্বে আরও অনেক কবি ঐ বিষয় লইয়া এবং

৩০ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৮, ৪র্থ সংখ্যা (ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ভারতচন্দ্র ও ভুরসুট রাজবংশ')

৩১ ডঃ মদনমোহন গোস্বামী—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, পৃ. ১৬৮

৩২ স্কন্দপুরাণ. রেবাখণ্ড

নারায়ণ ও পীরকে এক করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মিলনসূচক পাঁচালী জাতীয় পীরমাহাত্ম্যকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র পূর্বসূরীরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন[৩৩] ("বুদ্ধিরূপ কৈল নানাজনা"), বিশেষ কোথাও মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই। পৃষ্ঠপোষকের নির্দেশে রচিত কয়েক পাতড়ার পাঁচালীতে প্রতিভা আবিষ্কার করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। অন্যান্য সত্যনারায়ণের ব্রতকথার মতো ভারতচন্দ্রের পুঁথিতেও তিনটি কাহিনী নামমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে,[৩৪]—ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্মা, এক কাঠুরিয়া এবং এক বণিকের (সদানন্দ) আখ্যান। সত্যপীরের কৃপায় ধনজন ঐশ্বর্য লাভের কাহিনীই পালাগুলির মূল বক্তব্য। প্রথম পালায় কবি বলিয়াছেন যে, দ্বিজ-ক্ষত্রিয়দিগকে হীন এবং মুসলমানদিগকে বলবান করিবার জন্যই কলিযুগে শ্রীহরি সত্যনারায়ণরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন :

দ্বিজ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র কলিযুগে ক্রমে ক্ষুদ্র
যবনে করিতে বলবান।

মুসলমান প্রাধান্যের যুগে হিন্দু কবিকে এইরূপ 'বৈতসীবৃত্তি' অবলম্বন করিয়া হরি ও পীরকে এক করিতে হইয়াছিল; শুধু তাই নহে, কবি এখানে হিন্দুর তুলনায় মুসলমানকে অধিকতর বলবান করিতে চাহিয়াছেন। যাহা হউক প্রথম রচনার কোন কোন স্থলে ভারতচন্দ্রের পরবর্তী কালের রচনার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। যেমন, নায়িকা চন্দ্রকলার বর্ণনা :

কাদম্বকোদর স্থূলা কাদম্বিনী সুকোমলা
চন্দ্রমুখী চন্দ্রকলা নাম।
হাসে হেরে যার পানে ধৈরজ কি তার প্রাণে
কামিনী কামনা করে কাম॥ (প্রথম পুঁথি)

---

৩৩ রামেশ্বর প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

৩৪ স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে সত্যদেবের আখ্যান আছে। এই আখ্যানের চারিটি শাখা—(১) সত্যদেবের কৃপাপ্রাপ্ত কাশীপুর গ্রামনিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের (নাম নাই) কাহিনী, (২) কাষ্ঠকেতু নামক এক কাঠুরিয়ার কাহিনী, (৩) এক বণিকের কাহিনী (নাম নাই), (৪) বংশধ্বজ রাজার কাহিনী। বাংলা সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে চতুর্থ কাহিনীর কোন উল্লেখ নাই, অধিকাংশ পুঁথিতে ব্রাহ্মণ ও বণিকের কাহিনী আছে। পুঁথির কাহিনী ও স্কন্দপুরাণের কাহিনী প্রায় একপ্রকার। শুধু নামগুলিতে পার্থক্য আছে।

কিংবা পতিবিরহে চন্দ্রকলার বিলাপ :

যৌবনে প্রভুর কাল মদনদহন জ্বাল কোকিল কোকিলা কাল
রাখ পদতলে হে।
যৌবন প্রফুল্ল ফুল কেবল দুঃখের মূল খেদে হয় প্রাণাকুল
ঝাঁপ দিই জলে হে॥ (দ্বিতীয় পুঁথি)

এখানে অতিতরুণ কবির ঈষৎ অপরিপক্ক রচনার দোষগুণ—দুই ই প্রকাশ পাইয়াছে। রচনার স্বচ্ছন্দগতি এবং আবেগের কৃত্রিমতা—যাহা রায়-গুণাকরের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এখানে তাহার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে।

উল্লিখিত দুইখানি পাঁচালী জাতীয় অতিক্ষুদ্র কাব্য কবির ফারসী শিক্ষার সময় বা শিক্ষাসমাপ্তির অব্যবহিত পরে রচিত হইয়াছিল। ভাগ্যহত তরুণ কবি তখন পরের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। ইহার পর তাঁহার জীবনে নানা বিপর্যয়ের পর তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আনুকূল্য লাভ করিলেন। কবির যে সত্যকারের প্রতিভা আছে, তাহা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কৃষ্ণচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন। মহারাজ গুণীর প্রতিপালক ছিলেন। তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া ভারতচন্দ্র পৃষ্ঠপোষকের মনোরঞ্জনের জন্য বোধহয় প্রথমে কয়েকটি ছোট ছোট গীতিকবিতা রচনা করেন।[৩৫] ঈশ্বর গুপ্ত এই সমস্ত কবিতা কবির পৌত্র তারকনাথ রায়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। এইরূপ এগারটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে: বসন্তবর্ণনা, বর্ষাবর্ণনা, হাওয়া বর্ণনা, কৃষ্ণের উক্তি, রাধিকার উক্তি-উত্তর, বলিরাজার উক্তি, বাসনা বর্ণনা, ধেড়ে ও ভেড়ে, করত্রাফ্‌থ বর্ণনা, হিন্দীভাষায় কবিতা, চৌপদী ছন্দে বাংলা-সংস্কৃত-ফারসী-হিন্দী মিশ্র ভাষায় রচিত কবিতা।[৩৬] এই কবিতাগুলি সম্পর্কে দুই

৩৫ ঈশ্বর গুপ্ত সংগৃহীত তথ্যানুসারে দেখা যাইতেছে, কৃষ্ণচন্দ্র ছোট ছোট কবিতায় খুশি না হইয়া কবিকে কোন দীর্ঘ কাব্য (মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের আদর্শে) রচনা করিতে অনুরোধ করিয়া বলেন, "ভারত তোমার প্রণীত কবিতায় আমার মনে অত্যন্ত প্রীতি জন্মিয়াছে, কিন্তু আমি এবম্প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য শুনিতে ইচ্ছা করি না।" ইহাতে মনে হয়, রাজার আশ্রয়ে গিয়া কবি সর্বপ্রথম কতকগুলি বিচ্ছিন্ন কবিতা রচনা করেন।

৩৬ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতচন্দ্রের বংশধরের নিকট হইতে ভরতচন্দ্র ভণিতাযুক্ত 'গঙ্গাষ্টক' শীর্ষক একটি সংস্কৃত কবিতা সংগ্রহ করিয়া ১৯২০ সংবতের 'রহস্যসন্দর্ভের ৯ম খণ্ডে প্রকাশ করেন। সেটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'ভারতচন্দ্রের রচনাবলী'তে গৃহীত হইয়াছে।

একটি কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন। কারণ কেহ কেহ ইহাতে আধুনিকতার প্রথম পদধ্বনি শুনিতে পাইয়াছেন। এগুলি সমস্তই যে মহারাজকে শুনাইবার জন্য রচিত হইয়াছিল তাহা মনে হয় না, সবগুলি এক সময়ে রচিতও হয় নাই। কবি বৈচিত্র্যের অনুরোধে বোধহয় বড় কাব্য রচনার ফাঁকে ফাঁকে এইরূপ বিচ্ছিন্ন কবিতা রচনা করিয়া থাকিবেন। নিছক দেবদেবীর কথা ছাড়িয়া রঙ্গরসের দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে কবি যে বাস্তবজীবনের ছবি আঁকিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বসন্ত, বর্ষা, হাওয়া প্রভৃতি ছোট ছোট কবিতায় সর্বপ্রথম বাস্তবদৃষ্টি ফুটিয়াছে—কবি যে মধ্যযুগীয় বাঁধাপথ ছাড়িয়া আপন-খনিত পথে চলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ এই সমস্ত ছোট ছোট কবিতায় পাওয়া যাইবে। অবশ্য কবির মনে এই ধরনের কবিতা রচনার বৈচিত্র্য-পিপাসা জাগিলেও সৃষ্টিপ্রতিভা তখনও জাগে নাই। কাজেই এই বিচ্ছিন্ন পদগুলি অতিশয় কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে, কোথাও-বা অনুচিত রঙ্গরস ও অবাঞ্ছিত লঘুতা কবিতাগুলিকে একেবারে মাটি করিয়া দিয়াছে। বসন্ত বায়ু সম্বন্ধে কবির উক্তি :

এবে বাস নাপখেকো   ভুবন করিলি ভেকো   কেবল কামের ডেকো
সঙ্গে লয়ে সামন্ত।
অনঙ্গেরে অঙ্গ দিলি   শুষ্ক কাষ্ঠ মুঞ্জরিলি   ভারতেরে ভুলাইলি
আ আরে বসন্ত॥

বর্ষার বর্ণনা :

ভুবনে করিলি তূর্ণ   নদনদী পরিপূর্ণ   বিরহিণী বেশ চূর্ণ
ভাবিয়া অভস।।
বিদ্যুতের চকমকি   ডাহুকের মকমকি   কামানল ধকধকি
বড় হৈল বর্ষা॥

রাধার প্রতি কৃষ্ণের অভিযোগ :

বয়স আমার অল্প   নাহি জানি রসকল্প   তুমি দেখাইয়া তল্প
জাগাইলে বামী।
ননী ছানা খাওয়াইয়া   রসরঙ্গ শিখাইয়া   অঙ্গভঙ্গী দেখাইয়া
তুমি কৈলা কামী॥

এই সমস্ত বর্ণনায় একটা অমার্জিত অথচ নাগরিক মনোভাব ফুটিয়াছে, যাহাতে চটুলতা, কৌতুকপ্রবণতা ও হালকা মনোভাবের অলসতা প্রকাশ

পাইলেও আন্তরিকতা ফুটে নাই। কবি যেন বাম হাত দিয়া অবহেলা ভরে এই কবিতাগুলি লিখিয়াছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যেমন হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্বভৌম, প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি পণ্ডিত, দার্শনিক ও জ্ঞানীগুণীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নানারূপ শাস্ত্রালোচনায় মগ্ন থাকিতেন, তেমনি আবার অবসর কালে গোপাল ভাঁড়, 'হাস্যার্ণব' উপাধিক জনৈক ব্রাহ্মণ এবং 'বৈবাহিক' নামে পরিচিত মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির দ্বারা রঙ্গরহস্য কৌতুকে মশগুল হইতেন।[৩৭] ভারতচন্দ্রের উল্লিখিত হালকা চালের কবিতায় কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সভার আরেক রূপের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কখনও কখনও তিনি সমস্যা পূরণের জন্য ভারতচন্দ্রকে একটি পংক্তি দিতেন, ভারতচন্দ্র সেই পংক্তিটিকে কবিতার একটি চরণ হিসাবে ব্যবহার করিয়া সমস্যা পূরণ করিতেন। হয়তো মহারাজ লীলাচ্ছলে একটি পংক্তি ("পায় পায় পায়") দিয়া ভারতচন্দ্রকে কবিতা রচনা করিতে বলিলেন। ভারতচন্দ্র তৎক্ষণাৎ ইহার প্রত্যুত্তর দিলেন :

কেঁদে কহে বৃন্দাবলী বলিরাজ শুন বলি ছলিবারে বনমালী
হলেন উদয়।

হেন ভাগ্য কবে হবে যার বস্তু সেই লবে জগতে ঘোষণা রবে
বলি জয় জয় ॥

এক পদ আছে বক্রী প্রকাশ করিলে চক্রী এদেহ করিয়া বিক্রী
ধরহ মাথায়।

তুমি আমি দুজনের ঘুচিল কর্ণের ফের মিলাইল বামনের
'পায় পায় পায়' ॥

---

৩৭ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কিছু রচনাশক্তি ছিল। শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞও ছিলেন বলিয়া তাঁহার উপাধি ছিল—"অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী শ্রীমন্মহারাজ"। তাঁহার সভাকবি বাণেশ্বরের সঙ্গে তিনি সংস্কৃত কবিতাও রচনা করিতেন। তাঁহার নামে একটি শ্যামাসঙ্গীত শাক্ত পদসংগ্রহে গৃহীত হইয়াছে—"অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণা রজ্জুরূপিণী"। তাঁহার দুই পুত্র শিবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্রও শাক্ত গান বাঁধিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্র কখনও কখনও মিশ্রভাষায় কবিতা লিখিয়া[৩৮] নানা ভাষাজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন :

শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর বারদকে গোয়দ রুবর কাতর দেখে আদর কর
কাহে মর রো রোয়কে।
বক্তু্ং বেদং চন্দ্রমা ছুঁ লালা যে রেমা ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা
মেট্রিমে কাহে শোয়কে॥

এসমস্ত রচনাকণ্ডূয়ন অধিকাংশ স্থলেই বিরক্তিকর—অলস, অর্ধশিক্ষিত, অমার্জিত ধনীসমাজের মনস্তুষ্টির জন্য বংশবদ কবির কাব্যছলনা মাত্র। এ সমস্ত রচনা ঈশ্বর গুপ্ত লোকমুখে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাই এইগুলির প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত নহে। তবে এইরূপ রঙ্গরসের দুই একস্থানে কিঞ্চিৎ আন্তরিকতা ফুটিয়াছে। যেমন বর্ষার বর্ণনা :

কখনও দারুণ ঝড় পাখী উড়ে পাখী জড়, ঘর ভাঙ্গে উড়ে খড়
নাহি যায় চাওয়া।
বেগ কে সহিতে পারে মেঘ স্থির হতে নারে ছলস্থল পারাবারে
প্রলয়ের দাওয়া॥

এখানে ঝড়ের চাক্ষুষ বর্ণনা উনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতার পূর্বাভাস সূচিত করিতেছে। আর একটি কবিতায় ('বাসনা বর্ণনা') কবির ব্যক্তিগত জীবনের কিয়দংশ চকিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সম্পন্ন ঘরের সন্তান ভারতচন্দ্র সারাজীবন নানা বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছিলেন, দারিদ্র্যের হাত হইতে বহুদিন মুক্তি পান নাই, রাজানুকূল্যে কিঞ্চিৎ সচ্ছলতা ঘটিলেও[৩৯] অল্পদিনের

---

৩৮ কখনও বা হিন্দী ভাষায় কবিতা লিখিতেন :

এক সম বৃকভানুকুমারী।
মাতপিত সন বৈঠ নেহারী॥
হয়ে লগ্ আউসর দূতী জো আয়ী।
ভেট্ চল নন্দলাল বোলায়ি॥

৩৯ কবির শেষজীবনে এই রাজানুকূল্যও দুর্লভ হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে যে মূলাজোড় গ্রাম ইজারা দিয়াছিলেন, তাহাই আবার ফিরাইয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। "বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ"—ইহার নিদারুণ তাৎপর্য ভারতচন্দ্র নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 'বিদ্যাসুন্দরে' সুন্দর বর্ধমানে উপনীত হইয়া একজন রাজকর্মচারীর সঙ্গে আলাপ করিতে থাকিলে সেই কর্মচারী (দ্বারপাল) চাকুরীজীবনের বিড়ম্বনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিল :

মধ্যে কবিকে আবার ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্মুখে পড়িতে হয়। কবিপ্রিয়ার জবানীতে কবি নিজ দুর্ভাগ্যের কথা এইভাবে বলিয়াছেন :

মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে॥
শাঁখা সোনা রাঙ্গা শাড়ী না পরিনু কভু।
কেবল কাব্যের গুণে বিহারের প্রভু॥

নিজের সাংসারিক দুরবস্থার কথা এইভাবে ইঙ্গিতে বলিয়াছেন। কিন্তু 'বাসনা বর্ণনা' কবিতায় তাঁহার মনের কথা স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়াছে। কবির ইচ্ছা ছিল ঐশ্বর্যলাভ—"বাসনা করয়ে মন পাই কুবেরের ধন সদা করি বিতরণ"। কিন্তু "বাসনা পূরণ নৈল"। কবির বাসনা পুরিল না, লাভের মধ্যে শুধু লোকের মিথ্যাভাষণ সার হইল—"লাভ হতে লাভ হৈল লোকে মিথ্যাভাষণা"। যাহা হউক এই সমস্ত প্রকীর্ণ কবিতা হইতে দেখা যাইতেছে, রাজসভাজীবী কবিকে প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য অনেক সময় প্রতিভা-সরস্বতীকে রাজার তাম্বূলকরঙ্কবাহিনীতে পরিণত করিতে হইয়াছে—বুদ্ধিজীবী সারস্বত ব্যক্তির এ দুর্ভাগ্য কোন দিন ঘুচে নাই, ঘুচিবেও না। ইহার পর 'রসমঞ্জরীর' উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ঈশ্বর গুপ্তের মতে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র ও রতিমঞ্জরীর আদর্শে ও অনুকরণে ভারতচন্দ্র 'রসমঞ্জরী' রচনা করেন। গুপ্তকবি এই পুস্তিকার রচনা-কাল সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, "এই চারুগ্রন্থের (অন্নদামঙ্গল) পর "রসমঞ্জরী" রচনা করেন তাহাও সর্ব্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে।" কিন্তু বর্তমান কালের গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে, 'রসমঞ্জরী' অন্নদামঙ্গলের পরে নহে, পূর্বে রচিত

ঠকভর, দরবার ছলে লয় ঘর দ্বার
খরধার ছুঁতে কাটে মাছি।
চাকুরির মুখে ছাই ছাড়িতে না পারি ভাই
বিষকৃমি সম হয়ে আছি॥
ইহা কি চল্লিশ টাকা বেতনের রাজবয়স্য ভারতচন্দ্রের প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ ?

হইয়াছিল। কারণ এই কাব্যে কবি নিজ বংশপরিচয় দিতে গিয়া ইঙ্গিতে সনের উল্লেখ করিয়াছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গুণব্যাখ্যানে কবি বলিয়াছেন :

সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে শশী ঝাঁপ দেয় দুখে
যার যশে হয়ে অভিমানী ॥

ইহা হইতে কেহ কেহ ১১৪৭ বঙ্গাব্দ (১৭৪০ খ্রীঃ অঃ) পাইয়াছেন। কাব্য রচনার সন হিসাবে ইহা সত্য হইতে পারে।[৪০] কিন্তু যে-ভাবে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা যে কোন্ সনের প্রহেলিকা, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। অবশ্য আর এক দিক হইতে 'রসমঞ্জরী'র রচনাকাল সম্পর্কে অনুমানের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। ভণিতায় কবি কোথাও 'গুণাকর' উপাধি সংযুক্ত করেন নাই, এই উপাধি তিনি 'অন্নদামঙ্গল' রচনার সময়ে (১৭৫২) বা পরে পাইয়াছিলেন। ১৭৪৯ খ্রীঃ অব্দের একটি দলিলে কিন্তু তাঁহাকে 'রায় গুণাকর' বলা হইয়াছে। এই দলিলের নকল (১২০২ সালের নকল) নদীয়ায় কালেক্টরীতে আছে। মূল দলিল ১১৫৬ সালে ১লা অগ্রহায়ণ (১৭৪৯) সম্পাদিত হয়। ইহাতে তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং শ্রীতরঙ্গ নকল শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর সদুদারচরিতেষু"। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ১৭৪৯ খ্রীঃ অব্দেই তিনি 'রায়-গুণাকর' উপাধি পাইয়াছিলেন। অতঃপর সিদ্ধান্ত করিতে হয়, কবি অন্নদামঙ্গল রচনার পূর্বেই রাজার নিকট 'রায়গুণাকর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। 'রসমঞ্জরী'তে 'রায়গুণাকর' ভণিতা কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই—তাই মনে হয় ইহা অন্নদামঙ্গলের কিছু পূর্বে, ১৭৪৯ খ্রীঃ অব্দেরও পূর্বে রচিত হয়।

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ মৈথিলী কবি ভানুদত্ত কামশাস্ত্র ও অলঙ্কারশাস্ত্র মিলাইয়া 'রসমঞ্জরী' শীর্ষক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'র আদর্শ ভানুদত্তের এই গ্রন্থ। মৈথিলী কবি বাঙালী জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র অনুসরণে 'গীতগৌরীশ' নামে একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি জয়দেবের পরবর্তী কালের কবি। ১৪২৮ খ্রীঃ অব্দে অনন্তপণ্ডিত 'রসমঞ্জরী'র একখানি টীকা ('রসমঞ্জরী প্রকাশিকা')

---

৪০ ডঃ মদনমোহন গোস্বামী—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, পৃ. ১৩৭

রচনা করেন।[৪১] কবি তাহা হইলে নিশ্চয় ইহার পূর্বে বর্তমান ছিলেন। যাহা হউক ভারতচন্দ্র যে ভানুদত্তের আদর্শে 'রসমঞ্জরী' রচনা করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই—কারণ উভয়ের মধ্যে বহু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু রায়গুণাকর ভানুদত্তের রচনার হুবহু অনুবাদ করেন নাই। কাব্যারম্ভে ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন :

রসমঞ্জরীর রস ভাষায় করিতে বশ
আজ্ঞা দিলা রসে মিশাইয়া।

কিন্তু কবি 'রসমঞ্জরী'র মূল লেখক ভানু দত্তের কোন উল্লেখ করেন নাই। ভানু দত্তের গ্রন্থের ধারা অনুসরণ করিলেও রায়গুণাকর অনেক স্থলে নিজস্ব মৌলিকতাও দেখাইয়াছেন। সমধর্মী অন্যান্য গ্রন্থ হইতেও তিনি অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। যথা—জয়দেবের (গীতগোবিন্দের কবি নহেন) 'রতিমঞ্জরী', বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণ', বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র', রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি', জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্যের 'পঞ্চসায়ক' কল্যাণমল্লের 'অনঙ্গরঙ্গ'।[৪২] ভানুদত্তের গ্রন্থে কামশাস্ত্র ও অলঙ্কার শাস্ত্রের আদর্শে নায়িকাভেদ, নায়িকাসহায়, নায়কপ্রকারভেদ, নায়কসহায়, শৃঙ্গার, বিপ্রলম্ভ, বয়োবিভাগ, জাতিকথন প্রভৃতি বর্ণনা গৃহীত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রও সেই ধারা অনুসরণ করিয়া মূল বর্ণনাকে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন।[৪৩] অলঙ্কার শাস্ত্রের বর্ণনার যথাযথ অনুকরণ, কোথাও বা কিছু ব্যতিক্রম—ইহাতে ভারতচন্দ্রের প্রতিভার কিছু পরিচয় থাকিলেও উহা প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা নহে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। নায়ক-নায়িকা, নায়িকাসহায়িকা, নায়কসহায়ক প্রভৃতি বর্ণনায় অলঙ্কারশাস্ত্র ও কামশাস্ত্রের বাঁধা পথ ধরিয়া যেমন ভানুদত্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রও সেই পথ ধরিয়াছিলেন।

---

৪১ Dr. S. N. Dasgupta & Dr. S. K. De—*History of Sanskrit Literature*, Vol. I, p. 561 (Ist Edition), C. U.

৪২ ডঃ মদনমোহন গোস্বামী প্রণীত উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৩৮

৪৩ পুঁথি বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন :

(১) প্রত্যেক বর্ণিতে হয় কবিতা বিস্তর।
অনুভবে বুঝে লবে নাগরী-নাগর॥

(২) পুঁথি বাড়ে সকলের করিতে কবিতা।
অনুভবে বুঝ সবে লক্ষণ মিলিতা॥

কারণ কাব্যারম্ভেই তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন—"রসমঞ্জরীর রস ভাষায় করিতে বশ" তিনি বাংলা ভাষায় রসমঞ্জরী রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

একদা বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকাব্যের সার্থক দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া প্রথমেই ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'র নাম করিয়াছিলেন। ইহাতে স্থানে স্থানে গীতি-কবিতার স্পর্শ আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কবি সুললিত ছন্দে শৃঙ্গার রসাদির সংজ্ঞা দিয়া তার পরে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেমন বিপ্রলব্ধা নায়িকার সংজ্ঞায় তিনি বলিয়াছেন :

সঙ্কেত স্থানেতে গিয়া নাহি পায় পতি।
বিপ্রলব্ধা তাবে বলে পণ্ডিত সুমতি॥

পরে এই সংজ্ঞার বৃত্তি করিয়াছেন এইভাবে :

তিল পরিমাণ মান সদা করি অনুমান
গুরু ভয় লঘুভয় গেলা।
গৃহ ছাড়ি ঘন বন করিলাম আরোহণ
সাগর তরিনু ধরি ভেলা॥
হরি হরি মরি মরি উহু উহু হরি হরি
তবু নহে হরি সনে মেলা।
পর দুঃখ পর শ্রম পর জনে জানে কম
অপরূপ খলজনে খেলা॥

এই সমস্ত বর্ণনা কৃত্রিমতা দোষদুষ্ট ও গতানুগতিকতার দ্বারা ক্লিষ্ট, কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাটি মধুর গীতিরস সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে :

ওলো ধনি প্রাণধন শুন মোর নিবেদন
সরোবরে স্নানহেতু যেও না লো যেও না।
যদ্যপি বা যাও ভুলে অঙ্গুলে ঘোমটা তুলে
কমলকানন পানে চেও না লো চেও না॥
মরাল মৃণাল লোভে ভ্রমর কমল ক্ষোভে
নিকটে আইলে ভয় পেও না লো পেও না।
তোমা বিনা নাহি কেহ ঘামে পাছে গলে দেহ
বায় পাছে ভাঙ্গে কটি ধেও না লো ধেও না॥

যৌবন-বন্দনায় কবি বলিয়াছেন :

যৌবন-মরম না জানে যেবা।
পণ্ডিত তাহারে বলয়ে কেবা॥



শিবের বিবাহ—অন্নদামঙ্গল

(১৮১৬ সালে প্রথম-মুদ্রিত অন্নদামঙ্গলের কাঠখোদাই)

তপ-জপ-জ্ঞান-দান যে কিছু।
সকলি যৌবন-ধনের পিছু॥
যৌবন এ তিন অক্ষর লেখ।
যে জানে মরম উত্তম দেখ॥

কৃষ্ণনাগরিক রায়গুণাকর এখানে যেন 'হেডোনিস্ট্' কামসংহিতার মন্ত্রপাঠ করিয়াছেন। যৌবনের কবি ভারতচন্দ্র 'রসমঞ্জরী'তে যৌবনের নানা ছলা-কলার কথা বলিয়াছেন। অবশ্য আধুনিক রুচির নিকট এই কামশাস্ত্র ও অলঙ্কার শাস্ত্রের 'হ্যাণ্ডবুক' নিতান্তই বাহুল্য মনে হইবে। যেমন—ধীরা নায়িকার ভেদ : মধ্যাধীরা, মধ্যা-অধীরা, মধ্যা ধীরাধীরা, প্রগলভা ধীরা, প্রগল্‌ভা অধীরা, প্রগল্‌ভা ধীরাধীরা, ধীরা জ্যেষ্ঠা, ধীরা কনিষ্ঠা, অধীরা জ্যেষ্ঠা, অধীরা কনিষ্ঠা, ধীরাধীরা জ্যেষ্ঠা, ধীরাধীরা কনিষ্ঠা,—এই জাতীয় আলোচনা আধুনিক পাঠকের নিকট সময়ের অনাবশ্যক অপব্যয় মনে হইবে। ধীরা-অধীরা নায়িকার ভেদ লইয়া এরূপ permutation combination-এ কবির বুদ্ধিকৌশল প্রমাণিত হইলেও পাঠকের ধৈর্যরক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। অবশ্য দুই এক স্থলে সরস কবিত্বও প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া 'রসমঞ্জরী'কে কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যায় না।

ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয়—"অন্নদামঙ্গলকাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের অন্যতম। ভারতচন্দ্র পরিণত বয়সে পরিপক্ক রচনাশক্তির সাহায্যে কবিপ্রতিভার সার্থক দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন এই অন্নদামঙ্গল কাব্যে।" এই কাব্য রচনা করিয়াই বোধ হয় কবি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট রায়গুণাকর উপাধি পাইয়াছিলেন।[৪৪]

৪৪ কৃষ্ণচন্দ্র অন্নপূর্ণা প্রতিমাপূজার রীতি প্রচলন করেন, এবং কবিকে রায়গুণাকর উপাধি দিয়া তাঁহাকে অন্নদামাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্য লিখিতে বলেন। কবি অন্নদামঙ্গলের প্রারম্ভে 'কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বর্ণনে' বলিয়াছেন :

সেই রাজা এই অন্নপূর্ণার প্রতিমা।
প্রকাশিয়া পূজা কৈলা অনন্ত মহিমা॥
কবি রায় গুণাকর খ্যাতিনাম দিয়া।
ভারতেরে আজ্ঞা দিলা গীতের লাগিয়া॥

অন্নদামঙ্গলের তৃতীয় খণ্ড 'মানসিংহ' উপাখ্যানের সমাপ্তিতে কবি কাব্যরচনার সন উল্লেখ করিয়াছেন :

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

অর্থাৎ ১৬৭৪ শকে (১৭৫২ খ্রীঃ অঃ) চল্লিশ বৎসর বয়সে কবি এই সুবৃহৎ কাব্য রচনা করেন। অন্নদামঙ্গল তিন খণ্ডে বিভক্ত : (ক) অন্নদামঙ্গল বা পৌরাণিক লৌকিক অংশ, (খ) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর, (গ) অন্নপূর্ণামঙ্গল বা মানসিংহ। কাব্য তিনখানি একসঙ্গে রচিত না পৃথক সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছেন—কবি প্রথমে অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশ করিলেন, "বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণনা করতঃ ইহার সহিত সংযোগ করিতে হইবে।"[৪৫] বিদ্যাসুন্দর পৃথকভাবে রচিত হোক আর নাই হোক, কবি তিনখানি কাব্যকে একই গ্রন্থে গাঁথিয়াছিলেন। কারণ তিনখানির মধ্যে কাহিনীর যোগসূত্রগত আত্মীয়তার বন্ধন রহিয়াছে। তিনখানি আখ্যান যে একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ কবি তৃতীয় খণ্ড 'মানসিংহে'র শেষেই সনের উল্লেখ করিয়াছেন, অন্য দুই খণ্ডে (অন্নদামঙ্গল ও কালিকা-মঙ্গল) পৃথকভাবে সনের কোন উল্লেখ নাই।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে মহারাজের নিজ কীর্তি এবং তাঁহার পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের রাজ্য ও রাজা উপাধি লাভের কাহিনী বর্ণনাই ছিল কবির প্রধান উদ্দেশ্য। দেবী অন্নদা কিভাবে ভবানন্দ মজুমদারকে কৃপা করিলেন, এবং ভবানন্দ কিভাবে জাহাঙ্গীরের দ্বারা

---

৪৫ ঈশ্বর গুপ্তের পুস্তিকা হইতে মনে হয়, কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অনুরূপ কাব্য রচনার আদেশ দেন। পরে বোধহয় প্রথম খণ্ড অন্নদামঙ্গল শুনিয়া ইহাতে বিদ্যাসুন্দর আখ্যান জুড়িয়া দিতে বলেন। প্রচলিত জনশ্রুতিতেও দেখা যাইতেছে, কবি পৃথকভাবে বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া রাজাকে পড়িতে দিয়াছিলেন। অন্য কার্যে ব্যস্ত মহারাজ কাব্যখানিকে তাকিয়ার উপর হেলাইয়া রাখেন। তাহাতে কবি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া সরসভাবে বলিয়াছিলেন, উক্ত অবস্থায় রাখিলে কাব্যের রস গড়াইয়া পড়িবে। তখন কৃষ্ণচন্দ্র অন্য কাজ ফেলিয়া রাখিয়া বিদ্যাসুন্দর পাঠ করেন এবং কবির আদিরস রচনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইহাতে মনে হয়, বিদ্যাসুন্দর পৃথকভাবে রচিত হইয়াছিল। (দ্রষ্টব্য—দে কোম্পানী প্রকাশিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী)

অন্নপূর্ণা পূজা করাইয়া রাজত্ব ও রাজা খেতাব লাভ করিলেন—ইহার বর্ণনাই ছিল কবির প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য। কিন্তু কবি পৌরাণিক অংশ বিশেষ ফলাও করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বরং বিদ্যাসুন্দর ও মানসিংহ আখ্যান মূল অন্নদামঙ্গলের তুলনায় কিছু নিষ্প্রভ মনে হয়।

অন্নদামঙ্গল আখ্যানটি এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে—বাঙলা তখন আলিবর্দির (মহাবদ জঙ্গ) শাসনে ছিল। মুঘল সেনাবাহিনী ভুবনেশ্বর আক্রমণ করিয়া মন্দিরাদি ধ্বংস করিলে ক্রুদ্ধ মহাদেবের স্বপ্নাদেশের ফলে বর্গীর রাজা ভাস্কর পণ্ডিতকে বাঙলা লুঠিয়া অত্যাচারকারী মুসলমানকে যথোচিত শাস্তি দিতে আদেশ দিলেন। তারপর বাঙলা দেশে ভয়াবহ বর্গীর উৎপাত শুরু হইল, আলিবর্দির রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িল। অত্যাচারী নবাব মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট বার লক্ষ টাকা নজরানা দাবি করিয়া বসিলেন। রাজা এত টাকা দিতে অপারগ হইলে আলিবর্দি তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। বিপন্ন রাজা কারাকক্ষেই দেবী অন্নদাকে চৌত্রিশ অক্ষরে বন্দনা করিলে দেবী স্বপ্নাদেশ দিলেন, অন্নদার মূর্তি গড়াইয়া পূজা করিলে রাজা বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবেন, সভাসদ কবি ভারতচন্দ্রকে দেবী-মাহাত্ম্য বিষয়ক গান লিখিতেও আদেশ করিলেন :

সেই আজ্ঞামত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিলা সে দায়॥

এবং

সেই আজ্ঞামত কবি রায় গুণাকর।
অন্নদামঙ্গল কহে নবরসতর॥

অতঃপর পৌরাণিক আখ্যান অনুসরণে এবং কাশীখণ্ড অবলম্বনে ভারতচন্দ্র সতী ও মহাদেবের বিবাহ, যজ্ঞস্থলে দক্ষ কর্তৃক শিবনিন্দা, সতীর দেহত্যাগ, দক্ষযজ্ঞ নাশ, দক্ষের ছাগমুণ্ড প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। তারপরে হিমাচল গৃহে সতীর উমা রূপে পুনর্জন্ম, হরধ্যানভঙ্গের জন্য মদনের চেষ্টা, মহাদেব কর্তৃক মদনভস্ম, রতিবিলাপ প্রভৃতি পুরাপুরি পুরাণের ছাঁচে ঢালা হইয়াছে। খানিকটা লৌকিক ভাব-ভাবনানুযায়ী হরপার্বতীর বিবাহ ও কৈলাসে দাম্পত্যজীবন যাপনের কাহিনীও ইহার অন্যতম বর্ণিতব্য বিষয়। সেখানে দরিদ্র শিবের সঙ্গে শিবানীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষায় গমন, দেবীর মায়ায় ব্যর্থ

হইয়া প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি বর্ণনাও আছে। তারপর মহাদেব দেবী অন্নপূর্ণার নিকট 'সঘৃত পলান্ন' পায়সপয়োধি পিষ্টক প্রভৃতি পঞ্চমুখে আহার করিলেন। অতঃপর দেবীর মহিমাবৃদ্ধির জন্য শিব কাশী নির্মাণ করিয়া তাহাতে "চতুর্বর্গ-প্রদা গড়িল অন্নদা অনন্ত নাম মহিমা।" দেবতাদের সুকঠোর তপস্যায় দেবী দুর্গা অন্নপূর্ণা মূর্তিতে কাশীধামে অধিষ্ঠিতা হইলেন। চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে "অবতীর্ণা অন্নপূর্ণা হইলা কাশীতে"। মধুমাসের উৎসব, কাজেই যৌবনের কবি ভারতচন্দ্র দেবীর অধিষ্ঠান বর্ণনা করিতে গিয়া যৌবনের মোহনমন্ত্র ভুলেন নাই :

কলকোকিল অলিকুল বকুল ফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউলে॥
কমল পরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে।
বসন্ত রাজা আনি ছয় রাগিণী রাণী
করিলা রাজধানী অশোকমূলে॥
কুসুমে পুনপুন ভ্রমর গুন গুন
মদন দিল গুণ ধনুক হুলে।
যতেক উপবন কুসুমে সুশোভন
মধু মুদিত মন ভারত ভুলে॥

ইহা ঠিক দেবীবন্দনার পটভূমিকা নহে। কিন্তু যেখানে কাল মধুমাস, সেখানে মদন যদি সায়ক শানাইতে থাকেন এবং ভ্রমরে গুন গুন করিয়া কবির মন বিকল করিয়া দেয়, তাহা হইলে কবিই বা কি করিবেন, আর দেবী অন্নপূর্ণাই বা কি করিবেন? অতঃপর সুধন্য চৈত্রমাসে মহাদেব নিজে আদ্যাশক্তি অন্নপূর্ণার পূজা করিলেন। দেবী দেবতাদের বর দিয়া বলিলেন যে, মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার পূজা করিলে করতলে "তার ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম।"

ইহার পর আরও দুইটি কাহিনী আছে। একটিতে ব্যাসদেবের ব্যাসকাশী নির্মাণে ব্যর্থতা ও অশেষ দুর্গতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পৌরাণিক কাহিনী—মার্কণ্ডেয় পুরাণের কাশীখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় কাহিনী হরি-হোড়ের বৃত্তান্ত এবং ভবানন্দ মজুমদারের (কৃষ্ণচন্দ্রের খ্যাতনামা পূর্বপুরুষ) প্রতি দেবীর কৃপা বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কাহিনীটি কবিকল্পিত। কবি

প্রথম ও দ্বিতীয় কাহিনীর খানিকটা কাশীখণ্ড (মার্কণ্ডেয় পুরাণ) এবং ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। দেবীকর্তৃক ব্যাসের ছলনা 'কাশীপরিক্রমা' নামক একখানি অর্বাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়, কাশীখণ্ডে এই বর্ণনা নাই। ইহাতে দেখা যাইতেছে, পরম বৈষ্ণব ব্যাসদেব সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিবশতঃ হরিহরে ভেদ করিয়াছিলেন। যখন তিনি হরিভক্ত হইয়াছেন, তখন হরের নিন্দা করিয়াছেন, আবার হরির নিকট তর্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ হরিকে ছাড়িয়া ঘোরতর শিবভক্ত হইয়াছেন। এইরূপ হাস্যকর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির জন্য শিবের নিকট তাঁহাকে অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছে। অতঃপর শিব যখন তাঁহাকে পর্ব ব্যতীত কাশী-পরিক্রমা নিষেধ করিয়া দিলেন, তখন ক্ষুব্ধ অপমানিত বৃদ্ধ ব্যাস নূতন করিয়া কাশী নির্মাণ করিবার উদ্যোগ করিলেন ; ইহার জন্য সমস্ত দেবতার দ্বারস্থ হইলেন। দেবতারা তাঁহাকে এই বাতুলতা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলে তিনি শিবের উপর চটিয়া অন্নপূর্ণার ধ্যান আরম্ভ করিলেন। অন্নপূর্ণা কি আর করিবেন. তাঁহাকে সে ডাকে সাড়া দিতে হইল। কারণ দেবতারাও মন্ত্রের অধীন। কিন্তু দেবী জরতীর ছদ্মবেশে আবির্ভূত হইয়া ধ্যানস্থ ব্যাসের ধ্যানে বিঘ্ন করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, "কি হইবে এখানে মরিলে ?" বৃদ্ধ ব্যাস বিরক্ত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "গর্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে।" দেবী ব্যাসের মুখ হইতে এই কথাই বাহির করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্যাসের ভাগ্যদোষে বরই শাপ হইল—"তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্ধান।" এইরূপে কাশীমহিমা রক্ষিত হইল। ব্যাসের অসম্ভব প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ব্যাসকাশী গর্দভ-বারাণসী নামে উপহসিত হইল।

অতঃপর দেবী মর্ত্যলোকে পূজা প্রচার করিতে আসিয়া কুবেরের অনুচর বসুন্ধরকে অনুচিত কর্মের জন্য অভিশাপ দিয়া নরলোকে জন্মগ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। বসুন্ধর মর্ত্যে গিয়া অতি দরিদ্র বিষ্ণুহোড়ের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল—তখন তাহার নাম হইল হরিহোড়। এই স্থান হইতে তৃতীয় কাহিনী বা মর্ত্যলোকের কাহিনীর সূত্রপাত। ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ দেবীভক্ত ভবানন্দ মজুমদারের কীর্তি বর্ণনা করিবার জন্যই পুরাতন মঙ্গলকাব্যের ছাঁদে এই কাহিনী রচনা করিয়াছেন।

অতি দরিদ্র বিষ্ণুহোড় কায়স্থ হইলেও দারিদ্র্যের জন্য লোকে তাহাকে 'বাহাত্তরে কায়স্থ' বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। হরিহোড় মাতাপিতার ভরণপোষণের জন্য মাঠঘাট ঘুরিয়া ঘুঁটে কুড়াইয়া কোনও প্রকারে জীবিকা নির্বাহ করেন। অতঃপর দেবী কৃপাপরবশ হইয়া বৃদ্ধার বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বর দিলেন, তুচ্ছ ঘুঁটে সোনার ঘুঁটে হইয়া গেল। দেবীর কৃপায় বড়লোক হইয়া হরিহোড় দেবীকে দিয়া এই কথা কবুল করাইয়া লইলেন যে, তিনি দেবীকে নিজে চলিয়া যাইতে না বলিলে দেবী তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না, তাঁহার গৃহে দেবীকে অচলা হইয়া থাকিতে হইবে। হরিহোড় দেবীর কৃপায় সম্পন্ন গৃহস্থ হইয়া কুলীন বংশের তিনকন্যা বিবাহ করিলেন ("ঘোষ বসু মিত্র মুখ্য কুলীনের কন্যা"), তারপর তিনি ঘটা করিয়া দেবীর পূজা করিলেন, মর্ত্যে দেবীর পূজা প্রচার লাভ করিল। মহা আনন্দে হরিহোড়ের দিন কাটিতে লাগিল। এদিকে দেবী বসুন্ধরকে মর্ত্যজীবন হইতে স্বর্গে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, কারণ হরিহোড়রূপী বসুন্ধরের দ্বারা মর্ত্যে তাঁহার পূজা প্রচার লাভ করিয়াছে। সুতরাং এখন তাঁহাকে স্বস্থানে ফিরাইয়া লইতে হইবে। স্বর্গে বসুন্ধরের স্ত্রী বসুন্ধরা দেবীর নিকট নিত্যই অনুযোগ করিত, তাহাকে স্বর্গে রাখিয়া দেবী তাহার স্বামীকে মর্ত্যে শাপ দিয়া পাঠাইলেন, এ তাঁহার কিরূপ বিচার! তখন দেবী ভাবিলেন, এই বসুন্ধরাকে কলহপরায়ণা রমণীরূপে মর্ত্যে পাঠাইয়া দিলে বসুন্ধরকে স্বর্গে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইবে। তখন বসুন্ধরা মর্ত্যে মহা ঠক ঝড়ু দত্তের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিল, মর্ত্যজীবনে তাহার নাম হইল সোহাগী। শিশুকাল হইতেই সোহাগী কোন্দল বিদ্যায় পটিয়সী হইল। "বৃদ্ধকালে হরিহোড় বিয়া কৈল তারে"—চতুর্থপক্ষের স্ত্রী[৪৬] সোহাগী হরিহোড়ের গৃহে আসিয়া এমন কোন্দল জুড়িয়া দিল যে, বাড়ীতে আর শান্তি রহিল না, দেবীও হরিহোড়ের আবাস ছাড়িতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু পূর্ব প্রতিজ্ঞামতো হরিহোড় যাইতে না বলিলে তিনি তাঁহাকে ছাড়িতে পারেন না। তখন

৪৬ ডঃ সুকুমার সেন সোহাগীকে হরিহোড়ের 'দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী-ভার্যা' (বাং. সা. ইতি. অপরার্ধ, পৃ. ৪৮৩) বলিয়াছেন। ইহা ঠিক নহে। কারণ ইহার পূর্বেই হরিহোড় ঘোষ, বসু ও মিত্রের তিন মুখ্য কুলীনের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। সুতরাং সোহাগী তাঁহার চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী।

দেবী ব্যাসকে যেমন ছলিয়াছিলেন তেমনি হরিহোড়কে ছলনার নিমিত্ত তাঁহার কন্যা সাজিয়া আসিয়া বিদায় চাহিলেন। বিরক্ত হরিহোড় মনে করিলেন, "জামাই এসেছে তার কন্যারে লইতে।"—"ক্রোধভরে হরিহোড় 'যাহ যাহ' বলে।" দেবী এই কথারই অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ঝাঁপি লইয়া হরিহোড়ের ভবন ত্যাগ করিয়া গাঙ্গিনী নদী পার হইয়া আন্দুলিয়া গ্রামে ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে চলিলেন তাঁহাকে কৃপা করিতে। ইহার পূর্বেই দেবী অনুচিত কর্মের জন্য কুবেরের পুত্র নলকুবর এবং তাহার দুইপত্নী চন্দ্রিণী ও পদ্মিনীকে অভিশাপ দিয়া মর্ত্যভূমিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কারণ দেবী দেখিয়াছিলেন, বৃদ্ধ বুদ্ধিহত হরিহোড় চতুর্থপক্ষের কোন্দলী স্ত্রী সোহাগীর জন্য দুর্ভাগ্য টানিয়া আনিতেছেন। এখন দেবী কাহাকে আশ্রয় করিয়া মর্ত্যধামে নিজ পূজা প্রচার করাইবেন? নলকুবরকেই সেই কর্মের উপযুক্ত মনে করিয়া তিনি তাহার সামান্য অপরাধে দুই পত্নীর সহিত তাহাকে অভিশাপ দিয়া মর্ত্যে পাঠাইয়া দিলেন। অভিশপ্ত নলকুবর মর্ত্যে আন্দুলিয়া গ্রামের রাঢ়ী ব্রাহ্মণ রামসমাদ্দার ও তাঁহার পত্নী সীতাদেবীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। পৃথিবীতে আসিয়া নলকুবরের নাম হইল ভবানন্দ। তাঁহার দুই পত্নী চন্দ্রিণী ও পদ্মিনীও মর্ত্যে চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখী নামে জন্মগ্রহণ করিলেন। যথাকালে তাঁহারাও ভবানন্দের দুই পত্নীরূপে তাঁহার গৃহে স্থান পাইলেন। পরমভক্ত ভবানন্দ-ভবনে আসিবার জন্য দেবী গাঙ্গিনী নদীর (বর্তমান কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী জলাঙ্গী) পশ্চিম পারে অবস্থিত বড়গাছি গ্রামের হরিহোড়ের আবাস ছাড়িয়া পূর্বপারে আন্দুলিয়া গ্রামে যাত্রা করিলেন। এক সরলপ্রাণ পাটনী তাঁহাকে পার করিয়া দিলে তিনি তাহাকেও কৃপা করিলেন। দেবী নৌকায় যে কাঠের সেঁউতির উপর চরণ রাখিয়াছিলেন তাহা সোনা হইয়া গেল। দেবীর কৃপায় হরিহোড়ের ঘুঁটে যদি সোনায় পরিণত হয়, তাহা হইলে কাঠের সেঁউতি সোনা হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু ঈশ্বরী পাটনী পাটোয়ারী বুদ্ধিবিশিষ্ট হরিহোড়ের মতো ঐশ্বর্য প্রার্থনা করিল না, শুধু এই মাত্র প্রার্থনা জানাইল, "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" দেবী নির্লোভ পাটনীকে সেই বর দিয়া অদৃশ্য হইলেন। পাটনী সেই কথা ভবানন্দকে জানাইলে তিনি পুলকিত চিত্তে গৃহে আসিয়া দেখিলেন, "মেঝেয় এক মনোহর ঝাঁপি।"

ভবানন্দ বুঝিলেন—দেবী তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন। দৈববাণী যোগে দেবী কহিলেন :

এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে।
তোর বংশে মোর দয়া প্রধান থাকিবে॥

অতঃপর কবি অন্নদামঙ্গলের প্রথম অংশের কাহিনী শেষ করিয়া প্রতাপ-আদিত্য-মানসিংহের সমর বর্ণনায় অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু তাহার পূর্বে তিনি দ্বিতীয় উপাখ্যান বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী সারিয়া লইয়াছেন।

অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডের কাহিনীর মধ্যে যে তিনটি উপকাহিনী আছে—হরপার্বতী-ব্যাসদেব, হরিহোড় ও ভবানন্দ—তন্মধ্যে কবি দেবদেবীর কাহিনী গ্রন্থনে বহু স্থলে পৌরাণিক ধারা অনুসরণ করিলেও কাহিনী ও চরিত্রগুলিতে বিশেষ কোন দেবমাহাত্ম্য রক্ষা করেন নাই। হরগৌরীর বিবাহে শাশুড়ী ও এয়োগণের বিড়ম্বনা বর্ণনায় কৌতুকরসে কবি নিজেই উতরোল হইয়া পড়িয়াছেন। ঘটক নারদকে গালি দিয়া মাতা মেনকা যখন বলেন :

ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদা অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে॥

তখন একেবারে বাঙালী ঘরের জীবন যেন প্রত্যক্ষ হইয়া ওঠে। কিন্তু কবি রঙ্গরহস্য করিলেও বাগ্‌ভঙ্গিমায় যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। মেনকার জবানীতে উক্ত এই ছত্রগুলি মধ্যযুগীয় বাক্‌রীতির সার্থক দৃষ্টান্ত হিসাবে গৃহীত হইতে পারে :

আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো॥
উমার কেশ চামর ছটা তামার শলা বুড়ার জটা
তায় বেড়িয়া ফোঁপায় ফণী দেখে আসে জ্বর লো॥
* * * *
উমার গলে মণির হার বুড়ার গলে হাড়ের ভার
কেমন কবে ওমা উমা করিবে বুড়ার ঘর লো।
আমার উমা মেয়ের চূড়া ভাঙড় পাগল ওই লো বুড়া।
ভারত কহে পাগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লো॥

এখানে 'ফোঁপায় ফণী' একটি বিচিত্র আধুনিক প্রয়োগ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

ব্যাস প্রসঙ্গে কবি যে বেদব্যাসকে "বৈষ্ণববেশী ভঁাড়"[৪৭] রূপে আঁকিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া এই মন্তব্যও যুক্তিসঙ্গত নহে—"ব্যাসের বর্ণনা ভারতচন্দ্রের চরিত্রচিত্রণ-অক্ষমতার শোচনীয় নিদর্শন।"[৪৮] ভারতচন্দ্র অর্বাচীন পুরাণ অবলম্বনে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রীতি এবং সভাসদদের আনন্দ বর্ধনের জন্য এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য তাহার সঙ্গে কবির ভক্তিও ছিল। নিতান্ত রঙ্গব্যঙ্গ করিবার জন্য তিনি এই কাব্যরচনা করেন নাই—মঙ্গলকাব্যের ধারানুবর্তী এই শেষ সার্থক কাব্যে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর পরিকল্পনাই অনুসৃত হইয়াছে। দেবতা বা দেবীর পূজা প্রচারের জন্য শাপ-ভ্রষ্ট দেবকুমারের মর্ত্যে নরজন্ম গ্রহণ এবং তাহার সাহায্যে নিজ নিজ পূজা প্রচার—প্রায় সমস্ত মঙ্গলকাব্যেরই ইহা চিরাচরিত *motif*; ভারতচন্দ্রও সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। হরিহোড় ও ভবানন্দ—দুই জনেই শাপভ্রষ্ট। তাঁহাদের দ্বারা দেবী নিজের পূজা প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ হরিহোড়ের বুদ্ধিভ্রংশতা ও পত্নী সোহাগীর নীচ ব্যবহারে তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া ভবানন্দ মজুমদারের প্রতি কৃপা বর্ষণ করেন। ভবানন্দ জমিদারী খেলাত পাইলেন, 'রাজা' খেতাব পাইলেন,—তারপর খুব ঘটা করিয়া দেবী অন্নদার পূজা করিলেন। তাঁহার বংশ রাজবংশ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবে, তিনি দেবীর নিকট এই বরও পাইলেন। সেই রাজা হইলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়—কবির পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং এই কাব্যের পটভূমিকা যেমন মঙ্গলকাব্যের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, তেমনি আবার রাজমনোরঞ্জনের প্রচ্ছন্ন বাসনাও কবিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। মঙ্গলকাব্যে যেরূপ দেবদেবী চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে সেই ধারারই অনুবর্তন করিয়াছেন। তবে রাজসভার বিদগ্ধ কবি দেবতাদের সঙ্গে রঙ্গকৌতুক জুড়িয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণনগরের রাজপথে বাহির করিয়াছেন—তাঁহারা অনেকটা ঘরের মানুষ হইয়া পড়িয়াছেন। মহাদেব ভিক্ষায় বাহির হইয়া মায়ামুগ্ধ জীবকে চৈতন্য দান করিবার জন্য ডাকিয়া বলেন:

---

৪৭ ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম (অপরার্ধ), পৃ. ৪৭৯

৪৮ ঐ

চেত রে চেত রে চিত ডাকে চিদানন্দ।
চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ॥

কিন্তু এই আহ্বানে 'চিদানন্দের দল' বিশেষ সাড়া দিল না, বাহির হইয়া আসিল যত 'রঙ্গচিঙ্গা' (চ্যাঙড়া ?) :

কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥
* * * *
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥

কিন্তু শিবের ইহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, ভোলা মহেশ্বর শিশু-ভোলানাথদের সঙ্গে পরম কৌতুক বোধ করিতে লাগিলেন। এখানে শিবের ভিখারী-মূর্তি পৌরাণিক মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে বটে, কিন্তু বাস্তব চিত্র ও চরিত্রাঙ্কনে কবি যে বিশেষ পারদর্শী তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ভারতচন্দ্রের শিব কখনও পার্বতীর সঙ্গে কলহ করিতেছেন, কখনও ব্যাসের উপর চটিয়া উঠিয়া অগ্নিমূর্তি ধারণ করিতেছেন, কখনও দেবীর সঙ্গে গভীর তত্ত্বকথা আলোচনা করিতেছেন, হরিহর অভেদ ঘোষণা করিতেছেন, কখনও নারদের কথায় সং সাজিতেছেন—বিবাহের সভায় শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও এয়োদের সম্মুখে সবেমাত্র-সম্বল বাঘাম্বর খসিয়া পড়িলেও তাঁহার কোন আপত্তি নাই দেখা যাইতেছে। আবার কখনও-বা কামদেবকে অশিষ্টতার জন্য দারুণ শাপ দিয়াও কামবাণে ক্ষিপ্ত হইয়া কামারি ঘৃণ্য আচরণ করিতেছেন :

মরিল মদন তবু পঞ্চানন
মোহিত তাহার বাণে।
বিকল হইয়া নারী তপাসিয়া
ফিরেন সকল স্থানে॥
কামে মত্ত হর দেখিয়া অপ্সর
কিন্নরী দেবী সকল।
যায় পলাইয়া পশ্চাত তাড়িয়া
ফিরেন শিব চঞ্চল॥

দেবী বলিয়াছেন, "হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই।"[৪৯] কবি অন্নদামঙ্গলে দেবদেবীর নরলীলাই বর্ণনা করিয়াছেন। যথাসময়ে শিবের মৌতাত সেবা না হওয়াতে তাঁহার দুর্গতি কবি মহেশ্বরের জবানীতে যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে চোখের সামনে নেশাগ্রস্ত বৃদ্ধের বিড়ম্বিত জীবন কৌতুকরসে সিক্ত হইয়া ফুটিয়া ওঠে :

এত বেলা হৈল দেখ সিদ্ধি নাহি খাই।
বুদ্ধি হারা হইয়াছি শুদ্ধি নাহি পাই॥
ক্ষাপর হৈনু দেখ মুখে উড়ে ফেকো।
ভেভাচাকা লাগিল ভুলিয়া হৈনু ভেকো॥

অন্নদার জরতী মূর্তি বর্ণনায়ও কবি অসাধারণ নৈপুণ্য, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও চরিত্রচিত্রণের দুর্লভ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। পরবর্তী যুগে লোকচরিত্রাঙ্কনে নাট্যকার দীনবন্ধু যে নিঃস্পৃহ বাস্তববোধের পরিচয় দিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে দেবদেবী ও নরনারীর চরিত্রে তাহার পূর্বাভাস পাওয়া যাইবে। প্রত্যক্ষ করিয়া তোলা যদি চরিত্রসৃষ্টির মৌলিক বৈশিষ্ট্য হয়, তাহা হইলে ভারতচন্দ্র সে বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ অধিকারী। দুই-একটি রেখার টানে চরিত্রের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে তিনি জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ দুইটি চরিত্রের কথা ধরা যাক। হরিহোড় ও ঈশ্বরী পাটনী—দুই জনেই দরিদ্র, দুইজনেই দেবীর কৃপা লাভ করিয়াছিল। হরিহোড়কে কৃপা করিয়া দেবী তুচ্ছ ঘুঁটেকে সোনার ঘুঁটে করিয়া দিলেন—অতুল ঐশ্বর্য দিলেন।

---

৪৯ এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন, "মুকুন্দরাম দেবতাকে মানুষ করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র দেবতাকে নট করিয়াছেন।" (বা. সা. ইতি. অপরার্ধ, পৃ. ৪৮৩) কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, দেবচরিত্রে যে স্বাভাবিক মানবিক গুণের জন্য আমরা মুকুন্দরামের প্রশংসা করি, সেই একই গুণ ভারতচন্দ্রের দেবদেবীর চরিত্রে আছে। পার্থক্যের মধ্যে ভারতচন্দ্র দেবচরিত্রে সরস-কৌতুক ভাব যোগ করিয়া দিয়াছেন, মুকুন্দরাম তাহা করেন নাই। ইহার কারণ—জীবন সম্বন্ধে দুই কবির পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী ও দুই জনের পৃথক পরিবেশ। ভারতচন্দ্রের কিছু পূর্ব হইতেই লোকাভিনয়ে দেবদেবীর ভাঁড়ামি শুরু হইয়া গিয়াছিল। ডঃ সেন ভারতচন্দ্রের ব্যাসদেবকে 'ভাঁড়' চরিত্র বলিয়াছেন। কিন্তু সেই ভাঁড়ের 'ভাণ্ডপতি' স্বয়ং বড়ু চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নারদের সঙ্গে রায় গুণাকরের ব্যাস চরিত্রের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। আসল কথা, মধ্যযুগের সাহিত্যে, বিশেষতঃ মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক ও লৌকিক সংস্কার মিশিয়া গিয়াছিল। ভারতচন্দ্র নানা পুরাণতন্ত্রের দোহাই দিলেও লৌকিক সংস্কারের প্রতি আকর্ষণ ছাড়িতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু চতুর হরিহোড় বিষয়-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেও বিষয় বুদ্ধি হইতে বঞ্চিত ছিলেন না। তিনি ভাবিলেন, ঘুঁটে সোনা হইলে বা রাজার ঐশ্বর্য লাভেও স্বস্তি নাই—দুই দিনে তাহা উড়িয়া যাইতে পারে—তদুপরি দেবতাদের মেজাজ-মর্জিতে বিশ্বাস নাই। এখন তুষ্ট আছেন বটে, কিন্তু রুষ্ট হইতেও বিলম্ব হইবে না। তাই তিনি দেবীর কাছে প্রার্থনা করিলেন :

হরিহোড় কহে মাগো কর অবধান।
চঞ্চলা তোমার কৃপা চঞ্চলা সমান॥
অনুগ্রহ করিতে বিস্তর ক্ষণ নহে।
নিগ্রহ করিতে পুন বিলম্ব না সহে॥
তবে লব ধন আগে দেহ এই বর।
বিদায় না দিলে না ছাড়িবে মোর ঘর॥

এইভাবে তিনি সুকৌশলে দেবীকে নিজের বাটীতে বরাবরের জন্য বন্দী করিয়া চিরকালের জন্য সুখসৌভাগ্য লাভের পথ প্রশস্ত করিবার অভিসন্ধি করিলেন। অপরদিকে ঈশ্বরী পাটনী স্বচ্ছন্দে সোনার সেঁউতিখানা বেচিয়া কোঠা-বালাখানা বানাইতে পারিত, তাহাকে আর গাঙ্গিনী নদীতে খেয়া বাহিতে হইত না। কিন্তু দেবী যখন বর দিতে চাহিলেন, তখন সে জোড়হাতে বলিল, "আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।" তাহার নির্লোভ জীবনের প্রসন্নতা এবং সুচতুর হরিহোড়ের হিসাবী কৌশল—কবি দুইটি চরিত্রে চমৎকার ফুটাইয়াছেন।

বাকরীতির অভূতপূর্বতা, অন্ত্যানুপ্রাস ও অলঙ্কারের নিপুণ প্রয়োগ, নানাপ্রকার সংস্কৃত ছন্দের বাংলা রূপান্তর, হাস্যকৌতুকের যথাবিহিত ব্যবহার—প্রভৃতি উচ্চ কলাগুলির পরিচয় অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডেই পাওয়া যাইবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাষ্ট্র ও সমাজ ভাঙিয়া পড়িতেছিল, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মতো অনেকের ভাগ্যে ক্ষণেকে রাজানুগ্রহ জুটিত, ক্ষণেকে হাতে দড়ি পড়িত। মুঘল শাসনের অন্তিম মুহূর্তে অবক্ষয়ী জীবনাদর্শ যে কীভাবে গোটা বাঙালী সমাজকে নিঃশেষ করিয়া আনিতেছিল তাহা সেযুগের কথা আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে। সেই আবহাওয়ায় ভারতচন্দ্রের নৈতিক জীবন বর্ধিত হইয়াছে। দেশের মন হইতে তখন আত্মবিশ্বাস মুছিয়া গিয়াছে, চারিদিকে শাঠ্যষড়যন্ত্রের খেলা শুরু হইয়াছে।

ফলে দেবদেবীর প্রতি বহুকালাগত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাও কিঞ্চিৎপরিমাণে শিথিল হইয়া গিয়াছিল। ভারতচন্দ্র-অঙ্কিত দেবদেবীর চরিত্রে ধূলাবালি লাগিলে কবিকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ সেই দুর্নিরীক্ষ্য আঁধির মধ্যে পড়িয়া কেহই দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখিতে পারেন নাই। তাহা না হইলে ভক্তসাধক রামপ্রসাদ শাক্ত ভক্তির রক্তবাস ত্যাগ করিয়া বিদ্যাসুন্দরের বাসন্তী বাস পরিয়া অনুচিত বর্ণনায় মত্ত হইবেন কেন? তবে ভারতচন্দ্রের মনে কোনওপ্রকার ভক্তি ছিল না, কৌতুকসর্বস্ব কবি দেবতাদের লইয়া যাত্রার অধিকারীর সাধ মিটাইয়াছেন, এইরূপ মন্তব্যও ঠিক নহে। অন্নদামঙ্গল ফরমায়েসী রচনা হইলেও কবির ভক্তিনত অন্তরটি বহু স্থলেই শুচিস্নাত রূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্র শিবশিবানীর চরিত্রে বহুস্থলে লৌকিক ভাবের বশে বাস্তবচিত্রের আকারেই অঙ্কন করিয়াছেন, স্থানে স্থানে হাস্যপরিহাস কৌতুকেও যোগ দিয়াছেন; কিন্তু শিবায়ন কাব্যে বর্ণিত কুচনী প্রসঙ্গের দুইবার উল্লেখ করিলেও কোথাও এ বিষয়ে কোন বর্ণনা দেন নাই।[৫০] দেবদেবীকে লইয়া কবি যতই কৌতুক করুন না কেন, কৃষ্ণনগরের শিষ্টজনের সভায় তিনি শিবায়ন কাব্যের অমার্জিত বিষয় পেশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক—পণ্ডিত, সুরসিক ও কবি ভারতচন্দ্র রাজপ্রীত্যার্থে অন্নদার পূজা প্রচারের জন্য প্রধানতঃ পৌরাণিক কাহিনীই অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ রায়গুণাকর

---

৫০ (১) একবার অন্নপূর্ণা মহাদেবকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন:

অর্ধ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥

এই কথায় শিব একটু লজ্জা পাইয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার সহিত নহে এমন মরম"। এখানে দেখা যাইতেছে, দেবীর সরস অভিযোগ শিব এবং শিবভক্ত ভারতচন্দ্র—দুই জনে কিঞ্চিৎ 'সরমে' স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

(২) বসুন্ধর বিরহে বসুন্ধরা দেবীর কাছে অনুযোগ করিয়া বলিয়াছিল:

শিব যদি যান কভু কুচনীর বাড়ী।
ভাবহ আপনি কত কর তাড়াতাড়ি॥

সুতরাং কুচনী প্রসঙ্গ ভারতচন্দ্র জানিতেন, কিন্তু তাহা উল্লেখমাত্র করিয়া এড়াইয়া গিয়াছেন। যদি গ্রাম্য রঙ্গতামালি কবির লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে তিনি শিবের কুচনী পাড়ার যাত্রা বর্ণনা করিয়া লঘু রসের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িতেন।

সেই সভার রাজকবি ছিলেন—যেখানে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ নিত্য অবস্থান করিতেন, এবং স্বয়ং মহারাজ তাঁহাদের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করিতেন। সুতরাং কবি গ্রাম্যকাহিনী বাদ দিয়া অর্বাচীন পুরাণ হইতে অন্নদামঙ্গলের কাহিনী চয়ন করিয়াছেন, চরিত্র নির্মাণ করিয়াছেন। অবশ্য হরিহোড় ও ভবানন্দ-ঘটিত কাহিনী তাঁহার নিজস্ব পরিকল্পনা এবং এই অংশের কাহিনী ও বাস্তব বর্ণনা কবিকৃতিত্বই প্রমাণ করিতেছে। ভারতচন্দ্রের দেবদেবীর পরিকল্পনা আমাদের মার্জিত পৌরাণিক সংস্কারে কিঞ্চিৎ আঘাত করে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহার জন্য কবিও কিছুটা দায়ী। কৃষ্ণনগরে যে নাগরিক সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে মুর্শিদাবাদের যে কিছু দান ছিল না, তাহা মনে হয় না। মুর্শিদাবাদের দরবারী আদর্শের জাঁকজমক, বিলাসিতা, ইহমুখিতা, নৈতিক চরিত্রের শিথিলতা—প্রভৃতি জাতীয় চরিত্রের অধঃপতনের সোপানগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। ভারতচন্দ্রের দেবদেবীদের চরিত্রে সেই যুগের কিছু ছাপ পড়িলে ক্ষোভের কারণ নাই। তবে একথাও স্বীকার্য—ইহার জন্য রায়গুণাকর পুরাপুরি দোষী নহেন, অর্বাচীন শিবপুরাণে (প্রাচীন পুরাণকেও এই দোষ হইতে বাদ দেওয়া যায় না), মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডে, আরও নানা স্থলে দেবদেবীদের চরিত্র মাঝে মাঝে যেভাবে চিত্রিত হইয়াছে তাহাতে দেবমহিমা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্র সেই আদর্শে খানিকটা কৌতুকরস সঞ্চার করিয়া তাঁহাদিগকে ঘৃণার পাত্র না করিয়া কোন কোন সময়ে পরিহাসের পাত্র করিয়া তুলিয়াছেন। শিবপুরাণে কামারির কামুক বর্ণনা প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু মদনভস্ম প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র কিঞ্চিৎ মাত্রা ছাড়াইলেও অন্যত্র শিবচরিত্রকে কলুষিত হইতে দেন নাই। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা উঠিবে, তিনি আন্তরিক আবেগের চিত্র বড় একটা আঁকিতে পারেন নাই। যেখানে তিনি করুণ বেদনা ও বিলাপ সৃষ্টি করিতে গিয়াছেন সেখানেই তাহা কৃত্রিমতা-দোষদুষ্ট ও হাস্যকর হইয়া পড়িয়াছে। পতিশোকে রতির বিলাপ বর্ণনাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কবি এই ভাবে রতিবিলাপ আরম্ভ করিয়াছেন :

পতি শোকে রতি কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।



বকুলতলায় সুন্দর ও মালিনী—বিদ্যাসুন্দর

(১৮১৬ সালে প্রথম-মুদ্রিত অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাসুন্দরের কাঠখোদাই)

কিন্তু কবির চক্ষু অশ্রুসজল হয় নাই। বাঁধা পথ ধরিয়া কবি পতিহারা সদ্য-বিধবার বিলাপ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে আন্তরিকতা ফুটিতে পারে নাই। রতি যখন 'নানা ছাঁদে' ইনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন :

আহা আহা হরি হরি   উহু উহু মরি মরি
হায় হায় গোঁসাই গোঁসাই।

তখন তাহা করুণরস অপেক্ষা হাস্যরসেরই অধিক উপযোগী হইয়া দাঁড়ায়। কারণ করুণরস, গভীর হৃদয়াবেগ—এ সমস্ত ব্যাপারে ভারতচন্দ্রের বিশেষ দক্ষতা ছিল না, মানসিক প্রবণতাও ছিল না। তীক্ষ্ণ তির্যকতা, হাস্যকৌতুক, অসঙ্গতির চমকপ্রদ উজ্জ্বলতা, রঙ্গব্যঙ্গের উতরোল উল্লাস, বাগভঙ্গীর শানিত প্রকাশ—ইহাতেই তাঁহার কৃতিত্ব। রায়গুণাকর হৃদয়ের ব্যাপারী নহেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? [৫১] এক শতাব্দী পরবর্তী কালের কবি ঈশ্বর গুপ্ত যথার্থই রায়গুণাকরের উপযুক্ত শিষ্য হইয়াছিলেন—উভয়ের মনোধর্মের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য ছিল। সে যাহা হউক, কাহিনীগ্রন্থন, চরিত্রসৃষ্টি, পৌরাণিক ও লৌকিক ভাবের সংমিশ্রণ, অসাধারণ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য প্রভৃতি বিচার করিলে অন্নদামঙ্গলকে মঙ্গলকাব্য শাখার মধ্যে বিশিষ্টরূপে গণ্য করিতে হইবে।

অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দর নামে পরিচিত হইলেও ইহাকে প্রকৃত পক্ষে 'কালিকামঙ্গল' বলা যাইতে পারে—কারণ কবি ইহাতে পূর্ব-প্রচলিত কালিকামঙ্গলের ধারাই অনুসরণ করিয়াছেন। বোধ হয় নিমতার কবি কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গলের উপর ভারতচন্দ্র ভিত্তি করিয়াছিলেন

---

৫১ অবশ্য অন্নদামঙ্গলের দুই এক স্থলে আন্তরিকতাও ফুটিয়াছে। যেমন—হরগৌরীর কথোপকথন—

আমারে ছাড়িও না। ভবানি।
সুশীলা হইয়া   শিলায় জন্মিয়া
শিলাময় হিয়া হইও না।
এ ঘোর পাথারে   ফেলিয়া আমারে
দোষ বারে বারে লইও না।

ইহা কবির উক্তি হইলেও ইহাতে মহাদেবের স্নিগ্ধমধুর পত্নীপ্রীতি ফুটিয়াছে।

এবং সংস্কৃত 'চৌরপঞ্চাশিকা' হইতে নানা সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ—প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া বাঙলা দেশে, বিশেষতঃ নাগরিক সমাজে অখণ্ড জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন শুধু এই কাব্যটির জন্য। ছাপাখানার যুগে লোকরুচির প্রয়োজনে অনেক মুদ্রাকর অন্নদামঙ্গলের তিন খণ্ডের মধ্যে শুধু 'বিদ্যাসুন্দর' অংশটি ছাপাইয়া প্রচুর বিক্রয় করিতেন। সেযুগে এবং এযুগেও অনেকে ভারতচন্দ্রকে শুধু 'বিদ্যাসুন্দরে'র কবি বলিয়াই জানেন। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি গোপাল উড়ে টপ্‌পার ঢঙে এই বিদ্যাসুন্দরকে নৃত্যগীতে ঢালিয়া কলিকাতার সমাজে অতিশয় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। শিষ্ট সমাজে ভারতচন্দ্রের বহুল প্রচারের জন্য গোপাল উড়ের দানও তুচ্ছ করিবার মতো নহে। প্রথম দিকে নাটকাভিনয়ে এই বিদ্যাসুন্দর অভিনীত হইয়াছিল, ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে হেরাসিম লেবেডেফ নামক রুশীয় পর্যটক কলিকাতার ডোমতলা লেনে যে বাংলা অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতেও ভারতচন্দ্রের কবিতা গান হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও 'বিদ্যাসুন্দর নাটক' লিখিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।[৫২] অবশ্য ইহা হইতে কয়েকটি আপত্তিকর ঘটনা বাদ দেওয়া হইয়াছিল। এই নাটকের ছায়া অনুসারে হিন্দী নাট্যকার ভারতভূষণ ভারতেন্দু শ্রীহরিশ্চন্দ্র (১৮৫০—৮৫) হিন্দীভাষায় বিদ্যাসুন্দর নাটক রচনা করেন।[৫৩] ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে গৌরদাস বৈরাগী ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী ইংরেজী গদ্যে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন, নাম দেন *An English Translation of Vidya-sundar of Bharat Chandra Roy.* ইহাতে একটি ভূমিকা যোগ করিয়া বৈরাগী মহাশয় বিদ্যাসুন্দরকে রূপক কাব্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৫৪]

---

৫২ নাটকটি নাকি যতীন্দ্রমোহনের রচনা নহে, কালিদাস সান্যাল নামক এক ব্যক্তির রচনা। মহারাজের উদ্যোগে ও উৎসাহে ইহা একাধিকবার পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালায় অভিনীত হইয়াছিল। দ্রষ্টব্য—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

৫৩ ডঃ মদনমোহন গোস্বামী—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, পৃ. ৩১১

৫৪ বৈরাগী মহাশয়ের মতে, "The union of the hero and the heroine represents the union of Beauty and Wisdom—a union constituting an excellent ideal of human perfection, the Greek ideal embodied in Plato's Charmides of a beautiful mind in a beautiful body."

আধুনিক কালে দেবেন্দ্রবিজয় বসু সমগ্র বিদ্যাসুন্দর কাব্যকেই আধ্যাত্মিক নামাবলি ঢাকা দিয়া এক বিচিত্র মত প্রকাশ করিয়াছেন।[৫৫] ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ব্যক্ত অশ্লীলতা ঢাকিতে গিয়া কেহ কেহ রূপকের আশ্রয় লইতে চাহেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের সেরূপ কোন 'সদভিপ্রায়' ছিল না।[৫৬] তিনি নিছক মর্ত্যজীবনের প্রেমচিত্রই আঁকিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার উপর শুধু দেবী কালিকার কিঞ্চিৎ চরণামৃত ছিটাইয়া দিয়াছিলেন। এই নির্ভেজাল প্রেমোপাখ্যানকে কোন দিক দিয়াই আধ্যাত্মিকতার স্তরে উন্নীত করা যায় না—ভারতচন্দ্রের মনঃপ্রকৃতি সেরূপ ছিল না।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের (কালিকামঙ্গল) কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিকায়। কবি অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করিয়া লিখিয়াছিলেন :

ইতঃপর কহে শুন রায় গুণাকর।
প্রতাপ আদিত্য মানসিংহের সমর ॥

সুতরাং মনে হয়, ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে দেবী অচলা হইলে মজুমদার

৫৫ বঙ্গবাসী প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর (১৮৮৬) ভূমিকা দ্রষ্টব্য। ইহাতে দেবেন্দ্রবিজয় বসু কাব্য ছাড়িয়া কাব্যের সম্ভাব্য আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলেন এবং সমগ্র অন্নদামঙ্গলেই পরাপ্রকৃতি, স্বাহা, স্বধা, মায়াপ্রকৃতি প্রভৃতি গুরুতর ব্যাপারের সমাবেশ ঘটাইয়া প্রায় দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড বাধাইয়া দিয়াছিলেন। এযুগেও ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ বিদ্যাসুন্দরকে রূপককাব্য বলিয়াই মনে করেন। ডঃ সেনের মতে বিদ্যাসুন্দরের শিকড় প্রাগায় আবেস্তার যুগ পর্যন্ত প্রসারিত। আবেস্তার 'হুনর' প্রাচীন পারসিক 'হুনর' এবং বেদের 'সুনর' (অর্থাৎ গুণী)—ইহাই নাকি পরবর্তী কালে 'সুন্দরে' পরিণত হইয়াছে। ডঃ সেন কিন্তু গুণসিন্ধুতনয় সুন্দরকে নরসুন্দর বানাইয়া ফেলিয়াছেন—"এক ধরণের অর্থাৎ ভৈষজ্যগুণীর নাম হল যেমন 'বৈদ্য', আর এক ধরণের অর্থাৎ শল্যগুণীর নাম হল '[নর] সুন্দর'।" (শারদীয় জনসেবক, ১৩৫৯-এ প্রকাশিত ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের 'বিদ্যাসুন্দর তত্ত্ব' দ্রষ্টব্য) তাহা হইলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়, 'বিদ্যাসুন্দরের' সুন্দর শল্যচিকিৎসক বা সার্জন! নিতান্ত সাধারণ কথার অভিধেয়ার্থ ছাড়িয়া উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত অন্বিতার্থের পিছনে ছুটিলে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

৫৬ বাঙলার সুফী মতাবলম্বী মুসলমান কবিগণ য়ুসুফ-জুলেখা, শিরী-ফরহাদ, লায়লামজনু প্রভৃতি মর্ত্যপ্রেমের কাহিনীকে যেমন জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক বলিয়া মনে করিতেন, তেমনি তাঁহারা 'বিদ্যাসুন্দরকেও ঐরূপ রূপক কাব্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু কালিকা-মঙ্গল-বিদ্যাসুন্দরের কবিরা সেভাবে কাহিনীটিকে গ্রহণ করেন নাই।

কীভাবে প্রাধান্য লাভ করিলেন তাহা বর্ণনা করিবার জন্য তিনি প্রথম খণ্ডের পরেই প্রতাপ-মানসিংহের যুদ্ধ, প্রতাপের পরাভব ও ভবানন্দের প্রাধান্য লাভের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভও কতকটা এইরূপ। বাঙলা জয়ের জন্য প্রেরিত মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের ভূমিকা কবি বিদ্যাসুন্দরের প্রারম্ভে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যাইতেছে ভবানীর বরপুত্র প্রতাপাদিত্য প্রবল প্রতাপান্বিত হইলে বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁহাকে দমন করিবার জন্য মানসিংহকে বাঙলায় পাঠাইয়া দেন। মানসিংহ "বাইশী লস্কর সঙ্গে" লইয়া বর্ধমানে উপনীত হইলেন। সেই সময়ে দেবী অন্নদার কৃপায় ভবানন্দও বর্ধমানে গিয়া মানসিংহের কাননগো হইলেন। সেখানে একদিন মানসিংহ একটি সুড়ঙ্গ দেখিয়া কৌতূহলবশতঃ ভবানন্দকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করিলে কাননগো তাহার বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন :

বিবরিয়া মজুন্দার বিশেষ কহেন তার
যেইরূপে সুড়ঙ্গ হইল॥

বর্ধমানরাজ বীরসিংহের পরম রূপসী ও বিদুষী কন্যা বিদ্যা ও কাঞ্চীরাজ গুণসিন্ধুর পুত্র সুন্দরের গোপন মিলনই ইহার প্রধান আখ্যান। সুন্দর দেবী কালিকার কৃপায় সুড়ঙ্গ খনন করিয়া সুগোপনে অনূঢ়া রাজকন্যা বিদ্যার শয়নকক্ষে উপস্থিত হয়। উভয়ের সেই গোপনমিলন সংক্রান্ত কাহিনীটি ভবানন্দ মানসিংহকে সবিস্তারে নানা ছন্দে শুনাইলেন। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মধ্যে বা আর কোথাও ভবানন্দ-মানসিংহের কথোপকথন সংক্রান্ত কোন ইঙ্গিত নাই। [৫৭] কবি এই বলিয়া কাব্য সমাপ্ত করিয়াছেন :

ইতিহাস হইল সায় ভারত ব্রাহ্মণ গায়
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশিলা॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ব্রাহ্মণকবি ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন। ঈশ্বর গুপ্ত এ বিষয়ে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ড শুনিয়া কবিকে "বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণনা করতঃ" প্রথম খণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। কবিও রাজার ইচ্ছানুসারে "অতি কৌশলে

৫৭ কিন্তু তৃতীয় খণ্ডের ('মানসিংহ') প্রারম্ভে এই প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ আছে :

সাঙ্গ হইল বিদ্যাসুন্দরের সমাচার।
মজুন্দারে মানসিংহ কৈল পুরস্কার॥

বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া রাজাকে দেখাইলেন।" সুতরাং মনে হয়, আদিতে বিদ্যাসুন্দর রচনার কোন পরিকল্পনা কবির ছিল না। পৌরাণিক লৌকিক-ভাবের মিশ্রণে হরপার্বতীর কাহিনী, অন্নদার পূজা প্রচার এবং মর্ত্যধামে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের গৌরব খ্যাপনই ছিল কবির প্রধান উদ্দেশ্য। অন্নদামঙ্গল ও অন্নপূর্ণামঙ্গলই (প্রথম ও তৃতীয় খণ্ড) যথার্থ পূর্বাপর-সঙ্গতিপূর্ণ কাহিনী। মধ্যভাগের দ্বিতীয় খণ্ডটি (কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর) কবি পৃষ্ঠপোষকের প্রীত্যর্থে তাঁহার ইচ্ছানুসারে রচনা করিয়া প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডের মাঝখানে সুকৌশলে গ্রথিত করেন। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী মূল অন্নদামঙ্গলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত নহে, বর্ধমানে অবস্থান-কালে মুঘলবাহিনীর অধিনায়ক মানসিংহ তাঁহার কাননগো ভবানন্দ মজুমদারকে একটি গর্ত দেখাইয়া প্রশ্ন করিলে ভবানন্দ সেই সুড়ঙ্গের কাহিনী বলিতে গিয়া বিদ্যাসুন্দর আখ্যান বর্ণনা করেন—কবি এইভাবে এই রোমান্টিক গল্পকে মূল কাহিনীর সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছেন।

ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর কাব্যকে ইতিহাস বলিয়াছেন—"ইতিহাস হৈল সায়।" কিন্তু ইহার সঙ্গে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই। সংস্কৃতে বিহ্লনের নামে 'চৌরপঞ্চাশিকা' ('চৌরীসুরত পঞ্চাশিকা'), বররুচির নামে প্রচারিত সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দরম্', অন্যান্য কবির 'বিদ্যাসুন্দরচরিতম্', 'বিদ্যাসুন্দর-চৌরপঞ্চাশিকা', 'বিদ্যা-সুন্দরোপাখ্যানম্' প্রভৃতি প্রাচীন ও অর্বাচীন সংস্কৃত প্রেম-কাব্যে, প্রাচীন যুগ হইতে, রাজকুমার সুন্দর ও রাজকুমারী বিদ্যার গুপ্ত প্রণয়ের গল্প চলিয়া আসিতেছে। ভারতচন্দ্রের দুই-তিনশত বৎসর পূর্ব হইতেই বাঙলা দেশে কোন কোন কবি বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যযুগে এদেশে নিছক মানবীয় কাহিনী চলিত না বলিয়া ইহার সঙ্গে দেবী কালিকার প্রসঙ্গ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। দেবী কালিকার ভক্ত সুন্দর দেবীর কৃপাতেই গোপন সুড়ঙ্গ কাটিয়া বিদ্যার শয়নমন্দিরে উপস্থিত হয় এবং ধরা পড়িয়া প্রাণদণ্ডের জন্য মশানে নীত হয়। তাহার আকুল প্রার্থনায় স্বয়ং কালিকা মশানে আবির্ভূত হইয়া তাহার বন্ধনমোচন করিলেন এবং বীরসিংহ রাজার সৈন্যসামন্তকে মারিয়া ধরিয়া খেদাইয়া দিলেন। ভীত রাজা মশানে আসিয়া সুন্দরকে সাগ্রহে জামাতারূপে বরণ করিলেন এবং সুন্দরের দ্বারা তিনি আকাশমার্গে দেবী কালিকার দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইলেন।[1] এইটুকু শুধু

কালিকার প্রসঙ্গ। পরে সুন্দর সস্ত্রীক দেশে ফিরিয়া গিয়া "নানা মতে কালিকারে পূজিল"। দেবী বলিলেন :

তোরা মোর দাসদাসী শাপেতে ভূতলে আসি
আমার মঙ্গল প্রকাশিলা।
ব্রত হৈল পরকাশ এসে চল স্বর্গবাস
নানা মতে আমারে তুষিলা ॥[৫৮]

একদা অনেকে মনে করিতেন যে, ভারতচন্দ্র বর্ধমানরাজের কারাগারে বিনা দোষে নিক্ষিপ্ত হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন বলিয়া বিদ্যাকে বর্ধমান-রাজকন্যা রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। গুপ্ত প্রণয়ের ফলে কুমারী কন্যাকে সসত্ত্বা বর্ণনা করিলে রাজবংশে প্রচুর কলঙ্ক লেপন করিয়া পূর্বকৃত অত্যাচারের কিঞ্চিৎ শোধ লওয়া যাইবে—ইহাই বোধ হয় তাঁহার প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় ছিল —অর্থাৎ এই কাব্যের পাত্র-পাত্রী ও ঘটনাস্থল সম্পূর্ণরূপে কবি-কল্পিত। অপর মতে সে যুগে অনেক প্রাচীন ব্যক্তি বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী সত্য গল্প, বর্ধমানে ইহা ঘটিয়াছিল, এবং বিদ্যা বর্ধমান রাজার কন্যা—এইরূপ বিশ্বাস করিতেন।[৫৯] পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন একদা সুন্দরের সুড়ঙ্গ দেখিবার জন্য বর্ধমান পর্যন্ত হাজির হইয়াছিলেন! কেহ কেহ আবার বর্ধমান শহরের নানাস্থানে বিদ্যাসুন্দরে বর্ণিত স্থানও আবিষ্কার করিয়াছেন। বর্ধমানের অদূরে বাঁকানদীর ধারে ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে একটি গর্তকে লোকে 'বিদ্যার পোঁতা' বলে—ইহার ক্রোশখানেক দূরে বীরহাটা নামক স্থানে নাকি বীর-সিংহের বাসভবন ছিল এবং তাহারই একক্রোশ দক্ষিণে 'মালিপোঁতা'য়

---

৫৮ ভারতচন্দ্র কাব্য সমাপ্তির সময় বলিয়াছেন, সুন্দর ও বিদ্যা শাপভ্রষ্ট দেব-দেবী, কালিকার পূজা প্রচারের জন্যই মর্ত্যধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু কাব্যের প্রথমে তিনি সেরূপ কোন ঘটনার আভাস দেন নাই। আমাদের অনুমান কাব্য সমাপ্তির সময় কবি প্রণয়াখ্যানকে পুরাপুরি মঙ্গলকাব্যের ছাঁচে ঢালিতে গিয়া সুন্দর ও বিদ্যাকে শাপভ্রষ্ট দেব-দেবী বলিয়াছেন—কিন্তু হয় অনবধানতা বশতঃ, আর না হয় এবিষয়ে কবি যথেষ্ট 'সীরিয়স' ছিলেন না বলিয়া দেবদেবীর নাম উল্লেখ করেন নাই।

৫৯ কালিকামঙ্গলের অন্যান্য কবিদের বর্ণনায় প্রধান পাত্র-পাত্রীর নাম ঠিক থাকিলেও অন্য চরিত্র ও বর্ণনায় অনেক পার্থক্য দেখা যায়। কবিশেখর বলরামের কালিকামঙ্গলে সুন্দরের পিতা উৎকল-দ্রাবিড় দেশের মাণিক্য নগরের রাজা গুণসাগর, বিদ্যার পিতা বীরসিংহ বর্ধমানের রাজা। চট্টগ্রামের গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গলে সুন্দরের পিতা গৌড়ের কাঞ্চন নগরের অধিপতি, নাম গুণিসাগর, বিদ্যার পিতা বীরসিংহের রাজ্যের নাম রত্নপুর।

হীরা মালিনীর বাস ছিল। কেহ কেহ প্রাসাদতোরণের ভাঙা খিলানকেই সুড়ঙ্গ বলিয়া থাকে।[৬০] কিন্তু সম্প্রতি ভারতচন্দ্র-গবেষক ডঃ মদনমোহন গোস্বামী মহাশয় বহু অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, "এ সকল কাহিনী সম্পূর্ণ অলীক। বর্ধমানে বীরসিংহ নামে কোন রাজা কোন কালেই ছিলেন না।[৬১] কাহিনীটি সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অত্যধিক জনপ্রিয়তার ফলে মনসামঙ্গলে উল্লিখিত চাঁদসদাগরের ভিটি, বেহুলার ঘাট প্রভৃতি যেমন বাঙলার সর্বত্র মিলিয়া থাকে, তেমনি জনপ্রিয়তার জন্যই ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীতে বর্ণিত নামধামগুলি পরবর্তী কালে বর্ধমানে হাজির হইয়াছে।

রায়গুণাকরের বিদ্যাসুন্দর কাহিনী গ্রন্থনে বিশেষ কোন নূতনত্ব বা মৌলিকতা দেখা যাইতেছে না। ইতিপূর্বে তিন শতাব্দী ধরিয়া অন্যান্য কবি এ কাহিনীকে যেভাবে গ্রন্থিত করিয়াছেন, তিনিও প্রায় সেই একই পথ ধরিয়াছেন, শুধু নামধামে অল্পস্বল্প পার্থক্য আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, ভারতচন্দ্র সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গলের কাহিনী হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।[৬২] কিন্তু বাঙলাদেশে সাধারণ শ্রোতা ও কবিসমাজে কালিকামঙ্গল-আশ্রয়ী বিদ্যাসুন্দর আখ্যায়িকা অনেক পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে—ভারতচন্দ্র তাহার অনুবর্তন করিয়াছেন, বিশেষ কোন পূর্বগামী কবির নিকট ঋণ গ্রহণ করেন নাই।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যে ধৃত সুন্দরের মুখে কবি 'চৌরপঞ্চাশিকা' হইতে তিনটি সংস্কৃত শ্লোক[৬৩] বসাইয়া দিয়া তাহার অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং

---

৬০ মহঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—কবি কৃষ্ণরাম (সাহিত্য, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা)

৬১ ডঃ মদনমোহন গোস্বামী—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, পৃ. ৯৫

৬২ "বিদ্যাসুন্দর তাঁহার নিজের নহে, ধারকরা জিনিষ। ধারও আবার মূল সংস্কৃত হইতে নহে। মূল সংস্কৃত হইতে যদি বিদ্যাসুন্দর ধার করা হয়, তবে ভারতচন্দ্রের পূর্বে অন্যলোকে তাহা ধার করিয়াছিল, তিনি ধারকরা জিনিষ আবার ধার করিয়াছেন।... ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ দুইজনেই আর একজনের (কৃষ্ণরাম) নিকট বিদ্যাসুন্দর পাইয়াছিলেন।" (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সাহিত্য, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা)

৬৩ তিনটি শ্লোকের প্রথম পংক্তি: (১) অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীম্..., (২) অদ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ততে মে রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপাল পুত্র্যা..., (৩) অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং কূর্মো বিভর্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন...।

তিনি সংস্কৃত 'চৌরপঞ্চাশিকা' সম্বন্ধে সুপরিজ্ঞাত ছিলেন। কারণ তিনি দুই-স্থানে বলিয়াছেন যে, ধৃত সুন্দর রাজার নিকট 'চৌরপঞ্চাশিকার' পঞ্চাশ শ্লোকই আবৃত্তি করিয়াছিল।[৬৪] কিন্তু পুঁথির কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় "কহিছে ভারত তার গোটাকত শ্লোক।" 'চৌরপঞ্চাশিকা'র শ্লোকের দুইটি অর্থ আছে—'চৌরপঞ্চাশিকা'র টীকাকারগণ সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন, "দুই অর্থ কহি যদি পুঁথি বেড়ে যায়।" তাই তিনি অনুরোধ করিয়াছেন—পণ্ডিতগণ 'চোরপঞ্চাশী' টীকা দেখিয়া দুই প্রকার অর্থ করিয়া লইবেন—"বুঝিবে পণ্ডিত চোরপঞ্চাশী টীকায়"। অর্থাৎ কবি তিনটি শ্লোকের যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে শুধু বিদ্যাপক্ষেই অর্থ করিয়াছেন—কালী পক্ষে নহে। সভাজন বুঝিল এই দেবীভক্ত চোর মহাবিদ্যার স্তুতি করিতেছে। কিন্তু বীরসিংহ উক্ত শ্লোকের বাহ্যিক অর্থ (অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দরের মিলনপ্রসঙ্গ) বুঝিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন—"লজ্জা পেয়ে বীরসিংহ অধোমুখ হয়।" এখানে দেখা যাইতেছে, কবি একাধিক শ্লোকের উল্লেখ এবং তাহার বাহ্যিক অর্থ (বিদ্যাপ্রসঙ্গ) অনুবাদ করিয়াছিলেন—কালীপক্ষের অনুবাদ দেন নাই। কিন্তু কেহ কেহ মনে করিতেন যে, ভারতচন্দ্র সমগ্র 'চৌরপঞ্চাশিকা'র দুই অর্থযুক্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন। 'চৌরপঞ্চাশৎ' শীর্ষক একখানি অনুরূপ পুস্তিকাও মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহাতে ভারতচন্দ্র অনূদিত উক্ত তিনটি শ্লোক স্থান পায় নাই।[৬৫] উহা সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। সুতরাং মনে হইতেছে, ভারতচন্দ্র মাত্র তিনটি শ্লোকই অনুবাদ করিয়াছিলেন, সমগ্র 'চৌরপঞ্চাশিকা' নহে। মুদ্রিত সংস্কৃত 'চৌরপঞ্চাশিকা'য় সংযোজিত বাংলা অনুবাদ ভারতচন্দ্রের নহে। অবশ্য ইহা যে ভারতচন্দ্রের অনুবাদ নহে, তাহা সে যুগের প্রকাশকেরাও জানিতেন।[৬৬] এই অনুবাদে কবির বিশেষ

---

৬৪ চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া।
পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়া ভাবিয়া॥

৬৫ এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত 'চৌরপঞ্চাশতে'র একটি পুঁথিতে (G. 56-67—HD) দ্ব্যর্থবোধক বিয়াল্লিশটি শ্লোকের অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে দুইটি অনুবাদ ('তস্মন্যপি সম্প্রতি' এবং 'নোজ্ঝতি হরঃ') ভারতচন্দ্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। (দ্রষ্টব্য: ডঃ মদনমোহন গোস্বামীর গ্রন্থ, পৃ. ১২৫)

৬৬ ১৯১৩ খ্রীঃ অব্দে বটতলা হইতে দে ব্রাদার্সের প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে প্রকাশক স্বীকার করিয়াছেন যে, পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট বাংলা চৌরপঞ্চাশিকা ভারতচন্দ্রের অনুবাদ নহে।

কোন ভণিতা ছিল না। ১৭৭৬ শকাব্দের (১৮৫৪ খ্রীঃ অঃ) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'বিবিধার্থ সঙ্গ হে' হরিমোহন সেনগুপ্ত 'ভারতচন্দ্র রায়' শীর্ষক প্রবন্ধে সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, বাংলা 'চৌরপঞ্চাশৎ' ভারতচন্দ্রের নহে—তাহা নন্দকুমার কবিরত্ন[৬৭] অনূদিত। এই লেখক 'কালীকৈবল্যদায়িনী', 'শুকবিলাস' প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। হরিমোহনের মতে 'কালীকৈবল্যদায়িনী'-শুকবিলাসে'র রচনারীতির সঙ্গে বাংলা চৌরপঞ্চাশিকার রচনারীতির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। মুদ্রিত চৌরপঞ্চাশিকার সাতটি শ্লোকে নন্দকুমারের ভণিতা পাওয়া যায় ("রচিয়া বিবিধ ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্দ, বিরচিল শ্রীনন্দ-কুমার")। উক্ত কাব্যের বিংশতি শ্লোকের পর এইভাবে উল্লেখ আছে—"ইতি শ্রীঅভয়ামঙ্গলে বীরসিংহরাজ সন্নিধৌ গুণসিন্ধুসুত নৃপসুন্দরকৃত পঞ্চাশ শ্লোক ভারতচন্দ্র ব্যাখ্যার শেষ পূর্বাচার্য টীকামতে শ্রীকাশীনাথ সার্ব্বভৌম বিস্তারিত তদর্থপ্রতিপন্ন ভাষা প্রকাশিত শ্রীনন্দকুমার চোরপঞ্চাশিক নামা গ্রন্থে প্রথমোল্লাস।" ইহা হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলীর সম্পাদকদ্বয় সিদ্ধান্ত করেন—ইহা নন্দকুমারের অনুবাদ। কিন্তু ১৮২৬ সালের ১৪ই জানুয়ারী 'সমাচার দর্পণে' এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয়: "বিদ্যাবর্ণনার্থ সুন্দর নির্ম্মিত চৌরপঞ্চাশিকা পঞ্চাশ শ্লোকাত্মক গ্রন্থের ভাষায় অর্থ শ্রীকাশীনাথ সার্ব্বভৌমকৃত সংস্কৃত সমেত শ্রীনন্দকুমার দত্ত ছাপা করিয়াছেন।"[৬৮] 'সমাচার দর্পণে'র এই সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া কেহ কেহ মনে করেন—"আসলে চৌরপঞ্চাশতের এই অনুবাদ কর্তা ছিলেন শ্রীকাশীনাথ সার্বভৌম।"[৬৯] ইঁহাদের মতে নন্দকুমার মুদ্রাকর বা প্রকাশক ছিলেন।[৭০] কারণ 'সমাচার দর্পণে' তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "ছাপা করিয়াছেন।" কিন্তু 'চৌরপঞ্চাশিকা'য় সমাপ্তিতে মুদ্রিত পুষ্পিকা এবং 'সমাচার দর্পণে'র উল্লেখ হইতে কিছুই স্পষ্ট হইতেছে না। যেভাবে ঐ পংক্তিগুলি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাও কোন 'কমা' জাতীয় বিরামচিহ্ন না

৬৭ হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখকে' ইঁহাকে নন্দকুমার ভট্টাচার্য বলা হইয়াছে।

৬৮ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড

৬৯ ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম (অপরার্ধ), পৃ. ৮৮০

৭০ ঐ—পাদটীকা, পৃ. ৪৮০। কিন্তু নন্দকুমার মুদ্রাকর হইতে পারেন কিনা সন্দেহ হয়। কারণ ঐ কাব্য ১৮২৫ খ্রীঃ হরচন্দ্র রায়ের ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হয়।

বসাইলে[৭১] নন্দকুমারকেই প্রকৃত ভাষানুবাদক বলিয়া মনে হইবে। বিশেষতঃ ভণিতার কোন কোন স্থলে নন্দকুমারের নাম রহিয়াছে বলিয়া চৌরপঞ্চাশিকার অনুবাদক রূপে তাঁহাকে আপাতত গ্রহণ করা গেল। কিন্তু কাশীনাথ সার্বভৌমের সঙ্গে বাংলা চৌরপঞ্চাশিকার কি সম্বন্ধ বুঝা গেল না। 'সমাচার দর্পণে'র উল্লেখ হইতে কাশীনাথকেই প্রকৃত অনুবাদক এবং নন্দকুমার দত্তকে[৭২] মুদ্রাকর বা প্রকাশক মনে হইতেছে। আবার অপরদিকে 'চৌরপঞ্চাশিকা'র অনুবাদের কোন কোন স্থলে নন্দকুমারের ভণিতা রহিয়াছে, সে যুগের লেখকগণ তাঁহাকেই চৌরপঞ্চাশিকার অনুবাদক বলিয়া ধরিয়াছেন। এ বিষয়ে যখন কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না, তখন নন্দকুমারকেই উপস্থিত ক্ষেত্রে চৌরপঞ্চাশিকার প্রকৃত অনুবাদক বলিয়া ধরা গেল। সে যাহা হউক, চৌরপঞ্চাশিকার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের যে কোন সম্পর্ক নাই, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী উদ্ভাবনে ভারতচন্দ্রের কোন কৃতিত্ব নাই, কারণ তিনি ইহা পূর্বসূরীদের নিকট পাইয়াছিলেন —বহু প্রচারিত এই কাহিনীতে নূতন কিছু সংযোজিত করাও দুরূহ ছিল।

---

৭১ মূল ছাপায় কোন 'কমা' ছিল না, ডঃ সেন নিজের মনোমত অর্থ বাহির করিবার জন্য "তদর্থ প্রতিপন্ন ভাষা"-র পর বন্ধনীর মধ্যে কমা চিহ্ন যোগ করিয়া দিয়াছেন। দ্রষ্টব্য : বাং. সা. ইতি. ১ম (অপরার্ধ), পৃ. ৪৮০

৭২ 'সমাচার দর্পণে' নন্দকুমারকে 'দত্ত' বলা হইয়াছে, মূল অনুবাদে শুধু শ্রীনন্দকুমার বলা হইয়াছে, হরিমোহন সেনগুপ্ত 'ভারতচন্দ্র রায়' প্রবন্ধে ('বিবিধার্থ সংগ্রহ', জ্যৈষ্ঠ, ১৭৭৬ শক) ইঁহাকে নন্দকুমার কবিরত্ন বলিয়াছেন এবং হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 'বঙ্গভাষার লেখকে' বলিয়াছেন, নন্দকুমার কবিরত্নের উপাধি ছিল ভট্টাচার্য। ঐ গ্রন্থেই উদ্ধৃত নন্দকুমারের রচনায় 'দ্বিজ নন্দকুমার' ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইলে মুদ্রাকর নন্দকুমার দত্ত এবং নন্দকুমার কবিরত্ন (ভট্টাচার্য, দ্বিজ) কি পৃথক ব্যক্তি? এ বিষয়ে ডঃ মদনমোহন গোস্বামী সংশয়ের অবতারণা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সন্দেহ নিরসন করিতে পারেন নাই। দ্রষ্টব্য—ডঃ গোস্বামীর রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র—পৃ. ১২৭—১২৮। নূতন কোন তথ্য পাওয়া না গেলে সে সন্দেহ দূর করাও দুরূহ। তবে ডঃ সুকুমার সেন সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ও সজনীকান্ত-ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত ভারতচন্দ্রের রচনাবলীর ভূমিকায় উল্লিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্যকে (অর্থাৎ নন্দকুমারই প্রকৃত অনুবাদক) যেভাবে ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহের গলা টিপিয়া মারা হয়, কোনরূপ যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না।

চরিত্র বিন্যাসেও কবি ভারতচন্দ্র যে খুব একটা কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা মনে হয় না, নায়ক-নায়িকার চরিত্র কৃত্রিম ধরনের হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জাতীয় কামক্রীড়াচঞ্চল, হাস্যপরিহাসমুখর ও কৌতুকব্যঙ্গে উজ্জ্বল লঘু কাহিনীর নায়ক-নায়িকারা যেরূপ হইয়া থাকে, ভারতচন্দ্র সেই আদর্শই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দরের নায়ক-নায়িকারাও রায়গুণাকর অপেক্ষা খুব যে জীবন্ত হইতে পারিয়াছে তাহা মনে হয় না। ভারতচন্দ্র এবং এই আখ্যানের অন্যান্য কবিদের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে এই যে, ভারতচন্দ্র কৃত্রিম তুচ্ছ প্রণয়কাহিনী ও নারী-চোরের ধূর্ততাকে হাস্যমুখর করিয়াছেন, অন্য কবিরা তাহা পারেন নাই। ফলে রায়গুণাকরের ব্যঙ্গরসের ঝিকিমিকি-লীলায় কৃত্রিম নাগরিকতা বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছে। মুকুন্দরাম এই ধরনের নায়ক-নায়িকা আঁকিতে গেলে নিশ্চয় তাহা কৃত্রিম হইত। কারণ গ্রাম্য ভূস্বামী রাজা রঘুনাথের গৃহশিক্ষক মুকুন্দরাম এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বশংবদ ভারতচন্দ্রের মধ্যে নানা দিক দিয়া পার্থক্য আছে। যাহা হউক চোরচূড়ামণি সুন্দর এবং প্রেমের ব্যাপারে মুগ্ধা নায়িকা হইয়াও প্রগল্ভা নায়িকার পাটোয়ারী বুদ্ধি-সম্পন্না ষোড়শ বর্ষীয়া[১৩] বিদ্যার গোপন মিলন বর্ণনা যদি বাস্তবধর্মী ও স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই রুচিবান পাঠকের শালীনতা-বোধে আঘাত করিত। ভারতচন্দ্র কৃত্রিম অলঙ্কার ও চটুল বাক্‌রীতির কড়িমধ্যম লাগাইয়া রিপুর উত্তেজনাকে 'দাবাইয়া' রাখিয়াছেন। হীরা-মালিনী কর্তৃক বিদ্যার রূপ ব্যাখ্যান এইরূপ কৃত্রিম বর্ণনার উদাহরণ হিসাবে গৃহীত হইতে পারে :

বিনানিয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥
কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে॥

* * * *

১৩ "বৎসর পনর ষোল হইল বয়ঃক্রম"।—বিদ্যা সম্পর্কে সুন্দরের নিকট হীরা মালিনীর উক্তি।

দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থুইলা লুকাইয়া॥
পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়েছিল।
ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল॥
কুচ হইতে কত উচ মেরু চূড়া ধরে।
শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে॥

এ বর্ণনা অতিশয় কৃত্রিম সন্দেহ নাই, বলিতে কি অলঙ্কার মাত্রেই কৃত্রিম তবে এ বিদ্যা ভারতচন্দ্র সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র এবং ফারসী কিস্‌সা-কিতাব হইতে পাইয়াছিলেন। সুন্দরের অনুপস্থিতিতে বিরহিণী বিদ্যা গজকাঠি মাপিয়া মাপিয়া বিলাপ করিয়াছে :

কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে
কানে হানে যেন তীর।
যত অলঙ্কার জ্বলন্ত অঙ্গার
পোড়ায় মোর শরীর॥
এ নীল কাপড় হানিছে কামড়
যেমন কালসাপিনী।
শয্যা হৈল শাল সজ্জা হৈল কাল
কেমনে জীবে পাপিনী॥

এমন কি সুন্দর ধরা পড়িলে বিদ্যা বিলাপ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে বেদনা অপেক্ষা কায়দাকানুন বেশী। যথা :

কাঁদে বিদ্যা বিনিয়া বিনিয়া শ্বাস বহে অনল জিনিয়া।
ইহা কব কার কাছে এখনো পরাণ আছে
বঁধুয়ার বন্ধন শুনিয়া॥

অবশ্য দু'এক স্থলে আন্তরিকতার সম্পর্কও আছে। যেমন :

ক্ষণেক শয্যায় ক্ষণেক ধরায়
ক্ষণেক সখীর কোলে।
ক্ষণে মোহ যায় সখীরা জাগায়
বঁধু এল এই বলে॥

ইহার সুর অনেকটা বৈষ্ণব পদাবলীর ধার ঘেঁসিয়া গিয়াছে। ধৃত সুন্দরের

রাজসমীপে বাক্‌ছল বিস্তার[৭৪] নিশ্চয়ই কৃত্রিম ও অতিরঞ্জন দোষদুষ্ট। কিন্তু কবি তো কোন গম্ভীর ভাবোদ্যোতক কাব্য লিখিতে বসেন নাই, আদিরস ও রঙ্গরস মিশাইয়া রাজসভার উপযোগী লঘু ধরনের কাব্য লিখিতে চাহিয়াছিলেন—কাজেই এই কৃত্রিমতা কৃত্রিম না হইয়া বিষয়বস্তুর উপযোগীই হইয়াছে।

চরিত্রের মধ্যে কবি অপ্রধান চরিত্রগুলিতে যে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য আরোপ করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতে হইবে। হীরামালিনী, ধূমকেতু কোটাল ও বিদ্যার মাতার চরিত্র উদাহরণস্বরূপ উল্লিখিত হইতে পারে। হীরার চরিত্র সম্বন্ধে কবি সংক্ষেপে বলিয়াছেন—"কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম"। বালবিধবা হীরা যদিও শাদাশাড়ী পরিধান করে, তবুও তাহার 'চূড়াবান্ধা চুল', 'গালভরা গুয়াপান'। রসের মালিনী হীরা রাজবাড়ীতে ফুল যোগায়। এখন সে গলিতযৌবনা, কিন্তু—

আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে ॥

তাহার বেসাতি বর্ণনা ('আটপণে আধসের আনিয়াছি চিনি' প্রভৃতি[৭৫]) নায়ক-নায়িকার দূতীগিরি, ধূর্ততা প্রভৃতি অতি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

---

৭৪ বীরসিংহ সুন্দরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে গুণসিন্ধুতনয় 'হবু শ্বশুর'কে বাক্‌ছলে এইভাবে জবাব দিয়াছে:

আমি রাজার কুমার আমি রাজার কুমার।
কহিলে প্রত্যয় কেন হইবে তোমার ॥
বিদ্যাপতি মোর নাম বিদ্যাপতি মোর নাম।
বিদ্যাধর জাতি বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম ॥
শুন শ্বশুর ঠাকুর শুন শ্বশুর ঠাকুর।
আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর ॥

এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্য স্মরণীয়: "সুন্দরের যখন রাজার সুমুখে বিচার হয়, তখন তিনি বীরসিংহ রায়কে যে সব কথা বলেছিলেন তা শুনে জনৈক সমালোচক মহাশয় বলেছিলেন যে, শ্বশুরের সঙ্গে এ হেন ইয়ার্কি কোন্ সমাজের সুরীতি? এর নাম ছেলেমি, না জ্যাঠামি?" (প্রবন্ধ সংগ্রহ, 'ভারতচন্দ্র') এই ধরনের কাব্যে সুন্দরের বাক্‌ছলই উপযুক্ত হইয়াছে। এখানে সে গলবস্ত্র হইয়া ভাবী শ্বশুরের নিকট কুলপরিচয় দিলেই রসভঙ্গ হইত—ইহাই বোধহয় চৌধুরী মহাশয়ের বক্তব্যের ব্যঞ্জনা।

৭৫ মুকুন্দরামের ভাঁড়ুদত্তের হাটকরার অনুকরণে ভারতচন্দ্র হীরা মালিনীর বেসাতি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উজ্জ্বলতা ও তির্যকতায় ইহা মুকুন্দরামকে ম্লান করিয়া দিয়াছে।

গিয়াছেন।"[৭৩] এইরূপ অনুমানও ভক্তিনিধি মহাশয়কে অপবাদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। পুঁথি খণ্ডিত বলিয়া যিনি প্রকৃত কথা গোপন করেন, তিনি আর একটু অগ্রসর হইয়া যে সমস্তটাই নিজে বানাইয়া দেন নাই তাহার বিরুদ্ধ প্রমাণ কোথায়? ইতিপূর্বে আমরা রামায়ণ এবং ভাগবত প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় কৃত্তিবাসী রামায়ণের আত্মপরিচয়জ্ঞাপক পুঁথি এবং মালাধর বসুর সন-তারিখযুক্ত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পুঁথিতেও নানা গোলমাল পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন।[৭৪] এখানেও যে সেরূপ বিভ্রাট ঘটে নাই তাহাই বা কে বলিল? সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মতে 'পদসমুদ্রে'র কোন পুঁথি হারাধন দত্ত মহাশয়ের নিকট নিশ্চয়ই ছিল। তবে তাহা খণ্ডিত বলিয়া তিনি লোকসমাজে বাহির করেন নাই। যাহা হউক, যে মাছ ধরা পড়ে নাই, অথবা জাল ছিঁড়িয়া পলাইয়াছে, তাহার আকার-আয়তন লইয়া গবেষণা নিষ্ফল।

ডঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় *History of Brajabuli Literature*-এ সজনীকান্ত দাসের নিকট রক্ষিত একটি সুপ্রাচীন পদসঙ্কলনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[৭৫] তাঁহার মতে ইহাই সর্বপ্রাচীন বৈষ্ণবপদসঙ্কলন। পুঁথিটি পুস্তকের আকারে লিপিকৃত, ইহার প্রথমদিকের কয়েকখানি পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহার নাম জানা যায় না। সবচেয়ে কৌতূহলের ব্যাপার ইহার প্রতি পৃষ্ঠায় সনের উল্লেখ আছে। যথা—পুঁথির ৭৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রতি পৃষ্ঠায় ১০৬০ সন (১৬৫৩ খ্রীঃ অঃ), ৭৮-৯৭ পৃষ্ঠায় ১০৬১ সন (১৬৫৪ খ্রীঃ অঃ) এবং ৮৯ হইতে পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে ১০৬৩ সনের (১৬৫৭ খ্রীঃ অঃ) উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাতে বহু অজ্ঞাতনামা কবিরও পদ উল্লিখিত হইয়াছে। ডঃ সেন উহার একখানি পৃষ্ঠার আলোকচিত্রও নিজ গ্রন্থে জুড়িয়া দিয়াছেন। পুঁথির লিপি অষ্টাদশ শতাব্দীর হইতে পারে। পুঁথিটি খাঁটি হইলে ইহাকে প্রাচীনতম পদসংগ্রহ বলিতেই হইবে। কিন্তু প্রতি পৃষ্ঠায় যেভাবে সন-

---

৭৩ সতীশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "বলা বাহুল্য, আমরা ভক্তিনিধি মহাশয়ের পক্ষে ওকালতী গ্রহণ করি নাই।" কিন্তু তিনি যেভাবে ভক্তিনিধি মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বেশ দক্ষতার সঙ্গেই মোয়াক্কেলের 'কেস' জিতাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

৭৪ এই লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ১ম, (২য় সংস্করণ), পৃ. ৪৭৯-৮০ এবং পৃ. ৬২৯-৩০ দ্রষ্টব্য।

৭৫ Dr. S. K. Sen—HBBL, p. 6

হইলেও বাস্তব ও অপ্রধান চরিত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাহাদের বাক্য, ব্যবহার ও ভঙ্গিমা দৈনন্দিন জীবনকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ভারতচন্দ্র নায়ক-নায়িকার চরিত্রাঙ্কনে ততটা সার্থক না হইলেও অপ্রধান চরিত্রে বিশেষ কুশলতা দেখাইয়াছেন। সেগুলি পুঁথির পৃষ্ঠা ছাড়িয়া যেন প্রাত্যহিক জীবনের মাঝখানে নামিয়া আসিয়াছে। রায়গুণাকর বাল্যবয়স হইতেই ভাগ্যদেবীর অপ্রসন্নতা সহিয়া গিয়াছেন; রাজানুগ্রহ লাভ করিলেও তাঁহার শেষ জীবন নিশ্চিন্তে অতিবাহিত হয় নাই। কঠোর বাস্তব জীবন সম্বন্ধে এত প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁহার অপেক্ষা আর কাহার অধিক ছিল? এই জন্য নাগর-নাগরীদের হাবভাব, রাজপুরুষ, কোটাল ও তস্য দলবল বিদ্যাসুন্দর কাব্যে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যশিল্পের বিশেষ অনুরাগী প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন, "পরের মনোরঞ্জন করতে গেলে সরস্বতীর বরপুত্রও যে নটবিটের দলভুক্ত হয়ে পড়েন তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ স্বয়ং ভারতচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য না হলে তিনি বিদ্যাসুন্দর রচনা করতেন না, কিন্তু তাঁর হাতে বিদ্যা ও সুন্দরের অপূর্ব মিলন সংঘটিত হত; কেননা knowledge এবং art উভয়ই তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল।' বিদ্যাসুন্দর খেলনা হলেও রাজার বিলাসভবনের পাঞ্চালিকা—সুবর্ণে গঠিত, সুগঠিত এবং মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত" (বীরবলের হালখাতা)। চৌধুরী মহাশয়ের এরূপ মন্তব্যের তাৎপর্য—ভারতচন্দ্র রাজার মনোরঞ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া অশেষ প্রতিভা সত্ত্বেও তাঁহার বিদ্যাসুন্দরকাব্যে জ্ঞান ও সৌন্দর্যের মিলন হয় নাই—চরিত্রগুলি রাজবাড়ীর পুতুলনাচের সভায় অলঙ্কৃত পুতুলে পরিণত হইয়াছে, রক্তমাংসের মানুষ হইতে পারে নাই। তাঁহার এই অভিমত পুরাপুরি গ্রহণ করা যায় না।[৭৭] কারণ নায়ক-

---

৭৭ প্রমথ চৌধুরী দার্জিলিঙে অবস্থান কালে *The Story of Bengali Literature* শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহার পরেও তিনি শান্তিপুর সাহিত্য সম্মিলনীতে প্রদত্ত অভিভাষণে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন। দুই আলোচনাতেই তিনি শিল্পী ভারতচন্দ্রের প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু চরিত্রসৃষ্টি সম্বন্ধে বিশেষ কোন মন্তব্য করেন নাই। বিদ্যাসুন্দরকে তিনি "রাজার বিলাসভবনের পাঞ্চালিকা" বলিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় তিনি এই কাব্যের রচনাকৌশল ভিন্ন আর কিছুর প্রশংসা করেন নাই। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য—অশ্লীলতার দায় হইতে ভারতচন্দ্রের মুক্তিদান।

নায়িকাকে বাদ দিলে বিদ্যাসুন্দরে আর যে সমস্ত নরনারীর চরিত্র আছে, প্রসঙ্গ আছে—তাহাদিগকে কৃত্রিম পুতুল বলিয়া মনে হয় না। প্রত্যেকেরই কোনও-না-কোনও প্রকার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। মানবচরিত্র সম্বন্ধে কবির যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইয়াছিল বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অধিকাংশ চরিত্রে তাহার ছাপ পড়িয়াছে।

বহুদিন হইতে ভারতচন্দ্রের উপর একই অভিযোগ আরোপ করা হইতেছে—তিনি অশ্লীল, গ্রাম্য ও কুরুচিপূর্ণ বর্ণনার কবি। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী শিক্ষা-সংস্কৃতিতে লালিত রুচি ও নীতিমার্গীয় ব্রাহ্ম আদর্শের প্রভাবের ফলে আদিরসাত্মক বর্ণনার প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর অরুচি জন্মিয়াছিল; পরে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে অনুভূতি ও মনঃপ্রণালী এতই সূক্ষ্ম ও সৌন্দর্য-বিলাসী হইয়া পড়িল যে, স্থূল দেহায়তনের কথা দূরে বিসর্জিত হইল। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ও ইংরাজী প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ কিঞ্চিৎ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।[৭৮] বাংলা প্রবন্ধেও তিনি বলিয়াছেন, "তাঁর গোটাকাব্য অশ্লীল না হোক, তার অনেক অংশ যে অশ্লীল সে বিষয়ে দ্বিমত নেই।" তবে তাঁহার মতে ভারতচন্দ্র অশ্লীল বর্ণনাকে অলঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া ব্যক্ত অশ্লীলতাকে চাপা দিয়াছেন। বরং অন্য কবিদের অশ্লীলতায় এই আবরণ নাই বলিয়া তাঁহারা ভারতচন্দ্র অপেক্ষা নিন্দনীয়। এ বিষয়ে চৌধুরী মহাশয়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—"ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার ভিতরে art আছে, অপরের আছে শুধু nature." —কথাটা অত্যন্ত মূল্যবান। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের আদিরসের বর্ণনাগুলি মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, ভক্তকবি রামপ্রসাদের রচনায় বিদ্যাসুন্দর-সমাগম কুৎসিত জান্তবধর্মী কামক্রীড়ায় পর্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র দেহধর্মকে ছন্দে অলঙ্কারে রঙ্গে রসে নর্মলীলা করিয়া তুলিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রকে অশ্লীলতার দায় হইতে

---

[৭৮] "The Vidya-Sundara is a love story, a novel in verse. But the love he treats of has nothing spiritual or ideal about it, but is the common mundane passion which lends itself to humorous and even indelicate treatment···Bharat Chandra's poem, if I may say so, is a study in nude—not of Psyche, but of Venus Pandemos". (Pramatha Choudhury—*The Story of Bengali Literature*)

যুক্তি দিতে গিয়া অন্যান্য কবির কথা পাড়িয়াছেন—"এ স্থলে আমি জিজ্ঞাসা করি। তাঁর পূর্ববর্তী বাংলা ও সংস্কৃত কবিরা কি খুব শ্লীল?" অর্থাৎ ভারতচন্দ্র অপেক্ষাও অনেক বাংলা-সংস্কৃত কবিরা যখন অশ্লীলতার দায়ে অপরাধী, তখন একা ভারতচন্দ্রকে অশ্লীলতার জন্য নিন্দা করিয়া কি হইবে? বরং তাঁহার প্রশংসা করাই উচিত, কারণ তিনি শিল্পচাতুর্যের দ্বারা অশ্লীলতার স্থূলতা অনেকটা ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন।

আমাদের মনে হয় প্রমথ চৌধুরীর উল্লিখিত অভিমত একটা মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারবুদ্ধির সঙ্গমস্থলে দাঁড়াইয়া আছে। অশ্লীলতা, গ্রাম্যতা ও আদিরস—অনেক সময় আমরা তিনটিকে একত্রে মিশাইয়া ফেলি। আলঙ্কারিকের (বামন) মতে—"ব্রীড়াজুগুপ্‌সামঙ্গলাতঙ্কদায়ী"—যাহা ব্রীড়া, জুগুপ্‌সা, অমঙ্গল, ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে তাহাই অশ্লীল। 'শ্রী' শব্দের সঙ্গে শ্লীল শব্দের ধ্বনিতত্ত্বগত যোগ থাকিতে পারে। সহজকথায়, যে আদিরসাত্মক বর্ণনায় সৌন্দর্য নাই, পাঠকমনে ঘৃণা-লজ্জা উদ্রেক করে—তাহাই অশ্লীল—আদিরসাত্মক বর্ণনা মাত্রই অশ্লীল নহে। আদিরসাত্মক হইলেই যদি বর্ণনা অশ্লীল হয়, তাহা হইলে তো পৃথিবীর অধিকাংশ সাহিত্য শিল্পকলা বাতিল হইয়া যায়। কারণ বিশ্বসাহিত্যে শিল্পসংস্কৃতির একটা বড় অংশ নরনারীর দেহঘটিত মিলন-বিরহের কথা লইয়াই রচিত হইয়াছে।

গ্রাম্যতার সংজ্ঞা দিতে গিয়া আলঙ্কারিক বামন বলিয়াছেন, "লোকমাত্রপ্রযুক্তং গ্রাম্যম্"—জনসাধারণের অমার্জিত ভাষাই গ্রাম্য। শাস্ত্রকারগণ কাব্যসাহিত্যে গ্রাম্য শব্দের প্রয়োগ, গ্রাম্য বর্ণনা প্রভৃতি নিষেধ করিয়াছেন। এখন দেখা যাক, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে আদিরস, অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা—কোন্‌টি অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে কালীভক্তির মোড়ক থাকিলেও তাহা আদ্যন্ত আদিরসে পূর্ণ, নায়ক-নায়িকার বিবাহ-পূর্ব গুপ্ত প্রণয়ই ইহার একমাত্র বক্তব্য। সুতরাং ইহাতে আদিরসের কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি থাকিবেই—আদিরসের বর্ণনা আছে বলিয়া সঙ্কোচে পিছাইয়া গেলে চলিবে না। শুধু বিচার করিতে হইবে, আদিরসের বর্ণনা কোথাও অশ্লীল বা গ্রাম্য হইয়াছে কিনা।

কৃষ্ণনগরের চারিদিকে যে অভিজাত সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে মুর্শিদাবাদের দরবারী আদর্শ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। দরবারী

আদর্শের ফলে ফারসী আদিরসের গল্প-আখ্যান ফারসী-নবিশ মহলে বিশেষ মুখরোচক হইয়াছিল—ভারতচন্দ্রও রামচন্দ্র মুন্সীর নিকট অবস্থান কালে ফারসী ভাষায় বিশেষ কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন।[৭৯] উপরন্তু সংস্কৃত পুরাণগ্রন্থ সাহিত্য-অলঙ্কার-দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রাদিতেও তাঁহার নিপুণ অধিকার ছিল।[৮০] ফলে আদিরসকে তিনি নানা অলঙ্কার আভরণে সাজাইয়া মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন। 'বিদ্যাসুন্দরে' নায়ক-নায়িকার মিলন বর্ণনার মধ্যে বিহারারম্ভ, বিহার, বিপরীত বিহারারম্ভ, বিপরীত বিহার ও দিবাবিহার—এই বর্ণনা কয়টিতে প্রত্যক্ষভাবে কামরহস্যের শারীরঘটিত এমন বর্ণনা আছে, যাহা আধুনিক রুচিকে কিঞ্চিৎ পীড়িত করিতে পারে। নরনারীর দেহসম্পর্কঘটিত যে-কোন বর্ণনাই যদি অশ্লীল হয়, তবে ভারতচন্দ্রের এই অংশগুলিও অশ্লীল। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতচন্দ্র আদিরসের উত্তেজক বর্ণনাকে ভাষা, অলঙ্কার ও ব্যঞ্জনার দ্বারা কিছু সংযত করিয়াছেন বলিয়া এই সমস্ত মিলনরভসের বর্ণনা অশ্লীলতায় পৌঁছাইতে পারে নাই। কিন্তু দুই চারি স্থলে গ্রাম্যধরনের বাক্‌রীতি ও বর্ণনা যে নাই, তাহা নহে। প্রৌঢ়া হীরা-মালিনী সম্পর্কে তরুণ সুন্দরের উক্তি:

---

৭৯ আরবী-ফারসী-হিন্দুস্থানী ভাষায় কবি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহা 'মানসিংহে' তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

৮০ কবি এইভাবে নিজ অধ্যয়নের তালিকা দিয়াছেন:

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীতশাস্ত্রের অধ্যাপক॥
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারসী।

অধ্যাত্ম শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল:

বেদান্ত একাত্মবাদী দ্ব্যাত্মবাদী তর্ক।
মীমাংসার মীমাংসার না হয় সম্পর্ক॥
বৈশেষিকে বিশেষ কহিতে কিছু নারে।
পাতঞ্জলে মাথায় অঞ্জলি বান্ধি হারে॥
সাঙ্খ্যেতে কি হবে সঙ্খ্যা আত্মনিরূপণ।
পুরাণ সংহিতা স্মৃতি মনু বিজ্ঞ নন॥
*   *   *   *
অন্ত শাস্ত্র যে সব সে সব কাঁটা বন।
তত্ত্বত বাদরায়ণে প্রমাণ লিখন॥

কিন্তু মাগী একা থাকে দেখি নষ্ট রীত।
দুর্ব্বুদ্ধি ঘটায় পাছে হিতে বিপরীত॥
মাসী বলি সম্বোধন আমি করি আগে।
নাতি বলি পাছে মাগী দেখে ভয় লাগে॥

এই বর্ণনার ব্যঞ্জনায় খানিকটা অনুচিত প্রসঙ্গ আছে—কিন্তু ব্যঞ্জনার আকারে আছে বলিয়া স্থূল হইতে পারে নাই। ফুল জোগাইতে বিলম্ব হওয়ায় বিদ্যা ক্রুদ্ধা হইয়া হীরাকে গালি দিয়াছে—"রাঁড় হয়ে যেন ষাঁড়ের নাট"—এই উক্তি গালির মুখে বেমানান হয় নাই। অবশ্য এই অনুচিত কথা বলিয়া পরে বিদ্যা অনুতপ্তও হইয়াছে।[৮১] দিবাবিহারের বর্ণনাভঙ্গিমা মার্জিত হইলেও বক্তব্য বিষয় গ্রাম্য বটে। আর এক স্থলে চোরধরার বৃত্তান্তে দেখা যাইতেছে, বিদ্যার ঘরে সুড়ঙ্গমুখে লুকাইয়া থাকিয়া চোর ধরিবার জন্য কোটাল ধূমকেতু এবং তাহার আর ভাইয়েরা স্ত্রীবেশ ধারণ করিল। কনিষ্ঠ চন্দ্রকেতু দেখিতে সুশ্রী। সুতরাং সে বিদ্যার সাজ গ্রহণ করিয়া গুণ্ঠন টানিয়া সুন্দরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল—আর ভাইয়েরা বিদ্যার সখীর ছদ্মবেশে রহিল। যথারীতি সুন্দর সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করিয়া বিদ্যাবেশিনী গুণ্ঠনবতী চন্দ্রকেতুর পাশে বসিল এবং "কামকথা কহে কবি কামিনী জানিয়া।" কিন্তু কবি এখানেই রাশ টানিতে পারেন নাই—কামান্ধ সুন্দর হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া চন্দ্রকেতুর আঁচল ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল ("সুন্দর আঁচল ধরি করে টানাটানি")। তখন সখীবেশী আর এক ভাই সূর্যকেতু সুন্দরের এই উন্মত্ত ব্যবহারে শঙ্কিত হইয়া ভাবিল :

এটা যে দেখি গোঁয়ার।
কি জানি চাঁদেরে ধরি একে করে আর॥

ইহার পরে চন্দ্রকেতুকে বিদ্যাভ্রমে তাহার প্রতি সুন্দরের তদুপযুক্ত ব্যবহারের চেষ্টা এবং হাস্যকর বিড়ম্বনা কবি খুব কৌতুক পরিহাসের সঙ্গে বর্ণনা

---

৮১ হীরা উক্ত গালি খাইয়া ক্ষুব্ধ হইয়া চলিয়া যাইতে চাহিলে বিদ্যা অনুনয় করিয়া তাহাকে ফিরাইয়াছে :

থাক বঁধু লয়ে এই কথা কয়ে
অপরাধ হৈল মোর।
কৈতে পারি যেই কহিয়াছি তেঁই
আমি লো নাতিনী তোর॥

করিয়াছেন বটে, কিন্তু গ্রাম্য রঙ্গরস ঢাকিতে পারেন নাই। অবশ্য অসঙ্গতি-জনিত হাস্যপরিহাস স্থূল জুগুপ্সাব্যঞ্জক ব্যাপারকে কথঞ্চিৎ সহনযোগ্য করিয়াছে। সুন্দর ধরা পড়িলে নারীগণ যেভাবে পতিনিন্দা করিয়াছে তাহার স্থূল দেহঘটিত কথা সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। বীরসিংহের সমীপে সুন্দর আত্মপরিচয় দিতে গিয়া যেরূপ বাক্ছল ব্যবহার করিয়াছে তাহাতে গ্রাম্যতা অপেক্ষা রঙ্গকৌতুকই অধিক ফুটিয়াছে। যাহা হউক বিদ্যাসুন্দর কাব্যের বিষয়বস্তুর দিক হইতে ধরিলে ইহাতে ব্যক্তভাবে আদি-রসাত্মক বর্ণনা থাকিবেই। বস্তুতঃ কালিকামঙ্গলের অধিকাংশ কবি বিদ্যা-সুন্দরের মিলন বর্ণনায় সংযম রক্ষা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ভারতচন্দ্র সেই একই পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন—তবে রচনার কৌশলে স্থূল ব্যাপার কুৎসিত ও গ্রাম্য হইতে পারে নাই।

রায়গুণাকরের বিদ্যাসুন্দর কালিকামঙ্গলের রীতিতে রচিত, কাব্যের কোন কোন স্থলে দেবী কালিকার প্রত্যক্ষ উপস্থিতির উল্লেখ আছে। সুন্দর বিদ্যার রূপগুণ শুনিয়া কালীর নাম স্মরণ করিয়া ("যদি কালী কূল দেন কূলে আগমন") বর্ধমানে উপস্থিত হইল। হীরার নিকট বিদ্যার রূপগুণের পরিচয় পাইয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য সে ব্যাকুল হইল। কিন্তু কি করিয়া বিদ্যার সুরক্ষিত শয়নকক্ষে সুন্দর উপস্থিত হইবে? তখন সে কালিকা বন্দনা শুরু করিল।

মাতা সদয় হইয়া ভক্তকে অনূঢ়া রাজকন্যার শয়নকক্ষে সিঁধ কাটিবার উপায় বলিয়া দিলেন, তাম্রপত্রে সন্ধিমন্ত্র লিখিয়া দিলেন এবং "শূন্য হৈতে সিঁদকাটি দিলা ফেলাইয়া"। সেই মন্ত্রপূত সিঁধকাঠির সাহায্যে সুড়ঙ্গ কাটিয়া সুন্দরচোর বিদ্যার সমীপে উপস্থিত হইল। সুন্দর ধরা পড়িলে প্রাণদণ্ডের জন্য তাহাকে মশানে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে সে শব্দ-প্রয়োগের বহু প্রকার 'কেরামতী' দেখাইয়া দেবী কালিকার স্তব আরম্ভ করিয়া দিল:

মা কালিকে।
কালি কালি কালি কালি কালি কালি কালিকে॥
চণ্ডমণ্ডি মুণ্ড খণ্ডি খণ্ডমুণ্ড মালিকে।
ধক ধক ভক ভক অগ্নিচন্দ্র ভালিকে॥

লীহ লীহ লোল জীহ লক লক সাজিকে।
হক ঢক ভক ভক রক্তরাজি রাজিকে॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিকে।
মার মার ঘোর ঘোর ছিঙ্কি ভিঙ্কি ভাষিকে॥
ঢক ঢক হক হক পীতরক্ত হালিকে।
থেই থেই থেই থেই নৃত্যগীত তালিকে॥[৮২]

ইহার পর সে অকারাদিক্রমে চৌত্রিশ অক্ষরে এমন 'চৌতিশা' স্তব জুড়িয়া দিল যে, দেবী সদলবলে মশানে আবির্ভূত হইয়া সুন্দরকে অভয় দিয়া বলিলেন, "মা! ভৈষীঃ মা ভৈষীঃ বেটা, তোরে বা বধিবে কেটা তবে আজি করিব প্রলয়।" যাহা হউক দেবীর কৃপায় সুন্দর মুক্তি পাইল, রাজা বীরসিংহ নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া সুন্দরের কাছে ক্রটি স্বীকার করিলেন এবং তাহাকে সানন্দে জামাতারূপে বরণ করিলেন। কিন্তু দেবীর রোষে কোটাল প্রভৃতি রাজসেবকগণ বদ্ধ অবস্থায় আছে, তাহাদের কি হইবে? সুন্দর বলিল, "পূজা কর কালিকার, রক্ষা হবে সবাকার, ইহপরলোকের মঙ্গল"। তখন বীরসিংহ সুন্দরের উপদেশে কালীপূজা করিলেন এবং দেবীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। অতঃপর বিবাহান্তে কিছুদিন শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া সুন্দর সস্ত্রীক নিজ দেশে ফিরিয়া গেল। যথাকালে সে রাজ্যলাভ করিয়া "নানা মতে কালীরে পূজিল।" কাল পূর্ণ হইলে বিদ্যাসুন্দর পুত্রের হস্তে রাজ্যভার দিয়া মর্ত্যকায়া ত্যাগের উদ্যোগ করিল। তখন দেবী:

বিদ্যা সুন্দরেরে লয়ে কালিকা কৌতুকী হয়ে
কৈলাস শিখরে উত্তরিলা।

বিদ্যাসুন্দর যে শাপভ্রষ্ট দেবদেবী, পূর্বে কবি তাহা বলেন নাই, কিন্তু মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী শেষের দিকে নামমাত্র শাপের উল্লেখ করিয়া কবি পালা সাঙ্গ করিয়াছেন। অন্যান্য কালিকামঙ্গলে দেবীর যতটুকু উল্লেখ থাকে, ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাহাও নাই। সন্ধিখননে সুন্দরকে সাহায্য এবং মশানে তাহাকে রক্ষা—এই দুই ব্যাপারে কালিকার কিছু উদ্যোগ দেখা গিয়াছে। তাই এই কাব্যে কালিকামঙ্গলের বৈশিষ্ট্য বিশেষ রক্ষিত হয়

৮২ অনেক কবির শব্দের নেশা থাকে, ভারতচন্দ্রের ছিল যুক্তব্যঞ্জনবর্ণের নেশা—অনেক সময় তাহা নিছক শব্দ-মাতলামিতে পরিণত হইয়াছে—যেমন উল্লিখিত দৃষ্টান্ত।

নাই—ইহা প্রকৃতই বিদ্যাসুন্দর কাব্য হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দরে নরলীলাই প্রাধান্য পাইয়াছে—দেবী কালিকার যেটুকু প্রসঙ্গ না থাকিলে কাব্যের অঙ্গ হানি হয়, কবি শুধু সেইটুকুই আনিয়াছেন।

দেবী কালিকা ভক্ত সুন্দরকে বিদ্যার কক্ষে সিঁধ কাটিতে সাহায্য করিয়াছেন। অনেকে ইহার জন্য ভারতচন্দ্রকে দোষ দিয়া থাকেন। প্রথমতঃ ইহাতে ভারতচন্দ্রের বিশেষ দোষ নাই। দেবী কালিকা চোরদের দ্বারা পূজিত হইতেন। নারীচোর সুন্দর কার্য হাঁসিল করিবার জন্য কালিকার শরণ লইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? আর তাহা ছাড়া মঙ্গল কাব্যের দেবদেবীরা ভক্তের জন্য যে-কোন হীন কাজ করিতে সমর্থ। ভারতচন্দ্র সেই আদর্শই অনুসরণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ভারতচন্দ্র কালিকামঙ্গলের বহু-প্রচলিত 'প্যাটার্ন' কিঞ্চিৎ অনুসরণ করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে, তাঁহার যুগের রুচিকে এবং কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকে দুষিয়া লাভ নাই।

অতঃপর বিদ্যাসুন্দরের বাক্‌রীতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিদ্যাসুন্দরের রুচিঘটিত প্রশ্ন মুলতবি রাখিয়া একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, রায়গুণাকরের হাতে পড়িয়া মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষায় যৌবনের রূপ, রঙ ও রস অপূর্ব দীপ্তি ধারণ করিয়াছে। বিদ্যার সখীরা বলিয়াছিল, "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙে হীরার ধার"। কিন্তু গুণীর হাতে পড়িলে খনিগর্ভস্থ আ-কাটা হীরাও যে কিরূপ সহস্রমুখী হইয়া ওঠে, অযুত রশ্মি বিচ্ছুরিত করে, তাহা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের বাগ্‌বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। প্রমথ চৌধুরী বলিয়াছিলেন, "As regards Bharat Chandra's language, there is nothing more limpid, more birght, more graceful, or more elegant in the whole of Bengali Literature." বিদ্যাসুন্দরের তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল কৌতুকরস, মার্জিত ভাষা বাস্তবিক মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ভারতচন্দ্রের বাক্‌রীতিই তাঁহাকে অমরত্ব দিয়াছে, "ছাঁচে ঢালা সুন্দর মার্জিত ভাষার জ্যোতিতে"[৮৩] মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষা নূতন প্রাণ লাভ করিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ভারতচন্দ্র রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী'র অনুসরণে বলিয়াছিলেন,

৮৩ দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

"যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে।" রসোদ্বোধনের জন্ম বাণীমূর্তি যে কতটা সাহায্য করে, তাহা তাঁহার অপেক্ষা অধিক কে জানিত? নিম্নে এইরূপ কতিপয় বাক্‌রীতির উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :—

(১) মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

(২) নীচ যদি উচ্চভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে।

(৩) খুন হয়েছিনু বাছা চুণ চেয়ে চেয়ে।

(৪) কড়ি ফটকা চিড়া দই বন্ধু নাই কড়ি বই
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।

(৫) সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।

(৬) যার কর্ম তার সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে।

(৭) গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়।

(৮) ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

(৯) পুরুষ পরশমণি যারে ছোঁবে সেই ধনী।

(১০) ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়॥

(১১) বুঝ লোক যে জান সন্ধান।

(১২) ভেকে ভুলাইয়া পদ্মে ভৃঙ্গে মধু খায়।

(১৩) মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ রয়।

(১৪) সাপের বাসায় ভেকেরে নাচায় কেমন কুটিনী সে বা।

(১৫) এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার।

(১৬) না ধরিলে রাজা বধে, ধরিলে ভুজঙ্গ।
সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ॥

(১৭) লোভের নিকট যদি ফাঁদ পাতা যায়।
পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়॥
দেব উপদেব পড়ে তন্ত্রমন্ত্র ফাঁদে।
নিরাকার ব্রহ্ম দেহফাঁদে পড়ি কাঁদে।

(১৮) ইতো ভ্রষ্ট স্ততো নষ্ট ন পূর্ব ন পর।

(১৯) কোলে নিধি খরচ করিতে হয় খুন।

(২০) জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী।

(২১) বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী।

(২২) অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর।
ক্ষীরোদে থাকিলা হরি হিমালয়ে হর॥

উল্লিখিত কবি-প্রৌঢ়োক্তিগুলি এখন প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। ইহার কিছু কিছু সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু তীক্ষ্ণ তির্যকতার গুণে এই ধরনের বাক্যপ্রয়োগ আমাদের ঘরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। অসাধারণ 'ভাষাচতুর' ভারতচন্দ্র যাদুকরের মতো বিদ্যাসুন্দরের ভাষাকে যথেচ্ছা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এবং অভাবনীয়ত্বের চমক দিয়া যে বৈদগ্ধ্য ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ও বাঙালী পাঠকের মনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই মার্জিত নাগরিক ভাষা-ভঙ্গিমার জন্যই বিদ্যাসুন্দরের কামোত্তপ্ত বর্ণনা সাহিত্য-গুণান্বিত হইতে পারিয়াছে—তাহা না হইলে তাহা 'পর্নোগ্রাফি'তে পর্যবসিত হইত।

ভারতচন্দ্র অসাধারণ শব্দকুশলী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার—উভয় রীতিরই তিনি ছিলেন সিদ্ধ সাধক। সংস্কৃত, ফারসী ও হিন্দীর ভাণ্ডার হইতে তিনি প্রয়োজন মতো শব্দ চয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া ভাষার ঐশ্বর্যে তিনি মধ্যযুগীয় সমস্ত কবিকেই ছাড়াইয়া গিয়াছেন। পাণ্ডিত্য, কৌতুকপ্রবণতা ও রসবোধ একত্রে মিলিলে যাহা হয় ভারত-চন্দ্র তাহার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। অনাধুনিক বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধিদীপ্ত রচনা বলিতে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থকেই নির্দেশ করিতে হইবে। রঙ্গকৌতুক ও ব্যঙ্গ মূলতঃ বুদ্ধি-আশ্রয়ী। ভারতচন্দ্র এদিক হইতে বাঙালীর স্বভাবসুলভ আবেগকে প্রশমিত করিয়া বুদ্ধির হীরকদীপ্তি বিকীর্ণ করিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে এ বিষয়ে আলেকজাণ্ডার পোপের সমতুল্য বলিয়াছেন—কিন্তু এই কৌতুক, রঙ্গব্যঙ্গ ও বুদ্ধির দীপ্তি পোপ অপেক্ষা ফরাসী সাহিত্যের অধিক নিকটবর্তী। এ বিষয়ে প্রথম চৌধুরী মহাশয়ের উক্তি অতিশয় মূল্যবান—"আমার বিশ্বাস ভারতচন্দ্র যদি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করতেন তা হলে তাঁর প্রতিভা অনুকূল অবস্থার ভিতর আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠত এবং তাঁর রচনা ফরাসী সাহিত্যের একটি মাস্টারপিস বলে গণ্য হত।" (নানাকথা—'ফরাসী সাহিত্যের কবি পরিচয়')

রঙ্গরসে উতরোল বিদ্যাসুন্দর আখ্যানে কবি যে সমস্ত গীতিকবিতা সংযোজিত করিয়াছেন তাহাতে আধুনিক কালের কাব্যলক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিভাবপ্রধান গীতিকবিতার রূপ ও রস আধুনিক কালের ব্যাপার। দেবভাব-প্রধান মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিনিষ্ঠ গীতিকবিতার ততটা প্রচলন না হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু ভারতচন্দ্র আপনার অজ্ঞাতসারে উনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতার পথ খনন করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য এই গীতিকবিতাগুলি মূল কাহিনীর প্রতি উপচ্ছেদের প্রবেশক হিসাবে সংযোজিত হইয়াছে। কবি তৎকালীন প্রথামতো রাধাকৃষ্ণের প্রতীকে এই সমস্ত গীতিরসসিক্ত পদ রচনা করিয়াছেন। এখানে এইরূপ দুই একটি পদের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

ওহে বিনোদরায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে ॥
নব জলধর তনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু
পীতধড়া বিজলীতে ময়ূরে নাচাও হে।
নয়ন চকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর
মুখসুধাকর হাসি সুধায় বাঁচাও হে ॥

ইহার শেষ কয়ছত্রে কবিকল্পনা, আবেগ ও রচনাচাতুর্য বিশেষ চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিয়াছে :

নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে চাহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমত চাহে সেইমত চাও হে।

নিম্নে উদ্ধৃত পদে অন্তরের গভীরতা ততটা না ফুটিলেও রচনার সৌকুমার্য প্রশংসার যোগ্য :

কি বলিলি মালিনি ফিরে বল্ বল্।
রসে তনু ডগমগ মন টল টল ॥
শিহরিল কলেবর তনু কাঁপে থর থর
হিয়া হৈল জরজর আঁখি ছল ছল ॥

তেয়াগিয়া লোকলাজ কুলের মাথায় বাজ
ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ে চল চল ॥
রহিতে না পারি ঘরে আকুল পরাণ করে
চিত না ধৈরজ ধরে পিক কল কল।
দেখিব সে শ্যামরায় বিকাইব রাঙ্গা পায়
ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢল ঢল ॥

রাধার জবানীতে এই উক্তিটি সুন্দর হইয়াছে :

কারে কব লো যে দুঃখ আমার।
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার ॥
বাঁধা আছি কুলফাঁদে পরাণ সতত কাঁদে
না দেখিয়া শ্যামচাঁদে দিবসে আঁধার ॥

অবশ্য এই সমস্ত গীতিরসার্দ্র পদে আবেগ অপেক্ষা বাকরীতির তির্যকতাই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। যেমন এই পদটির কয়েক পংক্তি :

মোর পরাণ পুতলী রাধা।
সুতনু তনুর আধা ॥
দেখিতে রাধায় মন সদা ধায়
নাহি মানে কোন বাধা
রাধা সে আমার আমি সে রাধার
আর যত সব ধাঁধা ॥

এখানে কবি বৈষ্ণব পদাবলীর মর্মমূলে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। কারণ এই শাক্ত কবির বৈষ্ণব ভাবের প্রতি বড় একটা আসক্তি ছিল না—যদিও প্রথম যৌবনে তিনি কিছুকাল বৈষ্ণব হইয়া বৈষ্ণব আখড়ায় বাস করিয়াছিলেন। বুদ্ধিপ্রধান ও ব্যঙ্গরঙ্গের নাগরিক কবি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে বৈষ্ণব-পদকারের ভাবগভীর রস-তন্ময়তার কোনরূপ সম্পর্ক না থাকাই স্বাভাবিক। তাই বিদ্যাসুন্দরের মাঝে মাঝে প্রবেশক হিসাবে বৈষ্ণব পদাবলীর ঢঙে রচিত যে পদগুলি সংযোজিত হইয়াছে, সেগুলি কোন দিক দিয়াই বৈষ্ণব-পদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। ভাবগভীরতাহীন পদে বাক্‌চাতুরীর

বৈদগ্ধ্য যতই চিত্তাকর্ষী হোক না কেন, ইহাতে গভীর আবেগ সাড়া দেয় না। ভারতচন্দ্র এই সমস্ত পদে বৈষ্ণব পদাবলীর বাহিরের দিকটি অনুকরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আবেগের অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার তাঁহার ছিল না। যে যাহা হউক, প্রচুর কুখ্যাতি সত্ত্বেও বিদ্যাসুন্দরই ভারতচন্দ্রকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। রুচিবাগীশের দল নাসিকা কুঞ্চন করিলেও ইহাতে কবির পরিপক্ক রচনাশক্তি প্রশংসনীয় কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

এবার অন্নদামঙ্গলের তৃতীয় খণ্ড বা 'মানসিংহ অন্নপূর্ণামঙ্গল' আলোচনা করা যাইতেছে। এই তৃতীয় খণ্ডই কবির অন্যতম প্রধান বর্ণিতব্য বিষয়—অন্নপূর্ণার কৃপাবশতঃ জমিদারী লাভ করিয়া ভবানন্দের রাজ-উপাধির দ্বারা সমাজে প্রাধান্য বিস্তার। বরং বিদ্যাসুন্দর কাব্য অন্নদামঙ্গল ও অন্নপূর্ণামঙ্গলের মধ্যে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। 'মানসিংহ' অন্নপূর্ণামঙ্গল নামেও পরিচিত, কারণ ইহাতে ভবানন্দের অন্নপূর্ণা-কৃপালাভ এবং জাহাঙ্গীরকে দেবীভক্ত করিবার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই তৃতীয় খণ্ডটি বাঙলায় মুঘল অভিযানের পটভূমিকায় স্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং ইহার ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল সম্বন্ধে কবি সচেতন ছিলেন। কিন্তু ভবানন্দের গৌরব প্রচার করিতে গিয়া তিনি ইতিহাস ও রূপকথা, কাব্য ও তথ্য একসঙ্গে মিশাইয়া ইতিহাসের জাতি মারিয়াছেন। কবি দেখাইয়াছেন, মানসিংহ যখন প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে আসিয়া দুর্যোগে বিপন্ন হইয়াছিলেন, তখন ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের কানুনগো হইয়া দেবী অন্নপূর্ণার কৃপায় মুঘল ও রাজপুত বাহিনীকে অন্নদানে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে ইহার কোন উল্লেখ নাই। মানসিংহের দ্বারা প্রতাপাদিত্য পরাভূত ও বন্দী হন নাই। তাঁহার পরবর্তী সুবাদার ইসলাম খাঁয়ের সুবাদারীর সময়ে—১৬১২ খ্রীঃ অব্দে তিনি কয়েদ হন। মানসিংহ তাহার বারো বৎসর পূর্বে বাঙলার সুবাদারীত্যাগ করিয়া আগ্রা প্রস্থান করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে কবির প্রধান অবলম্বন ছিল জনশ্রুতি এবং সংস্কৃতে রচিত নদীয়া রাজবংশের কাহিনী 'ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিতম্'।[৮৩] কারণ মুসলমান ঐতিহাসিকগণ প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে

৮৩ 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্'-এ আছে, মানসিংহ ভবানন্দের সাহায্যে প্রতাপাদিত্যকে

বিশেষ কিছু বলেন নাই।[৮৪] ইসলাম খাঁ যখন ঢাকার সুবাদার রূপে বাস করিতেছিলেন (সুবাদারীকাল—১৬০৮-১৬১৩ খ্রীঃ) তখন মুঘলবাহিনীর সেনানায়ক মির্জা নাথনের চেষ্টায় প্রতাপ পরাজিত হইয়া (১৬১২ খ্রীঃ) বশ্যতা স্বীকার করেন। ঢাকায় ইসলাম খাঁয়ের নিকট নীত হইলে সুবাদার তাঁহাকে কয়েদখানায় বন্দী করিয়া রাখেন। তাহার পরের ঘটনা মুসলমান ঐতিহাসিক অনাবশ্যকবোধে বর্ণনা করেন নাই—প্রতাপাদিত্যের পরিণাম সম্বন্ধে প্রামাণিক কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি মতে প্রতাপাদিত্যকে কিছুদিন ঢাকায় একটি লোহার খাঁচায় বন্দী করিয়া রাখা হয়। তারপর বন্দী অবস্থায় সেই খাঁচায় করিয়া যখন তাঁহাকে দিল্লীতে জাহাঙ্গীরের কাছে লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখন পথিমধ্যে বারাণসীধামে তাঁহার দেহান্ত হয়। এই জনশ্রুতির মূলে কিছু সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে। অন্নদামঙ্গলের তৃতীয় খণ্ড অর্থাৎ 'মানসিংহ-অন্নপূর্ণামঙ্গলে' ভারতচন্দ্র প্রতাপাদিত্য প্রসঙ্গে কিছু জনশ্রুতি, কিছু ইতিহাস আর বাকিটা নিজস্ব কল্পনার দ্বারা পুরাইয়া লইয়াছেন। কবি যে যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন ইতিহাসের পট দ্রুত পাল্টাইয়া যাইতেছিল। রাজন্যবর্গের জীবন ও শাসনপ্রণালী জনসাধারণকে

পরাভূত করিয়া রাজাকে লোহার পিঞ্জরে বন্দী করিয়া ভবানন্দসহ দিল্লী যাত্রা করেন। পথে বারাণসীধামে প্রতাপের দেহান্ত হয় (প্রতাপাদিত্যং বদ্ধ্বা লৌহময়পিঞ্জরে নিক্ষিপ্য পুনরিন্দ্রপ্রস্থং যবনাধিপং নিবেদিতুং চলিতঃ। অথ বদ্ধস্য পথি গচ্ছতঃ প্রতাপাদিত্যস্য বারাণস্যাং পঞ্চত্বমভবৎ।")। H. S. Rainey-র 'Sundarban' প্রবন্ধে (*Proceedings of the Asiatic Society*, Dec. 1868) ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহার মতে, "The Prince (i. e. Pratapaditya) was defeated in a battle by Raja Ram Singh. The only written history of Pratapaditya is in the *Khitica Charita* a sanskrit History of the kings of Krishnagor...Bharat Chandra, author of the *Vidya Sundar*, has evidently taken his history form the sanskrit work as the very epithets of Pratapaditya used in the sanskrit work, are repeated in the poem." (ডঃ মদনমোহন গোস্বামীর 'রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র' হইতে উদ্ধৃত)

৮৪ 'বাহারিস্তানে' ইহার উল্লেখ আছে। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে' বর্ণিত অধিকাংশে ঐতিহাসিক তথ্য 'বাহারিস্তান' হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর খুলনার ইতিহাসে' এবং ১৩২৭ সনের কার্তিক মাসের 'প্রবাসীতে' স্যর যদুনাথ সরকারের প্রবন্ধে এবিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। দ্রষ্টব্য: *Baharistan-i-Ghaibi*—Tr. by Dr. Borah (Gauhati)

এতটা আঘাত করিয়াছিল যে, ভারতচন্দ্রের মতো কবি ঐতিহাসিক পটভূমিকা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন নাই। অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কিভাবে এবং কেন আলিবর্দি কর্তৃক মুর্শিদাবাদের কয়েদখানায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গ বলিতে গিয়া কবি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বর্গীর উৎপাতের বর্ণনা দিয়াছেন—অবশ্য প্রকারান্তরে তিনি বর্গীর আক্রমণ সমর্থন করিয়াছেন। এই অংশে ('গ্রন্থ-সূচনা'-) তিনি প্রথমে আলিবর্দি কর্তৃক উড়িষ্যা ধ্বংস বর্ণনা করেন। মুঘল-বাহিনী লুঠিতে লুঠিতে মহাদেবের স্থান ভুবনেশ্বরেও দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। ইহাতে শিবানুচর নন্দী মুঘল বিনাশের জন্য শূল নিক্ষেপে উদ্যত হইলে মহাদেব নিষেধ করিলেন। কারণ অল্প কয়েকজনকে বধ করিতে গেলে বিস্তর নিরীহ লোক মারা পড়িবে। তিনি নন্দীকে বলিলেন :

আছয়ে বর্গির রাজা গড় সেতারায়।
আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়॥
সেই আসি যবনেরে করিবে দমন।
শুনি নন্দি তারে গিয়া কহিলা স্বপন॥

স্বপ্ন দেখিয়া বর্গীরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া ইহার প্রতিকারের জন্য রঘুরাজ ও ভাস্কর পণ্ডিতকে বাঙলা লুঠিতে পাঠাইয়া দিলেন—দেশের সর্বনাশ হইল। তখন আলিবর্দি কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট বারো লক্ষ টাকা নজরানা চাহিয়া বসিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র এতটাকা দিতে অপরাগ হইলে আলিবর্দি তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে ধরিয়া আনিয়া কয়েদ করিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র কারা-কক্ষে দেবীর স্তব ও পূজা করিয়া সে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন। অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডের এই ঐতিহাসিক ইঙ্গিতটুকু ইতিহাস বিরোধী নহে—তবে মহাদেব-নন্দী প্রসঙ্গ কবিকল্পিত। কবি বিশ্বাস করিতেন, হিন্দুর উপর মুসলমানে অত্যাচার করিত বলিয়াই বাঙলার মুসলমান শাসন বর্গীর দ্বারা বিপর্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু 'মানসিংহে' কবি ভারতচন্দ্র ভবানন্দকে প্রধান করিবার জন্য ইতিহাস হইতে 'ছিটেফোঁটা' লইয়া কল্পনার সাহায্যে ঐতিহাসিক কাহিনী রচনা করিয়াছেন। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ :—

প্রতাপাদিত্য দমনে মানসিংহ বাঙলায় আসিলে ভবানন্দ তাঁহার কানুনগো নিযুক্ত হইলেন এবং ঝড়বৃষ্টিতে অতিব্যাকুল মুঘল-রাজপুত

বাহিনীকে দেবী অন্নপূর্ণার কৃপায় অন্নদান করিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা করিলেন। ইহাতে খুশি হইয়া মানসিংহ স্বীকার করিলেন, দিল্লী যাইবার সময় তিনি ভবানন্দকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া জাহাঙ্গীরের সঙ্গে ভেট করাইয়া দিবেন, এবং যাহাতে মজুমদারের ঐহিক সুবিধা হয়, তিনি সে ব্যবস্থা করিবেন। মানসিংহ ভবানন্দের উপদেশে অন্নপূর্ণা পূজা করিয়া সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন। প্রতাপাদিত্যকেও তিনি পরাভূত ও বন্দী করিয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন, সঙ্গে চলিলেন ভবানন্দ। জলপথে যাত্রা করিয়া এবং নানা তীর্থস্থান দর্শন করিয়া তাঁহারা দিল্লী পৌঁছাইলেন। ইতিমধ্যে যখন তাঁহারা মথুরাবৃন্দাবন দর্শন করিতেছিলেন, তখন লোহার খাঁচার মধ্যে বন্দী প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হইল—অনাহারেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।[৮৫] প্রতাপের শবদেহ ঘৃতে ভাজিয়া মানসিংহ সঙ্গে লইয়া চলিলেন, বাদশাহকে ভেট দিবেন।[৮৬] বাদশাহ তুষ্ট হইয়া বাঙলা জয়ের ব্যাপার জানিতে চাহিলে মানসিংহ ভবানন্দকে দেখাইয়া বলিলেন যে, অন্নপূর্ণার মহাভক্ত ভবানন্দ দেবীর কৃপায় তাঁহাদিগকে দারুণ বিপর্যয়ের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে রাজা উপাধি ও জমিদারী দান করা উচিত। ইসলাম ধর্মাবলম্বী জাহাঙ্গীর হিন্দুর দেবীর এই অলৌকিক ক্ষমতা অস্বীকার করিয়া হিন্দুধর্ম ও লোকাচারের নিন্দা করিলেন—"যত কাম করে হিন্দু সকলই নাপাক"। তাঁহার বিশেষ ক্রোধ ব্রাহ্মণের প্রতি, "বিশেষে বামন জাতি বড় দাগাদার"। তাই তাঁহার ইচ্ছা, সব হিন্দুকে মুসলমান করিবেন :

আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই।
সুন্নত দেওয়াই আর কলমা পড়াই॥

৮৫ 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্'-এর মতে বারাণসীধামে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হয়।

৮৬ প্রতাপ আদিত্য রাজা মৈল অনাহারে।
ঘৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে॥
কত দিনে দিল্লীতে হইয়া উপনীত।
সাক্ষাত করিলা পাতশাহের সহিত॥
ঘৃতে ভাজা প্রতাপ আদিত্য ভেট দিলা।
কত কব যত মত প্রতিষ্ঠা পাইলা॥
পাতশার আজ্ঞামত মানসিংহ রায়।
প্রতাপ আদিত্যে ভাসাইল যমুনায়॥

তাঁহার বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ ভবানন্দ কোন ভূতুড়ে কাণ্ড করিয়া মানসিংহকে তাক লাগাইয়া দিয়াছে। কিন্তু তাঁহার কাছে এসব ভেল্‌কি খাটিবে না—"এমন হিন্দুর ভূত দেখেছি বহুত।" যদি ব্রাহ্মণের এমন সাধ্য থাকে, সে ভূত দেখাক না! ইহার উত্তরে মনে মনে রুষ্ট হইয়া, কিন্তু মুখে বিনয় রাখিয়া ভবানন্দ যথোচিত জবাব দিলেন, এবং ইসলাম ধর্মাচারের মধ্যেও অনেক গলদ আছে তাহাও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, কিন্তু কোথাও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিলেন না :

মজুন্দার কহে জাঁহাপনা সেলামত।
দেবতার নিন্দা কেন কর হজরত॥
হিন্দু মুসলমান আদি জীবজন্তু যত।
ঈশ্বর সবার এক নহে দুই মত॥

ইহাতে জাহাঙ্গীর ক্রুদ্ধ হইয়া ভবানন্দকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করিলেন। কারাকক্ষে কাতর ভবানন্দ অন্নপূর্ণার স্তব করিলে দেবী আকাশবাণীতে মজুমদারকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে, অনাচারী, অত্যাচারী বাদশাহকে তিনি উচিত শিক্ষা দিবেন :

পাপী পাতশার পূত আমারে কহিল ভূত
ভাল মতে ভূত দেখাইব।
পাতশাহী সরঞ্জাম যত আছে ধূম ধাম
ভূত দিয়া সব লুঠাইব।

কারণ এই মুসলমান জাতি ও তাহাদের বাদশাহ হিন্দুর উপর বড় অত্যাচার করিতেছে :

যতেক বেদের মত সকলি করিল হত
নাহি মানে আগম পুরাণ।
মিছা মালা ছিলিমিলি মিছা জপের ইলিমিলি
মিছা পড়ে কলমা কোরান॥
যত দেবতার মঠ ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ
নানা মতে করে অনাচার।
বামন পণ্ডিত পায় থুথু দেয় তার গায়
পৈতা ছেঁড়ে ফোঁটা মোছে তার॥[৮৭]

---

[৮৭] অবহট্ঠ ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতায়'ও এইরূপ তুরুকের অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার পর দিল্লীতে ভূতপ্রেতের দারুণ উৎপাত শুরু হইল। শহরের সম্রান্ত মুসলমানের ঘরে ভূতে ভীষণ উপদ্রব করিতে লাগিল, বিবিদের ভূতে পাইল, "পেশবাজ ইজার ধমকে ছিঁড়া দিল"। ভয়ে ভয়ে মিয়া রোজা আনাইলেন, রোজা অনেক মন্ত্রতন্ত্র পড়িল, কিন্তু ভূতেরা বিবিকে তো ছাড়িলই না, উপরন্তু "ওঝারে কিলায়!" চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। তখন জাহাঙ্গীরের আক্কেল হইল। তাঁহাকে কাতর ও অনুতপ্ত দেখিয়া দেবী অন্নপূর্ণা আকাশে বাদশাহের অনুরূপ প্রপঞ্চ-দরবার সৃষ্টি করিলেন। নিজে পাতশাহ হইয়া সিংহাসনে বসিলেন, অন্যান্য দেবদেবীরাও যথাযোগ্য আমীর-ওমরাহ হইয়া আকাশ-দরবারে আসীন হইলেন :

রক্তশতদল তক্তে পাতশা অভয়া।
উজির হইল জয়া নাজির বিজয়া॥
মহাবিদ্যাগণ যত হৈলা পরিবার।
আমীর উমরা হৈল যত অবতার॥
* * * *
বিষ্ণু বকসী ব্রহ্মা কাজী মুনশী মহেশ।
সেনাপতি শাহজাদা কার্তিক গণেশ॥
* * * *
সক্কা হৈল বরুণ পবন ঝাড়ুকশ।[৮৮]
চন্দ্র সূর্য মশালচী মশাল ওজস্॥[৮৯]

আর সকলের সামনে রহিলেন দেবী অন্নপূর্ণা—তাঁহার শিরে দেবরাজ ইন্দ্র রাজছত্র ধরিলেন। জাহাঙ্গীর আকাশমার্গে আরও অনেক অদ্ভুত অনৈসর্গিক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। এইরূপ নানা দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার হিন্দুধর্মের প্রতি বিরূপতা কাটিয়া গেল, তিনি অন্নপূর্ণার ভক্ত হইলেন এবং ভবানন্দের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের জন্য অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন। অতঃপর বাদশাহ মজুমদারের নিকট মিনতি করিতে লাগিলেন এবং দিল্লী শহরে সাড়ম্বরে অন্নপূর্ণা পূজার আদেশ প্রচার করিলেন। ভূতপ্রেতের দারুণ উৎপাতে তাঁহার ধারণা

৮৮ সক্কা—জলবাহক
" ঝাড়ুকশ—ঝাড়ুদার

৮৯ এই প্রসঙ্গে সহদেব চক্রবর্তীর 'অনিল পুরাণ' ও রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণে উল্লিখিত 'নিরঞ্জনের রুস্মা'র কথা মনে পড়িবে। সেখানে দেবদেবীগণ সদ্ধর্মবিরোধী বৈদিক ব্রাহ্মণদের শাস্তি দিবার জন্য মুসলমান পীর-ফকিরের বেশ ধরিয়াছিলেন।

হইল, হিন্দুর দেবদেবী মিথ্যা নহে ("ভালমতে বুঝিনু তোমার দেবী সাঁচা")। স্বয়ং বাদশাহ মহানন্দে অন্নপূর্ণার পূজা করিলেন, দিল্লার পূর্ব ঐশ্বর্য আবার ফিরিয়া আসিল। খুশি হইয়া জাহাঙ্গীর ভবানন্দকে রাজা উপাধি দিয়া যথাবিহিত সম্মান সহ বিদায় দিলেন। ভবানন্দ অনুচরদের সঙ্গে লইয়া নিজ দেশের দিকে যাত্রা করিলেন এবং গঙ্গা বাহিয়া অযোধ্যা অতিক্রম করিয়া কাশী উপনীত হইলেন। সেখানে ষোড়শোপচারে অন্নপূর্ণার পূজা দিয়া নানা তীর্থ দর্শন করিয়া মহাগৌরবে নিজ গ্রামে পৌঁছাইলেন। অতঃপর দুই রাণী লইয়া ফাঁপরে পড়িলেন। জ্যেষ্ঠা রাণী সন্তানের জননী এবং গলিতযৌবনা, কনিষ্ঠা যুবতী। তখন ভবানন্দ ভারতচন্দ্রীয় কৌশলে দুই রাণীরই সাহচর্য লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি বাগুয়ান পরগণার রাজা হইয়া রাজোচিত কর্ম নির্বাহ করিতে লাগিলেন। খুব ঘটা করিয়া তিনি অন্নপূর্ণার পূজার আয়োজন করিলেন, স্বয়ং দেবী আবির্ভূত হইয়া ভবানন্দের সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করিলেন। দেবীর নির্দেশে ভবানন্দের প্রিয় পুত্র গোপাল রাজপদ পাইবে এইরূপ স্থির হইল। এইবার শাপ অবসানের কাল নিকটবর্তী হইল, সকলকে কাঁদাইয়া কুবের-পুত্র নলকুবর ভবানন্দের মর্ত্যকায়া ত্যাগ করিয়া স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন, ভবানন্দের দুই পত্নী (যাঁহারা স্বর্গে নলকুবরের পত্নী ছিলেন) স্বর্গে যাইতে উৎসুক হইয়া ভবানন্দের সঙ্গে সহমৃতা হইলেন।

'মানসিংহে'র এই কাহিনী কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে—অন্নদামঙ্গলের তিনটি খণ্ডের মধ্যে এই 'মানসিংহ' খণ্ডটি (তৃতীয় খণ্ড) নিকৃষ্টতম। কবি ইতিহাস অবলম্বন করিলেও ঐতিহাসিক তথ্যাদি সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। উপরন্তু কবি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জনের জন্য মহারাজের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের গৌরব খ্যাপনে অধিকতর ব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে এমন সমস্ত আজগুবি কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন যে, মনে হয়, তিনি যেন সম্ভব-অসম্ভবের সীমা অবহেলাভরে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছেন। তাহা না হইলে দিল্লীতে ভূতের উৎপাত এবং জাহাঙ্গীর ও অন্যান্য মুসলমান ওমরাহদের অন্নপূর্ণা-পূজায় সানন্দে যোগদান —কবি এরূপ হাস্যকর গল্প লিখিবেন কেন? ভবানন্দের মহিমা বাড়াইতে গিয়া কবি পরিমিতি ও ঔচিত্যবোধ হারাইরা ফেলিয়াছিলেন। ভবানন্দের প্রকৃত কাহিনীটি অতি অকিঞ্চিৎকর। সেই জন্য কবি নানা তীর্থ ও

স্থান মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া কাহিনীর দুর্বলতা ঢাকিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে সফল হন নাই। চরিত্রের মধ্যে জাহাঙ্গীরের উদ্ধত সাম্প্রদায়িক ভাব মন্দ ফুটে নাই, অন্যান্য চরিত্রে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইতেছে না। ভবানন্দের দুই স্ত্রীর চরিত্র বেশ কৌতুকাবহ ও বিচক্ষণ হইয়াছে। তবে কবি দুই একটি অপ্রধান চরিত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। মানসিংহের সেনাবাহিনী দারুণ ঝড়বৃষ্টিতে কাতর হইয়া পড়িল। যাহারা এই সেনাবাহিনীর সঙ্গে নানা কাজে যোগ দিয়া বাঙলায় আসিয়াছিল, তাহাদেরও দুর্গতির একশেষ হইল। তন্মধ্যে এক ঘেসেড়ানীর রঙ্গমুখর কৌতুকাবহ চরিত্র কবি তূলির দুই আঁচড়ে চমৎকার ফুটাইয়াছেন :

ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে।
ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হাবাসে॥
কান্দি কহে ঘেসেড়ানী হায় রে গোঁসাই।
এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই॥
বৎসর পনের ষোল বয়স আমার।
ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার॥
হেদে গোলামের বেটা বিদেশে আনিয়া।
অনেকে অনাথ কৈল মোরে ডুবাইয়া॥

পনের-ষোল বৎসর বয়স্কা ঘেসেড়ানীর দ্বাদশ নম্বরের ভর্তা হারাইয়া এই যে বিলাপ, ইহা ভারতচন্দ্রের উচ্চাঙ্গের রসিকতা বলিয়াই গণ্য হইবে। আর একটি দৃষ্টান্ত—দিল্লীতে ক্রুদ্ধ জাহাঙ্গীর ভবানন্দকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করিলেন। তখন ভবানন্দের দুইজন অনুচর দাশু ও বাশু বিপদ গণিয়া নিজ নিজ স্ত্রীর উল্লেখ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। তন্মধ্যে বাশুর দুঃখ কিছু অধিক। কারণ :

কুড়ি টাকা পণ দিয়া নূতন করিনু বিয়া
এক দিনো শুতে না পাইনু।

'মানসিংহে' ভারতচন্দ্রের কয়েকটি উক্তি খুব তীক্ষ্ণ হইয়াছে। কেন যাবনিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন :

না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে॥

এখানে তিনি রাজশেখরের মন্তব্য ("ভাসা জা হোদু সা হোদু"—'কর্পূর-মঞ্জরী') গ্রহণ করিয়াছেন। এক স্থলে কবি সুকৌশলে ফিরিঙ্গী জাতির আচার-ব্যবহার আক্রমণ করিয়া লিখিয়াছেন :

যবনেরে কত ভাল ফিরিঙ্গির মত।
কর্ণবেধ নাহি করে না দেয় সুন্নত॥
শৌচ আচমন নাহি যাহা পায় খায়।
কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায়॥

ভবানন্দের বড়রাণী কিঞ্চিৎ বয়োধিকা হইয়াও প্রৌঢ় স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এমন সময় কোলের ছেলে কাঁদিয়া উঠিল :

ছেলে কেন্দে উঠে কোলে তোষেণ মধুর বোলে
কান্দ না রে ঐ তোর বাপা।
তোর বাপে আনি গিয়া থাক বাছা চুপ দিয়া
অই ডাকে কানকাটা হাপা॥

এখানে হাস্যরস ও করুণরস একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। অন্যত্র কবির কিছু কিছু উক্তি বেশ চমকপ্রদ হইয়াছে। যথা :

(১) নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
(২) অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে।
পুষ্প সঙ্গে কীট যেন উঠে সুরমাথে॥
(৩) সুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥

তবে অন্নদামঙ্গলের তৃতীয়খণ্ডে কবিপ্রতিভার সজীবতা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে, ভাষা-ভঙ্গিমার তির্যকতাও ধার হারাইয়া ফেলিয়াছে। অবশ্য দুই-চারিটি বাক্যরীতিতে ভারতচন্দ্রের সরস পরিহাস-ব্যঙ্গ এখনও বজায় আছে বটে। যথা—নীলাচলের বর্ণনা :

খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় মুছিব হাথ
নাচিব গাইব কুতূহলে।
ভবসিন্ধু বিন্দু জানি পার হৈনু হেন মানি
সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে॥

এই খণ্ডের কোন কোন স্থলে কবির ভক্তিরসাশ্রিত মনের পরিচয় কয়েকটি গীতিকবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে :

তুমি অন্ন দেহ যারে অমৃত কি মিঠা তারে
সুধাতে কে করে সাধ এ সুধা ছাড়িয়া।
পরশিয়া অন্নসুধা ভারতের হর ক্ষুধা
মা বিনে বালকে অন্ন কে দেয় ডাকিয়া॥

এই কাব্যে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত প্রতাপাদিত্য চরিত্র সম্বন্ধে কবির মনোভাব যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য রায়গুণাকর এত ব্যস্ত ছিলেন যে, বীর প্রতাপাদিত্যের বন্ধন সম্বন্ধে তাঁহার মনে কিছুমাত্র বেদনা বা ক্ষোভ উদিত হয় নাই। যাঁহাকে বাঙলার জাতীয় বীর বলা হয়, তাঁহার বন্দীদশা, শোকাবহ মৃত্যুলাঞ্ছিত অন্ত্যেষ্টি বর্ণনা করিতে গিয়া এই বাঙালী কবির মনে কোন সহানুভূতি জাগে নাই। ভবানন্দের গৌরব বাড়াইতে গিয়া নটবিটের পর্যায়ভুক্ত এই রাজকবির দাস্যভাবই অধিক ফুটিয়াছে।—যাঁহারা এইরূপ মন্তব্য করেন, তাঁহারা কিছু অন্যায় কথা বলেন না। তবে ভারতচন্দ্র যে ইচ্ছা করিয়া প্রতাপের বীরত্ব লঘু করিয়াছেন তাহা নহে, বরং তাঁহার প্রচণ্ড শৌর্যই প্রকাশিত হইয়াছে। কবির বর্ণনায় মানসিংহ ভবানন্দকে সঙ্গে লইয়া যশোহরে উপনীত হইয়া প্রতাপাদিত্যকে একখানি তরবারি ও এক জোড়া বেড়ী পাঠাইয়া দিলেন। প্রত্যুত্তরে প্রতাপ তরবারিখানি রাখিয়া বেড়ীজোড়া দূতের মারফতে মানসিংহের কাছে ফেরত পাঠাইলেন, এবং বলিয়া দিলেন :

কহ গিয়া অরে চর মানসিংহ রায়ে।
বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে॥
লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে।
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে॥

আরও কয়েক স্থলে কবি কালিকার প্রসাদপুষ্ট ("বরপুত্র ভবানীর") বহু সৈন্যের নায়ক "মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ" প্রতাপাদিত্যের শৌর্যবীর্য ও গৌরবের কথা সগর্বে প্রচার করিয়াছেন। যাঁহার "বায়ান্ন হাজার ঢালী", "ষোড়শ হল্কা হাতী,[১০] "অযুত তুরঙ্গ সাথী" রহিয়াছে, আর "যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী", তিনি যে দিল্লীশ্বরকে অগ্রাহ্য করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি। কিন্তু এতবড় বীররাজা দুর্বুদ্ধিবশতঃ খুড়া বসন্তরায়কে সবংশে

১০ হল্কা—দল

কাটিয়া ফেলিলেন। বসন্তরায়ের পুত্র কচু রায় কোনও প্রকারে প্রাণ লইয়া পলাইয়া গিয়া দিল্লীশ্বরের নিকট অভিযোগ করিলে

ক্রোধ হৈল পাতসায় বান্ধিতে আনিতে তায়
রাজা মানসিংহে পাঠাইলা।

অন্যায় ও নৃশংস কার্যের জন্য প্রতাপের ইষ্টদেবী যশোরেশ্বরীও বিমুখ হইলেন :

পাপেতে ফিরিয়া বসিলা রুষিয়া
তাহারে অকৃপা করি।

ব্যাপার বুঝিয়া গুরুপুরোহিতেরাও মানসিংহের পক্ষেই যোগদান করিলেন। অতএব :

বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া
প্রতাপ আদিত্য হারে।

যাঁহার প্রতি অভয়া বিমুখ হইয়াছেন, তাঁহার প্রতি ভারতচন্দ্রের সহানুভূতি থাকে কি করিয়া? সুতরাং কবি পরম উদাসীনের ন্যায় বাঙলার বীর প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের ঘটনা দুই কথায় সারিয়াছেন :

পিঞ্জর করিয়া পিঞ্জরে ভরিয়া
প্রতাপ আদিত্যে লৈল॥

আমাদের মনে হইতে পারে, বাঙলার বীর সামন্ত, যিনি প্রবল প্রতাপান্বিত মুঘল-সম্রাটের বিরুদ্ধে বীরের মতো লড়িয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রের লেখনী তাঁহার বিষয়ে এতটা কৃপণতা করিল কেন? ইহার একটা কারণ কৃষ্ণনগরাধিপের মাসমাহিনার দ্বারা ক্রীত রায়গুণাকর পৃষ্ঠপোষকের পূর্বপুরুষের জয়গান করিতে গিয়া প্রতাপের প্রতি ততটা সুবিচার করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় কারণ, যাহাকে আধুনিক কালে স্বদেশপ্রেম বলে, তাহা ইংরাজ-শাসনের পূর্বে ভারতবর্ষে বড় একটা ছিল না। অবশ্য রাজপুত, শিখ ও মারাঠা জাতির জলন্ত দেশপ্রেমের কথা বিস্মৃত হওয়া যায় না। কিন্তু এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বীরত্বের প্রকাশ ঘটিয়াছিল, তাহার অনেকটাই ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মানুভূতিকে কেন্দ্র করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিল। রাজপুত জাতির বীরত্ব, কৌলিক মর্যাদা ও দলপতি বা প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে। এই জন্য মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাহিত্য ও জীবনে পাশ্চাত্য ধরনের স্বদেশপ্রেম বিকাশ লাভ করিবার বিশেষ অবকাশ পায় নাই। ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের অবসানের প্রাক্‌মুহূর্তে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ

হইয়াছিলেন, তাই প্রতাপকে ঘেরিয়া তাঁহার মনে স্বদেশপ্রেম জাগিবার অবকাশ পায় নাই—যদিও তিনি প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব সম্বন্ধে প্রশংসনীয় মন্তব্যই করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথার অবতারণা করা যাইতে পারে। প্রতাপাদিত্যকে কেন্দ্র করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বাঙালী নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকের মনে স্বদেশপ্রেমের বন্যা ডাকিয়াছিল—তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে। সেই যুগে প্রতাপাদিত্যের চারিদিকে যে স্বাদেশিক গৌরবের বহ্নিবলয় সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সেই যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ার জন্যই সম্ভব হইয়াছিল—পুরাতন কাহিনী ও ইতিহাসে (ইতিহাস যৎসামান্য) সেরূপ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ 'বউঠাকুরাণীর হাটে' প্রতাপাদিত্যকে যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহাতে একযুগের স্বদেশপ্রেমিক বাঙালী কিছু ক্ষুব্ধ হইলেও পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ইতিহাসের দিক দিয়া যথার্থ মনে হয়। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কবিগুরুর তীক্ষ্ণ মন্তব্য অতিশয় যুক্তিপূর্ণ—"স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীরচরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। এখনও তার নিবৃত্তি হয়নি। আমি সে-সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা-কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল, কিন্তু ক্ষমতা ছিল না।"[৯১] সে যাহা হউক, ভারতচন্দ্র ইতিহাসকে যথাযোগ্য সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু ইতিহাসকে কাব্যের পটভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়া মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতা ভঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন।

ইতিপূর্বে 'বিদ্যাসুন্দর' প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি যে. ভারতচন্দ্র আদিরসের কাব্য লিখিলেও যাহাকে গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতা বলে, তাহাকে পরিহার করিয়াই চলিয়াছেন। নাগরিক কবি নাগরজনোচিত বৈদগ্ধ্যই প্রকাশ করিয়াছেন, ফলে বক্তব্যের চটুলতা ও তীক্ষ্ণতা বর্ণনীয় বিষয়ের স্থূলতাকে

৯১ রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ সংযোজিত 'বউঠাকুরাণীর হাটের' "সূচনা"।

ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। অবশ্য কেহ কেহ ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গে সমাজ-মানসিকতার প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ভারতচন্দ্র এক অবক্ষয়ী সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার কাব্যে নৈতিক অধোগতি এতটা রমণীয় ও চিত্তাকর্ষীরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। বিদ্যার মন্দিরে সুড়ঙ্গ কাটিয়া সুন্দর দুর্নীতিপূর্ণ ক্লিন্ন জীবনের জয়গান গাহিয়াছে। এই সুড়ঙ্গ সমাজের অভ্যন্তরে সুগভীর ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি করিয়াছিল—ভারতচন্দ্র এই দূষিত দরবারী আদর্শের নকিব।[৯২] কারণ তাঁহার কাব্যে নায়ক-নায়িকার প্রাগ্‌বিবাহ-মিলনের কথা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত কাব্য-সাহিত্যে প্রাগ্‌বিবাহ ও পরকীয়া প্রেমের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এ বিষয়ে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে—মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন শ্রেণীর কাব্যে বিশেষ ধরনের রীতি অনুসৃত হইত। মঙ্গলকাব্যেরও কতকগুলি বাঁধা দস্তুর ছিল। ভারতচন্দ্র কালিকামঙ্গলের ধারা অনুসরণ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর কাব্যে গল্পটি যেভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে, কবি মোটামুটি সেই আদর্শই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যেক কালিকামঙ্গলেই দেবী কালিকার বরে বিদ্যার শয়নমন্দিরে সুন্দর গোপনে উপস্থিত হইয়াছিল—ভারতচন্দ্র সেই আদর্শই গ্রহণ করিয়াছেন। অন্য কবির সঙ্গে পার্থক্য শুধু এই যে, ভারতচন্দ্র স্থূল ব্যাপারকে সূক্ষ্ম কারুকর্মের দ্বারা সহনযোগ্য করিয়াছেন, কামরঙ্গের জান্তব উল্লাসকে বাক্‌বৈচিত্র্যের দ্বারা প্রশমিত করিয়াছেন, এবং হাস্য-কৌতুকের দ্বারা আপত্তিকর বর্ণনাকে লঘু করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যাসুন্দর রচনার জন্য ভারতচন্দ্রের দূষিত রুচি বা তৎকালীন সমাজজীবনের অধোগতি স্মরণ করিয়া বিষণ্ণ হইবার প্রয়োজন নাই।

আর একটা প্রসঙ্গ এই স্থানে আলোচনা করা যাইতে পারে। ভারতচন্দ্র দেবদেবীর প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদিগকে হাস্যকর ভাঁড়ে পরিণত করিয়াছেন, তাঁহার দেববিশ্বাস শিথিল হইয়া গিয়াছিল, এবং এই রন্ধ্র পথ দিয়া তিনি আধুনিক কাব্যের সূচনা করিয়া গিয়াছেন—এরূপ কথা অনেকেই

---

৯২ রুচিবাগীশদের পক্ষ হইতে দীনেশচন্দ্র ভারতচন্দ্রের নৈতিক ভাব সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করিয়া লিখিয়াছিলেন, "বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কাব্য নৈতিক জীবনের ভগ্নপতাকা, বিজাতীয় আদর্শ ও কুরুচি-কলুষিত কাচের মূল্যে বিকাইবার যোগ্য...।" কিন্তু কাব্য বিচার করিতে বসিয়া নৈতিক জীবনের পতাকা উচ্চ করিয়া তুলিলেই সব সময়ে শ্রেষ্ঠ কাব্য পাওয়া যায় না।

বলিয়া থাকেন। একথা অবশ্য সত্য যে, ভারতচন্দ্রের মধ্যযুগীয় সাহিত্যের নরলীলার প্রথম সচেতন কবি। অন্নদামঙ্গলে দেবদেবীর চরিত্র একেবারে মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে। দৈবী মহিমা অপেক্ষা মানবোচিত ত্রুটি-বিচ্যুতিই তাঁহাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে। তবে দেবদেবীর প্রতি কবির বিশ্বাস ও নিষ্ঠা শিথিল হইয়াছিল—তাহা পুরাপুরি স্বীকার করা যায় না। কারণ অন্নদামঙ্গলের তিন খণ্ডের কোথাও কবি দেব-দেবীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। দেবী অন্নদার পূজা প্রচারের জন্যই তিনি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং দেবদেবীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না, এরূপ কোন কথাই উঠিতে পারে না। সংস্কৃত অর্বাচীন পুরাণেও দেবদেবীর চরিত্রে সব সময়ে নৈতিক আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। ভারতচন্দ্র এই ধরনের পুরাণের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার অঙ্কিত দেবদেবীর চরিত্র কিয়দংশে অর্বাচীন পুরাণের অনুরূপ হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? আরও একটা কথা, কবি দেবদেবীর কাহিনীকে গার্হস্থ্য আদর্শের দ্বারা রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছেন। তাই অন্নদামঙ্গলের দেবদেবীর চরিত্রে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের ছায়া পড়িয়াছে। হরপার্বতীর দাম্পত্যজীবন, কলহ, শিবের ভিক্ষায় গমন, বৃদ্ধ ব্যাসের হাস্যকর বিড়ম্বনা—এ সমস্তই দৈনন্দিন জীবনচিত্র হইতে পারিয়াছে। দেবী যখন ব্যাসের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আশীর্বাদের ছলে অভিশাপ দিতে চলিলেন, তখন মহাদেব কৌতুক করিয়া বলিলেন :

হাসিয়া কহেন হর বুঝি তারে দিবা বর
মোরে মেনে দয়া না ছাড়িও।
আমি বৃদ্ধ তাই কই জানি নাই তোমা বই
এক মুটা অন্ন মেনে দিও॥

কোন কোন স্থলে হরগৌরীর কলহের মধ্য দিয়া দারিদ্র্যবিড়ম্বিত সংসারের বাস্তব চিত্র চমৎকার ফুটিয়াছে। শিবের অভিযোগে দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন, শিবের তো রূপগুণের সীমা নাই, বয়সেরও গাছপাথর নাই—সম্পদের মধ্যে সবেমাত্রসম্বল একটি বুড়া বলদ। আবার পুত্র দুইটিও বাপের উপযুক্ত হইয়াছে। বড় ছেলে গণেশের একমাত্র গুণ—বাপের মতো সিদ্ধি সেবনে দক্ষ। তাহার সখের ইঁদুর আবার কাটুরকুটুর করিয়া ভিক্ষালব্ধ চাল

খাইয়া নষ্ট করে। ছোট ছেলে কার্তিক উপায়-উপার্জন কিছুই করে না, শুধু ময়ূর উড়াইয়া বেড়ায়। কাজেই দেবীর দুঃখের সীমা নাই :

গুণের নাহিক সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক॥
সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা সিন্ধুকের কুঁজি॥
*   *   *
বড় পুত্র গজমুখ চারি হাতে খান।
সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান॥
ভিক্ষা মাগি ক্ষুদ-কোন যে পান ঠাকুর।
তাহার ইন্দুরে করে কাটুরকুটুর॥
ছোট পুত্র কার্তিকেয় ছয় মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূরে উড়ায়॥

এই কথা শুনিয়া ক্ষুধাতুর বৃদ্ধ হর লজ্জিত হইয়া ভিক্ষায় বাহির হইবার উপক্রম করিলেন :

ভবানীর কটুভাষে লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে
ক্ষুধানলে কলেবর দহে।
বেলা হৈল অতিরিক্ত পিত্তে গলা হৈল তিক্ত
বৃদ্ধলোকের ক্ষুধা নাহি সহে॥

এই সমস্ত বর্ণনায় কৈলাসবাসী দেবদম্পতীর দৈব মহিমা রক্ষিত হয় নাই বটে, কিন্তু প্রতিদিনের গার্হস্থ্যজীবন প্রত্যক্ষ বাস্তবানুগামী যেমন হইয়াছে, তেমনি সেই বাস্তব উপাদান শিল্পরূপও লাভ করিয়াছে।

অসাধারণ শব্দকুশলী ভারতচন্দ্র লীলাচ্ছলে নানা ধরনের কাব্যকবিতা লিখিয়াছিলেন। হিন্দী ও ফারসী তাঁহার নখদর্পণে ছিল; প্রয়োজন স্থলে মিশ্রভাষায় কবিতা লিখিয়া তিনি প্রতিভার সরসতা ও সজীবতাই প্রমাণ করিয়াছেন।[৯৩] সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে অসাধারণ কুশলী এই কবি তাঁহার

৯৩ সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'ভারতচন্দ্র রচনাবলী'র 'বিবিধ' অনুচ্ছেদে "এক সময় বৃকভানু কুমারী" এবং "শ্যামহিত প্রাণেশ্বর," দুইটি কবিতা ভাষার দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। প্রথমটিতে হিন্দী ভাষা এবং দ্বিতীয়টিতে বাংলা-সংস্কৃত-হিন্দী-ফারসী ভাষা অনুসৃত হইয়াছে। অবশ্য কবি এই ধরনের কবিতা ক্রীড়াচ্ছলে লিখিয়াছিলেন—কবিত্বের দিক দিয়া এগুলি অতি তুচ্ছ।

রচনার নানাস্থলে জ্ঞানবিদ্যা ও ভূয়োদর্শনের প্রচুর পরিচয় দিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় লেখা তাঁহার সামান্য কিছু রচনাও পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে 'অথ নাগাষ্টকং' এবং 'চণ্ডীনাটক' উল্লেখযোগ্য। পত্তনিদার রামচন্দ্র নাগের অত্যাচারে বিব্রত হইয়া কবি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার "বাটীগঙ্গাভজনপরিপাটী পুটয়িতা" —তাহা নাগ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে—"সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি"। তখন কবির বয়স মাত্র চল্লিশ বৎসর ("বয়শ্চত্বারিংশ") এবং "পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুরহহ নারী বিরহিণী"। এই পত্রকবিতা পাঠে কৃষ্ণচন্দ্র কবির দুঃখকষ্ট কিয়দংশে দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। এই কবিতাটিতেও কবি দ্ব্যর্থবোধক সংস্কৃত ভাষায় নিজ ন্যায্য অভিযোগ রাজ-সমীপে উপস্থিত করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ভারতচন্দ্র মিশ্রভাষায় 'চণ্ডীনাটক' রচনা আরম্ভ করেন।[৯৪] দুঃখের বিষয় এই বিচিত্র নাটকটির মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা লিখিয়াই কবি লোকান্তরিত হন। চণ্ডীনাটক সম্পূর্ণ হইলে ইহা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একখানি অভিনব গ্রন্থ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারিত। পুরাতন বাংলা সাহিত্যে বাংলা নাটক রচিত হয় নাই। ভারতচন্দ্র সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসরণ করিয়া চণ্ডীনাটকের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। পুরাণে বর্ণিত চণ্ডী ও মহিষাসুরের যুদ্ধ ও দেবীকর্তৃক অসুর বধ—ইহাই নাটকটির বক্তব্য। কবি সূত্রধারের উক্তিতে বলিয়াছেন, "ভাষাশ্লোককবিত্বগীতমিলিতং খণ্ডেন সদ্বর্ণিতং"। তিনি ইহাতে বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দী শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। নটী বাংলা-হিন্দী মিশ্র ভাষা ব্যবহার করিয়াছে, সূত্রধার বিশুদ্ধ সংস্কৃতেই আলাপ করিয়াছে। নটী ও সূত্রধারের সংলাপের পর কবি মহিষাসুরের আগমন বর্ণনা করিয়াছেন কয়েকটি অনুকারবাচী ধ্বন্যদ্যোতক শব্দের সাহায্যে—কিন্তু ভাষা পুরাপুরি সংস্কৃতেই রাখিয়াছেন। যথা :

---

৯৪ "মরণের কিছুদিন পূর্বে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতিক্রমে মহিষাসুরের যুদ্ধ বর্ণনাছলে সংস্কৃত ও হিন্দি মিশ্রিত বঙ্গভাষায় 'চণ্ডীনাটক' নামে এক গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন, তাহার ভূমিকা ও যুদ্ধের আড়ম্বর মাত্র প্ররচনা করিয়াই মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইলেন...।" (ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত 'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত')

খট্‌মট্‌ খট্‌মট্‌ খুরোত্থধ্বনিকৃতজগতীকর্ণপুরাবরোধঃ
ফোঁ ফোঁ ফোঁতি নাসানিলচলদচলাত্যস্তবিভ্রান্ত লোকঃ।
সপ্‌ সপ্‌ সপ্‌ পুচ্ছঘাতোচ্ছলদুদধিজল প্লাবিত স্বর্গমর্ত্যো।
ঘর্‌ঘর্‌ ঘোরনাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ॥

এখানে চার প্রকার অনুকারবাচী শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে—মহিষের ক্ষুরধ্বনি (খট্‌ মট্‌ খট্‌ মট্‌), নিশ্বাসের শব্দ (ফোঁ ফোঁ), পুচ্ছতাড়ন শব্দ (সপ্‌ সপ্‌ সপ্‌) এবং ঘোরনাদ (ঘর্‌ ঘর্‌)। এইরূপ বাস্তব শব্দ কবি এমন কৌশলে প্রয়োগ করিয়াছেন যে, মহিষাসুর যেন চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হইয়া ওঠে। অনুকারবাচী শব্দে ভারতচন্দ্রের নেশা লাগিয়া গিয়াছিল। অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ—প্রত্যেক খণ্ডেই তিনি প্রচুর অনুকারবাচী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তন্মধ্যে এখানে অল্প কয়েকটির উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :

(১) লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলকল তরঙ্গা॥
ফণাফণ ফণাফণ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধকধ্বক্‌ ধকধ্বক্‌ জ্বলে বহ্নিভালে।
ববম্বম ববম্বম মহাশব্দ গালে॥
দলম্মল দলম্মল গলে মুণ্ডমালা।
কটীকট্ট সদ্যোমরা হস্তিছালা॥ (অন্নদামঙ্গল—শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা)

(২) পায়সপয়োধি সপ্‌সপিয়া।
পিষ্টকপর্বত কচমচিয়া॥
চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া।
কচর মচর চর্ব্য চিবিয়া॥
লিহ লিহ জিহ্বে লেহ্য লেহিয়া।
চুমুকে চক চক পেয় পিয়া॥ (অন্নদামঙ্গল—শিবের ভোজন)

(৩) পয়দল দলবল ভূতল টলমল
সাজল দলবল অটল সোয়ারা।
দামিনী তক তক জামকী ধকধক
চকমক চকমক খর তরবারা॥ (মানসিংহ—সেনাসজ্জা)

সর্বত্র অবশ্য এই শব্দঝঙ্কার কাব্যধর্মী হয় নাই, কোন কোন স্থলে কবি এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়া শুধু কৌতুক সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন।

কোথাও-বা অনুকার শব্দে তাঁহার সামর্থ্য কতদূর, তাহাই যেন প্রমাণ করিতে গিয়াছেন। সে যাহা হউক, চণ্ডীনাটকে কবি মহিষাসুরের ক্ষুরধ্বনি প্রভৃতি অতিশয় কৌশলে বর্ণনা করিয়াছেন—যাহাতে বিশালকায় দৈত্যের বীভৎস মূর্তি চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে, কবি যে সমস্ত ধ্বনি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই বাস্তব শব্দের অনুকরণ হইয়াছে; তাহাতে একটা দুর্দান্ত বন্যমহিষের কর্দমাক্ত শরীর ব্যতীত পুরাণোক্ত মহিষাসুরের ভয়ঙ্কর মূর্তি ততটা ফুটিতে পায় নাই। সপ্ সপ্ পুচ্ছাঘাতের শব্দ হাস্যই উদ্রেক করে। সেই হাস্য উদ্দাম হইয়া পড়ে যখন অসুরের নাসিকা হইতে ফোঁ ফোঁ শব্দ নির্গত হয়। অবশ্য মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৮২-৮৩ অধ্যায়) মহিষাসুর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—মহাবীর্য মহিষাসুর অতিকোপে ক্ষুরাঘাতে পৃথিবীকে দীর্ণ করিয়া শৃঙ্গযুগল দ্বারা গিরিসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার বেগযুক্ত ভ্রমণে পৃথিবী বিশীর্ণা হইলেন, লাঙ্গুল-সন্তাড়িত সমুদ্র পৃথিবীকে প্লাবিত করিল। ভারতচন্দ্রের মহিষাসুরের বর্ণনায় এই গাম্ভীর্য রক্ষিত হয় নাই। অবশ্য মহিষাসুরের উক্তিটি হিন্দী ভাষায় চমৎকার মানাইয়াছে। মহিষাসুর দেবদেবীর পূজা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, ব্রত-উপবাস ছাড়িয়া মানুষকে ভোগসুখে কাল কাটাইতে বলিল। তাহার মতে মানুষের মর্তাভোগই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত :

শোনরে গোঁয়ার লোগ ছোড়্ দে উপোস রোগ
মানহুঁ আনন্দভোগ বৈষরাজ যোগমে।
আগমে লাগাও ধাঁউ কাহেকো ছালাও জাউ
একরোজ প্যার পিউ ভোগ এহি লোগমে॥

যোগধ্যান ছাড়িয়া এই জগতেই ভোগসুখ লুঠিয়া লও—ইহাই মোক্ষ ("ভোগ এহি লোগ মে")—ইহাই তাহার আদর্শ। পার্থিব ভোগসুখের ঘোষণায় দেবী চণ্ডিকা হাস্য করিলেন, পরে ক্রোধ প্রকাশ করিলেন—ইহার পরেই নাটক খণ্ডিত হইয়াছে—কবি এই অংশটুকু লিখিয়াই মর্ত্যদেহ ত্যাগ করেন। নাটকটি সম্পূর্ণ হইলে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একখানি বিচিত্র গ্রন্থ পাওয়া যাইত।

এ পর্যন্ত আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র একজন অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার

বাক্‌রীতির আদর্শ পরবর্তী কালেও অনুসৃত হইয়াছে। যে মাইকেল মধুসূদন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কাণ্ডারী, তিনিও ব্রজাঙ্গনা কাব্যের ভাষারীতিতে ভারতচন্দ্রের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। শব্দের বিচিত্র ব্যঞ্জনাময় ব্যবহার-কৌশল রায়গুণাকরের নখাগ্রে বিরাজ করিত; তাহার সহিত যোগ দিয়াছিল সরস পরিহাস-কৌতুক, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রসন্ন জীবনভোগের চিত্র। কবির ধর্মমতেও সেই উদারতা লক্ষণীয়। যদিও তিনি শাক্ত মঙ্গলকাব্য লিখিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুধর্মের বিশেষ কোন শাখা-উপশাখাকে প্রাধান্য না দিয়া পঞ্চোপাসক সাধারণ হিন্দুর সর্বদেবতার প্রতি সমভক্তি এবং তাত্ত্বিকের সাংখ্যমার্গে বেদান্ত প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতি নিষ্ঠা—তিনি ব্যক্তিগত জীবনে এই দুই মত স্বীকার করিয়াছেন।

পরিশেষে একথা বলিতে বাধা নাই যে, ভারতচন্দ্রের কাব্য কোন মহৎ বিরাট সৃষ্টি নহে। তাঁহার কাব্যে গভীর বেদনা ও করুণরসের ছবি অতি অল্পই আছে। যাহা অসঙ্গত, হাস্যমুখর, কৌতুকপ্রবণ—জীবনের সেই লঘুচপল ঊর্মিমুখর দিকটি কবি আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মর্ত্যধরিত্রীকে লইয়াই তাঁহার কারবার। প্রতিদিনের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া একপ্রকার সরস জীবনভোগের মার্জিত রূপ তাঁহার কাব্যে যতটা ফুটিয়াছে, জীবনের গভীর দিক ততটা ফুটে নাই। "কবি দেহের দেউলে দেহাতীতের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন"—একথা তাঁহার সম্বন্ধে বলা যায় কিনা সন্দেহ।[১৫] কারণ দেহাতীতের ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ কোন কৌতূহল ছিল বলিয়া মনে হয় না। প্রত্যক্ষ জীবনের পটভূমিকায় তিনি কাব্যকে উপস্থাপিত করিয়াছেন, দেবদেবীরাও মাটির মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে তদানীন্তন নাগরিক জীবনের ছবি যতটা ফুটিয়াছে, কোন আদর্শায়িত গভীর তত্ত্বকথা বা জীবনচিত্র ততটা ফুটে নাই। তাই কেহ কেহ বাক্‌পতিরাজ ভারতচন্দ্রের কাব্যকে "জীবনের দর্পণ"[১৬] বলিতে চাহেন। বাস্তবিক ভারতচন্দ্রের কাব্যের পৌরাণিক আখ্যানেও তৎকালীন সমাজ মানসের চিত্র প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কবিখ্যাতি আজ দুই শতাব্দী ধরিয়া যেরূপ স্থায়ী হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, উহাতে কোনদিন

---

১৫ ডঃ মদনমোহন গোস্বামী—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, পৃ ৬৩৫
১৬ ঐ

বিস্মরণীর গ্রহণ লাগিবে না। কেহ তাঁহাকে নটবিটের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন, কেহ তাঁহার অশ্লীলতার জন্য গালি দিয়াছেন, তাঁহার চরিত্র সৃষ্টির অক্ষমতার জন্য কেহ তাঁহার নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু "ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে।" সরসতা, কৌতুকপরিহাস, বাগবৈদগ্ধ্য প্রভৃতির প্রতি পাঠকের যতদিন আকর্ষণ থাকিবে, ততদিন ভারতচন্দ্রেরও আদর থাকিবে। তিনি মহৎ শিল্পী না হইলেও বিচিত্র প্রতিভাধর শিল্পী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ॥

সাধককবি রামপ্রসাদ সেন শ্যামাসঙ্গীতের রচয়িতা ও কালীসাধক বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনিও মধ্যবয়সে বিদ্যাসুন্দরের কামকূপে মজিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' (ঈশ্বর গুপ্তের মতে, ইহার প্রকৃত নাম 'কালিকামঙ্গল' বা কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর') কবে এবং কেন রচিত হয় তাহা লইয়াও সংশয় আছে। পরে শাক্তপদাবলী প্রসঙ্গে আমরা রামপ্রসাদের জীবনী আলোচনা করিব। এখানে সংক্ষেপে তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্যের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

ঈশ্বর গুপ্ত সর্বপ্রথম গবেষকের দৃষ্টি লইয়া রামপ্রসাদ সংক্রান্ত নানা তথ্য সংগ্রহ করেন।[৯৭] তাঁহার মতে, বিদ্যাসুন্দর, কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন—রামপ্রসাদের এই তিনখানি কাব্য পুঁথির আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার শাক্ত গানগুলি কোন পুঁথি হইতে সঙ্কলিত হয় নাই, লোকের কণ্ঠে কণ্ঠেই ফিরিত। কবির কালীকীর্তন মুদ্রিত হইলেও কৃষ্ণকীর্তন প্রকাশিত হয় নাই। ঈশ্বর গুপ্ত সংগ্রহ করিয়া 'সংবাদ প্রভাকরে' ইহার একটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।[৯৮] ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব হইতেই গুপ্তকবি রামপ্রসাদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন।[৯৯]

---

৯৭ সংবাদ প্রভাকর, ১২৬০, ১লা পৌষ

৯৮ পদটির প্রথম কয়েক পংক্তি:

প্রথম বয়স রাই রসরঙ্গিণী।
ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী।
রাই বদন চেয়ে ললিতা বলে রাই আমার মদনমোহিনী॥
রাই যে পথে পয়ান করে মদন পলায় ডরে
ছুটিল কটাক্ষশরে জিনিল কুসুম শরে॥

৯৯ ১২৬০ সনে সংবাদপ্রভাকরে তিনি লিখিয়াছিলেন, "পঞ্চবিংশতি বৎসর অতীত হইল

লোকপ্রবাদ মতে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশে রচিত হয়—তাঁহার কিছু পূর্বেই ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়াছিল। কাব্যের কোথাও রচনাকাল সম্বন্ধে কোন সনতারিখের উল্লেখ নাই। কাব্যের ভণিতায় কবি 'কবিরঞ্জন' উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। ১১৬৫ সনে (১৭৫৯ খ্রীঃ অঃ) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 'শ্রীরামপ্রসাদ সেন সুচরিতেষু' হালিশহর ও ঔখড়া পরগণার একান্ন বিঘা জমি 'মহোত্তরাণ' হিসাবে দান করেন। এই দলিলে 'কবিরঞ্জন' উপাধি নাই। অথচ কৃষ্ণচন্দ্র যাহাকে জমি দান করিয়া সম্মান করিতেন, দলিলে তাহার উপাধিও লিখিতেন।[১০০] ভারতচন্দ্রকে জমি দান করিয়া তিনি যে দলিল লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহাতেও ভারতচন্দ্রের উপাধি ছিল। সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে তাঁহার বিদ্যাসুন্দর রচিত হয় নাই, কারণ তাহার পূর্বে তিনি 'কবিরঞ্জন' উপাধি পান নাই। ঈশ্বর গুপ্তের মতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবির গানের খুব ভক্ত ছিলেন, কবির গ্রাম হালিশহরেও মহারাজ নাকি শুধু কবির গান শুনিবার জন্যই যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহার গান শুনিয়া "সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কবিরঞ্জন অভিধান দান করিয়াছিলেন।" ইহা হইতে অনুমিত হয় বিদ্যাসুন্দর রচনার পূর্বেই তিনি কবিসাধকরূপে খ্যাত হইয়াছিলেন এবং গানের জন্যই মহারাজের নিকট কবিরঞ্জন উপাধি পাইয়াছিলেন। কিন্তু কবি কোন পদে বা কাব্যে কৃষ্ণচন্দ্রের উল্লেখ করেন নাই। তাই কেহ কেহ মনে করেন, 'কবিরঞ্জন' উপাধি কবির "স্বয়ং-খ্যাপিত"।[১] এই উপাধি কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত—ইহার একমাত্র প্রমাণ ঈশ্বর গুপ্তের উক্তি। ঈশ্বর গুপ্ত যখন রামপ্রসাদ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন তখন কবিবরের পুত্র-পৌত্রাদি ও আত্মীয়স্বজন জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁহাদের নিকট হইতেই তথ্যাদি পাইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার উক্তি ততটা অমূলক নহে।

আমরা রামপ্রসাদি পদ্য সংগ্রহ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি।' সুতরাং ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব হইতেই তিনি এ বিষয়ে সন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে নানা অনুসন্ধানের পর তিনি 'কালীকীর্তন' প্রকাশ করেন।

১০০ ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, পৃ, ২০-২১

১ ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—ঐ পুস্তিকা, পৃঃ ২০

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল কবে রচিত হইয়াছিল তাহার একটা আনুমানিক ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে দলিলের সনতারিখ হইতে (১৭৫৯ খ্রীঃ)। ১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দের পর এই কাব্য রচিত হইয়াছিল, ইহা একরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু এবিষয়েও দ্বিমতের অবকাশ আছে। ঈশ্বর গুপ্তের মতে, "মহারাজ রামপ্রসাদি বিদ্যাসুন্দর দৃষ্টি করিয়া ভারতচন্দ্রের প্রতি বিদ্যাসুন্দর রচনার আদেশ করিয়াছিলেন"।[২] বোধ হয় তাঁহার এই মন্তব্য হইতে পরবর্তী কালের লেখকগণ মনে করিয়াছেন, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের রচনাকাল ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দ। সুতরাং কেহ কেহ অনুমান করেন রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে রচিত হয়।[৩] কিন্তু ইদানীং গবেষকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৭৬০-৭০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে ইহা রচিত হইয়া থাকিবে। তখন কবির তিনটি সন্তানের জন্ম হইয়াছে, কারণ কাব্যের মধ্যে তিনি তিন সন্তানের উল্লেখ করিয়াছেন, চতুর্থ পুত্র রামমোহনের উল্লেখ করেন নাই।[৪]

রামপ্রসাদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও অন্যান্য ভূস্বামীর নিকট নানাপ্রকার সহায়তা, বৃত্তি ও নিষ্কর জমি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে তিনি 'কালীকীর্তনে' রাজকিশোর নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারই অনুরোধে তিনি কালীকীর্তন রচনা করিয়াছিলেন। ইনি হয়তো হুগলীর দেওয়ান 'রাজকিশোর' হইবেন। রামপ্রসাদ যদি কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে বিদ্যাসুন্দর লিখিতেন, তাহা হইলে কাব্যের কোন না কোন স্থলে তাঁহার নাম উল্লেখ করিতেন ; সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণাভাবে এ কথা মানিয়া লওয়া যায় না। তবে এইটুকু সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, কবির চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় বিদ্যাসুন্দর রচিত হয়।[৫]

২ সংবাদ প্রভাকর, ১লা পৌষ, ১২৬০.

৩ রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কাব্যকে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পূর্ববর্তী বলিয়াছেন। কারণ ভারতচন্দ্রের অতি উপাদেয় কাব্য পূর্বে রচিত হইলে রামপ্রসাদ "প্রবহমান নদী সন্নিধানে সরোবর খননের ন্যায় নিতান্ত অবিজ্ঞের কার্য" (ন্যায়রত্ন—বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব) করিতে যাইবেন কেন? অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র।

৪ ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৩২

৫ ঐ পৃ. ৩২

যদিও রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের পরে বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতচন্দ্র অপেক্ষা অন্যান্য কালিকামঙ্গলের দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কাহিনী (সিন্দূর লেপনের দ্বারা চোর ধরা), চরিত্র (বিদু ব্রাহ্মণী) প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি অনেক সময় সপ্তদশ শতাব্দীর কালিকা-মঙ্গলের কবি কৃষ্ণরাম দাসের কাব্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। কৃষ্ণরামের দ্বারা তিনি এতদূর প্রভাবিত হইয়াছেন যে, কৃষ্ণরামের গ্রাম্য-অশ্লীল-ইতর শব্দগুলিও তিনি অনুসরণ করিয়াছেন।[৬] কাহিনীর সর্বশেষে সুন্দর কর্তৃক শবসাধনার বর্ণনা শাক্ত তান্ত্রিক কবিরই উপযুক্ত হইয়াছে।

রামপ্রসাদ প্রায়শঃই কৃষ্ণরামকে অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া কাহিনী গ্রন্থনে বিশেষ মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তবে কাব্যটি যে যথার্থ কালীভক্তের রচিত, তাহা ইহার আদ্যন্ত হইতেই পাওয়া যায়। তাঁহার সুন্দরও প্রকৃত ভক্তে পরিণত হইয়াছে, বিদ্যাও মনোমত পতিলাভের জন্য কালিকার কাছে আন্তরিক প্রার্থনা জানাইয়াছে। কবি তাই প্রাগ্-বিবাহ মিলনকে সিন্দূর দানের দ্বারা কথঞ্চিৎ শাস্ত্রসঙ্গত করিতে চাহিয়াছেন :

সুন্দরীরে সমর্পিলা সুন্দরের হাতে।
সুন্দর সিন্দুর দিলা সুন্দরীর মাথে॥[৭]

সুন্দরের বন্ধনমোচনের পর শাস্ত্রসম্মত বিবাহ-সংস্কারের জন্য রাজা বীরসিংহ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের মত লইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রের নজির তুলিয়া দেখাইলেন যে, গান্ধর্ব-বিবাহের পর পুনর্বার বিবাহ-সংস্কারের প্রয়োজন নাই, শুধু দ্বিজজাতিকে দান করিলেই এই বিবাহ সিদ্ধ হইবে। বীরসিংহ সেই রীতি অনুসরণ করিয়া জামাতাকে যথাবিধি সম্মান করিলেন। এখানে দেখা যাইতেছে, রামপ্রসাদ নায়ক-নায়িকার গান্ধর্ববিবাহ সত্ত্বেও শাস্ত্রসঙ্গত

---

৬ কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের তুলনামূলক আলোচনার জন্য ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ' (৫ম অধ্যায়) দ্রষ্টব্য।

৭ ভারতচন্দ্রও বিদ্যা-সুন্দরের বিবাহের কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা রূপকার্থে গৃহীত হইয়াছে :

বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ হৈল মনে আঁখি ঠার॥
কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর।
পুরোহিত ভট্টাচার্য হৈল পঞ্চশর॥

বিবাহের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র সে কথা ভাবেন নাই, তিনি বোধ হয় মনে করিয়া থাকিবেন—যেখানে মদনদৌত্যে নায়কনায়িকা মিলিত হইয়াছে, সেখানে শিখাসূত্রধারী ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের প্রয়োজন নাই। যাহা হউক রামপ্রসাদ যাঁহার নির্দেশেই এ কাব্য রচনা করুন না কেন, নিছক কৌতুক বা আদিরস তাঁহার কাব্যের প্রেরণা ছিল না। দেবীভক্ত রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দরের আদ্যন্ত শাক্ত মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। সুন্দর ও বিদ্যা-পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইবার পূর্ব হইতেই দেবীর সেবক-সেবিকা হইয়াছিল, কারণ তাহারা শাপভ্রষ্ট দেবদেবী, কালিকার পূজা প্রচারের জন্যই মর্ত্যধামে সুন্দর ও বিদ্যারূপে জন্মগ্রহণ করে।[৮] বর্ধমান যাত্রার পূর্বে সুন্দর সগর্বে বলিয়াছে :

দনুজদলনী শ্যামা জননী যাহার।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ভয় কি তাহার ॥[৯]

বিদ্যাও সুন্দরকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য ভক্তিভরে কালিকার স্তব করিয়াছে :

বিদ্যা রূপবতী সতী কৃতাঞ্জলি শুদ্ধমতি
কায়মনোবাক্যে করে স্তব।
তুমি বিদ্যা পরাৎপরা জন্মজরা মৃত্যুহরা
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু তুমি ভব ॥
তুমি জল তুমি স্থল ধর্মাধর্ম ফলাফল
তুমি সন্ধ্যা দিবাবিভাবরী।
তুমি কুলাচল সিন্ধু তুমি রবি তুমি ইন্দু
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী ॥

---

৮ সুন্দর শবসাধনা করিলে দেবী আবির্ভূত হইয়া বলিয়াছিলেন :

সাবধানে শুন পুত্র সর্ব্ব কথা কহি।
শাপভ্রষ্ট তোমা দোঁহাকার জন্ম মহী ॥
বিদ্যাবতী হারাবতী তুমি মালাধর।
মম পূজা প্রকাশার্থে হইয়াছ নর ॥

৯ স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া দেবী সুন্দরকে আশ্বাস দিয়াছিলেন :

ভাব কেন ওরে ভক্ত আমি তব অনুরক্ত
সেও তো আমার দাসী বটে।
পরম রূপসী সেই একান্ত জানিবে এই
তরুণী তোমার তরে ঘটে ॥

সুন্দর বিদ্যার কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্বেও দেবীবন্দনা সারিয়া লইয়াছে :

নমো ভগবতি কিবা জানি স্তুতি
প্রধানা প্রকৃতি কালী।
শ্মশানবাসিনী দনুজনাশিনী
মুণ্ডমালী মা করালী॥

কাব্যের সর্বত্র এইরূপ অকৃত্রিম শ্যামাভক্তির উদাহরণ মিলিবে। শাক্ত কবি সুন্দরকে দিয়া শবসাধনাও করাইয়া লইয়াছেন। এখানে কবি নিজ অভিজ্ঞতা ও তন্ত্রোক্ত শবসাধনার প্রক্রিয়ার সাহায্যে সুন্দরের শবসাধনার বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য কাব্যের পক্ষে এই শবসাধনার বর্ণনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িয়াছে—শাক্ত কবি নিজ ইষ্টদেবীর প্রতি ভক্তি-প্রকাশের জন্যই এই বিচিত্র বর্ণনার আশ্রয় লইয়াছেন। যদিও সাধককবি ধর্মীয় উদারতা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই,[১০] কিন্তু এই শাক্ত ভক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি মানসিক ঔদার্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ বীরভদ্রগোষ্ঠীর (বৈষ্ণব সহজিয়া) প্রতি তিনি কিছু নির্মম হইয়াছেন :

গৌড়রাজ্যে গৌড়'গুলা চলে যে যে ঠাটে।
সেরূপে ভ্রময়ে কত হাটে ঘাটে মাঠে॥
* * *
মুক্ত গুঞ্জছড়া গলে ঠাঁই ঠাঁই ছাপ।
দুই ভাই[১১] ভজে তারা সৃষ্টি ছাড়া ভাব॥
পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট।
ভেকা ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট॥
এক এক জনার ধুমড়ী দুটি দুটি।
দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবারে কুটী॥
ভুগলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে।
বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম উঠে ডেকে॥
সে রসে রসিক নবশাক লোক যত।
উঠে ছুটে পায় পড়ে করে দণ্ডবত॥

---

১০ ভবানী শঙ্কর বিষ্ণু এক ব্রহ্ম তিন।
ভেদ করে সেই মূঢ় জন প্রজ্ঞাহীন॥

১১ অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ

সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিজ বাড়ী।
ভালমতে সেবা চাই পড়ে তাড়াতাড়ি॥
গোষ্ঠী শুদ্ধ খাড়া থাকে বাবাজীব কাছে।
মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে॥
নানা রস ভুঞ্জায় শোয়ায় দিব্য খাটে।
শেষে মেয়ে পুরুষেতে পাত্রশেষ চাটে॥
বৈষ্ণব বন্দনা গ্রন্থ সকলে পড়ায়।
ছত্রিশ আশ্রম নিয়া একত্রে জড়ায়॥
কেমন কলির ধর্ম কব আর কি।
মজাইল গৃহস্থের কত কত ঝি॥

ঘোর শাক্ত কবি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি কিঞ্চিৎ প্রতিকূল হইয়াছেন, ইহা আজু গোঁসাইয়ের ব্যঙ্গের প্রত্যুত্তর কিনা কে বলিতে পারে? কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই ধরনের সম্প্রদায়গত ব্যঙ্গবিদ্রূপ নাই—এদিক হইতে রায়গুণাকর অধিকতর ঔদার্যের পরিচয় দিয়াছেন। ইহার কারণ রামপ্রসাদ নিজেই বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, সেইজন্যই বোধ হয় সব সময় অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ঔদার্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বীরভদ্রপন্থী সহজিয়া সম্প্রদায় যেভাবে সমাজে গুরুগিরির ব্যবসা চালাইতেন, এবং যেরূপ ব্যক্তিগত জীবনযাপন করিতেন তাহাতে সাধারণ গৃহস্থের মন ইঁহাদের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল—রামপ্রসাদের উল্লিখিত ছত্রগুলি হইতে তাহাই অনুমান হয়। রামপ্রসাদ বৈষ্ণববিদ্বেষী ছিলেন না, থাকিলে কৃষ্ণকীর্তন লিখিতে পারিতেন না, বা কালীকীর্তনে বৈষ্ণব পদপর্যায় নীতি অনুসরণ করিতেন না। শুধু সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অসামাজিক আচার-আচরণের বিরুদ্ধে তাঁহার মন বিষাইয়া গিয়াছিল।

চরিত্রাঙ্কনে কবিরঞ্জন রায়গুণাকর অপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ভারতচন্দ্রের কবিপ্রকৃতিটি হাস্য-পরিহাসমুখর ছিল, রামপ্রসাদ ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির 'সীরিয়স' কবি—তদুপরি ভক্ত-সাধক। তাঁহার বিদ্যাসুন্দর তাই কালিকামঙ্গলের দিকেই অধিক ঝুঁকিয়াছে, ভারতচন্দ্রে 'সেক্যুলর' রস অধিক ফুটিয়াছে। ভারতচন্দ্র চরিত্রসৃষ্টির চেষ্টা করেন নাই, চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি হইতে হাস্যকৌতুক সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু রামপ্রসাদের অঙ্কিত চরিত্রে কিছু

পরিণতি লক্ষ্য করা যাইবে, ভারতচন্দ্রের প্রধান চরিত্রগুলির বিশেষ কোন পরিণতি বা বিকাশ দেখা যায় না।

রায়গুণাকর আদিরসের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন, কিন্তু কোথাও গ্রাম্য ও অশ্লীল মনোভাবের সমর্থন করেন নাই। আদিরসের সঙ্গে কৌতুকরস মিশ্রিত হওয়াতে তাহার দৈহিক দিকের স্থূলতা অনেকটা খর্ব হইয়াছে। কিন্তু রামপ্রসাদের আদিরস নিতান্তই দেহের ব্যাপার, ভক্তকবি রামপ্রসাদ অবিশুদ্ধ কামপিপাসাকে ভারতচন্দ্রের মতো শিল্প-সৌকুমার্যের দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে পারেন নাই। একদিকে ভক্তকবির নির্বেদ বৈরাগ্য, অন্যদিকে অনঙ্গরঙ্গের আসক্তি—এই দুই বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির টানে তাঁহার বিদ্যা-সুন্দরের প্রেমের চিত্রগুলি অতিশয় ভারসাম্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন স্থলে তিনি এতটা লঘুচেতনা ও কুরুচিপূর্ণ ভাষা ও ইঙ্গিত ব্যবহার করিয়াছেন যে, ভক্তকবির প্রতি ভক্তি রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়ে। বিদু-ব্রাহ্মণীর দুর্গতি, সুন্দরকে দেখিয়া হীরামালিনীর অনুচিত ইচ্ছার আভাস, বিদ্যা ও রাণীর বাক্‌ছল প্রভৃতি বর্ণনা কুরুচিরই পরিচায়ক—ইহাকেই যথার্থ অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা বলে। ভারতচন্দ্র রাজসভায় সুন্দর ও বীরসিংহের যে বাক্‌ছল বর্ণনা করিয়াছেন, হাস্যপরিহাস ও ব্যঙ্গকৌতুকে সুন্দরের সেই ধৃষ্টতাও উপভোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু রামপ্রসাদ ভক্ত-কবি হইয়াও ইতর শব্দ ও কদর্য ইঙ্গিত ব্যবহারে সঙ্কুচিত হন নাই।

কেহ কেহ মনে করেন যে, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের ভারতচন্দ্রের মতো খ্যাতি না হইবার কারণ—"প্রথমতঃ ভারতচন্দ্রের অলঙ্কার ঝলমল রচনার দ্যুতি, দ্বিতীয়তঃ রামপ্রসাদের কৃষ্ণচন্দ্রের মতো ক্ষমতাবান পোষ্টার অভাব।"[১২] প্রথম মন্তব্যটি আংশিক সত্য হইতে পারে। "ভারতচন্দ্রের অলঙ্কার ঝলমল রচনার দ্যুতি"র অর্থ তাঁহার বিচিত্র রচনারীতি—মার্জিত, বিদগ্ধ ও বুদ্ধিদীপ্ত রচনাবৈশিষ্ট্যই ভারতচন্দ্রকে এত জনপ্রিয় করিয়াছিল—রামপ্রসাদের রচনায় এই নাগরিক বৈদগ্ধ্যের অভাব ছিল—বাক্‌রীতির নিষ্প্রভতার জন্যই তাঁহার বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের মতো জনপ্রিয় হয় নাই। তাঁহার ভাষা সংযত হইলেও সরস নহে, মাঝে মাঝে রসিকতা থাকিলেও তাহা নির্মল কৌতুক সৃষ্টি করিতে পারে নাই, বরং তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে

১২ ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ইতি. ১ম (অপরার্ধ), পৃ. ৪৮৯

অশালীনতার ধার ঘেঁষিয়া গিয়াছে। অনেকগুলি চরিত্র পরিণতি লাভ করিলেও পাঠকমনে দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই। উদাহরণ স্বরূপ হীরা-মালিনীর কথা ধরা যাক। ভারতচন্দ্রের হীরা হীরার মতোই ঝলমল করিতেছে, রামপ্রসাদের মালিনী অতিশয় অনুজ্জ্বল। কেবল নায়ক-নায়িকার চরিত্র দুইটি মোটামুটি বিকাশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু শেষাংশে শাক্ত কবি মাত্রাজ্ঞান বিসর্জন দিয়া নিষ্প্রয়োজনে সুন্দরকে দিয়া শবসাধনা করাইয়া লইয়াছেন। ভারতচন্দ্র ছিলেন নিরাসক্ত শিল্পী—শিল্পীজনোচিত সৌন্দর্যবোধ তাঁহার প্রধান অবলম্বন—অপরদিকে রামপ্রসাদ ছিলেন ভক্ত, তাই তাঁহার বিদ্যাসুন্দরে শ্যামাভক্তি প্রকাশ পাইলেও কাব্যসৌন্দর্যের বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায় না। ভারতচন্দ্রের অনেক উক্তি সূক্তির আকারে এবং অনেক বাক্য প্রবাদের আকারে এখনও চলিতেছে। রামপ্রসাদের বাক্‌রীতি এইরূপ গৌরব লাভ করিতে পারে নাই। নানাভাষাবিদ ভারতচন্দ্র কাব্যসরস্বতীকে দেশী-বিদেশী নানা আভরণে সাজাইয়াছেন। রামপ্রসাদ সেইরূপ অভিজ্ঞ হইলেও কাব্যে অধীতবিদ্যা ততটা কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যবহার করিতে পারেন নাই। এইজন্য ভক্ত রামপ্রসাদ শাক্তপদকার রূপেই পূজা পাইয়াছেন, বিদ্যাসুন্দরের কবি বলিয়া জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ ভারতচন্দ্রের মতো তিনিও কৃষ্ণচন্দ্রের দাক্ষিণ্য লাভ করিয়াছিলেন, আরও অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি ও সম্পন্ন ভূস্বামীরা ভক্ত রামপ্রসাদকে শ্রদ্ধার সঙ্গে নানাভাবে সহায়তা করিতেন। অবশ্য কবির অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। সেকথা তিনি বিদ্যাসুন্দরের গোড়াতেই ইঙ্গিতে বলিয়াছেন :

> বিষম দারিদ্র্যদোষে গুণরাশি নাশে।
> থাকুক আদর কেহ কথা না জিজ্ঞাসে॥
> কি আর কহিব বাড়া স্ত্রীপুত্র অবশ।
> বিরস বদনে কহে বচন কর্কশ॥

প্রথম জীবনে তিনি খিদিরপুরের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের (মতান্তরে কলিকাতার ভূস্বামী দুর্গাচরণ মিত্র) নিকট মুহুরীর কাজ করিতেন। তাঁহার নির্লোভ ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রভু তাঁহাকে দাসত্বকর্ম হইতে অব্যাহতি দিয়া মাসিক তিরিশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাড়ী বসিয়া তিনি

এই বৃত্তি পাইতেন। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় যাতায়াত ও রাজার মনোরঞ্জন করিয়া যাহা পাইতেন (চল্লিশ টাকা) তাহা মাস-মাহিনা মাত্র, সম্মানজনক 'বৃত্তি' নহে। রামপ্রসাদ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট অনেক বিঘা নিষ্কর জমি লাভ করেন। হালিশহরের সুভদ্রা দেবী কবিকে একটি বাড়ী সহ এক বিঘা বাস্তুজমি দান করেন। ঐ হালিশহরের জমিদার দর্পনারায়ণ রায় কবিকে দুই বিঘা এবং রাম রায় ও কালীচরণ রায়ের সহযোগে আরও আট বিঘা জমি দিয়াছিলেন। তাঁহার পোষ্টা বা পৃষ্ঠপোষকের অভাব ছিল না—তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের মতো "ক্ষমতাবান পোষ্টা"র সাহায্য পান নাই একথা ঠিক নহে। আর তাহা ছাড়া, পোষ্টা মুরুব্বির সাহায্য না পাইলে কবিরা জনপ্রিয় হন না —একথাও ঠিক নহে। কারণ কবিখ্যাতির চূড়ান্ত দরবার পাঠকসমাজ—ক্ষমতাবান পোষ্টা নহে। ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা না পাইলেও কবিরূপে একই প্রকার খ্যাতি লাভ করিতেন। যিনি দুঃখদারিদ্র্য-বিপর্যয়কে হাসিমুখে মানিয়া লইয়া বিরস আবহাওয়াকে সরস করিয়াছেন, তিনি যে পোষ্টার সহায়তায় এতটা জনপ্রিয় হইয়াছেন তাহা মনে হয় না। আসল কথা ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর কাব্যে অসাধারণ নৈপুণ্য ও প্রথমশ্রেণীর শিল্পী-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, রামপ্রসাদের প্রতিভা সেরূপ নহে। তাই স্বাভাবিক কারণেই তাঁহার বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পার্শ্বে নিষ্প্রভ মনে হয়। সে যাহা হউক, ভারতচন্দ্রের কাব্য সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও কবি আবার কেন যে একই বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করিলেন তাহা এক সমস্যার বিষয় বটে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশেই ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া মূল অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। তাহা হইলে অল্প সময়ের ব্যবধানে কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে আবার একখানি বিদ্যা-সুন্দর রচনার আদেশ দিবেন কেন ?[১৩] আর তাহা ছাড়া ইহা যে মহারাজের

১৩ কেহ কেহ বলেন, পল্লীর ধ্যানমগ্ন এই কবি রাজসভার বিদগ্ধরুচির কবি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে "মসীযুদ্ধের সুলভ উত্তেজনার জন্য উন্মুখ প্রতিবেশে শক্তির পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।" অথবা হয়তো, "কবির লড়াই দেখিতে অভ্যস্ত মহারাজ ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদকে একই বিষয়ে কাব্য রচনায় প্রণোদিত করিয়া উভয়ের শক্তি-প্রতিদ্বন্দ্বিতার মল্লযুদ্ধ উপভোগ করিতে চাহিয়াছিলেন।' (ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদে' ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গ্রন্থপরিচিতি' দ্রষ্টব্য, পৃ. ।।৵০) এরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত বটে, কিন্তু ইহার প্রমাণস্বরূপ তথ্যাদি না পাওয়া পর্যন্ত ইহাকে অনুমানের অধিক মর্যাদা দেওয়া যায় না।

আদেশেই রচিত হইয়াছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই—কবি কাব্যের কোথাও মহারাজের নাম উল্লেখ করেন নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, "শৃঙ্গার রসের বিচিত্র বর্ণনার পদে পদে বীরাচারী তান্ত্রিক ইষ্টদেবীর লীলা অনুভব করিয়াছেন। অর্থাৎ রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর একাধারে কাব্য ও কৌলতন্ত্রের নিবন্ধ এবং জনসাধারণের নিকট এ জাতীয় রহস্যময় তন্ত্রগ্রন্থ চিরকালই গুপ্ত থাকে।"[১৪] কিন্তু কবি বিদ্যা ও সুন্দরের রূপকে তান্ত্রিক রহস্য ব্যবহার করিয়াছেন—ইহাও অনুমান মাত্র—যুক্তি দিয়া ইহা প্রমাণ করা যায় না। সে যাহা হউক ভক্ত রামপ্রসাদ ইহাতে শ্যামাভক্তি ও তান্ত্রিক তত্ত্বকথা শুনাইলেও আদিরসের অনাবৃত বর্ণনা, আপত্তিকর উক্তি ও শব্দব্যবহারে যে পিছাইয়া ছিলেন তাহা মনে হয় না। তবে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য—ভারতচন্দ্র রঙ্গপরিহাস, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, ছন্দের কারুকর্ম প্রভৃতি নানা-প্রকার কলাকৌশলের দ্বারা স্থূলতাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, রামপ্রসাদ তাহা পারেন নাই—এবং পারেন নাই বলিয়া জনস্মৃতির বাহিরে রহিয়া গিয়াছেন।

কালিকামঙ্গলের কয়েকজন অপ্রধান কবি ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং তাহার পরেও কয়েকজন কবি বিদ্যা-সুন্দর পালা অবলম্বনে কালিকামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন—ভারতচন্দ্রের প্রভাবে তখন নাগরিক সমাজে বিদ্যাসুন্দরের খুব চল হইয়াছিল। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে গোপাল উড়ে হালকা-চালে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা গাহিয়া ভারতচন্দ্রকে আরও জনপ্রিয় করিয়া তোলেন। তাই অনেক ব্যক্তি কবিযশঃপ্রার্থী হইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও বিদ্যাসুন্দর কালিকা-মঙ্গলে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কিছুমাত্র প্রতিভা ছিল না, শুধু গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া বিদ্যাসুন্দর রচনার সুলভ উপায়ে জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে তিনজন কবির নাম উল্লেখ করা কর্তব্য।

কলিকাতাবাসী দ্বিজ রাধাকান্ত মিশ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে কালিকামঙ্গল রচনা করেন, তাহাকে কবি 'শ্যামার সঙ্গীত' বলিয়াছেন।

১৪ ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, পৃ. ৩৩

গ্রন্থসমাপ্তিতে তিনি যে শকাব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে গ্রন্থরচনার কাল হিসাবে ১৬৮৯ শক (১৭৬৮-৬৯ খ্রীঃ অঃ)[১৫] পাওয়া যাইতেছে। কবি নিজ কুলপরিচয় দিয়া বলিয়াছেন :

বহুকালাবধি কলিকাতা বসতি।
কাশ্যপের বংশ দ্বিজকুলে উৎপতি॥
পিতামহ শ্রীবল্লভ মিশ্র মহাশয়।
তাহার তনয় জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ শুভোদয়॥
শ্রীযুত শ্রীরামনাথ মিশ খ্যাতনাম।
তার সুত বিখ্যাত শ্রীযুত দেবীরাম॥
তাহার অনুজ দ্বিজ রাধাকান্ত ভণে।
কৃপায় কাতর জনগণ নিজগুণে॥

কবি কাব্যসমাপ্তিতে বলিয়াছেন যে, তিনি নূতন মঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছেন—"নৌতুন মঙ্গল ভবে করহ শ্রবণ"। কাব্যের যেটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে শুধু বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীটুকু আছে। কিন্তু পুঁথির শেষে 'কালিকামঙ্গলের সারমর্ম্ম' শীর্ষক বিবৃতি হইতে দেখা যাইতেছে কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের মতো গোড়ার দিকে পৌরাণিক আখ্যান বর্ণনা করিয়াছিলেন। তারপর বিদ্যাসুন্দর আখ্যান আরম্ভ হইয়াছিল। কাব্যারম্ভেও কবি বলিয়াছেন :

শ্যামার সঙ্গীত সপ্তা কবি সমাপন।
আরম্ভিল রসের সাগর জাগরণ॥

প্রথম সাত দিনে গীত হইবার জন্য কবি 'শ্যামার সঙ্গীত' অর্থাৎ পৌরাণিক শিবদুর্গার কাহিনী রচনার পর 'রসের সাগর' অর্থাৎ আদিরসের আকর বিদ্যাসুন্দরে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু বিদ্যাসুন্দরটুকু রক্ষা পাইয়াছে—'শ্যামার সঙ্গীতে'র সংক্ষিপ্ত বিষয় জানা গেলেও মূল কাব্য পাওয়া যায় নাই। কাব্যসমাপ্তির দিকে কবি কাব্যরচনা প্রসঙ্গে একটি কৌতুকাবহ মন্তব্য করিয়াছেন :

আর এক নিবেদন শুন সর্ব্বজন।
প্রাচীন কবিরা সব কৈরাছে রচন॥

---

১৫ শাকে গ্রহ বসু ঋতু বিধুর গণনে।
এই হেতু হইলা গীত প্রকাশ ভুবনে॥

কেহ কহে মায়ের হয়্যাছে প্রত্যাদেশ।
কেহ কহে দিল দেখা ধরি নিজ বেশ॥
কেহ বলে জিহ্বাতে কবিতা দিলা লিখি।
কেহ কেহ বলে আমি সপনেতে দেখি॥
যে পদ ধিয়ান করিয়া পান বিধাতা।
মানব হৈয়া কেহ কহে হেন কথা॥
কেমনে এমন কথা লইবে হিয়ায়।
কিন্তু সত্য মিথ্যা কিছু কহা নাহি যায়॥

কবি আধুনিক যুগের অব্যবহিত পূর্বে কালিকামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, কাজেই আধুনিক যুগের মনোভাবের অনুরূপ কিছু সংশয় কবিচিত্তে উঁকি দিয়াছে। "আধুনিক কালোচিত সংশয় রাধাকান্তের মনেও জাগিয়াছিল। তাই তিনি এই প্রকার প্রত্যাদেশের যথার্থতায় সন্দেহ তুলিয়া সেই দেব-অনুগৃহীত কবিদের স্পর্ধায় সায় দিতে পারেন নাই"—সমালোচকের[১৬] এই মন্তব্য যুক্তিপূর্ণ বটে। কিন্তু এখানে ঠিক সংশয় বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ফুটে নাই। কবি ঈশ্বরীসত্তায় সংশয় প্রকাশ করেন নাই, করিলে এ কাব্য লিখিতেই তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না। যে সমস্ত কবি দেবদেবীর প্রত্যাদেশের দোহাই পাড়িয়া কাব্যরচনার কথা বলিয়াছেন, কবি শুধু তাঁহাদের উক্তির প্রতি সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন; কবি বলিয়াছেন:

বেদ বলে ভকতবৎসলা মহামায়া।
কে জানিবে কেমনে কাহার তরে দয়া॥

ভক্তবৎসলা কাহাকে অনুগ্রহ করেন, কাহাকে নিগ্রহ করেন—তাহার কিছুরই ঠিকঠিকানা নাই। তবে কবি এ প্রসঙ্গে দৃঢ়নিশ্চয়—"ভজিলে তাঁহার নাম ভক্তি উপজয়"। কাজেই দেবীভক্ত কবিচিত্তে দেবী বিষয়ে কোন সংশয় ছিল না। বরং রামানন্দ ঘোষ, যিনি নিজেকে সদম্ভে বুদ্ধের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনিই বাস্তব প্রয়োজনবুদ্ধির (pragmatic) দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সক্ষোভে বলিয়াছিলেন, "বস্তুহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ"।[১৭]

রাধাকান্ত মিশ্রের বিদ্যাসুন্দরে বিশেষ কোন প্রতিভার চিহ্ন নাই, কেবল

১৬ ডঃ সেন—ঐ গ্রন্থ, পৃ. ৪৮৬
১৭ অনুবাদ-সাহিত্য প্রসঙ্গে রামানন্দ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

কাহিনী গ্রন্থনে তিনি কিছু কিছু নূতনত্বের আমদানি করিয়াছেন। যেমন—দেবী কালিকার মায়ায় সুন্দরের নদী পার, দেবী কর্তৃক সুন্দরকে মায়াকাজল দান, সেই কাজল পরিয়া সুন্দরের অদৃশ্য হইয়া যাওয়া, সুন্দর ও বিদ্যার তপস্বী-তপস্বিনীর সাজে বীরসিংহের সভায় উপস্থিত হইয়া কৌশলে বিবাহের অনুমতি আদায়, অপরাধিনী কন্যাকে রাজার বধ করিতে উদ্যোগ প্রভৃতি। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিদের কাব্যরচনার পর রাধাকান্ত একই বিষয় অবলম্বনে পালা রচনা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্বসূরীদের কাব্য হইতে যে তিনি বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। কাহিনীতে দুই-একটি মৌলিকতা ভিন্ন আর কোন দিক দিয়া তিনি বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই, চরিত্রগুলিতেও কোনও প্রকার ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠে নাই। কেহ কেহ তাঁহার রচনারীতির প্রশংসা করিয়া থাকেন।[১৮] তাঁহার ভাষা মার্জিত হইতে পারে, তাহাতে গ্রাম্য কুরুচির বিশেষ সংস্পর্শ না থাকিতে পারে। কিন্তু এ ভাষায় সরসতার একান্ত অভাব বলিয়া গ্রন্থখানি বহু স্থলে ক্লান্তিকর মনে হয়।

এই ব্রাহ্মণ-কবি বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন; বিদ্যা ও সুন্দরের দার্শনিক বিচার অংশে বেদান্ত তত্ত্বকে তিনি অতি সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুন্দর অদ্বৈততত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিদ্যাকে বলিল:

জ্ঞানের স্বরূপ এক ব্রহ্মজ্যোতির্ময়।
তাহা বিনে ত্রিভুবনে কিছু সত্য নয়॥
নিশ্চয় জানিহ এক নৃপতিতনয়া।
অনাদি অদ্ভুত আছে ঈশ্বরের মায়া॥
*　*　*　*
না কর সন্দেহ সখি আমার বচনে।
এক ভিন্ন দুই নাই এ তিন ভুবনে॥

কালিকামঙ্গলের অনেক কবিই কালিকার স্তবস্তুতি দিয়া কাব্যারম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু আদ্যাশক্তির অদ্বৈততত্ত্বে আসিয়া তাঁহাদের যাত্রা থামিয়াছে। যাহা হউক, রাধাকান্ত বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গলে বিশেষ কোন

---

১৮ ডঃ সেনের মন্তব্য—"রাধাকান্তের কাব্যের ভাষা মার্জিত, ভাব গ্রাম্যতা বর্জিত।"—বা. সা. ইতি. ১ম (অপরার্ধ) পৃ. ৪৮৬

নূতনত্ব দেখাইতে না পারিলেও সহজ ভাষায় কাহিনীটি বিবৃত করিয়াছেন বলিয়া ইহা কথঞ্চিৎ পাঠযোগ্য হইয়াছে।

রাঢ়ের আর এক কবি মধুসূদন চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অম্বিকাচরণ গুপ্ত মধুসূদনের কাব্যের একখানি পুঁথি অবলম্বনে কাব্য প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন।[১৯] কিন্তু এ কাব্য প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে কবিচন্দ্র-উপাধিক মধুসূদন চক্রবর্তীর কালিকামঙ্গলের একখানি পুঁথি আছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য অনুমান করেন—ইহাই সেই পুঁথি।[২০] ডঃ ভট্টাচার্যের মতে, কবির প্রকৃত নাম কবিচন্দ্র। কিন্তু কোন কোন পুঁথিতে মধুসূদন চক্রবর্তী, মধুসূদন কবীন্দ্র, কবিচন্দ্র ইত্যাদি ভণিতাও পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, "মধুসূদন কবীন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের ভাষা, বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য বিবেচনা করিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, ইহা রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পূর্ববর্তী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের রচনা।"[২১] কিন্তু ইহার ভাষার মধ্যে এমন কোন প্রাচীনত্বের চিহ্ন নাই যাহাতে উহাকে ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের পূর্ববর্তী বলিতে হইবে। এই অপরিণত ও দুর্বল রচনা কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণীয়। কেহ কেহ মনে করেন, একই সময়ে নিধিরাম কবিচন্দ্র নামে আর একজন কালিকামঙ্গল কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। মধুসূদন কবীন্দ্র এবং নিধিরাম কবিচন্দ্রের নিবাস ছিল একই অঞ্চলে—দক্ষিণ রাঢ়ে। তাই মনে হয় উভয়ের রচনা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। আবার চট্টগ্রামে নিধিরাম আচার্য নামে আর একজন কবির কালিকামঙ্গল (১৬৭৮ শক = ১৭৫৬ খ্রীঃ অঃ) পাওয়া গিয়াছে।[২২] এই দুই কবীন্দ্র-কবিচন্দ্র এবং একজোড়া নিধিরামে মিলিয়া কালিকামঙ্গলে পাড়ি জমাইতে

---

১৯ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৫০

২০ বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী' (মধুসূদন চক্রবর্তী কবীন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' অংশে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল পালের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।)

২১ শ্রীযুক্ত পালের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

২২ সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১—১

চাহিয়াছিলেন—কিন্তু ভারতচন্দ্র প্রভৃতি থাকিতে ইঁহারা সমুদ্রের পার্শ্বে কূপ খননে মাতিয়াছিলেন কেন বুঝা যাইতেছে না।

কালিকামঙ্গলের লোভনীয় বিষয়বস্তু, যাহাতে ভক্তিরস ও আদিরস মিশিয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি কবিযশঃপ্রার্থীদের আকর্ষণ থাকাই স্বাভাবিক। অবশ্য কালিকামঙ্গলে ভক্তিরসের শর্করামণ্ডন থাকিলেও ভিতরে আছে আদিরসের তিক্ত বটিকা —একথা সে যুগের পাঠকসম্প্রদায় ও শ্রোতারা জানিতেন। তাঁহারা আরও জানিতেন—এই তিক্ত বটিকা যতই তিক্ত হউক, ইহার প্রতি সাধারণ মানুষের দুর্নিবার আকর্ষণ অস্বীকার করা যায় না—তাই সেই আকর্ষণকে কবিরা ভক্তিরসের গঙ্গোদক ছিটাইয়া পবিত্র করিতে চাহিয়াছিলেন—কালিকামঙ্গলের ইহাই বাঁধা দস্তুর। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে যাঁহারা সেই বাঁধাপথের পথিক হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতিভার পাথেয় ছিল না। তাই তাঁহাদের স্থান পাঠকের সজীব মন নহে, বিবর্ণ পুঁথির তালিকা তাঁহাদের শেষ আশ্রয়।

এই শতাব্দীতে ব্রতকথা ধরনের আরও নানা প্রকার মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল। তখন জীবন ও সমাজের স্বাভাবিক স্রোত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাই বদ্ধ জলাশয়ের মতো তথাকথিত মঙ্গলকাব্যে শুধু পঙ্কস্তর জমিয়া উঠিতেছিল। সূর্য, পঞ্চানন, গঙ্গা, সারদা, লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, শনি প্রভৃতি পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীকে অবলম্বন করিয়া ছোট ছোট পাঁচালী রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি মুদ্রণ-সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছে—যথা রামজীবন বিদ্যাভূষণের সূর্যমঙ্গল (সা. প. পত্রিকা, ১৩শ খণ্ড), দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' (১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত), দয়ারামের সারদামঙ্গল, নরোত্তমের লক্ষ্মীমঙ্গল, রুদ্ররামের ষষ্ঠীমঙ্গল—এগুলির সাহিত্যগুণ নগণ্য। মাঝে মাঝে দু একটি রূপকথা ইহাতে কাহিনী হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সে সমস্ত বালক-ভুলানো গল্প শুধু স্ত্রীসমাজেই প্রচলিত ছিল, সাহিত্যরসিক সমাজে বড় কেহ তাহার খোঁজ রাখিত না। ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোকিত যুগেও এই ধারা গ্রামাঞ্চলে বহুকাল প্রবাহিত ছিল, শনি ও লক্ষ্মীর পাঁচালী এখনও মুদ্রিত হইয়া গ্রামে গ্রামে

বিক্রয় হয়। শনির কোপদৃষ্টি হইতে বাঁচিবার জন্য এবং ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভের জন্য এখনও ভক্তিমতী মহিলারা এই দেবদেবীর ব্রতপূজা করিয়া থাকেন। শনি, লক্ষ্মী ও সত্যনারায়ণ—এই তিনজনের পূজা-উপাসনা এখনও বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু আধুনিক জীবনের আঘাতে এই সমস্ত অর্ধ-গ্রামীণ সংস্কার ক্রমেই অবলুপ্তির পথে চলিয়াছে।

যাহা হউক এই সমস্ত পাঁচালী-ব্রতকথা-মঙ্গলকাব্য শ্রেণীর পুঁথিগুলির বিশেষ কোন সাহিত্যমূল্য না থাকিলেও বাঙালীর যথার্থ মানসিক বিকাশ জানিতে হইলে এই সমস্ত তুচ্ছ রচনারও বিশ্লেষণ হওয়া উচিত—তবে সে কাজে সাহিত্যের ইতিহাস অপেক্ষা সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় অধিকতর সুষ্ঠুরূপে সমাধা হইতে পারে।

এইস্থানে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যের কথা সমাপ্ত করিলাম। এই শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাঙলার রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজজীবন, অর্থনীতির স্বরূপ ও জীবনপ্রতীতির দ্রুত পরিবর্তনের ফলে মধ্যযুগীয় সংস্কারের প্রতীক মঙ্গলকাব্য ধরনের রচনা কোনও প্রকারে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেও, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইহাদের আয়ুর পরিধি ক্রমেই সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। তখন কালিকা, চণ্ডী, মনসা, ধর্ম, শনি, লক্ষ্মী, শীতলা, বাসুলীর স্থলে আধুনিক জীবনের নানা প্রশ্ন, সমস্যা, জটিলতা বাঙালী মানসকে নব নব অভিজ্ঞতার আঘাতে উচ্চকিত করিয়া তুলিল। অবশ্য তখনও গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে, নাটমন্দিরে, বারোয়ারীতলায় এই সমস্ত দেব-দেবীর পূজানুষ্ঠান, মঙ্গলগান, পাঁচালী গান হইতেছিল বটে, কিন্তু সহস্র দীপালোকিত কলিকাতার নাগরিক জীবনে সেই ধ্বনিতরঙ্গ ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া অবশেষে মিলাইয়া গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের নাগরিক জীবনে তবু খানিকটা মধ্যযুগীয় স্পর্শ ছিল। কিন্তু শেষার্ধে ইংরাজ রাজত্বের বনিয়াদ রচনার যুগে কলিকাতা নগরীর রূপসজ্জার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইল। বণিক-রাজের কেন্দ্রভূমি কলিকাতায় তখন আখড়াই, হাপ আখড়াই, কবিগান, টপ্পা, যাত্রা ও আধুনিক পাঁচালীর বান ডাকিয়াছে। ভক্তিরস নহে, পারত্রিক কল্যাণ নহে,—বণিক, মুৎসুদ্দি, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাধারণ কর্মচারী, হীনবৃত্তিজীবী সাধারণ লোক তখন দুই দণ্ডের জন্য আমোদের উত্তেজনা চাহিতেছিল। নাগরিক জীবনের আবিল কল্লোলে মধ্যযুগীয়

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা ক্রমেই ক্ষীণকণ্ঠ হইয়া পড়িলেন, অবশেষে সম্পূর্ণ নীরব হইয়া গেলেন। তারপর আরম্ভ হইল নব যুগ—নব জীবনের এক অভিনব ইতিবৃত্ত—উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগ।

২

অনুবাদ সাহিত্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মৌলিক অনুবাদ-সাহিত্যের সংখ্যা খুবই অল্প, গুণগত উৎকর্ষ আরও অল্প—যদিও এই বিষয়ে অসংখ্য পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত অবলম্বনে রচিত অনুবাদধর্মী বহু পুঁথি এই শতাব্দীতে স্তুপাকার হইয়া উঠিতেছিল। কিছু কিছু বৈষ্ণবপুরাণ, কাব্য, তত্ত্ব ও গোস্বামীপ্রভুদের গ্রন্থাদি সংক্ষেপে অনূদিত হইতেছিল। বলিতে কি, অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনুবাদ-সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের বারো আনা অংশ অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। অবশ্য পূর্ব-শতাব্দীর রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের পুঁথির প্রচুর নকল এই শতাব্দীতে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। কৃত্তিবাস ও কাশীরামই অধিকতর ভাগ্যবান, কারণ তাঁহাদের মহাগ্রন্থের পৃথক পৃথক পর্ব ও কাণ্ডের অসংখ্য পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতীর পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে। রামায়ণ ও মহাভারত বাঙালীর মনোভূমিকে সরস করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া অধিকাংশ পুঁথিই এই দুই মহাগ্রন্থের নকল। ভাগবত পুরাণ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকতর জনপ্রিয় ছিল বলিয়া উক্ত সম্প্রদায়ের কোন কোন লেখক ভাগবত বা ভাগবতধরনের বৈষ্ণব পুরাণ ও আখ্যানের কিছু কিছু ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন। তবে পূর্ব শতাব্দীর ভাগবত অনুবাদকগণের কাব্যই বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, ইহার বহু নকল হইয়াছিল, সেগুলি বৈষ্ণবগৃহে স্থান পাইয়াছিল। ভাগবতের বাহিরেও অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবসমাজে বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। নিম্নে এই সমস্ত অনুবাদ-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

রামায়ণের অনুবাদ ও রামায়ণাশ্রয়ী রচনা ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিচ্ছিন্নভাবে রামায়ণের অনেক পর্ব অনূদিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, অবশ্য কৃত্তিবাসের রামায়ণ অধিক জনপ্রিয় হইয়াছিল—এই রামায়ণের পুরা ও বিচ্ছিন্ন কাণ্ডের পুঁথি প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। তাই মনে হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলাদেশে কৃত্তিবাসী রামায়ণ বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল। এমন কি অন্য কবির উৎকৃষ্ট রচনাও কৃত্তিবাসের রচনার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে—কৃত্তিবাসের নামের এমনই মহিমা। কিন্তু আকাশে চন্দ্র-সূর্য থাকিলেও যেমন খদ্যোৎ স্বল্পতম আলো দিয়া ধন্য হয়, তেমনি কৃত্তিবাসী রামায়ণ সত্ত্বেও স্বল্প প্রতিভাবিশিষ্ট কয়েকজন কবি বাল্মীকি ও অধ্যাত্ম রামায়ণের কিয়দংশ বা সম্পূর্ণ ভাবানুবাদের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থগুলি অঞ্চলবিশেষে কিছু জনপ্রিয়-ও হইয়াছিল। তাহা না হইলে ইঁহাদের কাব্যের পুরা বা বিচ্ছিন্ন অংশের একাধিক পুঁথি মিলিয়াছে কেন? যাঁহাদের রচনার কোন দিক দিয়াই কোন গৌরব নাই, এখানে অনর্থক তাঁহাদের পরিচয় দিয়া ভিজা কম্বল ভারী করিবার প্রয়োজন নাই। এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর এমন কয়েকজন রামায়ণকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে—যাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ কবিপ্রতিভা ছিল।

১. শঙ্কর কবিচন্দ্রের রামায়ণ ॥ ইতিপূর্বে ভাগবত প্রসঙ্গে আমরা শঙ্কর কবিচন্দ্র সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ ভূস্বামী রাজা রঘুনাথের (দ্বিতীয়) রাজত্বকালের মধ্যে ১৭০২ খ্রীঃ অব্দে কবি শঙ্কর চক্রবর্তী বাল্মীকি ও অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে অতি সংক্ষেপে রামায়ণ পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। কোথাও তিনি নিজের কাব্যকে 'রামলীলা' ("শঙ্কর রচিলা রামলীলা উপাখ্যান") কখনও-বা 'শ্রীরাম মঙ্গল' ("শ্রীরাম মঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়") বলিয়াছেন। কবি শুধু অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বন করেন নাই, বাল্মীকি হইতেও অনেক কাহিনী গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিছু কিছু রচনা তাঁহার নিজস্ব পরিকল্পনা হইতে সৃষ্ট। অবশ্য তাঁহার একখানিও পুরাপুঁথি পাওয়া যায় নাই। বিচ্ছিন্নভাবে 'অঙ্গদের রায়বার', 'কুম্ভকর্ণের রায়বার', 'শিবরামের যুদ্ধ' প্রভৃতি পালার অনেক পুঁথি মিলিয়াছে। আমাদের মনে হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ও অষ্টাদশ পর্বের

মহাভারত রচনা করিবার মতো মানসিক 'দম' বড় কাহারও ছিল না, তাই তাঁহারা দুই একটি পালার বেশী লিখিতে পারেন নাই। শঙ্কর কবিচন্দ্রেরও বিচ্ছিন্ন পালাগুলি অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছিল, পুরা কাব্য তিনি নিশ্চয়ই লিখিয়াছিলেন—কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

কবি যে নিষ্ঠাসহকারে কোন বিশেষ সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ করেন নাই তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। বাল্মীকি রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, নিজস্ব কল্পনা প্রভৃতি মিশাইয়া কবি এই মিশ্রধরনের রামকাব্য লিখিয়াছেন। ইহা বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার অপর নাম 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ'।[২৩] কবির রচনা সরল, কিন্তু প্রসাদগুণযুক্ত নহে। স্থানে স্থানে কৃত্তিবাসের রচনার সঙ্গে তাঁহার অনেক রচনা মিশিয়া গিয়াছে—যেমন শিবরামের যুদ্ধ ও অঙ্গদের রায়বার। প্রাচীন কৃত্তিবাসী পুঁথিতে এই দুই পালা পাওয়া যায় না। কবিচন্দ্রের রচনা দুইটি নকলনবিশ বা রামায়ণগায়কদের কৃপায় কৃত্তিবাসের পুঁথিতে প্রবেশ করিয়াছে। অঙ্গদের রায়বার কবিচন্দ্রের রঙ্গরস ও ব্যঙ্গকৌতুকের সার্থক দৃষ্টান্ত। কবিচন্দ্র প্রতিভার দিক দিয়া কখনই কৃত্তিবাসের সমকক্ষ নহেন, কিন্তু তাঁহার রচনার কোন কোন অংশ কৃত্তিবাসের সমতুল্য তাহা স্বীকার করিতে হইবে। দুই-এক স্থলে তাঁহার আন্তরিক উক্তি বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বনবাসে কত কষ্ট ভয়, বনগমনের পূর্বে রামচন্দ্র তাহা সীতাকে বুঝাইতে আসিলে তিনি বলিলেন :

অমৃত সমান মোর না হইবে ক্লেশ।
ব্যাঘ্র ভল্লুক আদি না করিব দ্বেষ॥
বাকল অজিন মোর পট্টের বসন।
তৃণপত্র শয্যা মোর পালঙ্গ যেমন॥
তোমা ছাড়্যা একদণ্ড রহিতে নারিব।
চৌদ্দ বৎসর নাথ কি কর্‌্যা গোঙাব॥

এই উক্তিতে বিশেষ কোন কাব্যগুণ নাই বটে, কিন্তু সহজ প্রাণের সাদা কথা পাঠকের মনকে সহজেই আকর্ষণ করে। কবিচন্দ্র শঙ্কর রামায়ণ রচনায় বিশেষ কোন উৎকৃষ্ট ঐতিহ্য সৃষ্টি করিতে না পারিলেও রামায়ণের কোন

২৩ মণীন্দ্রমোহন বসু—বাঙ্গালা সাহিত্য, ২য়, পৃ. ১৪৭

কোন কাহিনী সরল ভাষায় রচনা করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন।

২. জগদ্রামের রামায়ণ॥ পিতা জগদ্রাম (জগৎরাম) ও পুত্র রামপ্রসাদ দুইজনে যৌথভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামায়ণ রচনা করেন। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে 'দুর্গাপঞ্চরাত্র' শীর্ষক আর একখানি কাব্যেও পিতা-পুত্রের ভণিতা দেখা যায়। জগদ্রাম-রামপ্রসাদের রামায়ণ মুদ্রিত হইয়াছে[২৪] বলিয়া ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যান্য রামায়ণকারের মতো বিস্মৃত হইয়া যান নাই। তাঁহার রামায়ণ কাব্যে ('অদ্ভুত রামায়ণ') তিনি সবিস্তারে নিজের পরিচয়, বংশপরিচয় গ্রন্থরচনার সন-তারিখ প্রভৃতি উল্লেখ করিয়াছেন। তখন মধ্যযুগীয় ভাবধারার দ্রুত অবসান হইতেছিল। কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশের ভূমিরাজস্ব ও অর্থনৈতিক কাঠামোরও পরিবর্তন ঘনাইয়া আসিতেছিল। কলিকাতা ও ইহার চতুষ্পার্শ্বে আধুনিক ভাবাবেগ বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিছু কিছু ছাপাখানার কাজকর্ম চলিতেছে, তাহা হইতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিজ্ঞাপন, ইস্তাহার, আইনের তর্জমা প্রভৃতি মুদ্রিত হইতেছে—অজ্ঞাতকুলশীল কলিকাতা নগরী ধীরে ধীরে নব রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের তলে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই যুগসন্ধিক্ষণে বর্ধমানের ভুলুই গ্রামে (দামোদর নদের তীরে পঞ্চকোটের রাজা রঘুনাথ রায়ের জমিদারী) জগদ্রাম রায় (বন্দ্যোপাধ্যায়)[২৫] জ্যেষ্ঠপুত্র রামপ্রসাদের সহায়তায় বাল্মীকি, অধ্যাত্ম, অদ্ভুত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে উপাদান ও আদর্শ গ্রহণ করিয়া বিরাট আকারের রামায়ণ রচনা করেন। কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জিতরামের আদেশেই এই কাব্য রচিত হয়।[২৬] কবির তিন পুত্র—রামপ্রসাদ, কৃষ্ণপ্রসাদ,

---

২৪ কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত।

২৫ বিপ্রবংশ বন্দ্যঘটী ভুলুই গ্রামেতে বাটী
জগত রচিল মহাকাব্য।

২৬ পিতা রঘুনাথ রায় মাতা শোভাবতী। দোঁহে জন্মদাতা আমি অধম অকৃতী।
সে দোঁহার পাদপদ্মে নতি বহুবার। জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা জিতরাম পদে নমস্কার।
তাঁহার আদেশে হৈল এ গ্রন্থ রচনা। নিরন্তর তাঁর পদ করিয়ে বন্দনা।

রামনারায়ণ। জ্যেষ্ঠ রামপ্রসাদ পিতার মতোই কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, পিতার গ্রন্থে তাঁহারও দান বড় কম নহে।

কবি জগদ্রাম পুত্রের সহযোগিতায় ১৭১২ শকে (১৭৯১ খ্রী: অ:) রামায়ণ রচনা করেন।[২৭] অবশ্য এই সনতারিখ সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আছে। কারণ পিতাপুত্র মিলিয়া 'দুর্গাপঞ্চরাত্র' শীর্ষক রামায়ণ বিষয়ক যে কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহা বৃহৎ রামায়ণের পূর্বে ১৬৯২ শকে (১৭৭০ খ্রী: অ:) রচিত হইয়াছিল।[২৮] ইহাতে পুত্র রামপ্রসাদ কিন্তু রামায়ণের উল্লেখ করিয়াছেন :

পিতা জগৎ রাম মোর রামপরায়ণ।
যেঁহ কাব্য রচিল অদ্ভুত রামায়ণ॥

সুতরাং 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'তে (১৬৯২ শক—১৭৭০ খ্রী: অ:) যখন রামায়ণের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, উক্ত রামায়ণ 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'র পূর্বে অর্থাৎ ১৬৯২ শকের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ কিছু গোলে পড়িয়াছেন। মণীন্দ্রমোহন বসু সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া অনুমান করিয়াছেন—'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'র "গ্রন্থ-রচনার তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়।"[২৯] কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ১৩০৮ সনে দুর্গাপঞ্চরাত্রির পুঁথি মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাহাতে কিন্তু সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩০২) প্রকাশিত 'ভুজ-রন্ধ্র-রস-চন্দ্র' ইত্যাদি শ্লোকটি মুদ্রিত হয় নাই। এইজন্য মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন—দুর্গাপঞ্চরাত্রির সমস্ত পুঁথিতে ঐ সন ছিল না। আবার কেহ কেহ দুর্গাপঞ্চরাত্রির সনকেই প্রামাণিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ১৭১২ শকে (১৭৯১) রামায়ণ সমাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া রামায়ণে পুত্র রামপ্রসাদ যে শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন, আসলে তাহা পিতার সমাপ্তিসূচক

---

২৭ সপ্তদশ শতাব্দে দ্বাদশ যুক্ত তাথে। ফাল্গুনের শুক্লপক্ষ তিথি পঞ্চমীতে॥
উনত্রিশ দিবসে বারেতে বৃহস্পতি। জন্মভূমি ভুলুই গ্রামেতে করি স্থিতি॥

ইহা হইতে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় (প্রবাসী, ১৩৩৬, পৃ. ৩৫০-৫১) ১৭১২ শক ২৯শে ফাল্গুন এই তারিখ গণিয়া বাহির করিয়াছেন।

২৮ দুর্গাপঞ্চরাত্রিতে পুত্র রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—"ভুজরন্ধ্ররসশকে"—অর্থাৎ ১৬৯২ শকে (১৭৭০ খ্রী: অ:) এই কাব্য রচিত হয়। সা-প-প, ১৩০২

২৯ মণীন্দ্রমোহন বসু—বাঙালা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩

শ্লোক্ নহে। পুত্র পিতার রামায়ণ রচনার অনেক পরে (অন্ততঃ বিশ-বাইশ বৎসর পরে) রামায়ণের বাকি অংশ সমাপ্ত করেন।[৩০]

জগদ্রাম অধ্যাত্ম ও অদ্ভুত রামায়ণ অবলম্বনে তাঁহার রামায়ণকে আট কাণ্ডে বিভক্ত করেন—আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা, পুষ্কর এবং উত্তরকাণ্ড। কেহ কেহ গ্রন্থোক্ত 'রামরাস'কে পুষ্কর ও উত্তরকাণ্ডের মধ্যে স্থাপন করিয়া আটের স্থলে নয় কাণ্ড স্থির করিয়াছেন। যাহা হউক জগদ্রাম আটকাণ্ডই রচনা করিয়াছিলেন—কিন্তু কৃত্তিবাসের কাব্যে লঙ্কা ও উত্তরকাণ্ড বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া তিনি উহা সংক্ষেপে রচনা করেন, পরে পুত্র রামপ্রসাদকে ঐ দুই কাণ্ড সবিস্তারে লিখিতে আদেশ দেন। পুত্র সেই প্রসঙ্গে উক্ত রামায়ণের এক স্থানে বলিয়াছেন :

পিতা জগদ্রাম মোরে রামলীলা বর্ণিবারে
উপদেশ দিলেন যেমতে ॥
সীতারাম লীলা নব্য রচিলা সুন্দর কাব্য
শ্রীঅদ্ভুত রামায়ণ নাম।
অদ্ভুত অধ্যাত্ম মত একত্র করিয়া যুত
রচনা বিবিধ রসধাম ॥
তারপর জ্ঞাত করি লঙ্কাকাণ্ড পরিহরি
সংক্ষেপেতে করিলা বর্ণন।
লঙ্কাকাণ্ড সুপ্রকাশ রচিলা সে কৃত্তিবাস
বিস্তারে শুন্যছে সর্ব্বজন।
এই মনে করি পিতা ছাড়িয়া লঙ্কার কথা
অদ্ভুত প্রসঙ্গে দিলা মন ॥
লঙ্কা ও উত্তর কাণ্ড যেমত অমৃত ভাণ্ড
সংক্ষেপে বর্ণন আছে ইথে।
মোর লৈয়া অনুমতি বিস্তার করিয়া অতি
রচনা করহ রামপ্রীতে ॥

ইহাতে দেখা যাইতেছে, জগদ্রাম প্রথমে পুত্রের সহযোগিতায় রামায়ণ রচনা করেন নাই। তিনি অধ্যাত্ম ও অদ্ভুত রামায়ণ অবলম্বনে সর্বপ্রথম ('দুর্গাপঞ্চরাত্রি' রচনার পূর্বে) একক চেষ্টার দ্বারা 'শ্রীঅদ্ভুত রামায়ণ' রচনা করেন। কৃত্তিবাস লঙ্কা ও উত্তরকাণ্ড সবিস্তারে লিখিয়াছিলেন বলিয়া

৩০ ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ইতি, ১ম (অপরার্ধ), পৃ ৪১১—৪১২

জগদ্রাম ঐ দুইকাণ্ড সংক্ষেপে বর্ণনা করেন, কিন্তু তৎস্থলে পুষ্করকাণ্ড ও 'রামরাস' রচনা করেন। পুষ্করকাণ্ডে অদ্ভুত রামায়ণ অনুসৃত হইলেও 'রামরাস' কবির মৌলিক রচনা—বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাবে পরিকল্পিত। এই সমস্ত তথ্য হইতে মনে হইতেছে, কবি জগদ্রাম অদ্ভুত ও অধ্যাত্মরামায়ণ অবলম্বনে পুরা মাপেই রামায়ণ রচনা করেন, কিন্তু লঙ্কা ও উত্তরকাণ্ড সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখেন নাই। পরে পুত্র কবিত্বশক্তি অর্জন করিলে তিনি তাঁহার সহযোগিতায় 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' রচনা করেন। হয়তো পুত্রের কবিত্বশক্তিতে খুশি হইয়া পিতা নিজ রামায়ণে সংক্ষেপে বর্ণিত লঙ্কা ও সুন্দরাকাণ্ড সবিস্তারে লিখিতে আদেশ করেন। পুত্র পিতার নির্দেশক্রমে এই দুই কাণ্ড সবিস্তারে রচনা করিয়াছিলেন—১৭১২ শক (১৭৯১ খ্রীঃ অঃ) পুত্রের কাব্য-সমাপ্তির তারিখ। এইরূপ অনুমান অনেকটা যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য জগদ্রাম কবে তাঁহার রামায়ণ রচনা সমাপ্ত করেন তাহার কথা কিছু বলেন নাই। তাঁহার রামায়ণের শেষে পুত্রের কাব্য সমাপ্তির তারিখটিকেই অনেকে জগদ্রামের রামায়ণ সমাপ্তির তারিখ মনে করেন এবং সেই জন্য 'দুর্গাপঞ্চ-রাত্রি'র রচনাকালের সঙ্গে রামায়ণ রচনার সনতারিখ মিলাইতে পারেন না। যাহা হউক এই বিষয়ে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসঙ্গত—জগদ্রামের একক প্রচেষ্টায় লেখা রামায়ণের অধিকাংশ 'দুর্গাপঞ্চরাত্রির' পূর্বেই সমাপ্ত হইয়াছিল, বাকি অংশ পুত্র রামপ্রসাদ বিশ-বাইশ বৎসর পরে ১৭১২ শকে সমাপ্ত করেন।

জগদ্রাম দেখিয়াছিলেন, প্রধানতঃ বাল্মীকি অবলম্বনে রচিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ জনসমাজে অধিকতর প্রচার লাভ করিয়াছিল। তাই তিনি বাল্মীকির পথ পরিত্যাগ করিয়া অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে 'শ্রীঅদ্ভুত রামায়ণ' রচনা করিলেন। মুদ্রিতগ্রন্থে আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, পুষ্করকাণ্ড এবং 'রামরাসে' জগদ্রামের ভণিতা এবং লঙ্কা ও উত্তরকাণ্ডে পুত্র রামপ্রসাদের ভণিতা দৃষ্টে পিতাপুত্রের কতটুকু অংশ তাহা সহজেই নির্দেশ করা যায়। জগদ্রাম অদ্ভুত রামায়ণ হইতে এই কাহিনী গ্রহণ করেন—পৃথিবী ও দেবতাদের প্রার্থনায় রাবণবধের জন্য নারায়ণের চারি অংশে দশরথের চারি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয়া সেতুবন্ধে শিবস্থাপনা পর্যন্ত অংশ মোটামুটি অদ্ভুত রামায়ণ হইতে গৃহীত। ইহার পরে

লঙ্কাকাণ্ড হইতে রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও অভিষেক পর্যন্ত অংশ পুত্র রামপ্রসাদের রচনা। পুষ্কর কাণ্ডের কাহিনী জগদ্রাম অদ্ভুত রামায়ণ হইতে গ্রহণ করেন। অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে তিনি রামের সভায় অগস্ত্যের আগমন ইত্যাদি কাহিনী সংগ্রহ করেন। রামপ্রসাদও অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে লঙ্কাকাণ্ডাদির কাহিনী লইয়াছিলেন।

কবিদ্বয় অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রধান প্রধান ঘটনা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেও পুঁথি নানা ঘটনা ও তত্ত্বকথায় বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। দুইজনেই নানাস্থান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া প্রচলিত রামসাহিত্যের এক নূতন রূপ দিতে চাহিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু যথেষ্ট শক্তি ও পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও ইহাতে বিশেষ কোন প্রশংসনীয় কাব্যগুণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেইজন্য কৃত্তিবাসের তুলনায় এই কাব্য কিছু নীরস মনে হয়। বাল্মীকির রামায়ণ ছাড়াও অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রতি তৎকালীন বাঙালী পাঠক ও কবিসমাজের কিরূপ কৌতূহল সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহা এই রামায়ণ হইতেই বুঝা যাইবে। অদ্ভুত রামায়ণের অদ্ভুত গল্প (যেমন সীতাকর্তৃক সহস্রশীর্ষ রাবণ বধ) এবং অধ্যাত্ম রামায়ণে বর্ণিত যোগদর্শনাদির তত্ত্বকথা সমাজের উপরিতলে বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আর একটা কথা—'রামরাস' শীর্ষক বিচিত্র মৌলিক রচনাটি জগদ্রামের কবিপ্রতিভার আর একটি দৃষ্টান্ত। চৈতন্যযুগের পর সমাজের নানাস্তরে বৈষ্ণব প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শাক্ত সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারতাদির অনুবাদে এই প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইবে। জগদ্রামও সেই বৈষ্ণব প্রভাবের বশে 'রামরাস' শীর্ষক একটি অপ্রাসঙ্গিক উপচ্ছেদ যোগ করিয়াছিলেন। ইহাতে আছে, অগস্ত্য মহাদেবের কাছে গিয়া বলিলেন যে, পূর্বে হনুমান রামচন্দ্রের ঐশ্বর্যলীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কেহ তো শ্রীরামচন্দ্রের মাধুর্যলীলা বর্ণনা করেন নাই। অগস্ত্য মহাদেবের নিকট রামের মাধুর্যলীলা শুনিতে চাহিলে মহাদেব কবুল জবাব দিয়া বলিলেন যে, তিনিও শুধু রামচন্দ্রের ঐশ্বর্যলীলাই জানেন ("ঐশ্বর্য প্রকট লীলা জ্ঞাত হই আমি")। কিন্তু—

মাধুর্য নিগূঢ়তত্ত্ব অতি গুপ্ততম।
পুরুষের ব্যক্ত নহে মাধুর্যের ক্রম।

নারীভাব হইয়া ভজয়ে যেই পাত্র।
মাধুর্য রসের বেত্তা সেই হয় মাত্র॥

সেই মাধুর্য রসের ভাণ্ডারী হইলেন হনুমান। তখন অগস্ত্য শিবের নির্দেশে হনুমানের কাছে আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মাধুর্য লীলা শুনিতে চাহিলে হনুমান সেই লীলা ব্যাখ্যা করিলেন। সরযূর তীরে সখীসহ রামচন্দ্রের রাসলীলাই এই বর্ণনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। বলাবাহুল্য জগদ্রাম বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাবে এই বিচিত্র রাসলীলা বর্ণনা করিয়াছেন—কিন্তু প্রতিভার স্বল্পতার জন্য বৈষ্ণব রাসলীলাকে রাম-রাসলীলার সঙ্গে মিলাইতে পারেন নাই। উত্তর ভারতে রামচন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া বাৎসল্য ও ভক্তিরসের ধারা প্রাদেশিক সাহিত্যে প্রবাহিত হয়, তুলসীদাস গোস্বামী তাহার ভাণ্ডারী। তাহার কাব্যরস ও ভক্তিরস অতি অপূর্ব। কিন্তু জগদ্রাম তুলসীদাসের মতো কবিত্বের অধিকারী ছিলেন না। কাজেই রামচরিত্রে রাসলীলা প্রয়োগ করায় রসসৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণের জন্যই কবি নিষ্প্রয়োজনে রামরাস রচনা করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা জানিয়া রাখা ভাল। লঙ্কাকাণ্ডে কবির বর্ণনায় আছে, ইন্দ্রজিতের স্ত্রী বীর্যবতী সুলোচনা সখীদের সঙ্গে লঙ্কায় প্রবেশ করিতে যাইতেছে। মাইকেল মধুসূদনের প্রমীলা চরিত্রের সঙ্গে, বিশেষতঃ লঙ্কা প্রবেশের বর্ণনার সঙ্গে রামপ্রসাদের লঙ্কাকাণ্ডের সুলোচনা চরিত্রের বেশ মিল আছে।[৩১] মাইকেলের মেঘনাদবধের একশতাব্দী পূর্বে এই রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, কিন্তু মুদ্রিত হয় নাই, প্রচারও অতিশয় সীমাবদ্ধ ছিল। অথচ এরূপ সাদৃশ্য কি করিয়া সম্ভব হইল তাহা চিন্তার বিষয় বটে।

---

৩১ এ বিষয়ে দীনেশচন্দ্র বলিয়াছেন, "But on reading the account given by the two poets one cannot but conclude that Madhusudana must have read this portion of Jagat Ram'a Ramayana. The character of Sulochana and Pramila have not only a family likeness, but the grandeur of the processions led by the two heroines bear a close affinity to each other." D. C. Sen—*Bengali Ramayanas*, p. 25.

এ কাব্য সম্বন্ধে মধুসূদনের কিছু জানা সম্ভব ছিল না, কারণ তখন ইহা মুদ্রিত হয় নাই। কেহ ইহার সম্বন্ধে কোন সংবাদই রাখিতেন না। কিন্তু এরূপ সাদৃশ্যের কারণ কি, তাহা ব্যাখ্যা করা যায় না।

'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'-ও পিতাপুত্র দুইজনের রচনা। রামচন্দ্র কর্তৃক শরৎকালে অকালে দেবীর বোধন এই কাব্যের বিষয় লইয়া পাঁচপালায় সম্পূর্ণ এই কাব্যের প্রথম তিনপালা পিতার এবং শেষ দুই পালা পুত্রের রচিত। জগদ্রাম আর একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন, ইহার নাম 'তত্ত্ববোধ'[৩২]। এই তত্ত্বমূলক রূপককাব্যটির রচনাকাল কবি স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন :

সতরশ নবম শকে পৌষ পূর্ণমাসী।
আত্মবোধ কহিব জগদ্রাম দাসী॥

অর্থাৎ ১৭০৯ শকে (১৭৮৭ খ্রীঃ অঃ) এই কাব্য রচিত হয়। এই কাব্যে কবি পূর্বে-রচিত রামায়ণেরও উল্লেখ করিয়াছেন :

এই স্থলে বসি ভাবি শ্রীরামচরণ।
রামকাব্য এই স্থানে হল উদ্দীপন॥

রামভক্ত কবি রূপকার্থে মনের অধ্যাত্মমার্গে উত্তরণের কথা বলিয়াছেন। দ্বাদশ উল্লাস বা অধ্যায়ে বিভক্ত এই রূপককাব্যে নানাবিধ তত্ত্বগ্রন্থ, বিশেষতঃ বৈষ্ণবদর্শন, কাব্য ও তত্ত্বদর্শন হইতে প্রচুর সাহায্য লইয়াছিলেন। বৈষ্ণব আবহাওয়ায় মানুষ হইয়া কবি রামচন্দ্রকেই আরাধ্য ইষ্টদেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন—অবশ্য বৈষ্ণবীয় ভাবই তাঁহাকে রামভক্তে পরিণত করিয়াছে। মনের দুই পত্নী—সুমতি ও কুমতি। সুমতির সুপুত্র ও কুমতির কুপুত্রদের কলহ কোন্দল, সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব—পরিশেষে চিত্তের সংশয় নাশ এবং রামচন্দ্রের কৃপায় সমস্ত নরনারীর মধ্যে 'রসরাজ' রামচন্দ্রের উপলব্ধির পর এই তত্ত্বকাব্য শেষ হইয়াছে। কবি যে নানা তত্ত্বদর্শনে প্রাজ্ঞ ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এমন কি বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্বও তিনি জানিতেন, সেই আদর্শে তিনি রামচন্দ্রকে এক বিচিত্রভাবে (প্রকৃতিভাবে) ভজনার ইঙ্গিত দিয়াছেন। তাঁহার মতে "প্রকৃতি-আশ্রয় বিনা এ জ্বালা না যায়," এবং—

প্রকৃতি স্বরূপে রাম দেখ বর্তমান।
রসরাম[৩৩] স্ত্রীপুরুষ দেহে অধিষ্ঠান।

সহজিয়া বৈষ্ণবদের মতো কবি দেহকে অবলম্বন করিয়া ইহার মধ্যে রামচন্দ্রকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন :

৩২ তত্ত্ববোধ—ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৬১)
৩৩ ইহা কি সহজিয়াদের 'রসবীজ' বা রসরাজ সাধনা ?

এই সর্ব্ব অবয়ব কলেবরখানি।
এই দেহরূপ মধ্যে রামবস্তু চিনি ॥
দেহালয় দেবালয় বেদে সত্য কয়।
এই দেহ যে জানে সেই আনন্দে ভাসয় ॥

বৈষ্ণব সাহিত্য ও ধর্ম যেমন সহজিয়াদের কবলিত হইয়াছিল, তেমনি কবি কি এখানে রামভক্তিবাদের সঙ্গে সহজিয়া দেহবাদ মিশাইতে চাহিয়াছেন?[৩৪] তাঁহার রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত 'রামরাসে' যেন তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

জগৎরাম রামায়ণ কাহিনীকে যে রূপকের দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহা 'আত্মবোধে' স্বীকার করিয়াছেন :

সেই দশরথ রাজা ত্রেতাযুগে গেছে।
আর দশরথ দেখ বর্ত্তমান কাছে ॥
দশজন ইন্দ্রিয় তাহাতে যার গতি।
দশরথ বলিয়া মনের গুপ্ত খ্যাতি ॥
মনকে আনন্দে রাখে সে কৌশল্যা হয়।
ভাবরূপা কৌশল্যা জানিহ নিশ্চয় ॥
মন দশরথ আর ভাব কৌশল্যাতে।
দোঁহে যুক্ত হইলে রামের জন্ম তাতে ॥
যথা রাম তথা সীতা সদা অবিচ্ছেদ।
হ্লাদিনী শক্তিরূপা যুক্তি বলে বেদ ॥

কবি রূপকধর্মের অন্তরালে সুগভীর দার্শনিক তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন—এইরূপ আদর্শ তিনি বোধ হয় অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতেই পাইয়াছিলেন। যাহা হউক, জগৎরাম অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন উল্লেখযোগ্য কবি হইয়াও রচনাশক্তির নীরসতার জন্য বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারেন নাই।

৩. রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ ॥ রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ অষ্টাদশ শতাব্দীর এক বিচিত্র বস্তু। যদিও কাব্যটির বিশেষ কোন সাহিত্য-গুণ

---

৩৪ এ সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন, "জগৎরাম যে রামায়েত বৈষ্ণব হইয়াও রাগানুগা পদ্ধতির সাধক ছিলেন তাহার প্রমাণ ইহাতে প্রচুর আছে।" ডঃ সেনের এই অনুমান বাংলা সাহিত্যের এক অজ্ঞাতপূর্ব শাখার ইঙ্গিত দিতেছে। এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালাইবার মতো উপাদান এখনও পাওয়া যায় নাই।

নাই, তবু কবির অদ্ভুত মনোভাবের জন্য তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে ততটা না হইলেও তাঁহার ব্যক্তিগত মতামত সম্বন্ধে আমাদের মনে বিশেষ কৌতূহল সঞ্চারিত হয়। আবার রামানন্দ যতি বলিয়া আর একজন কবির রামায়ণ পাওয়া গিয়াছে। এই দুইজন এক ব্যক্তি না পৃথক ব্যক্তি তাহা লইয়াও বেশ জটিলতার জট পাকাইয়াছে।

রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ সম্বন্ধে প্রথম তথ্য উদ্ধার করেন নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়। ১৯১৮ সালে বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনা নিবাসী পশুপতি হাজরা নামে আগুবি সম্প্রদায়ের এক ভদ্রলোক নিকটবর্তী গ্রাম হইতে রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ উদ্ধার করিয়া তাহা নগেন্দ্রনাথকে দিয়াছিলেন। সাহিত্যপরিষদে রামানন্দের রামায়ণের দুইখানি পুঁথি আছে। তন্মধ্যে ১৯৬ সংখ্যক পুঁথিতে শুধু অযোধ্যা ও অরণ্য কাণ্ড আছে। পুঁথিটির লিপিকাল ১২৪১ সাল। ২৪৫ সংখ্যক পুঁথিটি উত্তরকাণ্ড বাদে প্রায় সম্পূর্ণ অবস্থায় আছে, ইহার লিপিকাল ১১৮৬-৮৭ সাল। এইটিই নগেন্দ্রনাথ বসু পশুপতি হাজরার নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। *Bengali Ramayans* গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র এই পুঁথিটির কথাই বলিয়াছেন।

নগেন্দ্রনাথের পুঁথিটিও খণ্ডিত—যদিও লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত প্রায় সমস্তই আছে। ইহাকে রামানন্দ 'নূতন রামায়ণ' বলিয়াছেন—"রামানন্দ রচিত নূতন রামায়ণ।"[৩৫] খুব সম্ভব কবি অধ্যাত্ম রামায়ণ অথবা অদ্ভুত রামায়ণের[৩৬] প্রভাবে এই নূতন রামায়ণ রচনা করেন। কবির আর কোন পরিচয় বা কাব্যরচনার সময় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কবি এক-স্থলে "বলেতে হাম্বির হৈলা রূপেতে কন্দর্প"—এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে এই হাম্বির হইতেছেন বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বীর।[৩৭] সুতরাং কবি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন

---

৩৫ কবি কোথাও কোথাও 'রামলীলা'ও বলিয়াছেন।

৩৬ নগেন্দ্রনাথের মতে ইহা অদ্ভুত রামায়ণের প্রভাবে রচিত হয় এবং মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে অধ্যাত্ম রামায়ণই কবির আদর্শ ছিল। এই সম্পর্কে 'হরপ্রসাদ-সংবর্ধন লেখমালা'র নগেন্দ্রনাথের 'বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ' প্রবন্ধটি এবং মণীন্দ্রমোহনের 'বাংলা সাহিত্য' (২য় খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

৩৭ মণীন্দ্রমোহন বসু—ঐ গ্রন্থ, পৃ. ১৪৬

বলিয়া মনে হয়। কবি নিজেকে একবার শূদ্র, আবার পরক্ষণেই দ্বিজ বলিতেছেন। নগেন্দ্রনাথ তাঁহাকে কায়স্থ বলিয়াছেন। দীনেশচন্দ্রের মতে সদ্‌গোপ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তবে তিনি দ্বিজ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না, তাহা হইলে নিজেকে কখনও শূদ্র বলিতেন না। ভাষা ও রচনা-ভঙ্গিমা দেখিয়া রামানন্দ ঘোষকে সপ্তদশ শতাব্দীর অনেক পরবর্তী মনে হইতেছে। বিশেষতঃ তাঁহার ব্যক্তিগত মতামত এমন বিচিত্র যে, তাঁহাকে আধুনিক কালের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবি বলাই সঙ্গত। তাঁহার রামায়ণ গ্রন্থ কিন্তু বিশেষ কোন কাব্যগুণান্বিত নহে। আমরা তাঁহার বিচিত্র মনোভাবের জন্যই এখানে একটু পৃথকভাবে তাঁহার উল্লেখ করিতেছি।

গ্রন্থ মধ্যে নানা প্রসঙ্গে কবি অকপটে নিজ ধর্মমত, নৈতিক আদর্শ ও জীবনের পরিণাম সম্পর্কে এমন সমস্ত কথা বলিয়াছেন যে, মাঝে মাঝে তাঁহাকে অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়, কখনও-বা তাঁহার মত ও আদর্শের মধ্যে কোনও প্রকার সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কবির মন্তব্য হইতে মনে হইতেছে, তিনি কিছুকাল পুরীধামে জগন্নাথের ভক্তরূপে বাস করিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজের উপর, বিশেষতঃ দারুব্রহ্মের উপর মুসলমানের অত্যাচার দূর করিবার জন্য মহাকালী বুদ্ধদেবকে অভিশাপ দিয়া মর্ত্যভুবনে পাঠাইয়া দেন। 'ঘোষপুত্রের' মতে তিনিই সেই অভিশপ্ত বুদ্ধদেব, যিনি ম্লেচ্ছশক্তির হস্ত হইতে দেশ উদ্ধার করিয়া দারুব্রহ্মের (অর্থাৎ জগন্নাথদেবের) করে তাহা সমর্পণ করিবেন। তিনি বহুস্থলে নিজেকে বুদ্ধ অবতার বলিয়াছেন :

(১) আমি বুদ্ধ আমা অন্তে কল্কি অবতার।
(২) শূদ্রকুলে রামানন্দ জন্ম লয়েছিল।
সুদ্ধবেশ ধরি এবে তত্ত্ব লিখে গেল॥
(৩) কলিযুগে রামানন্দ বুধ্ব অবতার।

প্রাচীন বুদ্ধ কালীর অভিশাপে আধুনিক বুদ্ধ-রামানন্দ আকার ধরিয়াছেন।[৩৮]

---

৩৮ মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে "কবি নিজেকে 'বুদ্ধ' অর্থে 'জ্ঞানী' রূপেই প্রচারিত করিয়াছেন। অদ্বয় জ্ঞান তাঁহার জন্মিয়াছিল বলিয়াই তিনি নিজেকে 'বুদ্ধ' বলিয়াছেন।" (বা. সা. ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫) কিন্তু কবি নানা স্থানে যেভাবে নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলিয়াছেন, তাহাতে বুদ্ধশব্দ শুধু জ্ঞানী অর্থে লওয়া যায় না।

তিনি মনে করিয়াছিলেন কালীর শাপে মর্ত্যে জন্মাইয়া ম্লেচ্ছের হাত হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়া দারুব্রহ্ম অর্থাৎ পুরীধামের জগন্নাথদেবকে দিবেন :

যবন ম্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি লব।
একচ্ছত্র রাজা করি দারুব্রহ্মে দিব ॥

এইজন্য পুনঃ পুনঃ কালীর কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন, শাপের অবসানে তিনি যেন বুদ্ধ-অবতার রামানন্দ ঘোষকে মর্ত্য হইতে স্বস্থানে ফিরাইয়া লইয়া যান :

বুদ্ধ কহে কালি রহিবারে নারি।
স্বধাম আমার দান দেহ শীঘ্র করি ॥

এই সমস্ত উক্তি হইতে দেখা যাইতেছে, বালসুলভ মনোভাবের অধিকারী 'ঘোষপুত্র' রামানন্দ নিজেকে যথার্থই বুদ্ধ-অবতার মনে করিতেন এবং কালিকার অভিশাপে তিনি মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়া ম্লেচ্ছ অধিকার হইতে দেশ উদ্ধার করিয়া জগন্নাথদেবের মহিমা বাড়াইতে আসিয়াছেন—ইহা তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। বৌদ্ধধর্ম, শাক্ত ভক্তি ও রামোপাসনা—এই তিনপ্রকার ধর্মীয় মনোভাব তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। তিনি বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধেও নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন না।

এই যে শরীর দেখ জলবিম্ব প্রায়।
জলেতে উপজি বিম্ব জলেতে মিশায় ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ শরীর জড়িত।
ভবভয় ত্রাণ হবে ভজ লঙ্কাজিত ॥

এখানে তিনি বৌদ্ধ নীতি-আদর্শের পটভূমিকায় রামচন্দ্রের ভজনা করিতে বলিয়াছেন। কখনও-বা কবি পঞ্চশক্তির উপাসনার কথাও বলিয়াছেন :

রাধা কালী লক্ষ্মী বাণী গঙ্গা গুণবতী।
পঞ্চশক্তি প্রকাশ করিব এই ক্ষিতি ॥

কবি রামভক্ত হইয়াও বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি ততটা অনুকূল ছিলেন না। একস্থানে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "বিমল বৈষ্ণবী পূজা জগতে টুটাইব।" অর্ধোন্মাদের মতো তিনি নিজেকে কখনও স্বয়ং বুদ্ধদেব, কখনও কালিকার সেবক, পঞ্চশক্তির প্রচারক, কখনও-বা শুধু রামভক্ত বলিয়াছেন। কবির ধর্মমতের এইরূপ বিশৃঙ্খলার শেষ পরিণাম—নৈরাশ্যযন্ত্রণা ও ব্যর্থতার পীড়ন। কবি কেন যে হঠাৎ বুদ্ধ-অবতার বনিয়া গেলেন তাহা বুঝা

যাইতেছে না—দারুব্রহ্মের জন্য তিনি স্বর্গমর্ত্যপাতাল তোলপাড় করিয়াছেন, কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছাইয়া তিনি দেখিলেন তাঁহার অবতার গ্রহণ নিষ্ফল হইয়াছে। এই ব্যর্থতার বেদনা কয়েকস্থলে বেশ আন্তরিক হইয়াছে :

ক্ষুধায় না মিলে অন্ন পিয়াসে না পানি।
মিথ্যা ধন্ধে গেল মোর দিবসরজনী॥
*　　*　　*
দারা ছাড়ি পাপভরা ভরিনু অপার।
অস্থিচর্ম্মসার কৈলা অভিশাপ তার॥
দারা সুত সুতা আর বন্ধু কেহ নাই।
অবশেষে কি হইবে নাহি মিলে ঠাঁই॥
কাল হইল কণ্টক কল্পনা রৈল মনে।
না পুরিল চিত্ত-আশা কবে কোন জনে॥

এখানে কবি অকপটে নিজ জীবনাদর্শের ব্যর্থতা স্বীকার করিয়াছেন। জগন্নাথের পূজা করিয়া তাঁহার কোন লাভ হয় নাই। সুতরাং কাঠের ঠাকুর পূজিয়া কি লাভ? তাই তিনি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করিয়াছেন :

দারুব্রহ্মে সেবা করি জেরবার হৈল।
বৃথাকাষ্ঠ সেবি কাল কাটা নহে ভাল॥
বস্তুহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ।
নিজ কষ্ট দার আর লোকমধ্যে লাজ॥

বড়ই কৌতুকের বিষয়, এই আধুনিক 'সম্বুদ্ধ' ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই, 'দারুভূতো মুরারি'র পূজা করিয়াছিলেন ঐহিক সুখের কামনায়। জগন্নাথ পূজা করিয়াও যখন তাঁহার দুঃখ ঘুচিল না, তখন তিনি কাষ্ঠ-বিগ্রহের সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। দেবোপাসনা সম্বন্ধে তাঁহার এই pragmatic মনোভাব একটু অদ্ভুত মনে হইতেছে। ঈশ্বর সম্পর্কে এই ধরনের নাস্তিক্যবাদ ও সংশয়ী মনোভাব আধুনিক কালের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ভারতচন্দ্র দেবদেবীকে লইয়া রঙ্গকৌতুক করিলেও দেবসত্তায় তাঁহার অবিশ্বাস বা সংশয় ছিল না। সেদিক হইতে রামানন্দ ঘোষ যথার্থ আধুনিক যুগের সূত্রপাত করেন। শুনা যায় তাঁহার কিছু শিষ্য ছিল। মনে হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলাদেশে বৌদ্ধ প্রভাব গোপনে প্রবাহিত হইত। তাহা না হইলে কবি নিজেকে বুদ্ধ-

অবতার বলিবেন কেন? যাহা হউক রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ কাব্যাংশে অকিঞ্চিৎকর হইলেও তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনকথা ও বিচিত্র অভিমতের জন্য তাঁহার সম্বন্ধে এখানে দুই-এক কথা বলিতে হইল।

রামায়ণরচনাকার হিসাবে আর এক রামানন্দের নাম পাওয়া যাইতেছে। ১৩৫০ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রাচীন পুঁথির বিবরণীতে রামানন্দ যতির রামায়ণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় মুদ্রিত হয়।[৩৯] ১৯৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই পুঁথিতে (সা. প. পুঁথি সংখ্যা-৫০) রামানন্দ যতির ভণিতা আছে। ইঁহার বহু শিষ্য ছিল—তাঁহার রামায়ণে সেইরূপ উল্লেখ আছে। এই রামায়ণ খুব সম্ভব গান করিবার জন্য রচিত হইয়াছিল। ১৬৮৪ শকাব্দে (১৭৬২ খ্রীঃ অঃ) ইহা রচিত হয়—ইহাও অদ্ভুত রামায়ণের আদর্শে রচিত। কবির রচনা মধ্যম শ্রেণীর, উল্লেখযোগ্য সাহিত্যগুণ অতি অল্প। একটু দৃষ্টান্ত :

রামপদ মন নামে কাঁপে যম,
চিদানন্দ অবতার।
দেবমুনিভয় শাসিত হৃদয়
শ্রুব হইলা গুণাধার॥
মায়ারূপ ধরি রাবণ সংহরি
দিলা মুক্তি পদধাম।
অহল্যার শাপ নিবারিয়া তাপ
মোরে দয়া কর রাম॥

কবির শিষ্যগণ গুরুর বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। কবি যে সংস্কৃত সাহিত্য-দর্শনে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন তাহা রামায়ণের পুঁথি হইতে বুঝা যায়। তিনি অন্ততঃ চৌদ্দখানি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা করিয়াছিলেন।[৪০] ধর্মমতে তিনি রামায়েৎ বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে 'শচীসুতে'র সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন।

---

৩৯ সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় বলা হইয়াছে, "গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ। ১৯৫ পত্রে সম্পূর্ণ। গ্রন্থকার সুকবি ও কৃতবিদ্য ছিলেন।" (সা. প. প. ১৩০৫)

৪০ উক্ত রামায়ণে এই কবির রচিত অনেকগুলি টীকার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—গীতার টীকা, শান্তিশতক টীকা, ষটচক্রটীকা, মোহমুদ্গরটীকা, গায়ত্রীর টীকা, কুণ্ডতত্ত্ব-প্রকাশিকা, তন্ত্রসার, জ্ঞানভৈরব, অদ্বৈতরহস্য, জ্ঞানাবলী, অধ্যাত্মসার, যোগসারাবলী, অত্যাচার দীধিতি প্রভৃতি।

রামানন্দ যতি একখানি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যও লিখিয়াছিলেন। তাহার বিশেষ কোন কাব্যগুণ না থাকিলেও দুই এক স্থল একটু উল্লেখযোগ্য। কাব্যের প্রারম্ভে তিনি তীক্ষ্ণ ভাষায় কবিকঙ্কণের কাব্যের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, মুকুন্দরাম বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন না, তাঁহার চণ্ডীমঙ্গলে অনেক ভুলভ্রান্তি আছে। মুকুন্দরামের প্রতি দেবীর প্রত্যাদেশ রামানন্দ হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। এই কবি মুকুন্দ-রামের দোষক্রটি হইতে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যকে রক্ষা করিবার জন্যই নূতন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি নিজেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন :

এত দোষ উদ্ধারিতে লোকের চৈতন্য দিতে
চণ্ডী রচে রামানন্দ যতী ॥
অনেকের উপরোধ কেহ না করিত ক্রোধ
অনেক শিষ্যের অনুমতি ॥

ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় এই দুই রামানন্দ এক ব্যক্তি কি না তাহা লইয়া প্রশ্ন তুলিয়াছেন। দুই জনের রচনা, জগন্নাথ সেবা, পুরীধামে বাস এবং কালীভক্তি বিচার করিলে তাঁহাদিগকে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রামায়ণ দুইখানি এক ব্যক্তির রচনা নহে। সুতরাং দুইজনকে আপাতত দুইজন পৃথক কবি বলিয়া গ্রহণ করা গেল।

উল্লিখিত চারিজন কবিকে ছাড়িয়া দিলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর বিশেষ কোন কবি পুরা রামায়ণের অনুবাদে অগ্রসর হন নাই, অধিকাংশ স্থলে দুই একটি বিচ্ছিন্ন কাণ্ড বা পালার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কথকতার জন্যই শ্রোতৃসমাজে রামায়ণের এত চাহিদা ছিল, এবং কথকগণ জনরুচির দিকে চাহিয়া রামায়ণের বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা পালা ব্যবহার করিতেন। যাঁহাদের অল্পস্বল্প কবিত্ব ছিল তাঁহারা এই প্রয়োজনের দিকে চাহিয়াই রামায়ণের পালা লিখিতেন। অঙ্গদ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ প্রভৃতির কাল্পনিক রায়বার অবলম্বনে অনেকগুলি রায়বার পালা পাওয়া গিয়াছে। রাজসভায় উপস্থিত হইয়া দূতের অনুযোগ-অভিযোগ এবং তৎসহ রঙ্গরস প্রভৃতি ব্যাপার ধামালি জাতীয় স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দে এবং অশিষ্ট ভাষায় বর্ণিত এই রায়বারের পুঁথিগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগোপযোগী হইয়াছিল। সমাজের

লঘুচপল গ্রাম্য মনোভাব ও নাগরিক তির্যকতা—উভয়ই রায়বারের রঙ্গরসে ফুটিয়াছে। কেহ কেহ 'রঙের উপর রসান চড়াইবার' জন্য রায়বারের গালিতে হিন্দী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ফকিররাম কবিভূষণ, খোশাল শর্মা, রামনারায়ণ প্রভৃতি কবিদের রায়বারে হিন্দী শব্দের ছড়াছড়ি। উদাহরণস্বরূপ ফকিররাম কবিভূষণের অঙ্গদের রায়বার হইতে অল্প উদ্ধৃত হইতেছে। অঙ্গদ মেঘনাদকে 'বাপ তুলিয়া' যথেচ্ছা গালি দিতেছে :

কহত মেঘনাদ কমজাত রাভণ কি বেটে।
কোন দাউ তেরে কাহা গিআথা দিগবিজই রণ ভেটে ॥
কোন দাউ তেরে নহুড়িকা ঝুঠা খাআথা হে পাতালে।
কোন দাউ তেরে বান্ধা থা অর্জ্জুনকো ঘোটকশালে ॥
কোন দাউ তেরে দছিন জাকে জুঝা জমকি সাথে।
কোন দাউ তেরে মান্ধাতার রাজমে ঘাস কিআথা দাঁতে ॥
*   *   *   *
কোন দাউ তেরে বধু সাথে ধরকে আসক কিআ।
কোন দাউকা বহিনি তেরা দৈত্য মধু হরলিআ ॥
এতে বাত সুনরে কমজাত হেঅ তেরা মনমে।
কোন দাউ তেরে জব্দ হুআথা জামদগ্নিকা জুমে ॥
একে ২ কহা তেরে সব দাউকি বাত।
উএ সব মেরে কাম নেহি তেরে কাহা জুগিআ তাত ॥

অঙ্গদের রায়বারের অনুকরণে বিভীষণ, শূর্পণখা, কালনেমি, কুম্ভকর্ণ—সকলেরই রায়বার রচিত হইয়াছিল, কিছু কিছু পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে। ইহার অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্দীর অক্ষম রচনা। এই শতাব্দীতে বৈষ্ণব-পদাবলীর আদর্শে কিছু রামপদাবলীও রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে দু'একটির কাব্যমূল্য ও আন্তরিকতা মন্দ নহে। যথা—সীতার বিলাপ :

রাম মোর না কৈল উদ্দেশ।
কাননিবাসী হৈল   রাক্ষসের হাথে মৈল
ভাবিতে পরাণ হৈল শেষ ॥
যদি না পাইব রঘুবরে।
সাগরে মরিব গিয়া   রামপদ ধিয়াইয়া
এই সত্য কহিনু প্রভুরে ॥

শক্তিশেলে মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণের প্রতি রামের শোক :

উঠ উঠ লক্ষ্মণ ধানুকি।
কেবা করে রাজ্য পাট রথ গজ বাজিঠাট
কি করিবে বনিতা জানকি॥
মোর রাজ্যে হব রাজা হরসিত যত প্রজা
নবদণ্ড ধরাব তোমায়।
আসি ভরতের মাতা পণ্ড হৈল তথা
জটা দিয়া বনেতে পাঠায়॥
এ হেন সোনার গায় শোণিতের ধারা তায়
কেমনে দেখিয়া জীব আমি।
এতদিনে বিধি বাম লুকালে জানকি নাম
বিদেশে ছাড়িয়া গেলা তুমি॥

রামায়ণ রচনার এই আদর্শ উনবিংশ শতাব্দীতেও পরিত্যক্ত হয় নাই। কেহ কেহ পুরাতন পন্থা অনুসরণ করিয়া (রঘুনন্দন গোস্বামী, রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়), কেহ-বা আধুনিক পন্থা অবলম্বনে (রাজকৃষ্ণ রায়) রামায়ণের ভাবানুবাদের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে পরবর্তী খণ্ডে আলোচনা করা যাইবে।

মহাভারতের অনুবাদ॥

অষ্টাদশ শতকে মহাভারতের বহু বিচ্ছিন্ন পর্বের পুঁথি পাওয়া গেলেও পুরা মহাভারতে কেহ হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না—সেরূপ 'দম' কাহারও ছিল না। কাশীরামের নামে প্রচারিত মহাভারতের পর্বগুলির বহু নকল হইয়াছিল এবং সেইগুলিই অধিকাংশ স্থলে পাঠক-শ্রোতার মনোরঞ্জন করিত। কিন্তু তাহা ছাড়াও মহাভারতের বিভিন্ন পর্বের ও পালার পুঁথি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও নিতান্ত মন্দ পাওয়া যায় নাই। ইহার কিছু কিছু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকেও রচিত হইয়া থাকিবে। নিম্নে এইরূপ কয়েকজন কবির নাম উল্লেখ করা যাইতেছে:—

(১) দ্বৈপায়ন দাস (অশ্বমেধ পর্ব), (২) নন্দরাম (দ্রোণপর্বাদি), (৩) দ্বিজ শ্রীনাথ, (৪) কৃষ্ণানন্দ বসু (শান্তি পর্ব), (৫) দ্বিজ কৃষ্ণরাম (অশ্বমেধ পর্ব), (৬) অনন্ত মিশ্র (অশ্বমেধ পর্ব), (৭) দ্বিজ গোবর্ধন (গদা পর্ব), (৮) রামলোচন (নারী পর্ব), (৯) রাজারাম দত্ত (দণ্ডী পর্ব), (১০)

রাজেন্দ্র দাস (শকুন্তলার উপাখ্যান), (১১) গঙ্গাদাস সেন (সমগ্র মহাভারত), (১২) কবিচন্দ্র।

এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন পালার পুঁথিতে অনেক সময় সন-তারিখ থাকিত না, দুই-একটিতে আবার নকলের তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে। এইজন্য মূল পুঁথির রচনাকাল নির্ধারণ করা দুরূহ। তবে অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা, অন্ততঃ ভাষা ও রচনারীতি হইতে তাহাই মনে হয়। বিচ্ছিন্ন পালা হিসাবে শকুন্তলা ও দাতাকর্ণের কাহিনী খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। কারণ এই পালার অনেকগুলি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কবিচন্দ্রের দাতা কর্ণের পালা এবং রাজেন্দ্র দাসের শকুন্তলার উপাখ্যান কিছু উল্লেখযোগ্য। অবশ্য দাতা কর্ণের পালা মূল মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত নহে, খুব সম্ভব ধর্মমঙ্গলের লুইচন্দ্র পালার প্রভাবে পরিকল্পিত।[৪১]

নন্দরাম দাসের ভণিতাযুক্ত উদ্যোগ পর্ব, দ্রোণ পর্ব ও কর্ণ পর্বের কয়েকখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কবি পুরা মহাভারত লিখিয়াছিলেন কিনা বুঝা যাইতেছে না। কবি সম্ভবতঃ কাশীরামের ভ্রাতুষ্পুত্র, কাশীরামের মহাভারতের অনেকটা ইঁহার রচনা। বিশেষতঃ ইঁহার কর্ণ পর্ব ও দ্রোণ পর্ব কাশীরাম দাসের সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলিয়া যায়। কেবল উদ্যোগ পর্বটি ইঁহার নিজস্ব রচনা হইতে পারে—কারণ কাশীরামের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য নাই। ইঁহার ভাষাও প্রায় কাশীরামের অনুরূপ, সংস্কৃত প্রভাবিত, অলঙ্কৃত ও মার্জিত।

দ্বৈপায়ন দাস ভণিতাযুক্ত এক কবি নিজেকে 'কাশীর নন্দন' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন (ক. বি. পুঁথি-১৩৬২)। ইঁহার রচিত বনপর্ব, গদাপর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্বের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। অনেক সময় পিতার রচনার সঙ্গে পুত্রের রচনাংশ মিলিয়া গিয়াছে। দ্বিজ শ্রীনাথের দুই একটি পর্ব পাওয়া গেলেও কেহ কেহ অনুমান করেন, কবি পুরা মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন।[৪২] কবি কুচবিহাররাজের আজ্ঞায় মহাভারত রচনায় অগ্রসর হন। ইঁহার পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাও কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আর এক কবি দ্বিজ গোবর্ধন ১৬৩২ শকে (১৭১০ খ্রীঃ)

৪১ ডঃ সুকুমার সেন—পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৪২০

৪২ মণীন্দ্রমোহন বসু—বাংলা সাহিত্য, ২য়, পৃ. ১০৯

গদাপর্ব সমাপ্ত করেন—ইহা অনেকটা কবির স্বাধীন রচনা। এই যুগে প্রায় কেহই কাশীরামের প্রভাব ছাড়াইতে পারেন নাই। কিন্তু কবি এদিক দিয়া যথাসম্ভব মৌলিকতার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রামলোচন নামে আর এক কবি তো পুরাপুরি কাশীরামকে (স্ত্রীপর্ব) অনুকরণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ জৈমিনি ভারত অবলম্বনেও অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন। দ্বিজ কৃষ্ণরায় ও অনন্তমিশ্রের দুইখানি অশ্বমেধ পর্বের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। উর্বশী উদ্ধার বা দণ্ডীপর্বের চমকপ্রদ কাহিনীর জন্যও অনেকে শুধু এই পর্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

গঙ্গাদাস সেনের মহাভারতের দুই একটি পর্ব পাওয়া গেলেও তিনি বোধহয় সমস্ত পর্বেরই অনুবাদ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি একস্থলে বলিয়াছেন :

গঙ্গাদাস সেন কবি রচিলেক সর্ব্ব।
শ্লোক ভাঙ্গি রচিলেক অষ্টাদশ পর্ব্ব ॥

তিনি বিচিত্র প্রতিভার কবি ছিলেন। তাঁহার ভণিতায় রামায়ণ ও মনসার পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে। তিনি পিতা ষষ্ঠীবরের প্রতিভার অনেকটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের আদেশে কবিচন্দ্র মহাভারতের অনেকটা রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার গোবিন্দমঙ্গল একদা বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল।

মহাভারতের এই সমস্ত অনুবাদ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। কারণ বিচ্ছিন্ন পর্বের অনুবাদগুলিতে প্রায় কোথাও প্রতিভার চিহ্ন ফুটে নাই। অবশ্য দুই-একজনের রচনারীতিতে কিছু কিছু প্রশংসনীয় গুণ লক্ষ্য করা যাইবে। কিন্তু সমগ্র মহাভারতকে আয়ত্ত করিবার মতো ক্ষমতা খুব কম কবিরই ছিল। কাশীরামের আদর্শ অবলম্বনে ইঁহাদের প্রায় সকলেই মহাভারতের দুই-এক পর্ব ফাঁদিয়াছিলেন, কেহ-বা কাশীরামের বহু অংশ আত্মসাৎ করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। যাহা হউক, মহাভারত অনুবাদের রীতি আধুনিক যুগেও হ্রাস পায় নাই—তবে তাহার বাহন বদল হইয়াছে। পদ্যের স্থলে গদ্যই হইয়াছে অনুবাদের ভাষা।

ভাগবত-অনুসারী রচনা ॥

যে-কোন কারণেই হোক, মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে ভাগবত শাখায়

প্রথমশ্রেণীর কবিপ্রতিভার বড় একটা সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না—যদিও শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজে ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও এই একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই সম্প্রদায়গত চৈতন্যধর্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মরূপে সমগ্র দেশেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভাগবত-অনুসারী পূর্ণাঙ্গ রচনা একাধিক পাওয়া গিয়াছে; ভাগবত বা অন্য পুরাণের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক আখ্যানের অনুবাদও কিছু কম হয় নাই। তন্মধ্যে কয়েকজনের রচনায় কিছু কিছু কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নরহরিদাস, অচ্যুতদাস, কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী, দ্বিজ মাধবেন্দ্র, অভিরাম দাস, বলরাম দাস, দ্বিজ রামেশ্বর,—ইঁহারা সকলেই ভাগবতকেন্দ্রিক পুরা কাব্যই লিখিয়াছিলেন—যদিও সকলের পুরা কাব্য পাওয়া যায় নাই; ইঁহাদের মধ্যে শঙ্কর কবিচন্দ্র (গোবিন্দমঙ্গল বা ভাগবতামৃত), বলরাম দাস (শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল), দ্বিজ মাধবেন্দ্র (ভাগবতসার), দ্বিজ রমানাথ (শ্রীকৃষ্ণবিজয়) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা মূল ভাগবতের কৃষ্ণলীলা-সংক্রান্ত অধ্যায়গুলি সংক্ষেপে রচনা করিয়াছেন, আক্ষরিক অনুবাদ তাঁহাদের কাহারও উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহারা মূল ভাগবতের বহির্ভূত পালাও (যেমন দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড) নিজ নিজ কাব্যে গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্কর কবিচন্দ্র, দ্বিজ রমানাথ, বলরাম দাস—ইঁহাদের ভাগবত-অনুসারী কাব্যে অনেক কবিকল্পিত আখ্যানও স্থানলাভ করিয়াছে। দ্বিজ রমানাথের রচনারীতি নিরাভরণ হইয়াও সাদা কথায় পাঠকের মন জয় করিয়া লইয়াছে। যেমন—কৃষ্ণবলরাম মথুরাযাত্রার উদ্যোগ করিলে যশোদার বিলাপ :

অভাগিনী মায়ে ছাড়ি যাবে কোথাকারে।
বুঝিলাম কাঙ্গালিনী করিবে আমারে॥
হিয়ার পুতলী তুমি নয়নের তারা।
তিল আধ না দেখিলে জীয়ন্তে হই মরা॥
হাপুতীর বাছা তুমি আন্ধালার নড়ি।
নিধনের ধন তুমি কৃপণের কড়ি॥
না যাহ না যাহ বাছা জননী ছাড়িয়া।
তোমা না দেখিলে বুক যায় বিদরিয়া॥

মাতৃহৃদয়ের এরূপ আন্তরিক বেদনা বৈষ্ণব পদাবলীতেও খুব সুলভ

নহে। নরহরি দাসের ভাগবতে প্রাকৃতিক চিত্রের বর্ণনাও কিছু প্রশংসা দাবি করিতে পারে :

রবিকর তাপেতে তাপিত অষ্টমাস।
তাপ দূরে গেল হৈল মেঘের প্রকাশ॥
ঘন ঘন সঘনেতে মেঘের গর্জন।
দমকে দামিনী ঝুরু ঝুরু বরিষণ॥
ধরাধর বরিষণে ধরা ভেল সুখী।
সর্বদা সন্তোষে নৃত্য করে সব শিখী॥

বর্ষার বর্ণনা হিসাবে ইহা মন্দ হয় নাই।

কেহ কেহ আবার ভাগবতের কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের আদর্শে দানলীলা-নৌকালীলার বেশ জাঁকালো-রকমের বর্ণনা দিয়াছেন। কবিশেখরের শুধু দানলীলার একখানি পুঁথি (কলি. বিশ্ব. পুঁথি—৯৬৩) পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে প্রায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লীলাই অনুসৃত হইয়াছে। কৃষ্ণ-রাধাবিষয়ক লৌকিক লীলা কোন কোন কবিকে এমন প্রভাবিত করিয়াছিল যে, তাঁহারা ভাগবতের নানা পালা বিস্মৃত হইলেও বড়াইবুড়ী-রাধাকৃষ্ণ ঘটিত অমার্জিত গ্রাম্যকাহিনী সালঙ্কারে ব্যাখ্যানে অগ্রসর হইয়াছেন।

ভাগবতের দুই-একপালা লইয়া রচিত কয়েকখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে উদ্ধবসংবাদ উল্লেখযোগ্য। নরসিংহ দাস (মিশ্র), শিবরাম, পঞ্চানন—ইঁহারা সকলেই ভাগবতের দশক স্কন্ধে (৪৬-৪৭ অধ্যায়) বর্ণিত কৃষ্ণকর্তৃক উদ্ধবকে বৃন্দাবনে দূত করিয়া পাঠাইবার কাহিনী অবলম্বনে উদ্ধবসংবাদ রচনা করিয়াছিলেন। এই কবিগণ সকলেই অষ্টাদশ শতাব্দীর নহেন, কেহ কেহ কিছু পূর্ববর্তীও হইতে পারেন। ভাগবতের উদ্ধব-সংবাদের কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইঁহারা প্রায় স্বাধীনভাবে রচনা করিয়াছিলেন। রূপগোস্বামীর 'হংসদূত' অবলম্বনে নরসিংহ একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন (ক. বি. পুঁ.—৯৮৩)। তাঁহার মতে সংস্কৃত হংসদূত রূপগোস্বামীর নহে, দাসগোস্বামী অর্থাৎ রঘুনাথ দাস রচিত। ইহা অবশ্য ঠিক নহে—'হংসদূত' রূপগোস্বামীরই রচনা। 'রাধিকামঙ্গল' নামে রাধাকৃষ্ণ-সংক্রান্ত কিছু কিছু পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে উদ্ধবানন্দ, দ্বিজ কবিচন্দ্র, কৃষ্ণরামদাস, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণরাম দত্ত—ইঁহারা সংক্ষেপে রাধিকার জন্ম হইতে কাহিনী

শুরু করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে ভাগবতের সম্পর্ক অল্প, কবিত্বের সম্পর্ক আরও অল্প। ইহা ছাড়াও পদ্মপুরাণের অন্তর্গত 'ক্রিয়াযোগসার'-এর আখ্যান অবলম্বনে কেহ কেহ আধা-রোমান্টিক ধরনের তত্ত্বকথা সংবলিত কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। তালধ্বজা নগরীর রাজা বিক্রমের পুত্র মাধবের সঙ্গে প্লক্ষদ্বীপের রাজকুমারী সুলোচনার মিলনকথাই ইহার মূল কাহিনী। পুরাণের কথা হইলেও ইহাতে বিশুদ্ধ রোমান্টিক প্রেম ও দুঃসাহসের কাহিনী স্থান পাইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিরা এই আখ্যান অবলম্বনে দুইচারিখানি পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ পদ্মপুরাণের পাঁচ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ কাহিনীটিকে পুরাপুরি অনুকরণ করিয়াছেন, কেহ-বা প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন। ইহার সমাপ্তিতে নারায়ণ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইলেও আধুনিক পাঠকের নিকট ইহার মানবিক আবেদনই অধিকতর চিত্তাকর্ষী মনে হইবে—যদিও এই মধ্যম-শ্রেণীর কবিদের বিশেষ কোন কবিপ্রতিভা ছিল না।

সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী ধরিয়াই ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর সমাজে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পুরাণ অনুবাদের ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বরাহপুরাণ প্রভৃতির অন্তর্গত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কোন কোন পালা শিক্ষিত সমাজে বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। কোন কোন কবি সংযত পরিচ্ছন্ন রচনা-রীতিও আয়ত্ত করিয়াছিলেন—এরূপ কবির সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু এইরূপ পুঁথিতে যথার্থ প্রতিভাশালী কবির সাক্ষাৎ দুর্লভ। সমাজের নানা স্তরে, ভূস্বামী সমাজে সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব বেশ স্থায়ী হইয়াছিল। সাহিত্য ও সমাজের দিক হইতে শুধু এইটুকু প্রণিধানযোগ্য। বস্তুতঃ অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে পণ্ডিতসমাজের দ্বারা বিভিন্ন জমিদারবংশ সংস্কৃত পুরাণের বাংলা অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কুচবিহার, ত্রিপুরা ও বর্ধমান রাজাদের উৎসাহদান সাহিত্যের ইতিহাসে স্বীকৃতি লাভের যোগ্য। পরবর্তী কালে 'বঙ্গবাসী' মুদ্রাযন্ত্র হইতে সুলভ মূল্যে যাবতীয় পুরাণ সানুবাদ প্রকাশিত হইয়া গোটা বাঙলা দেশেই প্রচার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারও প্রায় দুই শতাব্দী পূর্ব হইতে বাঙলার কোন কোন বিদ্যোৎসাহী ও ধর্মানুরাগী ভূস্বামী ও সামন্তগণ বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব পুরাণের অনুবাদ করাইয়া উচ্চসমাজে পুরাণ প্রচারের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত অনুবাদ

অধিকাংশ স্থলে রাজসভার পণ্ডিতের দ্বারা সমাধা হইত বলিয়া ইহাতে লৌকিক ভাবের অবতারণার অবকাশ ছিল না। অনুবাদক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ, কবিত্বের দিকে ততটা না হইলেও, অনুবাদে মূলের বিশুদ্ধি রাখিবার চেষ্টা করিতেন। অবশ্য এই ধরনের রচনা কিছু পাণ্ডিত্যপূর্ণ, কেতাবী ও কৃত্রিম হইতে বাধ্য। কিন্তু উচ্চতর সমাজে বাংলা ভাষার মারফতে পৌরাণিক ভাব ও সংস্কার বেশ দৃঢ়মূল হইতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। পরবর্তী কালে উচ্চতর সমাজে ইংরাজী শিক্ষা-সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিলে, একদল কালাপাহাড়ী যুবসম্প্রদায় ('ইয়ং বেঙ্গল') এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায় যে-কোন পুরাণ গ্রন্থের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে আবার নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে পুরাণের অনুশীলন আরম্ভ হয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে অধিকাংশ স্থলে বাছিয়া বাছিয়া কৃষ্ণলীলাবিষয়ক বৈষ্ণবপুরাণের দিকেই অধিক দৃষ্টি পড়িয়াছিল, শাক্তপুরাণের অনুবাদ অতি বিরল। সমাজে বৈষ্ণবপ্রভাবের প্রাধান্যই ইহার কারণ। যাহা হউক, এই সমস্ত পুরাণ অনুবাদ প্রায় কোন দিক দিয়াই কাব্যগুণান্বিত হয় নাই। কারণ অনুবাদক-গণের পাণ্ডিত্য থাকিলেও বড় একটা কবিত্ব ছিল না। সুতরাং এই সমস্ত পুঁথিপত্র গবেষকদের আনন্দ বর্ধন করিলেও সাধারণ পাঠক ইহা হইতে বিশেষ কোন মানসিক তৃপ্তি পাইবেন না। শুধু যুগমানসের স্বরূপ নির্ধারণের জন্যই এই পুরাণাশ্রয়ী রচনাগুলির কিঞ্চিৎ সার্থকতা—কাব্যগুণের মাপকাঠির দ্বারা ইহাদিগকে বিচার করিতে গেলে ইহাদের প্রতি অবিচার করাই হইবে।

৩

বৈ ষ্ণ ব সা হি ত্য

বাঙলা দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানাধরনের বৈষ্ণব সাহিত্য রচিত হইয়াছে। সমাজে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রভাব বৃদ্ধির ফলে বাঙালী হিন্দুর একটা বড় অংশ বৈষ্ণবভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছিল। হয়ত কুলধর্মের দিক দিয়া কেহ কেহ শাক্তমতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রবণতার ফলে অনেকে বৈষ্ণব আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শুধু বাঙলা নহে, বাঙলার প্রান্তীয় অঞ্চলেও এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমত, দার্শনিকতা ও আচার-আচরণ

দৃঢ়মূল হইয়াছিল। বিশেষ বিশেষ ভূস্বামিবংশ বৈষ্ণব আচার্যদের শ্রদ্ধা করিতেন, কোন কোন জমিদার বৈষ্ণব ধর্মগুরুর নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষাও লইয়াছিলেন। সমাজে এইরূপ প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় ধর্মসংস্থাপক সাহিত্যেরও প্রয়োজন অনুভূত হইল। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বহু বৈষ্ণব কবি ও তাত্ত্বিক বাংলা ভাষায় নানা শ্রেণীর বৈষ্ণব সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন, পদ লিখিয়াছিলেন—অষ্টাদশ শতাব্দী বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্কলন ও সংগ্রহের যুগ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। গত তিন শতাব্দী (১৫শ-১৭শ) ধরিয়া যে সমস্ত বৈষ্ণবপদ রচিত হইয়াছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্কলকগণ তাহা হইতে নির্বাচিত করিয়া, টীকাটিপ্পনীসহ যে-সমস্ত পদসঙ্কলনগ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য বাংলা সাহিত্যের যে-কোন পাঠক কৃতজ্ঞতা বোধ করিবেন। এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিভিন্ন শ্রেণীর বৈষ্ণব সাহিত্যের কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। তবে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন—এই শতাব্দীতে বৈষ্ণব গ্রন্থের সংখ্যাপ্রাচুর্য থাকিলেও তাহার গুণগত উৎকর্ষ, সজীবতা ও মৌলিকতা যে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

মহাপুরুষ-জীবনী ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রধান প্রধান আচার্যের তিরোধানের ফলে মহাপুরুষ জীবনী বা আচার্যদের চরিতগ্রন্থের সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়া গিয়াছিল। দুই একজন আচার্য সম্বন্ধে যে জীবনীকাব্য রচিত হইতেছিল তাহারও গুণগত উৎকর্ষ এমন কিছু উচ্চাঙ্গের নহে। এই শতাব্দীতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-জীবনকাব্যের প্রচুর নকল হইয়াছিল; সেইগুলি বৈষ্ণবসমাজে নিত্য পঠিত-অনুশীলিত হইত। অবৈষ্ণব সমাজও তাহাতে যোগ দিত এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোন আচার্যকে অবলম্বন করিয়া মৌলিক কোন জীবনীগ্রন্থের বিশেষ সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তবু যে দুই একখানি পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এখানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রেমদাস—এই শতাব্দীতে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে যে দুই-একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এমন কোন নূতন কথা নাই। তবে চৈতন্য সম্প্রদায়

ও বৈষ্ণব সমাজ সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন তথ্য আছে। কবি প্রেমদাস এই বিষয়ে নূতন আলোক সম্পাত করিয়াছেন। প্রেমদাসের আসল নাম পুরুষোত্তম মিশ্র। তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী' এবং 'বংশী শিক্ষা'য় চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব সমাজ সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ আছে। কবির বৃদ্ধ প্রপিতামহ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। প্রেমদাস যোল বৎসর বয়সে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করেন। শুনা যায় তিনি বৃন্দাবনের গোবিন্দ জিউর মন্দিরের পাচক ছিলেন। কেহ-বা বলেন, পাচক নহে, উক্ত মন্দিরের তিনি পূজারী ছিলেন।[৪৩] ইঁহার প্রথম গ্রন্থ 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়কৌমুদী' কবি কর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' শীর্ষক চৈতন্য-জীবন বিষয়ক সংস্কৃত রূপক নাটকের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। অনুবাদের রচনাকাল সম্বন্ধে কবি নিজেই এইভাবে সন তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন :

চৌদ্দশত সাত শকে নবদ্বীপে নরলোকে
গৌরহরি আবির্ভাব হৈল।
চৌদ্দশত চোরনুট শক যবে গ্রন্থ এই
মোর মুখে প্রকট হৈল ॥
কর্ণপুর ইহা বলি শ্রীচৈতন্য নমস্কারি
নাটক করিল সমাপন।
ষোল শত চৌত্রিশ শকে লৌকিক ভাষাতে মুখে
প্রেমদাস করিল লিখন ॥

অর্থাৎ ১৪০৭ শকে (১৪৮৪-১৪৮৫ খ্রীঃ অঃ) মহাপ্রভুর আবির্ভাব, ১৪৯৪ শকে (১৫৭২ খ্রীঃ অঃ) কবি কর্ণপূর কর্তৃক 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক রচনা এবং ১৬৩৪ শকে (১৭১২ খ্রীঃ অঃ) প্রেমদাস কর্তৃক ইহার বঙ্গানুবাদ রচনা—উক্ত ত্রিপদী হইতে এইরূপ সঙ্কেত পাওয়া যাইতেছে। কর্ণপূর প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণমিশ্রের রূপক নাটকের ('প্রবোধচন্দ্রোদয়') আদর্শ অবলম্বনে সংস্কৃতে 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামীয় রূপক নাটক রচনা করেন। কবি প্রেমদাস সরল পয়ার ত্রিপদাতে সেই নাটকীয় কাহিনীকে বিবৃত করেন। প্রেমদাসের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী' নাটক নহে—আখ্যান-কাব্য। কবি মূল নাটকের কিছু কিছু অংশ সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেশন করিয়াছেন, কোথাও-বা একটু-আধটু নূতন কথা জুড়িয়া দিয়াছেন। আবেগের স্থলে বা করুণ রসের স্থলে

৪৩ পদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫০

তিনি মূল ছাড়িয়া একটু অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে সে সংবাদ শুনিয়া শচীমাতার বিলাপ কবি কর্ণপূরের মূল নাটক অপেক্ষা অনেক বেশী আন্তরিক হইয়াছে। যথা :

মোর কোল শূন্য করি কোথা গেল গৌরহরি
আর নাহি পাব দরশন॥
তপ্ত মোর বক্ষস্থল কে করিবে সুশীতল
কার মুখে করিব চুম্বন॥
বড় অভাগিনী আমি যদি না জানিতুঁ তুমি
ছাড়ি যাবে অনাথ করিয়া।
বুকভরি কোলে নিতুঁ চাঁদমুখে চুম্ব দিতুঁ
নিরখিতুঁ নয়ন ভরিয়া॥

কর্ণপূর শচীমাতার দুঃখ খুব সংক্ষেপে সারিয়াছেন, প্রেমদাস একটু বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে চৈতন্যকাহিনী ও চৈতন্য-পরিকরবৃন্দের যে চিত্র আছে তাহা কর্ণপূরের নাটক হইতে পুরাপুরি সংগৃহীত হইয়াছে।

তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বংশীশিক্ষা'ও চৈতন্যতত্ত্ব ও চৈতন্যজীবনকথার আংশিক উপাদান হিসাবে গ্রহণযোগ্য। চৈতন্য-সমসাময়িক ও চৈতন্য-সহচর বংশীবদন বা বংশীদাস চট্টো। ইঁহার পিতার নাম ছকড়ি চট্টো। চৈতন্যদেব বংশীদাসকে গুহ্য রসতত্ত্ব ('রসরাজোপাসনা'—অর্থাৎ সহজিয়া তত্ত্বকথা) শিক্ষা দিতেছেন, এইভাবে ইহা রচিত হইয়াছে। বংশীবদন চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া বাঘনাপাড়ায় শ্রীপাট স্থাপন করেন। শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার দেখাশুনার ভার চৈতন্যদেব বংশীবদনের উপর অর্পণ করেন। বংশীবদন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে শ্রীচৈতন্যবিরহে অতি কাতর দেখিয়া চৈতন্যদেবের মূর্তি নির্মাণ করাইয়া পূজার ব্যবস্থা করেন। বংশীবদনের পুত্র চৈতন্যদাস, চৈতন্যদাসের পুত্র রামচন্দ্র বা রামাই এবং শচীনন্দন। জাহ্নবাদেবী রামচন্দ্রকে দীক্ষা দিয়া নিজের পালিতপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ইঁহাদের চেষ্টায় খড়দহ শান্তিপুরের মতোই বাঘনাপাড়া বিখ্যাত বৈষ্ণবকেন্দ্রে পরিণত হয়। যাহা হউক প্রেমদাস চারি উল্লাসে সমাপ্ত 'শ্রীশ্রীবংশী শিক্ষা' রচনা করেন "ষোলশত অষ্টবিংশ শকের গণনে", অর্থাৎ ১৬২৮ শক বা ১৭১৬ খ্রীঃ অব্দে। কবি এই গ্রন্থকে 'রসরাজ' বলিয়াছেন। চৈতন্যদেবই 'রসরাজ', তিনিই শ্রেষ্ঠ রসতত্ত্ব। তাই প্রেমদাস কাব্যারম্ভে চৈতন্যবন্দনায় বলিয়াছেন :

অভিন্ন রসরাজায় শ্রীশচীনন্দনায় চ
গুরবে ভক্তরূপায় চৈতন্যায় নমোনমঃ।

চৈতন্যদেব বংশীবদনকে 'রসরাজোপাসনা' বিষয়ে শিক্ষা দিতেছেন, এইভাবে পুঁথিটি আরম্ভ হইয়াছে। চৈতন্যদেব বংশীবদনকে প্রথম 'উল্লাসে' রসরাজ ও গোপীতত্ত্ব, দ্বিতীয় উল্লাসে শ্রীরাধিকাতত্ত্ব, তৃতীয় উল্লাসে রসতত্ত্ব এবং চতুর্থ উল্লাসে সখীসাধনা সম্পর্কে উপদেশ দিতেছেন—কবি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সর্বশেষ উল্লাসে (চতুর্থ) শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পর বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ, বংশীবদনের তিরোধান, বংশীদাসের পুত্র চৈতন্যদাস, চৈতন্যদাসের দুই পুত্র রামচন্দ্র ও শচীনন্দনের কথা, জাহ্নবাদেবী কর্তৃক রামচন্দ্রকে দীক্ষা দান, জাহ্নবাদেবীর সঙ্গে রামচন্দ্রের বৃন্দাবন যাত্রা প্রভৃতি বর্ণনায় পরবর্তী কালের চৈতন্যসম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু কিছু নূতন তথ্য আছে। রামচন্দ্রের তিরোধানে 'বংশীশিক্ষা' সমাপ্ত হইয়াছে।

এই পুস্তিকার দুই অংশ—একটিতে অনেকটা সহজিয়া ধরনের তত্ত্বকথা বর্ণিত হইয়াছে। আর একটিতে উত্তর-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণবসমাজে খড়দহ ও বাঘনাপাড়ার প্রভাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে। প্রেমদাস বলিতেছেন:

বহিরঙ্গভাবে হরেকৃষ্ণ রাম নাম।
প্রচারিল জগমাঝে গৌর গুণধাম॥
অন্তরঙ্গভাবে অন্তরঙ্গ ভক্তগণে।
রসরাজ উপাসনা করিল অর্পণে॥

কবি মূলতঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে তত্ত্বাদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই তত্ত্বদর্শনকে কবি সংক্ষেপে ও গূঢ়শব্দে 'রসরাজোপাসনা' নাম দিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে একটা গুহ্যপন্থী ভক্তিসাধনার কথা নানা আভাস ইঙ্গিতে পাওয়া যাইতেছে। সহজিয়া বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকেই মূল প্রেরণারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 'বংশীশিক্ষা'তেও বংশীবদনের প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ-সংক্রান্ত তথ্য প্রেমদাস চৈতন্যচরিতামৃত হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আংশিকভাবে রহস্যবাদী সহজিয়া সাধনার তত্ত্বকথাও সংমিশ্রিত করিয়াছেন।

কাহিনীর দিক দিয়া ইহার শেষাংশে একটি বিচিত্র ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। বংশীবদনের নাতি জাহ্নবাদেবীর শিষ্য রামচন্দ্রের মাহাত্ম্যে বাঘনাপাড়ার খ্যাতি বৃদ্ধি পায়। একদা রামদাস নামে বাঘনাপাড়া নিবাসী এক

ভক্ত খড়দহে নিত্যানন্দপুত্র বীরচন্দ্রকে (বীরভদ্র) প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন। বীরচন্দ্র রামদাসের মুখে রামচন্দ্রের মাহাত্ম্য ও বাঘনাপাড়ার গৌরব শুনিয়া অনুচর 'নাড়া' দিগকে রামচন্দ্রের অলৌকিক ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া আসিতে বলিলেন।

এতেক শুনিল যবে প্রভু বীরচন্দ্র।
নাড়া নাড়া নাড়া বলি ডাকে মন্দ মন্দ ॥

ডাকিবামাত্র তাঁহার অনুচর বারো শত নাড়া হাজির হইল। বীরচন্দ্র তাহাদের বলিয়াছিলেন—বাঘনাপাড়ায় এক অতিথিপরায়ণ পরম বৈষ্ণব (রামচন্দ্র) আছেন, তোমরা গিয়া তাঁহার অতিথিপরায়ণতা পরীক্ষা করিয়া আইস।

বীরচন্দ্র কহে সবে কর এক কাম।
ত্বরা করি যাহ যাঁহা বাঘ্নাপাড়া গ্রাম ॥
কোন জনা আসি করে বৈষ্ণব সেবন।
তোমরা যাইয়া তারে কর বিড়ম্বন ॥

তাঁহার কথামতো বারো শত নাড়া গভীর রাত্রিতে শ্রীপাট বাঘনাপাড়ায় হাজির হইয়া রামচন্দ্রকে বলিল, "ক্ষুধার্ত আজি যে মোরা করাও ভোজন।" বিপদে পড়িয়া রামচন্দ্র জাহ্নবাদেবীকে স্মরণ করিলেন—এবং দেবীর কৃপায় বারো শত নাড়াদিগকে পৌষমাসের রাত্রিতে তাহাদের ইচ্ছামত আম্রের ব্যঞ্জন রাঁধিয়া আহার করাইলেন। নাড়ারা পরিতুষ্ট হইয়া খড়দহে ফিরিয়া গিয়া বীরচন্দ্রকে এই সংবাদ জানাইল। তখন বীরচন্দ্র বুঝিলেন, এই রামচন্দ্র তাঁহার বিমাতা জাহ্নবাদেবীর পুত্রস্থানীয়। সুতরাং তিনি বীরচন্দ্রের এক প্রকার ভাই হইলেন। ইহার পর বীরচন্দ্র আর কি করিয়া চুপ করিয়া খড়দহে থাকিবেন? তিনি সদলবলে বাঘনাপাড়ায় উপস্থিত হইয়া ভ্রাতৃস্থানীয় রামচন্দ্রকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। অতঃপর এখানে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া দুইজনে গভীরভাবে রসতত্ত্ব আলোচনা ও আস্বাদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বীরচন্দ্র প্রায় চারিমাস শ্রীপাট বাঘনাপাড়ায় রামচন্দ্রের সাহচর্য লাভ করিয়া বাস করিয়াছিলেন।

এই ঘটনা হইতে দেখা যাইতেছে, বীরচন্দ্রের নিকট সর্বদা বারো শত নাড়া অবস্থান করিত এবং তাহারা তাঁহার নির্দেশানুসারেই চলিত। ইতিপূর্বে সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব সমাজ প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, বীরচন্দ্রের

সঙ্গে নাড়া অর্থাৎ মুণ্ডিত মস্তক সহজিয়াগণ অবস্থান করিত। ইহাদিগকে তিনি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন। ইহারা যে বৈষ্ণবসমাজে কিঞ্চিৎ ভীতির কারণ হইয়াছিল, তাহা উপর্যুক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে।

প্রেমদাস স্বল্প কথায় কবিরাজগোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' বর্ণিত তত্ত্বকথা ভালই ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

প্রেমের প্রথমাবস্থা ভাব নাম ধরে।
যাহাতে সাত্ত্বিকভাব অল্প ব্যক্ত করে॥
ভাবশব্দে রতি কহে রতিশব্দে ভাব।
পুরাণাদি মতে এই একার্থতা লাভ॥
রতি গাঢ় হৈলে হয় প্রেমের উদয়।
যাহা মানবের মাত্র প্রয়োজন হয়॥
* * *
প্রেমের অপর নাম পিরীতি কহয়।
প্রীতির অর্থ একান্ত অনুরাগ হয়॥
বিবেকহীনের যৈছে বিষয়ের প্রতি।
অবিচ্ছিন্না মতি রহে জানিহ সুমতি॥
তৈছে শুদ্ধ কৃষ্ণে অবিচ্ছিন্ন মতি যেই।
পিরীতি আখ্যান তার কহিলাম এই॥

এই ধরনের পুস্তিকা হইতে মনে হইতেছে, সপ্তদশ শতাব্দীতেই সহজিয়া মত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কোন কোন অংশে জনপ্রিয় হইতেছিল। শ্রীখণ্ডের সমাজে যেমন একপ্রকার 'নাগরীভাবের' সাধনা ও সাহিত্যে খানিকটা সহজিয়া প্রভাব পড়িয়াছিল, তেমনি বাঘনাপাড়ার কেন্দ্রে বংশীদাস ও তাঁহার পৌত্র রামচন্দ্রের (রামাই) নেতৃত্বে এইরূপ সহজিয়া সাধনা ('রসরাজ') বৈষ্ণব-সমাজে ছাড়পত্র পাইয়াছিল। সহজিয়া চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদেরও এই সময়ে বিশেষ প্রচার হইয়াছিল, কারণ এই ধরনের পুস্তিকায় তাঁহার অনেক রাগাত্মিকাপদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

অকিঞ্চন দাস—বাঘনাপাড়ার রামচন্দ্র গোস্বামী বা রামাইয়ের আর এক শিষ্য অকিঞ্চন দাস 'বিবর্তবিলাস' নামে এই শ্রেণীর একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। পাঁচটি বিলাসে সমাপ্ত এই কাব্যে বৈষ্ণবসমাজ, ব্যক্তি ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে এমন অনেক তথ্য আছে, যাহার ঐতিহাসিক

ইঙ্গিত উল্লেখযোগ্য। অকিঞ্চন দাস বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্বকথাই ব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্যাখ্যাত রাগানুগা ভক্তির পটভূমিকায় ইহাতে সহজিয়া চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অনেক গালগল্প স্থান পাইয়াছে। কবি যে কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন তাহা তিনি গোড়াতেই বলিয়া লইয়াছেন :

বিদ্যাহীন ভক্তিহীন হওত সন্তোষে।
চরিতামৃত অর্থ কিছু চরিত প্রকাশে॥
কবিরাজ গোসাঞের মহা কৌশল সামর্থ্য।
এক স্থানে উক্তি করেন আর স্থানে অর্থ॥
আমি করিঞে তারে অষ্টাঙ্গ হইঞা।
তাঁহার মনের অর্থ লিখি বাড়াইয়া॥

তবে কবি রাগানুগা ভক্তিসাধনাকে অনেক স্থলে বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্বের বেশ পরাইয়া দিয়াছেন। কবির বৈষ্ণবোচিত বিনয়োক্তি বেশ চমৎকার হইয়াছে :

বালকের দোষ কেহ না লইবে মনে।
নিজ দাস করি সবে রাখহ চরণে॥

কবি সাধনমার্গে ততটা সার্থক হইতে পারিতেছেন না বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন :

এ জন্মে না হইল মোর সাধনভজন।
পুনঃ জন্মে পাই যেন এ ধর্ম্মরতন॥
কোটী জন্ম হয় যদি ভাগ্য করি মানি।
এক জন্মের কর্ম্ম নহে সাধুমুখে শুনি॥
যতবার জন্ম পাই ভারতভূমিতে।
ততবার পাই ধর্ম্ম কৈশোর কালেতে॥

সহজিয়া ও রাগানুগা সাধনাকে কবি 'বিবর্তত্ত্ব' বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি এই ভাবে 'বিবর্ততত্ত্ব' ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

এই কহিল স্থায়ী স্থিতি বিলাস নির্ধার।
সাধুসঙ্গে জানি সব বস্তু বিচার॥
সাধুসঙ্গ বিনে বস্তু কেহ বুঝিতে নারিবে।
বর্ত্ত আছে বিবর্ত্ততে কেমনে সাধিবে॥
বর্ত্তমান কামরূপ জগতে বিহরে।
কামগন্ধহীন হৈলে প্রেমের সঞ্চারে॥

সত্ত্বরূপে বর্ত্তদেশে করায় বিহার।
বিবর্ত্ত কহিয়ে সত্ত্ব রহে দেশান্তর॥
*　　*　　*
শোণিত শুক্র যারে কহি আনন্দ মদন।
রতিরস তেঁহ কাম কহিল কারণ॥
অতএব প্রাকৃতরূপে তেঁহ সে আছয়।
ইহা সাধি অপ্রাকৃত মানুষ পায়॥

অতঃপর অকিঞ্চন দাস কবি চণ্ডীদাসের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :

শ্রীযুত চণ্ডিদাস ঠাকুর মহাশয়।
পদেতে বর্ণিয়া তেঁহ স্পষ্ট করি গায়॥
কামমদন যে দুইয়ের পিতা যেহ।
তার পিতা যারে কহি সহজ মানুষ সেহ॥

কবি গুহ্য ইঙ্গিতের সাহায্যে এই সহজ মানুষের কথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই শতাব্দীতে দুইচারিখানি পুঁথিতে চৈতন্য-জীবনকথা এবং চৈতন্য-পরিকরদের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন—ভগীরথের 'চৈতন্য-সংহিতা', হৃদানন্দের 'চৈতন্যলীলা' (খণ্ডিত), রামরত্নের 'শ্রীচৈতন্যরত্নাবলী', পুরন্দরের 'চৈতন্যচরিত', দ্বিজ নিত্যানন্দের 'শ্রীচৈতন্যপাঁচালী' প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকায় চৈতন্যদেব ও তাঁহার অনুচরদের সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু কাব্য বা জীবনচরিত হিসাবে এগুলির বিশেষ কোন মূল্য নাই। বৈষ্ণব আচার্যদের মধ্যে শ্যামানন্দের একখানি ক্ষুদ্র জীবনালেখ্য উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণচরণ দাসের 'শ্যামানন্দপ্রকাশে' শ্যামানন্দের জীবনকথা বর্ণিত হইয়াছে।[৪৪] যাহা হউক অষ্টাদশ শতাব্দীতে এমন কোন বৈষ্ণব-জীবনবিষয়ক কাব্য রচিত হয় নাই, যাহাতে উৎকৃষ্ট জীবনীসাহিত্য ও তত্ত্ব-কথা আলোচিত হইয়াছে। দুইচারি জনে চৈতন্যদেব ও অন্যান্য বৈষ্ণব-মহাজনদের সম্বন্ধে কিছু কিছু চরিতগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তথ্য ও ইতিহাস অপেক্ষা গালগল্পই বেশী। তাহার সঙ্গে বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্ব মিশিয়া গিয়া উহাদের জীবনী-সাহিত্যের লক্ষণ অনেক সময়

৪৪ এই বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখের জন্য ডঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'র (১ম—অপরার্ধ) চতুর্দশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

হারাইয়া গিয়াছে। তখনও বিভিন্ন বৈষ্ণবসম্প্রদায়, সমাজ, আখড়া ও ভক্তদের নিকট কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-জীবনীকাব্য-গুলির অত্যন্ত জনপ্রিয়তা ছিল। কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীতেও এই দুই জীবনীগ্রন্থের বহু পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

বৈষ্ণব সমাজবিষয়ক গ্রন্থ ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বৈষ্ণবসমাজ, সম্প্রদায় ও আচার্যদের বিষয়ে বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা করিয়া নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যাম বৈষ্ণবসমাজ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়া গিয়াছেন। এখানে সংক্ষেপে তাঁহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

নরহরি চক্রবর্তী (ঘনশ্যাম দাস)—নরহরির 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাস' বৈষ্ণব সমাজ-সম্প্রদায়ের ও আদর্শের একটি মূল্যবান ইতিহাস বলিলেই চলে—যদিও তথ্য ও অতথ্য একই সঙ্গে ইহাতে স্থান পাইয়াছে। ইনি একজন পদকর্তাও ছিলেন, গ্রন্থের মধ্যে সেই সমস্ত পদের কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যামদাস ব্রজবুলির উৎকৃষ্ট পদকর্তা ছিলেন, আবার নরহরি চক্রবর্তীও ঘনশ্যাম নামে পদ লিখিতেন। ফলে উভয়ের পদের মধ্যে অল্পাধিক গোলমাল হইয়া যাওয়া স্বাভাবিক। যাহা হউক, 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাসই' তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করিতেছে।

নরহরি ভক্তিরত্নাকরের শেষে 'গ্রন্থানুবাদ' প্রসঙ্গে নিজের যৎসামান্য পরিচয় দিয়াছেন :

নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে !
পূর্ব্ব বাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজনে ॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ ॥
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরি দাস আর ঘনশ্যাম ॥
গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন।
মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রাত্রি দিন ॥

নরহরির পিতা জগন্নাথ চক্রবর্তী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব দার্শনিক বৃন্দাবনবাসী বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য ছিলেন। কবি অল্প বয়সে গার্হস্থ্যধর্ম ত্যাগ করিয়া কিছুকাল বৃন্দাবনে অবস্থান করেন এবং গোবিন্দ মন্দিরে পাচকের কাজ গ্রহণ করেন। ইঁহার নামে তিনখানি গ্রন্থ ('ভক্তিরত্নাকর', 'নরোত্তমবিলাস', 'শ্রীনিবাস-চরিত্র'), দুইখানি পদসংগ্রহ ('গীতচন্দ্রোদয়', 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি') ও অনেক পদ প্রচলিত আছে। জগদ্বন্ধু ভদ্রের মতে ('গৌরপদতরঙ্গিণী') নরহরি 'ছন্দঃসমুদ্র', 'পদ্ধতিপ্রদীপ' প্রভৃতি গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। ভদ্র মহাশয় ছন্দঃসমুদ্রের পুঁথি দেখিয়াছিলেন। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে তিনি এই বিষয়ে বলিয়াছেন, "ছন্দঃসমুদ্র পাঠ করিলে ইঁহার সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে গভীর ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।" কিন্তু এই দুই গ্রন্থের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।[৪৫] তবে সংস্কৃত সাহিত্যে পরমপণ্ডিত নরহরি যে সংস্কৃত ছন্দেও অভিজ্ঞ ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি নিজের বাংলা পদেও ছন্দের নানাপ্রকার বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন।

নানা শাস্ত্রবিশারদ, সঙ্গীতশাস্ত্রের আচার্য[৪৬] বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন নরহরি যথার্থই বৈষ্ণবসমাজ-সম্প্রদায়ের প্রকৃত ইতিহাসকার। তাঁহার রচিত বলিয়া প্রচারিত তিনখানি জীবনচরিত গ্রন্থের মধ্যে শুধু 'শ্রীনিবাসচরিত্রে'র কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। কোনও স্থলে ইহার কোন প্রসঙ্গ নাই, কোনও উদ্ধৃতিও পাওয়া যায় না। অথচ তিনি 'ভক্তিরত্নাকরে'র একাধিক স্থানে বলিয়াছেন যে, সর্বাগ্রে তিনি শ্রীনিবাসচরিত্রে লিখিয়াছিলেন। কারণ তিনি বলিয়াছেন, পূর্বগ্রন্থ 'শ্রীনিবাসচরিত্রে' অনেক কথা বলিয়াছেন বলিয়া 'ভক্তি-রত্নাকরে' শ্রীনিবাস সম্পর্কীয় বর্ণনা সংক্ষেপে সারিয়াছেন।[৪৭] মনে হয়, 'ভক্তি-রত্নাকরে' শ্রীনিবাস সম্বন্ধে অধিকাংশ তথ্য ব্যবহৃত হওয়ায় শ্রীনিবাসচরিত্র কালে লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু একটা কথা—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে

---

৪৫ নবদ্বীপের হরিবোলা কুটীরের পূজ্যপাদ হরিদাস দাস মহাশয়ের 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে' ছন্দঃসমুদ্রের খণ্ডিত পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে।

৪৬ নরহরি সংস্কৃতে 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ' নামে সঙ্গীতশাস্ত্রবিষয়ক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। সম্প্রতি উহা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

৪৭ শিষ্যগণনাথ এথা লিখিতে নারিনু।
শ্রীনিবাস চরিত্র গ্রন্থেতে বিস্তারিনু॥ ('ভক্তি')

ইহা রচিত হইয়াছিল, কিন্তু এক শতাব্দীর মধ্যেই তাহার পুঁথি লুপ্ত হইল— ইহা বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটে। অন্তত কবি ইচ্ছা করিয়া তথাকথিত শ্রীনিবাস-চরিত্র লোপ করেন নাই, করিলে ভক্তিরত্নাকরে তাহার ইঙ্গিত থাকিত। 'ভক্তি'তে শ্রীনিবাসচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া কবির 'শ্রীনিবাসচরিত্র' লুপ্ত হইয়াছিল, ইহা যদি মানিতে হয়, তাহা হইলে 'নরোত্তমবিলাস'ও লুপ্ত হইল না কেন? কারণ 'ভক্তি'-তে নরোত্তম চরিত্রও বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই 'শ্রীনিবাসচরিত্রে'র পুঁথি লুপ্ত হইল কেন তাহা বলা কঠিন।

'ভক্তিরত্নাকর' নরহরির শ্রেষ্ঠ প্রতিভার পরিচায়ক। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর গৌড় ও বৃন্দাবনের বৈষ্ণবসমাজ, আচার্য, কাহিনী, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে রচিত এরূপ বিরাট সমাজ ও ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ মধ্যযুগে অল্পই রচিত হইয়াছে। পঞ্চদশ তরঙ্গে বিভক্ত এই ইতিহাস-কাব্যে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের জীবনকথা, প্রচারকার্য, ভক্তিবাদ, তত্ত্বকথা ও শিষ্য সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা আছে। তবে কবি শ্রীনিবাস সম্বন্ধেই অধিক আলোচনা করিয়াছেন।[৪৮] বৃন্দাবনে তিন বন্ধুর শিক্ষালাভ, গ্রন্থাদি লইয়া গৌড় যাত্রা, গ্রন্থচুরি, গ্রন্থের পুনরুদ্ধার, শ্রীনিবাস কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গে অভিজাত সমাজে চৈতন্যধর্ম প্রচার প্রভৃতি ঐতিহাসিক বিষয় নরহরি নানা তথ্য অবলম্বনে বিবৃত করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে নিত্যানন্দের বিবাহ ও পুত্র বীরচন্দ্রের কাহিনীও বর্ণিত হইয়াছে। বলিতে কি, ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দী— এই দুইশত বৎসরে বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান ইতিহাস ইহাতে স্থান পাইয়াছে। গৌড় ও বৃন্দাবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটি বেশ চমৎকাররূপেই দেখান হইয়াছে। অবশ্য তথ্যাদির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কেহ কেহ কিছু সংশয় উত্থাপন করিয়াছেন এবং সে সংশয় নিতান্ত অমূলক নহে। ভক্তির দৃষ্টিতে অনেক সময় তথ্যের কিছু কিছু গোলমাল হওয়াই স্বাভাবিক।

মার্গসঙ্গীতে নরহরি যে পরম অভিজ্ঞ ছিলেন—তাহার প্রমাণ ভক্তি-রত্নাকরের পঞ্চম তরঙ্গ। যদিও এই তরঙ্গে বৃন্দাবন পরিক্রমা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু গবেষকের দৃষ্টি লইয়াই তিনি মার্গসঙ্গীতের নানা তথ্য ও স্বরবিজ্ঞান আলোচনা করিয়াছেন। 'সঙ্গীতপারিজাত', 'সঙ্গীতসার', 'সঙ্গীতদামোদর,'

---

৪৮ ইতিপূর্বে আমরা শ্রীনিবাস জীবনকথা আলোচনায় 'ভক্তি রত্নাকরে' বিবৃত অনেক তথ্য গ্রহণ করিয়াছি।

'সঙ্গীতদর্পণ', 'নারদসংহিতা' প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থাদি অবলম্বনে কবি স্বর, তাল, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, রাগরাগিণী, বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য, অঙ্গাভিনয় প্রভৃতি সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন এখনও তাহার তুলনাস্থল বিরল।

অবশ্য একথা সত্য যে, গ্রন্থটির মধ্যে সংহতির কিঞ্চিৎ অভাব আছে। মাঝে মাঝে প্রসঙ্গচ্যুতি যে হয় নাই তাহা নহে। ঘটনা, চরিত্র, তত্ত্বকথা—সবই মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে—এ অভিযোগ মিথ্যা নহে। অনেক স্থলের বর্ণনাও অতিশয় নীরস ও তথ্যসর্বস্ব। তবে কবি মাঝে মাঝে নিজের পদ উল্লেখ করিয়া নীরস তথ্যপ্রীতি অনেকটা কাটাইয়া উঠিয়াছেন।

নরহরির দ্বিতীয় জীবনী-ইতিহাস 'নরোত্তম বিলাস' আকারে হ্রস্ব, কিন্তু রচনার উৎকর্ষে অধিকতর প্রশংসনীয়।[৪৯] আকারে হ্রস্ব বলিয়াই ইহাতে গ্রন্থনশৈথিল্য বড় বেশী নাই এবং রচনাভঙ্গীও কোন কোন দিক হইতে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। নরোত্তমের অদ্ভুত বৈরাগী জীবনকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি উত্তরবঙ্গে নরোত্তমের প্রভাব এবং বৈষ্ণবমতবাদ প্রচারের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতেও বৈষ্ণবসমাজ ও আচার্যদের জীবনবিষয়ক অনেক মূল্যবান তথ্য আছে—বৈষ্ণব সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে তাহার প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব আচার্যদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও শিষ্য-পরম্পরা অবলম্বনে কিছু কিছু পুস্তিকা রচিত হইয়াছিল—তাহাতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়, বিশেষতঃ গুরু আচার্যদের পারিবারিক পরিচয় ও শিষ্যপ্রশিষ্যের দীর্ঘ তালিকা আছে। সাহিত্যের ইতিহাসে এই সমস্ত পুঁথিপত্রের আলোচনার বিশেষ অবকাশ নাই।

প্রসঙ্গক্রমে সহজিয়া সম্প্রদায় ও তাহাদের প্রচার-সাহিত্যের কথাও এখানে উল্লিখিত হইতে পারে। আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রসঙ্গে বৈষ্ণব সহজিয়াদের মত, আদর্শ ও সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈষ্ণব সহজিয়াদের সম্প্রদায়গত ও তত্ত্বদর্শনের যে শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই রহস্যময় প্রেমসাধনার প্রতি সাধারণের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তদুপরি সহজিয়া গুরুদের বিচিত্র

৪৯ ইতিপূর্বে নরোত্তম প্রসঙ্গে ইহা হইতে অনেক কাহিনী গৃহীত হইয়াছে বলিয়া এখানে বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হইল না।

জীবনধারার জন্যও অনেকে ইঁহাদের প্রতি কৌতূহলী হইয়াছিলেন। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজে সহজিয়া মতাবলম্বী বৈষ্ণব গুরুদের বিশেষ প্রভাব স্থাপিত হয়—সহজিয়া সাধনভজন-সংক্রান্ত অনেক পুঁথি-পুস্তিকাও রচিত হয়। তন্মধ্যে সহজিয়া চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদগুলি এই শতাব্দীতে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব সমাজে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল। ইতিপূর্বে আমরা 'বংশীশিক্ষা' ও 'বিবর্তবিলাস' সম্পর্কে বলিয়াছি—সহজিয়া তত্ত্ব ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের তত্ত্বকথা মিশাইয়া নূতন-ধরনের 'পিরীতি'সাধনা বৈষ্ণবসমাজে কিরূপ জনপ্রিয় হইতেছিল। এই সময়ে সহজিয়াগণ নিজ নিজ সাধন-ভজন ও আচার-আচরণ জনপ্রিয় করিবার জন্য রায় রামানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রূপ-সনাতন প্রভৃতি শ্রদ্ধার্হ আচার্যদের নামে পুঁথি লিখিয়া প্রচার করিতেন। এরূপ কিছু কিছু পুঁথি ('মর্ম্মনিরূপণ' 'কায়িকাপটল', 'মনঃশিক্ষা', 'ভক্তিলহরী' প্রভৃতি) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিবিভাগে আছে। কোন কোনটিতে আবার ধর্মপুরাণোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[৫০] এই ধরনের সহজিয়া-সংক্রান্ত মতাদর্শ দুইটি কেন্দ্র হইতে সর্বাধিক প্রচারিত হইয়াছিল—শ্রীখণ্ড ও বাঘনাপাড়া। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন এবং বাঘনাপাড়ার রামচন্দ্র (রামাই) এই মতের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তন্ত্রের দেহঘটিত সাধনা, যোগদর্শন এবং কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃতের ব্যাখ্যা ও রাগানুগাভক্তির তত্ত্ব-কথা মিশ্রিত করিয়া সহজিয়াগণ যে-সমস্ত আদর্শ ছড়াইতে থাকেন, তাহাই অসংখ্য পুঁথি ও পাতড়ায় বিবৃত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে সূফী সাধনা, বাউল ও সহজিয়া মত মিশিয়া গিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেহঘটিত রহস্যবাদী সাধনা হিন্দু ও মুসলমান সমাজে বিস্তার লাভ করে।[৫১] যাহা হউক, কাব্যাংশে এই সমস্ত পুঁথিপত্রের যেরূপ মূল্যই থাক না কেন, ইহাদের ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্য স্বীকার করিতে হইবে।

বৈষ্ণব পদাবলী ও পদাবলী সঙ্কলন ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুই একজন পদকর্তা কিছু কিছু কবিত্বের পরিচয়

৫০ দ্রষ্টব্য: ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ইতি. (১ম, অপরার্ধ) পৃ. ৩৭৯-৮০

৫১ ইহার পরে বাউল গানের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

দিলেও, এযুগ যে মৌলিক পদাবলীর যুগ নহে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, প্রথাপালনের জন্যও অনেক বৈষ্ণব কবি লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। ফলে আন্তরিকতার স্থলে কৃত্রিম কলাকৌশল প্রাধান্য পাইয়াছে। তবে এই শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্যের একটা বড় বৈশিষ্ট্য, অনেকগুলি সঙ্কলনে বৈষ্ণবপদ সংগৃহীত হইয়াছিল—এই সঙ্কলনগ্রন্থগুলি না পাইলে বহু বৈষ্ণব পদ নষ্ট হইয়া যাইত। বস্তুতঃ এই সঙ্কলন গুলিই বৈষ্ণব কবিদিগকে বিস্মৃতির গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছে। এখানে কয়েকখানি প্রধান সঙ্কলন-গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতেছে।[৫২]

১. বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ক্ষণদাগীতচিন্তামণি—ইহাই বৈষ্ণবপদ-সঙ্কলনের আদি গ্রন্থ। সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব দার্শনিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বৃন্দাবনে বাসকালে এই সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। তিনি বাংলা ভাষায় কিছু কিছু পদও লিখিয়াছিলেন। পদে তিনি হরিবল্লভ বা বল্লভ ভণিতা ব্যবহার করিতেন। জগদ্বন্ধু ভদ্রের মতে ('গৌরপদতরঙ্গিণী'র ভূমিকা) বিশ্বনাথ আনুমানিক ১৫৮৬ শকাব্দে (১৬৬৪ খ্রীঃ অঃ) নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শনে তাঁহার অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল। যদিও পিতার নির্দেশে বিশ্বনাথ বিবাহ করেন, কিন্তু ভাগবত পাঠের পর অন্তরে বৈষ্ণবভক্তি জাগ্রত হইলে সংসারের প্রতি তাঁহার আসক্তি অন্তর্হিত হয়। ইনি তরুণ বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান—এখানে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইঁহার তিরোধান হয়। সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার রচিত তেইশখানি সংস্কৃত গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ষোলখানিই টীকা।[৫৩] এতদ্ব্যতীত তিনি কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্যও রচনা

৫২ এই লেখকের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড), পৃ. ৫৬২-৬৩ দ্রষ্টব্য।

৫৩ কয়েকখানি টীকার নাম :

ভগবতের টীকা—সারার্থদর্শিনী
গীতার টীকা—সারার্থবর্ষিণী
অলঙ্কারকৌস্তুভের টীকা—সুবোধিনী
আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর টীকা—সুখবর্ত্তিনী
উজ্জ্বলনীলমণির টীকা—আনন্দচন্দ্রিকা

করিয়াছিলেন—'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত', 'স্বপ্নবিলাসামৃত', 'সংকল্পকল্পদ্রুম',—এই-গুলিই প্রধান। পাণ্ডিত্য ও কাব্যরসে মণ্ডিত হইয়া তাঁহার গ্রন্থগুলি অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, "পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে কবি হিসাবে রূপগোস্বামী ও কবিকর্ণপূরের পরেই চক্রবর্তী মহাশয়ের স্থান।"[৫৪] তাঁহার 'সঙ্কল্পকল্পদ্রুম' স্তোত্রকাব্য হিসাবে সংস্কৃত বৈষ্ণবসাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু কবিত্বের কথা বাদ দিলেও তাঁহার টীকা-টিপ্পনীগুলিতে যে অসাধারণ মনীষা, যুক্তিবাদ ও বিচক্ষণতা প্রকাশিত হইয়াছে, বলদেব বিদ্যাভূষণকে ছাড়িয়া দিলে এবিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ পণ্ডিতের সন্ধান পাওয়া ভার। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের পরকীয়াতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ('উজ্জ্বলনীলমণি'র টীকা 'আনন্দচন্দ্রিকা'য় ব্যাখ্যাত) বিস্ময়কর। কাব্য রচনা করিলেও তাঁহার মনটি দার্শনিকের মতো ছিল। সংস্কৃত গ্রন্থ ছাড়িয়া দিলে তাঁহার পদ ও পদাবলীসঙ্কলন উল্লেখযোগ্য।

১৬২৬ শকাব্দে বিশ্বনাথ ভাগবতের টীকা ('সারার্থদর্শিনী') সমাপ্ত করেন। ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার তিরোধান হয়। ভাগবতের টীকা রচনা ও তিরোধানের মধ্যবর্তী সময়ে, অর্থাৎ ১৬২৬ শকাব্দের (১৭০৪ খ্রীঃ অঃ) পর তিনি 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' নামে একখানি বৈষ্ণবপদ সঙ্কলন করেন।[৫৫] বোধহয় তিনি দুইখণ্ডে (পূর্ব ও উত্তরবিভাগ) সঙ্কলনটি পূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কারণ 'ক্ষণদা'র প্রত্যেক বিভাগের শেষে আছে—"ইতি শ্রীগীতচিন্তামনৌ পূর্ববিভাগে।" অর্থাৎ বিশ্বনাথ নিশ্চয় উত্তরবিভাগের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর জন্য বোধ হয় তাহা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই—আমরা 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র শুধু পূর্ববিভাগ পাইয়াছি। ক্ষণদার অর্থ রাত্রি। ইহাতে একমাসের প্রতি রাত্রির উৎসব-সংক্রান্ত পদ সঙ্কলিত হইয়াছে—তাই ইহা ত্রিরিশ ক্ষণদা বা রাত্রিতে বিভক্ত। নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে সাজাইয়া বিশ্বনাথ ৪৫ জন কবির তিন শতেরও অধিক পদ সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে বল্লভ ও হরিবল্লভ ভণিতায় তাঁহার নিজস্ব ৪০টি পদ ইহাতে স্থান পাইয়াছে—প্রায় সবগুলি পদই ব্রজ-

৫৪ পদকল্পতরু (সা. প. সংস্করণ), ৫ম, পৃ. ২৩১

৫৫ সতীশচন্দ্র রায়ের মতে ইহা ১৭০০ খ্রীঃ অব্দে সঙ্কলিত হইয়াছিল। পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ. ১

বুলিতে রচিত। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বহু কবির পদ স্থান পাইলেও ইহাতে চণ্ডীদাসের একটি পদও গৃহীত হয় নাই। ইহার কারণ নির্ণয় দুরূহ। কেহ কেহ বলেন, ইহাতে যে পর্যায়ে পদ বিন্যস্ত হইয়াছে, (যেমন—সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, বয়ঃসন্ধি, মুগ্ধা ইত্যাদি) চণ্ডীদাসের সেই পর্যায়ের কোন উৎকৃষ্ট পদ নাই বলিয়া ইহাতে তাঁহার কোন পদ গৃহীত হয় নাই। এই যুক্তি কিন্তু পুরাপুরি মানিয়া লওয়া যায় না। কারণ যে পর্যায় অনুসারে 'ক্ষণদা' বিন্যস্ত হইয়াছে, চণ্ডীদাসের সেই পর্যায়ের কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ আছে, বিশ্বনাথ ইচ্ছা করিলে তাহা সঙ্কলনে গ্রহণ করিতে পারিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতেও চণ্ডীদাসের পদ অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। তাই 'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি'তে তাঁহার কোন পদ কেন গৃহীত হয় নাই, তাহা চিন্তার বিষয় বটে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বিশ্বনাথ দুই পর্বে 'ক্ষণদা' সঙ্কলন করিবেন এইরূপ মনস্থ করিয়াছিলেন। আকস্মিক মৃত্যু বা যে কোন কারণেই হোক, তিনি উত্তরপর্ব সঙ্কলন করিতে পারেন নাই। তাই আমাদের অনুমান, বিশ্বনাথ বোধহয় উত্তরপর্বে চণ্ডীদাসের পদ সঙ্কলিত করিবেন মনে করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক বিশ্বনাথের এই সঙ্কলনটি প্রথম বৈষ্ণব-পদসঙ্কলন বলিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজেও কিছু কিছু পদ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু এই সমস্ত পদ "স্বয়মাগতা" নহে বলিয়া ইহাদের মধ্যে আন্তরিকতার সুর অতি ক্ষীণ।[৫৬] নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সঙ্কলিত বিদ্যাপতির পদে হরিবল্লভ-বল্লভ ভণিতায় রচিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর পদগুলি বিদ্যাপতির বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। এরূপ সিদ্ধান্তের পক্ষে কোন যুক্তি নাই। কারণ ক্ষণদা ও পদকল্পতরুতে হরিবল্লভ-বল্লভ ভণিতার পদগুলির অধিকাংশই বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর রচনা।[৫৭]

৫৬ এবিষয়ে 'পদকল্পতরু'র সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় যথার্থ বলিয়াছেন, "সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতের কবিকর্ণপুরের ন্যায় তিনিও ভাষাপদ রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের গণনায় কবিকর্ণপুর ওরফে পরমানন্দ সেনের ন্যায় বিশ্বনাথ ওরফে হরিবল্লভের স্থান অনেক নীচে।"—পদ. ৫ম. পৃ. ২৩১

৫৭ বৈষ্ণব সাহিত্যে একাধিক বল্লভদাস পদ লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন কবিরাজ উপাধিধারী এবং শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। তিনি পদকর্তা হিসাবেই প্রসিদ্ধ। নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্র কবিরাজের স্তবস্তুতি করিয়া কয়েকটি পদ লিখিয়াছিলেন। আর একজন বল্লভদাস চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যভক্ত বংশীবদন চট্টোর পৌত্র শ্রীবল্লভ অনেক পদ লিখিয়াছিলেন। 'বংশীলীলা' শীর্ষক পুস্তিকাও তাঁহার রচনা। বল্লভের পদগুলির কোন কোনটিতে যে ভণিতার গোলমাল ঘটে নাই এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

২. নরহরির পদসঙ্কলন গ্রন্থ— ভক্তিরত্নাকরের রচনাকার, পণ্ডিত, কবি ও সঙ্গীতরসজ্ঞ নরহরি চক্রবর্তী (ঘনশ্যাম) দুইখানি পদসঙ্কলন প্রস্তুত করিয়াছিলেন—'গীতচন্দ্রোদয়' ও 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'। গীতচন্দ্রোদয়ের দুইখানি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। শিবচন্দ্র শীলের নিকট যে পুঁথিটি ছিল,[৫৮] নবদ্বীপের হরিবোলা কুটীরের পূজ্যপাদ হরিদাস দাস তাহা অবলম্বনে যে পদসংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন (১৯৪৮) তাহাতে মোট ১১৭১টি পদ আছে। ত্রিপুরা রাজদরবারে যে পুঁথিটি[৫৯] আছে, তাহাতে নাকি ১৪৪৬ পদ স্থান পাইয়াছে।[৬০] মনে হয় মূল 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র পুঁথিতে আরও অনেক পদ ছিল। নরহরি সমস্ত পদকে আট অংশে বিভক্ত করিয়া নানা 'আস্বাদ' বা উপবিভাগে বিন্যাস করিয়া বিরাট সঙ্কলনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।[৬১] এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত অধ্যায় ও লীলাপর্যায় সঙ্কলিত হইতে পারিয়াছিল কিনা বুঝা যাইতেছে না। সঙ্গীতশাস্ত্রে পরম প্রাজ্ঞ নরহরি ইহাতেও সঙ্গীতবিষয়ক নানা তত্ত্বকথা সন্নিবিষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার 'গৌরচরিত চিন্তামণি'-ও হরিদাস দাস কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৪৭)। ইহাতে শুধু গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ সংগৃহীত হইয়াছে; পদের সংখ্যা ৩৭১। এই অভিনব সঙ্কলনটির বিশেষ প্রচার হয় নাই কেন, তাহা চিন্তার বিষয়—প্রচার হইলে ইহার একাধিক পুঁথি মিলিত।

৩. রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্র—শ্রীনিবাস আচার্যের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুর অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ('গীতচন্দ্রোদয়ে'র পরে ১৭২৫ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে) 'পদামৃতসমুদ্র' শীর্ষক এক পদসঙ্কলন প্রস্তুত করেন। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শুধু বৈষ্ণবসমাজেই নহে, বৃহত্তর হিন্দুসমাজেও বিশেষ শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে অগাধ

---

৫৮ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৮

৫৯ ত্রিপুরার পুঁথিতে প্রায় আড়াই হাজার পদ ছিল। HBBL, p. 279

৬০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার একখানি খণ্ডিত পুঁথি আছে। Ibid, p. 279

৬১ সতীশচন্দ্র রায়ের মতে 'গীতচন্দ্রোদয়' ১৭২৫ খ্রীঃ অব্দে সঙ্কলিত হইয়াছিল। কারণ নরহরির পিতার গুরু বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' ১৭০০ খ্রীঃ অব্দের দিকে সঙ্কলিত হইলে নরহরির 'গীতচন্দ্রোদয়' নিশ্চয় ইহার বিশ-পঁচিশ বৎসর পরে সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে।

জ্ঞানের জন্য[৬২] তিনি বিশিষ্ট অভিজাত বংশের গুরুর স্থান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য মহারাজ নন্দকুমার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি।[৬৩] যাহা হউক 'পদামৃতসমুদ্র' সঙ্কলনগ্রন্থ হিসাবে অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। ইহার মোট পদসংখ্যা—৭৪৬; তন্মধ্যে স্বয়ং সঙ্কলক নিজের ২২৮টি পদ ইহাতে গ্রহণ করিয়াছেন। গোবিন্দদাস ও রাধামোহনের মিলিত পদসংখ্যা প্রায় পাঁচশত, অন্যান্য পদকর্তাদের মাত্র আড়াই শত পদ গৃহীত হইয়াছে। পদের ধ্বনি-ঝঙ্কার, যাহা কীর্তনগানে বেশী ব্যবহৃত হয়, রাধামোহন সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ইহা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। কাজেই ইহাতে ঝঙ্কারমুখর ও আলঙ্কারিক কলারীতিতে উজ্জ্বল গোবিন্দদাসের পদের সংখ্যাই সর্বাধিক। তবে সঙ্কলক অতগুলি নিজের পদ গ্রহণ করিয়া সুবিবেচনার পরিচয় দেন নাই। কারণ তাঁহার পদগুলি গোবিন্দদাসের অনুকরণ মাত্র—কিঞ্চিৎ ধ্বনিঝঙ্কার থাকিলেও উহাদের এমন কোন উৎকৃষ্ট কাব্যগুণ নাই যাহার জন্য সঙ্কলনে এতগুলি পদ স্থান দিতে হইবে। এ বিষয়ে রাধামোহন বৈষ্ণবীয় বিনয়ের ততটা পরিচয় দিতে পারেন নাই। যাহা হউক, তিনি সঙ্কলিত পদগুলির 'মহাভাবানুসারিণী' নামক যে সংস্কৃত টীকা করিয়াছিলেন তাহাতে পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য তাঁহার টীকা-টিপ্পনী জনপ্রিয় হইলেও আধুনিক কালের কোন কোন পণ্ডিত ইহাকে পুরাপুরি স্বীকার করেন নাই। সতীশচন্দ্র এই বিষয়ে বলিয়াছেন, "তিনি নিজের সঙ্কলিত 'পদামৃত সমুদ্র' গ্রন্থের যে সংস্কৃত টিপ্পনী রচনা করিয়া এই গ্রন্থের

---

৬২ সে যুগে বৈষ্ণবসমাজে স্বকীয়া ও পরকীয়া তত্ত্ব লইয়া তত্ত্বগত বিরোধ ঘনাইয়াছিল। রাধা কৃষ্ণের স্বকীয়া, না পরকীয়া নায়িকা—ইহা লইয়াই বিরোধের সূচনা। এই মতান্তর চৈতন্যদেবের সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। সনাতন-রূপ-জীব গোস্বামীকে বহু পরিশ্রম করিয়া স্বকীয়া-পরকীয়া দ্বন্দ্ব মিটাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক ১৭১৮ খ্রীঃ অব্দে এই বিষয় লইয়া বৈষ্ণবসমাজে চূড়ান্ত আকারে মতভেদ দেখা দিলে এক তর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাধামোহন তাহাতে পরকীয়া তত্ত্বের পক্ষ লইয়া জয়লাভ করেন। এই ব্যাপার লইয়া এমনই কৌতূহল-উত্তেজনা সৃষ্টি হইয়াছিল যে, এই ঘটনা সুবাদার মুর্শিদ কুলি খাঁ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল।

৬৩ অথচ মহারাজ নন্দকুমার শাক্তপন্থী ছিলেন, শাক্তপদও লিখিয়াছিলেন, খুব ঘটা করিয়া দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবীর পূজা করিতেন। মুমূর্ষু মিরজাফরকে তিনি কিরীটেশ্বরী দেবীর চরণামৃত পান করাইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

সহিত সংযোজিত করিয়া গিয়াছেন, উহা হইতে পদাবলীর পাঠান্তরের ও দুরূহ বাক্যসমূহের অর্থনির্ণয়ে আশানুরূপ সাহায্য না পাওয়া গেলেও, তাঁহার সংক্ষিপ্ত অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ রসবিশ্লেষণ দ্বারা রসজ্ঞ পণ্ডিত পাঠকদিগের যথেষ্ট জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।" (পদকল্প, ৫ম, পৃ. ২) ইহাতে প্রায় ৩৯ জন কবির পদ সংগৃহীত হইয়াছে।[৬৪] রাধামোহনের অনেক পদ (১৮২টি) বৈষ্ণবদাসের 'পদকল্পতরু'তে গৃহীত হইয়াছে। তিনি গোবিন্দদাসের ব্রজবুলির অনুসরণে যে সমস্ত পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহা নিতান্তই অনুকরণমূলক। যথা :

অপরুব দিনহি কুসুমণি মণ্ডপে
শিতল পবন বহ মন্দ।
দ্বিজকুল নাদ সুবাদন যৈছন
মনমথ মন্ত্রক ছন্দ॥
জয় রাধা মাধন মেলি।
দুহুঁক প্রেমলব কো করু অনুভব
যবহুঁ সুরতরস কেলি॥
তহিঁ পুন অতিশয় নাগরি আগরি
অতএ সে নিমীলিত আঁখি।
আনন্দসিন্ধু নিবেশহিঁ মোহিত
দেয়ই প্রতিঅঙ্গ সাখী॥

৪. **বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু**—বৈষ্ণব পদের সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্কলন 'পদকল্পতরু' সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের এক অভিনব সংগ্রহ। ইহাকে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন, "This work can be said to be the most representative and exhaustive anthology of Vaisnava Lyrics—a veritable Veda of Bengali Vaisnava religious poetry." (HBBL, P. 5) ইহা অতিশয় যুক্তিসঙ্গত। এই সঙ্কলনের

৬৪ পদকারদের নাম : জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, সনাতন, গোবিন্দদাস কবিরাজ, গোবিন্দ চক্রবর্তী, নয়নানন্দ, বৃন্দাবন দাস, রামানন্দ রায়, অনন্ত দাস, যদুনন্দন, বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, বংশীবদন, বংশীদাস, সুবল, কবিশেখর, কবিরঞ্জন, চম্পতি, সিংহভূপতি নৃপতিসিংহ, নরোত্তম দাস, জগন্নাথ দাস, শেখর রায়, মুরারি গুপ্ত, মাধো, ঘনশ্যাম, মাধব ঘোষ, মাধব আচার্য, বীরনারায়ণ, বিজয় নারায়ণ, বাসুদেব ঘোষ, শ্রীনিবাস দাস, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ, নরহরি, গোপাল দাস, লোচনদাস, বল্লভ দাস, রাধামোহন।

সাহায্যেই সমগ্র বৈষ্ণব সাধনার শিল্পরূপ অবধারণ করিতে পারা যায়। সঙ্কলক গোকুলানন্দ সেন এই সুবৃহৎ সঙ্কলনে যে পরিশ্রম করিয়াছেন এবং যেরূপ রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, সেরূপ কোন তুলনা আধুনিক যুগেও পাওয়া যায় না।

গোকুলানন্দ সেন বৈষ্ণবদাস নামে পদ লিখিতেন। বৈদ্যবংশোদ্ভূত কবির নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার টেঞা-বৈদ্যপুর গ্রাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ পদকর্তা উদ্ধব দাসের (কৃষ্ণকান্ত মজুমদার) সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৭১৮ খ্রীঃ অব্দে রাধামোহন ঠাকুরের নেতৃত্বে স্বকীয়া ও পরকীয়া লইয়া যে বিতর্ক উপস্থিত হয়, সেই সভায় গোকুলানন্দ উপস্থিত ছিলেন—মনে হয়, তখন তিনি নবযুবক। সুতরাং অনুমান হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁহার জন্ম। জগদ্বন্ধু ভদ্রের মতে কবি ছিলেন রাধা-মোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য।[৬৫] ইহা সত্য হইতে পারে। কারণ গোকুলানন্দ 'পদকল্পতরু'তে শুধু গুরু বলিয়াই রাধামোহনের ১৮২টি সাধারণ শ্রেণীর পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। গোকুলানন্দ একজন সুদক্ষ কীর্তনিয়াও ছিলেন। তিনি যে বিশেষ গায়নপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কীর্তন গাহিতেন তাহা 'টেঞার ছপ' (অর্থাৎ টেঞা গ্রামের বিশেষ ঢঙ) নামে পরিচিত। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ 'পদকল্পতরু' সঙ্কলন। প্রথমে ইহার নাম ছিল 'গীতকল্পতরু':

এই গীতকল্পতরু নাম কৈলুঁ সার।
পূর্বরাগাদি ক্রমে চারি শাখা যার॥

পরে ইহা 'পদকল্পতরু' নামে বিখ্যাত হয়। গোকুলানন্দ রাধামোহনের 'পদামৃতসমুদ্রে'র আদর্শে এই সঙ্কলনের পরিকল্পনা করেন। প্রথমে তিনি

---

৬৫ 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য। কবি 'পদকল্পতরু'র শেষে অনুবাদ-প্রকরণে এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন:

শ্রীআচার্য প্রভুবংশ শ্রীরাধামোহন।
কে কহিতে পারে তার গুণের বর্ণন॥

কিন্তু কবি তাঁহার কোন পদে রাধামোহনকে গুরু বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তাই কেহ কেহ মনে করেন, কবির গুরু রাধামোহন আর পদামৃতসমুদ্রের রাধামোহন এক ব্যক্তি নহেন। কবির গুরু রাধামোহন কবিরই স্বগ্রামনিবাসী দ্বিজ হরিদাসের বংশধর। দ্রষ্টব্য: সা—প—প, ১৩১২, পৃ. ৬৫—৬৯

'পদামৃতসমুদ্র' অবলম্বনে কীর্তন গান করিতেন। তখনই তাঁহার মনে আর একটি বৃহৎ সঙ্কলনগ্রন্থের ইচ্ছা জাগে। তখন তিনি নানা স্থান পর্যটন করিয়া বহু পদ সংগ্রহ করেন। 'পদামৃত' হইতে বহু পদ লইয়া এবং নিজের সংগৃহীত পদসমূহ একত্র করিয়া তিনি এই 'গীতকল্পতরু' বা 'পদকল্পতরু' সংগ্রথিত করেন। 'পদকল্পতরু'র সমাপ্তিতে গ্রন্থ অনুবাদ প্রকরণে তিনি বলিয়াছেন :

শ্রীআচার্য প্রভুবংশ শ্রীরাধামোহন।
কে কহিতে পারে তার গুণের বর্ণন ॥
যাহার বিগ্রহে গৌরপ্রেমের নিবাস।
যেন শ্রীআচার্য প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ ॥
গ্রন্থ কৈলা পদামৃত সমুদ্র আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান ॥
নানা পর্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া।
তাহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া ॥
সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল।
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল ॥
এই গীতকল্পতরু নাম কৈলুঁ সার।
পূর্বরাগাদিক্রমে চারি শাখা যার ॥

কেহ কেহ মনে করেন ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে সঙ্কলিত হইয়াছিল। কিন্তু দেখা যাইতেছে ১৭১৮ সালের দিকে স্বকীয়া-পরকীয়া বিতর্ক সভায় যুবক-কবি উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সঙ্কলিত হইয়াছিল মনে হয়। এই বৃহত্তম বৈষ্ণবপদ-সঙ্কলনে প্রায় ১৪০ জন পদকর্তার তিন হাজারেরও অধিক পদ সংগৃহীত হইয়াছে। চারি শাখায় বিভক্ত ইহার প্রথম শাখায় ১১টি 'পল্লব' (অধ্যায়), দ্বিতীয় শাখায় ২৪, তৃতীয় শাখায় ৩১, এবং চতুর্থ শাখায় ৩৬টি পল্লব আছে। গোকুলানন্দ ইহাতে কোন টীকা সংযোজন না করিলেও বৈষ্ণব রসশাস্ত্র হইতে যে সমস্ত প্রবেশক শ্লোক যোগ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে পদবিন্যাসপদ্ধতি সাধারণ পাঠকের নিকটেও সুবোধ্য বলিয়া বোধ হইবে। কবি প্রধান প্রধান পদকর্তাদের যে সমস্ত পদ নির্বাচিত করিয়াছেন তাহার সংখ্যা :— গোবিন্দদাস কবিরাজ—৪০৬, চণ্ডীদাস (আদি-দ্বিজ-বড়ু)—১১৮, জ্ঞানদাস —১৮৬, বলরামদাস—১৩৬, বিদ্যাপতি—১৬৩। কবির বন্ধু দীনবন্ধু দাসের —৯৯টি পদ এবং কবির গুরু বলিয়া পরিচিত 'পদামৃতসমুদ্রে'র সঙ্কলক

রাধামোহনের ১৮২টি মধ্যম শ্রেণীর পদ সংগ্রহে কবি কিছু বন্ধুপ্রীতি, কিছু গুরুভক্তির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কবি নিজেও বৈষ্ণবদাস ভণিতায় পদ রচনা করিতেন। কিন্তু অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়, তিনি মাত্র ২৬টি স্বরচিত পদ এই সুবৃহৎ সঙ্কলনে স্থান দিয়াছেন—এ বিষয়ে তাঁহার বৈষ্ণবীয় বিনয় বিস্ময়কর। বহু বৈষ্ণবপদসঙ্কলক এইরূপ বিনয়ের পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাঁহারা অনেক সময় চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দিয়া নিজেদের অসংখ্য তৃতীয় শ্রেণীর পদ নিজ নিজ সঙ্কলনে চালাইয়া দিয়াছেন। অবশ্য গোকুলানন্দের পদগুলিতে যে বিশেষ কোন কাব্যগুণ নাই, তাহা তিনি জানিতেন—তাই বোধ হয় মাত্র কয়েকটি নিজস্ব পদ সংযোজিত করিয়াছিলেন। যাহা হউক গোকুলানন্দ সেন বহু বৈষ্ণব কবিকে বিস্মৃতির কালগ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া থাকিবেন।

অন্যান্য পদসঙ্কলন—উপরি-লিখিত পদসঙ্কলনগুলিতে সমুদ্রবৎ বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্যের বহু পদ সংগৃহীত হইলেও পরবর্তী কালে অনেক কবি পদ রচনা করিয়াছিলেন, যাঁহাদের পদ ঐ সমস্ত সঙ্কলনে স্থান পায় নাই। সঙ্কলকগণ গ্রন্থের পরিধি হ্রাস করিবার জন্য অনেক সময় নির্মমভাবে অনেক পদ বাদ দিয়াছেন—কোন কোন পদকর্তা সম্পূর্ণ বাদ পড়িয়াও গিয়াছেন। তাই অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোন কোন সঙ্কলক নূতনভাবে পদ-সঙ্কলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সঙ্কলিত 'কীর্তনানন্দ' ('সঙ্কীর্তনানন্দ'), ও 'সঙ্কীর্তনামৃত' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গোকুলানন্দের সমসাময়িক গৌরসুন্দর দাস ৬০ জন কবির প্রায় সাড়ে ছয়শত পদ সঙ্কলন করেন—ইহাই 'কীর্তনানন্দ' নামে পরিচিত। মুর্শিদাবাদ হইতে বনোয়ারীলাল গোস্বামী ইহা প্রকাশ করেন। গোকুলানন্দ সেন ও গৌরসুন্দর সমসাময়িক হইলেও গৌরসুন্দর নিজ সঙ্কলনে বৈষ্ণবদাসের কোন পদ উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু 'পদকল্পতরু'তে গৌরসুন্দরের ভণিতায় ৫টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। ইনি সঙ্কলক গৌরসুন্দর হইতে পারেন। তবে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।[৬৬] কারণ পদসাহিত্যে গৌরদাস ও গৌরসুন্দর দাসের ভণিতায় কিছু কিছু পদ পাওয়া

৬৬ পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ. ৪

গিয়াছে। ইহার মধ্যে কে কীর্তনানন্দের যথার্থ সঙ্কলক তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

দীনবন্ধু দাস 'সঙ্কীর্তনামৃত' শীর্ষক যে পদসঙ্কলন গ্রথিত করিয়াছিলেন নানা দিক দিয়া তাহা উল্লেখযোগ্য। মূল পুঁথিটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সংগ্রহে ছিল। তিনি সমস্ত পুঁথির সঙ্গে 'সঙ্কীর্তনামৃতে'র পুঁথিটিও সাহিত্য পরিষদে দান করেন। পরে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় ইহা সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়। পুঁথিতে ১৭৯৩ শকাব্দের (১৭৭১ খ্রীঃ অঃ) উল্লেখ রহিয়াছে দেখিয়া মনে হয় সঙ্কলক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই বর্তমান ছিলেন। ইহাতে ৪০ জন কবির লেখা প্রায় পাঁচশত পদ গ্রথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রায় অর্ধেক পদই স্বয়ং দীনবন্ধুর রচনা। কবি বৈষ্ণবশাস্ত্রে পরম প্রাজ্ঞ ছিলেন। ইহাতে তিনি রসশাস্ত্রের সংজ্ঞা দিয়া যেন ব্যাখ্যার জন্যই নানা পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং ইহা শুধু সঙ্কলন না হইয়া বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় পরিণত হইয়াছে। সঙ্কলকের কিঞ্চিৎ কবিত্বশক্তি ছিল; কিন্তু তাই বলিয়া সঙ্কলনের প্রায় অর্ধেক পদ স্বয়ং সঙ্কলকের রচনা, ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। আর একটা কথা—ইহাতে সঙ্কলক দীনবন্ধু কবি চণ্ডীদাসের একটা পদও গ্রহণ করেন নাই—ইহার কারণ দুর্জ্ঞেয়। কবি শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সরকারবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্র ও সাহিত্যে পরম প্রাজ্ঞ ছিলেন, অথচ চণ্ডীদাসের পদ কেন সংগ্রহ করিলেন না তাহার কারণ দুর্জ্ঞেয়। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছেন (পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ. ৫), তিনি 'পদকল্পতরু'র ৫ম খণ্ডে দেখাইবেন যে, কেন দীনবন্ধু চণ্ডীদাসের কোন পদ সংগ্রহ করেন নাই। কিন্তু রায়মহাশয় পরে চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে এ বিষয়ে কিছু বলেন নাই। কেহ কেহ মনে করেন, দীনবন্ধু অষ্টাদশ শতাব্দীরও পূর্ববর্তী সঙ্কলক। তাই তাঁহার সঙ্কলনে চণ্ডীদাসের কোন পদ উদ্ধৃত হয় নাই।[৬৭] ইহাও খুব যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। কারণ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে চণ্ডীদাসের নানা পদ সমগ্র দেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। তবে সঙ্কলনগ্রন্থগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কীর্তনের জন্য প্রস্তুত হইত বলিয়া চণ্ডীদাস অপেক্ষা গোবিন্দদাসাদির

৬৭ "Candidāsa too is entirely absent, which is a strong point in favour of its comparative antiquity." Dr. S. K. Sen—HBBL, p. 308

ঝঙ্কারমুখর পদাবলী অধিক গৃহীত হইত। কিন্তু দীনবন্ধুর 'সঙ্কীর্তনামৃতে' চণ্ডীদাসের একটি পদও নাই ইহা বিস্ময়ের কথা বটে। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ মহাশয় এই 'সঙ্কীর্তনামৃত' অবলম্বনে ১৩২৬ সালের 'নারায়ণ' (কার্তিক সংখ্যা) পত্রে 'সঙ্কীর্তনামৃত' নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার এক স্থানে তিনি এইরূপ মন্তব্য করেন : "আশ্চর্যের বিষয়, যে-চণ্ডীদাসের নাম বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, তাঁহার একটি পদও আলোচ্য গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বর্তমানে আমরা যাহাকে চণ্ডীদাসের পদ বলি, দীনবন্ধু দাসের কয়েকটা পদে তাহার সুর যেন বিলক্ষণ অনুভূত হইয়া থাকে।" দীনবন্ধু চণ্ডীদাসের অনুকরণে পদ লিখিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় উত্তমর্ণের নাম ও পদ চাপিয়া গিয়াছেন— উক্ত মন্তব্য হইতে এইরূপ একটা তাৎপর্য বাহির হইয়া পড়ে। যিনি গোটা সঙ্কলনে অনেক ভাল পদ বাদ দিয়া প্রায় অর্ধেকটা নিজের মধ্যম শ্রেণীর পদের দ্বারা ভরাইয়া দিতে পারেন, তিনি চণ্ডীদাসের পদ সম্পূর্ণ বাদ দিলে বিস্ময়ের কিছু নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কমলাকান্ত দাসের 'পদরত্নাকর' (১৮০৬-১৮০৭), নিমানন্দ দাসের 'পদরসসার', গৌরমোহন দাসের 'পদকল্প-লতিকা' প্রভৃতি সঙ্কলনগুলি মূলতঃ পুঁথি-আশ্রয়ী। কিন্তু ছাপার যুগেও কিছু কিছু নূতন সঙ্কলন প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বটতলা প্রকাশিত 'পদকল্পলতিকা'র নাম উল্লেখযোগ্য। কারণ একদা ইহা বাঙলার গ্রামাঞ্চলে অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। চুঁচুড়ার অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'প্রাচীন কবিতাসংগ্রহ' (১২৮৫ সাল), জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'গৌরপদতরঙ্গিণী' এবং রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'পদরত্নাবলী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'গৌরপদতরঙ্গিণী' অতিশয় মূল্যবান। ইহাতে সম্পাদক প্রায় দেড় হাজার গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ সঙ্কলন করিয়া বাংলা সাহিত্যের মহদুপকার করিয়াছেন।[৬৮]

৬৮ ডঃ সেন বৃন্দাবন দাস নামক এক সঙ্কলকের 'রসনির্যাস' শীর্ষক একখানি সঙ্কলনের কথা বলিয়াছেন (HBBL)। তাঁহার মতে এই বৃন্দাবন দাস অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে বর্তমান ছিলেন। ইনি খুব সম্ভব শ্রীখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। কারণ ডঃ সেন পুঁথিটি শ্রীখণ্ড হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন। এই বৃন্দাবন দাস বোধ হয় শেষজীবন বৃন্দাবন ধামেই অতিবাহিত করেন। এই সঙ্কলনে প্রায় ৪০ জন পদকর্তার পদ সংগৃহীত হইয়াছে। ডঃ সেন ইহা হইতে একটি বিচিত্র

এই প্রসঙ্গে আর একটি রহস্যজনক ও সন্দেহসঙ্কুল সঙ্কলনের নাম উল্লেখ করি। ইহা বৈষ্ণব আলোচক মহলে 'পদসমুদ্র' নামে পরিচিত। বৈষ্ণবভক্ত ও বৈষ্ণব সাহিত্যরসিক হুগলীর বদনগঞ্জ নিবাসী হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি নানা পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া যে সমস্ত নূতন পদ উদ্ধৃত করিতেন, সে সম্বন্ধে তিনি জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের সমসাময়িক বাবা আউল মনোহর দাস নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মোহান্ত প্রায় পনের হাজার পদের এক বিরাট পদাবলী সঙ্কলন করেন—ইহার নাম 'পদসমুদ্র'। তাহাতে 'পদকল্পতরু'র পাঁচ গুণ পদ সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ভক্তিনিধি মহাশয় উক্ত বিরাট পুঁথি মুদ্রিত করেন নাই, কাহাকে দেখিতেও দেন নাই। এমন কি, কলিকাতার কোন এক প্রকাশক ইহা দুই হাজার টাকায় কিনিতে চাহিলেও ভক্তিনিধি মহাশয় উহা হাতছাড়া করেন নাই।[৬৯] ইহাতে 'গৌর-পদতরঙ্গিণী'র সম্পাদক জগদ্বন্ধু ভদ্র এবং বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র কিছু সন্দিহান হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ভক্তিনিধি মহাশয় সাধনোচিতধামে প্রস্থান করিলে এ বিষয়ে আর কোন সন্ধান করা গেল না, সন্দেহের কারণ থাকিলেও জগদ্বন্ধু ভদ্র অতঃপর এ বিষয়ে নীরব হইলেন।[৭০]

পদ উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা হইতে গোবিন্দ দাস ভণিতায় একটি শাক্ত পদ—অর্ধনারীশ্বরের পদ (পূর্বে আমরা গোবিন্দদাস প্রসঙ্গে ৫৫৩-৫৪ পৃষ্ঠায় এই পদের কিয়দংশ উল্লেখ করিয়াছি) পাওয়া গিয়াছে। ইহার খানিকটা 'প্রেমবিলাসে'ও উল্লিখিত হইয়াছে। পদটির আরম্ভ এইরূপ :

হেম হেমগিরি দুই তনু চিরি
আধ নর আধ নারী।
আধ উজর আধ কাজর
তিনই লোচন ধারী॥
দেখ দেখ দুহুঁ মিলিত এক গাত।
ভকত * ভুবনবন্দিত
ভুবন মারতি তাত॥

৬৯ 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র ভূমিকায় জগদ্বন্ধু ভদ্রের মন্তব্য।

৭০ "সন্দেহ করিবার প্রচুর কারণ আছে। কিন্তু ভক্তিনিধি মহাশয় এখন গৌরধামে গোলোকে। তথা হইতে তাঁহাকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা নিষ্ঠুর ও অসভ্যের কাজ, অতএব আমরা নীরব রহিলাম।" ('গৌরপদতরঙ্গিণী'র ভূমিকা)

অবশ্য তিনি নীরব হইলেও ভক্তিনিধির উপর কিছু অনৃতাচারের অভিযোগ আসিয়া পড়ে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। পরে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ভক্তিনিধিকে এইরূপ অভিযোগ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সন্দেহের কারণ থাকিলেও প্রকৃষ্ট প্রমাণ না পাইলে একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব ভক্তের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ উচ্চারণ করা শোভন নহে। তবে ইতিহাস ও সত্যের খাতিরে সন্দেহ প্রকাশ করাই ভাল—ব্যক্তির প্রতি ভক্তি-অনুরক্তি ত্যাগ করা সত্য নির্ধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজন। ভক্তিনিধি মহাশয় আরও নানা বিষয়ে যেরূপ সংশয় সন্দেহ জিয়াইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রচারিত 'পদসমুদ্রে'র অস্তিত্বের বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াই স্বাভাবিক। সতীশচন্দ্র ভক্তিনিধির পক্ষ অবলম্বন করিয়াও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, তথাকথিত 'পদসমুদ্রে' আছে বলিয়া ভক্তিনিধি প্রচারিত রামীর ভণিতাযুক্ত পদ এবং বিদ্যাপতির পদের "লছিমাচরণ ধ্যান কবিতা নিকসয়ে" প্রভৃতি অংশ সম্পূর্ণ অসম্ভব"।[৭১] তাঁহার মন্তব্য—"কিন্তু তা বলিয়াই কি ভক্তিনিধি মহাশয় বাহাদুরী লওয়ার জন্য এই সকল রচনা জাল করিয়া 'পদসমুদ্রে'র নামে প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন—এরূপ মনে করা যাইতে পারে?" আমাদের মতে—এইরূপই মনে করা যাইতে পারে। ভক্তিনিধির কাছে পনের হাজার পদের কোন সঙ্কলন কস্মিনকালেও যে ছিল না সে বিষয়ে সতীশচন্দ্র নিঃসন্দেহ।[৭২] তবে তাঁহার বিশ্বাস, "পদসমুদ্রের পুঁথির কিয়দংশ ভক্তিনিধি মহাশয়ের নিকট ছিল; তিনি উহা হইতেই এইরূপ অনেক অজ্ঞাতপদ তাঁহার লেখায় উদ্ধৃত করিয়াছেন।" অথচ তিনি পুঁথিখানা কাহাকেও দেখিতে দেন নাই কেন? ইহার উত্তরে সতীশচন্দ্র বলিতেছেন, "তাঁহার পুঁথিখানি খণ্ডিত বলিয়া তিনি সম্ভবতঃ আগে প্রকৃত কথাটা গোপন করিয়া গিয়াছেন এবং পরে অপ্রতিভ হইবেন বলিয়া তাঁহার খণ্ডিত পুঁথিখানা আর লোকলোচনের গোচর করিতে সমর্থ হন নাই। সম্পূর্ণ পুঁথিখানাতে পনের হাজার পদ ছিল বলিয়া হয়ত একটা জনপ্রবাদ ছিল; তিনি উহার উপরে নির্ভর করিয়াই সে কথাটা প্রচার করিয়া

---

৭১ পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ. ১৪

৭২ "পনের হাজার পদপূর্ণ পদসমুদ্রের সম্পূর্ণ পুঁথিখানা ভক্তিনিধি মহাশয়ের নিকট ছিল কিনা সে বিষয়ে আমাদিগেরও সন্দেহ আছে।" পদকল্প, ৫ম, পৃ. ১৪

গিয়াছেন।"[৭৩] এইরূপ অনুমানও ভক্তিনিধি মহাশয়কে অপবাদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। পুঁথি খণ্ডিত বলিয়া যিনি প্রকৃত কথা গোপন করেন, তিনি আর একটু অগ্রসর হইয়া যে সমস্তটাই নিজে বানাইয়া দেন নাই তাহার বিরুদ্ধ প্রমাণ কোথায়? ইতিপূর্বে আমরা রামায়ণ এবং ভাগবত প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় কৃত্তিবাসী রামায়ণের আত্মপরিচয়জ্ঞাপক পুঁথি এবং মালাধর বসুর সন-তারিখযুক্ত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পুঁথিতেও নানা গোলমাল পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন।[৭৪] এখানেও যে সেরূপ বিভ্রাট ঘটে নাই তাহাই বা কে বলিল? সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মতে 'পদসমুদ্রে'র কোন পুঁথি হারাধন দত্ত মহাশয়ের নিকট নিশ্চয়ই ছিল। তবে তাহা খণ্ডিত বলিয়া তিনি লোকসমাজে বাহির করেন নাই। যাহা হউক, যে মাছ ধরা পড়ে নাই, অথবা জাল ছিঁড়িয়া পলাইয়াছে, তাহার আকার-আয়তন লইয়া গবেষণা নিষ্ফল।

ডঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় *History of Brajabuli Literature*-এ সজনীকান্ত দাসের নিকট রক্ষিত একটি সুপ্রাচীন পদসঙ্কলনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[৭৫] তাঁহার মতে ইহাই সর্বপ্রাচীন বৈষ্ণবপদসঙ্কলন। পুঁথিটি পুস্তকের আকারে লিপিকৃত, ইহার প্রথমদিকের কয়েকখানি পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহার নাম জানা যায় না। সবচেয়ে কৌতূহলের ব্যাপার ইহার প্রতি পৃষ্ঠায় সনের উল্লেখ আছে। যথা—পুঁথির ৭৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রতি পৃষ্ঠায় ১০৬০ সন (১৬৫৩ খ্রীঃ অঃ), ৭৮-৯৭ পৃষ্ঠায় ১০৬১ সন (১৬৫৪ খ্রীঃ অঃ) এবং ৮৯ হইতে পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে ১০৬৩ সনের (১৬৫৭ খ্রীঃ অঃ) উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাতে বহু অজ্ঞাতনামা কবিরও পদ উল্লিখিত হইয়াছে। ডঃ সেন উহার একখানি পৃষ্ঠার আলোকচিত্রও নিজ গ্রন্থে জুড়িয়া দিয়াছেন। পুঁথির লিপি অষ্টাদশ শতাব্দীর হইতে পারে। পুঁথিটি খাঁটি হইলে ইহাকে প্রাচীনতম পদসংগ্রহ বলিতেই হইবে। কিন্তু প্রতি পৃষ্ঠায় যেভাবে সন-

---

৭৩ সতীশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "বলা বাহুল্য, আমরা ভক্তিনিধি মহাশয়ের পক্ষে ওকালতী গ্রহণ করি নাই।' কিন্তু তিনি যেভাবে ভক্তিনিধি মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বেশ দক্ষতার সঙ্গেই মোয়াক্কেলের 'কেস' জিতাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

৭৪ এই লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ১ম, (২য় সংস্করণ), পৃ. ৪৭৯-৮০ এবং পৃ. ৬২৯-৩০ দ্রষ্টব্য।

৭৫ Dr. S. K. Sen—HBBL, p. 6

তারিখ দাগিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ইহার প্রামাণিকতায় সন্দেহ জন্মে। বাংলা পুঁথিপত্রে সন-তারিখ লইয়া নানা গোলমাল পাকাইয়া উঠিয়াছে। সেখানে সঙ্কলক যেন ভবিষ্যৎ গবেষকদের পরিশ্রম বাঁচাইবার জন্য প্রতি পৃষ্ঠায় সন-তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন। আরও একটা সন্দেহের কথা, সপ্তদশ শতাব্দীর পুঁথি, অথচ ইহা পুঁথির আকারে লেখা নহে, ছাপা বহির ধরনে প্রস্তুত। ইহাতেও সন্দেহ দৃঢ়তর হইতেছে। ডঃ সেন ও সজনীকান্ত দাস মহাশয় এরূপ মূল্যবান পুঁথি সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই বলিয়া এ বিষয়ে কোনরূপ আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

সর্বশেষে বৈষ্ণবসাহিত্যের পরমপ্রাজ্ঞ ও বিশেষ রসিক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' উল্লেখ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েকজন পদকর্তা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রায় দেড়হাজার গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ সংগ্রহ করিয়া কবিদের পরিচয় সহ 'গৌরপদতরঙ্গিণী' প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে অল্পস্বল্প ভুলভ্রান্তি থাকিলেও একক চেষ্টায় আধুনিক কালে এরূপ সঙ্কলন আর প্রকাশিত হয় নাই। ইহার সঙ্গে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের কৃতিত্বের তুলনা চলিতে পারে। তিনি যে 'পদকল্পতরু'র সটীক সংস্করণ ও কবিপরিচয় প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নহে। তাঁহার সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'ও একটি মূল্যবান সঙ্কলন রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই এরূপ অনেক পদ অবলম্বনে (পদসংখ্যা—ছয় শতেরও অধিক) সতীশচন্দ্র 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' প্রকাশ করেন। উপরন্তু অনেক অজ্ঞাতপরিচয় কবির পরিচয়াদি আবিষ্কার করিয়া সতীশচন্দ্র যেরূপ তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়।

পদসঙ্কলন ছাড়াও মধ্যযুগে এই ধরনের আরও কয়েকখানি পদসংগ্রহ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে রামগোপাল দাস বা গোপাল দাসের 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী' (১৬৭৩ খ্রীঃ অব্দে সঙ্কলিত) এবং তৎপুত্র পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী', মুকুন্দদাসের 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়', চন্দ্রশেখর ও শশিশেখরের 'নায়িকারত্নমালা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলি ঠিক সঙ্কলন গ্রন্থ নহে। কেহ রসতত্ত্ব ব্যাখ্যায়, কেহ-বা ধর্মতত্ত্ব ও অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় অনেক পদ

উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সমস্ত পদের কোন কোনটি অন্য কোন সঙ্কলনে গৃহীত হয় নাই। সেই দিক দিয়া ইহাদের মূল্য আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েকজন পদকর্তা ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদকর্তাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় পঁচাত্তর জন পদকর্তার পরিচয় উদ্ধার করিয়াছেন।[৭৬] ইঁহাদের কেহ কেহ পদ সঙ্কলন করিতে গিয়া পদ রচনার স্পৃহা দমন করিতে পারেন নাই। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ('ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'), রাধামোহন ঠাকুর ('পদামৃতসমুদ্র'), বৈষ্ণবদাস ('পদকল্পতরু'), গৌরসুন্দর দাস ('কীর্তনানন্দ'), দীনবন্ধু দাস ('সঙ্কীর্তনানন্দ'), নিমানন্দ ('পদরসসার'), কমলাকান্ত দাস ('পদরত্নাকর') প্রভৃতি পদ-সঙ্কলকগণ নিজেরাও কিছু কিছু পদ রচনা করিয়া নিজেদের সঙ্কলনে চালাইয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের কথা সঙ্কলন প্রসঙ্গে কিছু কিছু বলা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কিঞ্চিৎ কবিত্বের অধিকারী ছিলেন—যেমন রাধামোহন ঠাকুর, দীনবন্ধু দাস, কমলাকান্ত দাস প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে কমলাকান্তের একটু স্বতন্ত্র উল্লেখ প্রয়োজন। ইনি বীরভূম জেলার অধিবাসী, ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে 'পদরত্নাকর' সঙ্কলন করেন। পদের সংখ্যা—১৩৫৮। ইহাতে সঙ্কলক যে কয়টি স্বরচিত পদ গ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে দুটি একটি পদ মন্দ নহে—বাংলা ও ব্রজবুলি উভয়-ধরনের পদে তিনি কিছু কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। যথা :

কদম্ব কাননে উঠিছে সঘনে
একি ধ্বনি অনুপাম।
শ্রুতিপথ দিয়া অন্তরে পশিয়া
চঞ্চল করিল প্রাণ ॥
সই এ তোরে কহিলু সার।
হেন সুমধুর ধ্বনি রসপূর
ভুবনে না শুনি আর ॥
না জানি সজনি হেন ধ্বনি শুনি
কেন কাঁপে মোর গা।

৭৬ Dr. S. K. Sen, HBBL

বসন খসিল কেশ আউলাইল
চলিতে না চলে পা ॥

কবি বাংলা পদে চণ্ডীদাসের সরল ভাষা ও ভাব বেশ আয়ত্ত করিয়াছেন। এইবার অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েকজন পদকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

১. প্রেমদাস (প্রেমানন্দ দাস)—'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী' প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আমরা তাঁহার পরিচয় দিয়াছি। 'পদকল্পতরু'তে তাঁহার ভণিতায় ৩১টি পদ আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই বাংলা ভাষায় এবং চৈতন্যদেব-সংক্রান্ত রচনা। ব্রজবুলিতে রচিত দুই একটি পদ কাব্যাংশে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। বাংলা পদগুলি মোটামুটি চলনসই :

সই কাহারে করিব রোষ।
না জানি না দেখি সরল হইলু
সে পুনি আপনা দোষ ॥
বাতাস বুঝিয়া পেলাই থু
পা বাঢ়াইয়া বুঝিয়া থেহ।
মানুষ বুঝিয়া কথা সে কহিএ
রসিক বুঝিয়া নেহ ॥

কবির চৈতন্যবিষয়ক পদগুলির আন্তরিকতায় রচনার ত্রুটি অনেকটা ঢাকিয়া গিয়াছে। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে জগদ্বন্ধু ভদ্র প্রেমদাসের পদের অতি-প্রশংসা ("একজন উচ্চ দরের কবি") করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ বিষয়ে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মন্তব্যই যুক্তিসঙ্গত—"কবিত্ব হিসাবে প্রেমদাসের স্থান দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি লোচনদাস, অনন্ত, উদ্ধব, বংশীবদন, বসন্তরায় প্রভৃতি বহুসংখ্যক পদবর্তার পরে নির্দেশ করিতে হইবে।"[৭৭]

২. গোকুলচন্দ্র-গোকুলানন্দ—বৈষ্ণব পদসাহিত্যে একাধিক গোকুলচন্দ্র ও গোকুলানন্দ পদকর্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীনিবাস আচার্যের তিনজন শিষ্যেরই নাম ছিল গোকুলানন্দ—একজনের নাম গোকুলানন্দ আচার্য, দুইজনের নাম গোকুলানন্দ দাস। 'পদকল্পতরু'তে গোকুলদাসের

৭৭ পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ. ১৫২

একটি ব্রজবুলির পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে একখানি পুঁথির (পুঁথি—২৪১৬) কয়েকখানি পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়াছে। মনে হয় ইহা গোকুলচন্দ্র বা গোকুলানন্দের কোন পদসঙ্কলন। ভণিতায় কবি গোকুলদাস, গোকুলচাঁদ, গোকুলচন্দ্র এইরূপ নাম ব্যবহার করিয়াছেন।[৭৮] এখানে একটি সরল বাংলা পদ উদ্ধৃত হইতেছে :

ললিতার সনে রাই গেলা নিজ ঘর।
শ্যামপ্রেমে গরগর সভয় অন্তর॥
নিরবধি চমকিত নহে গৃহকাজ।
সঙরে বন্ধুর গুণ তেজি সব লাজ॥
হেনকালে আইলা তথি ব্রজবধূগণ।
রাই বলে ভাল হৈল আইলা সখিগণ॥

এই সমস্তপদের সারল্য ব্যতীত আর কোন গুণ নাই।

৩-৪. শেখর ভ্রাতৃদ্বয়—চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর দুইভাই 'নায়িকা-রত্নমালা' নাম দিয়া নায়িকার ৬৪ প্রকার বৈশিষ্ট্যসহ ৬৪টি পদ সঙ্কলন করেন। তাহাতে জ্যেষ্ঠ চন্দ্রশেখরের পদসংখ্যা—৪৫, কনিষ্ঠ শশিশেখরের পদসংখ্যা—১৪। চন্দ্রশেখর নামটিও একাধিক বৈষ্ণব ভক্ত ও কবি গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৭৯] কিন্তু যিনি 'নায়িকা-রত্নমালা' সঙ্কলন করেন তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।[৮০] শেখর ভ্রাতৃদ্বয়ের 'নায়িকারত্নমালা' ছাড়িয়া দিলে আরও দুই-একটি সঙ্কলনে দুই ভাইয়ের দুই-একটি পদ স্থান পাইয়াছে। চন্দ্রশেখরের ছন্দের হাত বেশ পরিপক্ক, বিশেষতঃ তাঁহার ব্রজবুলিগুলি উচ্চ প্রশংসা দাবি করিতে পারে। যথা :

কাহে তুহুঁ কলহ করি কান্ত সুখ তেজলি
অব সে বসি রোয়সি কাহে রাধে।
মেরুসম মান করি উলটি ফেরি বৈঠলি
নাহ যব চরণ ধরি সাধে॥

---

৭৮ Dr. S. K. Sen—HBBL, Chap. XI

৭৯ চন্দ্রশেখর আচার্য—চৈতন্যদেবের মেসো
বৈদ্যচন্দ্রশেখর—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি—১০ম
আচার্যচন্দ্র—HBBL, p. 396

৮০ 'বীরভূম বিবরণের' মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে।

তবহুঁ উহে নাগরি ভৎর্সনা করি তেজলি
মান বহু রতন করি গণলা।
অবহুঁ তুহুঁ ধরমপথ- কাহিনী উগারসি
রোষে হরি বিমুখ ভই চললা।

চন্দ্রশেখরের কনিষ্ঠভ্রাতা শশিশেখর কখনও শেখর, কখনও বা শশী এইরূপ ভণিতা দিয়াছেন। ফলে রায়শেখরের সঙ্গে তাঁহার কোন কোন পদ মিশিয়া যাওয়া আশ্চর্য নহে। যাহা হউক কবি প্রাণবন্ত ঝঙ্কারমুখর ছন্দে বেশ নিপুণতা দেখাইয়াছেন। যেমন:

অতি শীতল মলয়ানিল
মন্দ মধুর বহনা।
হরি বৈমুখ হামারি অঙ্গ
মদনানলে দহনা।
কোকিলাকুল কুহু কুহরই
অলি ঝঙ্করু কুসুমে।
হরিলালসে তনু তেজব
পাওব আনজনমে॥

জ্যেষ্ঠের পদে আন্তরিকতা ও গাম্ভীর্য থাকিলেও কনিষ্ঠের পদে জীবনচাঞ্চল্য অধিক।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরও বহু পদকারের দুই একটি পদ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বিশ্বম্ভর দাস, অকিঞ্চন দাস, সর্বানন্দ, রাধানাথ দাস, মুকুন্দদাস (রাধামুকুন্দ দাস), পরাণদাস, গদাধর দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়। অবশ্য ইঁহাদের শুধু নামই উল্লেখ করা যাইতে পারে, স্বাদগন্ধহীন এই সমস্ত পদের বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ভারতচন্দ্রও যে কোন কোন দিক দিয়া বৈষ্ণবপদাবলীর ঢঙটি অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার অন্নদামঙ্গল হইতেই জানা যাইবে।[৮১]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিকতার জোয়ার আসিলেও পুরাতন ধারার কোন কোন কবি (এবং দুই-এক জন আধুনিক ধারার কবি) বৈষ্ণবপদাবলীর রীতিটি বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের

৮১ ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

প্রপিতামহ রাজা পীতাম্বর মিত্র বাহাদুর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে অযোধ্যার নবাবের উকিল হিসাবে কার্য করিয়াছিলেন। তিনি দীক্ষিত বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া মিত্র বাহাদুর ধর্মজীবন অবলম্বন করেন এবং বাংলা ও ব্রজবুলিতে কয়েকটি বৈষ্ণব পদ রচনা করেন। ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পদের দুই চারিটি তাঁহার পৌত্র জনমেজয় মিত্র (ইনিও বৈষ্ণবপদ লিখিয়াছিলেন) নিজের পদ-সঙ্কলন 'সঙ্গীত-রসার্ণবে' মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রলালের পিতা জনমেজয় মিত্রও পিতামহের বৈষ্ণবপদাবলী রচনার আদর্শ গ্রহণ করেন এবং ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে 'সঙ্কর্ষণদাস' ভণিতায় 'সঙ্গীত-রসার্ণব' শীর্ষক একটি স্বরচিত পদসঙ্কলন প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহার পিতামহেরও কয়েকটি পদ গৃহীত হইয়াছিল। প্রায় আড়াইশত পদে কবি ব্রজবুলি ও বাংলা উভয়ই ব্যবহার করিয়াছেন। ইঁহার গৌরাঙ্গবিষয়ক কয়েকটি পদ জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে গৃহীত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে আরও কয়েকজন আধুনিক ধারার কবি ও লেখক বৈষ্ণবধারার কিছুটা অনুবর্তন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য', বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ব্যবহৃত দুই-একটি বিচ্ছিন্ন পদ, রাজ-কৃষ্ণরায়ের নাটকপ্রহসনে দুইচারিটি ব্রজবুলির পদ, কবি রজনীকান্ত সেনের পিতা গুরুপ্রসাদ সেনের 'পদচিন্তামণিমালা' (১৮৭৬ সালে প্রকাশিত) এবং তরুণ রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (বাংলা ১২৯১ সালে প্রকাশিত) উল্লেখযোগ্য।

মধুসূদন আধুনিক তন্ত্রের কবি হইয়াও রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর প্রতি প্রতিকূল ছিলেন না। তাঁহার মহাকাব্যাদিতেও সুযোগ-সুবিধা পাইলেই তিনি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের উল্লেখ করিয়াছেন। সহপাঠী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে [৮২] তিনি 'Poor Lady of Vraja' রাধার বিরহ সঙ্গীত অবলম্বনে ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনা করেন। কবি বিলাতী ওডের (Ode) ছাঁচে সরল বাংলায় ব্রজাঙ্গনা কাব্যে রাধার বিলাপ রচনা করেন—যদিও ইহাতে ভারত-

৮২ শুনা যায় ভূদেব নাকি মাইকেলকে বৈষ্ণবপদ রচনার অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ভাই- তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি করতে পার?" ('মধুস্মৃতি'—নগেন্দ্রনাথ সোম)

চন্দ্র ও কবিওয়ালাদের, বিশেষতঃ টপ্‌পা গায়কদের প্রভাব বেশী। কবি বৈষ্ণবপদের অনুকরণে ভণিতাও দিয়াছিলেন :

সহসা হইনু কালা জুড়া এ প্রাণের জ্বালা
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন।
মধু—যার মধুধ্বনি কহে, কেন কাঁদ ধনি,
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন।

বাহিরের দিক হইতে কবি নিপুণতার সঙ্গে বৈষ্ণব ধারা অনুকরণ করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবপদাবলীর অধ্যাত্ম বাতাবরণের সঙ্গে তাঁহার কিছু মাত্র যোগ ছিল না—যদিও তাঁহার একান্ত প্রিয় সুহৃদ গৌরদাস বসাক বৈষ্ণব বংশের সন্তান। মানবিক আদর্শ ও লীরিক গীতোচ্ছ্বাস মধুসূদনের রাধাকে নায়িকা রাধায় পরিণত করিয়াছে, 'শ্রীমতী' রাধায় পরিণত করিতে পারে নাই।[৮৩] কেহ কেহ মনে করেন বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের চেয়েও মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে বৈষ্ণবপদাবলীর ভাবাদর্শ অধিক রক্ষিত হইয়াছে।[৮৪] বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাহা সত্য হইলেও রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী সম্বন্ধে তাহা বলা যায় না। কারণ রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে ব্রজবুলির আদর্শে বৈষ্ণবপদাবলীর ঢঙটা অনেকটা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। যাঁহারা মনে করেন, "Madhusudan's poems breathe, however faintly, the perfume of devotion, but Rabindranath's Brajabuli poems have a purely esthetic appeal."[৮৫]—তাঁহাদের এই অভিমত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ বৈষ্ণব সাহিত্য ও সাধনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যতটা মানসিক আনুকূল্য ছিল, মধুসূদনের ততটা ছিল না—এ বিষয়ে মধুসূদন সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের কবি। 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে মধুসূদনের কোনও প্রকার "Perfume of devotion" ফুটে নাই, তাহা সম্ভবও ছিল না। তিনি বৈষ্ণবপদাবলীর মানবিক দিকটি বাছিয়া লইয়াছেন—তাই রাধার মর্মবেদনা মানবিক আবেগে ব্যাকুল হইলেও তাহার মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা কিছু মাত্র

৮৩ এই বিষয়ে লেখকের 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত' দ্রষ্টব্য।

৮৪ "But Madhusudan's poems conform to the spirit of Vaisnava poetry in much greater degree than the works of the latter two (i.e. Bankim Chandra and Rabindra Nath)". HBBL. p. 369

৮৫ Ibid, p. 369

নাই। অপর দিকে তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ লীলাচ্ছলে ব্রজবুলির অনুকরণে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী লিখিলেও তাহার ভাবে ভাষায় বৈষ্ণব স্বাদের ব্যঞ্জনা বহু স্থলেই উপলব্ধি করা যাইবে—যদিও ইহার 'esthetic appeal'-ও অতিশয় চিত্তাকর্ষী হইয়াছে।

এখানে আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা সমাপ্ত করিলাম। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালী-মানসে বৈষ্ণব আদর্শ যে কী বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা এই যুগের অসংখ্য বৈষ্ণবপদ, জীবনীকাব্য, সমাজ-ইতিহাস, তত্ত্বকথা, পদসঙ্কলন প্রভৃতি আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। সূক্ষ্ম শিল্পরীতি, কারুকর্ম ও ভক্তিরসে বাঙালীর যে মন আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার পরিচয় এই বিপুলায়তন বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যাইবে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের যদি কোন শাখা দেশ-কাল-নিরপেক্ষভাবে নিখিল রসিক-চিত্তে সারস্বত হর্ষ সঞ্চার করিতে পারে, তবে তাহা এই বৈষ্ণব সাহিত্য। অনুবাদ-সাহিত্য পুরাপুরি বাঙালীর নিজস্ব সংস্কার নহে, মঙ্গলকাব্যে গ্রামীণ প্রভাব বহু স্থলে প্রকট হইয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব পদামৃত-সমুদ্র যে চিরদিন রসিকজনের হৃদয় আনন্দরসে প্লাবিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই—রাসরস-শেখর শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা এই রসতীর্থের যুগল বিগ্রহ হইলেও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবেই বাঙলার বৈষ্ণবসাহিত্য আকারে-আয়তনে এবং গুণগত উৎকর্ষে এরূপ বিস্ময়কর অনুপম মহিমা লাভ করিয়াছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

নূতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ

শাক্ত পদাবলী, বাউল গান ও গাথাসাহিত্য

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় ছেদ টানিবার পূর্বে আর কয়েকটি বিচিত্র শাখা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। আমরা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের তিনটি খণ্ডে সমগ্র মধ্যযুগীয় সাহিত্যের রূপ ও রীতি, বিষয়-বস্তু প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি যে, খ্রীঃ দশম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী প্রায় আটশত বৎসর ধরিয়া প্রচুর পুঁথিপত্র লিখিত-অনুলিখিত হইলেও বৈচিত্র্য ও নূতনত্বের অভাব এই দীর্ঘকালবিস্তারী বাংলা সাহিত্যের দীনতাকে আরও প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। কবিগণ অধিকাংশ স্থলে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন; দুই-একজন একটু ভিন্ন পথে যাইবার চেষ্টা করিলেও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে নূতন সাহিত্যশাখা, শিল্পরীতি ও বিষয়বস্তুর বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে কোন কোন স্থলে অল্পস্বল্প নূতনত্বের ইঙ্গিত-আভাস ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, কিছু কিছু কবি পুরাতন ও বহুকথিত বিষয়বস্তু ও বক্তব্যভঙ্গিমা ত্যাগ করিয়া নূতন দিক হইতে সাহিত্য সৃষ্টির কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শাক্ত-পদাবলী, বাউলগান এবং কাহিনী-কেন্দ্রিক গাথা-কাব্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলির সূচনা অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেও হইতে পারে, কিন্তু যথার্থ বিকাশ অষ্টাদশ শতাব্দীতেই হইয়াছিল; তাহার জের উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চলিয়াছিল। আধুনিক কালেও কোন কোন কবি পুরাতন শাক্ত গীতিকা ও বাউলগান রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক এই তিনটি শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

১

শা ক্ত প দা ব লী

পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে মূলতঃ প্রেম-ভক্তি-আশ্রিত বৈষ্ণব সাহিত্য অধিকতর প্রাধান্য বিস্তার করিলেও অষ্টাদশ শতাব্দী

শাক্ত পদাবলীর যুগ—অধিকাংশ শাক্ত কবি এই শতাব্দীতে অসংখ্য শাক্ত পদ রচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে যেমন রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া বৈষ্ণব পদাবলীশাখা বিকশিত হইয়াছে তেমনি শাক্ত সাহিত্যে উমা-পার্বতী-চণ্ডী-কালিকাকে কেন্দ্র করিয়া শাক্ত পদাবলীর উৎপত্তি ও বিকাশ হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রাচীনকালে বাঙালী দুই নারীর ভজনা করিয়াছে—একজন কুলত্যাগিনী শ্রীরাধা, আর একজন কুলকন্যা ও কুলবধূ উমা হৈমবতী। একজন নিখিল মানবচিত্তকে সমাজসংসারের পর্যুসিত জীবন হইতে টানিয়া সুদূর রসস্বর্গে উন্নীত করিয়াছেন, আর একজন সহস্র কর্মজালজড়িত প্রতিদিনের সুখদুঃখের জীবনের মধ্যে তৃষাতপ্ত মানবশিশুকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। একজন সৌন্দর্য-ললিতকলার প্রতীক রূপে প্রেয়সীমূর্তিতে আদিরসের পুটপাকে চিত্তকে তুরীয়ানন্দের পথে লইয়া গিয়াছেন, আর একজন ষড়ৈশ্বর্যময়ী মাতৃ-মূর্তিতে স্নেহবাৎসল্যের প্রতীকরূপে মানুষের ঘরসংসারে আবির্ভূত হইয়াছেন। একজন অসীমের ইঙ্গিত দিয়াছেন, আর একজন সীমার মধ্যেই জীবনের চরিতার্থতা দান করিয়াছেন। বাঙালীর চেতনায় এই দুই নারী মূর্তি দেবীর বেশে বিচিত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের দ্বৈতসত্তার যুগলরস ভক্তের ধ্যানের সামগ্রী, আর ব্রহ্মস্বরূপিণী দেবী কালিকার অদ্বৈত উপলব্ধির দ্বারা মোক্ষলাভ সাধকের মূল লক্ষ্য। এই দুই দার্শনিক প্রত্যয়কে কেন্দ্র করিয়া মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে দুইটি প্রধান গীতিশাখা (বৈষ্ণব ও শাক্ত) যুগপৎ গান ও কবিতায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

শক্তিতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ ॥

শাক্তপদাবলী পূর্বে 'মালসী' (∠মালবশ্রী) গানরূপেই পরিচিত ছিল। 'শাক্তপদাবলী' শব্দ বৈষ্ণবপদাবলীর অনুকরণে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ব্যবহৃত হইয়াছে। মালসীগান বা শাক্তপদাবলী আদ্যাশক্তি চণ্ডী-কালিকাকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। মহাশক্তি বা আদ্যাশক্তি এই পদসাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাই এই পদ শাক্ত পদ নামে পরিচিত হইয়াছে। মহাশক্তি চণ্ডী-কালিকাকে কেন্দ্র করিয়া যে বিপুল পদসাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহার স্বরূপ বিচার করিবার পূর্বে শাক্তত্ত্বের বিকাশধারা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

শৈশবে মানুষ মাতৃক্রোড়ে পরম নির্ভয়ে বাস করে, অসহায় শিশুর তখন একমাত্র সম্বল মাতৃস্নেহের পীযূষধারা। অর্ধচেতন অর্ধজড় অবস্থায় সে তখন মাকেই আঁকড়াইয়া ধরে। পরে শিশু শৈশব ছাড়িয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, জগৎ ও জীবনকে চিনিয়া লয়, মাতৃবক্ষ ছাড়িয়া সে মাটিতে নামিয়া আসে। কিন্তু কোনদিনই সে সেই শৈশবস্মৃতির অনুষঙ্গ ভুলিতে পারে না, মাতৃভাব তাহার অন্তর-প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে জড়াইয়া যায়। মানবসভ্যতার শৈশবেও মানুষ ক্রূর প্রকৃতির প্রতিকূলতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া এইরূপ মাতার প্রয়োজন বোধ করিত—যিনি রক্ষা করিবেন, পালন করিবেন, স্নেহ করিবেন। তাই অতি প্রাচীনকাল হইতে সৃষ্টিরহস্যের মধ্যে একটি জননীতত্ত্ব মানবচিত্তকে অধিকার করিয়াছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ তাই সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্বের অন্তর্নিহিত প্রেরণা বলিতে এইরূপ এক মহাজননীকে বুঝিত। তাই বহুযুগের পরপারে যে মানুষ বাস করিত, যাহারা শিক্ষাসভ্যতার ধার ধারিত না, তাহারাও আদিম জীবনপিপাসার তাড়নায় সমস্ত সৃষ্টিশক্তির মূলে সৃজন-পালনক্ষম একটি মাতৃদেবতার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিত। ইনি অমিত শক্তি-ধারিণী, মানবশিশুকে ইনি কখনও অপার স্নেহের বশে, কখনও-বা আঘাত দিয়া শ্রেয়ের পথ দেখাইয়া দেন, বাস্তব দুঃখ-বেদনা ও ক্ষয়ক্ষতি হইতে রক্ষা করেন।

প্রাচীন বিশ্বের অনেক জাতি মাতৃস্বরূপিণী পৃথিবীকেই আদিজননী বলিয়া পূজা করিত, কারণ মা যেমন সন্তানকে পালন করেন, এই জড়পৃথিবীও সেইরূপ স্নেহরসে মৃত্তিকা সরস করিয়া মানবশিশুর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন। তাই দেখা যায়, প্রাচীন মেক্সিকো, প্রাচীন জার্মানী, প্রাচীন গ্রীস-রোমেও মাতৃরূপিণী পৃথিবীদেবীর পূজা-উপাসনা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন জার্মানীতে পৃথিবী-মাতার নাম ছিল নের্থাস; প্রাচীন গ্রীসের রিয়া এবং রোমের সাইবিল দেবীও পৃথিবীর মাতৃমূর্তির প্রতীক। ভারতবর্ষেও বৈদিক সাহিত্যে মাতৃরূপিণী পৃথিবীর কথা আছে। ঋগ্বেদের দেবমাতা অদিতিকে পৃথিবীমাতা বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। অথর্ববেদের 'পৃথিবীসূক্তে' এই স্নেহময়ী কল্যাণী পৃথিবীমাতার বর্ণনা আছে। কিন্তু নারী-দেবতাকে একমাত্র প্রধান করিয়া তোলার পশ্চাতে একটি বিশেষ ধরনের সমাজপ্রভাব কার্যকরী হইয়াছিল। সমস্ত সৃষ্টির মূলে একটি জগৎ প্রসবিত্রী নারীদেবতা বর্তমান—

এইরূপ প্রাচীন বিশ্বাস সাধারণতঃ মাতৃতান্ত্রিক সমাজেই উদ্ভূত হইয়াছিল দ্রাবিড়, নিষাদ, পীতজাতি প্রভৃতি মাতৃতান্ত্রিক সমাজে তাই দুর্গার অনুরূপ দেবীপূজার আভাস পাওয়া যাইতেছে। ক্রমে বৈদিক আর্যদের মধ্যে এইরূপ মাতৃদেবতার প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলে দেবীসূক্তে অম্ভৃণ মুনির কন্যা বাক্ সমস্ত সৃষ্টির মূলীভূত শক্তিকে মাতৃরূপেই বুঝিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে ব্রহ্মবাদিনী বাকের মাতৃশক্তির বন্দনাই (ঋগ্বেদ—১০।১০।১২৫) ভারতীয় আর্যসাহিত্যে সর্বপ্রথম মহাশক্তি বা আদ্যাশক্তির উল্লেখ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। সামবেদের রাত্রিসূক্তেও যে দেবীকে ময়ূরপুচ্ছধারিণী, পাশহস্তা, যুবতী-কুমারী ("শিখণ্ডিনীং পাশহস্তাং যুবতীং কুমারিণীম্") বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অথর্ববেদেই শক্তিপূজা, অভিচার প্রভৃতির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তাই কোন কোন মতে ঋক্-সামে শক্তিদেবীর উল্লেখ থাকিলেও তাঁহার পৃথক স্বরূপ অথর্ববেদেই বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই জন্য বিশুদ্ধ বৈদিকগণ অথর্ববেদকে যজ্ঞের উপযুক্ত মনে করেন নাই—কারণ ইহাতে বেদপন্থাবহির্ভূত অভিচারাদি কর্মের বিধান আছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বৈদিক সংহিতায় পুরুষ-দেবতার প্রাধান্য থাকিলেও ইহাতে ধীরে ধীরে শাক্ত দেবীও নিজ স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। উপনিষদে, বিশেষতঃ কেনোপনিষদের (৪।১) উমা হৈমবতীর গল্পটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

অসুরদিগকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্র-অগ্নি-বরুণ প্রভৃতি দেবতারা যখন অহংভাবে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন পর্বত অন্তরালে এক ভয়াবহ যক্ষকে দেখিয়া তাঁহারা সভয়ে তাঁহার স্বরূপ জানিতে চাহিলেন। অগ্নি-বরুণাদি দেবগণ সেই যক্ষের সম্মুখে সমস্ত শক্তি হারাইয়া ম্লান হইয়া গেলেন। অতঃপর ইন্দ্র তাঁহার স্বরূপ জানিতে আসিলে সেই যক্ষ দ্রুত অদৃশ্য হইয়া গেলেন এবং আকাশে উমা-হৈমবতীর জ্যোতির্ময় রূপ ফুটিয়া উঠিল। ইনিই ব্রহ্মস্বরূপিণী।

উপনিষদের অন্যত্র রুদ্রপত্নী অম্বিকা, অগ্নিশিখারূপিণী কালিকা প্রভৃতির উল্লেখ থাকিলেও উমা-হৈমবতীর কাহিনী হইতে মনে হয়, উপনিষদের যুগে উমা-পার্বতীকে আদ্যাশক্তিরূপে গ্রহণ করা হইতেছিল। দর্শনের যুগে

সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বও যে শক্তি-উপাসনাকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে শক্তিপূজা এবং উমা-পার্বতী-চণ্ডী কালিকাকে আদ্যাশক্তিরূপে গ্রহণের রীতি সর্বপ্রথম পৌরাণিক সাহিত্যে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ, কালিকা পুরাণ, এমনকি বৈষ্ণব পুরাণ ভাগবতেও শক্তি উপাসনার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।[৮৬] দক্ষপ্রজাপতির কন্যা সতীর সঙ্গে মহাদেবের বিবাহ, সতীর দেহত্যাগ, হিমাচলগৃহে তাঁহার উমা-পার্বতীরূপে পুনর্জন্ম, শিবের সঙ্গে বিবাহ, উভয়ের দাম্পত্য জীবন প্রভৃতি নানা কাহিনী এই সমস্ত শাক্ত ও শৈবপুরাণে পাওয়া যাইতেছে। অবশ্য এই পুরাণগুলি বিশেষ প্রাচীন নহে। সে যাহা হউক, বাঙলার শাক্ত-সাহিত্যের অনেকটা—বিশেষতঃ উমা-সংক্রান্ত কাহিনীগুলি শাক্ত-শৈবপুরাণ হইতেই গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 'দেবীমাহাত্ম্য' (ত্রয়োদশ অধ্যায়) উপচ্ছেদে সবিস্তারে চণ্ডীকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বাঙলার শাক্ত সাহিত্যে ও শাক্ত সম্প্রদায়ে এই চণ্ডীর প্রভাব সর্বাধিক।

এই প্রসঙ্গে বাঙলার মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীর কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই মঙ্গলকাব্য নানা দিক দিয়া গ্রাম্য সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই বাঙলীর আর্যেতর সংস্কার—বিশেষতঃ নিষাদ সংস্কারের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর কিছু কিছু যোগাযোগ লক্ষ্য করা যাইবে। মঙ্গলকাব্যের অন্যতম প্রধান শাখা চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চণ্ডিকাকে মহাদেবের সহধর্মিণী উমাপার্বতী ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্ন করা হইলেও, অনুমান হয়, মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী আদিতে পর্বতকান্তারবাসী কোন ব্যাধজাতির উপাস্য দেবী ছিলেন। পরে আর্যীকরণের যুগে মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী বা মঙ্গলচণ্ডীকে শিবসহধর্মিণীর সঙ্গে একীভূত করা হইয়াছে। নিজ পূজা প্রচারের জন্য মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী কোন কোন সময় হীনপন্থা অবলম্বনেও সঙ্কুচিত হন নাই। মঙ্গলকাব্যে যাঁহার আচার-আচরণ হইতে বিস্মৃতযুগের নিষাদ সংস্কৃতির ছাপ দূর হয় নাই, বাঙলার শাক্তপদাবলীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী উমা-পার্বতী-কালিকা-

[৮৬] ভাগবতে ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কাত্যায়নীর কাছে গোপীগণ কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইত।

চণ্ডী সে চণ্ডী নহেন। ইনি শাক্তপুরাণ ও ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

ভারতীয় পুরাণ, মহাকাব্য, স্মৃতি-সংহিতা, ধর্মদর্শনে হরপার্বতী, শিবদুর্গা, উমামহেশ্বর—'জগৎপিতরৌ' এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন। সংস্কৃতে রচিত শিবদুর্গা সাহিত্যের দুই শাখা—একটি মূলতঃ কাহিনী-কেন্দ্রিক, যাহাতে মহাদেব-সতী ও মহাদেব-উমার ঘরোয়া কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। আর একপ্রকার তত্ত্বাশ্রয়ী ও সাধন মার্গের সাহিত্যে (বিশেষতঃ নানা তন্ত্রে) শাক্ততত্ত্ব ও শাক্তদর্শন ব্যাখ্যাত হইয়াছে—যাহা মূলতঃ তন্ত্রের অধিকারভুক্ত। সেখানে সাধক আদ্যাশক্তির আরাধনা এবং দুরূহ সাধনপন্থা অবলম্বন করিয়া পিণ্ডদেহের মধ্যেই মোক্ষের চিদানন্দ উপলব্ধি করেন। বাঙলার শাক্তগীতিকায় এই দুই বৈশিষ্ট্য—অর্থাৎ একটিতে কাহিনী-কেন্দ্রিক ঘরোয়া জীবনের ছায়া, আর একটিতে সাধনার দ্বারা মোক্ষলাভের কথা বলা হইয়াছে।

চণ্ডীকে পুরাণে শিবের গৃহিণীরূপে গ্রহণ করা হইলেও চণ্ডীতত্ত্বের মূল উৎস মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীমাহাত্ম্য অংশে মহাদেবের সঙ্গে চণ্ডীর পতিপত্নীর সম্পর্ক স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয় নাই।[৮৭] 'চণ্ডী'তে দেবীকে কোথাও হিমাচল-কন্যা উমা বলিয়া সম্বোধন করা হয় নাই—যদিও মাঝে মাঝে তাঁহাকে 'দুর্গা' ও 'পার্বতী' বলা হইয়াছে। তবে সেখানে 'পার্বতী'র অর্থ পর্বতের কন্যা নহে, পর্বতবাসিনী দেবী বলিয়াই তাঁহাকে পার্বতী বলা হইয়াছে। সেইজন্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীতত্ত্ব ও চণ্ডীপ্রসঙ্গ সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। তাহার সঙ্গে পুরাণে-বর্ণিত উমাপার্বতীর বিশেষ কোন সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ব্রহ্মার স্তবে বিষ্ণুর দেহ হইতে বিষ্ণু-মায়া জাগ্রত হইয়া অসুরগণকে বিনাশ করিলেন। ইঁহার সঙ্গে শিব অপেক্ষা বিষ্ণুরই যেন অধিক সম্পর্ক। চণ্ডী বিষ্ণুর শক্তি, বিষ্ণুতেই লীন হইয়াছেন। কিন্তু অসুর বিনাশের জন্য তিনি খড়্গ, শূল, গদা, চক্র, শঙ্খ, ধনুক (চাপ), বাণ, ভুসণ্ডী, পরিঘ প্রভৃতি আয়ুধ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হন[৮৮] এবং দৈত্যদানবদিগকে

---

৮৭ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত—ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃ. ৫১

৮৮ খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুসণ্ডী পরিঘায়ুধা॥
—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১৷৮০

নির্মমভাবে বিনাশ করেন। ইঁহার সঙ্গে শিবের বিশেষ সম্পর্ক নাই। শুম্ভাসুর বিনাশের সময় দেবতারা দেবী চণ্ডিকার মধ্যে শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন, মহাদেবও দৈত্যবিনাশের জন্য চণ্ডিকাকে শক্তি দান করিয়াছিলেন এবং তিনি দেবীর দূত হইয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট গিয়াছিলেন। 'চণ্ডী'তে দেবী চণ্ডিকা এক স্বতন্ত্র দেবী. তিনি শুম্ভকে সদম্ভে বলিয়াছেন, "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা"—এ জগতে আমিই একমাত্র, আমার আবার দ্বিতীয় কে? দেবতারা চণ্ডীর স্তবে তাঁহাকে 'বিশ্বেশ্বরী', 'বিশ্বাত্মিকা', 'বিশ্বাশ্রয়া' ইত্যাদি শব্দে ভূষিত করিয়াছেন। সুতরাং তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র দেবী এইরূপ স্পষ্ট ইঙ্গিত মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্ভুক্ত চণ্ডী-আখ্যানে আছে। পরবর্তী কালে রচিত দেবীভাগবতে তাঁহাকে অখিল জগতের বিশ্বজননী বলা হইয়াছে। তিনি ও ব্রহ্ম যে একই, একথা দেবীভাগবত প্রকাশ্যেই প্রচার করিয়াছে। ব্রহ্মা দেবীর কাছে জানিতে চাহিলেন, তাঁহার সঙ্গে ব্রহ্মের কি সম্পর্ক। দেবী বলিলেন, "যোঽসৌ সাহমহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ"—তিনিও যা, আমিও তাই; মতিবিভ্রম বশতঃই লোকে আমাদের মধ্যে ভেদ করিয়া থাকে। সুতরাং লক্ষ্য করা যাইতেছে, চণ্ডী প্রথমে ছিলেন ব্রহ্মের শক্তি, পরে হইলেন বিষ্ণুমায়া বা বিষ্ণুশক্তি এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও দেবীভাগবতের মধ্য দিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে অদ্বিতীয়া ব্রহ্মসনাতনী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে উমা-পার্বতী ও চণ্ডিকার ধারা প্রায়ই এক হইয়া গিয়াছে।

বাঙলার শাক্ত পদাবলীতে হিমাচল-দুহিতা উমা-পার্বতী-গৌরী-দুর্গার যেরূপ উল্লেখ আছে, তেমনি আছে কালিকার। বোধ হয় এই পদসাহিত্যে দেবী কালিকার প্রভাবই অধিক। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থে কালিকা বা মহাকালিকার ঈষৎ ইঙ্গিত আছে। বিশেষজ্ঞের মতে বেদের রাত্রি দেবীই কালিকার পূর্বাভাস। মহাভারতেও রক্তাস্যনয়না, রক্তমাল্যানুলেপনা, পাশহস্তা ভয়ঙ্করী কালীর বর্ণনা আছে। খিলহরিবংশে আছে—মদ্যমাংসপ্রিয়া কালীকে শবর, বর্বর, পুলিন্দ প্রভৃতি অনার্য জাতিরা পূজা করিত। পরে কালী ও চামুণ্ডাদেবীকে প্রায় এক বলিয়া মনে হয়।[৮৯]

৮৯ চণ্ডীতে তাঁহাকে 'চামুণ্ডা' বলা হইয়াছে, কারণ তিনি চণ্ডমুণ্ডকে বধ করেন।

চণ্ডীতেও আছে, দেবী চণ্ডিকার ক্রুদ্ধ ললাটফলক হইতে নরকঙ্কালধারিণী, নরমালাবিভূষণা, লোলজিহ্বা, কৃষ্ণাঙ্গী, আরক্তলোচনা কালীর জন্ম হইল।[২০] ইনি অসুরগণকে মহাক্রোধে গ্রাস করিতে লাগিলেন। এখানে দেখা যাইতেছে, দেবী চণ্ডিকার দেহ হইতে কালিকার আবির্ভাব হইয়াছে, এবং চণ্ডীর নির্দেশেই তিনি রক্তবীজকে গ্রাস করেন। পরবর্তী পুরাণ ও তন্ত্রেও কালিকার সুবিস্তৃত বর্ণনা আছে। কিন্তু ইঁহার সহিত শিবের সংযোগ ঘটিল কি প্রকারে তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। আরও বিস্ময়ের কথা, মাতা চণ্ডিকা অসুরবিনাশের সময় শিবকে পদদলিত করিতেছেন এইরূপ বর্ণনাই নানাতন্ত্রে, বিশেষতঃ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'তন্ত্রসারে' গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য তন্ত্রে ইহার নানাপ্রকার দার্শনিক ও রূপক-ব্যাখ্যাও দেখা যায়।

কালিকা মূর্তির পূজোপাসনা অনেক পূর্ব হইতেই তন্ত্রের দেশ বাঙলায় প্রচারিত হইয়াছে।[২১] কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ (বোধ হয় চৈতন্যদেবের সমসাময়িক) 'তন্ত্রসারে' বাঙলা দেশে পূজিতা নানা প্রকার কালিকার উল্লেখ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক আচার্য ব্রহ্মানন্দ ('শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী' ও 'তারারহস্য' প্রণেতা), পূর্ণানন্দ ('শ্যামারহস্য' প্রণেতা) প্রভৃতি শাক্তসাধকগণ তান্ত্রিক সাধনা ও কালীর উপাসনা সম্বন্ধে নানা প্রকরণ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। বাঙলায় খ্রীঃ চতুর্দশ শতাব্দীর দিকে দশভুজার মূর্তি ও পূজার সন্ধান পাওয়া গেলেও চতুর্ভুজা কালিকার পূজা-পদ্ধতি ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে বড় একটা পাওয়া যায় না। অবশ্য এই ভয়ঙ্করী দেবীমূর্তির উপাসনা সমাজের সর্বত্র চলিত বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্ণব সম্প্রদায় তো মদ্যমাংসদানে কালিকাপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ফলে বহুস্থলে, কোথাও প্রকাশ্যে, কোথাও-বা অন্তরালে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব চলিত। এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশীনাথ 'কালীশপর্যাবিধি' গ্রন্থে যে ভাবে কালীপূজার সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, উচ্চতর সমাজের সর্বত্র এই দেবীর পূজা তখনও গৃহীত হয় নাই।[২২] কালিকাপুরাণে ও মহানির্বাণ

---

২০ বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা দ্বীপিচর্মপরিধানা শুষ্ক মাংসাতিভৈরবা।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনা ভীষণা নিমগ্নরক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥
(চণ্ডী, ৭।৭-৮)

২১. 'ব্রহ্মযামলে'র "কালিকা বঙ্গদেশে চ" উক্তিটি লক্ষণীয়

২২ দ্রঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৭৫

তন্ত্রাদিতে এই দেবীকে নানা গল্পকাহিনীর মধ্য দিয়া প্রধানা দেবী করিয়া তোলা হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের বহুস্থলে উমামহেশ্বর বা হরপার্বতীর নানাপ্রকার মানবলীলার চিত্র থাকিলেও কালীপূজা একটা বিশেষপ্রকার তন্ত্রসাধনারূপে বাঙলা দেশেই অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছিল। 'তন্ত্রসারে' কালী, তারা প্রভৃতির যে বন্দনা ও স্তব আছে, বাঙলা দেশের পরবর্তী কালের নিত্যকালী ও নৈমিত্তিক কালীপূজার যাবতীয় উপকরণ সেখান হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। বৌদ্ধ তারা, একজটা প্রভৃতি দেবীও কালিকার অনুরূপ—[১৩] মহাযানী বৌদ্ধধর্ম তন্ত্রের দ্বারা যে বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।[১৪] যতটুকু তথ্য পাওয়া যাইতেছে তাহাতে অনুমান হয়, মাতৃকা-উপাসনার দার্শনিক পটভূমিকারূপে তন্ত্রবিদ্যা বেদের পূর্বে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। তন্ত্রে 'চীনাচার' কথাটা এত অধিকবার ব্যবহৃত হইয়াছে যে মনে হয়, আদিতে ভোটচীনীয় নরগোষ্ঠীর

---

১৩ ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে, মহাচীনতারা, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি শাক্তদেবীগণ মূলতঃ মহাযানী বৌদ্ধ দেবী। এক বৌদ্ধ ডাকিনীর বর্ণনা এই রূপ :

চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা তু ত্রিনেত্রা একবক্ত্রিকা।
দংষ্ট্রারৌদ্রকরালী চ পঞ্চমুদ্রাভিধারিণীং ॥

তন্ত্রশাস্ত্র ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় মতকেই প্রভাবিত করিয়াছিল—এই উল্লেখ হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। (ডঃ ভট্টাচার্যের *Sadhanmala*—II দ্রষ্টব্য)

১৪ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে তন্ত্র কোন সম্প্রদায়বিশেষের নহে। ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায় তন্ত্রকে নিজ নিজ ধর্মসাধনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। "Tantricism is neither Buddhist nor Hindu in origin ; it seems to be religious under-current, originally independent of any abstruse metaphysical speculation, flowing on from an obscure point of time in the religious history of India," (Dr. S. B. Dasgupta—*Obscure Religious Cults as the Background of Bengali Literature*) কিন্তু ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে, "The bulk of literature which goes by the name of the Hindu tantras, arose almost immediately after the Buddhist ideas had established themselves." (*Sadhanmala*, Vol. II, Introduction) এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু সিদ্ধান্ত করা দুরূহ। তবে মনে হয় তান্ত্রিক দেবদেবীর পরিকল্পনায় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধমত একে অপরের দ্বারা অন্যোন্যভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল।

মধ্যে মন্ত্রতন্ত্রসংযুক্ত একপ্রকার উপাসনা ও সাধনা প্রচলিত ছিল। তারপরে ভোটচীনীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে ভৌগোলিক নৈকট্যের জন্য পূর্বভারতে তন্ত্রের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। "গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা"—ইহা অমূলক নহে। যাহা হউক তন্ত্রসাধনা কালক্রমে উত্তরবৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন ধর্মে প্রবেশ করে, তাহার সঙ্গে যোগ-হঠযোগ-তন্ত্রমন্ত্র-মুদ্রামণ্ডল যোগ দিয়া একটা বিচিত্র সাধন-প্রণালী গড়িয়া তোলে।

তন্ত্রের দেবতা শক্তি বা নারী। তিনি আদ্যাশক্তি, সৃষ্টিপ্রপঞ্চের মূল বীজ। জন্মযূপে বদ্ধ পশুভাবালম্বী জীবের মোহ বিনাশের পর কি করিয়া মোক্ষ লাভ হয় তাহাই তন্ত্রে নানা সাধনপ্রকরণের মধ্য দিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তান্ত্রিক দার্শনিকগণ দেখিয়াছেন, কলিতে মানবগণ "শিশ্নোদর-পরায়ণাঃ" ও "নিদ্রালস্যপ্রযুক্তাঃ" হইবে। ঐহিক সুখকামী জীবের যুগপৎ মোক্ষ ও সুখ, ভুক্তি ও মুক্তির জন্য তাঁহারা তন্ত্রাচারকেই কলিযুগের ভবব্যাধির একমাত্র নিদান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মানুষ যখন শুধু দেহী হইয়া থাকে, তখন তাহার নাম 'পশুভাব'। পরে সাধনার দ্বারা যাঁহারা দেহকে জয় করেন তাঁহারা বীরভাবের সাধক বলিয়া পরিচিত হন। এই 'বীরভাব' কোন কোন তন্ত্রে ('রুদ্রযামল') সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বীরভাবের সাধক দ্রঢ়িষ্ঠ মানসিক বলের সাহায্যে দুঃসাধ্য শবসাধনাদি করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। শীঘ্র সিদ্ধি লাভের জন্য বীরাচারী সাধকগণ 'পঞ্চমকার' এবং 'ষট্‌কর্মাদি'[১৫] আভিচারিক ক্রিয়াদি অনুশীলন করিয়া থাকেন। এই সমস্ত স্থূল ব্যাপারের গূঢ় তাৎপর্য আছে। ইহার পর 'দিব্যভাব'। ইহাই শ্রেষ্ঠ ভাব—সাধকের অন্তরে তখন মহাশক্তির দিব্যলীলা অনুভূত হয়—ইহা নিরাসক্ত নির্দ্বন্দ্ব অন্তর্যাগ—যাহার মূলকথা আদ্যাশক্তির আনন্দস্রোতে সাধক-সরিৎধারার পূর্ণ অবলুপ্তি। জীবকে অজীবলোকে উন্নীত করা, দেহপিণ্ডকে চিদানন্দময় ভাগবত তনুতে পরিণত করা, প্রবৃত্তি-তরঙ্গকে নিবৃত্তিসমুদ্রে বিলীন করা—ইহাই তন্ত্রসাধনার মূল রহস্য। প্রথমে পশুভাব, তারপর ক্রমোন্নতির ফলে বীরভাব, পরিশেষে দিব্যভাব—জীবের মোক্ষ-

১৫ পঞ্চমকার—মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাং মৈথুনমেব চ।
মকারং পঞ্চ দেবেশি শীঘ্রসিদ্ধিপ্রদায়কম্।
ষট্‌কর্ম— শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচাটন, মারণ।

মুক্তি।[২৬] এই পশু, বীর ও দিব্যভাবকে যথাক্রমে তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

তন্ত্রসাধনা প্রধানতঃ দেহকে কেন্দ্র করিয়াছে। তাই সাধককে ইষ্টসিদ্ধির জন্য প্রথমে দেহকে অবলম্বন করিয়া 'বহির্যাগ' করিতে হয়। 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী'তে বলা হইয়াছে, চৌরাশি লক্ষ শরীরীর মধ্যে মনুষ্য শরীর ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। সাধক দেখিয়াছেন, ব্রহ্মাণ্ড ও দেহভাণ্ডের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং তাঁহারা দেহ-সাধনার উপর পুনঃ পুনঃ গুরুত্ব দিয়াছেন। তান্ত্রিক ক্রিয়ার দ্বারা ভঙ্গুর জীবদেহেই পরামুক্তি লাভ হইতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় তন্ত্র, যোগ, হঠযোগ —সব মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়া আধিদৈহিক চর্যার রূপ ধারণ করিয়াছে। ইঁহারা দেহবিজ্ঞান আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভূত-শরীরে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ীর মধ্যে মেরুদণ্ডে প্রবাহিত ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না —এই তিন নাড়ীই প্রধান। আবার তাহার মধ্যে সুষুম্নাই সর্বপ্রধান। এই সুষুম্না নাড়ী গুহ্যদেশ হইতে শিরোদেশ পর্যন্ত প্রসারিত বলিয়া কল্পিত হইয়াছে ; এই নাড়ী বাহিয়াই চিৎশক্তির গতায়াত হইয়া থাকে। সুষুম্নাতে আবার ছয়টি চক্র (ষট্চক্র) পরিকল্পিত হইয়াছে। এই চক্রগুলি 'পদ্ম' নামেও অভিহিত হয়। ইহাদের নাম—মূলাধার চক্র, স্বাধিষ্ঠান চক্র, মণিপুর চক্র, অনাহত চক্র, বিশুদ্ধ চক্র ও আজ্ঞা চক্র। শিরোদেশে যে পদ্ম আছে তাহা সহস্র দল যুক্ত, তাহার নাম সহস্রার। গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যে মূলাধার চক্র, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান চক্র, নাভিমূলে মণিপুর চক্র, হৃদয়ে অনাহত চক্র, কণ্ঠে বিশুদ্ধ চক্র এবং ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্র অবস্থিত। তন্ত্রসাধনায় ন্যাস ও প্রাণায়ামের দ্বারা সাধক মূলাধারে নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনী অর্থাৎ আত্মাশক্তিকে জাগ্রত করিবেন, এবং কুম্ভকযোগের দ্বারা জাগ্রত কুলকুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে ক্রমে ক্রমে ঊর্ধ্বাভিমুখে উঠাইয়া স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞাচক্রে উন্নীত করিবেন। এইরূপ হইলে সাধকের অন্তরে বাহিরে চিদানন্দময় দিব্যানুভূতি জাগিবে। অতঃপর সাধক কুলকুণ্ডলিনীকে শিরঃস্থিত সহস্রারে

---

২৬ আদৌ ভাবং পশোঃ কৃত্বা পশ্চাৎ কুর্যাদাবশ্যকম্।
বীরভাবং মহাভাবং সর্বভাবোত্তমোত্তমম্।
তৎপশ্চাদতি সৌন্দর্যং দিব্যভাবং মহাফলম্। (রুদ্রযামল

নিদ্রোখিত শিবের সহিত 'সামরস্য' সাধন[১৭] করিবেন। ইহাই সাধকের মোক্ষ, নির্বাণ, মুক্তি। এইরূপ মানসিক অবস্থায় সাধকের আত্মপর ও জড়চেতন-বোধ এবং ভূতদেহের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন তিনি অপরিমেয় আনন্দস্রোতে ডুবিয়া যান। ইহার পর দিব্যচৈতন্যের অবস্থা আসে, যাহাকে সাধারণ ভাষায় 'সমাধি' বলা হয়।[১৮]

এই পটভূমিকায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্ত পদাবলীর স্বরূপ বিচার করিতে হইবে। বাঙলার শাক্ত কবিগণের অধিকাংশই তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তাই এই পদসমূহ নিছক কাব্যরসপিপাসা বা সহজভক্তির বশে রচিত হয় নাই। সাধ্য-সাধন-সম্পর্কিত মোক্ষতত্ত্বই বাঙলার শাক্ত পদাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

শাক্তপদের স্বরূপ ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীই শাক্তপদাবলীর বিকাশ ও পরিণতির যুগ। শ্রেষ্ঠ শাক্তপদকর্তৃগণ সকলেই এই শতাব্দীতে—বেশীর ভাগ দ্বিতয়ার্ধে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কেহ কেহ উনবিংশ শতাব্দীতেও শাক্তপদসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক উপাদান বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতেও শাক্তপদাবলীর প্রায় অনুরূপ সাহিত্য এদেশে একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। গোবিন্দদাস কবিরাজ প্রথম জীবনে শাক্ত ছিলেন। তাঁহার ভণিতায় হরপার্বতীর অর্ধনারীশ্বর বিষয়ক একটি পদও পাওয়া গিয়াছে।[১৯] শ্রীনিবাস আচার্যের প্রভাবে আসিবার পূর্বে তিনি শাক্ত সাধকই ছিলেন এবং অনুমান হয়, স্বভাবদত্ত কবিপ্রতিভার অধিকারী গোবিন্দদাস কিছু কিছু শাক্তপদও লিখিয়া থাকিবেন। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের পর তাঁহার শাক্ত মনোভাব ও শাক্তপদ সমভাবে মুছিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়াও চণ্ডীমঙ্গল বা ভবানীমঙ্গল ধরনের সাহিত্যে এবং শাক্তপুরাণের

---

১৭ এই সামরস্যকে যৌনমিলনের প্রতীকেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—"স্ত্রীপুংযোগে তু যৎ সৌখ্যং সামরস্যং প্রকীর্তিতম্।"

১৮ বিস্তারিত বর্ণনার জন্য অধ্যাপক শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর 'শাক্ত পদাবলী ও শক্তি সাধনা' (পৃ. ১৫৮-১৭১) দ্রষ্টব্য।

১৯ গোবিন্দদাস কবিরাজ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে।

বাংলা অনুবাদে শাক্তপদাবলীর পূর্বাভাস পাওয়া যায়। কিন্তু বিশিষ্ট কাব্য-শাখারূপে শাক্তপদাবলী অষ্টাদশ শতাব্দীতেই সর্বাধিক প্রাধান্য অর্জন করে। একদা পাঠান রাজত্বের অবসানকালে অরাজকতার মুহূর্তে জনসাধারণ প্রচণ্ড ক্ষমতাশালিনী দেবীর বরাভয় প্রার্থনা করিয়া মঙ্গলকাব্যকে প্রায় জাতীয় সাহিত্যে পরিণত করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দাতে, বিশেষতঃ মধ্যভাগে যখন সাম্রাজ্য, সমাজ, ধর্ম ও মনুষ্যত্ব ভাঙিয়া পড়িতেছিল, তখন দুর্বিপাক হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ভক্তহৃদয় আদ্যাশক্তির কাছে মোক্ষ প্রার্থনা করিয়া বাস্তব দুঃখনৈরাশ্যের কবল হইতে মুক্তির পথ খুঁজিয়াছে। এই জন্য দেখা যাইতেছে যাহারা উচ্ছৃঙ্খল শাসকের খামখেয়ালে সর্বস্বান্ত হইতেছিল, যে সমস্ত ধনাঢ্য ভূস্বামী নবাবী লীলার ইন্ধন জোগাইতে গিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে শ্যামা মায়ের নিকট অন্তরের আকুতি নিবেদন করিয়াছেন। তাঁহারা মোক্ষের কথা বলিলেও বাস্তব দুঃখকে বৈরাগ্যের গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা ঢাকিয়া ফেলেন নাই। যাহা হউক, প্রসিদ্ধ পদকর্তাদের শাক্তপদ হইতে দেখা যাইতেছে, এই পদসাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ ভাবদ্যোতক শাখা জনসাধারণ, কবি ও সাধকদের কাছে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই শাখার একটি অংশ কাহিনীকেন্দ্রিক, পুরাণে বর্ণিত হরপার্বতীর কাহিনী এবং তাহার সহিত সংযুক্ত লৌকিক গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনী দুই-ই অবিরোধে স্থান পাইয়াছে। এই কাহিনীতেই আবার মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীর আখ্যান ও তত্ত্ব গৃহীত হইয়াছে। আর একটি অংশে সাধকগণ কালিকাকে মাতৃরূপে ভজনা করিয়াছেন। মায়ের সঙ্গে সন্তানের যে স্নেহমধুর সম্পর্ক, ইঁহারা কালিকার সঙ্গে সেই সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন। এই অংশটি বৈষ্ণব-পদাবলীর বাৎসল্যরসের পদকে স্মরণ করাইয়া দেয়। অবশ্য শাক্তপদাবলীর বাৎসল্যরসের তুলনায় বৈষ্ণবপদাবলীর সমপর্যায়ের পদ ভাবের ঐকান্তিকতা ও আবেগের গভীরতায় ঈষৎ নিষ্প্রভ মনে হয়। তাহার কারণ শাক্তপদাবলীকারগণের বাৎসল্যরস একান্তভাবে বাস্তব মায়ের তীব্র চেতনায় পূর্ণ; বাস্তব বলিয়াই সে আবেগ এখনও এমন প্রত্যক্ষভাবে শ্রোতার চিত্ত আকর্ষণ করে। আর একটি পর্যায়ের পদে সাধকের 'সাধনসমর' অর্থাৎ মাতৃপ্রসাদে মোক্ষমুক্তি লাভের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে। এই অংশে কবি ও সাধকগণ তন্ত্রের নানা

ক্রিয়াকর্ম অবলম্বনে আদ্যাশক্তির করুণায় মোক্ষাভিপ্রয়াসী হইয়াছেন। শেষ পর্বই শাক্ত পদের ফলশ্রুতি, ভক্তের অদ্বৈতপন্থী ও ভূমানন্দময় মোক্ষলাভ।) (কবিগণ হরপার্বতীর গার্হস্থ্যজীবন বর্ণনায় বাঙলাদেশের প্রতিদিনের ছবিই গ্রহণ করিয়াছেন। এই সমস্ত অংশে কৃত্রিম কাব্যকলা সৃষ্টির কোনরূপ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না) বিশেষতঃ আগমনী ও বিজয়াবিষয়ক পদগুলিতে নিরাভরণ প্রাণের কথা মানবীয় আধারে পরিবেশিত হওয়াতে ইহাদের জনপ্রিয়তা এখনও অব্যাহত আছে। এখনও যখন হঠাৎ সজল দমকা হাওয়া দিয়াই বর্ষা বিদায় লয়, শরতের রৌদ্রাকীর্ণ প্রান্তরে উদাসী রাখালের মেঠো সুরের বাঁশী বাজে, তখন আগমনী পর্যায়ের পদগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া মনের মধ্যে গুনগুন করিতে থাকে, পথভিখারীর কণ্ঠে আগমনীর উল্লাস এবং বিজয়ার বিষণ্ণতা রামপ্রসাদী সুরে মাঠঘাট ভরিয়া ফেলে। তাই এই পদগুলিতে বাঙলা দেশের মায়েদের প্রাণের কথা বড় আন্তরিক করুণ সুরে ধরা পড়িয়াছে। এই জাতীয় পদের ভাবে-ভাষায় চেষ্টাকৃত কাব্যসৌন্দর্য সংযোজনার কোন চিহ্ন নাই—প্রাণের কথা কবি সাধকদের লেখনীতে সহজ-সরলভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।) কিন্তু তত্ত্বকথা বর্ণনায় কবিরা অলঙ্কার-কলা, বিশেষতঃ উপমারূপকের প্রচুর সাহায্য লইয়াছেন। কিংবা যেখানে সাধকেরা দেবীর প্রচণ্ড মূর্তির কথা বলিয়াছেন, সেখানেও ভাষায় তৎসম শব্দপ্রধান ক্লাসিক গাম্ভীর্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। যেখানে গিরিরাণী শিশু উমার আদর-আবদারের কথা গিরিরাজের কাছে আসিয়া নিবেদন করেন, তখন তাহার ভাষা মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্য-পরিপূরিত হইলেও তাহাতে কোনও-রূপ কাব্যকলার স্পর্শ নাই। উদাহরণস্বরূপ রামপ্রসাদের এই পদটি লক্ষ্য করা যাইতে পারে :

গিরিবর, আর পারি না হে প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান নাহি করে স্তন পান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে ॥
অতি অবশেষ নিশি গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়া ফুলালে আঁখি মলিন ও মুখ দেখি
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ॥

আয় আয় মা মা বলি ধরিয়ে কর অঙ্গুলি
যেতে চায় না জানি কোথা রে।
আমি কহিলাম তায় চাঁদ কি রে ধরা যায়
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে॥

এখানে কবির নিরাভরণ বর্ণনাই ইহার অলঙ্কার, সাদা কথাই কাব্যসমুৎকর্ষ সৃষ্টি করিয়াছে। আবার যখন ভক্তকবি আদ্যাশক্তির রণোন্মত্ত বেশ বর্ণনা করেন:

ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে কে আসে।
গলিত চিকুর আসব-আবেশে॥
বামা রণে দ্রুতগতি চলে দলে দানবদলে
ধরি করতলে গজ গরাসে।
নীলকান্তমণি নিতান্ত নখরনিকর তিমির নাশে॥
বামার কিরূপ ছটা রে কিরূপ ঘটা রে
ঘন ঘন ঘন উঠে আকাশে॥
কে রে কালী শরীরে শোভিছে রুধিরে
যমুনা সলিলে কিংশুক ভাসে।
কে রে নীলকমল শ্রীমুখমণ্ডল অর্ধচন্দ্র প্রকাশে॥

তখন ভাষা ও ভাবের মধ্যে একপ্রকার শঙ্কাতুর গাম্ভীর্য সঞ্চারিত হয়।

শাক্তপদের কবিত্ব ও সাধনা॥

সাধারণ কাব্যবিচারের মানদণ্ডের আদর্শে শাক্তপদাবলী বিচার করিতে গেলে কবিসাধকদের প্রতি অবিচার করা হইবে। কারণ ইঁহারা কেহই নিছক কাব্য করিবার জন্য বা শ্রোতাদের সঙ্গীত-পিপাসা নিবারণ করিবার জন্য এই গীতিকাসমূহ রচনা করেন নাই। তাঁহারা মূলতঃ সাধক ও মোক্ষাভিলাষী, গৌণতঃ কবি। তাই সাধারণ কাব্যকবিতার আদর্শে দেখিলে শাক্ত পদাবলীর অনেকটাই খর্ব মনে হইবে। কবিসাধকগণ নানা উপমা-অলঙ্কার ইঙ্গিতে-আভাসে জগজ্জননী আদ্যাশক্তির স্বরূপ নির্ধারণ করিতে গিয়াছেন, কারণ যাঁহাকে ভক্তি করিতে হয় তাঁহার একটা রূপায়তন না হইলে চলে না। তাই কবিরা পৌরাণিক সংস্কার ও গার্হস্থ্য চেতনার সমন্বয়ে মহাশক্তির বিশ্বাকাশসঞ্চারী বিরাট রূপের চিত্র যেমন আঁকিয়াছেন, তেমনি

আবার প্রতিদিনের জীবনকেন্দ্রেও বিশ্বমাতাকে ঘরের মায়ের রূপে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন। কবি কমলাকান্ত যখন বলেন :

রঙ্গে নাচে রণমাঝে কার কামিনী মুক্তকেশী।
হৈয়ে দিগম্বরী ভয়ঙ্করী করে ধরে তীক্ষ্ণ অসি ॥
কে রে তিমিরবরণী বামা হৈয়া নবীন ষোড়শী।
গলে দোলে মুণ্ডমালা মুখে মৃদু মৃদু হাসি ॥
বিনাশে দনুজ গণে দেখে মনে ভয় বাসি।
ভাখ, শবছলে চরণতলে আশুতোষ পড়িল আসি ॥

তখন কবি তন্ত্রে বর্ণিত বাঁধাগতের কালীরূপে বর্ণনা করেন—যাহাতে কবিত্ব-প্রকাশের বিশেষ অবকাশ নাই। কিন্তু যেখানে কবি কালভয়নিবারিণী মহাকালীকে নিজ অন্তরে উপলব্ধি করেন, তখনই তাহা শিল্পরূপ লাভ করে :

সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনোমোহিনী গো মা
তুমি আপনি সুখে আপনি নাচ, আপনি দাও মা করতালি।
আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালী।
যখন ব্রহ্মাণ্ড না ছিল হেথা মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ॥

কিংবা কবি যখন সাভিমানে কালিকাকে সম্বোধন করিয়া বলেন :

যে ভালো করেছ কালী আর ভালোতে কাজ নাই।
ভালোয় ভালোয় বিদায় দে মা আলোয় আলোয় চলে যাই ॥
মা তোমার করুণা যত বুঝিলাম অবিরত
জানিলাম শত শত কপাল ছাড়া পথ নাই ॥ (নরচন্দ্র)

তখন তাহাতে মর্ত্যের স্নেহাভিমান চমৎকার রসরূপ লাভ করে। শাক্তপদের কবিগণ কোন কোন স্থলে পৌরাণিক প্রভাবে গুরুগম্ভীর বাক্-রীতি ব্যবহার করিলেও[100] যেখানে প্রতিদিনের বাস্তব পরিবেশে আদ্যা-

১০০ যেমন—

অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণা রজ্জুরূপিণী।
না সরে নিঃশ্বাস পাশবন্ধনে রয়েছে প্রাণী ॥
চমকিত কি কুহক অজিত এ তিনলোক
অহংবাদী জ্ঞানী দেখে তমোরজোতে ব্যাপিনী।
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ সচৈতন্য নহে কেহ
শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনি ॥
(মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নামে প্রচারিত)

শক্তিকে স্থাপন করিয়াছেন সেখানে তত্ত্বরস মানবরসে পরিণত হইয়াছে। ব্যাকুল কবি যখন প্রশ্ন করেন :

বল্ মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা॥ (রামপ্রসাদ)

কিংবা কবি যখন নির্মম মাতার ব্যবহারে অভিমানস্ফুরিত কণ্ঠে বলেন :

মা বলে ডাকিস না রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই।
থাকলে আসি দিত দেখা সর্বনাশী বেঁচে নাই॥
শ্মশানে মশানে কত পীঠস্থান ছিল যত
খুঁজে হলাম ওষ্ঠাগত কেন আর যন্ত্রণা পাই॥ (নরচন্দ্র)

তখন ব্যক্তিচিত্তের স্পর্শে তত্ত্বকথাও মানবীয় আবেগ লাভ করে।

কবিগণ আগমনী-বিজয়ার পদে যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বাৎসল্য রসের এরূপ স্নিগ্ধতা, দেবীকে মানবীরূপের মধ্য দিয়া এরূপ নিবিড় উপলব্ধি—অথচ দেবীর দৈব মহিমাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, ইহার দৃষ্টান্ত বৈষ্ণব পদাবলীতে বিরল। দীর্ঘকাল পরে গৌরী পিতৃগৃহে ফিরিতেছেন, গিরিরাণীর স্নেহব্যাকুলতার আর্তি কবিরা একেবারে মানবী মাতার অন্তর হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। গিরিরাণীর অনুযোগে গিরিরাজের গৌরীকে আনিতে কৈলাসধামে যাত্রা, কন্যাকে নিজ পুরীতে লইয়া আসা, কিছুদিন আনন্দের হাটের বর্ণনা—এ সমস্তই বাঙালীর ঘরের পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুরবাসীরা গিরিরাণীকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন :

গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী। (দাশরথি রায়)

রাণী ব্যাকুল হইয়া কন্যাকে কোলে ধারণ করেন, "পুনঃ কোলে বসাইয়ে চারুমুখ নিরখিয়ে চুম্ব অরুণ অধরে," দীর্ঘ অদর্শনের পর মাতা-পুত্রীর এ মিলনদৃশ্য বাঙালীর ঘরের স্নেহ ছানিয়াই নির্মিত হইয়াছে। কবিগণ আত্মা-শক্তির বিরাট স্বরূপ সহস্রারের সহস্রদলে ধরিতে চাহিলেও আগমনী-বিজয়ার গানে কোলের সন্তানের কথাই বলিয়াছেন—এমন কি, কোন কোন পদকর্তা বলিয়াছেন, দশভুজা দুর্গা ও চতুর্ভুজা কালীমূর্তি দেখিয়া গিরিরাণী ভয়ে পিছাইয়া গিয়াছিলেন :

গিরি, কার কণ্ঠহার আনিলে গিরিপুরে।
এতো সে উমা নয়—ভয়ঙ্করী হে দশভুজা মেয়ে॥ (রসিকচন্দ্র)

কখনও গিরিরাণী বলিয়া ওঠেন :

কৈ হে গিরি কৈ সে আমার প্রাণের উমানন্দিনী।
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিণী॥ (দাশরথি)

জননী মেনকা তো ষড়ৈশ্বর্যশালিনী উমামহেশ্বরীকে চাহেন না :

হায় আমার সেই বিমলা অতি শান্তশীলা
রণবেশে কেন আসবে ঘরে।
* * * *
হায় হেন রণবেশে এল এলোকেশে
এ নারীরে কেবা চিনতে পারে॥ (রসিকচন্দ্র)

এই রণরঙ্গিণী রমণীতে গিরিরাণীর প্রয়োজন নাই—কবিদেরও প্রয়োজন নাই। মা যখন পুরবাসীকে ডাকিয়া বলেন :

দেখে যা গো নগরবাসী।
অঙ্গনে উদয় আমার উমা অকলঙ্ক শশী॥

তখন সে অকলঙ্ক শশী ভূতলেই উদয় হয়। কিন্তু আগমনী গানে যেমন স্নেহাসক্তির মানবীয় স্বাদ চিত্তকে প্রসন্ন করিয়া তোলে, বিজয়ার গানে তেমনি বিষণ্ণতা বৈরাগ্যের বেশ ধরিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। তিন দিন পরে বাঙালীর ঘর-সংসার চণ্ডীমণ্ডপ আঁধার হইয়া যায়। সেই কথা বিজয়ার গানে কবিগণ বড় মর্মান্তিকভাবে বলিয়াছেন। গিরিরাণী জানেন নবমীর নিশি পোহাইলেই ক্ষেপা মহেশ্বর আসিয়া উমাকে লইয়া যাইবেন—"ঐ দ্বারে বাজে ডম্বরু হর বুঝি নিতে এল।" ভোলা মহেশ্বর যে উমাকে আহ্বান করিয়াছেন :

বিছায়ে বাঘের ছাল দ্বারে বসে মহাকাল
বেরোও গণেশমাতা ডাকে বারবার।

মাতৃহৃদয়ের ব্যথা বেদনা বাঙালীর মনে চিরদিনই এমন একটা স্নেহব্যাকুল আবেগ সৃষ্টি করে যে, শরৎ আসিলেই যেমন একদিকে পীতরৌদ্রসিক্ত জলে-স্থলে আগমনীর গান বাজিতে থাকে, তেমনি আবার তাহারই সঙ্গে বিজয়ার বিষণ্ণতাও অন্তরকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে—বাঙালীর দশভুজা উৎসব শুধু ধর্মীয় উৎসব নহে, সমাজ ও পারিবারিক জীবনের সঙ্গেও ইহা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সুতরাং এই গানগুলিকে শুধু সাহিত্যের আদর্শে বিচার করিলে

চলিবে না, ইহার সঙ্গে বাঙালীর দীর্ঘ দিনের সংস্কারের যোগ তাহা ভুলিলে ইহার যথার্থ স্বরূপ বুঝা যাইবে না।

কবিগণ সাধনভজন-সংক্রান্ত যে সমস্ত গান লিখিয়াছেন এবং রূপকের ছলে যে সমস্ত নীতি-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে রসের সম্পর্ক বড় অল্প। সাধক-কবি যখন তন্ত্রসাধনার তাৎপর্য প্রতীকের সাহায্যে ইঙ্গিত দেন :

ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্যবিনোদিনী॥
শরীর শারীর যন্ত্রে সুষুম্নাদি ত্রয়তন্ত্রে
গুণভেদে মহামন্ত্রে তিন গ্রাম সঞ্চারিণী॥
আধারে ভৈরবাকার ষড়দলে শ্রীরাগ আর
মণিপুরেতে মহ্লার বসন্তে হৃৎপ্রকাশিনী॥ (নন্দকুমার)

কিংবা

হৃৎকমলমঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মনপবনে দুলাইছে দিবসরজনী ও মা॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা সুষুম্না মনোরমা
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা ব্রহ্মসনাতনী ও মা॥ (রামপ্রসাদ)

তখন মনে হয় কবি সাধনতত্ত্ব লইয়া এত ব্যস্ত যে কবিত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার সময় পান নাই। কিন্তু কোথাও কোথাও নিছক তত্ত্বকথাও ব্যক্তি-জীবনের স্পর্শে রসময় হইয়া উঠিয়াছে :

যে দেশেতে রজনী নাই সেই দেশের এক লোক ধরেছি।
আমার কিবা দিন কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি॥
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই যোগেযাগে জেগে আছি
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥

শাক্ত সাধকগণ ভারতবর্ষের সনাতন প্রথামতো রূপক-প্রতীকের প্রচুর সাহায্য লইয়াছেন, বিশেষতঃ তত্ত্বকথা ব্যাখ্যায়—এবং সে রূপকপ্রতীক প্রতিদিনের জীবন হইতেই চয়িত হইয়াছে। এখানে এইরূপ কিছু রূপক-প্রতীকের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :

পাশা খেলার রূপক—

ভবের আসা খেলব পাশা বড়ই আশা মনে ছিল
মিছে আশা ভঙ্গ দশা প্রথমে পঞ্জুড়ি প'ল॥

পঁবার আঠার ষোল   যুগে যুগে এলাম ভাল
শেষে কচ্চে বার পেয়ে মাগো পাঁজাছকায় বদ্ধ হল ॥ (রামপ্রসাদ)

কলুর বলদ—

মা আমায় ঘুরাবে কত।
কলুর চোখঢাকা বলদের মত ॥ (ঐ)

কূপের ঘড়া—

আর কত কাল ভুগবো কালী হয়ে আমি কুয়োর ঘড়া।
এই ভবকূপে কোনরূপে নিবৃত্তি নাই ওঠা পড়া ॥
আশী লক্ষ পাটে ঠেকে সর্বাঙ্গে পড়েছে কড়া।
আবার গলায় কশা শক্ত ফাঁসা মায়ামোহ দড়িদড়া ॥ (প্যারীমোহন)

তাস (গ্রাবু) খেলা—

সাধনরূপ গ্রাবু খেলা এই বেলা মন খেলিয়ে নে রে।
জিৎ হবে ভবের বাজি কালী নামের টেকা মেরে ॥ (রসিকচন্দ্র)

কৃষিকার্য—

মন রে কৃষিকাজ জান না।
এমন মানবজমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা ॥ (রামপ্রসাদ)

তারের বাদ্যযন্ত্র—

মন-সেতারে বাজারে তার তারা তারা বলে।
কাল বন্ধন করিতে তোরে আসে রজ্জু নিয়ে করে ॥
তোমার দেহরূপী লাউ ছিল   বহু দিনে জীর্ণ হল
জ্ঞানপর্দা ছিন্নভিন্ন হল তোর দোষে ॥ (গোবর্ধন)

নৌকা—

মনপবনের নৌকা বটে বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বলে।
মন মহামন্ত্র যন্ত্র যার সুনাতাসে বাদাম তুলে ॥
মহামন্ত্র কর হাল   কুণ্ডলিনী কর পাল
সুজন কুজন আছে যারা তাদের দে রে দাঁড়ে ফেলে ॥ (কমলাকান্ত)

ঘুড়ি—

শ্যামা মা উড়াচ্ছেন ঘুড়ি ভবসংসার বাজারের মাঝে।
ঐ যে মন-ঘুড়ি, আশাবায়ু বাঁধা তাতে মায়াদড়ি ॥ (রামপ্রসাদ)

এখানে দেখা যাইবে কবিগণ নিতান্তই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার রূপকে তত্ত্বকথার ইঙ্গিত দিয়াছেন। তবে একথাও স্বীকার করিতে হইবে, এই সমস্ত রূপকপ্রতীকের সাহায্যে তত্ত্বকথার ব্যঞ্জনা যথাযথ হইলেও বহু স্থলেই

ইহাতে বিশেষ কবিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু কবিরা যেখানে ব্যক্তিগত কথা বলিয়াছেন, সেখানে তত্ত্বরসও কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। কবি যখন বলেন—

মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় করে ছলো।
ওমা মিঠার লোভে তিতমুখে সারা দিনটা গেল॥ (রামপ্রসাদ)

কিংবা—

আমি কি দুখেরে ডরাই।
দুখে দুখে জন্ম গেল আর কত দুখ দাও দেখি তাই॥

* * *

প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি বোঝা নামাও ক্ষণিক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোকে গর্ব করে আমি করি দুখের বড়াই॥ (রামপ্রসাদ)

অথবা—

দোষ কারো নয় গো মা।
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা॥

তখন কবিদের বাস্তব দুঃখবেদনা ভক্তিরসে সার্থক হইলেও ইহার আবেদন মানুষের সহানুভূতিকে জাগ্রত করে। শাক্তপদের এই তীব্র বাস্তবচেতনার একটা কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক ও রাজনৈতিক দুঃখলাঞ্ছনা। মুঘল শাসনের অবসান এবং ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভকালে সাধারণ ব্যক্তি ও জমিদার উভয়কেই সেই বিশৃঙ্খলার তাপ ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই যুগে অশান্তি, আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা বাঙালীর মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল—কবিগণ তাহার পটভূমিকায় অধ্যাত্ম রসের কথা বলিয়াছেন বলিয়া ইহার বাহ্যিক রূপ অধিকতর চিত্তাকর্ষী হইয়াছে।

শাক্তপদের সাধনার কথা বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, কবিগণ সকলেই যেন অসহায় মানবশিশু, বাস্তব দুঃখলাঞ্ছনা তাঁহাদিগকে মুমূর্ষু করিয়া তুলিয়াছে। তাই তাঁহারা কালভয়নিবারিণী মহাকালিকার চরণে শরণ লইয়াছেন। কবিদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আদ্যাশক্তি। তিনি কখনও হরগেহিনী পার্বতী, গণেশজননী দুর্গা, কখনও চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী চণ্ডিকা, কখনও-বা ধ্বংসের প্রতীক কালিকা। সাধকগণ সেই আদ্যাশক্তির প্রসাদ প্রার্থনা করিয়াছেন, কালিকার উদ্যত খড়্গের তলে নিজেদের সঁপিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আদ্যাশক্তিই বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের মূল প্রেরণা। এই দিক

দিয়া তাঁহারা বেদান্তবাদীদের মতো অদ্বৈতবাদী।) কখনও তাঁহারা আদ্যা-শক্তিকে বলেন, "আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালী" (কমলাকান্ত), কেহ বলেন, "ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম—সকল আমার এলোকেশী" (রামপ্রসাদ), "আমার ব্রহ্মময়ী সর্বঘটে—পদে গয়াগঙ্গাকাশী" (ঐ) ষড়দর্শনেও তাঁহাকে পাওয়া যায় না ("ষড়দর্শনে না পায় দর্শন"—রামপ্রসাদ)। তাই রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, "আমি কালী ব্রহ্ম জেনে ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।"[১] দেওয়ান রামদুলাল নন্দী এ বিষয়ে চমৎকার বলিয়াছেন :

জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজি।
যে তোমায় যেভাবে ডাকে তাতে তুমি হও মা রাজি॥
মগ বলে ফরাতারা গড্ বলে ফিরিঙ্গী যারা মা
খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী॥
শাক্তবলে তুমি শক্তি শিব তুমি শৈবের উক্তি মা
সৌরী বলে সূর্য তুমি মা, বৈরাগী কয় রাধিকা জি॥
গাণপত্য বলে গণেশ যক্ষ বলে তুমি ধনেশ
শিল্পী বলে বিশ্বকর্মা বদর বলে নায়ের মাঝি॥

পরিশেষে রামদুলাল আদ্যাশক্তিকে ব্রহ্ম নামেই অভিহিত করিয়াছেন। কমলাকান্তও বলিয়াছেন, "যেরূপ যে জন করেন ভজন সেইরূপ তার মানসে রয়"। তাঁহাকে কবিওয়ালা নীলুঠাকুর (চক্রবর্তী) বলিয়াছেন, "ব্রহ্মরূপিণী, ব্রহ্মার জননী ব্রহ্মরন্ধ্রবাসিনী।" এইরূপ অদ্বৈততত্ত্বের মারফতেই কবিগণ সমস্ত সৃষ্টির মূলশক্তি আদ্যাশক্তিকে ব্রহ্মস্বরূপিণী বলিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। (শাক্তপদাবলীর পূর্বে বৈষ্ণবপদাবলী ও বৈষ্ণবমতাদর্শ সমগ্র বাঙলাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই শাক্তপদাবলীর গঠনপ্রকৃতিতে বৈষ্ণব প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য পুরাণে (চণ্ডী) মহামায়াকে পরমবৈষ্ণবী বলা হইয়াছে। তিনি বিষ্ণুর যোগনিদ্রা,[২] তাঁহার শক্তি; তাই তিনি বিষ্ণুমায়া নামে পরিচিত।[৩] বাঙলার শাক্তপদকারগণ বৈষ্ণবপদাবলী ও তত্ত্বের দ্বারা

১ পাঠান্তর—"এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্মকর্ম সব ছেড়েছি।"

২ শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৫৪

৩ যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। স্বয়ং রামপ্রসাদ কালীকীর্তনে বৈষ্ণব পদপর্যায়ই অনুসরণ করিয়াছেন—যদিও সে বর্ণনায় সর্বত্র সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই।[৪] শাক্তপদকারগণ এ বিষয়ে প্রচ্ছন্ন বৈষ্ণবানুরক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা শ্যামা ও শ্যামকে অভেদ বলিয়াছেন। এখানে এইরূপ কয়েক ছত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

(১) কালীঘাটে কালী তুমি মাগো কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধা প্যারী গোকুলে গোপিনী গো॥ (দ্বিজ রামপ্রসাদ)

(২) কালী হলি মা রাসবিহারী নটবর বেশে বৃন্দাবনে
পৃথক প্রণব নানা লীলাতব কে বুঝে একথা বিষম ভারি।
নিজ তনু আধা গুণবতী রাধা
আপনি পুরুষ আপনি নারী॥ (রামপ্রসাদ)

(৩) জান না রে মন পরম কারণ কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়॥
হয়ে এলোকেশী করে লয়ে অসি দনুজতনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি বাজাইয়ে বাঁশী ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়॥
(কমলাকান্ত)

(৪) অভেদে ভাব রে মন কালা আর কালী।
মোহন মুরলিধারী চতুর্ভুজা মুণ্ডমালী॥ (রামদুলাল দাস)

(৫) হৃদয়রাসমন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে।
একবার বাঁকা হয়ে দে মা দেখা শ্রীরাধারে বামে লয়ে॥ (নবাই ময়রা)

(৬) যশোদা নাচাতো গো মা বলে নীলমণি।
সে বেশ লুকালো কোথা করালবদনী শ্যামা॥ (রামপ্রসাদ)

এই সমস্ত উদ্ধৃতি হইতে দেখা যাইতেছে, শাক্তকবিগণ অসাম্প্রদায়িক উদার ধর্মসাধনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। আদ্যাশক্তির মধ্যেই সমস্ত তত্ত্ব নিহিত আছে, সব দেবদেবীই তাঁহার কায়ব্যূহ নির্মাণ করিয়াছেন, তাঁহার চরণ সমস্ত তীর্থের সার তীর্থ[৫]। তবু তাঁহারা যে কালী ও কৃষ্ণকে

---

৪ পরে আলোচনা করা হইয়াছে। শাক্তপদকার রামপ্রসাদ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৫ মদনমাস্টার নামক এক কবিওয়ালা গাহিয়াছেন, "গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি কাশীকাঞ্চী কেবা চায়।" রামপ্রসাদও বলিয়াছেন :

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়াগঙ্গা বারাণসী॥

এক করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, বৈষ্ণবতত্ত্ব তাঁহাদিগকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।)

শাক্তপদাবলীর কাব্যোৎকর্ষ বৈষ্ণবপদের সমতুল্য নহে, তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। কারণ অধিকাংশ কবি মূলতঃ ছিলেন সাধক ও গায়ক। সুতরাং সাধনা ও গানের সুরের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি থাকার জন্য শাক্তপদাবলী সর্বত্র কাব্যরূপ লাভ করিতে পারে নাই। বহু স্থলে রূপকাশ্রয়ী তত্ত্বকথা, তান্ত্রিক-সাধনা প্রভৃতি পারিভাষিক ব্যাপার এত বেশী ব্যবহৃত হইয়াছে যে, মণ্ডনকলার প্রতি কবিদের বিশেষ কোন লক্ষ্যই ছিল না। সহজ সরলভাষায় রূপকের আধারে কবিগণ বাৎসল্যরসের আবেগকে চমৎকার পার্থিব মূর্তি দান করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর যেমন অযুত ঐশ্বর্য যে-কোন পাঠককেই মুগ্ধ করিয়া রাখে, শাক্তপদাবলী সম্বন্ধে সর্বদা সে কথা বলা যায় না। তবে বৈষ্ণবপদাবলী হইতে বৈষ্ণব কবিদের ব্যক্তিগত কথা ততটা ধরা যায় না, শাক্তপদাবলীর কবিরা কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত কথা নিবেদন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। সে যাহা হউক, শাক্তপদাবলীর কাব্যসৌন্দর্য ও আবেগের সূক্ষ্মতা ও গভীরতা বৈষ্ণবপদাবলীর মতো উচ্চশ্রেণীর না হইলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্ত ভক্তিবাদ এবং বাঙালী সমাজের সঙ্গে সেই ভক্তিবাদের সম্পর্ক বুঝিতে হইলে শাক্তপদশাখার বিশেষ মূল্য স্বীকার করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে শাক্তপদের সঙ্গীতের আবেদনও স্মরণ করা যাইতে পারে। বৈষ্ণবপদাবলী যেমন বিভিন্ন ঘরানার কীর্তনের দ্বারা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্তপদাবলীও একটা বিশেষ সঙ্গীতরীতি অবলম্বন করিয়াছিল। অধিকাংশ শাক্তপদ বিভিন্ন রাগ রাগিণীতে গীত হইত, এখনও হয়। রামপ্রসাদ-কমলাকান্তের শ্যামাসঙ্গীতের মুদ্রিত সংস্করণের গানগুলির শিরোদেশে সব সময় রাগ ও তালের উল্লেখ থাকিত। রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু), কালী মির্জা, শ্রীধর কথক প্রভৃতি টপ্‌পাগায়কদের দ্বারা কিয়দংশে মার্গসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত টপ্‌পা গায়ন-রীতি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই টপ্‌পার ঢঙে 'ঠাকরুণ বিষয়ক' গান বা 'মালসী' (<মালবশ্রী) গান সঙ্গীতরসিক মহলে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু উমার বাল্যলীলা ও

কালীমহিমা বিষয়ক যে ধারাবাহিক পালাগান উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা কালীকীর্তন নামে পরিচিত। ইহাতেও নানা রাগ ও তাল অনুসৃত হইত। কিন্তু শাক্তপদের যে গীতিধারা অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে, এখনও যাহার সহজ সুরে গৃহাসক্ত মন বিবাগী হইয়া ওঠে, তাহা প্রসাদী সুর নামে পরিচিত। রামপ্রসাদ ইহার উদ্ভাবয়িতা অথবা অপর কেহ ইহা শাক্তপদের জন্যই উদ্ভাবন করেন তাহা জানা যাইতেছে না। তবে রামপ্রসাদ একজন সুদক্ষ গায়ক ছিলেন, স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার গান শুনিবার জন্য হালিশহরে আসিতেন, এমন কি নবাব সিরাজদ্দৌলাও নাকি তাঁহার শ্যামাসঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হন—এইরূপ নানা জনশ্রুতি হইতে মনে হয় প্রসাদী সুরের গায়ন-রীতিটি তাঁহারই উদ্ভাবন। এ গানের সুরকার তিনিই হউন, অথবা আর কেহ হউক, ইহার প্রাণগলানো সুরের মধ্যে এমন একটা নির্বেদ-বৈরাগ্যের ভাব আছে যে, এ গান এখনও সংসারজ্বালাদগ্ধ সাধারণ বাঙালীর প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা আনিয়া দেয়। এইবার কয়েকজন শাক্ত পদকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

কয়েকজন শাক্তপদকার ॥

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা দেশে অন্ততঃ কুড়িজন শাক্তপদকারের আবির্ভাব হইয়াছিল যাঁহারা প্রকৃত কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন।[৬] মাতৃনাম প্রচারক কবিওয়ালা ও টপ্‌পা গায়কদের সংখ্যা এবং গুণগত উৎকর্ষও অল্প নহে।[৭] অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী মহাশয় বহু সুপরিচিত ও অল্পপরিচিত সাধক-কবির জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই সমস্ত বিবরণে দেখা যাইতেছে—শাক্ত কবিগণ সকলেই গৃহী জীবন যাপন করিয়াছেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ আবার তান্ত্রিক মতের সাধকও ছিলেন। যে কবিওয়ালারা কবিগানের আসরে শ্রাব্য-অশ্রাব্য ভাষায় কুৎসিত গান ধরিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না, তাঁহারাও 'ঠাকরুণ বিষয়ক' গান গাহিবার সময় অতিশয় সাত্ত্বিক ভাষা অবলম্বন করিতেন। টপ্‌পা গায়কদের প্রধান অবলম্বন

---

৬ ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে ভালোমন্দ মিশাইয়া শাক্ত পদাবলীর কবির "সংখ্যা শতাধিক হইবে।" (কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ, পৃ. ৫৫)

৭ বিস্তারিত বিবরণের জন্য অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর 'শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা'

মর্ত্যপ্রেমের আলো-আঁধারি লীলা। কিন্তু তাঁহারাও টপ্‌পার গায়নরীতি অনুসারে যে সমস্ত শ্যামাসঙ্গীত ধরিয়াছিলেন, তাহার ভক্তির আন্তরিকতা বিস্ময়কর। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—এই যুগের শাক্তপদকারদের মধ্যে অনেকেই জমিদার ও ভূস্বামী বংশীয়। বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, নাড়াজোল নাটোর, কুচবিহারের প্রভৃতি রাজবংশের অনেকেই উৎকৃষ্ট শাক্তপদ রচনা করিয়াছেন। রাজাদের আদর্শ অনুসারে তাঁহাদের দেওয়ান প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্মচারীরাও পদকর্তারূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পুরাতন জমিদার বংশ নিঃস্ব হইয়া পড়িলে তাঁহারাই ঐহিক ক্ষয়ক্ষতি ভুলিবার জন্য শ্যামামাতার চরণে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইহা কিন্তু পুরাপুরি সত্য নহে। কোন কোন ভূস্বামীর মনের প্রকৃতিটিই সাধকধরনের ছিল। নাটোরের মহারাজ রামকৃষ্ণ প্রকৃত মাতৃভক্ত সাধক ছিলেন। তাঁহার জমিদারি ভাঙিয়া পড়িতে থাকিলে তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন—তিনি ভাবিতেন, এইভাবে মহামায়া তাঁহার সংসারবন্ধন কাটিয়া দিতেছেন। এখানে কয়েকজন প্রধান শাক্ত পদকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

১. রামপ্রসাদ সেন ॥

বাঙলা সাহিত্যে সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেন শুধু একজন কবিমাত্র নহেন, মাতৃমন্ত্রের তিনি প্রধান উদ্‌গাতা না হইলেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ পূজারী। তাঁহার পূর্বে বাঙলার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের স্থানে স্থানে শাক্ত পদাবলীর আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। রামপ্রসাদের সমসাময়িক ভারতচন্দ্রের রচনায় বহু স্থলে শাক্ত পদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে।[৮] কিন্তু রামপ্রসাদের কণ্ঠে শ্যামা-সঙ্গীত আকাশগঙ্গার শতধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। তাই তাঁহাকে শাক্ত-পদাবলীর প্রথম পূজারী বলিয়া ধরা হয়।

রামপ্রসাদের জীবনী—রামপ্রসাদের জীবনকথা ও শ্যামাভক্তি বাঙালীর ঘরে ঘরে প্রবাদবাক্যের মতো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার

(কবিপ্রসঙ্গ) দ্রষ্টব্য।

৮ পূর্বে ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

জীবনের ঘটনা বাস্তব ও অলৌকিকে একেবারে মিশিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু নানা সূত্র হইতে তাঁহার জীবনকাহিনী সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গিয়াছে। 'বিদ্যাসুন্দরে'ও তিনি নিজের সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ দিয়াছেন। বৈদ্য কুলপঞ্জিকাকারদের মতে বৈদ্যবংশের পূর্বপুরুষ শ্রীহর্ষসেন (চতুর্দশ শতাব্দী) নবাব ফকিরুদ্দিন শাহের ভিষক ছিলেন।[৯] সুলতানের কৃপায় তিনি সেনভূম পরগণার জমিদারি লাভ করেন। ইঁহার বংশধর বিমলসেন প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। তাঁহার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ কীর্তিবাস সেন। কীর্তিবাস ধলহণ্ড গ্রামে বাস করিতেন। রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর কাব্যে তাঁহার এই পূর্বপুরুষ কীর্তিবাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।[১০] তাঁহার কোন বংশধর (জয়কৃষ্ণ বা রামেশ্বর বা রামরাম) ধলহণ্ড গ্রাম ত্যাগ করিয়া কুমারহট্টে বসবাস করেন। এই সময় তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল।

ঈশ্বর গুপ্ত সর্বপ্রথম রামপ্রসাদের জীবনী সংগ্রহের চেষ্টা করেন (সংবাদ প্রভাকর, ১২৬০)। তাঁহার মতে প্রায় ষাট বৎসর বয়সে (১৭৮১ খ্রীঃ অঃ) রামপ্রসাদ দেহত্যাগ করেন। তাহা হইলে তাঁহার জন্মকাল ১৭২০-২১ খ্রীঃ অব্দের মধ্যেই হইবে মনে হয়। ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যও[১১] ঈশ্বর গুপ্তকে সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে কুলজীগ্রন্থ 'রত্নাপ্রভা' অনুসারে ১৭০০ খ্রীঃ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে রামপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিধিরামের জন্ম হয়। এই নিধিরামের প্রপৌত্র গঙ্গাচরণ সেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহপাঠী ছিলেন। রামপ্রসাদ কোন এক পদে "সোমমৌলি প্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল ধাম, ভজে বুধ বৃহস্পতি হীন কর্মনাশা"—এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১১২৭ বঙ্গাব্দ (১৭২০ খ্রীঃ অঃ) পাইয়াছেন। যাহা হউক উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধা নাই। রাম-

---

৯ কণ্ঠহারের কুলপঞ্জিকা দ্রষ্টব্য।

১০ ধনহেতু মহাকুল পূর্বাপর শুদ্ধ মূল
কীর্তিবাস তুল্য কীর্তি কই।
দানশীল গুণবন্ত শিষ্টশান্ত গুণান্বিত
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী॥

১১ ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন

প্রসাদ ভারতচন্দ্র অপেক্ষা কিছু বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার পিতা রামরাম সেনের দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের একমাত্র সন্তান নিধিরাম, দ্বিতীয় পক্ষের তৃতীয় সন্তান রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের দুই পুত্র ও দুই কন্যা—রামদুলাল, রামমোহন, পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী। পিতার মৃত্যুর পর নিতান্ত তরুণ বয়সে রামপ্রসাদ বিষয়কর্মে প্রবৃত্ত হন। কলিকাতার কোন এক ধনাঢ্য ভূস্বামীর বাটীতে তিনি মুহুরিগিরি করিতেন।[১২] অল্পবয়সেই তিনি শাক্তমতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এই সময় তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরভক্তির আবেশও দেখা যাইত। তিনি প্রভুর হিসাবের খাতায় "আমায় দাও মা তবিলদারী" গান লিখিয়াছিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া ভূস্বামী-প্রভু তাঁহাকে ভর্ৎসনা না করিয়া ভক্তকবিকে মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া কর্ম হইতে মুক্তি দেন। স্বয়ং দেবী কালিকা কবির কন্যা সাজিয়া বেড়া বাঁধিতে কবিকে সাহায্য করিয়াছিলেন, দেবী অন্নপূর্ণা তাঁহার গান শুনিবার জন্য কাশী ছাড়িয়া কবির চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছিলেন—এইরূপ নানা অলৌকিক কাহিনী এখনও চলিয়া আসিতেছে। শুনা যায় সিরাজদ্দৌলাও নাকি নৌকায় ডাকিয়া লইয়া গিয়া কবির শ্যামাসঙ্গীত শুনিয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কবি তাহা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন।[১৩] কবির কিছু উপার্জন ছিল। ভক্তগণ প্রণামী দিত; তাহা ছাড়াও অনেক ধনাঢ্য ভূস্বামীর নিকট তিনি ভূমিদান লাভ করিয়াছিলেন। স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবির গ্রামের নিকটে চৌদ্দ বিঘা নিষ্কর জমি দান

---

১২ ঈশ্বরগুপ্ত শুনিয়াছিলেন, কবি খিদিরপুরের গোকুলচন্দ্র ঘোষাল অথবা কলিকাতার দুর্গাচরণ মিত্রের বাড়ীতে কর্ম করিতেন। কেহ বলেন—তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মুহুরি ছিলেন (হরিমোহন সেন—'বিবিধার্থ সংগ্রহ', ১৭৭৩ শক, ফাল্গুন)। কেহ বলেন, তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঠিকাদার কৃষ্ণ মল্লিকের বাটীতে ১২৲ টাকা মাহিনায় চাকুরি করিতেন। আর একমতে রামপ্রসাদ নাকি চুঁচুড়ায় শীলেদের কর্মচারী ছিলেন।

১৩ ১২৬০ সালের (মাঘ) সংবাদ প্রভাকরে রামপ্রসাদ সেনের গ্রামবাসী যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেই প্রথম এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। পত্রপ্রেরক বলিয়াছেন, "রামপ্রসাদ সেন অস্মদ গ্রামস্থ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বিষয়ে আমরা অনেক জ্ঞাত আছি।" সিরাজদ্দৌলা রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন—ইহা জনরব বলিয়াই মনে হয়। তবে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে মাঝে মাঝে হালিশহরের কাছারিবাটীতে আসিয়া রামপ্রসাদের গান শুনিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

করিয়াছিলেন।[১৪] তাঁহার প্রদত্ত জমির মোট পরিমাণ পঞ্চাশ বিঘারও অধিক। সুতরাং কবি নিতান্ত নিঃস্ব ছিলেন না। কিন্তু অধিকাংশ অর্থ দানধ্যানেই ব্যয় হইয়া যাইত বলিয়া কবির দারিদ্র্যদুঃখ কোন দিনই ঘুচে নাই। এই সাধক-কবির তিরোধান সম্বন্ধেও অনেক জনশ্রুতি আছে। তিনি নাকি শ্যামাপূজার বিসর্জনের দিনে জলে নিমজ্জিত হইয়া স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করেন। এবিষয়ে ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছেন, "প্রাচীন লোকেরা কহেন, তিনি শ্যামা-প্রতিমা বিসর্জনের সময়ে পরিজন স্বজন বান্ধব সকলকে কহিলেন, অদ্য মায়ের বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিসর্জন হইবে, অতএব তোমরা সকলে প্রতিমা লইয়া আমার সঙ্গে আইস আমি পদব্রজে চলিলাম। এই বলিয়া বহুলোক সমভিব্যাহারে জাহ্নবীতটে গান করিতে করিতে আইলেন।" মৃত্যুর (১৭৮১ খ্রীঃ অঃ)[১৫] পূর্বে তিনি শ্যামাসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে জলে নিমজ্জিত হন। তাঁহার তিরোধান সম্পর্কে নানা গালগল্প, প্রবাদ ও জনশ্রুতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এইরূপ মাতৃসাধকের জীবনের সঙ্গে নানাপ্রকার অলৌকিক ব্যাপার কালক্রমে জড়াইয়া গিয়া বহু কাহিনীর উদ্ভব হওয়াই স্বাভাবিক। কলিকাতার সঙ্গে কবির কিছু যোগাযোগ ছিল। এখানে তিনি প্রায় দেড় বৎসর জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিয়াছিলেন। কলিকাতার জোড়াসাঁকোর নিকট দয়েহাটায় মাতুলালয়ে তিনি কিছুকাল অতিবাহিত করেন। কলিকাতার বিশিষ্ট ধনী ও কায়স্থ সমাজের অন্যতম নেতা চূড়ামণি দত্তের সঙ্গেও[১৬] তাঁহার সম্প্রীতি ছিল। তখন সবেমাত্র কলিকাতার নাগরিক

---

১৪ এ বিষয়ে এবং তাঁহার উপাধি ('কবিরঞ্জন') সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কবির বিদ্যাসুন্দর প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে।

১৫ ডঃ এডোয়ার্ড টমসনের মতে, "He died in 1775." (*Bengali Religious Lyrics*, p. 17)

১৬ প্রাচীন কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য দুই কায়স্থ নেতা শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেব এবং চূড়ামণি দত্তের মধ্যে যে কৌতুকপ্রদ রেষারেষি ছিল তাহার নানা গালগল্প প্রচলিত আছে। চূড়ামণি আমৃত্যু নবকৃষ্ণকে 'ছুয়ো' দিয়া আসিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে যখন তাঁহাকে দোলায় চাপাইয়া গঙ্গাযাত্রায় লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন তাঁহারই রচিত সঙ্কীর্তন গান তাঁহার ইচ্ছাক্রমে গাহিতে গাহিতে যাওয়া হয়। রাজা নবকৃষ্ণের বহির্বাটীর নিকট উপস্থিত হইয়া কীর্তনগায়কেরা তারস্বরে চূড়ামণি রচিত এই গান গাহিতে আরম্ভ করিল :

জীবন মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছিল। তখনই পঙ্কিল শহরে মানসিক পঙ্কিলতা জমা হইতে শুরু করিয়াছিল। কবির কোন কোন গানে তাই জমিজমা, মামলা মোকদ্দমা, পেয়াদা, হাকিম, হুকুম, নীলাম, তহবিল-তছরূপ প্রভৃতি তিক্ত ব্যাপারের প্রতীক ব্যবহৃত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে আবির্ভূত হইয়া শাক্তসাধক রামপ্রসাদ সেন বাঙালী চিত্তে একটা সুস্থ ভক্তির আদর্শ মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। এদেশে অনেক পূর্ব হইতে বহু শাক্ত সাধকের জন্ম হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গে অনেক তান্ত্রিক আচার্যের অলৌকিক জীবনকথা এখনও ঘরে ঘরে প্রচলিত আছে। পূর্ববঙ্গের মেহার গ্রামের মহাসাধক সর্বানন্দ ঠাকুরের কথা অনেকেরই মনে পড়িবে। কিন্তু রাম-প্রসাদের জীবনকথা সমগ্র বাঙালী জাতির প্রাণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছে।

দ্বিজ রামপ্রসাদ—যদিও রামপ্রসাদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কবি, তবু তাঁহার সম্বন্ধে, বিশেষতঃ তাঁহার রচিত পদাবলী সম্বন্ধে কিছু কিছু সংশয় সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ পূর্ববঙ্গে দ্বিজ রামপ্রসাদ (রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী) নামে একজন শাক্ত পদকার রামপ্রসাদের ঢঙে পদ লিখিয়াছিলেন। ভ্রমক্রমে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের পদসংগ্রহে দ্বিজ রামপ্রসাদের ভণিতাযুক্ত কিছু কিছু পদ ছাপা হইয়াছে। আবার রামপ্রসাদ নামে একজন কবিওয়ালাও ছিলেন। ফলে আসল রামপ্রসাদের পদের সঙ্গে এই দুইজনের পদের কিছু কিছু মিশ্রণ ঘটিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে।[১৭]

আয়রে আয় নগরবাসী দেখবি যদি আয়।
সবারে জিনিয়ে চূড় যম জিনিতে যায়।
যম জিনিতে যায় রে চূড় যম জিনিতে যায়,
নবা (অর্থাৎ নবকৃষ্ণ) দেখবি যদি আয়, নবা দেখবি যদি আয়॥

চূড়ামণি দত্ত সজ্ঞানে গঙ্গা লাভ করিলেও নবকৃষ্ণ মৃত্যুপথযাত্রী প্রদত্ত এই শেষ অপমান ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রতিকূলতায় চূড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধাদি কার্যে বিস্তর বাধা ঘটিয়াছিল।

১৭ সে যুগের কোন কোন লেখক রামপ্রসাদ সেনকে 'ব্যবসাদার' কবি বলিয়া তুচ্ছ করিয়া পূর্ববঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদ বা রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারীকেই শাক্ত পদের সমস্ত গৌরব দিতে চাহিয়াছেন। 'সাধক সঙ্গীতের' সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র সিংহ মনে করিতেন, "যে সকল

দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিলেও তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্প্রতি কিছুদিন ধরিয়া কোন কোন গবেষক কিছু নূতন তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গেও যে রামপ্রসাদী গানের বিশেষ প্রচলন ছিল তাহা ঈশ্বর গুপ্ত সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন, "পূর্ব অঞ্চলে রামপ্রসাদি কবিতা অনেক প্রচারিত আছে, সে সকল পদ্য এখানে প্রচার নাই। ঢাকা, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা প্রদেশের নাবিকেরা সর্বদাই তাহা গান করিয়া থাকে, সে বিষয়ে তাহাদিগের এত ভক্তি যে, যখন অস্নাত থাকে তখন মুখাগ্রে উচ্চারণ করে না। কহে বাসী কাপড়ে রামপ্রসাদের গান গাহিলে নরকে যাইতে হইবে।" এখানে দেখা যাইতেছে, ঈশ্বর গুপ্ত জানিতেন যে, পূর্ববঙ্গে প্রচলিত রামপ্রসাদী গানগুলি পশ্চিমবঙ্গে প্রচারিত হয় নাই। কেন হয় নাই, তিনি তখন তাহা ততটা মনোযোগ দিয়া বিশ্লেষণ করেন নাই। করিলে তিনি দেখিতেন, পূর্ববঙ্গে দ্বিজ রামপ্রসাদ নামে এক ব্রাহ্মণ-কবি বৈদ্য রামপ্রসাদের মতোই শ্যামাসঙ্গীত লিখিয়াছিলেন।[১৮] এ বিষয়ে পূর্বে কৈলাসচন্দ্র সিংহ ('সাধনসঙ্গীত'), অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (রামপ্রসাদ) ও দয়ালচন্দ্র ঘোষের গ্রন্থে ('প্রসাদ প্রসঙ্গ') এবং 'আর্যদর্পণ' (১৩১৯-২০) ও 'নব্যভারতে' (১৩০২) কিছু কিছু তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। কেহ কেহ পূর্ববঙ্গের রামপ্রসাদকে কায়স্থ বলিয়াছেন।[১৯] ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ তিনজন রামপ্রসাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সাধক-কবি রামপ্রসাদ বৈদ্যবংশোদ্ভূত এবং পূর্ববঙ্গের রামপ্রসাদ ও ঈশ্বর গুপ্তের সমসাময়িক কবিওয়ালা রামপ্রসাদ—দুইজনেই ব্রাহ্মণ। দয়ালচন্দ্র ঘোষ ও কৈলাসচন্দ্র সিংহ তাঁহাদের গ্রন্থে দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিয়াছেন। দয়ালচন্দ্র শুধু এইটুকু তথ্য দিয়াছিলেন, "পশ্চিম বাঙ্গালার সেন রামপ্রসাদ ভিন্ন পূর্ববাঙ্গালায় একজন দ্বিজ রামপ্রসাদ ছিলেন।"

সঙ্গীত বাহ্যাড়ম্বরের নিবিড় কুজ্ঝটিকায় আবৃত নহে, যাহা সরল হৃদয়ের সরল স্রোত—ভক্তিরসের সুবিমল উৎস, যাহাতে গাম্ভীর্য আছে, আস্ফালন নাই, ভাব আছে—ভাবুকতা নাই, সেই সকল সঙ্গীতের অধিকাংশ ব্রহ্মচারীর রচিত, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।" বলা বাহুল্য ইহা সম্পাদকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, যুক্তি নহে।

১৮ পরে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সমালোচকদের মধ্যে এই বিষয় লইয়া রীতিমতো বাগ্‌যুদ্ধ হইয়াছিল। দ্রষ্টব্য: ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, পৃ. ৫৭

১৯ নব্য ভারত, ১৩০২

কৈলাসচন্দ্র সিংহ 'সাধকসঙ্গীতে'র দ্বিতীয় সংস্করণে তিনজন রামপ্রসাদের উল্লেখ করিয়া পূর্ববঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদকে (তাঁহার মতে, 'রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী') সর্বোচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, "রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ব্রহ্মপুত্রতীরে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা জেলার অন্তর্গত চিনীসপুর নামক স্থানে যে কালীবাড়ী আছে, সেই কালীবাড়ীতে তিনি জীবনযাপন করিয়াছেন। তাঁহার জন্মমৃত্যুর অব্দ নির্ণয় করা সুকঠিন।" এই বিষয়ে একদা সাময়িকপত্রাদিতে প্রচুর আলোচনা হইয়াছিল। সম্প্রতি ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন' পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে রামপ্রসাদ নামে কবির সংখ্যা তিনজন নহে—চারজন। তিনি ত্রিপুরা জেলা হইতে একশত বৎসরের প্রাচীন রামপ্রসাদের এই পদটি পাইয়াছেন :

মাগো তারা সুরেশ্বরি।
কোন্ অবিচারে আমার তরে কর দুক্ষের ডিগিরি জারি॥
একা আছি ছটি পেদা বল্ মা কিসে সমাই করি।
আমার মনে লয় বিশ খরচ দিএ ছয় জনারে প্রাণে মারি॥
* * * *
সদরে দরখাস্ত দিতে কোথা পাব ইস্টাম্বরি।
রামপ্রসাদ বসে নিদানকালে দুর্গা ২ বলে মরি॥

এই পদকার সম্বন্ধে ডঃ ভট্টাচার্য বলেন, "ইহা কবিরঞ্জন, কবিওয়ালা বা 'দ্বিজের' রচনা নহে—চতুর্থ এক অজ্ঞাত ব্যক্তির রচনা।" আমাদের মনে হয়, দ্বিজ বা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের—যাবতীয় গান একদা লোকের মুখে মুখে ফিরিত। পরে ছাপার যুগে তাহার কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া মুদ্রণের ব্যবস্থা হয়। পূর্ববঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদের এই ধরনের কত গান নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং উল্লিখিত পদটির জন্য স্বতন্ত্র অর্থাৎ চতুর্থ রামপ্রসাদের অস্তিত্ব আবিষ্কারের প্রয়োজন নাই।

ঢাকা জেলার মহেশ্বরদি পরগণায় দ্বিজ রামপ্রসাদের জন্ম হয়—মনে হয় তিনি কবিরঞ্জনের কিছু পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। এখনও ঐ অঞ্চলে দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। আসাম-বঙ্গ রেলের ভৈরবটাঙ্গী শাখার জিনাদি স্টেশনের পাশে চিনীশপুরের কালীবাড়ীতে দ্বিজ রামপ্রসাদ সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি রামপ্রসাদ ঠাকুর (সাধারণতঃ

পদ্মঠাকুর নামে পরিচিত) নামে ঐ অঞ্চলে পরিচিত ছিলেন, এবং বহু দূরান্তরের যাত্রীদের ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বৈশাখী অমাবস্যা তিথিতে সিদ্ধি লাভ করেন, এখনও ঐ তিথিতে মন্দিরপ্রাঙ্গণে উৎসব হয়। তাঁহার একটিমাত্র কন্যাসন্তান ছিল, নাম জগদীশ্বরী। এখানেও লক্ষণীয় যে, কবিরঞ্জনেরও অন্যতমা কন্যার নাম জগদীশ্বরী। দ্বিজ রামপ্রসাদের দৌহিত্র-শাখা এখনও বর্তমান আছে। সিদ্ধিলাভের পর তিনি বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম পালন করেন এবং সিদ্ধিলাভের পীঠস্থান চিনীশপুরেই বাকিজীবন অতিবাহিত করেন। মনে হয় তিনি ১৭৪৫-৫০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে চিনীশপুরে ছিলেন। ঐ যুগে রাজমোহন নামক বিক্রমপুরের এক শাক্ত কবি দ্বিজ রামপ্রসাদের উল্লেখ করিয়া গান লিখিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে দ্বিজের সমতুল্য বলিলে তিনি ঘোরতর আপত্তি করিয়া গান লিখিয়াছিলেন, "রামপ্রসাদের তুলনা দেয়, তার রোমের যোগ্য না হই রে ভাই।" ইহাতে মনে হইতেছে তিনি এখানে পূর্ববঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদের কথাই বলিয়াছেন— কারণ তাঁহার পক্ষে হালিশহরের বৈদ্য রামপ্রসাদের কথা জানা সম্ভব ছিল না। আরও একটা কথা, দেবী কালিকা রামপ্রসাদের কন্যার বেশ ধরিয়া কবিকে বেড়া বাঁধিতে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া যে গল্পটি চলিয়া আসিতেছে, তাহার উল্লেখ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের কোন গানে পাওয়া যায় না। কিন্তু পূর্ববঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদের গানে ইহার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে :—

(১) মা ভক্তে ছলিতে তনয়া রূপেতে বাঁধল আসি ঘরের বেড়া।

(২) ওরে দেখ, কন্যারূপে রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া।[১০]

ঈশ্বর গুপ্তের মতেও ইহা কবিরঞ্জনের রচনা নহে, "কেন না তাহা হইলে তাঁহার অসীম রচনার কোন স্থানে না কোন স্থানে অবশ্যই ইহার কোন উল্লেখ থাকিত।" ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এই গানটি পূর্বেই পূর্ববঙ্গের গায়কদের নিকট শুনিয়াছিলেন। এই সমস্ত কাহিনীতে নানাপ্রকার জনশ্রুতি এরূপ জড়াইয়া গিয়াছে যে, এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা সহজ নহে। দুই রামপ্রসাদের কন্যার একই নাম (জগদীশ্বরী), দুইজনের জীবনীতেই বেড়া-বাঁধার গল্প রহিয়াছে। সুতরাং কোন্ কাহিনী কাহার উপর বর্তাইবে তাহা

১০ দয়ালচন্দ্র ঘোষের 'প্রসাদ প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য।

নির্ণয় করা অতি দুরূহ। যাহা হউক পূর্ববঙ্গে দ্বিজ রামপ্রসাদের বহু গান অদ্যাপি প্রচলিত আছে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের গান মুদ্রিত হইবার সময় পূর্ববঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদের অনুরূপ ভাবের কিছু কিছু পদ তাহার সঙ্গে গৃহীত হয়—অবশ্য পূর্ববঙ্গের রামপ্রসাদের পদগুলিকে পৃথক করিবার জন্য প্রায়ই তাঁহার পদের শেষে দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতা থাকিত। ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে, "রামপ্রসাদী গানের প্রায় চতুর্থাংশ এই দ্বিজ রচিত।"[২১] দ্বিজের কোন কোন গান কবিরঞ্জনের গানের ভাব ও ভাষায় এমন সমধর্মী যে, দুইজনের পৃথক ভণিতা না থাকিলে পদগুলিকে আলাদা করিয়া চিহ্নিত করা যায় না। দ্বিজ রামপ্রসাদের দুই-চারিটি গান প্রায় সকলেই কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের রচনা বলিয়া জানে। যথা :

মা বসন পর।
বসন পর বসন পর মা গো বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চিত জবা পদে দিব আমি॥

* * *

আপনে পাগল পতি পাগল মা গো আরও পাগল আছে।
দ্বিজ রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল চরণ পাবার আশে গো॥

কিংবা

এ সংসারে ডরি কারে রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে বসত করি॥

* * *

বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ আছে এ মনের সাধ মা।
আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারি॥

(দয়ালচন্দ্র ঘোষ—প্রসাদ প্রসঙ্গ)

অনুভূতি রস, সাধনা, ভাব, ভাষা প্রভৃতি বিচার করিলে দুই রামপ্রসাদের পদের পার্থক্য নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব—এবং অসম্ভব বলিয়া একের পদ অপরের নামে চলিয়া গিয়াছে—এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে।

এই প্রসঙ্গে দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্পর্কে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মত আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। 'সাধককবি রামপ্রসাদে' গুপ্ত মহাশয় দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্পর্কে কিছু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বৈষ্ণ-

২১ ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, পৃ. ৫৬

সম্প্রদায়ও ব্রাহ্মণের মতো 'দ্বিজ'। সুতরাং কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন নিজেকে দ্বিজ বলিতেও পারেন। অতএব 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভণিতা দেখিলেই কবিরঞ্জন ছাড়া পূর্ববঙ্গের কোন ঐ নামীয় কবির কথা না মানিলেও চলে। কারণ 'মহানির্বাণতন্ত্রে' আছে :

সম্প্রাপ্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমা।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ পৃথক্ পৃথক্॥

অর্থাৎ ভৈরবীচক্রে বসিলে সব জাতিই দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ভৈরবীচক্র পরিত্যাগ করিলে আবার সমস্ত বর্ণ পৃথক্ হইয়া যায়। রামপ্রসাদ তন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে পদে 'দ্বিজ' ভণিতা দিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? তাহা ছাড়া বৈদ্যসম্প্রদায়ও দ্বিজত্বের অধিকারী, ইহা বৈদ্যরাও জানেন, অপরেও তাহাতে আপত্তি করে না। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের দত্তকপুত্র রাজকৃষ্ণ একদা এই ব্যাপারে মীমাংসা করিবার জন্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে আহ্বান করিয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর স্বীকার করেন যে, বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণের মতো দ্বিজত্বের অধিকারী; শিখাসূত্র এবং ঊর্ধ্ব ফোটাতেও তাহাদের ব্রাহ্মণের মতোই অধিকার। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের এই যুক্তি নিতান্ত দুর্বল নহে বটে, কিন্তু পূর্ববঙ্গের চিনীশপুরের দ্বিজরামপ্রসাদকেও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তিনি যে শাক্তসাধক ছিলেন এবং শাক্তপদ লিখিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে গায়কদের মুখে মুখে ফিরিয়া অনেক সময় দ্বিজ ও কবিরঞ্জনের পদের ভণিতার গোলমাল হইয়া গিয়াছে।

আর একজন রামপ্রসাদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে—ঈশ্বর গুপ্তের প্রায় সমকালে কলিকাতায় কবির দলে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি কবিওয়ালা রামপ্রসাদ নামে পরিচিত। রামপ্রসাদ চক্রবর্তী ও নীলমণি চক্রবর্তী —দুই ভাই কলিকাতার সিমলা অঞ্চলে বাস করিতেন, তাঁহাদের কবির দলও ছিল।[২২] এই দল 'নীলুরামপ্রসাদের দল' নামে পরিচিত হইয়াছিল।

---

২২ এই বিষয়ের মূল উৎস—সাধন সঙ্গীত, পৃ. ৪৮ (কৈলাসচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত); প্রাচীন কবিসংগ্রহ (পৃ. ৩৬, ৪৩, ৪৬, ৭২) এবং প্রসাদপদাবলী (কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সম্পাদিত)

নানা কবিসঙ্গীতে ইঁহাদের গানও সংগৃহীত হইয়াছে। কবিওয়ালা রামপ্রসাদের দুই চারিটি শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত বৈদ্য রামপ্রসাদের গানের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া থাকিবে।

রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাই—প্রসঙ্গক্রমে রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাই সংক্রান্ত দুই-একটি কৌতূহলজনক সংবাদ দেওয়া যাইতে পারে। রামপ্রসাদের সঙ্গে আজু গোঁসাইয়ের বাক্‌যুদ্ধসংক্রান্ত কিছু কিছু কবিতা সর্বপ্রথম ঈশ্বর গুপ্ত রামপ্রসাদ প্রসঙ্গে 'সংবাদপ্রভাকরে' উদ্ধৃত করেন।[২৩] তিনিই সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটি তথ্যও উদ্ধার করেন। "রাজা (অর্থাৎ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র) যখন কুমারহট্টে আসিতেন তখন রামপ্রসাদ সেন এবং আজু গোঁসাইকে একত্র করিয়া উভয়ের সঙ্গীতযুদ্ধের কৌতুক দেখিতেন। রামপ্রসাদ সেন কবীন্দ্র ছিলেন, আজু গোঁসাই আদ-পাগলা ছিলেন, কিন্তু মুখে মুখে রহস্যকবিতা রচনা করিতে পারিতেন। রামপ্রসাদ সেন জ্ঞানভক্তির বিষয়ে পদবিন্যাস করিতেন, ইনি তখন রহস্য ছলে তাঁহারি উত্তর করিতেন" (সংবাদ প্রভাকর)। ঈশ্বর গুপ্ত ইঁহার সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ দিয়াছেন, তাহার অধিক বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। পরে কেহ কেহ সন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, ইঁহার প্রকৃত নাম অযোধ্যানাথ বা অযোধ্যারাম গোস্বামী। মতান্তরে অজয় গোস্বামী, অচ্যুত গোস্বামী বা রাজচন্দ্র গোস্বামী[২৪]। ইনি বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহাকে 'আদ্-পাগলা' বলিয়াছেন, তাহা বোধ হয় ঠিক নহে। শুনা যায়, ইনি বৈষ্ণব সাধনমার্গের পথিক ছিলেন, অপরদিকে বেশ পরিহাসপটুও ছিলেন। রামপ্রসাদের কোন কোন শ্যামাসঙ্গীতকে তিনি বেশ রঙ্গরহস্যের দ্বারা তীক্ষ্ণভাবে আক্রমণ করিতেন। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া স্বভাবতঃই তিনি শাক্ত রামপ্রসাদকে ততটা পছন্দ করিতেন না। শাক্ত রামপ্রসাদ উপাসনার অঙ্গ হিসাবে 'কারণ' সেবা করিতেন, পদেও তাহার উল্লেখ আছে।[২৫] এই জন্য গ্রামবাসীদের কেহ কেহ কবির প্রতি কিছু

২৩ সংবাদ প্রভাকর, ১২৬০,১ পৌষ

২৪ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—সাধককবি রামপ্রসাদ

২৫ "সুরা পান করি নে আমি সুধা খাই জয় কালী বলে।"

বিরূপ ছিলেন।[২৬] হয়তো আজু গোঁসাই ঐ দলে ছিলেন। রামপ্রসাদের গভীর তত্ত্ববহ গানগুলি অবলম্বনে আজু গোঁসাই যেরূপ পরিহাসের ভঙ্গিতে তাহার জবাব দিতেন তাহাতে তাঁহাকে তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী রসিক পুরুষ বলিয়াই মনে হয়। হয়তো রামপ্রসাদ গাহিলেন :

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরুতলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে খাবি॥

আজু গোঁসাই ইহার উত্তর দিলেন :

কেন মন বেড়াতে যাবি।
কারও কথায় কোথাও যাস নে রে মন
মাঠের মাঝে মারা যাবি॥

রামপ্রসাদ গান ধরিলেন :

ডুব দে রে মন কালী বলে।
হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে॥

আজু গোঁসাই অমনি ফিরাইয়া দিলেন :

ডুবিস নে মন ঘড়ি ঘড়ি।
দম আটকে যাবি তাড়াতাড়ি॥
একে তোমার কফোনাড়ী ডুব দিও না বাড়াবাড়ি
তোমার হলে পরে জ্বরজারি মন যেতে হবে যমের বাড়ী॥

রামপ্রসাদের :

এ সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি॥

আজু গোঁসাইয়ের উত্তর :

এ সংসার রসের কুটি।
হেথা খাই দাই আর মজা লুটি॥
ওহে যার যেমন মন তার তেমন ধন

---

২৬ একদা কুলক্রিয়ার পর 'কারণ' সেবা করিয়া রামপ্রসাদ কুমারহট্টের বিখ্যাত তার্কিক বলরাম তর্কভূষণের টোলের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। "উক্ত অভিমানি পণ্ডিত তাঁহাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিলেন, 'দেখ দেখ মাতাল বেটা যাইতেছে'।" (সংবাদ প্রভাকর, ১২৬০, পৌষ) আজু গোঁসাই কবির 'কারণ' সেবাকে বিদ্রূপ করিতেন, বলিতেন, "কর্মের ঘাট, তেলের কাট, মলেও যায় না।" তাহার উত্তরে আজু গোঁসাই বলিয়াছিলেন, "কর্মডোর ও বচোর আর মদের গোর মোলেও যায় না।" সংবাদ প্রভাকর, ১২৬০, পৌষ)

মন কর রে পরিপাটি।
ওহে সেন নাহি জ্ঞান বুঝ তুমি মোটামুটি॥

আজু গোঁসাই কর্তৃক রামপ্রসাদের তত্ত্বগানের তীক্ষ্ণ জবাব ঠিক বৈষ্ণবোচিত হয় নাই। এই দিক দিয়া আজু গোঁসাইয়ের মনোধর্ম অনেকটা ভারতচন্দ্রের মতো ছিল। কিন্তু তাঁহার একটি উত্তর বাস্তবিক প্রশংসা দাবি করিতে পারে। এই বৈষ্ণবকবি শাক্ত-রামপ্রসাদের কারণসেবা, ভুক্তিমুক্তি তত্ত্ব, গৃহীজীবনে তত্ত্বসাধনা প্রভৃতি ভালো চক্ষে দেখিতেন না, তাই রাম-প্রসাদের পদের সরস ব্যঙ্গাত্মক রূপান্তর করিয়া যথোপযুক্ত জবাব দিতেন; কিন্তু রামপ্রসাদের আর এক প্রকার রচনার তিনি গভীরভাবেই প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কবিরঞ্জন 'কালীকীর্তনে' বৈষ্ণব ভাবাবেশে বলিয়াছেন যে, দেবী গৌরী কৈশোরে একাম্র কাননে গিয়া শ্যামের মতো গোচারণাদি করিতেছেন।[২৭] গৌরীর বাল্যলীলা বর্ণনায় রামপ্রসাদ কৃষ্ণলীলার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া বৈষ্ণব পদাবলীর গোষ্ঠলীলার অনুরূপ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন:

গিরিশগৃহিণী গৌরী গোপবধূ বেশ।
কঠিত কাঞ্চনকান্তি প্রথম বয়েস॥
সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে শুনে যার বেণু॥

কৃষ্ণের মতো গৌরীর গোচারণের বর্ণনা আজু গোঁসাইয়ের নিকট হাস্যকর মনে হইয়াছিল। তাই তিনি এই অসঙ্গত বর্ণনার জবাব দিয়াছিলেন তীব্রতর ভাষায়:

না জানে পরম তত্ত্ব কাঁঠালের আমসত্ত্ব
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে।
তা যদি হইত যশোদা যাইত
গোপালে কি পাঠায় রে॥

এই বিদ্রূপের খোঁচা অতিশয় বুদ্ধিদীপ্ত হইয়াছে। অন্য এক প্রসঙ্গে রামপ্রসাদ গান ধরিয়াছিলেন:

---

২৭ একাম্র কাননে মাতা করিল প্রবেশ॥
চরাইতে ধেনু বেণু দান দিলা ভব।
অধরে সংযোগ করি উর্ধ্বে মুখে রব॥
—দ্বারকানাথ বসু সম্পাদিত 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদী গ্রন্থাবলী' (১৮৯৫), পৃ. ১৩৮

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা দুটোর একটা করে যাব।
হাতে কালী মুখে কালী সর্বাঙ্গে কালী মাখিব॥

ইহার প্রত্যুত্তরে আজু গোঁসাই বলিয়াছিলেন :

সাধ্য কি তোর কালী খাবি,
ও যে রক্তবীজের বংশ খেলে তার মুণ্ডমালা কেড়ে নিবি।
সর্বাঙ্গে নয়, উভয় গালে ভূষো কালি মেখে যাবি॥

আজু গোঁসাইয়ের ধর্মবিশ্বাসে রামপ্রসাদের যে গান অসঙ্গত মনে হইয়াছিল, তিনি শানিত ব্যঙ্গোক্তি নিক্ষেপ করিয়া তাহার যথোপযুক্ত উত্তর দিতেন। দুঃখের বিষয় জনশ্রুতি ছাড়া এবিষয়ে আর কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের এক অভিনব দৃষ্টান্ত মিলিত।

রামপ্রসাদের কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন—রামপ্রসাদের নামে কালীকীর্তন, কৃষ্ণকীর্তন ও সীতাবিলাপ শীর্ষক কাব্য ও কবিতার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কালীকীর্তন রচনা করিয়া একদা তিনি অতিশয় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন—আধুনিক কালের কোন কোন প্রসাদ-জীবনীকার এই আখ্যানকাব্যের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে ঈশ্বর গুপ্ত সর্বপ্রথম এই কাব্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেন যে, রামপ্রসাদের কালীকীর্তন ঈশ্বর গুপ্তের সমসাময়িক কীর্তনীয়াগণ গান করিতেন বটে, কিন্তু তখনই এই কাব্যের পুঁথি দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছিল।[২৮] তদুপরি কালীকীর্তন-গায়কদের অল্প বিদ্যার জন্য কবির মূল রচনা অত্যন্ত বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত "আকর স্থান হইতে মূল পুস্তক আনয়নপূর্বক সংশোধিত করিয়া কালীকীর্তন মুদ্রিত করণে প্রবৃত্ত" হইয়াছিলেন।[২৯] কালীকীর্তনের পুঁথিতে অনেক ভুলভ্রান্তি দেখিয়া তিনি নিজে ইহার কিয়দংশ সংশোধন করেন। ভূমিকাতে

---

২৮ ঈশ্বর গুপ্ত ভূমিকায় বলিয়াছেন, "পুস্তক অপ্রাচুর্য নিমিত্ত" লোকে ইহার বিশেষ সংবাদ রাখিত না।

২৯ উক্ত কাব্যের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

[illegible] সংস্কৃতে লিখিয়াছিলেন, "সংশোধিতাঅপি ময়া বহুলপ্রয়াসেনৈতাবদ্যুৎ সুধিয়াং প্রতিশোধয়ন্তু।" সুতরাং মুদ্রিত কালীকীর্তনে ঈশ্বর গুপ্ত যে সংশোধনের জন্ত বেশ কিছু লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। পরে রামপ্রসাদের গ্রন্থাবলীতে এই কালীকীর্তন মুদ্রিত হইয়াছে। অবে ঈশ্বর গুপ্ত সংগৃহীত কালীকীর্তন ও প্রসাদগ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত কালীকীর্তনে অনেক পার্থক্য আছে। যাঁহারা কালীকীর্তনের পুঁথি দেখিয়া প্রসাদগ্রন্থাবলীতে ইহার ঠাঁই দিয়াছিলেন তাঁহাদের অবলম্বিত পাঠের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদিত পুঁথির কিছু পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। কারণ ঈশ্বর গুপ্ত পুঁথির ত্রুটিপূর্ণ রচনার কিছু কিছু সংশোধন করিয়াছিলেন। কালীকীর্তন ঈশ্বর গুপ্তের সংগ্রহের পূর্বেও নিতান্ত অপরিচিত ছিল না, কারণ পাদ্রী ওয়ার্ডসাহেব তাঁহার *The Hindoos*—গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এই কাব্যের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "Kalee Keerttun by Ramoprasada a shoodra." এই গীতিধর্মী ক্ষুদ্র আখ্যানকাব্যের বিষয়বস্তু একটু অভিনব বটে। ইহাতে বৈষ্ণব পদশাখার অনুকরণে হিমাচল গৃহে উমার বাৎসল্য ও কৈশোর লীলার এবং শেষে হরপার্বতীর বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় নামক এক পৃষ্ঠপোষকের নির্দেশে কবি এই কাব্য রচনা করেন।[৩০] ভণিতায় নিজ নামের পূর্বে তিনি 'শ্রীকবিরঞ্জন' উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। ১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দে কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে জমি দান করিয়া যে দলিল সম্পাদন করেন, তাহাতে এই কবিরঞ্জন উপাধি দেখা যায় না। মনে হয় কালীকীর্তন এই তারিখের পরে রচিত।[৩১]

কবি এই 'কালীকীর্তনে' উমার বাল্যকৈশোর লীলা কিছুটা আখ্যানের ঢঙে, কিছুটা গীতিরসের সাহায্যে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রারম্ভ ভাগে গিরিরাণীর বিখ্যাত উক্তি "গিরিবর আর আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে" সংযোজিত হইয়াছে। শিশুকন্যা উমা চাঁদ ধরিবার বায়না লইয়াছেন, কিছুতেই শান্ত হইতেছেন না। তাই গিরিরাণী দুধের কন্যাকে স্বামীর কাছে

---

৩০ তিনি কালীকীর্তনের ভণিতায় এইভাবে রাজকিশোরের উল্লেখ করিয়াছেন :

শ্রীরাজকিশোর দাসে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মহা অন্তের ঔষধ॥

৩১ কবিরঞ্জন উপাধি সম্বন্ধে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে।

জানিয়াছেন। গিরিরাজ গৌরীকে কোলে লইয়া হাতে একখানি মুকুর দিলেন :

আনন্দে কহিছে হাসি　　　ধর মা এই লও শশী
মুকুর লইয়া দিল করে।

দেবী মুকুরে কোটিশশধর বিনিন্দিত নিজমুখচন্দ্র দেখিয়া তবে শান্ত হইলেন :

মুকুরে দেখিয়া মুখ　　　উপজিল মহাসুখ
বিনিন্দিত কোটি শশধরে।

ক্রমে জগন্মাতা ঘুমাইয়া পড়িলে গিরিরাজ তাঁহাকে পালঙ্কে শোয়াইয়া দিলেন। শাক্তপদাবলীর বাৎসল্য রসের যদি কোন একটি পদকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হয়, তবে আমাদের মতে রামপ্রসাদের এই পদটির সেই গৌরব প্রাপ্য। স্নিগ্ধ বাৎসল্য রস, সুকুমারী উমার চাঁদ ধরিবার জন্য বায়না, গিরিরাজ কর্তৃক মুকুরে দেবীর কোটিচন্দ্রোপম মুখসৌন্দর্য দেখানো, মুকুরের মধ্যে নিজ মুখকেই চাঁদ বলিয়া দেবীর শিশুসুলভ ব্যবহার—সর্বোপরি গিরিরাণীর ব্যাকুলতা ও গিরিরাজের শান্ত প্রসন্ন গার্হস্থ্য জীবনচিত্র যে কোন প্রথম শ্রেণীর কবির পরম কাম্য।

পরে কাব্যটিতে উমার বাল্যলীলা বৈষ্ণবপদাবলীর ঢঙে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার খানিকটা কবির উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত, খানিকটা পুরাণানুযায়ী। দেবী উমা গোপবালকদের মতো ধেনু লইয়া গোষ্ঠে চলিলেন গোচারণে। 'গোপবধূবেশে' ('গিরিশ গৃহিণী গৌরী গোপবধূবেশে') একাম্রকাননে গিয়া তিনি গোরু চরাইতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণের মতোই বেণু বাজাইয়া গোরুগুলিকে ডাকিতে লাগিলেন, তাহারাও দেবীর চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল :

মা ডাকিছে আবরে সুরভি।
নবঘন তৃণ তটিনীজল শীতল দূরে ধাবত কাছে মায় রে সুরভি।
উমার মধুর বেণু শুনিয়া শ্রবণে।
সারি সারি নিকটে দাঁড়াল ধেনুগণে ॥
ঊর্ধ্বমুখে বিধুমুখী নিরখিয়া থাকে।
দুনয়নে প্রেম ধারা হাম্বা রবে ডাকে ॥

বৈষ্ণবপদাবলীর কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার পদ উমার উপরে প্রয়োগ হওয়ায় হাস্যকর হইয়াছে। এই বিষয়ে আজু গোঁসাইয়ের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি নিতান্ত অন্যায় নয় :

নাই। কালীকীর্তনে কবি আবার উমার রাসলীলাও বর্ণনা করিয়াছেন।[৩২] অবশ্য শুধু দেবীর যৌবনলাবণ্য বর্ণনা করিয়াই কবি রাসলীলার ইতি করিয়াছেন। কারণ দেবীর রাসলীলা গোষ্ঠলীলা অপেক্ষাও হাস্যকর হইত। কবি বৈষ্ণবপদাবলীর ঢঙে দেবীর নৃত্যও বর্ণনা করিয়াছেন :

রাণী বলে আমি সাধে সাজাইলাম বেশ বানাইলাম
উমা একবার নাচ গো।
একবার নেচেছ ভাল তেমনি করে আবার নাচিতে হবে
নূপুর দিয়েছি পায় সুমধুর ধ্বনি তায় গো॥

এ সমস্ত বর্ণনা বৈষ্ণব পদাবলীর ব্যর্থ অনুকরণ মাত্র। কবি পুষ্পকাননে হরপার্বতীর মিলন ও আলাপ বর্ণনা করিয়াছেন :

প্রেরসীর প্রেমরসে গদগদ তনু বশে
খসিছে কটির বাঘাম্বর।
শিরে সুরতরঙ্গিণী কুলু কুলু উঠে ধ্বনি
সঘনে গরজে বিষধর॥

তাঁহাকে মন্দাকিনী তীরে ভ্রমণরত দেখিয়া ব্যাকুল মহাদেব নন্দীকে প্রশ্ন করিলেন :

নন্দি একি রূপমাধুরী আহা মরি মরি
গঠিল সে যে কেমন বিধি।
চঞ্চল মনোমীন হৃদি সরোবর ত্যজি
প্রবেশিল লাবণ্য জলধি॥

তারপর কবি আভাসে হরপার্বতীর মিলন বর্ণনা করিয়া কালীর শতনাম উচ্চারণের পর কালীকীর্তন সমাপ্ত করিয়াছেন।

গীতে এই কাব্যের কিঞ্চিৎ মূল্য থাকিলেও সাধারণভাবে ইহাতে বিশেষ কোন শিল্পলক্ষণ পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে এত বেশী অসঙ্গতি আছে যে, ইহার কাব্যরস প্রায় কোথাও জমিতে পায় নাই। অথচ দেখিতেছি, সে

---

৩২ কাহারও কাহারও মতে প্রাচীন সাহিত্যে (রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী' নাটক) হরপার্বতীর রাসলীলা বা হিন্দোললীলা প্রচলিত ছিল। রামপ্রসাদ এই আদর্শেই 'কালীকীর্তনে' উমার রাসলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য : অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী প্রণীত 'শাক্ত পদাবলী ও শক্তি সাধনা' পৃ. ২৪৮—৪৯) কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে যাহাই থাকুক না কেন, বাঙ্গালাদেশে ভগবতীর রাসলীলা প্রচলিত নাই। ইহা রামপ্রসাদের বৈষ্ণব-ভাবের [illegible] রচনা।

যুগের সমালোচকগণ এই কাব্যের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন।[৩৩] কিন্তু দুই একটি পদ ব্যতীত আর সমস্তই কাব্যাংশে অতি নিকৃষ্ট, রচনার মধ্যে কোনও প্রকার গ্রন্থন-কৌশল নাই। গান ও তত্ত্বকথা একসঙ্গে মিশিয়া গিয়া জগাখিচুড়ির আকার ধারণ করিয়াছে। ভাষা, শব্দপ্রয়োগ এবং ছন্দ এত দুর্বল যে, ইহা যে শাক্ত-সাধক রামপ্রসাদের রচনা তাহা মনে হয় না। অথচ কবি পরিণত পরিপক্ব বয়সে এই কাব্য লিখিয়াছিলেন। কবি এই কাব্যে বৈষ্ণব ও শাক্তভাব মিলাইতে গিয়া যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ শাক্ত পদে তিনি শ্যাম ও শ্যামার চমৎকার সমন্বয় করিয়াছেন। উৎকট অদ্ভুত নূতনত্ব এবং গীতিরসের জন্য একদা এই কাব্য গায়ক ও শ্রোতার মধ্যে খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল, কিন্তু গানের আবেদন সরাইয়া রাখিলে ইহার কঙ্কালসার দুর্বল মূর্তি বাহির হইয়া পড়ে।

ঈশ্বর গুপ্ত রামপ্রসাদের জীবনী ও কাব্য-কবিতা সংগ্রহ করিতে গিয়া কৃষ্ণকীর্তন নামীয় একখানি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পুঁথি পাইয়াছিলেন, কিংবা কাহারও মুখ হইতে উহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১২৬০ সালের পৌষ সংখ্যার 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বর গুপ্ত এই কৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধে বলেন, "উক্ত মহাশয় যে কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন রচনা করিয়াছেন তাহা বিদ্যাসুন্দরের অপেক্ষা অনেক উত্তম—।" মনে হয় গুপ্তকবি কৃষ্ণকীর্তনের সবটাই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তখনই যে ঐ কাব্য লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল, তাহাও তিনি বলিয়াছেন, "গায়কের অভাবে ইদানীং কালীকীর্তন,

---

৩৩ ঈশ্বর গুপ্তের মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধির কবিও বলিয়াছেন, "কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন বিদ্যাসুন্দরের অপেক্ষা অনেক উত্তম।' হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ('কবিচরিত') এই কাব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ইহাতে কবিরঞ্জন অদ্ভুত কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।" অবশ্য শেষে তিনিও স্বীকার করিয়াছেন, "গ্রন্থখানি এতাদৃশ প্রশংসার যোগ্য হইলেও তাহার রচনাপ্রণালীর দোষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।' 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ'র লেখক দয়ালচন্দ্র ঘোষ আরও সুর চড়াইয়া বলিয়াছেন, "রামপ্রসাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য কালীকীর্তন।" ইদানীং যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তও বলিয়াছেন "কালীকীর্তনের সুমধুর পদাবলী এক সময়ে বাঙালীর ঘরে ঘরে মধু বর্ষণ করিত।" (সাধককবি রামপ্রসাদ) ইঁহারা বিষয়গৌরবকে কবিত্ব বলিয়া মনে করিয়াছেন; তাই কবিত্ববর্জিত বিচিত্র বিষয়পূর্ণ কালীকীর্তনের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু কাব্যাদর্শের দিক হইতে কালীকীর্তন বিচার করিলে রামপ্রসাদের নামে প্রচারিত এই [illegible] অসংলগ্ন [illegible] কোন প্রকারেই সার্থক কাব্য বলা যাইবে না।

কৃষ্ণকীর্তন ও বিদ্যাসুন্দর—এই তিনখানি গ্রন্থ কেবল লিখিত হইয়াছিল, আর কিছুই লিপিবদ্ধ ছিল না।" ইহাতে মনে হইতেছে কৃষ্ণকীর্তনের পুরা রূপ সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বর গুপ্ত ইহা হইতে শুধু একটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন :

প্রথম বয়স রাই রসরঙ্গিণী।
ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী॥
রাই বদন হেরো ললিতা বলে।
রাই আমার মোহনমোহিনী॥ ইত্যাদি

এই সমস্ত রচনা প্রকৃতই রামপ্রসাদের রচিত কিনা বলা যায় না। ভাষা ও রীতি পারিপাট্যের মধ্যে এমন কোন রামপ্রসাদী ভাব নাই, যাহাতে ইহাকে সহজেই রামপ্রসাদের বলিয়া চিনিতে পারা যায়। গুপ্ত কবি রামপ্রসাদের ভণিতাযুক্ত কৃষ্ণের নৌকালীলার একটি গানও উদ্ধার করেন :

ও নৌকা বাও হে হরা নতন কাণ্ডারী
রঙ্গে ব্রজবধূর সঙ্গে।
আতপ লাগয় হে চ় তরুণী ভরা তরণী
চালন কর মনের রঙ্গে॥

'সীতার বিলাপোক্তি' শীর্ষক কবিতায় 'প্রসাদ কহিছে শুন মা জানকী' এইরূপ ভণিতা আছে বলিয়া ইহাকে ঈশ্বর গুপ্ত রামপ্রসাদের রচনার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালের গবেষকগণও এই ধরনের কবিতায় রাম-প্রসাদের ভণিতায় (অথবা শুধু প্রসাদ ভণিতা) দেখিয়া ইহাদিগকে শাক্ত-কবি রামপ্রসাদ সেনের রচনা মনে করিয়াছেন। কিন্তু 'সীতার বিলাপোক্তি' এই রামপ্রসাদের রচনা নহে। খুব সম্ভব কবিওয়ালা রামপ্রসাদই ইহার রচয়িতা। এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতেছে :

অভাগিনি ডাকে উঠ না তুরিতো,
শুনিয়া না শুনো এ কেমন উচিতো,
কমলনয়নে চাহ না চকিতো
বিদরে পরাণো করুণা স্থকিতো
প্রবোধ দেহ না উঠিবা হে।

ইহা স্পষ্টতঃই কোন কবিওয়ালার রচনা। ইহার শব্দবিন্যাস, ছন্দ এবং বিশেষ ধরনের শব্দ ব্যবহার (তুরিতো, উচিতো, চকিতো, পরাণো, স্থকিতো)

পুরাপুরি কবিগানের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত, এই ধরনের অধিকাংশ পদ বা গান রামপ্রসাদ সেনের রচিত নহে। 'শিবসঙ্গীতে'র—

বৃষভ চলিছে খিমিকি খিমিকি,
বাজয়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি,
ধবত তাল দ্রিমিকি দ্রিমিকি,
হরি গুণে হর নাচিয়া।

ইহাও কোন কবিওয়ালার রচনা বলিয়া মনে হইতেছে। আর ইহা যদি রামপ্রসাদ সেনের রচনা বলিয়াই প্রমাণিত হয়, তাহা হইলেও কবিকে ইহার জন্য ধন্য-ধ্বনির দ্বারা অভিনন্দিত করিবার প্রয়োজন নাই—কারণ কাব্য-বিচারে এ সমস্ত অকিঞ্চিৎকর রচনা উল্লেখযোগ্য নহে। রামপ্রসাদের প্রধান পরিচয়—তাঁহার শাক্তপদাবলী। অতঃপর আমরা তাঁহার পদাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইয়া এই কবিপ্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব।

রামপ্রসাদের শাক্তপদাবলী—রামপ্রসাদ 'বিদ্যাসুন্দরে' বলিয়াছেন, "গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত"। বাস্তবিক, তাঁহার শাক্তপদে গ্রন্থলব্ধ পাণ্ডিত্যের যাবতীয় সংস্কার দূর হইয়া যায়। আমরা যেন আদিম পৃথিবীর ভয়াতুর নৈশান্ধকারে ফিরিয়া যাই, যে অন্ধকারে স্নেহব্যাকুল জননী কোল পাতিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। রামপ্রসাদ দেবী কালিকার রূপক প্রতীকের আড়ালে বিশ্বজননীকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন—আমরা মাতার বরাভয় লাভ করিয়া অভীঃ হই, অনাবৃত শিশুর বেশে তাঁহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ি। সাধক-কবি কবিরঞ্জন আমাদের জন্য এই আশ্বাস ও সান্ত্বনা তাঁহার গানে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। বাহিরের প্রতিকূল শক্তি যত দুর্মদ হউক না কেন, জননী কালিকার স্নেহধন্য আশ্রয় পাইলে আমরা যমরাজকে অবহেলা করিতে পারি। রামপ্রসাদ আদিম অন্ধকারের মধ্যে আশার বর্তিকা জ্বালাইয়াছেন। মায়ের কৃপা পাইলে ব্রহ্মপদও তুচ্ছ হইয়া যায়। রামপ্রসাদ সেই আলোকতীর্থের মশালবাহী। তাই তিনি শুধু কবি বা গায়কমাত্র নহেন। মানুষের ত্রিতাপদগ্ধ জীবনে তিনি স্নেহের প্রলেপ দিয়াছেন।

ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন, "এমত জনরব যে কবিরঞ্জন একলক্ষ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।" স্বয়ং রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, "লাখ উকিল করেছি

তাড়া, মায় কি ইহার বাড়া মা গো।" ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন, কবি লক্ষ গান রচনা করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য অনুমান মাত্র। তিনি বহু পদ লিখিয়াছিলেন; পূর্ববঙ্গেব দ্বিজ বামপ্রসাদ এবং কলিকাতাব কবিওয়ালা রামপ্রসাদেব অনেক গান তাঁহাব গানেব সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে তাহাও ঠিক। আর তাহা ছাড়া তিনি "বাল্যকাল হইতে মৃত্যুব দিবস পর্যন্ত পদবিন্যাসে বিরত হয়েন নাই।" (ঈশ্বব গুপ্ত) সে যাহা হউক, তাঁহাব পদসমূহ তাঁহাব জীবিতকালে লোকেব মুখে মুখে ফিবিত, তিনি বোধ হয বিদ্যাসুন্দরেব মতো কোন পুঁথিতে পদ সংগ্রহ কবিয়া যান নাই। ফলে যাহাব কাছে তাঁহার পদ ছিল, তিনি তাহা গোপনে বক্ষা কবা পবিত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। ঈশ্বব গুপ্ত বহু চেষ্টা কবিয়াও সেই সমস্ত ভক্তদেব কাছ হইতে রামপ্রসাদেব পদ বাহিব কবিতে পাবেন নাই। তবে তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত পদগুলিব অধিকাংশই গায়কদেব কণ্ঠ এবং কথক ও পাঁচালী-কারদের খাতা হইতে লিখিয়া লইয়াছিলেন। ইহাব সংখ্যা মোট ৯১। নিশ্চয রামপ্রসাদ ইহাব অনেক বেশী পদ লিখিয়াছিলেন, যাহাব যৎসামান্য লোকমুখে, পথভিখাবী ও কালীকীর্তন-গাযকদেব নিকট বক্ষিত ছিল।[৩৪] এখন যে সমস্ত প্রসাদপদাবলী মুদ্রিত হইতেছে, তাহাতে প্রায তিনশত পদ পাওয়া যায়। তাহাব সবগুলিই বামপ্রসাদ সেনেব বচনা নহে। দ্বিজ বামপ্রসাদ, কবি-ওয়ালা বামপ্রসাদ এবং আবও কয়েকজন শাক্তপদকাব 'বামপ্রসাদ' ভণিতা দিয়া বহু পদ রচনা কবিয়া প্রসাদ-পদাবলীব সংখ্যা আবও বাডাইযা দিয়াছেন।[৩৫]

রামপ্রসাদেব সাধনসঙ্গীতেব পটভূমিকায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীব দ্বিতীয়ার্ধেব বাঙলাদেশেব অর্থনৈতিক ও সামাজিক পবিবেশের প্রভাব বহিয়াছে তাহা

---

৩৪ "রামপ্রসাদ জীবন ভবিযা বহু সহস্র গান রচনা করিযাছিলেন, যাহার শতাংশও রক্ষা পায় নাই।"—ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (সাধক কবি বামপ্রসাদ)

৩৫ কেহ কেহ ('প্রসাদ-পদাবলী'র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ) মনে করেন, রামপ্রসাদ ভণিতাযুক্ত যে সব পদে আপীল, ডিক্রী, ডিসমিস, প্রভৃতি ইংরাজী শব্দ আছে সেগুলি পরবর্তী কালের কবিওযালা বামপ্রসাদ চক্রবর্তীর রচনা। কারণ কবিরঞ্জনের পক্ষে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার সম্ভব ছিল না। এ যুক্তি মানিযা লইতে বাধা নাই। কিন্তু রামপ্রসাদ যখন জমিদারী সেরেস্তাব কাজ করিতেন, তখন ইস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানীর রাজস্ব ব্যবস্থা চালু হইয়াছিল, দেওযানী ব্যাপারে ইংরাজের হস্তক্ষেপ শুরু হইয়া গিযাছিল। কাজেই সমসাময়িক কবির পক্ষে এইরূপ শব্দের ব্যবহার নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার নহে।

অতীতকালের কথা বাদ দিলেও তখন সবেমাত্র ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বর্গীর হাঙ্গামা, মুসলমান শাসনের বিশৃঙ্খলা, দুর্ভিক্ষ, লুঠতরাজ প্রভৃতি নানা প্রকাব অত্যাচাবে বাঙালীব মনে শান্তি ছিল না, সমাজেও শৃঙ্খলা ছিল না। কাজেই বামপ্রসাদেব পদে সেই দারিদ্র্য, অনাচার-অবিচাব-অত্যাচাবেব প্রতীক ব্যবহৃত হইয়াছে—কবিব ব্যক্তিগত জীবনও তাঁহাব ভজনগীতিকে কম প্রভাবিত কবে নাই। বস্তুতঃ তাঁহাব পদেব কাব্যসৌন্দর্য ও ভক্তিতত্ত্ব ছাড়িয়া দিলেও ইহা অবলম্বনে তৎকালীন বাঙলাদেশেব দৈনন্দিন জীবনেব বাস্তবধর্মী চিত্র পাওয়া যায়।

বিষয় ধবিয়া প্রসাদ-পদাবলীকে অনেক সংগ্রাহক নানা নামে ও শ্রেণীতে বিভক্ত কবিয়াছেন।[৩৬] আভ্যন্তবীণ বিষযেব ভাব অনুসাবে উপচ্ছেদে ভাগ কবিলে অসংখ্য শ্রেণী-উপশ্রেণীব সাবি দিযা সাজানো যায়। সুতরাং অনাবশ্যক জটিলতাব মধ্যে না গিযা প্রসাদ-পদাবলীকে এই ভাবে বিভক্ত কবা যায় :—উমা-বিষযক (আগমনী ও বিজয়া), সাধন-বিষয়ক (তন্ত্রোক্ত-সাধনা), দেবীব স্বরূপ-বিষয়ক, তত্ত্বদর্শন ও নীতি-বিষয়ক এবং কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি-বিষয়ক।

বামপ্রসাদেব আগমনী ও বিজয়া গানেব সংখ্যা নগণ্য, কাব্যোৎকর্ষও এমন কিছু প্রশংসনীয় নহে। বৎসবান্তে উমাব হিমাচল ভবনে আগমনে চাবিদিকে যখন আনন্দেব স্রোত বহিতেছে তখন কন্যাব দাবিদ্র্যেব কথা স্মরণ কবিয়া গিবিবাণী বলেন :

বলে জনক তোমাব গিবি পতি জনম ভিখাবী
তোমা হেন সুকুমাবী দিলাম দিগম্বরে।

আনন্দের হাটে মেনকাব এই মনোবেদনা কবি বেশ আন্তরিকভাবেই ফুটাইয়াছেন। তবে পববর্তী কবিসাধক ও গায়কগণ, বিশেষতঃ কবিওয়ালাগণ এই পর্যায়েব পদে অধিকতর নিপুণতা দেখাইয়াছেন।

রামপ্রসাদ স্বয়ং তন্ত্রসাধক ছিলেন। এই সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ

৩৬ কৈলাসচন্দ্র সিংহ 'সাধক-সঙ্গীতে' প্রসাদ-পদাবলীকে এইভাবে বিভক্ত করিয়াছেন : (১) প্রার্থনা, স্তুতি ও অভিমান ইত্যাদি, (২) মৃত্যুর প্রাকালে সঙ্গীত, (৩) ষট্‌চক্র বর্ণন, (৪) ষট্‌চক্রভেদ, (৫) শব সাধনা, (৬) সমরবিষযক, (৭) আগমনী, (৮) বিজয়া। ইহার উপরে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ('সাধককবি রামপ্রসাদ') আরও কয়েকটি উপবিভাগের কল্পনা করিয়াছেন ; যথা—সংসার বিতৃষ্ণা, আত্মনির্ভরতা, বৈরাগ্য ইত্যাদি।

করিয়াছিলেন, এইরূপ নানা গল্পকাহিনী প্রচলিত আছে। তাঁহার গ্রামে এখনও তাঁহার সাধন-ধামের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার দীক্ষা-গুরুর নাম নিশ্চিতরূপে জানা যায় না বটে,[৩৭] তবে কবি তন্ত্রসাধনায় বীরাচারী সাধক ছিলেন। 'পঞ্চমকার' ও পঞ্চমুণ্ডি আসন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির কথা তাঁহার পদে পাওয়া যায়। তন্ত্রোক্ত সাধনা মূলতঃ সাধকের দেহকেন্দ্রিক সাধনা। কবি বহু পদে সেই সমস্ত তত্ত্বকথা এবং সেই তত্ত্ব বিষয়ক উপলব্ধির কথা বলিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার তন্ত্রসাধনার উপলব্ধি সংক্রান্ত কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইতেছে :

(১) আমার মনের বাসনা জননি।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে হ, ল, ক্ষ, ব্রহ্মরূপিণী॥
মূলে পৃথ্বী ব, শ, অন্তে চারি পদে মায়া ডাকিনী।
সার্ধ ত্রিসংখ্যাকারে শিরে শোভে কুণ্ডলিনী॥

(২) বর্ণরূপা তুমি বট ব, স, র, ল, ড, য, ক, ঠ[৩৮]
ষোল স্বর কণ্ঠায় শিখরে।
হ, ক্ষ আজ্ঞাভুক নিত্যশুদ্ধ কহিলা শুক
চিন্তা এই শরীর ভিতরে॥

(৩) হৃৎকমল মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মনপবনে দুলাইছে দিবসরজনী ও মা॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা সুষুম্না মনোরমা
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা ব্রহ্মসনাতনী ও মা॥

(৪) তীর্থগমন মিথ্যা ভ্রমণ মন উচাটন করো না রে।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈসে শীতল হবে অন্তঃপুরে॥

---

৩৭ কবি কোন কোন পদে শ্রীনাথ দত্তের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া ("শুনেছি শ্রীনাথের কথা বট চতুর্বর্গদাতা", "আছে শ্রীনাথ দত্ত পটলসত্ত্ব মধ্যে মধ্যে এটি চাবা") তাঁহাকেই কবির দীক্ষাগুরু বলা হয়। কেহ বলেন, তাঁহার অপর নাম 'কৃপানাথ' (তারাপদ বক্সিত—'ভিক্টোরিয়া যুগের বাংলা সাহিত্য')। কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।

৩৮ তন্ত্রে বিভিন্ন চক্রে বিভিন্ন পদ্ম পরিকল্পিত হইয়াছে, সেই পদ্মের দলে বিভিন্ন মাতৃকা শক্তি বিরাজ করেন। তাঁহাদিগকে অক্ষরপ্রতীকে চিহ্নিত করা হইয়াছে। যথা—সুষুম্না নাড়ীর মুখে প্রস্ফুট পদ্মের নাম 'আধার' পদ্ম। ইহার চারি দলে চারিটি মাতৃকাবর্ণ—ব, শ, ষ, স। নাভিমূলে 'মণিপুর' পদ্ম। ইহার দশদলে দশটি মাতৃকাবর্ণ—ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ। এই পদ্মদলে ইষ্টদেবীকে বসাইয়া ধ্যান আরাধনা করিতে হয়। এখানে রামপ্রসাদ সেই সমস্ত অক্ষর-প্রতীকের ইঙ্গিত করিয়াছেন।

তিনি যে তান্ত্রিক গ্রন্থাদি অবলম্বনে ও গুরুনির্দেশে তন্ত্রসাধনা করিতেন, তাহার নানা ইঙ্গিত এই সমস্ত সাধনভজন-সংক্রান্ত পদে আছে। এই পথের পথিকদের নিকট ইহার তাৎপর্য বিশেষমূল্যবান হইলেও সাহিত্যের ইতিহাসে ও কাব্যরস বিচারে ইহাদের বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কেবল যেখানে সাধ্যসাধন তত্ত্বকথা কবির ব্যক্তিগত অনুভূতিকে স্পর্শ করিয়াছে সেখানেই কিঞ্চিৎ শিল্পরসের উদ্ভব হইয়াছে। কবি যখন বলেন :

কে জানে গো কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন।
কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁরে মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন॥

তখন তাহা তত্ত্বকথা হইয়াও বিচিত্র রসরূপ সৃষ্টিতে সার্থক হইয়া ওঠে।

রামপ্রসাদ কোন কোন পদে দেবীর স্বরূপ অবধারণ করিতে গিয়াছেন। সন্তান যেমন মাকে খুঁজিয়া বেড়ায় তিনিও তেমনি তাঁহাকে নানাভাবে সন্ধান করিয়াছেন। কবি কখনও কালিকার রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া প্রশ্ন করেন, "ঢ'লয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে।" অসুরযুদ্ধে কালিকার কালো অঙ্গে রাঙা রক্ত লাগিয়াছে, কবি দেখিতেছেন—"কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে"—এ বর্ণনা সংযত, গম্ভীর এবং বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ উপযুক্ত। শেষ পর্যন্ত কবি বলিয়াছেন, "ব্রহ্মময়ীরে করুণাময়ীরে বল জননী।" কবি বিশ্বমাতাকে নিজের মা বলিয়া চিনিতে পারিয়া আশ্বস্ত হইলেন। কখনও-বা কবি দেখিতেছেন— "মহাকাল কানু, শ্যামা শ্যামতনু একই সকল বুঝিতে নারি।" কবির উদার চিত্তের কাছে শাক্ত বৈষ্ণবের ভেদ সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া যায়। কবি বেদ-পুরাণে কত সন্ধান করিলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখিলেন, "সকল আমার এলোকেশী।" তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই শিব, তিনিই রাম। তাই কবি বহু বিচিত্রের মধ্যে পরম এককে উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইলেন—"আমার ব্রহ্মময়ী সর্বঘটে, পদে গয়া গঙ্গা কাশী।"[৩৯] এই দিক দিয়া তিনি জননীকে যে

৩৯ কবি একাধিক পদে বাহ্যিক মূর্তি, পূজা, উপাসনা, বলি উপচারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন নাই। একটি পদে তিনি বলিয়াছেন :

ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি জেনেও কি তাই জান না ?
মাটির মূর্তি গড়িয়ে মন করতে চাও তাঁর উপাসনা॥

আদ্যাশক্তিরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা ব্রহ্মতত্ত্বেরই অনুরূপ। কবি দেখেন, সমস্ত ভুবন জুড়িয়া ক্ষেপা মায়ের খেলা চলিয়াছে—"এ সব ক্ষেপা মায়ের খেলা।" এই ক্ষেপার খেলায় রামপ্রসাদও যোগ দিয়া প্রবহমান বিশ্বার্ণবে ভেলা ভাসাইয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছেন :

প্রসাদ বলে, থাকো বসে ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা।
যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাবে, ভাঁটিয়ে যাবে ভাঁটার বেলা॥

কবি তীর্থদর্শন কামনা করেন না ('আর কাজ কি আমার কাশী'), কারণ "মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়াগঙ্গাবারাণসী।" কাশীধামে মোহমুক্তি হয়। কিন্তু কবি তো মোক্ষ-মুক্তির অভিলাষী নহেন—মাতা-পুত্রের বাৎসল্য লীলার স্নিগ্ধমধুর ভাবই তাঁহার কাম্য। তাঁহার সেই বিখ্যাত উক্তি—"চিনি হওয়া ভাল নয় মা, চিনি খেতে ভালবাসি।" ব্রহ্মময়ীর সাযুজ্য লাভ নহে, তাঁহার সঙ্গে লীলারসই তাঁহার একান্ত কামনা।

কবি যেমন শাক্ততন্ত্রের সাধ্যসাধনতত্ত্বের বাতায়ন হইতে আদ্যাশক্তির লীলামাহাত্ম্য দর্শন করিয়াছেন, তেমনি আবার জীবন, নীতি ও ধর্মসাধনার কেন্দ্র হইতেও অনেক পদ রচনা করিয়াছিলেন। তবে এগুলি ইংরেজ 'মেটাফিজিকাল' কবিদের মতো নিছক তত্ত্বদর্শন নহে, কবিমানসের উন্নয়নই এই নীতিমার্গীয় গানগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। কবি বুঝিয়াছেন, চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক প্রবণতা বিদূরণ তন্ত্রসাধনার প্রথম সোপান। অথচ মানুষের মন নিত্যই বিষয়াসক্ত। এই বিষয়বাসনা হইতে বিষয়ীর মুক্তি যেন কিছুতেই করায়ত্ত হয় না। তাই কবি অবাধ্য অবশ মনকে তত্ত্বের কশাঘাতে শাসন করিতে চাহিয়াছেন। বিষয়রসে আকণ্ঠমগ্ন পার্থিব মনকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিয়াছেন, "ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি দেখিস না রে বসে বসে।" কখনও কবি বলেন :

মন ভুলো না কথার ছলে।
লোকে বলে বলুক মাতাল ব'লে॥

কখনও নিজের মনকে সান্ত্বনা ও সাহস দিয়া তাহাকে সজাগ করিয়া দেন :

আর একটি পদে বলিয়াছেন :

ধাতু পাষাণ মাটির মূর্তি কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদিপদ্মাসনে॥

মন কেন রে ভাবিস এত—
যেমন মাতৃহীন বালকের মত।
ভবে এসে ভাবছ বসে কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে কালের কাল মহাকাল সে কাল মায়ের পদানত॥

কখনও বিষয়াসক্ত মনকে কবি ভর্ৎসনা করিয়া বলেন :

রইলি না মন আমার বশে।
ত্যজে কমলদলের অমল মধু মত্ত হলি বিষয়রসে॥

অবশ্য মনের অধোগতির জন্য মনকে দায়ী না করিয়া কবি শ্যামা মায়ের প্রতিই অনুযোগ করেন :

মন-গরীবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা যেমনি নাচাও তেমনি নাচে॥

এমনি করিয়া অশান্ত দুর্বশ মনকে শ্যামা মায়ের চরণে সঁপিয়া দিয়া কবি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

একটু অবহিত হইয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, কবি যে একটি বিশেষ সামাজিক উৎক্রান্তির মুখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তিনি গোপন করেন নাই। জমিজমা তাঁহার নিতান্ত মন্দ ছিল না, আর্থিক অনটন হইবারও কথা নহে। কিন্তু বিষয়বুদ্ধিতে অপটু এবং বাস্তবজীবনে উদাসীন কবির অর্থকৃচ্ছ্রতা কোনদিন ঘুচে নাই। তাই তাঁহার সাধকজীবনে বাস্তব-জীবনের নানা চিত্র প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি জমিদারী সেরেস্তার খাতায় দেবী কালিকার কাছে 'তবিলদারী' চাহিয়া পদ লিখিয়াছিলেন। তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ কবির উদ্দিষ্ট হইলেও তাঁহার বাস্তবজীবনের চিত্রও ইহাতে স্পষ্টতর হইয়াছে। তিনি যখন বলেন :

আমার কপাল গো তারা
ভাল নয় মা, ভাল নয় মা, ভাল নয় মা কোনকালে॥

কিংবা

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ গো মা সংসারি॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি।

কখনও-বা তিনি সান্ত্বনা পাইয়া বলিয়াছেন, "তুমি এ ভাল করেছ মা আমায় বিষয় দিলে না।" কখনও সংসারের দুঃখে ব্যথিত কবি বলেন, "এই সংসারে

সং সাজিতে সার হলো গো দুঃখের ভরা।" কোন কোন সময় তিনি প্রত্যক্ষভাবেই বাস্তব দুঃখদুর্দশার কথা তোলেন :

দুঃখের কথা কই গো তারা, মনের কথা কই।
কে বলে তোমারে তারা দীন দয়াময়ী॥
* * * *
কারও অঙ্গে শাল দো-শালা ভাতে চিনি দই।
আবার কারও ভাগ্যে শাকে বালি ধানে ভরা খই॥

তাই কবি আর্তনাদ করিয়া বলিয়াছেন :

কেন আসার আশা ভবে আসা আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রইল॥
মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় করে ছলো।
ওমা মিঠার লোভে তিত মুখে সারা দিনটা গেল॥

কবির দীর্ঘ জীবনটা মিঠার লোভ করিয়াছিল, শেষ পর্যন্ত দুঃখের তিক্ততায় সারা জীবন কাটিয়া গেল। কিন্তু "এবার বাজি ভোর হলো।" এখন জীবনপ্রান্তে পৌঁছাইয়া কবি কি করিবেন? "এখন সন্ধ্যাবেলায় ঘরের ছেলে ঘরে নিয়ে চল।" রামপ্রসাদ কোলের সন্তান হইয়া বিশ্বজননীর স্নেহাঞ্চলে ঠাঁই চাহিয়াছেন, অভাব-অভিযোগ দূর হইয়াছে, মৃত্যুভীতিও বিদায় লইয়াছে—"যারে শমন যারে ফিরি।"

সারা দেশে রামপ্রসাদের জনপ্রিয়তার একটা কারণ, বাস্তব দুঃখকে তিনি বৈষ্ণবপদাবলীর মতো সূক্ষ্ম রসে পরিণত করেন নাই; তাহাকে স্বীকার করিয়া তাহা হইতে মুক্তির পথ খুঁজিয়াছেন। দুঃখবেদনা হইতে পলায়ন নহে, তাহার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াও নহে—আদ্যাশক্তির কৃপায় কবি সমস্ত সুখ-দুঃখ ত্যাগ করিয়া মুক্তির পথ খুঁজিয়াছেন। তখন কবি বলেন :

আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
ভবে দাও দুঃখ মা আর কত চাই॥
আগে পাছে দুখ চলে মা যদি কোন খানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥
* * * *
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে আমি করি দুখের বড়াই॥

কবি দুঃখের আঘাতে আরও নিবিড় করিয়া জননীকে চিনিয়া লইয়াছেন—

এই জন্যই দুঃখ লইয়া তাঁহার বড়াই, শ্যামার দেওয়া দুঃখ তাঁহাকে অগ্নিশুদ্ধ স্বর্ণের মতো বিশুদ্ধি দান করিয়াছে। কবি দেখিয়াছেন, দুঃখ হইতে একমাত্র পরিত্রাণের পথ—শ্যামার চরণে আশ্রয় গ্রহণ, এক যুগের বাঙালী এ কথায় বড় সান্ত্বনা পাইয়াছিল। তদানীন্তন কুশাসন, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, নিত্য দারিদ্র্য—ইহা হইতে মুক্তির পথ কোথায়? সেই পথই রামপ্রসাদ দেখাইয়া দিয়াছেন। কাজেই তাঁহার গানের মধ্যে দুঃখবেদনার কথা থাকিলেও সেই দুঃখবেদনা প্রসাদী সঙ্গীতের ফলশ্রুতি নহে—বাস্তব দুঃখ হইতে সাধনার চিদানন্দময়লোকে উত্তরণই কবির অভিপ্রেত—সাধারণ গৃহী মানুষ ইহা হইতে আশার আলোক লাভ করিয়াছে, মুমুক্ষু ইহা হইতে মুক্তিমোক্ষের এষণা লাভ করিয়াছে, লীলারসিক এই সমস্ত গানে মাতাপুত্রের বাৎসল্য-রসের সম্পর্ক দেখিয়া তৃপ্ত হইয়াছে। এইজন্যই বাঙালী জাতির বিশেষ ঐতিহাসিক ক্ষণের সঙ্গে রামপ্রসাদের পদাবলী জড়াইয়া গিয়াছে।

রামপ্রসাদের পদের অনেক স্থলে অলঙ্কৃত বাক্‌রীতি থাকিলেও[৪০] কবি সাদা সুরে সহজ ভাষায় অধিকাংশ গান রচনা করিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতাই তাঁহার অবলম্বন, দৈনন্দিন জীবিকার প্রতীকই তাঁহার তত্ত্বকথার বাহন হইয়াছে। যখন তিনি প্রশ্ন করেন:

বল্ দেখি ভাই কি হয় ম'লে!
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥

তখন স্বয়ং কবিই তাহার জবাব দেন:

প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই তাই হবি রে নিদানকালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে॥

---

৪০ কয়েকটি অলঙ্কৃত বাক্‌রীতির দৃষ্টান্ত:

(১) তনু দলিতাঞ্জন শরদ সুধাকরমণ্ডল বদনী রে।
কুন্তল বিগলিত শোণিত শোভিত
তড়িত জড়িত নবঘন ঝলকে রে॥

(২) ওকে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি বিগলিত বেশ
বসনবিহীনা কে রে সমরে।
মদনমথন উরসি রূপসী হাসি হাসি বামা বিহরে॥
প্রলয়কালীন জলদ গর্জে তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জে
জগমনোহরা শমন সোদরা গর্বখর্ব করে॥

সহজ উপমা-রূপকে তিনি যেভাবে তত্ত্বকথার নির্দেশ দান করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কবিত্বের বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। অবশ্য বৈষ্ণব পদকারের মতো ভাষা ও ছন্দের ঝঙ্কার এবং কল্পনার সূক্ষ্মতা তাঁহার রচনায় ততটা পাওয়া যায় না, রূপক-প্রতীকের সাহায্যে কবি তত্ত্বকথার ইঙ্গিত দিলেও তাহা বহুস্থলেই শিল্পরূপ লাভ করিতে পারে নাই। অবশ্য ইহা শুধু তাঁহার একার ত্রুটি নহে, সমস্ত শাক্তপদাবলীরই ইহা একটা সাধারণ লক্ষণ। কবিগণ মূলতঃ সাধক ছিলেন বলিয়া তত্ত্বের দিকেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন—ফলে কাব্যকলার কিঞ্চিৎ খর্বতা ঘটিয়াছে। রামপ্রসাদ সম্বন্ধেও সে কথা কিয়ৎপরিমাণে সত্য। তাঁহার কয়েকটি পদের রচনাকৌশল, সংযত বাক্‌মূর্তি ও ভাবাবেগ অতি প্রশংসনীয় মনে হইলেও বহু স্থলেই পদগুলি নিতান্ত গতানুগতিক, কৃত্রিম ও রসবর্জিত হইয়াছে। তথাপি এই পদে ত্রিতাপজর্জর মানুষের সান্ত্বনার বাণী আছে বলিয়া ইহার কাব্যমূল্য যেমনই হোক না কেন, বাঙালী-মানসে ইহার বিশেষ প্রভাব ও চিরকালীন আবেদন অস্বীকার করা যায় না।

২. সাধক-কবি কমলাকান্ত ॥

জীবনকথা—বাংলা শাক্তপদসাহিত্যে আর একজন কবি ও সাধক রামপ্রসাদের তুল্য গৌরব লাভ করিয়াছেন। তিনি বর্ধমানের সুবিখ্যাত কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (বন্দ্যোপাধ্যায়)। রামপ্রসাদের মতোই তাঁহার জীবনকে কেন্দ্র করিয়া নানা অলৌকিক গল্প প্রচলিত হইয়াছে, সাধনমার্গেও তিনি রামপ্রসাদের মতো সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অবশ্য কবিরঞ্জনের অধিকতর জনপ্রিয়তার ফলে কমলাকান্তের খ্যাতি কিছু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে—যদিও তাঁহার অনেক শাক্তপদ কাব্যগুণে রামপ্রসাদ অপেক্ষা কোন দিক দিয়াই ন্যূন নহে। বর্ধমান রাজবংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল বলিয়া তাঁহার তিরোধানের পর বর্ধমানরাজের উদ্যোগে জীবনীসহ তাঁহার সমগ্র পদাবলী ('শ্যামাসঙ্গীত'—১৮৫৭) মুদ্রিত হইয়াছিল।[৪১] ইহার তিন-চারি

৪১ ইহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

শ্রীশ্রীকালীশরণং / শ্যামাসঙ্গীত। / অধুনা / শ্রীলশ্রীযুক্ত বৰ্দ্ধমানাদি মহামহীশ্বর / চতুৰ্দ্দশ-ভূপতির / আজ্ঞানুসারে ও ব্যয়দ্বারা / শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক / সংগৃহীত / এবং / শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা / সংশোধিত হইয়া / কলিকাতা / ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। / সন ১২৬৪। ইংরাজী ১৮৫৭ সাল। / শকাব্দ ১৭৭৯। / ২২ ভাদ্র।

বৎসর পূর্বে ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' (১২৬০) রামপ্রসাদের সঙ্গীত ও জীবনী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু কমলাকান্ত সম্বন্ধে তিনি কৌতূহলী হন নাই কেন, তাহা বুঝা যাইতেছে না। ১৯২০ সালে কমলাকান্তের জীবনীকার অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বয়ং কবির জন্মস্থান, জীবনকথা ও সাধনস্থান সম্বন্ধে প্রচুর অনুসন্ধান করিয়া যৎসামান্য তথ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বর্ধমান রাজগ্রন্থাগারেও কমলাকান্ত-সংক্রান্ত কোন পুঁথি বা সঙ্গীত সংগ্রহ দেখিতে পান নাই।[৪২] তাঁহার কমলাকান্তের জীবনী ১৩৩২ সালে প্রকাশিত হয়। ঐ একই বৎসরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে কমলাকান্তের 'সাধকরঞ্জন' শীর্ষক তন্ত্রসাধনা বিষয়ক বাংলা কাব্য প্রকাশিত হয়। উভয় গ্রন্থেই কবির সংক্ষিপ্ত জীবনকথা স্থান পাইয়াছে। কিন্তু তথ্যের অভাবে উক্ত গ্রন্থে জনশ্রুতি ও গালগল্পের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক পর্যন্ত যিনি জীবিত ছিলেন, যিনি রাজবংশের গুরু বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন এবং জীবিতকালেই মহাসাধক বলিয়া যাঁহার নাম প্রচারিত হইয়াছিল, তাঁহার জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য ঘটনা সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই—ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

কমলাকান্ত 'সাধকরঞ্জনে'র সমাপ্তির দিকে এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন :

অতঃপর কহি শুন আত্মনিবেদন।
ব্রহ্মকুলে উপনীত শ্যাম নারায়ণ॥
জন্মভূমি অম্বিকা নিবাস বর্দ্ধমান।
শ্রীপাট গোবিন্দমাঠ গোপালের স্থান॥
প্রভু চন্দ্রশেখর গোস্বামী মহাধন।
তার পদরেণু যার মস্তকভূষণ॥
নামেতে কমলাকান্ত ভাবি ত্রিলোচন।
ভাষা পুঞ্জে বিরচিল সাধক রঞ্জন॥

কবির এই উক্তি, অন্যান্য স্থান হইতে সংগৃহীত তথ্য, 'সাধক কমলাকান্তে'র লেখক অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিবরণ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'সাধকরঞ্জনে'র মুখবন্ধ হইতে দেড় শতাব্দী পূর্বে আবির্ভূত কমলাকান্তের জীবনী সম্বন্ধে আন্দাজী রকমের জীবনকথা জানা যায়।

---

৪২ অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সাধক কমলাকান্ত, পৃ. ৩৫

তাঁহার আদিনিবাস কালনার অন্তর্গত অম্বিকা গ্রাম। পিতার নাম মহেশ্বর ভট্টাচার্য, মাতার নাম মহামায়া। তাঁহার দুই সহোদর, তন্মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ। অম্বিকা-কালনার বিদ্যাবাগীশ পাড়ায় রায় বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহাদের কৌলিক উপাধি খুব সম্ভব বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁহার পিতা ও তিনি 'ভট্টাচার্য' উপাধির দ্বারাই পরিচিত হইয়াছিলেন। কালনার বিদ্যাবাগীশ পাড়ায় এখনও কমলাকান্তের বাস্তুভিটার চিহ্ন আছে। বাল্যবয়সে কবি স্থানীয় টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি মাতার সহিত মাতুলালয় চান্নাগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই চান্নাগ্রাম বর্ধমান জেলার খানা জংসনের নিকটবর্তী একখানি ছোট গ্রাম। এখানে বিশালাক্ষী বা বাসুলির মন্দির ও মূর্তি আছে। স্থানীয় প্রবাদানুসারে কবি এই মন্দিরেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কমলাকান্তের মাতুলের নাম নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য। কবির মাতুল-ভিটার চিহ্ন এখনও আছে। কবির সঙ্গে বর্ধমান রাজবংশের শ্রদ্ধাপ্রীতির সম্পর্ক ছিল। কালনায় বাস করিবার সময়েই উক্ত রাজবংশের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বর্ধমানের নিকটবর্তী কোটালহাটে কবির জন্য একটি বাটী নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। শুনা যায়, কবিকে নাকি বর্ধমান রাজসরকার হইতে মাসিক দুই শত টাকা বৃত্তি দেওয়া হইত।[৪৩] পরবর্তী কালে মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র হইতে বিজয়চন্দ্র প্রভৃতি রাজা ও রাজকুমারেরা এই মহাসাধকের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মহারাজ তেজচন্দ্র কমলাকান্তকে সভাপণ্ডিতের গৌরবজনক পদ দিয়াছিলেন। এমন কি, পুত্র প্রতাপচন্দ্রের শিক্ষাদীক্ষার ভারও তিনি কমলাকান্তের উপর দিয়াছিলেন। কমলাকান্ত ও প্রতাপচন্দ্রের মধ্যে সুগভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। কমলাকান্তের সঙ্গে রাজা প্রতাপচন্দ্রের বন্ধুত্বের সম্পর্ক লইয়া পরবর্তী কালে মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ্র মহাতাব বাহাদুর 'কমলাকান্ত' শীর্ষক একখানি নাটিকাও লিখিয়াছিলেন (১৩২০)। বস্তুতঃ বর্ধমান রাজবংশ কমলাকান্তের স্মৃতিকে পরম ভক্তিভরে রক্ষা করিয়াছেন। ১৮৫৭ সালে মহারাজাধিরাজ মহাতাবচাঁদ বাহাদুর 'শ্যামাসঙ্গীত' নামক কাব্যে কমলাকান্তের যাবতীয়

---

৪৩ অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৫৭ (পাদটীকা)

পদাবলী প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে কমলাকান্তের যত পদসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, সবই ঐ 'শ্যামাসঙ্গীত' অবলম্বনে সঙ্কলিত হইয়াছে।

কমলাকান্তের দুই বিবাহ ছিল শুনা যায়। তাঁহার সম্বন্ধে নানা অলৌকিক গল্পকাহিনী এখনও বর্ধমান অঞ্চলে প্রচলিত আছে। দেবী কালিকা যেমন রামপ্রসাদের কন্যারূপে বেড়া বাঁধিতে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া গল্প শুনা যায়, তেমনি কমলাকান্তের মাহাত্ম্য বর্ধনের জন্য ঐরূপ একটি অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। স্বয়ং কালিকা বাগদিনী বেশে আসিয়া কবিকে মাছ জোগাইয়াছিলেন, এ গল্প এখনও স্থানীয় প্রবাদবাক্যের আকারে প্রচলিত আছে। আর একটি গল্প—একবার রাত্রিতে তিনি চান্নাগ্রামের নিকটবর্তী ডাকাইত-অধ্যুষিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর 'ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা' দিয়া আসিতেছিলেন। তখন ডাকাইতেরা তাঁহাকে ধরিয়া টাকাকড়ি কাড়িয়া লইয়া মারিয়া ফেলিতে উদ্যত হইলে তিনি মায়ের নামগান আরম্ভ করিলেন :

আর কিছু নাই শ্যামা তোমার কেবল দুটি চরণ রাঙা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি, অতেব হলেম সাহস-ভাঙা॥
জ্ঞাতিবন্ধু সুতদারা সুখের সময় সবাই তারা
কিন্তু বিপদকালে কেউ কোথা নাই ঘরবাড়ী ওড়গাঁয়ের ডাঙা॥

এই গান শুনিয়া দস্যুগণ অনুতপ্ত চিত্তে পাপ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া কমলাকান্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[৪৪] পত্নীর মৃত্যু হইলে কমলাকান্ত জলন্ত চিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গান ধরিয়াছিলেন :

কালি সব ঘুচালি লেঠা।
....
দুঃখে রাখ সুখে রাখ করব কি আর দিয়ে খোঁটা॥
আমি দাগ দিয়ে পরেছি আর পুঁছতে নারি সাধের ফোঁটা।

কবির মৃত্যুকালে তেজচন্দ্র বাহাদুর তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি তাহাতে অসম্মত হইয়া গাহিয়াছিলেন :

কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব।
আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে বিমাতার কি শরণ লব॥

ধর্মমতে তিনি কৌলসাধক ছিলেন, মদ্যপানাদি করিতেন। তাহার জন্য তেজচন্দ্র গুরুর কাছে ঈষৎ অনুযোগ করিতেন। বোধহয় কুমার প্রতাপ-

৪৪ ময়মনসিংহ গীতিকার দস্যু কেনারামের পালাও কতকটা এই প্রকার।

চন্দ্রও কমলাকান্তের সাহচর্যে কৌলধর্ম ও 'কারণে' বিশেষ আসক্ত হইয়াছিলেন। এইজন্য তেজচন্দ্র মাঝে মাঝে গুরুর নিকটে অনুযোগ করিতেন। অবশ্য প্রথম জীবনে কমলাকান্ত বোধহয় বৈষ্ণব গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার 'সাধকরঞ্জনে'র সমাপ্তিতে দেখা যাইতেছে :

প্রভু চন্দ্রশেখর গোস্বামী মহাধন।
তার পদরেণু যার মস্তকভূষণ ॥

কবি কিছু বৈষ্ণব পদও রচনা করিয়াছিলেন। এই জন্য মনে হয়, প্রথমজীবনে কালনায় থাকিবার সময় তিনি বৈষ্ণব প্রভাবে আসিয়াছিলেন। কিন্তু মাতুলালয়ে আসিয়া তিনি শাক্ত মত গ্রহণ করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। অবশ্য তাই বলিয়া তিনি বৈষ্ণব মত পুরাপুরি ত্যাগ করেন নাই, কারণ কয়েকটি শাক্তপদে কবি কৃষ্ণ ও কালীকে অভিন্ন বলিয়াছেন।[৪৫]

কমলাকান্তের তিরোধান সম্বন্ধে গবেষকগণ অনুমান করেন, সাধককবি ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে কোটালহাটের আশ্রমে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। কমলাকান্ত প্রিয় রাজবন্ধু প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুর (১৮২০ খ্রী: অ:) পরে বেশী দিন জীবিত ছিলেন না, এইরূপ শুনা যায়।[৪৬] জীবিতকালেই কবি সাধকরূপে বর্ধমানের চতুষ্পার্শ্বে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। স্বগ্রামে তিনি একটি টোল প্রতিষ্ঠা করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা দান করিতেন। কবি বহু সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, কোন পুঁথিতে কিছু কিছু পদ লিখিয়াও রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ভণিতায় 'সাধকরঞ্জন' শীর্ষক তন্ত্র সাধনা সম্পর্কিত যে পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, প্রথমে তাহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

সাধকরঞ্জন—কমলাকান্ত তন্ত্রসাধনা সম্পর্কে বাংলা পয়ার ত্রিপদীতে 'সাধকরঞ্জন' শীর্ষক একখানি তত্ত্বগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন—এইরূপ শুনা যায়। কিন্তু ১৯১৮ সালের পূর্বে ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বর্ধমান রাজবাটী হইতে প্রকাশিত কমলাকান্তের গীতসংগ্রহের ('শ্যামাসঙ্গীত') প্রথম সংস্করণ (১৮৫৭) ভূমিকায় এ বিষয়ে কোন উল্লেখ ছিল না, কলিকাতা হইতে

৪৫ পরে আলোচিতব্য।

৪৬ অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৭৬

প্রকাশিত ইহার দ্বিতীয় সংস্করণেও (১২৯২) 'সাধকরঞ্জন' সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত ছিল না। ১৯১৮ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীমৎ নিরালম্ব স্বামীর সঙ্গে তাঁহার বাসভূমি চান্নাগ্রামে বেড়াইতে যান। সেখানে তিনি সাহিত্যপরিষদের জন্য পুঁথি সন্ধান করিতেছেন বলিয়া স্থানীয় বিশালাক্ষী দেবীর জনৈক পূজারী যোগেশ্বর ভট্টাচার্য কমলাকান্তের 'সাধকরঞ্জনে'র পুঁথিখানি প্রকাশের জন্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে অর্পণ করেন। পুঁথিটির নাম যে 'সাধকরঞ্জন' তাহা উহার সমাপ্তির দিকে কমলাকান্ত নিজেই বলিয়াছেন :

নামেতে কমলাকান্ত ভাবি ত্রিলোচন।
ভাষাপুঞ্জে বিরচিল সাধকরঞ্জন॥

এই পুঁথির লিপিকার শিবরামও এই নামই স্বীকার করিয়া পুঁথির পুষ্পিকায় বলিয়াছেন :

সাধকের প্রতি হয় চক্ষের অঞ্জন।
অতএব লেখিলেক সাধকরঞ্জন॥

অথচ দেখা যাইতেছে নিরালম্ব স্বামী ১৯২০ সালে 'সাধক কমলাকান্তে'র লেখক অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে যে চিঠি দিয়াছিলেন তাহাতে ইহাকে 'সাধক পঞ্চক' বলিয়াছিলেন—"কমলাকান্তের স্বহস্ত লিখিত পুস্তিকাখানির নাম 'সাধকপঞ্চক'"।[৪৭] 'সাধকরঞ্জনে'র পুঁথি সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অনেক দিন ছিল, তারপর তাহা সাহিত্য পরিষদ পুঁথিশালায় প্রদত্ত হয়। অতঃপর তাহা ১৩৩২ সালে বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ ও অটল বিহারী ঘোষের সম্পাদনায় প্রবোধচন্দ্রের মুখবন্ধ সহ পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়। এদিকে 'সাধক কমলাকান্তে'র লেখক অতুল চন্দ্র বহু চেষ্টার পর ১৩২৭ সালে (১৯২১), পরিষদে রক্ষিত 'সাধক-রঞ্জনে'র একখানি নকল সংগ্রহ করেন এবং তাহা 'সাধক কমলাকান্তে'র শেষাংশে মুদ্রিত করেন। তাঁহার উক্ত গ্রন্থ কমলাকান্তের যাবতীয় পদাবলী ও 'সাধকরঞ্জন' সহ ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। সাহিত্য পরিষদের পুস্তিকাও ('সাধকরঞ্জন') ঐ একই বৎসরে প্রকাশিত হয়। যাহা হউক, প্রথম দিকে অতুলচন্দ্র যখন প্রবোধচন্দ্রের কব্জা হইতে কমলাকান্তের পুঁথিখানি বাহির

৪৭ অতুলচন্দ্রের উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৬৮

করিতে পারিলেন না, তখন অন্যত্র তাহার কোন নকল আছে কিনা সন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি শুনিলেন কাশীবাসী রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট উহার একখানি নকল আছে, কিন্তু ইহার অতিরিক্ত আর কোন তথ্য তিনি পাইলেন না। পরে তিনি শুনিলেন, বর্ধমানের রাখরাম ভট্টাচার্যের শাশুড়ীর নিকট কমলাকান্তের 'লতাসাধন' শীর্ষক একখানি তন্ত্রগ্রন্থ আছে। বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি সেই বৃদ্ধার নিকট হইতে পুঁথিটি সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। আমাদের অনুমান উক্ত 'লতাসাধন'ই "সাধকরঞ্জন"। যাহা হউক এই সমস্ত সংবাদ হইতে মনে হইতেছে এই পুস্তিকাটি কোন কোন মহলে নিতান্ত অপরিচিত ছিল না।

'সাধকরঞ্জনে' শিবসংহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা, চক্রনিরূপণ, হঠযোগ-প্রদীপিকা প্রভৃতি তন্ত্র, যোগ ও হঠযোগ অনুসারী শাক্তসাধনার সূক্ষ্মতত্ত্ব ও প্রক্রিয়া সরল বাংলা পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। কবি যে তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহা সুবিদিত ঘটনা। শ্রীমৎ চিদানন্দ 'সাধকাষ্টক' গ্রন্থে কমলাকান্তের বীরভূমে তারাপীঠে গিয়া সস্ত্রীক কৌলমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণের কথা বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি গৃহে ফিরিয়া পঞ্চবটী বনে পঞ্চমুণ্ডি আসনে কুলাচারপদ্ধতিতে সস্ত্রীক সাধনা আরম্ভ করেন এবং ক্রমে সিদ্ধিলাভ করেন। শ্রীমৎ চিদানন্দের বর্ণনায় দেখা যাইতেছে কবি পঞ্চমুণ্ডি আসনে সাধনা করিলেও শবসাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। শুধু জপধ্যানের দ্বারাই তিনি দেবীর কৃপালাভ করেন।

এই পুস্তিকায় কবি কৌল শাস্ত্রানুসারে অন্তর্যাগ সাধনার বাল্যভাব, মধ্যভাব, উত্তমভাবের বর্ণনার পরে তন্ত্রোক্ত নাড়ী বর্ণনা, ষট্‌চক্রবর্ণনা (মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা), তারপর কুল-কুণ্ডলিনীর জাগরণ এবং মূলাধার হইতে ক্রমে ক্রমে শিরঃস্থিত সহস্রারে উঠিয়া শিবের সহিত সামরস্যসম্ভূত চিদানন্দ লাভের বর্ণনার পর যোগের বিভিন্ন আসন, মুদ্রা, বায়ু, ইড়া-পিঙ্গল-সুষুম্নার উল্লেখ এবং তাহার পর স্বদেহেই সাধকের মোক্ষ লাভ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা তন্ত্রসাধনার গ্রন্থ, সুতরাং পারিভাষিক শব্দ ও দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বে পূর্ণ হইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? বিশুদ্ধ কাব্যরস কবির অভিপ্রেত ছিল না তাহা মনে রাখিতে হইবে। তবে কবি সাধনমার্গের তত্ত্বকথাও কবিত্বের ঝঙ্কার দিয়া বলিতে

পারিয়াছেন—ইহাও কম প্রশংসার বিষয় নহে। সাধকের সমাধির সময় কবি কুলকুণ্ডলিনীর শিবের সঙ্গে মিলন যাত্রার বর্ণনায় বৈষ্ণবপদাবলীর শ্রীরাধার অভিসারের রূপক গ্রহণ করিয়াছেন :

চঞ্চল চপলা জিনিয়ে প্রবলা
অবলা মৃদুমধু হাসে।
সুমণি উন্মনা লইয়ে সঙ্গিনী
ধাইল ব্রহ্মনিবাসে॥
উন্মত্তবেশা বিগলিত কেশা
মণিময় আভরণ সাজে।
তিমির বিনাশী বেগে ধায় রূপসী
ঝুনু ঝুনু নূপুর বাজে॥

কুলসাধনা করিতে গিয়া কবি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের বিড়ম্বনার কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই :

যে জনা এ পথে চলে সকলে অকৃতী বলে
বনিতা না কহে প্রিয়বাণী।
দেখিয়া তাহার মুখ দুখেতে ভাবিয়া সুখ
বড় খুসি আপনা আপনি॥
পরিহরি পরিবার কামিনী করিব সার
একে একে সব তেয়াগিন।
বিষয় ভরম গেছে গিয়েছে না যেতে আছে
তথাপি না তাহারে ছাড়িব॥
আমার চরিত্র দেখি সকলের রাঙ্গা আঁখি
বাতুল বলিয়ে করে রোষ॥
একথা বুঝাব কারে স্বভাবে সকল করে
নতুবা আমার কিবা দোষ॥

কবি সাধনতত্ত্ব বলিতে গিয়া নিজের কথাও কিছু বলিয়াছেন, ইহাই আমাদের উপরি লাভ। যাহা হউক মধ্যযুগে সহজিয়া মার্গের সাধনভজন-সংক্রান্ত অনেক পুস্তিকা রচিত হইলেও বাংলা সাহিত্যে কবিতার দ্বারা তন্ত্র-রহস্যের ব্যাখ্যার চেষ্টা একটু অভিনব বটে—এবং নিছক তত্ত্বকাব্য হইলেও ইহার কোন কোন স্থানে ঈষৎ কবিত্বও আছে। সেইজন্য 'সাধকরঞ্জন' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচনার যোগ্য।

কমলাকান্তের পদাবলী—রামপ্রসাদের মতো কমলাকান্তেরও শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁহার পদাবলীতে নিহিত আছে। কবি বহু সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, কিছু কিছু পুঁথিতে লিখিয়াও রাখিয়াছিলেন। বর্ধমান রাজবাটী হইতে ১৮৫৭ সালে তাঁহার 'শ্যামাসঙ্গীত' নামে যে পদসঙ্কলন মহারাজাধিরাজ মহাতাবচন্দের দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাতে কবির স্বহস্ত লিখিত পুঁথির পদ গৃহীত হইয়াছিল। ১৮৫৭ সালের কিছু পূর্বে মহাতাবচন্দ কমলাকান্তের পদাবলী প্রকাশের ইচ্ছায় কবির বাটী হইতে "সুজীর্ণ অতি মলিনবর্ণ গীতপুস্তকদ্বয়" সংগ্রহ করেন এবং বিপ্রদাস তর্কবাগীশ ভট্টাচার্যের দ্বারা তাহা সংশোধন করাইয়া লন। সম্পাদক নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কমলাকান্তের বাটীতে প্রাপ্ত দুইখানি পুঁথি এবং লোকমুখে ও শিষ্যদের মধ্যে প্রচলিত কবির গীত অবলম্বনে প্রায় পৌনে তিনশত শাক্ত ও বৈষ্ণবপদাবলী প্রকাশ করেন। সম্পাদক যে মূল পুঁথির কিছু কিছু শব্দ পরিবর্তিত করিয়াছিলেন তাহা তিনি ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন, "যে পুস্তক সন্দর্শনপূর্বক এই সঙ্গীতগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার জীর্ণতা জন্য অনেক শব্দের পরিবর্তন ও নিতান্ত দেশ্যভাষার কতিপয় শব্দ রূপান্তরিত হইল, কিন্তু তাহাতে রচকের প্রকৃত ভাবের বৈলক্ষণ্য হইবার সম্ভাবনা নাই।" সুতরাং দেখা যাইতেছে মূল পুঁথি দুইখানি জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া সম্পাদক যে শব্দ বুঝিতে পারেন নাই, সেখানে নিজের মনোমত শব্দ বসাইয়া দিয়াছেন, এবং স্থানীয় গ্রাম্য শব্দ সকল বাতিল করিয়া কমলাকান্তের ভাষাকে কিছুটা সভ্যভব্য করিয়া তুলিয়াছেন। ১২৯২ বঙ্গাব্দে শ্রীকান্ত মল্লিক যে 'কমলাকান্ত পদাবলী' প্রকাশ করেন, তাহারও মূল উপাদান বর্ধমান রাজবাটীর ১৮৫৭ সালের প্রথম সংস্করণের 'শ্যামাসঙ্গীত'। কিন্তু মল্লিক মহাশয়ও পদগুলিতে হস্তক্ষেপের ত্রুটি করেন নাই—"আমি উক্ত পুস্তক (রাজবাটীর 'শ্যামাসঙ্গীত') দৃষ্টে ভট্টাচার্য মহাশয় কৃত পদসমূহের পাঠ শোধন করিয়াছি। এই পদাবলীর পাঠ শোধনের উপায়ান্তর না থাকায় এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি।"[৪৭] সুতরাং প্রচলিত মুদ্রিত পদাবলীতে যে মূল কমলাকান্তীয় ভাষার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কমলাকান্তের পদাবলীর ভাষা

৪৭ অতুলচন্দ্রের উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৬৮

রামপ্রসাদ অপেক্ষা মার্জিত, তাহার একটা কারণ—পদাবলীর সম্পাদকের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পাঠসংস্কার বা পরিবর্তন।

বর্ধমান রাজবাটী প্রকাশিত কমলাকান্তের পদাবলী সংগ্রহে ('শ্যামাসঙ্গীত') মোট ২৬৯টি পদ ছিল, তন্মধ্যে ২৪৫টি শ্যামাবিষয়ক এবং ২৪টি বৈষ্ণবভাবাপন্ন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ। কবি যে প্রথম জীবনে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, তাহা 'সাধকরঞ্জন' হইতে বুঝা যায়। তাঁহার গুরু চন্দ্রশেখর গোস্বামী শ্রীপাট গোবিন্দ মাঠের গোপালমন্দিরের মঠাধীশ ছিলেন। এই গোবিন্দমাঠ কোথায় অবস্থিত তাহা লইয়া নানা আলোচনা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, বর্ধমানের গুস্করা স্টেশনের নিকটে আউসগ্রামে এই গোবিন্দমাঠ অবস্থিত। উক্ত গোবিন্দমাঠের গোপালমন্দিরে এখনও গোপালবিগ্রহের পূজা হয়, গোবিন্দমেলা বসিয়া থাকে। উক্ত মন্দিরের ঠাকুরদাস গোস্বামাই বোধহয় কমলাকান্তের গুরু চন্দ্রশেখর গোস্বামী হইবেন। কবি বৈষ্ণবভাবের বশে প্রথম জীবনে অনেকগুলি বৈষ্ণব পদ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার এই ধরনের অধিকাংশ বৈষ্ণবপদই কবিত্ববর্জিত, শুধু গৌরচন্দ্রিকার পদে কিঞ্চিৎ প্রতিভার পবিচয় পাওয়া যায়। যথা :

আমার গৌর নাচে রে যাচে হরিনাম
সংকীর্তন রস প্রকাশে।
হরি হরি বলি দেয় করতালি
কলিকলুষ নাশে॥
তড়িতপুঞ্জ জড়িতকায় শরত ইন্দু বদন তায়
একি আনন্দ ভকতবৃন্দ মগন প্রেমপাশে॥

রাধার জবানীতে কবি যে-সমস্ত বিরহ ও মান অভিমানের পদ লিখিয়াছেন তাহা নিতান্তই গতানুগতিক হইয়াছে, অধিকাংশ স্থলে কবিওয়ালা ও টপ্পা গায়কদের ঢঙ অনুসৃত হইয়াছে। যথা :

ইহারি কারণে সঁপিলাম যৌবনজীবনপ্রাণ।
পুরুষরতন তুমি রসিক সুজন॥
কঠিন হৃদয় যার সদাই চাতুরী তার
চিরদিন নাহি রয় কুজনে মিলন॥

কৃষ্ণের উক্তি :

কি লাগিয়ে প্রাণপ্রিয়ে মানিনী হয়েছ।
ও বিধুবদনি কেন মুখ মলিন করেছ॥

চাতক ত্যজিয়ে ঘন করে রস আরাধন
চকোরনিকর শশী ত্যাগি কি দেখেছ॥

এই পর্যায়ের দুই একটি পদ মন্দ নহে। যেমন—শ্রীরাধার আক্ষেপোক্তি :

রতন বলিয়ে সখি যতন করিলাম তারে।
কে জানে পাষাণ হবে দিন দুই তিন পরে॥

যাহা হউক একথা স্বীকারে বাধা নাই যে, কমলাকান্তের রাধাকৃষ্ণ পদগুলিতে আন্তরিকতা ও শিল্পকৌশল কোনটাই প্রশংসনীয় নহে। কমলাকান্তের বৈষ্ণবপদের ঘোর বিরোধী কৈলাসচন্দ্র সিংহ এই জাতীয় পদ সম্পর্কে ঈষৎ বিদ্রূপের ছলে বলিয়াছিলেন, "ভট্টচার্য মহাশয় কৃষ্ণপ্রেমবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া রাধিকার প্রেমের কাঁদুনি কাঁদিয়াছেন।"[৪৮] এই মন্তব্য অযৌক্তিক নহে। বাস্তবিক এই সমস্ত পদ 'কাঁদুনি'তেই পর্যবসিত হইয়াছে, মাঝে মাঝে ভাবে ভাষায় কবির অক্ষমতা চরমে উঠিয়াছে। মনে হইতেছে, কবি যেন প্রথা পালনের জন্য বৈষ্ণবপদ ফাঁদিয়াছিলেন; ইহার মূলে তাঁহার অন্তরের স্পর্শ পাওয়া যায় না। ইহার কারণস্বরূপ কেহ কেহ অনুমান করেন, "হয়ত দীক্ষাগুরুর আজ্ঞায় এবং স্থানীয় বৈষ্ণবমতাবলম্বী ব্যক্তির প্রীতির জন্য তিনি এই সমস্ত পদ রচনা করিয়াছিলেন।"[৪৯] অর্থাৎ এই জাতীয় রচনার পশ্চাতে কবিহৃদয়ের সাগ্রহ ব্যাকুলতা ছিল না। এই অনুমান যুক্তিসঙ্গত। তাঁহার গোটাকয়েক শিবসঙ্গীতও পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে সংস্কৃত বিভক্তির ছিটেফোটা ভিন্ন আর কোন বৈশিষ্ট্য নাই। যথা :

মন্মথমথনং ভূতেশং সদা শশিশেখরং ভজে।
ত্রিগুণাকরং ত্রিলোচন সুন্দরং হরং
গঙ্গাধরং গুরুং গিরিজাবরং ভজে॥

তিনি 'সাধকরঞ্জনে'র শেষে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "নামেতে কমলাকান্ত ভাবি ত্রিলোচন।" এইজন্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মনে করিয়াছিলেন, "কমলাকান্ত শৈব ছিলেন? সম্ভবতঃ শৈবতান্ত্রিক।"[৫০] কিন্তু তাঁহার শাক্তপদাবলী ও 'সাধকরঞ্জনে'র তত্ত্বকথা ধরিলে তাঁহাকে

---

৪৮ সাধকসঙ্গীত, পৃ. ৩০০

৪৯ সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'সাধকরঞ্জনে' প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'মুখবন্ধ', পৃ ।০

৫০ অতুলচন্দ্রের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৩৯০

শাক্ত তান্ত্রিকই বলিতে হইবে। অবশ্য কৌলশাস্ত্রাদিতে শিব-শক্তি এক হইয়া গিয়াছেন, ব্রহ্মনাড়াতে প্রসুপ্তা কুলকুণ্ডলিনীকে (শক্তি) শিব[illegible] শিবের সঙ্গে সঙ্গত করাই তো তন্ত্রসাধনার মূল লক্ষ্য। সুতরাং শৈব তান্ত্রিক ও শাক্ত তান্ত্রিক বহু স্থলেই এক হইয়া গিয়াছেন। আরও একটা কথা, সাধকরঞ্জনের গোড়াতেই কবি বলিয়াছেন,

তে কারণে কামিনী করিয়া নিরঞ্জনে।
বর্ণিব বৃত্তান্ত কথা ব্রহ্মদরশনে॥

'সাধকরঞ্জনে'র অন্যতম সম্পাদক প্রসিদ্ধ তন্ত্রবিদ অটলবিহারী ঘোষ এইভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তিস্বরূপ লক্ষ্য করিয়া, ব্রহ্মকে কুণ্ডলিনীস্বরূপ জানিয়া।" অর্থাৎ কবির মতে শক্তিই ব্রহ্ম। এই বিষয়ে নূতন তাৎপর্যের ইঙ্গিত দিয়া যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলিয়াছেন, "এ পুথীতে (অর্থাৎ 'সাধকরঞ্জন') একটা নূতন কথা দেখিলাম। নিরঞ্জনকে কামিনী কল্পনা করা হইয়াছে। কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে শিবের কামিনী বলা হইয়া থাকে। কিন্তু শিবশক্তির উর্ধ্বে যে নিরঞ্জন ব্রহ্ম, তাঁহাকে আকাশা কামিনী কল্পনা গুরুভেদে হইয়া থাকিবে।"[৫১] সুতরাং কবিকে শৈব তান্ত্রিক না বলিয়া শাক্ত তান্ত্রিক বলাই শ্রেয়, তাঁহার শাক্তপদাবলীও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

তাঁহার ভণিতায় প্রায় তিনশত শাক্তপদ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে আগমনী ও বিজয়ার গান অতি উৎকৃষ্ট। তাহাতে মাতৃহৃদয়ের বেদনা আশা-আকাঙ্ক্ষা কবি চমৎকার ফুটাইয়াছেন। মাতা মেনকা স্বপ্নে উমাকে দেখিয়া গিরিরাজকে বলেন :

আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে।
গিরিরাজ অচেতন কত না ঘুমাও হে॥
এই এখনি শিয়রে ছিল গৌরী আমার কোথায় গেল
হে, আধ আধ মা বলিয়ে বিধুবদনে॥

উদাসীন স্বামীর প্রতি অনুযোগ করিয়া মেনকা বলেন :

যাবে যাবে বল গিরিরাজ গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হৈয়াছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে॥

---

৫১ অতুলচন্দ্রের উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৩৩১

গৌরী দিবে দিগম্বরে আনন্দে রয়েছ ঘরে
কি আছে তব অন্তরে না পারি বুঝিতে।
কামিনী করিল বিধি তেঁই হে তোমারে সাধি
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে॥

তারপর গিরিরাজ কৈলাসে গিয়া কন্যাকে আনিয়া গিরিরাণীর কোলে অর্পণ করিয়া বলেন :

গিরিরাণী, এই নাও তোমার উমারে
ধর ধর হরের জীবনধন।

দেবীকে কোলে লইয়া মা মেনকা বলিয়া ওঠেন :

ভাল হল এলে তুমি আর না পাঠাব আমি
বুঝি বিধি প্রসন্ন হৈল গো।
আপনার অঞ্চলে রাণী মুছাবে চাঁদ মুখখানি
প্রাণ উমা কোলেতে লইল গো॥

কিন্তু কন্যাকে তিনি কয়দিনই-বা ধরিয়া রাখিতে পারিবেন? নবমী নিশি অবসান হইলেই তো ভোলামহেশ্বর আসিয়া গৌরীকে আবার কৈলাসে লইয়া যাইবেন। তাই রাণী আকুল প্রার্থনা জানান: "ওরে নবমী নিশি, না হৈও রে অবসান।" কিন্তু কাল কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না, নবমী নিশিরও অবসান হয়, ভোলানাথের ডম্বরু বাজিয়া ওঠে :

কি হলো নবমীনিশি হৈল অবসান গো।
বিশাল ডমরু ঘনঘন বাজে শুনে ধ্বনি বিদরে প্রাণ গো॥

উমার তো থাকিবার উপায় নাই, তাঁহাকে তো হিমাচলগৃহ আঁধার করিয়া কৈলাসে চলিয়া যাইতে হইবে। তাই মাতা মেনকার শুধু বিলাপই সম্বল। তিনি কাঁদিয়া বলেন :

ফিরে চাও গো উমা তোমার বিধুমুখ হেরি
অভাগিনী মায়েরে বধিয়া কোথা যাও গো।

* * *

এইখানে দাঁড়াও উমা বারেক দাঁড়াও মা
তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও গো॥

এই সমস্ত আগমনী-বিজয়ার পদে বিশেষ কোন কাব্যগুণ না থাকিলেও

আন্তরিকতা ও মানসিক আবেগের জন্য এগুলি এখনও দুর্গোৎসবের পূর্বে বাঙলা দেশের পথভিখারীর কণ্ঠে গীত হয়।

কমলাকান্তের কয়েকটি শ্যামাসঙ্গীত শাক্ত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁহার কোন কোন পদ কবিত্বের দিক দিয়া রামপ্রসাদ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। আবেগ, শিল্পরূপ তাত্ত্বিকতা প্রভৃতি গুণগুলিকে তিনি কয়েকটি পদে চমৎকার মিলাইয়াছেন। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি পদ হইতে উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে:

(১) সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনোমোহিনী গো মা,
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ আপনি দাও মা করতালি॥
আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালী
যখন ব্রহ্মাণ্ড ছিল না মা মুণ্ডমালা কোথায় পেলি॥

শেষ পংক্তিটি তত্ত্ব ও কাব্যের অপরূপ সমন্বয়ে বিচিত্র মানসিকতা ফুটাইয়াছে।

(২) তাই শ্যামারূপ ভালোবাসি।
কালী মনোমোহিনী এলোকেশী।
তোমায় সবাই বলে কালো কালী আমি দেখি অকলঙ্ক শশী॥

(৩) শুকনো তরু মঞ্জুরে না, ভয় লাগে মা ভাঙে পাছে।
তরু পবনবলে সদাই দোলে প্রাণ কাঁপে মা থাকতে গাছে॥
বড় আশা ছিল মনে ফল পাব মা এই তরুতে
তরু মুঞ্জরে না শুকায় শাখা ছটা আগুন লিগুন আছে॥

ইহার সাধনতত্ত্বগত গুহ্যার্থ যাহাই হোক না কেন, কিন্তু পংক্তি কয়টির নিখুঁত ছন্দ, প্রতীক প্রভৃতি এবং কবির হতাশা ইহাতে আন্তরিকতার সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে।

(৪) আদর করে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি দেখ আমি দেখি আর যেন তাই কেউ না দেখে॥

(৫) আপনাবে আপনি দেখ যেও না মন কারু ঘরে।
যা চাবে এইখানে পাবে খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরমধন পরশমণি যে অসংখ্য ধন দিতে পারে।
এমন কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে।

(৬) মন-গরিবের কি দোষ আছে।
তারে কেন নিন্দা কর মিছে।
বাজিকরের মেয়ে তারে যেমন নাচায় তেমি নাচে॥

এই সমস্ত পদের মার্জিত সংযত ভাবাভঙ্গিমার মধ্য দিয়া কবি যে সমস্ত

তত্ত্বকথা বলিয়াছেন, তাহার গূঢ় তাৎপর্য সাধকের কাছে পরম আদরের বস্তু, কিন্তু সাধারণ রসিক পাঠকের নিকট ইহার কাব্যমূল্যও অল্প নহে। কবি যখন বলেন :

ইন্দীবর জিনি তনু সজল জলদ জিনি কায়া।
নীলাম্বুজ নীল মরকত হিমকর দিনকর কিবা পুরজায়া।
অঞ্জন দলিত স্থগিল জঘনা
যেন অপরা কুসুম সমর নীল কায়া॥

তখন তাহার সংযত বাক্‌রীতি বিশেষ উপভোগ্য হইয়া ওঠে। তাঁহার দুই একটি গান শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতারূপে বাঙলা দেশে চিরদিন শ্রদ্ধা লাভ করিবে। সাঙ্গরূপক ঢঙে রচিত এই গানটির কবিত্ব বিচার-বিতর্কের অপেক্ষা রাখে না :

মজিল মনভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে।
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হৈল কামাদি কুসুম সকলে॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো কালোয় কালো মিশে গেল
দেখ সুখদুঃখ সমান হল আনন্দসাগর উথলে।

কমলাকান্ত একটি পদে বৈষ্ণব ও শাক্তের দ্বন্দ্ব দূর করিতে গিয়া শ্যাম-শ্যামাকে যেভাবে এক করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার উদার মনোধর্ম ও সূক্ষ্ম বাক্‌রীতি অতিশয় বিস্ময়কর মনে হইবে :

জান না রে মন পরম কারণ
কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয়।
হয়ে এলোকেশী করে লয়ে অসি
দনুজতনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি বাজাইয়ে বাঁশী
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়॥
ত্রিগুণ ধারণ করিয়ে কখন
করয়ে সৃজন পালন লয়।
কভু আপনার মায়ায় আপনি বাঁধা
যতনে এ ভবযাতনা সয়॥
যেরূপে যে জনা করয়ে ভাবনা
সে রূপে তার মানসে রয়॥

বাঙলা শাক্ত সাহিত্যে বহু সাধক, ভক্ত ও কবির আবির্ভাব হইয়াছে,

তাঁহাদের রচিত শ্যামাসঙ্গীতের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত এই বিপুলায়তন পদসাহিত্যের মধ্যেও আপন আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছেন। রামপ্রসাদের কবিত্ব ও সাধকত্ব একসূত্রে মিলিয়া গিয়াছে, তাই তাঁহার বাণীমূর্তি অনেক সময় নিরাভরণ, চলতি গ্রাম্যজীবনেরই প্রতিচ্ছবি। তিনি প্রতিদিনের বিবর্ণ জীবনযাত্রার রূপকেই তত্ত্বকথার ব্যঞ্জনা দিয়াছেন; কিন্তু কমলাকান্ত এক মার্গের পথিক হইলেও তাঁহার পদে সচেতন রচনাশক্তির মার্জিত বাগ্‌রীতি অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। অবশ্য কমলাকান্তের মৌখিক গানের ভাষা বোধ হয় রামপ্রসাদের মতোই স্বাভাবিক জীবনের ছায়ারূপেই উদ্‌গীত হইত। পরে বর্ধমানের মহারাজের উদ্যোগে মুদ্রণের সময় সম্পাদক মহাশয় কমলাকান্তের গ্রাম্য ও আঞ্চলিক শব্দ বদলাইয়া তাঁহার মনোমত শব্দ বসাইয়া দেন—কমলাকান্তের 'শ্যামাসঙ্গীতে'র সম্পাদক তাহা অসঙ্কোচেই স্বীকার করিয়াছেন। সেই জন্যই কমলাকান্তের গানের ভাষায় ঈষৎ পাণ্ডিত্যের গন্ধ রহিয়াছে এবং ভাষা ও ছন্দ অনেকটা নিখুঁত হইয়াছে। রামপ্রসাদের গান সুরের আশ্রয় না পাইলে যেন দাঁড়াইতে পারে না, কিন্তু কমলাকান্তের গানের অনেক স্থলে বিশুদ্ধ লীরিক রূপটি রক্ষিত হইয়াছে—তাঁহার পদ গান না করিলেও চলে, শুধু পাঠে বা আবৃত্তিতে ইহার রস ধরা পড়ে। সে যাহা হউক, সাধনা ও কবিত্বে রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত ভক্তির আকাশে যুগ্ম তারা রূপেই বিরাজ করিতেছেন। বাঙালীর মনোভঙ্গীর কোন উৎকট পরিবর্তন না হইলে তাঁহারা চিরদিন স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

কয়েকজন অপ্রধান শাক্তপদকার—অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে যে বেশ কয়েকজন শাক্ত পদকার পদরচনা করিয়া শাক্ত গীতিসাহিত্য ও শাক্ত সাধনাকে জনপ্রিয় করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্বাতিশায়ী বৈষ্ণবপ্রভাব, বিশেষতঃ বৈষ্ণব গুরুবাদ ও সহজিয়া বৈষ্ণবদের রহস্যময় রসের সাধনার প্রতিষেধক হিসাবেও অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধারণ সমাজে ও অভিজাত বংশে শাক্ত পদচর্চার বিশেষ বাহুল্য দেখা যায়। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি, ষোড়শ শতাব্দীতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার জন্য উৎপীড়িত জনচিত্তে সর্বশক্তিময়ী মঙ্গলকাব্যের দেবীদের পরিকল্পনা হইয়াছিল, তাঁহাদের

মহিমাজ্ঞাপক পুরাণধর্মী কাহিনী কাব্যও রচিত হইয়াছিল। সেই উপদ্রুত রাজনৈতিক জীবনে দেবীর বরাভয় জনচিত্তকে সঙ্কটমুহূর্তে আত্মরক্ষা করিতে প্রেরণা জোগাইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি হইতে বাঙলা দেশে আবার রাষ্ট্রসঙ্কট মাথা তুলিল; রাষ্ট্রের পেষণযন্ত্রে ধনি-দরিদ্র, রায়ত-জমিদার, প্রজা-ভূস্বামী সকলেই সমবেতভাবে পিষ্ট হইতে লাগিল। সেই বাস্তব ভৌম যন্ত্রণা ভুলিয়া মানসিক মুক্তির উদার আসনে শ্যামামাতার স্নেহাঞ্চলে ভক্তের দল শিশুর বেশে মিলিত হইলেন। (তাই দেখা যাইতেছে মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলী অপেক্ষা অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর শাক্তপদাবলীতে তদানীন্তন জীবনের বাতাবরণ অধিকতর স্পষ্ট হইয়াছে। কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনা একপ্রকার সূক্ষ্ম সাঙ্কেতিক রসের লীলা, যাহার সঙ্গে পরিপার্শ্বের বিশেষ যোগ নাই। মুঘল-পাঠানের বিরোধে যখন দেশ উৎসন্নে যাইতেছিল, তখনই বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যে ও জীবনী-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফুলগুলি অপার্থিব গন্ধমাধুরী লইয়া ভাবাকাশে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণবের লীলাবাদের অর্থ অপ্রাকৃত লীলা। ভৌম-বৃন্দাবন অপেক্ষা ভাব-বৃন্দাবনই বৈষ্ণবের অধিকতর কাম্য। অপর দিকে শাক্ত পদসাহিত্যের মাতাপুত্রের লীলা একেবারে প্রাকৃত স্নেহ-রসের দ্বারা পরিবেষ্টিত: আদিম পৃথিবীর বুকে চোখ চাহিয়া মানুষ, কে জানে, কাহার কাছে বরাভয় চাহিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর উপদ্রুত বাঙালী আদ্যাশক্তির অঞ্চলতলে আশ্রয় মাগিয়াছিল, মহাকালিকার উদ্যত খড়্গের সম্মুখে নিজেকে অসহায়ের মতো সঁপিয়া দিয়াছিল—তাই খড়্গ-খর্পরধারিণী মহাকালী সব ঐশ্বর্য লুকাইয়া মাটির মায়ের স্নেহে সাধকদের কোলে তুলিয়া লইয়াছেন। শাক্তপদে বাৎসল্য রসই স্থায়ী রস, শ্রেষ্ঠ রস—আর মর্ত্যচেতনাই বাৎসল্যরসের প্রাণ। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর অব্যবস্থিত সমাজ-পরিপ্রেক্ষিত শাক্তপদসাহিত্যের বিকাশে এত সাহায্য করিয়াছে। অবশ্য শাক্তপদসাহিত্যেও তন্ত্রসাধনার নানা জটিল উল্লেখ আছে, এবং অনেক কবি মূলতঃ তন্ত্রসাধক ছিলেন। কিন্তু শাক্তপদে রসের সাধনা ও তন্ত্রের সাধনা একে অপরের উপর ততটা নির্ভরশীল নহে। রামপ্রসাদ কমলাকান্ত প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শাক্তসাধকগণ তন্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব, কৃত্য প্রভৃতি লইয়া অনেক পদ লিখিয়াছিলেন—কিন্তু তাহার বাহিরে তাঁহারা বাৎসল্যরসের যে সমস্ত পদ

লিখিয়াছিলেন কাব্যের দিক দিয়া তাহার মূল্যই বিশেষভাবে স্বীকার্য। কমলাকান্ত 'সাধকরঞ্জনে' কিরূপ সূক্ষ্মভাবে তন্ত্রসাধনার বর্ণনা করিয়াছেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার পদাবলী যত জনপ্রিয়, 'সাধকরঞ্জন' ততটা নহে। কারণ পদসাহিত্য সাধারণ-অসাধারণ সকলেরই প্রাণের সামগ্রী, কিন্তু তন্ত্রকথা-সংক্রান্ত গূঢ় সাধনায় সাধকের প্রয়োজন থাকিলেও ত্রিতাপদগ্ধ সাধারণ মানুষের তাহাতে বিশেষ আকর্ষণ নাই। আরও একটি কথা, এই শাক্ত পদকারগণ বাৎসল্যরসকে ভিত্তি করিয়াছিলেন বলিয়া পদাবলীতে বিশুদ্ধ শিল্পলক্ষণ অনেক সময় অনুপস্থিত থাকিলেও ইহার কোনও প্রকার বিকৃতি দেখা দেয় নাই। সুপেয় রসও কালবৈগুণ্যে অমেধ্য সুরায় পরিণত হয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীর সূক্ষ্ম 'উজ্জ্বলরস' শেষের দিকে যে 'গৌড়ী সুরা'য় পরিণত হয় নাই তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। অপ্রাকৃত রাধা-কৃষ্ণলীলা পরবর্তী কালে (সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী) 'আরোপ'-সিদ্ধির খিড়কিপথে যে কিরূপ কলুষিত হইয়াছিল, তাহা এই দুই শতাব্দীর বৈষ্ণব-সমাজকথা আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে। ইহার কারণ আদিরসের সাধনায় অধিকারী-ভেদ আছে, অনধিকারীর পক্ষে এ সাধনা বড়ই বিপদ-সঙ্কুল। ক্রমে ক্রমে এই ধরনের অতীন্দ্রিয় আদিরস-অনুশীলন দেহপ্রমাথী নিছক কামচর্যায় পরিণত হয়—বৈষ্ণব সহজিয়া ও তাঁহাদের পদাবলী-সাহিত্য এবং সাধনভজন-সংক্রান্ত পুঁথিপত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু মাতাপুত্রের স্নেহরসের সম্পর্ক কোন কারণেই বিষাইয়া উঠিতে পারে না। তাই পরবর্তী কালের বাড়াবাড়ির ফলে শাক্তপদে স্বতঃস্ফূর্তি ক্ষুণ্ণ হইলেও ইহাতে কোন বিকার প্রবেশ করে নাই।

একথা বোধহয় নিশ্চিন্ত হইয়া বলা যাইতে পারে যে, শাক্তপদসাহিত্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ব্যাপার হইলেও ইহা যেভাবে সম্প্রদায়-উপ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকেই আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিয়াছে, মানুষের বাস্তব সুখদুঃখের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছে, তাহাতে মধ্যযুগীয় গীতিসাহিত্যে তাহার তুলনা বিরল। শ্যাম-শ্যামাকে এক ভাবিতে তাই শাক্তপদকারদের সঙ্কোচ বোধ হয় নাই। সাধক কমলাকান্ত অসঙ্কোচেই রসরঙ্গিণী রাধার পদ লিখিয়া গিয়াছেন।[৫২] অষ্টাদশ শতাব্দীর নৈতিক অস্বাস্থ্যের মধ্যে শাক্ত সাধকগণ

৫২ অবশ্য সেকালের কবিগণ যেরূপ অসাম্প্রদায়িক উদার মনের পরিচয় দিয়াছেন,

যে এইরূপ ঔদার্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন তাহার জন্ত তাঁহারা প্রশংসার যোগ্য।

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেক শাক্ত সাধকের কণ্ঠে ভক্তির গান উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, আর সেই গান সমগ্র দেশেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই সমস্ত গানের একটা সাধনাগত সূক্ষ্ম তাৎপর্য আছে যাহা ঐ বিশেষ পথের পথিকগণই অবধারণ করিতে পারিবেন। কিন্তু দুঃখহত সাধারণ মানুষ এই সমস্ত গান গাহিয়া ও শ্রবণ করিয়া মানসিক শান্তি পাইয়াছিল, শোকে দুঃখে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল, দৈব, প্রাকৃতিক ও রাষ্ট্রিক উৎপাত নিরুদ্বেগে সহিবার মতো মানসিক প্রেরণার অধিকারী হইয়াছিল—সমাজের দিক হইতে এ কথাটাও স্মরণযোগ্য। হয়তো অধিকাংশ শাক্ত পদে কবিত্ব অপেক্ষা তত্ত্বকথা প্রাধান্য পাইয়াছে, একই ধরনের চিত্রকল্প উপমারূপক-প্রতীক ব্যবহারে পদগুলি উজ্জ্বলতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। তবু অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃত্রিম কাব্যকলার যুগে ভক্তিরসের শাক্তপদ বাঙালীর নীতিভ্রষ্ট ও অবক্ষয়প্রাপ্ত জীবনে প্রলেপের কাজ করিয়াছিল।

শাক্ত পদকর্তাদের মধ্যে অনেকেই রাজবংশোদ্ভূত ও ভূস্বামিসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, কেহ-বা দেওয়ান প্রভৃতি উচ্চ অভিজাত রাজকর্মচারীও ছিলেন

একালের সমালোচকগণ সেরূপ মানসিক ঔদার্যের দ্বারা রক্ষা করিতে পারেন নাই। 'সাধক সঙ্গীতের' সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় শাক্ত কমলাকান্ত-রামপ্রসাদের বৈষ্ণবপদ সহ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে শাক্ত সাধককে শুধু কালিকার ভজনা করিতে হইবে—অন্ত দেবতার আশ্রয় লওয়া মানসিক দুর্বলতার চিহ্ন। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য কৌতুকজনক, "ইঁহার সাধন' পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। ইঁহার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ব্যবসাদারী ছিল; নচেৎ তিনি কৃষ্ণকীর্তন রচনা করিতে পারিতেন না।" (পৃ. ৪৭) তাঁহার কমলাকান্ত-সংক্রান্ত উক্তি অধিকতর হাস্যকর। "ভট্টাচার্য মহাশয় কৃষ্ণ প্রেমবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া রাধিকার প্রেমের কাঁদুনি কাঁদিয়াছেন। আমরা শক্তি সাধকের মুখে এই সকল কাঁদুনি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি না।" (পৃ. ৩০১) এই জাতীয় সমালোচকদের কমলাকান্তেরই বাণী স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে:

জান না রে মন পরম কারণ
কালী কেবল মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয়।

তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শোষণনীতি এবং কর্নওয়ালিস-ওয়েলেসলির রাজস্ব ও জমিজমাঘটিত চণ্ডনীতির ফলে সম্পন্ন ভূস্বামীরাও যে রাতারাতি দেউলিয়া হইয়া গিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসেব দিক দিয়া সত্য। এইরূপ মানসিক বিপর্যয় হইতেই হউক, বা যে-কোন কাবণেই হউক বাঙলাব অনেক জমিদাব ও দেওয়ান বংশে অষ্টাদশ শতাব্দীব দ্বিতীয়ার্ধ হইতে উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধের মধ্যে একাধিক শাক্ত পদকাবেব আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের কেহ কেহ তন্ত্রানুমোদিত সাধনাতেও আত্মনিয়োগ কবিয়াছিলেন। কেহ কেহ জমিদারী পবিচালনায় উদাসীন হইয়া সাধনভজন লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। বোধহয় তৎকালীন জমিদাব শ্রেণী ও তাঁহাদেব দেওয়ানদের শাক্ত পদ বচনা একটা প্রথায় পবিণত হইয়াছিল। তা না হইলে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ জমিদাব ও দেওয়ান বংশে এতগুলি শাক্ত পদকাবেব আবির্ভাব হইবে কেন?

নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগব, নাটোব, বর্ধমান, কুচবিহাব প্রভৃতিব জমিদার ও সামন্তবর্গেব অনেকেই অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীব মধ্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট শাক্তপদ বচনা কবিয়াছিলেন। নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগবেব মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশ বিশেষভাবে শাক্ত বলিয়া পবিচিত ছিলেন। বামপ্রসাদেব প্রভাবেই হোক, বা কুলধর্মানুসাবেই হোক, স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁহাব দুইপুত্র মহারাজ শিবচন্দ্র, কুমাব শম্ভুচন্দ্র, ঐ বংশেব কুমাব নবচন্দ্র প্রভৃতি রাজপবিবারভুক্ত কয়েকজন ভক্ত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট শ্যামাসঙ্গীত বচনা কবিয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রেব নামে "অতি দুবারাধ্যা তাবা ত্রিগুণা বক্ষরূপিণী" গানটি[৫৩] শাক্ত পদসংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। পুত্র শম্ভুচন্দ্রব এই গানটি সুপবিচিত:

চিন্তাময়ী তাবা তুমি আমাব চিন্তা কবেছ কি?
নামে জগৎ-চিন্তাময়ী, ব্যাভাবে কই তেমন দেখি?
প্রভাতে দাও বিষয়চিন্তে, মধ্যাহ্নে দাও জঠরচিন্তে
ওমা শয়নে দাও সর্ব চিন্তে, বল্ মা তোরে কখন ডাকি?

এই রাজবংশের ভক্ত-কবিদের মধ্যে কুমার নবচন্দ্র বাস্তবিক কবিত্বপ্রতিভায়

৫৩ পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

অধিকারী ছিলেন। মাতার সঙ্গে সন্তানের এমন শুচিস্নিগ্ধ সম্পর্ক রামপ্রসাদকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। কবি যখন জগন্মাতার প্রতি গাঁতিমানে বলেন :

যে ভালো করেছ কালী আব ভালোতে কাজ নাই।
ভালোয় ভালোয় বিদায় দে মা আলোয় আলোয় চলে যাই॥
মা তোমার করুণা যত বুঝিলাম অবিরত
জানিলাম শত শত কপাল ছাড়া পথ নাই॥

তখন যেন কবির অভিমান-স্ফীত ওষ্ঠাধরও প্রত্যক্ষ হইয়া ওঠে—বাৎসল্যরসের এমন চমৎকার মানবরসপূর্ণ ব্যঞ্জনা শাক্তপদসাহিত্যেও বড় বেশী নাই। তাঁহার এইরূপ অভিমানের আর একটি পদেও আন্তরিকতা চমৎকার ফুটিয়াছে :

মা বলে ডাকিস না রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই।
থাকলে আসি দিত দেখা, সর্বনাশী বেঁচে নাই॥
শ্মশানে মশানে কত পীঠস্থান ছিল যত
খুঁজে হলাম ওষ্ঠাগত কেন আর যন্ত্রণা পাই।
গিয়ে বিমাতার তীরে কুশপুত্তুল দাহন করে
অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে কালাশৌচে কাশী যাই॥

মহাদেবের শিরোধার্যা গঙ্গাদেবীর প্রতি মাতা দুর্গার কিঞ্চিৎ ঈর্ষা থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু মাতার সন্তানেরা যে বিমাতার (গঙ্গা) প্রতি একটু তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। মুমূর্ষু কমলাকান্ত 'কেন গঙ্গাতীরে যাব' বলিয়া ভাগীরথী নীরে প্রাণত্যাগ করিতে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। যাহা হউক কুমার নরচন্দ্রের অভিমানের পদগুলি আন্তরিকতায় আধুনিক পাঠকেরও হৃদয় স্পর্শ করে।

বর্ধমানের রাজবাটীতে সাধক কমলাকান্তের প্রভাবে ঐ রাজবংশের কেহ কেহ শাক্ত ভক্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কমলাকান্তের সুহৃদ কুমার প্রতাপচন্দ্র শাক্ত সাধনাও করিয়াছিলেন। তেজচন্দ্রের দত্তকপুত্র মহারাজাধিরাজ মহাতাবচাঁদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ব্যক্তি। কিন্তু তাঁহার অন্তরটি সাধক ভক্তের মতোই ছিল। তিনিই উদ্যোগী হইয়া কমলাকান্তের পদাবলীর প্রথম সংস্করণ বর্ধমান রাজবাটী হইতে প্রকাশ করেন। তাঁহার ভণিতায় দশমহাবিদ্যা বিষয়ক অনেকগুলি পদ শাক্ত পদসাহিত্যে সঙ্কলিত হইয়াছে। কুচবিহাররাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর এবং সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমারের

ভণিতায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কয়েকটি শাক্ত পদ পাওয়া গিয়াছে। মহারাজ নন্দকুমার নিজেও তন্ত্রসাধক ছিলেন। নানা রাজবংশের কবিদের মধ্যে নাটোরের সুবিখ্যাত সাধক রাজা রামকৃষ্ণের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বে এই প্রসঙ্গে গোড়ার দিকে আমরা রামকৃষ্ণের কালীসাধনার কথা বলিয়াছি। তিনি রাণীভবানীর দত্তকপুত্র। বিরাট ভূস্বামী হইয়াও তিনি রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র কালিকার ধ্যান-সাধনা লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন, পঞ্চমুণ্ডি আসনে বসিয়া তন্ত্রোক্ত সাধনাদি করিতেন। ফলে তাঁহার জমিদারী নিলামে উঠিয়া যায়। ইহাতে তিনি বিষয়বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বরং আনন্দিতই হইয়াছিলেন। তাঁহার কালীসাধনা, গঙ্গাতীরে সজ্ঞানে তনুত্যাগ প্রভৃতি নানা গল্পকাহিনী এখনও সুবিদিত। তাঁহার গানগুলি কবিত্বের দিক দিয়া গতানুগতিক। কিন্তু তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, কবি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।

বর্ধমানরাজের দেওয়ান ব্রজকিশোর রায় এবং তাঁহার পুত্র নন্দকুমার (নন্দকিশোর) রায় ও রঘুনাথ রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে অনেকগুলি শাক্ত পদ লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রঘুনাথের কয়েকটি গান কাব্যগুণে শাক্ত-পদ-সাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। তাহার দুই চারি পংক্তি প্রশংসার যোগ্য। যথা—

পড়িলে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী।
মায়া-ঝড় মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী॥

ত্রিপুরারাজের দেওয়ান ও প্রসিদ্ধ ভক্ত ও কবি রামদুলাল নন্দী ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার কয়েকটি পদে ভক্তিসাধনার সঙ্গে আধুনিক মনোভাবও মিশ্রিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে আমরা তাঁহার প্রসিদ্ধ পদ 'জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজি' পদটি উদ্ধৃত করিয়াছি। তাঁহার ভণিতায় আর একটি পদ শাক্ত সাহিত্যে সুপরিচিত, বাংলা সাহিত্যেও অতিশয় প্রসিদ্ধ :

সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি
কারে দাও মা ইন্দ্রত্ব পদ কারে কর অধোগামী॥

যে বোল বোলাও তুমি সেই বোল বলি আমি
তুমি যন্ত্র তুমি মন্ত্র তন্ত্রসারের সার তুমি ॥[৫৪]

রাজবংশ বা দেওয়ান বংশাদি সামন্তশ্রেণী ও অভিজাত বংশ ছাড়িয়া দিলেও অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও কয়েকজন সাধক-কবির শাক্তপদ শাক্তসাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে। গোবিন্দ চৌধুরী (বগুড়া), মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (প্রেমিক), নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, রামলাল দাস প্রভৃতি শাক্ত কবিদের নাম উল্লেখ করা যায়। ইঁহাদের মধ্যে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ও রামলালের অনেক গান এখনও পথভিখারীরা গাহিয়া থাকে। নীলাম্বরের নির্বেদ-বৈরাগ্যমূলক 'তারা কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসারগারদে থাকি বল' এবং রূপকধর্মী 'কালীপদ আকাশেতে মনঘুড়িখান উড়তেছিল' এবং রামলালের :

শ্মশান ভালো বাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি ॥
আর কোন সাধ নাই মা চিতে,
চিতার আগুন জ্বলছে চিতে
ওমা চিতাভস্ম চারিভিতে রেখেছি মা আসিস যদি ॥

প্রভৃতি গানগুলির সরল আন্তরিক সুরে চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া যায়।

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর হরুঠাকুর, নীলুঠাকুর, এ্যান্টনী ফিরিঙ্গী প্রভৃতি কবিওয়ালা এবং নিধুবাবু, কালী মির্জা, শ্রীধরকথক প্রভৃতি টপ্পা-গায়ক এবং দাশরথি রায়, রসিক রায় প্রভৃতি পাঁচালী গায়কেরা শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীতাদি রচনা করিয়াছিলেন। তবে এই সমস্ত রচনার অধিকাংশই উনবিংশ শতাব্দীর পর্যায়ভুক্ত বলিয়া বর্তমান প্রসঙ্গে শুধু ইঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি।[৫৫]

বাঙলার শাক্তপদসাহিত্য যুগপৎ কাব্য ও সাধনার মুক্তবেণী রচনা

৫৪ এই গানটি 'সঙ্গীত-সন্দর্ভে' নবচন্দ্রের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অনেক শাক্ত পদে ভণিতা নাই বলিয়া একের পদ অন্যের নামে চলিয়া গিয়াছে। সরলভাবা ও রচনার উৎকর্ষের জন্য ইহা নরচন্দ্রেরও হইতে পারে।

৫৫ বিভিন্ন শাক্তপদাবলী ও কবির বিস্তারিত পরিচয়ের জন্য অধ্যাপক শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর 'শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা' দ্রষ্টব্য।

করিয়াছে। বৈষ্ণবপদের তুলনায় এই সমস্ত পদে সূক্ষ্ম কল্পনার কারিগরি, ভাবাবেগের রোমান্টিক উৎসার, বাগ্‌ভঙ্গিমার চমৎকারিত্ব প্রভৃতি প্রথমশ্রেণীর কাব্যগুণ ততটা নাই। অনেক পদ নিছক তন্ত্রসাধনার মুষ্টিযোগে পর্যবসিত হইয়াছে। কোনটিতে সংসারদগ্ধ জীবের দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের বাসনা অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে, রূপকপ্রতীকের ফাঁসে কোন কোন সময়ে কবিত্ব যে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। তবু এই শাক্ত-পদাবলী অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতা ভঙ্গ করিয়াছে। সাহিত্যের স্বাদবৈচিত্র্য ফিরাইবার জন্য এই পদগুলির প্রয়োজনীয়তা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য।

২

বা উ ল গা ন

একজন বাউল গাহিয়াছেন :

ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহুরী।
নিকষে ঘষয়ে কমল আ মরি মরি॥

পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া পাণ্ডিত্যের অণুবীক্ষণ যন্ত্র মানসনেত্রে চড়াইয়া বাউলগানের তত্ত্বসন্ধানকে বাউলকবি নিকষপাথরে কমল যাচাই করিবার মতো বিড়ম্বনা বলিয়া মনে করেন। তিনি তো সারা জীবন ধরিয়া অধরার সন্ধানে ফিরিয়াছেন :

আমার মনের মানুষ যে রে,
আমি কোথায় পাব তারে,
হারায়ে সেই মানুষে দেশবিদেশে
বেড়াই ঘুরে ঘুরে॥

বিশ্বসংসার ঢুঁড়িয়া সেই 'মনের মানুষ'কে কি পাওয়া যায়? "কভু মিলে, কভু না মিলে দৈবের লিখন" (চৈতন্যচরিতামৃত)। বাউলসাধক ও কবিগণ নিজ নিজ সাধনার দ্বারা সেই দুরায়ত্ত দৈবকেই করায়ত্ত করিয়াছেন। তাই বাঙলার বাউলগান যেমন একদিকে শিল্পরসের বিচারে বিচিত্র গীতিরসসিক্ত ও প্রতীকধর্মী বলিয়া উচ্চ প্রশংসা দাবি করিতে পারে, তেমনি ইহার পশ্চাদপটে একপ্রকার বিশেষ ধরনের আচার-আচরণমূলক কৃত্য ও সাধনা

আছে এবং সেই সাধনার মূলতত্ত্ব যোগতান্ত্রিক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাঙলা দেশে ভ্রাম্যমাণ বাউল গায়ক-গায়িকাদের এখনও পথে পথে গান করিয়া ভিক্ষা করিতে দেখা যায়, দুই-এক শতাব্দী পূর্বে আরও অধিকসংখ্যায় দেখা যাইত। এই বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণ ব্যক্তিগত জীবনযাপনে এমন কতকগুলি বিচিত্র পন্থা অবলম্বন করিত, পারিবারিক জীবনসম্বন্ধে এত উদাসীন ছিল এবং বিশেষ ধরনের ধ্যানধারণা উপলব্ধি লইয়া এত ব্যস্ত ছিল যে, ইহারা বড় একটা বাহিরের সংবাদ রাখিত না, উচ্চশ্রেণীর ভদ্রসমাজ ইহাদের সম্বন্ধে কিছু কৌতূহল প্রকাশ করিলেও রহস্যময় সাধনা ও জীবনের জন্য ইহাদের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাউলদের গভীর অর্থবহ অধ্যাত্ম সঙ্গীতের প্রতি শিক্ষিত সমাজের সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়—যদিও এই সম্প্রদায়ের সাধনভজনের গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে নব্যসমাজ বিশেষ কোন সংবাদ রাখিতেন না।

বাউলসাধনার স্বরূপ ॥

বাতুল, ব্যাকুল, আউল (আরবি), বাউর (হিন্দী) —যে শব্দ হইতেই বাউল শব্দের উৎপত্তি হোক না কেন, ইঁহারা যে দলছাড়া, সাধারণ সমাজের বহির্ভূত, অদ্ভুতপন্থার পথিক—তাহা ইঁহাদের পদ হইতেই বুঝা যাইবে। চৈতন্যচরিতামৃতে 'বাউল' ও 'বাউল্যা' শব্দ দুইটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঈশ্বর প্রেমে মাতাল, বাস্তবজ্ঞানবর্জিত, উদাসীন ভক্ত—এই অর্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতের একাধিক স্থানে বাউল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যথা :

(১) কহিবারে যোগ্য নয় তথাপি বাউলে কয়
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ?

(২) আমি তো বাউল আন্ কহিতে আন্ কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য স্রোতে আমি যাই বহি ॥

(৩) বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥

কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে শিথিল, বুদ্ধিহীন—এইরূপ একটা ঊনার্থক ইঙ্গিতেও 'বাউল্যা' শব্দের ব্যবহার আছে :

(১) গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল—ইহা আজি হৈতে।
বাউল্যা বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে॥

(২) স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাউল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥

এই সমস্ত উক্তি হইতে মনে হয়, চৈতন্য-সমসাময়িক কালে বাস্তবজীবনে উদাসীন, বাহিরের দিক হইতে অসম্বদ্ধ—এমন এক ঈশ্বরভক্ত সম্প্রদায় সমাজে বাউল নামে পরিচিত হইয়াছিল। অদ্বৈতপ্রভু শান্তিপুর হইতে পুরীধামে চৈতন্যদেবকে যে আর্যা পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে তিনি মহাপ্রভুকে 'বাউল' আখ্যা দিয়াছিলেন। মহাপ্রভুও চৈতন্যচরিতামৃতে ঈশ্বরভক্ত অর্থে বাউলশব্দ একাধিকবার ব্যবহার করিয়াছেন। বাহিরের দিকে আচার-আচরণ ধর্ম-কর্মাদি অসঙ্গতিপূর্ণ ও রহস্যময় হইলেও অন্তরে অন্তরে যাঁহারা যথার্থ ঈশ্বর-ভাবরসে মাতাল হইয়া থাকিতেন, তাঁহারাই বাহিরের লোকের নিকট বাতুল অর্থাৎ বাউল বলিয়া অভিহিত হইতেন। পরবর্তী কালে, বিশেষতঃ সহজিয়া পদেও এইরূপ বিশিষ্ট ধরনের সাধককে বুঝাইতে বাউল শব্দ ব্যবহৃত হইত। বাতুল, বাউল, বাউর—সবই বায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ করে। ইহার সঙ্গে সূফী 'ওয়ালী' (নিকট) শব্দের বহুবচন 'ওয়ালীয়া' (অর্থাৎ ঈশ্বরসান্নিধ্যে অবস্থিত ভক্তগণ) শব্দটি আউল-আউলিয়া শব্দগঠনে সাহায্য করিয়াছে। আকুল হইতে আউল—অথবা 'ওয়ালীয়া' হইতে আউল, যে শব্দ হইতেই হোক না কেন, একদা মুসলমান ঈশ্বরভক্ত যে আউলিয়া নামে পরিচিত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা ইতিপূর্বে সহজিয়া সম্প্রদায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দুসমাজবহির্ভূত সহজিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ বীরচন্দ্র কর্তৃক বৈষ্ণবসমাজে গৃহীত হইবার পর তাঁহারা সাধারণতঃ সহজিয়া বৈষ্ণব নামে উল্লিখিত হইতেন। কিন্তু তাঁহারা দেহমানসিক সাধনার ধারা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ না করিয়া চৈতন্যচরিতামৃত-ব্যাখ্যাত অনুরাগ-তত্ত্ব (রাগানুগা সাধনা), পরকীয়াবাদ এবং শ্রীখণ্ডসম্প্রদায় প্রচারিত গৌরনাগর ভাবের ধারা-উপধারাকে নিজেদের ধর্মাচার ও চিন্তার সঙ্গে মিলাইয়া যে বিচিত্র সাধনপ্রণালী গড়িয়া তোলেন, তাহাই সপ্তদশ-উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলা দেশে চণ্ডীদাসের সহজিয়া পদে এবং বৈষ্ণব সাধকদের

মাঝে প্রচারিত কড়চাগ্রন্থে নানা ইঙ্গিত ও প্রহেলিকায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সহজিয়া সম্প্রদায় হইতেই বাউলসম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয় বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়, সূফী আউলিয়া সম্প্রদায় এবং শৈব নাথধর্ম, যোগতন্ত্র, হঠযোগ প্রভৃতি ধর্ম ও উপধর্মের 'কায়াসাধনা' তত্ত্ব অবলম্বনে এই বাউল সম্প্রদায় একপ্রকাব অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ক্রিয়াকর্ম অনুশীলন করিত, এখনও করে। বস্তুতঃ বাউলসম্প্রদায়ে জাতিপাঁতিব ভেদ না থাকিলেও সহজিয়া পন্থী হিন্দু বাউল এবং সূফী পন্থী মুসলমান ফকির বাউল (আউলিয়া)—এইরূপ দুইটি সাধনপ্রণালী লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য অধিকাংশ স্থলে হিন্দু বাউল ও মুসলমান বাউলেব সম্প্রদায়গত বিশেষ কোন পার্থক্য নাই; হিন্দু বাউলও সূফী সাধনার শব্দাদি ব্যবহার করেন, মুসলমান ফকির বাউলও হিন্দুর যোগতন্ত্রঘটিত শাবীরতত্ত্ব স্বীকার করিয়া হিন্দুব পারিভাষিক শব্দ যথেচ্ছা ব্যবহার করিয়াছেন।

বাঙলার বাউলদের যথার্থ আত্মীয়তার যোগ বৈষ্ণব সহজিয়াদের সঙ্গে। বৌদ্ধ সহজিয়াদের সঙ্গে ইঁহাদের প্রত্যক্ষতঃ কোন যোগাযোগ নাই বলিয়া প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়াদের সঙ্গে ইঁহাদের ধর্মাচারের তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন নাই। বৈষ্ণব সহজিয়াগণ সাধক-সাধিকার দেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব আরোপ করিয়া অনন্ত প্রেমরস ('সহজ-ধর্ম') আস্বাদন করিতে চাহেন। অর্থাৎ নরনারীর পিণ্ডদেহকে শুদ্ধ দেহে পরিণত করিয়া সীমার মারফতে অসীম প্রেমরস উপলব্ধি —ইহাই তাঁহাদের মূল লক্ষ্য। কিন্তু তাহা মূল লক্ষ্য হইলেও সহজিয়ারা মানুষকে ভুলিতে পারেন না। বস্তুতঃ বাস্তব মানুষই তাঁহাদের প্রেমসাধনার মূল উপাদান।[৫৬] প্রাকৃত মানুষের উপর রাধাকৃষ্ণত্ব আরোপ করিয়া উভয়ের সামরস্যসম্ভূত অদ্বৈতানুভূতিই তাঁহাদের মোক্ষ-সাধনা। কিন্তু

৫৬ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের *Obscure Religious Cults as the Background of Bengali Literature* দ্রষ্টব্য। ডঃ দাশগুপ্ত ইহাকে "the most perfect form of human love" বলিয়াছেন।

বাউলগণ সহজিয়াদের ছাড়াইয়া আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছেন।[৫৭] তাঁহারা প্রেমসত্তাকে পুরুষ-প্রকৃতি, রাধাকৃষ্ণ, নারী-নর—এই রূপ দ্বৈতভাবে না দেখিয়া, নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে অভিনব সাধনপ্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এই দেহের মধ্যেই মনের মানুষ, সাঁই (স্বামী), অচিনপাখী, অধরমানুষ আছেন। সেই অধরাকে ধরাই ভক্ত, সাধক, বাউলের একমাত্র লক্ষ্য। অর্থাৎ জড়জীবী ব্যক্তিসত্তা এবং চিদানন্দময় ভাগবতসত্তার অদ্বৈত মিলনরস তাঁহাদের কাম্য। আমাদের সীমাবদ্ধ সত্তাকে সেই ভাগবতসত্তায় মিলাইয়া দিবার জন্য সাধক দেহ-'ত্রিবেণী'র ঘাটে বসিয়া থাকেন। 'ত্রিবেণী'তে জোয়ার আসিলে তিনি মাছ ধরিবেন। এই মীন 'জোয়ারে'র জলে ভাসিয়া আসে। জোয়ারের 'গোন' চলিয়া গেলে সাধক আর মাছ ধরিতে পান না। ইহার সরলার্থ—দেহের মধ্যে যে ক্ষুদ্র 'আমি' আছে, তাহাকে অসীম অখণ্ড 'আমি'র সঙ্গে মিলিত করাই বাউলের লক্ষ্য। অবশ্য এই সাধনপ্রণালী ভারতবর্ষের চিরাচরিত কায়াসাধনারই আর একটি

---

৫৭ সহজিয়াদের ব্যবহৃত সাধন-সঙ্কেত—রূপ, স্বরূপ, রসরতি, প্রবর্ত, সাধকসিদ্ধ প্রভৃতি শব্দ বাউলরাও ব্যবহার করিয়াছেন, একাধিক বাউলপদে ইহার উল্লেখ আছে। যথা:

ব্রজপুরে রূপনগরে যাবি যদি মন
তবে করগে যা স্বরূপ সাধন।
স্বরূপের রূপ রূপের স্বরূপ
স্বরূপ দেহে হয় মিলন॥

(ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' হইতে উদ্ধৃত।)

বাউলেরা সহজিয়াদের প্রেমতত্ত্বের 'সমর্থা, সমঞ্জসা ও সাধারণী'—এই তিনটি শব্দও গ্রহণ করিয়াছেন। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে এই তিনপ্রকার রতির বর্ণনায় বলা হইয়াছে—সাধারণী রতির নায়িকা নিজ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির জন্য প্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হয়, সমঞ্জসা রতির নায়িকা দয়িতের সঙ্গে মিলনে সমান রসভোগ করিতে চাহে, আর সমর্থারতির নায়িকা শুধু প্রিয়ের তৃপ্তির জন্যই মিলন চাহে, নিজের কোন কামনা তাহার থাকে না। বলা বাহুল্য ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট প্রেমসাধনা। বাউল কবিও ইহার আদর্শে গাহিয়াছেন:

সাধারণের ভাটির কারণ
সামঞ্জসার হয় যে মরণ
সমর্থার রয় গো উজান
আধরতি প্রেম গোপিকারে॥

(ডঃ ভট্টাচার্যের গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বিচিত্র শাখাপথ মাত্র। সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউলদের তত্ত্বকথা দাদূ, কবীর, নানক, রুইদাস, রজ্জব প্রভৃতি উত্তরাপথের মধ্যযুগীয় সাধকদের দোঁহা ও গীতাবলীতেও পাওয়া যাইবে। এই জাতীয় সন্তসাধনা ও বাউলসাধনার মূল কথা—মানুষের দেহের মধ্যে যে পরম সত্য বা সত্তা রহিয়াছেন, তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। তাই এই সমস্ত অর্ধ-লোকযানে শ্রেণী-সম্প্রদায়, গ্রন্থ-পাণ্ডিত্য, ধর্মসংস্কারকে ছাড়িয়া অন্তরের সত্যের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে 'বে-শরা' সূফী সাধকদেরও অন্তরের সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। এক সম্প্রদায়ের দ্বারা অপর সম্প্রদায় স্বাভাবিক ভাবেই প্রভাবিত হইয়াছে। পূর্ব হইতেই সূফী মতের সঙ্গে বাউল মতের সাদৃশ্য আছে—এ সাদৃশ্য অংশ্য প্রভাবজনিত নহে। এই ধরনের অধ্যাত্ম সাধনা,যাহা শুধু হৃদয়কেই স্বীকৃতি দেয়—সমাজসংস্কার নহে, তাহা প্রায় সমস্ত ধর্মের মধ্যে কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও-বা পরোক্ষভাবে প্রচলিত আছে, অতীতেও ছিল। সূফীদের সঙ্গে বাঙলার বাউলদেরও কোন কোন বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য আছে—সে সাদৃশ্য খানিকটা আচার-আচরণমূলক, খানিকটা-বা তত্ত্বদর্শনগত। বাঙলা দেশ একদা সূফীসাধনার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, তাহা আমরা ইতিপূর্বে সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি প্রসঙ্গে দেখিয়াছি। সূফীদের সম্প্রদায় সাতভাগে বিভক্ত: সুহ্‌রাবর্দি, চিশ্‌তি, কাদাদরি, মাদারি, অধমি, কিদোয়ারি, নক্‌শবন্দি, কাদিরি। প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে এদেশে উক্ত বিভিন্ন সূফীসম্প্রদায়ের প্রভাব স্থাপিত হয়। ধর্মান্তরিত মুসলমানদের উপর এই সমস্ত সূফীসম্প্রদায়ের বিশেষ প্রভাব ছিল, কারণ বাঙলার ধর্মান্তরিত মুসলমানের অধিকাংশই হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, এবং হিন্দুর কোন কোন শাখার সঙ্গে সূফীমতের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। যাহা হউক, সহজিয়া বৈষ্ণব বাউল ও সূফী মতের মধ্যে মিলন হইতে বিলম্ব হয় নাই। বাউলদের নৃত্যগীতের সঙ্গে সূফীদের 'সমা' (দরবেশের নৃত্যগীত) তুলনীয়। সূফীদের 'ফানা' অনেকটা বাউলদের 'জ্যান্তে মরা'র সমতুল্য। উপরন্তু সূফীগণ বাউলের মতোই গুরুবাদী। বাউলের গুরুশিষ্যের সম্পর্কের মতো সূফীরাও মুর্শিদ-মুরিদের[৫৮] সম্পর্কে বিশ্বাসী। মুসলমান বাউলদের

৫৮ মুর্শিদ—গুরু, মুরিদ—শিষ্য

মুর্শিদা গানে এই গুরুশিষ্যসম্পর্ক চমৎকার ফুটিয়াছে। মুর্শিদের কৃপাতেই মুরিদ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তাই সুফী বাউল গাহিয়াছেন :

উমুর ঝুমুর বাজে নাও আমার নিহাইল্যা বাতাসে রে
আমি রইলাম তোর আশে।
পশ্চিমে গাজিল ম্যাঘ রে হাওয়ায় দিল রে ডাক,
আমার ছিঁড়িল হালের পানস নৌকায় খাইল পাক
মুর্শিদ, রইলাম তোর আশে॥

আর এক হিন্দুবাউল গাহিয়াছেন :

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন ?
তোর অঠিক গুরু পথিক গুরু গুরু অগণন।
গুরু যে তোর বরণডালা গুরু যে তোর মরণজ্বালা
গুরু যে তোর মনের ব্যথা (যে) ঝরায় দুনয়ন॥

আবার এক শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান বাউল গুরূপদেশ তুচ্ছ করিয়া বলিয়াছে :

তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে মসজেদে।
তোমার ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই
রুইখা দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে॥

কেহ বলিয়াছেন :

আমার নাই মন্দির কি মসজিদ,
নাই পূজা কি বকরিদ,
তিলে তিলে মোর মক্কা কাশী
পলে পলে মদিনা॥

কেহ কেহ মনে করেন বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল ছিলেন গুরুবাদী, তাঁহারা 'পুথ্যা' ('পুঁথিয়া'), অর্থাৎ যাঁহারা গুরু, গ্রন্থ ও মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসী ; আর একদল ছিলেন 'তথ্যা', অর্থাৎ প্রকৃত বাউল—যাঁহারা কোন নিয়ম-নিগড় মানিতেন না, কোন মর্ত্যব্যক্তির শাসন স্বীকার করিতেন না।[৫৯] ইঁহারা গাহিয়াছেন :

আছে হেথায় মনের মানুষ মনে সেকি জপে মালা।
অতি নির্জনে বসে বসে দেখছে খেলা॥
কাছে রয় ডাকে তারে উচ্চ স্বরে কোন্ পাগেলা॥

সূফী মতাবলম্বী মুসলমান বাউলগণ হিন্দু বাউলদের মূল আদর্শ স্বীকার করিয়াছেন, অনেকেই শ্রীচৈতন্যকে আদি বাউল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

৫৯ ক্ষিতিমোহন সেন—বাংলার বাউল

কিন্তু ইঁহারা পারিভাষিক শব্দ প্রসঙ্গে ইসলামী শব্দও প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে আল্লাহের পরম জ্যোতি মর্ত্যে নবীদের মধ্যে প্রকাশ পায়—সকল মানবের মধ্যেই আল্লাহের অস্তিত্ব আছে—নবী ও সাধারণ মানুষ—প্রত্যেকের মধ্যেই তিনি আছেন। অবশ্য সাধারণ মানুষের সাধনার অভাবের জন্য আল্লাহের প্রকাশ কিছু আচ্ছন্ন থাকে, আর নবীদের মধ্যে তাঁহার স্বরূপ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। তিনি 'মনের মানুষ', তিনিই 'মাশুক'। যাঁহারা 'মজ্জুব' (ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা) ও 'দিওয়ানা' (পাগল), তাঁহারাই শুধু তাঁহাকে লাভ করেন।[৬০] বাহিরের মক্কামদিনার কীই-বা প্রয়োজন? কারণ—"আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে"। ইঁহারা ইসলামী শব্দ যোগে এইভাবে গূঢ় তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন:

মন রে আত্মতত্ত্ব না জানিলে সাধন হবে না।
পড়শি রে গোলে।
আগে জান্‌গে কালুল্লা আনাল হক আল্লা
যারে মানুষ বলে॥[৬১]

একটি পদে লালন ফকির ইসলামী মতে বাউলতত্ত্বের সুন্দর ইঙ্গিত দিয়াছেন,

জান গে নূরের[৬২] খবর যাতে নিরঞ্জন ঘেরা।
নূর সাধিলে নিরঞ্জনকে যাবে রে ধরা॥
নূরে নবীর[৬৩] জন্ম হয় নূর গঠনে অটলময় কান্দরা।
নূরেতে মোকামমঞ্জিল উজল করা॥

---

৬০ ইসলাম ধর্মের সাধনায় চারিটি স্তর লক্ষ্য করা যায়—(১) 'শরীয়ত'—অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের বৈধীমার্গে যে সমস্ত আচারানুষ্ঠান স্বীকৃত হয়, তাহার সতর্ক অনুশীলন, (২) 'তরীক'—অর্থাৎ বৈধীমার্গ ছাড়াও অন্য পথ কোন কোন সদ্ধর্মবিশ্বাসী অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অনেকটা ব্যক্তিগত সাধনভজনের পথ, যাহাতে মুর্শিদ (গুরু) মুরিদকে (শিষ্য) উপদেশ দিয়া থাকেন, (৩) 'হকিক'—অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রকৃত সত্তা। অতীন্দ্রিয়বাদী অধ্যাত্মপন্থী সাধকেরাই এই পন্থা জানেন, (৪) 'বেদাতী'—অর্থাৎ যাঁহারা শরীয়তের শাসন অস্বীকার করিয়া নূতন পন্থা অবলম্বন করেন। ইঁহারাই বে-শরা পন্থী বেদাতী ফকির। বাঙলার বাউল সাধনায় ইঁহাদের দান যথেষ্ট।

৬১ কালুল্লা—ঈশ্বরের বাণী
আনাল হক আল্লা—আমিই ঈশ্বর, অর্থাৎ আমার মধ্যেই ঈশ্বরের লীলা চলিতেছে।

৬২ নূর—আল্লাহের জ্যোতি

৬৩ নবী—অবতার

কবি আর এক পদে সূফীতত্ত্বকে বাউলতত্ত্বের সঙ্গে গূঢ়ভাবে মিলাইয়া দিয়াছেন :

ফানা-ফিস-শেখ বাকা ফানা,
ফানা ফেল্লা ফানা-ফের-রসুল,
এই চার ঘরেতে লালন মুরশিদ ভজ রে অতি গোপনে॥

এখানে ব্যক্তিসত্তাকে ধ্বংস করিয়া '(ফানা)' ঈশ্বর-সাযুজ্য ('বাকা') লাভের কথা বলা হইয়াছে। সূফী মতে চারিপ্রকার সাধনা নির্দিষ্ট হইয়াছে। ফানা-ফিস-শেখ—অর্থাৎ গুরুর মধ্যে বিলীন হওয়া, ফানা-ফের-রসুল—ঈশ্বর অবতারের মধ্যে বিলীন হওয়া, ফানা-ফিস-আল্লা, অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যে বিলীন হওয়া এবং সর্বোচ্চ স্তর—বকাবিল্লা অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হইয়া যাওয়া। বাউলও অদ্বৈত 'বকাবিল্লা'-ই উপলব্ধি করিতে চাহে। এই সমস্ত মুসলমান সূফী বাউল ইসলামী শব্দ ব্যবহার করিলেও বৈষ্ণব বাউলদের আদর্শ ও শব্দের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়।

সাধনার দিক হইতে বাউলগণ ভারতের অধ্যাত্ম সাধনাকেই একটু নূতন দিক হইতে দেখিতে চাহিয়াছেন। পুঁথিপত্র বিলাইয়া দিয়া শুধু অন্তরের আলোকে সাঁইকে চিনিয়া লইতে হইবে[৬৪], মানুষ জন্মসূত্রে যে অনন্তের শরীক হইয়া আসে, গুরুমুর্শিদের উপদেশে বা নিজ সাধনার দ্বারা সেই অনন্তকে উপলব্ধি করিলেই সাধকের চূড়ান্ত লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে। এই কথাটা বৈষ্ণব বাউল ও সূফী বাউল, 'তথ্যা' বাউল ও 'পুথ্যা' বাউল, আউলিয়া-নেড়া-সহজী কর্তাভজা-সাঁই-দরবেশী—সকলেই বিভিন্ন ভাষা ও প্রতীকের দ্বারা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষে এই প্রকার অনেক সম্প্রদায় এখনও আছেন যাঁহাদের কিছুমাত্র আক্ষরিক বিদ্যা নাই, পুঁথির জ্ঞান হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণ বঞ্চিত। কিন্তু উচ্চস্তরের অধ্যাত্ম সাধনা তাঁহাদের নখদর্পণে, সূক্ষ্ম

৬৪ দাদু তাঁহার 'কায়াবেলী'তে এই বিষয়ে বলিয়াছেন, "কায়া মাহি হৈ সো নিধি জানে নাঁহি।" অর্থাৎ কায়ার মাঝেই তিনি (কর্তা) রহিয়াছেন, কেহ সেই নিধিকে চিনিতে পারিল না। কবীরের প্রসিদ্ধ উক্তিও এই কথারই ইঙ্গিত দিয়াছে :

পুরব দিসা হরীকা বাসা পছিম অলহ মুকামা।
দিলহী খোজি দিলৈ দিল ভিতরি ইহা রাম-রহিমানা॥

—পূর্ব দিকে হরির বাস, পশ্চিমে আল্লাহের মোকাম, অন্তরের মধ্যেই খুঁজিয়া দেখ, এখানেই রহিয়াছেন রাম-রহিম।

তত্ত্বকথা তাঁহাদের হস্তামলক। বহু প্রাচীন কাল হইতে এই ধরনের রহস্যময় সাধনার ধারা ভারতে চলিয়া আসিতেছে—ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন, নানা লোকযান, সূফী ধারা—সমস্তই ইহাতে আসিয়া মিলিত হইয়া একপ্রকার অদ্বয় সাধনার জন্ম দান করিয়াছে।

বাউলগানের স্বরূপ ॥

বাউল সাধনার তত্ত্ব, কাব্য ও সাধনক্রিয়া—তিনটি দিক আছে, তিনটিই পরস্পর-নির্ভরশীল। বাঙলাদেশের শিক্ষিত সমাজে বাউলগানের যে আলোচনা হয়, তাহা প্রধানতঃ তত্ত্ব ও কাব্যধর্মের আলোচনা। মনের মানুষের সন্ধান, মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অমৃতত্বকে জাগ্রত করা এবং ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎ সত্তাকে উপলব্ধি করা—মোটামুটি ইহাই বাউলসাধনার নির্যাস, তাহা আধুনিক কালের শিক্ষিত সম্প্রদায় জানেন। বাঙলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নব্য বাউলতন্ত্রের যে জাগরণ হয় তাহার পুরোধা ছিলেন শিক্ষিত সম্প্রদায়। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী এবং হরিনাথের শিক্ষিত তরুণ শিষ্যেরা পুরাতন বাউল ঢঙে অনেক গান লিখিয়াছিলেন।

আধুনিক বাউলগানের আদিগুরু হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-৯৬), যিনি কাঙাল হরিনাথ বা ফিকির চাঁদ বাউল নামে পরিচিত; তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই আধুনিক বাউলগান ও সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। নদীয়া জেলার কুমারখালী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত তিলি পরিবারে হরিনাথের জন্ম হয়। নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের পর তিনি স্বগ্রামে একটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেকালে এই বিদ্যালয়ের খুব খ্যাতি ছিল। অত্যন্ত অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে পড়িয়াও তিনি বিচলিত হন নাই; স্কুল পরিচালনা, সমাজসেবা এবং 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' (১৮৬৩) নামে একখানি মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন—গ্রাম হইতেই তাহা প্রকাশিত হইত। তাঁহার সাত্ত্বিক আদর্শ চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অনেকে তাঁহার সান্নিধ্য কামনা করিতেন। হরিনাথ কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে সাধন-ভজন করিতেন। জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি তরুণের দল তাঁহাকে সর্বক্ষণ ঘেরিয়া থাকিতেন।

গিয়াছিলেন। জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি হরিনাথের অনুরাগী তরুণেরা সেই ভাবে বাউলগান রচনা করিয়া তাহাতে সুর সংযোগ করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে হরিনাথ বাউলগান রচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রথম গানের একটু দৃষ্টান্ত :

আমি করব এ রাখালী কতকাল,
পালের ছটা গোরু ছুটে কংছে আমায় কালবেহাল ॥

তাঁহার শিষ্য প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—যাঁহারা 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকার' সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁহারাও হরিনাথের বাউল-গানের দলে যোগ দিলেন, কেহ-বা নিজেই বাউলগান রচনা শুরু করিলেন। হরিনাথ 'ফিকিরচাঁদ' এই ভণিতায় অনেক বাউলগান লিখিয়াছেন। বাংলা ১২৮৭ সালে কুমারখালী গ্রামে হরিনাথের বন্ধু ও শিষ্যগণ 'ফিকিরচাঁদ ফকিরের দল' নামে বাউল-সঙ্ঘ স্থাপন করেন। ১২৯৩ হইতে ১৩০০ বঙ্গাব্দের মধ্যে হরিনাথ রচিত বাউলগানসমূহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পর তাঁহার যাবতীয় বাউলগান 'কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের বাউল-সঙ্গীত' (১৯০৪) নামে প্রকাশিত হয়। একদা পথভিখারীরা তাঁহার গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত। বাউলের সাধনপ্রক্রিয়া বাদ দিলে আধুনিক কালে বাউলগানকে আর কেহ এরূপ নিপুণভাবে অনুকরণ করিতে পারেন নাই। কাঙালের দুই একটি সুপরিচিত বাউলগানের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

(১) ওহে, দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্তা শুনে বার্তা ডাকছি হে তোমারে ॥
আমি আগে এসে ঘাটে রইলাম বসে
(ওহে, আমায় কি পার করবে নাহে আমার অধম বলে)
যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে ॥

(২) অরূপের রূপের ফাঁদে পড়ে কাঁদে প্রাণ আমার দিবানিশি ;
কাঁদলে নির্জনে বসে আপনি এসে দেখা দেয় সে রূপরাশি।
সে যে কি অতুল্যরূপ নয় অনুরূপ শত শত সূর্যশশী ॥

(৩) শূন্যভরে একটি কমল আছে কি সুন্দর।
নাই তারে জলে গোড়া আকাশ জোড়া সমানভাবে নিরন্তর ॥
কমলের সহস্রেক দল।
তাও বিরাজ করে সোনার মানিক কিবা সে উজ্জ্বল ॥

তারে যে জেনেছে যে পেয়েছে সেই হয়েছে দিগম্বর।
কমলের ড'াটাতে কাঁটা ;
আবার ছয়টা সাপে জড়িয়ে ধরে করেছে লেঠা:
কেবল পায় রে দেখা যারা বোকা সাপের ফণা ভয়ঙ্কর॥

এই সমস্ত গানে কবি বাউলসাধনার অধ্যাত্ম ইঙ্গিত দিয়াছেন, কিন্তু বাউল সাধনার ক্রিয়াক্রম সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই।

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ১২৯৪ সালে 'কল্পনা' পত্রিকায় কয়েকটি বাউলগান প্রকাশ করেন। এগুলি (২০টি) ১৩০৭ সালে প্রকাশিত বিহারীলাল গ্রন্থাবলীতে 'বাউল-বিংশতি' নামে মুদ্রিত হইয়াছিল। বিহারীলালও বাউলগানের তত্ত্বকথার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন, কিন্তু মূল সাধনা সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। তাঁহার বাউলগানের একটু দৃষ্টান্ত :

এ কেমন ভালোবাসা।
বল কোন্ ভাবেতে মন ভুলাতে দেখা দিয়ে ছলতে আসা।

কিংবা

এ চাঁদ কোথায় পেলে।
বল এ চাঁদ কোথায় পেলে।
ত্রিভুবন আলো করে পদ্মফুলে খেলা করে সোনার ছেলে॥

পুরাতন বাউলগানের কবিত্ব, অধ্যাত্মসাধনা ও মিস্টিক রস যে অনেক আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিকে[৬৫] প্রভাবিত করিয়াছিল—উল্লিখিত গানগুলিই তাহার প্রমাণ। কিন্তু বাউলগান ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা। নদীয়া জেলার শিলাইদহে জমিদারী পরিদর্শনের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল সেই অঞ্চলে ছিলেন। তাহার নিকটবর্তী নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমায় সেঁউড়িয়া গ্রামে লালন ফকিরের আশ্রম ছিল। রবীন্দ্রনাথ বাউল ফকিরের মুখে এই সমস্ত গান শুনিয়া ইহার গভীর তাৎপর্য ও কবিত্বের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বিশেষতঃ বাউল আদর্শের সঙ্গে তাঁহার

---

৬৫ শুনা যায় ঈশ্বরচিন্তায় উদাসীন প্রখর কর্মযোগী বিদ্যাসাগরও শেষ জীবনে মানসিক অশান্তির মধ্যে পড়িলে অখিল উদ্দিন নামক এক মুসলমান বাউলকে বাসায় আনাইয়া তাঁহার দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান শুনিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকার তাঁহার গ্রন্থে, ('বিদ্যাসাগর') অখিল উদ্দিনের অনেকগুলি গানের নমুনা দিয়াছেন। অখিল উদ্দিনের গানে 'গোঁসাই চাঁদ' ভণিতা আছে। গোঁসাই চাঁদ নামে একাধিক বাউলের [illegible] গিয়াছে। দ্রষ্টব্য—ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের গ্রন্থ।

মনের মিল হওয়াতে তিনি লালন ফকিরের অনেক গান সংগ্রহ করেন। ১৩২২ সালের (শ্রাবণ) 'প্রবাসী' পত্রে তাঁহার সংগৃহীত কুড়িটি বাউলগান প্রকাশিত হয়। লালনের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়' গানটির সঙ্গে তাঁহার অন্তর-বাণীর বিশেষ সাদৃশ্য ছিল। কবিগুরুর সংগৃহীত বাউলগানের মোট সংখ্যা—২৯৮, বিশ্বভারতীর 'রবীন্দ্রসদনে' এখনও এই গানগুলির নকল আছে। পরে ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী বহু বাউলগান সংগ্রহ করেন, কিন্তু তাহার অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় দীর্ঘকাল ধরিয়া সংগৃহীত বাউলগান ও বাউলতত্ত্ব সম্পর্কে 'বাংলার বাউল ও বাউলগান' নামে যে বিশাল গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন সংগৃহীত বাউল গানের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের জমিদারীর এক কর্মচারীর (বামাচরণ ভট্টাচার্য) দ্বারা লালনের মূল খাতা হইতে অনেকগুলি গান নকল করাইয়া লন এবং "পরে উহা হইতে শুদ্ধ করিয়া কতকগুলি গান প্রবাসীতে প্রকাশ করেন।"[৬৬] ইহার কারণ ডঃ ভট্টাচার্যের মতে, "বাগ্‌ধারা ও অনেক ক্রিয়াপদ কুষ্টিয়া অঞ্চলের সাধারণের চলিত ভাষার অনুরূপ। অজ্ঞতার জন্য যে শব্দগুলি বিকৃতভাবে উচ্চারিত বা লিখিত হইয়াছে, সেইগুলি সেইরূপ রাখা অর্থহীন। সেই জন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ঐ গানগুলি শুদ্ধ উচ্চারণ অনুযায়ী বানান ঠিক করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।"[৬৭] অর্থাৎ ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত গানের ভাষাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া শুধু বানান শুদ্ধ করিয়া এবং আঞ্চলিক শব্দগুলিকে শুদ্ধ উচ্চারণের রীতিতে ছাপাইয়াছিলেন। কিন্তু আচার্য ক্ষিতিমোহন সংগৃহীত গানগুলির প্রামাণিকতা সম্পর্কে ডঃ ভট্টাচার্য একটু অভিযোগ আনিয়াছেন। তাঁহার মতে ক্ষিতিমোহন সংগৃহীত গানের নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি কোন অশিক্ষিত বাউলের রচনা হইতে পারে না :—

(১) নিঠুর গরজী, তুই কি মানসমুকুল ভাজবি আগুনে ?

(২) সহজধারা আপনহারা তার বাণী শুনে।

---

৬৬ ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৫

৬৭ ঐ

(৩) হৃদয়কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি।

(৪) আমি মজেছি মনে—
না জানি মন মজল কিসে আনন্দে কি মরণে।
ওগো এখন আমায় ডাকা মিছে,
আনন্দে এই মন নাচিছে
তার নূপুর বাজে রাত্রিদিনে।[৬৮]

(৫) আমার ডুবল নয়ন রসের তিমিরে—
কমল যে তার গুটালো দল আঁধারের তীরে।
গভীর কালো যমুনাতে চলছে লহরী,
রসের লহরী।
ও তার জলে ভাসে কানে আসে রসের বাশরী,
সাঁইয়ের বাশরী।
আমি বাইরে ছুটি বাউল হয়ে সকল পাসরি
ঘর ছাড়িয়ে।
শুধু কেঁদে মরি—ভাসাই কূল রসের নীরে,
আমার চোখ ডুবেছে রসের তিমিরে।

এই গানগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে ডঃ ভট্টাচার্যের সংশয় নিশ্চয় সুধীজনের চিন্তা উদ্রেক করিবে—"এইরূপ বাক্‌চাতুর্য ও কল্পনা আধুনিক কালের কবিদের রচনা ছাড়া বর্তমান বাউলদের গানে মিলে না, তাহা এই পনের ষোল বছর ধরিয়া প্রায় দেড় সহস্র বাউলগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনায় অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছি।"[৬৯] অবশ্য অবিশেষজ্ঞ হইয়াও বলিতে বাধা নাই যে, উল্লিখিত চার ও পাঁচ সংখ্যক গান দুইটির ভাব, ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গিমা আধুনিকমনা সুশিক্ষিত ব্যক্তির রচনা বলিয়া মনে হইতেছে। সে যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথ যে বাঙলার বাউলগানকে দেশে-বিদেশে[৭০] জনপ্রিয় করিয়াছেন, এই অশিক্ষিত সাধনসঙ্গীতের প্রতি বিশ্বের বিদ্বজ্জনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার সাধনায় যেমন বাউল তত্ত্বের প্রভাব আছে, তেমনি গানেও বাউলসঙ্গীতের

৬৮ এ ভাষা একেবারে শিক্ষিত কবির ভাষা, ইহাকে অশিক্ষিত গ্রাম্য বাউলের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

৬৯ ঐ, পৃ. ৭৯

৭০ রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতামালার অন্তর্ভুক্ত *Religion of Man*-এ বাউল সঙ্গীতের অধ্যাত্মসাধনা পাশ্চাত্য দেশে সর্বপ্রথম প্রচারিত হয়।

ছাঁদটা অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে। এখানে রবিগুরুর একটি সুপরিচিত বাউল ঢঙের গানের কয়েকছত্র উদ্ধৃত হইতেছে, যাহা হইতে তাঁহাকে সহজেই বাউলদের দোসর বলিয়া চিনিয়া লওয়া যাইবে ঃ

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে।
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো।
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে।
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাউলগানের যে আলোচনা ও অনুকরণ হইয়াছে, তাহার অনেকটাই কবিত্ব ও অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা। অবশ্য একথা সত্য যে, অশিক্ষিত বাউলদের কয়েকটি গান যে-কোন প্রথমশ্রেণীর গীতিকবিতার সমকক্ষ। লালনের 'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে', 'যে মন হাওয়ার ঘরে ফাঁদ পেতেছে', 'ওগো দাইসাগরে নামল শ্যামরায়' প্রভৃতি গানের[৭১] কবিত্ব ও অধ্যাত্মরস প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। ফকির পাঞ্জু শাহ্, মদন বাউল প্রভৃতি বাউল-সাধকদের নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের বাউলগানে ভাষা, ছন্দ, ভাব, রূপকপ্রতীক প্রভৃতির সুকৌশল প্রয়োগ হইতে তাঁহাদিগকে আদৌ অশিক্ষিত বলিয়া মনে হয় না। হাউড়ে গোসাই নামক প্রসিদ্ধ বাউলসাধক সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। পাঞ্জু শাহ্ ও অন্যান্য মুসলমান ফকির ও বাউল ইসলামি মরমীসাধনা ও হিন্দুর যোগতত্ত্বে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। অবশ্য আমরা যে সমস্ত বাউলগানে মুগ্ধ হই তাহার অধিকাংশই উনবিংশ—এমন কি বিংশ শতাব্দীর রচনা। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন, "অধিকাংশ আধুনিক বাউলের গানের অমূল্যতা চলে গেছে, তা চলতি হাটের শস্তা দামের জিনিষ হয়ে পথে পথে বিকোচ্ছে। তা' অনেক স্থলে বাঁধি বোলের পুনরাবৃত্তি এবং হাস্যকর উপমাতুলনার দ্বারা আকীর্ণ।" আধুনিক কালে কোন কোন অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্য বাউল বক্তব্য বিষয়কে মনোহারী ও চটকদারী করিবার জন্য আধুনিক জীবন হইতে তুলনা-উপমা সংগ্রহ'

৭১ ডঃ মতিলাল দাস ও পীযূষ মহাপাত্র সম্পাদিত 'লালন গীতিকা', পৃ ১০০, পৃ ১০৬, পৃ. ২৩০

করিয়াছেন। এখানে এইরূপ আধুনিক বাউলরূপকের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

(১) আইন-আদালতের রূপক—

ওরে মন আমার হাকিম হতে পার এবার।
মন যদি হও হাকিম আমি হই চাপরাশি,
কনস্টেবল হয়ে হাজির হই হুজুরি,
তোমার হুকুম জোরে আইন জারি করে
আনব চোরকে ধরে করে গ্রেফতার॥ (হারামণি—১ম)

(২) রেলগাড়ীর রূপক—

যাচ্ছে গৌর প্রেমের রেলগাড়ী।
তোরা দেখসে আয় তাড়াতাড়ি॥
* * *
গার্ড হয়েছেন নিতাই আমার,
শ্রীঅদ্বৈত ইঞ্জিনিয়ার,
এবার ভবে ভাবনা কিরে আর
মুখে হরি হরি গৌর হরি
করবেন টিকিট মাস্টারি॥ (হারামণি—১ম)

(৩) হাসপাতালের রূপক—

তোরা আয় কে যাবি রে
গোরাচাঁদের হাসপাতালে নদীয়া পুরে।
আর কেন ভাই যাতনা পাই
কলিকালের ম্যালেরিয়ার জ্বরে।
* * *
নিতাইবাবু সিভিল সার্জন,
অ্যাসিসট্যাণ্ট অদ্বৈত হল রে
নেটিভ শ্রীবাস আর শ্রীনিবাস হরিদাস
আছে কম্পাউণ্ডার রে॥
নিতাই বাবুর সুযশ ভালো জগাই মাধাই রোগী ছিল
তাদের বৈষম্যজ্বর ছেড়ে গেল একটি মিকচারে।
পথ্য বলে দিচ্ছেন বাবু সাধুবাদ দুগ্ধ সাবুরে॥ (হারামণি—১ম)

(৪) বাইসাইকেলের রূপক—

মন যদি চড়বি রে সাইকেল।
আগে দে কপ্‌নি এ টে অকপটে সাচ্চা কব্‌ দেল॥
ফুটপিনে দিয়ে পা হপিং করে এগিয়ে যা
পিনের পরে উঠে দাঁড়া বেদবিধি হবি ছাড়া
সামনে কর নজর চড়া আগাগোড়া ঠিক রাখিস হ্যাণ্ডেল॥
সীটের পরে বসে মন ব্যালেন্স ধরবি কষে,
যাবি উর্ধ্বশ্বাসে কুম্ভক শ্বাসে
চাস না আশেপাশে, ছয় আর দশে
মূলমন্ত্রে কর প্যাডেল॥
(ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্কলন)

(৫) বৈদ্যুতিক আলোর রূপক—

মরি কি কলের বাতি দিবারাতি জ্বলচে এ শহরে।
লণ্ঠনের মধ্যে পোরা দেখগে তোরা
ঝড় বাতাসে নেভে না রে॥
টিপ দিলে বাতির কলে বাতি জ্বলে বিনা তৈলে
সে ধরম জানে যারা জ্বালায় তারা
অন্তে কি জ্বালাতে পারে॥ (ডঃ ভট্টাচার্যের সংগ্রহ)

(৬) ব্যাঙ্কের রূপক—

গুরুমহাজনের চেক সাধুর ব্যাঙ্কে নাও ভাঙারে।
নিত্যপ্রেম-পরমার্থ-তত্ত্ব আত্মদান মোহর করিয়ে॥ (ঐ সংগ্রহ)

আধুনিক জীবনের রূপকে বাউল কবিগণ এই যে পদ রচনা করিয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে, তাঁহারা তত্ত্বরস ব্যাখ্যায় অতি-আধুনিক জীবনকেও গ্রহণ করিয়াছেন। তবে এ সমস্ত রচনা ভক্তসাধকের কাছে কিরূপ লাগে জানি না, কিন্তু আমাদের মতো 'অব্যাপারীর' নিকট ইহা হাস্যরসের খোরাক জোগাইয়া থাকে।

যাহা হউক আধুনিক যুগে ইংরাজী-শিক্ষিত মহলেও যে বাউলগানের কদর হইয়াছে তাহার কারণ, এই সমস্তগানে সাদা প্রাণের এবং অনাবৃত হৃদয়াবেগের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন কোন পদে জীবনেশ্বরের সঙ্গে সাধকের নিবিড় মিলনের ইঙ্গিত রহিয়াছে, মাঝে মাঝে আশ্চর্য কবিত্বের দ্বারা অন্তর্গূঢ় মিস্টিক রস উপচিত হইয়াছে, এবং তাহার আবেদনে আধুনিক মনও সাড়া দিয়াছে। শাক্তপদের তান্ত্রিক তাৎপর্য ছাড়িয়া দিলেও ইহার

মধ্য হইতে যেমন বাৎসল্যরসের নিবিড় স্বাদ পাওয়া যায়, তেমনি বাউল-পদেও আমরা বিশাল উপলব্ধির দ্বারে আসিয়া দাঁড়াই, তুচ্ছের মধ্যেও চিরজ্যোতির্ময়কে দেখিয়া বিস্মিত হই, আমাদের হারানো অর্ধ খণ্ডকে এই সমস্ত পদের গভীর তাৎপর্যের মধ্যে সন্ধান করিয়া ধন্য হই। সুতরাং বাউলগান আধ্যাত্মিক গীতিগুচ্ছ হইলেও ইহার সঙ্গে একটি নিবিড় মর্ত্য আবেগ ও সৌন্দর্যবোধ অনুস্যূত হইয়া আছে বলিয়া অশিক্ষিত বাউল-গায়কদের কয়েকটি পদে শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতারই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া বাউলগানের সাধন সংক্রান্ত বিশিষ্ট আচরণপদ্ধতিকেও ভুলিয়া থাকা যায় না। বস্তুতঃ বাউল-সাধকদের নিকট কৃত্য ভিন্ন বাউলগানের কোন সার্থকতাই নাই। অর্থাৎ বাউলের তত্ত্বকথা শুধু মস্তিষ্ক দিয়া উপলব্ধি করার জিনিষ নহে, ইহাতে একপ্রকার গুহ্যধরনের এমন সাধন-প্রকরণ আছে যাহা উক্ত সম্প্রদায় ভিন্ন অন্যত্র তাহার তাৎপর্য বুঝা যায় না। কাঙাল হরিনাথ হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত—অনেকেই বাউলগানের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু সে প্রভাব শুধু সাধারণভাবে শিল্প ও সৌন্দর্য-বোধের প্রভাব, এবং বিশেষভাবে অধ্যাত্মচেতনার আকর্ষণ। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের ভিতরে প্রবেশ করিলে, আখড়ায় প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিলে ইঁহাদের একপ্রকার বিচিত্র 'কায়াসাধনার' কথা জানা যাইবে। ইঁহারা সেই কায়াসাধনাকে নানা রূপক-প্রতীকে আকারে ইঙ্গিতে বলিয়াছেন—যাঁহারা এই পথের পথিক, তাঁহারা ঐ আভাস-ইঙ্গিত হইতেই সাধ্যসাধনার পথ খুঁজিয়া পাইবেন—ইহাই ছিল বাউলসাধক ও গুরুদের উদ্দেশ্য। এখন সংক্ষেপে ইঁহাদের সাধনপ্রক্রিয়ার কথা আলোচনা করা যাক।

বাউলসাধনার মূল তত্ত্ব॥

বাউলসাধনা 'প্রকৃতি' লইয়া সাধনা, নরনারীর যুগনদ্ধলীলাই তাহার প্রধান উপাদান। বাউল সাধক শুধু গীতিকবিতা রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা শ্রেণীসম্প্রদায় নির্বিশেষে একপ্রকার প্রাকৃত দেহচর্যার কথা বলিয়াছেন—যাহা ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মতম মোক্ষানন্দে পৌছাইয়া দেয়। নরনারীর বাস্তব দেহকে রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত দেহরূপে কল্পনা করিয়া উভয়ের অপার্থিব মিলনের মধ্য দিয়া জীবনের সারমর্ম উপলব্ধি করিতে

হইবে। একদল বাউল হিন্দুর যোগতন্ত্র অনুসরণ করিয়া নিজ দেহেই রাধাকৃষ্ণ বা শিব-দুর্গার সামরস্যসম্ভূত স্বর্গীয় মিলনানন্দ ভোগ করিতে চাহে—ইহাই মোক্ষের প্রধান সোপান। আর একদল বাউল স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া কামকে প্রেমে পরিণত করে। এই অপার্থিব প্রেম উপলব্ধির জন্য পার্থিব দেহকে আধার স্বরূপ চাই। এই দেহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, সাঁই বা 'আলেখ নূর' (জ্যোতি) বাস করেন। জড় দেহের মধ্যে কিভাবে চিদানন্দময় অনন্তের স্বাদ পাওয়া যায় বাউলগণ তাহারই সন্ধান করিয়াছেন। ইহার জন্য এমন সমস্ত দৈহিক প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে যাহা আধুনিক ব্যক্তির নিকট বীভৎস মনে হইতে পারে।

বাউলদের এক প্রকার বিচিত্র ধরনের দেহ-দর্শন আছে। নারী দেহকেই তাঁহারা মুক্তির সোপান বলিয়া মনে করেন।[৭২] তাঁহাদের দেহতত্ত্বের মতে, স্ত্রীধর্মের তিনটি দিনে নারীদেহে 'সহজ মানুষ', 'মনের মানুষ' বা 'অধর চাঁদে'র আবির্ভাব হয়। চতুর্থ দিনেই মনের মানুষ পলাইয়া যায়। সাধক নারীদেহ অবলম্বন করিয়া তিন দিন ধরিয়া 'ত্রিবেণী' ধারায় বসিয়া মনের মানুষরূপী মৎস্য শিকার করিবেন। সহজ অর্থে, স্ত্রীধর্মের বিশেষ দিনে স্ত্রীপুরুষে বিশেষ দৈহিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সঙ্গত হইলে বাউল সাধনার সিদ্ধি নিকটতর হইবে। "এই তিন দিনই বাউলের সাধনার প্রশস্ত সময়। ইহাই 'মানুষ' ধরার সময়। এই তিন দিনের শেষে পূর্ণভাবে সহজ মানুষের আবির্ভাব হয়। ইহা সাধকের অনুভূতি-সাপেক্ষ। এই সহজ মানুষের স্বরূপের অনুভূতি শৃঙ্গারে অচঞ্চল বীজোদ্ভূত আনন্দানুভূতি। এই

---

৭২ পাঞ্জু শাহ্ 'মেয়ে'র গৌরব ঘোষণা করিতে গিয়া বলিয়াছেন :

ভজন সাধন করবি রে মন কোন্ রাগে।
আগে মেয়ের অনুগত হও গে॥
জগৎ জোড়া মেয়ের বেড়া রে কেবল একপতি সাঁইজী জাগে॥
মেয়ে সামান্য ধন নয়,
জগৎ করেছে আলোময়,
কোটি চন্দ্র জিনি কিরণ আছে মেয়ের পায়।
মেয়ে ছাড়া ভজন করা রে তা হবে না কোনো যোগে॥

আর এক বাউল গাহিয়াছেন—"মেয়ে ভজতে পারলে পারে যাওয়া যায়।"

(উদ্ধৃতিগুলি ডঃ ভট্টাচার্যের সঙ্কলন হইতে গৃহীত)

আনন্দানুভূতিকে যোগক্রিয়ার দ্বারা ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী করিয়া দ্বিদলপদ্ম পর্যন্ত উঠাইলে অটলবীজরূপী ঈশ্বররূপের সঙ্গে শৃঙ্গারলীলাময় সহজমানুষ রূপের মিলনে নিরন্তর অপরিসীম শৃঙ্গারানন্দের অনুভূতি জাগে। মূলতঃ পরমতত্ত্বের স্বরূপই এই প্রকৃতিপুরুষের মিথুন-ঘটিত মহোল্লাসময় অবস্থা। এই অবস্থা লাভই বাউলের সাধনার চরম লক্ষ্য। ইহাই তাহার আত্মোপলব্ধি—সহজ অবস্থা লাভ।"[৭৩] এইরূপ সহজ অবস্থার জন্য নানাপ্রকার দৈহিক, যৌগিক, তান্ত্রিক প্রক্রিয়া আছে, যাহার খোলাখুলি বর্ণনা বর্তমান প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন।[৭৪] লালন, পাঞ্জশাহ্ প্রভৃতি বাউল গুরুগণ তাঁহাদের গানে ত্রিবেণীর ঘাট, অধর মানুষ (মীন) জোয়ার, জোয়ারের জলে মীনরূপী অধর-মানুষ বা সহজমানুষের ভাসিয়া আসা, সময় থাকিতে থাকিতে তিন দিনের মধ্যেই সাধক কর্তৃক সাবিকার দেহতীর্থ হইতে সাধনামৃত লাভ—প্রভৃতি গূঢ় ব্যাপারের ইঙ্গিত দিয়াছেন। বাউলগানের কাব্যধর্ম ও অধ্যাত্মব্যঞ্জনা যেমন আধুনিক রুচির নিকট অতিশয় বিস্ময়কর মনে হয়, তেমনি ইঁহাদের অনেক গানে এমন সমস্ত দৈহিক প্রক্রিয়ার কথা আভাসে ব্যক্ত হইয়াছে যে, বর্তমান কালে ও আধুনিক সমাজে তাহার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে অনেকেই সঙ্কুচিত হইবেন। লালনের এই পদটিতে সেই রহস্যাচারের কিছু ইঙ্গিত আছে :

সময় গেলে রে ও মন সাধন হবে না।
দিন থাকিতে তিনের সাধন কেনে করলে না॥
জানো মন খালে বিলে মীন থাকে না জল শুকালে
কি হয় তারে জাঙাল[৭৫] দিলে শুকনো মোহানা॥

---

৭৩ ডঃ ভট্টাচার্যের উক্ত গ্রন্থ, পৃ ৩৭২—৭৩

৭৪ এ বিষয়ে ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য দীর্ঘদিন ধরিয়া বাউলসম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুরিয়া তাহাদের নিকটসাহচর্যে আসিয়া উহাদের 'কায়াসাধনা'র মোটামুটি পরিচয় উদ্ধার করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের 'নীর' (অর্থাৎ রজঃ) এবং পুরুষের 'ক্ষীর' (অর্থাৎ শুক্র)—এই নীর ক্ষীরের মিলিত সত্তার নাম সহজ সত্তা। নীরে কামের অধিকার, ক্ষীরে প্রেমের অধিকার। সাধককে প্রক্রিয়া-বিশেষের সাহায্যে 'নীর' হইতে 'ক্ষীর' বাহির করিয়া লইতে হইবে, অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের দৈহিক আসক্তিকে প্রেমের দ্বারা জয় করিতে হইবে। এই সাধনার 'চারিচন্দ্র ভেদের' প্রথা, 'পানপ্রথা' প্রভৃতি কোন কোন সম্প্রদায়ে গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। ইহার বর্ণনা আধুনিক সমাজে নিতান্ত ঘৃণাব্যঞ্জক অঘোর পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি ইহাতে বিবমিষা বোধ করিবেন।

৭৫ ইহা বোধ হয় 'বাঁধাল' (অর্থাৎ বাঁধ) হইবে।

ফকির পাঞ্জ শাহ্ও ত্রিবেণীর ঘাটে বসিয়া সহজ মানুষ ধরিতে নির্দেশ দিয়াছেন :

ত্রিবেণীর তীরধারে সুধারে জোয়ার আসে।
সুখসাগরে মানুষ খেলে বেহাল বেশে।
উথলে সুধাসিন্ধু সুধারে সুধার সিন্দু
সুখময় সিন্ধু জলে ছলে ছলে সাঁতার খেলে।
জীব নিস্তারিতে জোয়ার এসে অধর মানুষ যায় গো ভেসে ॥[৭৬]

এই যে নরনারীর শারীর মিলনের মধ্য দিয়া 'অধর মানুষ'কে ধরা, ইহা তথাকথিত কায়াবাদী হিন্দু তন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র, নাথধর্ম—এমন কি সুফীমতেও স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। অবশ্য সাধনার উচ্চ স্তরে উঠিয়া সাধক আর 'প্রকৃতি'র সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেন না,[৭৬ক] নিজ দেহেই 'আজ্ঞাচক্র' পর্যন্ত অনুভূতিকে উঠাইয়া সেখানে শিব-শক্তির[৭৬খ] মিলনজনিত পরমানন্দ উপলব্ধি করেন—ইহাই 'মনের মানুষ' ধরা।

এই সমস্ত বাউলসম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি মতাবলম্বীরা আছেন—কিন্তু মূল তত্ত্বে সকলেই এক। মেছের শা ফকির ইসলামি তত্ত্ব ও পারিভাষিক শব্দের সাহায্যে বাউলসাধনার ইঙ্গিত দিয়াছেন :

জপ রে তার নামের মালা হয় না যেন ভুল
গাঁথ না নাম আপন গলায়।
দূরে যাবে দুঃখ জ্বালা অন্ধকারে হব উজালা
এই দুনিয়ার মূল।

---

৭৬ অন্য কোন নির্দেশ না থাকিলে উদ্ধৃত বাউল গানগুলি ডঃ ভট্টাচার্যের সংগ্রহ হইতে গৃহীত বুঝিতে হইবে।

৭৬ক ডঃ ভট্টাচার্যের উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৮৪—৮৫

৭৬খ বাউলগণ শাক্ত প্রতীকশব্দও ব্যবহার করিয়াছেন :

ভজরে ভজরে ও মন শক্তিমূলাধারে।
শক্তি বিনা মুক্তিপদ এ ভবে কেউ দিতে পারে ॥
(ডঃ ভট্টাচার্যের গ্রন্থ, পৃ. ৩৫১)

বাউলপন্থী কর্তাভজা সম্প্রদায়ও শক্তিপূজার প্রতীক স্বীকার করিয়াছেন :

অলসে মাকে পূজলি না কেনে।
সে যে আদ্যাশক্তি, পূজ শক্তি দশ ভুজা
যথাশক্তি আয়োজনে॥ (ঐ, পৃ. ৩৫৯)

তুমি লা এলাহা ইল্লাল্লা বল[৭৭]
এই আঁধার কাটে চক্ষু মেল,
অই ভবের হাট ভুলো নারে মহম্মদ রছুল।
মুহ্-অল এছাবৎ[৭৮] নফুয়ল নবি[৭৯],
ও তোমার ফানাফাল্লা[৮০] যখন হবি
মেছের শা কয় তবে হবি আল্লার মকবুল।[৮১]

মুসলমান বাউল আবার বৈষ্ণব পন্থাকেও সাধনপন্থা রূপে গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন :

ওগো রাইসাগরে নামলো শ্যামরায়।
তোরা ধর্ গো হরি ভেসে যায়॥ (লালন)

কেহ-বা হরপার্বতী ও রাধাকৃষ্ণকে ত্রিবেণী তীর্থে অবতারণা করিয়াছেন :

দ্বিদলে ত্রিবেণী-মহাতীর্থধামে
শশাঙ্কশেখর গৌরী লয়ে বামে
নিরখি নয়নে সেই রাধাশ্যামে
আনন্দ সলিলে ভাসে অনুক্ষণ॥ (ডঃ ভট্টাচার্যের সংগ্রহ)

যাহা হউক বাউলপদের মধ্যে কোন কোন স্থলে তত্ত্বের অতিরিক্ত একটি চমৎকার কাব্যসৌন্দর্য আছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। উহার অন্তর্নিহিত দেহমানসিক গূঢ় সাধনক্রম ছাড়িয়া দিলেও গভীর হৃদয়ানুভূতি, অনন্ত ভগবানের সঙ্গে ভক্তের মিলনলীলা প্রভৃতি উচ্চতর চিত্তধর্ম রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আধুনিক মনীষীদের প্রভাবিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনা, কাব্যরূপ, হৃদয়াবেগ, রূপনির্মিতি, সঙ্গীতপ্রতিভা অনেক সময় বাঙলার বাউলদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। বাউলদের সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম সাধনাও কবিগুরুকে নূতন ভাবলোকে লইয়া গিয়াছে, বাউলসঙ্গীতের সাদা সুরও রবীন্দ্রনাথের বহু গানে অনুসৃত

৭৭ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই।

৭৮ আল্লাহের দ্বারা নিজ অস্তিত্ব প্রমাণ করা এবং সর্বত্র সেই অনাদি শক্তির অসীম সত্তা উপলব্ধি করা।

৭৯ হজরত মুহম্মদের ধ্যান করিতে করিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া সমগ্র জগতে শুধু তাঁহারই বিকাশ উপলব্ধি করা।

৮০ ক্ষুদ্র অহংকে ত্যাগ করিয়া 'আনাল হক' বা আমিই ব্রহ্ম—এইরূপ উপলব্ধি।

৮১ প্রিয় ব্যক্তি (হারামণি, ১ম, পৃ. ৭৮—৮০ দ্রষ্টব্য)

হইয়াছে। তাই বর্তমান শতাব্দীতে বাউলদের অধ্যাত্ম দর্শনের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে শ্রদ্ধামিশ্রিত কৌতূহল ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের দান। অশিক্ষিত বাউলরাও অনেক সময় 'রবিঠাকুর বাবুমশায়'-কে নিজেদের ভাবাদর্শের আত্মীয় বলিয়াই মনে করেন।[৮২] বাউল সাধনার গুহ্য চর্যা সম্প্রদায়ের বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় না। প্রকৃতি লইয়া সাধনভজন বলিয়া বাউল-আচার্যেরা এই সাধন প্রণালী গোপনে রাখাই কর্তব্য মনে করেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাউলগানের কাব্যত্ব ও উচ্চ ধর্মভাব শ্রদ্ধা জোগাইলে ও ইঁহাদের চারচন্দ্র সাধন, বিন্দু পান, ত্রিবেণীতে মৎস্য শিকার, উল্টাসাধন, রসের ভিয়ান বা রসের পাক, নীরক্ষীর তত্ত্ব, অমৃতরস, বাণক্রিয়া, 'জেন্তে মরা' প্রভৃতি গূঢ় আচরণের তাৎপর্য জানিলে আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি ইহাকে উদ্দাম রিপুর অনাচার চর্চা বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন।[৮৩] এমন কি 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে'র মনীষী-লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত লোকগান সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিলেও বাউলদের সাধনভজন সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার মতে, "এই সম্প্রদায়ের মধ্যে নরমাংসভোজন (মৃতদেহ) এবং শবের বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া পরিধান করা প্রচলিত আছে।' তিনি বোধ হয় বীভৎস-আচারী অঘোরপন্থী ও বাউলদিগকে গুলাইয়া ফেলিয়াছেন। এ-বিষয়ে বাউল-গবেষক ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, "আমাদের কল্পনায় বাউলনামে এক অদ্ভুত জীব বাস করে এবং এই কল্পনার উপর নির্ভর করিয়াই এতদিন আমাদের বর্ণনায় বেশ খানিকটা রঙ চড়ানো হইয়াছে। বর্তমানে সারা

৮২ ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলার বাউল ও বাউলগান', ২য় খণ্ড, পৃ. ১

৮৩ অবশ্য বাউল সাধনা অনধিকারীর হাতে পড়িয়া যে, কোন কোন ক্ষেত্রে কুৎসিত ব্যভিচারে পরিণত হয় নাই তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। 'প্রকৃতি' লইয়া দৈহিক সাধনায় পদস্খলনের সম্ভাবনা তো পদে পদে আছেই। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে বহু বাউলের সাহচর্যে আসিয়াছিলেন, তিনিও এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে অনাচার লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি খোলাখুলিভাবেই বলিয়াছেন, "একদা পাড়াগাঁয়ে যখন বাস করতুম তখন সাধুসাধকের বেশধারী কেউ কেউ আমার কাছে আসত, তারা সাধনার নামে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়চর্চার সংবাদ আমাকে জানিয়েছে। তাতে ধর্মের প্রশ্রয় ছিল। এই প্রশ্রয় সুরঙ্গপথে শহর পর্যন্ত গোপনে শিস্তে প্রশিস্তে শাখায়িত।" (শিক্ষা—শিক্ষার বিকিরণ)

বাংলায় যাহা দেখিতেছি, তাহাদের মধ্যে অদ্ভুতত্ব বা বীভৎসতা কিছুই নাই। অতি নিরীহ, শান্ত, সংযত, সর্বদা আত্মগোপনশালী, সাংসারিক ভোগবিলাসে উদাসীন, ভাবের ঘোরে আত্মসমাহিত ও অন্যমনস্ক এক সম্প্রদায়,—প্রবল দারিদ্র্য ও নানা সামাজিক নির্যাতন সহ্য করিয়াও নীরবে এবং স্থির বিশ্বাসে আপন ধর্ম সাধন করিতেছে।"[৮৪] অতঃপর দুই-একজন বাউল গায়কের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

কয়েকজন বাউলের পরিচয় ॥

এই গ্রন্থে বাউল পদকর্তা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিবার অবকাশ নাই, প্রয়োজনও নাই। কারণ যে সমস্ত বাউলের পদাবলী সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে, শিক্ষিত সম্প্রদায় যে সমস্ত পদে মুগ্ধ, সেগুলির অধিকাংশই আধুনিক কালের রচনা। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বাউল গান সংগ্রহের চেষ্টা আরম্ভ হয়। যাঁহাদের পদ আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রায় সকলেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বর্তমান ছিলেন। গুরুপরম্পরাক্রমে তাঁহারা সাধনভজন করিয়া আসিলেও তাঁহাদের পদের ভাষা ও প্রতীকে আধুনিক কালের স্পর্শ লাগিয়াছে—তাহা আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি। সুতরাং আধুনিক কালে সংগৃহীত বাউলগান আধুনিক কালের সামগ্রী ও আধুনিক যুগের সাধকের রচনা। তবে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে বৈষ্ণব সহজিয়াদের সাধন-ভজনের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বাউল সাধনা বর্তমান ছিল, কিছু কিছু বাউল-সম্প্রদায়ও গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে বে-শরা-পন্থী মুসলমান ফকিরও যোগ দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাউলগানকে সাংস্কৃতিক মর্যাদা দিয়া সংগ্রহের চেষ্টা দেখা যায় না।[৮৫] গত তিন-চার

৮৪ ডঃ ভট্টাচার্যের উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫০

৮৫ রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন, ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যামোদিগণ কিছু কিছু বাউলগান সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ আরম্ভ করেন। গবেষকের দৃষ্টি লইয়া এবং ইহার প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অনেক আখড়া অঞ্চল ঘুরিয়া নানা ধরনের বাউল গান সংগ্রহ করিয়া তাঁহার 'বাংলার বাউল ও বাউল গানে' প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডঃ মতিলাল দাস এবং পীযূষকান্তি মহাপাত্রের সম্পাদনায় 'লালনগীতিকা' প্রকাশিত হইয়াছে।

দশক ধরিয়া গবেষকগণ এই সাধনা ও সাহিত্য লইয়া নানা সন্ধান-অনুসন্ধান করিতেছেন, বাঙলার বিভিন্ন বাউল আখড়ার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়াছেন —বাউল সাধকেরাও আর ততটা মন্ত্রগুপ্তির পক্ষপাতী নহেন। কেঁদুলী, প্রেমতলী, রাজশাহী, রঙপুরের বাউলকেন্দ্র, শ্রীহট্ট, ঢাকাজেলার নরসিংদি, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নবদ্বীপের বনচারীর বাগান (বাউল চণ্ডীদাস গোঁসাইয়ের আশ্রম), বর্ধমান জেলার বেতালবন (নিতাই বাউলের আশ্রম) প্রভৃতি বাউল কেন্দ্রগুলিতে কোন কোন উৎসাহী গবেষক যাতায়াত শুরু করিয়া দিয়াছেন, কেঁদুলিতে জয়দেব মেলায় সমাগত বাউল সম্মেলনে আজকাল শিক্ষিত সমাজের অনেকেই যোগ দিয়া থাকেন, দৈনিক পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতারাও এই সমস্ত অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রকাশ করিতেছেন। আজকাল আবার কলিকাতার নাগরিক সমাজে, তথাকথিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে, লোকসাহিত্যের আসরে পল্লীঅঞ্চলের বাউলদের আনাইয়া তাঁহাদের নৃত্যগীতের আয়োজন করা হইতেছে। বাউল বলিয়া পরিচিত কোন কোন ব্যক্তি বাউল ঢঙের গানে আধুনিক শ্রোতার রুচির উপযোগী সুরবিন্যাস করিয়া নাগরিক জীবনে গ্রামীণ রসের স্বাদ বিতরণ করিতেছেন। কিন্তু পল্লীর আবহাওয়া হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া বাউলের 'আলেকলতাকে' ড্রয়িংরুমের ফুলের টবে বাঁচাইয়া রাখা যায় কিনা সন্দেহ। লালন ফকির গাহিয়াছেন :

> হীরেলাল মতির দোকানে গেলে না।
> সদাই কিনলি সে সব পিত্তল দানা॥

বর্তমান কালধর্মে গিল্টিকরা পিতলদানাই 'হারামণি'র দামে বিকাইতেছে। উপরন্তু নাগরিক সমাজে বাউল গানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ফলে ইহার সঙ্গে অর্থাদির প্রলোভনও জড়াইয়া গিয়াছে—ফলে এই গোপনচারী সাধক-সম্প্রদায়ের আত্মগুপ্তি বেশীদিন বজায় থাকিবে বলিয়া মনে হয় না।

বাউলসাধকদের কোন ইতিহাস বা জীবনকথার প্রামাণিক সংগ্রহ নাই, কোন তথ্যসম্মত আলোচনাও হয় নাই। পত্র-পত্রিকায় মাঝে মাঝে যে দু-একটি আলোচনা প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে অনেক অযথার্থ কথা থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পূর্ববর্তী কোন বাউলের জীবনকথা জানিবার উপায় নাই। লালন শাহ্, পাঞ্জু শাহ্, মদন বাউল প্রভৃতি বিখ্যাত বাউল-

সাধক ও বাউল গীতিকারেরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। এখানে এইরূপ দুই একজন বিখ্যাত বাউলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

লালন শাহ্ ফকির—প্রথমে শ্রেষ্ঠ বাউল সাধক ও গীতিকার লালন শাহ্ বা লালন ফকিরের জীবনকাহিনী আলোচনা করা যাক। রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের বাউল গান অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তাঁহার জন্যই লালনের গান সম্বন্ধে আধুনিক কালের শিক্ষিত সমাজ কৌতূহলী হইয়া উঠেন। ১৩২২ সালের 'প্রবাসী'-তে (আশ্বিন-মাঘ) কবিগুরু 'হারামণি' শীর্ষক সংগ্রহে লালনের কুড়িটি গান প্রকাশ করেন, তাহার পর হইতেই শিক্ষিত সমাজ বাউল গানের প্রতি কৌতূহলী হইয়া উঠেন। খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথ লালনকে চোখে দেখেন নাই, কারণ জমিদারী কর্মোপলক্ষে তাঁহার শিলাইদহে যাইবার পূর্বেই লালনের তিরোধান হয়।

লালন ফকির সম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতি আছে—কারণ কুষ্টিয়া ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে তাঁহার বহু হিন্দু-মুসলমান শিষ্য আছে। এখনও অম্বুবাচিতে লালনের আশ্রম সেঁউড়িয়া গ্রামের আখড়ায় তাঁহার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ ও অন্যান্য তথ্য কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশিত পাক্ষিকপত্র 'হিতকরী'তে (১২৯৭) প্রকাশিত হয়। ইহাতে দেখা যাইতেছে ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে লালন দেহরক্ষা করেন। 'হিতকরী'র মতে এবং স্থানীয় প্রবাদানুসারে লালনের মৃত্যুর সময় ১১৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল। এত বৃদ্ধ বয়সেও তিনি একটি ছোট ঘোড়ায় চড়িয়া নানা গ্রামে গিয়া নিজ ধর্ম প্রচার করিতেন। অনুমান তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে। তিনি কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানার অন্তর্ভুক্ত গোরাই নদীর তীরে ভাঁড়রা গ্রামে কায়স্থ করবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যেই তাঁহার মনে ধর্মভাব উদিত হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন, তিনি নিরক্ষর ছিলেন, ভাবের আবেশে গান বলিয়া যাইতেন বা গাহিতেন—ভক্তেরা সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া লইতেন। কিন্তু তাঁহার পদে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মসংক্রান্ত যে সমস্ত ইঙ্গিত ও উল্লেখ আছে, তাহাতে তাঁহাকে একজন মনীষী পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক প্রথম জীবনে বিবাহের পর কবি সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে পায়ে হাঁটিয়া পুরীধামে যাত্রা করেন,

কিন্তু পথিমধ্যে বসন্তরোগাক্রান্ত হইলে সঙ্গীরা তাঁহাকে সেই অবস্থায় ফেলিয়া গন্তব্য পথে চলিয়া যায়। এক নিঃসন্তান মুসলমান দম্পতী তাঁহাকে ঘরে লইয়া গিয়া বহু সেবাযত্ন ও চিকিৎসার পর তাঁহাকে আরাম করিয়া তোলেন। ঐ মুসলমান ব্যক্তিটির নাম সিরাজ, তিনিও সাধক ফকির ছিলেন। নিদারুণ মারীগুটিকার আক্রমণে লালনের একটি চক্ষু বরাবরের জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। পরে সুস্থ হইয়া গ্রামে ফিরিয়া তিনি নিজের আত্মীয়স্বজনের নিকট মুসলমান দম্পতী কর্তৃক প্রাণরক্ষার কথা বলেন। এই সংবাদে তাঁহার মাতাপিতা তাঁহাকে ঘরে ঠাঁই দিতে চাহিলেন না, এমন কি তাঁহার স্ত্রীও যবনসংস্পর্শদোষের জন্য স্বামীর সঙ্গে যাইতে অসম্মত হইলেন। ইহার পর লালন নিজ সমাজ ও আত্মীয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জীবনদাতা ও প্রতিপালক সিরাজ ফকিরের কাছেই ফিরিয়া যান এবং তাঁহার নিকট ফকিরী ধর্ম বা বাউল-সাধনা গ্রহণ করেন। প্রায় পদেই কবি শ্রদ্ধার সঙ্গে এই সিরাজকে 'সিরাজ সাঁই' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাহারো মতে সিরাজ ফকির নাকি পাল্কী বেহারা ছিলেন, অবসর সময়ে সাধনভজন করিতেন। যাহা হউক ইঁহার নিকট লালন দীক্ষা লাভ করেন এবং লালন শাহ্ বা লালন ফকির নামে পরিচিত হন। লালন নাম তাঁহার প্রকৃত কৌলিক নাম, অথবা বাউল ফকিরী দীক্ষা লাভের পর তিনি এই নামে পরিচিত হন, তাহা জানা যাইতেছে না। অতঃপর বাউল আদর্শ প্রচারার্থে তিনি বহু স্থলে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। তিনি আত্মীয়স্বজনের দ্বারা পরিত্যক্ত হইলেও গ্রামের মায়া কাটাইতে পারেন নাই। ১২৩০ সালের দিকে লালন গোরাই নদীর তীরে নিজ গ্রামের নিকট মুসলমান মোমিন সম্প্রদায়ের (জোলা) দ্বারা অধ্যুষিত সেঁউড়িয়া গ্রামে আশ্রম নির্মাণ করিয়া সাধন ভজন করিতে থাকেন এবং এখানেই কোন এক মোমিন-কন্যাকে বিবাহ করিয়া গৃহী-জীবন আরম্ভ করেন। এই মোমিন শ্রেণীর মুসলমানেরা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অনুরাগী হইয়া পড়েন, কিন্তু শরিয়তপন্থী রক্ষণশীল মুসলমানদের ভয়ে প্রকাশ্যে তাঁহার প্রতি আনুগত্য দেখাইতে তাঁহারা সাহস করিতেন না। এই সময়ে বাউলপন্থী মুসলমান ফকিরগণ 'নেড়া ফকির' নামে অভিহিত হইতেন। এইরূপ বহু 'নেড়া ফকির' ও গৃহীভক্ত শিষ্য হইয়াছিলেন—তাঁহার অনেক হিন্দু শিষ্যও ছিল। তিনি শরিয়তী বিধানে

ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ মুসলমান ফকির ও বাউলেরা হিন্দু মুসলমান কোন ধর্মেরই অনুষ্ঠান মানিতেন না—যদিও সাধন-ভজনে অনেক সূফী শব্দ ও কোরানশরিফের নির্দেশ ব্যবহার করিতেন। লালন বাহ্যতঃ মুসলমান ফকিরবৎ আচরণ করিলেও খুব সম্ভব আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই, করিলে হিন্দুসমাজে তিনি এতটা শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহার গান শুনিয়াই হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ বা ফিকিরচাঁদ বাউল), জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি দেশবরেণ্য ব্যক্তিগণ বাউলগানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার ঢঙে গান রচনায় মনোনিবেশ করেন।[৮৬] যাহা হউক এই উচ্চমার্গের সাধক ও প্রথম শ্রেণীর গীতিকবি ধর্মমতেও অসাধারণ ঔদার্যের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যেমন সূফী সাধনার শব্দ ও কোরানের তত্ত্বকথা বাউলপদে ব্যবহার করিয়াছেন, তেমনি বহু পদে বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শ, রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপ ও চৈতন্যদেবের বন্দনা করিয়া অধ্যাত্মমার্গের পদ রচনা করিয়াছিলেন। তবে সাধারণ হিন্দুসমাজ এবং শরিয়তী মুসলমানদের নিকট এই সমস্ত বে-শরা ফকিরীপন্থা নিন্দিত হইয়াছিল। তাঁহার শিষ্যেরা 'প্রকৃতি' লইয়া সাধন ভজন করিতেন বলিয়া শিক্ষিত সমাজের কেহ কেহ এই সব ব্যাপারকে সুদৃষ্টিতে দেখিতেন না। লালনের তিরোধানের পর 'হিতকরী' পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে যে সংবাদ বাহির হয়, তাহাতে প্রকাশ্যেই বলা হইয়াছিল যে, তাঁহার শিষ্যেরা সাধনার নামে স্ত্রীলোক লইয়া ব্যভিচার করে। শরিয়তপন্থী রক্ষণশীল মুসলমান, যাঁহারা বিশুদ্ধ আরবী 'তমদ্দুনে' বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহারা এই ধরনের 'বেদাতী' ফকিরী সাধনাকে বরদাস্ত করিতে পারিতেন না—এখনও করেন না। তাঁহারাই অধিকাংশ সময়ে তাঁহার এবং তাঁহার শিষ্যদের বিরুদ্ধে এই সব অলীক কথা রটাইতেন। যাহা হউক দীর্ঘজীবী লালন শাহ্ বাঙলার নানা জেলায় বহু শিষ্যের ভক্তি ও আনুগত্য লাভ করিয়াছিলেন। স্থানীয় শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই তাঁহাকে আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন দিব্যপুরুষ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার স্বহস্তলিখিত কোন গানের খাতা বা পুঁথি পাওয়া যায় না। আশ্রমের শিষ্যগণ গুরুর মুখনিঃসৃত যে সমস্ত গান খাতায় টুকিয়া রাখিতেন, তাহার কিছু কিছু রবীন্দ্রনাথ

৮৬ জলধর সেন প্রণীত 'কাঙাল হরিনাথ' দ্রষ্টব্য।

তাঁহার এক কর্মচারীর দ্বারা নকল করাইয়া লন। সেই নকল এখনও বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত আছে। সম্প্রতি সেগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'লালনগীতিকা'য় স্থান পাইয়াছে। কুষ্টিয়ার মুন্সেফ ডঃ মতিলাল দাস মহাশয় লালনের আশ্রমের পুরাতন খাতা দেখিয়া ৩৭১টি গান নকল করাইয়া লন। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত নকলের সহিত এই সমস্ত পদের সাদৃশ্য আছে, কয়েকটি নূতন পদও আছে। মতিলাল ও রবীন্দ্রসংগ্রহে আরও ৮৯টি নূতন গান পাওয়া যায়। অর্থাৎ এ পর্যন্ত সাড়ে চারি শতেরও অধিক পদ মুদ্রিত হইয়াছে। ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও ফকিরদের নিকট লালনের আরও কিছু নূতন গান সংগ্রহ করিয়া তাঁহার 'বাংলার বাউল ও বাউল গানে'র অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

লালনের পদে কখনও ইসলামী সূফী পারিভাষিক শব্দের দ্বারা, কখনও-বা হিন্দুর যোগতন্ত্রাদি হইতে সাধনপ্রক্রিয়ার ধারা অনুসৃত হইয়াছে, কোথাও-বা চৈতন্যদেবেরও সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। কবি আবার ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলার আদর্শে কয়েকটি চমৎকার পদ লিখিয়াছিলেন। যথা :

কোথা কানাই গেলি রে প্রাণের ভাই।
একবার এসে দেখা দে রে প্রাণ জুড়াই॥
শোকে তোর পিতা নন্দ
কেঁদে কেঁদে হল অন্ধ
আরও সবে নিরানন্দ ধেনু গাই।

এখানে বৈষ্ণবপদাবলীর সখ্যরসের চমৎকার চিত্র পাওয়া যাইতেছে। ইসলামী রীতির গানে কবি কিন্তু পুরাপুরি ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন :

নবীর অঙ্গে জগৎ পয়দা হয়।
সেই যে আকার কি হল তার কে করে নির্ণয়॥
আবদুল্লার ঘরে বলো
সেই নবীর জন্ম হলো
মূল দেহ তার কোথায় রইল শুধাবো কোথায়॥
কিরূপে নবী জান সে
যুক্ত হয় রাগের বীজে
আব-হায়াত যার নাম লিখেছে হাওয়া নাই সেথায়॥

গৌরাঙ্গবিষয়ক গানেও তিনি নদীয়ানাগরীভাবের (লোচন দাসের ধামালির

আদর্শে) ধারা অনুসরণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুই একটি গান যেন শ্রীখণ্ডগোষ্ঠীর রচনা বলিয়া মনে হয়। যথা—

ও গৌরের প্রেম রাখিতে সামান্যে কি পারবি তোরা।
কুলশীল ত্যাগ করিয়ে হতে হবে জ্যান্তে মরা॥
থেকে থেকে গোরার হৃদয়
কত ভাব হয় গো উদয়
ভাব জেনে ভাব দিতে সদায়
জানবি কঠিন কেমন ধারা॥

দুই একটি পদের ভাবভঙ্গী লোচন দাস ও নরহরি সরকার ঠাকুরের পদের কথা মনে করাইয়া দেয়। যথা—

গোল করো না ও নাগরী, গোল করো না গো।
দেখি দেখি ঠাউরে দেখি কেমন গৌরাঙ্গ॥
সাধু কি ও যাদুকর
এসেছে এই নদে পুরী
খাটবে না হেথা জারিজুরি তাই কি ভেবেছ॥

কবি ও সাধক লালন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, রহস্যময় প্রতীক প্রভৃতির সাহায্যে যেমন বাউল সাধনার গূঢ় রহস্যের আভাস দিয়াছেন, তেমনি সাধনরসকে কাব্য-রসেও পরিবর্তিত করিয়াছেন। কবি যখন গাহেন :

বল কি সন্ধানে যাই সেখানে মনের মানুষ যেখানে।
(ওরে) আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি দিবারাতি নাই সেখানে॥
কত ধনীর ভরা যাচ্ছে মারা পড়ে নদীর তোড় তুফানে।
ভবে রসিক যারা পার হয় তারা তারাই নদীর ধারা চেনে।

আবার যখন বলেন :

চেয়ে দেখ্ না রে মন দিব্য নজরে।
চারি চাঁদ দিচ্ছে ঝলক মণিকোঠার ঘরে॥
হলে সে চাঁদের সাধন
অধর চাঁদ হয় দরশন
আবার চাঁদেতে চাঁদের আসন রেখেছে ঘিরে॥

তখন তাহার অন্তরালে বাউল সাধনার প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত থাকিলেও ইহার কাব্যরসও অতি উপাদেয় হইয়া ওঠে। যাহা হউক লালন ফকিরের বহু গানে যেমন বিশুদ্ধ কাব্যরস রক্ষিত হইয়াছে, তেমনি আবার তাহার পশ্চাতে বাউল সাধনাও সুকৌশলে মিশিয়া গিয়াছে। এই দুইটি বৈশিষ্ট্য লালনের

অধিকাংশ গানে মিলিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে এক বিচিত্র প্রতিভাধর সাধক ও কবি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

পাঞ্জ শাহ্ বাউল—লালনের মৃত্যুর পর পাঞ্জ শাহ্ বাউল অধ্যাত্ম-মার্গে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা লালনের শূন্যস্থান অনেকটা পূরণ হইয়াছিল। সারা বাঙলাদেশেই তাঁহার অসংখ্য শিষ্য (হিন্দু-মুসলমান) ছিল। তাঁহার গানগুলিও ভক্তি, অধ্যাত্মচেতনা, বাউলের গূঢ় সঙ্কেত ও কবিত্বরসে লালনের অপেক্ষা কোন দিক দিয়াই ন্যূন নহে। তাঁহার পুত্র রফিউদ্দিন খোন্দকার শিক্ষিত ব্যক্তি; তিনি পিতার জীবনী, গান প্রভৃতি সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায়, ১২৫৮ সনের শ্রাবণ মাসে (১৮৫১) ফকির পাঞ্জ শাহ্ যশোহর জেলার শৈল-কুপা গ্রামে প্রসিদ্ধ মুসলমান বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম খাদেম আলি খোন্দকার। বিরোধী ব্যক্তিদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া খাদেম আলি যশোহর জেলার আর একখানি গ্রাম হরিশপুরে উঠিয়া আসেন এবং এখানে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের সাহায্যে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ইসলামী আচার বিচার পালন করিতেন, এবং ইসলামী 'তমদ্দুন' ভালোভাবে আয়ত্ত করিবার জন্য পুত্র পাঞ্জকে শুধু আরবী-ফারসী-উর্দু ভাষা শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু পাঞ্জ বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগবশতঃ গোপনে বাংলাভাষাও শিক্ষা করেন। হরিশপুর গ্রামে অনেক হিন্দু মুসলমান বাউল-সাধক বাস করিতেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ লালনের শিষ্য ছিলেন, কেহ-বা সূফী সাধনা করিতেন। বৈষ্ণব সাধক ও হিন্দু বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ গ্রামের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পাঞ্জ শাহ্ বাল্য হইতেই পিতাকে লুকাইয়া এই সমস্ত ফকির সাধু-সন্তদের সঙ্গ করিতেন। কিন্তু পিতা জানিতে পারিলে তাঁহাকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত করিতেন।

১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে পিতার লোকান্তর হইলে পাঞ্জ শাহ্ যথারীতি খেলাফত অর্থাৎ ফকিরের বৈরাগ্যবস্ত্র ধারণ করিয়া সাধনভজনে প্রবৃত্ত হন। ইতিপূর্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল—তিনি সাধনায় লিপ্ত হইলেও গৃহধর্মকে অবহেলা করেন নাই। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি হরিশপুরের এক সূফীসাধক হেরাজ-তুল্লা খোন্দকারের নিকট দীক্ষিত হন। অতঃপর তাঁহার মহৎ চরিত্র ও

অধ্যাত্ম শক্তির কথা চারিদিকে প্রচার লাভ করে, এবং তাঁহার বয়স যখন ৩৩-৩৪, তখনই তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বাড়িতে আরম্ভ করে। তিনি 'ইস্কি ছাদেকী সহর' নামে একখানি সূফীসাধনার পুস্তক মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বেই তিনি সূফী ও বাউলসাধনা সম্পর্কিত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গান লিখিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে সেগুলি তাঁহার শিষ্যদের দ্বারা দূর-দূরান্তরে প্রচারিত হয়। গানগুলির ভাব,ভাষা ও তাৎপর্য লালন ফকিরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সমস্ত গান এখনও আউল-বাউল-ফকির সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে।

পাঞ্জ শাহ্ ইসলামী শাস্ত্রে অতিশয় অভিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে শাস্ত্রের বিধিনিষেধ অপেক্ষা অন্তরের বাণীর অধিক মূল্য দিতেন বলিয়া "কাঠমোল্লাদের কাছে ইনি 'নাড়ার ফকির' বলিয়া উপেক্ষিত হন।"[৮৭] কবি কোন নিন্দা গ্রাহ্য করিতেন না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অতিশয় সাত্ত্বিক-ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রথম বয়স হইতেই তিনি আমিষ আহার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তামাকু ব্যতীত তাঁহার আর কোন ব্যাপারে কোনও প্রকার আসক্তি ছিল না, শেষ জীবনে তিনি তাহাও ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ আচার ব্যবহার ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির জন্য সাধারণ মুসলমানগণ তাঁহাকে হিন্দু বৈরাগী বলিয়াই মনে করিত।[৮৮] তিনি অধিকাংশ সময় সাধনভজন লইয়া থাকিতেন, অবসর সময়ে সাধুসজ্জন দীন-দরিদ্রের সেবা করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেন। ১৯১৪ সালে পাঞ্জ শাহ্ সাধনোচিতধামে প্রস্থান করেন। তাঁহার কয়েকটি গান বাংলা বাউল সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। আমরা লালনগীতিকার উচ্চ কাব্যধর্ম সম্বন্ধে অবহিত, কিন্তু পাঞ্জ শাহের গান যে লালন হইতে কোন দিক দিয়াই নিকৃষ্ট নহে, বরং রচনার দিক হইতে অধিকতর পরিপক্ক ও

---

৮৭ ডঃ ভট্টাচার্যের গ্রন্থে মুদ্রিত কবিপুত্র খোন্দকার রফি উদ্দিনের বিবরণী দ্রষ্টব্য। ('বাংলার বাউল ও বাউল গান', ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫)

৮৮ কবি বোধ হয় তথাকথিত 'কাঠমোল্লা'দের দ্বারা উত্যক্ত হইয়াই লিখিয়াছিলেন—

জেতের বড়াই কি।
ইহকাল পরকালে জেতের বড়াই কি।
আমার মন বলে, অগ্নি জেলে দিই জেতের মুখি।

কাব্যগুণান্বিত তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাঁহার এই পদটির মতো উচ্চশ্রেণীর বাউল পদ বাংলা সাহিত্যে বড় বেশী নাই :

শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে তারে পাবি ওরে মন-পাগেলা।
যে ভাবে আল্লাতালা বিষম লীলা ত্রিজগতে করছে খেলা॥
কত জনে জপে মালা তুলসী তলা,
হাতে ঝোলে মালার ঝোলা,
আর কত জন হরি বলে মারে তালি, নেচে গেয়ে হয় মাতেলা॥
কত জন হয় উদাসী তীর্থবাসী মক্কাতে দিয়াছে মেলা।
কেউবা মসজিদে বসে তার উদ্দেশে সদায় করে আল্লা আল্লা॥
স্বরূপে মানুষ মিশে স্বরূপদেশে খোবায় কালায় নিত্যলীলা।
স্বরূপের ভাবনা জেনে চামর কিনে হচ্ছে কত গাজীর চেলা॥

কবি কখনও কখনও আকুল হৃদয়ে তাঁহার 'সাঁই-কে ডাক দিয়া বলিয়াছেন :

আমারে দেও চরণতরী।
তোমার নামের জোরে পাষাণ গলে অপারের কাণ্ডারী॥

কখনও-বা আর্তনাদ করিয়াছেন :

গুরু দয়া কর মোরে গো, বেলা ডুবে এল।
তোমার চরণ পাবার আশে রইলাম বসে, সময় বয়ে গেল॥

কখনও বাউলসাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব রূপকের ছলে বলিয়াছেন :

ত্রিবেণীর তীরে ধারে সুধারে জোয়ার আসে।
সুখসাগরে মানুষ খেলে বেহাল বেশে॥
উথলে সুধাসিন্ধু
সু-ধারে সুধার বিন্দু
সুখময় সিন্ধুজলে ছলে ছলে সাঁতার খেলে।
জীব নিস্তারিতে জোয়ার এসে অধর মানুষ যায় গো ভেসে॥

এই সমস্ত পদে বাউল সাধনাবিষয়ক গূঢ় সঙ্কেত আছে বটে, কিন্তু তাহার অতিরিক্ত একটা স্নিগ্ধ গীতিমাধুর্য এই তত্ত্বকথাকে শিল্পরূপ দান করিয়াছে। কবির অসাম্প্রদায়িক মন আশ্চর্য ঔদার্য অবলম্বন করিয়া গাহিয়াছে :

দয়া কর নিমাইরূপী,
আর আছে হজরত নবী,
নিমাই-হজরত একে ভিন্ন ছবি সাঁই একা একেশ্বর॥[৮৯]

৮৯ পাঞ্জু শাহের গানগুলি ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্কলন হইতে গৃহীত।

সব দিক দিয়া বিচার করিলে ফকির পাঞ্জ শাহ্‌কে লালন ফকিরের পার্শ্বেই স্থান দিতে হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে এদেশে বহু হিন্দু-মুসলমান বাউল-সাধকের আবির্ভাব হইয়াছে, ইঁহাদের গীতাবলী বাউল ও ফকিরের আখড়ায় এখনও প্রচলিত আছে। হাউড়ে গোঁসাই (ব্রাহ্মণ), গোঁসাই গোপাল (ব্রাহ্মণ), চণ্ডীদাস গোঁসাই (নবদ্বীপের নমঃশূদ্র), এরফান শাহ, মদন বাউল প্রভৃতি অনেক বাউলকবি উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে অনেক উৎকৃষ্ট বাউলগান লিখিয়াছিলেন। হাউড়ে গোঁসাই, গোঁসাই গোপাল প্রভৃতি আধুনিক যুগের বাউলগণ উচ্চশিক্ষিত, হিন্দুর যোগতন্ত্রাদিতে অতিশয় অভিজ্ঞ—অনেক আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি ইঁহাদের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। অজ্ঞাতনামা বাউলও কিছু কিছু উৎকৃষ্ট গান লিখিয়া গিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ এইরূপ একটি গানের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইতেছে:

তত্ত্ব করে আঁধার ঘরে সে ধন কি যায় রে চেনা।
আঁধারে খুঁজলে পরে পড়বি ফেরে, সে ধন হাতে আর পাবে না॥
যেখানে আছে সে ধন মাণিক রতন, যতন বিনা যায় কি জানা।
জ্বালায়ে মনের বাতি তড়িৎভাতি চিনে নে রাঙ কি সোনা॥

বাউল গানের ধারা গ্রামাঞ্চলে বৈষ্ণব বৈরাগীর আখড়ায় ও ফকির-মুর্শিদের আস্তানায় এখনও বহমান। তবে আধুনিক ভাবধারার স্রোতে এই বিচিত্র ধর্মসাধনা ও সাধনসঙ্গীত কতদিন অটুট থাকিবে বলা যায় না। কারণ ইতিমধ্যেই এই সাধনার মন্ত্রগুপ্তি চলিয়া গিয়াছে। গবেষকগণ এই সমস্ত লোকযান, লোকসাহিত্য, গূঢ়াচারী সাধনপ্রণালী লইয়া যেরূপ সতর্ক অনুসন্ধান শুরু করিয়াছেন, তাহাতে ক্ষুদ্র উপদল ও ব্যক্তিগত রহস্যময় সাধনার রহস্য ঘুচিয়া গিয়া ক্রমেই প্রকাশ্য সভার আলোচনার বস্তু হইয়া উঠিবে। সে যাহা হউক, বাউলগান আধুনিক কালে লিখিত হইলেও ইহা যে অষ্টাদশ শতাব্দীর অবশেষ তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এই জন্য আমরা মধ্যযুগীয় সাহিত্যশাখার শেষ পর্বে ইহার স্থান নির্দেশ করিয়াছি।

৩

গাথা সাহিত্য

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের উপসংহার প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমরা বর্তমান আলোচনা সমাপ্ত করিব। ইতিপূর্বে আমরা মধ্য-যুগের সাহিত্য আলোচনা কালে দেখিয়াছি, অলৌকিকতা ও দেবদেবীর প্রাধান্য পুরাতন বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। লৌকিক জীবন, স্থানীয় পরিবেশ, ঐতিহাসিক ঘটনা—মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকায় এই প্রভাব কার্যকরী হইলেও কবিগণ দেবায়তনের বাতায়ন হইতেই কাব্য-সাহিত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পাঠক ও শ্রোতারাও সেই মানসিক পরিবেশের মধ্যে বর্ধিত হইয়া কাব্যে দেবদেবীর কথাই শুনিতে চাহিত। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্বিপাকের মধ্যে পড়িয়াও বাঙালী পাঠক দৈবকৃপাকেই ত্রাণকর্তা বলিয়া মনে করিত। মঙ্গলকাব্যাদিতে বাস্তব বাঙলাদেশের স্থানকালের প্রভাব থাকিলেও তাহা হইতে দেবপ্রাধান্য লোপ পায় নাই, বরং বর্ধিতই হইয়াছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক কারণে জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমেই মাটির প্রতি নিবদ্ধ হইল। ঢাকা, রাজমহল, মুর্শিদাবাদে নাগরিক সভ্যতার পত্তন হইলে বিলাসকলাকুশল ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতিও সাধারণ বাঙালী হিন্দু আকৃষ্ট হইল, উপরন্তু পাশ্চাত্য বণিকদের নিত্য যাতায়াত ও বিকিকিনির ফলে স্থানীয় জন-সাধারণের দৃষ্টি ক্রমেই দূরে-দূরান্তরে প্রসারিত হইতে লাগিল—এবং সেই নূতন দৃষ্টিভঙ্গিমা ও যুগের অস্পষ্ট চিহ্ন এই-সময়ে-রচিত কয়েকটি পুঁথি-পাঁচালীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ হইতেই বাঙলাদেশে লৌকিক জীবন ও তাহার সমস্যা লইয়া দুই চারিটি পুঁথি রচিত হইয়াছে—যাহার বিশেষ কোন কাব্যমূল্য না থাকিলেও বাংলা সাহিত্যের দিক্‌নির্দেশক হিসাবে তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। অবশ্য এই শতাব্দীতেও দেবদেবী ও পীর মাহাত্ম্যবিষয়ক প্রচুর পুঁথি রচিত হইয়াছে। যোগাদ্যা দেবীর বন্দনা, তারকেশ্বর বন্দনা, জগন্নাথ বন্দনা, শিববন্দনা প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবী-সংক্রান্ত বন্দনাগানের দুই-চারি পাত্‌ড়ার যে সমস্ত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা এতই অকিঞ্চিৎকর

যে, সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার উল্লেখ না করিলেও চলে। কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কিছু কিছু পুঁথিও রচিত হইয়াছিল—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত তাহার জের চলিয়াছিল, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত ও মঙ্গলকাব্যের নীরস পুনরাবৃত্তিও নিতান্ত মন্দ হয় নাই। কিন্তু তাহাতে শুধু পুঁথির জঞ্জাল বাড়িয়াছে, সাহিত্যের কোন দিক দিয়াই লাভ হয় নাই। অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের বিষয় লইয়া যে কয়টি পুঁথি রচিত হইয়াছে, যে সমস্ত ঘটনা অবলম্বনে লোকমুখে ছড়া পাঁচালী-পালাগান প্রচলিত হইয়াছে তাহার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য তুচ্ছ করা যায় না।

√লৌকিক ও ঐতিহাসিক ছড়াপাঁচালী ॥

হিন্দী-গুজরাটী-মারাঠী প্রভৃতি সাহিত্যের মধ্যযুগীয় পর্বে লৌকিক জীবন, বীররসাত্মক যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি লইয়া অনেক কাহিনীকাব্য রচিত হইলেও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস চেতনা বাঙালী কবিকে বিশেষ প্রভাবিত বা প্রবুদ্ধ করে নাই, তাহা আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে স্থানীয় ঘটনাকাহিনী জনসাধারণের মনকে যে উত্তেজিত করিতেছিল, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, সামাজিক শিথিলতা, নানা-প্রকার আধিভৌতিক দুর্যোগের আঘাতে যে জনমানস সাড়া দিয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের যে সম্পূর্ণ নূতন দিকে পরিবর্তন হইল, তাহার আভাস অষ্টাদশ শতাব্দীর লৌকিক ছড়াপাঁচালীতে লক্ষ্য করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের মূল প্রেরণা—মানবতন্ত্রবাদ, এবং লৌকিকতাই সেই মানবতন্ত্রবাদের নিয়ামক শক্তি। সেই লৌকিকতার অর্থ—ইহলোক, বাস্তব পরিবেশ ও পার্থিব সুখদুঃখ সম্বন্ধে কবিদের সচেতন উপলব্ধি। পুরাতন ধারার শেষ সক্ষম কবিদ্বয় রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে সেই বাস্তব চিত্র উঁকি দিলেও তাঁহারা ভাগবত সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া লোকজীবনের মধ্যে পুরাপুরি অবতীর্ণ হইতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্রের রচনাভঙ্গিমা ও মনোভাবের মধ্যে পরিবেশ-চেতনা ও বাস্তববোধ অতি তীক্ষ্ণ হইলেও তিনি পুরাদস্তুর মানবরসের কবি নহেন। মঙ্গলকাব্য, শাক্ত পদাবলী, বাউল

দেবচরিত্রে মানবীয়তা প্রভৃতি আধুনিক কালের কিছু কিছু লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বাউল গায়ক—ইঁহাদের মনের সূত্র মধ্যযুগের ভাবাদর্শের সঙ্গেই গ্রন্থিবদ্ধ। তবে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য ইঁহাদের মনোভঙ্গিমা ও রচনাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে লোকজীবনের সংস্পর্শ ঘটিয়াছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্থানীয় ঘটনা অবলম্বনে যে সমস্ত ছড়াপাঁচালী ধরনের রচনা লোকের মুখে মুখে ফিরিয়াছে, তাহার মূল লোকজীবনেই প্রোথিত। এগুলির বিশেষ কোন কাব্যমূল্য নাই, অনেক ছড়াপাঁচালী নিতান্ত স্থানীয় ব্যাপার হইয়া রহিয়াছে, ক্ষুদ্র গ্রামের সীমা ইহারা কদাচিৎ পার হইতে পারিয়াছে। কোন কোনটি আবার শুধু মৌখিক আকারেই বাঁচিয়া আছে, লেখার মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। তথাপি এই সমস্ত পুঁথিপত্র হইতে বুঝা যাইতেছে, পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যে বাস্তব জীবন ও লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রধান হইয়া উঠিবে। এখানে এইরূপ দুই একটা ছড়াপাঁচালীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

ঐতিহাসিক ছড়া—অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রসঙ্কট ও সমাজ বিশৃঙ্খলা, রাজসভাজীবী বিলাসী নাগরিকতা, অর্থনৈতিক শোষণ, বিদেশী বণিকের শনৈঃ শনৈঃ অনুপ্রবেশ প্রভৃতি কারণের ফলে বাস্তব ব্যাপারে উদাসীন জনচিত্তে সর্বপ্রথম ইতিহাসের ঘটনাবলীর প্রভাব সূচিত হয়। ইতিপূর্বে তখ্‌ত্‌ লইয়া পাঠানে-মুঘলে হানাহানি চলিতে থাকিলেও সাধারণ লোকে তাহার দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয় নাই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল-শাসনের দুর্বলতা, বাঙলার মসনদ লইয়া বিশৃঙ্খলা, বর্গীর হাঙ্গামা, মুর্শিদাবাদ নবাববংশের অধঃপতন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাধান্য বিস্তার, দুর্ভিক্ষ, অনাচার, সামন্ততন্ত্রের ভঙ্গুর অবস্থা জনসাধারণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। ফলে সাহিত্যেও তাহার কিঞ্চিৎ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, ঐতিহাসিক সঙ্কটের বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে রায়গুণাকরও অবহিত ছিলেন। তাঁহার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে অল্পস্বল্প ঐতিহাসিক বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার

করিতে পারে নাই। দুই একটি বৈষ্ণবগ্রন্থ[৯০], মঙ্গলকাব্য[৯১], অনুবাদ সাহিত্য[৯২], নানা ছড়াপাঁচালী[৯৩], ইসলামী কাব্যাদি[৯৪] এবং ত্রিপুরা-রাজবংশমালায় সমকালীন রাজবংশ ও স্থানীয় ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে শায়েস্তা খাঁয়ের অত্যাচার সংক্রান্ত 'মদনের গান' মদনপালার পুঁথিটি উল্লেখযোগ্য।

উল্লিখিত 'মদনের গান' পুঁথিটির রচনাকারের নাম পাওয়া যায় না। তবে কাব্যারম্ভে 'শ্রীশ্রীখোদা'র উল্লেখ আছে বলিয়া ইহা কোন মুসলমান কবির রচনা মনে হইতেছে। চব্বিশপরগণার জমিদার মেদনমল্ল বাকি খাজনার দায়ে শায়েস্তা খাঁযের দ্বারা উৎপীড়িত হইলে বড় খাঁ গাজী পীরের কৃপায় উদ্ধার পান—ইহাই সংক্ষিপ্ত ঘটনা। বলা বাহুল্য ইহা মুসলমান সমাজে প্রচলিত পীরমাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্য। কিন্তু ইহাতে মুসলমান কবি মুসলমান সুবাদার শায়েস্তা খাঁয়ের হিন্দু জমিদার দলনের নির্মম ঘটনা বর্ণনায় সঙ্কুচিত হন নাই। লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ছড়াপাঁচালীতে বিশেষ কোন কাব্যগুণ না থাকিলেও ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে ইহার

---

৯০ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আছে, চৈতন্যের পূর্বপুরুষ রাজা ভ্রমরের ভয়ে উড়িষ্যা ত্যাগ করিয়া শ্রীহট্টে পলায়ন করেন। অবশ্য এই তথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। গোপীজন বল্লভের 'রসিকমঙ্গলে' (১৬৫২ খ্রীঃ অব্দের পরে রচিত) জমিদারদের প্রতি মেদিনীপুরের শাসক আহম্মদী বেগের অত্যাচারের বর্ণনা আছে।

৯১ মুকুন্দরামের আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে মুঘল পাঠানের বিরোধের ঐতিহাসিক চিত্র অ নিপুণতার সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। ধর্মমঙ্গলেও নানা প্রকার স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলা উল্লেখ আছে।

৯২ শ্রীকরনন্দীর মহাভারতে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছুটি খাঁয়ের সঙ্গে ত্রিপুরাধিপতির যু কথা আছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে, ছুটি খাঁয়ের ভয়ে ত্রিপুরাধিপ "পর্বতগহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ।" অবশ্য ছুটি খাঁয়ের সভা কবির এই বর্ণনা কতদূর সত্য তাহা চিন্তার বিষয়।

৯৩ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত 'মদনপালা' শীর্ষক ছড়াগানে (পুঁথি—৯৩৪) শায়েস্তা খাঁ কর্তৃক জমিদারদের উপর অকথ্য অত্যাচারের কথা আছে।

৯৪ নিজ জীবনকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে 'পদ্মাবতী'র কবি সৈয়দ আলাওল কিছু কিছু স্থানীয় ঐতিহাসিক তথ্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন, বিশেষতঃ পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারের কাহিনী উল্লেখযোগ্য। মহম্মদ খাঁয়ের 'মুক্তাল হোসেনে' (১৭শ শতাব্দী) চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নাতুর খাঁ কর্তৃক ত্রিপুররাজের পরাজয়ের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

কিছু মূল্য আছে। শায়েস্তা খাঁ জমিদারদের বাকি খাজনার দায়ে কিরূপ শাস্তি দিতেন তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা :

কারে কারে ইটের উপরে করে রেখেছে খাড়া।
চাবুকের চোটে কার পোস্ত দিচ্ছে নাড়াচাড়া॥
কারু কারু ফেলে রেখেছে সিংহমাছের গড়ি।
পিষ্ট তুলে মারে জোড়া বেতের বাড়ি॥
* * * *
তামাক খেয়ে শুল কারু ছাপ খচ্ছে গায়।
লঙ্কামরিচের ধোঁয়া কারু নাকে দেয়॥

শায়েস্তা খাঁয়ের অত্যাচার কোন কোন লোককবিকে ছড়াপাঁচালী রচনায় উদ্বুদ্ধ করিলেও ইহার বিশেষ কোন কাব্যমূল্য নাই। এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি ঐতিহাসিক ছড়াপাঁচালীর উল্লেখ করা যায়। গিরিয়ার প্রান্তরে সরফরাজ ও আলিবর্দির সংঘর্ষ, পলাশীতে সিরাজের পতন এবং মিরকাশিমের সঙ্গে ইংরাজের মনান্তর ও যুদ্ধাদি সম্পর্কেও অনেক অখ্যাতনামা কবি মুখে মুখে ছড়া রচনা করিয়াছিলেন। লোকসাহিত্য ও স্থানীয় ইতিহাসের উপাদান হিসাবে তাহার কিছু মূল্য আছে। নিম্নে এইরূপ কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

গিরিয়ার প্রান্তরে সরফরাজ ও আলিবর্দির যুদ্ধ :

সহর কইতে নবাব হইল বাহির সহর করে খালি।
দিনে দিনে সোণার বরণ হয়ে গেল কালি॥
মারামারি লেগে গেল গিরিয়ার ময়দানে।
কান্দে বাঙ্গালার সুবাদার হাপুস নয়নে॥
পুবেতে করিল মানা জাফর খাঁ নানা।
ভালমন্দ হলে নবাব সহর ছেড না॥
* * *
পড়িল নবাবের তাম্বু ব্রাহ্মণীর স্থানে।
আলবর্দির তাম্বু পড়ে গিরিয়ার ময়দানে॥

কোন এক ছড়াকার মীরকাশিমের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংঘর্ষেরও বর্ণনা করিয়াছিলেন :

বাঙ্গালামুখী করে পানসী ভরে দেখতে লাগে ভালো।
সাজিল তেলেঙ্গা গোরা কুর্তিলালে লাল॥

শোন শোন একভাবে কাব্যরসের কথা।
নবাব লুঠিল কুঠী সহর কলকাতা" ২৫
সামনে গুলকি গেড়ে ধরল তেড়ে যত তেলেঙ্গা গোরা।
লড়াই দিতে পালিয়ে গেলে মামুদ তকীর ঘোড়া॥
ফিরিল মামুদ তকী তাহা দেখি দাঁতে কাটে ঘাস। ২৬
বাবুজান একটি চাকর তেবা নফর গায়ে ভরা মাস॥

কিন্তু রচনার আন্তরিকতায় পলাশীর যুদ্ধ এবং সিরাজের অন্তিম পরিণাম বর্ণনা বাস্তবিক প্রশংসার যোগ্য :

কি হল রে জান।
পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল প্রাণ॥
তির পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে রথে।
একলা মীরমদন সাহেব কত নিবে সাথে॥
* * * *
নবাব কান্দে সিপাই কান্দে আর কান্দে হাতী
কলকেতায় বসে কান্দে মোহনলালের পুতি॥
দুধে ধোয়া কোম্পানির উড়িল নিশান।
মীরজাফরের দাগাবাজিতে গেল নবাবের প্রাণ॥
ফুলবাগে মল্লো নবাব খোসবাগে মাটি।
চান্দোয়া খাটায়ে কান্দে মোহনলালের বেটী॥ ২৭

এই ছড়ায় দেখা যাইতেছে মীরজাফরের 'দাগাবাজিতে' সিরাজ পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন তাহা ছড়াকার জানেন। তবে 'মোহনলালের বেটী' সিরাজের উপপত্নীস্বরূপ ছিল কিনা জানা যায় না। লোকমুখে প্রচারিত নানারূপ অতিরঞ্জিত ঘটনা ছড়াতে স্থান পাইয়াছে। এই ছড়াটির সরল সহজ সুরের মধ্যে যে করুণরসের স্পর্শ রহিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ কাব্যমূল্য স্বীকার করিতে হইবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমসাময়িক ঐতিহাসিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক

২৫ মীরকাশিম কলিকাতা লুঠেন নাই, সিরাজ লুঠ করিয়াছিলেন। ছড়াকার ভ্রমবশতঃ মীরকাশিমের উপর তাহা আরোপ করিয়াছেন।

২৬ এখানে বীরভূমের নিকট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত মীরকাশিমের সেনাপতি মহম্মদ তকি খাঁয়ের যুদ্ধের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

২৭ এই ছড়াগুলি সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (১৩১২, ১ম সংখ্যা) প্রকাশিত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্যের 'নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা' হইতে গৃহীত হইয়াছে।

দুর্যোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু ছড়াপাঁচালী, পুঁথিপুস্তিকা রচিত হইয়া এখানে ...হার বিশেষ কোন কাব্যমূল্য না থাকিলেও সমসাময়িক জীবনের ...হিসাবে সেগুলি মূল্যবান। যেমন বিজয় রাম সেন বিশারদের 'তীর্থম...ছু কিছু ১৭৬৮-৬৯ সালে খিদিরপুরের ভূস্বামী কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল নৌকাযোগে ...ছু শাহ... যাত্রা করিলে ভাজনঘাট নিবাসী কবিরাজ বিজয়রাম সেন তাঁহার সঙ্গী বাঙালী কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে কবিরাজ মহাশয় তীর্থযাত্রার যে বিবরণ লি...ও সালে করেন তাহাই 'তীর্থমঙ্গল' (নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত)। কাব্যটি ...ছলেন। খ্রীঃ অব্দে সম্পূর্ণ হয়।[৯৮] কবি তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে বহু গ্রামজনপদ, লোক...ব্যবহার তীর্থমাহাত্ম্য, রাজনৈতিক জীবন, পথঘাটের যে সমস্ত বর্ণনা দিয়াছেন সমসাময়িক চিত্র হিসাবে তাহার ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। পরবর্তীকালে রচিত জয়নারায়ণ ঘোষালের 'কাশীপরিক্রমা'য় কাশীধামের অনেক বিবরণ আছে। এই ধারা পরবর্তী শতাব্দীতেও অনুসৃত হইয়াছিল। 'বরদামঙ্গলকাব্য', 'গোঁসানীমঙ্গল কাব্য' প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোককাব্যে সমসাময়িক অনেক ঘটনার বর্ণনা আছে। দামোদর ও ময়ূরাক্ষীর বন্যা, সাঁওতাল বিদ্রোহ, দুর্ভিক্ষ, ঘূর্ণিবাত্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে অনেক ছোটখাট ছড়াপাঁচালী রচিত হইয়াছিল—যাহার কাব্য-মূল্য না থাকিলেও সমসাময়িক ঘটনা হিসাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত ছড়ার অধিকাংশই উনবিংশ শতাব্দীর রচনা। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর ...না হইলেও এগুলি গ্রামীণ সংস্কৃতি হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে বলিয়া এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা যাইতেছে।

১২৬২ সালে বীরভূমে সাঁওতাল বিদ্রোহ উপলক্ষে রচিত এই ছড়াটি উল্লেখযোগ্য :

> শুন ভাই বলি তাই সভাজনের কাছে।
> সুভবাবুর[৯৯] হুকুম পেযে সাঁওতাল জুটেছে॥
> বেটাবা কোক চড়িল জড় হইল হাজার হাজার।
> কখন এসে কখন লোটে থাকা হল ভার॥

---

৯৮ এইভাবে কবিরাজ মহাশয় কাব্যরচনার সন তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন :

> সাতাত্তরি সনেতে আর ভাদ্র মাসে।
> বিশারদে কহে পুথি কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে॥

৯৯ বিদ্রোহী সাঁওতালদের নেতা।

হল সব দুর্ভাবনা রাম কান্দনা সবাই ভাবে বসে।
ঘড়া ঘটি মাটিতে পোঁতে কখন লিবে এসে॥
বলে ভাই রাখব কোথা হেথা সেথা এই কথা শুনি।
বাখতে মুলুক সলা স্থলুক ভাবতেছে কোম্পানি॥
বেটাদেব শক্তি শুনে প্রজাগণে কৈছে ধীরে ধীরে।
জিনিষ ছেড়ে পালাও না ভাই সবাই থাক ঘরে॥[১০০]

কিন্তু রচ
বর্ণনা বাস্ত

সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ উপলক্ষে রাইকৃষ্ণদাস এই ছড়া রচনা করেন। ত সাঁওতালদিগকে অত্যাচারী রূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। রতিরাম দাস নামে এক রাজবংশী কবি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে 'জাগগান' শীর্ষক যে ছড়া লিখিয়াছিলেন তাহাতে এই ব্যাপারের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইজারাদার দেবীসিংহের অত্যাচার, রংপুরের কালেকটার গুডল্যাড সাহেব কর্তৃক তাঁহাকে অন্যায়ভাবে রক্ষা, দেবীসিংহের বিরুদ্ধে স্থানীয় জমিদারদের উত্থান প্রভৃতি ঘটনা কবি অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। ইজারাদারের অত্যাচারে প্রজাদের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে :

রাইযৎ প্রজারা সবে থাকে খাড়া হইয়া।
হাত জুড়ি চক্ষু জলে বক্ষ ভাসাইয়া॥
পেটে নাই অন্ন তাদের পৈরানে নাই বাস।
চাষে ঢাকা হাড় কয়খানা করি উপবাস॥[১]

এই ঘটনায় দেখা যাইতেছে স্থানীয় জমিদার ও প্রজারা সমবেতভাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং অন্যায়ের প্রতিকার করিতে কথঞ্চিৎ সমর্থ হইয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বর্ধমানের রাজকুমার প্রতাপচাঁদকে কেন্দ্র করিয়া পারিবারিক চক্রান্তের ফলে জাল প্রতাপচাঁদের মামলা হয় : আইনে অপরাধী সাব্যস্ত প্রতাপচাঁদ কীভাবে সর্বত্র ধর্মগুরুরূপে পূজা লাভ করেন তাহা লইয়া বর্ধমান অঞ্চলে অনেক ছড়া-

১০০ বীরভূমি, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শিবরতন মিত্র সংগৃহীত ছড়া)

১ রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা, ১৩১৭

পাঁচালী রচিত হইয়াছিল। তবে তাহা পরবর্তী কালের রচনা বলিয়া এখানে শুধু তাহার উল্লেখ করা হইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের অত্যাচার লইয়া কিছু কিছু ছড়া পাঁচালী রচিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ মজনু শাহ্ নামে উত্তর প্রদেশের এক ফকির বাঙলায় আসিয়া দলবল জুটাইয়া বাঙালী হিন্দুর উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছিল। সেই ঘটনা লইয়া ১৮১৩ সালে পঞ্চানন দাস 'মজনুর কবিতা' নামক এক দীর্ঘ ছড়া রচনা করিয়াছিলেন। এই ফকির সামরিক কায়দায় ঘোরাফেরা করিত, যথেচ্ছা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিত—অত্যাচারটা হিন্দুর উপরেই বেশী হইত, হিন্দুনারী হরণে তাহার অনুচরবর্গে বড়ই প্রীতি ছিল। ইহারা বুরহানা সম্প্রদায়ের মাদারী শ্রেণীভুক্ত মুসলমান। ইহাদের আক্রমণ পদ্ধতি কতকটা এইরূপ ছিল—হিন্দুর গ্রামে গিয়া ইহারা বন্দুকের আওয়াজ করিত, তাহা শুনিয়া ভয়ে হিন্দুগণ গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গেলে তাহারা নিশ্চিন্তমনে রহিয়া বসিয়া গ্রাম লুঠ করিত। ১৭৬০ হইতে ১৭৬৮ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত মজনু শাহ্ ও তাহার দলবল সারা বাঙলাদেশে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাইয়াছিল। ১৭৮৬ সালে বগুড়ার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিপাহীদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে ফকির পরাজিত হইয়া কানপুরের অন্তর্গত মাখনপুর গ্রামে (তাহাদের প্রধান আড্ডা) পলাইয়া যায়। সেখানে ১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দে ফকির সাহেবের মৃত্যু হয়। হিন্দু ছড়াকার এই ফকিরকে অপভাষায় নিন্দা করিয়া ছড়া বাঁধিয়াছিলেন :

> শুন সভে একভাবে নোতুন বচনা।
> বাঙ্গালা নাশের হেতু মজনু বাবণা॥
> কালান্তক সম বেটাকে কে বলে ফকিব।
> যাব ভয়ে বাজা কাঁপে প্রজা নহে স্থিব॥

মজনু ফকির সাহেব-সুবার মতই জাঁকজমকের সহিত চলিত ("সাহেব সুভার মত চলন সুঠাম"), ঘোড়ায় চড়িয়া যখন সে সদলবলে যাইত তখন তাহাকে 'মরদ গাজি' বলিয়াই মনে হইত :

> চৌদিকে ঘোড়ার সাজ তীর বরকন্দাজি।
> মজনু তাজির পর যেন মরদ গাজি॥

মৃত্যুর পর এই অত্যাচারী ব্যক্তিকে তাহার শিষ্যের দল অতি শ্রদ্ধাসহকারে

কবরস্থ করে।[২] তাহার অত্যাচার-সংক্রান্ত এই ছড়াতে এই যুগের তরল রাষ্ট্র ব্যবস্থার চিত্র ধরা পড়িয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে চব্বিশ পরগণা-যশোহর-নদীয়া জেলায় তিতুমীরের অত্যাচার সংক্রান্ত দুই চারিটি ছড়া রচিত হইয়াছিল। ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে চব্বিশ পরগণার হায়দারপুর গ্রামে তিতুমীরের জন্ম হয়। তিতু প্রথম জীবনে দুর্দান্ত লাঠিয়াল ছিল, গুণ্ডামির অপরাধে তাহার কয়েকমাস 'শ্রীঘর' বাসও হইয়াছিল। তাহার পরে মক্কায় তীর্থ করিতে গিয়া তিতু আরবের 'ওয়াহবি' সম্প্রদায়ের নেতা সৈয়দ আহমদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সারা দুনিয়ায় ধর্মযুদ্ধের দ্বারা পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচার এই ধর্মান্ধ উপ-সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র হইল। ১৮২৯ সালে মক্কা হইতে ফিরিয়া তিতু ঐ মত প্রচার করিতে থাকে, অনেক নিম্নশ্রেণীর মুসলমান তাহার সম্প্রদায়ে যোগ দেয়, ক্রমে তাহার বিশেষ শক্তিবৃদ্ধি হয়। সে হিন্দু এবং তাহার মতে অবিশ্বাসী মুসলমানদের প্রতিও অত্যাচার শুরু করে। তাহার নির্দেশে তাহার শিষ্যেরা একটা বিশেষ মাপের দাড়ি রাখিত, মাথার মধ্যস্থল কামাইয়া ফেলিত। পুঁড়া-খোড়গাছি গ্রামের হিন্দু জমিদার ইহাদের শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত ও বিরক্ত হইয়া প্রত্যেকের দাড়ি পিছু আড়াই টাকা কর ধার্য করেন। এই কর আদায় করিতে গিয়া তাঁহার লোকজনের সঙ্গে তিতুমীরের ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। তিতু নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে বাঁশ পুতিয়া কেল্লা বানাইয়া তাহার মধ্যে তাহার দলবলকে আশ্রয় দেয়। এক ফকিরের নির্দেশেই সে চালিত হইত। যাহা হউক নদীয়া ও বারাসতে তাহার অত্যাচার চূড়ান্তরূপ ধারণ করে, তাহার এক অনুচর প্রবল প্রতাপশালী জমিদার দেবনাথ রায়ের মাথা কাটিয়া লয়, দারোগাকে হত্যা করে—নীলকুঠির সাহেব কুঠিয়াল কোনও প্রকারে পলাইয়া গিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। কলিকাতা হইতে প্রথম দিকে যে সৈন্য ও অধিনায়ক প্রেরিত হন, তাঁহারাও তিতুর কাছে পরাভূত

---

২ "Mainu Shah died in March or May, 1787 (according to different report) at Makhanpur and his remains were carried to a famous burial place in the country of Mewaat lying to the southwards of Dholly."—J.M. Ghosh—*Sannyasi Fakir Raiders in Bengal* (সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইতিহাসাশ্রিত বাংলা' কাব্য হইতে উদ্ধৃত।

ও বন্দী হন, তাঁহাদের কেহ কেহ তিতুর হাতেই মারা পড়েন। গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিকের আদেশে প্রেরিত নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটও যখন প্রাণ লইয়া পালাইতে বাধ্য হইলেন তখন কলিকাতা হইতে কামান ও সৈন্য পাঠাইতে হইল। কামানের গোলার মুখে তিতুমীরের নারিকেলবেড়িয়ার বাঁশের কেল্লা ধূলিসাৎ হইল, ঘটনাস্থলেই সে গুলি খাইয়া মরিল, তাহার বহু অনুচর মারা পড়িল, কাহারও ফাঁসি, কাহারও বা দীর্ঘ মেয়াদী কারাবাস হইল। তখন অত্যাচারিত হিন্দু জনসাধারণ ও হিন্দু জমিদার কিঞ্চিৎ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবশতঃ তিতুর অবশিষ্ট অনুচরদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও অত্যাচার করিয়া পূর্ব লাঞ্ছনার শোধ লইতে লাগিল। তিতুর আমীর হইবার দিবাস্বপ্নের চিরসমাধি হইল, গাজি বনিবার পবিত্র ইচ্ছাও পূরিল না। এই ব্যাপার লইয়া কিছু কিছু মুসলমান ছড়াকার তিতুকে প্রায় বাদশা বানাইয়া ছড়া রচনা করিয়াছিল :

তিতুমীর বাদশা হল হুকুম দিল উজিরের তরে।
মৈজুদ্দি উজির হয়ে হুকুম জারি করে॥[৩]

কিন্তু অত্যাচারিত হিন্দুরাই অধিকতর তীক্ষ্ণ ভাষায় তিতুকে ব্যঙ্গ করিয়া অনেক ছড়া রচনা করিয়াছিল—এই ব্যঙ্গের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সাম্প্রদায়িকতা আসিয়া গিয়াছিল। তিতুমীরের ধ্বংসের পর তাহার অনেক অনুচর অত্যাচারিত হইবার ভয়ে দাড়ি কাটিয়া ফেলিয়াছিল, এই লইয়া ছড়াকার ব্যঙ্গ করিয়া গাহিয়াছিল :

উত্তরে এক গ্রাম ছিল নামে নারিকেলবেড়ে
তাতে হাজার দুই নেড়ে।
ওরে বুড়ো, ওরে বুড়ি আজকে গাঁয়ের হাট।
কেস্তে দিয়ে দাড়ি কাট॥
তিতুমীর বলে আল্লা বানাইলাম বাঁশের কেল্লা।
তাতে আমার নেই হেল্লা॥
যেমন মাঠে ধান ছিল তেমনই হল মাঠ।
কেস্তে দিয়ে দাড়ি কাট॥

আমরা বাল্যকালে নারিকেলবেড়িয়া, পুঁড়ো, খোড়গাছি, লাউঘাটি প্রভৃতি

৩ বিহারীলাল সরকারের 'তিতুমীর' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

গ্রামে গ্রাম্য ছড়াকারদের মুখে এইরূপ 'দাড়িকাটা'র রঙ্গ-রসাত্মক অনেক ছড়াগান শুনিতাম। তাহার দুই-এক পংক্তি এখনও স্মরণে আছে :

যেরলে রে নারকেলবেড়ে যত ভ্যালেঙ্গার।
এবার হাঁদু বলে দাড়ি ফেলে যদি রক্ষে পাই॥

যাহা হউক একদা এইরূপ স্থানীয় উৎপাত ইত্যাদি লইয়া কিছু কিছু ছড়া-পাঁচালী রচিত হইয়াছিল, ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তাহার জের চলিয়াছিল। ইহার বিশেষ কোন কাব্যমূল্য না থাকিলেও সমাজজীবনের অনেক মূল্যবান তথ্য ইহাতে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে। সেই জন্য সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার উল্লেখ প্রয়োজন। এবার আমরা যথার্থ ইতিহাস বিষয়ক দুইখানি গ্রন্থের আলোচনা করিব—ত্রিপুরা রাজবংশের বিবরণী 'রাজমালা' এবং গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'।

রাজমালা—ত্রিপুরারাজবংশের ইতিহাস 'রাজমালা' নামে একাধিকবার মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার পুঁথি ও মুদ্রিত সংস্করণের মধ্যে নানা বিষয়ে বৈষম্য আছে।[৪] ত্রিপুরারাজ কাশীচন্দ্র মাণিক্যের (১৮২৬—৩০ খ্রীঃ অঃ—রাজ্যকাল) কর্মচারী দুর্গামণি উজীর প্রাচীন রাজমালাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কোথাও সংক্ষিপ্ত করিয়া, কোথাও বা সম্পূর্ণরূপে অদল বদল করিয়া সম্পাদন করেন। ১৩১১ ত্রিপুরাব্দে ইহাই ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রাজমালার যে পুঁথি আছে (পুঁথি সংখ্যা—২২৫৯) তাহার লিপিকাল দুর্গামণি উজীরের নবসংস্করণের পূর্ববর্তী বলিয়া তাহা অধিকতর নির্ভরযোগ্য। ইহার সহিত দুর্গামণির গ্রন্থের তথ্যগত অনেক পার্থক্য আছে। প্রাচীন রাজমালা মোট চারিখণ্ডে বিভক্ত—প্রথম খণ্ড ত্রিপুররাজ ধর্মমাণিক্যের সময়ে (১৪৫৮—৯০), দ্বিতীয় খণ্ড অমর মাণিক্যের সময়ে (১৫৭৭—৮৬), তৃতীয় খণ্ড গোবিন্দমাণিক্যের সময়ে (১৬৩৭—৭৫) এবং চতুর্থ খণ্ড কৃষ্ণমাণিক্যের সময়ে (১৭৬০—৮৩) রচিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দুর্গামণি উজীর কর্তৃক সংশোধিত ও পরিমার্জিত

৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রাজমালার একখানি প্রাচীন পুঁথি (পুঁ. সং.—২২৫৯) আছে। ইহার সঙ্গে মুদ্রিত রাজমালার প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়।

রাজমালাই আধুনিক মুদ্রিত রাজমালার মূল উৎস। দুর্গামণি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন :

পুরাতন রাজমালা আছিল রচিত।
প্রসঙ্গেত অলগ্নিক ভাষা যে কুৎসিৎ ॥
পূর্ব্ব প্রসঙ্গ পরে পর পূর্ব্বে কত।
সেই ত কারণে লোকে নাহি বুঝে তত ॥

* * *

বারশ আটত্রিশ সন ত্রিপুরা যখনি।
তাহাকে সুধিল পুনি উজির দুর্গামণি ॥

প্রাচীন রাজমালার বিশৃঙ্খলা সংশোধন করিয়া দুর্গামণি ইহাকে নূতনভাবে রচনা করেন[৫] ১২৩৮ ত্রিপুরাব্দে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত রাজমালার পুঁথি হইতে জানা যায় যে, ধর্মমাণিক্যের অনুরোধে তাঁহার দুইজন সভাপণ্ডিত বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর এবং রাজকুলপুরোহিত চোন্তাই প্রধান দুর্লভেন্দ্র ধর্মমাণিক্যের শাসনকাল পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজবংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। মনে হয় রাজবংশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ দুর্লভেন্দ্র ঘটনা বিবৃত করেন এবং সভাপণ্ডিতদ্বয় রচনা করেন। কারণ উক্ত পুঁথিতে আছে :

আর দুর্লভেন্দ্র নাথ চোন্তাই প্রধান।
রাজবংশ কথাতে বড় সাবধান ॥

দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনী রাজা অমরমাণিক্যের সেনাপতি রণচতুর নারায়ণের নামে চলিলেও, মনে হয়, অন্য কেহ ইহা রচনা করিয়া থাকিবেন। বোধ হয় প্রধান উদ্যোগী সেনাপতির নামটি প্রকৃত রচনাকারের নাম-পরিচয় গ্রাস করিয়াছে।[৬] তৃতীয় খণ্ড সম্পর্কে পুঁথিতে আছে :

৫ ডঃ সুকুমার সেনের মতে, "ইহা চোন্তাই দুর্লভচন্দ্র, পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও পণ্ডিত বাণেশ্বর সঙ্কলিত 'রাজরত্নাকর' ও 'রাজমালা' অবলম্বনে লেখা। বাঙ্গালা রাজমালা ঊনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগের পূর্বে রচিত হয় নাই।" (সা. সা. ইতি, অপবার্ধ, পৃ ৫১২) ডঃ সেনের এ মন্তব্য পুরাপুরি গ্রহণ করা যায় না। কারণ সাহিত্য পরিষদেই রাজমালার প্রাচীন পুঁথি আছে।

৬ রাজমালার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "সেনাপতি বিবরণ কহিলেন, একথা পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এই লহরের (অর্থাৎ খণ্ড) রচয়িতা কে তাহা পাওয়া যায় না। সেনাপতি স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন রাজমালার উক্তির দ্বারা এরূপ বুঝা যায় না। শতাধিক বৎসর বয়স্ক স্থবির সৈনিক বিভাগের কর্মচারী দ্বারা গ্রন্থ রচিত হওয়া সম্ভাব্যও নহে। রণচতুরের বর্ণনানুসারে নিশ্চয়ই কোন সভাপণ্ডিত কর্তৃক রাজমালার এই অংশ রচিত হইয়াছিল।"

গোবিন্দ মাণিক্য রাজা পুস্তক লিখাইয়া।
মন্ত্রিএ কহিল তাহা শুনিল চিত্ত দিয়া ॥[১]

গোবিন্দমাণিক্য পুস্তক লিখাইয়া লন এবং মন্ত্রী তাহা বলিয়া যান। এখানেও প্রকৃত লেখকের নাম পাওয়া যাইতেছে না। কেবল চতুর্থ খণ্ডটির রচনাকাল ও রচনাকারের নাম পাওয়া যায়। ইহাতে দেখা যাইতেছে, কৃষ্ণমাণিক্যের নির্দেশে মন্ত্রীর উদ্যোগে বৃদ্ধ বিশ্বাসনারায়ণই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চতুর্থ খণ্ড রচনা করেন। যাহা হউক প্রাচীন রাজমালার কোন প্রামাণিক পুঁথি পাওয়া যায় নাই এবং মুদ্রিত রাজমালা সম্পূর্ণ নির্ভর-যোগ্য নহে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

রাজমালা ত্রিপুরা রাজবংশের বৃত্তান্ত হইলেও ইহার সঙ্গে উক্ত অঞ্চলের তদানীন্তন সমাজ ও ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। ইহার কিছু কিছু বর্ণনাও কৌতূহলোদ্দীপক। ত্রিপুরারাজের সঙ্গে পাঠান ও মুঘলের যে সমস্ত যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে অবশ্য প্রায়ই ত্রিপুরারাজকে জয়ী বলা হইয়াছে—যাহা হয়তো ইতিহাস হিসাবে সব সময়ে সত্য নহে। তবে সেই সময়ের স্থানীয় রাজনীতি ও ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এই ইতিহাস-কাব্যের মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। এখানে এইরূপ দুই একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যাইতেছে। ত্রিপুরারাজবংশে সেনাপতিদের বিশেষ প্রাধান্য ছিল, কারণ রাজারা অনেক সময়ে সেনাপতিদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিতেন। ফলে কোন কোন রাজা সেনাপতির হাতের পুতুলে পরিণত হইতেন। রাজা বিজয়মাণিক্যের সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ এতটা প্রবল হইয়াছিলেন যে রাজা সক্ষোভে বলিয়াছিলেন, "আমার নহে এ রাজ্য দৈত্যনারায়ণ"। এমন কি সেনাপতি বা তাঁহার কোন আত্মীয় অতিশয় ঘৃণ্য কুকর্ম করিলেও রাজা তাহাকে শাস্তি দিতে ভয় পাইতেন। কোন কোন

১ দুর্গামণি উজীর বলিয়াছেন, তৃতীয় খণ্ড রাজা রামমাণিক্যের দ্বারপণ্ডিত সিদ্ধান্তবাগীশ রচনা করেন:

সিদ্ধান্তবাগীশ কহে কর অবধান।
যাহা দেখি শুনিয়াছি বলিব আখ্যান ॥

তবে দুর্গামণির এই উক্তি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহাতে সন্দেহ আছে। তৃতীয়খণ্ড রাজা গোবিন্দ মাণিক্যই উদ্যোগী হইয়া লিখাইয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য: সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় —'ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা'—পৃ. ২০—২১

সময়ে অসহিষ্ণু রাজা সেনাপতির আধিপত্য সহ্য করিতে না পারিয়া চরমপন্থা অবলম্বন করিতেন। বিজয়মাণিক্য শেষ পর্যন্ত সেনাপতি দৈত্যনারায়ণকে হত্যা করিতে বাধ্য হন। রাজমালার আরও একটি কৌতূহলজনক তথ্য—ত্রিপুরায় একদা পানাসক্তি অতি প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল; এমন কি স্ত্রীলোকেও মদ্যপান করিয়া উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করিত। শুনা যায় ধর্মমাণিক্যের রাণী রমণীদের মদ্যপান করাইয়া তাহাদিগকে মত্ত অবস্থায় অসম্বদ্ধ আচরণ করিতে দেখিতে ভালবাসিতেন। রাজমালার বর্ণনানুসারে দেখা যাইতেছে তখন ত্রিপুরায় এক পয়সায় দুই সের মদ মিলিত। সুতরাং 'দীয়তাং পীয়তাং' যে একটু বেশী মাত্রায় চলিত তাহাতে আর সন্দেহ কি?[৮] ইহাতে স্থানে স্থানে অতিরঞ্জনদূষিত অপ্রামাণিক বর্ণনা থাকিলেও বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসাশ্রিত রাজবংশমালা হিসাবে ইহার বিশিষ্ট স্থান স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহার মুদ্রিত সংস্করণের রচনাভঙ্গিমা আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত, নীরস ও কাব্যগুণবর্জিত। বিষয়গত নূতনত্ব ছাড়া ইহার আর কোন গুণ নাই।

সম্প্রতি ত্রিপুরারাজবংশ-সংক্রান্ত আর একখানির পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহার নাম 'চম্পকবিজয়'। ইহার একখানি প্রাচীন পুঁথি ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকট আছে, আর একখানি আধুনিক নকল ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার রাজগ্রন্থাগারে আছে। ইহাতে ত্রিপুরারাজ রত্নমাণিক্যের (রাজত্বকাল—১৬৮৫—১৭১০ খ্রীঃ অঃ) রাজ্যচ্যুতি নরেন্দ্রমাণিক্যের বিদ্রোহ, সেনাপতির সহায়তায় রত্নমাণিক্যের পুনরায় সিংহাসনলাভ, যুবরাজ চম্পকরায়ের বিশেষ সহায়তা এবং পরিশেষে রাজা হইতে বাসনা করিলে সৈন্যদের দ্বারা নিহত হইবার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যে একদা সিংহাসন লইয়া যে পারিবারিক হানাহানি ঘটিয়াছিল তাহার অনেক বিবরণ এই জাতীয় রাজবংশের ইতিহাসে আছে। এই পারিবারিক কাব্যের কবির নাম সেখ মহাদ্দি। কবি রাজা রত্নমাণিক্যকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, কাব্যটির ছত্রে ছত্রে সেই শ্রদ্ধা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনে হয় এই কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত হইয়াছিল।[৯] এই অকিঞ্চিৎকর ঐতিহাসিক কাব্যের পারিবারিক তথ্য ও রাজবংশের

৮ দ্রষ্টব্য: সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কাব্য, পৃ ২৪-২৫

৯ ঐ, পৃ ২৯

হানাহানির বর্ণনায় আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, ত্রিপুররাজগণ ধর্মমতে কেহ শৈব, কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব হইলেও[১০] তাঁহারা মুসলমান সেনাপতি, মন্ত্রী ও উচ্চ রাজকর্মচারী নিয়োগে কুণ্ঠিত হইতেন না। রাজ্যচ্যুত রত্নমাণিক্য তাঁহার সেনাপতি মির খাঁ গাজীর সাহায্যে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন, মির খাঁ-ই কবি সেখ মহদ্দিকে দিয়া 'চম্পকবিজয়' লিখাইয়াছিলেন। যাহা হউক এই সমস্ত ঐতিহাসিক কাব্য-কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য যেরূপ হউক, কাব্যমূল্য যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর তাহাতে সন্দেহ নাই।[১১]

গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণ—নানা দিক দিয়া গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইহাই একমাত্র ইতিহাসাশ্রিত যথার্থ তথ্যকাব্য।* ইহাতে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙলাদেশের বর্গীর হাঙ্গামার কাহিনী অত্যন্ত নিপুণ বাস্তবতার সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। দুই একস্থলে কিছু ইতিহাসবিরোধী কথা থাকিলেও কবি ইহার প্রায় সর্বত্র ঐতিহাসিকের বস্তুগত নিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছেন। বর্ণনা পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন কবি স্বচক্ষে সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাই ইহাকে মধ্যযুগের একমাত্র ইতিহাস-কাব্য বলা

---

১০ সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ত্রিপুরারাজগণ প্রধানতঃ শৈব ছিলেন, কেহ কেহ শাক্ত মতও গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেমন যুবরাজ চম্পক রায় তন্ত্রমতে লক্ষ হোম করিয়াছিলেন, যুবরাজ রাজধর আবার বৈষ্ণবমত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১১ গাজীনামা (ত্রিপুরারাজ কাহিনীর অংশ বিশেষ), কান্তনামা (কাশিমবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবু এবং উক্তবংশধর রাজা হরিনাথ ও কৃষ্ণনাথের কীর্তিকথা), কুচবেহার রাণী বৃন্দেশ্বরীর 'বেহারোদন্ত' (কুচবিহার রাজবংশের কাহিনী) প্রভৃতি পারিবারিক ইতিহাস প্রায়শই সাহিত্যগুণবর্জিত বলিয়া এখানে আলোচনা করা হইল না। উপরন্তু এগুলি ১৯শ শতাব্দীর রচনা—আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নহে। কৌতূহলী পাঠক এবিষয়ে সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত গ্রন্থ দেখিতে পারেন।

* উড়িষ্যার ঢেন্‌কানল বাসী কবি ব্রজনাথ বড়জেনা তাঁহার অঞ্চলে বর্গীর হাঙ্গামা অবলম্বনে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওড়িয়া ভাষায় 'সমরতরঙ্গ' শীর্ষক একখানি ঐতিহাসিক কাব্য লিখিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য যথার্থই কাব্য হইয়াছে, গঙ্গারামের মতো শুধু কাহিনীমাত্র হয় নাই।

যাইতে পারে, যাহা ততটা কাব্যধর্মী না হইলেও ঐ সময়ের প্রকৃত ইতিহাস হইয়াছে বটে।

বাংলা ১৩১১ সনে ময়মনসিংহে যে কৃষিশিল্পপ্রদর্শনী হয় তাহাতে স্থানীয় পত্রিকা 'সৌরভে'র সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় এই কাব্যের একখানি পুরাতন পুঁথি জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে উক্ত প্রদর্শনীতে উপস্থিত করিয়াছিলেন। ইহার বছর দুই পরে সাহিত্য পরিষদের ব্যোমকেশ মুস্তাফী মহাশয় ১৩১৩ সনের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় উক্ত মহারাষ্ট্র পুরাণের গোটাটা ছাপাইয়া দেন এবং খানিকটা ভূমিকা জুড়িয়া দিয়া তাহাতে কবিপরিচয় ও কাব্যে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। উহাতে তিনি কবিকে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী বলিয়া প্রমাণ করেন, এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইহাতে কিছু কিছু ঐতিহাসিক ভ্রান্তি থাকিলেও কবি যথাসম্ভব ঐতিহাসিক ঘটনা অনুসরণ করিয়াছেন। ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে কেদারনাথ মজুমদার সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (১৩১৫, ৪র্থ সংখ্যা) ব্যোমকেশ মুস্তাফীর উক্ত প্রবন্ধের কোন কোন উক্তি প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, তিনিই (মজুমদার মহাশয়) ময়মনসিংহের গ্রাম হইতে উক্ত কাব্য আবিষ্কার করিয়াছেন এবং কবির পরিচয় সংগ্রহ করিয়া পূর্বেই 'ময়মনসিংহের বিবরণে' (তাঁহার রচিত ইতিহাস) তাহার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহারাষ্ট্র পুরাণের সন তারিখযুক্ত একখানি পুঁথিও আছে (পুঁথি. সং. ১৭৮৪)। এখানে পুঁথির প্রথম পৃষ্ঠার আলোকচিত্র মুদ্রিত হইল।

গঙ্গারামের জীবনকথা সম্পর্কে 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' আবিষ্কর্তা কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের মতামত অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য বলিয়া তাঁহার প্রদত্ত তথ্য এখানে গৃহীত হইল। কেদারনাথ ১৯০৭ সালে সংবাদ পান যে, ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ধরীশ্বর গ্রামে মহারাষ্ট্র পুরাণের কবি গঙ্গারাম জন্মগ্রহণ করেন। সেই গ্রামে গিয়া কেদারনাথ কবির বংশধরের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে কবি সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার সংগৃহীত তথ্যানুসারে দেখা যাইতেছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ধরীশ্বর গ্রামে গঙ্গারামের জন্ম হয়। গঙ্গারামের প্রপিতামহ হরিদাস দেব অন্য কোন স্থান হইতে ধরীশ্বর গ্রামে আসিয়া বসবাস করেন। ঐ গ্রামে

বর্তমান কালে কিছু দিন পূর্বেও তাঁহার বংশধারা বর্তমান ছিল। গঙ্গারাম জঙ্গলবাড়ীর ইশা খাঁয়ের বংশধর এক মুসলমান জমিদারের সেরেস্তায় কর্ম করিতেন। তাঁহাকে মাঝে মাঝে রাজস্ব ও অন্যান্য হিসাবনিকাশের জন্য মুর্শিদাবাদে নবাব সরকারে আসিতে হইত। কেদারনাথের সংগৃহীত তথ্যাদি হইতে দেখা যাইতেছে যে, কবি যখন মুর্শিদাবাদে যাতায়াত করিতেন তখন পশ্চিমবঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামা হয়। কবি সম্ভবতঃ তখন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন, কিংবা হয়তো মুর্শিদাবাদে কর্মসূত্রে যাতায়াত করিবার কালে তিনি স্থানীয় জনসাধারণের মুখে বর্গীর হাঙ্গামার প্রত্যক্ষ বিবরণ শুনিয়াছিলেন। কবি জঙ্গলবাড়ীর জমিদারের সেরেস্তায় দক্ষতার সঙ্গে কর্ম সম্পাদন করিয়া চৌধুরী উপাধি পাইয়াছিলেন, কায়স্থ কবির কৌলিক উপাধি ছিল 'দেব'। কবি বেশ শিক্ষিত ছিলেন, তাঁহার মার্জিত রচনাভঙ্গিমা তাহার প্রমাণ, জমিদারের সঙ্গে মতান্তরের ফলে তিনি উক্ত কর্ম ত্যাগ করেন। কেদারনাথ বাংলা ১৩০৭ সনে যখন ময়মনসিংহের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য ধরীশ্বর গ্রামে গিয়াছিলেন, তখন কবির বংশধরের নিকট গঙ্গারাম (গঙ্গানারায়ণ) রচিত 'শুকসংবাদ', 'লবকুশের চরিত্র', ও 'ভাস্করপরাভব' অর্থাৎ মহারাষ্ট্র পুরাণের পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার চারি বৎসর পরে ১৩১১ সনে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত কৃষিশিল্প প্রদর্শনীতে মহারাষ্ট্র পুরাণের পুঁথিটি উপস্থাপিত হইয়াছিল।[১২]

ব্যোমকেশ মুস্তাফী সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩১৩, ৩য় সংখ্যা) এই পুঁথিটি মুদ্রিত করেন। ইহাতে যে টিপ্পনী ও ভূমিকা যোগ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি কবি সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ দিতে পারেন নাই। তবে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, পুঁথিটি পূর্ববঙ্গের কোন লিপিকারের দ্বারা নকল করা হইয়াছিল বলিয়া ইহাতে এত পূর্ববঙ্গীয় শব্দ স্থান পাইয়াছে।

১২ ডঃ সুকুমার সেনের মতে উক্ত পুঁথিটি নগেন্দ্রনাথ বসুর সংগ্রহ। "পুঁথি নগেন্দ্রনাথ বসুর সংগ্রহ, সুতরাং দক্ষিণরাঢ় অথবা মল্লভূম হইতে পাওয়া বলিয়া অনুমান হয়" (বা. সা. ইতি, অপরার্ধ, পৃ ৫০৬. পাদ টীকা)। কিন্তু এ অনুমান পুরাপুরি গ্রহণ করা যায় না। কারণ কেদারনাথ মজুমদার সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে ('কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্র পুরাণ" সা-প-প, ১৩১৫।৪) স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, তিনি ময়মনসিংহ হইতেই মহারাষ্ট্রপুরাণের পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিটিতে (পুঁ. সং. ১৭৮৪) প্রচুর পূর্ববঙ্গীয় শব্দ আছে। সুতরাং পুঁথিটি এবং কবিকে পূর্ববঙ্গেরই বলিতে হইবে।

তিনি গঙ্গারামকে রাঢ়বাসী মনে করিয়াছিলেন, কারণ পুঁথিতে কিছু কিছু অনুনাসিক স্বরের প্রয়োগ আছে। ইহার অনেক দিন পরে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪৬ সনের শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' "যশোহরের অখ্যাতনামা কবি গঙ্গারাম দত্ত" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, যশোহর নড়াইলের কবি গঙ্গারাম দত্ত রামায়ণ, 'সুদামাচরিত্র', 'উষাহরণ', 'সত্যনারায়ণের কথা' রচনা করিয়াছিলেন। 'সুদামাচরিত্রে'র পুষ্পিকা হইতে জানা যায় যে, এই কবি সিরাজদ্দৌলার সময় বর্তমান ছিলেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "এই গঙ্গারামই মহারাষ্ট্র পুরাণ রচয়িতা।" প্রবন্ধকার নড়াইলের কবি গঙ্গারাম দত্তের পূর্ব-পরিচয়ও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই দত্তবংশ হাওড়া শহরের নিকটবর্তী বালিগ্রামে বাস করিতেন। পরে বর্গীর উৎপাতের সময়ে তাঁহারা প্রথমে মুর্শিদাবাদ এবং সেখান হইতে নড়াইলে গিয়া বসবাস করিতে থাকেন। কিন্তু নড়াইলের গঙ্গারাম দত্ত এবং মহারাষ্ট্র পুরাণের গঙ্গারাম যে এক ব্যক্তি, অধ্যাপক রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। কেদারনাথ মজুমদার সংগৃহীত তথ্য হইতে গঙ্গারামকে পূর্ববঙ্গের কবি বলিয়া মনে হইতেছে—অবশ্য জমিদারী কর্মোপলক্ষে তিনি ময়মনসিংহ হইতে মুর্শিদাবাদে যাতায়াত করিতেন। তাঁহার কাব্যে এত অধিক পূর্ববঙ্গীয় শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যে, (কইরা, গুইলা অর্থাৎ গুলিয়া, ধইরা, ছাইরা, আইসতে, সুইনা, আইসা ইত্যাদি), কবিকে রাঢ়বাসী বলিতে দ্বিধা হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত মহারাষ্ট্রপুরাণের পুঁথিতে কাব্যরচনার সন এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে—"ইতি মহারাষ্ট্র পুরাণে প্রথম কাণ্ডে ভাস্করপরাভব শকাব্দ ১৬৭২ সন ১১৫৮ সাল তারিখ ১৪ই পৌষ রোজ শনিবার।" অর্থাৎ এই কাব্য ১৭৫১ খ্রীঃ অব্দে রচিত হয়। প্রাপ্ত পুঁথিটির লিপিও বোধহয় ঐ একই কালের। এই পুষ্পিকা হইতে অনুমান হয়, কবি মহারাষ্ট্র পুরাণের শুধু প্রথম কাণ্ডটি ('ভাস্করপরাভব') রচনা করিয়াছিলেন—যাহার সমাপ্তিতে বর্গী নেতা ভাস্করপণ্ডিতের হত্যাকাণ্ড বর্ণিত হইয়াছে। বোধহয় বর্গীর হাঙ্গামার পরবর্তী বিবরণ দেওয়াও তাঁহার অভিপ্রেত ছিল—হয়তো পরবর্তী কাণ্ডে তিনি অন্যান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম কাণ্ডটি ব্যতীত মহারাষ্ট্রপুরাণের আর

কোন কাণ্ডের পুঁথি পাওয়া যায় নাই—মনে হয় তিনি আর কোন কাণ্ড রচনা করেন নাই।

বর্গীর হাঙ্গামা একদা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ধনেপ্রাণে সর্বনাশ করিয়াছিল। সেই ব্যাপক ক্ষতি ও অত্যাচারের ক্ষতচিহ্ন বাঙালী কোন দিনই ভুলিতে পারে নাই, নর-নারী-শিশু—সকলেরই চিত্তে সেই দুঃস্বপ্নের স্মৃতি পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। একদা যেমন ইংলণ্ডের মাতারা দুষ্ট শিশুকে নেপোলিয়নের ভয় দেখাইয়া ঘুম পাড়াইত, তেমনি বাঙলাদেশেও বহু দিন 'বর্গী এলো দেশে' এই ছড়া গাহিয়া মায়েরা শিশুদের শান্ত করিত। বস্তুতঃ অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক,—সব দিক দিয়াই বর্গীর অভিযান বাঙালীর মনে তীব্র ঘৃণা-বিতৃষ্ণা ও প্রচণ্ড সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছিল। ইতিপূর্বে এই পর্বের প্রারম্ভে রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনার সময় আমরা দেখিয়াছি যে, ১৭৪২ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৭৪৯ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত—প্রায় সাত বৎসর ধরিয়া পশ্চিম বাঙলায় মারাঠা লুঠেরা বর্গী অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়া এদেশে কৃষি-ব্যবস্থা নষ্ট, ব্যবসাবাণিজ্যের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন এবং হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি নারকীয় ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়া সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করিয়াছিল। বহু সংঘর্ষ ও দুঃখলাঞ্ছনার পর শেষ পর্যন্ত আলিবর্দি মারাঠা নেতা রঘুজীকে বার লক্ষ টাকা চৌথ দিতে স্বীকৃত হন। ইহার পর উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরের উত্তরাংশ দীর্ঘকালের জন্য মারাঠাদের অধিকারে চলিয়া যায়। ১৭৪২ খ্রীঃ অব্দের শীতকালে বাঙলায় মারাঠাদের প্রথম অত্যাচার শুরু হয়, ১৭৪৩ সালে দ্বিতীয় অভিযান এবং ১৭৪৪ সালে তৃতীয় অভিযানে বর্গীর নেতা ভাস্করপণ্ডিত এদেশে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাইয়াছিলেন। অবশ্য এই অভিযানে বর্গরা প্রচুর লুঠতরাজ করিলেও ভাস্কর পণ্ডিত দুইবার বিতাড়িত হইয়া প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ প্রথম বার তিনি যখন কাটোয়ায় মহাসমারোহে দুর্গাপূজা করিতেছিলেন তখন আলিবর্দির অতর্কিত আক্রমণে অষ্টমী পূজার রাত্রে প্রতিমা ফেলিয়া পলাইতে বাধ্য হন। দ্বিতীয় অভিযানে আলিবর্দির সঙ্গে পেশোয়া বালাজী রাওয়ের সন্ধি হইলে[১৩] বালাজীর প্রতিযোগী রঘুজী ও সহচর ভাস্করপণ্ডিত তাঁহার

১৩ দ্বিতীয় অভিযানে এই মর্মে সন্ধি হয় যে, আলিবর্দি মারাঠারাজ সাহুকে রাজস্বের এক চতুর্থাংশ (চৌথ) দিবেন। তিনি সৈন্যদের ব্যয়নির্বাহের জন্য পেশোয়া বালাজী রাওকে বাইশ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন।

দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বাঙলা হইতে বিতাড়িত হন—তাঁহাদিগকে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। তৃতীয় অভিযানে (১৭৪৪) ভাস্কর পণ্ডিত শক্তি-বৃদ্ধি করিয়া পুনরায় বাঙলায় অভিযান শুরু করেন এবং প্রচণ্ডতম অত্যাচার চালাইতে থাকেন। হৃতসর্বস্ব আলিবর্দি তখন দেওয়ান জানকীরাম ও সিপাহশালার মুস্তাফা খাঁয়ের কৌশলে ভাস্কর ও তাঁহার মুষ্টিমেয় অনুচরকে নিরস্ত্র অবস্থায় মানকরার শিবিরে লইয়া আসেন এবং সানুচর ভাস্করকে হত্যা করিয়া (৩১ মার্চ, ১৭৪৪) বাঙলাকে কিছু দিনের জন্য মারাঠা লুঠেরাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হন।

গঙ্গারাম তাঁহার 'মহারাষ্ট্র পুরাণে'র প্রথমকাণ্ডে ('ভাস্কর পরাভব') ভাস্কর পণ্ডিতের বাঙলায় আগমন এবং আলিবর্দি কর্তৃক নিহত হইবার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য ১৭৪২ হইতে ১৭৪৪ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে প্রেরিত তিনটি বর্গী অভিযানের মধ্যে দ্বিতীয় অভিযান সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই। তাঁহার কাব্য হইতে মনে হয় ভাস্কর পণ্ডিত পর পর দুই অভিযানের শেষে নিহত হইয়াছিলেন। ইতিহাসে দেখা যাইতেছে, দ্বিতীয় অভিযানের (যাহার সম্বন্ধে কবি কিছু বলেন নাই) নেতৃত্ব করিয়াছিলেন নাগপুরের রঘুজী ভোঁশলা, ভাস্কর তাঁহার অনুচর রূপেই উপস্থিত ছিলেন এবং পেশোয়া বালাজী বাজী রাও-ই তাঁহাকে বাঙলা হইতে বিতাড়িত করিয়া আলিবর্দির সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাই বোধ হয় কবি দ্বিতীয় অভিযান সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই।

গঙ্গারাম মহারাষ্ট্র পুরাণের আরম্ভ ও সমাপ্তিতে পুরাণের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সামান্য অংশ বাদ দিলে কাব্যটিতে যে তথ্য বিবৃত হইয়াছে, মারাঠা বর্গীর অভিযান সম্পর্কে তদপেক্ষা সমসাময়িক নির্ভরযোগ্য উপাদান পাওয়া যায় না। কবি ইহাতে অনেকটা আধুনিক ঐতিহাসিকের মতো অতি সতর্কতার সঙ্গে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। সে যুগের গমনাগমনের অসুবিধা ও উপাদান সংগ্রহের পরিবেশের অভাব সত্ত্বেও দেশীয়-মতে-শিক্ষিত এই পূর্ববঙ্গের কবি পশ্চিমবঙ্গের দুঃস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনায় যেরূপ বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গিমার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে বিশেষ প্রশংসা করিতে হইবে।

কাব্যটি এইভাবে শুরু হইয়াছে। মর্ত্যে অত্যাচার-অনাচার দেখিয়া মহাদেব অনুচর নন্দীকে* বলিলেন :

নন্দীকে দেখিয়া শিব বলিছে বচন।
দক্ষিণ শহরে তুমি জাহ ততক্ষণ॥
সাহুরাজা নামে এক আছে পৃথিবীতে।
অধিষ্ঠান হও যাইয়া তাহার কণ্ঠেতে॥
বিপরীত পাপ হৈল পৃথিবী উপরে।
দূত পাঠাঞা জেন পাপিলোক মারে॥

এই আদেশ পাইয়া নন্দী সাহুরাজাকে অনুরূপ কথা জানাইলে রাজা তাঁহার অনুচর রঘুরাজাকে বলিলেন :

সাহুরাজা বোলে তবে রঘুরাজার তরে।
অনেক দিন হৈল বাঙ্গালার চৌত না দেয় মোরে॥
দূত পাঠাঞা দেক বাদশার স্থানে।
বাঙ্গালার চৌথাই না দেএ কিসের কারণে॥

ইতিহাস হইতে দেখা যাইতেছে শিবাজীর পৌত্র সাহুজী বালাজী বিশ্বনাথ নামক এক ব্রাহ্মণের উপদেশে সাতারার রাজা হইয়া (১৭০৮) বসেন এবং বিশ্বনাথকে প্রধানমন্ত্রী বা পেশোয়ার পদে নিযুক্ত করেন (১৭১৪)। ১৭১৯ খ্রীঃ অব্দে বালাজী বিশ্বনাথ দিল্লীশ্বর ফারুকসায়রের নিকট হইতে সাহুর নামে ফারমান আনয়ন করেন এবং দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবা হইতে 'চৌথ' (এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব) ও 'সরদেশমুখী (একদশমাংশ) আদায়ের অনুমতি লাভ করেন। সরফরাজ নিধনের পর বাঙলাদেশে আলিবর্দি নবাব হইয়া প্রায় দুই বৎসর দিল্লীতে কোন রাজস্ব পাঠান নাই। ১৭৪০ সালে মারাঠারা দিল্লীর বাদশাহের নিকট বাঙলার চৌথ দাবি করিলে বাদশাহ তাঁহাদিগকে আলিবর্দির নিকট হইতে চৌথ আদায় করিবার অনুমতি দিলেন। সাহু চৌথ আদায়ের ভার দিলেন নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলের উপর। রঘুজীর সঙ্গে যোগ দিল মির হাবিব নামে আলিবর্দির এক অসন্তুষ্ট কর্মচারী। তখন রঘুজী তাঁহার অনুচর ভাস্কররাম বা ভাস্করপণ্ডিতের সহায়তায় উড়িষ্যা ও বাঙলা অভিযানে সঙ্কল্প করিলেন। ১৭৪১ সালে পূজার সময় বিজয়াদশমী

* ১৭৫২-৫৩ খ্রীঃ অব্দে সমাপ্ত অন্নদামঙ্গলেও ভারতচন্দ্র বর্গীর হাঙ্গামা প্রসঙ্গে মহাদেব-নন্দী ঘটিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

দিবসে ('দশেরা') ভাস্করের নেতৃত্বে দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ রঘুজী যাত্রা করিলেন। গঙ্গারামের ঐতিহাসিক কাহিনী এইস্থান হইতে শুরু হইয়াছে। কবির বর্ণনায় দেখা যাইতেছে সাহুজী বাঙলার চৌথ আদায়ের ভার দিলেন রঘুরাজার উপর, রঘু সে ভার দিলেন ভাস্করপণ্ডিতের উপর। ভাস্কর সাতারা ছাড়িয়া বিজাপুর হইয়া নাগপুরে পৌঁছিলেন এবং বাঙলার আলিবর্দি সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া বীরভূম বামে রাখিয়া গোপভূমের পার্শ্ব দিয়া গোপনে সসৈন্যে বর্ধমানের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে রাণীদীঘির পাড়ে পূর্বেই আলিবর্দি অবস্থান করিতেছিলেন। ১৭৪২ খ্রীঃ অব্দের (১১৪৯ বঙ্গাব্দ) ১৯শে বৈশাখ তারিখে সংঘর্ষ শুরু হইল :

বৈশাখের উনিশায় বর্গী আইলা তায়
মহা আনন্দিত হৈয়া মনে।

আলিবর্দি সংবাদ পাইলেন যে, চৌথ আদায় করিবার জন্য সাহুরাজার হুকুমে ভাস্করপণ্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠা বর্গীরা বাঙলায় হাজির হইয়াছে। তিনি উকিল দিয়া ভাস্করকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি দিল্লীতেই রাজস্ব দেন, মারাঠারা সেখান হইতে চৌথ লউক। কিন্তু ভাস্কর জবাব পাঠাইলেন, দিল্লীশ্বরের কথামতোই তাঁহারা বাঙলায় চৌথ আদায় করিতে আসিয়াছেন, চৌথ না পাইলে দেশ ছারখার করিয়া দিবেন। এই সংবাদে দুই দলের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়িয়া গেল. ভাস্কর সাত দিন ধরিয়া নবাবের শিবির অবরোধ করিয়া রাখিলেন। নবাব ও সেনাবাহিনী অন্নাভাবে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। সেই সঙ্কটের সময় বাস্তব দুরবস্থার চিত্র গঙ্গারাম অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে অঙ্কিত করিয়াছেন :

মুদি বানিঞা যত পারাইতে নারে।
লুটে কাটে মারে ছমুতে পায় যারে॥
বরগীর তরাসে কেহ বাহির না হয়।
চতুর্দ্দিকে বরগীর ডরে রসদ না লয়॥

এই দুর্যোগের সময় আলিবর্দি সৈন্য-সেনাপতি সহ দারুণ বিপদে পড়িলেন—সকলে শুধু মাত্র কলার এঁটে খাইয়া উদরপূর্তি করিতে লাগিলেন :

কলার আইঠা যত আনেন তুলিয়া।
তাহা আনি সব লোক খাএ সিজাইয়া॥

* * *

বিষম বিপত্য বড় বিপরীত হইল।
অন্ত পরে কা কথা নবাব সাহেব খাইল ॥

সেনাপতি মুস্তাফা খাঁয়ের বুদ্ধি কৌশলে আলিবর্দি কোনও প্রকারে কাটোয়ায় উপস্থিত হইলেন। শিকার পলাইয়াছে দেখিয়া ক্রুদ্ধ ভাস্কর নির্বিচারে লুঠতরাজ ও ধ্বংসের আদেশ দিলেন, বর্গী সৈন্যেরা[১৪] নির্মমভাবে অত্যাচার ও লুঠ করিতে করিতে অগ্রসর হইল। স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার ইহাদের স্বভাবধর্মে পরিণত হইয়াছিল। অতঃপর তাহারা বর্ধমান ধ্বংস করিয়া হুগলীতে আসিয়া পৌঁছিল। এখানেও তাহারা অত্যাচারের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িল, ভীত জনসাধারণ ও জমিদারদের নিকট হইতে বলপূর্বক রাজস্ব আদায় করিতে লাগিল। ভাস্কর পণ্ডিতের প্রায়-বর্বর বর্গী লুঠেরাগণ রাঢ়ের বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও হুগলীজেলার বহু গ্রাম জ্বালাইয়া পুড়াইয়া নরহত্যা ও নারীধর্ষণ করিয়া পশুত্বের ঘৃণ্যতম পরিচয় দিল। এখানে গঙ্গারাম অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিধ্বস্ত গ্রামের আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়াছেন। তাহার পর বর্গীরা মুর্শিদাবাদের জেমোকান্দী ও ডাহাপাড়া গ্রাম পুড়াইয়া হাজিগঞ্জের ঘাট পার হইয়া রাজধানী মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইল। তখনও আলিবর্দি মুর্শিদাবাদে পৌঁছাইতে পারেন নাই। বর্গীরা মুর্শিদাবাদ লুঠপাট করিয়া জগৎশেঠকে বেকায়দায় ফেলিয়া তাঁহার নিকট হইতে তিন লাখ টাকা আদায় করিয়া শহর জ্বালাইয়া পুড়াইয়া নারকীয় কাণ্ড উপস্থিত করিল—শুধু নবাবের প্রাসাদ ও কেল্লা কোনও প্রকারে রক্ষা পাইল। নবাব মুর্শিদাবাদে পৌঁছাইবার পূর্বেই ভাস্কর দ্রুতগামী বর্গীসেনা-সহ মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়া কাটোয়া পৌঁছাইয়া দাঁইহাট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সেনা সন্নিবেশ করিলেন। কারণ ঘোর বর্ষায় আর লুঠতরাজ চলিবে না। স্থানীয় জনসাধারণ ও জমিদারেরা ভয়বশতঃ ভাস্করকে রাজস্ব দিতে লাগিল।

---

১৪ বর্গী (মূল শব্দ 'বার্গীর'—নিম্নশ্রেণীর সিপাহী) অর্থাৎ যে সমস্ত অশ্বারোহী সৈন্য ভাস্করের সঙ্গে বাঙলা অভিযানে আসিয়াছিল তাহারা অতি নিম্নশ্রেণীর সিপাহী ছিল। অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর সৈন্যকে 'শিলাহ্‌দার' বলা হইত। তাহারা এই অভিযানে আসে নাই। তাহারা পদমর্যাদায় বর্গী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহাদের নিজস্ব অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রাদি ছিল, কিন্তু বর্গীরা অশ্ব ও অস্ত্র সরকার হইতে পাইত। ইহারা নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত ব্যক্তি ছিল বলিয়া (অনেকটা টমিদের মতো) জনসাধারণের উপর পশুবৎ অকথ্য অত্যাচার করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিত না।

তখন আশ্বিন মাস, বাঙালী হিন্দুর দুর্গাপূজা আসিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ ভাস্কর পণ্ডিত বাঙালী হিন্দুর রীতিতে মহাসমারোহে দুর্গাপূজার আয়োজন করিলেন; জমিদারগণ নতমস্তকে যাবতীয় খরচ যোগাইলেন।[১৫] কিন্তু অষ্টমীপূজার গভীর রাত্রে আলিবর্দি অতর্কিতে ভাস্করকে আক্রমণ করিলে পরাভূত বিপর্যস্ত বর্গীনায়ক লোকলস্কর সহ প্রতিমা ফেলিয়াই দ্রুত পলাইলেন, নবমীপূজা আর হইল না। কিন্তু কয়েকমাস যাইতে না যাইতেই চৈত্র মাসে ভাস্কর আবার বাঙলায় হাজির হইয়া অত্যাচারের মাত্রা ভয়াবহ পরিমাণে বাড়াইয়া

---

১৫ ঐতিহাসিকের মতে, "Bhaskar was celebrating the Durga Puja at Katwa in the most lavish style with forced contribution from the Zamindars". (HOB. II, p. 458) অবশ্য গঙ্গারামের কাব্যের পুরাণ ধাঁচের বর্ণনায় দেখা যাইতেছে মহাদেব সাহুরাজাকে বাঙলা হইতে পাপ দূর করিবার জন্যই নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে মারাঠা বর্গীরা স্ত্রীলোক-গো-ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলে দেবী পার্বতী ক্রুদ্ধ হইয়া মারাঠাদের প্রতি বিমুখ হইলেন এবং নবাবকে কৃপা করিলেন। পাপের ফলেই ভাস্কর মারা পড়েন। ইহাতে মনে হইতে পারে বর্গীর আক্রমণকে বাঙলার হিন্দু জনসাধারণ প্রথমটা মনে মনে অভিনন্দিত করিয়াছিল। কিন্তু পরে ইহাদের ভয়াবহ অত্যাচারে হিন্দুদের মন বিষাইয়া যায়। এই সময়ে "The under-current of discontent amongst Hindu-subjects" (K. K. Datta—*Alivardi and His Times*, p. 58) বহিলেও হিন্দুরা মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে বিরক্ত হইয়া মারাঠাদের অভ্যর্থনা করিয়াছিল এমন কোন প্রকৃষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। অবশ্য ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও বলা হইয়াছে, নন্দীকে মহাদেব নির্দেশ দিলেন :

আছয়ে বর্গীর রাজা গড় সেতারায়।
আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়॥
সেই আসি যবনেরে করিবে দমন।
শুনি নন্দী তারে গিয়া কহিল তখন॥
স্বপ্ন দেখি বর্গী রাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইলা রঘুরাজা ভাস্কর পণ্ডিত॥

এই সমস্ত সমসাময়িক উক্তি হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দুদের চাপা আক্রোশ ছিল, তাই তাহারা গোড়ার দিকে বর্গীর অভিযানে আশান্বিতই হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের অকথ্য অত্যাচারে হিন্দুদের আশা ধূলিসাৎ হইয়া যায়।—এই অনুমান মিথ্যা নাও হইতে পারে। কিন্তু সেরূপ কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনও হস্তগত হয় নাই।

দিলেন—বোধহয় পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য। গঙ্গারাম সেই ঘটনার যে চাক্ষুষ বর্ণনা দিয়াছেন তাহা রীতিমতো লোমহর্ষক :

মাঘে ঘেরিয়া বর্গী তবে দেয় সাড়া।
সোনারূপা লুটে নেয় আর সব ছাড়া॥
কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
একি চোটে কারু বধএ পরাণ॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক যত ধইরা লইয়া যাএ।
অঙ্গুষ্ঠে দড়ি বেঁধে দেয় তার গলাএ॥
একজনে ছাড়ে তারে অন্তজনা ধরে।
রমণের ভরে ত্রাহি শব্দ করে॥
এই মতে বরগি কত পাপকর্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রালোক জত দেয় সব ছাইড়া॥
তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধাএ।
বড় ২ ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ॥

* * *

কাহুকে বাঁধে বরগী দিআ পিঠমোড়া।
চিত কইরা মারে লাথি পাএ জুতা চড়া॥
রূপি দেহ ২ বলে বারে বারে।
রূপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে॥
কাহুকে ধরিয়া বরগি পখইরে ডুবাএ।
ফাফর হইয়া তবে কারু প্রাণ জাএ॥

এ বর্ণনা অতি নির্মম, কিন্তু অণুমাত্রও অতিরঞ্জিত নহে।[১৬] কারণ সম-

---

১৬ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩১৩।৩য়) ব্যোমকেশ মুস্তাফী কিন্তু এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত মনে করিয়াছেন—"ভাস্করের দ্বিতীয়বার আক্রমণে তাঁহা কর্তৃক গোব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও স্ত্রীহত্যার যেরূপ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা যেন অতিমাত্র অতিশয়োক্তি বলিয়া বোধ হয়।" গঙ্গারাম লিখিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত সন্ন্যাসী ছিল।
গো হত্যা স্ত্রীহত্যা শত শত কৈল॥

এ বর্ণনা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। হলওয়েল *Interesting Historical Events*-এ বর্গীর হাঙ্গামার এইরূপ বর্ণনাই দিয়াছেন। সলিমুল্লাও তাঁহার 'তারিখ-ই-বাংলা'য় বলিয়াছেন যে, মারাঠাদের লোলুপ দৃষ্টি হইতে নারীর পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য অনেক সম্পন্ন ব্যক্তি গঙ্গার পূর্বপারে পলাইয়া আসিয়াছিলেন—"All rich and respectable people

সাময়িক ইংরাজ ও ফরাসী বণিকেরাও ইহার যে স্মৃতিচিত্র রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে গঙ্গারামের এই উক্তি সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। তারপর পুরাণের ইঙ্গিত টানিয়া আনিয়া কবি বলিয়াছেন, নারী ও ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচারে দেবী পার্বতী ভাস্করের প্রতি রুষ্ট হইয়া নবাবের প্রতি সদয় হইলেন :

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হিংসা দেখিবারে নারি।
এতেক কহিয়া তবে রুসিলা শঙ্করী ॥
ভৈরবী জোগনী যত নিকটে ছিল।
জোড়হস্ত কইরা তারা ছমুতে গড়াইল ॥
তবে দুর্গা কহে শুন এতেক ভৈরবী।
ভাস্করকে বাম হইয়া নবাবকে সদয় হবি ॥

অতঃপর নবাব আলিবর্দি এই নির্মম লুঠেরার আক্রমণ হইতে বাঙলার জান-মান বাঁচাইবার জন্য তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করিয়া সানুচর ভাস্করকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিলেন। তাঁহার পরামর্শে দেওয়ান জানকীরাম ও সিপাহ্‌সালার মুস্তাফা খাঁ ভাস্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন যে, নবাবেব সঙ্গে ভাস্কর যদি নিরস্ত্র গিয়া আলাপ-আলোচনা করেন তাহা হইলে তিনি যাহা চাহেন তাহাতে নবাব সম্মত হইবেন। জানকীরাম গঙ্গাজল ও শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া ভাস্করের নিরাপত্তার জামিন হইলেন :

জানকীরাম কহে গঙ্গাজল সালগ্রাম লইয়া।
কিছু চিন্তা নাই তোমাকে আনিল মিলাইয়া ॥

মুস্তাফা খাঁ কোরান স্পর্শ করিয়া বলিলেন :

কিছু কিন্তু জদি মনে কর তুমি।
কোরান দরমান লইয়া কিরা খাইছি আমি ॥

বিধাতা বাম হইলে লোকের বুদ্ধি লোপ পায়। ভাস্কর এই স্তোকবাক্যে

---

abandoned their homes and migrated to the eastern side of the Ganges in order to save the honour of their women." সমসাময়িক সংস্কৃত চম্পূকাব্য 'চিত্রচম্পূতেও ঐরূপ বর্ণনা আছে (দ্রষ্টব্য : সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—'ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা', পৃ. ১০-১১)। সুতরাং স্ত্রীলোকের প্রতি তাহারা যে অকথ্য অত্যাচার করিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভুলিয়া নিরস্ত্র অবস্থায় কিছু অনুচরসহ মানকরায় (বহরমপুর ক্যাউনির পূর্বে) আলিবর্দির শিবিরে যাত্রা করিলেন :

বিধাতা বিপত্য হইলে বুধ্য গুইলা গেল।
হাতিয়ার থুইয়া আইসা নবাবকে মিলিল॥

২রা বৈশাখ ১৭৪৪ সালে মানকরায় নবাবশিবিরে ভাস্কর সানুচর উপস্থিত হইলেন। চৌথের হার সম্পর্কে একটু-আধটু আলাপাদি চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে নবাব বাহিরে যাইবার প্রয়োজন বোধ করিলেন, সে কথা জানাইয়া মৃদু হাসিয়া তিনি শিবিরের বাহিরে 'লঘ্যি'[১৭] করিবার জন্ম গেলেন :

এতেক শুনিয়া নবাব কহিলেন হাসি।
খানিক বিলম্ব কর 'লঘ্যি' কইরা আসি॥

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর ভাস্কর যখন দেখিলেন নবাব ফিরিতে বিলম্ব করিতেছেন, তখন তিনি বোধ হয় কিছু আশঙ্কা করিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু ঘোড়ায় চড়িবার পূর্বেই সানুচর ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের সংগুপ্ত সেনানায়কদের দ্বারা নিহত হইলেন। গঙ্গারাম খুব সংক্ষেপে মাত্র চারি পংক্তিতে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বর্ণনা করিয়াছেন :

যেই মাত্র ভাস্কর ঘোড়াএ চড়িতে।
তলোয়াব খুলিয়া তখন মারিলেক তাথে॥
সেই ক্ষণে তবে খটাখট্টি হইল।
যতগুলা আইসা ছিল সবগুলা মইল॥

কবি যদি এই 'খটাখট্টি' আর একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতেন তাহা হইলে ইতিহাসে-অনুরক্ত আধুনিক পাঠক খুশী হইতেন।

সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণ একটি বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনা, যাহা বাঙলা-দেশকে দীর্ঘকাল ধরিয়া সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, গঙ্গারাম ঐতিহাসিকের তথ্যানুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সাহায্যে তাহার নিপুণ বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন। কাব্যের প্রারম্ভে ও মধ্যের একস্থলে পুরাণের যৎসামান্য অনুসরণ আছে বটে, কিন্তু আর কোথাও পৌরাণিক প্রভাব নাই। কবি নিঃস্পৃহভাবে বর্গীর অভিযান ও অত্যাচারের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। ভাষা ও বর্ণনায়

১৭ 'লঘ্যি' অর্থাৎ নিজেকে লঘু করা—ইংরাজী ককনি ভাষায় যাহাকে pissing বলে।

বিশেষ কোন কবিত্বলক্ষণ না থাকিলেও কবি নির্মম বর্ণনাতেও আশ্চর্য নিরাসক্তি রক্ষা করিয়াছেন—যাহা ইতিহাস-সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। মারাঠা ও নবাবপক্ষীয় সেনানায়কদের পরিচয়, পথঘাট ও বর্গার গমনপথের সঙ্কেত প্রভৃতি মূল্যবান তথ্য তিনি যেভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে বিশেষ প্রশংসা করিতে হইবে। দুই চারিটি ঐতিহাসিক ভ্রান্তি থাকিলেও মহারাষ্ট্র পুরাণ ইতিহাস-কাব্য হিসাবে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকা॥

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কাব্যগুণের দিক হইতে না হইলেও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের দিক হইতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অল্পস্বল্প নূতনত্বের সঞ্চার হইয়াছিল। দেবদেবীর লীলাকথা কিছু অন্তরালে রাখিয়া সমসাময়িক ইতিহাস ও সমাজের বাস্তব চিত্রাঙ্কনে কবিগণ কৌতূহলী হইয়াছিলেন। কিন্তু ময়মনসিংহ এবং পূর্ববঙ্গের নানা স্থান হইতে (ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রাম) যে পালাগানগুলি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে, অনাধুনিক বাংলা সাহিত্যে তাহা এক অভিনব ব্যাপার তাহাতে সন্দেহ নাই। এই গাথা ও গীতিকা লইয়া প্রচুর আলোচনা হইয়াছে, মতান্তর সৃষ্টি হইয়াছে, সংশয়ের মেঘ ঘনাইয়াছে। বিদেশী পণ্ডিতেরাও এই সমস্ত বিতর্কে যোগ দিয়া ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা সম্বন্ধে ভারতের বাহিরের অনুরাগী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।[১৮] এই গাথাগীতিকা-সাহিত্যের প্রচার, ব্যাখ্যা-ব্যাখ্যান—সমস্তই একজন ব্যক্তির আপ্রাণ চেষ্টার দ্বারা সম্ভব হইয়াছে—তিনি দীনেশচন্দ্র সেন। পূর্ববঙ্গের গাথা জাতীয়

---

১৮ দীনেশচন্দ্র ময়মনসিংহ-পূর্বনঙ্গ গীতিকার পালাগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া *Eastern Bengal Ballads* নামে প্রকাশ করেন। পাশ্চাত্যের অধিকাংশ পণ্ডিত সেই অনুবাদ হইতেই ময়মনসিংহ-পূর্বনঙ্গ গীতিকার আস্বাদ লাভ করিয়াছিলেন—তাঁহাদের প্রায় কেহই (গ্রীয়ার্সন বাদে) বাংলা জানিতেন না। সুতরাং দীনেশচন্দ্রের গদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যানের উপর তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইয়াছিল। সম্প্রতি প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ দুসান জ্বাভিতেল উত্তমরূপে বাংলা ভাষা শিখিয়া *Bengali Folk-Ballads from Mymensingh* (C. U.) শীর্ষক যে আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে আর অনুবাদের উপর নির্ভর করিতে হয় নাই।

সাহিত্যের প্রতি তাঁহার বরাবরই মমতা ছিল। তাঁহার আগ্রহে ও প্রয়াসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন কর্ণধার স্যর আশুতোষের আনুকূল্যের ফলে পূর্ববঙ্গের নদনদী-জলজঙ্গল-হাওড়ের এই গীতিকাগুলি আধুনিক যুগের পাঠকদের মনেও সপ্রশংস কৌতূহল সঞ্চার করিয়াছে।

গাথা ও গীতিকার কথা—পূর্ব-ময়মনসিংহ এবং পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল হইতে সংগৃহীত গীতিকাগুলি 'ব্যালাড' (গাথা বা গীতিকা সাহিত্য) সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ইংরাজী ballad শব্দটি প্রাচীন লাতিন ballare হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, যাহার অর্থ নৃত্য। পূর্বে পাশ্চাত্যে যে সমস্ত কাহিনীকে নৃত্যগীতে পরিবেশন করা হইত তাহাকে ballad বলিত। প্রথম দিকের ব্যালাডে বিশেষ কোন কাহিনী ছিল না। কিন্তু মধ্যযুগে দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে যুদ্ধবিগ্রহ, প্রেমপ্রণয় প্রভৃতি বিষয়ে গীতিধর্মী লোককাহিনী প্রচলিত হইতে আরম্ভ করে। আদিম যুগে জনসাধারণ যে সমস্ত ঘটনা অবলম্বনে নৃত্যগীতে মত্ত হইত তাহাই ক্রমে গীতাত্মক কাহিনীর রূপ ধারণ করে। বলা বাহুল্য এই লোকসাহিত্য প্রাচীনকালে মুখে মুখে প্রচারিত হইয়াছিল। কালক্রমে এই সমস্ত লোকগাথা মহাকাব্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে ইংরাজী সাহিত্যে লোক-গাথাকাব্যকে শিক্ষিত সম্প্রদায় সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নব্য ক্লাসিকতার কৃত্রিম শাসনে বিক্ষুব্ধ গীতিকবিরা রোমান্টিক গীতিকবিতার পুনর্জাগরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা (ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোলরীজ) কৃষকসমাজে প্রচলিত পুরাতন স্কটিশ ব্যালাডকে সর্বপ্রথম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে শুরু করেন। বিশপ পার্শি *Reliques of Ancient English Poetry (1765)* শীর্ষক সঙ্কলনে বহু ব্যালাড সংগ্রহ করেন। এই সময় নব্য রোমান্টিক কবিগণ পুরাতন ইংরাজী ও স্কটিশ ব্যালাডের অনুসরণে আধুনিক ব্যালাড লিখিতে আরম্ভ করেন। বার্নস্‌, স্কট এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ গোষ্ঠীর চেষ্টায় প্রাচীন ব্যালাডের আধুনিক রূপান্তর ইংরাজী গীতিকবিতার এক নূতন দিগন্ত খুলিয়া দিয়াছিল। আমাদের দেশেও ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকার আদর্শে ও প্রভাবে কবি জসিমুদ্দিন আধুনিক ব্যালাড রচনা করেন, সেগুলি তাঁহার কাব্যগ্রন্থাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

অতি পুরাতন যুগ হইতে জনসাধারণ যে সমস্ত কাহিনী লইয়া গান বাঁধিত, পাঁচালী রচনা করিত, তাহার উপাদান মর্ত্যভূমি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল। এগুলি লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।[১৯] কোন একটি নাটকীয় ধরনের দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রেম-প্রণয় বা দ্বন্দ্ব-কলহ-সংঘর্ষঘটিত স্থানীয় কাহিনী পুরাতন গীতিসাহিত্যের পটভূমিকা বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। অবশ্য অধ্যাত্মচেতনা, অলৌকিকতা, অদ্ভুত ব্যাপারও ব্যালাড বা গীতিসাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্যে সুপরিচিত ব্যালাডের অন্তর্ভুক্ত *Thomas Rymer* গাথায় পরীস্থানের কাহিনী এবং *The Wife of Usher's Well*-এ অলৌকিক জগতের কথা স্থান পাইয়াছে। আমাদের নাথসাহিত্যের খানিকটা গাথাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। সে যাহা হউক, মর্ত্যজীবনের আলো-ছায়ার লীলাই যে গাথাগীতিকা সাহিত্যের ভিত্তিভূমি তাহা স্বীকার করিতে হইবে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গাথা-গীতিকার যে একেবারেই উদ্ভব হয় নাই তাহা নহে। মঙ্গলকাব্যের অনেকটাই পুরাতন গাথা-সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু বিশুদ্ধ গাথা-গীতিকা সাহিত্যের যথার্থ দৃষ্টান্ত মিলিয়াছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য়। ইহার শ্রেষ্ঠ আখ্যায়িকাগুলি মর্ত্যপ্রেমের অশ্রুবেদনায় ভরপুর। পুরাতন পাশ্চাত্য ব্যালাডের অনেক-গুলিতে ব্যর্থ প্রেমের রক্তাক্ত প্রতিহিংসা ও জিঘাংসাই প্রধান স্থান পাইয়াছে, কিন্তু পূর্ববঙ্গের গীতিকাগুলিতে প্রেমের ত্যাগ তিতিক্ষা ও বেদনা অধিকতর বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। মধ্যযুগের উপান্তভূমিতে রচিত হিন্দু-মুসলমানের অসাম্প্রদায়িক হৃদয়বৃত্তির যে অপূর্ব সমন্বয় এই সমস্ত গীতিসাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আর কোথাও তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অবশ্য প্রেম-প্রণয় ব্যতীত ঐতিহাসিক যুদ্ধ-সংঘর্ষ লইয়াও পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ হইতে কিছু কিছু গাথা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহার শিল্পমূল্য প্রেমপ্রণয়ঘটিত গাথাগুলির মতো উৎকৃষ্ট নহে।

---

১৯ কেহ কেহ মনে করেন, ব্যালাড মধ্যে মাঝে যেরূপ উচ্চতর কাব্যগুণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে তাহাতে ইহাকে পুরাপুরি লোকসাহিত্য বলা যায় না। মনে হয় ইহার পশ্চাতে কোন উচ্চতর প্রতিভাসম্পন্ন কবির হস্তক্ষেপ রহিয়াছে, অন্ততঃ রবিনহুডের ব্যালাড এবং সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর স্কটিশ ব্যালাডের সুগঠিত শিল্পমূর্তি দেখিয়া তাহাই মনে হয়। (—*Dictionary of World Literary Terms*—Edited by J. T. Shipley, p. 34)

ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকার আবিষ্কার—এখন দেখা যাক কিভাবে এই সমস্ত পূর্ববঙ্গীয় গাথা-গীতিকা আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইল। ১৯১২-১৩ সালের কথা। ময়মনসিংহ হইতে কেদারনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় 'সৌরভ' নামে প্রথম শ্রেণীর একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। উক্ত পত্রের বাংলা ১৩২০ সনের বৈশাখ সংখ্যায় (১৯১৩, এপ্রিল) চন্দ্রকুমার দে নামক কোন এক ব্যক্তি 'মালীর জোগান' নামে একটি প্রবন্ধে ময়মনসিংহে প্রচলিত অনেকগুলি কবিগান[২০] মুদ্রিত করেন। ইতিপূর্বে ময়মনসিংহের সাহিত্য বা লোকসাহিত্য সম্পর্কে কলিকাতার সাহিত্যসমাজ কিছুই জানিতেন না, এমন কি শিক্ষিত ময়মনসিংহবাসীরাও এবিষয়ে বিশেষ কোন সংবাদ রাখিতেন না।[২১] যাহা হউক, দীনেশচন্দ্র কৌতূহলী হইয়া 'সৌরভে'র পুরাতন সংখ্যা খুঁজিয়া দেখিয়া অভিলষিত বস্তু পাইয়া বিস্মিত হইলেন। ১৯১২-১৪ সালে 'সৌবভ' পত্রিকা ঘাঁটিয়া তিনি দেখিলেন, উক্ত চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত দস্যু কেনারামের পালা, কবি কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর, চন্দ্রাবতী-সংক্রান্ত গাথার দুই-চারি পংক্তি দৃষ্টান্তের পশ্চাতে ময়মনসিংহের অজ্ঞাত-পরিচয় এক বিরাট পালাসাহিত্য উঁকি দিতেছে। তখন তিনি 'সৌরভ' সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদারের সহায়তায় চন্দ্রকুমার দে-কে খুঁজিয়া বাহির করিলেন।

১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কেন্দুয়া ডাকঘরের অন্তর্ভুক্ত আইথর গ্রামে অতি দরিদ্রবংশে চন্দ্রকুমার দে-র জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রামকুমার দারিদ্র্যের জন্য পুত্রকে বিশেষ লেখাপড়া

---

২০ অবিভক্ত বাঙলাদেশের ময়মনসিংহে প্রচুর কবিগান প্রচলিত ছিল। হিন্দু মুসলমান—উভয়েই মহানন্দে কবির লড়াইয়ে যোগ দিত। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দেব তাঁহার 'পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ' পুস্তিকায় এইরূপ অনেক আধুনিক কবিগানের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

২১ দীনেশচন্দ্র অনেক শিক্ষিত ময়মনসিংহবাসীর নিকট স্থানীয় গ্রাম্যগাথা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তাঁহারা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিয়াছিলেন, "ছোটলোকেরা, বিশেষতঃ মুসলমানেরা ঐ সকল মাথামুণ্ডু গাহিয়া যায়, আর শত শত চাষা লাঙ্গলের উপর বাহুভর করিয়া দাঁড়াইয়া শোনে। ঐ গানগুলির মধ্যে এমন কি থাকিতে পারে যে, শিক্ষিত সমাজ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন?" এমন কি কেহ কেহ দীনেশচন্দ্রের হিতের জন্য এমন উপদেশও দিয়াছিলেন, "আপনি এই ছেঁড়া পুঁথিগুলি দিন কয়েকের জন্য ছাড়িয়া দিন।" (ময়মনসিংহ গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, ২য় সংস্করণ, পৃ. /০)

শিখাইতে পারেন নাই। চন্দ্রকুমার বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় যৎসামান্ত বাংলা ব্যতীত শিক্ষা ব্যাপারে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। জমিদারের অত্যাচারে তাঁহাদের সর্বমাত্র সম্বল কয়েক বিঘা জমিও চলিয়া যায়। বাল্যেই তাঁহার মাতা-পিতা উভয়েরই মৃত্যু হয়। অতি অল্প বয়সে তাঁহাকে মাসিক একটাকা বেতনে মুদিখানার দোকানে চাকুরী লইতে হয়। কিন্তু সে কার্যে অসমর্থ দেখিয়া দোকানদার তাঁহাকে বরখাস্ত করিল। তখন তিনি বহু কষ্টে দুই টাকা মাহিনায় গ্রাম্য তহসিলদারের পদ লাভ করিলেন। এই সময়ে লোকসাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার আশ্চর্য উপায়ে যোগাযোগ ঘটিয়া গেল। খাজনা আদায়ের অবকাশে তিনি নিরক্ষর হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের সঙ্গে মেলামেশা করিতেন, তাহাদের বারোমাসী গান শুনিতেন, তাহারা দলবদ্ধভাবে এই গান গাহিত। যৌবনে নিজে চেষ্টা করিয়া চন্দ্রকুমার ভাল বাংলা লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, সাহিত্যাদিতেও তাঁহার বেশ অনুরাগ ছিল। ক্রমে তিনি স্থানীয় মাসিক পত্র 'সৌরভে' নিজ সংগৃহীত ছড়া ও পালাগান প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কয়েকটি প্রবন্ধও লিখিলেন। 'সৌরভ' সম্পাদক কেদারনাথ চন্দ্রকুমারকে এই সমস্ত গান সংগ্রহ করিতে উৎসাহিত করিতেন। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত ছড়া ও পালাগান-গুলি কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম দীনেশচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[২২] তিনি তখন কেদারনাথের মারফতে চন্দ্রকুমারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। সেই সময় কিছুদিন দরিদ্র চন্দ্রকুমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া বাড়ী বসিয়াছিলেন। যাহা হউক একটু সুস্থ হইয়া তিনি ১৯১৯ সালে দীনেশচন্দ্রের আহ্বানে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। দীনেশচন্দ্র তৎপর হইয়া তাঁহার চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করিলেন। চন্দ্রকুমার উক্ত পালা গান সম্বন্ধে কিন্তু খুব উৎসাহ দেখাইলেন না। তিনি বলিলেন যে, লোকমুখে প্রচারিত এই সমস্ত পালাগান সংগ্রহ করা সহজ নহে, কারণ একজনের নিকট পুরাগান পাওয়া যায় না—"এখন একটি পালাগান সংগ্রহ করিতে হইলে বহু লোকের দরবার করিতে হয়। কাহারও একটি গান মনে আছে, কাহারও বা দুইটি,—নানা গ্রামে পর্যটন করিয়া নানা লোকের

২২ D. C. Sen (edited)—*Eastern Bengal Ballads*, Vol. 1, Part I, Introduction, pp. XVI—XVII

শরণাপন্ন হইয়া একটি সম্পূর্ণ পালা উদ্ধার করিতে পারা যায়।"[২৩] তাঁহার সংগৃহীত কিছু কিছু পালাগানে খুশি হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার আশুতোষের উদ্যোগে দীনেশচন্দ্র তাঁহাকে একবৎসরের জন্য বেতনভোগী পালা-সংগ্রাহকের পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার নির্দেশে চন্দ্রকুমার পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চল ঘুরিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পালা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অবশ্য প্রথম প্রথম নিরক্ষর কৃষক-কবির মৌখিক পালাগান অপেক্ষা পুরাতন ট্র্যাডিশনের পুঁথিপত্রাদির উপর চন্দ্রকুমারের বেশী ঝোঁক ছিল। ময়মনসিংহের প্রাচীন কবি মুক্তারামের দুর্গাপুরাণ, রামকান্তের মনসার ভাসান, উমার বিবাহ, দুর্বাসার পারণ, দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ, নরমেধযজ্ঞ প্রভৃতি পৌরাণিক ঘটনার পুঁথি সংগ্রহের জন্য তিনি অধিকতর কৌতূহলী হইয়াছিলেন। কিন্তু দীনেশচন্দ্র চন্দ্রকুমারকে পৌরাণিক ঘটনার পুঁথিপত্রাদি ছাড়িয়া শুধু মৌখিক পালাগান সংগ্রহের উপদেশ দিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিয়া লই। চন্দ্রকুমার শুধু একজন বেতনভুক পালাসংগ্রাহকমাত্র ছিলেন না, নিজের চেষ্টায় তিনি বাংলা লেখাপড়া বেশ ভালই শিখিয়াছিলেন। উপরন্তু তাঁহার আবার কিঞ্চিৎ সাহিত্যনিষ্ঠা ছিল, কবিপ্রতিভাও ছিল। 'সৌরভ' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিবার জন্য সম্পাদক কেদারনাথ এই দরিদ্র সাহিত্যিক সর্বদা উৎসাহিত করিতেন। এখানে এই সংবাদটির উল্লেখের কারণ, পরে আমরা বিচার করিয়া দেখিব, কবি-প্রতিভার কিঞ্চিৎ অধিকারী চন্দ্রকুমার সংগৃহীত পালার ভাষা ও বর্ণনায় কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন কি না। ময়মনসিংহ গীতিকার ১ম খণ্ডের ২য় ভাগের ভূমিকায় দেখা যাইতেছে, গোড়ার দিকে চন্দ্রকুমার এই পালাগানগুলি কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের প্রীতিকর হইবে না আশঙ্কা করিয়া চিরাচরিত পৌরাণিক কাহিনীর পুঁথিপত্র সংগ্রহ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দীনেশচন্দ্র তাঁহাকে গতানুগতিক পুঁথি বাদ দিয়া শুধু পল্লীগীতিকা সংগ্রহের জন্যই নির্দেশ দিয়াছিলেন।[২৪]

গীতিকাসমূহের পালাবিন্যাস—দীনেশচন্দ্রের নির্দেশে চন্দ্রকুমার দে

---

২৩ দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত—ময়মনসিংহ গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ. ৶৹

২৪ সংগৃহীত মৌখিক পালাগানে চন্দ্রকুমার হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন কিনা, সে বিষয়ে পরে 'গীতিকাসমূহের প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা' শীর্ষক উপচ্ছেদে আলোচনা আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালাসংগ্রাহকরূপে নিম্নলিখিত পালাগুলি সর্বপ্রথম সংগ্রহ করিয়াছিলেন :—(১) দ্বিজ কানাই রচিত মহুয়া, (২) মলুয়া, (৩) নয়নচাঁদ ঘোষ রচিত জয়চন্দ্র-চন্দ্রাবতীর পালা, (৪) দ্বিজ ঈশান রচিত কমলা, (৫) দেওয়ান ভাবনা, (৬) রঘুসুত, দামোদর, নয়নচাঁদ ও শ্রীনাথ বানিয়া রচিত কঙ্ক ও লীলা, (৭) মনসুর বয়াতি রচিত দেওয়ানা মদিনা, (৮) রূপবতী, (৯) চন্দ্রাবতী রচিত কেনারাম, (১০) কাজল-রেখা, (১১) দেওয়ান মসনদ আলি, (১২) ফিরোজ খাঁ, (১৩) ভেলুয়া সুন্দরী, (১৪) জিরালনি, (১৫) মদনকুমার ও মধুমালা, (.৬) কবি কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর[২৫], (১৭) চন্দ্রাবতীর রামায়ণ[২৬], (১৮) কবিগান, (১৯) রাধাকৃষ্ণ গীতিকা ৪ যাত্রাগান, (২০) অসমা সুন্দরী, (২১) সুলা গায়েন রচিত গোপিনীকীর্তন, (২২) দেওয়ান মনোহর খাঁ।

বিহারীলাল সরকার, আশুতোষ চৌধুরী, নগেন্দ্রচন্দ্র দে, মনোরঞ্জন চৌধুরী, কবি জসিমুদ্দিন প্রভৃতি সংগ্রাহকদের দ্বারা দীনেশচন্দ্র আরও অনেক পালা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ক্রমে ১৯২৩ হইতে ১৯৩২ সালের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দীনেশচন্দ্রের সম্পাদনায় বিস্তারিত ভূমিকাসহ 'ময়মনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' প্রকাশিত হয়। অবশ্য প্রথমে প্রতিখণ্ডের ইংরাজী অনুবাদ ও ভূমিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তারপর বাংলা পালাগান ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়।

চারিখণ্ডে প্রকাশিত এই পালাসংগ্রহের প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগ ইংরাজীতে *Eastern Bengal Ballads—Mymensingh* (Vol. I, Part I, 1923) এই নামে প্রকাশিত হয়। ইহার বাংলা সংস্করণ 'ময়মনসিংহ গীতিকা', প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা নামে মুদ্রিত হয় (১৯২৩)। ইংরাজী খণ্ডে দীনেশচন্দ্র মূল পালার গদ্যানুবাদ সংযুক্ত করিয়াছিলেন, বাংলা খণ্ডে মূল পালা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংরাজী ও বাংলা খণ্ডের ভূমিকা প্রায় এক প্রকার। প্রথম খণ্ডে মোট দশটি পালা মুদ্রিত হইয়াছিল—(১) মহুয়া, (২) মলুয়া, (৩) চন্দ্রাবতী, (৪) কমলা, (৫) দেওয়ান ভাবনা, (৬) দস্যু কেনারামের পালা, (৭) রূপবতী, (৮) কঙ্ক ও লীলা, (৯)

২৫ এই গ্রন্থের ১৯১—১৯৮ পৃষ্ঠায় এই কাব্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

২৬ চন্দ্রাবতীর রামায়ণ সম্পর্কে ৪৪৪—৪৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

কাজলরেখা, (১০) দেওয়ানা মদিনা। ইংরাজী খণ্ডেও এই দশটি পালার সংক্ষিপ্ত গদ্য অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। এই দশটি পালাই চন্দ্রকুমার দে সংগ্রহ করেন।

পূর্ব-ময়মনসিংহবাসী দ্বিজকানাই নামে কোন এক নমঃশূদ্র-ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ভুক্ত কবি নাকি তিনশত বৎসর পূর্বে যাত্রার ঢঙে মহুয়া পালা রচনা করেন।[২৭] তিনি দল তৈয়ারি করিয়া নাটকের আকারে অভিনয়ও করিয়াছিলেন। শুনা যায় এই দ্বিজকানাই নমঃশূদ্র জাতীয়া কন্যার প্রতি প্রণয়াসক্ত হন এবং মহুয়া পালায় বর্ণিত নদের চাঁদের মতো তিনিও দুঃখ ভোগ করেন। এই তথ্য দীনেশচন্দ্র চন্দ্রকুমারের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। অবশ্য এই সমস্ত গালগল্পের সততা পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য কিনা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। মহুয়ার পালার ভাষা কিছুতেই তিনশত বৎসরের প্রাচীন হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ তিনশত বৎসর পূর্বে উক্ত দ্বিজকানাই "organised a party of players and was the first to put the melodrama on the stage"[২৮]—ইহাও বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ তিনশত বৎসর পূর্বে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হইত না, দর্শকদের মাঝখানে খোলা স্থানে যাত্রাভিনয় হইত। মনে হয়, আধুনিক কালের কোন দ্বিজকানাই এই পালাগান রচনা করিয়া থাকিবেন।[২৯] কিন্তু পালাগানের কোথাও রচনাকারের ভণিতা নাই। দীনেশচন্দ্রও স্বীকার করিয়াছেন, চন্দ্রকুমার দে নানাজনের নিকট হইতে পালাটির টুক্‌রা টুক্‌রা সংগ্রহ করেন, কেবল শেখ আশাকালির নিকট একটু বেশী সাহায্য পাইয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্রকে চন্দ্রকুমার যেভাবে পালাটি পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে নানা বিশৃঙ্খলা ছিল।[৩০] মাঝে মাঝে সংলাপের ঢঙে গদ্য-উক্তিও ছিল—কিন্তু চন্দ্রকুমার

২৭ *Eastern Bengal Ballads*, Vol, I, Pt. I, Preface to 'Mahua the Gypsy Girl'.

২৮ Ibid

২৯ পরে প্রামাণিকতা প্রসঙ্গে মহুয়ার প্রাচীনতা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

৩০ দীনেশচন্দ্র বিশৃঙ্খল পালাটিকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনিতে গিয়া ইহাতে বেশ খানিকটা হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, *Eastern Bengal Ballads*-এ তাহা স্বীকার করিয়াছেন, "I had to take great pains to rearrange the poem by a close and careful study of the text." (Vol. I, pt. 1, p. ii)

গদ্যাংশগুলি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।[৩১] আরও জানা যাইতেছে, ইহাতে বেদিয়ার কন্যার সঙ্গে ব্রাহ্মণযুবার প্রেমের চিত্র ছিল বলিয়া নাকি হিন্দু বাড়ীতে এই গান বড় একটা অনুষ্ঠিত হইত না। তাই সাধারণতঃ মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজে এই পালাগান অনুষ্ঠিত হইত।[৩২] মলুয়া (দীনেশচন্দ্রের মতে ইহা মল্লিকা শব্দের অপভ্রংশ) পালার অধিকাংশ চন্দ্রকুমার পাষাণী বেওয়া নাম্নী এক পালাগায়িকার নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। শেখ কাঁচা এবং নিদান ফকিরও এই পালার খানিকটা চন্দ্রকুমারকে গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্রের মতে, ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা। অবশ্য এই ধরনের কোন পালার লিখিত পুঁথি পাওয়া যায় নাই; গায়ক-গায়িকাদের মুখ হইতে শুনিয়া লিখিয়া লওয়া হইয়াছে। সুতরাং ইহার রচনাকাল নির্ধারণ করা দুরূহ। তবে ইহাতে মুসলমান কাজীর যেরূপ অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় এই কাহিনী সপ্তদশ না হইলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর হইতে পারে, তবে ভাষা প্রাচীন নহে—একেবারে হাল আমলের। কে ইহার রচনাকার তাহা জানা যায় না। প্রথমে বন্দনাংশে চন্দ্রাবতীর ভণিতা আছে দেখিয়া দীনেশচন্দ্র ইহাকে চন্দ্রাবতীর রচনা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন—অবশ্য ইহাও অনুমান মাত্র।

চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্রের কাহিনী সংবলিত পালা নয়নচাঁদ ঘোষের রচনা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ভণিতায় কোন নাম নাই। কমলার পালা চন্দ্রকুমার তিন চার জন স্ত্রীলোকের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। পালার এক স্থানে দ্বিজ ঈশান ভণিতা আছে ("দ্বিজ ঈশান কয় কিল আর তেল। একবার পড়িলেই গণ্ডগোল গেল॥")। দীনেশচন্দ্র মনে করেন, ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা। কিন্তু রাঢ় অঞ্চলের আধুনিক কথিত ভাষার সঙ্গে এই পালার ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। যথা—

পানের গোলাম হইয়া শিরে উঠতে চায়।
বেঙ্গে কবে শুনেছিস পদ্মের মধু খায়॥
ইচ্ছা যদি করি তাবে দিতে পারি শূলে।
কুকুরে কামড়ায় কেবা কুকুরে কামড় দিলে।

---

৩১ পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ সংগৃহীত 'বাজানীর গানে' এই গদ্যাংশটুকু আছে।

৩২ পূর্ণচন্দ্র তাঁহার নিজ গ্রামের বাটিতে (ময়মনসিংহ জেলার বাসোয়া গ্রাম) ১২৯১।৯২ সালের দিকে বাজানীর গান শুনিয়াছিলেন। ('বাজানীর গান'-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

সুতরাং এ পালার ভাষায় কিছু গাঢ়তর হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 'দেওয়ান ভাবনা' পালার অনেকটা চন্দ্রকুমার কৈলাসচন্দ্রের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন, বাকি অংশ নেত্রকোণা মহকুমার কেন্দুয়া গ্রাম-নিবাসী কয়েকজন পালাগায়ক মাঝিদের নিকট পাওয়া যায়। এই পালা সাধারণতঃ কৃষকসমাজেই গীত হইত। 'কেনারামের পালা' চন্দ্রাবতীর রচিত বলিয়া মনে হয়। কারণ মাঝে মাঝে চন্দ্রাবতীর ভণিতা আছে।[৩৩] কিন্তু পালাটির ভাষায় আধুনিক লক্ষণ অতি স্পষ্ট। হয়তো কালক্রমে লোকমুখে ভাষা বদলাইয়া গিয়াছে, কিংবা হয়তো আধুনিক কালের কেহ ইহাতে কিছু কিছু সংস্কার কার্য চালাইয়াছেন। 'রূপবতী' পালাটি চন্দ্রকুমার নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করেন। ইহার পটভূমিকায় কিছু স্থানীয় ঘটনা ছিল, পালার পাত্র-পাত্রীও যথার্থ ব্যক্তি। তাই চন্দ্রকুমারের উপদেশে দীনেশচন্দ্র পাত্র-পাত্রীর নাম-ধাম পাল্টাইয়া দিয়াছেন। 'কঙ্ক ও লীলা' পালার ভণিতায় রঘুসুত, দামোদর, নয়নচাঁদ ঘোষ ও শ্রীনাথ বানিয়ার নাম পাওয়া যায়। অবশ্য ইহার অধিকাংশ রঘুসুত ও দামোদরের রচনা। পালাটির রচনা ভঙ্গিমা একটু ঝঙ্কারবহুল। পালায় বর্ণিত কঙ্কই সত্যপীরের মহিমাজ্ঞাপক বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন।[৩৪] 'কাজলরেখা'র পালাটি অনেকটা রূপকথার মতো—ইহাতে গদ্য পংক্তিও আছে। পালাটিকে এই সঙ্কলন হইতে বাদ দিলে ভাল হইত। কারণ বহু পূর্বে দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার তাঁহার 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে ইহাকে রূপকথার আকারেই বিবৃত করিয়াছিলেন। চন্দ্রকুমার সংগৃহীত কাজলরেখার পালা গাথাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। 'দেওয়ানা মদিনা'র পালা মনসুর বয়াতি নামক এক নিরক্ষর কৃষকের রচনা, তাই ইহাতে স্থানীয় শব্দের বিশেষ প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ভাষার বাঁধুনি দেখিয়া ইহাকে নিরক্ষর ব্যক্তির রচনা বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ববঙ্গগীতিকার দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় মোট চৌদ্দটি পালা

---

৩৩ চন্দ্রাবতী কয় শুন গো অপুত্রীর ঘরে।
সুন্দর ছাওয়াল হৈল মনসার বরে॥

৩৪ পূর্বে ১১৬—১১৭ পৃষ্ঠার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী সংস্করণে[৩৫] বারটি পালা আছে—নীলা, মদনকুমার-মধুমালার পালা বাদ পড়িয়াছে। এই চৌদ্দটি পালার তালিকাঃ— (১) ধোপার পাট, (২) মইষাল বন্ধু, (৩) কাঞ্চনমালা, (৪) শান্তি, (৫) নীলা, (৬) ভেলুয়া, (৭) কমলারাণীর গান, (৮) মাণিকতারা বা ডাকাইতের পালা, (৯) মদনকুমার ও মধুমালা, (১০) সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া, (১১) নেজাম ডাকাইতের পালা, (১২) দেওয়ান ইশা খাঁ মসনদ আলি, (১৩) সুরৎজামাল ও অধুয়া, (১৪) ফিরোজ খাঁ দেওয়ান।

'ধোপার পাটের' কাহিনী চন্দ্রকুমার দে ১৯২৪ সালে ময়মনসিংহের সাকুইয়াবাড়ী গ্রামের রজনীকান্ত ভদ্র, চরশম্ভুগঞ্জবাসী দীন গোপ এবং কীর্তনখোলার মধুর বাপ নামক এক পালাগায়কের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। দীনেশচন্দ্র ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ভাব ও রচনা-ভঙ্গীতে অনুমান হয়, এই কবিতাটি চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল।"[৩৬] কিন্তু ইহার বিষয়বস্তুতে চতুর্দশ শতাব্দীর কোন চিহ্ন নাই, ভাষাতেও আধুনিককালের উপভাষার প্রভাব লক্ষণীয়। সুতরাং এই পালার রচনাকাল ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর পূর্বে যাইতে পারে না। একটু দৃষ্টান্তঃ—

সত্য কর সুন্দর কন্যা লো সত্য কর বইয়া।
নিশাকালে আইবা তুমি ফুলের মধু লইয়া॥
এইখানে থাকিয়া আমি বাজাইবাম বাঁশী।
এইখানে তোমারে লইয়া কাটাইবাম নিশি॥
এইখানে পাতিয়া রাখ বাঁশপাতার বিছান।
তোমারে লইয়া বুকে দেখবাম স্বপন॥ (পূ. গী. ৪র্থ—২য়, পৃ. ৫)

ইহা কখনও চতুর্দশ শতাব্দীর ভাষা হইতে পারে না। ইহার আইবাম, বাজাইবাম, কাটাইবাম, দেখবাম—ভবিষ্যৎবাচক পূর্ববঙ্গীয় ক্রিয়াগুলি তুলিয়া দিয়া পশ্চিমবঙ্গীয় চলিত বা সাধু ক্রিয়াপদ বসাইয়া দিলে ইহাকে স্বচ্ছন্দে কবি জসিমুদ্দিন বা কবি বন্দে আলি মিয়ার রচনা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়। 'মইষাল বন্ধু'র দুইটি পালা চন্দ্রকুমার সংগ্রহ করেন, তন্মধ্যে একটি ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণা হইতে সংগৃহীত। 'কাঞ্চনমালা'র পালা পুরাপুরি রূপকথার ধরনে গদ্যেপদ্যে রচিত। হরচন্দ্র বর্মা ও রামকুমার

---

৩৫ *Eastern Bengal Ballads*, Vol. II, pt. I

৩৬ পূর্ববঙ্গগীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ. ১০.

মিস্ত্রীর নিকট শুনিয়া চন্দ্রকুমার ইহা লিখিয়া লইয়াছিলেন। কবি জসিমুদ্দিন (তখন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালাসংগ্রাহক ছিলেন) ফরিদপুরের এক নিরক্ষর মুসলমানের নিকট 'শান্তি ও নীলার পালা' শুনিয়া সংগ্রহ করেন। ইহার ভণিতায় জয়ধর বাণিয়ার উল্লেখ আছে বলিয়া দীনেশচন্দ্র ইঁহাকেই পালার আদি রচয়িতা বলিয়াছেন। ইতিপূর্বে এই পালার আর এক ছাপা সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। পালাটি অনেকটা বারোমাসী জাতীয়। চন্দ্রকুমার বানিয়াচঙ্গ হইতে 'ভেলুয়ার পালা' সংগ্রহ করেন। কিন্তু তাঁহার পূর্বে চট্টগ্রাম হইতে হামিদুল্লা নামে এক কবি এই কাহিনী অবলম্বনে 'ভেলুয়াসুন্দরী' কাব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার আরও নানা ছাপা সংস্করণ পাওয়া যায়। দীনেশচন্দ্রের মতে, মুদ্রিত পালাগানগুলিতে লোকসাহিত্যের লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে। 'কমলারাণী'র পালাগান চন্দ্রকুমার সবটা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, মাত্র দুইটি সর্গ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, দীনেশচন্দ্রের নিকট পাঠাইবার সময় তিনি তাহার সারাংশ পাঠাইয়াছিলেন।[৩৭] ইহার সরল অর্থ—চন্দ্রকুমার ইচ্ছামত পালাটি ছাঁটিয়া কাটিয়া দীনেশচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ইহার ভণিতায় অধরচাঁদের নাম আছে। তিনি বোধ হয় আদি রচনাকার হইবেন। সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়াটি ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইবার কোন কারণ নাই। কারণ ইহা কাব্যরস-বর্জিত ক্ষুদ্র একটি আধুনিক ছড়া, তদুপরি ইহা পশ্চিমবঙ্গের ঘটনা। দীনেশচন্দ্র ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "এই ক্ষুদ্র ছড়াটিতে বিশেষ কবিত্ব না থাকিলেও ইহার কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া পালাটিকে 'গীতিকা'য় সন্নিবিষ্ট করিলাম।'[৩৮] —ইহা যুক্তিসঙ্গত মনে হইতেছে না। ইতিপূর্বে এই ছড়া সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। পালাসংগ্রাহক আশুতোষ চৌধুরী 'নিজাম ডাকাইতের পালা' চট্টগ্রামের দুইজন মুসলমানের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকের মতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে দিল্লীর নিকট জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি দুর্দান্ত ডাকাত ছিলেন। পরে প্রসিদ্ধ পীর শেখ ফরিদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁহার চরিত্রের আমূল পরিবর্তন হয়—তিনি সাধক ভক্তে

৩৭ পূর্ববঙ্গগীতিকা, ২।২, পৃ ২৪

৩৮ ঐ, পৃ. ৩৬

পরিণত হয়। এই ছড়াটিতে সেই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য ঘটনাটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের রত্নাকর দস্যু ও পালাগানের কেনারাম ডাকাতের কাহিনীর আদর্শে গ্রথিত হইয়াছে। জঙ্গলবাড়ীর প্রসিদ্ধ ভুঁইয়া ঈশা খাঁ সম্বন্ধে মোট চারিটি পালাগান পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীনতম পালাটি, দীনেশচন্দ্রের মতে সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত। কবির কোন নাম পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় পালা কিশোরগঞ্জ গলাচিপা নিবাসী আবদুল করিম রচিত। তৃতীয় পালায় ঈশা খাঁয়ের পৌত্র মনুয়ার খাঁয়ের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ পালার নাম 'দেওয়ান ফিরোজ খাঁয়ের গান'। এই চারিটি পালায় ঈশা খাঁ সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহার পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে পারা যায় না, ইতিহাসের সঙ্গেও অনেক বিরোধ আছে। একদা ঈশা খাঁয়ের প্রতাপের কাহিনী এবং তাঁহার সঙ্গে কেদাররায়ের ভগিনীর (কন্যার) ঘটনা লইয়া অনেক পালা রচিত হইয়াছিল —তাহার যৎসামান্য রক্ষা পাইয়াছে। এই সমস্ত ছড়া-পাঁচালীতে ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান করা পণ্ডশ্রম মাত্র। চন্দ্রকুমার শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ্গ হইতে ছুরত জামাল ও অধুয়াসুন্দরীর পালা সংগ্রহ করেন—ইহা অন্ধকবি বৈদ্যু ফকির রচিত। ইহাতে বানিয়াচঙ্গের মুসলমান দেওয়ান-পরিবারের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। পালাটিতে ইসলামী ও গ্রাম্যশব্দের কিছু আধিক্য দেখা যায়। ফিরোজ খাঁ দেওয়ানের পালাটি চন্দ্রকুমার কয়েকজন মুসলমান গায়েন এবং একটি অন্ধ ভিক্ষুকের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন।

পূর্ববঙ্গগীতিকার তৃতীয় খণ্ডে (দ্বিতীয় সংখ্যা)[৩৯] মোট এগারটি পালা সংগৃহীত হইয়াছে :—(১) মাঞ্জুর মা, (২) কাফেনচোরা, (৩) ভেলুয়া, (৪) হাতীখেদা, (৫) আয়নাবিবি, (৬) কমলসদাগর, (৭) শ্যামরায়, (৮) চৌধুরীর লড়াই, (৯) গোপিনীকীর্তন, (১০) সুজাতনয়ার বিলাপ, (১১) বারতীর্থের গান।

'মাঞ্জুর মা' পালাগান নগেন্দ্রনাথ দে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহার রচনাকারের নাম পাওয়া যায় না। তবে বর্ণিত বিষয়, ভাষা ও রচনাভঙ্গিমা

[৩৯] *Eastern Bengal Ballads*-এর তৃতীয় খণ্ডটিকে Vol III ও Part I চিহ্নিত করা হইয়াছে। ইহাতে পূর্ববঙ্গ গীতিকার তৃতীয় খণ্ডের (দ্বিতীয় সংখ্যা) পালাগুলির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

দেখিয়া মনে হয় ইহা কোন মুসলমান কবির রচনা। 'কাঞ্চেন চোরা'র সংগ্রাহক আশুতোষ চৌধুরী। ইহার নায়ক মনসুর অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ডাকাতি করিয়া কুখ্যাত হইয়াছিল। সুতরাং তাহার অনেক পরে পালাটি রচিত হইয়াছিল। আধুনিক কালে রচিত হইলেও ইহাতে প্রচুর স্থানীয় শব্দ আছে বলিয়া মনে হয়, ইহাতে সংগ্রাহকেরা বড একটা হস্তক্ষেপ করেন নাই। তৃতীয় খণ্ডেব ভেলুয়ার পালার সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের ঐ নামের পালার কোন সম্পর্ক নাই। চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, নোয়াখালি অঞ্চলে ভেলুয়ার দুই প্রকার কাহিনী ও পালা প্রচলিত আছে। দীনেশচন্দ্রের পূর্বেই ঢাকা হইতে মুন্সী মোহাম্মদ আলি ভেলুয়ার কাহিনীর একটি মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৯২০)। তাহারও পূর্বে চট্টগ্রামের মকবুল আহম্মদ এই পালার আর একটি মুদ্রণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার অনেকগুলি সংস্করণ মুসলমান সমাজে বেশ প্রচার লাভ করিয়াছিল। আশুতোষ চৌধুরী মুদ্রিত পালা পরিত্যাগ করিয়া চট্টগ্রামেব কোন এক মুসলমান মাঝি এবং আর একজন বৃদ্ধ মুসলমান চিকিৎসকের নিকট হইতে গোটা পালাটি সংগ্রহ করেন। ভেলুযার কাহিনীতে কিঞ্চিৎ ইতিহাসের ছায়া আছে। হামিদুল্লা নামক কোন এক ফার্সী লেখক তাঁহাব 'তারিখী হামিদি' গ্রন্থে এই কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার ঘটনার ঐতিহাসিক কাল হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের নিকটবর্তী (ষোড়শ শতাব্দী)। এই ধরনের গান মুসলমান স্ত্রীসমাজে "হাঁহলা' নামে পরিচিত। তাঁহারা বিবাহের সময়ে এই গান গাহিয়া থাকেন।

হাতীধরা সংক্রান্ত হাতীখেদাব পালাগান চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলমান সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় আখ্যান। আসাম, ত্রিপুরা, চট্টগ্রামে একদা হাতী-ধরার অনেক কেন্দ্র ছিল, এখনও আছে। এখনও শিকারীরা খেদা, পবতালা, ফাঁসি ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ কৌশলে হাতী ধরিয়া থাকে।[৪০] চট্টগ্রামের

৪০ খেদা—বন্য হাতীকে তাড়াইয়া আনিয়া সুদৃঢ় বেড়ার মধ্যে আটক রাখা হয়।

পরভালা শিকার—কামান্ধ পুরুষ হস্তী ('মকনা') উন্মত্ত হইয়া দল ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়া লোকালয়ে ভয়ানক উৎপাত করে। তখন শিকারীরা কয়েকটি 'কুন্‌কী' হাতীর (স্ত্রী হাতী) সাহায্যে এই গুণ্ডাহাতীকে ধরিয়া ফেলে।

ফাঁসি শিকার—স্ত্রীহাতীকে পোষা হাতীর দ্বারা ভুলাইয়া সমতল ভূমিতে আনিয়া কৌশলে তাহাকে ফাঁসের দ্বারা আয়ত্ত করা হয়।

গর্জনিয়ার পাহাড়, ভুলাহাজরা, চুনতির পাহাড়, খুস্তাখালী ছড়ার নিকটবর্তী অঞ্চল, বাঙ্গাল হালিয়া ও নলুয়া ছড়া, পার্বত্য চট্টগ্রামের মাইয়নির মুখ এবং ত্রিপুরার অমরসাগর দোয়াল, মনু দোয়াল, সাইমা দোয়াল, দেওগাং দোয়াল, ধলাই দোয়াল, কল্যাণপুর দোয়াল, কমল খাঁ দোয়াল প্রভৃতি কেন্দ্র হাতী-ধরার জন্য বিখ্যাত। দুই এক শতাব্দী পূর্বে বিপদসঙ্কুল হাতীধরার কাহিনী লইয়া একাধিক পালাগান রচিত হইয়াছিল। এখনও চট্টগ্রাম অঞ্চলে হাতী-খেদার ছাপা পুস্তিকা মুসলমান সমাজে চলে।[৪১] আশুতোষ চৌধুরী কৃষকদের মুখ হইতে হাতীখেদার পালাটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

'আয়নাবিবির পালা' চন্দ্রকুমার কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। কমল সদাগরের পালা আশুতোষ চৌধুরী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রূপকথার 'শীত-বসন্তে'র অনুকরণে এই পালা রচিত হইয়াছে। মুসলমান পাটনী ও মাঝিরা এখনও এই গান গাহিয়া থাকে। চন্দ্রকুমার কিশোরগঞ্জের কয়েকজন ব্যক্তির নিকট শ্যামরায়ের পালাগানের কিছু কিছু সংগ্রহ করেন, তারপর ময়মনসিংহের বিখ্যাত তীর্থস্থান গুপ্তবৃন্দাবনের এক বৈরাগীর নিকট হইতে পুরাপালাটি লিখিয়া লন। এই পালায় সংগ্রাহক বোধ হয় কিঞ্চিৎ লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলেন, ভাষা দেখিয়া তাহাই মনে হয়। মহুয়া ও ধোপার পাটের সঙ্গে ইহার কাহিনীগত সাদৃশ্য আছে। দীনেশচন্দ্র বলিয়াছেন, "শ্যামরায়ের কবি খুব সম্ভব চণ্ডীদাসের সমকালবর্তী ছিলেন।...এই ভাবের পালাগান ষোড়শ শতাব্দীর পরে আর রচিত হয় নাই।"[৪২] দীনেশচন্দ্রের এই সমস্ত মন্তব্য নিতান্তই অনুমান মাত্র। ইহার ভাষা আধুনিককালের পূর্বে যাইতে পারে না। ইহাতে বর্ণিত নিঃস্বার্থ প্রেমের কাহিনী আধুনিক কালের অনেক লেখায় পাওয়া যাইবে। সুতরাং কাহিনী দেখিয়া শ্যামরায়ের পালাকে প্রাচীন বলা যায় না।

নোয়াখালী জেলার লামারচরনিবাসী মনোরঞ্জন চৌধুরী, এম. এ. মহাশয় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালাসংগ্রাহক) স্থানীয় কৃষকদের মুখ হইতে 'চৌধুরীর লড়াই' নামক অর্ধ-ঐতিহাসিক পালাগান সংগ্রহ করিয়া-

---

৪১ চট্টগ্রামের নবাপাড়া নিবাসী মকবুল আহম্মদের হাতীখেদার গান মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহা এখনও ঐ অঞ্চলের পাঠকসমাজে প্রচলিত আছে।

৪২ পূর্ববঙ্গগীতিকা, ৩।২, পৃ. ২৭১

ছিলেন। প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর পূর্বে নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের নিম্ন-শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে 'চৌধুরী লডাইয়ে'র খুব জনপ্রিয়তা ছিল। ইহা আগাগোড়া গান করা হইত। কিন্তু কোন কোন স্বল্পশিক্ষিত ও কবিযশঃ-প্রার্থী ব্যক্তি আধুনিক ছাঁচে ঢালিয়া এই কাব্যের মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়া পালাটির জাতি মারিয়াছেন। ইঁহারা ভারতচন্দ্রাদি পাঠ করিয়া তাঁহার গুণ ছাড়িয়া শুধু অশ্লীলতাটুকু ধরিয়া রাখিয়া একাধিকবার এই পালা ছাপাইয়াছিলেন। বছনিয়া শেখ, ইয়াকুব আলি, ইয়নস মিঞা প্রভৃতি লেখকেরা আদিরসের অশ্লীল ফোড়ন ছড়াইয়া নোয়াখালির চৌধুরী-পরিবারের পারিবারিক দুর্ঘটনা অবলম্বনে যে সমস্ত লোকরঞ্জক পালাগান মুদ্রিত করিয়াছিলেন, সাহিত্য হিসাবে তাহা অতি অপদার্থ। এমন কি কেহ কেহ এইরূপ কাহিনীতে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে অশ্লীল বর্ণনা দিবার জন্য আদালতে অভিযুক্ত হইয়া কিছু গুনাহ্‌গার দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।[৪৩] যাহা হউক যুদ্ধ সংঘর্ষ ও উৎকট আদিরসের সংমিশ্রণের জন্য চৌধুরীর লডাইয়ের মুদ্রিত পালাগান একদা নোয়াখালী-চট্টগ্রামের মুসলমানসমাজে খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল—যদিও কাহিনীটি হিন্দু জমিদারবংশকে কেন্দ্র করিয়াছে। নোয়াখালির বাবুপুর-জমিদারবংশ চৌধুরীপরিবারের নায়ক রাজচন্দ্র চৌধুরীর লাম্পট্য, অত্যাচার, নীচজাতীয়া স্ত্রীলোক লইয়া অবৈধ আচরণ, খুল্লতাত রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর প্রতিবাদ ও বিরোধিতা ইত্যাদি কাহিনী লইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যে খুনখারাবি কাণ্ড হইয়াছিল, এই দীর্ঘ পালাগানে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। এই পালাটি উত্তেজক কাহিনীমূলক য়ুরোপীয় ব্যালাডের অনুরূপ বলিয়া রচনাংশ উৎকৃষ্ট না হইলেও অন্যদিক দিয়া ইহার কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এখনও ঐ অঞ্চলে সেই সমস্ত ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন রহিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নেত্রকোণার অন্তর্ভুক্ত ঠাকুরকোণা গ্রামের সুলা (<সুলক্ষণা) নাম্নী এক মহিলাকবি 'গোপিনীকীর্তন' শীর্ষক কৃষ্ণলীলা-

---

৪৩ এই কাহিনীর অন্যতম লেখক ইয়নস মিঞা এবং প্রকাশক ও মুদ্রাকর রহিম বকস্ নোয়াখালির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অশ্লীল গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের দায়ে অভিযুক্ত হইয়া দুইজনে ৪০৲ টাকা হিসাবে জরিমানা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পুস্তকের সমস্ত কপি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল। পূ. গী, ৩২, পৃ, ২৯৮

বিষয়ক একটি পালাগান রচনা করিয়াছিলেন। রামী ও চন্দ্রাবতীকে ছাড়িয়া দিলে সুলা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় মহিলাকবি। নমঃশূদ্র কুলে জন্মিয়া তিনি বিদ্যা, সঙ্গীত ও নৃত্যে পারদর্শিতা অর্জন করেন, অতঃপর তিনি সুলা গায়েন নামে পরিচিত হন। তাঁহার বিবাহ-জীবন সুখের হয় নাই, স্বামী তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। তাঁহার রচনার মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের সেই ব্যর্থতার ইঙ্গিত আছে। নৃত্যগীতে কৃতিত্বের জন্য সুলা প্রায়ই ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে আহূত হইতেন। তাঁহার বৈষ্ণব পালাগানটি সহজ ভাষায় রচিত —নিতান্ত মন্দ নহে। অবশ্য পল্লীগাথার মধ্যে এই বৈষ্ণব কাহিনী অন্তর্ভুক্ত না হইলেই ভালো হইত। চন্দ্রকুমার দে এই পালাগান এবং সুলা গায়েনের জীবনী ময়মনসিংহের জমিদার বিজয়নারায়ণ আচার্যের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। বিহারীলাল রায় ময়মনসিংহ হইতে 'বারতীর্থের গান' শীর্ষক পালাটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পালাটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের রচনা, সজু বয়াতি নামক এক কৃষক-কবি ১২৮০ বঙ্গাব্দে ইহা রচনা করেন। ময়মনসিংহের অন্তর্গত জোয়ানশাহীতে এই বারতীর্থের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। এ সম্বন্ধে নানা পুরাতন অলৌকিক গল্প প্রচলিত থাকিলেও কাহিনীটির পশ্চাতে ঐতিহাসিক ঘটনাও আছে। উক্ত অঞ্চলের জমিদার দত্তবংশের নায়ক ভগদত্ত বারটি তীর্থে গিয়া পবিত্র সলিল সংগ্রহ করিয়া নিজ-রাজ্যে বিরাট দীঘি খনন করান এবং ঐ দীঘিতে বারতীর্থের জল সিঞ্চন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতির কালে কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে রাজ্যশাসন করিলেও অকৃতজ্ঞ প্রজারা ভগদত্ত তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিলে বিনাকারণে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। ইহাতে রামচন্দ্র ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হইয়া অভিশাপ দেন—এই দেশ জঙ্গলে পরিণত হইবে, প্রজারাও চিরদুঃখী হইবে। তাহার পরেই নাকি এই রাজ্য ও দীঘিকার মহিমা বিনষ্ট হয়। এখনও মধুপুরের দুর্ভেদ্য জঙ্গলের[৪৪] মধ্যে বিরাট পরিত্যক্ত পুরীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান কৃষক কবি রচনার ঢঙে ছড়া ও পালাগানের সুরটি চমৎকার রক্ষা করিয়াছেন। যথা—

---

৪৪ "মধুপুর জঙ্গলের কঠিন রক্তবর্ণ ভূমি ঢাকা হইতে আরম্ভ করিয়া জামালপুর পর্যন্ত বিস্তৃত।" পূ. ব. গী. ৩।২, পৃ, ৫০১

রাজা গেছে প্রজা গেছে গেছে রে ভাই ঠাট-ঠমক।
উজার ভিটা পইরা রইছে এ্যাহন শিয়ালের বৈঠক॥
হে-হে-হে।

কবি মুসলমান ছিলেন বলিয়া হিন্দুর তীর্থধর্মের প্রতি কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ করিতে কসুর করেন নাই। তিনি বলিতেছেন, বারতীর্থের জলপূত দীর্ঘিকার জল পান করিলে নাকি হিন্দুরা স্বর্গে যায়। তবে স্বর্গে যাক আর নাই যাক, ওলাউঠায় যে আক্রান্ত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই:

এইখানেতে চান করিলে হিন্দু লোকেরা ভেস্তে যায়।
প্যাকের পানি খাইয়া তারা ওলাটা লাগায়॥
হে-হে-হে।

বৈষ্ণবী ও অন্যান্য সুন্দরী স্ত্রীলোকেরা এই তীর্থে স্নান করিতে আসে। লাভের মধ্যে দুষ্ট-লোকের হাতে পড়িয়া তাহাদের জাতি যায়:

বৈষ্টমী আর এব্যাসেরা মাইয়া লোকেরা ছান করে।
দুষ্ট লোকের হস্তে পৈরা জাইত বদল করে॥
হে-হে-হে।

পূর্ববঙ্গ গীতিকার সর্বশেষ খণ্ড চতুর্থ খণ্ডে (দ্বিতীয় সংখ্যা)[৪৫] মোট উনিশটি পালা সংগৃহীত হইয়াছে:—(১) নছর মালুম, (২) শীলাদেবী, (৩) রাজা রঘুর পালা, (৪) নুরন্নেহা ও কবরের কথা, (৫) মুকুট রায়, (৬) ভারাইয়া রাজার কাহিনী, (৭) আন্ধাবন্ধু, (৮) বগুলার বারমাসী, (৯) চন্দ্রাবতীর রামায়ণ, (১০) সন্নমালা, (১১) বীরনারায়ণের পালা, (১২) রতনঠাকুরের পালা, (১৩) পীরবাতাসী, (১৪) রাজা তিলকবসন্ত, (১৫) মলয়ার বারমাসী, (১৬) জিরালনী, (১৭) পরীবানুর হাঁহলা, (১৮) সোনারায়ের জন্ম, (১৯) সোনাবিবির পালা। ইহার অন্তর্ভুক্ত চন্দ্রাবতীর রামায়ণ সম্পর্কে পূর্বে কিছু আলোচনা করিয়াছি।[৪৬] এই উনিশটি পালার মধ্যে অধিকাংশই বিশেষত্ব বর্জিত। শীলাদেবী, ভারাইয়া রাজার কাহিনী, পরীবানুর হাঁহলা ইত্যাদি পালাগুলি কিঞ্চিৎ উল্লেখযোগ্য। ইহার অধিকাংশ পালাই চন্দ্রকুমার দে সংগ্রহ করেন, বাকিগুলি আশুতোষ

---

৪৫ ইহা Eastern Bengal Ballads (Vol. IV, part I)-এ অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

৪৬ এই গ্রন্থের ৬৪৪—৬৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চৌধুরীর সংগ্রহ। 'লীলাদেবীর পালা' পূর্বে 'আরতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল—সেইটি অধিকতর পুরাতন। চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত পালায় আধুনিক হস্তক্ষেপ অতি স্পষ্ট।

গীতিকার বিষয়বস্তু ও কাব্যধর্ম—ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকার চারিটি খণ্ডে সংগৃহীত ৫৪টি পালাগানের মধ্যে কয়েকটি পালা ভিন্ন বিষয়ের বলিয়া আলোচনা হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম খণ্ডের কাজলরেখার পালা পুরাপুরি রূপকথা জাতীয়—গদ্যেপদ্যে রচিত এই রূপকথাটির এই সংগ্রহে যুক্ত হইবার কোন কারণ নাই। দ্বিতীয় খণ্ডের সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়ার সঙ্গে এই গীতিকা-সাহিত্যের কোন সম্পর্ক নাই। তৃতীয় খণ্ডের গোপিনী-কীর্তন প্রসঙ্গবহির্ভূত রচনা—তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। হাতীখেদার পালা বৈচিত্র্যপূর্ণ হইলেও এই পালাগানের সঙ্গে ইহার যোগাযোগ অতি অল্প। বারতীর্থের গানও পালাগানের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। চতুর্থ খণ্ডের চন্দ্রাবতীর রামায়ণকে এই পালাসংগ্রহ হইতে বাদ দিলে সঙ্গতি রক্ষিত হইত।[৪৭]

এই পালাগুলিতে বিষয়বস্তুগত তিনটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায়—লৌকিক প্রণয়গাথা, ঐতিহাসিক-রোমান্টিক আখ্যান এবং বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক আখ্যান। ইহা ছাড়াও বিবিধ বিষয় লইয়া দুই একটি পালা রচিত হইয়াছিল—যেমন, হাতীখেদা। লৌকিক প্রেম এবং তাহার বাধাবিপত্তি ও পরিণাম লইয়াই অধিকাংশ পালা রচিত হইয়াছে এবং শ্রেষ্ঠ পালাগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মহুয়া, মলুয়া, কঙ্ক ও লীলা, দেওয়ানা মদিনা, ধোপার পাট, কাঞ্চন-মালা প্রভৃতি পালাগুলিতে নারীর অত্যাজ্য প্রেম, প্রেমের জন্য যে-কোন ত্যাগ-

---

৪৭ ডঃ দুসান জ্‌বাভিতেল (Dr. Dusan Zbavitel) রচিত ***Bengali Folk Ballads from Mymensingh and the Problem of their Authenticity*** (1963)-তে দস্যু কেনারামের পালাকে ব্যালাড বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন না, এবং এই জন্যই তাঁহার গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেন নাই। কেনারামের পালায় 'কিছু উচ্চ তত্ত্বকথা ও দার্শনিক ইঙ্গিত আছে; দুর্দান্ত ডাকাতের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন অনেকটা ধর্মভাবের অনুগত।' তাই বলিয়া ইহাকে ব্যালাডের অন্তর্ভুক্ত কেন করা যাইবে না তাহা বুঝা যাইতেছে না। সোজার ডাকাতের পালাও (পূ.ব. গী. ২।২) একই প্রকার; তাই বলিয়া তাহাকে কি এই পালা-গীতিকা হইতে বাদ দেওয়া যায়?

স্বীকার এবং প্রেমের স্বর্গীয় প্রবাহে জাতিসম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণতা লোপের ছবি চমৎকার ফুটিয়াছে। তন্মধ্যে মহুয়ার গল্পটি পূর্ব-পশ্চিমবঙ্গ নির্বিশেষে সর্বত্র চলিয়াছে, আধুনিক কালের দর্শকশ্রোতাও ইহাকে আধুনিক যুগের উপযোগী অভিনয় ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্ববঙ্গ-গীতিকার প্রথম পর্ব 'ময়মনসিংহগীতিকা'র অনেকগুলি পালাতেই অতি উৎকৃষ্ট কবিত্ব, শিল্পগুণ, মানবরস ও উদার-অসাম্প্রদায়িক ভাব লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য প্রেমঘটিত ব্যালাডে অনেক সময় ব্যর্থ প্রণয়ের জন্য তীব্র প্রতিহিংসা, ঘৃণা, হানাহানি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই গীতিকাগুলির হিন্দু-মুসলমান নারীচরিত্রে কোমলতা, প্রেমের জন্য সুকঠোর আত্মত্যাগ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য কৃষক কবিগণ আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন! ইঁহাদের প্রায় কেহই পুঁথিগত বিদ্যার অধিকারী ছিলেন না. সকলেই কৃষিকার্য, মাছধরা, নৌকা বাওয়া ইত্যাদি সামান্য কর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন এবং কাজকর্মের স্বল্প অবকাশে কেহ স্থানীয় আত্মত্যাগ বা দ্বন্দ্বকলহ লইয়া ছড়াগান বাঁধিতেন, কেহ বা তাহা গাহিয়া শ্রোতাদের আনন্দ দিতেন। কেহ কেহ এই সমস্ত পালাগান গাহিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

পালাগানগুলিতে কোনও প্রকার ধর্মীয় গণ্ডী মানা হইত না, মুসলমান কাজী বা জমিদার কর্তৃক হিন্দু ললনা অপহরণের অপরাধমূলক কাহিনী বর্ণনায় মুসলমান কৃষক কবি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। মুসলমান গৃহস্থের বাড়ীতেও সে গান অনুষ্ঠিত হইত। অবশ্য রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সমাজে এই সমস্ত কাহিনী ও গানের বোধ হয় ততটা জনপ্রিয়তা ছিল না। সে যাহা হউক এই পালাগীতিকাগুলির রচনারীতিতে অনেক ত্রুটি থাকিলেও বক্তব্য বিষয়টি অতীব প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। মধ্যযুগের শেষভাগে দেবদেবীর কথা বাদ দিয়া পাঁচালী-ছড়া-গাথাকারেরা যে মর্ত্যজীবী নরনারীর বিরহ-মিলনের কথাকে এতটা সহানুভূতির রসে আর্দ্র করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। তবে কেহ কেহ এবিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, "এ দেশের পারিবারিক পরিবেশে স্বাধীন ভালোবাসা কোন দিন প্রশ্রয় পায় নি, তাই পরকীয়াবাদকে এদেশে ধর্ম বলে চালাতে হয়েছে। তাই বিদ্যাসুন্দরকেও শেষপর্যন্ত কালীমাহাত্ম্য দিয়ে বাঁচাতে হয়েছে। এই দেশে বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ প্রেম এবং তার জন্যে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ...

এ সত্যই অদ্ভুত। আর এ থেকেই সন্দেহ জাগে গীতিকার প্রাচীনতা নিয়ে।"[৪৮] তাই কোন কোন সমালোচক সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, গীতিকাগুলি পুরাতন বাংলা সাহিত্য নহে, আধুনিক কালে কেহ পুরাতন গাথার ঢঙে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারাই রচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমরা পরবর্তী উপচ্ছেদে পালাগানগুলির প্রামাণিকতা প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। উপস্থিত প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, এই গীতিকাগুলি পূর্ববাঙলার একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলে ময়মনসিংহ জেলার পূর্বভাগে প্রচলিত আছে। এই অঞ্চলে অনতিপূর্বে সংঘটিত কোন ঘটনা, চরিত্র ও স্থানের নামধাম এই পালাগুলিতে ব্যবহৃত হইয়াছে।[৪৯] পূর্ব-ময়মনসিংহের নদনদীবেষ্টিত জলাভূমি (হাওর<হাবড) এই আখ্যান-সমূহের পটভূমি। দীনেশচন্দ্রের মতে, "উত্তরে সুসঙ্গ, দুর্গাপুর ও দক্ষিণে নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জের অন্তর্বর্তী পল্লীসমূহ বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনার অভিনয় ক্ষেত্র।"[৫০] এখন দেখা যাক, বাঙলার আর সমস্ত অঞ্চল বাদ দিয়া শুধু এই অঞ্চলেই কেন লৌকিক প্রেমের গাথা রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। ঐতিহাসিকের মতে দুর্গম ময়মনসিংহ, বিশেষতঃ ইহার পূর্বভাগে বহুদিন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রবেশ করিতে পারে নাই, এখানে নানাপ্রকার আদিবাসী ও পাহাড়ী জাতির নিত্য আনাগোনা চলিত, মুসলমান ধর্মান্তরী-করণ এই অঞ্চলে পুরাদমে চলিয়াছিল। সুতরাং স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে রক্ষণশীল মনোভাব তত্টা ছিল না, থাকিলে ব্যর্থপ্রেমে হিন্দু-রমণীর আজীবন কুমারী থাকিবার কাহিনী এবং অসবর্ণ বিবাহের গল্প শ্রোতৃসমাজে কখনও জনপ্রিয় হইতে পারিত না। মহুয়া, কঙ্ক ও লীলা প্রভৃতির আখ্যানে দেখা যাইতেছে হিন্দুদের জাতিভেদপ্রথা ও ছুঁৎমার্গ এই আখ্যানগুলিতে নাই। দীনেশচন্দ্রের ভাষায়, "নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম সেই প্রদেশে জয়ডঙ্কা বাজাইতে পারে

৪৮ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা, পৃ. ৪৭। অবশ্য এই ধরনের পালাগান বা ব্যালাড ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যেও আছে। খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীতে মারাঠী সাহিত্যে ঐতিহাসিক যুদ্ধবিষয়ক অনেক ছড়াগান ('পোয়াদা') এবং প্রেমপ্রণয়বিষয়ক গাথা ('লাবনী') রচিত হইয়াছিল।

৪৯ "পালাগানের অধিকাংশই পূর্বময়মনসিংহের কোন যথার্থ ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে।" ময়মনসিংহ গীতিকা, ১ম।২য়, পৃ. ।/০

৫০ ময়মনসিংহ গীতিকা, ১ম।২য়, পৃ. ।৶০

নাই, এই জন্য আদিম আদর্শের গৌরবশ্রী সেখানে অনেক দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।"[৫১] অবশ্য এসব কথা ইতিহাসসম্মত কিনা তাহা ঐতিহাসিকেরা বিবেচনা করিবেন। পূর্ব-ময়মনসিংহে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার প্রবেশ করিতে পারে নাই—প্রাচীন ভাবধারা দীর্ঘকাল বজায় ছিল, এসমস্ত কথা যথেষ্ট তথ্যসঙ্গত নহে। কারণ ঐ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যসংস্কার দুই চারিশত বৎসর পূর্বে যেমন ছিল অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতেও সেই প্রকার ছিল। সুতরাং গোটা বাঙলার মধ্যে একমাত্র পূর্ব-ময়মনসিংহের ভালে 'ব্রাত্য' তিলক আঁকিয়া দিয়া স্বতন্ত্র মর্যাদা দিবার প্রয়োজন নাই। এইরূপ লৌকিক প্রেমের গল্প একদা সমস্ত বাঙলা দেশেই প্রচলিত ছিল—রূপকথাগুলি তাহার দৃষ্টান্ত। পশ্চিমবঙ্গের অনেক রূপকথায় নিছক লৌকিক প্রেমের কথাই বলা হইয়াছে। এই রূপকথাগুলি বহু প্রাচীনকাল হইতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। আসলে গল্প শুনিবার বাসনা মানুষের চিরন্তন। ধর্ম ও দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া যেমন একশ্রেণীর আখ্যা-আখ্যায়িকা গড়িয়া ওঠে, তেমনি লৌকিক জীবনধারাকে অবলম্বন করিয়া কিছু কিছু লোকসাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ—সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মল্লরাজাদের অনুগ্রহভাজন ফকিররাম কবিভূষণের 'সখীসোনা' বা 'সখীসেনা'র কাহিনী উপকথাকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে—ইহার একাধিক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কয়েকবার ইহা ছাপাও হইয়াছে। গল্পটি এইরূপ :—রাজকুমারী সখীসোনা কোটালপুত্রের সঙ্গে একই গুরুর নিকট পড়িত। রাজকুমারীর করচ্যুত লেখনীটি কোটালপুত্র কয়েকবার তুলিয়া দিয়া তাহার প্রতিদানস্বরূপ রাজকুমারীর কর দাবি করে—যাহা হউক উভয়ের মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হয়। সেই রূপকথার কাহিনী ফকিররাম কয়েকশত বৎসর পূর্বে পয়ারত্রিপদীতে রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে মর্ত্যপ্রেমের কথাই বর্ণিত হইয়াছে।[৫২] কবি সরূফের 'দামিনী চরিত্র'[৫৩] (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের পুঁথি), 'নীলার বারমাসি' (উত্তরবঙ্গ হইতে গ্রায়ার্সন সংগৃহীত)[৫৪] প্রভৃতিতে লৌকিক

৫১ ঐ, পৃ, ৸৶০

৫২ দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ২য় খণ্ড, পৃ। ১৩৫২—৬৫

৫৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

৫৪ J. R. A. S. B, 1877 (গ্রীয়ার্সনের সংগ্রহ)

কাহিনীই অনুসৃত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব-ময়মনসিংহের মাটির গুণেই যে গীতিকাগুলির উদ্ভব হইয়াছে সেরূপ সিদ্ধান্ত পুরাপুরি তথ্যসঙ্গত নহে। কারণ পূর্ব-ময়মনসিংহ ছাড়াও পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও ঐরূপ গীতিকা পাওয়া গিয়াছে। তবে পূর্ব-ময়মনসিংহের পালাগুলির কাব্যধর্ম অধিকতর প্রশংসনীয় তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

ময়মনসিংহ গীতিকার প্রায় সমস্ত পালায় স্ত্রীচরিত্রের প্রাধান্য, কিন্তু পূর্ব-বঙ্গের অন্য স্থান হইতে সংগৃহীত অনেক পালায় পুরুষচরিত্রেরও গৌরব স্বীকৃত হইয়াছে। ময়মনসিংহ গীতিকার নারীচরিত্রে যে আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা যেন আধুনিক কালের কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ব্যালাড্-রূপ বলিয়া মনে হয়। একনিষ্ঠ প্রেম, যাহার প্রভাবে জাতিসম্প্রদায়-আভিজাত্য ধূলায় মলিন হইয়া যায়—তাহাই তো মহুয়া, মলুয়া, মইষালবন্ধু প্রভৃতি পালায় বিকাশলাভ করিয়াছে। পবিত্র প্রেমের অপূর্ব লিপিচিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া পল্লীর নিরক্ষর কবিগণ পুঁথিপত্র, শাস্ত্রসংহিতা ও মৌলবী-পুরোহিতের পাঁতি লইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই; অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকেই তাঁহারা রত্নদীপের অচঞ্চল শিখার মতো মনে করিয়াছেন। এই প্রেমে প্রতারণা আছে, আঘাত আছে, বিরহের পীড়ন আছে—আর তাহার সঙ্গে আছে নারীর সর্বসমর্পণমূলক আত্মনিবেদন, প্রিয়তমের জন্য জাতিকুল খোয়াইবার অবিস্মরণীয় কাহিনী। কবিগণ কাহিনীকে কখনও বিবৃতিমূলক ঘটনার মতো দৌড় করাইয়াছেন, কখনও গীতিকবিতার মতো ভাবাবেগে মন্থর করিয়া তুলিয়াছেন, কখনও-বা নাটকীয় পঞ্চসন্ধির অন্ধি-সন্ধিতে তীব্র ঘটনাবেগ, অসাধারণ চরিত্রদ্বন্দ্ব, মনস্তত্ত্বের নিপুণ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন —এইজন্য তাঁহাদের 'অশিক্ষিত পটুত্ব' বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। গায়েনদের নামের আড়ালে এইরূপ কত অখ্যাত কবির নামপরিচয় হারাইয়া গিয়াছে। ময়মনসিংহ গীতিকার অধিকাংশ পালা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকার কয়েকটি পালায় যে গাথাকাব্যের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ভাষা ও বর্ণনায় গ্রাম্য মাটির স্পর্শ থাকিলেও শব্দকল্প ও উপমানির্বাচনে[৫৫] অশিক্ষিত কবিগণ বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

৫৫ ডঃ দুশান জ্বাভিতেলের *Bengali Folk Ballads*-এ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। দ্রষ্টব্য : উক্ত গ্রন্থের পৃঃ ১৫২—২০১

কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুব্যা মরি॥

প্রভৃতি পংক্তির রচনাচাতুর্য বিস্ময়কর। এখানে এইরূপ উৎকৃষ্ট কাব্যধর্মী কয়েক পংক্তির উদাহরণ দেখা যাইতেছে:

(১) মেঘের সমান কেশ তার তারার সম আঁখি।
(২) সাপে যেমন পাইল মণি পিয়াসী পাইল জল।
(৩) আশমানের চান্দ যেমন জমিনে পড়িয়া।
(৪) দরিয়ায় গলিয়া পড়ে আমার গলার হার।[৫৩]
(৫) দিনে দিনে ফোটে কন্যার যৌবনের কলি।
(৬) চান্দের সমান রূপে করে ঝলমল।
(৭) মধু না আসিতে ফুলে নাহি আসে অলি।
(৮) সুন্দর বদন যেমন মঙ্গুয়ার ফুল।
(৯) দেশেতে ভ্রমরা নাই কি করব উপায়।
(১০) গোলাপের মধু ভাগ গোবরিয়া খায়॥
(১১) আমার সোয়ামী যেন পর্বতের চূড়া।
(১২) সকল থাক্যা অধিক মিঠা বিরহে মিলন।

নানা গীতিকায় অতি আশ্চর্য ধরনের অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যাহাতে চলিত জীবনচিত্র ও ক্লাসিক বাকরীতি একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থলে কবিগণ অতি চমৎকার নাট্যরস ও গীতিরস সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বামীর কলঙ্ক দূর করিবার জন্য স্বামী-সপত্নীকে রাখিয়া গহীন সমুদ্রে মলুয়ার তরী ভাসাইবার বর্ণনাটি অতি চমৎকার হইয়াছে:

পূবেতে উঠিল ঝড় গর্জিয়া ওঠে দেওয়া।
এই সাগরের কূল নাই ঘাটে নাই খেওয়া॥
"ডুবুক ডুবুক নাও আর বা কতদূর।
ডুইব্যা দেখি কতদূরে আছে পাতালপুর॥"
পূবেতে গর্জিল দেওয়া ছুটল বিষম বাও।
কইবা গেল সুন্দর কন্যা মনপবনের নাও॥

মলুয়া পালার সমাপ্তিতে এইরূপ একটি বিষণ্ণ বেদনার সুরে সমুদ্রের উন্মত্ত পবন কাঁদিয়া উঠিয়াছে, পূবালি ঝড়ে মলুয়ার মনপবনের নাও কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু মলুয়ার আত্মত্যাগ পাঠকের মনে চিরজীবী হইয়া রহিল।

৫৩ অর্থাৎ মলুয়া বলিতেছে নদীর মধ্যে তাহার গলার হার অর্থাৎ মনের চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে।

মহুয়ার নাট্যরসোজ্জ্বল[৫৭] আখ্যানটিও সমগ্র পালাসাহিত্যের মধ্যমণি স্বরূপ গণ্য হইতে পারে। কাল্পনিক আখ্যায়িকা হইলেও ইহার চারিদিকে ভৌগোলিক বর্ণনায় দূরস্মৃত গ্রাম-জনপদের যথার্থ পরিচয় আছে। পালায় বর্ণিত বামনকান্দি, বাইদার (< বাদিয়ার) দীঘি, ঠাকুরবাড়ীর ভিটা, উলুয়াকান্দি প্রভৃতি গ্রাম, দীঘি ও স্থানের এখনও অস্তিত্ব আছে। কিছুদিন পূর্বেও নেত্রকোণার গ্রামে এই পালাগান গাহিবার জন্য মুসলমান গায়কদের দল ছিল।[৫৮] এই গানের করুণ বিষাদান্ত পরিণতি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী, জাতিধর্মনির্বিশেষে এমন বিশুদ্ধ মানবীয় রস মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে একপ্রকার দুর্লভ বলিলেই হয়। নাটকীয় গুণযুক্ত এই কাহিনীও পালাগানের রীতিতে গ্রথিত হইয়া বেশ সংহত আকার ধারণ করিয়াছে। দ্বিজ কানাই নামে কোন এক কবি নাকি তিনশত বৎসর পূর্বে ইহা রচনা করেন। এ সম্বন্ধে অবশ্য আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে, কারণ ময়মনসিংহের স্থানীয় ভাষার প্রভাব সত্ত্বেও ইহার রচনাভঙ্গিমা ও অন্যান্য ভাষা-বৈশিষ্ট্য আদৌ পুরাতন নহে। সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত মসুকা গ্রামের শেখ আলি ও উমেশচন্দ্র দে এবং গোরালী গ্রামের নসু সেখের নিকট হইতে এই পালা সংগ্রহ করিয়া ১৯২১ সালে দীনেশচন্দ্রকে পাঠাইয়া দেন। প্রাপ্ত পালায় অনেক অসঙ্গতি দেখিয়া দীনেশচন্দ্র ইহার পাঠ সংশোধন ও পুনর্বিন্যাসের পর 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র প্রথম পালারূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন।[৫৯] কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ :—

---

৫৭ সংগ্রহকার চন্দ্রকুমার দে মহুয়া পালার শুধু গীতিকাটুকু সংগ্রহ করেন, গায়কেরা ইহাতে যে নাটকীয় গদ্যসংলাপ জুড়িয়া দিতেন, অনেক স্থলে অভিনয়ের রীতিও গ্রহণ করিতেন। চন্দ্রকুমার বাহুল্যবোধে তাহা সংগ্রহ করেন নাই। কিন্তু ময়মনসিংহ নিবাসী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ যে 'বাদ্যানীর গান' সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা হইতে প্রকাশ করেন (১৯৪৪), তাহাতে তিনি এই মহুয়া গীতিনাট্যের নাটকীয় অংশ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ফলে দেখা যাইতেছে, অধিকাংশ পালাগানে নাটকীয়তাও প্রচুর ছিল—অর্থাৎ এই জাতীয় গীতিকাগুলি কথা লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে মহুয়ার প্রামাণিকতা প্রসঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

৫৮ ময়মনসিংহ গীতিকা, ১ম/২য়, পৃ. ১।৵০

৫৯ পূর্বোল্লিখিত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ১২৯১-৯২ সালে তাঁহার বাল্যকালে ময়মনসিংহের সোয়া গ্রামে বাড়ীর আঙিনায় সর্বপ্রথম 'বাদ্যানীর গান' শুনেন—গায়কের নাম শেখ কাঙালী,

পাহাড়ী বেদিয়া জাতির অন্তর্ভুক্ত হুমরা বেদে গারো পাহাড়ে ডাকাতি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। সে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছয়মাসের শিশুকন্যা চুরি করিয়া পলাইয়া যায়। তাহাকে সে নিজ কন্যার মতো লালনপালন করিতে লাগিল। ক্রমে সেই কন্যার বয়স হইল ষোল, তাহার নাম দেওয়া হইল মহুয়া।[৬০] সে অপূর্ব সুন্দরী হইয়া উঠিল, তাহাকে সঙ্গে লইয়া দলবল-সহ হুমরা নানাস্থানে বাজি দেখাইয়া বেড়ায়। বাজি দেখাইতে দেখাইতে তাহারা ময়মনসিংহের বামুনকান্দা গ্রামে উপস্থিত হইল এবং নদের চাঁদ নামক এক ব্রাহ্মণ যুবার বাড়ীতে বাজি দেখাইতে গেল। মহুয়ার খেলা দেখিয়া নদের চাঁদ মুগ্ধ হইল, ক্রমে গোপনে সাক্ষাতের পর উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ জন্মিল। ব্রাহ্মণকুমার একদিন জলের ঘাটে মহুয়ার নিকট নিজের অভিলাষ জ্ঞাপন করিল, "তোমার মত নারী পাইলে করি আমি বিয়া।" মহুয়াও চন্দ্র-সূর্যকে সাক্ষী করিয়া নিজের বান্ধবী পালংসখীর নিকট ঘোষণা করিল, "নদ্যার ঠাকুর হইল আমার প্রাণের সোয়ামী।" হুমরা বেদে ইহা জানিতে পারিয়া মহুয়াকে লইয়া সে গাম ছাড়িবার সিদ্ধান্ত করিল। বাধ্য হইয়া মহুয়া নদের চাঁদের নিকট চোখের জলে বিদায় লইল। বেদের দল চলিয়া গেলে নদের চাঁদ মহুয়ার বিরহে উন্মাদের মতো হইয়া পড়িল—শেষে মহুয়ার খোঁজে সে গ্রাম ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইল। পথের পথিককে ডাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করে :

মেঘের সমান কেশ তার তারার সম আঁখি।
এই দেশে নি উইড়া আইছে আমার তোতাপাখী॥

ক্রমে সে কংশাই নদীর তীরে বেদিয়া দলের সন্ধান পাইল এবং নদীর ঘাটে

এক মুসলমান চৌকিদার। পরে ১৩২১-২২ সালে তিনি পালাটিকে সংগ্রহ করেন এবং ইহার অনেক দিন পরে ১৩৫১ সালে তাহা কলিকাতা হইতে প্রকাশ করেন। মহুয়া পালা এবং বাস্তানীর গান একই বিষয় লইয়া রচিত—উভয়ের মধ্যে রচনারীতিগত বহু সাদৃশ্য আছে। তবে বাস্তানীর গানে অনেক নাটকীয় গদ্যসংলাপ আছে, মহুয়া পালায় তাহা নাই। মনে হয়, একই কাহিনী লইয়া নানা গ্রামে নানা প্রকার পালাগান প্রচলিত ছিল। এক দলের গীত পালার সঙ্গে অপর দলের পালার কিছু পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। অবশ্য এই পার্থক্যের কারণ হিসাবে কেহ কেহ গুরুতর সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। পরে পালাগানগুলির প্রাচীনতা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করিয়াছি।

৬০ পূর্ণচন্দ্রের সংগৃহীত কাহিনীতে 'বাস্তানীর গানে' হুমরা বেদের নাম উমরা বাস্তা, মহুয়ার নাম সেওয়া। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হইয়াছে।

মহুয়ার সাক্ষাৎ লাভ করিল—"সাপে যেমন পাইল মণি পিয়াসী পাইল জল।" সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া হুমরা বেদে একদিন রাত্রে মহুয়ার হাতে একখানি ছুরি দিয়া বলিল, "শুইয়া আছে নদীযার ঠাকুর মাইরা আইল তারে।" মহুয়া গভীর রাত্রে নদের চাঁদের নিকট উপস্থিত হইয়া সব কথা জানাইল। পরে তাহারা দুইজনে বেদিয়ার দল ছাড়িয়া দূরে পলাইয়া গেল। তাহারা এক বণিকের নৌকায় ঠাঁই করিয়া লইল। কিন্তু সেই বণিক মহুয়ার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে নদের চাঁদকে অতর্কিতে নৌকা হইতে ঠেলিয়া জলে ফেলিয়া দিল। মহুয়া কৌশলে বিষমিশ্রিত পান খাওয়াইয়া বণিক ও মাঝিমাল্লাকে অচৈতন্য করিয়া নৌকা ডুবাইয়া দিয়া কোনও প্রকারে তীরে উঠিল এবং নদের চাঁদকে খুঁজিতে লাগিল। অসুস্থ নদের চাঁদকে সে খুঁজিয়া পাইল এবং এক সাধুর সাহায্যে স্বামীকে বাঁচাইল। কিন্তু অসাধুপ্রকৃতির সন্ন্যাসী মহুয়ার প্রতি প্রলুব্ধ হইলে সে অসুস্থ স্বামীকে কাঁধে করিয়া অরণ্যপথে পলায়ন করিল। ক্রমে নদের চাঁদ মহুয়ার সেবায় সুস্থ হইয়া উঠিল, দুইজনে আবার মহানন্দে অরণ্য পর্বতের পটভূমিকায় ভ্রমণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। কিন্তু বেশীদিন এ সুখ সহিল না। সেখানে ঘুরিতে ঘুরিতে আবার হুমরা বেদের দল হাজির হইল। এবার হুমরা মহুয়াকে সক্রোধে বলিল :

প্রাণে যদি বাঁচ কন্যা আমার কথা ধর।
বিষলক্ষের ছুরি দিয়া দুষমনেরে মার॥

একদিকে পালকপিতার আদেশ, আর একদিকে স্বামীর প্রতি প্রেম—উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া সে নিজের বুকেই সেই 'বিষলক্ষের ছুরি' বিঁধাইয়া দিয়া প্রাণত্যাগ করিল। হুমরাও সক্রোধে নদেরচাঁদকে মারিয়া ফেলিল, তারপর কবর খুঁড়িয়া দুইজনকেই এক কবরে মাটি দিল। সকলে চলিয়া গেল, শুধু মহুয়ার প্রাণের সখী পালংসই সেই কবরের পাশে পড়িয়া রহিল, তাহার চোখের জলে কবরের মাটি ভিজিয়া উঠিল।

এই করুণরসের সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি একটি উৎকৃষ্ট পল্লীগাথা রূপে স্বীকৃতি পাইবার যোগ্য। বেদিয়ার পালিত ব্রাহ্মণকন্যা মহুয়া ও ব্রাহ্মণকুমার নদের-

ইহার স্নিগ্ধমধুর ও বেদনাবিধুর মানবরস ভারতবর্ষের বাহিরেও অনেকের প্রশংসা উদ্রেক করিয়াছে।

মলুয়া, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, ধোপার পাটের নায়িকা কাঞ্চনমালা প্রভৃতি চরিত্রগুলি গ্রাম্য জীবনের পটভূমিকায় গ্রাম্য কবি কর্তৃক রচিত হইলেও রসের দিক হইতে ইহাতে চিরন্তনের সুর বাজিয়াছে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পুঁথি-আশ্রয়ী-দেবপ্রভাবিত সাহিত্যের পার্শ্বে এই গ্রাম্য সাহিত্য এবং গ্রাম্য নায়িকাদের চরিত্র একটা বিচিত্র বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে।

দীনেশচন্দ্র সর্বপ্রথম রসিকের দৃষ্টি লইয়া এই সমস্ত নারী চরিত্রের বিশ্লেষণ করেন এবং গাথাসাহিত্যের কাব্যরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইহাদিগকে তথাকথিত 'ভদ্রসাহিত্যের' উপরে স্থান দান করেন। তাঁহার এই মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত, "বাঙ্গালা সাহিত্যে পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি সংস্কৃত শব্দের সোনালী চুমকী দেওয়া বেনারসী চেলী পরিয়া ঝলমল করিতেছে—কিন্তু পাড়াগাঁয়ের এই সকল সরল কথা, যাহাতে সংস্কৃতের একটুও ধারকরা শোভা নাই, যাহা নিজ স্বাভাবিক রূপে অপূর্ব সুন্দর—তাহার নমুনা আমরা কোথায় পাইতাম! ·····ইহা স্বর্গ হইতে আহৃত অমৃত ভাণ্ড নহে, ইহা আমাদের দেশের আমগাছের মৌচাক, এজন্য এই খাঁটি মধুর আস্বাদ আমাদের নিকট এত ভাল লাগিয়াছে।"[৬১] তাঁহার এই মন্তব্য একটু ভক্তিবিগলিত হইলেও

৬১ ময়মনসিংহ গীতিকা, ১ম/২য়, পৃ।০ দ্রষ্টব্য, দীনেশচন্দ্র এই সমস্ত গাথাকে এত উচ্চশ্রেণীর বলিয়া মনে করিতেন যে, পুরাণকেন্দ্রিক বাংলাসাহিত্যকে তুচ্ছ করিয়া ইহাদের গৌরবধ্বজা সু-উচ্চ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার মতে কেবল উৎকৃষ্ট বৈষ্ণবপদাবলী এই সমস্ত গাথার সমকক্ষতা করিতে পারে—"রঙ্গভারতী বৈষ্ণবগীতিকার রক্ত শতদলে বসিয়াছিলেন—এবার তাঁহাকে শুভ্র কুন্দলালীনা দেখিলাম।" *Eastern Bengal Ballads* (Vol I, Part I)-এ তাঁহার মনোভাব এইরূপ—"Some of them at least, I believe, will rank next only to the most beautiful of the Vaishnava songs in our literature." ভক্তির উচ্ছ্বাস বশতঃ দীনেশচন্দ্র মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাদি অপেক্ষা এই পালাগানে অধিকতর আনন্দ ও বিস্ময় খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তাঁহার মন্তব্য, "প্রথম যেদিন বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষ, রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি ও শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি পড়িয়াছিলাম, তাহারও পূর্বে যেদিন মধুসূদনের মেঘনাদের ডমরুর ধ্বনি কর্ণরন্ধ্রে মন্দ্রিত হইয়াছিল সেই সকল দিনের কথা আমার মনে আছে, তাহা কখনই ভুলিব না। এই পালাগানের শ্রেষ্ঠগানগুলি পাঠকালে আমার মনের উপর ততোধিক বিস্ময় ও আনন্দের প্রবাহ চলিয়া গিয়াছিল।"—পূর্ববঙ্গগীতিকা, ৩য়/২য়, পৃ. ১৸৵০

অযৌক্তিক নহে। কিন্তু ভাবের আবেগে তিনি সুর চড়াইতে চড়াইতে পল্লী-গীতিকাগুলিকে শীর্ষ স্থানে বসাইতে গিয়া পৌরাণিক ভারত-সংস্কৃতির সীতা-সাবিত্রীকেও নস্যাৎ করিয়া বলিয়াছেন, "এগুলি জানিতাম না বলিয়া আমরা এতকাল শুধু সীতাসাবিত্রীকে লইয়া গৌরব করিয়াছি—এখন আমরা মলুয়া, মদিনা ও কমলকে লইয়া তদপেক্ষা বেশী গৌরব করিতে পারি—যেহেতু তাহারা ঘাগরা পরা বিদেশিনী নহে, শাড়ীপরা আমাদেরই ঘরের মেয়ে।"[৬২] বলাবাহুল্য এ মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক, অযৌক্তিক ও হাস্যকর। দীনেশচন্দ্র পৌরাণিক ভারত-ঐতিহ্যকে উড়াইয়া দিয়া মহুয়া-মলুয়া-মদিনাকে অধিকতর গৌরবময় স্থানে স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন এবং সীতা-সাবিত্রীকে 'ঘাগরা পরা বিদেশিনী' আখ্যা দিয়া তাঁহাদিগকে বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালীর হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইংরাজী ও স্কটিশ ব্যালাডকে শেক্সপীয়র-মিল্টনের মাথার উপরে বসাইয়া দিলে যেরূপ অবস্থা হয়, দীনেশ-চন্দ্রের এই প্রচেষ্টাও সেই রূপ উপহাসের বিষয় হইবে। পল্লীগীতিকার একটা স্বতন্ত্র মাধুর্য আছে, তাই বলিয়া সীতা-সাবিত্রীকে হঠাইয়া দিয়া সেই স্থানে মহুয়া-মলুয়াকে স্থাপন করিতে যাওয়া ডঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায়—"আদিখ্যেতা, অর্থাৎ বিশেষ এক প্রকার ভাববিলাসের আতিশয্য।"[৬৩] এ বিষয়ে ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ মন্তব্যটি অতিশয় যুক্তিপূর্ণ বলিয়া এখানে উদ্ধৃত হইল :

"বাঙ্গালা পল্লীগাথার মলুয়া, মদিনা ও কমলার চরিত্র লইয়া আমরা গর্ব করিবই—এই অপূর্ব নারীচরিত্রগুলি আমাদের বাঙ্গালারই পল্লীজীবনের সৃষ্টি, কিন্তু উমা, সীতা ও সাবিত্রীকে লইয়া কম গৌরব করিব না; কারণ সমগ্র ভারতবর্ষের উমা-সীতা-সাবিত্রী বাঙ্গালার বিশেষকে অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালারই অন্তর্নিহিত প্রাণের সহিত অচ্ছেদ্য স্নেহ ও শ্রদ্ধার সূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া বাঙ্গালীর জীবনে শ্রেষ্ঠতম নারীর প্রতীক হইয়া বিরাজ করিতেছেন;—আদি আর্যভাষাকে বাদ দিলে যেমন বাঙ্গালা ভাষাই থাকে না, অর্থাৎ আদি-আর্যযুগের বা সংস্কৃত যুগের ঐতিহ্য ও আদর্শকে বাদ দিলে বাঙ্গালার সংস্কৃতি বলিয়া আমরা কোনও জিনিসের কল্পনা করিতে পারি না।

---

৬২ ময়মনসিংহ গীতিকা, ১ম/২য়, পৃ. ।০

৬৩ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—জাতি-সংস্কৃতি ও সাহিত্য, পৃ. ১০

রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সীতাসাবিত্রীকে "ঘাঘরা পরা বিদেশিনী" এই আখ্যা দান করিয়া বাঙ্গালার হৃদয় হইতে নামাইয়া দিতে চাহেন, বা হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিতে চাহেন; তাঁহাদের স্থানে নবাবিষ্কৃত বাঙ্গালা পল্লীগাথাবলীর নায়িকা মলুয়া, মদিনা ও কমলাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। সীতাসাবিত্রীর সত্যকারের পোষাক যাহাই থাকুক (তবে প্রাচীন আর্যযুগের মেয়েরা যে ঘাঘরা পরিত না, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই), বাঙ্গালার মাটিতে তাঁহারা কোনও এক অজ্ঞাত পুণ্যমুহূর্তে পাদক্ষেপ করা মাত্রই আমরা তাঁহাদের বাঙ্গালী ধরনের সাড়ী পরাইয়া আমাদের নিতান্ত আপনার জন করিয়া লইয়াছি, ঘরের মধ্যেই তাঁহাদের পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।" ('জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য', পৃঃ ৯-১০)

প্রসঙ্গক্রমে এইরূপ প্রেম, ত্যাগ, তিতিক্ষার পালাগান এবং শ্রেষ্ঠ নর-নারী চরিত্র সম্বলিত নানা ধরনের গীতিকার কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ দস্যু কেনারামের পালাটি গ্রহণ করা যাইতে পারে। ডাকাইত কেনারামের অদ্ভুত পরিবর্তনের আখ্যায়িকার পশ্চাদপটে পৌরাণিক রামায়ণের রত্নাকরের আখ্যানের প্রভাব থাকিলেও ইহাতেও উৎকৃষ্ট আখ্যানধর্ম রক্ষিত হইয়াছে। নরঘাতক দস্যু কেনারাম মনসার পাঁচালী-গায়ক বংশীদাসকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল। মৃত্যুর আগে বংশীদাস মা মনসার গান গাহিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দস্যু রাজী হইলে তিনি অতি করুণস্বরে বেহুলার দুঃখ বেদনার গান গাহিতে লাগিলেন। এই গানে নির্মম দস্যুর হৃদয় গলিল, বেহুলার শোকে সেও মুহ্যমান হইয়া পড়িল। অতঃপর কেনারাম হাতের খাঁড়া ফেলিয়া দিয়া বংশীদাসের পা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "গুরু গো কি গান শুনাইলা গুরু ফিরে কও শুনি।" সে মানুষ মারিয়া যত ধনসম্পত্তি সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার সমস্তই বংশীদাসকে দিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল। কিন্তু ভক্ত বংশীদাস নরঘাতক ডাকাতের পাপের ধন লইতে অসম্মত হইলেন। অতঃপর নির্মমহৃদয় ডাকাত কেনারামের অভূতপূর্ব মানসিক পরিবর্তন হইল। সে যখন নিজের খাঁড়ায় নিজেই আত্মঘাতী হইতে গেল, তখন তাহাকে যথার্থ অনুতপ্ত দেখিয়া বংশী-দাস তাহাকে শিষ্য করিয়া লইলেন। ভয়ালদর্শন ডাকাত কেনারাম ভক্ত কেনারাম হইল, গুরুর সঙ্গে গ্রামে গ্রামে সুমধুরকণ্ঠে মনসার ভাসান গাহিয়া

বেড়াইতে লাগিল, তাহার গানে পাষাণ গলিয়া যায়, গাছের পাতাও ঝরিয়া পড়ে—"কেনারাম গায় গীত ঝরে বৃক্ষের পাতা।" যদিও এই পালাটি নরনারীর প্রেম সংক্রান্ত নহে ইহাতে দেবীমহিমা ও ভক্তিবাদের প্রাধান্য, তথাপি রচনার প্রকরণটি উৎকৃষ্ট গাথার মতোই। পূর্ববঙ্গগীতিকায় (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা) 'নেজাম ডাকাইতের পালা'ও কতকটা এইরূপ। ইহার ভণিতা হইতে বংশীদাস-কন্যা চন্দ্রাবতীই ইহার রচনাকার মনে হইতেছে। কিন্তু ভাষাতে প্রাচীনত্বের কোন চিহ্ন নাই, স্থানে স্থানে পশ্চিমবঙ্গীয় চলিত শব্দেরও প্রয়োগ আছে।

ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া, বিশেষতঃ জঙ্গল বাড়ীর সামন্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা ঈশা খাঁয়ের চরিত্র লইয়া একাধিক পালাগান রচিত হইয়াছিল। এই সমস্ত আখ্যানে (দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদ আলি, ফিরোজ খাঁ দেওয়ান) ইতিহাস, লোকশ্রুতি, রোমান্স, জমিদারদের সংঘর্ষ প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে। তবে হিন্দু জমিদার পরিবারের কাহিনী সংক্রান্ত 'চৌধুরীর লড়াই' পালাটি পূর্ববঙ্গে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল বলিয়া এখানে সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে দুই এক কথা আলোচনা করা যাইতেছে। এই আখ্যানটির পশ্চাতে ঐতিহাসিক ঘটনা আছে। যদিও হিন্দু জমিদার বংশকে কেন্দ্র করিয়া এই ঘটনা আবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার রচনাকার ও শ্রোতা অধিকাংশই মুসলমান। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে নোয়াখালির জমিদার চৌধুরীবংশের পারিবারিক দুর্ঘটনা লইয়া এই ছড়াগান রচিত হইয়াছিল। নোয়াখালির তরুণ জমিদার রাজচন্দ্র চৌধুরী লাম্পট্যের জন্য অতি কুখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার খুড়া রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীও জমিদার ছিলেন। তিনি ভাইপোর চারিত্রিক শিথিলতা মোটেই সমর্থন করিতেন না। রামচন্দ্র বহু স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করিয়াছিলেন। নিজের অপকর্মে তিনি কিছুমাত্র লজ্জিত হইতেন না। একদা তাঁহার নিযুক্ত এক বৈষ্ণবী কুট্টিনী রঙ্গমালা নাম্নী এক নটজাতীয়া (নীচজাতীয়া) তরুণীর সংবাদ আনিল। রঙ্গমালার বিবাহ হইলেও সে স্বামীর ঘর করিত না। তাহার রূপযৌবনের বর্ণনা শুনিয়া রাজচন্দ্র তাহাকে হস্তগত করিতে সচেষ্ট হইলেন। রঙ্গমালা সহজেই ধরা দিল এবং রাজচন্দ্রকে দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইয়া লইতে লাগিল। একবার সে আবদার ধরিল—৪৫০ বিঘা পরিমাণ একটি দীঘি কাটাইতে হইবে এবং তাহার বাপের

নামে সেই দীঘির নামকরণ করিতে হইবে। রাজচন্দ্র একটু ছোট মাপের (৫০ বিঘা কালি) পুষ্করিণী খনন করাইয়া প্রতিষ্ঠার সময় যাবতীয় ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি লম্পট ও কদাচারী ছিলেন বলিয়া ভদ্রসমাজে তাঁহার স্থান বড় ছোট হইয়া গিয়াছিল। নীচজাতীয়া রঙ্গমালার বাপের নামে পুকুর প্রতিষ্ঠায় ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলে তাঁহাদের চূড়ান্ত অপমান হইবে, রাজচন্দ্রের প্রতিহিংসাও চরিতার্থ হইবে। তিনি আরও মতলব করিলেন বৃদ্ধ খুড়া রাজেন্দ্রনারায়ণকে উক্ত নীচজাতীয় ব্যক্তির বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাওয়াইলে তাঁহারও যথেষ্ট অপমান হইবে। রাজেন্দ্রনারায়ণ গুণধর ভাইপোর আমন্ত্রণলিপি পাইয়া জাতি যাইবার ভয়ে ভীত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন চাঁদ ভাণ্ডারী নামে তাঁহার এক সেনাপতি এই অপমানের প্রতিবিধান করিতে গিয়া রঙ্গমালার বাটীতে উপস্থিত হইল এবং ভীতা ব্যাকুলা সুন্দরী রঙ্গমালার অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়া তাহার মুণ্ড কাটিয়া ফেলিল। তাহার ভাইকেও মারিয়া ফেলিয়া সে তাহাদের ঘরবাড়ীতে আগুন লাগাইয়া এবং রঙ্গমালার কাটামুণ্ড লইয়া রাজেন্দ্রনারায়ণের কাছে উপস্থিত হইল। এরূপ অপূর্ব সুন্দরী হত্যার জন্য রাজেন্দ্রনারায়ণ বড়ই দুঃখিত হইলেন। এদিকে রাজচন্দ্র এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া খুল্লতাতের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবার জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রামের মুসলমান জমিদার ইঙ্গা চৌধুরীর সাহায্য গ্রহণ করিলেন। কিন্তু চাঁদ ভাণ্ডারীর গুপ্ত আক্রমণে ইঙ্গা চৌধুরী ও তাঁহার একটি পুত্র ছাড়া তাঁহার পক্ষের আর সকলেই নিহত হইল। ইঙ্গার পুত্রটি পলাইয়া গিয়া মাতুল মনোহর গাজির আশ্রয় গ্রহণ করে। মনোহর তখন রাজেন্দ্রনারায়ণের বাটী আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দেয়। অতঃপর রাজচন্দ্র পিতৃব্যের জমিদারিও অধিকার করেন। অবশ্য শেষে খুড়া ভাইপোর মধ্যে আবার মিলন হয়, বৃদ্ধ রাজেন্দ্রনারায়ণ কাশীবাসী হন। এই কাহিনীটি একদা নোয়াখালি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছিল।[৬৪] পালায় উল্লিখিত স্থানগুলির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতেও পাওয়া যায়। চৌধুরীদের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এবং রঙ্গমালার দীঘি এখনও আছে। অবশ্য এই পালাগানে

---

৬৪ নোয়াখালি গেজেটিয়ারে বাবুপুর পরগণার ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে রাজচন্দ্র ও রঙ্গমালার কাহিনীর উল্লেখ আছে।

যুদ্ধ বিগ্রহের বাস্তব বর্ণনা ভিন্ন বিশেষ কোন কাব্যগুণ নাই। কিন্তু বিষয়-বস্তুর অভিনব বৈচিত্র্যের জন্য এখানে আমরা কাহিনীটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। যাহা হউক যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী অপেক্ষা প্রেম প্রণয়ঘটিত কাহিনী-গুলি (মহুয়া, মলুয়া, কমলা, কঙ্ক-লীলা, ধোপার পাট, মইষাল বন্ধু, কাঞ্চন-মালা, ভেলুয়া, মাঞ্জুর মা, আয়নাবিবি প্রভৃতি পালা) অধিকতর চিত্তাকর্ষী ও কাব্যরসে রমণীয় হইয়াছে, বিশেষতঃ ময়মনসিংহ গীতিকার কয়েকটি পালায় মুক্ত প্রেম, প্রেমের জন্য নারীর সুকঠোর ত্যাগ স্বীকার ও কৃচ্ছ্র সাধনা অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গেই অঙ্কিত হইয়াছে। কয়েকটি চরিত্র পরিকল্পনাতেও অশিক্ষিত কৃষক কবিগণ আশ্চর্য লিপিকুশলতা ও মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। ভাষাভঙ্গিমার অনেক স্থলে স্থানীয় উপভাষার প্রভাব আছে, বহুস্থলে গ্রাম্যধরনের বাকরীতিও আছে। কিন্তু বহু পালায় যে গ্রামীণ জীবন, রস ও সংস্কৃতির প্রভাব দেখা যায়, হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি লক্ষ্য করা যায়, কাব্যের অতিরিক্ত তাহারও একটা মূল্য আছে। এই পালাগুলিকে বিস্মৃতির কবল হইতে রক্ষা করিয়া দীনেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের মহদুপকার করিয়াছেন। তাঁহার কৃত গীতিকাগুলির ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া পাশ্চাত্যের পণ্ডিত-মনীষীরা তাঁহাকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন। তাহার কারণ এই পালাগুলিতে পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের ধর্মবিরহিত লোকযাত্রা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ বেদনার যে চিত্র আছে তাহার ঐতিহাসিক মূল্য য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছিল। রোমাঁ রোলাঁ মদিনা, মহুয়া, চন্দ্রাবতী এবং লীলাও কঙ্কের উচ্চ প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন, " I was specially delighted with the touching story of Madina which although only two centuries old is an antique beauty and a purity of sentiment which art has rendered faithfully without changing it. Chandravati is a very noble story, and Mahua, Kanka and Lila are Charming (to mention only those ones)." লর্ড রোনাল্ডসে, সিলভাঁ লেভি, পার্জিটার, জুলে ব্লখ, প্রভৃতি বিশ্বের মনীষী-বর্গ একবাক্যে এই গীতিকাগুলির উচ্চ প্রশংসা করেন এবং দীনেশচন্দ্রের এই বিষয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য তাঁহারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। কিন্তু

বাঙলা দেশের গবেষক ও পণ্ডিতসমাজ এই গাথাসম্বন্ধে এতটা উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাণী ব্যবহার করেন নাই—কেন করেন নাই, এইবার আমরা সেই প্রসঙ্গে আসিতেছি।

গীতিকাসমূহের প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা—ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রকাশিত হইলে বাঙলাদেশে কিছু আলোড়ন শুরু হইয়াছিল, তবে তাহা অবিমিশ্র প্রশংসাবাণী নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা, যাঁহারা এই গীতিকাগুলির উচ্চ প্রশংসা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র গ্রীয়ার্সন ছাড়া আর কেহ উক্ত গাথা বুঝিবার মতো বাংলা জানিতেন না, ইঁহাদের অনেকেই ইংরাজী অনুবাদ ভিন্ন কোন বাংলা গ্রন্থ পড়েন নাই।[৬৫] সুললিত ইংরাজীতে অনূদিত হওয়ার জন্য[৬৬] এবং ইহাতে দেবদেবী ও হিন্দুধর্মের বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকার জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহলে ইহার বিশেষ সমাদর হইয়াছিল। যাহা হউক এই গীতিকাগুলির প্রকাশের পর বাঙলাদেশের নানা মহলে ইহার প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা লইয়া বিশেষ সংশয় সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছিল। দীনেশচন্দ্র এই সমস্ত গাথাকে যতটা প্রাচীন

---

৬৫ রোমাঁ রোলাঁ ইংরাজী জানিতেন না, তাঁহার ভগিনী মেডেলাইন রোলাঁ *Eastern Bengal Ballads*-এর প্রথম খণ্ডটির ফরাসী অনুবাদ করেন, রোলাঁ তাহা হইতেই পূর্ববঙ্গ-গীতিকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। ভগিনী নিবেদিতাও উক্ত গীতিকার ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়াই দীনেশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "বড় বড় লম্বা শব্দ লাগাইয়া যাঁহারা মহাকবির নাম কিনিয়াছেন, পল্লীগাথার অমার্জিত ভাষার মধ্যে অনেক সময় তাঁহাদের অপেক্ষা ঢের গভীর ও প্রকৃত কবিত্ব আছে⋯ তাহাদের মেঠো সুরে রাগিণী না থাকিলেও প্রাণ আছে, আর তাদের কুঁড়ে ঘরে সোনারূপার ধাম না থাকিলেও আঙ্গিনায় সিউলি ও মল্লিকাফুলের গাছ আছে।" —দীনেশচন্দ্র সেন—ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য, পৃ. ৩৭০

৬৬ সম্প্রতি ডঃ দুসান জ্‌বাভিতেল এই অনুবাদ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "However great its merit may have been in presenting the ballads to non-Bengali readers, it must be said that this translation does not faithfully reproduce the Bengali Text." (*Bengali Folk-Ballads from Mymensingh*, p. 38, foot note) এ অভিযোগ মিথ্যা নহে। দীনেশচন্দ্র পালার কাহিনী যেভাবে ইংরাজী গদ্যে বিবৃত করিয়াছেন তাহাতে মূলের স্বাদগন্ধ, ভাষা প্রভৃতি কিছুই রক্ষিত হয় নাই। *Eastern Bengal Ballads* ও ময়মনসিংহ গীতিকা-পূর্ববঙ্গ গীতিকার, সম্পর্কটি অনেকটা ল্যাম্বের *Tales from Shakespeare*-এর সঙ্গে মূল সেকস্‌পীয়রের নাটকের সম্পর্কের মতো।

বলিয়া মনে করিতেন, ইহারা যে ততটা প্রাচীন নহে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। গাথাগুলিতে হিন্দুমুসলমান সংক্রান্ত যে সমস্ত কাহিনী আছে, তাহাতে মনে হইতেছে, পালাগুলির জড তিন চারি শত বৎসর পূর্বে যাইতে পারে। কিন্তু যে ভাষায় ইহাদের পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের আধুনিক ভাষার কিঞ্চিৎ প্রভাব আছে। কিন্তু গোল বাধিয়াছে অন্য স্থানে। ময়মনসিংহ গীতিকার সব পালা চন্দ্রকুমার দের সংগ্রহ—এবং এই পালাগুলির ভাষায় পশ্চিমবঙ্গীয় শব্দপ্রয়োগ, সূক্ষ্ম কবিত্বরস, বর্ণনার আধুনিক লক্ষণ এতই প্রকটভাবে ধরা পড়িয়াছে যে, অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকেন এগুলিতে চন্দ্রকুমারের প্রচুর হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছিল। কেহ গুরুতর সংশয় উত্থাপন করিলেন। তাঁহাদের মতে, এই সমস্ত পালাগানের মধ্যে যেগুলি অতি উৎকৃষ্ট সেগুলি অশিক্ষিত কৃষকের রচনা হইতেই পারে না। পালাগুলিতে আধুনিক কালের কবির লেখনীসঞ্চালন লক্ষ্য করা যাইতেছে।

ছাপার অক্ষরে একই বৎসরে দুইজনে এই সংশয়ের ভাষা জোগাইয়াছিলেন। ১৯৪০ সালে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' এবং শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা' প্রকাশিত হয়। দুই জনেই একাধিক দিক হইতে ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকার পালাগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সংশয় উত্থাপন করেন। ডঃ সেন স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, "অধিকাংশ পালা শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত। পালাগুলিতে স্থানীয় উপভাষার রূপ বজায় রাখিবার চেষ্টা সত্ত্বেও সাধুভাষার এবং কলিকাতা অঞ্চলের কথ্যভাষার প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। মধ্যে মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার (এবং সাধুভাষার) শব্দগুলিকে পূর্ববঙ্গীয় রূপ দিবার চেষ্টা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে সন্দেহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, পালাগুলি সর্বাংশে অকৃত্রিম নয়।" তারপরে তিনি মুদ্রিত মহুয়া পালার অনেকগুলি পশ্চিমবঙ্গীয় শব্দের দৃষ্টান্ত দেন। অতঃপর তিনি দেখাইলেন যে, কোন কোন পংক্তি নিতান্তই আধুনিক কালের রচনা। যেমন—"ভিনদেশী অতিথির মুখ দেখয়ে স্বপন", কিংবা, "ওই শুন বাজে বাঁশী দূরে শুনা যায়।" সন্ধান করিলে ময়মনসিংহ গীতিকা হইতে আধুনিক দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যাইতে পারে। ভাষার কথা ছাড়িয়া দিলেও অনেক

পালাতে পুনর্বিন্যাস বা হস্তক্ষেপের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কোন কোন সংক্ষিপ্ত পালাতে "অন্য গল্পের অংশ যোগ করিয়া অথবা অন্যরূপে কাহিনীকে পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত করিয়া রোমান্টিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে।" ডঃ সেনের মতে এই সমস্ত পালা কখনও সুবিন্যস্তরূপে গীত হইত না। সংগ্রাহক এই সমস্ত বিশৃঙ্খল পালাকে নিজ জ্ঞানবুদ্ধি মতো পরিবর্ধিত বা পরিবর্তিত করিয়াছেন। বিশেষতঃ "গীতিকাগুলির মধ্যে যেগুলি সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের মনোহরণ করিয়াছে সেগুলির কোনটিকেই সর্বাংশে অকৃত্রিম গণ্য করা যায় না।"

শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত পালাগানগুলির প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা সম্পর্কেও কিঞ্চিৎ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন ('বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা')। তাঁহার যুক্তিটি এইরূপ:—মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য দেবলীলাপ্রধান। মানুষের যে সমস্ত কাহিনী বা চরিত্র আছে তাহাও দেবদেবীর কৃপা-অকৃপা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এরূপ অবস্থায় শুধু ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকায় দেবভাববর্জিত মর্ত্যজীবনের সুখদুঃখের কথা, বিরহমিলনের বাণী এতটা প্রাধান্য পাইল কি করিয়া?[৬৭] অর্থাৎ তিনিও সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, এই গীতিকায় হয়তো কিছু হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে।[৬৮] কবি জসিমুদ্দিন (যিনি একদা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গাথা-গীতিকা সংগ্রহ করিতেন) কিন্তু অনেক পূর্বে এইরূপ সংশয় উত্থাপন করিয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্রের নিকট তিনি খুব সম্ভব চন্দ্রকুমার সংগৃহীত পালা গান সম্বন্ধে সন্দেহের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্র তাঁহার 'পুরাতনী' (১৯৩৯) গ্রন্থে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন, "কবি জসিমুদ্দিন এত সুন্দর গানগুলি খাঁটি কিনা এ জন্য প্রথমত একটা দ্বিধাযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে নিজ পল্লীতে ঘুরিয়া অনেক গান নিজে শুনিয়া আমাকে লিখিয়াছিলেন, "আমার পূর্বে সন্দেহ

৬৭ শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত—বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা (নূতন সংস্করণ, পৃ ৪৭) শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের মনে "গীতিকার প্রাচীনতা নিয়ে সন্দেহ" জাগিলেও কাব্যধর্মে তিনি গীতিকার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। অবশ্য "এর তুলনা ফরাসী ক্রবাদুর কাব্যে এবং স্কচ ব্যালাডে আছে"—তাঁহার এই মন্তব্য একটু উচ্ছ্বসিত মনে হইতেছে।

৬৮ নন্দগোপাল বাবুর মতটি প্রণিধানযোগ্য, "গীতিকার গল্পগুলি পুরাতন, কিছু কিছু অংশও পুরাতন, কিন্তু তাকে ঘষে মেজে যথাসম্ভব প্রাচীন সাজে সাজিয়ে একালেই লেখা হয়েছে, এ কালের অনুযায়ী ব্যঞ্জনা দিয়ে।"—ঐ গ্রন্থ, পৃ. ৪৬

হইয়াছিল তাহাই আমার দোষ। আর এখন যে আমি এ গান শুনিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া আসিয়াছি তাহা কি কেহ দেখিবে না? গীতিকার মত গান রবীন্দ্রনাথও রচনা করিয়া গৌরব করিতে পারেন। সন্দেহ না করিলে সত্যকে পাওয়া যায় না। স্বয়ং মহাপ্রভুকে অদ্বৈতের মত জ্ঞানবান ব্যক্তি সন্দেহ করিয়া নানারূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন।"৬৯ দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে ('পুরাতনী') উল্লিখিত কবি জসিমুদ্দিনের এই পত্র হইতে মনে হইতেছে, প্রথম দিকে জসিমুদ্দিন চন্দ্রকুমার সংগৃহীত গীতিকাগুলির প্রামাণিকতায় বিশেষ সন্দিহান হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে স্বয়ং ময়মনসিংহে গিয়া নিজকর্ণে শুনিয়া ঐ গানগুলির প্রমাণ পান, ইহাদের কবিত্বে মুগ্ধ হন, ইহাদিগকে প্রামাণিক বলিয়া সাগ্রহে স্বীকার করেন এবং সম্ভবতঃ চন্দ্রকুমারকে অনৃতাচারের অভিযোগ হইতে মুক্তি দেন। কিন্তু ব্যাপারটি এত সহজে মীমাংসা হইবার নহে। তাই জটিল ব্যাপার জটিলতর করিবার জন্যই যেন ময়মনসিংহের মাসোয়া গ্রামনিবাসী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ ১৩৫১ সালে (১৯৪৪) নিজ সংগৃহীত একটি পল্লীগাথা 'বাদ্যানীর গান' (বেদেনীর গান) প্রকাশ করিলেন।

'বাদ্যানীর গান' মহুয়া পালারই গ্রাম্যরূপ। উক্ত সংগ্রহের মুখবন্ধে সংগ্রাহক পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যাইতেছে, ১২৯১/৯২ সালে ভট্টাচার্য মহাশয় অতি অল্পবয়সে তাঁহাদের গ্রামের বাটীতে (ময়মনসিংহের মাসোয়া গ্রাম) 'বাদ্যানীর গান' ও 'কোঁড়াশিকারীর গান' শুনিয়াছিলেন। শেখ কাঙালী নামে এক মুসলমান পল্লীগায়ক ঐ অঞ্চলে মহুয়া-সংক্রান্ত বাদ্যানীর গান প্রচার করিয়াছিল। জঙ্গলবাড়ীর প্রসিদ্ধ ভূস্বামী সৌখীন প্রকৃতির সোহাবান দাদখাঁ সাহেব (ঈশাখাঁর বংশধর) সখের পালাগানের দল তৈয়ারী করিয়াছিলেন। শেখ কাঙালী চৌকিদার তাঁহার দলে বাদ্যানীর গান গাহিত। জমিদার সাহেবের গানের দল উঠিয়া গেলে উক্ত শেখ কাঙালী শেখ জহর আলি, শেখ মনীর, তারিণী দে প্রভৃতির সাহায্যে গ্রামে গ্রামে লোকাভিনয় ও পাঁচালীর সংমিশ্রণে বাদ্যানীর গান গাহিয়া বেড়াইত। বাল্যকালে পূর্ণচন্দ্র নিজেদের বাড়ীতে উহাদের গীত বাদ্যানীর গান শুনিয়াছিলেন। তখন হইতেই তিনি পালাগানটি সংগ্রহের

৬৯ দীনেশচন্দ্র—পুরাতনী, পৃ ৯

চেষ্টায় ছিলেন। ১৩২১।২২ সালের দিকে তিনি গায়কদের মুখ হইতে শুনিয়া পালাটি লিখিয়া লইয়াছিলেন। নানা অসুবিধার জন্ত তিনি সংগৃহীত পালাগান মুদ্রিত করিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ময়মনসিংহ গীতিকা প্রকাশিত হইলে তিনি দেখিলেন, তাঁহার সংগৃহীত 'বাগ্যানীর গান' এবং ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া পালা একই। তফাতের মধ্যে, তাঁহার পালাগান গ্রাম্য কবির রচনা, গ্রাম্য গায়কের গান, আর চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত মহুয়ার পালা আধুনিক রুচির উপযোগী, আধুনিক ধরনের বাগ্‌বিন্যাসে পূর্ণ। তাঁহার পালার নায়িকার নাম মহুয়া নহে, মেওয়া। মহুয়ার পালকপিতার নাম হুমরা বেদে নহে, উন্দরা বেদে। মহুয়া সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য—"মহুয়া শব্দটা এদেশের আধুনিক শিক্ষিতের বাপদাদারাও জানিতেন না, বাজে লোকের তো কথাই নাই।" কারণ মহুয়া গাছ পূর্ববঙ্গের কোথাও জন্মে না, ইহা পশ্চিমবঙ্গের বৃক্ষ। সুতরাং নায়িকার নাম মহুয়া হয় কি প্রকারে? বরং মেওয়া হইতে পারে, কারণ পূর্ববঙ্গে মেওয়া-মিশ্রি সমাদৃত, পাড়ার ছেলেমেয়েদের নাম রাখা হয় মেওয়া। সুতরাং ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে মহুয়া নামটি সংগ্রাহকের সংযোজন, নায়িকার প্রকৃত নাম মেওয়া।[৭০] এ বিষয়ে আমাদের মনে হয়, পূর্ববঙ্গে মহুয়া শব্দ অজ্ঞাত নহে (পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। পূর্ণচন্দ্র নায়িকার নাম মেওয়া শুনিয়াছিলেন। মহুয়া শব্দ ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনে (মহুয়া>মউয়া>মেওয়া) অথবা উচ্চারণ বিকৃতির জন্ত 'মেওয়া' হইতে বাধা নাই। সুতরাং চন্দ্রকুমার দে-র সংগ্রহে মহুয়া আছে বলিয়া চিন্তিত হইবার কারণ নাই। হোমরা (হুমরা) বেদের নামটি পূর্ণচন্দ্রের সংগ্রহে দেখা যাইতেছে উন্দরা বেদে। এ বিষয়ে সুরসিক ভট্টাচার্য মহাশয় অম্লরসসিক্ত মন্তব্য করিয়াছেন, "হোমরা-চোমরা পশ্চিমবঙ্গ হইতে রেলে স্টিমারে এ দেশের শিক্ষিত ঘরে আসিয়াছে—গ্রামে যায় নাই। কাঙালীর দলে হোমরা ছিল না। খাঁটি নামটিই ছিল—উন্দরা বাল্যা।" এ সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়, হোমর (হুমরা) শব্দটিও ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনে বা উচ্চারণ বিকৃতির জন্ত উন্দরা শব্দে রূপান্তরিত হইতে পারে। অর্থাৎ

৭০ কিন্তু মলুয়া পালায় মহুয়া ফুলের উল্লেখ আছে—"সুন্দর বদন যেন মহুয়ার ফুল।" পূর্ববঙ্গে মহুয়া গাছ না জন্মাইলেও মহুয়ার নাম অজানা ছিল না।

বিভিন্ন স্থানের পালাগায়কদের মুখে পা জ্ঞান জ্‌ বাভিতেল ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দে
হওয়া বিচিত্র নহে। সুতরাং আমরা চন্দ্রকুমা ম্বন্ধে গবেষণা করিবার অভিপ্রায়ে
জন্ত না হয় নাই অভিযুক্ত করিলাম। কিন্তু চন্দ্রকু গ্রামাঞ্চল পরিভ্রমণ করেন,
সম্বন্ধে পূর্ণচন্দ্র গুরুতর অভিযোগ আনিয়াছেন। তি গ্রামে ঘুরিয়াও চন্দ্রকুমার
পালা সংগ্রহ করেন তাহাই খাঁটি, কারণ তাহাতে গ্র পাইলেন না।[৭২] ডঃ
আধুনিক পশ্চিমবঙ্গীয় পরিমার্জনের কোন চিহ্ন নাই। নের সন্ধান না পাইবার
চন্দ্রকুমারের সংগ্রহের দুইচারি পংক্তির তুলনামূলক গানগুলি সংগৃহীত
যাইতেছে :— গুলিও লুপ্ত
পলায়ন

চন্দ্রকুমারেব সংগ্রহ—

পাইযা সুন্দবী কইন্যা হুমবা বাইদ্যাব নাবী।
ভাব্যা চিন্তা নাম বাখল মহুযা সুন্দবী ॥

পূর্ণচন্দ্রের সংগ্রহ—

এই না কইন্যা কোলে লইযা উন্দবা বাদ্যাব নারী।
বাচগুচ্ছ্যা নাম থৈল মেওযা না সুন্দবী ॥

চন্দ্রকুমারের সংগ্রহ—

সইন্দ্যা বেলা জলেব ঘাটে একলা যাইও তুমি।
ভরা কলসা কাম্বে তোমাব তুল্যা দিব আমি ॥

পূর্ণচন্দ্রের সংগ্রহ—

সন্ধ্যা বেলায জলেব ঘাটে একলা যাইও তুমি।
ভবা কলসী কান্ধে তোমাব তুল্যা দিবাম আমি ॥

চন্দ্রকুমারের সংগ্রহ—

লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুব লজ্জা নাই বে তব।
গলায় কলসী বাইন্ধা জলে ডুব্যা মব ॥
কোথায পাব কলসী কইন্যা কোথায পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুব্যা মরি ॥

পূর্ণচন্দ্রের সংগ্রহ—

লাজধর্ম সকল ছাড়ছ ছাড়ছ দেশের ডর।
গলায় কলসী বান্দ্যা জলে ডুব্যা মর ॥
কৈ পাইবাম কলসী রে কন্যা কৈ বা পাইবাম দরি।
তুমি হও গহিন গাঙ আমি ডুব্যা মবি ॥

এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইতেছে, দুইজনের সংগ্রহের মধ্যে বেশ মিল

চেষ্টায় ছিলেন। ১৩২১।২২ সালের হয় 'ভাষা অধিকতর মার্জিত ও কাব্য-ভনিয়া পালাটি লিখিয়া লইয়াছিলেন সংগ্রহের ভাষাতেও যে সংগ্রাহকের একটু-পালাগান মুদ্রিত করিতে পারেন তাহা বলা যায় না। তবে চন্দ্রকুমারের সংগ্রহের হইতে ময়মনসিংহ গীতিক টু অধিক হইয়াছিল, তাহা 'বাস্তানীর গান' ও মহুয়ার সংগৃহীত 'বাস্তানীর গা মূলক আলোচনা হইতেই বুঝা যাইবে।[৭১]

তফাতের মধ্যে, তাঁর বিষয় লইয়া আবার বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। কবি আর চন্দ্রকুমার দে স দের দেখেছি', ঢাকা, ১৯৫২) এবং রৌসন ইজদানি পালা আর্ মনশাহীর লোকসাহিত্য') পূর্ব পাকিস্তান হইতে পরলোকগত তাঁহার দ্রকুমার দের বিরুদ্ধে আবার নূতন করিয়া কিছু অনুতাচারের অভিযোগ না আনিয়াছেন। বহু পূর্বে জসিমুদ্দিন এই পালাগানের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেও বিশেষ কোন গূঢ় কারণবশতঃ পালাগুলির প্রতি তাঁহার বিশ্বাস আবার ফিরিয়া আসে। কারণ তিনি ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চলে সেই সমস্ত গান শুনিয়া নাকি কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্রকে সেই মর্মেই তিনি চিঠি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত 'যাদের দেখেছি' গ্রন্থে তিনি আবার পুরাতন অভিযোগ জীয়াইয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনাতেও জসিমুদ্দিন এই একই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত পালাগান প্রকাশিত হইবার পর তিনি ময়মনসিংহের নানা স্থান ঘুরিয়াও কোথাও ঐ পালাগান বা চন্দ্রকুমার উল্লিখিত কোন পালাগায়কের সন্ধান পাইলেন না। অবশ্য ঐ ধরনের পালাগান তখনও গ্রামাঞ্চলে লোকমুখে চলিত বটে, কিন্তু তাহার ভাবভাষা সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার—গ্রাম্য কবি ও শ্রোতার উপযুক্ত। তখন জসিমুদ্দিন সাহেবের ধারণা হইল, চন্দ্রকুমার দে পল্লীগীতিকাগুলি সংগ্রহ করিয়া গ্রাম্য কাঠামোর উপর নিজেই মেদমাংস সংযোজনা করিয়া দীনেশচন্দ্রের নিকট উপস্থিত করেন। তাঁহার মতে চন্দ্রকুমার গ্রাম্যগাথার কিছু কিছু লইয়া নিজ ভাবভাষা দিয়া পালাগুলিকে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। চেকোস্লোভেকিয়ার

---

৭১ ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন, মূল কাহিনীর শেষে মহুয়ার আত্মহত্যার ঘটনা ছিল না—এই অভিনাটকীয় আধুনিক ব্যাপার কোন আধুনিক ব্যক্তির সংযোজনা। কিন্তু তাঁহার এ অনুমান ঠিক নহে। কারণ পূর্ণচন্দ্রের সংগৃহীত তথাকথিত "গায়কমুখে যথাশ্রুত একটি খাঁটি সংস্করণ" বাস্তানীর গানের শেষেও মহুয়ার আত্মহত্যার কথাই আছে।

প্রাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ দুসান জ্‌বাভিতেল ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দে 'উনেস্কোর' বৃত্তি লইয়া পূর্ববঙ্গের গাথা সম্বন্ধে গবেষণা করিবার অভিপ্রায়ে সরেজমিনে তদন্ত করিবার জন্য ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চল পরিভ্রমণ করেন, সঙ্গে ছিলেন কবি জসিমুদ্দিন। তাঁহারা বহু গ্রামে ঘুরিয়াও চন্দ্রকুমার সংগৃহীত কোন পালা বা পালাগায়কের সন্ধান পাইলেন না।[৭২] ডঃ জ্‌বাভিতেলের মতে এখন উক্ত পালাগান ও গায়েনের সন্ধান না পাইবার কারণ, চন্দ্রকুমার ও অন্যান্য সংগ্রাহকদের দ্বারা ছড়াগানগুলি সংগৃহীত হইবার পর ক্রমে ক্রমে এই পালাগায়কেরা মরিয়া যায়, গানগুলিও লুপ্ত হইয়া যায়। পাকিস্তান হইবার পর এই জাতীয় গানের যে দ্রুত অপসারণ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

রৌসন ইজদানি তাঁহার 'মোমেনশাহীর লোকসাহিত্যে' বলিয়াছেন যে, তিনি স্বগ্রামবাসী চন্দ্রকুমার দেকে চিনিতেন। তাঁহার মতে, চন্দ্রকুমার ময়মনসিংহ হইতে যে সমস্ত পালাগান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়াছিলেন—বিশেষতঃ নামগুলি। স্বয়ং চন্দ্রকুমার একদা নিজেই ইজদানি সাহেবের নিকট একথা স্বীকার করিয়াছিলেন। চন্দ্রকুমার সংগৃহীত মহুয়ার পালার আসল নাম—'বাগ্যানীর গান'। হুমরা বেদে পালাগানে উমরা বেদে নামে উল্লিখিত, 'দেওয়ানা মদিনা'র পালার আসল নাম—'আলাল-দুলাল'। অবশ্য ইজদানি সাহেবের মতে, মূল আখ্যানে দে-মহাশয় বিশেষ হস্তক্ষেপ করেন নাই। এখানে-সেখানে এবং নামধামে দুই চারিটি পরিবর্তন করিলেও সেজন্য চন্দ্রকুমারকে অপরাধী সাব্যস্ত করা ঠিক নহে—ইজদানি সাহেবের ইহাই অভিমত।

উল্লিখিত তথ্য হইতে দেখা যাইতেছে, সংগৃহীত পালায় কিছু কিছু হস্তক্ষেপ করিলেও চন্দ্রকুমার পালাগুলির আদ্যন্ত পাল্টাইয়া ফেলেন নাই। কবি জসিমুদ্দিন যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন (অর্থাৎ পালাগুলি চন্দ্রকুমারের রচনা) তাহা বোধ হয় ঠিক নহে। কারণ উক্ত আখ্যানগুলি যে কিছুকাল পূর্বে ময়মনসিংহে প্রচলিত ছিল তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে। ইতিপূর্বে পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের সংগৃহীত 'বাগ্যানীর গানে'র উল্লেখ করা

৭২ Dr. Dusan Zbavitel—*Bengali Folk-Ballads from Mymensingh*, pp. 7—8

হইয়াছে। পুরাতন 'সৌরভ' পত্রিকায় (১৬ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা) যতীন্দ্রনাথ মজুমদার লিখিয়াছেন যে, তিনি বাল্যকালে নিম্নবর্ণের জনসাধারণের মধ্যে বাস্থানীর গান, ভেলুয়ার গান, কাঞ্চনমালার গান, মাঞ্জুর মার গান প্রভৃতি গীতিকার প্রচলন দেখিয়াছিলেন। কিছুকাল পূর্বেও ময়মনসিংহের অধিবাসীরা মহুয়ার পালা শুনিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ঢাকার আজহাউল ইসলাম ১৯৩৪ সালেও মহুয়ার গানের প্রচলন দেখিয়াছিলেন। এরূপ ধরনের পালাগান চন্দ্রকুমারের সংগ্রহের পূর্বেও চট্টগ্রাম নোয়াখালির মুদ্রা যন্ত্র হইতে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন ভেলুয়ার গান, চৌধুরীর লড়াই, হাতীখেদার গান প্রভৃতি।[৭৩] এমন কি এখনও পূর্ববঙ্গে এই ধরনের পালাগানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দেব এইরূপ কিছু কিছু ছড়া-পাঁচালী সংগ্রহ করিয়া তাঁহার 'পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গে' প্রকাশ করিয়াছেন।[৭৪] সুতরাং চন্দ্রকুমার সংগৃহীত পালাগানগুলির অস্তিত্বে অবিশ্বাস করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

কিন্তু তিনি যে সংগৃহীত পালায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে পরোক্ষ প্রত্যক্ষ উভয় প্রমাণই পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ—পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য সংগৃহীত 'বাস্থানীর গান' ও চন্দ্রকুমার সংগৃহীত মহুয়ার পালার তুলনামূলক আলোচনা। 'বাস্থানীর গানে'র মোট ছত্রসংখ্যা—দেড় হাজার। কিন্তু মহুয়ার পালার ছত্র সংখ্যা সাড়ে সাত শতের কিছু বেশী। মনে হইতেছে, গাথা সংগ্রহ করিবার সময় চন্দ্রকুমার অনেক পংক্তি যথেষ্ট কবিত্ব

৭৩ ১৮৭৭ সালে বরিশাল হইতে মহম্মদ বাজিউদ্দিন 'জয়ানন্দ-বিবাহ' পালা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ইহা ময়মনসিংহ গীতিকার অন্তর্ভুক্ত 'চন্দ্রাবতী'র পূর্বরূপ। (ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ই. পরার্ধ, পৃ ৫৭৬, পাদটীকা)

৭৪ শ্রীযুক্ত দেব এক মুসলমান বৃদ্ধার নিকট 'আত্তাপসন্তাপের গল্প' শীর্ষক যে পালাগান সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা স্বচ্ছন্দে পূর্ববঙ্গ গীতিকায় স্থান পাইতে পারিত। একটু দৃষ্টান্ত:

আমি ত অবলা নারী বন্ধু হইলাম অন্তরপুরা।
কূল ভাঙ্গিলে নদীর জল মধ্যে পড়ে চড়া॥
রে বন্ধু মধ্যে পড়ে চড়া॥
বইস্তা কান্দে ফুলের ভ্রমর উইড়্যা কান্দে কাগা।
শিশুকালে করলাম পিরীত যৌবনকালে দাগা॥
রে বন্ধু যৌবনকালে দাগা॥

পূর্ণ নহে বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।[৭৫] চন্দ্রকুমার যে পালাগানের প্রকৃত পংক্তি বা ভাষা বদলাইয়া ফেলিতেন তাহার প্রমাণ স্বয়ং দীনেশচন্দ্রও রাখিয়া গিয়াছেন। 'মদনকুমার ও মধুমালা' পালার (পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ২।২) স্থানে স্থানে তিনি বদলাইয়া ফেলিয়াছিলেন, দীনেশচন্দ্র তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তবে তাঁহার মতে চন্দ্রকুমার এই পালায় কিছু হস্তক্ষেপ করিলেও চাষার ভাষা অনেকটা বজায় রাখিয়াছেন।[৭৬] 'কমলারাণী'র ভূমিকায় (পূ. ব. গী. ২।২, পৃ. ২৪) দেখা যাইতেছে চন্দ্রকুমার এই পালার সবটা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, যাহাও সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাও যথাযথ পাঠান নাই, "সারাংশ লিখিয়া পাঠান।"[৭৭] সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হয়, সংগৃহীত পালাগানে কলম চালাইয়া চন্দ্রকুমার অনেক কিছু বাদ দিয়া শুধু সারাংশটুকু দীনেশচন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন। পালাগান সংগ্রাহকেরা যে অনেক সময়ে দীনেশচন্দ্রের নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া গ্রাম্য শব্দাদি পাল্টাইয়া কলিকাতার সমাজের উপযোগী সাধু-শিষ্ট শব্দ জুড়িয়া দিতেন, দীনেশচন্দ্র তাহা অস্বীকার করেন নাই।[৭৮] 'শ্যামরায়ের পালা' (পূ. ব. গী. ৩।২) প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, এই পালাটিতে যে মাঝে মাঝে ঘটনাগত শিথিলতা দেখা যায়, ইহার কারণ—"হয়ত কবি-হৃদয়ে ঘটনাগুলি এতই স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল যে, তিনি শুধু কবিত্বময় অংশগুলি রাখিয়া অপেক্ষাকৃত নীরস ঘটনার অংশ বাদ দিয়া গিয়াছেন।"[৭৯] কিন্তু এখানে কবির উপর এ অভিযোগ চাপানো উচিত হইবে না। গীতিকার কবিরা মূলতঃ আখ্যান-কাব্যের কবি, তাঁহারা অনেক সময় গল্পের ঝোঁকে অপ্রাসঙ্গিক আখ্যানও ফাঁদিয়াছেন। সুতরাং এই আখ্যানের কবি নীরস বলিয়া আখ্যানের

৭৫ ডঃ সুকুমার সেন—পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৫৮২

৭৬ "শিক্ষিত লোকের লেখনী মাঝে মাঝে, চাষার কথার প্রতি ঘৃণার দরুণই হউক অথবা অভ্যাসগত অনবধানতা বশতই হউক, প্রাচীন রচনার উপর অনেকটা সংশোধনকার্য করিয়া থাকে। কয়েক স্থানে বর্তমান সংগ্রাহক এই দোষ এড়াইতে পারেন নাই।" (পূ. ব. গী. ২।২ পৃ ৩৪)

৭৭ ঐ, পৃ. ২৪

৭৮ "পালাগান-সংগ্রাহকেরা আমার উপদেশ সত্ত্বেও সর্বদা সাধুভাষার প্রভাব কাটাইয়া চলিত শব্দ ও কথিত ভাষা ব্যবহার করেন নাই।" (পূ. ব. গী. ৩।২, পৃ. ১/০)

৭৯ পূ. ব. গী. ৩।২, পৃ. ২৭০

কিয়দংশ ছাড়িয়া যাইবেন—তাহা মনে হয় না। সম্ভবতঃ চন্দ্রকুমার সে-ই কলিকাতার শিষ্টসমাজে পালাগানের বিস্ময়কর কবিত্বরস জাহির করিবার জন্য এবং দীনেশচন্দ্রের প্রশংসা কুড়াইবার জন্য অনেক পালার এরূপ অনেক 'নীরস' অংশ বেমালুম বাদ দিয়া গিয়াছেন। ইতিপূর্বে রামায়ণ অংশের আলোচনায়[৮০] চন্দ্রাবতীর রামায়ণ প্রসঙ্গে আমরা চন্দ্রকুমারের পালা বদলানো বা নূতন করিয়া লিখিবার অভ্যাসের কথা বলিয়াছি। এখন কথা হইতেছে, পালাগান লিখিবার মতো বা পরিবর্তন করিবার মতো কবিত্ব কি তাঁহার আয়ত্ত ছিল? তাঁহার যে খানিকটা কবিত্বশক্তি ও লিখিবার কলা-বিদ্যা আয়ত্ত হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পুরাতন 'সৌরভ' পত্রে তাঁহার যে সমস্ত প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে, সেগুলি বেশ সুখপাঠ্য, ভাষার মধ্যে কবিজনোচিত বাঁধুনি ও ঝঙ্কার দুর্লভ নহে। দীনেশচন্দ্র ময়মনসিংহ গীতিকার ভূমিকায় দেখাইয়াছেন যে, চন্দ্রকুমার মহাকাব্য, প্রবন্ধ ও উপন্যাস রচনায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, একখানি উপন্যাস ও মহাকাব্য আরম্ভও করিয়াছিলেন।[৮১] সুতরাং ঐ অঞ্চলের অধিবাসী এবং কবিত্বগুণসম্পন্ন চন্দ্রকুমার মূল পালায় দুই চার পংক্তি জুড়িয়া দিলে বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু কেহ যদি প্রশ্ন করেন, হঠাৎ তিনি জোড়াতাড়া দিয়া পালাগানের চেহারা পাল্টাইয়া দিবেন কেন? তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভুক্ পালা-সংগ্রাহক ছিলেন—তাঁহার কর্তব্য—"যচ্ছ্রুতং তল্লিখিতং"। তাহা না করিয়া কোন্ স্বার্থের বশে তিনি এইরূপ অপকর্মে প্রবৃত্ত হইবেন? তাহারও সঙ্কেত ময়মনসিংহ গীতিকার ভূমিকা হইতে পাওয়া যাইবে। দীনেশচন্দ্র সর্বপ্রথম ১৯১৯ সনে যখন কলিকাতায় চন্দ্রকুমারের সঙ্গে পরিচিত হইলেন, তখন তিনি দেখিলেন, পল্লীগাথা অপেক্ষা পৌরাণিক সাহিত্য সংগ্রহের দিকেই

---

৮০ এই গ্রন্থের ৪৪৬—৪৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৮১ এ বিষয়ে চন্দ্রকুমার দীনেশচন্দ্রকে জানাইয়াছিলেন, "সৌরভে চন্দ্রাবতীর উপাখ্যান আমার প্রথম উদ্যম। ইহার পরে 'লোহার মাঞ্জাস' নামে একখানি কাব্য লিখিতে আরম্ভ করি। বলা বাহুল্য ইহা চাঁদসদাগর এবং বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী। ইহার সপ্তম সর্গ পর্যন্ত লেখা আছে। শেষ করিতে পারি নাই। এই সময় শরীরের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া গুরুতর পরিশ্রম করিতাম। প্রাতে পত্রিকার জন্য গল্প, বিকালে উপন্যাস ও গভীর রাত্রে লোহার মাঞ্জাস লিখিতাম।" (ময়মনসিংহ গীতিকা, ১।২, ভূমিকা)

চন্দ্রকুমারের অধিক ঝোঁক। পালাগানগুলি ভালবাসিলেও চন্দ্রকুমার পৌরাণিক পুঁথিসাহিত্যকে অধিকতর শ্রদ্ধা করিতেন। পালাগুলি তিনি সংগ্রহ করিতেন বটে, কিন্তু গীতিকাগুলির প্রতি দীনেশচন্দ্রের যেমন অপরিসীম মমতা ছিল, চন্দ্রকুমারের ততটা ছিল না বলিয়াই মনে হয়।[৮২] কারণ তিনি কয়েকটি পালাগান সংগ্রহ করিতে গিয়া দীনেশচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন, "এগুলি এত প্রাচীন ও ইহাদের ভাষা এমন পাড়াগেঁয়ে যে শুনিলে হাসি পায়।" "পাড়াগেঁয়ে" ভাষায় লিখিত পালাগানগুলি যদি চন্দ্রকুমারের হাস্য উদ্রেক করিয়া থাকে, তবে তিনি তাহার প্রতিষেধক হিসাবে কিসের সাহায্য লইয়াছিলেন? গ্রাম্যভাষায় গ্রথিত কৃষক-কবিদের বিকৃত ভাষাকে রাজধানীর বিদ্বজ্জনের সভায় পেশ করিবার সময় তিনি নিশ্চয় ইহাকে মাজিয়া ঘষিয়া ও চাঁছিয়া ছুলিয়া বেশ 'সভ্যভব্য' করিয়া তুলিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাতে দ্বিমত নাই যে, সংগৃহীত পালার ভাষায় গ্রাম্যতা ও হাস্যকর কিছু থাকিলে চন্দ্রকুমার তাহা তুলিয়া দিয়া কোন কোন স্থানে নিজের ভাষা ও শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন—দীনেশচন্দ্র সে কথা গোপন করেন নাই।

কিন্তু পালাগানের ভাষা ও বিন্যাসে অযথা হস্তক্ষেপের অপরাধ শুধু চন্দ্রকুমারের একার স্কন্ধে চাপাইলে অবিচার করা হইবে। এ বিষয়ে স্বয়ং দীনেশচন্দ্রকেও কি বেকসুর খালাস দেওয়া যায়? দীনেশচন্দ্র ময়মনসিংহ-গীতিকা, পূর্ববঙ্গগীতিকা ও *Eastern Bengal Ballads*-এর ভূমিকায় তাহা স্বীকার করিয়াছেন। চন্দ্রকুমার ও অন্যান্য পালা সংগ্রাহকেরা তাঁহার কাছে যেভাবে পালাগুলি পাঠাইতেন, তিনি সেগুলিকে সেভাবে ছাপাইতেন না, প্রাপ্ত পালাগুলিকে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি মতো সাজাইয়া গুছাইয়া নানাভাবে বিন্যস্ত করিয়া তবে প্রকাশ করিতেন। বক্তব্যের নাটকীয় গতি হিসাবে দীনেশচন্দ্র পালাগুলিকে অনেকগুলি উপচ্ছেদে বিভক্ত করিতেন। এবিষয়ে তাঁহার উক্তি উল্লেখযোগ্য: "চন্দ্রকুমার দে প্রেরিত মহুয়ার পালায়

৮২ ময়মনসিংহ হইতে চন্দ্রকুমার রাধাকৃষ্ণ ও উমামেনকা সম্পর্কীয় কবিগান সংগ্রহের জন্য ব্যগ্র হইলে দীনেশচন্দ্র চন্দ্রকুমারের "এই উৎসাহ খুব সতেজ" হইতে দেন নাই। চন্দ্রকুমার-কে তিনি পল্লীর মৌখিক পালাগান সংগ্রহ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু মার্জিত ধরনের মঙ্গলকাব্যাদির পুঁথির প্রতি চন্দ্রকুমারের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ছড়া ও পালাসংগ্রহের ফাঁকে ফাঁকে তিনি বহু কবিগান ও যাত্রাগানের পালা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (ময়মনসিংহ-গীতিকা, ভূমিকা, পৃ. ।/০) তাহার সামান্যই ছাপা হইয়াছে—যথা 'গোপিনীকীর্তন'।

কতকগুলি গোড়ার পদ ও শেষের পদ বিশৃঙ্খলভাবে দেওয়া ছিল। তিনি যেমন শুনিয়াছিলেন তেমনই সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমি সেগুলি যথাসাধ্য শৃঙ্খলার মধ্যে আনিয়াছি।"[৮৩] ইতিপূর্বে আমরা 'বাস্তানীর গান' প্রসঙ্গে দেখিয়াছি চন্দ্রকুমার মূল পালাতে যথেষ্ট হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, দীনেশচন্দ্র তাহার উপর আবার কিছু কলম চালাইয়াছিলেন। এই লেখনী সঞ্চালনের পরিমাণ কতটুকু, তাহা নির্ধারণ করা সহজ নহে। তিনি কি শুধু শব্দের বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিয়াছিলেন? কিংবা ভাষা ও বর্ণনাতেও হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন? এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য ডঃ দুসান জ্‌বাভিতেল দীনেশচন্দ্রের বাটীতে গিয়া সংগৃহীত পালাগুলির পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার চেষ্টা করেন, কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক তিনি সেগুলি দেখিবার অনুমতি পান নাই।[৮৪] পালাগুলির পাণ্ডুলিপি লোকলোচনের সম্মুখে আনা সম্ভব হইলে সংগৃহীত পালা ও সম্পাদিত পালার তুলনামূলক আলোচনা

---

৮৩ মহুয়া পালা সম্বন্ধে তিনি আরও একস্থলে বলিয়াছেন, "চন্দ্রকুমার দে যেভাবে গীতিটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে অনেক অসঙ্গতি ছিল, গোড়ার গান শেষে আর শেষের গান গোড়ায়—এইভাবে গীতিকাটি উলট-পালট ছিল, আমি যথাসাধ্য এই কবিতাগুলি পুনঃ পুনঃ পড়িয়া পাঠ ঠিক করিয়া লইয়াছি।' (ম. সি. গীতি পৃ. ১৷৵৹) *Eastern Bengal Ballads*-এ (Vol. I, pt. I) তিনি ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া লিখিয়াছেন : "The songs embodying these were found strewn at random over the whole collection in a quite unconnected way. I had to take great pains to re-arrange the poem by a close and careful study of the text" (Preface to Mahua. p. ii) অনুবাদের সময়ে তিনি সব সময়ে আক্ষরিক অনুবাদ করিতেন না। দীর্ঘ বর্ণনাকে ছাঁটিয়া দিয়া পাশ্চাত্য পাঠকের উপযোগী করিয়া কাহিনীটিকে পরিবেশন করিতেন। কেনারামের পালার অনুবাদ প্রসঙ্গে তিনি স্বীকার করিয়াছেন, "I have greatly abridged the story of Manasar Bhasan introduced in Canto V, in my English translation, giving the mere gist to enable my readers to follow the incidents of Kenaram's reformation. I have curtailed passages here and there, but nowhere introduced any idea that is not to be found in the text." (*Eastern Bengal Ballads*, Vol I, p. 167)

৮৪ ডঃ জ্‌বাভিতেলের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য : "To ascertain the truth and to find out to what extent the editor re-arranged some parts of the individual ballads, as he mentioned in his Prefaces, I tried to see the collector's manuscripts ; they are in the keeping of one of Prof. D. C. Sen's sons. Unfortunately, I was able only to ascertain that they still exists, but was not given the opportunity to read them." (*Bengali Folk-Ballads from Mymensingh*, p 59. foot note)

করিয়া দেখা যাইত—চন্দ্রকুমার দে, আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি সংগ্রাহকদের প্রেরিত পালায় দীনেশচন্দ্র কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন কিনা। যাহা হউক, উপসংহারে একথা অসঙ্কোচেই বলা যাইতে পারে যে, ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকার কোন কোন অংশ চিত্তাকর্ষী হইলেও উহাতে প্রাচীন গাথাগীতিকা সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসৃত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভুক্ কর্মচারীরা এবং স্বয়ং দীনেশচন্দ্রের মতো প্রাচীন সাহিত্যের বিচক্ষণ বোদ্ধাও গ্রাম্য গাথাসাহিত্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সম্পাদনের রীতি সম্বন্ধে সম্যক অবগত ছিলেন না। তাই পালাসংগ্রাহকের হাতে গাথাগুলিতে 'একমেটে' রং ধরিয়াছে, দীনেশচন্দ্রের হস্তে 'দোমেটে' হইবার পর গীতিকাগুলি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হইয়া দিব্য শ্রীছাঁদ লাভ করিয়াছে। ইহাতে সংগ্রাহক ও সম্পাদকের অযথা হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে—পরিবর্জন ও পরিবর্ধনের চিহ্নও দুষ্প্রাপ্য নহে। তাই এই সুখপাঠ্য পালাগুলিকে নির্ভেজাল পল্লী সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কিঞ্চিৎ দ্বিধা জন্মায়।

উপসংহার ॥

খ্রীস্টীয় দশম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত আমরা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের তিন খণ্ডে সমাপ্ত করিলাম। এই জাতির ইতিহাস, মনঃপ্রকৃতি, অধ্যাত্মচেতনা, দৈনন্দিন জীবন এই আটশত বৎসরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যে কিরূপ প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পুরাতন বাংলা সাহিত্যের বিস্তারিত ইতিহাস আলোচনা করা হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাঙালীর মধ্যযুগীয় জীবন ধারা, সামন্ততান্ত্রিক শাসনপ্রণালী, গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য, অনাগরিক ও অনাধুনিক মনোভাব ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া গেল। পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া উনবিংশ শতাব্দী হইতে বাঙালীর জাতি-মানস ও শিল্প-সাহিত্যের যে অভাবনীয় পরিবর্তন ও বিকাশ হইল তাহা পরবর্তী যুগের বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। অতঃপর পুরাতন জীবনধারা ও সাহিত্যসংস্কৃতির এইখানে অবসান, আমাদের মধ্যযুগীয় সাহিত্যের দীর্ঘ পথপরিক্রমারও পরিসমাপ্তি ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দ্বিতীয় পর্বের পরিশিষ্ট

সমকালীন য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সাহিত্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের পরিচয় প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, মৌলিক বৈশিষ্ট্য, রচনারীতি ও বিষয়বস্তুগত বৈচিত্র্য—সাহিত্যের বিষয়, রূপ ও রীতির আর বিশেষ কোন নূতনত্ব দেখা দেয় নাই। ভারতচন্দ্র-গোষ্ঠীর কিছু রীতিগত নূতনত্ব, শাক্ত-বাউল গান এবং গাথা ও গীতিকা-সাহিত্য—ইহাই অষ্টাদশ শতাব্দীর একমাত্র উল্লেখযোগ্য পরিচয়। সেই দিক দিয়া দেখিলে মনে হয়, পূর্ববর্তী শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের যে ঐশ্বর্য ও বিকাশ দেখা গিয়াছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেরূপ প্রাণের লক্ষণ আর ফুটিয়া উঠে নাই। তখন মধ্যযুগ শেষ হইয়া আসিতেছে, অতিক্রান্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের পট পরিবর্তিত হইতেছে—মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আয়ুও ক্রমে হ্রস্ব হইয়া আসিতেছে। সাহিত্যেও সেই ক্ষয়িষ্ণুতার লক্ষণ ক্রমেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, এখন দেখা যাক পাশ্চাত্য ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যে কিরূপ বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

য়ুরোপীয় সাহিত্য ॥

ইংরাজী সাহিত্য—প্রথমে ইংরাজী সাহিত্যের কথা ধরা যাক। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যে যে বিস্ময়কর সৃষ্টির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা নহে। কাব্যের দিকে ক্লাসিক ধরনের বুদ্ধিপ্রধান কাব্য-কবিতা—যাহার নায়ক ছিলেন আলেকজাণ্ডার পোপ, এবং গদ্যসাহিত্যের প্রধান ব্যক্তি ডক্টর স্যামুয়েল জনসন—এই দুইজন সারস্বত সাধক অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যম শ্রেণীর সাহিত্যের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতিতে কিন্তু নানা- প্রকার নূতন বৈশিষ্ট্যের সূচনা হইয়াছিল।

নিঃসন্তান তৃতীয় উইলিয়মের মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় জেম্‌সের দ্বিতীয়া কন্যা

অ্যান ইংলণ্ডের রাণীর পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। এই সময়ে স্পেন ও ফ্রান্সের সহিত সংঘর্ষে ইংরাজের বিজয়গৌরব য়ুরোপেও খ্যাতি সম্প্রসারিত করিল, জিব্রাল্টারে ইংরাজদের আধিপত্য সুদৃঢ় হইল। ১৭১৩ খ্রীঃ অব্দে উট্রেখ্‌ট্ সন্ধির পর ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক সত্তা ও শক্তি ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। ইতিপূর্বে (১৭০৭) ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের সমন্বয়ের ফলে এই দ্বীপ গ্রেটব্রিটেন নামে সকলের ঈর্ষা উদ্রেক করিয়াছিল। এই সময়ে ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি, ঔপনিবেশিক ঐশ্বর্যের সূচনা প্রভৃতির সঙ্গে পার্লামেন্টের সহিত জনতার যোগাযোগ, টোরি-হুইগ পার্টির দ্বন্দ্বে মুদ্রাযন্ত্র ও চিন্তার স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকারবোধ প্রভৃতি প্রগতিশীল ব্যাপার জনচিত্তকে গভীরভাবে আকর্ষণ করিল।

রাণী অ্যানের আকস্মিক মৃত্যুর (১৭১৪) পর হ্যানোভার রাজবংশের উত্থান এবং রাজা প্রথম জর্জ (রাজত্বকাল—১৭১৪—২৭), দ্বিতীয় জর্জ (রাজত্বকাল—১৭২৭—৬০), তৃতীয় জর্জের (রাজত্বকাল—১৭৬০—১৮২০), শাসনকালে ইংলণ্ডের উপর দিয়া প্রবল পরিবর্তন, উত্তেজনা ও বিষণ্ণতায় স্রোত বহিয়া গিয়াছে। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, নেপোলিয়নের উত্থান প্রভৃতি ঘটনায় ইংলণ্ডের রাজশক্তি ও জনশক্তি সমভাবে উচ্চকিত হইয়া উঠিল, আর সেই চেতনা ইংরাজী সাহিত্যে—বিশেষতঃ গদ্যসাহিত্যের নূতন দিক নির্দেশ করিল।

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কবি আলেকজাণ্ডার পোপ এবং দ্বিতীয়ার্ধে চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক ডঃ জনসন নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে আলেকজাণ্ডার পোপের প্রভাবে ক্লাসিকধর্মী, সংহতগঠন, কৃত্রিম মাপের যে কাব্যকবিতা রচিত হইয়াছে তাহাতে ভাষাবিন্যাসগত সংযম রক্ষিত হইলেও কল্পনার শীর্ণতা ও আবেগের দীনতার জন্য এই ক্লাসিকযুগের কাব্যসাহিত্যে চিরন্তনের স্বাক্ষর ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। পোপের ব্যঙ্গকাব্য *The Rape of the Lock*, *Dunciad*, তত্ত্বকাব্য *Essay on Man*, *Essay on Criticism* প্রভৃতিতে বিচিত্র কলাকৌশল, উতরোল রঙ্গ ও বিষাক্ত ব্যঙ্গ থাকিলেও তাহাতে মানবহৃদয়ের কোন গভীর ইঙ্গিত নাই, জীবন সম্বন্ধে কোন প্রত্যয় নাই—নিষ্প্রাণ নীরস বুদ্ধির কেরামতি এবং ক্লাসিক রোমান প্রভাবে চাঁছাছোলা ও মাপা-

জোখা বাগ্‌বিন্যাসই ছিল পোপ এবং তাঁহার সমকালীন ও উত্তরসূরীদের একমাত্র মূলধন। পার্লামেন্ট, রাজনীতি, নাগরিকতা প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া তাঁহারা এমন মাতিয়া উঠিয়াছিলেন যে, হৃদয় নামক বস্তুটিকে কিছুদিনের জন্ম শিকায় তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। স্যামুয়েল গার্থ (১৬৬১—১৭১৯), প্রায়র, ব্ল্যাকমুর—ইঁহারা গভীর ও রঙ্গরসের ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, তাহাতে ড্রাইডেন-পোপের অনুসরণ ব্যতীত বিশেষ কোন নূতনত্বের আভাস ফুটে নাই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কিছু পূর্বে ইংরাজী কাব্যে কিছু পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরিবর্তনের বাণী বহন করিয়া আনিলেন দুইজন কবি—জেমস্ টমসন এবং উইলিয়ম কুপার। টমসনের ঋতুবিষয়ক কবিতাগুলি (*The Seasons—1726-30*) মর্ত্যজীবনেব আবেগ ও চিত্রে ভরপুর। কলিন্‌স্, গ্রে—ইঁহারাও কিঞ্চিৎ কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু যথার্থ নূতনত্বের ভাণ্ডারী হইলেন উইলিয়ম কুপার। যদিও তিনি রচনা-ভঙ্গীতে পুরাতন বাঁধাছাঁদা রীতিপ্রকরণ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তথাপি প্রেম, প্রকৃতি ও জীবনের বিচিত্র রহস্য তাঁহার কাব্যকবিতায় ধরা পড়িয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ ও বিষণ্ণতা তাঁহার কবিজীবনের কিয়দংশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তথাপি *The Task, The Winter Walk, On the Recipt of my Mother's Picture* প্রভৃতি কবিতা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পোপ-ড্রাইডেনের ভারী আবহাওয়া ও রঙ্গরসের চটুলতা ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, পরবর্তী যুগের গীতিপ্রবণতা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। ক্র্যাব নিঃস্পৃহ ও নিরুৎসুকভাবে ইংলণ্ডের বিবর্ণ পল্লীজীবনের নীরস, বাস্তব ও আবেগবর্জিত চিত্র অঙ্কন করিলেও কুপার প্রকৃতি ও মানবজীবনের স্নিগ্ধ-মধুর রহস্যময়তা ও বিষণ্ণ বিধুরতার যে মর্মগ্রাহী সুর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোলরীজের *The Lyrical Ballads*-এর মধ্য দিয়া পরবর্তীযুগে সহস্রধারায় প্রবাহিত হইল, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী কাব্যকবিতা আইনকানুনের বাঁধাবাঁধি শৃঙ্খলা হইতে মুক্ত হইল—কুপারের কবিতা তাহারই নান্দী পাঠ করিয়াছে।

নাটকের দিকেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশেষ কাহাকে লইয়া গর্ব করিবার কিছু নাই। স্বয়ং ড্রাইডেন প্রায় ত্রিশখানি মধ্যম শ্রেণীর নাটক লিখিয়া-

ছিলেন—অনেক সময় ফরাসী কমেডির অনুকরণে। স্ভাডওয়েল, উইচারলি কনগ্রাভ, গোল্ডস্মিথ এবং সেরিডান—ইঁহারা অনেকগুলি বুদ্ধিদীপ্ত কমেডি লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই ধরনের কৃত্রিম নাটকের সাহিত্যগত মূল্য অধিক নহে। এই যুগে দুই চারিখানি ট্র্যাজেডিও রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে টমাস অটোয়ের *Venice Preserved* ট্র্যাজেডি হিসাবে একযুগে বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। যাহা হউক অষ্টাদশ শতাব্দীর ট্র্যাজেডি ও কমেডি—কোন নাটকই দীর্ঘস্থায়ী যশ লাভ করিতে পারে নাই। এই যুগ কৃত্রিম কাব্যকলার যুগ, আবেগ তখন মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। নিপুণ রচনাকৌশলই তখন একমাত্র কবিত্ব বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে কমেডি ও লঘুরসের নাটক তবু কিছু আসর জমাইতে পারে, কিন্তু ট্র্যাজেডির আবেগ, গাম্ভীর্য ও স্তব্ধ বেদনার সীমাহীন আর্তনাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর ট্র্যাজেডিগুলি এত নিষ্প্রাণ মনে হয়।

ইংরাজী সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর যদি কোন ঐতিহাসিক মূল্য থাকে তবে তাহা উপন্যাস ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ। ইতিপূর্বে উপন্যাসের সূচনা হইলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে যথার্থ উপন্যাস রচিত হয় নাই। স্যামুয়েল রিচার্ডসন (১৬৮৯-১৭৬১), হেন্‌রি ফিল্ডিং (১৭০৭-৫৪), টোবিয়াস স্মোলেট (১৭২১-৭১), লরেন্স স্টার্ন (১৭১৩-৬৮), কয়েকজন মহিলা ঔপন্যাসিক (আফ্রা বেন, মান্‌লি, ফিল্ডিং ভগিনী, নাট্যকার সেরিডানের মাতা ফ্রান্সিস সেরিডান, হানা মুর, ফ্যানি বার্নি প্রভৃতি) অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যকে কৃত্রিম কাব্যকলা ও তুচ্ছ কমেডি হইতে রক্ষা করেন। রিচার্ডসনের পামেলা, ক্লারিসা হার্লো প্রভৃতি উপন্যাসে নীতির দিকটি প্রাধান্য পাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার কাহিনীগুলিতে স্বাভাবিক আবেগের যথাযথ প্রকাশ ঘটিয়াছে বলিয়া একদা এই সমস্ত উপন্যাসের এত চাহিদা ছিল। ফিল্ডিং-এর জোসেফ এ্যাণ্ড্রুস, জোনাথান ওয়াইল্ড, আমেলিয়া—তিনখানি উপন্যাসে কোথাও ব্যঙ্গরস, কোথাও জীবনের গভীর অনুভূতি ও বেদনা নরনারীর নূতন মূর্তি অঙ্কন করিয়াছে। স্মোলেট ও স্টার্ন উপন্যাসে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জীবন্ত ভাব সঞ্চার করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গদ্য নিবন্ধসাহিত্য ও রম্যরচনাবলী ইংরাজী সাহিত্যের

শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য দাবি করিতে পারে। চিন্তানায়ক ডঃ জনসন (১৭০৯-৮৪) অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তাশীল গদ্য সাহিত্যে ও ইংলণ্ডের মনীষায় মানদণ্ড স্বরূপ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার অনুচর বিশ্ববিখ্যাত বসওয়েল প্রণীত তাঁহার জীবনচরিতে এই বিরাট ব্যক্তির জীবনাদর্শ, মনঃপ্রকৃতি ও গদ্যশিল্পীর স্বরূপ ধরা পড়িয়াছে। জনসনের চিরস্মরণীয় কীর্তি ইংরাজী ভাষার অভিধান সঙ্কলন (*Dictionary of the English Language*)। কবিতা ও নাটকেও তিনি কিঞ্চিৎ হাত পাকাইয়া গদ্যনিবন্ধে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহার নীতি-মার্গীয় উপন্যাস 'রাসেলাস' একযুগে গণপাঠ্য কথাগ্রন্থ হিসাবে অভিনন্দিত হইয়াছিল। এমনকি উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই বাঙলাদেশে ইহার একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে কিছু কিছু চিত্তাকর্ষী আখ্যান থাকিলেও ইহার গুরুগম্ভীর 'জনসনীয়' বাচনরীতি ও বিশুদ্ধ নীতি প্রচার এ যুগের পাঠকের ভাল লাগিবে না। ডঃ জনসন একাধিক পত্র-পত্রিকা স্থাপন ও প্রচার করিয়া ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবী সমাজের নেতৃত্ব করিয়া-ছিলেন। তাঁহার *Lives of the Poets* সমালোচনা-সাহিত্যে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তবে জনসন যে পরবর্তীকালে এত বিখ্যাত ও স্মরণীয় হইয়াছেন তাহার অন্যতম কারণ—তাঁহার অনুরাগী বসওয়েলকৃত *Life of Samuel Johnson*—ইহাতে প্রকাশিত তাঁহার অভিমত, আদর্শ, মন্তব্য ইত্যাদি বিষয় ইংরাজী সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁহাকে অক্ষয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যমশ্রেণীর ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র প্রথম-শ্রেণীর ব্যতিক্রম—নিবন্ধ সাহিত্য। জোসেফ এ্যাডিসন (১৬৬১-১৭১৯), রিচার্ড স্টিল (১৬৬২-১৭২৯), ডানিয়েল ডিফো (১৬৬১-১৭৩১), জোনাথান সুইফ্‌ট্ (১৬৬৭-১৭৪৫), অলিভার গোল্ডস্মিথ (১৭২৮-৭৪) প্রভৃতি প্রাবন্ধিক, রম্যরচনাকার ও রঙ্গ-সাহিত্যের স্রষ্টারা ইংরাজী গদ্যসাহিত্যকে যথার্থই য়ুরোপীয় গদ্যসাহিত্যের সমকক্ষ, কোথাও বা উৎকৃষ্টতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।* তন্মধ্যে ডিফোর 'রবিন্সন ক্রুশো' এবং সুইফ্‌টের

---

* ইতিপূর্বে এই গ্রন্থের ৮০৪ পৃষ্ঠায় ইঁহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ ইঁহাদের সাহিত্যজীবন কোন কোন ক্ষেত্রে সপ্তদশ শতাব্দীতেই আরম্ভ হইয়াছিল। তাই ইঁহাদের সাহিত্য-প্রতিভার কিয়দংশ সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যের সঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

গালিভারস্ ট্র্যাভেল সমগ্র য়ুরোপে ক্ল্যাসিক সাহিত্য' বলিয়া এখনও সম্মানিত। এ্যাডিসন, ষ্টিল, গোল্ডস্মিথ প্রভৃতি নিবন্ধকারেরা ইংরাজী গদ্যসাহিত্যের যথার্থই পরিপোষ্টার পদ দাবি করিতে পারেন। তাঁহাদের নিবন্ধগুলিতে মনীষা, সরসতা, ভূয়োদর্শন, জীবনের প্রতি ঔদার্য ও সূক্ষ্ম গীতিপ্রবণতার যে অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছে, তাহা ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী নিবন্ধকার মণ্টেই এবং পরবর্তী কালের বিখ্যাত ইংরাজী রচনাকার ল্যামের সমগোত্র। এই নিবন্ধগুলিতে বিশেষ ধরনের ইংরাজ-মন ব্যক্ত হইলেও তাহাতে কোনও প্রকার সঙ্কীর্ণতা নাই। এই নিবন্ধসাহিত্য রচিত না হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যের বিবর্ণতা ঘুচিত না। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে ইংলণ্ডের বাহিরের অনেক ঘটনা এবং ইংলণ্ডের ঘরোয়া ব্যাপার জনসাধারণকে এতটা সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল যে, নানাপ্রকার আন্দোলনের বাহন হিসাবে গদ্যসাহিত্যের ডাক পড়িয়াছিল— এবং অতি দ্রুত ইংরাজী প্রবন্ধনিবন্ধ সাহিত্যের উন্নতির একটা প্রধান কারণ, তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী। গদ্য নিবন্ধগুলিতে মননের সঙ্গে শিল্পরূপের এমন চমৎকার মিলন পরবর্তী কালের ইংরাজী সাহিত্যেও খুব বেশী নাই।

ফরাসী সাহিত্য—অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যকে 'প্রজ্ঞা'র সাহিত্য ('Enlightenment') বলে। এই একটি শতাব্দীতে ফরাসী জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র ও সাহিত্যের যে কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছিল তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দেশ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সারা য়ুরোপকেই নবজীবনের বার্তা শুনাইয়াছে। ১৭১৫ খ্রীঃ অব্দে স্বেচ্ছাচারী ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের মৃত্যু হইলে লোকে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেও পঞ্চদশ লুইয়ের রাজত্বকালও কোন আশার বাণী বহিয়া আনিল না। স্পেনযুদ্ধ (১৭০১-১৭১৩), অস্ট্রিয়া যুদ্ধ (১৭৪১-৪৮), 'সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ' (১৭৫৬-৬৩) প্রভৃতি ব্যাপারে জড়াইয়া পড়ার ফলে এবং স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র, আমলাচক্র, ধনিসমাজ এবং ধর্মধ্বজীদলের মূঢ় আচরণের প্রতিক্রিয়ার একদিকে যেমন রাজকোষ শূন্য হইতেছিল, তেমনি আর এক দিকে অত্যাচারিত জনসাধারণ ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় এই কুশাসন

ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। অত্যাচারী পঞ্চদশ লুই ভবিষ্যৎ বিচারের দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত দাম্ভিক উক্তি "Apre's moi le deluge" (After me the deluge)—ইহার দ্বারাই তাঁহার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাঁহার মৃত্যুর পর ষোড়শ লুইও (শাসনকাল—১৭৭৪-৮৯) অধঃপতনের সোপানসমূহ আরও স্পষ্ট করিয়া তোলেন। তাঁহার রাণী ম্যারিয়া আঁতোয়ানেৎ শুধু জনসাধারণের ঘৃণাই কুড়াইয়াছিলেন। রুসো, দিদেরো প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীরা বিপ্লবী রচনাদির সাহায্যে মানুষের সাম্যমৈত্রীর বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন, ফলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড বিপ্লবী শক্তি সঞ্চারিত হইল, আর তাহার রক্তচিহ্ন ফুটিয়া উঠিল ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে জনসাধারণেব দ্বারা ব্যাস্টিল দুর্গ পতনেব পর। এই বৎসরই রাজারাণীর শিরশ্ছেদ হইল। ইহার ছয়বৎসর পরে কর্সিকার বীর নেপোলিয়ন কনসাল পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তারপর ১৮০৪ খ্রীঃ অব্দে নিজেই শিরে মুকুট ধারণ করিয়া ফরাসী দেশের সিংহাসনে পুনরায় রাজারূপে অধিষ্ঠিত হইলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দেশে শুধু গণতন্ত্র ও জনশক্তির জয় ঘোষণাই প্রধান ঘটনা নহে। এই যুগে যেমন নানা প্রতিষ্ঠান ও পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্যালোচনা প্রাধান্য পাইতে লাগিল, তেমনি চিন্তার স্বাধীনতা, বাস্তববোধ, প্রশ্নমনস্কতা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-শক্তি, বৈজ্ঞানিক চেতনা সাহিত্যকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিলে শিক্ষিত সমাজে বিপ্লবী চিন্তা প্রচার লাভ করিতে লাগিল। বৈজ্ঞানিক ও মানববাদী আদর্শও সাহিত্যিক ও দার্শনিকের মন জয় করিয়া লইল। প্রথা, সংস্কার, ধর্মপ্রণালী, রাজতন্ত্র—সব কিছুকে ম্লান করিয়া মানুষের স্বাধীন বুদ্ধি ও বিবেক ফরাসী মনঃধর্মকে নূতন আন্দোলনের দিকে উন্মুখ করিয়া তুলিল। ইহাই প্রভাস্বর প্রজ্ঞার যুগ ('The age of Enlightenment')। আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ ও বিবেকবুদ্ধিসমর্থিত ন্যায়বোধ এই যুগে মানুষের নিয়ামক শক্তি বলিয়া স্বীকৃত হইল—এক কথায় য়ুরোপের মানসমুক্তির তোরণদ্বার অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী কবি, সাহিত্যিক, সমাজবিপ্লবী ও বৈজ্ঞানিকগণই সর্বপ্রথম খুলিয়া দেন। সমস্ত কিছুর মূলীভূত কারণ হইল মানুষের প্রাধান্য, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। রুসো ও ভোলতেয়রই যুগনায়ক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ভোলতেয়র (১৬৯৪-১৭৭৮)

এবং রুসো (১৭১২-১৭৭৮)—ইঁহারা একাধারে কবি, নিবন্ধকার, নাট্যকার, দার্শনিক ও রাষ্ট্রনায়ক। ভোলতেয়রকে প্রজ্ঞাযুগের প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করা হয়। অভিজাত সমাজকে খোঁচা দিয়া প্রথম জীবনে তাঁহাকে কারাবাস করিতে হইয়াছিল, পরে ইংলণ্ডে পলাইয়া গিয়া কিছুকাল প্রগতিশীল ইংরাজ জননায়কদের সঙ্গে পরিচিত হইলে তাঁহার মানসিক আকাশের সীমা আরও বাড়িয়া যায়। বিচিত্র প্রতিভাধর ভোলতেয়র নাটক (ঐতিহাসিক ও গ্রীকপুরাণধর্মী), কাব্য (১৭২৮ সালে রচিত 'আঁরিয়াদ' নামক মহাকাব্য) ইতিহাস ও রাজবংশের জীবনী, দর্শন, সমালোচনা (কর্ণেইলের সাহিত্য-জীবন বিশ্লেষণ) প্রভৃতি সাহিত্যের নানা বিভাগে অবাধে বিচরণ করিয়াছেন এই সমস্ত রচনার মধ্য দিয়া একটি প্রচণ্ড বিপ্লবী প্রাণশক্তিই সর্বদা আত্ম-প্রকাশের পথ খুঁজিয়াছে। চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনিতে সক্ষম না হইলেও অন্যায়, অবিচার, সঙ্কীর্ণতা, অনুদারতা, কুসংস্কার প্রভৃতির চিরশত্রু, বিপ্লবের বন্ধু ভোলতেয়র ফরাসী সাহিত্যে অননুকরণীয় স্থান অধিকার করিয়া আছেন তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না।

আর একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জঁা জ্যাক রুসো। ব্যক্তিগত জীবনে বেপরোয়া বোহেমিয়ান, চিন্তার জগতে বিপ্লবী, হৃদয়ের দিক হইতে উগ্র রোমান্টিক, স্বপ্নালুতার দিক হইতে প্রাচীনত্ববিলাসী—এই বিচিত্র প্রতিভাধর ব্যক্তিটি একদা সারা পশ্চিমবিশ্ব তোলপাড় করিয়াছিলেন, ইহার ঢেউ তাহার অর্ধশত বৎসর পরে পূর্বদেশে, বাঙলার শ্যামল প্রান্তরেও আঘাত করিয়াছিল। আধুনিক যুগের আদি-রোমান্টিক রুসো সমাজ, রাজনীতি, নীতি—যাহা লইয়াই ব্যস্ত থাকুন না কেন, আসলে তিনি ছিলেন পুরাদস্তুর আবেগবাদী, কল্পনাপ্রবণ মনীষী। তাঁহার দর্শন ও চিন্তাপ্রণালীর অনেকটাই যুক্তির ধোপে টিঁকে নাই; কিন্তু মানুষের চেতনাকে তিনি যেরূপ প্রবলভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, য়ুরোপের কোন ব্যক্তিই তাহার অনুরূপ মানসিক শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই। বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, উপন্যাস এবং আত্মজীবনী রচনা করিয়া তিনি রোমান্টিক মানসিকতাকে বিচিত্র সাহিত্যকর্ম ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন। প্রচণ্ড আবেগ, অপার্থিব স্বপ্নবিলাস এবং অদ্ভুত কল্পনাশক্তির উন্মত্ত বন্যাপ্রবাহে তিনি মানুষের যুক্তিবুদ্ধিকে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি

ভবিষ্যদ্বাণীই ফরাসী বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল। তাঁহার আবেগোচ্ছল অনেক কথা আজ অর্থহীন ও যুক্তিবিরোধী মনে হইলেও এই বেপরোয়া ব্যক্তিটি তাঁহার কালে এবং পরবর্তী দুই শতাব্দী ধরিয়া মানব-মনীষায় অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

প্রবন্ধনিবন্ধে মঁতেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫) যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সমাবেশ ঘটাইয়াছিলেন তাহাই 'এনসাইক্লোপীডিস্ট্' আন্দোলনে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। দেনি দিদেরো (১৭১৩-৮৪) এই বিশ্বকোষের প্রধান সম্পাদক হইয়া (ইহার প্রকৃত নাম—'Encyclopaedia or Practical Dictionary of the Sciences, of the Arts and of the Trades') ৩৪ খণ্ডে নানা জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন-রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ভোলতেয়র, দ্য'লেমবার, রুসো, মঁতেস্কু প্রভৃতি পণ্ডিত, মনীষী ও চিন্তাবিপ্লবীরাও এই গ্রন্থমালায় মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন—বস্তুতঃ ফরাসীবিপ্লবের বেদমন্ত্র এই 'এনসাইক্লোপীডিস্ট' আন্দোলন হইতেই উদ্গীত হইয়াছিল।

এই যুগে কিছু কিছু নাটক, রঙ্গনাট্য ও ট্র্যাজেডি রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু গুণগত উৎকর্ষে তাহার মূল্য বেশী নহে। এই প্রসঙ্গে রুসোর শিষ্য সেণ্ট পিয়েরির নাম করা যাইতে পারে। রোমান্টিক কিশোর-কিশোরীর স্নিগ্ধমধুর প্রেমের উপাখ্যান লইয়া তিনি 'পল এত্ ভার্জিনি' নামক গদ্য আখ্যান রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে য়ুরোপের রোমান্টিক গল্প-আখ্যানের ক্রমবিকাশে এই কথাগ্রন্থটির বিশেষ প্রভাব স্মরণীয়। বাঙলা-দেশেও উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই উপন্যাসের একাধিক বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহা হউক, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যে কাব্য, নাটক ও কথাসাহিত্য অভূতপূর্ব বিস্ময় সৃষ্টি করিতে না পারিলেও চিন্তামূলক নিবন্ধসাহিত্যে যে সুগভীর রেখা মুদ্রিত করিয়াছিল, তাহা আজ দীর্ঘ দুই শত বৎসরের ব্যবধানেও অস্পষ্ট হইয়া যায় নাই। চিন্তার স্বাধীনতা, বিবেকবুদ্ধির জাগরণ, সংস্কারের বন্ধনমোচন, মানুষের বাস্তব বাসনাকামনার প্রাধান্য প্রভৃতি শুধু যে গদ্যসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে তাহা নহে—সমস্ত যুগটিকেই প্রজ্ঞার যুগরূপে চিহ্নিত করিয়া পশ্চিমবিশ্বের ইতিহাসে নবজীবন-চেতনা সৃষ্টি করিয়াছে।

জার্মান সাহিত্য—অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মান সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে জার্মান সাহিত্যে অনুকরণের অভিশাপ ঘুচে নাই। অবশ্য রাজনৈতিক দিক হইতে বিচার করিলে অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মানীর জীবনে প্রভূত উন্নতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমষ্টি হইলেও ইহাদের মধ্য হইতে প্রাসিয়ার প্রাধান্য লাভ জার্মান সংস্কৃতির উন্নতির কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রাসিয়ার প্রাধান্য লাভের ফলে গোটা জার্মান জাতির অন্তরে জাতীয় উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। 'সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে' (১৭৫৬-৬৩), দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের (রাজত্বকাল: ১৭৪০-৮৬) নেতৃত্বে ও সুশাসনে ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার আক্রমণ প্রাসিয়া কৃতিত্বের সঙ্গে সহ্য করিয়াছিল। চিন্তাশীল সমাজে যুক্তিবাদ প্রভাব বিস্তার করিলেও রুসোর আবেগবহুল রোমান্টিকতা এই যুক্তিবাদকে বেশ কিছুটা খর্ব করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ইহার ফলে জার্মান সাহিত্য ও চিন্তাধারাও নূতনবেশে সজ্জিত হইয়াছিল। রুসোর রোমান্টিক আদর্শবাদের প্রভাবে সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল মহলে যে সংস্কৃতি লাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল, তাহার ফলে সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রব্যাপারে নবজীবনজ্ঞাপক একটি নূতন ভাবাদর্শের জন্ম হয়। ইহা জার্মান সাংস্কৃতিক জীবনে *Sturm und Drang* অর্থাৎ ঝড়ঝঞ্ঝার আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল—রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি এবং জার্মান সাহিত্যের নবজীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা। বৃথা নিয়মকানুন ও অনুকরণে যখন জার্মান জাতির সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিকাশ শুরু হইয়া গিয়াছিল তখন *Sturm und Drang* আন্দোলনের দ্বারা সাহিত্য ও ব্যক্তিচিত্তের স্বাধীনতা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা সাহিত্যিক ও মনীষীদের চিত্তকে অধিকার করিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ জার্মান সাহিত্যের যে বিচিত্র বিকাশ লক্ষ্য করা গিয়াছে, সমগ্র জার্মান সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। ১৭০০-১৭৫০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন গ্রন্থ জার্মান সাহিত্য অলঙ্কৃত করে নাই। ১৭২৫ খ্রীঃ অব্দের দিকে জোহান ক্রিস্টোফ গটশেড (১৭০০-৬৬) জার্মান সাহিত্যের উন্নতির জন্য ফরাসী ক্লাসিক সাহিত্যের আদর্শে ও নৈতিক বিশুদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে সুকঠোর নিয়মানুবর্তিতার কথা ঘোষণা করেন এবং

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আবেগের অতিরেক খর্ব করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু গটশেড প্রচারিত এই নব্যক্লাসিকতা জার্মান জাতির চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের প্রভাবে ও রুসোর মতবাদের আদর্শে সাহিত্য ও সংস্কৃতির কর্ণধারগণের মনে সাহিত্যসংক্রান্ত উদারতর আন্দোলনের ইচ্ছা ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে এবং ১৭৪৮ সালে উক্ত আন্দোলনের ফলস্বরূপ *Sturm und Drang* আন্দোলন প্রবলভাবে বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত করিতে শুরু করে। ঔপন্যাসিক উইল্যাণ্ড ও সমালোচক লেসিং অতি দ্রুত জার্মান সাহিত্যের উন্নতি করেন। বিশেষতঃ লেসিং-এর সাহিত্য ও শিল্প-সমালোচনা জার্মান চিন্তামূলক সাহিত্যকে সমগ্র য়ুরোপেই শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে।

জন গটফ্রিড হার্ডার (১৭৪৪-১৮০৩) অষ্টাদশ শতাব্দীর আর এক দিকপাল—ইনিই জার্মান সাহিত্যে সর্বপ্রথম আধুনিকতার সূত্রপাত করেন। তাঁহাকে *Sturm und Drang* আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। রুসোর আদর্শ তাঁহার চিন্তায় সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ক্রিয়াশীল সাহিত্যসৃষ্টি অপেক্ষা সাহিত্যান্দোলনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়া তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মানসাহিত্যে স্মরণীয় হইয়া আছেন।

প্রসিদ্ধ গীতিকবি ক্লপস্টক (১৭২৪-১৮০৩), মহাকবি গ্যয়টে (১৭৪৯-১৮৩২) এবং নাট্যকার শিলার (১৭৫৯-১৮০৫) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে জার্মান সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে তুলিয়া ধরেন—তাঁহাদের কাব্য ও নাটককে জার্মান প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি বলিয়া গ্রহণ করা হয়। ক্লপস্টক মূলতঃ গীতিকবির প্রতিভা লইয়া জন্মাইলেও মিল্টনের প্রভাবে খ্রীস্টের জীবন অবলম্বনে *Messias* শীর্ষক সুবৃহৎ মহাকাব্য রচনা করেন। তিনি কিছু কিছু নাটকও লিখিয়াছেন—ইহার অনেকগুলির উপাদান বাইবেল হইতে সংগৃহীত। তাঁহার প্রতিভা গীতিকবিতায় অধিকতর বিকাশলাভ করিয়াছে।

পরবর্তী যুগে যাঁহারা নাটকে ফরাসী নিয়মকানুন ছাড়িয়া লেসিং-এর আদর্শ অনুযায়ী নাটক রচনা করিয়া বিশ্ববিখ্যাত হন তাঁহাদের মধ্যে গ্যয়টে ও শিলারের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। জোহান উল্‌ফ্‌গং ভন গ্যয়টে ফ্রাঙ্ক-

সংস্কৃতি, সাহিত্য ও জীবনে অসাধারণত্ব অর্জন করিয়া জার্মান প্রতিভার প্রতীকপুরুষ নামে অভিহিত হইয়াছেন। প্রথম যৌবন হইতে বিরাশি বৎসর পর্যন্ত তিনি অসাধারণ সাহিত্যপ্রতিভার চিহ্নস্বরূপ বহু কাব্য, নাটক, উপন্যাস রচনা করিয়াছেন—তাঁহার গ্রন্থসংখ্যা অন্যূন ১২০ খানি। তাঁহার দুইখানি মহাকাব্য *Hermann Und Dorothea* (1797) এবং *Faust* (১৭৬৯-১৮৩২), বিশেষতঃ শেষোক্ত নাট্যধর্মী মহাকাব্য গ্যয়ঠের বিশ্ববিস্তারী প্রতিভার স্মারকচিহ্নরূপে বর্তমান। ইহা আকারে নাটক হইলেও, মহাকাব্যের বিস্তার, কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির গাঢ়তা, মনীষার গভীরতা ও সূক্ষ্ম প্রতীকতা এই মহাগ্রন্থকে সর্বকালের সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে--ইহার দ্বারা তিনি ব্যাস-বাল্মীকি-হোমারের পার্শ্বেই স্থান পাইয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থেও প্রতিভার অভাব নাই, কিন্তু যাহাকে চিরন্তন সাহিত্য বলে, *Faust* তাহারই সার্থক উদাহরণ।

জোহান ক্রিস্টোফ ফ্রেড্রিক ভন শিলার, শুধু জার্মানীর নহে, পশ্চিমবিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে পরিচিত: য়ুরোপে তিনি প্রায় শেক্সপীয়রের মতোই খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম জীবনে রচিত নাটকে স্বাধীন চেতনার যে আধিক্য দেখা যায়, সেই মুক্ত বুদ্ধি ও প্রাণশক্তি তাঁহার পরবর্তী নাটকেও রক্ষিত হইয়াছে। দার্শনিক কান্টের প্রভাবে তিনি দর্শন ও সৌন্দর্যতত্ত্ব লইয়াও গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত নাটক *Die Rauber* (The Robbers, 1781) এবং *Wallenstein* শ্রেষ্ঠ নাট্যসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রতিভায় তিনি শেক্সপীয়র ও গ্যয়ঠের সমকক্ষ না হইলেও জার্মানসাহিত্যে তাঁহার সুগভীর প্রভাব স্বীকার করিতে হইবে। সাহিত্যের গুরুত্ব, উৎকর্ষ, সমগ্র জাতির আত্মিক স্বরূপ প্রভৃতি বিচার করিলে অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মান সাহিত্যে, বিশেষতঃ এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সাহিত্যে সমগ্র জার্মান জাতিরই গভীর পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই জার্মান সাহিত্য যথার্থই বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইটালি, স্পেন ও রুশদেশেও সাহিত্যের কিছু বিকাশ হইয়াছে বটে, কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে তাহার গৌরবময়

ভূমিকা স্বীকৃত হয় নাই। ইটালির নাট্যকার আলফিয়ারি (১৭৪৯-১৮০৩), ঔপন্যাসিক মানজোনি (১৭৮৫-১৮৭৩) এবং গীতিকবি ও সমালোচক লিওপার্দি বিরাট প্রতিভার অধিকারী না হইলেও অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর ইটালির সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর স্পেনীয় সাহিত্যেও বিশেষ কোন প্রতিভার চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে না। মলিয়রের অনুকরণে কিছু কিছু রঙ্গনাট্য এবং যৎসামান্য আখ্যানকাব্য ও ব্যঙ্গকাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর স্পেনীয় সাহিত্যের একমাত্র পরিচয় বহন করিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই স্পেনীয় সাহিত্যে যৎকিঞ্চিৎ আধুনিকতার সূচনা হয়।

এই দিক হইতে রুশ সাহিত্যের বিবর্তন বড় বিচিত্র। যথার্থ রুশ সাহিত্যের বিকাশ উনবিংশ শতাব্দী হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। দশম শতাব্দীর দিকে কিয়েভের রাজা ভ্লাদিমির রুশদেশে খ্রীস্টানধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেন, খ্রীস্টানী পুঁথি-সাহিত্যকেও রুশদেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতে প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত রুশদেশকে অর্ধবর্বর তাতার জাতি করতলগত করিয়া রাখিয়াছিল। ফলে এই সময়ে রুশসাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রুশসম্রাট মহামতি পিটার পুনরায় রুশ জাতি ও দেশকে পাশ্চাত্য জাতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশ হইতে আগত গণতন্ত্রের আদর্শ ও সাহিত্যতত্ত্ব রুশদেশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত যে দুইচারিখানি কাব্য ও নাটকের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে সাহিত্যের দিক হইতে উহার মূল্য অধিক নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই রুশ সাহিত্য কিয়ৎ-পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। উপন্যাস, ব্যঙ্গনাটক, গীতিকবিতা প্রভৃতির সংখ্যা বেশী না হইলেও গুণগত উৎকর্ষ তুচ্ছ করিবার মতো নহে। অবশ্য ফরাসী নব্যক্লাসিকতার আদর্শে বিশ্বাসী অষ্টাদশ শতাব্দীর রুশ সাহিত্যিকেরা সাহিত্য ও রচনাসংক্রান্ত নীতিনিয়মের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিলেন বলিয়া তখনও রুশ সাহিত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিকাশ লাভ করিতে পারে

নাই। উনবিংশ শতাব্দীতেই রুশসাহিত্যের যথার্থ বিকাশ আরম্ভ হইল। যে সমস্ত রুশ সাহিত্যিক বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও আবির্ভাব উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে হয় নাই। এবার ভারতের কয়েকটি প্রধান প্রাদেশিক সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্য ॥

হিন্দী সাহিত্য — অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্য বিশেষ কোন অভূতপূর্ব গৌরব বহন করিতেছে না। ইহার পরে উনবিংশ শতাব্দী হইতে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। তাহার পূর্ববর্তী সাহিত্যধারায় উল্লেখযোগ্য কাব্যগুণের বিশেষ চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

হিন্দী সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতেও রীতির যুগ বা শৃঙ্গারকালের প্রাধান্য বজায় ছিল। মধ্যমশ্রেণীর কবিরা হিন্দু ভূস্বামীদের সভা আশ্রয় করিয়া শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্যকাহিনী ও তীক্ষ্ণধরনের কবিতা রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। কেহ কেহ হিন্দী অলঙ্কারশাস্ত্র রচনাপ্রসঙ্গে একটু বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা দিয়াছিলেন। কবিভূষণের হিন্দী অলঙ্কার শাস্ত্রের দৃষ্টান্তগুলিতে শিবাজীর বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী অনুসৃত হইয়াছে। ইহা একটু অভিনব বটে, কারণ সাধারণতঃ অলঙ্কার শাস্ত্রে আদিরসাত্মক দৃষ্টান্ত দেওয়াই রীতি—সেই দিক হইতে ভূষণ নূতনত্বের সূচনা করেন। বৃন্দ ও গিরিধারী রায় নামক দুইজন কবি নীতিবিষয়ক কিছু কিছু কবিতা লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার মূল্য নিতান্তই সাধারণ। মোটকথা অষ্টাদশ শতাব্দীতে মধ্যযুগীয় হিন্দী সাহিত্যের অবসান ঘনাইয়া আসিতেছিল; ভূস্বামিসম্প্রদায় হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন, মুঘলমহিমা অস্তমিত হইয়া গিয়াছিল, মারাঠাশক্তিও পারস্পরিক বিরোধে অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। ফলে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই শতাব্দীর হিন্দী সাহিত্যেরও শ্রীবৃদ্ধি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

গুজরাটী সাহিত্য—অষ্টাদশ শতাব্দীর গুজরাটী সাহিত্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু উহারও মৌলিক সৃষ্টি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত কবি দয়ারামের কিছু কিছু গর্বা গান

গুজরাটী গীতি-সাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। ইনি ব্রজ-ভাষাতেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। গীতিরসের মাধুর্য ও ঝঙ্কারে দয়ারামের গানগুলি এখনও জনপ্রিয়তা রক্ষা করিয়াছে। আরও দুইচারিজন কবি—অনুবাদক ভালন, ঐতিহাসিক কাব্য 'কাহ্নদদে প্রবন্ধে'র কবি পদ্মনাভ, ভাগবতপুরাণের আদর্শে কৃষ্ণকাহিনীর কবি ভীম এবং বৈরাগ্য মার্গের কবি ভোজো—ইঁহারা গুজরাটী সাহিত্যের ধারা বহন করিয়াছিলেন। 'স্বামী-নারায়ণ' সম্প্রদায়ের ভক্তকবিগণ অনেকটা বাঙলার বৈষ্ণব সহজিয়াদের মতো মানবদেহকে মুক্তির প্রধান সোপান মনে করিতেন—তাঁহাদের সাধন-ভজন সংক্রান্ত অনেক গুজরাটী কবিতা পাওয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের দিকে গুজরাটী সাহিত্যে ধর্ম ও ভক্তিভাবের কবিতার অতিরেক সাহিত্যের সজীবতা অনেকটা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রথা-পালনের মতো কবিগণ জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের পদ লিখিতেন, রাধাকৃষ্ণের স্বর্গীয় প্রেমের বিষয় গান বাঁধিতেন; কিন্তু বাস্তবজীবনের সঙ্গে এই সাহিত্যের যোগাযোগ ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে সুরাটের নবাবের মৃত্যুর পর গুজরাটী জীবন বৈচিত্র্যহীন ও মন্থর হইয়া পড়িল, আধুনিক যুগ আরম্ভের পূর্বে গুজরাটী সাহিত্যেও প্রাণের লক্ষণ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল।

মারাঠী সাহিত্য—এই দিক হইতে মারাঠী সাহিত্যের কিঞ্চিৎ সজীবতা লক্ষ্য করা যাইবে। আধুনিক যুগের অব্যবহিত পূর্বে অধিকাংশ প্রাদেশিক সাহিত্যের বিকাশ প্রায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মারাঠী সাহিত্যে কিছু প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মারাঠী সাহিত্যে দুইটি শাখার স্পষ্ট স্বরূপ ধরা পড়িয়াছে—একটি সংস্কৃত প্রভাবিত ক্লাসিক ধারা, অপরটি লোকসাহিত্যের ধারা। প্রাচীন কবি মুক্তেশ্বরের মহাভারতের মাত্র দু-একটি পর্ব রক্ষা পাইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েকজন কবি মহাভারতের বাকি পর্বগুলি রচনা করিয়া অসমাপ্ত মহাভারতকে পূর্ণতা দিতে চাহিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীধরের সংক্ষিপ্ত মহাভারত 'পাণ্ডবপ্রতাপ' উল্লেখযোগ্য। কবি রামায়ণ অবলম্বনে 'রামবিজয়' এবং ভাগবত অবলম্বনে 'হরিবিজয়' কাব্য লিখিয়া মারাঠী অনুবাদ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি

আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া নিজের ভাষায় কাহিনী বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ভাষা, বচনাবলী, আবেগের স্বাচ্ছতা ইত্যাদি গুণের জন্ম তাঁহার কাব্য তিনখানি মারাঠী সাহিত্যে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। মাধব মুনি ও অমৃত বেদ—অষ্টাদশ শতাব্দীর এই দুই জন কবি মারাঠী সাহিত্যে অপরিচিত নহেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর আর এক কবি মহিপতি 'ভক্ত বিজয়' ও 'ভক্ত লীলামৃত' শীর্ষক দুইখানি জীবনী-কাব্যে মহাপুরুষ চরিত্র বর্ণনা করিয়া গুজরাটী সন্ত-সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একজন বিখ্যাত কবির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। মোরোপন্থ প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণ-মহাকাব্যের আদর্শেই নিজ কাব্যজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন; রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতকে তিনি সহজবোধ্য মারাঠী ভাষায় ও আর্যাছন্দে রূপান্তরিত করিয়া শিক্ষিত সমাজে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এই কাব্য তিনখানিতে অনুবাদ-সাহিত্যের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি অনেক স্থানে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে মূলকে অনুসরণ করিয়াছেন। যদিও তিনি সংস্কৃত ধারায় লালিত হইয়াছিলেন, তবু ভাষার মধ্যে সংস্কৃত প্রাধান্য ত্যাগ করিয়া সরল ভাষা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এমন কি রামায়ণের একস্থানে তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত অপেক্ষা মারাঠী ভাষায় রামায়ণ রচনা করিলে তাহা জনসমাজে অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে—এবং এই জন্যই তিনি জনসাধারণের ভাষা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও রক্ষণশীল মারাঠী পণ্ডিতের দল রামায়ণাদিকে লোকভাষায় অনুবাদের ব্যাপার বিশেষ সুদৃষ্টিতে দেখিতেন না—অনেকটা মধ্যযুগের বাঙলা দেশের মতো। এদেশেও কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসকে সংস্কৃত পণ্ডিতেরা 'সর্বনেশে' বলিতেন। মোরোপন্থ গীতিকবিতায়ও প্রতিভার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন 'কেকাবলী' কবিতায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মারাঠী সাহিত্যের প্রধান অংশ যে প্রাচীন পুরাণ-মহাকাব্য প্রভৃতি ক্লাসিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা স্বীকার করিতে হইবে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের প্রতিকূলতার জন্য মারাঠী কবিরা ক্লাসিক আদর্শ অনুসরণে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত ও শিক্ষাভিমানীদের অগোচরে এই শতাব্দীতে আর একটি কাব্যশাখা ক্রমেই লোকসমাজে বিস্তার লাভ করিতেছিল। এই যুগে অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে একদল

লোককবির আবির্ভাব হয়। ইঁহারা 'শাহির' (লোককবি) নামে পরিচিত। ইঁহারা অবশ্য পুরাদস্তুর কাব্য লিখিয়াছিলেন, যাহাতে অশিক্ষিত মারাঠীরাও বুঝিতে পারে, এইজন্য জনসাধারণের ভাষাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। অনেকটা বাঙলার ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ-গীতিকার মতো পালাগানের আকারে 'শাহিরগণ' দুই ধরনের মারাঠী ব্যালাড বা পালাগান লিখিয়াছিলেন। যে পালাগানে বীরত্বের কাহিনী বর্ণিত হইত, তাহার নাম 'পোয়াদা' আর যাহাতে প্রেমের গান ও প্রণয়কাহিনী স্থান পাইত তাহা 'লাবনী' নামে অভিহিত হইত। শিবাজীর বীরত্বগাথা এবং মারাঠী বীরপুরুষদের কাহিনীই 'পোয়াদা'র প্রধান অবলম্বন। এই জাতীয় বীরত্বের কাহিনী প্রথম লেখক অগেনদাস একটি গাথায় শিবাজী কর্তৃক আফজল খাঁয়ের নিধন বর্ণনা করিয়াছেন। শিবাজী-অনুচর তানাজী কর্তৃক সিংহগড় দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার লইয়া তুলসীদাস নামক এক কবি যে গান রচনা করেন, তাহা কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট এবং মহারাষ্ট্রে আজও প্রচারিত। অবশ্য এই সমস্ত বীরত্বের কাহিনী পুরাপুরি লোকসাহিত্যের অন্তর্গত নহে। কারণ ইহার রচনারীতির বাঁধাবাঁধি বন্ধন এবং নির্দিষ্ট রচনাকার থাকিবার জন্য ইহা পুঁথির সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য। পেশোয়াদের শাসনকালে বীররসাত্মক 'পোয়াদা' গানগুলি বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল।

'লাবনী' গানগুলিই যথার্থ লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্য হইতেই এই শ্রেণীর কবিগায়কের আবির্ভাব হইয়াছিল—যাঁহাদের বড় একটা পুঁথিগত বিদ্যা ছিল না। সুতরাং তাঁহাদের এই সমস্ত কবিতা ও কাহিনী জনসাধারণের মধ্যে যে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ক্রমে ক্রমে লোকসাহিত্য শ্রেণীর এই প্রেম-গীতিকা এত জনপ্রিয় হইল যে, প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণকবি রোমাজোশী, অনন্ত ফণ্ডি, প্রভাকর—এই 'লাবনী' গানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বলিতে কি এই ধরনের গানে প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ই যোগ দিয়াছিলেন—এবং ইহাই যথার্থ গণসাহিত্য। এই প্রেমগীতিকার কোন কোনটিতে উচ্চতর তত্ত্ব ও দার্শনিকতাও স্থান পাইয়াছে। ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দে পেশোয়া শাসনের অবসান কাল পর্যন্ত প্রাচীন মারাঠী সাহিত্যের সীমা। এই যুগে দুই একখানি গদ্য গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। যথা—'মহানুভব' সম্প্রদায়ের 'লীলাচরিত্র',

পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ এবং দুই চারিটি যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনা ও ঐতিহাসিক কাহিনীর যৎসামান্য বিবৃতি। কিন্তু এই গদ্য গ্রন্থগুলির সাহিত্য-মূল্য যৎসামান্য। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতেই মারাঠী গদ্য-সাহিত্যের যথার্থ বিকাশ হইতে আরম্ভ হইল। মারাঠী ভাষার প্রথম উপন্যাস 'যমুনাপর্যটক' (১৮৫৭) এবং বাংলা ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয়।

ওড়িয়া সাহিত্য—অষ্টাদশ শতাব্দীর ওড়িয়া সাহিত্যে উপেন্দ্রভঞ্জ, গোপালকৃষ্ণ ও ব্রজনাথ বড়জেনার ক্লাসিক কাব্যধারা ও গীতিকবিতার আদর্শ ওড়িয়া ভাষী জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল। উড়িষ্যার উপর দিয়া চারি শতাব্দী ধরিয়া বিশৃঙ্খলার ঝড় বহিয়া গিয়াছে, বোধ হয় সেই কারণেই অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের মতো মধ্যযুগের ওড়িয়া সাহিত্য বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে উড়িষ্যার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়, তারপর ইংরাজের ভারতত্যাগের পূর্বে উড়িষ্যার ভাগ্যে আর স্বাতন্ত্র্য লাভ ঘটে নাই। এই কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর উপেন্দ্রভঞ্জের ক্লাসিকধরনের কাব্য এবং গোপালকৃষ্ণের সুমধুর গীতিকা ব্যতীত উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন কাব্যকবিতার উদাহরণ পাওয়া যায় না। তবে এই প্রসঙ্গে ঢেন্‌কানল নিবাসী ব্রজনাথ বড়জেনার 'সমরতরঙ্গ' শীর্ষক ঐতিহাসিক কাব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠা কর্তৃক ঢেনকানল অভিযান সম্পর্কে ব্রজনাথ এই কাব্য রচনা করেন। ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন, তাঁহার পৃষ্ঠপোষক এক স্থানীয় রাজার বীরত্বে ঢেনকানল হইতে মারাঠা শত্রু বিতাড়িত হইয়াছিল। মধ্যযুগীয় ওড়িয়া সাহিত্যের একমাত্র ঐতিহাসিক কাব্য 'সমরতরঙ্গ' শুধু ইতিহাস নহে, কাব্য হিসাবেও প্রশংসার যোগ্য। বাঙলার গঙ্গারামও বর্গীর হাঙ্গামা অবলম্বনে 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' লিখিয়াছিলেন। তাহাতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য থাকিলেও বিশেষ কোন কবিত্বগুণ নাই।

আসামী সাহিত্য—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আসামী সাহিত্যের যৎকিঞ্চিৎ বিকাশ দেখা গেলেও পরবর্তী অর্ধশতকে আসামের রাষ্ট্রব্যবস্থা

যেমন শিথিল হইয়া পড়ে, সাহিত্যও তেমনি নিষ্প্রভ হইয়া যায়। আসাম-রাজ রুদ্রসিংহ এবং তাঁহার সুযোগ্য তিনপুত্র শিবসিংহ, প্রমাত্তা সিংহ ও রাজেশ্বর সিংহের (১৬৯৮-১৭৬৯) সময়ে রাজসভার অনুগ্রহভাজন অনেক কবি সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ বা অনুরূপ আখ্যান লিখিয়াছিলেন। রাজা এবং রাজপুত্রেরাও কিঞ্চিৎ কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। রুদ্রসিংহের পৌত্র (রাজেশ্বর সিংহের পুত্র) যুবরাজ চারুসিংহের জন্য কবিশেখর ভট্টাচার্য নামক এক কবি 'হরিবংশ' রচনা করেন। অবশ্য ইহার সঙ্গে পৌরাণিক হরিবংশ এবং হরির কোন সম্পর্ক নাই। গ্রন্থটি নিছক কামশাস্ত্রের পর্যায়ে পড়ে—নববিবাহিত রাজকুমারের প্রীত্যর্থে রচিত হইয়াছিল। এই শতাব্দীতে গীতগোবিন্দ, হস্তীবিদ্যার্ণব, শঙ্খচূড়বধ, ধর্মপুরাণ প্রভৃতি কাব্যের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এগুলির অধিকাংশই কাব্যধর্ম বর্জিত, কোনটি আবার পুরাতন কাব্যের নকল মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজেশ্বর সিংহের মৃত্যুর পর আসামে যে বিশৃঙ্খলা শুরু হইল তাহা প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত প্রবল বিক্রমে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক শিথিলতার যুগে সাহিত্যাদি কখনও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে আসামী সাহিত্যের বিকাশ প্রায় সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কেবল সত্যমিথ্যাপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা সংবলিত 'বুরঞ্জি'গুলি কিঞ্চিৎ প্রচলিত ছিল।

সমকালীন প্রধান প্রধান প্রাদেশিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইয়া দেখা গেল যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের তুলনায় প্রাদেশিক সাহিত্যসমূহে নূতন কোন বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। মোটামুটি একই ছক ও ছাঁদ প্রাদেশিক সাহিত্যসমূহেও অনুসৃত হইয়াছে। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ, ভক্তিসাহিত্য, কৃত্রিম ক্লাসিক কাব্যকলা—এইগুলি প্রায় তাবৎ ভারতীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। বাঙলায় যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যক্ষেত্রে গদ্যের আবির্ভাব হইয়াছিল, হিন্দী মারাঠী ওড়িয়া প্রভৃতি সাহিত্যেও সেই একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এইখানে বাঙলার সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের আর্যশাখা-সাহিত্যের আত্মীয়তার সম্পর্ক। কতকগুলি বিষয়ে প্রত্যেক প্রদেশের সাহিত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকিলেও

প্রধান বিষয় ও মৌলিক সাহিত্য সাধনায় বাংলা, আসামী, ওড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দী—সবই যে একগোত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যেব ইতিহাস হইতে তাহাব প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

নির্ঘণ্ট

'কমা' চিহ্নের দ্বারা গ্রন্থের নাম বুঝাইতেছে।

পা. টী.—পাদ টীকা